তাফসীর
ইব্‌নে
কাসীর
অষ্ঠম, নবম, দশম ও একাদশ খন্ড
মূলঃ
হাফেজ ইমাদুদ্দিন ইব্‌নু কাসীর (রঃ)
অনুবাদঃ ডঃ মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান

তাফসীর ইবনে কাসীর

অষ্টম, নবম, দশম ও একাদশ খণ্ড

সূরাঃ আন'আম, আ'রাফ, আনফাল তাওবা ও ইউনুস

মূলঃ
হাফেজ আল্লামা ইমাদুদ্দিন ইব্নু কাসীর (রহঃ)

অনুবাদঃ
ডঃ মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান
প্রাক্তন অধ্যাপক ও সভাপতি
আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ।

প্রকাশক :

তাফসীর পাবলিকেশন কমিটি
(পক্ষে ডঃ মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান)
বাসা নং-৫৮, সড়ক নং-২৮
গুলশান, ঢাকা-১২১২

৪র্থ সংস্করণ :
জানুয়ারী-২০০৪ ইং
জিলকদ-১৪২৪ হিঃ
মাঘ-১৪১০ বাং

কম্পিউটার কম্পোজঃ
দারুল ইবতিকার
১০৫, ফকিরাপুল
মালেক মার্কেট (নীচ তলা), ঢাকা।
ফোন : ৯৩৪৮৭৩৬

মুদ্রণ :
আব্দুল্লাহ এন্টারপ্রাইজ
৪৩, [illegible] রোড, মানিকগঞ্জ হাউজ
(৪র্থ তলা), পুরানা পল্টন মোড়, ঢাকা।
ফোন : ০১৮-২৩৭৫২২

বিনিময় মূল্য : ৪৫০.০০

তাফসীর পাবলিকেশন কমিটির সদস্যবৃন্দ

১। **ডঃ মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান**
বাসা নং-৫৮, সড়ক নং-২৮
গুলশান, ঢাকা-১২১২

২। **মোঃ আব্দুল ওয়াহেদ**
বাসা নং-৫৮, সড়ক নং-২৮
গুলশান, ঢাকা।
টেলি : ৮৮২৪০৮০, ৮৮২৩৬১৭

৩। **মোঃ নূরুল আলম**
বাসা নং-১৫, সড়ক নং-১২
সেক্টর-৪, উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা।
ফোন : ৮৯১৪৯৮৩

উৎসর্গ

আমার শ্রদ্ধাষ্পদ আব্বা মরহুম অধ্যাপক মওলানা আবদুল গনীর কাছেই আমি সর্বপ্রথম পাই তাফসীরের মহতী শিক্ষা এবং তাফসীর ইবনে কাসীর তরজমার পথিকৃত আমার মরহুম শ্বশুর মওলানা মুহাম্মদ জুনাগড়ীর কাছে পাই এটি অনুবাদের প্রথম প্রেরণা। প্রায় অর্ধশতাব্দী পূর্বে তিনি পূর্ণাঙ্গভাবে একে উর্দূতে ভাষান্তরিত করেন। আমার জন্যে এঁরা উভয়েই ছিলেন এ গ্রন্থের উৎসাহদাতা, শিক্ষাগুরু এবং প্রাণপ্রবাহ। তাই এঁদের রূহের মাগফিরাত কামনায় এটি নিবেদিত ও উৎসর্গীকৃত।

ডঃ মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান

প্রকাশকের আরয

আল-হামদুলিল্লাহ। যাবতীয় প্রশংসা সেই জাতে পাক-পরওয়ারদিগারে আলম মহান রাব্বুল আ'লামীনের, যিনি আমাদিগকে একটি অমূল্য তাফসীর প্রকাশ করার গুরুদায়িত্ব পালনের তাওফীক দান করেছেন। অনন্ত অবিশ্রান্ত ধারায় দরূদ ও সালাম বর্ষিত হতে থাক সারওয়ারে কায়েনাত নবীপাক মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর। আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে আল্লাহ কবূল করুন। -আমীন!

ডঃ মুহাম্মদ মুজীবুর রহমানের অনুদিত ৮, ৯, ১০, ১১ নম্বর খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ নিঃশেষ হয়ে যাওয়ায় অসংখ্য গুণগ্রাহী ইসলামী চিন্তাবিদ এবং ভক্ত অনুরাগী ভাই-বোনের অনুরোধে ও বর্তমানে চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা পুনঃ তৃতীয় সংস্করণের কাজে হাত দিই। মহান আল্লাহ পাকের অশেষ কৃপায় তৃতীয় সংস্করণ অফসেট কাগজে প্রকাশ করতে পেরে আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করছি।

ঢাকাস্থ গুলশান সেন্ট্রাল মসজিদের সহকারী ইমাম ও এই মসজিদের হাফেজিয়া মাদ্রাসার শিক্ষক আলহাজ্জ হাফেজ মাওলানা মোহাম্মদ আবদুর রহিম সাহেব ছাপাবার পূর্ব মুহূর্তে পুনরায় নিখুঁতভাবে শেষ প্রুফটি দেখে দিয়েছেন। এজন্য আমরা তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

তৃতীয় সংস্করণে যদি কিছু ভুল ভ্রান্তি থেকে থাকে, ক্ষমার দৃষ্টি নিয়ে আমাদের অবহিত করলে পরবর্তীতে সংশোধনের চেষ্টা করবো ইন্‌শাআল্লাহ।

তাফসীর ইবনে কাসীরের এই খণ্ডটি প্রকাশ করতে গিয়ে যারা আমাদের সর্বতোভাবে সাহায্য করেছেন তাদের মধ্যে মাওলানা মোঃ মুজিবুর রহমান (কাতিব) সাহেবের নিকট আমরা কৃতজ্ঞ। তিনি কম্পিউটার কম্পোজ থেকে শুরু করে আরবী হস্তলিপি এবং অন্যান্য সম্পাদনার কাজে যথাযথভাবে সাহায্য করেছেন। মুদ্রণের গুরুদায়িত্ব পালন করেছেন আবদুল্লাহ এন্টারপ্রাইজের মালিক ও কর্মচারীবৃন্দ। তাদেরকেও আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই।

তাফসীর পাবলিকেশন কমিটি

অনুবাদকের আরয

মানবকুলের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ তাঁরাই যাঁরা পবিত্র কুরআনের পঠন-পাঠনে নিজেকে নিয়োজিত করেন সর্বতোভাবে। তাই নবী আকরামের (সঃ) এই পুতঃবাণী সকল যুগের জ্ঞান-তাপস ও মনীষীদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছে পাক কুরআনের ব্যাখ্যা প্রণয়ন করার কাজে।

তাফসীর ইবনে কাসীরের ব্যাপক জনপ্রিয়তা, কল্যাণকারিতা এবং অপরিসীম গুরুত্ব ও মূল্যের কথা সম্যক অনুধাবন করে আজ থেকে প্রায় অর্ধ শতাব্দী পূর্বে এটি উর্দূতে পূর্ণাঙ্গভাবে ভাষান্তরিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছিল। এই উর্দূ অনুবাদের গুরু দায়িত্বটি অম্লানবদনে পালন করেছিলেন উপমহাদেশের অপ্রতিদ্বন্দ্বী আলেম, প্রখ্যাত ভাষাবিদ ও বিদগ্ধ মনীষী মওলানা মুহাম্মদ সাহেব জুনাগড়ী স্বীয় ক্ষুরধার বলিষ্ঠ লেখনীর মাধ্যমে। তখন থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত এটি পাক ভারতের উর্দূ ভাষাভাষীদের ঘরে ঘরে অতি ব্যাপকভাবে প্রচারিত ও পঠিত হয়ে আসছে। এভাবে এই উপমহাদেশের আনাচে কানাচে দলমত নির্বিশেষে সকল মহলেই এটি সমাদৃত ও সর্বজন গৃহীত।

আমি তাফসীর ইবনে কাসীরের মূল প্রণেতা আল্লামা হাফেজ ইমাদুদ্দীনের প্রামাণ্য জীবনী লিখে যেমন প্রকাশ করেছি, তেমনি তার উর্দূ অনুবাদক মওলানা জুনাগড়ীরও তথ্যভিত্তিক জীবন কথা লিখে প্রকাশ করেছি। কারণ একজন প্রণেতা, লেখক ও অনুবাদককে বিলক্ষণভাবে না জানতে পারলে তাঁর সংকলিত বা অনূদিত গ্রন্থের গুণাগুণ সম্পর্কে সম্যক পরিচিতি লাভ আদৌ সম্ভবপর নয়। ইংরেজী ভাষার প্রবচন অনুযায়ী লেখককে তার ভাষা শৈলী, সাহিত্যরীতি ও লেখনীর মাধ্যমেই জানতে হয়।

এই উর্দূ এবং অন্যান্য ভাষায় ইবনে কাসীরের অনুবাদের ন্যায় আমাদের বাংলা ভাষাতেও বহু পূর্বে এই তাফসীরটির অনুবাদ হওয়া যেমন উচিত ছিল, তেমনি এর প্রকট প্রয়োজনও ছিল। কারণ এ বিশ্ব জাহানের বিভিন্ন ভাষাভাষী মুসলিম জনগণের মধ্যে তুলনামূলকভাবে বাংলা ভাষী মুসলমানের সংখ্যা হচ্ছে সর্বাধিক। কিন্তু এ সত্ত্বেও এই সংখ্যা গরিষ্ঠের তুলনায় এবং এই প্রকট প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে আজ পর্যন্ত বাংলা ভাষায় কুরআন তরজমা ও তাফসীর রচনার প্রয়াস নিতান্ত অপর্যাপ্ত ও অপ্রতুল। ব্যাপারটা সত্যিই অতি মর্মপীড়াদায়ক। তাই একান্ত ন্যায়সংগতভাবেই প্রত্যাশা করা যায় যে, একমাত্র হাদীস ভিত্তিক এই বিরাট তাফসীর ইবনে কাসীরের বাংলা তরজমার মহোত্তম পরিকল্পনা যেদিন বাস্তবে রূপ লাভ করে ক্রমশঃ খণ্ডাকারে ও পূর্ণাঙ্গরূপে প্রকাশিত হবে, সেদিন এ ক্ষেত্রে শুধুমাত্র একটা নতুন দিগন্তই উন্মোচিত হবে না, বরং নিঃসন্দেহে এক বিরাট দৈন্য এবং প্রকট অভাবও পূরণ হবে। এই মহান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করেই আমার "বাংলা ভাষায় কুরআন চর্চা" শীর্ষক প্রায় ৫৬৪ পৃষ্ঠা বইটি ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে। আরো হয়েছে, 'কুরআনের

চিরন্তন মুজিযা', 'কুরআন কণিকা', "ইজাযুল কুরআন ইত্যাদি। শেষোক্তটি উর্দূ ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে বেনারসের (ভারত) এক প্রকাশনী সংস্থা থেকে।

আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন আব্বা মরহুম অধ্যাপক মওলানা আবদুল গনী সাহেবের কাছেই সর্বপ্রথম আমার কুরআন এবং তাফসীরের শিক্ষা। অতঃপর দেশ-বিদেশের শ্রেষ্ঠ খ্যাতিমান কুরআন-হাদীস বিশারদদের কাছে শিক্ষা গ্রহণের পর দীর্ঘ দুই যুগেরও অধিককাল ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর শ্রেণীসমূহের হাদীস ও তাফসীরের ক্লাশ নিয়েছি। সাহিত্য জীবনেও আমার রচিত অন্যান্য গ্রন্থমালা যে প্রধানতঃ হাদীস ও তাফসীর বিষয়েই সীমাবদ্ধ এ সম্পর্কে আমি ইতিপূর্বে ইঙ্গিত জানিয়েছি।

এইসব ন্যায়সঙ্গত এবং অনুকূল প্রেক্ষাপটের কারণেই আমি আজ বহুদিন ধরে তাফসীর ইবনে কাসীরকে বাংলায় ভাষান্তরিত করার সুপ্ত আকাংখা অন্তরের গোপন গহনে লালন করে আসছিলাম। কিন্তু এ পর্যন্ত একে বাস্তবে রূপ দেয়ার তেমন কোন সম্ভাবনাময় সুযোগ-সুবিধে আমি করে উঠতে পারিনি।

তাই আজ থেকে প্রায় দেড় যুগ আগে একমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা করে এই বিরাট তাফসীরের অনুবাদ কর্মে হাত দিই এবং অতিসন্তর্পনে এই কন্টকাকীর্ণ পথে সতর্ক পদচারণা শুরু করি এবং কয়েকটি খণ্ড প্রকাশ করি।

এ ব্যাপারে আমার প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল বাংলায় তাফসীর সাহিত্যের অভাব পূরণ এবং ভাষাভাষীদের জন্যে আমার গুরুদায়িত্ব পালন।

জনাব আবদুল ওয়াহেদ সাহেব বাকী খণ্ডগুলোর সুষ্ঠু প্রকাশনার উদ্যোগ নিতে গিয়ে ৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটিও গঠন করেন। এই সদস্যমণ্ডলীর মধ্যে তিনি এবং আমি ছাড়া বাকি দু'জন হচ্ছেন তার সহকর্মী জনাব নূরুল আলম ও মরহুম মুহাম্মদ মকবুল হোসেন সাহেব। কিছু দিন পর গ্রুপ ক্যাপ্টেন (অবঃ) মামুনুর রশীদ সাহেব এই কমিটিতে যোগ দিন। এভাবে আল্লাহ পাক অপ্রত্যাশিত ও অকল্পনীয়ভাবে তাঁর মহিমান্বিত মহাগ্রন্থ আল্ কুরআনুল কারীমের ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের অচল প্রায় কাজটিকে সচল ও অব্যাহত রাখার ব্যবস্থা করলেন এবং এ ব্যাপারে সার্বিক সহযোগিতা করেন গ্রুপ ক্যাপ্টেন (অবঃ) মামুনুর রশীদ সাহেব, বেগম বদরিয়া রশীদ এবং বেগম ইয়াসমিন রোকাইয়া ওয়াহেদ। সুতরাং সকল প্রকার প্রশংসা ও স্তবস্তুতি একমাত্র আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলার। এই জন্য আল্লাহর দরবারে কমিটির সবাইর জন্যে এবং তাঁদের সহকর্মীবৃন্দ, বন্ধু-বান্ধব, ও পরিবারবর্গের জন্যে সর্বাঙ্গীন কল্যাণ, মঙ্গল ও শুভ কামনা করতে গিয়ে প্রাণের গোপন গহণ থেকে উৎসারিত দোয়া, মোনাজাত ও আকুল মিনতি প্রতিনিয়তই পেশ করছি।

আরো মুনাজাত করছি যেন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এই কুরআন তাফসীর প্রচারের বদৌলতে আমাদের মরহুম আব্বা আম্মার রূহের প্রতি স্বীয় অজস্র রহমত, আশীষ ও মাগফিরাতের বারিধারা বর্ষণ করেন। আমীন! রোয হাশরের

অনন্ত সওয়াব রিসানী এবং বরকতের পীযুষধারায় স্নাতসিক্ত করে আল্লাহপাক যেন তাঁদের জান্নাত নসীব করেন। সুম্মা আমীন!

এই খণ্ডগুলির দ্বিতীয় সংস্করণ থেকে প্রকাশনার ক্ষেত্রে বিন্যাসের একটু ব্যতিক্রম ঘটলো। ইতিপূর্বে সব খণ্ডগুলো হয়েছে পারা ভিত্তিক কিন্তু এবার হলো সূরা ভিত্তিক। কারণ প্রতি পারায় সমাপ্তির সাথে সাথে খণ্ডের পরিসমাপ্তি ঘটলে সূরার একটা চলমান বিষয়বস্তু হঠাৎ করে স্তব্ধ হয়ে যায়। এতে করে পাঠকের মনের কোণে একটা অস্ফুট অতৃপ্তি ও অব্যক্ত অস্বস্তি বিরাজ করে। এই অতৃপ্তির নিরসন কল্পেই সূরা ভিত্তিক প্রকাশনার অবতারণা।

ইয়া রাব্বুল আলামীন! এই তাফসীর তরজমার সকল ত্রুটি বিচ্যুতি ও ভ্রমপ্রমাদ আমার একান্তই নিজস্ব এবং এর যা কিছু শুভ কল্যাণপ্রদ ও ভালো দিক রয়েছে সেগুলো সবই তোমার নিজস্ব। তাই মেহেরবানী করে তুমিই আমাদের সবাইকে তোমার পাক কালাম সম্যক অনুধাবন, সঠিক হৃদয়ঙ্গম এবং তার প্রতি আমল করার পূর্ণ তাওফীক দান করো। একান্ত দয়া পরবশ হয়ে তুমি আমাদের সবার এ শ্রম সাধনা কবূল করো। একমাত্র তোমার তাওফীক এবং শক্তি প্রদানের উপরেই তাফসীর তরজমার এই মহত্তম পরিকল্পনার সুষ্ঠ পরিসমাপ্তি নির্ভরশীল। তাই এ সম্পর্কিত সকল ভ্রমপ্রমাদকে ক্ষমা ও সুন্দর চোখে দেখে পবিত্র কুরআনের এই সামান্যতম খিদতম আমাদের সবার জন্যে পারলৌকিক মুক্তির সম্বল ও নাজাতের অসীলা করে দাও। আমীন! সুম্মা আমীন!!

এই তাফসীর খণ্ডকে দিনের আলো বাতাসের সঙ্গে পরিচিত করতে গিয়ে কম্পিউটার কম্পোজ থেকে শুরু করে আরবী হস্তলিপি ও সুষ্ঠ মুদ্রণের গুরুদায়িত্ব কাঁধে নিয়ে মওলানা মোহাম্মদ মুজিবুর রহমান (কাতিব) সাহেব এবং আবদুল্লাহ এন্টারপ্রাইজের মালিক ও কর্মচারীবৃন্দ যে কর্তব্য পরায়ণতা ও যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন তা সকল যুগেই দৃষ্টান্তমূলক প্রশংসার দাবিদার। এ প্রসঙ্গে মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান ও সাফিয়া রহমান প্রমুখ আমার সন্তান সন্তুতি আন্তরিকতাপূর্ণ প্রচেষ্টা কোন ক্রমেই কম নয়। তাই এঁদের সবাইকে শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে প্রতিনিয়ত দোয়া করছি যেন মহান আল্লাহ এঁদেরকেও কুরআন খিদমতের নেকীতে শামিল করে নেন। আমীন!

বিনয়াবনত
ডঃ মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান
প্রাক্তন প্রফেসর ও চেয়ারম্যান
আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ।

বর্তমানে
তওহীদ ও সানতুল হক সেন্টার ইনঃ
১২৪-০৭, জামাইকা এভিনিউ,
রিচমিণ্ড হিল, নিউইয়র্ক-১১৪১৮
যুক্তরাষ্ট্র

সূচীপত্রঃ

সূরা ঃ আন'আম মাক্কী سُورَةُ الْاَنْعَامِ مَكِّيَّةٌ

(আয়াতঃ ১৬৫, রুকু' ঃ ২০) (اٰيَاتُهَا : ١٦٥، رُكُوْعَاتُهَا : ٢٠)

সূরায়ে আন'আম মক্কায় এক রাতের মধ্যেই সম্পূর্ণটা একই সাথে অবতীর্ণ হয়। সত্তর হাজার ফেরেশতা এই সূরাটি নিয়ে হাজির হন এবং তাসবীহ পাঠ করতে থাকেন। হযরত আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রাঃ) বলেনঃ নবী (সঃ) উষ্ট্রীর উপর সওয়ার ছিলেন। এমতাবস্থায় সূরায়ে আন'আম অবতীর্ণ হচ্ছিল। আমি তাঁর উষ্ট্রীটির লাগাম ধরে রেখেছিলাম। অহীর ভারে উষ্ট্রীটির পিঠ এমনভাবে কুঁজো হয়ে যাচ্ছিল যে, মনে হচ্ছিল যেন ওর পিঠের হাড় ভেঙ্গে যাবে। ফেরেশতাগণ আসমান ও যমীনকে পরিবেষ্টন করে রেখেছিলেন। সূরায়ে আন'আম অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাসবীহ পড়তে শুরু করেন এবং বলেনঃ "এই সূরার অনুসরণে ফেরেশতাগণ দিগন্ত পর্যন্ত পরিবেষ্টন করে রেখেছিলেন। তাঁদের سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ -এই তাসবীহের গুঞ্জনে আসমান ও যমীন মুখরিত ছিল।" রাসূলুল্লাহ (সঃ) নিজেও এই তাসবীহ পাঠ করছিলেন। তিনি বলেনঃ "সূরায়ে আন'আম একবারেই অবতীর্ণ হয়েছে এবং এটা সত্তর হাজার ফেরেশতার তাসবীহ ও তাহমীদের গুঞ্জনের মাধ্যমে অবতীর্ণ হয়েছে।"

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

পরম দয়ালু দাতা আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)।

١- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمٰتِ وَالنُّوْرَ ثُمَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُوْنَ ○

১। সমস্ত প্রশংসাই আল্লাহর জন্যে যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং সৃষ্টি করেছেন আলো ও অন্ধকার; এটা সত্ত্বেও যারা কাফির হয়েছে তারা অপর জিনিসকে তাদের প্রতিপালকের সমকক্ষ নিরূপণ করছে।

٢- هُوَ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ طِيْنٍ ثُمَّ قَضٰۤى اَجَلًا ۭ وَاَجَلٌ

২। অথচ তিনিই তোমাদেরকে মাটি হতে সৃজন করেছেন, অতঃপর তোমাদের জীবনের জন্যে একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ নির্ধারণ করেছেন, এ ছাড়া

مُّسَمًّى عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ ○

একটি নির্দিষ্ট মেয়াদও তাঁর নিকট নির্ধারিত রয়েছে, কিন্তু এর পরেও তোমরা সন্দেহ করে থাক।

٣- وَهُوَ اللّٰهُ فِى السَّمٰوٰتِ وَفِى الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ ○

৩। আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে ঐ এক আল্লাহই রয়েছেন, তোমাদের অপ্রকাশ্য ও প্রকাশ্য সব অবস্থাই তিনি জানেন, আর তোমরা ভাল মন্দ যা কিছু কর সেটাও তিনি পূর্ণরূপে অবগত আছেন।

এখানে মহান আল্লাহ তাঁর পবিত্র সত্তার প্রশংসা করছেন যে, তিনিই আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। যেন তিনি স্বীয় বান্দাদেরকে প্রশংসা করার কথা শিক্ষা দিচ্ছেন। তিনি দিনে আলোককে এবং রাত্রে অন্ধকারকে তাঁর বান্দাদের জন্যে একটা উপকারী বস্তু বলে ঘোষণা দিচ্ছেন। এখানে نُورٌ শব্দটিকে একবচন এবং ظُلُمٰتٌ শব্দটিকে বহুবচনরূপে ব্যবহার করা হয়েছে। কেননা, উৎকৃষ্ট জিনিসকে একবচন রূপেই ব্যবহার করা হয়ে থাকে। যেমন আল্লাহ তা'আলার উক্তি রয়েছেঃ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ এবং وَأَنَّ هٰذَا صِرَاطِى مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَاتَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ এখানে يَمِينٌ শব্দকে একবচন এবং شَمَائِل শব্দকে বহুবচন আনা হয়েছে। আর নিজের রাস্তাকে سَبِيل বলে একবচন এনেছেন এবং ভুল রাস্তাগুলোকে سُبُلٌ বলে বহুবচন এনেছেন। মোটকথা, যদিও আল্লাহর কতকগুলো বান্দা কুফরীতে লিপ্ত হয়ে তাঁর শরীক স্থাপন করেছে এবং তাঁর স্ত্রী ও সন্তান সাব্যস্ত করেছে (নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক),তথাপি তিনি এ সবকিছু হতে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র।

هُوَ الَّذِى خَلَقَكُمْ مِّنْ طِينٍ –তিনি সেই প্রভু যিনি তোমাদেরকে মাটি হতে সৃষ্টি করেছেন অর্থাৎ তোমাদের পিতা হযরত আদম (আঃ)-কে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছিল এবং মাটিই তাঁর গোশত ও চামড়ার আকার ধারণ করেছিল। অতঃপর তাঁরই মাধ্যমে মানবকে সৃষ্টি করে পূর্ব ও পশ্চিমে ছড়িয়ে দেয়া হয়। তারপর হযরত আদম (আঃ) পূর্ণ শক্তি প্রাপ্ত হন এবং তাঁর মৃত্যুর নির্ধারিত সময়ে পৌঁছে যান। হযরত হাসান (রঃ)-এর মতে প্রথম اَجَل শব্দ দ্বারা মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের

সময় বুঝানো হয়েছে। আর দ্বিতীয় اَجَل শব্দ দ্বারা মৃত্যুর পরে পুনর্জীবন পর্যন্ত সময়কে বুঝানো হয়েছে। اَجَلِ خَاصٌ হচ্ছে মানুষের চলন্ত বয়স এবং اَجَلِ عَامٌ হচ্ছে সারা দুনিয়ার বয়স অর্থাৎ দুনিয়া লয়প্রাপ্ত হওয়া থেকে নিয়ে দারে আখিরাতের সময় আসা পর্যন্ত।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এবং হযরত মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, প্রথম اَجَل দ্বারা দুনিয়ার সময়কাল এবং اَجَلٍ مُّسَمًّى দ্বারা মানুষের জীবন হতে মৃত্যু পর্যন্ত সময়কে বুঝানো হয়েছে। এটা যেন আল্লাহ তা'আলার নিম্নের উক্তি হতেই গ্রহণ করা হয়েছে ঃ

وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّكُمْ..... অর্থাৎ "তিনি রাত্রিকালে তোমাদেরকে মেরে ফেলেন এবং দিবা ভাগে তোমরা যা কিছু কর তা তিনি সম্যক অবগত। আর রাত্রিকালে তো তোমরা কিছুই করতে পার না।" (৬ঃ ৬০) অর্থাৎ তোমরা সে সময় নিদ্রিত অবস্থায় থাক এবং সেটা হচ্ছে আত্মা বেরিয়ে যাওয়ার রূপ। তারপরে তোমরা জেগে ওঠ, তখন যেন তোমরা তোমাদের সঙ্গী সাথীদের কাছে ফিরে আস। আর তাঁর عِنْدَهٗ -এই উক্তির অর্থ এই যে, ঐ সময়টা একমাত্র তিনি ছাড়া আর কেউ জানে না। যেমন তিনি অন্য এক জায়গায় বলেছেনঃ "ওর জ্ঞান একমাত্র আল্লাহরই কাছে। ওর সময় আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানতে পারে না।" অনুরূপভাবে আল্লাহ পাকের উক্তি "হে নবী (সঃ)! লোকেরা তোমাকে কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে যে, ওটা কখন সংঘটিত হবে? তাহলে তোমার ঐ সম্পর্কে কি জ্ঞান আছে? এ জ্ঞানতো একমাত্র আল্লাহরই রয়েছে" -এই উক্তির অর্থ এটাই। তারপর ওর নীচের আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে– "আকাশসমূহ ও পৃথিবীর আল্লাহ তিনিই, তিনি তোমাদের প্রকাশ্য কথা সম্পর্কেও জ্ঞান রাখেন এবং গোপন কথা সম্পর্কেও তাঁর পূর্ণ জ্ঞান রয়েছে, আর তোমরা যা কিছু করছো সেটাও তিনি সম্যক অবগত।" এই আয়াতের তাফসীরকারকগণ প্রথমে জাহমিয়া সম্প্রদায়ের উক্তির অস্বীকৃতির উপর একমত হয়েছেন। অতঃপর তাঁদের পরস্পরের মধ্যেও কিছুটা মতানৈক্য দেখা দিয়েছে। জাহমিয়াদের উক্তি এই যে, এই আয়াত এই অর্থ বহন করছে যে, আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক জায়গাতেই স্বয়ং বিদ্যমান রয়েছেন। অর্থাৎ এই আকীদায় এই কথা গ্রহণ করা হচ্ছে যে, আল্লাহ পাক প্রত্যেক জিনেসের মধ্যে স্বয়ং বিদ্যমান রয়েছেন। সঠিক উক্তি এই যে, আসমান ও যমীনে একমাত্র আল্লাহকেই মান্য করা হয় এবং তাঁরই ইবাদত করা হয়। আকাশে যেসব ফেরেশতা রয়েছে ও যমীনে যেসব মানুষ রয়েছে সবাই

তাঁকে মা'বূদ বলে স্বীকার করছে। তঁকে তারা 'আল্লাহ' বলে ডাকতে রয়েছে। কিন্তু জ্বিন ও মানুষের মধ্যে যারা কাফির তারা তাঁকে ভয় করে না। আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেছেনঃ 'তিনিই আকাশসমূহেরও আল্লাহ এবং যমীনেরও আল্লাহ।' এই উক্তিরও ভাবার্থ এটাই যে, আসমানে যত কিছু রয়েছে এবং যমীনে যত কিছু রয়েছে সবারই তিনি আল্লাহ। অর্থ এটা নয় যে, আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে ওগুলোই আল্লাহ। এর উপর ভিত্তি করেই নির্দেশ দেয়া হচ্ছে যে, তিনি তোমাদের গোপন কথাও জানেন এবং প্রকাশ্য কথাও জানেন।

দ্বিতীয় উক্তি এই যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে—আল্লাহ তিনিই যিনি আকাশ ও পৃথিবীর সমস্ত প্রকাশ্য ও গোপনীয় কথা জানেন এবং এটা তাঁর فِى السَّمٰوٰتِ وَفِى الْاَرْضِ يَعْلَمُ -এই উক্তির সাথে সম্পর্কযুক্ত। এর অন্তর্নিহিত অর্থ এটাই হচ্ছে যে, তিনিই আল্লাহ যিনি আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে তোমাদের সমস্ত কথা জানেন এবং তোমরা যা কিছু কর ওর সংবাদ তিনি রাখেন।

তৃতীয় উক্তি এই যে, هُوَاللّٰهُ فِى السَّمٰوٰتِ -এটা وَقْف تَام বা পূর্ণ বিরতি। এর পরে পুনরায় خَبَر -এর সূচনা হচ্ছে। অর্থাৎ هُوَاللّٰهُ فِى السَّمٰوٰتِ হচ্ছে مُبْتَدَاء এবং فِى الْاَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ হচ্ছে خَبَر আর ইবনে জারীর (রঃ)-এর মত এটাই।

৪। আর তাদের অবস্থা হচ্ছে এই যে, তাদের নিকট তাদের প্রতিপালকের নিদর্শনসমূহ হতে যে কোন নিদর্শনই আসুক না কেন, তা হতেই তারা মুখ ফিরিয়ে নিয়ে থাকে।

٤- وَمَا تَاْتِيْهِمْ مِّنْ اٰيَةٍ مِّنْ اٰيٰتِ رَبِّهِمْ اِلَّا كَانُوْا عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ ○

৫। সুতরাং তাদের নিকট যখন সত্য এসেছে, ওটাও তারা মিথ্যা জেনেছে, অতএব অতিসত্বরই তাদের নিকট সেই বিষয়ের সংবাদ এসে পৌঁছবে, যার সাথে তারা ঠাট্টা বিদ্রূপ করতো।

٥- فَقَدْ كَذَّبُوْا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاۤءَهُمْ فَسَوْفَ يَاْتِيْهِمْ اَنْۢبٰۤؤُا مَا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ○

٦- اَلَمْ يَرَوْا كَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ قَرْنٍ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَّكُمْ وَاَرْسَلْنَا السَّمَآءَ عَلَيْهِمْ مِّدْرَارًا ۖ وَّجَعَلْنَا الْاَنْهٰرَ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهِمْ فَاَهْلَكْنٰهُمْ بِذُنُوْبِهِمْ وَاَنْشَاْنَا مِنْۢ بَعْدِهِمْ قَرْنًا اٰخَرِيْنَ ○

৬। তারা কি ভেবে দেখেনি যে, আমি তাদের পূর্বে বহু দল ও সম্প্রদায়কে ধ্বংস করে দিয়েছি, যাদেরকে দুনিয়ায় এমন শক্তি সামর্থ্য ও প্রতিপত্তি দিয়েছিলাম, যা তোমাদেরকে দেইনি, আর আমি তাদের প্রতি আকাশ হতে প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করেছি এবং তাদের নিম্নভূমি হতে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত করেছি, কিন্তু আমার নিয়ামতের না শোকরীর দরুন গুনাহের কারণে আমি তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছি, এবং তাদের পর অন্য নবতর জাতি ও সম্প্রদায়সমূহ সৃষ্টি করেছি।

মুশরিক ও কাফিরদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, যখনই তাদের কাছে আল্লাহর কোন আয়াত আসে অর্থাৎ কোন মু'জিযা বা আল্লাহ তা'আলার একত্বের উপর কোন স্পষ্ট দলীল অথবা রাসূল (সঃ)-এর সত্যতার কোন নিদর্শন এসে পড়ে তখন তারা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং ওটাকে মোটেই গ্রাহ্য করে না। আর যখন তাদের কাছে সত্য কথা এসে যায় তখন তারা তা অস্বীকার করতে শুরু করে। এর পরিণাম তারা সত্বরই জানতে পারবে। এটা তাদের জন্যে কঠিন হুমকি স্বরূপ। কেননা, তারা সত্যকে মিথ্যা জেনেছে। সুতরাং এখন এই মিথ্যা প্রতিপন্ন করার পরিণাম তাদেরকে অবশ্যই দেখতে হবে। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ভয় প্রদর্শন করছেন যে, তাদের পূর্ববর্তী লোকেরা, যারা তাদের চেয়ে বেশী শক্তিশালী ছিল এবং শাসন ক্ষমতাও লাভ করেছিল, আর সংখ্যার দিক দিয়েও তারা অধিক ছিল, তাদেরকেও তিনি শাস্তি থেকে রেহাই দেননি। এটা থেকে তাদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত যে, ঐরূপ শাস্তি তাদের উপরও এসে যেতে পারে। তাই আল্লাহ পাক বলেনঃ তারা কি দেখেনি যে, আমি তাদের পূর্বে বহু কওমকে ধ্বংস করে দিয়েছি? অথচ তারা

দুনিয়ায় বিরাট শক্তির অধিকারী ছিল! তাদের মত ধন-দৌলত, সন্তান-সন্ততি এবং শান-শওকত তোমরা লাভ করতে পারনি। আমি তাদের উপর আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করতাম। তারা দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হয়নি। তাদেরকে আমি বাগ-বাগিচা, ঝরণা এবং নদ-নদী প্রদান করেছিলাম। এর দ্বারা আমার উদ্দেশ্য ছিল তাদেরকে ঢিল দিয়ে রাখা। অতঃপর তাদের পাপের কারণে আমি তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছি এবং তাদের স্থলে অন্য কওমকে এনে বসিয়েছি। পূর্ববর্তী লোকেরা তো তাদের কর্মফল হিসেবে ধ্বংস হয়ে যায়! তাদের পরবর্তী লোকেরাও কিন্তু তাদের মতই আমল করে, ফলে তাদের মত তারাও হালাক হয়ে যায়। অতএব, হে লোক সকল! তোমরাও ভয় কর, নতুবা তোমাদের পরিণতিও তাদের মতই হবে। তোমাদেরকে ধ্বংস করা তাদের তুলনায় আল্লাহর কাছে মোটেই বড় কাজ নয়। তোমরা যে রাসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছো তিনি তো তাদের রাসূল অপেক্ষা বেশী মর্যাদার অধিকারী। সুতরাং তোমরা যদি তাঁর আনুগত্য স্বীকার না কর তবে তোমরা তাদের চেয়ে বেশী শাস্তির যোগ্য হয়ে যাবে।

৭। (হে নবী সঃ!) যদি আমি কাগজের উপর লিখিত কোন কিতাব তোমার প্রতি অবতীর্ণ করতাম, অতঃপর তারা তা নিজেদের হস্ত দ্বারা স্পর্শও করতো; তবুও কাফির ও অবিশ্বাসী লোকেরা বলতো যে, এটা প্রকাশ্য যাদু ছাড়া আর কিছুই নয়।

৭- وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتٰبًا فِيْ قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوْهُ بِاَيْدِيْهِمْ لَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ○

৮। আর তারা বলে থাকে যে, তাদের কাছে কোন ফেরেশ্তা কেন অবতীর্ণ করা হয় না? আমি যদি প্রকৃতই কোন ফেরেশ্তা অবতীর্ণ করতাম তবে যাবতীয় বিষয়েরই চূড়ান্ত সমাধান হয়ে যেতো, অতঃপর আর তাদেরকে কিছু মাত্রই অবকাশ দেয়া হতো না।

৮- وَقَالُوْا لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ اَنْزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِيَ الْاَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُوْنَ ○

৯- وَلَوْ جَعَلْنٰهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنٰهُ رَجُلًا وَّلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَّا يَلْبِسُوْنَ ○

৯। আর যদি আমি ফেরেশ্‌তাই অবতীর্ণ করতাম তবে তাকে মানুষ রূপেই করতাম। আর আমার এই কাজ দ্বারা তাদেরকে আমি সেই সন্দেহেই ফেলে দিতাম, যে সন্দেহ ও প্রশ্ন এখন তারা করছে।

১০- وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِيْنَ سَخِرُوْا مِنْهُمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ○ ع

১০। বাস্তবিকই তোমার পূর্বে যেসব রাসূল এসেছিল, তাদের সাথেও ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হয়েছে, ফলতঃ এইসব ব্যঙ্গ বিদ্রূপের পরিণামফল বিদ্রূপকারীদেরকে পরিবেষ্টন করে ফেলেছিল।

১১- قُلْ سِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ ثُمَّ انْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ ○

১১। (হে নবী সঃ!) তুমি বল, তোমরা ভূ-পৃষ্ঠে পরিভ্রমণ কর, অতঃপর সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদের পরিণাম কি হয়েছে তা গভীর অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য কর।

এখানে আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের বিরোধিতা, অহংকার এবং তর্ক-বিতর্কের সংবাদ দিতে গিয়ে বলেন, যদি তোমাদের উপর আমি কাগজে লিখিত কোন কিতাবও অবতীর্ণ করতাম, আর তোমরা তা হাত দ্বারা স্পর্শ করতেও পারতে এবং আকাশ হতে অবতীর্ণ হতেও দেখতে পেতে, তবে তখনও তোমরা এ কথাই বলতে যে, এটা সরাসরি যাদু। যেমন অনুভূতিশীল বস্তুর মধ্যেও তাদের ঝগড়াপ্রিয় স্বভাবের চাহিদা এটাই যে, যদি আমি তাদের জন্যে আকাশের একটা দরজা খুলে দেই এবং তারা ওর উপর চড়তেও শুরু করে তথাপি তারা বলবে যে, তাদেরকে নযরবন্দী করে দেয়া হয়েছে। কিংবা যেমন আল্লাহ পাক বলেন যে, যদি তারা আকাশের একটা খণ্ড পতিত হতেও দেখে, তবে তখনও তারা বলবে যে, ওটা মেঘের একটা টুকরা।

অতঃপর তাদের 'আমাদের কাছে কোন ফেরেশ্‌তা অবতীর্ণ করা হয় না **কেন?'** এই উক্তি সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, ঐরূপ হলে তো কাজের ফায়সালাই হয়ে যেতো। কেননা, ফেরেশ্‌তাকে দেখার পরেও তারা যাদু[illegible] কথাই বলতো। কিন্তু তখন আর তাদেরকে সঠিক পথে আসবার জন্যে [illegible] দেয়া হতো না, বরং তৎক্ষণাৎ তারা আল্লাহর আযাবে পতিত [illegible] ওটা তাদের জন্যে মোটেই সুসংবাদ নয়।

ইরশাদ হচ্ছে—যদি আমি মানব রাসূলের সাথে কোন ফেরেশতাকে প্রেরণও করতাম তবে সেও তাদের কাছে মানুষের আকারেই আসতো যাতে তারা তার সাথে আলাপ করতে পারে বা তার থেকে কোন উপকার লাভ করতে পারে। আর যদি এরূপ হতো তবে ব্যাপারটা তাদের কাছে সন্দেহজনকই থেকে যেতো যেমন তারা মানব রাসূলের ব্যাপারে সন্দেহ করতে রয়েছে। যেমন এক জায়গায় মহান আল্লাহ বলেছেনঃ "আমি তো আকাশ থেকে ঐ সময় ফেরেশতা পাঠাতাম যখন তারা যমীনে চলাফেরা করতো এবং যখন এইরূপ হতো তখন আকাশ থেকে পাঠাবার কি প্রয়োজন থাকতো? এটা তো আল্লাহর রহমত যে, যখন তিনি মাখলূকের কাছে কোন রাসূল প্রেরণ করেন তখন তিনি তাকে তাদের মধ্য থেকেই প্রেরণ করে থাকেন, যাতে একে অপরের সাথে কথা বলতে পারে এবং সেই রাসূল থেকে উপকার লাভ করা ঐ লোকদের জন্যে সম্ভবপর হয়।" যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "মুমিনদের উপর আল্লাহর এটা অনুগ্রহ যে, তাদের রাসূল হচ্ছে তাদেরই একজন লোক যিনি তাদের কাছে আল্লাহর আয়াতসমূহ পেশ করে থাকে এবং তাদেরকে (পাপ থেকে) পবিত্র করে থাকে, নতুবা (ফেরেশতা পাঠালে) ফেরেশতার ঔজ্জ্বল্যের কারণে তার দিকে তারা তাকাতেও পারতো না এবং এর ফলে ব্যাপারটা তাদের কাছে সন্দেহজনকই থেকে যেতো। আর হে নবী (সঃ)! তোমার পূর্ববর্তী নবীদের সাথেও তো এইরূপ উপহাসমূলক ব্যবহার করা হয়েছিল! তারা তাদেরকে বিদ্রূপ ও উপহাস করেছিল বলেই তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছিল!" এখানে নবী (সঃ)-কে উৎসাহ প্রদানপূর্বক বলা হচ্ছে, যদি কেউ তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তবে তুমি মোটেই গ্রাহ্য করো না। অতঃপর মুমিনদেরকে সাহায্য করার পরিণাম ভাল করার ওয়াদা দেয়া হয়েছে। পরিশেষে তাদেরকে বলা হয়েছে—তোমরা ভূ-পৃষ্ঠে ভ্রমণ করে দেখো যে, অতীতে যারা তাদের নবীদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল তাদের বাসভূমি কিভাবে ধ্বংস হয়ে গেছে! আজ তাদের বাড়ী ঘরের চিহ্নটুকু শুধু বাকী রয়েছে। এটা তাদের পার্থিব শাস্তি। অতঃপর পরকালে তাদের জন্যে পৃথক শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে। তারা ঐরূপ শাস্তির কবলে পতিত হয়েছিল বটে, কিন্তু রাসূল ও মুমিনদেরকে ঐ শাস্তি থেকে রক্ষা করা হয়েছিল।

١٢- قُلْ لِّمَنْ مَّا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ قُلْ لِّلّٰهِ كَتَبَ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيْهِ اَلَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ○

১২। তুমি (হে নবী সঃ!) জিজ্ঞেস কর–আকাশ মণ্ডলে ও ধরাধামে অবস্থিত যা কিছু রয়েছে, তা কার মালিকানাধীন? তুমি বল, তা সবই আল্লাহর মালিকানা স্বত্ব, আল্লাহ নিজের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহের নীতি অবলম্বন করার বাধ্য-বাধকতা স্বীকার করে নিয়েছেন, তিনি তোমাদের সকলকে কিয়ামতের দিন অবশ্যই সমবেত করবেন, যেদিন সম্পর্কে কোনই সন্দেহ নেই, যারা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি ও ধ্বংসের মুখে ফেলেছে তারাই ঈমান আনে না।

١٣- وَلَهٗ مَا سَكَنَ فِى الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ○

১৩। রাতের অন্ধকারের মধ্যে এবং দিনের আলোতে যা কিছু বসবাস করে ও বর্তমান রয়েছে, এসব কিছুই আল্লাহর; তিনি সব কিছুই শুনেন ও জানেন।

١٤- قُلْ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ اِنِّىْٓ اُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ اَوَّلَ مَنْ اَسْلَمَ وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ○

১৪। (হে নবী সঃ!) তুমি জিজ্ঞেস কর–আমি কি আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকেও নিজের পৃষ্ঠপোষক ও বন্ধুরূপে গ্রহণ করবো (সেই আল্লাহকে বর্জন করে) যিনি হলেন আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা? তিনি রিযিক দান করেন, কিন্তু রিযিক গ্রহণ করেন না, তুমি বল –আমাকে এই আদেশই করা হয়েছে যে, আমি সকলের আগেই ইসলাম গ্রহণ করে তাঁর সামনে মাথা নত করে দেবো, আর আমাকে

١٥- قُلْ إِنِّيْٓ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّيْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ○

١٦- مَنْ يُّصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهٗ وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِيْنُ ○

বিশেষভাবে তাকীদ করা হয়েছে– তুমি মুশরিকদের মধ্যে শামিল হবে না।

১৫। তুমি বল–আমি আমার প্রতিপালকের অবাধ্য হলে–আমি মহা বিচারের দিনের মহা শাস্তির ভয় করছি।

১৬। সেই দিন যার উপর হতে শাস্তি প্রত্যাহার করা হবে, তার প্রতি আল্লাহ বড়ই অনুগ্রহ করবেন, আর এটাই হচ্ছে প্রকাশ্য মহা সাফল্য।

জানিয়ে দেয়া হচ্ছে যে, আল্লাহ পাক আকাশ ও পৃথিবীর মালিক এবং তিনি নিজের উপর দয়া ও অনুগ্রহকে ওয়াজিব করে নিয়েছেন । সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমে হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "আল্লাহ তা'আলা মাখলূককে সৃষ্টি করার পর লাওহে মাহফূযে লিখে দেন– আমার রহমত আমার গযবের উপর জয়যুক্ত থাকবে।"

ইরশাদ হচ্ছে–অবশ্যই তিনি কিয়ামতের দিন তোমাদের সকলকে একত্রিত করবেন। এখানে لَامٌ টি কসমের জন্যে ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ পাক যেন কসম খেয়ে বলছেন যে, তিনি নির্ধারিত দিনে তাঁর সকল বান্দাকে একত্রিত করবেন। মুমিনদেরতো এ ব্যাপারে কোনই সন্দেহ নেই । কিন্তু কাফিরদের এতে সন্দেহ রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, সেখানে কি প্রস্রবণও রয়েছে? তিনি উত্তরে বলেছিলেনঃ "আল্লাহর কসম! তথায় প্রস্রবণ রয়েছে। নিশ্চয়ই আল্লাহর সৎ বান্দারা নবীদের হাওযে অবতরণ করবে। আল্লাহ তা'আলা সত্তর হাজার ফেরেশ্তা পাঠাবেন যাদের হাতে আগুনের ডাণ্ডা থাকবে এবং নবীদের হাওযের উপর অবতরণকারী কাফিরদেরকে সেখান থেকে ডাক দিতে থাকবে।" এই হাদীসটি গারীব। জামিউত্ তিরমিযীতে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "প্রত্যেক নবীর একটি করে হাওয থাকবে এবং আমি আশা করি যে, আমার হাওযে জনগণের ভীড় বেশী হবে।"

বলা হচ্ছে–যারা নিজেরাই নিজেদেরকে ক্ষতি ও ধ্বংসের মুখে ফেলেছে, তারাই ঈমান আনে না এবং পরকাল সম্পর্কে ভয় রাখে না।

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ রাত্রিকালে এবং দিবাভাগে যা কিছু বসবাস করে সব কিছুই আল্লাহর ব্যবস্থাপনায় রয়েছে, তিনি বান্দাদের সমস্ত কথাই শুনেন এবং তাদের সম্পর্কে সব কিছুই অবগত আছেন। তিনি তাদের অন্তরের কথা সম্পর্কেও পূর্ণ ওয়াকেফহাল।

অতঃপর তাঁর যে রাসূল (সঃ)-কে মহান একত্ববাদ এবং সুদৃঢ় শরীয়ত প্রদান করা হয়েছে তাঁকে তিনি সম্বোধন করে বলেনঃ "তুমি লোকদেরকে সিরাতে মুসতাকীমের দিকে আহ্বান কর এবং তাদেরকে বলে দাও– আমি কি আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে নিজের পৃষ্ঠপোষক ও বন্ধু রূপে গ্রহণ করবো?" যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেছেনঃ

"(হে নবী সঃ!) তুমি বল, হে মূর্খ লোকেরা! তোমরা কি আমাকে নির্দেশ দিচ্ছ যে, আমি আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কারও ইবাদত করবো?" ভাবার্থ এই যে, আল্লাহ হচ্ছেন আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা। বিনা নমুনায় তিনি নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলকে সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং আমি এইরূপ মা'বূদকে বাদ দিয়ে অন্য কারও কিরূপে ইবাদত করতে পারি? তিনি সকলকে খাওয়াইয়ে থাকেন, তাঁকে খাওয়ানো হয় না, তিনি বান্দার মুখাপেক্ষী নন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ "আমি দানব ও মানবকে শুধুমাত্র আমার ইবাদতের জন্যে সৃষ্টি করেছি।" কেউ কেউ লা-য়ূ্যৎআমু শব্দটিকে লা-য়্যাৎআমু পড়েছেন, অর্থাৎ তিনি নিজে কিছুই খান না। হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ "আহলে কুবার একজন আনসারী রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে দাওয়াত করেন। তাঁর সাথে আমরাও গমন করি। খাওয়া শেষে তিনি বলেন– সেই আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি যিনি খাওয়ান অথচ নিজে খান না, তিনি আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করতঃ আমাদেরকে খাওয়ান, পান করান এবং আমাদের উলঙ্গ দেহে কাপড় পরান। সুতরাং আমরা সেই আল্লাহকে ছাড়তে পারি না, তাঁর প্রতি অকৃতজ্ঞ হতে পারি না এবং আমরা তাঁর থেকে অমুখাপেক্ষীও থাকতে পারি না। তিনি আমাদেরকে পথভ্রষ্টতা থেকে বাঁচিয়েছেন, আমাদের অন্তরের কালিমা দূর করেছেন এবং সমস্ত মাখলূকের উপর আমাদের মর্যাদা দান করেছেন।"

ইরশাদ হচ্ছে– হে নবী (সঃ)! তুমি বল, আমাকে এই নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, আমি যেন সর্ব প্রথম মুসলমান হই এবং শির্ক না করি। আমি যদি আল্লাহর না-ফরমানী করি তবে ভীষণ দিনের কঠিন শাস্তির আমার ভয় রয়েছে। কিয়ামতের দিন যার উপর থেকে আল্লাহর শাস্তি সরিয়ে দেয়া হবে, তার প্রতি

ওটা তাঁর অনুগ্রহই বটে, আর ওটাই হচ্ছে বিরাট সফলতা। যেমন এক জায়গায় আল্লাহ পাক বলেনঃ "যাকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে সেই ব্যক্তি হবে পূর্ণ সফলকাম।" আর সফলতা হচ্ছে উপকার লাভ করা এবং ক্ষতি হতে বেঁচে থাকা।

১৭। যদি আল্লাহ কারও ক্ষতি সাধন করেন তবে তিনি ছাড়া সেই ক্ষতি দূর করার আর কেউই নেই, আর যদি তিনি কারও কল্যাণ করেন, (তবে তিনি সেটাও করতে পারেন, কেননা) তিনি প্রতিটি বস্তুর উপর ক্ষমতাবান ও কর্তৃত্বশালী।

১৭- وَإِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗٓ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَّمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○

১৮। তিনিই তাঁর বান্দাদের উপর একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী, তিনিই মহাজ্ঞানী ও সর্ব বিষয়ে ওয়াকিফহাল।

১৮- وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهٖ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ ○

১৯। (হে মুহাম্মাদ সঃ!) তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর, কার সাক্ষ্য সবচেয়ে বেশী গণ্য ? তুমি বলে দাও, আমার ও তোমাদের মধ্যে আল্লাহই হচ্ছেন সাক্ষী, আর এই কুরআন আমার নিকট অহীর মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে, যেন আমি তোমাদেরকে এবং যাদের নিকট এটা পৌঁছবে তাদের সকলকে এর দ্বারা সতর্ক ও সাবধান করি। বাস্তবিকই তোমরা কি এই সাক্ষ্য দিতে পার যে, আল্লাহর সাথে অন্য কোন মা'বূদ রয়েছে? তুমি বল—আমি

১৯- قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللّٰهُ شَهِيْدٌۢ بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ وَأُوْحِيَ إِلَيَّ هٰذَا الْقُرْاٰنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهٖ وَمَنْۢ بَلَغَ أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُوْنَ أَنَّ مَعَ اللّٰهِ اٰلِهَةً أُخْرٰى قُلْ لَّآ أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلٰهٌ

وَّاحِدٌ وَّإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ○

এই সাক্ষ্য দিতে পারি না, তুমি ঘোষণা কর যে, তিনিই একমাত্র মা'বূদ আর তোমরা যে শিরকে লিপ্ত রয়েছো, আমার সাথে ওর কোনই সম্পর্ক নেই।

٢٠- اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ○

২০। যাদেরকে আমি কিতাব দান করেছি, তারা রাসূল (সঃ)-কে এমনভাবে জানে ও চিনে, যেরূপ তারা নিজেদের সন্তান সন্ততিদেরকে জানে ও চিনে, কিন্তু যারা নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখে ফেলে দিয়েছে তারা ঈমান আনবে না।

٢١- وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِهٖ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُونَ ○

২১। যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি মিথ্যা দোষারোপ করে কিংবা আল্লাহর আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, তার চেয়ে বড় যালিম আর কে হতে পারে? এরূপ যালিম লোক কখনই সাফল্য লাভ করতে পারবে না।

এখানে আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, তিনি লাভ ও ক্ষতির মালিক। তিনি তাঁর সৃষ্টির মধ্যে নিজের ইচ্ছামত ব্যবস্থাপনা চালিয়ে থাকেন। তাঁর নির্দেশকে না কেউ পিছনে সরাতে পারে, না তাঁর মীমাংসাকে কেউ বাধা প্রদান করতে পারে। যদি তিনি অকল্যাণ ও অমঙ্গলকে থামিয়ে দেন তবে সেটা কেউ চালু করতে পারে না। পক্ষান্তরে যদি তিনি কল্যাণ ও মঙ্গলকে চালু করেন তবে সেটাকে কেউ থামাতে পারে না। যেমন তিনি বলেছেনঃ

مَا يَفْتَحِ اللّٰهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَ مَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ

অর্থাৎ "আল্লাহ মানুষকে যে রহমত দিতে চান ওটা কেউ বন্ধ করতে পারে না এবং যার থেকে তিনি তা বন্ধ রাখেন ওটা কেউ প্রদান করতে পারে না।" (৩৫ঃ২) সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলতেনঃ

اَللّٰهُمَّ لَامَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَامُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَايَنْفَعُ ذَاالْجَدِّمِنْكَ الْجَدُّ

এই জন্যেই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهٖ অর্থাৎ তিনি সেই আল্লাহ যাঁর জন্যে মানুষের মাথা নুয়ে পড়েছে, তিনি প্রত্যেক জিনিসের উপর জয়যুক্ত, তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও উচ্চ সর্যাদার সামনে সব কিছুই নতি স্বীকার করেছে। তাঁর সমস্ত কাজ হিকমতে পরিপূর্ণ। তিনি বস্তুসমূহের স্থান সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল। তিনি কিছু প্রদান করলে ওর প্রাপককেই প্রদান করে থাকেন এবং কিছু বন্ধ রাখলে যে প্রাপক নয় তার থেকেই তা বন্ধ রাখেন।

তিনি বলেনঃ قُلْ اَیُّ شَیْءٍ اَكْبَرُ شَهَادَةً অর্থাৎ, হে মুহাম্মাদ (সঃ)! তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর যে, কার সাক্ষ্য সবচেয়ে বেশী গণ্য?

قُلِ اللّٰهُ شَهِیْدٌ بَیْنِیْ وَبَیْنَكُمْ অর্থাৎ, হে নবী (সঃ)! তুমিই তাদেরকে উত্তরে বলে দাও– আমার ও তোমাদের মধ্যে আল্লাহই হচ্ছেন সাক্ষী। আর এই কুরআন আমার নিকট অহীর মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়েছে, যেন আমি এর মাধ্যমে তোমাদেরকে ভয় প্রদর্শন করি এবং তাকেও ভয় দেখাই যার নিকট এই কুরআনের বাণী পৌঁছবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وَمَنْ يَّكْفُرْ بِهٖ مِنَ الْاَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهٗ

অর্থাৎ "ঐ লোকদের মধ্যে যারা কুফুরী করবে, জাহান্নাম হবে তাদের ওয়াদাকৃত স্থান।" (১১ঃ ১৭) আর যার কাছে কুরআনের বাণী পৌঁছবে সে যেন নবী (সঃ)-এর সাথেই সাক্ষাৎ করলো। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "যার কাছে কুরআন পৌঁছে গেল তার কাছে যেন স্বয়ং আমিই তবলীগ করলাম।" নবী (সঃ) আরও বলেছেনঃ "আল্লাহর আয়াতগুলো পৌঁছিয়ে দাও। যার কাছে আল্লাহর কিতাবের কোন আয়াত পৌঁছে গেল তাঁর কাছে তাঁর হুকুম পৌঁছে গেল।" রাবী ইবনে আনাস বলেছেন, রাসূল (সঃ)-এর অনুসারীর এটা অবশ্য কর্তব্য যে, ইসলামের দাওয়াত সে এমনভাবে দেবে যেমনভাবে রাসূলুল্লাহ (সঃ) দিয়েছিলেন এবং এমনভাবে ভয় প্রদর্শন করবে যেমনভাবে রাসূলুল্লাহ (সঃ) ভয় প্রদর্শন করেছিলেন। ইরশাদ হচ্ছে–

اِئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُوْنَ اَنَّ مَعَ اللّٰهِ اٰلِهَةً اُخْرٰى قُلْ لَّاۤ اَشْهَدُ

অর্থাৎ হে মুশরিকরা, তোমরা কি সাক্ষ্য দিচ্ছ যে, আল্লাহর সাথে অন্যান্য মা'বূদ রয়েছে? তুমি বলে দাও–এরূপ সাক্ষ্য আমি তো দিতে পারি না। যেমন অন্য জায়গায় তিনি বলেছেনঃ

فَاِنْ شَهِدُوْا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ

অর্থাৎ “যদি তারা সাক্ষ্য দিয়েই ফেলে তবে হে নবী (সঃ)! তুমি কিন্তু তাদের সাথে সাক্ষ্য দিয়ো না।” (৬ঃ ১৫০) আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

قُلْ اِنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ وَّاِنَّنِیْ بَرِیْٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ ـ

অর্থাৎ হে নবী (সঃ)! তুমি ঘোষণা করে দাও যে, তিনিই একমাত্র মা'বূদ, আর তোমরা যে শিরকে লিপ্ত রয়েছো, আমার সাথে ওর কোনই সম্পর্ক নেই।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আহলে কিতাবদের সম্পর্কে বলছেন যে, তারা এই কুরআনকে এমন উত্তম রূপে জানে যেমন উত্তম রূপে জানে তারা নিজেদের পুত্রদেরকে। কেননা, তাদের কিতাবে পূর্ববর্তী নবীদের সংবাদ রয়েছে। তাঁরা সবাই মুহাম্মাদ (সঃ)-এর অস্তিত্ব লাভের সুসংবাদ দিয়েছেন এবং তাঁর গুণাবলী, তাঁর দেশ, তাঁর হিজরত, তাঁর উম্মতের গুণাবলী ইত্যাদি সম্পর্কে খবর দিয়ে গেছেন। এ জন্যই এরপর আল্লাহ পাক বলেনঃ

اَلَّذِیْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا یُؤْمِنُوْنَ ـ

অর্থাৎ 'যারা নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছে তারা ঈমান আনবে না।' অথচ ব্যাপারটা খুবই পরিষ্কার যে, নবীগণ তাঁর সুসংবাদ দিয়েছেন এবং প্রাচীন যুগ থেকে তাঁর নবুওয়াত ও আবির্ভাবের ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন।

বলা হচ্ছে– وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰی عَلَی اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِاٰیٰتِهٖ অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর মিথ্যা দোষারোপ করে কিংবা আল্লাহর আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, তার চেয়ে বড় যালিম আর কে হতে পারে? অর্থাৎ তার চেয়ে বড় যালিম আর কেউই হতে পারে না। এরপর ঘোষণা করা হচ্ছে– اِنَّهٗ لَا یُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ অর্থাৎ এরূপ আল্লাহর উপর মিথ্যা দোষারোপকারী এবং আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকারকারী কখনই সাফল্য লাভ করতে পারবে না।

২২। সেই দিনটিও স্মরণযোগ্য যেদিন আমি সকলকে একত্রিত করবো, অতঃপর যারা আমার সাথে শির্ক্ করেছে, তাদেরকে আমি বলবো, তোমাদের সেই শরীকগণ এখন কোথায় যাদেরকে তোমরা মা'বূদ বলে ধারণা করতে?

২২– وَیَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِیْعًا ثُمَّ نَقُوْلُ لِلَّذِیْنَ اَشْرَكُوْٓا اَیْنَ شُرَكَآؤُكُمُ الَّذِیْنَ كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ ○

٢٣- ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ اِلَّا اَنْ قَالُوْا وَاللّٰهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ ○

২৩। অতঃপর তারা মিথ্যা কথা বলা ব্যতীত আর কোন ফিৎনা সৃষ্টি করতে পারবে না, তারা বলবে যে, আল্লাহর কসম, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা মুশরিক ছিলাম না।

٢٤- اُنْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ○

২৪। লক্ষ্য কর, তারা নিজেদের সম্পর্কে কিরূপ মিথ্যা বলছে! তখন যাদেরকে তারা মিথ্যা মা'বূদ মনোনীত করেছিল, তারা সবাই নিরুদ্দেশ হয়ে যাবে।

٢٥- وَ مِنْهُمْ مَّنْ يَّسْتَمِعُ اِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَّفْقَهُوْهُ وَفِيْٓ اٰذَانِهِمْ وَقْرًا ط وَاِنْ يَّرَوْا كُلَّ اٰيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوْا بِهَا ط حَتّٰٓى اِذَا جَآءُوْكَ يُجَادِلُوْنَكَ يَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ هٰذَآ اِلَّآ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ○

২৫। তাদের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে, যারা মনোযোগ সহকারে কান লাগিয়ে তোমার কথা শুনে থাকে, (অথচ গ্রহণ করে না, কিন্তু তাদের কর্ম ফলে) তোমার কথা যাতে তারা ভালরূপে বুঝতে না পারে সে জন্যে আমি তাদের অন্তরের উপর আবরণ রেখে দিয়েছি এবং তাদের কর্ণে কঠিন ভার (বধিরতা) অর্পণ করেছি (যাতে শুনতে না পায়), তারা যদি সমস্ত আয়াত ও প্রমাণাদিও অবলোকন করে তবুও তারা ঈমান আনবে না, এমন কি যখন তারা তোমার কাছে আসে তখন তোমার সাথে অর্থহীন বিতর্ক জুড়ে দেয়, আর তাদের কাফির লোকেরা (সব কথা শোনার পর) বলে, এটা

প্রাচীনকালের লোকদের কিস্সা কাহিনী ব্যতীত আর কিছুই নয়।

٢٦- وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْـــَٔوْنَ عَـــنْـــهُ وَإِنْ يُّــهْـــلِـــكُـــوْنَ إِلَّآ أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ ○

২৬। তারা নিজেরা তো তা থেকে বিরত থাকে, অধিকন্তু অন্য লোকদেরকেও তারা তা থেকে বিরত রাখতে চায়; বস্তুতঃ তারা ধ্বংস করছে শুধুমাত্র নিজেদেরকেই অথচ তারা অনুভব করছে না।

এখানে আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের সম্পর্কে সংবাদ দিচ্ছেন– আমি যখন কিয়ামতের দিন তাদেরকে একত্রিত করবো তখন তাদেরকে ঐসব প্রতিমা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করবো আল্লাহকে ছেড়ে তারা যেগুলোর উপাসনা করতো। তিনি বলবেন, আল্লাহ তা'আলার সাথে তোমরা যেসব প্রতিমাকে শরীক করতে সেগুলো আজ কোথায়? আল্লাহ পাক বলেনঃ

لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّآ أَنْ قَالُوْا وَاللّٰهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ-

অর্থাৎ, তাদের ওযর-আপত্তি ও দলীল শুধুমাত্র এতটুকুই হবে যে, তারা বলবে–আল্লাহর কসম! আমরা মুশরিক ছিলাম না। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তাঁর কাছে একটি লোক এসে বললো, হে ইবনে আব্বাস (রাঃ)! আপনি তো শুনেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– وَاللّٰهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ অর্থাৎ, আল্লাহর কসম! আমরা মুশরিক ছিলাম না। কিন্তু এটা কিভাবে হবে? তখন তিনি বললেন, যখন মুশরিকরা দেখবে যে, নামাযী ছাড়া আর কেউ জান্নাতে প্রবেশ করছে না তখন তারা পরস্পর বলাবলি করবে– 'এসো আমরা শিরক করাকে অস্বীকার করি।' একথা বলে তারা নিজেদের মুশরিক হওয়াকে অস্বীকার করে বসবে। তখন আল্লাহ পাক তাদের মুখে মোহর লাগিয়ে দিবেন। অতঃপর তাদের হাত পা তাদের মুশরিক হওয়ার সাক্ষ্য দিতে থাকবে, ফলে তারা কোন কথাই আর গোপন করতে পারবে না। হে প্রশ্নকারী! সুতরাং এখন তো তোমার মনে কোন সন্দেহ রইলো না যে, কুরআন কারীমে এমন কোন কথা অবশিষ্ট নেই যা খুলে খুলে বলার অপেক্ষা রাখে। কিন্তু তুমি বুঝতে পার না এবং ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতেও সক্ষম নও। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে,

এই আয়াতটি মুনাফিকদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছিল। কিন্তু এখানে সন্দেহের উদ্রেক হচ্ছে যে, এই আয়াতটি তো মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছিল, আর মক্কায় আবার মুনাফিক ছিল কোথায়? মদীনায় ইসলাম সাধারণভাবে গৃহীত হওয়ার পরে তো তাদের দল সৃষ্টি হয়। মুনাফিকদের ব্যাপারে যে আয়াত অবতীর্ণ হয় তা হচ্ছে আয়াতে মুজাদালাহ। তা হচ্ছে–

يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ

অর্থাৎ "যেই দিন আল্লাহ তাদেরকে একত্রিত করবেন (অর্থাৎ কিয়ামতের দিন), সেই দিন তারা আল্লাহর নামে কসম খেয়ে খেয়ে বর্ণনা করতে থাকবে।" (৫৮ঃ ১৮) অনুরূপভাবে আল্লাহ পাক এখানে ঐ লোকদের সম্পর্কে বলেছেনঃ

انْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يَفْتَرُوْنَ ـ

অর্থাৎ লক্ষ্য কর, তারা নিজেদের সম্পর্কে কিরূপ মিথ্যা বলছে! তখন যাদেরকে তারা মিথ্যা মা'বূদ মনোনীত করেছিল, তারা সবাই নিরুদ্দেশ হয়ে যাবে।

ইরশাদ হচ্ছে–তাদের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে যারা মনোযোগ সহকারে কান লাগিয়ে তোমার (মুহাম্মাদ সঃ) কথা শুনে থাকে, কিন্তু তাদের দুষ্কর্মের কারণে যাতে তারা তোমার কথা ভালরূপে বুঝতে না পারে সে জন্যে আমি তাদের অন্তরের উপর আবরণ রেখে দিয়েছি এবং তাদের কানে বধিরতা রেখেছি, যাতে তারা শুনতে না পায়, তারা যদি সমস্ত আয়াত ও প্রমাণাদিও অবলোকন করে তথাপি তারা ঈমান আনবে না। তারা অহী শুনবার জন্যে এসে থাকে, কিন্তু এই শ্রবণে তাদের কোনই উপকার হয় না। যেমন আল্লাহ তা'আলা অপর এক জায়গায় বলেছেন, তাদের দৃষ্টান্ত সেই চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায় যে তার রাখালের শব্দ ও ডাক শুনে বটে, কিন্তু অর্থ কিছুই বুঝে না। অতঃপর মহান আল্লাহ বলেন যে, তারা দলীল প্রমাণাদি অবলোকন করে থাকে বটে, কিন্তু তাদের না আছে কোন বিবেক বুদ্ধি এবং না তারা ন্যায়পরায়ণতার সাথে কাজ করে থাকে, সুতরাং তারা ঈমান আনবে কিরূপে? এরপর আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে সম্বোধন করে বলেনঃ যদি তাদের মধ্যে কল্যাণ লাভের সামর্থ্য থাকতো তবে আল্লাহ তাদেরকে শুনবার তাওফীক দিতেন। আর যখন তারা তোমার কাছে আসে তখন তর্ক বিতর্কে লিপ্ত হয়ে যায় এবং বাতিল ও অযৌক্তিক কথা পেশ করতঃ সত্যকে লোপ করে দেয়ার চেষ্টা করে। তারা বলে– হে মুহাম্মাদ (সঃ)! যেসব কথা

আপনি অহীর নাম দিয়ে পেশ করছেন ওগুলো তো পূর্ববর্তী লোকদের কাহিনী ছাড়া আর কিছুই নয়। তারা জনগণকে নবী (সঃ)-এর সাথে যোগাযোগ করতে বাধা প্রদান করে এবং তারা নিজেরাও দূরে সরে থাকে।

يَنْهَوْنَ -এর তাফসীরে দু'টি উক্তি রয়েছে। একটি হচ্ছে যে, তারা জনগণকে সত্যের অনুসরণ, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সত্যতা স্বীকারকরণ এবং কুরআন কারীমের অনুসরণ হতে বিরত রাখে এবং নিজেরাও এগুলো থেকে দূরে সরে থাকে। তারা যেন দু'টি খারাপ করে থাকে । তা হল এই যে, তারা না নিজেরা উপকৃত হয়, না অন্যদেরকে উপকার লাভ করতে দেয়। দ্বিতীয় উক্তি হল এই যে, يَنْهَوْنَ عَنْهُ-এর ভাবার্থ হল–জনগণ রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে কষ্ট দেয়ার চেষ্টা করলে আবূ তালিব তাদেরকে বাধা দিতেন। সেই সম্পর্কেই এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। সাঈদ ইবনে আবূ হিলাল বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর দশজন চাচা সম্পর্কে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। তারা সবাই লোকদেরকে তাঁকে হত্যা করা থেকে বাধা প্রদান করতো বটে, কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় এই যে, তারা নিজেরা ঈমানের বরকত লাভ থেকে বঞ্চিত থাকতেন। সুতরাং তাঁরা ছিলেন বাহ্যতঃ তাঁর প্রতি সহানুভূতিশীল, কিন্তু ভিতরে ছিলেন তাঁর বিরুদ্ধাচরণকারী। এর পর ইরশাদ হচ্ছে যে, তারা নির্বুদ্ধিতা বশতঃ নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। তারা এ কথাটা মোটেই বুঝছে না যে, তারা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি ও ধ্বংস টেনে আনছে!

২৭। তুমি যদি তাদের সেই সময়ের অবস্থাটি অবলোকন করতে যখন তাদেরকে জাহান্নামের কিনারায় দাঁড় করানো হবে, তখন তারা বলবে–হায়! আমরা যদি আবার দুনিয়ায় ফিরে যেতে পারতাম, আমরা সেখানে আমাদের প্রতিপালকের নিদর্শনসমূহ অবলোকন করতাম এবং আমরা ঈমানদার হয়ে যেতাম!

٢٧- وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يٰلَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِاٰيٰتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ○

٢٨- بَلْ بَدَا لَهُمْ مَّا كَانُوْا يُخْفُوْنَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوْا لَعَادُوْا لِمَا نُهُوْا عَنْهُ وَاِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ○

২৮। (এই কথা বলার কারণ হলো) যেই সত্য তারা পূর্বে গোপন করেছিল, তা তখন তাদের নিকট সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়ে পড়বে, আর একান্তই যদি তাদেরকে সাবেক পার্থিব জীবনে ফিরে যেতে দেয়া হয়, তবুও যা করতে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল তারা তা-ই করবে, নিঃসন্দেহে তারা মিথ্যাবাদী।

٢٩- وَقَالُوْٓا اِنْ هِىَ اِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوْثِيْنَ ○

২৯। তারা বলে-এই পার্থিব জীবনই প্রকৃত জীবন, এরপর আর কোন জীবন নেই, আর আমাদেরকে পুনরুত্থিতও করা হবে না।

٣٠- وَلَوْ تَرٰٓى اِذْ وُقِفُوْا عَلٰى رَبِّهِمْ ۗ قَالَ اَلَيْسَ هٰذَا بِالْحَقِّ ۗ قَالُوْا بَلٰى وَرَبِّنَا ۗ قَالَ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ○ ع

৩০। হায়! তুমি যদি সেই দৃশ্যটি দেখতে, যখন তাদেরকে তাদের প্রতিপালকের সম্মুখে দণ্ডায়মান করা হবে, তখন আল্লাহ তা'আলা জিজ্ঞেস করবেন- এটা (কিয়ামত) কি সত্য নয়? তখন তারা উত্তরে বলবে-হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আমাদের প্রতিপালকের (আল্লাহর) শপথ করে বলছি-এটা বাস্তব ও সত্য বিষয়, তখন আল্লাহ বলবেন- তবে তোমরা এটাকে অস্বীকার ও অমান্য করার ফল স্বরূপ শাস্তির স্বাদ গ্রহণ কর।

আল্লাহ পাক এখানে কাফিরদের অবস্থা বর্ণনা করছেন যে, কিয়ামতের দিন যখন তাদেরকে আগুনের সামনে দাঁড় করানো হবে, তারা ওর কড়া ও শৃংখল

দেখতে পাবে, তখন আফসোস করে বলবেঃ হায়! পুনরায় যদি আমাদেরকে দুনিয়ায় ফিরিয়ে দেয়া হতো তবে আমরা ভাল কাজ করতাম এবং আমাদের প্রতিপালকের আয়াতসমূহ অবিশ্বাস করতাম না। বরং ঐগুলোর উপর ঈমান আনয়ন করতাম। আল্লাহ পাক বলেনঃ না, না, বরং কথা এই যে, কুফ্‌র, অবিশ্বাস ও বিরোধিতার যে ব্যাপারগুলো তারা অন্তরে গোপন রেখেছিল সেগুলো আজ প্রকাশ হয়ে গেল। যদিও দুনিয়া বা আখিরাতে তারা তা অস্বীকার করেছে। যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ "তাদের যুক্তি শুধুমাত্র এটাই যে, তারা বলে–আমরা মুশরিক ছিলাম না। লক্ষ্য কর, তারা কিরূপ মিথ্যা কথা বানিয়ে নিয়েছে।" এর অর্থ এও হতে পারে –দুনিয়ায় তারা যে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সত্যতা জানা সত্ত্বেও তাঁর উপর ঈমান আনেনি সেটা কিয়ামতের দিন তাদের কাছে প্রকাশ পেয়ে যাবে এবং তখন তারা আফসোস করতে থাকবে। দুনিয়ায় কিন্তু সেটা প্রকাশ পায়নি। যেমন হযরত মূসা (আঃ) ফিরাউনকে বলেছিলেনঃ "হে ফিরাউন! তুমি তো ভালরূপেই জান যে, এটা আল্লাহই অবতীর্ণ করেছেন!" আর আল্লাহ পাকও ফিরাউন ও তার কওম সম্পর্কে বলেছেনঃ "তারা অস্বীকার করেছে বটে, কিন্তু তাদের অন্তরে এই বিশ্বাস রয়েছে যে, ওটা তাদের পক্ষ থেকে অত্যাচার ও বাড়াবাড়ি।" এর ভাবার্থ এটা হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে যে, এর দ্বারা ঐ মুনাফিকদেরকে বুঝানো হয়েছে, যারা লোকদের সামনে মুমিন বলে পরিচিত ছিল বটে, কিন্তু ভিতরে ছিল কাফির। এর মাধ্যমে এই কাফিরদের ঐ কথার সংবাদ দেয়া হচ্ছে যেই কথা তারা কিয়ামতের দিন বলবে। যদিও এই সূরাটি মক্কী এবং নিফাক তো ছিল মদীনাবাসী বা ওর আশে পাশের লোকদের মধ্যে, তবুও এতে কোন ক্ষতি নেই। কেননা, আল্লাহ তা'আলা তো মক্কী সূরার মধ্যেও নিফাকের বর্ণনা দিয়েছেন এবং সেটা হচ্ছে সূরায়ে আনকাবূত। এই সূরায় আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ -

অর্থাৎ 'যারা মুমিন তাদেরকেও আল্লাহ জানেন এবং যারা মুনাফিক তাদেরকেও জানেন।' (২৯ঃ ১১) এর উপর ভিত্তি করেই বলা হয়েছে যে, পরকালে মুনাফিকরা যখন শাস্তি অবলোকন করবে তখন কুফ্‌র ও নিফাক গোপন করার পর তাদের কাছে এটা সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, তাদের ঈমান ছিল বাহ্যিক ঈমান। সুতরাং এখানে আল্লাহ পাক যে বলেছেন, 'তারা যা গোপন করতো এখন তা প্রকাশ পেয়েছে' এর ভাবার্থ এই যে, তারা পুনরায় দুনিয়ায় ফিরে যেতে চাচ্ছে তা যে ঈমানের প্রতি ভালবাসা ও আগ্রহের কারণে তা নয়। বরং কিয়ামতের দিনের শাস্তি দেখে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়েই তারা এ কথা বলছে। উদ্দেশ্য হচ্ছে এ কথা

বলে সাময়িকভাবে জাহান্নামের শাস্তি হতে মুক্তি লাভ। আর যদি তাদেরকে পুনরায় দুনিয়ায় পাঠানোও হয় তবে আবারও তারা কুফরী করতেই থাকবে। তারা যে বলছে, 'আমরা আর অবিশ্বাস করবো না, বরং ঈমানদার হয়ে যাবো' এ সব মিথ্যা কথা। তারা তো বলে-এই পার্থিব জীবনই প্রকৃত জীবন, এরপর আর কোন জীবন নেই, আর আমাদেরকে পুনরুত্থিতও করা হবে না। আল্লাহ পাক মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (সঃ)-কে সম্বোধন করে বলেনঃ হায়! তুমি যদি সেই দৃশ্যটি দেখতে, যখন তাদেরকে তাদের প্রতিপালকের সামনে দণ্ডায়মান করা হবে, তখন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন- এটা (অর্থাৎ কিয়ামত) কি সত্য নয়? তারা উত্তরে বলবেঃ হ্যাঁ, আপনার কসম! এটা সত্য। তখন তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হবে- তাহলে তোমরা শাস্তির স্বাদ গ্রহণ কর, এটা কি যাদু? তোমাদেরকে কি অন্তর্দৃষ্টি দেয়া হয়নি?

٣١- قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِلِقَاءِ اللّٰهِ حَتّٰى اِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوْا يٰحَسْرَتَنَا عَلٰى مَا فَرَّطْنَا فِيْهَا وَهُمْ يَحْمِلُوْنَ اَوْزَارَهُمْ عَلٰى ظُهُوْرِهِمْ اَلَا سَاءَ مَا يَزِرُوْنَ ○

৩১। ঐসব লোকই ক্ষতিগ্রস্ত হলো যারা আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ হওয়ার সংবাদকে মিথ্যা ভেবেছে, যখন সেই নির্দিষ্ট সময়টি হঠাৎ তাদের কাছে এসে পড়বে, তখন তারা বলবে-হায়! পিছনে আমরা কতই না দোষত্রুটি করেছি, তারা নিজেরাই নিজেদের গুনাহের বোঝা নিজেদের পিঠে বহন করবে, ওগো শুনে রেখো, তারা যা কিছু বহন করেছে তা কতই না নিকৃষ্ট ধরনের বোঝা!

٣٢- وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا اِلَّا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ○

৩২। এই পার্থিব জীবন খেল তামাশা ও আমোদ প্রমোদের ব্যাপার ছাড়া কিছুই নয়, প্রকৃতপক্ষে পরকালের আরামই হবে তাদের জন্যে মঙ্গলময় যারা ধ্বংস হতে বেঁচে থাকতে চায়, ওগো তোমরা কি চিন্তা ভাবনা করবে না?

এখানে মহান আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ হওয়াকে যারা অস্বীকার করে তাদের সম্পর্কে এবং তাদের উদ্দেশ্য সফল না হওয়া ও তাদের নৈরাশ্য সম্পর্কে বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। আল্লাহ পাক বলছেন যে, যখন কিয়ামত হঠাৎ এসে পড়বে তখন তারা তাদের খারাপ আমলের জন্যে কতই না লজ্জিত হবে! তারা বলবে ঃ হায়! আমরা যদি সত্যের বিরোধিতা না করতাম তবে কতই না ভাল হতো! فِيْهَا শব্দের هَا সর্বনামটি পার্থিব জীবনের দিকেও ফিরতে পারে এবং আমলের দিকেও ফিরতে পারে।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ তারা তাদের গুনাহর বোঝা নিজেদের পিঠে বহন করবে এবং যেই বোঝা তারা বহন করবে সেটা কতই না জঘন্য বোঝা! হযরত কাতাদা (রঃ) يَزِرُوْنَ শব্দটিকে يَعْمَلُوْنَ পড়তেন। ইবনে আবি হাতিম (রঃ) আবূ মিরযাওক (রঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেনঃ যখন কাফির বা পাপী ব্যক্তি কবর থেকে উঠবে তখন একটা অত্যন্ত জঘন্য আকৃতির লোক তাকে অভ্যর্থনা করবে। তার থেকে ভীষণ দুর্গন্ধ ছুটবে! ঐ কাফির ব্যক্তি তখন তাকে জিজ্ঞেস করবে, 'তুমি কে?' সে উত্তরে বলবেঃ "তুমি আমাকে চিনতে পারছো না? আমি তো তোমারই নিকৃষ্ট আমলের প্রতিকৃতি, যে আমল তুমি দুনিয়ায় করতে। দুনিয়ায় বহু দিন যাবত তুমি আমার উপর সওয়ার ছিলে। এখন আমি তোমার উপর সওয়ার হবো।"[১] এই পরিপ্রেক্ষিতেই বলা হয়েছে যে, তারা তাদের পিঠের উপর তাদের বোঝা বহন করবে। সুদ্দী (রঃ) বলেন যে, যখনই কোন পাপী ব্যক্তিকে কবরে প্রবেশ করানো হয় তখনই এক অত্যন্ত জঘন্য প্রতিকৃতি তার কাছে এসে থাকে। ঐ প্রতিকৃতি অত্যন্ত কৃষ্ণ বর্ণের এবং ওর পরনের কাপড় খুবই ময়লাযুক্ত। তার থেকে বিকট দুর্গন্ধ ছুটতে থাকে। সে ঐ ব্যক্তির কবরে অবস্থান করতে থাকে। সে তাকে দেখে বলে, 'তোমার চেহারা কতই জঘন্য।' সে তখন বলে, 'আমি তোমার জঘন্য কাজেরই প্রতিকৃতি। তোমার কাজগুলো ছিল এই রূপই দুর্গন্ধময়।' সে বলবেঃ 'তুমি কে?' সেই প্রতিকৃতি উত্তরে বলবেঃ 'আমি তোমারই আমল।' অতঃপর সে কিয়ামত পর্যন্ত তার সাথে তার কবরেই অবস্থান করবে। কিয়ামতের দিন সে তাকে বলবেঃ 'দুনিয়ায় আমি তোমাকে কাম ও উপভোগের আকারে বহন করে এসেছিলাম। আজ তুমিই আমাকে বহন করবে।' অতঃপর তার আমলের প্রতিকৃতি তার পিঠের উপর সওয়ার হয়ে তাকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাবে। এই আয়াতের ব্যাখ্যা এটাই।

১. এটা ইবনে আবি হাতিম আমর ইবনে কায়েসের হাদীস থেকে আবূ মিরযাওক হতে বর্ণনা করেছেন।

ইরশাদ হচ্ছে যে, পার্থিব জীবন খেল তামাশা ও আমোদ-প্রমোদের ব্যাপার ছাড়া আর কিছুই নয়, আর মুত্তাকীদের জন্যে পরকালই হচ্ছে মঙ্গলময়।

٣٣- قَدْ نَعْلَمُ اِنَّهٗ لَيَحْزُنُكَ
الَّذِيْ يَقُوْلُوْنَ فَاِنَّهُمْ
لَا يُكَذِّبُوْنَكَ وَلٰكِنَّ الظّٰلِمِيْنَ
بِاٰيٰتِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ ○

৩৩। তাদের কথাবার্তায় তোমার যে খুব দুঃখ ও মনঃকষ্ট হয় তা আমি খুব ভালভাবেই জানি। তারা শুধুমাত্র তোমাকেই মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে না, বরং এই পাপিষ্ঠ যালিমরা আল্লাহর আয়াতসমূহকেও অস্বীকার এবং অমান্য করছে।

٣٤- وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ
قَبْلِكَ فَصَبَرُوْا عَلٰى مَا كُذِّبُوْا
وَاُوْذُوْا حَتّٰى اَتٰهُمْ نَصْرُنَا
وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِ اللّٰهِ وَلَقَدْ
جَآءَكَ مِنْ نَّبَاِى الْمُرْسَلِيْنَ ○

৩৪। তোমার পূর্বে বহু নবী-রাসূলকেও মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হয়েছে। অতঃপর তারা এই মিথ্যা প্রতিপন্নকে এবং তাদের প্রতি কৃত নির্যাতন ও উৎপীড়নকে অম্লান বদনে সহ্য করেছে, শেষ পর্যন্ত তাদের কাছে আমার সাহায্য এসে পৌঁছেছে, আল্লাহর কালামকে পরিবর্তন করার মত কেউই নেই, তোমার কাছে কোন কোন সাবেক নবীদের কিছু কিছু সংবাদ ও কাহিনী তো পৌঁছে গেছে।

٣٥- وَاِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ
اِعْرَاضُهُمْ فَاِنِ اسْتَطَعْتَ اَنْ
تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِى الْاَرْضِ اَوْ
سُلَّمًا فِى السَّمَآءِ فَتَاْتِيَهُمْ

৩৫। আর যদি তাদের অনাগ্রহ ও উপেক্ষা সহ্য করা তোমার কাছে কঠিন হয়ে পড়ে, তবে ক্ষমতা থাকলে মাটির কোন সুড়ঙ্গ অনুসন্ধান কর বা

بِاٰيَةٍ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدٰى فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ ○

আকাশে সিঁড়ি লাগিয়ে দাও, অতঃপর তাদের কাছে কোন নিদর্শন নিয়ে এসো, আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদের সকলকে তিনি হেদায়াতের উপর সমবেত করতেন, সুতরাং তুমি গণ্ডমূর্খদের মত হয়ে যেয়ো না।

٣٦- اِنَّمَا يَسْتَجِيْبُ الَّذِيْنَ يَسْمَعُوْنَ وَالْمَوْتٰى يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ ثُمَّ اِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ ○

৩৬। যারা (মনোযোগ দিয়ে) শুনে থাকে তারাই সত্যের ডাকে সাড়া দেয়, আল্লাহ মৃতদেরকে জীবিত করে উঠাবেন, অতঃপর তারা তাঁরই কাছে ফিরে যাবে।

লোকেরা যে নবী (সঃ)-কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে এবং তাঁর বিরুদ্ধাচরণে উঠে পড়ে লেগেছে সে জন্যে আল্লাহ পাক তাঁকে সান্ত্বনার সুরে বলছেন, হে নবী (সঃ)! তাদের তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা এবং এর ফলে তোমার দুঃখিত ও চিন্তিত হওয়ার ব্যাপারটা আমার অজানা নয়। যেমন তিনি বলেছেনঃ

فَلَاتَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرٰتٍ

অর্থাৎ 'তুমি তাদের উপর দুঃখ ও আফসোস করো না।' (৩৫ঃ ৮) অন্য জায়গায় আল্লাহ পাক বলেনঃ

لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ اَلَّا يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ-

অর্থাৎ "হে মুহাম্মাদ (সঃ)! তারা যদি ঈমান না আনে তাহলে তুমি হয়তো তাদের জন্যে তোমার জীবন বিসর্জন করে দেবে ।" (২৬ঃ ৩) অন্য স্থানে রয়েছেঃ

فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلٰى اٰثَارِهِمْ اِنْ لَّمْ يُؤْمِنُوْا بِهٰذَا الْحَدِيْثِ اَسَفًا

অর্থাৎ "হে নবী (সঃ)! তারা যদি ঈমান না আনে তবে হয়তো তাদের পিছনে আফসোস করে করে তুমি তোমার জীবন বিসর্জন করবে।" (১৮ঃ ৬)

ইরশাদ হচ্ছে– "নিশ্চয়ই তারা তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে না, বরং এই **যালিম**রা আল্লাহর আয়াত সমূহকেই অস্বীকার করছে।" অর্থাৎ হে মুহাম্মাদ

(সঃ)! তারা তোমার উপর মিথ্যা বলার অপবাদ দিচ্ছে না, বরং প্রকৃতপক্ষে এই অত্যাচারী লোকেরা সত্যের বিরোধিতা করে আল্লাহর আয়াত সমূহকেই অস্বীকার করছে। এ সম্পর্কে-ই হযরত আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, আবূ জেহেল নবী (সঃ)-কে বলেছিল– "আমরা তোমাকে তো মিথ্যাবাদী বলছি না, বরং যে দ্বীন তুমি নিয়ে এসেছ ওটাকেই আমরা মিথ্যা ও অসত্য বলছি।" তখন আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত অবতীর্ণ করেন।

ইবনে আবি হাতিম (রঃ) আবূ ইয়াযীদ আল মাদানী (রঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সঃ)-এর সঙ্গে আবূ জেহেলের সাক্ষাৎ হয়। তখন সে তাঁর সাথে মুসাফাহ্ (কর মর্দন) করে। এ দেখে তার এক সাথী তাকে বলেঃ 'তুমি এঁর সাথে মুসাফাহ্ করলে?' উত্তরে আবু জেহেল বলেঃ "আল্লাহর শপথ! অবশ্যই আমি জানি যে, ইনি আল্লাহর নবী। কিন্তু আমরা কি কখনও আবদে মানাফের অনুগত হতে পারি?"

আবূ জেহেলের কাহিনীর ব্যাপারে বলা হয়েছে যে, সে রাত্রিকালে গোপনে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কিরাত শুনবার জন্যে আগমন করে । অনুরূপভাবে আবূ সুফইয়ান ও আখনাস ইবনে শুরাইকও আসে। কিন্তু তারা একে অপরের খবর জানতো না। তিনজনই সকাল পর্যন্ত কুরআন শুনতে থাকে। সকালের আলো প্রকাশিত হয়ে উঠলে তারা বাড়ীর দিকে প্রত্যাবর্তন করে। পথে তিনজনেরই সাক্ষাৎ ঘটে। তারা তখন একে অপরকে জিজ্ঞাসাবাদ করেঃ 'কি উদ্দেশ্যে এসেছিলে?' তারা প্রত্যেকেই তাদের আগমনের উদ্দেশ্যের কথা বলে দেয়। অতঃপর তারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয় যে, আর তারা এ কাজে আসবে না। কেননা, হতে পারে যে, তাদের দেখাদেখি কুরায়েশদের যুবকরাও আসতে শুরু করে দেবে এবং তারা পরীক্ষার মধ্যে পড়ে যাবে। দ্বিতীয় রাত্রে প্রত্যেকেই ধারণা করে যে, ওরা দু'জন তো আসবে না। সুতরাং কুরআন কারীম শুনতে যাওয়া যাক। এ ধারণার বশবর্তী হয়ে সবাই এসে যায় এবং ফিরবার পথে পুনরায় পথে তাদের সাক্ষাৎ হয়। প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের কারণে একে অপরকে তিরস্কার করে এবং পুনরাবৃত্তি না করার অঙ্গীকার করে। তৃতীয় রাত্রেও তারা তিনজনই এসে যায় এবং সকালে পুনরায় তাদের সাক্ষাৎ ঘটে। এবার তারা দৃঢ়ভাবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয় যে, আর কখনও কুরআন শুনতে আসবে না। এক্ষণে আখনাস ইবনে শুরাইক আবূ সুফইয়ান ইবনে হারবের কাছে গমন করে এবং বলেঃ 'হে আবূ হানযালা! তুমি মুহাম্মাদ (সঃ)-এর মুখে যে কুরআন শুনেছো সে সম্পর্কে তোমার মতামত কি?'

উত্তরে আবূ সুফইয়ান বললেনঃ "হে আবূ সা'লাবা! আল্লাহর কসম! আমি এমন কিছু শুনেছি যা আমার নিকট খুবই পরিচিত এবং ওর ভাবার্থও আমি ভালভাবে বুঝেছি। আবার এমন কিছুও শুনেছি যা আমি জানিও না এবং ওর ভাবার্থও বুঝতে পারিনি।" তখন আখনাস বললোঃ 'আল্লাহর কসম! আমার অবস্থাও তাই।' এরপর আখনাস সেখান থেকে ফিরে এসে আবূ জেহেলের নিকট গমন করে এবং তাকে বলে, হে আবুল হাকাম! মুহাম্মাদ (সঃ)-এর নিকট থেকে যা কিছু শুনেছো সে সম্পর্কে তোমার অভিমত কি? তখন আবূ জেহেল বলল, "গৌরব লাভের ব্যাপারে আমরা আবদে মানাফের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে রয়েছি। তারা দাওয়াত করলে আমরাও দাওয়াত করি। তারা দান খয়রাত করলে আমরাও করি। অবশেষে আমরা হাতপা গুটিয়ে বসে আছি এমন সময় তারা দাবী করেছে যে, তাদের কাছে আল্লাহর নবী (সঃ) রয়েছেন এবং তাঁর কাছে আকাশ থেকে অহী আসে, আমরা তো এ কথা বলতে পারছি না। সুতরাং আল্লাহর কসম! আমরা কখনও ওর উপর ঈমান আনবো না এবং তাঁর নবুওয়াতের উপরও বিশ্বাস স্থাপন করবো না।" আখনাস এ কথা শুনে সেখান থেকে চলে যায়।

"তারা তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে না, বরং অত্যাচারীরা আল্লাহর আয়াত সমূহকেই অবিশ্বাস করছে।" এই আয়াত সম্পর্কে সুদ্দী (রঃ) বলেন যে, বদরের দিন আখনাস বিন শুরাইক বানী যুহরাকে বলেঃ "মুহাম্মাদ (সঃ) তোমাদের ভাগ্নে। সুতরাং তোমাদের তাঁরই পক্ষ অবলম্বন করা উচিত। যদি সত্যি তিনি নবীই হন তবে আজ বদরের দিনে তোমাদের তাঁর সাথে যুদ্ধ না করাই সমীচীন। আর যদি তিনি মিথ্যাবাদীই হন তবে তোমাদের ভাগ্নে হিসেবে তাঁর থেকে বিরত থাকাই তোমাদের কর্তব্য। তোমরা তাঁর সাথে যুদ্ধও করবে না এবং তাঁকে সাহায্যও করবে না। অপেক্ষা কর আমি আবুল হাকামের সাথে সাক্ষাৎ করি। যদি সে মুহাম্মাদ (সঃ)-এর উপর জয়যুক্ত হয় তবে তোমরা নিরাপদে দেশে ফিরে যাবে। আর যদি মুহাম্মাদ (সঃ) জয়যুক্ত হন তবে তোমরা তোমাদের কওমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করনি বলে তারা তোমাদের কোন ক্ষতি করবে না। সুতরাং তোমাদের যুদ্ধ থেকে বিরত থাকাই উচিত।" সেদিন থেকেই তার নাম আখনাস হয়ে যায়। পূর্বে তার নাম ছিল উবাই। এখন আখনাস আবূ জেহেলের সাথে নির্জনে মিলিত হয়। সে তাকে জিজ্ঞেস করে, হে আবুল হাকাম! এখানে তো আমি ও তুমি ছাড়া কুরায়েশদের আর কেউ নেই। আমাকে বলতো, মুহাম্মাদ (সঃ) সত্যবাদী, না মিথ্যাবাদী? আবূ জেহেল উত্তরে বলেঃ "আরে নরাধম! মুহাম্মাদ (সঃ) তো সত্যবাদী বটেই। তিনি জীবনে কখনও মিথ্যা কথা বলেননি।

কিন্তু কথা এই যে, বানু কুসাইরাই যদি পতাকাধারীও হয়, হজ্বের মৌসুমে হাজীদেরকে পানি সরবরাহকারী তারাই হয় এবং কা'বা ঘরের চাবি রাখার হকদার তারাই হয়, আবার তাদের নবুওয়াতও সবাই মেনে নেয় তবে অন্যান্য কুরাইশদের জন্যে বাকী থাকলো কি? এই কারণেই তা আমরা অস্বীকার করছি।" তখন আল্লাহ তা'আলা فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ ..... يَجْحَدُونَ -এই আয়াতটি অবতীর্ণ করেন। আর মুহাম্মাদও (সঃ) তো আল্লাহর আয়াত।

وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ .... أَتٰهُمْ نَصْرُنَا -এই আয়াতে নবী (সঃ)-কে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে এবং তাঁকে সাহায্য করার ওয়াদা করা হয়েছে। যেমনভাবে তাঁর পূর্ববর্তী নবীদেরকেও সাহায্য করা হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত কওমের মিথ্যা প্রতিপন্ন করা ও তাদের কষ্ট পৌঁছানোর পরে তাঁদের সাথে ওয়াদা করা হয়েছিল যে, পরিণাম তাঁদেরই ভাল হবে। এমন কি দুনিয়াতেও তাঁদের উপর আল্লাহর সাহায্য নেমে এসেছিল। আর পরকালে তো সাহায্য অবধারিত রয়েছেই। এই জন্যেই বলা হয়েছে যে, আল্লাহর কথার কোন পরিবর্তন নেই এবং সাহায্যের যে ওয়াদা করা হয়েছে তা অবশ্যই পুরো করা হবে। যেমন তিনি এক জায়গায় বলেছেন–

وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِيْنَ

অর্থাৎ "ইতিপূর্বে আমার প্রেরিত বান্দাদের পক্ষেই আমার কথা প্রাধান্য লাভ করেছে।" (৩৭ঃ ১৭১) আর এক জায়গায় তিনি বলেছেন–

كَتَبَ اللّٰهُ لَاَغْلِبَنَّ اَنَا وَرُسُلِيْ اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ عَزِيْزٌ۔

অর্থাৎ "আল্লাহ ফরয করে নিয়েছেন– অবশ্যই আমি এবং আমার রাসূলগণই জয়যুক্ত হবো, নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমতাবান ও পরাক্রমশালী।" (৫৮ঃ ২১)

আল্লাহ পাক বলেনঃ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَّبَاِى الْمُرْسَلِيْنَ অর্থাৎ হে নবী (সঃ)! অবশ্যই তোমার কাছে রাসূলদের খবর এসে গেছে। আর তাদের জীবনীতে তোমার জন্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে।

এরপর ইরশাদ হচ্ছে– وَاِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ اِعْرَاضُهُمْ অর্থাৎ তাদেরকে এড়িয়ে চলা যদি তোমার পক্ষে কঠিন হয়, তবে তুমি এর কোন প্রতিকার করতে পারবে কি? ভূপৃষ্ঠে সুড়ঙ্গ তৈরি কর এবং সেখান থেকে তাদের জন্যে আল্লাহর নির্দেশাবলী বের করে নিয়ে এসো অথবা আকাশে সিঁড়ি লাগিয়ে উপরে উঠে যাও এবং সেখানে কোন নিদর্শন অনুসন্ধান কর, আর তা তাদের কাছে পেশ কর।

সম্ভব হলে এসব কাজ কর। কিন্তু এটা কখনও সম্ভব নয়। তাছাড়া এরূপ করলেও তারা ঈমান আনবে না। চাইলে আল্লাহ তাদের সকলকে ঈমানের উপর একত্রিত করতেন। সুতরাং হে নবী (সঃ)! কথা বুঝবার চেষ্টা কর। অযথা দুঃখ করো না এবং মূর্খদের মত হয়ো না। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَوْشَاءَ رَبُّكَ لَاٰمَنَ مَنْ فِى الْاَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيْعًا

অর্থাৎ "যদি তোমার প্রভু চাইতেন তবে অবশ্যই পৃথিবীর সকলেই ঈমান আনতো।" (১০ঃ ৯৯) এই আয়াত সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, সমস্ত লোকই যেন ঈমান আনয়ন করে এবং হিদায়াতের অনুসারী হয়ে যায় এই চেষ্টাই রাসূলুল্লাহ (সঃ) করতে রয়েছিলেন। তখন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁকে জানিয়ে দিলেন যে, যার ভাগ্যে পূর্বেই ঈমান লিপিবদ্ধ রয়েছে একমাত্র সেই ঈমান আনবে।

আল্লাহ পাক বলেন ঃ اِنَّمَا يَسْتَجِيْبُ الَّذِيْنَ يَسْمَعُوْنَ অর্থাৎ যারা মনোযোগ দিয়ে শুনে তারাই সত্যের ডাকে সাড়া দেবে এবং সত্য অনুধাবন করবে।

وَالْمَوْتٰى يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ ثُمَّ اِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ ـ

অর্থাৎ আল্লাহ মৃতদেরকে জীবিত করে উঠাবেন, অতঃপর তাদেরকে তাঁরই কাছে ফিরিয়ে নেয়া হবে। مَوْتٰى দ্বারা কাফিরদেরকে বুঝানো হয়েছে, কেননা তাদের অন্তর মৃত। এ জন্যে জীবিতাবস্থাতেই তাদেরকে মৃত বলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং দেহের মরে যাওয়ার সাথে সাদৃশ্য যুক্ত করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে তাদেরকে লাঞ্ছিত করা।

৩৭। তারা বলে যে, তাঁর রবের নিকট হতে তাঁর প্রতি কোন নিদর্শন কেন অবতীর্ণ করা হলো না? তুমি বলে দাও– নিদর্শন অবতীর্ণ করাতে আল্লাহ নিঃসন্দেহে পূর্ণ ক্ষমতাবান, কিন্তু অধিকাংশ লোকই তা জ্ঞাত নয়।

৩৭– وَقَالُوْا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ اٰيَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ؕ قُلْ اِنَّ اللّٰهَ قَادِرٌ عَلٰٓى اَنْ يُّنَزِّلَ اٰيَةً وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ○

৩৮। ভূ-পৃষ্ঠে চলমান প্রতিটি জীব এবং বায়ুমন্ডলে ডানার সাহায্যে উড়ন্ত প্রতিটি পাখিই

৩৮– وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِى الْاَرْضِ وَلَا طٰٓئِرٍ يَّطِيْرُ بِجَنَاحَيْهِ اِلَّآ

أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِى الْكِتٰبِ مِنْ شَىْءٍ ثُمَّ إِلٰى رَبِّهِمْ يُحْشَرُوْنَ ○

তোমাদের ন্যায় এক একটি জাতি, আমি কিতাবে কোন বস্তুর কোন বিষয়ই লিপিবদ্ধ করতে ছাড়িনি, অতঃপর তাদের সকলকে তাদের প্রতিপালকের কাছে সমবেত করা হবে।

৩৯- وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا صُمٌّ وَّبُكْمٌ فِى الظُّلُمٰتِ مَنْ يَّشَاِ اللّٰهُ يُضْلِلْهُ وَمَنْ يَّشَاْ يَجْعَلْهُ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ○

৩৯। আর যারা আমার নিদর্শন সমূহকে মিথ্যা মনে করে, তারা অন্ধকারে নিমজ্জিত মূক ও বধির, আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা করেন হিদায়াতের সরল সহজ পথের সন্ধান দেন।

মুশরিকদের ব্যাপারে ইরশাদ হচ্ছে– তারা বলেঃ হে মুহাম্মাদ (সঃ)! আমাদের চাহিদা অনুযায়ী কোন নিদর্শন বা অলৌকিক জিনিস আল্লাহ আপনার উপর অবতীর্ণ করেন না কেন? যেমন যমীনে ঝরণা প্রবাহিত হওয়া ইত্যাদি। তাই ইরশাদ হচ্ছে–হে মুহাম্মাদ (সঃ)! তুমি বলে দাও যে, আল্লাহ তো এই কাজের উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান। কিন্তু এর বিলম্বে দূরদর্শিতা রয়েছে। তা এই যে, যদি তাদের চাহিদা অনুযায়ী মহান আল্লাহ কোন নিদর্শন অবতীর্ণ করে দেন এবং এর পরেও তারা ঈমান না আনে তবে তৎক্ষণাৎ তাদের উপর তাঁর শাস্তি নেমে আসবে, মৃত্যু পর্যন্ত তাদেরকে অবসর দেয়া হবে না। যেমন পূর্ববর্তী উম্মতদের সাথে এরূপ ব্যবহারই করা হয়েছিল। আহলে সামূদের দৃষ্টান্ত তো তোমাদের সামনেই বিদ্যমান রয়েছে। আমি ইচ্ছে করলে নিদর্শনও দেখাতে পারি।

আল্লাহ পাক বলেনঃ .....وَمَا مِنْ دَابَّةٍ অর্থাৎ হে মুশরিকদের দল! ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণকারী জীব-জন্তু এবং আকাশে উড্ডীয়মান পাখিও তোমাদের মতই বিভিন্ন প্রকারের রয়েছে।

মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, এইসব জীব-জন্তু ও পাখির কতগুলো প্রকার রয়েছে যেগুলোর নাম প্রসিদ্ধ হয়ে আছে। কাতাদা (রঃ) বলেন যে, পাখিও একটি উম্মত এবং মানব-দানবও এক একটি উম্মত। এইসব উম্মতও তোমাদের মতই আল্লাহর সৃষ্টজীব।

مَا فَرَّطْنَا.... অর্থাৎ সমস্ত জীবেরই আল্লাহ খবর রাখেন। কাউকেও আহার্য দান করতে তিনি ভুলে যান না। জলচরই হোক বা স্থলচরই হোক। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে–

وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِى الْاَرْضِ اِلاَّ عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا

অর্থাৎ 'ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণকারী প্রত্যেক প্রাণীরই জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহর উপর রয়েছে।' (১১ঃ ৬) অর্থাৎ তিনি ঐ সব প্রাণীর সংখ্যা, বাসস্থান ইত্যাদি সম্পর্কে পূর্ণ অবগত । এমন কি ওগুলোর অঙ্গভঙ্গি সম্পর্কেও তিনি পূর্ণ ওয়াকিফহাল। আর এক জায়গায় রয়েছে –

وَكَاَيِّنْ مِّنْ دَآبَّةٍ لَّاتَحْمِلُ رِزْقَهَا اللّٰهُ يَرْزُقُهَا وَاِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

অর্থাৎ "এমন বহু প্রাণী রয়েছে যেগুলোর জীবিকার দায়িত্ব তোমার উপর নেই, আল্লাহই তাদেরকে এবং তোমাদেরকে জীবিকা দান করছেন, তিনি শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী।" (২৯ঃ ৬০) হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত উমার (রাঃ)-এর খিলাফতের যুগে এক বছর ফড়িং অদৃশ্য হয়ে যায়। তিনি লোকদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করেও কোন সন্ধান পেলেন না। ফলে তিনি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। অতঃপর তিনি ইরাক, সিরিয়া প্রভৃতি দেশে লোক পাঠিয়ে সংবাদ নিলেন যে, কোন ফড়িং দেখা যায় কি-না। তখন ইয়ামান হতে আগত লোক কতগুলো ফড়িং তার সামনে এনে হাযির করে। তা দেখে তিনি তিনবার 'আল্লাহু আকবার' পাঠ করেন এবং বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলতেন, "আল্লাহ তা'আলা এক হাজার মাখলুকাত সৃষ্টি করেছেন, ছয়শ' জলচর এবং চারশ' স্থলচর। সর্ব প্রথম আল্লাহ পাক ফড়িংকে ধ্বংস করবেন। তারপর ক্রমান্বয়ে অন্যান্য সৃষ্টজীবকে ধ্বংস করতে থাকবেন, যেমনভাবে তাসবীহ্‌র দানা ঝরতে থাকে।"

ثُمَّ اِلٰى رَبِّهِمْ يُحْشَرُوْنَ অতঃপর তাদেরকে তাদের প্রভুর নিকট সমবেত করা হবে। অর্থাৎ এই সমুদয় উম্মতেরই মৃত্যু সংঘটিত হবে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, চতুষ্পদ জন্তুর মৃত্যুই ওদের হাশর হওয়া। এই সম্পর্কে অন্য একটি উক্তি এই রয়েছে যে, এই চতুষ্পদ জন্তুগুলোকেও কিয়ামতের দিন পুনরায় উঠানো হবে। যেহেতু আল্লাহ পাক বলেছেন– وَاِذَا الْوُحُوْشُ حُشِرَتْ অর্থাৎ 'এবং যখন চতুষ্পদ জন্তুগুলোকে একত্রিত করা হবে।' (৮১ঃ ৫) হযরত আবূ যার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) দু'টি ছাগলকে দেখলেন যারা একে অপরকে শিং দ্বারা মারছিল। তখন বললেনঃ হে আবূ যার (রাঃ)! এরা কিভাবে লড়াই করছে তা কি তুমি জান? তিনি উত্তরে বললেনঃ 'জ্বীনা।' রাসূলুল্লাহ (সঃ)

তখন বললেনঃ 'আল্লাহ কিন্তু অত্যাচারীকে জানেন এবং কিয়ামতের দিন এদেরও তিনি বিচার করবেন।' আবূ যার (রাঃ) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদেরকে উড়ন্ত পাখী সম্পর্কেও জ্ঞান দান করেছেন। তিনি বলেন যে, শিং বিশিষ্ট বকরী হতে শিং বিহীন বকরী কিয়ামতের দিন প্রতিশোধ নিয়ে নেবে। إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُم সম্পর্কে হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ চতুষ্পদ জন্তু, ভূপৃষ্ঠে বিচরণকারী প্রাণী এবং পাখীসমূহকেও সৃষ্টি করবেন। প্রত্যেকেই অপর হতে নিজ নিজ প্রতিশোধ গ্রহণ করবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ওগুলোকে সম্বোধন করে বলবেনঃ 'তোমরা সব মাটি হয়ে যাও! সেই সময় কাফিররাও আফসোস করে বলবেঃ 'হায়! আমরাও যদি মাটি হয়ে যেতাম!'

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ অর্থাৎ, যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে তারা তাদের মূর্খতা ও নির্বুদ্ধিতার কারণে বধির ও মূকদের মত আর তারা অন্ধকারের মধ্যে রয়েছে। তারা কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। এমতাবস্থায় এই লোকগুলো সঠিক ও সোজা রাস্তার উপর কিরূপে চলতে পারে? তাদের দৃষ্টান্ত ঐ ব্যক্তির মত, যে আগুন জ্বালিয়েছে। ফলে ওর আশে-পাশের স্থান আলোকিত হয়েছে। হঠাৎ ঐ আগুন নিভে গেছে। কাজেই সে অন্ধকারের মধ্যে পড়ে গেছে। কিছুই সে দেখতে পায় না। এ জন্যেই আল্লাহ পাক বলেছেন–

مَنْ يَشَإِ اللّٰهُ يُضْلِلْهُ وَمَنْ يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ

অর্থাৎ আল্লাহ যাকে চান পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে চান সোজা সরল পথের উপর পরিচালিত করেন।

৪০। তুমি তাদেরকে বল, তোমরা যদি নিজেদের আদর্শে সত্যবাদী হও তবে চিন্তা করে দেখতো যদি তোমাদের প্রতি আল্লাহর শাস্তি এসে পড়ে অথবা তোমাদের নিকট কিয়ামত এসে উপস্থিত হয়, তখনও কি তোমরা আল্লাহকে ব্যতীত অন্য কাউকেও ডাকবে?

٤٠- قُلْ أَرَءَيْتَكُمْ إِنْ أَتٰىكُمْ عَذَابُ اللّٰهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللّٰهِ تَدْعُوْنَ إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○

৪১। বরং তাকেই তোমরা ডাকতে থাকবে, অতএব যার জন্যে তোমরা তাঁকে ডাকছো, ইচ্ছা করলে তিনি তা তোমাদের থেকে দূর করে দিবেন, আর যাদেরকে তোমরা অংশী করেছিলে তাদের কথা ভুলিয়ে দিবেন।

٤١- بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُوْنَ فَيَكْشِفُ
مَا تَدْعُوْنَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ
وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُوْنَ ۝ ع

৪২। আর আমি তোমাদের পূর্বেকার জাতিসমূহের কাছে বহু রাসূল পাঠিয়েছি, (কিন্তু তাদেরকে অমান্য করার কারণে) আমি তাদের প্রতি ক্ষুধা, দারিদ্র ও রোগ-ব্যাধি চাপিয়ে দিয়েছি, যেন তারা নম্রতা প্রকাশ করে আমার সামনে নতি স্বীকার করে।

٤٢- وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّنْ
قَبْلِكَ فَأَخَذْنٰهُمْ بِالْبَأْسَاءِ
وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُوْنَ ۝

৪৩। সুতরাং তাদের প্রতি যখন আমার শাস্তি পৌঁছলো তখন তারা কেন নম্রতা ও বিনয় প্রকাশ করলো না? বরং তাদের অন্তর আরও কঠিন হয়ে পড়লো, আর শয়তান তাদের কাজকে তাদের চোখের সামনে শোভাময় করে দেখালো।

٤٣- فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا
تَضَرَّعُوْا وَلٰكِنْ قَسَتْ
قُلُوْبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ
مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝

৪৪। অতঃপর তাদেরকে যা কিছু উপদেশ ও নসীহত করা হয়েছিল তা যখন তারা ভুলে গেল তখন আমি সুখ-শান্তির জন্যে প্রতিটি বস্তুর দরজা উন্মুক্ত করে দিলাম, শেষ পর্যন্ত যখন তারা তাদেরকে দানকৃত

٤٤- فَلَمَّا نَسُوْا مَا ذُكِّرُوْا بِهٖ
فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ
شَيْءٍ حَتّٰى إِذَا فَرِحُوْا بِمَا

أُوتُوا أَخَذْنَهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُّبْلِسُونَ ○

বস্তু লাভ করে খুব আনন্দিত ও উল্লসিত হলো, তখন হঠাৎ একদিন আমি তাদেরকে পাকড়াও করলাম, আর তারা সেই অবস্থায় নিরাশ হয়ে পড়লো।

٤٥- فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ○

৪৫। অতঃপর অত্যাচারী সম্প্রদায়ের মূল শিকড় কেটে ফেলা হলো, আর সমস্ত প্রশংসা বিশ্ব প্রভু আল্লাহরই জন্যে।

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় সৃষ্টির মধ্যে সর্ব প্রকারের ক্ষমতা প্রয়োগে সক্ষম। না কেউ তাঁর কোন হুকুম পরিবর্তন করতে পারে, না তাঁর নির্দেশকে পিছনে ফেলতে পারে। যদি তাঁর কাছে কিছু চাওয়া হয় তবে ইচ্ছা করলে তিনি তা কবূল করে থাকেন। তিনি বলেনঃ তোমরা কি দেখ না যে, যদি হঠাৎ করে কিয়ামত এসে পড়ে কিংবা আকস্মিকভাবে আল্লাহর শাস্তি এসে যায় তবে তোমরা আল্লাহ ছাড়া আর কাউকেও ডাকবে না। কেননা, তোমরা জান যে, আল্লাহ ছাড়া আর কেউ এই শাস্তি সরাতে পারে না। যদি তোমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকেও মা'বূদ বলে মেনে নেয়ার ব্যাপারে সত্যবাদী হও তবে চিন্তা করে দেখ তো, তখন তো তোমরা আল্লাহকেই ডাকতে থাকবে। অতঃপর তিনি ইচ্ছা করলে ঐ শাস্তি সরিয়ে দেবেন। ঐ সময় তোমরা ঐসব অংশীদার ও প্রতিমাকে ভুলে যাবে। সমুদ্রে অবস্থানরত অবস্থায় যখন তোমরা কোন বিপদে পতিত হও তখন অন্যান্য অংশীদারদেরকে ভুলে গিয়ে তোমরা একমাত্র আল্লাহকেই ডেকে থাক।

আল্লাহ পাক বলেনঃ তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতদের নিকটেও আমি নবীদেরকে পাঠিয়েছিলাম। যখন তারা তাদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তখন আমি তাদেরকে ক্ষুধা ও সংকীর্ণতার শাস্তিতে জড়িয়ে ফেলি এবং ব্যাধি ও রোগ যন্ত্রণায় ভুগাতে থাকি। উদ্দেশ্য এই যে, তারা যেন একমাত্র আমাকেই ডাকতে থাকে এবং আমার কাছে বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ করে। তাহলে যখন আমি তাদেরকে শাস্তি প্রদান করি তখন তারা আমার নিকট বিনয়ী হয় না কেন? কথা এই যে, তাদের অন্তর পাথরের মত শক্ত হয়ে গেছে। তাই কোন কিছুই তাতে ক্রিয়াশীল হয় না। শয়তান তাদের শির্ক ও বিদ্রোহমূলক কার্যকলাপকে তাদের চোখে শোভনীয়

করে তুলেছে। সুতরাং তারা যখন আমার সতর্কবাণীকে ভুলে গেছে এবং ঈমানের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করছে, আমি তখন তাদের জীবিকার দরজাকে পূর্ণভাবে খুলে দিয়েছি, যেন তাদের রশি আরও ঢিল পড়ে যায়। তারা যখন আল্লাহর বিধান ভুলে গিয়ে পার্থিব সুখ-শান্তিতে মেতে উঠেছে এবং ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির মোহে পড়ে আমাকে সম্পূর্ণরূপে ভুলে বসেছে, এমতাবস্থায় হঠাৎ তাদের উপর আমার শাস্তি নেমে এসেছে কিংবা তারা মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে। হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেনঃ "যার জীবিকা প্রশস্ত হয়ে যায় সে এ কথা চিন্তাই করে না যে, এটাও আল্লাহ পাকের একটা পরীক্ষামূলক নীতি, পক্ষান্তরে যার জীবিকা সংকীর্ণ হয়ে যায় সেও এটা চিন্তা করে না যে, তাকে পরীক্ষা করা হচ্ছে এবং অবকাশ দেয়া হচ্ছে। কা'বার প্রভুর শপথ! যখন আল্লাহ তা'আলা পাপীকে পাকড়াও করার ইচ্ছা করেন তখন তাকে তিনি পার্থিব সুখ-শান্তিতে ডুবিয়ে দেন।" কাতাদা (রঃ) বলেনঃ আল্লাহ তা'আলা কোন কওমকে ততক্ষণ পর্যন্ত পাকড়াও করেননি যতক্ষণ পর্যন্ত তারা সুখ সাগরে নিমগ্ন না হয়েছে। প্রতারিত হয়ো না। ফাসিক ও পাপী লোকেরাই প্রতারিত হয়ে থাকে। اَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ দ্বারা পার্থিব সুখ-শান্তি ও স্বচ্ছলতাকেই বুঝানো হয়েছে। ইবনুল আমির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ "যখন তোমরা কাউকে দেখতে পাও যে, সে আল্লাহর নাফরমানী করছে, অথচ আল্লাহ তাকে পার্থিব সুখ-সম্পদে ডুবিয়ে রেখেছেন তখন তুমি বিশ্বাস করে নাও যে, এটা ছিল আল্লাহ পাকের তাকে ঢিল দেয়ার সময় এবং তা এখন শেষ হতে চলেছে।" অতঃপর তিনি উক্ত আয়াতটি পাঠ করেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ আল্লাহ তা'আলা যখন কোন কওমকে অবশিষ্ট রাখার এবং তাদেরকে উন্নতি প্রদানের ইচ্ছে করেন তখন তাদেরকে পবিত্র থাকার এবং মধ্যমপন্থা অবলম্বী হওয়ার তাওফীক দান করে থাকেন। পক্ষান্তরে যে কওমের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার তিনি ইচ্ছে করেন তাদের উপর তিনি খিয়ানতের দরযা খুলে দেন এবং যখন সে গর্বিত হয়ে পড়ে তখন হঠাৎ তাকে পাকড়াও করেন। ফলে সে নিরাশ হয়ে বসে পড়ে। অতঃপর ঐ কওমের মূল শিকড় কেটে ফেলা হয়। আর সমস্ত প্রশংসা বিশ্বপ্রভু আল্লাহরই জন্যে।

৪৬। (হে মুহাম্মাদ সঃ)! তুমি জিজ্ঞেস কর, আল্লাহ যদি তোমাদের শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নেন এবং তোমাদের মনের কপাটে তালা

٤٦- قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ اَخَذَ اللّٰهُ سَمْعَكُمْ وَاَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ

عَلٰى قُلُوْبِكُمْ مَّنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِهٖ اُنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُوْنَ ○

লাগিয়ে মোহর করে দেন, তবে এই শক্তি তোমাদেরকে আবার দান করতে পারে এমন কোন সত্তা আল্লাহ ব্যতীত আছে কি? লক্ষ্য কর তো, আমি আমার নিদর্শনসমূহ ও দলীল প্রমাণাদি কি ভাবে বিভিন্ন কায়দায় পেশ করছি, এর পরেও তারা তা থেকে ফিরে আসছে!

٤٧- قُلْ اَرَءَيْتَكُمْ اِنْ اَتٰىكُمْ عَذَابُ اللّٰهِ بَغْتَةً اَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ اِلَّا الْقَوْمُ الظّٰلِمُوْنَ ○

৪৭। তুমি আরও জিজ্ঞেস কর, আল্লাহর শাস্তি যদি হঠাৎ করে বা প্রকাশ্যে তোমাদের উপর এসে পড়ে, তবে কি অত্যাচারীরা ছাড়া আর কেউ ধ্বংস হবে?

٤٨- وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِيْنَ اِلَّا مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ فَمَنْ اٰمَنَ وَاَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ○

৪৮। আমি রাসূলদেরকে তো শুধু এই উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে থাকি যে, তারা (সৎ লোকদেরকে) সুসংবাদ দেবে এবং (অসৎ লোকদেরকে) ভয় দেখাবে, সুতরাং যারা ঈমান এনেছে ও চরিত্র সংশোধন করেছে তাদের জন্যে কোন ভয়ভীতি থাকবে না এবং তারা চিন্তিতও হবে না।

٤٩- وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ○

৪৯। আর যারা আমার আয়াত ও নিদর্শন সমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে, তারা নিজেদের ফাসেকীর কারণে শাস্তি ভোগ করবে।

মহান আল্লাহ রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলছেনঃ হে মুহাম্মাদ (সঃ)! এই সব মিথ্যা প্রতিপন্নকারী ও বিরোধিতাকারীকে বলে দাও—আল্লাহ তা'আলা যদি তোমাদের শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি ছিনিয়ে নেন যা তিনি তোমাদেরকে দান করেছেন, তাহলে কে এমন আছে, যে তোমাদেরকে তা প্রদান করতে পারে! যেমন তিনি বলেছেনঃ

هُوَ الَّذِیٓ اَنْشَاَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ .... (৬৭ঃ ২৩) আবার এর ভাবার্থ এও হতে পারে যে, তাদের চক্ষু ও কর্ণ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও শরঈ উপকার লাভ করা থেকে যদি তাদেরকে তিনি বঞ্চিত করে দেন এবং সত্য কথার উপকারিতা থেকে তারা অন্ধ ও বধির হয়ে যায়। আর ... وَخَتَمَ عَلٰى قُلُوْبِكُمْ -এরও ভাবার্থ এটাই। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ اَمَّنْ یَّمْلِكُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ (১০ঃ ৩১) এবং আর এক জায়গায় বলেনঃ

وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ یَحُوْلُ بَیْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهٖ

অর্থাৎ 'তোমরা জেনে রেখো যে, আল্লাহ মানুষ ও তার অন্তরের মধ্যে ফিরে থাকেন।' (৮ঃ ২৪) অর্থাৎ যদি তিনি তোমাদের অন্তরের উপর মোহর লাগিয়ে দেন তবে কে এমন আছে, যে ঐ মোহরকে ভেঙ্গে দিতে পারে? এই জন্যেই তিনি বলেনঃ তোমরা একটু চিন্তা করে দেখো যে, আমি কিভাবে নিজের কথাকে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে থাকি। যা এর স্পষ্ট দলীল যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন মা'বূদ নেই এবং তিনি ছাড়া যত মা'বূদ রয়েছে সবই মিথ্যা ও বাতিল। এই স্পষ্ট বর্ণনার পরেও তারা সত্যের অনুসরণ থেকে মানুষকে বিরত রাখছে এবং নিজেরাও বিরত থাকছে। মহান আল্লাহ বলেনঃ তোমরা কি জান যে, যদি আকস্মিকভাবে তোমাদের উপর আল্লাহর শাস্তি নেমে আসে কিংবা তোমাদের চোখের সামনে শাস্তি এসে পড়ে তবে এই পথভ্রষ্ট সম্প্রদায় ছাড়া আর কেউ ধ্বংস হবে না! তবে ঐ লোকেরা মুক্তি পেয়ে যাবে যারা এক আল্লাহরই ইবাদত করে। তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না। যেমন আল্লাহ পাক বলেনঃ

اَلَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ یَلْبِسُوْٓا اِیْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُولٰٓئِكَ لَهُمُ الْاَمْنُ وَ هُمْ مُّهْتَدُوْنَ-

অর্থাৎ 'যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের ঈমানকে শিরক দ্বারা কলংকিত করেনি তাদের জন্যে শান্তি ও নিরাপত্তা রয়েছে এবং তারা সুপথ প্রাপ্ত।' (৬ঃ৮২)

ইরশাদ হচ্ছে—আমি নবীদেরকে জান্নাতের সুসংবাদদাতা এবং জাহান্নাম হতে ভয় প্রদর্শনকারী রূপে প্রেরণ করেছি। তারা মুমিন ও সৎ লোকদেরকে শুভ

সুসংবাদ দেয় এবং কাফির ও পাপী লোকদেরকে ভয় প্রদর্শন করে থাকে। এ জন্যেই আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, যারা অন্তরের সাথে ঈমান এনেছে এবং নবীদের অনুসরণ করেছে তাদের ভবিষ্যতের জন্যে কোন ভয় নেই এবং অতীতের জন্যেও তাদের কোন দুঃখ ও আফসোস নেই। কেননা, তারা দুনিয়ায় যেসব আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব রেখে যাবে তাদের অভিভাবক স্বয়ং আল্লাহ। এরপর আল্লাহ পাক বলেনঃ যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে তাদেরকে তাদের কুফর ও পাপের কারণে ভীষণ শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে। কেননা, তারা মহান আল্লাহর আদেশসমূহ অমান্য করেছে এবং তাঁর নিষেধকৃত কাজে লিপ্ত হয়ে পড়েছে। আর তারা তাঁর সীমা অতিক্রম করেছে।

৫০। (হে মুহাম্মাদ সঃ)! তুমি (তাদেরকে) বল– আমি তোমাদেরকে এ কথা বলি না যে, আমার কাছে আল্লাহর ধন ভাণ্ডার রয়েছে, আর আমি অদৃশ্য জগতেরও কোন জ্ঞান রাখি না, এবং আমি তোমাদেরকে এ কথাও বলি না যে, আমি একজন ফেরেশ্‌তা, আমার কাছে যা কিছু অহীরূপে পাঠানো হয়, আমি শুধুমাত্র তারই অনুসরণ করে থাকি। তুমি (তাদেরকে) জিজ্ঞেস কর–অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি সমমানের? সুতরাং তোমরা কেন চিন্তা ভাবনা কর না?

٥٠- قُلْ لَّآ اَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِىْ خَزَآئِنُ اللّٰهِ وَ لَآ اَعْلَمُ الْغَيْبَ وَ لَآ اَقُوْلُ لَكُمْ اِنِّىْ مَلَكٌ ۚ اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوْحٰٓى اِلَىَّ ؕ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الْاَعْمٰى وَ الْبَصِيْرُ ؕ اَفَلَا تَتَفَكَّرُوْنَ ۝ ع

৫১। (হে মুহাম্মাদ সঃ)! তুমি এর (অহীর) সাহায্যে ঐসব লোককে ভীতি প্রদর্শন কর যারা ভয় করে যে, তাদেরকে তাদের প্রতিপালকের কাছে এমন অবস্থায় সমবেত করা

٥١- وَاَنْذِرْ بِهِ الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ اَنْ يُّحْشَرُوْٓا اِلٰى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ

وَلِيٌّ وَّلَا شَفِيْعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ○

হবে যেখানে তিনি ছাড়া তাদের না কোন সাহায্যকারী হবে, না থাকবে কোন সুপারিশকারী, হয়তো এই কারণে তারা মুত্তাকী হবে।

৫২- وَلَا تَطْرُدِ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ ؕ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ وَّمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِّنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُوْنَ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ○

৫২। আর যেসব লোক সকাল-সন্ধ্যায় তাদের প্রতিপালকের ইবাদত করে এবং এর মাধ্যমে তাঁর সন্তুষ্টিই কামনা করে, তাদেরকে তুমি দূরে সরিয়ে দিবে না, তাদের হিসাব-নিকাশের কোন কিছুর দায়িত্ব তোমার উপর নেই এবং তোমার হিসাব-নিকাশের কোন কিছুর দায়িত্ব তাদের উপর নেই। এর পরও যদি তুমি তাদেরকে দূরে সরিয়ে দাও, তবে তুমি যালিমদের মধ্যে শামিল হয়ে যাবে।

৫৩- وَكَذٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِّيَقُوْلُوْٓا اَهٰٓؤُلَآءِ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنْ بَيْنِنَا ؕ اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَعْلَمَ بِالشّٰكِرِيْنَ ○

৫৩। এমনিভাবেই আমি একজন দ্বারা অপরজনকে পরীক্ষায় নিপতিত করে থাকি, যেন তারা বলতে থাকে যে, এরাই কি ঐসব লোক যে, আমাদের মধ্যে এদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ ও মেহেরবানি করেছেন? ব্যাপারটা কি এটা নয় যে, আল্লাহ কৃতজ্ঞতাপরায়ণ লোকদেরকে ভালভাবেই জানেন?

৫৪। আমার আয়াতসমূহের উপর বিশ্বাস স্থাপনকারীরা যখন তোমার নিকট আসে তখন তাদেরকে বল–তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক, তোমাদের প্রতিপালক নিজের উপর দয়া ও অনুগ্রহ করার নীতি বাধ্যতামূলক করে নিয়েছেন, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি অজ্ঞানতা ও মূর্খতাবশতঃ কোন খারাপ কাজ করে বসে, অতঃপর সে যদি তাওবা করে ও নিজেকে সংশোধন করে নেয়, তবে জানবে যে, তিনি হচ্ছেন ক্ষমাপরায়ণ, কৃপানিধান।

٥٤- وَاِذَا جَـآءَكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاٰيٰتِنَا فَقُلْ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ اَنَّهٗ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوْٓءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهٖ وَاَصْلَحَ فَاَنَّهٗ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

আল্লাহ পাক হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)-কে বলছেনঃ হে রাসূল (সঃ)! তুমি তাদেরকে বলে দাও–আমি এই দাবী কখন করি যে, আমার কাছে আল্লাহর ধন ভাণ্ডার রয়েছে? আর আমি এই দাবীও করি না যে, আমি ভবিষ্যতের বিষয় অবগত রয়েছি। ভবিষ্যতের জ্ঞানতো একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই রয়েছে। তিনি আমাকে যেটুকু জানিয়েছেন আমি শুধু ঐটুকুই জানি। আমি এ কথাও বলি না যে, আমি একজন ফেরেশ্তা। আমি একজন মানুষ ছাড়া কিছুই নই। আমার বৈশিষ্ট্য শুধু এটুকুই যে, আমার কাছে আল্লাহর অহী বা প্রত্যাদেশ এসে থাকে। আল্লাহ তা'আলা আমাকে এরই মর্যাদা দান করেছেন এবং আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। এ জন্যেই আমি অহী ছাড়া অন্য কিছুর অনুসরণ করি না এবং অহীর সীমা হতে অর্ধ হাতও আগে বাড়ি না।

ইরশাদ হচ্ছে– হে মুহাম্মাদ (সঃ)! তুমি তাদেরকে বল, অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি সমান হতে পারে? অর্থাৎ সত্যের অনুসরণকারী এবং পথভ্রষ্ট ব্যক্তি কি কখনও সমান হয়? তোমরা কি এটা চিন্তা করে দেখো না? যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলছেনঃ 'হে মুহাম্মাদ (সঃ)! তোমার উপর তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যা

কিছু অবতীর্ণ হয়েছে তা যে সত্য এটা যে ব্যক্তি জানে সে কি অন্ধ ব্যক্তির মত হতে পারে?

এরপর ঘোষিত হচ্ছে-হে মুহাম্মাদ (সঃ)! এই কুরআনের মাধ্যমে তুমি ঐ লোকদেরকে ভয় প্রদর্শন কর যাদের এই ভয় রয়েছে যে, তাদেরকে আল্লাহর সামনে হাজির হতে হবে এবং এই বিশ্বাস আছে যে, আল্লাহ ছাড়া তাদের কোন অভিভাবক নেই, আর কোন সুপারিশকারী দ্বারাও কিছুই উপকার হবে না। যারা আল্লাহর ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত থাকে এবং হিসাবের দিনের ভয় রাখে, আর এই ভয় রাখে যে, তাদেরকে আল্লাহর সামনে উপস্থিত হতে হবে। সেই দিন তাদের জন্যে না কোন বন্ধু থাকবে এবং না কোন সুপারিশকারী থাকবে, যে সুপারিশ করে তাদেরকে আল্লাহর শাস্তি থেকে মুক্তির ব্যবস্থা করবে। তাদেরকে সেই দিনের ভয় প্রদর্শন কর যেই দিন আল্লাহ ছাড়া আর কারও হুকুমত চলবে না। এর ফলে হয়তো তারা আল্লাহকে ভয় করবে এবং দুনিয়ায় এমন আমল করবে যা তাদেরকে কিয়ামতের দিনের শাস্তি হতে মুক্তি দেবে এবং প্রতিদান পেলে দ্বিগুণ প্রতিদান পাবে।

মহান আল্লাহ বলেনঃ (হে মুহাম্মাদ সঃ!) যারা সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং সেই সময় তাদের চিত্ত সম্পূর্ণরূপে নির্মল থাকে, তুমি তাদেরকে তোমার নিকট থেকে দূর করে দিয়ো না, বরং তাদেরকে তোমার সাহচর্য লাভের সুযোগ দান কর। যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেনঃ

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَ الْعَشِيِّ (১৮ঃ ২৮)

আল্লাহ পাকের উক্তিঃ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ -এর ভাবার্থ হচ্ছে- তারা তাঁর ইবাদত করে এবং তাঁর নিকট যাচ্ঞা করে। بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِيِّ -এই উক্তি সম্পর্কে সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব (রঃ) বলেন যে, এর দ্বারা 'ফরয নামায' বুঝানো হয়েছে।[১]

এটা আল্লাহ তা'আলার وَ قَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِيْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ -এই উক্তির মতই। অর্থাৎ 'তোমরা আমার নিকট প্রার্থনা কর, আমি তোমাদের সেই প্রার্থনা কবূল করবো।' (৪০ঃ ৬০)

يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ (১৮ঃ ২৮) অর্থাৎ এই আমলের মাধ্যমে তারা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে। আর এই আমল তারা আন্তরিকতার সাথে করে।

১. এটা মুজাহিদ (রঃ), হাসান (রঃ) এবং কাতাদারও (রঃ) উক্তি।

ইরশাদ হচ্ছে—হে মুহাম্মাদ (সঃ)! না তাদের হিসাব তোমার কাছে নেয়া হবে, না তোমার হিসাব তাদের কাছে নেয়া হবে। যেমন যারা হযরত নূহ (আঃ)-কে বলেছিলঃ 'আমরা কি তোমার উপর ঈমান আনবো? অথচ আমাদের যারা নিম্ন শ্রেণীর লোক তারাই তোমার অনুসরণ করছে!' তাদের এ কথার উত্তরে হযরত নূহ (আঃ) তাদেরকে বলেছিলেনঃ "তারা কি আমল করছে তা তো আমার জানা নেই। তোমাদের যদি তা জানা থাকে তবে তোমরা তা জেনেই থাক, তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলাই সব কিছু জানেন এবং তিনিই তাদের হিসাব গ্রহণকারী।"

ঘোষিত হচ্ছে—হে মুহাম্মাদ (সঃ)! যদি তুমি তাদেরকে তোমার নিকট থেকে সরিয়ে দাও তবে তুমি অত্যাচারীদের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে। হযরত ইবনে মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, কুরাইশদের একটি দল নবী (সঃ)-এর নিকট আগমন করে। ঐ সময় তাঁর কাছে হযরত খাব্বাব (রাঃ), হযরত সুহাইব (রাঃ), হযরত বিলাল (রাঃ) এবং হযরত আম্মার (রাঃ) উপবিষ্ট ছিলেন। তখন তাদের সম্মানিত লোকেরা বললোঃ "হে মুহাম্মাদ (সঃ)! কওমের এই লোকেরাই কি তোমার নিকট পছন্দনীয়? এরাই কি এমন লোক যে, আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে ছেড়ে তাদের উপর অনুগ্রহ করেছেন? এখন আমরা তাদের দলে মিলিত থেকে কিভাবে তোমার অনুসরণ করতে পারি? তুমি তাদেরকে তোমার নিকট থেকে সরিয়ে দাও। তাহলে আমরা তোমার অনুসরণ করবো।" তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। এই স্থলে মহান আল্লাহ পাক বলেনঃ এভাবেই আমি এককে অপরের দ্বারা পরীক্ষায় ফেলে থাকি।

নবী (সঃ)-এর পাশে ঐ দুর্বল মুমিন লোকগুলোকে দেখে তারা তাঁদের ঘৃণার চোখে দেখেছিল। তাই তারা নবী (সঃ)-কে গোপনীয়ভাবে বলেছিলঃ "আমরা আপনার মজলিসে শরীক থাকতে চাই। তবে গ্রাম্য লোকেরা আমাদের মর্যাদা সম্পর্কে অবহিত রয়েছে। আরব প্রতিনিধিরা আপনার কাছে যাতায়াত করতে আছে। তারা আমাদেরকে এই নিম্ন শ্রেণীর লোকদের সাথে দেখবে, এতে আমরা লজ্জা বোধ করছি। সুতরাং আমরা যখন আপনার নিকট অবস্থান করবো তখন আপনি এই লোকদেরকে আপনার নিকট থেকে সরিয়ে দিবেন। অতঃপর যখন আমরা আপনার নিকট থেকে চলে যাবো তখন ইচ্ছে করলে আপনি তাদেরকে আপনার নিকট বসাতে পারেন।" একথা শুনে নবী (সঃ) তাদেরকে বলেনঃ "আচ্ছা, ঠিক আছে।" তখন তারা বলেঃ "এই চুক্তির উপর আমাদেরকে একটা

সনদ লিখে দিন।" তাদের এই কথামত রাসূলুল্লাহ (সঃ) কাগজ আনতে বলেন এবং সনদ লিখবার জন্যে হযরত আলী (রাঃ)-কে ডেকে পাঠান। সেই সময় ঐ দুর্বল মুমিন লোকগুলো এক কোণে বসেছিলেন। ঐ অবস্থায় এই আয়াত অবতীর্ণ হয়, তাতে বলা হয়- হে মুহাম্মাদ(সঃ)! এই লোকদেরকে তোমার নিকট থেকে সরিয়ে দেবে না। তারা আল্লাহকে স্মরণ করে থাকে। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত আলীর হাত থেকে কাগজ নিয়ে তা ছুঁড়ে ফেলে দেন। এরপর তিনি ঐ দুর্বল মুমিন লোকদেরকে নিজের কাছে ডেকে নেন। [১] এই হাদীসটি গারীব। কেননা এই আয়াতটি মক্কী। আর আকরা ইবনে হাবিস আত্তামীমী এবং উয়াইনা ইবনে হাসন আল ফাযারী হিজরতের পরে ইসলাম গ্রহণ করেন। হযরত সা'দ বলেন যে, এই আয়াতটি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ছয়জন সাহাবীর ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়, যাঁদের মধ্যে হযরত ইবনে মাসউদও (রাঃ) রয়েছেন। তিনি বলেনঃ "আমরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট পৌঁছার ব্যাপারে একে অপরকে ছাড়িয়ে যেতাম। তিনি আমাদেরকে তাঁর কাছে বসিয়ে নিতেন। তখন কুরাইশরা বলতোঃ "আপনি আমাদেরকে ছেড়ে এদেরকে আপনার কাছে বসিয়ে নিচ্ছেন।" [২]

ইরশাদ হচ্ছে-তাদের মধ্যে কে কেমন তা আমি পরীক্ষা করে নিয়েছি। এই পরীক্ষার ফলাফল এই ছিল যে, কাফির কুরাইশরা বলতোঃ এরাই কি ঐ সব লোক যে, আমাদেরকে বাদ দিয়ে আল্লাহ তাদের উপর অনুগ্রহ করেছেন? ব্যাপারটা ছিল এই যে, প্রথম যুগে বেশীর ভাগ ঐসব লোকই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন যাঁরা ছিলেন দুর্বল ও নিম্ন শ্রেণীর লোক। আমীর ও নেতৃস্থানীয়দের খুব কম লোকই ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন। যেমন হযরত নূহ (আঃ)-এর কওমের নেতৃস্থানীয় লোকেরা তাঁকে বলেছিলঃ "আমরা তো দেখছি যে, নিম্ন শ্রেণীর লোকেরাই আপনার অনুসরণ করছে, কোন সম্ভ্রান্ত ও প্রভাবশালী লোক তো আপনার অনুসরণ করছে না।" অনুরূপভাবে রোম-সম্রাট হিরাক্লিয়াস আবূ সুফিয়ান (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেছিলঃ 'কওমের ধনী ও সম্ভ্রান্ত লোকেরা তাঁর (মুহাম্মাদ সঃ -এর) অনুসরণ করছে, না দরিদ্র লোকেরা?' আবূ সুফিয়ান (রাঃ) উত্তরে বলেছিলেনঃ 'বেশীর ভাগ দুর্বল ও গরীব লোকেরাই তাঁর অনুসরণ করছে।'

---

১. এটা ইবনে আবি হাতিম (রঃ) তাখরীজ করেছেন এবং ইমাম ইবনে জারীরও (রঃ) আসবাত ইবনে নাসরের হাদীস থেকে এটা বর্ণনা করেছেন!

২. এটা ইমাম হাকিম স্বীয় 'মুসতাদরাক' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম বুখারী (রঃ) ও ইমাম মুসলিম (রঃ)-এর শর্তের উপর বলেছেন এবং ইবনে হিব্বান তাঁর সহীহ গ্রন্থে এটা তাখরীজ করেছেন।

তখন হিরাক্লিয়াস মন্তব্য করেছিলঃ 'এরূপ লোকেরাই রাসূলদের অনুসরণ করে থাকে।' ভাবার্থ এই যে, কাফির কুরাইশরা ঐ দুর্বল মুমিনদেরকে বিদ্রূপ করতো এবং তাদের উপর কর্তৃত্ব লাভ করলে তাদেরকে কষ্ট দিতো। তাদের কথা এই যে, শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তাদেরকেই কেন সুপথ প্রদর্শন করলেন? যে পথে তারা পা রেখেছে সেটা যদি ভালই হয় তবে আল্লাহ তাদেরকেই বা ছাড়লেন কেন? তারা আরো বলতোঃ 'যদি এটা মেনে নেয়া ভাল কাজ হতো তবে এরা আমাদের থেকে কখনও বেড়ে যেতে পারতো না।' যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ যখন তাদের সামনে আমার স্পষ্ট আয়াতসমূহ পাঠ করা হয় তখন ঐ কাফিররা মুমিনদেরকে বলে– 'আচ্ছা বল তো তোমাদের দু'দলের মধ্যে ভাল কোন্ দল? অথবা সম্মানিত সম্পদশালী কারা?' এর জবাবে আল্লাহ বলেনঃ "তাদের পূর্বে আমি এমন বহু কওমকে ধ্বংস করে দিয়েছি যারা এদের চেয়ে বেশী সম্মানিত, জায়গা জমির মালিক ও জাঁকজমকপূর্ণ ছিল।" আর যারা বলেছিলঃ 'আমাদের উপর এদেরকে আল্লাহ কেন প্রাধান্য দিয়েছেন?' তাদের উত্তরে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "আল্লাহ তা'আলা কি কৃতজ্ঞ, ভাল অন্তরের অধিকারী ও সৎকর্মশীল লোকদেরকে জানেন না? মহান আল্লাহ এ ধরনের লোকদেরকেই ভাল কাজের তাওফীক দিয়ে থাকেন। কেননা, তিনি সৎকর্মশীল লোকদের সাথেই রয়েছেন।" সহীহ হাদীসে রয়েছে– 'আল্লাহ তোমাদের আকৃতি ও রং এর দিকে দেখেন না, বরং তিনি তোমাদের অন্তর ও আমলের দিকেই দেখে থাকেন।'[১]

(হে মুহাম্মাদ সঃ!) তুমি ভীতি প্রদর্শন কর ঐ লোকদেরকে যাদের আল্লাহর সামনে হাযির হওয়ার ভয় রয়েছে– এই আয়াত সম্পর্কে এই বর্ণনা রয়েছে যে, বানী আবদে মানাফ গোত্রের কয়েকজন সম্ভ্রান্ত লোক আবূ তালিবের নিকট এসে বলেঃ "হে আবূ তালিব! যদি আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র মুহাম্মাদ (সঃ) আমাদের গোলাম ও নিম্ন শ্রেণীর লোকদেরকে তাঁর নিকট থেকে সরিয়ে দিতেন তবে কতই না ভাল হতো! কেননা তারা আমাদের গোলাম ও সেবক। আর তাদের সাথে উঠা বসা করা আমাদের কাছে খুবই কঠিন ঠেকছে। সুতরাং যদি তিনি তাদেরকে তাঁর নিকট থেকে সরিয়ে দেন তবে আমরা তার অনুসরণ করবো এবং তাঁর সত্যতা স্বীকার করবো।" তখন আবূ তালিব রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে এসে তা বর্ণনা করেন। হযরত উমার (রাঃ) তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলেনঃ "ঠিক আছে,

---

১. ইমাম মুসলিম (রঃ) হাদীসটিকে নিম্নরূপ শব্দের সাথে তাখরীজ করেছেনঃ إِنَّ اللّٰهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى أَجْسَامِكُمْ وَلَا إِلَى صُوَرِكُمْ অর্থাৎ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের দেহ ও তোমাদের আকৃতির প্রতি নযর করেন না।'

এরূপই করে দেখুন! এর দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য জানা যাবে এবং এর পরে তারা কি করে তা দেখা যাবে।" সেই সময় এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ পাক বলেনঃ 'আল্লাহ কৃতজ্ঞ বান্দাদেরকে কি জানেন না?' কৃতজ্ঞ বান্দাদের দ্বারা নিম্ন লিখিত লোকদেরকে বুঝানো হয়েছেঃ হযরত বিলাল (রাঃ), হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রাঃ), হযরত হুযাইফার (রাঃ) গোলাম হযরত সালিম (রাঃ), হযরত উসাইদের (রাঃ) আযাদকৃত গোলাম ও হযরত ইবনে মাসঊদের (রাঃ) মিত্র হযরত সুবাইহা (রাঃ), হযরত মিকদাদ ইবনে আমর (রাঃ), হযরত মাসঊদ (রাঃ), হযরত ইবনুল কারী (রাঃ), হযরত ওয়াকিদ ইবনে আবদুল্লাহ হানযালী (রাঃ), আমর ইবনে আবদি আমর (রাঃ), যুশ্ শিমালাইন (রাঃ), মুরছিদ ইবনে আবি মুরছিদ (রাঃ) এবং হযরত হামযা ইবনে আবদিল মুত্তালিব (রাঃ)-এর মিত্র হযরত আবূ মুরছিদ আল গানাভী (রাঃ)। আর এই আয়াত কাফির কুরাইশদের নেতৃস্থানীয় লোক ও তাদের মিত্রদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। যখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয় তখন হযরত উমার (রাঃ) তড়িৎ গতিতে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট গমন করেন এবং নিজের ভুল পরামর্শ দানের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

তাই ইরশাদ হচ্ছে– যখন আমার আয়াতসমূহের উপর বিশ্বাস স্থাপনকারী লোকেরা তোমার নিকট আগমন করে তখন তাদেরকে বল, তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। অর্থাৎ হে মুহাম্মাদ (সঃ)! তাদের প্রতি সালাম জানিয়ে তাদের সম্মান বাড়িয়ে দাও এবং তাদেরকে মহান আল্লাহর ব্যাপক রহমতের সুসংবাদ প্রদান কর। এজন্যেই মহান আল্লাহ বলেন, আল্লাহ নিজের উপর রহমতকে ওয়াজিব করে দিয়েছেন। এরপর তিনি বলেন, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি অজ্ঞানতা ও মূর্খতা বশতঃ কোন খারাপ কাজ করে বসে, অতঃপর সে যদি তাওবা করে নিজেকে সংশোধন করে নেয়, তবে জানবে যে, তিনি হচ্ছেন ক্ষমাশীল, কৃপানিধান।

হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ যখন আল্লাহ তা'আলা মাখলূকের উপর তাকদীর স্থাপন করেন তখন তিনি স্বীয় কিতাব লাওহে মাহফূযে লিপিবদ্ধ করেন, যা আরশের উপর রয়েছেঃ 'আমার ক্রোধের উপর আমার রহমত জয়যুক্ত থাকবে।' অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ যখন আল্লাহ তা'আলা স্বীয় মাখলূকের উপর নির্দেশ জারী করে ফেলবেন তখন তিনি আরশের উপর থেকে কিতাব গ্রহণ করবেন যাতে লিখিত থাকবেঃ 'আমি আরহামুর রাহিমীন।' তারপর তিনি এক বা দুই মুষ্ঠিপূর্ণ মাখলূককে জাহান্নাম

থেকে বের করবেন যারা একটিও ভাল কাজ করেনি। আর তাদের চক্ষুদ্বয়ের মধ্যস্থলে মাথার উপর লিখিত থাকবেঃ عُتَقَاءُ اللّٰهِ অর্থাৎ এরা হচ্ছে আল্লাহর আযাদকৃত। كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ আল্লাহ তা'আলার এই উক্তি সম্পর্কে হযরত সালমান ফারসী (রাঃ) লিখেছেন, "তাওরাত গ্রন্থে আমরা লিখিত পাই যে, আল্লাহ তা'আলা যমীন ও আসমান সৃষ্টি করেন এবং স্বীয় একশ'টি রহমতও সৃষ্টি করেন, আর এটা তিনি মাখলূককে সৃষ্টি করার পূর্বেই সৃষ্টি করেন। তারপর তিনি মাখলূককে সৃষ্টি করেন এবং একশ'টি রহমতের মধ্যে মাত্র একটি রহমত তিনি মাখলূকের মধ্যে বন্টন করে দেন। আর নিজের মধ্যে তিনি নিরানব্বইটি রহমত রেখে দেন। এই একটি মাত্র রহমতের বরকতেই মানুষ পরস্পরের মধ্যে দয়া ও ভালবাসা দেখিয়ে থাকে, পরস্পর মিলেমিশে বাস করে, উষ্ট্রী, গাভী ও ছাগী এই একটি রহমত থেকেই অংশ নিয়ে স্বীয় বাচ্চাদের প্রতি স্নেহ ও মমতা দেখিয়ে থাকে এবং সমুদ্রে দু'টি সাপ পরস্পর মিলে জুলে অবস্থান করে। কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ এইসব রহমত এবং নিজের রহমত সমস্তই স্বীয় পাপী বান্দাদের জন্যে ব্যবহার করবেন।" এই বিষয়ে বহু হাদীস বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) সাহাবীদেরকে জিজ্ঞেস করেনঃ 'বান্দাদের উপর আল্লাহর কি হক রয়েছে তা কি তোমরা জান?' অতঃপর তিনি বলেনঃ "বান্দাদের উপর আল্লাহর হক এই যে, তারা তাঁরই ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কাউকেও শরীক করবে না।" তারপর তিনি জিজ্ঞেস করেনঃ "আল্লাহর উপর তাঁর বান্দাদের কি হক রয়েছে তা কি তোমরা অবগত আছ? তা এই যে, তিনি তাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন এবং তাদেরকে শাস্তি দেবেন না।"

৫৫। এমনিভাবে আমি আমার আয়াত ও নিদর্শনসমূহ সবিস্তার বর্ণনা করে থাকি, যেন অপরাধী লোকদের পথটি সুস্পষ্ট হয়ে পড়ে।

٥٥- وَ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ وَ لِتَسْتَبِيْنَ سَبِيْلُ الْمُجْرِمِيْنَ ۝ ع

৫৬। (হে মুহাম্মাদ সঃ)! তুমি কাফিরদের বলে দাও– তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে যার ইবাদত কর, আমাকে তার ইবাদত করতে নিষেধ করে দেয়া

٥٦- قُلْ اِنِّيْ نُهِيْتُ اَنْ اَعْبُدَ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ط

قُلْ لَّآ اَتَّبِعُ اَهْوَآءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ اِذًا وَّمَآ اَنَا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ ○

হয়েছে। তুমি আরও বল—আমি তোমাদের ইচ্ছা ও মনোবৃত্তির অনুসরণ করবো না, কেননা, তা করলে আমি পথহারা হয়ে পড়বো এবং আমি আর পথ প্রাপ্তদের মধ্যে থাকবো না।

৫৭- قُلْ اِنِّىْ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّىْ وَكَذَّبْتُمْ بِهٖ مَا عِنْدِىْ مَا تَسْتَعْجِلُوْنَ بِهٖ اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفٰصِلِيْنَ ○

৫৭। তুমি বল— আমি আমার প্রতিপালকের প্রদত্ত একটি সুস্পষ্ট উজ্জ্বল যুক্তি-প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত, আর তোমরা সেই দলীলকে মিথ্যা মনে করছো, যে বিষয়টি তোমরা খুব তাড়াতাড়ি পেতে চাও তার ইখতিয়ার আমার হাতে নেই, হুকুমের মালিক আল্লাহ ছাড়া আর কেউই নয়, তিনি সত্য ও বাস্তবানুগ কথা বর্ণনা করেন, তিনিই হচ্ছেন সর্বোত্তম ফায়সালাকারী।

৫৮- قُلْ لَّوْ اَنَّ عِنْدِىْ مَا تَسْتَعْجِلُوْنَ بِهٖ لَقُضِىَ الْاَمْرُ بَيْنِىْ وَبَيْنَكُمْ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالظّٰلِمِيْنَ ○

৫৮। তুমি বল— তোমরা যে বস্তুটি তাড়াতাড়ি পেতে চাও, তা যদি আমার ইখতিয়ারভুক্ত থাকতো, তবে তো আমার ও তোমাদের মধ্যে চূড়ান্ত ফায়সালা অনেক আগেই হয়ে যেতো, আর যালিমদেরকে আল্লাহ খুব ভাল করেই জানেন।

৫৯। অদৃশ্য জগতের চাবিকাঠি তাঁরই নিকট রয়েছে; তিনি ছাড়া আর কেউই তা জ্ঞাত নয়, স্থল ও জলভাগের সব কিছুই তিনি অবগত রয়েছেন, তাঁর অবগতি ব্যতীত বৃক্ষ হতে একটি পাতাও ঝরে পড়ে না এবং ভূপৃষ্ঠের অন্ধকারের মধ্যে একটি দানাও পড়ে না, এমনিভাবে কোন সরস ও নিরস বস্তুও পতিত হয় না; সমস্ত বস্তুই সুস্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে।

٥٩- وَ عِنْدَهٗ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَاۤ اِلَّا هُوَ وَ يَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ مَا تَسْقُطُ مِنْ وَّرَقَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا وَ لَا حَبَّةٍ فِيْ ظُلُمٰتِ الْاَرْضِ وَ لَا رَطْبٍ وَّ لَا يَابِسٍ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ۝

ইরশাদ হচ্ছে- যেমন আমি পূর্ববর্তী বর্ণনায় দলীল প্রমাণাদির মাধ্যমে সাধুতা, হিদায়াত ইত্যাদিকে প্রকাশ করে দিয়েছি, তেমনই যে আয়াতগুলোর সম্বোধিত ব্যক্তি প্রকাশ্য বর্ণনার মুখাপেক্ষী তার কাছে আমি ঐ আয়াতগুলো স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছি। এর কারণ এটাও যে, যেন অপরাধীদের পথ সুস্পষ্ট হয়ে পড়ে। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল (সঃ)-কে সম্বোধন করে বলছেন, হে মুহাম্মাদ (সঃ)! তুমি কাফিরদেরকে বলে দাও-আল্লাহ তা'আলা যে অহী আমার নিকট পাঠিয়েছেন আমি তা অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখে ওর উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছি। পক্ষান্তরে তোমরা সত্যকে মিথ্যা জেনেছো। তোমরা যে শাস্তির জন্য তাড়াহুড়া করছো তা আমার হাতে নেই। হুকুমের মালিক তো একমাত্র আল্লাহ। যদি তিনি সত্বর তোমাদের উপর শাস্তি আনয়নের ইচ্ছে করেন তবে সেই শাস্তি সত্বরই তোমাদের উপর এসে পড়বে। আর যদি তিনি কোন মহান উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে শাস্তি প্রদানে বিলম্ব করেন এবং তোমাদেরকে অবকাশ দেন তবে ওটারও তাঁর অধিকার রয়েছে। এজন্যেই আল্লাহ পাক বলেনঃ তিনি সত্যপন্থা অবলম্বন করে থাকেন এবং তিনি কোন নির্দেশ জারী ও বান্দাদের মধ্যে কোন হুকুম চালুর ব্যাপারে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকেন। হে নবী (সঃ)! তুমি তাদেরকে বল-যদি তোমাদের উপর সত্বর শাস্তি আনয়ন আমার অধিকারভুক্ত হতো তবে তোমরা যে শাস্তির যোগ্য তা আমি সত্বরই তোমাদের উপর অবতীর্ণ করতাম। আর আল্লাহ তো অত্যাচারীদেরকে ভালরূপেই জানেন। যদি প্রশ্ন করা হয় যে, এই আয়াত

এবং সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হাদীস পরস্পর বিরোধী, তাহলে উভয়ের মধ্যে আনুকূল্য আনয়নের উপায় কি? হাদীসটি নিম্নে বর্ণিত হলোঃ

হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! উহুদের দিবস অপেক্ষা কঠিনতর কোন দিন কি আপনার জীবনে এসেছিল? তিনি উত্তরে বলেনঃ হে আয়েশা (রাঃ)! তোমার কওমের পক্ষ থেকে যে ভীষণতম কষ্ট আমার উপর পৌঁছেছিল তা হচ্ছে আকাবা দিবসের কষ্ট। যখন আমি ইবনে আবদি ইয়ালীল ইবনে আবদি কিলালের উপর নিজেকে পেশ করি তখন সে আমার আহ্বানে সাড়া না দিয়ে তা প্রত্যাখ্যান করে। আমি তখন অত্যন্ত দুঃখিত মনে সেখান থেকে ফিরে যাই। কারণে সাআ'লিব নামক স্থানে পৌঁছে আমার জ্ঞান ফিরে আসে। আমি মাথা উঠিয়ে দেখি যে, আমার উপরে এক খণ্ড মেঘ ছেয়ে আছে। আমি ওর মধ্যে হযরত জিবরাঈল (আঃ)-কে দেখতে পাই। তিনি আমাকে বলেন, হে মুহাম্মাদ (সঃ)! আপনার কওমের লোকেরা আপনাকে যা বলছে তা আল্লাহ শুনেছেন! তিনি আপনার সাহয্যার্থে পাহাড়ের ফেরেশতাকে পাঠিয়েছেন যাতে আপনি যা চান তাকে তাই নির্দেশ দেন! পাহাড়ের ফেরেশতাও সাড়া দিলেন এবং তাঁকে সালাম জানালেন। অতঃপর বললেন, আল্লাহ আমাকে আপনার সাহায্যার্থে পাঠিয়েছেন। সুতরাং যদি আপনি আমাকে হুকুম করেন তবে আমি এই পাহাড় দু'টি আপনার কওমের উপর নিক্ষেপ করি। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, আমি আশা রাখছি যে, আল্লাহ এই কাফিরদের বংশ হতে এমন লোকও বের করবেন যারা মুমিন হবে এবং আল্লাহর সাথে আর কাউকেও শরীক করবে না।

সহীহ মুসলিমে নিম্নরূপ শব্দ রয়েছে– তাদের উপর ফেরেশতা শাস্তি পেশ করলে রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাদেরকে অবকাশ দিতে বললেন এবং শাস্তি প্রদানে বিলম্ব করণের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন, যাতে তাদের বংশ থেকে মুমিনদের জন্মলাভ হতে পারে। তাহলে এখন সমস্যা দেখা দিচ্ছে যে, আল্লাহর উল্লিখিত উক্তি এবং এই হাদীসের মধ্যে আনুকূল্যের উপায় কি? পূর্ববর্তী উক্তি এই যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে বলা হচ্ছে– তোমরা যে শাস্তি চাচ্ছ তা যদি আমার অধিকারে থাকতো তাহলে তো এখনই আমার ও তোমাদের মধ্যে ফায়সালা হয়েই যেতো এবং এখনই আমি তোমাদের উপর শাস্তি অবতীর্ণ করতাম। আর এখানে শাস্তি প্রদানের অধিকার লাভ সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাদের উপর শাস্তি অবতীর্ণ করছেন না! এই সমস্যার সমাধান এইভাবে হতে পারেঃ পবিত্র আয়াত দ্বারা এটাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, যে শাস্তি তাঁরা চাচ্ছে তা তাদের চাওয়ার কারণেই

তাদের উপর পতিত হতো। আর উক্ত হাদীসে এটা উল্লেখ নেই যে, তারা শাস্তি চেয়েছিল। বরং ফেরেশতা তাদের উপর শাস্তি পেশ করতে চেয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, হে মুহাম্মাদ (সঃ)! যদি আপনি চান তবে আমি এই 'আখশাবাইন' পাহাড় দু'টিকে তাদের উপর নিক্ষেপ করে দেই, যে পাহাড় দু'টি মক্কায় অবস্থিত এবং মক্কাকে উত্তর ও দক্ষিণ দিক থেকে ঘিরে রয়েছে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সঃ) নমনীয়তা প্রদর্শন করতঃ বিলম্বের সাথে কাজ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

ইরশাদ হচ্ছে- অদৃশ্যের কথা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, "গায়েবের বিষয় হচ্ছে পাঁচটি। (১) কিয়ামতের সময়ের কথা আল্লাহ ছাড়া আর কারও জানা নেই। (২) বৃষ্টি বর্ষণ করা। (৩) গর্ভবতীর গর্ভে পুত্র সন্তান আছে কি কন্যা সন্তান আছে। (৪) কোন লোক আগামীকল্য কি উপার্জন করবে। (৫) কোন লোকই এটা জানে না যে, কোন্ ভূমিতে সে মৃত্যুবরণ করবে। একমাত্র আল্লাহই এসব বিষয়ের খবর রাখেন।" হযরত উমার (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে যে, এক সময় হযরত জিবরাঈল (আঃ) একজন গ্রাম্য লোকের রূপ ধারণ করে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট আগমন করেন এবং ঈমান, ইসলাম ও ইহসান সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস করেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন উত্তর দিতে গিয়ে এক পর্যায়ে বলেনঃ "পাঁচটি বিষয়ের জ্ঞান আল্লাহ ছাড়া আর কারও নেই।" অতঃপর তিনি إِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ (৩১ঃ ৩৪) -এই আয়াতটি পাঠ করেন। আর আল্লাহ পাকের উক্তিঃ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ -এর ভাবার্থ এই যে, জলভাগে ও স্থলভাগে যত কিছু অজৈব বস্তু বিদ্যমান রয়েছে, আল্লাহ পাকের জ্ঞান সেই সব কিছুকেই পরিবেষ্টন করে রয়েছে। যমীন ও আসমানের অণু পরিমাণ জিনিসও তাঁর থেকে গোপন নেই। কবি সারসারী কতই না সুন্দর কথা বলেছেন-

فَلَا يَخْفَى عَلَيْهِ الذَّرُّ اِمَّا * تَرَاءَى لِلنَّوَاظِرِ اَوْ تَوَارٰى

অর্থাৎ "আল্লাহ থেকে কোন অণু পরিমান জিনিসও গোপন থাকতে পরে না, দর্শকের সামনে তা প্রকাশিতই হোক বা গোপনীয়ই থাক না কেন।"

وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَّرَقَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا আল্লাহ পাকের এই উক্তির তাৎপর্য এই যে, তিনি যখন অজৈব বস্তুর গতিরও খবর রাখেন তখন তিনি প্রাণীসমূহ, বিশেষ করে দানব ও মানবের গতি ও আমলের খবর কেন রাখবেন না? কেননা, তাদের উপর তো ইবাদত বন্দেগীর দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে! যেমন এক জায়গায় তিনি বলেনঃ

يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْاَعْيُنِ وَمَا تُخْفِى الصُّدُوْرُ অর্থাৎ "তিনি চক্ষুসমূহের অবিশ্বস্ততা ও অন্তরের গোপন কথাও জানেন।" (৪০ঃ ১৯) স্থলভাগ ও জলভাগের প্রত্যেক বৃক্ষের উপরও একজন করে নিযুক্ত রয়েছেন, যিনি পাতাসমূহের পতনের শব্দ পর্যন্ত গণে রাখেন। লাওহে মাহফূযে প্রত্যেক আদ্র-শুষ্ক, প্রত্যেক সরল-বক্র এবং ভূ-পৃষ্ঠের অন্ধকারের মধ্যকার এক একটি অণু পরিমাণ বস্তুও লিখিত রয়েছে। প্রত্যেক গাছ এমন কি সূঁচের ছিদ্রের উপরও ফেরেশতা নিযুক্ত রয়েছেন। তিনি গাছ সম্পর্কে লিখতে রয়েছেন যে, কখন সেটা সজীব হলো এবং কখন শুকিয়ে গেল। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা দোয়াত ও লিপি সৃষ্টি করেন এবং দুনিয়ায় যত কিছু হবে, সবই লিপিবদ্ধ করেন। অর্থাৎ কিরূপ মাখলূক সৃষ্টি করা হবে, তার জীবিকা হালাল হবে কি হারাম হবে, তার আমল ভাল হবে কি মন্দ হবে ইত্যাদি সব কিছুই লিপিবদ্ধ করেন। হযরত আমর ইবনুল আস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তৃতীয় যমীনের নীচের এবং চতুর্থ যমীনের উপরের জ্বিনেরা তাদের নূর বা আলো প্রকাশ করতে চাইলো, কিন্তু কোন কোণ থেকেই তাদের নূর বা আলো প্রকাশ করতে পারলো না। এ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার মহরসমূহ। প্রত্যেক মহরের উপর একজন ফেরেশতা রয়েছেন। আল্লাহ পাক প্রত্যহ একজন ফেরেশতাকে পাঠিয়ে দিয়ে বলেনঃ "যে মহরের দায়িত্ব তোমার উপর রয়েছে, তুমি তার হিফাযত করবে।"

৬০। আর সেই মহা প্রভুই রাত্রিকালে নিদ্রারূপে তোমাদের এক প্রকার মৃত্যু ঘটিয়ে থাকেন, আর দিনের বেলা তোমরা যে পরিশ্রম করে থাক তিনি সেটাও সম্যক পরিজ্ঞাত; অতঃপর তিনি নির্দিষ্ট সময়কাল পূরণের নিমিত্ত তোমাদেরকে নিদ্রা থেকে জাগিয়ে থাকেন, তার পর পরিশেষে তাঁর কাছেই তোমাদেরকে ফিরে যেতে হবে, তখন তিনি তোমাদেরকে তোমাদের কৃত-কর্ম সম্পর্কে অবহিত করবেন।

٦٠- وَهُوَ الَّذِىْ يَتَوَفّٰىكُمْ بِالَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيْهِ لِيُقْضٰى اَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ اِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ع

৬১। আর আল্লাহই স্বীয় বান্দাদের উপর প্রতাপশালী, তিনি তোমাদের উপর পাহারাদার নিযুক্ত করে পাঠিয়ে থাকেন, এমন কি যখন তোমাদের কারও মৃত্যুর সময় সমুপস্থিত হয়, তখন আমার প্রেরিত দূতগণ তার প্রাণ হরণ করে নেয়, এ ব্যাপারে তারা বিন্দুমাত্র ত্রুটি করে না।

٦١- وَ هُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهٖ وَ يُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتّٰٓى اِذَا جَآءَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَ هُمْ لَا يُفَرِّطُوْنَ ○

৬২। তারপর সকলকে তাদের আসল প্রভু আল্লাহর কাছে প্রত্যাবর্তিত করানো হয়, তোমরা জেনে রেখো যে, ঐ দিন একমাত্র আল্লাহই রায় প্রদানকারী হবেন, আর তিনি খুবই ত্বড়িত হিসাব গ্রহণকারী।

٦٢- ثُمَّ رُدُّوْٓا اِلَى اللّٰهِ مَوْلٰىهُمُ الْحَقِّ اَلَا لَهُ الْحُكْمُ قف وَ هُوَ اَسْرَعُ الْحٰسِبِيْنَ ○

আল্লাহ পাক বলেন যে, তিনি স্বীয় বান্দাদেরকে রাত্রিকালে নিদ্রারূপ মৃত্যুদান করে থাকেন এবং এটা হচ্ছে وَفَاتِ اَصْغَرْ বা ছোট মৃত্যু। যেমন তিনি বলেনঃ "যখন আল্লাহ বলেন–হে ঈসা (আঃ)! নিশ্চয়ই আমি তোমাকে মৃত্যু দানকারী এবং আমার কাছে উত্তোলনকারী।" অন্য জায়গায় তিনি বলেনঃ "আল্লাহ মৃত্যুর সময় প্রাণগুলোকে ওফাত দিয়ে থাকেন, আর যে প্রাণ নিদ্রার সময় মৃত্যুবরণ করে না তা এমন প্রাণ যে, ওর উপর আগমনকারী মৃত্যুকে থামিয়ে দেয়া হয় এবং ওর উপর অন্য মৃত্যুকে পাঠিয়ে দেয়া হয় অর্থাৎ নিদ্রা, আর এটা নির্ধারিত মৃত্যু পর্যন্ত চলতে থাকে।"এই আয়াতে দু'টি ওফাতের উল্লেখ করা হয়েছে। একটা হচ্ছে مَوْتِ كُبْرٰى অর্থাৎ বড় মৃত্যু এবং অপরটি হচ্ছে مَوْتِ صُغْرٰى বা ছোট মৃত্যু।

ইরশাদ হচ্ছে– তিনি রাত্রিকালে তোমাদেরকে ওফাত দিয়ে থাকেন। তখন তোমরা কাজ কারবার থেকে বিরত থাক। কিন্তু দিনের বেলায় তোমরা নিজ নিজ কাজে লিপ্ত থাক। আর তিনি তোমাদের দিনের ঐসব কাজ কারবার সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল । এটি একটি নতুন ও পৃথক বাক্য যা এটাই প্রমাণ করছে যে,

আল্লাহ তা'আলার জ্ঞান তাঁর সমস্ত মাখলূকের উপর পরিবেষ্টিত রয়েছে। রাত্রিকালে যখন নীরবতা বিরাজ করে তখনও এবং দিনের বেলায় যখন সারা বিশ্ব কর্মমুখরিত থাকে তখনও। যেমন তিনি বলেনঃ

سَوَاءٌ مِّنكُم مَّنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ-

অর্থাৎ গোপনীয় ও প্রকাশ্য, রাত্রিকালের বা দিবাভাগের সমস্ত ব্যাপারেই তাঁর পূর্ণ জ্ঞান রয়েছে। (১৩ঃ ১০) আর এক জায়গায় তিনি বলেনঃ

وَمِن رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ

অর্থাৎ "এটা আল্লাহর একটা অনুগ্রহ যে, তিনি তোমাদের জন্যে দিন ও রাত করেছেন যেন তোমরা রাত্রে বিশ্রাম ও শান্তি লাভ কর এবং দিনে জীবিকা অর্জন কর।" (২৮ঃ ৭৩) তিনি আরও বলেনঃ

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا - وَّجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا

অর্থাৎ "আমি রাত্রিকে তোমাদের জন্যে পোশাক বানিয়েছি এবং দিনকে তোমাদের জন্যে জীবিকা উপার্জনের সময় করেছি।" (৭৮ঃ ১০-১১) এজন্যেই তিনি বলেনঃ

وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ অর্থাৎ তিনি রাত্রিকালে তোমাদেরকে মৃত্যু দান করেন এবং দিবাভাগে তোমরা যা কিছু আমল করেছ বা যা কিছু উপার্জন করেছ তা তিনি সম্যক অবগত। অতঃপর তিনি তোমাদের এই বাহ্যিক মৃত্যুর পরে তোমাদেরকে দিনে পূর্ণ জীবন দান করেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, "প্রত্যেক মানুষের সাথে একজন ফেরেশতা থাকেন। যখন সে ঘুমিয়ে পড়ে তখন সেই ফেরেশতা তার প্রাণ বের করে নিয়ে আল্লাহ তা'আলার নিকট চলে যান। আল্লাহ পাক সেই প্রাণকে রেখে দিতে বললে রেখে দেন, নতুবা পুনরায় তা তার দেহে ফিরিয়ে দেন।" هُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ -এই উক্তির ভাবার্থ এটাই।

মহান আল্লাহ বলেনঃ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তির নির্ধারিত সময় পূর্ণ হয়ে যাওয়ার পর তার প্রাণ আল্লাহ তা'আলার নিকট পৌঁছিয়ে দেয়া হয়। সে যে আমল করেছিল তা তিনি তাকে জানিয়ে দেন। অতঃপর তিনি তাকে বিনিময় প্রদান করেন। ভাল হলে ভাল বিনিময় এবং মন্দ হলে মন্দ বিনিময়।

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ তিনি তাঁর বান্দাদের উপর প্রতাপশালী। অর্থাৎ তিনি সব কিছুর উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান এবং সমস্তই তাঁর সামনে অবনত। তিনি মানুষের উপর ফেরেশতা নিযুক্ত করে রেখেছেন, যিনি সর্বক্ষণ তার রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকেন। যেমন তিনি বলেনঃ "মানুষের সামনে ও পিছনে ফেরেশতা অবস্থান করে, যে আল্লাহর নির্দেশক্রমে তার রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকে।" আল্লাহ পাক বলেনঃ وَاِنَّ عَلَيْكُمْ لَحٰفِظِيْنَ অর্থাৎ "নিশ্চয়ই তোমাদের উপর রক্ষকগণ রয়েছেন।" (৮২ঃ ১০) অন্য জায়গায় তিনি বলেনঃ

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ۔

অর্থাৎ "সে যখনই কোন কথা মুখ দিয়ে বের করে তখনই তার নিকট একজন রক্ষক বিদ্যমান থাকে।" (৫০ঃ ১৮) মহান আল্লাহ আরও বলেনঃ

اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيٰنِ عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيْدٌ۔

অর্থাৎ "যখন ডানে ও বামে উপবিষ্ট দু'জন পাকড়াওকারী পাকড়াও করবে।" (৫০ঃ ১৭) আল্লাহ তা'আলা আর এক জায়গায় বলেনঃ "যখন তোমাদের কারও মৃত্যু এসে যায় তখন আমার ফেরেশতাগণ তার রূহ্ কবয করে নেয়।" হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, মালাকুল-মাওত বা মৃত্যুর ফেরেশতার কয়েকজন সাহায্যকারী ফেরেশতা রয়েছেন যাঁরা দেহ থেকে রূহকে টানতে থাকেন। যখন সেই রূহ গলা পর্যন্ত পৌঁছে যায় তখন মৃত্যুর ফেরেশতা তা কবয করে নেয়। يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ (১৪ঃ ২৭) -এই আয়াতের তাফসীরের সময় এর বর্ণনা আসবে।

وَهُمْ لَا يُفَرِّطُوْنَ অর্থাৎ ঐ ফেরেশতাগণ সেই ওফাতপ্রাপ্ত রূহের রক্ষণাবেক্ষণে বিন্দুমাত্র ত্রুটি করেন না। অতঃপর তাঁরা ওকে ঐ স্থানে পৌঁছিয়ে দেন যেখানে পৌঁছানোর আল্লাহ ইচ্ছা করেন। যদি তা সৎ হয় তবে ওকে ইল্লীয়্যিন নামক স্থানে জায়গা দেয়া হয়। আর যদি ওটা অসৎ হয় তবে ওকে সিজ্জীনে রাখা হয়। সিজ্জীন হচ্ছে জাহান্নামের একটা স্তর। আমরা এটা থেকে আল্লাহ পাকের কাছে আশ্রয় চাচ্ছি। অতঃপর ঐ ফেরেশতাগণ এই রূহগুলোকে তাদের প্রকৃত প্রভু অর্থাৎ আল্লাহর কাছে ফিরিয়ে দেন।

এখানে আমরা একটি হাদীস বর্ণনা করছি, যা ইমাম আহমাদ (রঃ) হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, মরণ শয্যায় শায়িত ব্যক্তির কাছে ফেরেশতাগণ আগমন করেন। যদি সে সৎকর্মশীল হয় তবে

তাঁরা বলেনঃ "হে পবিত্র আত্মা! তুমি এসে যাও। তুমি পবিত্র দেহের মধ্যে ছিলে। দুনিয়া হতে তুমি প্রশংসিত অবস্থায় ফিরে এসো। তোমাকে জান্নাতের রূহ ও ঈমানের সুসংবাদ দিচ্ছি। আল্লাহ তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট নন।" যখন তাঁরা ক্রমাগত এ কথা বলতে থাকেন তখন রূহ দেহ হতে বেরিয়ে আসে। ফেরেশতারা তখন তাকে নিয়ে আকাশে উঠে যান। তার জন্যে আকাশের দরযা খুলে দেয়া হয়। জিজ্ঞেস করা হয়, কে? উত্তরে বলা হয়, অমুকের আত্মা। তখন আকাশের ফেরেশতা বলেনঃ 'মারহাবা! হে পবিত্র আত্মা! তুমি পবিত্র দেহের মধ্যে ছিলে। তোমার জন্যে সুসংবাদ।' শেষ পর্যন্ত তিনি তাকে নিয়ে ঐ আকাশ পর্যন্ত উঠে যান যেখানে আল্লাহ তা'আলা রয়েছেন। আর যদি ওটা অসৎ ও পাপী লোকের আত্মা হয় তবে ফেরেশতাগণ তাকে সম্বোধন করে বলেনঃ "হে অপবিত্র দেহের ভিতরে অবস্থানকারী অপবিত্র প্রাণ! তুমি লাঞ্ছিত অবস্থায় বেরিয়ে এসো। তোমাকে গরম পানি ও রক্ত-পুঁজের সুসংবাদ এবং এই গরম পানি ও রক্ত-পুঁজ ছাড়াও তোমার জন্যে অন্য শাস্তিও রয়েছে।" বার বার বলার পর যখন সে বেরিয়ে আসে তখন তাকে নিয়ে ফেরেশতাগণ আকাশে উঠে যান। আকাশের দরযা খুলে দেয়া হয় এবং জিজ্ঞেস করা হয়, কে? উত্তর দেয়া হয়, অমুক। তখন ফেরেশ্তা বলেনঃ 'হে অপবিত্র নফস! তোমার উপর লা'নাত বর্ষিত হোক। তোমার জন্যে আকাশের দরযা খোলা হবে না।' তারপর ঐ রূহকে তার কবরে ফিরিয়ে দেয়া হয়। এই হাদীসটি গারীব। এর ভাবার্থ নিম্নরূপ হতে পারেঃ ثُمَّ رُدُّوا অর্থাৎ সমস্ত মাখলূককে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার নিকট ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে এবং মহান আল্লাহ ইনসাফ ভিত্তিক তাদের উপর নির্দেশ জারী করবেন। যেমন তিনি বলেনঃ

إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ - لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ -

অর্থাৎ "নিশ্চয়ই পূর্ববর্তীগণকে নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট স্থানে একত্রিত করা হবে।" (৫৬ঃ ৪৯-৫০) অন্য জায়গায় তিনি বলেনঃ وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا অর্থাৎ "আমি তাদের সকলকেই উঠাবো, কাউকেই ছাড়বো না এবং আমি তাদের কারও উপর অত্যাচার করবো না।" (১৮ঃ ৪৭) এ জন্যেই আল্লাহ পাক বলেনঃ তারপর সকলকেই তাদের প্রকৃত প্রভু আল্লাহর কাছে প্রত্যাবর্তিত করানো হয়, তোমরা জেনে রেখো যে, ঐ দিন একমাত্র আল্লাহই রায় প্রদানকারী হবেন, আর তিনি খুবই ত্বরিত হিসাব গ্রহণকারী।

٦٣- قُلْ مَنْ يُّنَجِّيْكُمْ مِّنْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ تَدْعُوْنَهٗ تَضَرُّعًا وَّ خُفْيَةً لَئِنْ اَنْجٰنَا مِنْ هٰذِهٖ لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ ○

৬৩। (হে মুহাম্মাদ সঃ)! তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর, স্থলভাগ ও জল ভাগের অন্ধকার (বিপদ) থেকে তোমাদেরকে কে পরিত্রাণ দিয়ে থাকে, যখন কাতর কণ্ঠে ও বিনীতভাবে এবং চুপে চুপে তাঁর কাছে প্রার্থনা করে থাক, আর বলতে থাক– তিনি যদি আমাদেরকে এই বিপদ থেকে মুক্তি দেন তবে আমরা অবশ্যই কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত থাকবো।

٦٤- قُلِ اللّٰهُ يُنَجِّيْكُمْ مِّنْهَا وَ مِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ اَنْتُمْ تُشْرِكُوْنَ ○

৬৪। (হে নবী সঃ)! তুমি বলে দাও–আল্লাহই তোমাদেরকে ঐ বিপদ এবং অন্যান্য প্রতিটি বিপদ আপদ থেকে রক্ষা করে থাকেন, কিন্তু এর পরও তোমরা শির্ক করতে থাক।

٦٥- قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلٰۤى اَنْ يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ اَوْ مِنْ تَحْتِ اَرْجُلِكُمْ اَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَّ يُذِيْقَ بَعْضَكُمْ بَاْسَ بَعْضٍ اُنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُوْنَ ○

৬৫। (হে রাসূল সঃ)! তুমি বলে দাও –আল্লাহ তোমাদের ঊর্ধ্বলোক হতে এবং তোমাদের পায়ের তলদেশ হতে শাস্তি প্রেরণ করতে যথেষ্ট ক্ষমতাবান, অথবা তোমাদেরকে দলে দলে বিচ্ছিন্ন করে এক দলের দ্বারা অপর দলের শক্তি স্বাদ গ্রহণ করাবেন; লক্ষ্য কর, আমি বারে বারে বিভিন্ন উপায়ে আমার নিদর্শন ও যুক্তিপ্রমাণ বর্ণনা করেছি। উদ্দেশ্য হলো, যেন বিষয়টিকে তারা পূর্ণরূপে জ্ঞানায়ত্ব ও হৃদয়ঙ্গম করে নিতে পারে।

মহান আল্লাহ স্বীয় বান্দাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন- যখন বান্দা স্থলভাগ ও জলভাগের অন্ধকারের মধ্যে অর্থাৎ কঠিন বিপদ-আপদের মধ্যে পতিত হয় তখন আমি তাদেরকে কি প্রকারে মুক্তি দিয়ে থাকি। যখন বান্দা সমুদ্রের ঘূর্ণির মধ্যে পড়ে গিয়েছিল এবং সেখানে বিচ্ছিন্ন বায়ু প্রবাহিত হচ্ছিল তখন তারা প্রার্থনার জন্যে এক আল্লাহকেই নির্দিষ্ট করে নিয়েছিল। যেমন এক জায়গায় বলেনঃ

وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِى الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ

অর্থাৎ "যখন সমুদ্রে তোমাদের উপর কোন বিপদ পৌঁছে তখন সমস্ত অংশীদারকে ভুলে গিয়ে একমাত্র আল্লাহকেই ডেকে থাক।" (১৭ঃ ৬৭) আল্লাহ পাক এক স্থানে বলেনঃ "তিনি সেই আল্লাহ যিনি জলে ও স্থলে তোমাদেরকে ভ্রমণ করিয়ে থাকেন। যখন জাহাজ উত্তম ও অনুকূল বাতাসে চলতে থাকে তখন তোমরা খুবই খুশী হও। আর যখন বিচ্ছিন্ন ও প্রতিকূল বাতাস প্রবাহিত হয় এবং সব দিক থেকে ঢেউ এসে পড়ে আর তোমাদের মনে এই বিশ্বাস জন্মে যে, মৃত্যু তোমাদেরকে ঘিরে ফেলেছে, তখন তোমরা অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে আল্লাহকেই ডাকতে থাক এবং বল-হে আল্লাহ! যদি আপনি আমাদেরকে এই বিপদ থেকে মুক্তি দান করেন তবে অবশ্যই আমরা কৃতজ্ঞ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবো।"

ইরশাদ হচ্ছে- চিন্তা কর তো, জল ও স্থলের অন্ধকারের মধ্যে তোমাদেরকে সোজা পথে কে পরিচালিত করে? আর স্বীয় অনুগ্রহে নির্মল বাতাস কে প্রবাহিত করে? আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ আছে কি যাদেরকে তোমরা শরীক বানিয়ে নিয়েছো?

মহান আল্লাহ বলেনঃ স্থলভাগের ও জলভাগের অন্ধকার থেকে কে তোমাদেরকে মুক্তি দিয়ে থাকেন? যাঁকে তোমরা প্রকাশ্যে ও গোপনে ডেকে ডেকে বল- যদি আপনি আমাদেরকে বিপদ থেকে মুক্তি দান করেন তবে আমরা আপনার কৃতজ্ঞ বান্দা হয়ে যাবো। হে রাসূল (সাঃ)! তুমি তাদেরকে বলে দাও- আল্লাহই তোমাদেরকে এই সমুদয় বিপদ-আপদ থেকে মুক্তি দান করে থাকেন। অথচ তোমরা খুশী মনে প্রতিমাগুলোকে তাঁর শরীক বানিয়ে নিচ্ছ! আল্লাহ তোমাদের উপর শাস্তি অবতীর্ণ করতে পূর্ণ ক্ষমতাবান। যেমন সূরায়ে 'সুবহানে' রয়েছে, তোমাদের প্রতিপালকই জাহাজসমূহ সমুদ্রে চালিয়ে থাকেন যেন তোমরা সম্পদ উপার্জন করতে পার। তিনি তোমাদের প্রতি দাতা ও দয়ালু। যখন

তোমাদের উপর কোন বিপদ এসে পড়ে তখন তোমরা তোমাদের সমুদয় মূর্তিকে ভুলে গিয়ে আল্লাহকেই স্মরণ করে থাকো। আর যখন তিনি তোমাদেরকে সমুদ্রের বিপদ থেকে বাঁচিয়ে স্থলভাগে আনয়ন করেন তখন তোমরা আল্লাহকে এড়িয়ে চল, মানুষ খুবই অকৃতজ্ঞ। তোমরা কি মনে করেছো যে, স্থলভাগে এসেই রক্ষা পেয়ে গেছো? তিনি ইচ্ছে করলে তোমাদেরকে পানিতে ডুবিয়ে দেয়ার মত যমীনেও ঢুকিয়ে দিতে পারেন কিংবা আকাশ থেকে তোমাদের উপর পাথর বর্ষণ করতে পারেন, অতঃপর তোমাদের কোন সাহায্যকারী থাকবে না। পুনরায় তিনি তোমাদেরকে সমুদ্রে ভ্রমণ করিয়ে প্রতিকূল বায়ু প্রবাহিত করতঃ পানিতে ডুবিয়ে দিতে সক্ষম বা তোমাদের পায়ের নীচে থেকেই তোমাদের প্রতি শাস্তি প্রেরণে পূর্ণ ক্ষমতাবান। হাসান বলেন যে, এর দ্বারা মুশরিকদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। আল্লাহ পাক ক্ষমা করুন। আমরা তারই উপর ভরসা করি। এখানে আমরা উপরোক্ত আয়াতের সাথে সম্পর্কযুক্ত কতগুলো হাদীস বর্ণনা করবোঃ

ইমাম বুখারী (রাঃ) বলেন যে, يَلْبِسَكُمْ -এর অর্থ হচ্ছে- তোমরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে গিয়ে পরস্পর ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত হয়ে পড়। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছে করলে তোমাদেরকে এই ধরনের শাস্তিতে জড়িত করতে পারেন। হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, যখন عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ -এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয় তখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেনঃ اَعُوْذُ بِوَجْهِكَ অর্থাৎ 'আমি আপনার সন্তুষ্টির মাধ্যমে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।' আর تَحْتِ اَرْجُلِكُمْ -এর সময়ও বলেনঃ اَعُوْذُ بِوَجْهِكَ অর্থাৎ 'আমি আপনারই কাছে আশ্রয় চাচ্ছি।' আবার যখন তিনি اَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا শুনেন তখন বলেনঃ هٰذِهٖ اَهْوَنُ اَوْ اَيْسَرُ অর্থাৎ তুলনামূলকভাবে এটা অনেকটা সহজ।' হযরত জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, যখন قُلْ هُوَ الْقَادِرُ -এই আয়াত অবতীর্ণ হয় তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ ذٰلِكَ অর্থাৎ 'এর থেকে আমি আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাচ্ছি।' অতঃপর مِنْ تَحْتِ اَرْجُلِكُمْ -এটুকু শুনে বলেন ঃ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ অর্থাৎ 'আমি আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাচ্ছি।' তারপর يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا -এটুকু শুনে বলেনঃ 'এটা সহজতর বটে।' তিনি ওটা থেকে আশ্রয় চাইলেও চাইতে পারতেন। হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) হতেও বর্ণিত আছে যে, এই আয়াত শুনে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন ঃ 'এটা অবশ্যই হবে, এখন পর্যন্ত হয়নি।'

হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ 'আমরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে চলছিলাম। শেষ পর্যন্ত আমরা বানী মু'আবিয়া (রাঃ)-এর মসজিদে আগমন করি। তিনি মসজিদে প্রবেশ করে দু'রাকআত নামায পড়েন। অতঃপর দীর্ঘক্ষণ ধরে তিনি মহা মহিমান্বিত আল্লাহর দরবারে মুনাজাত করতে থাকেন। তারপর তিনি বলেনঃ "আমি আমার প্রতিপালকের কাছে তিনটি জিনিসের আবেদন জানিয়েছিলাম– (১) আমার উম্মত যেন পানিতে ডুবে যাওয়ার মাধ্যমে ধ্বংস হয়ে না যায়। তিনি তা কবূল করেছেন। (২) আমার উম্মত যেন سَنَةٌ বা দুর্ভিক্ষে ধ্বংস হয়ে না যায়। তিনি ওটাও কবূল করেছেন। (৩) তাদের পরস্পরের মধ্যে যেন যুদ্ধ-বিগ্রহের সৃষ্টি না হয়। তিনি ওটা না মঞ্জুর করেন।"[১]

ইমাম আহমাদ (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্দিল্লাহ ইবনে জাবির ইবনে উতাইক (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেনঃ বানু মু'আবিয়া পল্লীতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) আমাদের নিকট আগমন করেন, ওটা হচ্ছে আনসারদের একটা গ্রাম। এসে তিনি বলেন– 'তোমাদের এই মসজিদে রাসূলুল্লাহ (সঃ) কোথায় নামায পড়েছিলেন তা তুমি জান কি?' আমি বললাম, হ্যাঁ, এবং একটি কোণের দিকে ইশারা করলাম। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেনঃ 'তিনি তিনটি কি কি জিনিসের জন্যে প্রার্থনা করেছিলেন তা কি তুমি জান?' আমি উত্তরে বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেনঃ 'ঐগুলোর সংবাদ আমাকে দাও।' আমি তখন বললাম, তিনি প্রার্থনা করেছিলেন যে, তাঁর উম্মতের উপর যেন কোন শত্রু জয়যুক্ত না হয় এবং তারা যেন দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে ধ্বংস হয়ে না যায়। ঐ দু'টি মঞ্জুর করে নেয়া হয়। আর তিনি এই প্রার্থনাও করেন যে, তারা যেন পরস্পরে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে না পড়ে। এটা গৃহীত হয়নি। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) তখন বলেনঃ 'তুমি ঠিকই বলেছো। কিয়ামত পর্যন্ত মুসলমানদের পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ হতেই থাকবে।'[২]

ইমাম আহমাদ (রঃ) হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেনঃ 'সফরে একদা আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে দেখেছি যে, তিনি চাশতের আট রাকআত নামায পড়লেন। অতঃপর নামায শেষ করে তিনি

১. এই হাদীসটি ইমাম মুসলিম (রঃ) কিতাবুল ফিতানের মধ্যে তাখরীজ করেছেন। سَنَةٌ শব্দের অর্থ হচ্ছে দুর্ভিক্ষ।

২. ইবনে কাসীর (রঃ) বলেন যে, এই হাদীসটির ইসনাদ খুবই উত্তম ও মযবুত বটে, কিন্তু ছ'টি বিশুদ্ধ হাদীস গ্রন্থের মধ্যে এটি বর্ণিত হয়নি।

বললেনঃ আমি 'রগবত' ও 'রহবতের' (আগ্রহ ও ভীতির) নামায পড়লাম। আমার প্রভুর কাছে আমি তিনটি জিনিসের জন্যে প্রার্থনা করলাম। তিনি দু'টি কবূল করলেন কিন্তু একটি কবূল করলেন না। আমি প্রার্থনা করলাম যে, আমার উম্মত যেন দুর্ভিক্ষের কবলে না পড়ে। এটা তিনি মঞ্জুর করলেন। আমি আবেদন জানালাম যে, আমার উম্মতের উপর যেন তাদের শত্রুরা জয়যুক্ত হতে না পারে। এটাও তিনি কবূল করলেন। আমি দরখাস্ত করলাম যে, আমার উম্মত যেন দলে দলে বিভক্ত হয়ে না পড়ে। এটা তিনি মঞ্জুর করলেন না।

হযরত মুআয্ ইবনে জাবাল (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে গেলাম। বলা হলো যে, তিনি এখনই বেরিয়ে গেলেন। যেখানেই যাই সেখানেই বলা হয় যে, তিনি এখনই চলে গেলেন। অবশেষে আমি তাঁকে এক জায়গায় নামাযের অবস্থায় দেখতে পেলাম। আমি তাঁর সাথে নামাযে দাঁড়িয়ে গেলাম। তিনি দীর্ঘক্ষণ ধরে নামায পড়লেন। নামাযের পরে আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আপনি এতো দীর্ঘক্ষণ ধরে নামায পড়লেন কেন? তিনি উত্তরে বললেন ঃ 'আমি ভয় ও আগ্রহের নামায পড়ছিলাম।' অতঃপর তিনি উপরোক্ত তিনটি প্রার্থনার বর্ণনা দেন।

ইমাম আহমাদ (রঃ) বানী যাহ্‌রার গোলাম খাব্বাব ইবনে আরত (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন, তিনি বলেনঃ একদা আমি সারা রাত ধরে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে নামায পড়ছিলাম। তিনি নামাযের সালাম ফিরালে আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আপনি আজ এতো দীর্ঘ সময় ধরে নামায পড়লেন যে, এর পূর্বে কোন দিন আমি আপনাকে এত লম্বা সময় ধরে নামায পড়তে দেখিনি (এর কারণ কি?)! তিনি বললেনঃ হ্যাঁ, এটা ছিল রগবত ও ভীতির নামায। এই নামাযে আমি আমার মহা মহিমান্বিত প্রভুর নিকট তিনটি জিনিসের জন্যে প্রার্থনা করেছিলাম। দু'টি তিনি মঞ্জুর করেছেন এবং একটি মঞ্জুর করেননি। আমার মহান প্রভুর কাছে প্রার্থনা করলাম যে, আমাদের পূর্ববর্তী উম্মতদেরকে যে জিনিসে ধ্বংস করে দিয়েছিল তা যেন আমাদেরকে ধ্বংস না করে। এটা তিনি কবূল করেছেন। আমার সম্মানিত প্রভুর নিকট আমি আবেদন জানালাম যে, আমাদের উপর আমাদের শত্রুরা যেন জয়যুক্ত হতে না পারে। এটাও গৃহীত হয়েছে। আমার মহা মর্যাদাবান প্রতিপালকের কাছে আমি দরখাস্ত

করলাম যে, আমরা যেন বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে না পড়ি। এটা তিনি কবূল করলেন না।[১] আবূ মালিক (রঃ) বলেনঃ 'আমি বর্ণনাকারী নাফে' ইবনে খালিদকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি এই হাদীসটি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর মুখে শুনেছেন? তিনি উত্তরে বললেনঃ 'হ্যাঁ, আমি ঐ লোকদের মুখে শুনেছি যাঁরা স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর মুখে শুনেছিলেন।

হযরত শাদ্দাদ ইবনে আউস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ আমার জন্যে যমীনকে নিকটবর্তী করে দিয়েছেন, এমন কি আমি ওর মাশ্‌রিক ও মাগরিবকে দেখতে পাই এবং আমার উম্মত এই সবের মালিক হয়ে যাবে। আমাকে দু'টি ধন-ভাণ্ডার দেয়া হয়েছে। একটি সাদা ও অপরটি লাল।[২] আমি আমার মহা মহিমান্বিত প্রভুর নিকট প্রার্থনা করেছিলাম যে, আমার উম্মত যেন সাধারণ দুর্ভিক্ষের কবলে পতিত না হয়। আরও প্রার্থনা জানিয়েছিলাম যে, তাদের উপর শত্রুরা যেন এমনভাবে জয়যুক্ত না হয় যার ফলে তারা সাধারণভাবে ধ্বংস হয়ে যায়। আমার প্রার্থনা এটাও ছিল যে, আমার উম্মত যেন দলে দলে বিভক্ত না হয়। তখন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "হে মুহাম্মাদ (সঃ)! আমি যে ভাগ্য নির্ধারণ করে দিয়েছি তা রদ হবে না। আমি তোমার এই প্রার্থনা মঞ্জুর করলাম যে, তোমার উম্মত সাধারণ দুর্ভিক্ষের কবলে পড়বে না। আর আমি তোমার এই প্রার্থনাও কবূল করলাম যে, তোমার উম্মতের উপর তাদের শত্রুরা এমনভাবে জয়যুক্ত হবে না যে, তাদেরকে ধ্বংস করবে, হত্যা করবে এবং বন্দী করবে।" রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "আমি শুধুমাত্র আমার উম্মতের পথভ্রষ্ট ইমাম ও নেতৃবর্গকে ভয় করি। যদি একবার আমার উম্মতের উপর তরবারী চড়ে যায় তবে তা আর নামবার নয়। বরং কিয়ামত পর্যন্ত তাদের পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ চলতে থাকবে।"[৩]

তিবরানী (রঃ) হযরত জাবির ইবনে সুমরাতুস সুওয়ারী (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, আমি আমার প্রতিপালকের নিকট তিনটি জিনিসের জন্যে আবেদন জানিয়েছিলাম। তিনি দু'টি মঞ্জুর করেছেন এবং একটি না মঞ্জুর করেছেন। আমি প্রার্থনা করেছিলাম, হে আমার প্রভু! আমার উম্মতকে আপনি ক্ষুধায় ধ্বংস করবেন না। তিনি বললেনঃ "এটা তোমার জন্যে কবূল করা

---

১. এই হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ), ইমাম নাসাঈ (রঃ), ইবনে হিব্বান (রঃ) এবং ইমাম তিরমিযী (রঃ) বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম তিরমিযী (রঃ) এটাকে হাসান ও সহীহ বলেছেন।

২. সাদা ও লাল ধন-ভাণ্ডার দ্বারা স্বর্ণ ও রৌপ্য বুঝানো হয়েছে।

৩. ইবনে কাসীর (রঃ) বলেন যে, এই হাদীসটি ছ'টি বিশুদ্ধ হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত হয়নি। তবে এর ইসনাদ খুবই উত্তম ও মযবুত।

হলো।” আমি বললাম, হে আমার প্রভু! আপনি তাদের উপর তাদের ছাড়া অন্যদেরকে অর্থাৎ মুশরিকদেরকে এমনভাবে জয়যুক্ত করবেন না যে, তারা তাদেরকে ধ্বংস করে দেবে। তিনি বললেনঃ “এটাও তোমার জন্যে মঞ্জুর করলাম।” আমি প্রার্থনায় বললাম, হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমার উম্মতের পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ সৃষ্টি করবেন না। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন আমার প্রভু এটা মঞ্জুর করলেন না।

হযরত নাফে' ইবনে খালিদ খুযায়ী (রঃ) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, যিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর সাহাবীদের মধ্যে একজন এবং বৃক্ষের নীচে অনুষ্ঠিত বায়আতুর রিযওয়ানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সঃ) নামায পড়েন। জনগণ তাঁকে ঘিরে রয়েছিলেন। তিনি হালকাভাবে নামায আদায় করেন, তবে রুকূ' ও সিজদা পূর্ণভাবেই করেন। কিন্তু তাঁর নামাযের বৈঠক খুবই দীর্ঘ হয়। এমন কি আমরা একে অপরকে ইঙ্গিতে বলি যে, সম্ভবতঃ তাঁর উপর অহী অবতীর্ণ হচ্ছে। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ “না, রগবত ও ভীতির নামায পড়ছিলাম।” এই পূর্ণ হাদীসটি শোনার পর নাফে' ইবনে খালিদ খুযায়ীকে বলি, আপনার পিতা কি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর মুখ থেকে শুনেছেন? তিনি উত্তরে বলেনঃ “হ্যাঁ, আমার পিতা বলেছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর মুখে তাঁর দশটি অঙ্গুলির মত দশবার শুনেছেন।”

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, আমি আমার মহা মহিমান্বিত প্রভুর নিকট প্রার্থনা করেছি যে, তিনি যেন তাদেরকে চারটি জিনিস থেকে দূরে রাখেন। তখন আল্লাহ তাদেরকে দু'টি জিনিস থেকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। আমি আল্লাহ তা'আলার কাছে প্রার্থনা করেছিলাম যে, তিনি যেন আমার উম্মতের উপর আকাশ থেকে পাথর বর্ষণ না করেন, তারা যেন ফিরাউন ও তার লোকজনদের মত ডুবে না মরে, তারা যেন দলে দলে বিভক্ত হয়ে না পড়ে এবং তারা যেন পরস্পরে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে না পড়ে। মহান আল্লাহ তখন পাথর বর্ষণ না করা এবং ডুবে না মরার প্রার্থনা কবূল করেছেন বটে, কিন্তু তারা দলে দলে বিভক্ত না হওয়া এবং তাদের পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ সংঘটিত না হওয়া এই প্রার্থনা দু'টি তিনি কবূল করেননি।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, যখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয়ঃ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ তখন নবী (সঃ) উঠে অযু করেন এবং দু'আ করতে থাকেনঃ “হে আল্লাহ! উপর ও নীচ হতে আমার উম্মতের উপর শাস্তি অবতীর্ণ করবেন না এবং তাদের মধ্যে যেন দলাদলি সৃষ্টি না হয়, তারা যেন পরস্পরে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে না পড়ে।” তখন হযরত জিবরাঈল (আঃ) এসে বলেন, “হে মুহাম্মাদ (সঃ)! আল্লাহ

তা'আলা আপনার উম্মতকে আকাশ থেকে শাস্তি অবতীর্ণ হওয়া থেকে এবং পায়ের নীচ হতে আযাব নাযিল হওয়া থেকে রক্ষা করেছেন।” এর পরে এই শ্রেণীরও এই বিষয়ের আরও কয়েকটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে, যেগুলোর পুনরাবৃত্তি তরজমা ও তাফসীর পাঠকদের জন্যে নিষ্প্রয়োজন।

আসমানী আযাব দ্বারা পাথর বর্ষণ এবং পায়ের নীচের শাস্তি দ্বারা যমীন ধ্বসে যাওয়া বুঝানো হয়েছে। উল্লিখিত চারটি জিনিসের মধ্যে দু'টি নবী (সঃ)-এর ইন্তেকালের পঁচিশ বছর পর থেকেই প্রকাশ পেতে থাকে। অর্থাৎ মুসলমানদের মধ্যে মতভেদ ও দলাদলি সৃষ্টি এবং তাদের দু'দলের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ শুরু। আর আকাশ থেকে পাথর বর্ষণ ও যমীন ধ্বসে যাওয়া থেকে উম্মতে মুহাম্মদিয়াকে মাহফূয ও নিরাপদ রাখা হয়েছে। মুজাহিদ (রঃ), সাঈদ ইবনে জুবাইর (রঃ), সুদ্দী (রঃ), ইবনে যায়েদ (রঃ) এবং ইবনে জারীর (রঃ) ভাবার্থ এটাই গ্রহণ করেছেন।

এই আয়াতের ব্যাপারে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) মসজিদে অথবা মিম্বরের উপরে অবস্থানরত অবস্থায় চীৎকার করে বলেছিলেন, “হে লোক সকল! তোমাদের উপর আল্লাহর আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। যদি আকাশ থেকে শাস্তি এসে যায় তবে কারও রক্ষা নেই। আর যদি পায়ের নীচ থেকে আযাব এসে পড়ে তবে তোমাদেরকে নিয়ে যমীন ধ্বসে যাবে এবং তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে। যদি তোমরা দলে দলে বিভক্ত হয়ে পড় এবং পরস্পর যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হয়ে যাও তবে এটা সবচেয়ে জঘন্য ব্যাপার হবে।” হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলতেন যে, উপরোক্ত আয়াতের عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ দ্বারা দুষ্ট নেতাদেরকে বুঝানো হয়েছে এবং تَحْتِ اَرْجُلِكُمْ দ্বারা বুঝানো হয়েছে দুষ্ট খাদেম এবং খারাপ অনুসারীদেরকে। অথবা এর দ্বারা আমীর ও গরীবদেরকে বুঝানো হয়েছে। ইবনে জারীর (রঃ) বলেন যে, এই উক্তিটি যুক্তিপূর্ণ হলেও প্রথম উক্তিটিই বেশী স্পষ্ট ও মযবুত। তিনি বলেন যে, এর সঠিকতার সাক্ষ্য স্বয়ং মহান আল্লাহর নিম্নের উক্তিটি বহন করছেঃ

ءَاَمِنْتُمْ مَّنْ فِى السَّمَاءِ اَنْ يَّخْسِفَ بِكُمُ الْاَرْضَ فَاِذَا هِىَ تَمُوْرُ ـ اَمْ اَمِنْتُمْ مَّنْ فِى السَّمَاءِ اَنْ يُّرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُوْنَ كَيْفَ نَذِيْرُ ـ

অর্থাৎ “তোমরা কি এর থেকে নিরাপদ হয়ে গেছ যে, আল্লাহ যমীনকে ধ্বসিয়ে দিয়ে তোমাদেরকে ওর ভিতরে ঢুকিয়ে দিবেন এবং ওটা গরম হয়ে গিয়ে

টগবগ করে ফুটতে থাকবে? অথবা তোমরা কি এর থেকে নিরাপত্তা লাভ করেছ যে, তিনি তোমাদের উপর পূর্ববর্তী কওমের মত আকাশ থেকে পাথর বর্ষণ করবেন? সত্বরই তোমরা জানতে পারবে যে, আমার ভীতি প্রদর্শন কিরূপ সঠিক ছিল।" (৬৭ঃ ১৬-১৭)

হাদীসে রয়েছে যে, আকাশ থেকে পাথর বর্ষিত হওয়া, যমীন ধ্বসে পড়া, আকৃতি পরিবর্তিত হওয়া, এইগুলো এই উম্মতের মধ্যে সংঘটিত হবে এবং এইগুলো হচ্ছে কিয়ামতের নিদর্শনাবলীর অন্তর্ভুক্ত। কিয়ামতের পূর্বে এই নিদর্শনগুলো প্রকাশিত হবে এবং ইনশাআল্লাহ এইগুলোর বর্ণনা ওর স্থানে দেয়া হবে। يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا দ্বারা বিভিন্ন ফিরকা বুঝানো হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ আমার উম্মত তেহাত্তর ফিরকায় বিভক্ত হয়ে যাবে। এক ফিরকা ছাড়া বাকী সবগুলোই জাহান্নামী হবে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, শাস্তি ও হত্যার মাধ্যমে এক দলকে অন্য দলের উপর বিজয়ী করে দেয়া হবে।

انظر كَيْفَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُوْنَ। অর্থাৎ লক্ষ্য কর? আমি বারে বারে বিভিন্ন উপায়ে আমার নিদর্শন ও যুক্তি প্রমাণ বর্ণনা করছি, উদ্দেশ্য এই যে, যেন বিষয়টিকে তারা পূর্ণরূপে জ্ঞানায়ত্ব ও হৃদয়ঙ্গম করে নিতে পারে। হযরত যায়েদ ইবনে আসলাম (রাঃ) বলেন যে, যখন هُوَ الْقَادِرُ.... -এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয় তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "আমার পরে তোমরা কাফির হয়ে যেয়ো না যে, তরবারী দ্বারা একে অপরের গর্দান উড়িয়ে দেবে।" তখন জনগণ বলেন, আমরা তো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই এবং আপনি আল্লাহর রাসূল (এর পরেও কি আমরা এরূপ কাজ করবো?) রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "হ্যাঁ।" তখন তাঁদের কেউ একজন বলেন, আমরা যখন মুসলমান তখন এটা হতে পারে না যে, আমাদের একে অপরকে হত্যা করবে। সেই সময় এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। ইরশাদ হচ্ছে- وَكَذَّبَ بِهٖ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ.... হে নবী (সঃ)! তোমার সম্প্রদায় একে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে অথচ এটা প্রমাণিত সত্য, তুমি বলে দাও- আমি তোমাদের উকিল হয়ে আসিনি। মহান আল্লাহ বলেনঃ

لِكُلِّ نَبَاٍ مُّسْتَقَرٌّ وَّسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ -

অর্থাৎ প্রত্যেকটি সংবাদ প্রকাশের একটি নির্দিষ্ট সময় রয়েছে। অতি শীঘ্রই তোমরা নিজেদের পরিণতি সম্পর্কে অবহিত হতে পারবে।[১]

১. এটা ইবনে আবি হাতিম (রঃ) ও ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

৬৬। (হে মুহাম্মাদ সঃ)! তোমার সম্প্রদায়ের লোকেরা ওকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে, অথচ ওটা প্রমাণিত সত্য, তুমি বলে দাও– আমি তোমাদের উকিল হয়ে আসিনি।

٦٦- وَكَذَّبَ بِهٖ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَّسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيْلٍ ○

৬৭। প্রত্যেকটি সংবাদ প্রকাশের একটি নির্দিষ্ট সময় রয়েছে, অতি শীঘ্রই তোমরা নিজেদের পরিণতি সম্পর্কে অবহিত হতে পারবে।

٦٧- لِكُلِّ نَبَاٍ مُّسْتَقَرٌّ وَّسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ○

৬৮। যখন তুমি দেখবে যে লোকেরা আমার আয়াতসমূহে দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধান করছে তখন তুমি তাদের নিকট হতে দূরে সরে যাবে, যতক্ষণ না তারা অন্য কোন প্রসঙ্গে নিমগ্ন হয়; শয়তান যদি তোমাকে এটা বিস্মৃত করে দেয় তবে স্মরণ হওয়ার পর আর এই যালিম লোকদের সাথে তুমি বসবে না।

٦٨- وَاِذَا رَاَيْتَ الَّذِيْنَ يَخُوْضُوْنَ فِيْٓ اٰيٰتِنَا فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتّٰى يَخُوْضُوْا فِيْ حَدِيْثٍ غَيْرِهٖ وَاِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطٰنُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرٰى مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ○

৬৯। যালিম লোকদের হিসাব নিকাশের দায়-দায়িত্ব মুত্তাকী লোকদের উপর কিছুমাত্র অর্পিত নয়, তবে তাদের উপর ওদেরকে উপদেশ প্রদানের দায়িত্ব রয়েছে, হয়তো বা উপদেশের ফলে ওরা পাপাচার হতে বেঁচে থাকতে পারবে।

٦٩- وَمَا عَلَى الَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ وَّلٰكِنْ ذِكْرٰى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ○

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল (সঃ)-কে সম্বোধন করে বলছেন, তোমার কওম অর্থাৎ কুরায়েশরা তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে, অথচ এটা ছাড়া সত্য আর কিছুই নেই।

তুমি তাদেরকে বল–আমি তোমাদের রক্ষক ও জিম্মাদার নই। যেমন মহান আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেনঃ

"(হে মুহাম্মাদ সঃ)! তুমি বল–এটা তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে সত্য, সুতরাং যার ইচ্ছা হবে সে ঈমান আনবে এবং যে ইচ্ছা করবে সে অমান্য করবে।" অর্থাৎ আমার দায়িত্ব তো হচ্ছে শুধু প্রচার করে দেয়া, আর তোমাদের কাজ হচ্ছে শ্রবণ করা ও মেনে নেয়া। যে আমার কথা মান্য করবে সে দুনিয়া ও আখিরাতে উজ্জ্বল চেহারা বিশিষ্ট হবে এবং যে বিরুদ্ধাচরণ করবে সে উভয় জায়গাতেই হতভাগ্য হবে। এ জন্যেই ইরশাদ হচ্ছে – প্রত্যেক সংবাদের জন্যেই একটি নির্দিষ্ট সময় রয়েছে, যদিও সেটা বিলম্বে হয়। যেমন অন্যত্র আল্লাহ পাক বলেনঃ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَاَهُ بَعْدَ حِيْنٍ অর্থাৎ "অবশ্যই তোমরা ওর সংবাদ কিছুদিন পরে জানতে পারবে।" (৩৮ঃ ৮৮) তিনি আরও বলেনঃ لِكُلِّ اَجَلٍ كِتَابٌ অর্থাৎ "প্রত্যেক মৃত্যুর জন্যেই একটা নির্ধারিত সময় রয়েছে।" (১৩ঃ ৩৮) এটা হচ্ছে ধমক ও ভীতি প্রদর্শন। এ জন্যেই মহান আল্লাহ বলেনঃ "সত্বরই তোমরা জানতে পারবে।"

وَاِذَا رَاَيْتَ الَّذِيْنَ يَخُوْضُوْنَ فِيْ اٰيٰتِنَا فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ –অর্থাৎ হে মুহাম্মাদ (সঃ)! যখন তুমি কাফিরদেরকে দেখবে যে, তারা মিথ্যা প্রতিপন্নতা ও বিদ্রূপের সঙ্গে আমার আয়াতসমূহ সম্পর্কে সমালোচনা করছে, তখন তুমি তাদের নিকট থেকে দূরে সরে যাবে যে পর্যন্ত না তারা অন্য কোন প্রসঙ্গে লিপ্ত হয়। আর যদি শয়তান তোমাকে এটা ভুলিয়ে দেয় তবে স্মরণ হওয়া মাত্রই তুমি এই অত্যাচারীদের সাথে আর বসবে না। ভাবার্থ এই যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর উম্মতের কোন লোকই যেন ঐ সব অবিশ্বাসকারী ও মিথ্যা প্রতিপন্নকারীর সাথে উঠা-বসা না করে যারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে পরিবর্তন করে ফেলে এবং ওগুলোকে সঠিক ও প্রকাশমান ভাবার্থের উপর কায়েম রাখে না। এ জন্যেই হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "আমার উম্মত ভুল বশতঃ বা বাধ্য হয়ে কোন কাজ করে বসলে তা ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে।" [১] কুরআন কারীমের "যখন তোমরা

১. হাদীসটি ইবনে মাজাহ (রঃ) তাখরীজ করেছেন এবং তাঁর হাদীস গ্রন্থের ভাষা হচ্ছে নিম্নরূপঃ اِنَّ اللّٰهَ وَضَعَ عَنْ اُمَّتِىْ الْخَطَاَ অর্থাৎ "নিশ্চয়ই আল্লাহ আমার উম্মতের ভুলত্রুটি ক্ষমা করে দিয়েছেন।"

শুনতে পাও যে, আল্লাহর আয়াতসমূহের সাথে কুফরী করা হচ্ছে এবং ওগুলোকে বিদ্রূপ করা হচ্ছে তখন তোমরা তাদের নিকট থেকে উঠে যাও যে পর্যন্ত না তারা অন্য প্রসঙ্গে নিমগ্ন হয়, নতুবা তোমরা তাদেরই সমতুল্য হয়ে যাবে” -এই আয়াতে ঐ দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

মহান আল্লাহ বলেনঃ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ অর্থাৎ যালিম লোকদের হিসাব নিকাশের দায়-দায়িত্ব মুত্তাকী লোকদের উপর কিছুমাত্র অর্পিত নয়। অর্থাৎ মুত্তাকী লোকেরা যখন ঐ সব কাফির ও যালিমের সাথে উঠাবসা করবে না, বরং তাদের নিকট থেকে উঠে যাবে তখন তারা তাদের দায়িত্ব পালন করলো। ফলে তারা তাদের সাথে পাপে জড়িত হবে না। সাঈদ ইবনে জুবাইর (রাঃ) এর ভাবার্থ বলেনঃ যদি ঐ যালিম ও কাফিররা আল্লাহর আয়াতসমূহকে ক্রটিযুক্ত করার চেষ্টায় লেগে থাকে তবে এখন মুসলমানদের উপর কোন দায়িত্ব অর্পিত হবে না যদি তারা তাদের থেকে দূরে সরে থাকে। কিন্তু অন্যান্য আলেমগণ এর ভাবার্থ বর্ণনায় বলেছেনঃ মুসলমানরা ঐ যালিমদের সাথে উঠাবসা করলেও তাদের বিদ্রূপ করণের যিম্মাদারী তাদের উপর পড়বে না। তাঁদের ধারণায় এই আয়াতটি اَلنِّسَاءُ الْمَدَنِيَّةُ -এর আয়াত দ্বারা মানসূখ হয়ে গেছে। আয়াতটি হচ্ছে اِنَّكُمْ اِذًا مِّثْلُهُمْ অর্থাৎ ঐ অবস্থায় তোমরাও তাদের সমতুল্য হয়ে যাবে। (৪ঃ ১৪০) আয়াতের এই ব্যাখ্যা وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ -এই আয়াতের সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিল। এটা ছিল মুজাহিদ (রঃ), সুদ্দী (রঃ), ইবনে জুরাইজ (রঃ) প্রমুখ মনীষীর উক্তি। তাঁদের এই কথার ভিত্তিতে আল্লাহ পাকের وَلٰكِنْ ذِكْرٰى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ -এই উক্তির ভাবার্থ হবে নিম্নরূপঃ “কিন্তু আমি তোমাদেরকে এরূপ অবস্থায় তাদের থেকে পরান্মুখ থাকার নির্দেশ দিয়েছি, যাতে ওটা তাদের জন্যে শিক্ষা ও উপদেশ হয়, হয়তো তারা এর ফলে সতর্ক হয়ে যাবে এবং ভবিষ্যতে আর এর পুনরাবৃত্তি করবে না।

৭০। যারা নিজেদের দ্বীনকে খেল-তামাশার বস্তুতে পরিণত করেছে তুমি তাদেরকে বর্জন করে চলবে, এই পার্থিব জগত তাদেরকে সম্মোহিত করে ধোঁকায় নিপতিত করেছে,	٧٠- وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَّلَهْوًا وَّغَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهٖٓ اَنْ تُبْسَلَ

نَفْسٌۢ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيٌّ وَّلَا شَفِيْعٌ ۚ وَاِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَا ؕ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اُبْسِلُوْا بِمَا كَسَبُوْا ۚ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيْمٍ وَّعَذَابٌ اَلِيْمٌۢ بِمَا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ ۝ ع

কুরআন দ্বারা তাদেরকে উপদেশ দিতে থাক, যাতে কোন ব্যক্তি স্বীয় কৃতকর্মের জন্য ধ্বংস না হয়, আল্লাহ ছাড়া তার কোন বন্ধু, সাহায্যকারী ও সুপারিশকারী থাকবে না, আর এই অবস্থার সম্মুখীন না হয় যে, দুনিয়াভর বিনিময় বস্তু দিয়েও মুক্তি পেতে চাইলে সেই বিনিময় গ্রহণ করা হবে না, তারা এমনই লোক যে, নিজেদের কর্মদোষে আটকা পড়ে গেছে, তাদের কুফরী করার কারণে তাদের শাস্তির জন্যে ফুটন্ত গরম পানীয় এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে সম্বোধন করে বলেনঃ যারা দ্বীনকে খেল-তামাশার বস্তু বানিয়ে নিয়েছে তুমি তাদেরকে ছেড়ে দাও। কেননা, তারা ভয়াবহ শাস্তির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এ জন্যেই মহান আল্লাহ বলেনঃ তুমি কুরআন কারীমের মাধ্যমে তাদেরকে উপদেশ দিতে থাক, আল্লাহর আযাব থেকে ভয় প্রদর্শন কর, যাতে তাদেরকে তাদের দুষ্কার্যের কারণে ধ্বংস করে দেয়া না হয়। যহ্হাক (রঃ) تُبْسَلُ শব্দকে تُسْلَمُ অর্থে ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ যেন সঁপে দেয়া না হয়। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে– যেন তাকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত না করা হয়। কাতাদা (রঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে– যেন তাকে আটকিয়ে দেয়া না হয়। আর মুররা (রঃ) ও ইবনে যায়েদ (রঃ) এর অর্থ নিয়েছেন 'পাকড়াও করা'। এই সমুদয় উক্তির ভাবার্থ প্রায় একই। মোটকথা এই যে, ধ্বংসের জন্যে ছেড়ে দেয়া, কল্যাণ থেকে বিমুখ করা, উদ্দেশ্য সফল না করা ইত্যাদির প্রায় একই অর্থ। যেমন মহান আল্লাহ এক জায়গায় বলেনঃ كُلُّ نَفْسٍۢ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ اِلَّآ اَصْحٰبَ الْيَمِيْنِ অর্থাৎ "প্রত্যেক ব্যক্তি স্বীয়

কৃতকর্মের জন্যে আটককৃত, শুধু যার ডান হাতে আমল নামা দেয়া হবে সে নয়।” (৭৪ঃ ৩৮)

আল্লাহ পাকের উক্তিঃ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيٌّ وَّ لَا شَفِيْعٌ অর্থাৎ “আল্লাহ ছাড়া তার কোন বন্ধু ও সুপারিশকারী থাকবে না।” যেমন মহান আল্লাহ আর এক জায়গায় বলেনঃ

مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خُلَّةٌ وَّلَا شَفَاعَةٌ وَالْكٰفِرُوْنَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ۔

অর্থাৎ “(মানুষের সাবধান হওয়া উচিত) এমন দিন আসার পূর্বে যেই দিন না ক্রয়-বিক্রয় চলবে, না বন্ধুত্ব থাকবে, না সুপারিশ চলবে, কাফিররা পূর্ণরূপে অত্যাচারী।”

আল্লাহ তা'আলার উক্তিঃ وَاِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَا অর্থাৎ আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশ্যে যদি সে দুনিয়াভর বিনিময় বস্তুও দিতে চায় তথাপি তা গ্রহণ করা হবে না। যেমন তিনি অন্যত্র বলেনঃ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَ مَاتُوْا وَ هُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْ اَحَدِهِمْ مِّلْءُ الْاَرْضِ ذَهَبًا অর্থাৎ “নিশ্চয়ই যারা কাফির হয়ে থাকা অবস্থাতেই মারা গেল, যদি তারা (বিনিময় হিসাবে) দুনিয়াভর সোনাও প্রদান করে তথাপি তা কখনও গ্রহণ করা হবে না।” (৩ঃ ৯১)

এরপর ঘোষিত হচ্ছে– তারা এমনই লোক যে, তারা নিজেদের কর্মদোষে আটকা পড়ে গেছে, তাদের জন্যে রয়েছে ফুটন্ত গরম পানীয় এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

৭১। হে মুহাম্মাদ (সঃ!) তুমি বলে দাও–আমরা কি আল্লাহ ছাড়া এমন বস্তুর ইবাদত করবো, যারা আমাদের কোন উপকার করতে পারবে না এবং আমাদের কোন ক্ষতিও করতে পারবে না? অধিকন্তু আমাদেরকে সুপথ প্রদর্শনের পর আমরা কি উল্টো পদে ফিরে যাবো? আমরা কি ঐ ব্যক্তির ন্যায় হবো যাকে

٧١- قُلْ اَنَدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَ لَا يَضُرُّنَا وَ نُرَدُّ عَلٰٓى اَعْقَابِنَا بَعْدَ اِذْ هَدٰىنَا اللّٰهُ كَالَّذِى اسْتَهْوَتْهُ الشَّيٰطِيْنُ فِى الْاَرْضِ حَيْرَانَ

لَهٗۤ اَصۡحٰبٌ یَّدۡعُوۡنَهٗۤ اِلَی الۡهُدَی ائۡتِنَا ؕ قُلۡ اِنَّ هُدَی اللّٰهِ هُوَ الۡهُدٰی ؕ وَ اُمِرۡنَا لِنُسۡلِمَ لِرَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ ۙ○

শয়তান মরুভূমির মধ্যে বিভ্রান্ত করে ফেলেছে এবং যে দিশাহারা-লক্ষ্যহারা হয়ে ঘুরে মরছে? তার সঙ্গীগণ তাকে হিদায়াতের দিকে ডেকে বলছে—তুমি আমাদের সঙ্গে এসো, তুমি বল—আল্লাহর হিদায়াতই হচ্ছে সত্যিকারের সঠিক হিদায়াত, আর আমাকে সারা জাহানের প্রতিপালকের সামনে মাথা নত করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

৭২- وَ اَنۡ اَقِیۡمُوا الصَّلٰوۃَ وَ اتَّقُوۡهُ ؕ وَ هُوَ الَّذِیۡۤ اِلَیۡهِ تُحۡشَرُوۡنَ ○

৭২। আর তুমি নিয়মিতভাবে নামায কায়েম কর এবং সেই প্রভুকে ভয় করে চল যার নিকট তোমাদের সকলকে সমবেত করা হবে।

৭৩- وَ هُوَ الَّذِیۡ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضَ بِالۡحَقِّ ؕ وَ یَوۡمَ یَقُوۡلُ کُنۡ فَیَکُوۡنُ ۬ؕ قَوۡلُهُ الۡحَقُّ ؕ وَ لَهُ الۡمُلۡکُ یَوۡمَ یُنۡفَخُ فِی الصُّوۡرِ ؕ عٰلِمُ الۡغَیۡبِ وَ الشَّهَادَۃِ ؕ وَ هُوَ الۡحَکِیۡمُ الۡخَبِیۡرُ ○

৭৩। সেই প্রতিপালকই আকাশমণ্ডলকে ও ভূ-মণ্ডলকে যথাযথভাবে সৃষ্টি করেছেন, যেদিন তিনি বলবেন হাশর হও; সেদিন হাশর হয়ে যাবে, তাঁর কথা খুবই যথার্থ বাস্তবানুগ; যেদিন শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে, সেইদিন একমাত্র তাঁরই হবে বাদশাহী ও রাজত্ব, গোপন ও প্রকাশ্য সবকিছু তাঁর জন্যে, তিনি হচ্ছেন প্রজ্ঞাময়, সর্ববিদিত।

মুশরিকরা মুসলমানদেরকে বলেছিল—তোমরা মুহাম্মাদের দ্বীনকে পরিত্যাগ কর। তখন আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত অবতীর্ণ করেন। তিনি বলেনঃ হে মুহাম্মাদ (সঃ)! তুমি মুশরিকদেরকে বলে দাও—আমরা কি আল্লাহকে ছেড়ে ঐ সব মূর্তির পূজা করবো যারা আমাদের কোন উপকারও করতে পারবে না এবং কোন ক্ষতি করারও শক্তি তাদের নেই? কুফরী অবলম্বন করে কি আমরা উল্টো পথে ফিরে যাবো? অথচ আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে আলো দান করেছেন! তাহলে তো শয়তান যাকে পথভ্রষ্ট করেছে আমাদের দৃষ্টান্ত তার মতই হবে। অর্থাৎ ঈমান আনয়নের পর কুফরী অবলম্বন করা এরূপই যেমন একটি লোক সফররত অবস্থায় পথ ভুলে গেল এবং শয়তানরা তাকে পথভ্রষ্ট করলো। আর তার সঙ্গী সরল পথে রইলো এবং তাকে ডেকে বললোঃ আমাদের কাছে এসো। আমরা সরল সোজা পথে রয়েছি। সে কিন্তু যেতে অস্বীকার করলো। এটা ঐ ব্যক্তি যে নবী (সঃ)-কে ভালভাবে জানা সত্ত্বেও পথভ্রষ্টদের অনুসরণ করে কাফের হয়ে যাচ্ছে এবং নবী (সঃ) তাকে সোজা পথে আসার জন্যে ডাক দিচ্ছেন। এই পথ হচ্ছে ইসলামের পথ।

قُلْ اَنَدْعُوْا এতে মূর্তি ও মূর্তিপূজকদের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা হয়েছে এবং ঐ লোকদের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা হয়েছে যারা তাদেরকে আল্লাহর হিদায়াতের দিকে ডাকতে রয়েছে। যেমন কেউ পথ ভুলে গেছে। অতঃপর কোন আহ্বানকারী তাকে ডাক দিয়ে বলছে— হে অমুক! তুমি পথের দিকে এসো। আর তার অন্য সাথী বলছে— তুমি বিভ্রান্ত হয়ো না, আমাদের সোজা পথের দিকে এসো। এখন সে যদি পূর্ববর্তী আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দিয়ে দেয় তবে সে তাকে নিয়ে গিয়ে ধ্বংসের গর্তে ফেলে দেবে। কিন্তু যদি অন্য সঙ্গীর কথা মেনে নেয় তবে সে তাকে সোজা ও হিদায়াতের পথে নিয়ে আসবে। প্রথম আহ্বানকারী হচ্ছে জঙ্গলের শয়তানের অন্তর্ভুক্ত। এটা হচ্ছে ঐ ব্যক্তির দৃষ্টান্ত, যে আল্লাহর নিকট থেকে সরে গিয়ে মূর্তিপূজা করতে শুরু করে দেয় এবং ওর মধ্যেই মঙ্গল নিহিত আছে বলে মনে করে। আর যখন তার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসবে তখন লজ্জিত হতে হবে। এটা হচ্ছে পথভ্রষ্টকারী শয়তান যে তাকে তার বাপ-দাদার নাম নিয়ে এবং তার নাম নিয়ে ডাক দেয়। তখন সে তার অনুসরণ করতে শুরু করে দেয় এবং ওটাকেই কল্যাণকর বলে মনে করে। তখন শয়তান তাকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করে। তাকে সে ক্ষুধা পিপাসায় কাতর করে জংগলে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ায়, যাতে সে ধ্বংস হয়ে যায়।

حيران শব্দ দ্বারা হতবুদ্ধি লোককে বুঝানো হয়েছে। যেমন কোন লোক পথ ভুলে হতবুদ্ধি হয়ে ঘুরে বেড়ায়। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এর দ্বারা ঐ ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে যে ব্যক্তি আল্লাহর হিদায়াত কবূল না করে শয়তানের অনুসরণ ও পাপের কাজ করে থাকে। অথচ তার সাথী তাকে হিদায়াতের দিকে আহ্বান করতে থাকে। মহান আল্লাহ্ বলেন যে, সে শয়তান কর্তৃক পথভ্রষ্ট ব্যক্তি যার ওলী হচ্ছে মানুষ। আল্লাহর হিদায়াতই হচ্ছে প্রকৃত হিদায়াত এবং পথভ্রষ্টতা হচ্ছে ওটাই যার দিকে শয়তান ডেকে থাকে। এটা ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন। অতঃপর তিনি বলেনঃ সে এরই উপযোগী যে, তার সাথী তাকে পথভ্রষ্টতার দিকে আহ্বান করছে। আর সে ধারণা করছে যে ওটাই হচ্ছে সঠিক পথ। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এটা প্রকাশ্য আয়াতের উল্টো। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেনঃ তার সফরের সঙ্গী তাকে হিদায়াতের দিকে আহ্বান করছে। সুতরাং এটা জায়েয নয় যে, ওটাকে পথভ্রষ্টতা বলা হবে, অথচ আল্লাহ্ তো ওটাকে হিদায়াত বলে খবর দিয়েছেন। আর ইবনে জারীর (রঃ) যা বলেছেন রচনাভঙ্গী ওরই দাবীদার। তা এই যে, كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيٰطِيْنُ فِي الْاَرْضِ حَيْرَانَ এটা حَال হওয়ার কারণে نَصَبْ -এর স্থানে রয়েছে। অর্থাৎ কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা, পথভ্রষ্টতা এবং অজ্ঞতা ও মূর্খতার অবস্থায়, আর তার সঙ্গী সাথীরা ঐ পথেই চলছে এবং ঐ পথেই তাদেরকে আসতে বলছে, যেটাকে আল্লাহ্ পাক দৃষ্টান্তস্বরূপ বর্ণনা করেছেন। তখন এই বাক্যের অর্থ হবে–সে তাকে আহ্বানকৃত পথে যেতে অস্বীকার করছে এবং ওর দিকে মনোনিবেশ করছে না। যদি আল্লাহ্ ইচ্ছা করতেন তবে তাকে হিদায়াত করতেন এবং সোজা-সঠিক পথে পরিচালিত করতেন। এই জন্যেই তিনি বলেছেন–আল্লাহর হিদায়াতই হচ্ছে সঠিক হিদায়াত। যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেছেনঃ "যাকে আল্লাহ্ হিদায়াত করেন তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না।" তিনি আর এক জায়গায় বলেছেনঃ

اِنْ تَحْرِصْ عَلٰى هُدٰىهُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِيْ مَنْ يُّضِلُّ وَ مَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ -

অর্থাৎ "হে নবী (সঃ)! তুমি তাদেরকে হিদায়াতের উপর আনবার লোভ করলেও আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তাকে কে হিদায়াতের উপর আনতে পারে? এবং তাদের জন্যে কোন সাহায্যকারী নেই।" (১৬ঃ ৩৭)

ইরশাদ হচ্ছে– وَ اُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ অর্থাৎ আমাদেরকে সারা জাহানের প্রতিপালকের সামনে মাথা নত করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এর ভাবার্থ হচ্ছে–আমাদের প্রতি এই নির্দেশ রয়েছে যে, আমরা যেন আন্তরিকতার সাথে

তাঁর ইবাদত করি, নামায সুপ্রতিষ্ঠিত করি, আল্লাহকে ভয় করি এবং সর্বাবস্থায় তাকওয়া অবলম্বন করি। কিয়ামতের দিন তাঁরই কাছে সকলকে সমবেত করা হবে। তিনিই আকাশ ও যমীনকে ভারসাম্য রক্ষা করে সৃষ্টি করেছেন। তিনিই এ দু'টির মালিক। কিয়ামতের দিন তিনি শুধু كُنْ বা 'হও' বলবেন আর তখনি চোখের পলকে সমস্ত কিছুর অস্তিত্ব পুনরায় এসে যাবে। এখানে يَوْمَ يَقُوْلُ كُنْ فَيَكُوْنُ -এই বাক্যে يَوْمَ শব্দকে হয়তো বা وَاتَّقُوْهُ -এর উপর عَطْف বা সংযোগের কারণে نَصَب দেয়া হয়েছে। সেই সময় বাক্যের রূপ হবে وَ اتَّقُوا يَوْمَ يَقُوْلُ كُنْ فَيَكُوْنُ -এইরূপ। অথবা يَوْمَ শব্দকে এর উপর ভিত্তি করে نَصَب দেয়া হয়েছে যে, ওর সংযোগ হয়েছে خَلَقَ السَّمٰوٰتِ -এর উপর। যেহেতু সৃষ্টির সূচনা ও সৃষ্টির পুনরাবৃত্তির উল্লেখ করা হয়েছে। আর এটাই বেশী যুক্তিসঙ্গতও বটে। কিংবা এখানে فِعْل উহ্য রাখা হয়েছে এর উপর ভিত্তি করেই يَوْمَ শব্দকে نَصَب দেয়া হয়েছে। তখন বাক্যের রূপ হবে وَ اذْكُرْ يَوْمَ يَقُوْلُ كُنْ فَيَكُوْنُ এইরূপ।

ইরশাদ হচ্ছে- قَوْلُهُ الْحَقُّ وَ لَهُ الْمُلْكُ এখানে রয়েছে দু'টি বাক্য। এই উভয় বাক্যের مَحَلّ হচ্ছে جَرّ, এটা এর উপর ভিত্তি করে হয়েছে যে, এ দু'টোই رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ -এর صِفَت বা বিশেষণ হয়েছে। আর আল্লাহ তা'আলার উক্তিঃ يَوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ এটা يَوْمَ يَقُوْلُ كُنْ فَيَكُوْنُ -এর بَدَل হতে পারে। আবার এরও সম্ভাবনা রয়েছে যে, وَ لَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ -এর ওটা ظَرَف হবে। যেমন আল্লাহ পাক বলেনঃ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ অর্থাৎ আজ রাজত্ব কার? আজ প্রবল পরাক্রমশালী একক আল্লাহরই রাজত্ব সত্য।" (৪০ঃ ১৬) যেমন মহান আল্লাহ এক জায়গায় বলেনঃ

اَلْمُلْكُ يَوْمَئِذِنِ الْحَقُّ لِلرَّحْمٰنِ وَ كَانَ يَوْمًا عَلَى الْكٰفِرِيْنَ عَسِيْرًا

অর্থাৎ "সেই দিন পরম দাতা ও দয়ালুর রাজত্ব সত্য এবং ঐ দিন কাফিরদের উপর অত্যন্ত কঠিন হবে।" (২৫ঃ ২৬)

মুফাস্‌সিরগণ يَوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ এই ব্যাপারে মতভেদ করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন যে, صُوَر শব্দটি হচ্ছে صُوْرَةٌ শব্দের বহুবচন। ইবনে জারীর (রঃ) বলেন, যেমন سُوَر বলা হয় প্রাচীর বেষ্টিত শহরকে এবং এটা হচ্ছে سُوْرَةٌ -এর বহুবচন, তদ্রূপ এটাও। সঠিক কথা হচ্ছে এটাই যে, صُوْر -এর অর্থ হচ্ছে সেই শিঙ্গা যার

মধ্যে হযরত ইসরাফীল (আঃ) ফুঁ দেবেন। ইবনে জারীর (রঃ) বলেন যে, সঠিক ওটাই যার উপর হাদীসে রাসূল (সঃ) দ্বারা আলোকপাত করা হয়েছে। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "হযরত ইসরাফীল (আঃ) শিঙ্গা মুখে লাগিয়ে রয়েছেন। তিনি মাথা নীচু করে অপেক্ষমান রয়েছেন যে, কখন শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়ার হুকুম হয়!" একজন গ্রাম্য লোকও রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করেছিলঃ صُوَرٌ কি জিনিস? তখন তিনি উত্তরে বলেছিলেনঃ "এটা হচ্ছে শিঙ্গা, যাতে ফুৎকার দিয়ে বাজানো হয়।"

একদা নবী (সঃ) সাহাবীদের সাথে বসেছিলেন। সেই সময় তিনি বলেনঃ আল্লাহ তা'আলা আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করার পর صُوَرٌ বা শিঙ্গাকে সৃষ্টি করেন এবং তা তিনি হযরত ইসরাফীল (আঃ)-কে প্রদান করেন। ওটাতে তিনি মুখ লাগিয়ে রয়েছেন। তিনি আরশের দিকে তাকিয়ে আছেন। কখন শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়ার হুকুম হয় তার তিনি অপেক্ষায় রয়েছেন। হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) বলেন, আমি তখন জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! صُوَرٌ কি জিনিস? তিনি উত্তরে বললেনঃ "ওটা হচ্ছে শিঙ্গা।" তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেনঃ "ওটা কিরূপ?" তিনি জবাব দিলেন, ওটা খুবই বড়। যে আল্লাহ আমাকে পাঠিয়েছেন তাঁর শপথ! ওর প্রস্থ হচ্ছে আকাশ ও পৃথিবীর প্রস্থের সমান। ওতে তিনবার ফুৎকার দেয়া হবে। প্রথম ফুৎকার হবে ভয় ও সন্ত্রাস সৃষ্টির ফুৎকার। দ্বিতীয় ফুৎকার সবাইকে বেহুঁশ করে ফেলবে এবং তৃতীয় ফুৎকারের সময় সবাই আল্লাহর সামনে এসে হাযির হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা যখন প্রথম ফুৎকারের নির্দেশ দিবেন তখন সারা দুনিয়ার লোক হতবুদ্ধি হয়ে পড়বে, তবে তিনি যাকে স্বাভাবিক অবস্থায় রাখবেন তার অবস্থা ঠিকই থাকবে। দ্বিতীয় ফুৎকারের হুকুম না হওয়া পর্যন্ত প্রথম ফুৎকার চলতেই থাকবে, থামবে না। যেমন আল্লাহ তা'আলা এক জায়গায় বলেনঃ

وَمَا يَنْظُرُ هٰؤُلَاۤءِ اِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً مَّا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ

অর্থাৎ "আর এরা শুধু একটি ভীষণ ধ্বনির প্রতিক্ষায় রয়েছে, যাতে শ্বাস গ্রহণেরও অবকাশ হবে না।" (৩৮ঃ ১৫) ওটা একটা ভীষণ ও উচ্চ শব্দ হবে, যার ফলে পাহাড় মেঘের মত উড়তে থাকবে এবং যমীন হেলতে দুলতে থাকবে। যেমন নড়বড়ে নৌকাকে সমুদ্রের তরঙ্গ চারদিকে হেলাতে দুলাতে থাকে এবং যেমন ছাদে লটকান লণ্ঠনকে বাতাস দোল দিতে থাকে। যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ .... يوم ترجف الرَّاجِفَةُ (৭৯ঃ ৬)অর্থাৎ "যেই দিন কম্পনকারী বস্তু

প্রকম্পিত করবে। যার পর আর এক পশ্চাদগামী বস্তু এসে পড়বে। সেই দিন সবাই ভীষণ আতংকিত হবে। লোকেরা পড়ে যাবে। মায়েরা দুগ্ধপোষ্য শিশুদেরকে ভুলে যাবে। গর্ভবতী স্ত্রীলোকদের গর্ভপাত হয়ে যাবে। ভয়ে ছেলেদের উপর বার্ধ্যক্য এসে পড়বে। শয়তানরা প্রাণ বাঁচানোর উদ্দেশ্যে যমীনের প্রান্তে প্রান্তে পালিয়ে যাবে। কিন্তু ফেরেশতাগণ তাদেরকে মেরে মেরে ফিরিয়ে আনবেন। একে অপরকে ডাকতে থাকবে, কিন্তু আল্লাহ ছাড়া কেউ কাউকেও আশ্রয় দিতে পারবে না। মানুষ এরূপ ভয় ও সন্ত্রাসের মধ্যে থাকবে এমন সময় যমীন প্রত্যেক কোণ থেকে ফাটতে শুরু করবে। সেই সময় এমন ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হবে যা পূর্বে কখনও দেখা যায়নি। এমন ব্যাকুলতা ও সন্ত্রাস দেখা দেবে যা একমাত্র আল্লাহই জানেন। তারপর মানুষ আকাশের দিকে তাকাতে থাকবে। তখন তারা দেখতে পাবে যে, ওর টুকরাগুলো উড়তে রয়েছে। তারকাগুলো নিক্ষিপ্ত হবে। চন্দ্র ও সূর্য কৃষ্ণ বর্ণ ধারণ করবে।" রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন যে, মৃত লোকেরা এর কোন সংবাদই রাখবেন না। হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) বলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আল্লাহ তা'আলা তো বলেছেন– فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ اِلَّا مَنْ شَاءَ اللّٰهُ অর্থাৎ "আল্লাহ যাদেরকে চাইবেন তারা ছাড়া আকাশ ও পৃথিবীতে যারা রয়েছে তারা সবাই হতবুদ্ধি হয়ে পড়বে।" (২৭ঃ ৮৭) তাহলে তিনি সেই দিন কাদেরকে হতবুদ্ধি হওয়া থেকে মুক্ত রাখবেন? রাসূলুল্লাহ (সঃ) উত্তরে বলেনঃ তারা হচ্ছে শহীদ। হতবুদ্ধি এবং ভীত সন্ত্রস্ত তো হয় জীবিত লোকেরা। আর শহীদেরা জীবিত বটে, কিন্তু তারা অবস্থান করছে আল্লাহ তা'আলার নিকট, আল্লাহ তাদেরকে জীবিকা দান করছেন। তিনি সেই দিনের সন্ত্রাস থেকে তাদেরকে রক্ষা করবেন। কেননা, ওটা তো হচ্ছে আল্লাহর আযাব। আর তাঁর আযাব তো বর্ষিত হবে অসৎ লোকদের উপর। এটাকেই আল্লাহ ...... تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ (২২ঃ ২) -এই আয়াতে বর্ণনা করেছেন যে, সেই দিন প্রত্যেক দুগ্ধবতী স্ত্রী লোক তার দুগ্ধপোষ্য শিশুকে ভুলে যাবে এবং প্রত্যেক গর্ভবতীর গর্ভপাত হয়ে যাবে। আল্লাহ যতদিন চাইবেন ততদিন তারা এই আযাবে ডুবে থাকবে। দীর্ঘদিন পর্যন্ত এই অবস্থা থাকবে। তারপর আল্লাহ পাক হযরত ইসরাফীল (আঃ)-কে জ্ঞান লোপকারী ফুৎকার দেয়ার নির্দেশ দিবেন। ফলে সমস্ত আকাশবাসী ও যমীনবাসী অজ্ঞান হয়ে পড়বে। তবে আল্লাহ যাকে চাইবেন তার জ্ঞান ঠিকই থাকবে। মৃত্যুর ফেরেশতা আল্লাহ তা'আলার নিকট এসে বলবেনঃ "হে আল্লাহ! সবাই মরে গেছে।" আল্লাহ তো জানেনই।

তবু তিনি জিজ্ঞেস করবেনঃ "অবশিষ্ট কে আছে?" তিনি বলবেনঃ "অবশিষ্ট একমাত্র আপনি আছেন। আপনার তো কখনও মৃত্যু হবে না। তা ছাড়া আরশ বহনকারী ফেরেশতাগণও বাকী রয়েছেন। আর বাকী রয়েছেন জিবরাঈল এবং মিকাঈলও। বাকী আমিও রয়েছি।" তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেনঃ "জিবরাঈল ও মীকাঈলের তো মৃত্যু হওয়া উচিত।" তখন আরশ বলে উঠবেঃ "হে আমার প্রভু! জিবরাঈল এবং মীকাঈলও মরে যাবেন?" আল্লাহ তা'আলা উত্তরে বলবেনঃ "কথা বলো না। আরশের নীচে যত কিছু আছে সবাইকেই মরতে হবে।" মৃত্যুর ফেরেশ্তা পুনরায় আরয করবেন- "হে প্রভু! জিবরাঈল এবং মীকাঈলও মরে গেছেন।" আল্লাহ জিজ্ঞেস করবেনঃ "এখন আর কে বাকী আছে?" তিনি উত্তরে বলবেনঃ "বাকী আছেন আপনি, আপনার তো মৃত্যু নেই। এখন আমি বাকী আছি এবং বাকী আছেন আরশ বহনকারী ফেরেশতাগণ।" তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেনঃ "আরশ বহনকারীদেরকেও তো মরতে হবে।" তারাও মরে যাবে। আল্লাহ পাক জিজ্ঞেস করবেনঃ "এখন বাকী আছে কে?" আয্রাঈল (মৃত্যুর ফেরেশতা) তখন বলবেনঃ "মৃত্যুবরণ না কারী আপনি বাকী আছেন, আর বাকী আছি আমি।" আল্লাহ তা'আলা তখন ইসরাফীলের নিকট থেকে শিঙ্গা নিয়ে নেয়ার জন্যে আরশকে হুকুম করবেন এবং ইসরাফীল (আঃ)-কে তিনি বলবেনঃ "তুমিও আমার মাখলূক, সুতরাং তুমিও মরে যাও।" তিনি তৎক্ষণাৎ মরে যাবেন এবং একমাত্র আল্লাহই অবশিষ্ট থাকবেন যিনি এক, অমুখাপেক্ষী, তার কোন সন্তান নেই এবং তিনিও কারও সন্তান নন। তারপর আসমান ও যমীনকে জড়িয়ে নেয়া হবে যেমনভাবে 'তূমার'কে জড়িয়ে নেয়া হয়। ও দু'টোকে তিনবার খুলে দেয়া হবে এবং তিনবার জড়িয়ে নেয়া হবে। তারপর মহান আল্লাহ বলবেনঃ "আমি জাব্বার (সর্ব শক্তিমান ও বিজয়ী), আমি জাব্বার, আমি জাব্বার।" এরপর তিনবার তিনি উচ্চস্বরে বলবেনঃ "আজকের দিন রাজত্ব কার?" উত্তর দেবে কে? সুতরাং স্বয়ং তিনিই বলবেনঃ "আজকের দিন আল্লাহরই রাজত্ব যিনি একক ও প্রবল পরাক্রান্ত।"

অতঃপর তিনি দ্বিতীয় যমীন ও আসমান সৃষ্টি করবেন, ও দু'টো ছড়িয়ে দিবেন এবং দীর্ঘ করবেন। ও দু'টোর মধ্যে কোন বক্রতা ও ত্রুটি থাকবে না। তারপর আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে মাখলূকের প্রতি এক ভীষণ শব্দ হবে। তখন নতুনভাবে সৃষ্ট যমীনে সবাই পূর্বের মত হয়ে যাবে। যারা যমীনের মধ্যে ছিল তারা যমীনের মধ্যেই হবে এবং যারা বাইরে ছিল তারা বাইরেই হবে। অতঃপর

আরশের নীচ থেকে আল্লাহ পানি বর্ষণ করবেন। আকাশকে তিনি পানি বর্ষণের নির্দেশ দিবেন। চল্লিশ দিন পর্যন্ত বৃষ্টি বর্ষিত হতে থাকবে। তারপর তিনি দেহগুলোকে নির্দেশ দিবেন যে, ওগুলো যেন যমীন থেকে এমনভাবে প্রকাশিত হয় যেমনভাবে ঘাসপাতা ও শাক-শব্জী অঙ্কুরিত হয়। যখন দেহগুলো পূর্বের ন্যায় পরিপূর্ণ হয়ে যাবে তখন সর্বপ্রথম আরশের ফেরেশ্তাদেরকে জীবিত করা হবে। আল্লাহ ইসরাফীল (আঃ)-কে শিঙ্গা গ্রহণ করতে বলবেন। তিনি তা গ্রহণ করবেন। তারপর মহান আল্লাহ জিবরাঈল (আঃ) ও মীকাঈল (আ)-কে জীবিত করবেন। এরপর আত্মাগুলোকে ডাক দেয়া হবে। মুসলমানদের আত্মা আলোর মত চমকিতে থাকবে। আর কাফিরদের আত্মা অন্ধকারের ন্যায় থাকবে। এই সবকে নিয়ে শিঙ্গার মধ্যে নিক্ষেপ করা হবে। আল্লাহ তা'আলা হযরত ইসরাফীল (আঃ)-কে হুকুম করবেন যে, পুনর্জীবনের জন্যে যেন শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হয়। সুতরাং শিঙ্গায় ফুঁ দেয়া হবে, ফলে রূহগুলো মৌমাছির মত তীব্র বেগে বেরিয়ে আসবে। তাদের দ্বারা যমীন ও আসমান ভরে যাবে। এরপর আল্লাহ তা'আলা রূহগুলোকে দেহের ভিতর প্রবেশ করার নির্দেশ দিবেন। তখন দুনিয়ার সমস্ত রূহ নিজ নিজ দেহের মধ্যে প্রবেশ করতে শুরু করবে এবং দেহগুলোর মধ্যে নাকের ছিদ্রের পথ হয়ে যাবে, যেমন কোন সর্পদষ্ট ব্যক্তির দেহের মধ্যে বিষ অনুপ্রবেশ করে থাকে। তারপর যমীন ফাটতে শুরু করবে এবং মানুষেরা উঠে উঠে নিজেদের প্রতিপালকের দিকে মুখ করবে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, সর্বপ্রথম আমার কবর খুলে যাবে। মহান আল্লাহর দিকে চলে যাব। কাফিররা বলবেঃ 'এদিন তো বড় কঠিন বলে মনে হচ্ছে।' লোকেরা সব উলঙ্গ হয়ে থাকবে। তারা সবাই একই জায়গায় দণ্ডায়মান হবে। সত্তর বছর পর্যন্ত এই অবস্থাই থাকবে। আল্লাহ তা'আলা তাদের দিকে দেখবেনও না এবং কোন ফায়সালাও করবেন না। লোকেরা ক্রন্দন এবং বিলাপ করতে থাকবে। তাদের অশ্রু শেষ হয়ে যাবে। তখন তাদের চক্ষু দিয়ে রক্ত প্রবাহিত হতে থাকবে। নিজেদের শরীরের ঘামে তারা ভিজে যাবে। ঘাম এতো বেশী ঝরবে যে, সেই ঘামের পানিতে তাদের থুতনী পর্যন্ত ডুবে যাবে। লোকেরা পরস্পর বলাবলি করবে যে, আল্লাহর নিকট সুপারিশের জন্যে কাউকে পাঠানো হোক, যেন তিনি কোন মীমাংসা করে দেন। তারা তখন পরস্পর মন্তব্য করবে যে, পিতা আদম (আঃ) ছাড়া কে এমন আছেন যিনি আল্লাহর সামনে কথা বলার সাহস রাখেন? আল্লাহ তা'আলা তাঁকে নিজের হাতে সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর মধ্যে রূহ ফুঁকেছেন। আর সর্বপ্রথম তিনি তাঁর সাথে কথা বলেছেন। অতঃপর তারা হযরত আদম (আঃ)-এর কাছে যাবে এবং

নিজেদের উদ্দেশ্য পেশ করবে। তিনি সুপারিশ করতে অস্বীকৃতি জানাবেন এবং বলবেনঃ "আমি এর যোগ্য নই।" অতঃপর তারা পৃথক পৃথকভাবে এক একজন নবীর কাছে যাবে। যার কাছেই যাবে তিনিই অস্বীকার করবেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, এরপর তারা আমার কাছে আসবে। আমি তখন যাবো এবং 'ফাহস' -এর উপর সিজদায় পড়ে যাবো। হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) জিজ্ঞেস করেন, "হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) 'ফাহস' কি জিনিস?" তিনি উত্তরে বলেন, ওটা হচ্ছে আরশের সামনের অংশ। তখন আল্লাহ তা'আলা একজন ফেরেশতা পাঠাবেন। তিনি আমাকে আমার বাহু ধরে উঠাবেন। মহামহিমান্বিত আল্লাহ আমাকে সম্বোধন করে বলবেনঃ "তুমি কি বলতে চাও?" আমি আরয করবো– হে আমার প্রভু! আপনি আমাকে সুপারিশ করার অধিকার দানের ওয়াদা করেছেন। অতএব এই অধিকার আমাকে দান করুন এবং লোকদের মধ্যে ফায়সালা করুন। আল্লাহ পাক তখন বলবেনঃ "আচ্ছা ঠিক আছে। তুমি সুপারিশ করতে পার এবং আমি লোকদের মধ্যে ফায়সালা করবো।" রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ আমি তখন ফিরে এসে লোকদের সাথে দাঁড়িয়ে যাবো। আমরা সব দাঁড়িয়েই থাকবো-এমন সময় হঠাৎ আকাশ থেকে এক ভীষণ শব্দ আসবে। আমরা চিন্তান্বিত হয়ে পড়বো। পৃথিবীবাসী দানব ও মানবের দ্বিগুণ সংখ্যক ফেরেশতা আকাশ থেকে অবতরণ করবেন। তাঁরা যমীনের নিকটবর্তী হবেন। যমীন তাঁদের আলোতে উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। তাঁরা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে যাবেন। আমরা তাঁদেরকে জিজ্ঞেস করবো– আপনাদের মধ্যে কি মহান আল্লাহ রয়েছেন? তাঁরা উত্তরে বলবেনঃ "না, তবে তিনি অবশ্যই আসবেন।" দ্বিতীয়বার আকাশ থেকে ফেরেশতাগণ অবতরণ করবেন। তাঁদের সংখ্যা পূর্বের অবতারিত ফেরেশতাদের সংখ্যার দ্বিগুণ এবং দানব ও মানবের সংখ্যার দ্বিগুণ হবে। যমীন তাঁদের আলোকে চমকিত হয়ে উঠবে। তাঁরা দাঁড়িয়ে যাবেন। আমরা জিজ্ঞেস করবো– আল্লাহ কি আপনাদের মধ্যে রয়েছেন? তাঁরা জবাবে বলবেনঃ "না, তবে তিনি অবশ্যই এসে পড়বেন!" তারপর তৃতীয়বার ওর চেয়েও দ্বিগুণ সংখ্যক ফেরেশতা অবতরণ করবেন। তখন মহাপ্রতাপান্বিত ও মহামহিমান্বিত আল্লাহ মেঘের ছত্র লাগিয়ে আটজন ফেরেশতা দ্বারা স্বীয় তখ্ত বহন করিয়ে নিয়ে তাশরিফ আনবেন, অথচ এখন তো তাঁর তখ্ত চারজন ফেরেশতা বহন করতে রয়েছেন। তাঁদের পা যমীনের সর্বশেষ স্তরের তলায় রয়েছে। আসমান ও যমীন হচ্ছে তাঁদের দেহের অর্ধাংশের সমান। আল্লাহ তা'আলার আরশ তাঁদের স্কন্ধের উপর রয়েছে। তাঁদের মুখে তাসবীহ ও তাহমীদ উচ্চারিত হতে থাকবে। তাঁরা বলতে থাকবেনঃ

سُبْحَانَ ذِى الْعَرْشِ وَ الْجَبَرُوْتِ سُبْحَانَ ذِى الْمُلْكِ وَ الْمَلَكُوْتِ سُبْحَانَ الْحَىِّ الَّذِىْ لَا يَمُوْتُ سُبْحَانَ الَّذِىْ يُمِيْتُ الْخَلَائِقَ وَ لَا يَمُوْتُ سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ قُدُّوْسٌ قُدُّوْسٌ سُبْحَانَ رَبِّنَا الْاَعْلٰى رَبِّ الْمَلٰئِكَةِ وَ الرُّوْحِ سُبْحَانَ رَبِّنَا الْاَعْلٰى الَّذِىْ يُمِيْتُ الْخَلَائِقَ وَ لَا يَمُوْتُ

অর্থাৎ "আমরা তাঁরই পবিত্রতা বর্ণনা করছি যিনি আর্‌শ্ ও সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। আমরা পবিত্রতা বর্ণনা করছি তাঁরই যিনি রাজ্য, রাজত্ব ও আধ্যাত্মিক জগতের মালিক। আমরা তাঁরই পবিত্রতা বর্ণনা করছি যিনি মৃত্যুবরণ করেন না। আমরা তাঁরই পবিত্রতা ঘোষণা করছি যিনি সমস্ত মাখলূকের মৃত্যু ঘটিয়ে থাকেন কিন্তু নিজে মৃত্যুবরণ করেন না। আমরা তাঁরই তসবীহ্ পাঠ করছি। তিনি পবিত্র, তিনি পবিত্র, তিনি পবিত্র। আমরা আমাদের মহান প্রভুর পবিত্রতা বর্ণনা করছি যিনি ফেরেশ্‌তামণ্ডলী ও রূহের (জিবরাঈল আঃ-এর) প্রভু। আমরা আমাদের সর্বোচ্চ প্রভুর পবিত্রতা বর্ণনা করছি যিনি সারা মাখলূকের মৃত্যু ঘটিয়ে থাকেন কিন্তু নিজে মৃত্যুবরণ করবেন না।" তারপর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কুরসীর উপর উপবেশন করবেন। একটা শব্দ হবে– "হে দানব ও মানবের দল! তোমাদেরকে সৃষ্টি করার পর থেকে আজ পর্যন্ত আমি নীরব ছিলাম। তোমাদের কথা শুনে এসেছি এবং তোমাদের কাজকর্ম দেখে এসেছি। এখন তোমরা নীরব থাক। তোমাদের আমলের সহীফা তোমাদেরকে পাঠ করে শুনানো হবে। যদি ওটা ভাল সাব্যস্ত হয় তবে আল্লাহর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। আর যদি মন্দ হয় তবে নিজেদেরকেই তিরস্কার করবে।" অতঃপর আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামকে নির্দেশ দিবেন, তখন ওর মধ্যে ভীষণ কৃষ্ণকায় এক আকৃতি দেখা দেবে। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেনঃ "হে আদম সন্তান! আমি কি তোমাদেরকে বলিনি যে, তোমরা শয়তানের উপাসনা করবে না। কারণ, সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু? এটা সেই জাহান্নাম যার ওয়াদা তোমাদেরকে দেয়া হয়েছিল এবং যাকে তোমরা অবিশ্বাস করতে। সুতরাং হে পাপীর দল! সৎ লোকদের থেকে এখন তোমরা পৃথক হয়ে যাও।" একথা বলে আল্লাহ তা'আলা উম্মতদেরকে পৃথক করে দিবেন। এরশাদ হচ্ছে– 'হে নবী (সঃ)! তুমি প্রত্যেক উম্মতকে জানুর ভরে পতিত দেখতে পাবে। প্রত্যেক উম্মতের পাশে তার আমলনামা থাকবে এবং স্বীয় কৃতকর্মের প্রতিফল পাবে। এরপর আল্লাহ স্বীয় মাখলূকের মধ্যে ফায়সালার কাজ শুরু করবেন। কিন্তু জ্বীন ও মানুষের বিচার তখনও শুরু হবে না।

প্রথমে আল্লাহ হিংস্র ও চতুষ্পদ জন্তুর বিচার শুরু করবেন। এমন কি এক অত্যাচারী শিং বিশিষ্ট ছাগলের অত্যাচারের প্রতিশোধও অন্য ছাগলের দ্বারা গ্রহণ করাবেন। শেষ পর্যন্ত যখন তিনি জন্তুগুলোকে সম্বোধন করে বললেনঃ "তোমরা মাটি হয়ে যাও।" এ দেখে কাফিররা বলবেঃ "হায়! আমরাও যদি মাটি হয়ে যেতাম তবে এই শাস্তি থেকে বাঁচতে পারতাম।" অতঃপর বান্দাদের বিচারকার্য শুরু হবে। সর্বপ্রথম হত্যা ও খুনের মোকদ্দমা পেশ করা হবে। তখন এমন প্রত্যেক নিহত ব্যক্তি আসবে যাকে আল্লাহর পথে হত্যাকারী হত্যা করেছিল; আল্লাহ তা'আলা হত্যাকারীকে হুকুম করবেন তখন সে ঐ নিহত ব্যক্তির মাথা উঠিয়ে নেবে। ঐ মাথা তখন বলবেঃ "হে আল্লাহ! একে জিজ্ঞেস করুন, কেন সে আমাকে হত্যা করেছিল?" আল্লাহ তখন তাকে জিজ্ঞেস করবেন (অথচ আল্লাহ নিজেই জানেন)ঃ "কেন তাকে হত্যা করেছিলে?" সেই গাযী তখন বলবেঃ "হে আল্লাহ! আপনার মর্যাদা ও আপনারই নামের জন্যে।" তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেনঃ "তুমি সত্য বলেছো।" সেই সময় তার মুখমণ্ডল সূর্যের আলোকের মত চমকাতে থাকবে। ফেরেশতাগণ তাকে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাবেন। অনুরূপভাবে অন্যান্য নিহতগণ নিজ নিজ নাড়ি ভূড়ি মাথায় নিয়ে আসবে। আল্লাহ পাক ওদের হত্যাকারীদের জিজ্ঞেস করবেন– "কেন হত্যা করেছিলে?" তারা উত্তরে বলতে বাধ্য হবে যে, নিজের নাম ও খ্যাতির উদ্দেশ্যে। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেনঃ "ধ্বংস হয়ে যাও।" মোটকথা, প্রত্যেক নিহত ব্যক্তির মোকদ্দমা পেশ করা হবে এবং বিচার হবে। প্রত্যেক অত্যাচারের প্রতিশোধ অত্যাচারী থেকে নেয়া হবে। যে অত্যাচারীকে আল্লাহ ইচ্ছা করবেন শাস্তি দেবেন এবং যার উপর ইচ্ছা রহমত বর্ষণ করবেন। তারপর সারা মাখলূকের বিচার করা হবে এবং এমন কোন অত্যাচারী অবশিষ্ট থাকবে না যে, সে অত্যাচারী থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করেনি। এমন কি যে ব্যক্তি দুধে পানি মিশিয়ে বিক্রি করতো এবং বলতো যে, দুধ খাঁটি, তাকেও শাস্তি দেয়া হবে। আর ক্রেতাকে তার পুণ্য দেয়া হবে। এই কার্য সমাপ্তির পর এক আহ্বানকারী আহ্বান করবে যা সারা মাখলূক শুনতে পাবে। সেই আহ্বান হবে নিম্নরূপঃ

"প্রত্যেক দল যেন নিজ নিজ মা'বূদের কাছে চলে যায় এবং তার অঞ্চল চেপে ধরে।" তখন এমন কোন মূর্তিপূজক থাকবে না যার সামনে তার মূর্তি লাঞ্ছিত অবস্থায় পড়ে না থাকবে। ঐদিন একজন ফেরেশ্তা হযরত উযায়ের (আঃ)-এর রূপ ধরে আসবেন এবং আর একজন ফেরেশতা হযরত ঈসা ইবনে মারইয়াম (আঃ)-এর রূপ ধরে আগমন করবেন। তখন ইয়াহূদীরা হযরত উযায়ের

(আঃ)-এর পিছনে চলে আসবে এবং খ্রীষ্টানেরা আসবে হযরত ঈসা (আঃ)-এর পিছনে। অতঃপর তাদের এই কল্পিত মা'বূদ তাদেরকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাবে। তখন তারা বলবে যে, যদি ওরা তাদের প্রকৃত মা'বূদ হতো তবে তাদেরকে কখনও জাহান্নামে নিয়ে যেতো না। তারা জাহান্নামে চিরকাল অবস্থান করবে। এখন শুধু মুমিনরাই বাকী থাকবে এবং তাদের মধ্যে মুনাফিকরাও থাকবে। আল্লাহ তা'আলা নিজের ইচ্ছামত পরিবর্তিত আকৃতিতে তাদের কাছে আসবেন এবং বলবেনঃ "হে লোক সকল! সবাই নিজ নিজ মা'বূদের সাথে মিলিত হয়েছে। সুতরাং তোমরাও যাদের ইবাদত করতে তাদের সাথে মিলিত হও।" তখন মুনাফিক মিশ্রিত মুমিনরা বলবেঃ "আল্লাহর শপথ! আমাদের মা'বূদ তো আপনিই ছিলেন। আপনাকে ছাড়া আমরা আর কাউকেও মানতাম না।" এরপর আল্লাহ তা'আলা তাদের নিকট থেকে সরে যাবেন। অতঃপর তিনি নিজেই প্রকৃত দীপ্তি ও জাঁকজমকের সাথে আসবেন এবং যতক্ষণ চাইবেন ততক্ষণ তাদের থেকে সরে থাকবেন। তারপর তিনি তাদের সামনে আসবেন এবং পুনরায় বলবেনঃ "হে লোকেরা! সবাই নিজ নিজ মা'বূদের সাথে মিলিত হয়েছে। সুতরাং তোমাদের মা'বূদের সাথে মিলিত হও।" তারা বলবেঃ "আল্লাহর শপথ! আপনি ছাড়া আমাদের অন্য কোন মা'বূদ নেই। আমরা একমাত্র আপনারই ইবাদত করতাম।" তখন আল্লাহ পাক তাঁদের পায়ের গোছা খুলে দেবেন। এবং মর্যাদা গুণে তাদের কাছে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, তার মা'বূদ তিনিই। তারপর সবাই মাথার ভরে সিজদায় পড়ে যাবে। কিন্তু মুনাফিকরা পিঠের ভরে পড়বে। সিজদার জন্যে তারা ঝুঁকে পড়তে পারবে না। তাদের পিঠ গাভীর পিঠের মত সোজা হয়ে থাকবে। যখন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়ার হুকুম করবেন। তখন তাদের সামনে পুলসিরাত এসে পড়বে। ওটা তরবারীর ধারের চেয়ে তীক্ষ্ণ হবে। ওর স্থানে স্থানে আঁকড়া ও কাঁটা থাকবে এবং অত্যন্ত পিচ্ছিল ও বিপজ্জনক হবে। ওর নীচে আরও একটি পিচ্ছিল সেতু থাকবে। ভাল লোকেরা চক্ষের পলকে দ্রুত গতিতে ওটা পার হয়ে যাবে। যেমন বিদ্যুৎ চমকিত হয় বা প্রবল বেগে বায়ু প্রবাহিত হয় অথবা দ্রুতগামী ঘোড়া কিংবা দ্রুত দৌড়ালু মানুষ চলে থাকে। কতগুলো লোক তো সম্পূর্ণরূপে অক্ষত থাকবে ও পরিত্রাণ পেয়ে যাবে। কতগুলো লোক আহত হবে এবং বহু লোক কেটে জাহান্নামে পড়ে যাবে। অতঃপর জান্নাতীদেরকে যখন জান্নাতে পাঠিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করা হবে তখন তারা বলবেঃ "আমাদের জন্যে আল্লাহর নিকট সুপারিশ করবে কে?" তারা হযরত আদম (আঃ)-এর নিকট

গিয়ে সুপারিশের আবেদন জানাবে। তখন তিনি নিজের পাপের কথা উল্লেখ করে বলবেনঃ "আমার এর যোগ্যতা নেই। তোমরা হযরত নূহ (আঃ)-এর নিকট যাও। তাঁকে আল্লাহর প্রথম রাসূল বলা হয়।" লোকেরা তখন হযরত নূহ (আঃ)-এর কাছে যাবে। তিনিও নিজের অপরাধের কথা উল্লেখ করে বলবেনঃ "আমার তো এই কাজের যোগ্যতা নেই। তোমরা হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর কাছে যাও। আল্লাহ তা'আলা তাকে নিজের বন্ধু বলেছেন।" তারা তাঁর কাছে যাবে। তিনিও নিজের দোষের কথা উল্লেখ করে বলবেনঃ "তোমরা হযরত মূসা (আঃ)-এর কাছে যাও। আল্লাহ তা'আলা তাঁর সাথে কথা বলেছেন এবং তাঁর উপর তাওরাত অবতীর্ণ করেছেন।" তারা তখন হযরত মূসা (আঃ)-এর কাছে যাবে এবং সুপারিশের জন্যে আবেদন করবে। তিনি নিজের হত্যার পাপের কথা উল্লেখ করে বলবেনঃ "আমি এই কাজের যোগ্য নই। তোমরা বরং হযরত ঈসা রূহুল্লার (আঃ) কাছে যাও। তিনি আল্লাহর রূহ ও তাঁর কালেমা।" হযরত ঈসাও (আঃ) বলবেনঃ "না, আমি এ কাজের যোগ্য নই। তোমরা হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)-এর কাছে যাও।" রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন– তখন লোকেরা আমার কাছে আসবে। আল্লাহ তা'আলা আমাকে শাফা'আতের অধিকার দিয়েছেন এবং ওয়াদা করেছেন। আমি জান্নাতের দিকে যাবো এবং জান্নাতের দরজায় করাঘাত করবো। জান্নাতের দরজা খুলে যাবে এবং আমাকে অভ্যর্থনা জানানো হবে। জান্নাতে প্রবেশ করে আমি আল্লাহ পাকের দিকে দৃষ্টিপাত করবো এবং সিজদায় পড়ে যাবো। আল্লাহ তা'আলা আমাকে এমন তাহমীদ ও তামজীদের অধিকার দান করবেন যা তিনি অন্য কাউকেও শিখিয়ে দেননি। অতঃপর তিনি বলবেনঃ "হে মুহাম্মাদ (সঃ)! মাথা উঠাও। সুপারিশ করতে হয় কর। তোমার সুপারিশ কবূল করা হবে এবং তোমার আবেদন মঞ্জুর করা হবে।" আমি তখন আমার মাথা উঠাবো। আল্লাহ জিজ্ঞেস করবেনঃ "কি বলতে চাও?" আমি বলবো, হে আমার প্রভু! আপনি আমাকে সুপারিশ করার অধিকার দিয়েছেন। জান্নাতীদের ব্যাপারে আমার শাফা'আত কবূল করুন! তারা যেন জান্নাতে প্রবেশ করতে পারে। তখন তিনি বলবেনঃ "ঠিক আছে, আমি অনুমতি দিলাম। এই লোকগুলো জান্নাতে প্রবেশ করতে পারে।" নবী (সঃ) বলেনঃ আল্লাহর শপথ! দুনিয়ায় তোমরা তোমাদের বাসস্থান ও স্ত্রীদেরকে যেমন চিনতে পার তার চেয়ে তাড়াতাড়ি তোমরা তোমাদের জান্নাতের বাসস্থান ও স্ত্রীদেরকে চিনতে পারবে। প্রত্যেক লোককে বাহাত্তরটি স্ত্রী দেয়া হবে। তারা আদম সন্তানদের মধ্য থেকে হবে দু'জন এবং হূরদের থেকে হবে সত্তরজন। ঐ সত্তরজনের উপর এই দু'জনের

মর্যাদা দান করা হবে। কেননা, এই সতী সাধ্বী মহিলারা দুনিয়ায় খুব বেশী বেশী করে আল্লাহর ইবাদত করতো। জান্নাতবাসী যখন একজনের কাছে যাবে তখন দেখতে পাবে যে, সে ইয়াকূতের ঘরে মণিমুক্তা দ্বারা সজ্জিতা হয়ে সোনার সিংহাসনে বসে আছে। সে মিহীন সবুজ রেশমের সত্তরটি জান্নাতী হুল্লা পরিধান করে রয়েছে। সে যখন তার কাঁধের উপর হাত দেবে তখন তার বক্ষের উপর কাপড়, দেহ, মাংস ইত্যাদি থাকা সত্ত্বেও ওগুলো ভেদ করে বক্ষের অপর দিকে তার হাতের প্রতিবিম্ব দেখা যাবে। তার দেহ এত স্বচ্ছ হবে যে, তার পায়ের গোছার মজ্জা পর্যন্ত দেখতে পাওয়া যাবে। মনে হবে যে, তোমরা যেন ইয়াকূতের ছুরি দেখতে রয়েছো। তার অন্তর এর জন্যে এবং এর অন্তর তার জন্যে আয়না বানানো হবে। না এ ওর থেকে ক্লান্ত হবে এবং না ও এর থেকে ক্লান্ত হবে। সে যখন কখনো কোন মহিলার কাছে আসবে তখন সে তাকে কুমারী রূপেই পাবে। না স্বামী স্ত্রীর ক্লান্তির অভিযোগ করবে এবং না স্ত্রী স্বামীর ক্লান্তির অভিযোগ করবে। এমনই অবস্থায় শব্দ শোনা যাবেঃ "তোমাদের কারো প্রাণ ভরবে না এটা তো আমার জানা আছে। কিন্তু অন্যান্য স্ত্রীরাও তো রয়েছে।" সুতরাং সে পালাক্রমে তাদের কাছে যাবে। যার কাছেই সে যাবে সে-ই বলবেঃ "আল্লাহর কসম! জান্নাতে তোমার চেয়ে সুন্দর আর কেউ নেই এবং আমার কাছে তোমার চেয়ে প্রিয়তম কেউই নেই।" কিন্তু জাহান্নামীদেরকে যখন জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে তখন আগুন কারও পা পর্যন্ত পৌঁছবে কারও পায়ের গোছার অর্ধেক পর্যন্ত পৌঁছবে, কারও পৌঁছবে জানু পর্যন্ত, কারও কোমর পর্যন্ত এবং কারও শুধু মুখমণ্ডল বাদ দিয়ে সমস্ত দেহ পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। কেননা, মুখমণ্ডলের উপর আগুনকে হারাম করে দেয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ আমি আল্লাহ তা'আলাকে বলবো– হে আমার প্রভু! আমার উম্মতের জাহান্নামবাসীদের ব্যাপারে আমার শাফা'আত কবূল করুন। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেনঃ "তুমি তোমার উম্মতের যাদেরকে চিনো তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে নাও।" সুতরাং কোন উম্মতই অবশিষ্ট থাকবে না। তারপর সাধারণ শাফা'আতের অনুমতি দেয়া হবে। তখন প্রত্যেক নবী ও প্রত্যেক শহীদ নিজ নিজ শাফা'আত পেশ করবে। আল্লাহ পাক তখন বলবেনঃ "যার অন্তরে এক দীনারের ওজন পরিমাণও ঈমান রয়েছে তাকে জাহান্নাম থেকে বের করে নাও।" তারপর বলবেনঃ "এক দীনারের এক তৃতীয়াংশ ঈমান থাকলেও তাকে বের কর।" এরপর বলবেনঃ "এক দীনারের দুই তৃতীয়াংশ ঈমান থাকলেও তাকে বের কর। এক চতুর্থাংশ হলেও বের কর। এক কীরাত বরাবর হলেও বের

করে নাও। এমন কি কারও অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণ ঈমান থাকলে তাকেও বের করে নাও। তারপর যারা আল্লাহর জন্যে কোন একটি ভাল কাজও করেছে তাকেও বের কর।" তখন আর এমন কেউই বাকী থাকবে না যে শাফা'আতের যোগ্য। এমন কি আল্লাহ তা'আলার এই সাধারণ রহমত দেখে শয়তানের লোভ হবে যে, যদি কেউ তার জন্যেও সুপারিশ করতেন। আল্লাহ তা'আলা বলবেনঃ "আমি তো হচ্ছি সবচেয়ে বড় দয়ালু।" অতঃপর তিনি জাহান্নামে স্বীয় হাতটি রাখবেন এবং এতো অসংখ্য জাহান্নামীকে বের করবেন যারা পুড়ে কয়লার মত হয়ে যাবে। তাদেরকে জান্নাতের 'নাহরে হায়ওয়ান' নামক একটি নদীতে নিক্ষেপ করা হবে। তারা এমনভাবে নব জীবন লাভ করবে যেমনভাবে কোন জলাশয়ের ধারে উদ্ভিদ অংকুরিত হয় এবং রোদের আলোতে সবুজ আকার ধারণ করে। আবার ছায়ায় থাকলে ফ্যাকাশে হয়ে থাকে। ঐ জাহান্নামীরা জান্নাতের ঐ নদীতে গোসল করার পর শ্যামল সবুজ উদ্ভিদের মত সুন্দর আকার ধারণ করবে। তাদের কপালে লিখা থাকবে 'আল্লাহর আযাদকৃত জাহান্নামী'। তাদের এই চিহ্ন দেখে জান্নাতবাসীরা তাদেরকে চিনতে পারবে যে, তারা কিছু ভাল কাজ করেছিল। কিছুকাল তারা এইভাবেই জান্নাতে অবস্থান করবে। তারপর তারা মহান আল্লাহর নিকট আবেদন করবে যে, তাদের ঐ কপালের লিখাটা যেন মিটিয়ে দেয়া হয়। তখন তা মিটিয়ে দেয়া হবে।"

এটি একটি মাশ্হূর ও দীর্ঘ হাদীস। হাদীসটি অত্যন্ত গারীব এবং বিভিন্ন হাদীসের বিভিন্ন অংশ বিশেষ। এর কতগুলো কথা তো একেবারে অস্বীকারযোগ্য। মদীনার কাযী ইসমাঈল ইবনে রাফে' একাই এর বর্ণনাকারী। এর বিশুদ্ধতার ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। কেউ কেউ এটাকে বিশ্বাসযোগ্য বলেছেন এবং কেউ কেউ একে দুর্বল বলেছেন। আবার কেউ কেউ সম্পূর্ণরূপেই অস্বীকার করেছেন। যেমন আহমাদ ইবনে হাম্বল (রঃ), আবূ হাতিম রাযী (রঃ) এবং উমার ইবনে ফালাস (রঃ)। কেউ কেউ বলেছেন যে, এই হাদীসটি সম্পূর্ণরূপে বর্জনীয়। ইবনে আদী (রঃ) বলেন যে, এই হাদীসটির ব্যাপারে চিন্তা ভাবনার অবকাশ রয়েছে। এর বর্ণনাকারীরা সবাই দুর্বল। আমি বলি যে, কয়েকটি কারণে এর ইসনাদে মতভেদ রয়েছে। আমি এটাকে পৃথক একটি খণ্ডে বর্ণনা করেছি। এর বর্ণনাভঙ্গীও বিস্ময়কর। বহু হাদীস মিলিয়ে একটি হাদীস বানিয়ে নেয়া হয়েছে। এজন্যেই এটা অস্বীকারযোগ্য হয়ে গেছে। আমি আমার শিক্ষক হাফিয আবুল হাজ্জাজ আল মুযী (রঃ)-এর কাছে শুনেছি যে, এটা

ওয়ালীদ ইবনে মুসলিমের একটি রচনা, যা তিনি জমা করেছেন। এটা যেন কতগুলো পৃথক পৃথক হাদীসের সাক্ষ্য বহনকারী। আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

٧٤- وَ اِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ لِاَبِيْهِ اٰزَرَ اَتَتَّخِذُ اَصْنَامًا اٰلِهَةً ۚ اِنِّيْٓ اَرٰىكَ وَ قَوْمَكَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ○

৭৪। (সেই সময়টি স্মরণযোগ্য) যখন ইবরাহীম (আঃ) তার পিতা আযরকে বললো– আপনি প্রতিমাগুলোকে মা'বূদ মনোনীত করেছেন? নিঃসন্দেহে আমি আপনাকে ও আপনার সম্প্রদায়কে প্রকাশ্য ভ্রান্তির মধ্যে নিপতিত দেখছি।

٧٥- وَ كَذٰلِكَ نُرِيْٓ اِبْرٰهِيْمَ مَلَكُوْتَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَلِيَكُوْنَ مِنَ الْمُوْقِنِيْنَ ○

৭৫। এমনি আমিই ইবরাহীম (আঃ) -কে আসমান ও যমীনের সৃষ্টি অবলোকন করিয়েছি, যাতে সে বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

٧٦- فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ الَّيْلُ رَاٰ كَوْكَبًا ۚ قَالَ هٰذَا رَبِّيْ ۚ فَلَمَّآ اَفَلَ قَالَ لَآ اُحِبُّ الْاٰفِلِيْنَ ○

৭৬। যখন রাত্রির অন্ধকার তাকে আবৃত করলো, তখন সে আকাশের একটি নক্ষত্র দেখতে পেলো, আর বললো– (তোমাদের মতে) এটাই আমার প্রতিপালক। কিন্তু যখন ওটা অস্তমিত হলো তখন সে বললো– আমি অস্তমিত বস্তুকে ভালবাসি না।

٧٧- فَلَمَّا رَاَ الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هٰذَا رَبِّيْ ۚ فَلَمَّآ اَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَّمْ يَهْدِنِيْ رَبِّيْ

৭৭। আর যখন সে আকাশে চন্দ্রকে উজ্জ্বল আভায় দেখতে পেলো তখন বললে– এটাই আমার প্রতিপালক, কিন্তু ওটাও যখন অস্তমিত হলো, তখন

لَاَكُوْنَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّيْنَ ○

বললো- আমার প্রতিপালক যদি আমাকে পথ প্রদর্শন না করেন তবে আমি পথভ্রষ্ট সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবো।

৭৮- فَلَمَّا رَاَ الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هٰذَا رَبِّيْ هٰذَآ اَكْبَرُ فَلَمَّآ اَفَلَتْ قَالَ يٰقَوْمِ اِنِّيْ بَرِيْٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ ○

৭৮। অতঃপর যখন সে সূর্যকে উজ্জ্বল উদ্ভাসিত দেখতে পেলো তখন বললো- এটি আমার মহান প্রতিপালক। যখন সেটিও অস্তমিত হল তখন সে বললো, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা যাকে আল্লাহ্‌র অংশী কর, তা থেকে আমি মুক্ত।

৭৯- اِنِّيْ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَآ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ○

৭৯। আমার মুখমণ্ডলকে আমি সেই মহান সত্তার দিকে ফিরাচ্ছি যিনি গগণমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডল সৃষ্টি করেছেন, আর আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর পিতার নাম আযর ছিল না। বরং তার নাম ছিল তারেখ। আল্লাহ পাকের উক্তি ...... وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ لِاَبِيْهِ اٰزَرَ -এই সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এখানে 'আযর' দ্বারা মূর্তিকে বুঝানো হয়েছে। হযরত ইবরাহিম (আঃ)-এর পিতার নাম ছিল তারেখ, মাতার নাম ছিল শা'নী এবং স্ত্রীর নাম ছিল সারা। আর হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর মাতার নাম ছিল হাজেরা। তিনি ছিলেন হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর ক্রীতদাসী। উলামায়ে নাসাবের (বংশ তালিকা যাঁদের জানা আছে) অধিকাংশের এটাই উক্তি। আযর ছিল একটা মূর্তির নাম। হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর পিতা এই মূর্তির খাদেম ছিল বলে সে এই নামেই প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। আল্লাহ্ তা'আলাই সবেচেয়ে ভাল জানেন।

ইবনে জারীর প্রমুখ গুরুজনেরা বলেন যে, ঐ যুগের লোকদের পরিভাষায় 'আযর' শব্দটি গালি ও দূষণীয় কথা হিসেবে ব্যবহৃত হতো। 'আযর' শব্দের অর্থ হচ্ছে বক্রতা। ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বলেন যে, মু'তামির ইবনে সুলাইমান বর্ণনা করেছেন, আমি আমার পিতা থেকে শুনেছি যে, তিনি 'আযর' শব্দের অর্থ বক্রতা বলতেন এবং এটা হচ্ছে একটা শক্ত কথা যা হযরত ইবরাহীম (আঃ) মুখে উচ্চারণ করেছিলেন। ইবনে জারীর (রঃ) বলেনঃ "সঠিক কথা হচ্ছে এটাই যে, হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর পিতার নাম ছিল তারেখ। তারপর তিনি বলেন যে, তাঁর দু'টো নাম ছিল, যেমন অধিকাংশ লোকের দু'টো নাম থাকে। অথবা হতে পারে যে, একটি ছিল প্রকৃত নাম এবং আর একটি ছিল উপাধি ও পরিচিতি হিসাবে নাম। এটাই একটা উত্তম কারণ হতে পারে। আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে বেশী জানেন।

হযরত হাসান বসরী (রঃ) ও হযরত আবূ ইয়াযীদ মাদানী (রঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে–হে আযর! তুমি কি প্রতিমাগুলোকে মা'বূদ রূপে সাব্যস্ত করছো? এখানে যেন আযরকে সম্বোধন করা হয়েছে। জমহূর উলামা آزَرَ শব্দকে فَتْح বা যবর দিয়ে পড়েছেন। হাসান বসরী (রঃ)-এর মতে একে পেশ দিয়ে পড়া হয়নি। এর ভাবার্থ এই হল যে, এই শব্দটি হচ্ছে মা'রেফা ও আ'লাম। এই হিসেবে একে غَيْرُ مُنْصَرِف মনে করা হবে এবং এটা যেন لِاَبِيْهِ হতে بَدَل হয়েছে এবং এর উপর ভিত্তি করেই এতে যবর দেয়া হয়েছে। অথবা একে عَطْف بَيَان মনে করা হবে। আর এটাই বেশী সঠিক হতে পারে। কতক লোক একে نَعَت বলে থাকেন, যেমন اَحْمَرُ ও اَسْوَدُ শব্দগুলো غَيْرُ مُنْصَرِف রূপে ব্যবহৃত। কিন্তু কতক লোকের ধারণা এই যে, ওটা مَحْمُوْل হওয়ার ভিত্তিতে مَنْصُوْب হয়েছে। কেননা اَتَتَّخِذُ -এর প্রকৃত রূপ يَا اَبَتِ اَتَتَّخِذُ اٰزَرَ اَصْنَامًا اٰلِهَةً -এই রকম হবে। অর্থাৎ 'হে পিতঃ! আযর মূর্তিগুলোকে কি আপনি মা'বূদ বানিয়ে নিচ্ছেন?' কিন্তু نَعَت -এর দিক দিয়ে এই উক্তিটি বহু দূরের। কেননা, যে অক্ষরটি اِسْتِفْهَام -এর পরে হয় সেটি ওর পূর্ববর্তী অক্ষরের উপর আমল করে না। কারণ এই حَرْفِ اِسْتِفْهَام -এর জন্যে তো صَدْرِ كَلَام হওয়া চাই। ইবনে জারীর (রঃ) প্রমুখ মনীষীগণ এর সত্যতা স্বীকার করেছেন এবং আরবী ব্যাকরণে এটাই প্রসিদ্ধ হয়ে আছে। উদ্দেশ্য এই যে, হযরত ইবরাহীম (আঃ) স্বীয় পিতাকে উপদেশ দেন। মূর্তিপূজায় তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করেন। তাকে তার থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করেন। কিন্তু তার পিতা ফিরে আসলেন না। হযরত ইবরাহীম (আঃ) তাঁর

পিতাকে বললেনঃ "আপনি কি প্রতিমাগুলোকে মা'বূদ বানিয়ে নিয়েছেন? আমি তো আপনার এবং আপনার অনুসারীদেরকে বড়ই বিভ্রান্তির মধ্যে পাচ্ছি?" তাদেরকে মূর্খ ও বিভ্রান্ত বলে ঘোষণা করা প্রত্যেক স্থিরবুদ্ধির অধিকারীর জন্যে একটা স্পষ্ট দলীল।

মহান আল্লাহ ঘোষণা করছেন– কুরআন হাকীমে ইবরাহীম (আঃ)-এর বর্ণনার প্রতি লক্ষ্য কর। তিনি ছিলেন সত্যের সাধক ও নবী। তিনি স্বীয় পিতাকে বলেছিলেন– "হে পিতঃ! এমন বস্তুর উপাসনা করো না যে শুনেও না, দেখেও না এবং তোমাদের কোন কাজেও আসে না। হে পিতঃ, আল্লাহর পক্ষ থেকে আমি এমন জ্ঞান লাভ করেছি, যে জ্ঞান আপনার নেই। কাজেই আপনি আমার কথা শুনুন। আমি আপনাকে সরল সঠিক পথ প্রদর্শন করবো। আব্বা! শয়তানের উপাসনা করবেন না। শয়তান আল্লাহর শত্রু। হে পিতঃ, আমার ভয় হচ্ছে যে, আপনার উপর আল্লাহর আযাব এসে পড়বে এবং আপনি শয়তানের বন্ধুতে পরিণত হয়ে যাবেন।" তখন আযর উত্তরে বললোঃ "হে ইবরাহীম (আঃ)! তুমি কি আমার মা'বূদগুলো থেকে বিমুখ? তুমি যদি এই কাজ থেকে বিরত না হও তবে আমি তোমাকে প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা করবো এবং তোমাকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করবো।" ইবরাহীম (আঃ) বললেনঃ "আমি আপনাকে সালাম জানাচ্ছি। আপনার জন্যে আমি আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবো! আমার প্রভু অত্যন্ত দয়ালু। কিন্তু আমিও আপনাকে ছেড়ে দিলাম এবং ছেড়ে দিলাম আপনার কপোল কল্পিত মা'বূদগুলোকেও। আমার প্রভুর সঙ্গেই আমি সংযোগ স্থাপন করবো। আমি আশা রাখি যে, আমার প্রভু আমাকে বিমুখ করবেন না।" তখন থেকে হযরত ইবরাহীম (আঃ) তাঁর পিতার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকেন। অতঃপর তাঁর পিতা যখন শিরকের উপরই মারা গেল এবং তিনি জানতে পারলেন যে, মুশরিকের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা কোন কাজে আসে না তখন তিনি তার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করা ছেড়ে দিলেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "ইবরাহীম (আঃ)-এর তার পিতার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা শুধু এই কারণেই ছিল যে, সে তার পিতার সাথে ওয়াদা করেছিল। কিন্তু যখন সে জানতে পারলো যে, সে আল্লাহর শত্রু, তখন সে তার প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করলো, নিশ্চয়ই ইবরাহীম ছিল আবিদ ও সহনশীল।" বিশুদ্ধ হাদীসে রয়েছে যে, কিয়ামতের দিন হযরত ইবরাহীম (আঃ) তাঁর পিতার সাথে মিলিত হবেন। তখন আযর তাকে বলবেঃ "হে আমার প্রিয় পুত্র! আজ আমি তোমার অবাধ্যাচরণ করবো না।" তখন হযরত ইবরাহীম (আঃ) স্বীয় প্রভুর নিকট আরয

করবেন– "হে আমার প্রভু! আপনি আমাকে কিয়ামতের দিন লজ্জিত করবেন না। এই ওয়াদা কি আপনি আমার সাথে করেননি? আজ আমার পিতা যে অবস্থায় আছে এর চেয়ে লজ্জাজনক অবস্থা আমার জন্যে আর কি হতে পারে? আল্লাহ তা'আলা তখন ইবরাহীম (আঃ)-কে বলবেনঃ "হে ইবরাহীম (আঃ)! তুমি তোমার পিছন দিকে ফিরে তাকাও।" তখন তিনি স্বীয় পিতাকে দেখার পরিবর্তে একটা বেজীকে দেখতে পাবেন, যার সারা দেহ কাদাময় হয়ে থাকবে। আর দেখা যাবে যে, তার পা ধরে টেনে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তাই মহান আল্লাহ বলেন–আমি ইবরাহীম (আঃ)-কে আসমান ও যমীনের সৃষ্টি অবলোকন করিয়েছি এবং তার দৃষ্টিতে এই দলীল কায়েম করেছি যে, কিভাবে মহামহিমান্বিত আল্লাহর একত্ববাদের উপর যমীন ও আসমান সৃষ্টির ভিত্তি স্থাপিত রয়েছে। এর দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যেতে পারে যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন প্রতিপালক নেই। এরূপ দৃষ্টির প্রমাণকেই 'মালাকূত' বলা হয়। দৃষ্টির প্রমাণ সর্বপ্রথম লাভ করেছিলেন হযরত ইবরাহীম (আঃ)। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

اَوَ لَمْ يَنْظُرُوْا فِىْ مَلَكُوْتِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ

অর্থাৎ "তারা কি আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিরহস্যের প্রতি লক্ষ্য করে না (অর্থাৎ এই বিষয়ে গবেষণা করে না)?" (৭ঃ ১৮৫) মহান আল্লাহ আর এক জায়গায় বলেনঃ

اَفَلَمْ يَرَوْا اِلٰى مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَ مَا خَلْفَهُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَ الْاَرْضِ ....

অর্থাৎ "তারা কি যমীনের মধ্যকার সৃষ্টির প্রতি (শিক্ষা গ্রহণের) দৃষ্টি নিক্ষেপ করে না? তাদের সামনের, পিছনের, আকাশের ও যমীনের প্রতি চিন্তাযুক্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করা উচিত (তাহলে তারা বুঝতে পারবে) আমি যদি ইচ্ছা করি তবে তাদেরকে যমীনে ধ্বসিয়ে দিতে পারি এবং ইচ্ছা করলে তাদের উপর আকাশের খণ্ড নিক্ষেপ করতে পারি, অবশ্যই আগ্রহশীল ও আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনকারীদের জন্যে এতে নিদর্শনসমূহ রয়েছে।" (৩৪ঃ ৯) কিন্তু مَلَكُوْت সম্পর্কে ইবনে জারীর (রঃ) প্রমুখ গুরুজন বলেন যে, হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর দৃষ্টির সামনে আকাশ ফেটে গিয়েছিল এবং তিনি আকাশের সমুদয় জিনিসই দেখতে পাচ্ছিলেন। এমন কি তাঁর দৃষ্টি আরশ পর্যন্ত পৌঁছে যায় এবং সাতটি যমীনও তাঁর সামনে খুলে যায়, আর তিনি যমীনের ভিতরের জিনিসগুলো দেখতে থাকেন। কেউ কেউ এই বিষয়টিকে আরও একটু বাড়িয়ে

দিয়েছেন এবং তাঁরা বলেছেন যে, হযরত ইবরাহীম (আঃ) লোকদের পাপগুলোকেও দেখতে পাচ্ছিলেন এবং ঐ পাপীদের জন্যে তিনি বদ দু'আ করতে শুরু করেছিলেন। তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁকে বলেছিলেন– "হে ইবরাহীম (আঃ)! আমি তাদের উপর তোমার চেয়ে বহুগুণে বেশী দয়ালু। এতে বিস্ময়ের কিছুই নেই যে, তারা হয়তো তাওবা করে আমার দিকে ফিরে আসবে।"

এই আয়াতের ব্যাপারে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় ক্ষমতাবলে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-কে আসমান ও যমীনের প্রকাশ্য ও গোপনীয় সমস্ত জিনিস দেখিয়ে দেন। কোন কিছুই তাঁর কাছে গোপন ছিল না। যখন তিনি পাপীদের প্রতি লা'নত বর্ষণ করতে শুরু করেন তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁকে বলেনঃ 'না, এরূপ করা চলবে না।' এভাবে মহান আল্লাহ তাঁকে বদ দু'আ করা থেকে বিরত রাখেন। সুতরাং হতে পারে যে, তাঁর চোখের সামনে থেকে পর্দা সরে গিয়েছিল এবং সব কিছুই তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। আবার এও হতে পারে যে, তাঁর অন্তর্চক্ষু খুলে গিয়েছিল এবং ওর দ্বারাই তিনি সবকিছু অবলোকন করেছিলেন। আর তিনি আল্লাহ তা'আলার প্রকাশিত হিকমত এবং অকাট্য প্রমাণ সম্পর্কে অবহিত হয়েছিলেন।

যেমন ইমাম আহমাদ (রঃ) এবং তিরমিযী (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন– স্বপ্নে আল্লাহ তা'আলা অতি সুন্দর আকৃতিতে আমার কাছে হাযির হন এবং আমাকে বলেনঃ "হে মুহাম্মাদ (সঃ)! মালায়ে আ'লাতে কি নিয়ে আলোচনা চলছে?" আমি বললাম, হে আমার প্রভু! আমি তো জানি না। তিনি তখন তাঁর হাতখানা আমার দু'কাঁধের মধ্যভাগে রাখলেন, আমি তাঁর অঙ্গুলিগুলোর শীতলতা আমার বক্ষে অনুভব করলাম। তখন সমস্ত জিনিস আমার সামনে প্রকাশিত হয়ে পড়লো এবং আমি সবকিছু দেখতে লাগলাম।" আল্লাহ পাকের وَلِيَكُوْنَ مِنَ الْمُوْقِنِيْنَ -এই উক্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এখানে وَاوْ টি অতিরিক্ত। আয়াতের প্রকৃতরূপ হবে–

مَلَكُوْتَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلِيَكُوْنَ مِنَ الْمُوْقِنِيْنَ -এই মত। অর্থাৎ وَاوْ অক্ষরটি বাদ দিতে হবে। যেমন–

وَكَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ وَلِتَسْتَبِيْنَ سَبِيْلُ الْمُجْرِمِيْنَ (৬ঃ ৫৫)-এই আয়াতে الْاٰيٰتِ -এর পরেও وَاوْ অক্ষরটি অতিরিক্ত রয়েছে। এখানে শুধু পরবর্তী কথার ভিত্তির উপর কথা উঠানো হয়েছে। অর্থাৎ "আমি ইবরাহীম (আঃ)-এর উপর مَلَكُوْتَ প্রকাশ করে দিয়েছি, যেন সে দেখে নেয় এবং বিশ্বাসও করে নেয়।"

আল্লাহ তা'আলার উক্তিঃ যখন অন্ধকার রাত এসে গেল এবং ইবরাহীম (আঃ) তারকা দেখতে পেলো তখন বললো– এটা আমার প্রতিপালক। কিন্তু ওটা যখন অস্তমিত হয়ে গেল তখন সে বললো– যা অস্তমিত হয় তাকে তো আমি পছন্দ করি না এবং যা অদৃশ্য হয়ে যায় সে তো প্রতিপালক হতে পারে না।

কাতাদা (রঃ) বলেন যে, প্রভু যিনি হবেন তিনি যে ধ্বংস ও নষ্ট হতে পারেন না এটা হযরত ইবরাহীম (আঃ) জানতে পারলেন।

আল্লাহ বলেনঃ অতঃপর যখন ইবরাহীম (আঃ) চন্দ্রকে উজ্জ্বল দেখলো তখন বলল– এটাই আমার প্রতিপালক। কিন্তু ওটাও যখন ডুবে গেল তখন সে বললো– এটাও আমার প্রভু নয়। যদি সত্য প্রভু আমাকে পথ প্রদর্শন না করেন তবে আমি অবশ্যই পথভ্রষ্ট হয়ে যাবো।

মহান আল্লাহ বলেনঃ তারপর ইবরাহীম (আঃ) যখন সূর্যকে উদিত হতে দেখলো তখন বললোঃ এটা উজ্জ্বল ও বৃহত্তম। সুতরাং এটাই আমার প্রভু। কিন্তু ওটাও যখন অস্তমিত হয়ে গেল তখন সে বললো– হে আমার সম্প্রদায়! তোমাদের শিরকীর সাথে আমার আদৌ কোন সম্পর্কে নেই, আমি মুক্ত। আমি তো আমার মুখমণ্ডল সেই সত্তার দিকে ফিরাচ্ছি যিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন। আমি এখন সম্পূর্ণরূপে তাঁরই হয়ে গেলাম এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারি না। আমি আমার ইবাদত তাঁরই জন্যে নির্দিষ্ট করছি যিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন, অথচ ও দু'টো সৃষ্টি করার সময় তাঁর সামনে কোন নমুনা ছিল না। এভাবে আমি শিরক থেকে তাওহীদের দিকে ফিরে আসছি।

এই স্থানে মুফাস্সিরদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে যে, এটা কি হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর গভীর চিন্তা ও গবেষণার স্থান, কিংবা কওমের সাথে বচসার স্থান? হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এটাকে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর নিম্নের উক্তি দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছেন– "যদি আমার প্রভু আমাকে সুপথ প্রদর্শন না করেন তবে আমি অবশ্যই পথভ্রষ্ট কওমের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবো।" মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক (রঃ) বলেন যে, এই কথা হযরত ইবরাহীম (আঃ) ঐ সময় বলেছিলেন যেই সময় তিনি প্রথমবার ঐ গুহা হতে বাইরে এসেছিলেন যেখানে তাঁর মা তাঁকে প্রসব করেছিলেন। কেননা নমরূদ ইবনে কিন্আনের ভয়ে প্রসবের সময় তাঁর মা ঐ গুহার মধ্যে ঢুকে পড়েছিলেন। জ্যোতির্বিদরা নমরূদকে বলেছিলঃ 'এমন এক শিশু জন্মগ্রহণ করবে যার হাতে আপনার রাজ্য ধ্বংস হয়ে

যাবে।' তখন সে ঘোষণা করেছিল যে, ঐ বছর যত পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করবে সবাইকে যেন হত্যা করে দেয়া হয়। হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর মা যখন গর্ভবতী হন এবং তাঁর প্রসবের সময় ঘনিয়ে আসে তখন তিনি শহরের বাইরে এক গুহার ভিতরে প্রবেশ করেন। সেখানেই তিনি হযরত ইবরাহীম (আঃ)-কে প্রসব করেন এবং ওখানেই তাঁকে একাকী রেখে চলে আসেন। মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক এখানে এক অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ করেছেন এবং এর উপর ভিত্তি করেই পূর্ববর্তী ও পরবর্তী মুফাস্সিরগণও ওগুলো বর্ণনা করেছেন। কিন্তু সত্য কথা এই যে, হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর তাঁর কওমের কাছে এটা বর্ণনা করা তর্কের খাতিরেই ছিল। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল তাদের বিশ্বাসকে বাতিল সাব্যস্ত করা যে, তারা যেসব প্রতিমার পূজা করছে সেগুলো বাজে ও ভিত্তিহীন। সূচনাতেই তিনি প্রতিমাপূজা সম্পর্কে স্বীয় পিতার ভুল প্রকাশ করছেন। প্রতিমাগুলোকে তারা মালাইকাদের আকারে বানিয়ে রেখেছিল। ওদের উদ্দেশ্য ছিল এই যে, ঐ প্রতিমাগুলো মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলার সামনে তাদের জন্যে সুপারিশ করবে। অথচ ঐ মূর্তিগুলো স্বয়ং তাদের দৃষ্টিতেও ছিল ঘৃণ্য ও তুচ্ছ। কিন্তু তারা যেন মালাইকাদের ইবাদত করে এই চাচ্ছিল যে, তারা জীবিকা এবং অন্যান্য প্রয়োজনের ব্যাপারে তাদের জন্যে আল্লাহ তা'আলার কাছে সুপারিশ করবে। এই স্থলে তাদের ভুল ও পথভ্রষ্টতা প্রকাশ করা হয়েছে। এই প্রতিমাগুলো সাতটি নক্ষত্রের নামে ছিল। সেগুলো হচ্ছে 'কামার', 'আতারিদ', 'যুহরা', 'শামস', 'মিররীখ', 'মুশতারী' এবং 'যাহল'। সবচেয়ে বেশী উজ্জ্বল নক্ষত্র হচ্ছে 'শামস'। তারপর 'কামার'। সমস্ত তারকার মধ্যে উজ্জ্বলতম হচ্ছে 'যুহরা'। হযরত ইবরাহীম (আঃ) সর্বপ্রথম এই 'যুহরা' তারকা থেকেই শুরু করলেন। তিনি তাঁর কওমের লোকদেরকে বললেন যে, এই তারকাগুলোর মধ্যে মা'বূদ হওয়ার যোগ্যতা নেই। এরা তো দাসত্বের শৃংখলে আবদ্ধ। তাদের গতি সীমিত। তাদের স্বেচ্ছায় ডানে-বামে যাবার কোন অধিকার নেই। এগুলো তো হচ্ছে আকাশের নক্ষত্র যেগুলোকে আল্লাহ পাক আলো দানকারী রূপে সৃষ্টি করেছেন এবং এতে তার বিশেষ নৈপুণ্য নিহিত রয়েছে। এরা তো পূর্ব দিক থেকে বের হয় এবং পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে পথ অতিক্রম করে চক্ষু হতে অদৃশ্য হয়ে যায়। পরবর্তী রাত্রে পুনরায় প্রকাশিত হয়। সুতরাং এই বস্তুগুলো তো হচ্ছে বাঁধা ধরা অভ্যাসের দাস। কাজেই এদের মা'বূদ হওয়া কিরূপে সম্ভব? এরপর তিনি 'কামার' -এর দিকে আসলেন এবং 'যুহরা' সম্পর্কে যা বলেছিলেন এর সম্পর্কেও সেই কথাই বললেন। তারপর তিনি 'শামস' -এর বর্ণনা দিলেন। তাঁর বক্তব্যের মাধ্যমে তিনি এটাই প্রমাণ করলেন যে, এই উজ্জ্বলতম নক্ষত্রগুলোর মধ্যে মা'বূদ বনবার

যোগ্যতা মোটেই নেই। অতঃপর তিনি কওমের লোককে সম্বোধন করে বললেনঃ হে আমার কওম! তোমরা যাদেরকে মা'বূদ রূপে কল্পনা করছো আমি এর থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। যদি এরা মা'বূদ হয় তবে তোমরা এদেরকে সাহায্যকারী বানিয়ে নিয়ে আমার বিরুদ্ধাচরণ কর এবং আমার প্রতি মোটেই অনুগ্রহ প্রদর্শন করো না। আমি তো আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তার একজন দাসে পরিণত হয়েছি। আমি তোমাদের মত শিরকের পাপে লিপ্ত হবো না। আমি এই বস্তুগুলোর সৃষ্টিকর্তার ইবাদত করবো যিনি এইগুলোর পরিচালক ও নিয়ন্ত্রণকারী। প্রত্যেক বস্তুর আনুগত্যের সম্পর্ক তাঁরই হাতে রয়েছে। যেমন তিনি বলেন– “তোমাদের প্রভু তো একমাত্র তিনিই যিনি ছয় দিনে আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি আরশের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন, তিনি রাতকে দিন দ্বারা এবং দিনকে রাত দ্বারা ঢেকে দেন, একে অপরের পিছনে আসা যাওয়া করছে, সূর্য, চন্দ্র এবং তারকারাজি সবই তাঁর অনুগত ও বাধ্য, সবই তাঁর হুকুমের দাস, তিনি বিশ্বপ্রভু ও বড় কল্যাণময়।”

এটা কিরূপে সম্ভব হতে পারে যে, এই ব্যাপারে ইবরাহীম (আঃ) চিন্তা ভাবনা করবেন এবং প্রথমে শিরকের কল্পনা তাঁর মনে বদ্ধমূল থাকবে! অথচ আল্লাহ তা'আলা তাঁর সম্পর্কে বলে দিচ্ছেন– “আমি প্রথম থেকেই ইবরাহীম (আঃ)-কে হিদায়াত দান করেছিলাম। আমি তাকে খুব ভালরূপেই জানি। সে স্বয়ং নিজের পিতা ও কওমের লোককে বলেছিলঃ এগুলো কেমন মূর্তি যেগুলোর তোমরা উপাসনা করছো?” হযরত ইবরাহীম (আঃ) সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আরও বলেনঃ “সে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদতকারী এবং সে হচ্ছে আল্লাহর বিশিষ্ট ও মনোনীত বান্দা। সে কখনও শিরক করেনি। সে আল্লাহর নিয়ামতের উপর কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী। আল্লাহ তাকে মনোনীত করেছেন এবং সরল সঠিক পথে পরিচালিত করেছেন। দুনিয়াতেও আল্লাহ তাকে পুণ্য ও কল্যাণ দান করেছেন এবং পরকালেও সে সৎ লোকদের অন্তর্ভুক্ত হবে। হে নবী (সঃ)! আমি তোমার কাছে অহী করছি যে, তুমি মিল্লাতে ইবরাহীমের অনুসরণ করবে। সে ছিল একনিষ্ঠ, সে মুশরিক ছিল না।” মহান আল্লাহ আরও বলেনঃ “হে নবী (সঃ)! তুমি বলে দাও–আমার প্রতিপালক আমাকে সরল সঠিক পথের সন্ধান দিয়েছেন, যার উপর ইবরাহীম প্রতিষ্ঠিত ছিলেন এবং তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।”

সহীহ হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “প্রত্যেক শিশু ফিতরাত বা প্রকৃতির উপর জন্মগ্রহণ করে থাকে।” নবী (সঃ) বলেছেনঃ “আল্লাহ স্বীয় বান্দাকে 'হানীফ' বা একনিষ্ঠরূপে সৃষ্টি করেছেন, অর্থাৎ তারা তাঁরই হয়ে

থাকবে।" তিনি আরও বলেছেনঃ "আল্লাহর ফিতরাত হচ্ছে ওটাই যার উপর মানুষের সৃষ্টিকার্য সম্পন্ন হয়েছে এবং যে জিনিসকে যেভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে ওর উপর কোন পরিবর্তন আসতে পারে না।" যেমন আল্লাহ পাক বলেছেন-

وَ اِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِيْ اٰدَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَ اَشْهَدَهُمْ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوْا بَلٰى (৭ঃ ১৭২)

একটি উক্তির রীতি হিসেবে যার অর্থ এটাই। যেমন তিনি বলেছেন- فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِيْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا (৩০ঃ ৩০) যার বর্ণনা পরে আসবে। অর্থাৎ "মানুষকে আল্লাহ তা'আলা তাঁর ফিতরাতের উপর সৃষ্টি করেছেন, তাঁর সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই।" যখন আল্লাহর আনুগত্যের ফিতরাত ও দাসত্বের স্বীকারোক্তি সব কিছুই মাখলূকের ব্যাপারে প্রযোজ্য তখন ইবরাহীম খলীলুল্লাহ (আঃ)-এর ব্যাপারে এটা প্রযোজ্য হবে না কেন? আর তিনি মহান আল্লাহর ব্যাপারে সন্দেহ পোষণকারী হতে পারেন কিরূপে? তিনি তো ভদ্র প্রকৃতির দিক দিয়ে উত্তম অস্তিত্ব ছিলেন! বরং নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, ঐ স্থলে তিনি স্বীয় কওমের সাথে তর্ক ও বচসা করছিলেন এবং যে শিরকে তারা জড়িত ছিল, তাদের সেই ধারণা ও কল্পনাকে দলীল প্রমাণের সাহায্যে দূর করে দিচ্ছিলেন। এ কথা নয় যে, তিনি স্বয়ং সন্দেহে পতিত ছিলেন।

৮০- وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ اَتُحَاجُّوْنِّيْ فِي اللّٰهِ وَقَدْ هَدٰىنِ وَلَا اَخَافُ مَا تُشْرِكُوْنَ بِهٖ اِلَّا اَنْ يَّشَاءَ رَبِّيْ شَيْئًا وَسِعَ رَبِّيْ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا اَفَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ ○

৮০। আর তার জাতির লোকেরা তার সাথে ঝগড়া করতে থাকলে সে তাদেরকে বললো- তোমরা কি আল্লাহর ব্যাপারে আমার সাথে ঝগড়া করছো? অথচ তিনি আমাকে সঠিক পথের সন্ধান দিয়েছেন! তোমরা আল্লাহর সাথে যা কিছু শরীক করছো আমি ওটাকে ভয় করি না তবে যদি আমার প্রতিপালক কিছু চান, প্রতিটি বস্তু সম্পর্কে আমার প্রতিপালকের জ্ঞান খুবই ব্যাপক, এর পরও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না?

৮১। তোমাদের মনগড়া ও বানানো শরীকদেরকে আমি কিরূপে ভয় করতে পারি? অথচ তোমরা এই ভয় করছো না যে, আল্লাহর সাথে যাদেরকে তোমরা শরীক করছো তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তোমাদের কাছে কোন দলীল প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি, আমাদের দুই দলের মধ্যে কারা অধিকতর শান্তি ও নিরাপত্তা লাভের অধিকারী যদি তোমাদের জানা থাকে, তবে বল তো?

٨١- وَكَيْفَ اَخَافُ مَا اَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُوْنَ اَنَّكُمْ اَشْرَكْتُمْ بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا ۭ فَاَيُّ الْفَرِيْقَيْنِ اَحَقُّ بِالْاَمْنِ ۚ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝

৮২। প্রকৃতপক্ষে তারাই শান্তি ও নিরাপত্তার অধিকারী এবং তারাই সঠিক পথে পরিচালিত–যারা নিজেদের ঈমানকে যুলুমের সাথে (শিরকের সাথে) সংমিশ্রিত করেনি।

٨٢- اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْٓا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُولٰٓئِكَ لَهُمُ الْاَمْنُ وَهُمْ مُّهْتَدُوْنَ ۝ ع

৮৩। আর এটাই ছিল আমার যুক্তি-প্রমাণ, যা আমি ইবরাহীম (আঃ)-কে তার স্বজাতির মোকাবিলায় দান করেছিলাম, আমি যাকে ইচ্ছা করি সম্মান-মরতবা ও মহত্ত্ব বাড়িয়ে দিয়ে থাকি, নিঃসন্দেহে তোমার প্রভু প্রজ্ঞাময় ও বিজ্ঞ।

٨٣- وَتِلْكَ حُجَّتُنَآ اٰتَيْنٰهَآ اِبْرٰهِيْمَ عَلٰى قَوْمِهٖ ۭ نَرْفَعُ دَرَجٰتٍ مَّنْ نَّشَآءُ ۭ اِنَّ رَبَّكَ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ۝

মহান আল্লাহ ইবরাহীম খলীল (আঃ)-এর সম্পর্কে বলছেন—যখন তিনি একত্ববাদ নিয়ে স্বীয় কওমের সাথে তর্ক বিতর্ক করছিলেন এবং তাদেরকে বলছিলেনঃ আল্লাহ তা'আলার ব্যাপারে কি তোমরা আমার সাথে ঝগড়া করছো? তিনি তো এক ও অদ্বিতীয়। তিনি আমাকে সরল সঠিক পথে পরিচালিত করেছেন এবং তিনি যে এক ওর দলীল প্রমাণ আমি তোমাদের সামনে পেশ করছি। এর পরেও কিভাবে আমি তোমাদের বাজে কথা এবং অহেতুক সন্দেহের প্রতি মনোযোগ দিতে পারি? তোমাদের কথা যে বাজে ও ভিত্তিহীন এর দলীল আমার কাছে বিদ্যমান রয়েছে। তোমাদের নিজেদের তৈরী এই মূর্তিগুলোর তো কোন কিছুই করার ক্ষমতা নেই। আমি ওদেরকে ভয় করি না এবং তিল পরিমাণও পরওয়া করি না। যদি এই মূর্তিগুলো আমার কোন ক্ষতি সাধনে সক্ষম হয় তবে ক্ষতি করুক দেখি? তবে হ্যাঁ, আমার মহান প্রভু আল্লাহ ইচ্ছা করলে আমার ক্ষতি সাধন করতে পারেন। সমস্ত বস্তু সম্পর্কে তাঁর ব্যাপক জ্ঞান রয়েছে। কোন কিছুই তাঁর কাছে গোপন নেই। আমি যা কিছু বর্ণনা করছি তোমরা কি এর থেকে একটুও শিক্ষা এবং উপদেশ গ্রহণ করবে না? উপদেশ গ্রহণ করলে অবশ্যই তোমরা এদের পূজা-অর্চনা থেকে বিরত থাকতে। তাদের সামনে এইসব দলীল প্রমাণ পেশ করার ফল ঠিক হযরত হূদ (আঃ)-এর তাঁর কওমের সামনে এইসব দলীল পেশ করার ফলের মতই। এই আ'দ সম্প্রদায়ের ঘটনা কুরআন কারীমে বিদ্যমান রয়েছে। আল্লাহ পাক তাদের কথার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেনঃ قَالُوا يٰهُوْدُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَّمَا نَحْنُ بِتَارِكِيْ اٰلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَ مَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِيْنَ .... صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ (১১ঃ ৫৩-৫৬) অর্থাৎ হযরত হূদ (আঃ)-এর কওমের লোকেরা তাকে বলেছিল, হে হূদ (আঃ)! আপনি তো আমাদের সামনে কোন মু'জিযা পেশ করেননি, শুধু আপনার কথার উপর বিশ্বাস করেই কি আমরা আমাদের মা'বূদগুলোকে পরিত্যাগ করবো? আমরা তো আপনার উপর ঈমান আনয়ন করবো না। আমরা তো মনে করছি যে, আমাদের মা'বূদগুলোর পক্ষ থেকে আপনার উপর কোন লা'নত বর্ষিত হয়েছে। তখন হূদ (আঃ) বললেনঃ আমি আল্লাহকে সাক্ষী করছি এবং তোমরাও সাক্ষী থাকো, আমি ঐ সমস্ত বস্তুর প্রতি অসন্তুষ্ট যাদেরকে তোমরা আল্লাহর শরীক সাব্যস্ত করছো, অনন্তর তোমরা সকলে মিলে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চালাও, অতঃপর আমাকে সামান্য অবকাশও দিয়ো না। আমি আল্লাহর উপর ভরসা করেছি যিনি আমারও রব এবং তোমাদেরও রব; ভূ-পৃষ্ঠে যত বিচরণকারী আছে সবারই ঝুটি তাঁরই মুষ্টিতে আবদ্ধ; নিশ্চয়ই আমার রব সরল পথে অবস্থিত।"

পরবর্তী আয়াতে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর উক্তি তুলে ধরা হয়েছে– আমি তোমাদের বাতিল মূর্তিগুলোকে ভয় করবো কেন? অথচ তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে প্রতিমাগুলোকে নিজেদের মা'বূদ বানিয়ে নিতে ভয় করছো না এবং তোমাদের কাছে এর কোন দলীল প্রমাণও নেই। যেমন এক জায়গায় আল্লাহ পাক বলেনঃ اَمْ لَهُمْ شُرَكٰٓؤُا شَرَعُوا لَهُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَالَمْ يَاْذَنْ بِهِ اللّٰهُ (৪২ঃ ২১) তিনি আর এক জায়গায় বলেছেনঃ

اِنْ هِىَ اِلَّآ اَسْمَآءٌ سَمَّيْتُمُوْهَآ اَنْتُمْ وَاٰبَآؤُكُمْ (৫৩ঃ ২৩)

অতঃপর ইরশাদ হচ্ছে– তোমরাই বল তো যে, তোমাদের এবং আমার দলের মধ্যে কোন্ দলটি সত্যের উপর রয়েছে? সেই মা'বূদ কি সত্যের উপর রয়েছেন যিনি সবকিছু করতে সক্ষম, না ঐ মা'বূদগুলো সত্যের উপর রয়েছে যেগুলো লাভ ও ক্ষতি কোনটারই মালিক নয়?

এরপর ঘোষিত হচ্ছে– যারা ঈমান এনেছে এবং ঈমানের উপর যুলুম অর্থাৎ শির্ককে সংমিশ্রিত করেনি, শান্তি ও নিরাপত্তার অধিকারী তো তারাই এবং তারাই সঠিক পথে পরিচালিত। তারা ইবাদতকে একমাত্র আল্লাহর জন্যে নির্দিষ্ট করেছিল এবং সেই ইবাদতকে শির্ক থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত রেখেছিল। তাই দুনিয়া ও আখিরাত তাদেরই অধিকারে রয়েছে।

সহীহ বুখারীতে হযরত আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, وَلَمْ يَلْبِسُوْا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ -এই আয়াতটি যখন অবতীর্ণ হয় তখন সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করেন, "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! কে এমন আছে যে নিজের নফসের উপর যুলুম করেনি?" তখন اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। অর্থাৎ "নিশ্চয়ই শির্কই হচ্ছে সবচেয়ে বড় অত্যাচার।" (৩১ঃ ১৩)

যখন উপরোল্লিখিত আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং লোকেরা ভুল বুঝে নেয়, তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাদেরকে বলেন, তোমরা যা বুঝেছো তা নয়। সৎ বান্দা অর্থাৎ লোকমান হাকীম কি বলেছিলেন তা কি তোমরা শুননি? তিনি স্বীয় পুত্রকে সম্বোধন করে বলেছিলেনঃ

يٰبُنَىَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ

অর্থাৎ "হে আমার প্রিয় পুত্র! আল্লাহর সাথে শরীক স্থাপন করো না, নিশ্চয়ই তাঁর সাথে শরীক স্থাপন করা হচ্ছে বড় অত্যাচার।" (৩১ঃ ১৩) এখানে যুলুম দ্বারা শির্ককে বুঝানো হয়েছে।[১]

১. এটা ইমাম আহমাদ (রঃ) ও ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। ইমাম বুখারী (রঃ) এটাকে شَقَّ ذٰلِكَ عَلٰى اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -এই শব্দ দ্বারা তাখরীজ করেছেন।

হযরত আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, যখন لَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ -এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয় তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "আমাকে বলা হয়েছে যে, তুমি ঐ ঈমানদার লোকদেরই অন্তর্ভুক্ত।"

হযরত জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেনঃ একদা আমরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে চলছিলাম। আমরা যখন মদীনা হতে বাইরে চলে যাই তখন একজন উষ্ট্রারোহীকে আমাদের দিকে আসতে দেখা যায়। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ "এই উষ্ট্রারোহী তোমাদের সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যেই আসছে।" যখন সে আমাদের কাছে পৌঁছে যায় তখন নবী (সঃ) তাকে জিজ্ঞেস করেনঃ "কোথা থেকে আসছো?" সে উত্তরে বললোঃ "আমার পরিবারবর্গ ও গোত্রের নিকট থেকে আসছি।" রাসূলুল্লাহ (সঃ) জিজ্ঞেস করলেনঃ "কোথায় যাবে?" সে জবাবে বললোঃ "আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করতে চাই।" তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ "আচ্ছা, কি বলতে চাও বল, আমিই আল্লাহর রাসূল।" সে বললোঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমাকে ঈমান সম্পর্কে শিক্ষা দান করুন।" তিনি বললেনঃ "তুমি সাক্ষ্য দান করবে যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন মা'বূদ নেই এবং আরও সাক্ষ্য দেবে যে, মুহাম্মাদ (সঃ) আল্লাহর রাসূল। আর তুমি নামায সুপ্রতিষ্ঠিত করবে, যাকাত দেবে, রমযানের রোযা রাখবে এবং বায়তুল্লাহর হজ্ব করবে।" সে বললোঃ "আমি এগুলো স্বীকার করলাম।" বর্ণনাকারী বলেন যে, (সে ফিরে যেতে উদ্যত হলে) তার উটের সামনের পা জংলী ইঁদুরের গর্তে ঢুকে যায়। ফলে উটটি পড়ে যায় এবং সাথে সাথে লোকটিও পড়ে যায়। এই কারণে তার মাথা ফেটে যায় এবং গর্দান ভেঙ্গে যায়। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন বলেনঃ "লোকটির রক্ষণাবেক্ষণ করা আমার দায়িত্ব।" সাথে সাথে হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রাঃ) ও হযরত হুযাইফা (রাঃ) দৌড়ে গিয়ে উঠালেন। তারপর তাঁরা বলে উঠলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! লোকটির তো প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেছে!" একথা শুনে তিনি তাঁদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন। তারপর তিনি তাঁদেরকে বলেনঃ "আমি লোকটির দিক থেকে কেন মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলাম তা কি তোমরা জান? (এর কারণ এই যে,) আমি দেখতে পাচ্ছিলাম যে, দু'জন ফেরেশতা তার মুখে জান্নাতের ফল দিতে রয়েছেন! এর দ্বারা আমি বুঝতে পারলাম যে, লোকটি ক্ষুধার্ত অবস্থায় মারা গেছে।" এরপর রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ এ লোকটি ঐ লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল যাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– "তারা তাদের ঈমানের সাথে যুলুম অর্থাৎ শিরিককে সংমিশ্রিত করে না।" তারপর তিনি বললেনঃ "তোমাদের ভাইয়ের কাফন

দাফনের ব্যবস্থা কর।" আমরা তখন তাকে গোসল দিলাম, কাফন পরালাম ও সুগন্ধি লাগালাম। অতঃপর তাকে কবরের দিকে বহন করে নিয়ে গেলাম। এরপর রাসূলুল্লাহ (সঃ) আসলেন এবং কবরের ধারে বসে পড়লেন। অতঃপর তিনি বললেনঃ "বগলী কবর খনন কর, খোলা কবর করো না। আমাদের কবর বগলীই হয়ে থাকে এবং অন্যদের জন্যে হয় খোলা কবর। এই লোকটি ঐ লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল যারা অল্প আমল করে অধিক পুণ্য লাভ করে থাকে।"

ইবনে আব্বাস (রাঃ) হাদীসটি আরো একটু বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেনঃ "আমরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে পথ চলছিলাম। এমন সময় একজন গ্রাম্য লোক আমাদের সামনে এসে পড়ে এবং বলতে শুরু করেঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! যে আল্লাহ আপনাকে সত্যসহ পাঠিয়েছেন তাঁর শপথ করে আমি বলছি যে, আমি আমার দেশ, ছেলেমেয়ে এবং মালধন ছেড়ে আপনার নিকট এসেছি। উদ্দেশ্য এই যে, আপনার মাধ্যমে আমি হিদায়াত লাভ করবো। আমার অবস্থা এই যে, পথে শুধু ঘাস-পাতা খেয়ে আপনার কাছে পৌঁছেছি। এখন আপনি আমাকে দ্বীনের শিক্ষা দান করুন!" রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন তাকে দ্বীন শিক্ষা দিলেন এবং সে তা কবূল করল। আমরা তার চারদিকে ভীড় জমালাম। সে ফিরে যেতে উদ্যত হলো। এমন সময় তার উটের পা জংলী ইঁদুরের গর্তে ঢুকে গেল। তখন উটটি পড়ে গেল এবং ধাক্কা খেয়ে লোকটির ঘাড় ভেঙ্গে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ "আল্লাহর কসম! লোকটি ঠিকই বলেছিল যে, দেশ ও ছেলেমেয়ে ছেড়ে শুধুমাত্র হিদায়াত ও দ্বীন লাভের উদ্দেশ্যে আমার নিকট আগমন করেছিল। সে দ্বীনী শিক্ষা লাভ করেছে। আমি জানতে পারলাম যে, এই সফরে সে শুধু যমীনের ঘাস পাতা খেয়ে দিন কাটিয়েছে। সে আমল করেছে অল্প কিন্তু পুণ্য লাভ করেছে অধিক। 'যারা তাদের ঈমানের সাথে যুলুম অর্থাৎ শিরককে মিশ্রিত করেনি তারাই শান্তি ও নিরাপত্তা লাভের অধিকারী। তারাই প্রকৃত হিদায়াত প্রাপ্ত।' এই কথা যাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে এ লোকটি তাদেরই একজন।"

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সাখীরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "যাকে দেয়া হলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, না দেয়া হলে ধৈর্যধারণ করে, কারও উপর যুলুম করলে তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং তার উপর যুলুম করা হলে যুলুমকারীকে ক্ষমা করে দেয়" -এ পর্যন্ত বলে তিনি নীরব হয়ে গেলেন। তখন সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেনঃ "হে আল্লাহর

রাসূল (সঃ)! তার জন্যে কি রয়েছে?” তখন তিনি পাঠ করলেন- أُولٰئِكَ لَهُمُ الْاَمْنُ وَهُمْ مُّهْتَدُوْنَ। অর্থাৎ এই লোকদের জন্যে রয়েছে শান্তি ও নিরাপত্তা এবং এরাই হচ্ছে সুপথ প্রাপ্ত।[১]

وَتِلْكَ حُجَّتُنَا اٰتَيْنٰهَا اِبْرٰهِيْمَ عَلٰى قَوْمِهٖ অর্থাৎ “এটাই ছিল আমার যুক্তি-প্রমাণ যা আমি ইবরাহীম (আঃ)-কে তার স্বজাতির মুকাবিলায় দান করেছিলাম।” আল্লাহ পাকের এই উক্তির মধ্যে যে যুক্তি-প্রমাণের কথা রয়েছে তা এই যে, হযরত ইবরাহীম (আঃ) তাঁর সম্প্রদায়ের লোককে বলেছিলেনঃ “তোমরা যখন কোন দলীল প্রমাণ ছাড়াই আল্লাহর সঙ্গে শরীক স্থাপন করতে ভয় কর না, তখন আমি তোমাদের এই সব শক্তিহীন মা'বূদকে ভয় করবো কেন? এখন তোমরা নিজেরাই দেখে নেবে যে, আমাদের দুই দলের মধ্যে কারা বেশী নিজেদের রক্ষার ব্যবস্থা করেছে।” মহান আল্লাহ এটারই নাম দিয়েছেন শান্তি, নিরাপত্তা এবং হিদায়াত। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ ...... اٰمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْا এবং এর পরে বলেছেনঃ

وَتِلْكَ حُجَّتُنَا اٰتَيْنٰهَا اِبْرٰهِيْمَ عَلٰى قَوْمِهٖ نَرْفَعُ دَرَجٰتٍ مَّنْ نَّشَاءُ এখানে درجت শব্দটিকে اِضَافَتْ -এর সঙ্গেও পড়া হয়েছে এবং اِضَافَتْ ছাড়াও পড়া হয়েছে। দু'টোর অর্থ প্রায় একই। যেমন সূরায়ে يُوْسُفْ -এ রয়েছে।

اِنَّ رَبَّكَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ অর্থাৎ “তিনি নিজের কথায় হাকীম বা প্রজ্ঞাময় এবং নিজের কাজে আলীম বা বিজ্ঞ।” (১২ঃ ৬) অর্থাৎ তিনি যাকে চান হিদায়াত দান করেন এবং যাকে চান পথভ্রষ্ট করেন। যেমন তিনি এক জায়গায় বলেছেনঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ - وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ اٰيَةٍ حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ -

অর্থাৎ “হে নবী (সঃ)! নিশ্চয়ই যাদের উপর তোমার প্রভুর কথা ও ফায়সালা সাব্যস্ত হয়ে গেছে তারা সমস্ত নিদর্শন দেখলেও ঈমান আনবে না, যে পর্যন্ত না তারা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রত্যক্ষ করে।” (১০ঃ ৯৬-৯৭)

---

১. লুবাব গ্রন্থে ইবনে আবি হাতিম (রঃ) তাখরীজ করেছেন যে, একজন মুসলিম-শত্রু মুসলমানদের উপর আক্রমণ চলিয়ে পর পর তিনজনকে শহীদ করে দেয়। তারপর সে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করেঃ 'এখন আমার ইসলাম গ্রহণে কোন উপকার হবে কি?' তিনি উত্তরে বলেনঃ 'হ্যাঁ।' তখন সে ঘোড়া চালিয়ে মুসলমানদের মধ্যে প্রবেশ করে। অতঃপর তার সঙ্গীদের উপর আক্রমণ চালিয়ে পর পর তিনজনকে হত্যা করে। কয়েকজন মনীষী মনে করেন যে, ...الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا -এই আয়াতটি তারই ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়।

٨٤- وَ وَهَبْنَا لَهٗۤ اِسْحٰقَ وَ يَعْقُوْبَ ؕ كُلًّا هَدَيْنَا ۚ وَ نُوْحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِهٖ دَاوٗدَ وَ سُلَيْمٰنَ وَ اَيُّوْبَ وَ يُوْسُفَ وَ مُوْسٰى وَ هٰرُوْنَ ؕ وَ كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ۙ

৮৪। আমি তাকে, ইসহাক (আঃ) ও ইয়াকূব (আঃ)-কে দান করেছি এবং উভয়কেই সঠিক পথের সন্ধান দিয়েছি, আর তার পূর্বে (এমনিভাবে) নূহ (আঃ)-কেও সঠিক পথের হিদায়াত দিয়েছি; আর তার (ইবরাহীমের) বংশের মধ্যে দাঊদ, সুলাইমান, আইয়ূব, ইউসুফ, মূসা ও হারূন (আঃ)-কে এমনিভাবেই সঠিক পথের সন্ধান দিয়েছি; এমনিভাবেই আমি সৎ ও পুণ্যশীল লোকদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি।

٨٥- وَ زَكَرِيَّا وَ يَحْيٰى وَ عِيْسٰى وَ اِلْيَاسَ ؕ كُلٌّ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ۙ

৮৫। আর যাকারিয়া, ইয়াহ্‌ইয়া ঈসা ও ইলিয়াস, তারা প্রত্যেকেই সৎ লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

٨٦- وَ اِسْمٰعِيْلَ وَ الْيَسَعَ وَ يُوْنُسَ وَ لُوْطًا ؕ وَ كُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ۙ

৮৬। আর ইসমাঈল, ইয়াসাআ', ইউনুস ও লূত (আঃ) এদের প্রত্যেককেই আমি নবুওয়াত দান করে সমগ্র বিশ্বের উপর মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি।

٨٧- وَ مِنْ اٰبَآئِهِمْ وَ ذُرِّيّٰتِهِمْ وَ اِخْوَانِهِمْ ۚ وَ اجْتَبَيْنٰهُمْ وَ هَدَيْنٰهُمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ

৮৭। আর এদের বাপ-দাদা, সন্তান-সন্ততি, ভাই-ব্রাদারের মধ্যে অনেককে আমি সম্মানিত করে নিজস্ব করে নিয়েছি এবং সঠিক ও সোজা পথে পরিচালিত করেছি।

৮৮। এটাই আল্লাহর হিদায়াত; তিনি তাঁর বান্দার মধ্যে যাকে চান এই পথে পরিচালিত করেন, কিন্তু তারা যদি শির্‌ক করতো তবে তারা যা কিছুই করতো, সবই পণ্ড হয়ে যেতো।

٨٨- ذٰلِكَ هُدَى اللّٰهِ يَهْدِىْ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ۗ وَلَوْ اَشْرَكُوْا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○

৮৯। এরা ছিল সেই লোক, যাদেরকে আমি কিতাব, শাসনভার ও নবুওয়াত দান করেছি, সুতরাং যদি এরা নবুওয়াত অস্বীকার করে, তবে তাদের স্থলে আমি এমন এক জাতিকে নিয়োগ করবো, যারা ওটা অস্বীকার করে না।

٨٩- اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ۚ فَاِنْ يَّكْفُرْ بِهَا هٰٓؤُلَآءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوْا بِهَا بِكٰفِرِيْنَ ○

৯০। এরা হচ্ছে ওরাই, যাদেরকে আল্লাহ সুপথ প্রদর্শন করেছিলেন, সুতরাং তুমিও তাদের পথ অনুসরণ করে চল, তুমি বলে দাও– আমি কুরআন ও দ্বীনের তাবলীগের বিনিময়ে তোমাদের কাছে কোন কিছুই প্রার্থনা করি না, এই কুরআন সমগ্র জগতবাসীর জন্যে উপদেশের ভাণ্ডার ছাড়া কিছুই নয়।

٩٠- اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ فَبِهُدٰىهُمُ اقْتَدِهْ ۗ قُلْ لَّآ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا ۗ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٰى لِلْعٰلَمِيْنَ ○ ع

আল্লাহ পাক বলেন–ইবরাহীম (আঃ)-কে আমি ইসহাকের ন্যায় সুসন্তান দান করেছি, অথচ বার্ধক্যের কারণে সে এবং তার স্ত্রী সন্তান থেকে নিরাশ হয়ে গিয়েছিল। ফেরেশতা তাদের কাছে আসেন এবং তারা হযরত লূত (আঃ)-এর কাছেও যাচ্ছিলেন। ফেরেশতাগণ স্বামী-স্ত্রী দু'জনকেই হযরত ইসহাক

(আঃ)-এর জন্মের সুসংবাদ দেন। তখন স্ত্রী হতবুদ্ধি হয়ে বলেনঃ "হায়! হায়! কি করে আমাদের সন্তান হবে! আমি তো বন্ধ্যা ও বৃদ্ধা এবং আমার স্বামী (ইবরাহীম আঃ) অতি বৃদ্ধ! সুতরাং এটা কতই বিস্ময়কর কথা!" তখন ফেরেশতাগণ বলেনঃ "আপনি কি আল্লাহর কাজে বিস্ময় বোধ করছেন? হে বাড়ীর মালিকগণ! আপনাদের উপর আল্লাহর রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক।" ফেরেশতাগণ তাঁদেরকে এ সুসংবাদও দেন যে, ইসহাক (আঃ) নবীও হবেন এবং তাঁর বংশ বৃদ্ধিও হবে। যেমন আল্লাহ পাক বলেনঃ وَبَشَّرْنٰهُ بِاِسْحٰقَ نَبِيًّا مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ। অর্থাৎ "আমি তাকে ইসহাক (আঃ) -এর সুসংবাদ দিলাম, যে নবী হবে ও সৎ লোকদের অন্তর্ভুক্ত হবে।" (৩৭ঃ ১১২) এটা বড় সুসংবাদ এবং বড় নিয়ামতও বটে। আর এক জায়গায় মহান আল্লাহ বলেনঃ فَبَشَّرْنٰهَا بِاِسْحٰقَ وَمِنْ وَّرَاۤءِ اِسْحٰقَ يَعْقُوْبَ অর্থাৎ "আমি তাকে ইসহাক (আঃ) -এর শুভ সংবাদ দিলাম এবং এ সুসংবাদও দিলাম যে, ইসহাক (আঃ) -এর ঔরষে ইয়াকূব (আঃ) জন্মগ্রহণ করবে।" (১১ঃ ৭১) মহান আল্লাহ হযরত ইবরাহীম (আঃ) ও তাঁর স্ত্রীকে এ সংবাদ দেন যে, তাঁদের জীবদ্দশাতেই ইসহাকের আঃ ঔরষে হযরত ইয়াকূব (আঃ) জন্মগ্রহণ করবেন। সুতরাং পুত্র ইসহাকের জন্মগ্রহণের ফলে যেমন তাঁদের চক্ষু ঠাণ্ডা হবে, অনুরূপভাবে পৌত্র ইয়াকূব (আঃ) -এর জন্মগ্রহণের ফলেও তাঁদের চক্ষু ঠাণ্ডা হবে। কেননা, বংশ বৃদ্ধির কারণ হিসেবে পৌত্রের জন্মলাভ খুবই খুশীর ব্যাপার। বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা যখন সন্তান থেকে নিরাশ হয়ে যাচ্ছেন যে, তাঁদের সন্তান লাভ সম্ভব নয়, এমতাবস্থায় পুত্র ইসহাক (আঃ) -এর জন্মলাভ এবং ইসহাক (আঃ) -এর পুত্র ইয়াকূব (আঃ) -এর জন্মলাভ এটা কি কম খুশীর কথা! এতে কে না খুশী হয়? এটা ছিল হযরত ইবরাহীমের নেক আমলেরই প্রতিদান, যিনি একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে নিজের দেশ ও জাতিকে ছেড়ে দিয়ে দূর দূরান্তের পথে পাড়ি জমালেন। এর প্রতিদানই ছিল তার ঔরষজাত নেককার সন্তানগণ, যাদের কারণে তাঁর চক্ষু ঠাণ্ডা হয়েছিল। যেমন আল্লাহ পাক বলেনঃ "যখন ইবরাহীম স্বীয় কওম ও তাদের মা'বূদদেরকে পরিত্যাগ করলো তখন আমি তাকে প্রতিদান হিসাবে ইসহাক ও ইয়কূবকে দান করলাম।" আর এখানে বলেনঃ

وَوَهَبْنَا لَهٗۤ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ كُلًّا هَدَيْنَا

অর্থাৎ "আমি তাকে ইসহাক ও ইয়াকূবকে দান করেছি এবং উভয়কেই **সঠিক পথের** সন্ধান দিয়েছি।" এরপর বলেনঃ

وَ نُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ

অর্থাৎ “আর তার পূর্বে এমনিভাবে নূহ (আঃ)-কেও সঠিক পথ প্রদর্শন করেছি।” মহান আল্লাহ আরও বলেনঃ আমি ইবরাহীম (আঃ)-কে ভাল বংশ দান করেছি। ইসহাক (আঃ) ও ইয়াকূব (আঃ) বিরাট বৈশিষ্ট্য লাভ করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা যখন হযরত নূহ (আঃ)-এর সময় সমস্ত দুনিয়াবাসীকে ধ্বংস করেছিলেন। সেই সময় শুধুমাত্র ঐ লোকগুলো রক্ষা পেয়েছিল যারা হযরত নূহ (আঃ) -এর উপর ঈমান এনে তাঁর নৌকায় আরোহণ করেছিল! এই পরিত্রাণ প্রাপ্ত লোকগুলোই ছিল হযরত নূহের সন্তান এবং সারা দুনিয়ার লোক হচ্ছে এদের সন্তান। আর ইবরাহীম (আঃ) -এর পরে তাঁর সন্তানদের মধ্য থেকেই আল্লাহ নবী প্রেরণ করেন। যেমন তিনি বলেনঃ

وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَ الْكِتٰبَ

অর্থাৎ “আমি তার সন্তানদের মধ্যে নবুওয়াত ও কিতাব রেখেছি।” (২৯ঃ২৭) তিনি আর এক জায়গায় বলেনঃ

وَ لَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوحًا وَّ اِبْرٰهِيْمَ وَ جَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَ الْكِتٰبَ

অর্থাৎ “অবশ্যই আমি নূহ (আঃ) ও ইবরাহীম (আঃ)-কে প্রেরণ করেছি এবং তাদের সন্তানদের মধ্যে নবুওয়াত ও কিতাব রেখেছি।” (৫৭ঃ ২৬) আল্লাহ তা'আলা আরও বলেছেনঃ “নবীদের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে যাদেরকে আল্লাহ পুরস্কৃত করেছেন, তারা আদম (আঃ)-এর সন্তানদের অন্তর্ভুক্ত, আর ঐ লোকদের অন্তর্ভুক্ত যাদেরকে আমি নূহ (আঃ)-এর সাথে নৌকায় উঠিয়েছিলাম এবং তারা ইবরাহীম (আঃ) ও ইসমাঈল (আঃ)-এর সন্তানদের অন্তর্ভুক্ত, যাদেরকে আমি সুপথ প্রদর্শন করেছিলাম ও মনোনীত করেছিলাম, যখন তাদের সামনে আল্লাহর আয়াতসমূহ পাঠ করা হয় তখন তারা ক্রন্দনরত অবস্থায় সিজদায় পড়ে যায়।”

এই আয়াতে কারীমায় وَمِنْ ذُرِّيَّتِهٖ শব্দ রয়েছে। এর অর্থ হবেঃ আমি তার সন্তানদেরকেও সুপথ দেখিয়েছি। অর্থাৎ দাউদ (আঃ) ও সুলাইমান (আঃ)-কেও হিদায়াত দান করেছি। কিন্তু যদি ذُرِّيَّتِهٖ -এর সর্বনামটিকে نُوحٌ -এর দিকে ফিরানো হয়, কেননা ওটা نُوحٌ শব্দের নিকটতর, তবে এটা তো একেবারে পরিষ্কার কথা, এতে কোন জটিলতা নেই। ইবনে জারীরও (রঃ) এটাই গ্রহণ করেছেন। কিন্তু যদি সর্বনামটিকে اِبْرٰهِيْمَ শব্দের দিকে ফিরানো হয়, কেননা বাকরীতি এরূপই বটে, তবে তো খুবই ভাল কথা। কিন্তু এতে একটু জটিলতা

এই রয়েছে যে, হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর সন্তানদের ক্রমপরম্পরায় 'লূত' শব্দটিও এসে গেছে। অথচ হযরত লূত (আঃ) হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর সন্তানদের অন্তর্ভুক্ত নন। বরং তিনি হচ্ছেন তাঁর ভাই হারূন ইবনে আযরের ছেলে। তবে এতে বিস্ময়ের কিছুই নেই যে, হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর সন্তানদের সংখ্যাধিক্যের কারণেই হয়তো হযরত লূত (আঃ)-কেও তাঁর সন্তানদের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়া হয়েছে। যেমন আল্লাহর নিম্নের উক্তিতেও রয়েছেঃ

أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلٰهَكَ وَإِلٰهَ آبَائِكَ إِبْرٰهِيمَ وَإِسْمٰعِيلَ وَإِسْحٰقَ إِلٰهًا وَّاحِدًا وَّنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (২ঃ ১৩৩)

এখানে ইয়াকূব (আঃ)-এর পূর্বপুরুষদের ক্রমপরম্পরায় হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর নামও চলে এসেছে, অথচ হযরত ইসমাঈল (আঃ) তো তাঁর চাচা ছিলেন। এটাও আধিক্য হিসাবেই হয়েছে। অনুরূপভাবে নিম্নের আয়াতেও রয়েছেঃ

فَسَجَدَ الْمَلٰئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ - إِلَّا إِبْلِيسَ (৩৮ঃ ৭৩-৭৪) এখানে ইবলীসকে ফেরেশতাদের মধ্যে শামিল করা হয়েছে। কেননা, ফেরেশতাদের সাথে তার সাদৃশ্য ছিল। প্রকৃতপক্ষে সে ফেরেশতা ছিল না। বরং সে ছিল জ্বিন, তার প্রকৃতি হচ্ছে আগুন এবং ফেরেশতাদের প্রকৃতি হচ্ছে আলো। তা ছাড়া এই কারণেও যে, হযরত ঈসা (আঃ)-কে হযরত ইবরাহীম (আঃ) বা হযরত নূহ (আঃ)-এর সন্তানদের ক্রমপরম্পরায় আনা হয়েছে। তাকেও যেন ইবরাহীম (আঃ)-এরই বংশধর বলা হয়েছে। এরূপ করা হয়েছে এই দলীলের উপর ভিত্তি করেই যে, কন্যার সন্তানদেরকেও তার পিতার বংশধর মনে করা হয়। এখন যদি হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর সঙ্গে হযরত ঈসা (আঃ)-এর কোন সম্পর্ক থাকে তা শুধু এর উপর ভিত্তি করেই যে, তাঁর মা মারইয়াম (আঃ) হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর বংশধর ছিলেন। নতুবা হযরত ঈসা (আঃ)-এর তো পিতাই ছিল না।

বর্ণিত আছে যে, হাজ্জাজ ইয়াহইয়া ইবনে ইয়াসারকে বলেনঃ "আমার নিকট সংবাদ পৌঁছেছে যে, আপনি নাকি হযরত হাসান (রাঃ) ও হযরত হুসাইন (রাঃ)-কে নবী (সঃ)-এর সন্তানদের অন্তর্ভুক্ত বলে থাকেন? অথচ তারা তো হযরত আলী (রাঃ) ও আবূ তালীবের বংশধর, আবার এও নাকি দাবী করেন যে, কুরআন কারীম দ্বারাই এটা প্রমাণিত? আমি তো কুরআন কারীম প্রথম থেকে

শেষ পর্যন্ত পাঠ করেছি, কিন্তু কোন জায়গাতেই এটা পাইনি তো!” তখন ইবনে ইয়াসার তাঁকে বলেনঃ “আপনি কি সূরায়ে আন'আমের (وَ مِنۡ ذُرِّیَّتِهٖ دَاوٗدَ وَ سُلَیۡمٰنَ এবং یَحۡیٰی وَ عِیۡسٰی পর্যন্ত পড়েন) -এই আয়াতগুলো পাঠ করেননি?” হাজ্জাজ উত্তরে বলেনঃ “হ্যাঁ, পড়েছি তো।” তিনি তখন বলেনঃ “এখানে হযরত ঈসা (আঃ)-কে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর সন্তানদের অন্তর্ভুক্ত বলা হয়েছে, অথচ তাঁর তো পিতাই ছিল না। শুধুমাত্র কন্যার সম্পর্কের কারণেই তাঁকে সন্তান ধরা হয়েছে। তাহলে কন্যার সম্পর্কের কারণে হযরত হাসান (রাঃ) ও হযরত হুসাইন (রাঃ)-কে নবীর সন্তান বলা হবে না কেন?” হাজ্জাজ তখন বলেনঃ “আপনি ঠিক কথাই বলেছেন।”

এ কারণেই যখন কোন লোক স্বীয় মীরাস নিজের সন্তানের নামে অসিয়ত করে কিংবা ওয়াকফ বা হিবা করে, তখন ঐ সন্তানদের মধ্যে কন্যার সন্তানদেরও ধরে নেয়া হয়। কিন্তু যখন সে পুত্রদের নামে অসিয়ত বা ওয়াক্ফ করে তখন নির্দিষ্টভাবে ঔরষজাত পুত্র বা পুত্রের পুত্ররাই হকদার হয়ে থাকে। অন্যান্যরা বলে থাকেন যে, এতে কন্যার সন্তানেরাও শামিল থাকবে। কেননা, সহীহ বুখারীতে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত হাসান (রাঃ) সম্পর্কে বলেছিলেনঃ “নিশ্চয়ই আমার এই পুত্র সাইয়েদ বা নেতা এবং আল্লাহ এর মাধ্যমে মুসলমানদের দু'টি বড় দলের মধ্যে সন্ধি করিয়ে দিবেন এবং যুদ্ধের ফিৎনা প্রশমিত করবেন।” এখানে রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত হাসান (রাঃ)-কে পুত্র বলেছেন, যা এটাই প্রমাণ করে যে, তাঁকে তাঁর পুত্ররূপে গণ্য করা যেতে পারে। وَ مِنۡ اٰبَآئِهِمۡ وَ ذُرِّیّٰتِهِمۡ وَ اِخۡوَانِهِمۡ আল্লাহ তা'আলার এই উক্তির মধ্যে ‘নসল’ ও ‘নসব’ এই দু'টিরই উল্লেখ রয়েছে এবং হিদায়াত ও মনোনয়ন সবারই উপর প্রযোজ্য হয়েছে। এ জন্যেই মহান আল্লাহ বলেনঃ

وَ اجۡتَبَیۡنٰهُمۡ وَ هَدَیۡنٰهُمۡ اِلٰی صِرَاطٍ مُّسۡتَقِیۡمٍ

অর্থাৎ “আমি তাদেরকে মনোনীত করেছি এবং সরল সোজা পথে পরিচালিত করেছি।”

ذٰلِكَ هُدَی اللّٰهِ یَهۡدِیۡ بِهٖ مَنۡ یَّشَآءُ مِنۡ عِبَادِهٖ অর্থাৎ এটাই আল্লাহর হিদায়াত; তিনি স্বীয় বান্দাদের মধ্যে যাকে চান এই পথে পরিচালিত করেন।

وَ لَوۡ اَشۡرَكُوۡا لَحَبِطَ عَنۡهُمۡ مَّا كَانُوۡا یَعۡمَلُوۡنَ অর্থাৎ যদি তারা শিরক করতো তবে তারা যা কিছুই করতো, সবই পণ্ড হয়ে যেতো। এখানে এটা বলাই উদ্দেশ্য যে,

শিরকটা কতই কঠিন ব্যাপার এবং এর পরিণাম কতই না জঘন্য। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وَلَقَدْ اُوْحِيَ اِلَيْكَ وَ اِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ

অর্থাৎ "হে নবী (সঃ)! আমি তোমার কাছে ও তোমার পূর্ববর্তী নবীদের কাছে এই অহী করেছি যে, যদি তুমি শিরক কর তবে অবশ্যই তোমার আমল পণ্ড হয়ে যাবে।" (৩৯ঃ ৬৫) এই বাক্যটি শর্তের স্থানে রয়েছে, আর শর্তের জন্যে এটা জরুরী নয় যে, ওটা সংঘটিত হবেই। যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ قُلْ اِنْ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ وَلَدٌ فَاَنَا اَوَّلُ الْعٰبِدِيْنَ অর্থাৎ "হে নবী (সঃ)! তুমি বলে দাও– যদি রহমানের অর্থাৎ আল্লাহর সন্তান হয় তবে আমি প্রথম উপাসনাকারী হয়ে যাবো।" (৪৩ঃ ৮১) আল্লাহ তা'আলা আরও বলেনঃ

لَوْ اَرَدْنَا اَنْ نَّتَّخِذَ لَهْوًا لَّاتَّخَذْنٰهُ مِنْ لَّدُنَّا ....

অর্থাৎ "যদি আমি খেল-তামাসা বানাতে চাইতাম তবে নিজের নিকট থেকেই বানিয়ে নিতাম।" (২১ঃ ১৭) আর এক জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

لَوْ اَرَادَ اللّٰهُ اَنْ يَّتَّخِذَ وَلَدًا لَّاصْطَفٰى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحٰنَهٗ هُوَ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ-

অর্থাৎ "যদি আল্লাহ সন্তান বানিয়ে নেয়ার ইচ্ছা করতেন তবে স্বীয় মাখলূকের মধ্য হতে যাকে ইচ্ছা মনোনীত করে নিতেন, কিন্তু এর থেকে তিনি সম্পূর্ণরূপে পবিত্র এবং তিনি এক ও মহাপরাক্রমশালী।" (৩৯ঃ ৪)

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ وَ الْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ এরা সেই লোক যাদেরকে আমি কিতাব, শাসনভার ও নবুওয়াত দান করেছি। আর এদের কারণেই আমি আমার বান্দাদেরকে নিয়ামত ও দ্বীনের অধিকারী করেছি। সুতরাং যদি এই লোকেরা অর্থাৎ মক্কাবাসী [১] নবুওয়াতকে অস্বীকার করে তবে আমি তাদের স্থলে এমন লোকদেরকে নিয়োগ করবো যারা ওটা অস্বীকার করবে না, বরং তারা আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। এখন ঐ অস্বীকারকারীরা কুরায়েশই হোক বা অন্যেরাই হোক, আরবী হোক বা আজমীই হোক অথবা আহলে কিতাবই হোক, ওদের স্থলে অন্য জাতিকে অর্থাৎ মুহাজির ও আনসারদেরকে নিয়োগ করবো। তারা আমার কোন কথাকেই অস্বীকার করে না এবং প্রত্যাখ্যানও করে না। বরং তারা কুরআন কারীমের সমস্ত আয়াতের উপরই বিশ্বাস রাখে। আয়াতগুলো স্পষ্ট মর্ম বিশিষ্টই হোক অথবা অস্পষ্ট মর্ম বিশিষ্ট হোক।

১. এটা ইবনে আব্বাস (রাঃ), যহ্হাক (রঃ), কাতাদা (রঃ) প্রমুখ মনীষীদের উক্তি।

এখন আল্লাহ পাক স্বীয় রাসূল (সঃ)-কে সম্বোধন করে বলছেনঃ "উল্লিখিত নবীরা এবং তাদের বাপ-দাদা, সন্তান-সন্ততি ও ভাই বেরাদর এমনই লোক, যাদেরকে আল্লাহ সুপথ প্রদর্শন করেছিলেন, সুতরাং তুমি তাদের অনুসরণ কর।"

রাসূল (সঃ)-এর জন্যে যখন এই আদেশ, তখন তাঁর উম্মত তো তাঁরই অনুসারী, সুতরাং তাদের উপরও যে এই আদেশই প্রযোজ্য এটা বলাই বাহুল্য।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে প্রশ্ন করা হয়েছিল- সূরায়ে صٓ এ কি সিজদা রয়েছে? তিনি উত্তরে বললেনঃ "হ্যাঁ।" অতঃপর তিনি وَوَهَبْنَا لَهٗۤ اِسْحٰقَ وَ يَعْقُوْبَ হতে فَبِهُدٰىهُمُ اقْتَدِهْ পর্যন্ত আয়াতগুলো পাঠ করে বলেনঃ তিনি তাঁদেরই অন্তর্ভুক্ত। ইয়াযিদ ইবনে হারূন, মুহাম্মাদ ইবনে উবাইদ ও সুহাইল ইবনে ইউসুফ আওয়াম হতে, তিনি মুজাহিদ হতে নিম্নের কথাটুকু বেশী বর্ণনা করেনঃ

মুজাহিদ বলেনঃ আমি ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন- "তোমাদের নবী (সঃ) তাঁদেরই অন্তর্ভুক্ত যাঁদেরকে তাঁদের অনুসরণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।"

قُلْ لَّاۤ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا হে নবী (সঃ)! তুমি লোকদেরকে বলে দাও-আমি তোমাদের কাছে এই কুরআন প্রচারের বিনিময়ে কোন কিছুই যাঞ্চা করি না।

اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٰى لِلْعٰلَمِيْنَ এটা তো হচ্ছে সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্যে উপদেশের ভাণ্ডার, যেন তারা এর মাধ্যমে গুমরাহী থেকে হিদায়াতের দিকে আসতে পারে এবং কুফরী ছেড়ে ঈমান আনয়ন করতে পারে।

৯১। এই লোকেরা আল্লাহ তা'আলার যথাযথ মর্যাদা উপলব্ধি করেনি। কেননা, তারা বললো—আল্লাহ কোন মানুষের উপর কোন কিছু অবতীর্ণ করেননি; (হে নবী সঃ) তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর— মানুষের হিদায়াত ও আলোক বর্তিকারূপে যে কিতাব মূসা (আঃ) এনেছিল, তা কে অবতীর্ণ করেছেন? তোমরা সেই কিতাব খণ্ড খণ্ড করে

٩١- وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖۤ اِذْ قَالُوْا مَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰى بَشَرٍ مِّنْ شَيْءٍ قُلْ مَنْ اَنْزَلَ الْكِتٰبَ الَّذِيْ جَآءَ بِهٖ مُوْسٰى نُوْرًا وَّهُدًى لِّلنَّاسِ تَجْعَلُوْنَهٗ

قَرَاطِيْسَ تُبْدُوْنَهَا وَ تُخْفُوْنَ كَثِيْرًا وَ عُلِّمْتُمْ مَّا لَمْ تَعْلَمُوْٓا اَنْتُمْ وَ لَآ اٰبَآؤُكُمْ قُلِ اللّٰهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِيْ خَوْضِهِمْ يَلْعَبُوْنَ ○

বিভিন্ন পত্রে রেখেছো , ওর কিয়দাংশ তোমরা প্রকাশ করছো, এবং বহুলাংশ গোপন রাখছো, (ঐ কিতাব দ্বারা) তোমাদেরকে বহু বিষয়ে অবহিত করা হয়েছে, যা তোমরা ও তোমাদের পূর্বপুরুষরা জানতে না; তুমি বলে দাও –তা আল্লাহই অবতীর্ণ করেছেন। সুতরাং তুমি তাদেরকে তাদের বাতিল ধারণার উপর ছেড়ে দাও, তারা খেলা করতে থাকুক।

৯২– وَ هٰذَا كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ مُبٰرَكٌ مُّصَدِّقُ الَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَ لِتُنْذِرَ اُمَّ الْقُرٰى وَ مَنْ حَوْلَهَا وَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَ هُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ ○

৯২। আর এই কিতাবও (কুরআন) আমিই অবতীর্ণ করেছি; যা খুব বরকতময় কিতাব এবং পূর্বের সকল কিতাবকে সত্যায়িত করে থাকে, যেন তুমি কেন্দ্রীয় মক্কা নগরী এবং ওর চতুষ্পার্শ্বস্থ জনপদের লোকদেরকে ওর দ্বারা ভীতি প্রদর্শন কর, যারা পরকালে বিশ্বাস রাখে তারা এই কিতাবকেও বিশ্বাস করবে এবং ওর প্রতি ঈমান আনবে, আর তারা নিয়মিতভাবে নামাযও আদায় করে থাকে।

আল্লাহ পাক বলেন–তারা যখন আল্লাহর রাসূল (সঃ)-কে অবিশ্বাস করলো তখন বুঝা গেল যে, তারা আল্লাহ তা'আলার মর্যাদার হক আদায় করলো না। আবদুল্লাহ ইবনে কাসীর (রঃ) বলেন যে, এই আয়াতটি কুরায়েশদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। আবার একথাও বলা হয়েছে যে, এটা ইয়াহূদীদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। অথবা এটা অবতীর্ণ হয় মালিক ইবনে সায়েফের ব্যাপারে। এই নির্বোধদের

উক্তি এই যে, আল্লাহ তা'আলা কোন মানুষের উপর কিতাব অবতীর্ণ করেননি। শানে নুযূল হিসেবে প্রথম উক্তিটিই সঠিকতম। কেননা, এ আয়াতটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়। আর ইয়াহূদীরা তো এ কথা বলতো না যে, মানুষের উপর কোন কিতাব অবতীর্ণ হয়নি। কেননা, তারা তো এটা স্বীকার করে যে, তাওরাত হযরত মূসা (আঃ)-এর উপর অবতীর্ণ হয়েছিল। মক্কার অধিবাসী কুরায়েশ ও আরবরাই মুহাম্মাদ (সঃ)-কে অস্বীকার করতো। তাদের দলীল ছিল এই যে, মুহাম্মাদ (সঃ) একজন মানুষ এবং মানুষের উপর কিতাব অবতীর্ণ হয় না। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

اَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا اَنْ اَوْحَيْنَاۤ اِلٰى رَجُلٍ مِّنْهُمْ اَنْ اَنْذِرِ النَّاسَ

অর্থাৎ "আমি মানুষের মধ্য হতে কারও উপর অহী পাঠাই– তুমি তাদেরকে (কুফরী থেকে) ভয় প্রদর্শন কর, এতে কি মানুষেরা বিস্ময় বোধ করে?" (১০ঃ২) আরও ইরশাদ হচ্ছে–

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ اَنْ يُّؤْمِنُوْۤا اِذْ جَآءَهُمُ الْهُدٰى ....

অর্থাৎ "যখন তাদের কাছে হিদায়াত পৌঁছে তখন যে জিনিস তাদেরকে ঈমান আনয়নে বাধা দেয় তা হচ্ছে এই যে, তাদের কথা ছিল– আল্লাহ কি কোন মানুষকে রাসূল করে পাঠিয়েছেন? হে নবী (সঃ)! তুমি তাদেরকে বল, ফেরেশতারা যদি ভূ-পৃষ্ঠে চলাফেরা করার প্রাণী হতো তবে কোন ফেরেশতাকেই আমি রাসূল করে পাঠাতাম।" (১৮ঃ ৫৫) এখন আল্লাহ পাক এখানে বলেনঃ আল্লাহর যেরূপ মর্যাদা দেয়া উচিত তা তারা দেয়নি। অর্থাৎ তারা বলে দিলো যে, আল্লাহ কোন মানুষের উপর কিছু অবতীর্ণ করেননি। হে নবী (সঃ)! তুমি তাদেরকে বলে দাও– আল্লাহ মূসা (আঃ)-এর উপর কিতাব অবতীর্ণ করেছিলেন। যে কিতাব লোকদের উপর নূর ও হিদায়াত রূপে প্রমাণিত হয়েছে। হযরত মূসা (আঃ) কর্তৃক পেশকৃত কিতাব 'তাওরাত' কার দ্বারা অবতীর্ণ করা হয়েছে? তোমরা এবং সবাই একথা অবগত যে, মূসা ইবনে ইমরান (আঃ)-এর কিতাব আল্লাহ কর্তৃকই অবতারিত ছিল। যদ্দ্বারা মানুষ হিদায়াতের আলো লাভ করতো এবং সন্দেহের অন্ধকারে সোজা সরল পথ খুঁজে পেতো।

মহান আল্লাহ বলেন, তোমরা তাওরাতকে খণ্ড খণ্ড করে বিভিন্ন পত্রে রেখেছো, কিন্তু তাতে লিখতে গিয়ে নিজেদের পক্ষ থেকে পরিবর্ধনও করতে রয়েছো। আর বলতে রয়েছো, এটাও আল্লাহরই আয়াত। এজন্যে আল্লাহ পাক বলেন, কিছু কিছু প্রকৃত আয়াত প্রকাশ করছো বটে, কিন্তু অধিকাংশ আয়াতকেই তোমরা গোপন করছো।

আল্লাহ তা'আলার উক্তি– এই কিতাবের মাধ্যমে তোমরা এমন কিছু জেনেছো যা তোমরাও জানতে না এবং তোমাদের পূর্বপুরুষরা। অর্থাৎ হে কুরায়েশের দল! কে এই কুরআন অবতীর্ণ করেছেন, যাতে অতীতের সংবাদ রয়েছে এবং ভবিষ্যত বাণীও বিদ্যমান আছে? যেগুলো না তোমরা জানতে, না তোমাদের বাপ-দাদারা জানত। কাতাদা (রঃ) বলেন যে, এই সম্বোধন আরবের মুশরিকদেরকে করা হয়েছে। আর মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, এই সম্বোধন মুসলমানদেরকেই করা হয়েছে। যখন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ এই প্রশ্নের উত্তর তুমি নিজেই প্রদান কর যে, এই কুরআন আল্লাহই অবতীর্ণ করেছেন। এটা হচ্ছে ওটাই যা হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন এবং এই শব্দের তাফসীরে এটাই নির্দিষ্ট। তাফসীর এই রূপ নয় যা পরবর্তী গুরুজনরা বলেছেন। তা এই যে, قُلِ اللّٰهُ -এর অর্থ হচ্ছে– হে মুহাম্মাদ (সঃ)! তাদের প্রতি তোমার সম্বোধন এটা ছাড়া নয় যে, এই শব্দ শুধু একক শব্দ, অর্থাৎ শব্দটি হচ্ছে 'আল্লাহ'। এতে এটা অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়বে যে, একটা একক শব্দ বাক্যও হতে পারে যা غَيْرِ مُرَكَّبٍ বা অমিশ্রিত শব্দ। কিন্তু একক শব্দকে আরবী অভিধানে غَيْرِ مُفِيْد মনে করা হয় এবং ওর উপর سَكُوْت বা নীরবতা চলতে পারে না।

আল্লাহ পাকের উক্তি– হে নবী (সঃ)! তুমি তাদেরকে বাতিল ধারণার উপর ছেড়ে দাও, তারা খেলা করতে থাকুক। অবশেষে মৃত্যুর পর তাদের বিশ্বাসের চক্ষু খুলে যাবে এবং পরিশেষে তারা আল্লাহ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করবে।

মহান আল্লাহর উক্তি– এই কুরআন হচ্ছে অত্যন্ত বরকতময় এবং এই কিতাব পূর্ববর্তী সমস্ত কিতাবকে সত্যায়িত করে থাকে। এ কিতাব তিনি এই জন্যেই অবতীর্ণ করেছেন যেন তুমি এর মাধ্যমে মক্কা ও তার চতুষ্পার্শ্বে বসবাসকারী আরব গোত্রগুলোকে এবং আরব ও আজমের আদম সন্তানদেরকে কুফর ও শিরকের ভয়াবহ পরিনাম থেকে ভীতি প্রদর্শন করতে পার। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে–

قُلْ يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا .....

অর্থাৎ "হে রাসূল (সঃ)! তুমি বলে দাও– হে লোক সকল! নিশ্চয়ই আমি তোমাদের সকলের প্রতি রাসূল রূপে প্রেরিত হয়েছি, যেন আমি তোমাদেরকে সতর্ক করি এবং তাদেরকেও, যাদের কাছে আমার পয়গাম পৌঁছে যাবে।" (৭ঃ১৫৮) মহান আল্লাহ আরও বলেনঃ

وَ مَنْ يَّكْفُرْ بِهٖ مِنَ الْاَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهٗ

অর্থাৎ "দলসমূহের মধ্য থেকে যারা এর সাথে কুফরী করবে, তাদের জন্যে জাহান্নামের অঙ্গীকার রয়েছে।"(১১ঃ ১৭) আল্লাহ তা'আলা আর এক জায়গায় বলেনঃ

تَبٰرَكَ الَّذِىْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهٖ لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرًا -

অর্থাৎ "ঐ সত্তা কল্যাণময় যিনি স্বীয় বান্দার উপর (মুহাম্মাদ সঃ -এর উপর) ফুরকান (কুরআন) অবতীর্ণ করেছেন, যেন সে সারা বিশ্ববাসীর জন্যে ভয় প্রদর্শক হয়ে যায়।" (২৫ঃ ১) আল্লাহ পাক আর এক জায়গায় বলেনঃ

وَقُلْ لِّلَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ وَ الْاُمِّيّٖنَ ءَاَسْلَمْتُمْ فَاِنْ اَسْلَمُوْا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَ اِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلٰغُ وَ اللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِالْعِبَادِ -

অর্থাৎ "হে নবী (সঃ)! তুমি আহলে কিতাব ও মূর্খদেরকে (মুশরিকদেরকে) বলে দাও– তোমরা কি ইসলাম গ্রহণ করলে? যদি তারা ইসলাম গ্রহণ করে তবে সুপথ লাভ করবে, আর যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে (তুমি সে জন্যে দায়ী নও) তোমার দায়িত্ব শুধু পৌঁছিয়ে দেয়া। আল্লাহ স্বীয় বান্দাদের সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল।" (৩ঃ ২০) সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "আমাকে এমন পাঁচটি জিনিস দেয়া হয়েছে যেগুলো আমার পূর্ববর্তী নবীদের কাউকেই দেয়া হয়নি। ওগুলোর মধ্যে একটি এই যে, প্রত্যেক নবী নির্দিষ্টভাবে নিজের কওমের নিকটেই প্রেরিত হয়েছিলেন, আর আমি সারা বিশ্ববাসীর কাছেই প্রেরিত হয়েছি।" এজন্যেই আল্লাহ পাক বলেনঃ

وَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ

অর্থাৎ "যারা আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন করে তারা এই কিতাবের (কুরআনের) উপরও বিশ্বাস রাখে যা আমি (হে মুহাম্মাদ সঃ) তোমার উপর অবতীর্ণ করেছি।" মহান আল্লাহ বলেনঃ

وَ هُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ

অর্থাৎ "তারা এমনই মুমিন যে, তারা স্বীয় নামাযসমূহের পাবন্দী করে।" অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যেমনভাবে সময়মত নামায আদায় করা তাদের উপর ফরয করে দিয়েছেন তারা সেভাবেই নামায আদায় করে থাকে।

৯৩। আর ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক অত্যাচারী কে হতে পারে যে আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছে? অথবা এরূপ বলে– আমার উপর অহী নাযিল করা হয়েছে, অথচ তার উপর প্রকৃতপক্ষে কোন অহীই নাযিল করা হয়নি এবং যে ব্যক্তি এরূপ বলে– যেরূপ কালাম আল্লাহ নাযিল করেছেন তদ্রূপ আমিও আনয়ন করছি; আর তুমি যদি দেখতে পেতে (ঐ সময়ের অবস্থা) যে সময় যালিমরা হবে মৃত্যু সংকটে (পরিবেষ্টিত); আর ফেরেশ্‌তারা হাত বাড়িয়ে বলবে–নিজেদের প্রাণগুলো বের কর, আজ তোমাদেরকে সেই সব অপরাধের শাস্তি হিসেবে লাঞ্ছনাময় শাস্তি দেয়া হবে যে, তোমরা আল্লাহ্‌র উপর মিথ্যা দোষারোপ করে অকারণ প্রলাপ বকছিলে এবং তাঁর আয়াতসমূহ কবূল করা হতে অহংকার করছিলে।

٩٣- وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ قَالَ اُوْحِيَ اِلَيَّ وَلَمْ يُوْحَ اِلَيْهِ شَيْءٌ وَّمَنْ قَالَ سَاُنْزِلُ مِثْلَ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ ؕ وَلَوْ تَرٰٓى اِذِ الظّٰلِمُوْنَ فِيْ غَمَرٰتِ الْمَوْتِ وَالْمَلٰٓئِكَةُ بَاسِطُوْٓا اَيْدِيْهِمْ ۚ اَخْرِجُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ؕ اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُوْنِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ اٰيٰتِهٖ تَسْتَكْبِرُوْنَ ○

৯৪। আর তোমরা আমার কাছে এককভাবে এসেছো, যেভাবে প্রথমবারে আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছিলাম, আর যা কিছু আমি তোমাদেরকে দিয়েছিলাম তা তোমরা নিজেদের পশ্চাতেই

٩٤- وَلَقَدْ جِئْتُمُوْنَا فُرَادٰى كَمَا خَلَقْنٰكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّتَرَكْتُمْ مَّا

خَوَّلْنٰكُمْ وَرَآءَ ظُهُوْرِكُمْ وَمَا نَرٰى مَعَكُمْ شُفَعَآءَكُمُ الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ اَنَّهُمْ فِيْكُمْ شُرَكٰٓؤُا لَقَدْ تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَّا كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ ۝ (৯৪)

ছেড়ে এসেছো, আর আমি তো তোমাদের সাথে তোমাদের সেই সুপারিশকারীদেরকে দেখছি না যাদের সম্বন্ধে তোমরা দাবী করতে যে, তারা তোমাদের কাজেকর্মে (আমার) শরীক; বাস্তবিকই তোমাদের পরস্পরের সম্পর্ক তো বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, আর তোমরা যা কিছু ধারণা করতে তা সবই আজ তোমাদের নিকট থেকে উধাও হয়ে গেছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপকারীদের চেয়ে বড় অত্যাচারী আর কে আছে? সে তাঁর শরীক স্থাপন করছে বা বলছে যে, তাঁর সন্তান রয়েছে, কিংবা দাবী করছে যে, আল্লাহ তাকে রাসূল করে পাঠিয়েছেন, অথচ তাকে পাঠানো হয়নি। এ জন্যেই আল্লাহ পাক বলেন, সে বলছে যে, তার কাছেও অহী পাঠানো হয়েছে, অথচ তার কাছে তা পাঠানো হয়নি। ইকরামা ও কাতাদা বলেন যে, এই আয়াতটি মুসাইলামা কায্যাবের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়।

আর তার চেয়ে বড় যালিম আর কে আছে যে বলে, আল্লাহ যেমন কুরআন অবতীর্ণ করেছেন আমিও তদ্রূপ অবতীর্ণ করতে পারি। অর্থাৎ সে দাবী করছে যে, আল্লাহর মত অহী সেও অবতীর্ণ করতে পারে।[১] যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ

وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا قَالُوْا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَآءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هٰذَا ....

অর্থাৎ "যখন তাদের কাছে আমার আয়াতসমূহ পাঠ করা হয় তখন তারা বলে– আমরা শুনলাম এবং ইচ্ছা করলে আমরাও এরূপ বলতে পারি।" (৮:৩১)

১. লুবাব গ্রন্থে রয়েছে– ইবনে জারীর হতে তাখরীজ করা হয়েছে যে, وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ قَالَ اُوْحِيَ اِلَيَّ وَلَمْ يُوْحَ اِلَيْهِ شَيْءٌ -এই আয়াতটি মুসাইলামার ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। আর وَمَنْ قَالَ سَاُنْزِلُ مِثْلَ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ -এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয় আব্দুল্লাহ ইবনে সা'দের ব্যাপারে। সুদ্দী (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, আব্দুল্লাহ ইবনে সা'দ বলতো– যদি মুহাম্মাদ (সঃ)-এর কাছে অহী করা হয়ে থাকে তবে আমার কাছেও অহী করা হয়ে থাকে। আর যদি আল্লাহ তাঁর কাছে (কুরআন) অবতীর্ণ করে থাকেন তবে আমিও তদ্রূপ অবতীর্ণ করতে পারি। মুহাম্মাদ (সঃ) বলেনঃ سَمِيْعًا عَلِيْمًا আর আমি عَلِيْمًا حَكِيْمًا বলি।

وَلَوْ تَرٰى اِذِ الظّٰلِمُوْنَ فِىْ غَمَرٰتِ الْمَوْتِ অর্থাৎ হে নবী (সঃ)! যদি তুমি ঐ সময়ের অবস্থা দেখতে, যে সময় যালিমেরা মৃত্যু যন্ত্রণায় পরিবেষ্টিত হবে! وَالْمَلٰٓئِكَةُ بَاسِطُوْٓا اَيْدِيْهِمْ অর্থাৎ ফেরেশতারা মারবার জন্যে হাত উঠাবে। যেমন মহান আল্লাহ এক জায়গায় বলেনঃ لَئِنْۢ بَسَطْتَّ اِلَىَّ يَدَكَ অর্থাৎ "(হে কাবীল আমাকে হত্যা করার জন্যে) যদি তুমি আমার দিকে হাত উঠাও।" (৫ঃ ২৮) আর এক জায়গায় তিনি বলেনঃ وَيَبْسُطُوْٓا اِلَيْكُمْ اَيْدِيَهُمْ وَ اَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوْٓءِ অর্থাৎ "(হে নবী সঃ) তারা তোমাকে কষ্ট দেয়ার জন্যে ও ভালমন্দ বলার জন্যে তোমার দিকে হাত ও জিহ্বা প্রসারিত করে।" (৬০ঃ ২) যহ্হাক (রঃ) ও আবূ সালিহ (রঃ) বলেন যে, এখানে ভাবার্থ হচ্ছে শাস্তির জন্যে হাত উঠানো। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وَ لَوْ تَرٰٓى اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِيْنَ كَفَرُوا الْمَلٰٓئِكَةُ يَضْرِبُوْنَ وُجُوْهَهُمْ وَ اَدْبَارَهُمْ

অর্থাৎ "(হে মুহাম্মাদ সঃ)! যদি তুমি দেখতে যখন মৃত্যুমুখী কাফিরদেরকে ফেরেশতারা তাদের চেহারায় ও পিঠে মারতে রয়েছে!" এজন্যেই আল্লাহ পাক বলেনঃ وَ الْمَلٰٓئِكَةُ بَاسِطُوْٓا اَيْدِيْهِمْ অর্থাৎ ঐ ফেরেশতারা তাদের দেহ থেকে প্রাণ বের করার জন্যে তাদের দিকে তাঁদের হস্ত প্রসারিত করবেন। তারা তাদেরকে বলবেন, তোমরা তোমাদের প্রাণগুলো বের করে দাও। যখন কাফিরদের মৃত্যুর সময় নিকটবর্তী হবে তখন ফেরেশতারা তাদেরকে শাস্তি, শৃংখল, জাহান্নাম, গরম পানি এবং আল্লাহর গযবের সংবাদ প্রদান করবেন। তখন তাদের আত্মাগুলো বেরিয়ে আসতে অস্বীকার করবে এবং তাদের দেহের মধ্যে ফিরতে থাকবে। সেই সময় ফেরেশতারা তাদেরকে প্রহার করতে থাকবেন যে পর্যন্ত না তাদের আত্মাগুলো বেরিয়ে আসে। আর তারা বলবেন, নিজেদের প্রাণগুলো বের করে দাও। তোমরা যে আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করতে তারই শাস্তি স্বরূপ আজকে তোমাদেরকে অপমানজনক আযাব প্রদান করা হবে। মুমিন ও কাফিরদের মৃত্যু সম্পর্কীয় বহু হাদীস এসেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "মুমিনদেরকে আল্লাহ পার্থিব জগতে ও পরকালে সঠিক কথার উপর অটল রাখবেন।" ইবনে মিরদুওয়াই (রঃ) এখানে গারীব সনদে একটি সুদীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে বলে কথিত আছে। ইরশাদ হচ্ছে−

وَلَقَدْ جِئْتُمُوْنَا فُرَادٰى كَمَا خَلَقْنٰكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ

অর্থাৎ “তোমরা আমার কাছে এককভাবে এসেছো, যেভাবে আমি প্রথমবার তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছিলাম।” একথা তাদেরকে কিয়ামতের দিন বলা হবে। যেমন আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেনঃ

وَ عُرِضُوْا عَلٰى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُوْنَا كَمَا خَلَقْنٰكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ

অর্থাৎ “(হে নবী সঃ)! তাদেরকে তোমার প্রভুর সামনে সারিবদ্ধভাবে পেশ করা হবে, (তাদেরকে আল্লাহ বলবেন) তোমরা আমার কাছে এককভাবে এসেছো, যেভাবে আমি তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম। আর তোমরা এটা অস্বীকার করতে এবং এই কিয়ামতের দিনকে বহু দূরের ব্যাপার মনে করতে। এটাই হচ্ছে পুনরুত্থানের দিন।” (১৮ঃ ৪৮) তিনি আরও বলেনঃ

وَ تَرَكْتُمْ مَّا خَوَّلْنٰكُمْ وَرَآءَ ظُهُوْرِكُمْ

অর্থাৎ “আমি তোমাদেরকে দুনিয়ায় যে নিয়ামত ও মালধন দান করেছিলাম তা তোমরা শুধু জমা করেই রেখেছিলে, ওগুলো দুনিয়ায় তোমাদের পিছনে ছেড়ে এসেছো।” সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “ইবনে আদম (আদম সন্তান) বলে– আমার মাল, আমার মাল। অথচ তোমার মাল তো এতটুকুই যা তুমি খেয়ে শেষ করছো, যা পরিধান করে পুরানা করেছো এবং যা দান-খয়রাত করে বাকী রেখেছো, এ ছাড়া তোমার সমস্ত সম্পদ অন্যের জন্যে। (তুমি রেখে গেলে)।” আল্লাহ পাক আদম সন্তানকে জিজ্ঞেস করবেনঃ ‘তুমি যা জমা করেছিলে তা আজ কোথায়?’ সে উত্তরে বলবেঃ “হে আমার প্রভু! আমি দুনিয়াতে জমা করেছিলাম, বাড়িয়ে ছিলাম এবং তা সেখানেই ছেড়ে এসেছি।” অতঃপর তিনি বলবেনঃ “তোমরা যাদেরকে আমার শরীক মনে করতে তোমাদের সেই সব সুপারিশকারী কোথায়? এখন তারা সুপারিশ করছে না কেন?” এর দ্বারা তাদেরকে ভর্ৎসনা ও তিরস্কার করা হচ্ছে। কেননা, তারা দুনিয়ায় মূর্তির পূজা করতো এবং মনে করতো যে, ওগুলো পার্থিব জীবনে ও পারলৌকিক জীবনে তাদের জন্যে উপকারী হবে। কিন্তু কিয়ামতের দিন সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে। পথভ্রষ্টতা শেষ হয়ে যাবে, মূর্তিগুলোর রাজত্বের অবসান ঘটবে এবং আল্লাহ পাক লোকদেরকে সম্বোধন করে বলবেনঃ “যেসব মূর্তিকে তোমরা আমার শরীক মনে করতে সেগুলো আজ কোথায়?” তাদেরকে আরও বলা হবে– “এখন তোমাদের মিথ্যা মা'বূদগুলো কোথায়? তারা কি এখন

তোমাদের কোন সাহায্য করতে পারবে, বা তোমরাই তাদেরকে কোন সাহায্য করতে পারবে কি?" এজন্যেই তিনি বলেনঃ "আমি তো তোমাদের সাথে তোমাদের সেই সুপারিশকারীদেরকে দেখছি না যাদের সম্বন্ধে তোমরা দাবী করতে যে, তারা তোমাদের কাজেকর্মে আমার শরীক। বাস্তবিকই তোমাদের পরস্পরের সম্পর্ক তো বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে!" বায়নাকুম শব্দটিকে যদি رَفَعْ দিয়ে অর্থাৎ বায়নুকুম পড়া যায় তবে অর্থ হবে– তোমাদের দলগুলো ভেঙ্গে দেয়া হবে। আর যদি نَصَبْ দিয়ে পড়া হয় তবে ভাবার্থ হবে– তোমাদের পরস্পরের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে এবং মূর্তিগুলোর নিকট থেকে তোমরা যা কিছু পাওয়ার আশা করতে সে আশা গুড়ে বালি। যেমন তিনি বলেনঃ "যখন মাতব্বরগণ তাবে'দারগণ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে যাবে এবং সবাই শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে, আর তাদের যে পারস্পরিক সম্পর্ক ছিল তা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। আর এই তাবে'দারগণ বলবে–যদি আমরা একটু (দুনিয়ায়) ফিরে যেতে পারতাম, তবে আমরাও তাদের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক হতাম যেমন (আজ) তারা আমাদের থেকে পরিষ্কারভাবে পৃথক হয়ে পড়েছে। আল্লাহ এরূপই তাদেরকে তাদের কুকর্মগুলো নিষ্ফল আকাংখারূপে দেখিয়ে দিবেন, আর তাদের জাহান্নাম থেকে বের হওয়া কখনও নসীবে ঘটবে না।" মহান আল্লাহ আর এক জায়গায় বলেনঃ "যখন শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে তখন তাদের পারস্পরিক বংশ সম্পর্ক কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না এবং তারা একে অপরের সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদও করবে না।" তিনি অন্য জায়গায় বলেনঃ "তোমরা দুনিয়ায় যে তাদের পূজা-অর্চনা করতে তা শুধুমাত্র পার্থিব জীবনে মহব্বত ও ভালবাসার খাতিরে। কিন্তু কিয়ামতের দিন তোমরা একে অপরকে অস্বীকার করে বসবে এবং একে অপরকে তিরস্কার করতে থাকবে, সেদিন তোমাদের আশ্রয়স্থল হবে জাহান্নাম এবং তোমাদের কেউ সাহায্যকারী হবে না।" আর এক স্থানে আল্লাহ পাক বলেনঃ "তাদেরকে বলা হবে–তোমাদের শরীকদেরকে (যাদেরকে তোমরা আল্লাহর সাথে শরীক বানিয়ে নিয়েছিলে তাদেরকে) ডাক, তারা তখন তাদেরকে ডাকতে থাকবে, কিন্তু তারা তাদেরকে কোন উত্তর দেবে না।" কুরআন কারীমে এ সম্পর্কীয় বহু সংখ্যক আয়াত বিদ্যমান রয়েছে।

৯৫। নিশ্চয়ই দানা ও বীজ দানকারী হচ্ছেন আল্লাহ, তিনিই জীবন্তকে প্রাণহীন থেকে বের করেন এবং তিনিই	٩٥- إِنَّ اللّٰهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَ النَّوٰى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ

الْمَيِّتِ وَ مُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ ○

প্রাণহীনকে নির্গতকারী জীবন্ত হতে, তিনিই তো আল্লাহ, তাহলে তোমরা উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে (লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে) কোথায় যাচ্ছো?

٩٦- فَالِقُ الْاِصْبَاحِ ۚ وَ جَعَلَ الَّيْلَ سَكَنًا وَّالشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ حُسْبَانًا ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ○

৯৬। তিনিই রাত্রির আবরণ বিদীর্ণ করে রঙ্গীন প্রভাতের উন্মেষকারী, তিনিই রজনীকে বিশ্রামকাল এবং সূর্য ও চন্দ্রকে সময়ের নিরূপক করে দিয়েছেন; এটা হচ্ছে সেই পরম পরাক্রান্ত ও সর্বপরিজ্ঞাতার (আল্লাহর) নির্ধারণ।

٩٧- وَهُوَ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ النُّجُوْمَ لِتَهْتَدُوْا بِهَا فِىْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ○

৯৭। আর তিনিই তোমাদের জন্যে নক্ষত্ররাজিকে সৃষ্টি করেছেন -যেন তোমরা ওগুলোর সাহায্যে অন্ধকারে পথের সন্ধান পেতে পার, স্থলভাগেও এবং সমুদ্রেও; নিশ্চয়ই আমি প্রমাণসমূহ খুব বিশদভাবে বর্ণনা করে দিয়েছি ঐ সব লোকের জন্যে যারা জ্ঞান রাখে।

আল্লাহ পাক সংবাদ দিচ্ছেন যে, তিনি যমীনের বপনকৃত দানাকে উপরে এনে চৌচির করে দেন এবং তার থেকে বিভিন্ন প্রকারের সব্জি ও বর্ধনশীল উদ্ভিদ পয়দা করেন। ওগুলোর রং পৃথক, আকৃতি এবং ডাঁটা পৃথক। فَالِقُ الْحَبِّ وَ النَّوٰى -এর তাফসীরে বলা হয়েছে যে, তিনি একটা প্রাণহীন জিনিসের মধ্য থেকে একটা প্রাণযুক্ত জিনিস অর্থাৎ উদ্ভিদ সৃষ্টি করে থাকেন এবং জীবন্ত জিনিস থেকে নির্জীব জিনিস পয়দা করেন। যেমন বীজ ও দানা যা হচ্ছে নির্জীব জিনিস, এটা তিনি জীবন্ত উদ্ভিদ থেকে পয়দা করে থাকেন। যেমন তিনি বলেনঃ

وَ اٰيَةٌ لَّهُمُ الْاَرْضُ الْمَيْتَةُ اَحْيَيْنٰهَا وَاَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَاْكُلُوْنَ۔

অর্থাৎ "তাদের জন্যে একটি নিদর্শন হচ্ছে নির্জীব যমীন, আমি ওকে সঞ্জীবিত করেছি এবং তা থেকে শস্য উৎপন্ন করেছি, ফলে তারা তা থেকে আহার করে থাকে।" (৩৬ঃ ৩৩)

مُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ -এটা فَالِقُ الْحَبِّ -এর উপর সংযুক্ত। তারপর এর তাফসীর করা হয়েছে। অতঃপর مُخْرِجُ الْمَيِّتِ -কে এর উপর সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে। এই সবগুলোরই অর্থ প্রায় একই। কেউ কেউ বলেন যে, এর দ্বারা প্রাণহীন ডিম হতে জীবন্ত মুরগী পয়দা করা বুঝানো হয়েছে। কিংবা এর বিপরীত। আবার কেউ কেউ বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে পাপাচারের ঔরষে সৎ সন্তানের জন্মলাভ এবং সৎ ব্যক্তির ঔরষে পাপাচার ছেলের জন্মলাভ। কেননা, সৎ ব্যক্তি জীবিতের সাথে তুলনীয় এবং পাপী লোক মৃতের সাথে তুলনীয়। এ ছাড়া আরও বহু অর্থ হতে পারে।

আল্লাহ পাক বলেনঃ এ সবকিছু আল্লাহই করে থাকেন যিনি হচ্ছেন এক, যাঁর কোন অংশীদার নেই। তাহলে তোমরা বিভ্রান্ত হয়ে কোন্ দিকে যাচ্ছ? সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছ কেন? আল্লাহ ছাড়া তোমাদের অন্য কারও ইবাদত করার কারণ কি? আলো ও অন্ধকারের সৃষ্টিকর্তা তো তিনিই। যেমন তিনি অত্র সূরার শুরুতেই বলেছেনঃ وَجَعَلَ الظُّلُمٰتِ وَالنُّوْرَ অর্থাৎ "তিনিই অন্ধকার ও আলো বানিয়েছেন।" (৬ঃ ১) অর্থাৎ তিনি দিনের আলোকের মধ্য থেকে রাতের অন্ধকারকেও বের করেছেন, আবার তিনি রাতের মধ্য থেকে দিনের আলোকে বের করেছেন যা সারা প্রান্তকে উজ্জ্বলময় করে দিয়েছে। রাত্রি শেষে অন্ধকার দূরীভূত হয় এবং উজ্জ্বল দিন প্রকাশিত হয়। যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ

يُغْشِى الَّيْلَ النَّهَارَ- অর্থাৎ "রাত্রি দিনকে ঢেকে ফেলে।" (৭ঃ ৫৪) এইভাবে মহান আল্লাহ পরস্পর বিপরীতমুখী জিনিসগুলো সৃষ্টি করে স্বীয় ব্যাপক ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। এজন্যেই তিনি বলেন যে, তিনি রাতের মধ্য থেকে দিনকে ফেড়ে বের করে থাকেন। রাতকে তিনি বিশ্রামকাল করেছেন যেন সমুদয় জিনিস ওতে শান্তি ও আরাম লাভ করতে পারে। যেমন তিনি বলেছেনঃ

وَالضُّحٰى - وَالَّيْلِ اِذَا سَجٰى- অর্থাৎ "কসম দিনের আলোকের এবং রাত্রির, যখন তা প্রশান্ত হয়।" (৯৩ঃ ১-২) তিনি আরও বলেছেনঃ

وَالَّيۡلِ اِذَا يَغۡشٰى ـ وَ النَّهَارِ اِذَا تَجَلّٰى অর্থাৎ "শপথ রাত্রির যখন ওটা (সূর্যকে) আচ্ছন্ন করে ফেলে, আর দিবসের যখন ওটা আলোকিত হয়ে পড়ে।" (৯২ঃ১-২) মহান আল্লাহ আর এক জায়গায় বলেছেনঃ

وَالنَّهَارِ اِذَا جَلّٰهَا وَ الَّيۡلِ اِذَا يَغۡشٰهَا

অর্থাৎ "কসম দিবসের যখন ওটা ওকে ভালরূপে আলোকিত করে এবং কসম রাত্রির যখন ওটা ওকে সমাচ্ছন্ন করে।" (৯১ঃ ৩-৪)

হযরত সুহাইব রূমী (রাঃ)-এর স্ত্রী তাঁর অধিক রাত্রি জাগরণের অভিযোগ করে বলেনঃ "আল্লাহ তা'আলা সবারই জন্যে রাত্রিকে বিশ্রামকাল ও আরামের সময় বানিয়েছেন বটে, কিন্তু সুহাইব (রাঃ)-এর জন্যে নয়। কেননা, যখন তাঁর জান্নাতের কথা স্মরণ হয় তখন তিনি ওর আগ্রহাতিশয্যে সারা রাত শয়নই করেন না। বরং সারা রাত্রি ধরে ইবাদতে মগ্ন থাকেন। আবার যখন তাঁর জাহান্নামের কথা স্মরণ হয় তখন তাঁর নিদ্রাই উড়ে যায়।"[১] মহান আল্লাহ বলেনঃ "সূর্য ও চন্দ্র নিজ নিজ রীতিনীতি ও নিয়ম শৃংখলার উপর চলতে রয়েছে। ওদের গতির নিয়মের মধ্যে অণু পরিমাণও পরিবর্তন ঘটে না, ওগুলো এদিক ওদিক চলে যায় না, বরং প্রত্যেকটির কক্ষপথ নির্ধারিত রয়েছে। গ্রীষ্মকালে ও শীতকালে ওরা নিজ নিজ কক্ষপথে চলতে রয়েছে। এই শৃংখলিত নিয়মের ফলেই দিন রাত্রি কমতে ও বাড়তে রয়েছে। যেমন আল্লাহ পাক বলেনঃ "তিনিই সেই আল্লাহ যিনি সূর্যকে দীপ্তিময় বানিয়েছেন এবং চন্দ্রকে কোমল আলো দান করেছেন এবং হ্রাস বৃদ্ধির মনযিল নির্ধারণ করেছেন।" যেমন তিনি বলেনঃ "সূর্যের সাধ্য নেই যে চন্দ্রকে ধরে নিবে, আর না রাত্রি দিবসের পূর্বে আসতে পারবে এবং প্রত্যেকেই এক একটি চক্রের মধ্যে সন্তরণ করতে রয়েছে।" তিনি আরও বলেনঃ "সূর্য, চন্দ্র ও তারকারাজি তাঁর আদেশ পালনে সদা নিয়োজিত রয়েছে।" আল্লাহ পাক আরও বলেছেনঃ "এটা তারই নির্ধারিত পরিমাণ, যিনি মহা পরাক্রান্ত, জ্ঞানময়।" কেউ তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করতে পারে না। কেউই তাঁর অগোচরে থাকতে সক্ষম নয়, সেটা যমীন আসমানের অণু পরিমাণই জিনিস হোক না কেন।

আল্লাহ তা'আলা যেখানেই রাত্রি ও দিন এবং সূর্য ও চন্দ্রের সৃষ্টির কথা বর্ণনা করেছেন সেখানেই তিনি বাক্যকে عَزِيۡزٌ ও عَلِيۡمٌ শব্দ দ্বারাই শেষ করেছেন। যেমন এখানেও ঐ নিয়মের ব্যক্তিক্রম ঘটেনি।

১. এই হাদীসটি ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

মহান আল্লাহ বলেনঃ "তাদের জানবার পক্ষে রাত্রিও একটা নিদর্শন যে, ওর মধ্য থেকে আমি দিনকে অপসারণ করি, তৎক্ষণাৎ তারা অন্ধকারের মধ্যে থেকে যায়। আর সূর্যও স্বীয় গতিপথে চলতে রয়েছে এবং স্বীয় নির্ধারিত কক্ষের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এটা সেই মহা পরাক্রান্ত ও জ্ঞানময়েরই নির্ধারিত পরিমাপ এবং মাপকাঠি।" মহান আল্লাহ حٰمٓ السَّجْدَةُ সূরার প্রথমভাগে যমীন, আসমান এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী বস্তুসমূহের সৃষ্টি সম্পর্কে বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেনঃ

وَ زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ وَ حِفْظًا ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ

অর্থাৎ "আমি এই নিকটবর্তী আসমানকে নক্ষত্ররাজি দ্বারা সুশোভিত করেছি এবং ওকে সুরক্ষিত করেছি, এটা মহাপরাক্রান্ত, মহাজ্ঞানীর নিয়ন্ত্রণ।" (৪১ঃ১২)

আল্লাহ পাকের উক্তিঃ তিনি তোমাদের জন্যে নক্ষত্ররাজি সৃষ্টি করেছেন–যেন তোমরা ওগুলোর সাহায্যে অন্ধকারে পথের সন্ধান পেতে পার, স্থলভাগেও এবং সমুদ্রেও।

আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, এই তারকাগুলো এক তো হচ্ছে আকাশের সৌন্দর্য, দ্বিতীয়তঃ এগুলো দ্বারা শয়তানদেরকে প্রহার করা হয় এবং তৃতীয়তঃ এগুলোর মাধ্যমে স্থলভাগ ও সমুদ্রের অন্ধকারে পথ চেনা যায়। পূর্ববর্তী গুরুজনদের কেউ কেউ বলেছেন যে, তারকারাজি সৃষ্টির মধ্যে শুধুমাত্র তিনটি উদ্দেশ্যই নিহিত রয়েছে। এছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই। যদি কেউ মনে করেন যে, এই তিনটি উদ্দেশ্য ছাড়া আরো উদ্দেশ্য রয়েছে তবে তিনি ভুল বুঝেছেন এবং কুরআনের আয়াতের উপর বাড়াবাড়ি করেছেন। এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ আমি প্রমাণসমূহ খুব বিশদভাবে বর্ণনা করে দিয়েছি, যাতে লোকেরা কিছু জ্ঞান লাভ করতে পারে এবং সত্য ও ন্যায়কে চিনে নিয়ে অসত্য ও অন্যায়কে পরিহার করে।

৯৮। তিনিই তোমাদেরকে এক ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন, অনন্তর (প্রত্যেকের জন্যে) একটি স্থল অধিক দিন থাকবার জন্যে এবং একটি স্থল অল্প দিন থাকবার জন্যে রয়েছে, এই নিদর্শনসমূহ আমি তাদের জন্যে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করলাম যাদের বুদ্ধি বিবেচনা আছে।

৯৮- وَهُوَ الَّذِيْٓ اَنْشَاَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَّ مُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّفْقَهُوْنَ ۝

৯৯। আর তিনি আকাশ হতে পানি বর্ষণ করেছেন, ওর সাহায্যে সব রকমের উদ্ভিদ আমি (আল্লাহ) উৎপন্ন করেছি; অতঃপর তা থেকে সবুজ শাখা বের করেছি, ফলতঃ তা থেকে আমি উপর্যুপরি উত্থিত বীজ উৎপন্ন করে থাকি। আর খেজুর বৃক্ষ থেকে অর্থাৎ ওর পুষ্পকলিকা থেকে ছড়া হয় যা নিম্ন দিকে ঝুঁকে পড়ে, আর আঙ্গুর সমূহের উদ্যান এবং যায়তুন ও আনার যা পরস্পর সাদৃশ্যযুক্ত, প্রত্যেক ফলের প্রতি লক্ষ্য কর যখন ওটা ফলে এবং ওর পরিপক্ক হওয়ার প্রতি লক্ষ্য কর; এই সমুদয়ের মধ্যে নিদর্শনসমূহ রয়েছে তাদেরই জন্যে যারা ঈমান রাখে।

٩٩- وَهُوَ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَخْرَجْنَا بِهٖ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَاَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُّخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَّجَنّٰتٍ مِّنْ اَعْنَابٍ وَّالزَّيْتُوْنَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَّغَيْرَ مُتَشَابِهٍ اُنْظُرُوْٓا اِلٰى ثَمَرِهٖٓ اِذَآ اَثْمَرَ وَيَنْعِهٖ اِنَّ فِيْ ذٰلِكُمْ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ○

আল্লাহ পাক বলেনঃ তিনিই তোমাদেরকে একটা আত্মা হযরত আদম (আঃ) থেকে সৃষ্টি করেছেন। যেমন তিনি বলেনঃ “হে মানবমণ্ডলী! তোমরা স্বীয় প্রতিপালক (এর বিরোধিতা)কে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে একই প্রাণী (আদম আঃ) হতে সৃষ্টি করেছেন এবং ঐ প্রাণী হতে তার জোড়া (বিবি হাওয়াকে) সৃষ্টি করেছেন, আর এতদুভয় হতে বহু নর ও নারী বিস্তার করেছেন।”

فَمُسْتَقَرٌّ وَّمُسْتَوْدَعٌ -এ দু'টি শব্দের ব্যাপারে মুফাসসিরদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ), হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ মনীষীগণ বলেন যে, مُسْتَقَرٌّ শব্দ দ্বারা মায়ের গর্ভকে বুঝানো হয়েছে। আর مُسْتَوْدَعٌ শব্দ দ্বারা পিতার পিঠকে বুঝানো হয়েছে। আবার কারো মতে مُسْتَقَرٌّ হচ্ছে দুনিয়ার অবস্থান এবং مُسْتَوْدَعٌ হচ্ছে মৃত্যুর পর পরকালের অবস্থান।

হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইর (রঃ) বলেন যে, এ দু'টো হচ্ছে দুনিয়ার মাতৃগর্ভে ও ভূ-পৃষ্ঠে অবস্থান এবং মৃত্যুর পরের অবস্থান। হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেন যে, মৃত্যুর পর আমল বন্ধ হয়ে যাওয়া হচ্ছে مُسْتَقَرٌّ এবং দারে আখিরাত হচ্ছে مُسْتَوْدَعٌ। কিন্তু প্রথম উক্তিটিই সঠিকতম।

قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّفْقَهُوْنَ- আমি নিদর্শনসমূহ ঐসব লোকের জন্যে সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করে দিয়েছি যারা বুঝে অর্থাৎ আল্লাহর কালাম ও ওর অর্থ সম্পর্কে যারা সম্যক জ্ঞান রাখে।

মহান আল্লাহ বলেনঃ তিনিই সেই আল্লাহ যিনি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন, ওর সাহায্যে তিনি সব রকমের উদ্ভিদ উৎপন্ন করেছেন। তারপর তা থেকে সবুজ শাখা বের করেছেন অর্থাৎ চারাগাছ পয়দা করেছেন। অতঃপর তাতে তিনি দানা ও ফল সৃষ্টি করেছেন। যেমন তিনি বলেনঃ পানি দ্বারাই সমস্ত জিনিস জীবন লাভ করে থাকে। এর ফলেই ভূমির শস্য ও সবুজ উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়ে থাকে। ঐসব গাছে আবার দানা ও ফল পয়দা হয়। ওগুলোর মধ্য থেকে আমি এমন দানা বের করে থাকি যা একে অপরের সাথে জড়িয়ে থাকে। একে গুচ্ছ বলা হয়। খুরমা গাছে গুচ্ছযুক্ত শাখা হয়। قِنْوَانٌ শব্দটি قِنْوٌ শব্দের বহু বচন। এর অর্থ হচ্ছে তাজা খেজুরের গুচ্ছ যা কাছাকাছি একে অপরের সাথে জড়িত থাকে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ দ্বারা ঐ ছোট ছোট খেজুর গাছ বুঝানো হয়েছে যেগুলোর গুচ্ছ মাটির সাথে লেগে থাকে। হেজাযবাসী তো একে قِنْوَانٌ পড়ে থাকে, কিন্তু বানু তামীম গোত্র একে قِنْيَانٌ অর্থাৎ يَا -এর সঙ্গে পড়ে। এটা قِنْوٌ -এর বহু বচন। যেমন صِنْوَانٌ শব্দটি صِنْوٌ -এর বহু বচন। এরপর আল্লাহ পাক বলেনঃ 'আঙ্গুরের বাগানসমূহ' অর্থাৎ আমি যমীনে আঙ্গুরের বাগান পয়দা করেছি। মহান আল্লাহ খুরমা ও আঙ্গুরের বর্ণনা দিয়েছেন। কেননা, হেজাযবাসীদের কাছে এ দু'টো ফলই সর্বোত্তম ফল বলে গণ্য হয়। শুধু হেজাযবাসী নয়, বরং সারা দুনিয়ার লোক এ দু'টো ফলকে সর্বোত্তম ফল মনে করে থাকে। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় ইহসানের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, এই সব খুরমা ও আঙ্গুর ফল দ্বারা তোমরা মদ তৈরী করে থাক এবং নিজেদের জন্যে উত্তম খাদ্য প্রস্তুত কর। এটা হচ্ছে মদ হারাম হওয়ার পূর্বেকার আয়াত। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ যমীনে আমি খুরমা ও আঙ্গুরের বাগান বানিয়েছি। তিনি আরও বলেনঃ আমি যায়তুন ও আনারেরও বাগান করে দিয়েছি যা পাতা ও আকৃতির দিক দিয়ে একে অপরের সাথে সাদৃশ্যযুক্ত বটে, কিন্তু ফল, গঠন, স্বাদ এবং

স্বভাব ও প্রকৃতির দিক দিয়ে সম্পূর্ণ পৃথক! আল্লাহ পাক বলেনঃ যখন ফল পেকে যায় তখন ঐগুলোর প্রতি লক্ষ্য করে দেখো! অর্থাৎ হে মানুষ! তোমরা আল্লাহর ক্ষমতা সম্পর্কে চিন্তা করে দেখো যে, তিনি কিভাবে ওগুলোকে অস্তিত্বহীনতা থেকে অস্তিত্বে আনয়ন করেছেন। ফল ধরার পূর্বে গাছগুলো তো জ্বালানী কাষ্ঠ ছাড়া আর কিছুই ছিল না। এই কাঠের মধ্য থেকেই মহান আল্লাহ এসব সুমিষ্ট খুরমা, আঙ্গুর এবং অন্যান্য ফল বের করেছেন! যেমন তিনি বলেনঃ যমীনে ঘন বৃক্ষ, আঙ্গুর এবং শস্যের বাগানসমূহ রয়েছে, ওগুলোর মধ্যে কিছু কিছু গুচ্ছ বিশিষ্ট এবং কিছু কিছু গুচ্ছবিহীন। সবগুলো একই পানি পেয়ে থাকে অথচ খেতে একটি অপরটি হতে বহুগুণে উত্তম। এ জন্যেই আল্লাহ পাক এখানে বলেনঃ "হে লোকেরা! এগুলো আল্লাহর ব্যাপক ক্ষমতা ও পূর্ণ নৈপুণ্যের পরিচয় বহন করছে। ঈমানদার লোকেরাই এগুলো বুঝতে পারে এবং তারাই আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ)-এর সত্যতা স্বীকার করে থাকে!"

১০০। আর এই (অজ্ঞ) লোকেরা জ্বিনদেরকে আল্লাহর শরীক বানিয়ে নিয়েছে, অথচ আল্লাহই ঐগুলোকে সৃষ্টি করেছেন, আর না জেনে না বুঝে তারা তাঁর জন্যে পুত্র-কন্যা রচনা করে; তিনি মহিমান্বিত (পবিত্র), এদের আরোপিত বিশেষণগুলো হতে বহু উর্ধে তিনি।

١٠٠- وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَكَاۤءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوْا لَهٗ بَنِيْنَ وَبَنٰتٍۢ بِغَيْرِ عِلْمٍ ؕ سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يَصِفُوْنَ ۟

এখানে মুশরিকদের কথাকে অগ্রাহ্য করা হচ্ছে যারা আল্লাহর সাথে অন্যকে শরীক বানিয়ে নেয় এবং শয়তানের উপাসনায় লিপ্ত হয়ে পড়ে। যদি প্রশ্ন করা হয় যে, তারা তো মূর্তিগুলোর পূজা করতো, তাহলে শয়তানের পূজা করার ভাবার্থ কি? উত্তরে বলা যাবে যে, তারা তো শয়তান কর্তৃক পথভ্রষ্ট হয়ে এবং তার অনুগত হয়েই মূর্তিপূজা করতো। যেমন আল্লাহ পাক বলেনঃ "তারা অল্লাহকে পরিত্যাগ করে শুধুমাত্র কয়েকটি নারী জাতীয় বস্তুর পূজা করে (অর্থাৎ ফেরেশতাদেরকে আল্লাহর কন্যা মনে করে ঐ মেয়ে ফেরেশতাদের পূজা করতে শুরু করে। নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক), আর শুধু শয়তানের পূজা করে, যে

(আল্লাহর) নির্দেশ লংঘনকারী। যাকে আল্লাহ স্বীয় (বিশেষ) করুণা হতে দূরে নিক্ষেপ করেছেন এবং যে (আল্লাহকে) বলেছিল– আমি অবশ্যই আপনার বান্দাগণ হতে স্বীয় নির্ধারিত অংশ নিয়ে নেবো, (আনুগত্যের দ্বারা) আমি ওদেরকে পথভ্রষ্ট করবো এবং তাদেরকে বৃথা আশ্বাস প্রদান করবো আর আমি তাদেরকে শিক্ষা দেবো যেন তারা (প্রতিমার নামে) চতুষ্পদ জন্তুর কান কর্তন করে এবং তাদেরকে (আরও) শিক্ষা দেবো যেন তারা আল্লাহর সৃষ্ট আকৃতিকে বিকৃত করে দেয়। আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে ত্যাগ করে শয়তানকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে, সে নিশ্চয়ই প্রকাশ্য ক্ষতিতে নিপতিত হবে। শয়তান তাদের সাথে অঙ্গীকার করে ও বৃথা আশ্বাস দেয়; আর শয়তান এদের সাথে শুধু মিথ্যে (প্রবঞ্চনা মূলক) অঙ্গীকার করে।" যেমন মহান আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেনঃ "তোমরা কি আমাকে ছেড়ে শয়তান ও তার সন্তানদেরকে বন্ধু বানিয়ে নিয়েছো? অথচ তোমাদের উচিত ছিল আমারই অঞ্চল চেপে ধরা।" ইবরাহীম (আঃ) তাঁর পিতাকে বলেছিলেনঃ "হে পিতা! আপনি শয়তানের ইবাদত করবেন না, শয়তান তো হচ্ছে রহমানের (আল্লাহর) অবাধ্য।" যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "হে আদম সন্তানগণ! (এবং হে জ্বীনগণ) আমি কি তোমাদেরকে সতর্ক করে দেইনি যে, তোমরা শয়তানের পূজা করো না, সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। আর এও যে, তোমরা শুধু আমারই ইবাদত করো; এটাই সরল পথ।" কিয়ামতের দিন ফেরেশতাগণ বলবেনঃ "আপনি পবিত্র। আপনি আমাদের অলী। এই মুশরিকরা যদিও আমাদেরকে 'আল্লাহর কন্যা' -এ কথা বলে পূজা করেছে, কিন্তু আমাদের তাদের সাথে কোনই সম্পর্ক নেই। এরা তো প্রকৃতপক্ষে শয়তানেরই পূজা করেছে!" যেমন আল্লাহ তা'আলা এখানে বলেনঃ "এই মুশরিকরা শয়তানদেরকে আল্লাহর শরীক বানিয়ে নিয়েছে, অথচ তাদেরকেও এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং তারা আল্লাহর সাথে তাঁরই মাখলুক বা সৃষ্টকে কি করে পূজা করছে!" যেমন হযরত ইবরাহীম (আঃ) বলেছিলেনঃ "তোমরা কি এমন জিনিসের পূজা করছো যাদেরকে তোমরা স্বয়ং নিজ হস্তে বানিয়েছ? অথচ তোমাদেরকেও এবং তোমাদের এইসব বানানো জিনিসকেও আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন। এ জন্যে তোমাদের উচিত যে, তোমরা একমাত্র এক-অদ্বিতীয় আল্লাহরই ইবাদত করে তাঁর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করবে।" আল্লাহ পাক বলেনঃ "তারা না জেনে না বুঝে আল্লাহর জন্যে পুত্র-কন্যা রচনা করে।" এখানে আল্লাহ তা'আলার গুণাবলীর মধ্যে বিভ্রান্তের বিভ্রান্তির উপর সাবধান বাণী উচ্চারণ করা হচ্ছে। যেমন ইয়াহূদীরা বলে যে, উযায়ের (আঃ) আল্লাহর পুত্র, অথচ তিনি

একজন পয়গম্বর। আর খ্রীষ্টানরা বলে যে, ঈসা (আঃ) আল্লাহর পুত্র এবং আরবের মুশরিকরা ফেরেশতাদেরকে আল্লাহর কন্যা বলতো। এই অত্যাচারীরা যে উক্তি করছে, আল্লাহ তা থেকে বহু ঊর্ধ্বে।

خَرَقُوا- শব্দের অর্থ হচ্ছে– তারা মন দ্বারা গড়িয়ে নিয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে– তারা অনুমান করে নিয়েছে। আওফী (রঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে–তারা মীমাংসা করে নিয়েছে। মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে তারা মিথ্যা কথা বানিয়ে নিয়েছে। ভাবার্থ হলো এই যে, যাদেরকে তারা ইবাদতে শরীক করে নিচ্ছে তাদেরকে আল্লাহ তা'আলাই সৃষ্টি করেছেন। তারা প্রকৃত ব্যাপার সম্পর্কে ওয়াকিফহাল না হয়েই এইসব কথা বলছে। তারা আল্লাহ তা'আলার শ্রেষ্ঠত্ব ও বুযুর্গী সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ। যিনি আল্লাহ, তাঁর পুত্র, কন্যা, স্ত্রী কি করে হতে পারে! এ জন্যেই তিনি বলেনঃ তিনি মহিমান্বিত, তাদের আরোপিত বিশেষণগুলো হতে বহু ঊর্ধ্বে।

১০১। তিনি আসমান ও যমীনের উদ্ভাবক; তাঁর সন্তান হবে কি করে? অথচ তাঁর জীবন সঙ্গিনী কেউ নেই! তিনিই প্রত্যেকটি জিনিস সৃষ্টি করেছেন, প্রত্যেকটি জিনিস সম্পর্কে তাঁর ভালরূপ জ্ঞান রয়েছে।

١٠١- بَدِيعُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ أَنّٰى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَّلَمْ تَكُنْ لَّهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ○

আল্লাহ তা'আলাই হচ্ছেন আসমান ও যমীনের উদ্ভাবক ও সৃষ্টিকর্তা। এ দু'টো সৃষ্টি করার সময় কোন নমুনা তাঁর সামনে ছিল না। বিদ্আতকে বিদ্আত বলার কারণ এই যে, প্রাচীন যুগে এর কোন নযীর থাকে না। মানুষ কোন আমলকে নিজের পক্ষ থেকে আবিষ্কার করে নিয়ে ওকে পুণ্যের কাজ মনে করে থাকে।

আল্লাহ পাক বলেনঃ আল্লাহর সন্তান হবে কিরূপে? তাঁর তো জীবন সঙ্গিনী নেই। সন্তান তো দু'টি অনুরূপ জিনিসের মাধ্যমে জন্মলাভ করে থাকে! আর আল্লাহর অনুরূপ তো কেউই নেই। যেমন তিনি বলেনঃ

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا ـ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا ـ

অর্থাৎ "তারা বলে যে, রহমান (আল্লাহ) সন্তান বানিয়ে নিয়েছেন, এটা তোমরা বড়ই মিথ্যা কথা বলছো!" (১৯ঃ ৮৮-৮৯)

তিনিই তো সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। অতএব, তাঁরই সৃষ্ট কিরূপে তাঁর স্ত্রী হতে পারে? তাঁর কোন নযীর নেই। এতদসত্ত্বেও তাঁর নযীর হয়ে সন্তান কিরূপে আসতে পারে? আল্লাহর সত্তা এসব থেকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র।

১০২- ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوْهُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيْلٌ ۝

১০২। তিনি আল্লাহ তোমাদের পরওয়ারদেগার, তিনি ছাড়া অন্য কেউই মা'বূদ নেই, প্রত্যেক বস্তুরই স্রষ্টা তিনি, অতএব তোমরা তাঁরই ইবাদত করতে থাকবে, তিনিই সব জিনিসের উপর দায়িত্বশীল।

১০৩- لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ ۝

১০৩। তাঁকে তো কারও দৃষ্টি পরিবেষ্টন করতে পারে না, আর তিনি সকল দৃষ্টি পরিবেষ্টনকারী এবং তিনি অতীব সুক্ষ্মদর্শী এবং সব বিষয়ে ওয়াকিফহাল।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ তিনিই তোমাদের প্রভু যিনি প্রত্যেক জিনিস সৃষ্টি করেছেন। তিনিই প্রত্যেক জিনিসের সৃষ্টিকর্তা। সুতরাং তোমরা তাঁরই ইবাদত কর এবং তাঁর একত্ববাদ স্বীকার করে নাও । তাঁর কোন সন্তান নেই, পিতা নেই, জীবন সঙ্গিনী নেই এবং সমতুল্যও কেউ নেই। প্রত্যেক বস্তুর উপর তিনি রক্ষক। প্রত্যেক জিনিসের তিনি তদবীরকারী। তিনিই জীবিকা দান করে থাকেন। রাত-দিন তিনিই বানিয়েছেন। কারও দৃষ্টি তাঁকে পরিবেষ্টন করতে পারে না। এই মাসআলায় পূর্ববর্তী গুরুজনদের কয়েকটি উক্তি রয়েছে। একটি উক্তি এই যে, পরকালে চক্ষু দ্বারা তাঁকে দেখা যাবে বটে, কিন্তু দুনিয়াতে তাঁকে দেখা যাবে না। নবী (সঃ)-এর হাদীসের মাধ্যমে ক্রমাগতভাবে এটাই প্রমাণিত আছে। যেমন হযরত মাসরূক (রাঃ) হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেনঃ যে ব্যক্তি এই ধারণা করে যে, মুহাম্মাদ (সঃ) স্বীয় প্রতিপালককে

দেখেছেন সে আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করেছে। কেননা, আল্লাহ তা'আলা তো বলেছেনঃ "তাঁকে কারও দৃষ্টি পরিবেষ্টন করতে পারে না, আর তিনি সকল দৃষ্টি পরিবেষ্টনকারী।" হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর বিপরীত মত পোষণ করেছেন। তিনি আল্লাহ-দর্শনকে 'মুত্লাক' বা অনির্দিষ্ট রেখেছেন এবং তাঁর থেকে এটাও বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) অন্তর্দৃষ্টিতে আল্লাহ তা'আলাকে দু'বার দেখেছেন। এই মাসআলাটি সূরায়ে নাজমে ইনশাআল্লাহ বর্ণিত হবে। ইবনে উয়াইনা বলেন যে, দুনিয়াতে চক্ষুগুলো তাঁকে দেখতে পাবে না। অন্যান্যদের মতে এর ভাবার্থ হচ্ছে এই যে, চোখ ভরে কেউ তাঁকে দেখতে পাবে না। এর থেকে ঐ দর্শনের স্বাতন্ত্র্য রয়েছে যা আখিরাতে মুমিনরা লাভ করবে। মুতাযিলারা নিজেদের বিবেকের চাহিদার ভিত্তিতে এর ভাবার্থ এই বুঝেছে যে, চক্ষু দ্বারা আল্লাহকে ইহজগতেও দেখা যাবে না এবং পরজগতেও না। তাদের এই বিশ্বাস আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের বিপরীত। এটা মুতাযিলাদের অজ্ঞতারই পরিচায়ক। কেননা, আল্লাহ তা'আলাকে যে দেখা যাবে এটাতো তাঁর উক্তি দ্বারাই প্রমাণিত হয়। তিনি বলেনঃ وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ - اِلٰى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ অর্থাৎ "সেই দিন বহু মুখমণ্ডল উজ্জ্বল ও জ্যোতির্ময় হবে। (এবং) স্বীয় প্রতিপালকের দিকে তাকাতে থাকবে।" (৭৫ঃ ২২-২৩) আবার কাফিরদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ كَلَّاۤ اِنَّهُمْ عَنْ رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوْبُوْنَ অর্থাৎ "(তারা যেরূপ ধারণা করছে সেরূপ) কখনও নয়, এসব লোক সেই দিন তাদের প্রতিপালক (এর দর্শন লাভ) হতে প্রতিরুদ্ধ থাকবে।" (৮৩ঃ ১৫) অর্থাৎ তারা মহান আল্লাহকে দেখতে পাবে না। এর দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, মুমিনদের জন্যে আল্লাহ তা'আলার দর্শন লাভের ব্যাপারে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হবে না। মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারাও এটা প্রমাণিত হয় যে, দারুল আখিরাতে মুমিনরা জান্নাতে স্পষ্টভাবে আল্লাহ তা'আলাকে দেখতে পাবে। মহান আল্লাহর অনুগ্রহের ফলেই তারা এই মর্যাদার অধিকারী হবে। তিনি আমাদেরকে স্বীয় ফযল ও করমে তাঁদের অন্তর্ভুক্ত করুন! আমীন!

আর ভাবার্থ সম্পর্কে এও বলা হয়েছে যে, জ্ঞান তাঁকে পরিবেষ্টন করতে পারবে না। এরূপ ধারণা খুবই বিস্ময়কর বটে। এটা প্রকাশ্য আয়াতের উল্টো। এর ভাবার্থ হলো এই যে, 'ইদরাক' -এর অর্থ হচ্ছে দর্শন। আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। তাছাড়া অন্যান্যদের এই ধারণা রয়েছে যে, দর্শন প্রমাণিত হওয়াকে মেনে নেয়া 'ইদরাক'কে অস্বীকার করার বিপরীত নয়। কেননা 'ইদরাক'

দর্শন হতে বিশিষ্টতর। আর বিশিষ্টের অস্বীকৃতিতে সাধারণের অস্বীকৃতি হয় না। যে 'ইদরাক'কে এখানে অস্বীকার করা হয়েছে সেটা কোন্ প্রকারের সে ব্যাপারে কয়েকটি উক্তি রয়েছে। যেমন হাকীকতকে জানা। আর হাকীকতের জ্ঞান তো আল্লাহ ছাড়া আর কারও থাকতে পারে না। যদিও মুমিনদের দর্শন লাভ হবে তথাপি হাকীকত অন্য জিনিস। চন্দ্রকে তো সবাই দেখে থাকে। কিন্তু ওর হাকীকত, মূলতত্ত্ব ও রহস্য সম্পর্কে কারও জ্ঞান থাকতে পারে না। সুতরাং আল্লাহর সমতুল্য তো কেউই নেই। ইবনে আলিয়্যাহ্ বলেন যে, আল্লাহকে দেখতে না পাওয়া দুনিয়ার মধ্যে নির্দিষ্ট। অর্থাৎ দুনিয়ায় আল্লাহ তা'আলাকে চক্ষু দ্বারা দেখা যাবে না। কেউ কেউ বলেন যে, 'ইদরাক' 'রূইয়াত' হতে বিশিষ্টতর। কেননা, পরিবেষ্টন করাকে ইদরাক বলা হয়। আর পবিবেষ্টন না করা দর্শন না করাকে অপরিহার্য করে না। যেমন সমুদয় জ্ঞানকে পরিবেষ্টন করতে না পারা এটা অপরিহার্য করে না যে, সাধারণ জ্ঞানও লাভ করা যাবে না। মানুষ যে ইল্মকে স্বীয় আবেষ্টনীর মধ্যে আনতে পারবে না তা নিম্নের আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়। আল্লাহ পাক বলেনঃ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا অর্থাৎ "তারা ইলমকে পরিবেষ্টন করতে পারে না।" (২০ঃ ১১০)

সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেনঃ "হে আল্লাহ! আমি আপনার প্রশংসাকে পরিবেষ্টন করতে পারি না।" এর অর্থ এটা নয় যে, তিনি আল্লাহর সাধারণ প্রশংসাও করতে পারবেন না। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর উক্তি রয়েছে যে, কারও দৃষ্টি আল্লাহকে পরিবেষ্টন করতে পারে না। ইকরামা (রঃ)-কে বলা হয়ঃ لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ অর্থাৎ "চোখগুলো তাঁকে পরিবেষ্টন করে না।" তখন তিনি বলেনঃ "তোমরা কি আকাশ দেখতে পাও না?" উত্তরে বলা হয়ঃ "হ্যাঁ, পাই তো।" পুনরায় তিনি জিজ্ঞেস করেনঃ "এক দৃষ্টিতেই কি সম্পূর্ণ আকাশটা দেখতে পাও?" মোটকথা, আল্লাহ পাকের উপর যে দৃষ্টিগুলো পড়বে তা থেকে তিনি বহু উর্ধ্বে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, মুমিনদের মুখমণ্ডল উজ্জ্বল ও জ্যোতির্ময় হবে এবং তারা তাদের প্রতিপালককে দেখতে থাকবে। কিন্তু তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও বুযুর্গীর কারণে তাঁকে পরিবেষ্টন করতে সক্ষম হবে না। এই আয়াতের তাফসীরে যে হাদীসটি এসেছে যে, "যদি সমস্ত দানব, মানব, শয়তান এবং ফেরেশতার একটি সারি বানানো হয় তথাপিও তাঁকে পরিবেষ্টন করা যাবে না।" সেই হাদীসটি খুবই গারীব বা দুর্বল এবং ছয়খানা বিশুদ্ধ হাদীস গ্রন্থের কোনটার মধ্যেই বর্ণিত হয়নি।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, নবী (সঃ) আল্লাহ তা'আলাকে দেখেছিলেন। তখন তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়ঃ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ (দৃষ্টিসমূহ তাঁকে পরিবেষ্টন করতে পারে না) একথা কি আল্লাহ তা'আলা বলেননি? তিনি উত্তরে বলেনঃ ওটা তো হল আল্লাহর নূর বা জ্যোতি। কিন্তু এই আয়াতের ভাবার্থ এই যে, যদি আল্লাহ পাক স্বীয় সমস্ত নূরসহ প্রকাশিত হন তবে চক্ষুসমূহ তাঁকে দেখতে সক্ষম হবে না। আবার কেউ কেউ এই ভাবার্থ বর্ণনা করেন যে, কোন জিনিস তাঁর সামনে প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা নিদ্রা যান না এবং নিদ্রা যাওয়া তাঁর পক্ষে শোভনীয়ও নয়। তিনি দাঁড়িপাল্লা দাঁড় করে রেখেছেন। দিনের আমলগুলো রাত্রির পূর্বে এবং রাত্রির আমলগুলো দিনের পূর্বে তাঁর সামনে পেশ করা হয়। তাঁর পর্দা আলো বা আগুন। যদি তিনি উঠে পড়েন তবে তাঁর জ্যোতি সারা দুনিয়াকে জ্বালিয়ে দেবে।

পূর্ববর্তী কিতাবগুলোতে রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আঃ)-কে বলেছিলেনঃ "হে মূসা (আঃ)! কোন প্রাণী আমার ঔজ্জ্বল্য পেয়ে জীবিত থাকতে পারে না এবং কোন শুষ্ক জিনিস ধ্বংস ছাড়া আর কিছুই থাকতে পারে না।" আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "যখন আল্লাহ পাহাড়ের উপর স্বীয় জ্যোতি বিচ্ছুরিত করলেন তখন পাহাড় বিদীর্ণ হয়ে গেল এবং মূসা (আঃ) অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল। যখন তার জ্ঞান ফিরলো তখন বললো– আমি আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছি, আর আপনার দিকে প্রত্যাবর্তন করছি এবং আমিই হলাম বিশ্বাস স্থাপনকারীদের প্রথম ব্যক্তি।" ইদরাকে খাস বা বিশেষ পরিবেষ্টন কিয়ামতের দিনের রূইয়াত বা দর্শনকে অস্বীকার করে না। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় মুমিন বান্দাদের উপর নিজের জ্যোতি প্রকাশ করবেন। তাঁর জ্যোতি এবং শ্রেষ্ঠত্ব ও বুযুর্গী তাঁর অভিপ্রায় অনুযায়ী হবে। দৃষ্টিসমূহ তা পুরোপুরিভাবে পরিবেষ্টন করতে পারবে না। এ কারণেই হযরত আয়েশা (রাঃ) আখিরাতের দর্শনের প্রতি স্বীকৃতি দান করেন এবং দুনিয়ার দর্শনকে অস্বীকার করেন। তিনিও এই আয়াতকেই দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। সুতরাং 'ইদরাক' যা অস্বীকার করছে তা হচ্ছে ঐ শ্রেষ্ঠত্ব ও বুযুর্গীর দর্শন। এটা কোন মানব বা ফেরেশ্তার পক্ষে সম্ভবপর নয়।

ইরশাদ হচ্ছে– وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ অর্থাৎ তিনি সকল দৃষ্টি পরিবেষ্টনকারী। কেননা তিনিই মানুষের চক্ষু সৃষ্টি করেছেন। কাজেই তিনি তা পরিবেষ্টন করতে পারবেন না কেন? তিনি বলেনঃ তিনি কি স্বীয় সৃষ্ট বস্তুকে জানবেন না? তিনি তো অতীব সূক্ষ্মদর্শী ও সব বিষয় ওয়াকিফহাল। কখনও কখনও اَبْصَار শব্দ দ্বারা

مُبْصِرِيْن বুঝানো হয়ে থাকে। অর্থাৎ দর্শকরা তাঁকে দেখতে পারে না। তিনি হচ্ছেন لَطِيْفٌ অর্থাৎ কোন কিছু বের করার ব্যাপারে খুবই সূক্ষ্মদর্শী এবং তিনি خَبِيْر অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তুর ঠিকানা সম্বন্ধে তিনি পূর্ণ ওয়াকিফহাল। আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। যেমন মহান আল্লাহ হযরত লোকমানের উক্তির উদ্ধৃতি দিয়ে বলেনঃ يٰبُنَيَّ اِنَّهَا اِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ........لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ অর্থাৎ "(লোকমান আঃ স্বীয় পুত্রকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন) হে বৎস! যদি কোন কার্য (অতি গুপ্তও হয়, যেমন) সরিষা বীজের পরিমাণ হয়, অতঃপর তা পাথরের অভ্যন্তরে থাকে অথবা আসমান সমূহের ভিতরে কিংবা যমীনের অভ্যন্তরে থাকে, তথাপি আল্লাহ তা এনে উপস্থিত করবেন; নিঃসন্দেহে আল্লাহ বড়ই সূক্ষ্মদর্শী সর্ব বিষয়ে খবরদার।" (৩১ঃ১৬)

১০৪। এখন নিশ্চয়ই তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে সত্য দর্শনের উপায়সমূহ পৌঁছেছে, এখন যে ব্যক্তি নিজের গভীর দৃষ্টিতে অবলোকন করবে, সে নিজেরই কল্যাণ সাধন করবে, আর যে অন্ধ থাকবে সে নিজেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে, আর আমি তো তোমাদের প্রহরী নই।

١٠٤- قَدْ جَآءَكُمْ بَصَآئِرُ مِنْ رَّبِّكُمْ فَمَنْ اَبْصَرَ فَلِنَفْسِهٖ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَآ اَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيْظٍ ○

১০৫। এরূপেই আমি নিদর্শনসমূহ প্রকাশ করে থাকি, যেন তুমি সকলকে পৌঁছিয়ে দাও এবং যেন লোকেরা বলে–তুমি কারও নিকট থেকে পড়ে নিয়েছো, আর যেন আমি একে বুদ্ধিমান লোকদের জন্যে প্রকাশ করে দেই।

١٠٥- وَ كَذٰلِكَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ وَلِيَقُوْلُوْا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهٗ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ○

بَصَآئِر- শব্দের অর্থ হচ্ছে দলীল প্রমাণাদি এবং নিদর্শনাবলী যা কুরআন মাজীদের মধ্যে রয়েছে এবং যা রাসূলুল্লাহ (সঃ) পেশ করেছেন। সুতরাং যে

ব্যক্তি এগুলো অনুযায়ী কাজ করলো সে নিজেরই উপকার সাধন করলো। যেমন আল্লাহ্ পাক বলেনঃ "যে ব্যক্তি হিদায়াত গ্রহণ করবে সে তার নিজের উপকারের জন্যে করবে, আর যে পথভ্রষ্ট হবে তার পথভ্রষ্টতার শাস্তি তার নিজের উপরই বর্তিত হবে।" এজন্যেই এখানে মহান আল্লাহ্ বলেন, যে অন্ধ থাকবে সে নিজেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেনঃ "তাদের চক্ষু অন্ধ হয় না, বরং তাদের অন্তরগুলো অন্ধ হয়ে থাকে।" আল্লাহ্ পাক স্বীয় রাসূল (সঃ)-কে বলেনঃ হে রাসূল (সঃ)! তুমি তাদেরকে বলে দাও–আমি তো তোমাদের প্রহরী নই। আমি শুধুমাত্র একজন প্রচারক। হিদায়াতের মালিক তো আল্লাহ্। তিনি যাকে চান হিদায়াত করেন এবং যাকে ইচ্ছা করেন পথভ্রষ্ট করেন।

ইরশাদ হচ্ছে– এরূপেই আমি নিদর্শনসমূহ বিভিন্ন ধারায় বর্ণনা করে থাকি। যেমন তিনি এই সূরায় একত্ববাদের বর্ণনা করেছেন এবং এর উপর ভিত্তি করেও যে, মুশরিক ও কাফিররা বলে–হে মুহাম্মাদ (সঃ)! আপনি এইসব কথা পূর্ববর্তী কিতাবগুলো হতে নকল করেছেন এবং ওগুলো শিখে নিয়েই আমাদেরকে শুনাচ্ছেন।[১]

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, دَرَسْتَ শব্দের অর্থ تَلَوْتَ অর্থাৎ 'আপনি পাঠ করেছেন।' তাদের এ কথাগুলো তর্ক বিতর্ক ও ঝগড়ার স্থলে ছিল। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা ঐ কাফিরদের মিথ্যা অপবাদ ও বিরোধিতার সংবাদ দিয়ে বলেনঃ "কাফিররা বলে–এটা তো বানানো মিথ্যা কথা এবং অন্যান্যরাও এই কুরআন তৈরী করতে সাহায্য করেছে। এটাই বড়ই অত্যাচার ও মিথ্যা প্রতিপন্ন করার কথা। তারা বলে– এটা তো পূর্ববর্তী লোকদের কথিত ও লিখিত কথা যা তিনিও (নবী সঃ) লিখে নিয়েছেন।" কাফিরদের মিথ্যা ধারণা সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ "সে চিন্তা করলো, তৎপর একটা মন্তব্য স্থির করলো? সুতরাং সে ধ্বংস হোক, কেমন মন্তব্য সে স্থির করল? অতঃপর সে দৃষ্টিপাত করলো। তৎপর মুখ বিকৃত করলো, আরও অধিক বিকৃত করলো। তৎপর সে মুখ ফিরিয়ে নিলো এবং গর্ব করলো। অনন্তর বললো– এটা তো নকল করা যাদু। এটা তো মানুষের উক্তি।"

আল্লাহ্ পাক বলেনঃ আমি একে জ্ঞানবান লোকদের জন্যে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে থাকি যারা সত্যকে জেনে নেয়ার পর ওর অনুসরণ করে থাকে এবং মিথ্যা

১. এটা ইবনে আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রঃ), সাঈদ ইবনে জুবাইর (রঃ), যহ্হাক (রঃ) এবং অন্যান্যদের উক্তি।

ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকে। কাফিরদের পথভ্রষ্টতা এবং মুমিনদের সত্যকে স্বীকার করে নেয়ার মধ্যে আল্লাহ তা'আলার কৌশল ও যৌক্তিকতা রয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "তিনি এর দ্বারা অনেককে বিপথগামী করে থাকেন এবং অনেককে সুপথগামী করে থাকেন।" অন্য জায়গায় মহান আল্লাহ বলেনঃ "যাদের অন্তরে রোগ আছে এবং যাদের অন্তর (পাথরের মত) শক্ত, শয়তান তাদের অন্তরে ফিৎনা নিক্ষেপ করে থাকে এবং এই জিনিসগুলো তাদের জন্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষা বনে যায়, আর আল্লাহ মুমিনদেরকে সরল সোজা পথ প্রদর্শন করে থাকেন।" আল্লাহ তা'আলা আর এক জায়গায় বলেনঃ "আমি জাহান্নামে ফেরেশতাদেরকে নিযুক্ত করে রেখেছি এবং তাদের নির্ধারিত সংখ্যা (১৯) কাফিরদের জন্যে একটা ফিৎনার কারণ, কিন্তু এর মাধ্যমেই আহলে কিতাব ও মুমিনদের ঈমান আরও বৃদ্ধি পেয়ে থাকে, আহলে কিতাব ও মুমিনরা এতে সন্দেহ পোষণ করে না (কেননা, আহলে কিতাব নিজেদের কিতাবেও এই নির্ধারিত সংখ্যার উল্লেখ পেয়ে থাকে), কিন্তু কাফির ও রোগাক্রান্ত অন্তর বিশিষ্ট লোকেরা বলে থাকে –এসব কথা বলার আল্লাহর কি প্রয়োজন ছিল? এভাবেই বহু লোক পথভ্রষ্ট হয়ে যায় এবং বহু লোক সুপথ প্রাপ্ত হয়, আল্লাহ ছাড়া তাঁর সেনাবাহিনী সম্পর্কে কার জ্ঞান রয়েছে?" আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "আমি এমন বস্তু অর্থাৎ কুরআন নাযিল করেছি যে, ওটা ঈমানদারদের জন্যে শেফা ও রহমত এবং ওর দ্বারা যালিমদের শুধু অনিষ্টই বর্ধিত হয়।" তিনি আর এক জায়গায় বলেনঃ " (হে মুহাম্মাদ সঃ!) তুমি বলে দাও–এই কুরআন মুমিনদের জন্যে হিদায়াত ও শেফা আর কাফিরদের কানে কর্ক বা ছিপি লাগা আছে এবং তারা অন্ধ।" কুরআন মুমিনদের জন্যে যে হিদায়াত স্বরূপ এবং হিদায়াত ও পথভ্রষ্টতা যে তাঁরই ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল এ সম্পর্কে বহু আয়াত রয়েছে। এ জন্যেই এখানে তিনি বলেনঃ "এরূপেই আমি নিদর্শনসমূহ বিভিন্ন ধারায় প্রকাশ করে থাকি, কিন্তু কাফিররা একথাই বলছে যে, তুমি কারও নিকট থেকে লিখিয়ে নিয়েছো।"

হযরত ইবনে[১] আব্বাস (রাঃ) دَرَسْتَ শব্দের অর্থ قَرَاْتَ এবং تَعَلَّمْتَ বর্ণনা করেছেন। হাসান (রঃ) এটার অর্থ تَقَادَمْتَ বলেছেন। ইবনে যুবাইর (রঃ) বলেনঃ "ছেলেরা এখানে دَارَسْتَ পড়ে থাকে, অথচ دَرَسْتَ রয়েছে। হযরত ইবনে মাসঊদ (রাঃ)-এর কিরআতে দারাসতা রয়েছে এবং এর অর্থ تَقَادَمْتَ -ই বটে। এর ভাবার্থ হচ্ছে– "হে মুহাম্মাদ (সঃ)! যেসব কথা আপনি আমাদেরকে

১. মুজাহিদ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) এবং যহ্হাক (রহঃ) হতেও এটা বর্ণিত আছে।

শুনাচ্ছেন সেগুলো আমরা পূর্ববর্তীদের মাধ্যমে অবগত রয়েছি।” হযরত ইবনে মাসউদের কিরআতে دَرَسَ রয়েছে। অর্থাৎ মুহাম্মাদ (সঃ) ওটা শিখে রেখেছেন। এই মতভেদ বিস্ময়করই বটে। হযরত উবাই ইবনে কাব (রাঃ) বলেনঃ “রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে ‘ওয়া লিয়াকুলু দারাস্তা’এইরূপ শুনিয়েছেন।

১০৬। (হে মুহাম্মাদ সঃ)! তোমার প্রতি তোমার প্রভুর পক্ষ থেকে যে অহী নাযিল হয়েছে, তুমি তারই অনুসরণ করে চল, তিনি ছাড়া অন্য কেউই মা'বূদ নেই, আর অংশীবাদীদের থেকে বিমুখ থাক।

١٠٦- اِتَّبِعْ مَا اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ ○

১০৭। আর যদি আল্লাহর অভিপ্রায় হতো তবে এরা শিরক করতো না; আর আমি তোমাকে এদের পর্যবেক্ষক নিযুক্ত করিনি এবং তুমি তাদের উপর ক্ষমতা প্রাপ্তও নও।

١٠٧- وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَآ اَشْرَكُوْا وَمَا جَعَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا وَمَآ اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ ○

আল্লাহ পাক রাসূলুল্লাহ (সঃ) ও তাঁর উম্মতকে নির্দেশ দিচ্ছেন- তোমরা অহীরই অনুসরণ কর এবং ওর উপরই আমল কর। কেননা, এটাই সত্য এবং এতে কোন ভেজাল বা মিশ্রণ নেই। আর তোমরা এই মুশরিকদেরকে এড়িয়ে চল, তাদেরকে ক্ষমা কর এবং তারা যে কষ্ট দিচ্ছে তা সহ্য করে নাও যে পর্যন্ত না তোমাদেরকে আল্লাহ তাদের উপর জয়যুক্ত ও সফলকাম করেন। জেনে রেখো যে, তাদেরকে পথভ্রষ্ট করার মধ্যে আল্লাহর নৈপুণ্য নিহিত রয়েছে। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তো সারা দুনিয়াবাসীই হিদায়াত লাভ করতো এবং মুশরিকরা শিরকই করতো না। এর মধ্যে মহান আল্লাহর বিশেষ নিপুণতা রয়েছে। তিনি যা কিছু করেন তাতে কোন প্রতিবাদ করো না। তবে হ্যাঁ, তিনি সবারই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করতে সক্ষম। হে নবী (সঃ)! আমি তোমাকে তাদের পর্যবেক্ষক নিযুক্ত করিনি। তাদের মনে যা আসে তাই তাদেরকে বলতে ও করতে দাও। আমি তোমার উপর দেখা শোনার ভার অর্পণ করিনি। তুমি তাদেরকে আহার্যও প্রদান

কর না। তোমার কাজ তো শুধু প্রচার করা। যেমন আল্লাহ পাক বলেনঃ "তুমি শুধুমাত্র উপদেশ দিতে থাক, তুমি তো একজন উপদেষ্টা মাত্র। তুমি তাদের উপর দায়গ্রস্ত অধিকারী নও।" অন্য জায়গায় তিনি বলেনঃ "তোমার কাজ শুধু পৌছিয়ে দেয়া, আর হিসাব গ্রহণের দায়িত্ব আমার।"

১০৮। (হে মুমিনগণ)! এরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদের ইবাদত (পূজা-অর্চনা) করে তোমরা তাদেরকে গালাগালি করো না, তাহলে তারা অজ্ঞানতা বশতঃ বৈরীভাবে আল্লাহকেই গালাগালি দিতে শুরু করবে, আমি তো এরূপেই প্রতিটি জনগোষ্ঠির জন্যে তাদের আমলকে চাকচিক্যময় করে দিয়েছি, শেষ পর্যন্ত তাদেরকে তাদের প্রভুর কাছে ফিরে যেতে হবে, তখন তারা কি কি কাজ করতেছিল তা তিনি তাদেরকে জানিয়ে দিবেন।

١٠٨- وَلَا تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَيَسُبُّوا اللّٰهَ عَدْوًاۢ بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ اُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ اِلٰى رَبِّهِمْ مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○

আল্লাহ পাক স্বীয় রাসূল (সঃ) এবং মুমিনদেরকে সম্বোধন করে বলছেন যে, তাঁরা যেন মুশরিকদের দেবতাগুলোকে গালাগালি না করে এবং ভালমন্দ না বলে। এতে কিছুটা যৌক্তিকতা থাকলেও এর ফলে ঝগড়া ফাসাদ ও বিবাদ বিসম্বাদ বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ তাদের দেবতাদেরকে গালি দিলে তারাও মুসলমানদের প্রভু আল্লাহকে গালি দেবে। মুশরিকরা বলতোঃ "হে মুহাম্মাদ (সঃ)! আপনারা আমাদের দেবতাদের গালি দেয়া হতে বিরত থাকুন, নতুবা আমরাও আপনাদের প্রভুর নিন্দে করবো।" তাই আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের দেবতাদেরকে গালি দিতে মুসলমানদেরকে নিষেধ করলেন। হযরত কাতাদা (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, মুসলমানরা কাফিরদের মূর্তিগুলোকে গালি দিতেন। তখন কাফিররাও হাকীকত না বুঝে বৈরীভাব নিয়ে আল্লাহ তা'আলাকে ভালমন্দ বলতো। যখন

আবূ তালিব মৃত্যু শয্যায় শায়িত হন তখন কুরায়েশরা পরামর্শ করে– "চল, আমরা আবূ তালিবের কাছে যাই এবং তাঁকে অনুরোধ করি যে, তিনি যেন স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্রকে আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করতে নিষেধ করে দেন। কেননা, এটা আমাদের জন্যে লজ্জাজনক ব্যাপার হবে যে, আবূ তালিবের মৃত্যুর পর আমরা মুহাম্মাদ (সঃ)-কে হত্যা করে ফেলবো। কারণ, এরূপ করলে আরববাসী বলবে যে, আবূ তালিবের জীবদ্দশায় তো কাপুরুষরা কিছুই করতে পারলো না, আর যেমনই তিনি মারা গেলেন তেমনই তারা তাকে হত্যা করে ফেললো।" সুতরাং আবূ জাহেল, আবূ সুফিয়ান, আমর ইবনুল আস এবং আরও কয়েকজন লোক প্রতিনিধি হিসেবে আগমন করে। তারা মুত্তালিব নামক একটি লোককে অনুমতি লাভের জন্যে প্রেরণ করে। আবূ তালিব তাদেরকে ডেকে নেন। তারা তখন তাকে বলেঃ "হে আবূ তালিব! আপনি আমাদের বড় এবং আমাদের নেতা। মুহাম্মাদ (সঃ) আমাদেরকে কষ্ট দিচ্ছেন এবং আমাদের দেবতাদেরকে কষ্ট দিচ্ছেন এবং আমাদের দেবতাদেরকে গালি দিচ্ছেন। আমরা চাই যে, আপনি তাঁকে ডেকে নিয়ে নিষেধ করে দেন। তিনি যেন আমাদের দেবতাদের নাম পর্যন্ত না নেন! নতুবা আমরাও তাঁকে ও তাঁর আল্লাহকে ছেড়ে দেব না।" এ কথা শুনে আবূ তালিব মুহাম্মাদ (সঃ)-কে ডেকে পাঠান এবং তাঁকে বলেনঃ 'এরা তোমারই কওম এবং তোমারই চাচার সন্তান।' রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন তাঁকে বলেনঃ 'চাচা! খবর কি? এবং এরা চায় কি?' তখন তারা বলেঃ "আমাদের উদ্দেশ্য এই যে, আপনি আমাদের উপর এবং আমাদের দেবতাদের উপর কোন হস্তক্ষেপ করবেন না। তাহলে আমরাও আপনার উপর এবং আপনার আল্লাহর উপর কোন হস্তক্ষেপ করবো না।" রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাদের কথার উত্তরে বলেনঃ "আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি কথা বলে দেবো যে, যদি তোমরা ওটা মেনে নাও তবে তোমরা আরব ও আজমের মালিক হয়ে যাবে এবং সমস্ত দেশ থেকে তোমাদের কাছে রাজস্বের সম্পদ আসতে থাকবে?" উত্তরে আবূ জাহেল বললোঃ 'আপনার একটা কথা কেন, দশটা কথা মানতে রাজি আছি। বলুন সেটা কি?' তিনি বললেনঃ 'বল – لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ (আল্লাহ ছাড়া আর কেউ মা'বূদ নেই)।' তারা সেটা অস্বীকার করল এবং মুখ ফিরিয়ে নিলো। আবূ তালিব তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বললেনঃ "হে ভাতিজা! এটা ছাড়া অন্য কথা বল। তোমার কওম তো একথাতে আরও অগ্নিশর্মা হয়ে উঠছে।" একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ "চাচাজান! এটা ছাড়া অন্য কিছু বলার আমার কি অধিকার আছে? এরা যদি আমার হাতে সূর্যও এনে দেয় তথাপি আমি এটা ছাড়া অন্য কিছুই বলতে

পারি না।" একথা দ্বারা তাদেরকে নিরাশ করাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। সুতরাং তারা তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠে তাঁকে বললোঃ "আমাদের দেবতাদেরকে ভালমন্দ বলা থেকে বিরত থাকুন, নতুবা আমরাও আপনাকে ও আপনার আল্লাহকে গালি দিব।" এ জন্যেই আল্লাহ পাক বলেনঃ 'তারা অজ্ঞানতা বশতঃ বৈরীভাবে আল্লাহকেই গালি দিতে শুরু করবে।' সুতরাং তাদের দেবতাদেরকে গালি দিবার যৌক্তিকতা থাকলেও এই অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখে তা থেকে বিরত থাকা উচিত। কেননা, এতে বিবাদ বিসম্বাদ আরও বেড়ে যাবে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ ' যে তার পিতা-মাতাকে গালি দেয় সে অভিশপ্ত!' সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! কোন লোক কি তার পিতা-মাতাকে গালি দিতে পারে?" তিনি উত্তরে বলেনঃ "যে কোন লোকের পিতাকে গালি দেয়, তখন লোকটি এর পিতাকে গালি দেয় এবং যে কোন লোকের মাকে গালি দেয়, সে তখন এর মাকে গালি দেয়, সুতরাং প্রথম লোকটি যেন নিজের পিতা-মাতাকেই গালি দিলো।"

আল্লাহ পাক বলেনঃ كَذٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ اُمَّةٍ عَمَلَهُمْ অর্থাৎ "এভাবেই আমি প্রতিটি জনগোষ্ঠির জন্যে তাদের আমলকে চাকচিক্যময় করে দিয়েছি।" অর্থাৎ যেমন এই কওম মূর্তির প্রতি আসক্তিকেই পছন্দ করেছে, তদ্রূপ পূর্ববর্তী উম্মতও পথভ্রষ্ট ছিল এবং তারাও নিজেদের আমলকেই পছন্দ করতো।

আল্লাহ তা'আলা যা ইচ্ছা তাই করে থাকেন এবং তাতেই নিপুণতা নিহিত থাকে। শেষ পর্যন্ত মানুষকে আল্লাহর কাছেই ফিরে যেতে হবে। সেইদিন তারা তাদের দুনিয়ার কৃত কার্যগুলো ভাল কি মন্দ তা জানতে পারবে। যদি সেগুলো ভাল হয় তবে তারা ভাল বিনিময় পাবে এবং যদি মন্দ হয় তবে মন্দ বিনিময়ই প্রাপ্ত হবে।

১০৯। আর কঠিন অঙ্গীকার সহকারে আল্লাহর নামে কসম করে তারা বলে– কোন একটা নিদর্শন (মু'জিযা) তাদের কাছে আসলে তারা ঈমান আনবে। (হে মুহাম্মাদ সঃ)! তুমি বলে দাও– নিদর্শনগুলো সমস্তই আল্লাহর অধিকারে।

١٠٩- وَاَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَآءَتْهُمْ اٰيَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا ۭ قُلْ اِنَّمَا الْاٰيٰتُ

عِنْدَ اللّٰهِ وَ مَا يُشْعِرُكُمْ اَنَّهَاۤ اِذَا جَآءَتْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ○

আর (হে মুসলমানরা)! কি করে তোমাদেরকে বুঝানো যাবে যে, নিদর্শন আসলেও তারা ঈমান আনবে না!

١١٠- وَ نُقَلِّبُ اَفْـــئِـــدَتَهُمْ وَ اَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوْا بِهٖۤ اَوَّلَ مَـــــــرَّةٍ وَّ نَذَرُهُمْ فِيْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ○ ع

১১০। আর যেহেতু তারা প্রথমবার ঈমান আনেনি, এর ফলে তাদের মনোভাবের ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করে দিবো এবং তাদেরকে তাদের অবাধ্যতার মধ্যেই বিভ্রান্ত থাকতে দিবো।

মুশরিকরা আল্লাহর নামে কসম করে বলে—যদি মুহাম্মাদ (সঃ)-কে কোন মু'জিযা দেয়া হয় এবং তার দ্বারা অলৌকিক ঘটনা সংঘটিত হয় তবে ঈমান আনবো। তাদের এই কথার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল (সঃ)-কে বলেন, হে নবী (সঃ)! তুমি তাদেরকে বলে দাও, মু'জিযা তো আল্লাহ্ তা'আলার কাছে রয়েছে। তিনি ইচ্ছা করলে আমাকে মু'জিযা প্রদান করবেন, ইচ্ছা না করলে না করবেন। কুরায়েশরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলেছিল— "হে মুহাম্মাদ (সঃ)! আপনি তো আমাদেরকে বলেছেন যে, হযরত মূসা (আঃ) তাঁর লাঠিখানা পাথরের উপর মারা মাত্রই তাতে বারোটি ঝরণা বের হয়েছিল। হযরত ঈসা (আঃ) মৃতকে জীবিত করতেন। সামুদ জাতিও (হযরত সালিহ আঃ -এর কাছে) উষ্ট্রীর মু'জিযা দেখেছিল। সুতরাং আপনিও যদি এ ধরনের কোন মু'জিযা আমাদের সামনে পেশ করতে পারেন তবে আমরা আপনাকে সত্য নবী বলে মেনে নেবো।" রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন তাদেরকে বলেছিলেনঃ "তোমরা কি মু'জিযা দেখতে চাও?" তারা উত্তরে বলেছিলঃ "এই সাফা পাহাড়কে আমাদের জন্যে সোনা বানিয়ে দিন।" তিনি তাদেরকে বলেনঃ "যদি এরূপ হয়ে যায় তবে তোমরা একত্ববাদে বিশ্বাস করবে তো?" তারা উত্তরে বলেঃ "হ্যাঁ, আমরা সবাই ঈমান আনবো।" তিনি তখন উঠেন এবং আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতে শুরু করেন। তখন জিবরাঈল (আঃ) আগমন করেন এবং বলেনঃ "আপনি চাইলে সাফা পাহাড়কে সোনায় পরিণত করা হবে। কিন্তু তারপরেও যদি তারা ঈমান না আনে তবে তৎক্ষণাৎ তাদের উপর আল্লাহর শাস্তি নেমে আসবে। আর আপনি

ইচ্ছা করলে এদেরকে এভাবেই ছেড়ে দেয়া হোক। কেননা, হয়তো পরবর্তীকালে এদের মধ্যে কেউ কেউ ঈমান আনবে এবং তাওবা করবে।" তাই, আল্লাহ পাক বলেনঃ "তারা কঠিন অঙ্গীকার সহকারে আল্লাহর নামে কসম করে বলে ... তারা ঈমান আনবে না।" কিন্তু কথা এই যে, তাদের অধিকাংশই অজ্ঞ ও মূর্খ। আল্লাহ পাক বলেনঃ মু'জিযা প্রেরণে আমার কাছে শুধু এটাই প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, তাদের পূর্ববর্তী লোকেরা মু'জিযা দেখার পরেও ঈমান আনেনি। সুতরাং এরাও যদি মু'জিযা দেখার পরেও ঈমান আনয়ন না করে তবে সাথে সাথেই তাদের উপর শাস্তি এসে পড়বে এবং যে অবকাশ তাদেরকে দেয়া হয়েছে তা আর থাকবে না। তোমাদেরকে কি করে বুঝানো যাবে যে, তাদের কাছে মু'জিযা আসলেও তারা ঈমান আনবে না।

কেউ কেউ বলেছেন যে, يُشْعِرُكُمْ দ্বারা মুশরিকদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। আল্লাহ পাক যেন তাদেরকে বলছেন– যে ঈমান যুক্ত কথাগুলো কসম করে করে বলা হচ্ছে সেগুলো কি তোমরা প্রকৃতই সত্য মনে করছো?

اَنَّهَا اِذَا جَآءَتْ لَا يُؤْمِنُوْنَ- এখানেও اِنَّ-এর هَمْزَه -কে যের দিয়ে পড়া হয়েছে এই ভিত্তিতে যে, মু'জিযা দেখার পর ঈমান না আনার সংবাদ শুরু করা হয়েছে। কাজেই 'ইন্না' পড়তে হচ্ছে। কেউ কেউ تُؤْمِنُوْنَ অর্থাৎ ت দ্বারা পড়েছেন এবং বলা হয়েছে যে, وَمَا يُشْعِرُكُمْ দ্বারা মুমিনদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। অর্থাৎ "হে মুমিনগণ! তোমরা কি জান যে, এই নিদর্শনগুলো প্রকাশিত হওয়ার পরেও এরা ঈমান আনবে না?" এই অবস্থায় اَنَّهَا -এর هَمْزَه -কে যবরের সাথেও পড়া যেতে পারে এবং যেরের সাথেও পড়া যেতে পারে। অর্থাৎ এটা يُشْعِرُكُمْ -এর مَعْمُوْل হয়ে এবং এই অবস্থায় لَا يُؤْمِنُوْنَ -এর صِلَه হবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ مَا مَنَعَكَ اَلَّا تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُكَ (৭ঃ ১২) এখানেও اَنْ لَا -এ اَنْ শব্দটি صِلَه হয়েছে। আল্লাহ পাক বলেনঃ وَحَرٰمٌ عَلٰى قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَا اَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُوْنَ (২১ঃ ৯৫) এখানেও অনুরূপ অবস্থা। ...... وَمَا يُشْعِرُكُمْ -এই আয়াতের লুক্কায়িত ভাবার্থ হচ্ছে– হে মুমিনগণ! তোমাদের কাছে এর কি প্রমাণ আছে যে, এরা এদের চাওয়া নিদর্শন ও মু'জিযা দেখে অবশ্যই ঈমান আনবে? কেউ কেউ একথাও বলেছেন যে, اَنَّهَا এখানে لَعَلَّهَا অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এ কথা শোনা গেছে যে, আরববাসী বলে থাকেঃ اِذْهَبْ اِلَى السُّوْقِ اَنَّكَ تَشْتَرِىْ لَنَا شَيْئًا অর্থাৎ তুমি বাজারে

যাও এবং আমাদের জন্যে কিছু খরিদ করে আনবে। অর্থাৎ لَعَلَّكَ تَشْتَرِىْ সম্ভবতঃ তুমি খরিদ করবে। অনুরূপভাবে এই দাবীর অনুকূলে আরবদের কবিতা পেশ করা হয়েছে।

আল্লাহ পাক বলেনঃ وَنُقَلِّبُ اَفْئِدَتَهُمْ وَ اَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوْا بِهٖ اَوَّلَ مَرَّةٍ

অর্থাৎ "যেহেতু তারা প্রথমবার ঈমান আনেনি, এর ফলে আমি তাদের মনোভাবের ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করে দেবো।" অর্থাৎ তাদের অস্বীকার ও কুফরীর কারণে আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তর এবং দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটিয়েছেন। তারা এখন কিছুই মানতে রাজী নয়। তাদের মধ্যে ও ঈমানের মধ্যে বিচ্ছেদ এসে গেছে। তারা সারা দুনিয়ার নিদর্শন ও মু'জিযা দেখলেও ঈমান আনবে না। যেমন প্রথমবার তাদের মধ্যে ও তাদের ঈমানের মধ্যে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়েছিল। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, তারা যা বলবে তা বলার পূর্বেই আল্লাহ ওর সংবাদ দিয়েছেন এবং তারা যে আমল করবে, পূর্বেই তিনি সেই খবর দিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেনঃ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيْرٍ অর্থাৎ "(মহা মহিমান্বিত) খবরদাতার মত কেউ তোমাকে খবর দিতে পারে না।" (৩৫ঃ ১৪) "মানুষ বলবে, হায়, আফসোস! যে বাড়াবাড়ি ও পাপ কার্য আমি করেছি ...... যদি আমাকে পুনরায় দুনিয়ায় ফিরিয়ে দেয়া হতো, তবে আমি সৎকর্মশীল লোকদের অন্তর্ভুক্ত হতাম।" আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "যদি তাদেরকে দুনিয়ায় পুনরায় ফিরিয়ে দেয়াও হয় তথাপি আবারও তারা হিদায়াতের উপর থাকবে না।" তিনি আরও বলেনঃ "যদি তাদেরকে (দুনিয়ায়) ফিরিয়ে দেয়াও হয় তবুও তারা নিষিদ্ধ কাজগুলোতেই পুনরায় লিপ্ত হয়ে পড়বে, নিশ্চয়ই তারা মিথ্যাবাদী।" অর্থাৎ দ্বিতীয়বার দুনিয়ায় ফিরে যাওয়ার পরেও তারা পূর্বের মতই ঈমান আনবে না। কেননা, এই সময়ের ন্যায় ঐ সময়েও আল্লাহ তাদের অন্তর ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটাবেন এবং আবারও তাদের মধ্যে ঈমানের প্রতিবন্ধতকার সৃষ্টি হয়ে যাবে। আর আল্লাহ পাক তাদেরকে তাদের অবাধ্যতার মধ্যেই বিভ্রান্ত থাকতে দেবেন।

সপ্তম পারা সমাপ্ত

١١١- وَلَوْ اَنَّنَا نَزَّلْنَآ اِلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتٰى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْآ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُوْنَ ○

১১১। আমি যদি তাদের কাছে ফেরেশ্তাও অবতীর্ণ করতাম, আর মৃতগণও যদি তাদের সাথে কথাবার্তা বলতো এবং দুনিয়ার সমস্ত বস্তুও যদি আমি তাদের চোখের সামনে সমবেত করতাম, তবুও তারা ঈমান আনতো না আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত, কিন্তু তাদের অধিকাংশই অজ্ঞ।

আল্লাহ পাক বলেনঃ যারা কসম করে করে বলে যে, তারা কোন নিদর্শনও মু'জিযা দেখতে পেলে অবশ্যই ঈমান আনবে, তাদের প্রার্থনা যদি আমি কবূল করি এবং তাদের উপর ফেরেশতাও অবতীর্ণ করি যারা রাসূলদেরকে সত্যায়িত করবে এবং তোমার (মুহাম্মাদ সঃ-এর) রিসালাতের সাক্ষ্য প্রদান করবে, তথাপিও তারা ঈমান আনবে না। যেমন আল্লাহ তা'আলা তাদের উক্তি উদ্ধৃত করে বলেনঃ "আপনি আল্লাহ এবং ফেরেশতাদেরকে এনে হাজির করুন। আর আমরা ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমান আনবো না যতক্ষণ পর্যন্ত অন্যান্য রাসূলদের মত আপনিও নিদর্শনসমূহ পেশ না করবেন।" "যারা আমার সাথে সাক্ষাতের বিশ্বাস রাখে না তারা বলে– আমাদের উপর কেন ফেরেশতা অবতীর্ণ করা হয় না, কেন আমরা আমাদের প্রভুকে দেখতে পাই না? এরা বড়ই একগুঁয়েমি ও অবাধ্যতার মধ্যে রয়েছে।" "আর যদি ফেরেশতাও তাদের কাছে এসে কথা বলে এবং রাসূলদেরকে সত্যায়িত করে ও সমস্ত জিনিসের ভাণ্ডার তাদের কাছে এনে জমা করে দেয়, তথাপি তারা ঈমান আনবে না।" قُبُلًا শব্দটিকে কেউ কেউ قَافْ -এ যের দিয়ে এবং بَا -কে যবর দিয়ে পড়েছেন, যার অর্থ হচ্ছে প্রতিদ্বন্দ্বিতা। আবার কেউ কেউ দু'টোকেই পেশ দিয়ে পড়েছেন, যার কারণে অর্থ দাঁড়িয়েছে–"দলে দলে লোক এসেও যদি রাসূলদেরকে সত্যায়িত করে তথাপিও তারা ঈমান আনবে না। হিদায়াত দান তো একমাত্র আল্লাহর হাতে। যতই লোক হোক না কেন তাদেরকে হিদায়াত করতে পারবে না। তিনি যা চান তা-ই করেন। তিনি সকলকেই প্রশ্ন করবেন, কিন্তু তাঁকে প্রশ্ন করা যেতে পারে না।" যেমন তিনি

বলেনঃ "(হে নবী সঃ!) যাদের উপর তোমার প্রভুর কথা সত্য ও পূর্ণ হয়ে গেছে তারা সমস্ত নিদর্শন দেখলেও ঈমান আনবে না, যে পর্যন্ত না তারা বেদনাদায়ক শাস্তি অবলোকন করে।"

১১২। আর এমনিভাবেই আমি প্রত্যেক নবীর জন্যে বহু শয়তানকে শত্রুরূপে সৃষ্টি করেছি, তাদের কতক শয়তান মানুষের মধ্যে এবং কতক শয়তান জ্বিনদের হতে হয়ে থাকে, এরা একে অন্যকে কতগুলো মনোমুগ্ধকর, ধোঁকাপূর্ণ ও প্রতারণাময় কথা দ্বারা প্ররোচিত করে থাকে, তোমার প্রতিপালকের ইচ্ছা হলে তারা এমন কাজ করতে পারতো না, সুতরাং তুমি তাদেরকে এবং তাদের মিথ্যা রচনাগুলোকে বর্জন করে চলবে।

١١٢- وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيٰطِيْنَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ يُوْحِيْ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوْرًا وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوْهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُوْنَ ○

১১৩। (তাদের এরূপ প্ররোচনামূলক কথার উদ্দেশ্য হলো) যারা পরকালের প্রতি ঈমান রাখে না তাদের অন্তরকে ঐ দিকে অনুরক্ত করা; এবং তারা যেন তাতে সন্তুষ্ট থাকে আর তারা যেসব কাজ করে তা যেন তারাও করতে থাকে।

١١٣- وَلِتَصْغٰۤى اِلَيْهِ اَفْئِدَةُ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوْا مَا هُمْ مُّقْتَرِفُوْنَ ○

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল (সঃ)-কে বলেনঃ হে মুহাম্মাদ (সঃ)! তোমার যেমন বিরোধিতাকারী ও শত্রু রয়েছে, অনুরূপভাবে তোমার পূর্ববর্তী নবীদেরও বিরোধিতাকারী ও শত্রুতাকারী ছিল। সুতরাং তুমি তাদের বিরোধিতার কারণে

দুঃখিত হয়ো না। মহান আল্লাহ স্বীয় নবী (সঃ)-কে আরও বলেনঃ তোমার পূর্ববর্তী নবীরা এমনই ছিল যে, লোকেরা তাদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন ও অবিশ্বাস করতো এবং বিভিন্ন প্রকারের কষ্ট দিতো, তথাপি তারা ধৈর্যধারণ করতো। হে রাসূল (সঃ)! এই লোকগুলো তোমাকে যা কিছু বলছে, তোমার পূর্ববর্তী রাসূলদেরকেও এসব কথাই বলা হয়েছিল। জেনে রেখো যে, আল্লাহ যেমন ক্ষমতাশীল তেমনই কঠিন শাস্তিদাতাও বটে। আল্লাহ পাক বলেনঃ 'এভাবেই আমি প্রত্যেক নবীর জন্যে মানুষ ও জ্বিনের শয়তানদেরকে শত্রুরূপে সৃষ্টি করেছি। ওয়ারাকা ইবনে নওফল রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলেছিলেনঃ "হে মুহাম্মাদ (সঃ)! এই কুরায়েশরা আপনার সাথে শত্রুতা করবে এবং যে কোন নবীই আপনার মত কথা স্বীয় উম্মতকে বলেছেন তাঁর সাথেই শত্রুতা করা হয়েছে।"[১] شَيٰطِيْنَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ হচ্ছে بَدَل এবং عَدُوًّا হচ্ছে مُبْدَلٌ مِنْهُ অর্থাৎ তাঁদের শত্রুরা হচ্ছে মানুষ ও জ্বিনদের মধ্যকার শয়তানগণ। আর শয়তান এমন সবকেই বলা হয় যাদের দুষ্টামির কোন নযীর থাকে না। ঐ রাসূলদের শত্রুতা ঐ শয়তানরা ছাড়া আর কে-ই বা করতে পারে যারা তাঁদেরই জাতি ও শ্রেণীভুক্ত? কাতাদা (রঃ) বলেন যে, জ্বিনদের মধ্যেও শয়তান আছে এবং মানুষের মধ্যেও শয়তান রয়েছে। তারা নিজ নিজ দলভুক্তদেরকে পাপকার্য শিক্ষা দিয়ে থাকে। কাতাদা (রঃ) বলেনঃ আমার কাছে এ সংবাদ পৌঁছেছে যে, হযরত আবূ যার (রাঃ) একদা নামায পড়ছিলেন। সে সময় নবী (সঃ) তাঁকে বলেছিলেন– "হে আবূ যার (রাঃ)! মানুষ ও জ্বিনের শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা কর।" তখন তিনি বলেন, মানুষের মধ্যেও কি শয়তান রয়েছে? উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, "হ্যাঁ"।[২] ইবনে জারীর (রঃ) হযরত আবূ যার (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন, আমি একদা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট আগমন করি। মজলিস বড় হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে বলেনঃ "হে আবূ যার (রাঃ)! তুমি কি নামায পড়েছ?" আমি উত্তরে বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (সঃ)! না (আমি নামায পড়িনি)। তিনি বললেন, উঠ, দু'রাক'আত নামায পড়। তিনি (আবূ যার রাঃ) বলেনঃ (আমি দু'রাক'আত নামায পড়লাম) অতঃপর তাঁর কাছে এসে বসে পড়লাম। তখন তিনি বললেন, "হে আবূ যার (রাঃ)! তুমি কি জ্বিন ও মানুষের শয়তানদের থেকে

১। এটি একটি দীর্ঘ হাদীসের অংশ বিশেষ, যে হাদীসটি ইমাম বুখারী (রঃ) স্বীয় 'সহীহ' গ্রন্থে بَدْءُ الْوَحْيِ অনুচ্ছেদে তাখরীজ করেছেন।

২। ইবনে কাসীর (রঃ) বলেন যে, এটা তো কাতাদা ও আবূ যার (রাঃ)-এর মধ্যে مُنْقَطِعٌ হচ্ছে!

আশ্রয় প্রার্থনা করেছো?" আমি বললাম, না, হে আল্লাহ্র রাসূল (সঃ)! মানুষের মধ্যেও কি শয়তান রয়েছে? তিনি উত্তরে বললেন, "হ্যাঁ, তারা জ্বিনের শয়তানদের চেয়েও দুষ্টতম।"[১]

ইবনে আবি হাতিম (রঃ) আবূ উমামা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ হে আবূ যার (রাঃ)! তুমি জ্বিন ও মানুষের শয়তানদের থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করেছো?" তিনি উত্তরে বলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! মানুষের মধ্যেও কি শয়তান রয়েছে?" রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 'হ্যাঁ'।

ইকরামা (রঃ) বলেন যে, জ্বিনের শয়তানরা মানবরূপী শয়তানদের কাছে অহী নিয়ে আসে এবং মানবরূপী শয়তানরা জ্বিনের শয়তানদের কাছে অহী নিয়ে আসে।

يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا আল্লাহ পাকের এই উক্তি সম্পর্কে ইকরামা (রঃ) বলেন যে, মানুষের মধ্যেও শয়তান আছে এবং জ্বিনদের মধ্যেও আছে। এখন মানবরূপী শয়তানরা জ্বিন-শয়তানদের কাছে তাদের মনের সংকল্পের কথা প্রকাশ করে থাকে। তারা একে অপরের কাছে খারাপ কথার অহী করে। ইকরামা (রঃ) বলেন যে, মানবীয় শয়তান হচ্ছে তারাই যারা মানুষকে পাপকার্যের পরামর্শ দান করে এবং জ্বিনদের মধ্যকার শয়তানরা জ্বিনদেরকে পথভ্রষ্ট করে থাকে। সুতরাং প্রত্যেকেই নিজ নিজ সাথীকে বলে– "আমি তো আমার সঙ্গীকে পথভ্রষ্ট করেছি, তুমিও এভাবে তোমার সঙ্গীকে পথভ্রষ্ট কর।" এইভাবে তারা একে অপরকে পাপকার্যের শিক্ষা দান করতে থাকে। মোটকথা, ইবনে জারীর (রঃ) এটাই মনে করেছেন যে, ইকরামা ও সুদ্দীর মতে মানবীয় শয়তান দ্বারা দানবীয় ঐ শয়তানদেরকে বুঝানো হয়েছে যারা মানুষকে বিভ্রান্ত করে থাকে। অর্থ এটা নয় যে, মানুষের মধ্যে মানবীয় জ্বিনও রয়েছে। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, ইকরামার কথা দ্বারা এটাই প্রকাশ পাচ্ছে, কিন্তু সুদ্দীর কথা দ্বারা এ অর্থ বুঝায় না, যদিও এর সম্ভাবনা রয়েছে।

যহ্হাক (রঃ)-এর বর্ণনায় রয়েছে যে, জ্বিনদের মধ্যেও শয়তান আছে যারা তাদেরকে বিভ্রান্ত করে থাকে, যেমন মানবীয় শয়তান মানুষের বিভ্রান্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এখন মানবীয় শয়তান দানবীয় শয়তানদের সাথে মিলিত হয়ে বলে– তাকে এর দ্বারা বিভ্রান্ত কর এবং এভাবে বিভ্রান্ত কর। যেমন আল্লাহ পাক বলেনঃ

১। এতেও اِنْقِطَاعْ রয়েছে। আহমাদ ও ইবনে মিরদুওয়াই থেকে مُتَّصِلْ রূপে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا

অর্থাৎ "তারা একে অপরকে কতগুলো মনোমুগ্ধকর ধোঁকাপূর্ণ ও প্রতারণাময় কথা দ্বারা প্ররোচিত করে থাকে।" মোটকথা, সঠিক কথা হচ্ছে ওটাই যা হযরত আবূ যার (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে। তা হচ্ছে এই যে, মানুষের মধ্যেও মানবীয় শয়তান রয়েছে এবং প্রত্যেক জিনিসের শয়তান হচ্ছে ওরই শ্রেণীভুক্ত অবাধ্য ও উদ্ধত জিনিসটা। সহীহ মুসলিমে হযরত আবূ যার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন– "কালো কুকুর শয়তান হয়ে থাকে।" এর অর্থ এটাই দাঁড়ায় যে, ওটা কুকুরের মধ্যে শয়তান। মুজাহিদ (রঃ) এই আয়াতের তাফসীরে লিখেছেন যে, জ্বিন জাতির কাফিররা হচ্ছে দানবীয় শয়তান এবং ঐ শয়তানরা মানবীয় শয়তানদের কাছে অহী পাঠিয়ে থাকে। আর মানব জাতির কাফিররা হচ্ছে মানবীয় শয়তান।

ইকরামা (রঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ আমি একদা মুখতারের কাছে গমন করি। সে আমাকে অতিথি হিসেবে গ্রহণ করে এবং রাতেও আমাকে তার কাছে অবস্থান করায়। অতঃপর সে আমাকে বলে, "আমার কওমের কাছে যাও এবং তাদেরকে হাদীস শুনাও।" আমি তখন তার কথামত তাদের কাছে গমন করি। একটি লোক আমার সামনে এসে বলে– "অহী সম্পর্কে আপনার মতামত কি?" আমি উত্তরে বলি– অহী দু' প্রকারের হয়ে থাকে। আল্লাহ পাক বলেন, بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هٰذَا الْقُرْاٰنَ অর্থাৎ "(হে নবী সঃ!) আমি এই কুরআন তোমার কাছে অহী করেছি।" (১২ঃ ৩) আর এক জায়গায় তিনি বলেনঃ

شَيٰطِيْنَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا

অর্থাৎ "মানবী শয়তান ও দানবীয় শয়তানরা একে অপরের কাছে কতগুলো মনোমুগ্ধকর ধোঁকাপূর্ণ ও প্রতারণাময় কথার অহী করে থাকে।" এ কথা শোনামাত্র তারা আমার উপর আক্রমণ করে বসে এবং আমাকে মার পিট করতে উদ্যত হয়। আমি তাদেরকে বলি, এটা তোমাদের কি ধরনের আচরণ? আমি তো তোমাদের একজন মেহমান! শেষ পর্যন্ত তারা আমাকে ছেড়ে দেয়। ইকরামা (রঃ) মুখতারের কাছে এ কথাটা পেশ করেছিলেন। সে ছিল আবূ উবাইদের পুত্র। আল্লাহ তার মঙ্গল না করুন! সে ধারণা করতো যে, তার কাছেও অহী এসে থাকে। তার বোন সুফিয়া হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ)-এর স্ত্রী ছিলেন। তিনি একজন সতী সাধ্বী মহিলা ছিলেন। আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) যখন খবর দেন যে, মুখতার তার উপর অহী আসার দাবী করে থাকে, তখন

ইকরামা (রঃ) বলেনঃ "আল্লাহ তা'আলা সত্য বলেছেন যে, শয়তানেরা তাদের বন্ধুদের কাছে অহী করতে থাকে এবং একে অপরের কাছে মিথ্যে কথা পৌঁছিয়ে বেড়ায়, যা শোনার ফলে শ্রবণকারী তার উপর প্রভাবিত হয়ে পড়ে। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ যদি আল্লাহ চাইতেন তবে তারা এরূপ করতো না। অর্থাৎ এ সবকিছু আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা ও মর্জিতেই হচ্ছে যে, প্রত্যেক নবীরই শত্রু লোকদের মধ্য থেকেই হয়ে থাকে। সুতরাং হে নবী (সঃ)! তুমি তাদেরকে ক্ষমা করে দাও এবং তাদের মিথ্যা অপবাদ থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও। তাদের শত্রুতার ব্যাপারে তুমি আল্লাহর উপরই ভরসা কর। তিনিই তোমার জন্যে যথেষ্ট।

وَلِتَصْغٰۤى اِلَيْهِ আল্লাহ পাকের এ উক্তির অর্থ এই যে, যারা পরকালের উপর বিশ্বাস করে না তারা এসব শয়তানের দিকে ঝুঁকে পড়ে এবং তাদের বন্ধু ও সহায়ক হয়ে যায়। তারা একে অপরকে খুশী করতে থাকে। যেমন তিনি বলেনঃ

فَاِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ ـ مَاۤ اَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفٰتِنِيْنَ ـ اِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيْمِ ـ

অর্থাৎ "তোমরা এবং তোমাদের উপাস্যগণ (সমবেত হয়ে) আল্লাহ হতে কাউকেও ফিরাতে পারবে না। ঐ ব্যক্তি ছাড়া, যে জাহান্নামে প্রবেশকারী হবে।" (৩৭ঃ ১৬১-১৬৩) আর এক জায়গায় বলেনঃ

اِنَّكُمْ لَفِیْ قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ ـ يُّؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ اُفِكَ

অর্থাৎ "অবশ্যই তোমরা কিয়ামত সম্বন্ধে বিভিন্ন মত পোষণ করে থাক। ওটা হতে ঐ ব্যক্তিই নিরস্ত থাকে, যে (সম্পূর্ণরূপে মঙ্গল হতে) বিরত থাকতে চায়।" (৫১ঃ ৮-৯)

মহান আল্লাহ বলেনঃ وَلِيَقْتَرِفُوْا مَا هُمْ مُّقْتَرِفُوْنَ অর্থাৎ হে নবী (সঃ)! যদি তারা শয়তান হয়ে বিভ্রান্ত করতে থাকে এবং লোকেরা তাদের দিকে ঝুঁকে পড়ে, তবে তারা যা উপার্জন করতে রয়েছে তা তাদেরকে উপার্জন করতে দাও।

১১৪। (হে মুহাম্মাদ সঃ! তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর) তবে কি আমি আল্লাহকে বর্জন করে অন্য কাউকে মীমাংসাকারী ও বিচারকরূপে অনুসন্ধান করবো? অথচ তিনিই তোমাদের কাছে এই কিতাবকে

١١٤- اَفَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْتَغِيْ حَكَمًا وَّهُوَ الَّذِيْۤ اَنْزَلَ اِلَيْكُمُ الْكِتٰبَ مُفَصَّلًا ؕ وَالَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ

الْكِتٰبَ يَعْلَمُوْنَ اَنَّهٗ مُنَزَّلٌ مِّنْ رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ ۝

বিস্তারিতভাবে অবতীর্ণ করেছেন! আর আমি যাদেরকে কিতাব দান করেছি তারা জানে যে, এই কিতাব তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হতেই যথার্থ ও সঠিকভাবে অবতীর্ণ করা হয়েছে, সুতরাং তুমি সন্দেহ পোষণকারীদের মধ্যে শামিল হয়ো না।

١١٥- وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَّعَدْلًا ۭ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِهٖ ۚ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۝

১১৫। তোমার প্রতিপালকের বাণী সত্যতা ও ইনসাফের দিক দিয়ে পরিপূর্ণতায় পরিণত হয়েছে, তাঁর বাণী পরিবর্তনকারী কেউই নেই, তিনি সবকিছু শোনেন ও সবকিছু জানেন।

মহান আল্লাহ্ স্বীয় নবীকে সম্বোধন করে বলেছেন, হে নবী (সঃ)! তুমি এই মুশরিকদেরকে বলে দাও– আমি কি আমার ও তোমাদের মধ্যে আল্লাহকে ছাড়া আর কাউকেও বিচারক ও মীমাংসাকারী রূপে অনুসন্ধান করবো? অথচ তিনি তোমাদের কাছে একটি বিস্তারিতভাবে লিখিত কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। শুধু তোমাদের জন্যে নয়, বরং এই কিতাব তিনি আহলে কিতাবদের জন্যেও অবতীর্ণ করেছেন। ইয়াহূদী ও নাসারা সবাই এটা জানে যে, এই কিতাব সত্য সত্যই আল্লাহ তা'আলার নিকট থেকেই অবতীর্ণ হয়েছে। কেননা, তোমাদের ব্যাপারে তাদের কিতাবে পূর্ববর্তী নবীদের শুভ সংবাদ বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং তোমরা সন্দেহের মধ্যে পতিত হয়ো না। যেমন আল্লাহ পাক্ বলেনঃ "আমি তোমার উপর যা অবতীর্ণ করেছি তাতে যদি তোমার কোন সন্দেহ হয় তবে তোমার পূর্ববর্তী কিতাবের যারা পাঠক তাদেরকে জিজ্ঞেস কর, তোমার কাছে আমার পক্ষ থেকে সত্য জিনিসই এসেছে, সুতরাং তুমি সন্দেহ পোষণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।" এই আয়াতটি শর্তরূপে এসেছে, আর শর্ত প্রকাশিত হওয়া জরুরী নয়। এ জন্যেই নবী (সঃ) বলেনঃ "আমি সন্দেহও করি না এবং জিজ্ঞেস করারও আমার প্রয়োজন নেই।"

وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَّعَدْلًا অর্থাৎ হে নবী (সঃ)! তোমার প্রভুর বাণী সত্যতা ও ইনসাফের দিক দিয়ে পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। যা কিছু তিনি বলেন তার সবই সত্য। তা যে সত্য এতে কোন সন্দেহই থাকতে পারে না। আর যা কিছু তিনি হুকুম করেন তা ইনসাফ ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। তিনি যা থেকে বিরত থাকতে বলেন তা বাতিল ও ভিত্তিহীনই হয়ে থাকে। তিনি খারাপ ও অন্যায় থেকেই বিরত থাকতে বলেন। যেমন তিনি বলেনঃ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهٰهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ অর্থাৎ "তিনি তাদেরকে ভাল কাজের আদেশ করেন এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করেন।" (৭ঃ ১৫৭) لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِهٖ অর্থাৎ দুনিয়া ও আখিরাতে তাঁর হুকুম পরিবর্তনকারী কেউই নেই। তিনি স্বীয় বান্দাদের কথা শুনে থাকেন এবং তাদের সমুদয় কাজ সম্পর্কে তিনি পূর্ণ ওয়াকিফহাল। প্রত্যেক আমলকারীর আমলের বিনিময় তিনি আমল অনুযায়ীই দিয়ে থাকেন।

١١٦- وَاِنْ تُطِعْ اَكْثَرَ مَنْ فِي الْاَرْضِ يُضِلُّوْكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِنْ هُمْ اِلَّا يَخْرُصُوْنَ ○

১১৬। (হে নবী সঃ)! তুমি যদি দুনিয়াবাসীদের অধিকাংশ লোকের কথামত চল, তবে তারা তোমাকে আল্লাহর পথ হতে বিভ্রান্ত করে ফেলবে, তারা নিছক ধারণা ও অনুমানের ভিত্তিতেই চলে, তারা ধারণা ও অনুমান ছাড়া কিছুই করছে না।

١١٧- اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ مَنْ يَّضِلُّ عَنْ سَبِيْلِهٖ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ○

১১৭। কোন্ ব্যক্তি আল্লাহর পথ হতে বিভ্রান্ত হয়েছে তা তোমার প্রতিপালক নিশ্চিতভাবে অবগত আছেন, আর তিনি তাঁর পথের পথিকগণ সম্পর্কেও খুব ভালভাবে জ্ঞাত রয়েছেন।

আল্লাহ পাক বলেনঃ বানী আদমের অধিকাংশের অবস্থা বিভ্রান্তিতে পরিপূর্ণ। যেমন তিনি বলেনঃ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ اَكْثَرُ الْاَوَّلِيْنَ "তাদের পূর্ববর্তী লোকদের অধিকাংশই ভ্রান্তির পথ অবলম্বন করেছিল।" (৩৭ঃ ৭১) আর এক জায়গায়

তিনি বলেন, وَمَا اَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْحَرَصْتَ بِمُؤْمِنِيْنَ অর্থাৎ "(হে নবী সঃ)! তুমি আকাঙ্ক্ষা করলেও লোকদের অধিকাংশই মুমিন নয়।" (১২ঃ ১০৩) তারা ভ্রান্তির মধ্যে রয়েছে। মজার কথা এই যে, তাদের আমলের উপর তাদের নিজেদেরই বিশ্বাস নেই। তারা মিথ্যা ধারণার উপর বিভ্রান্ত হয়ে ফিরতে রয়েছে। তারা অনুমানে কথা বলছে এবং সন্দেহের মধ্যে পতিত হয়েছে।

خَرْصٌ ও اِلَّايَخْرُصُوْنَ শব্দের অর্থ হচ্ছে আন্দাজ ও অনুমান করা। বৃক্ষ ও চারা গাছের অনুমান করাকে বলা হয় خَرْصُ النَّخْلِ বা খেজুর গাছের অনুমান করণ। আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা ও অনুমান এই যে, তিনি স্বীয় পথ হতে বিভ্রান্ত পথিককে ভালভাবেই জানেন। এ জন্যেই তিনি তার পক্ষে বিভ্রান্ত হওয়াকে সহজ করে দেন। আর যারা সুপথ প্রাপ্ত, তিনি তাদের সম্পর্কেও পূর্ণ ওয়াকিফহাল। তিনি তাদের জন্যেও হিদায়াতকে সহজ করে দেন। যে জিনিস যার জন্যে সমীচীন তাই তিনি তার জন্যে সহজ করে থাকেন।

১১৮। অতএব, যে জীবকে আল্লাহর নাম নিয়ে যবাই করা হয়েছে তা তোমরা ভক্ষণ কর– যদি তোমরা আল্লাহর বিধানের প্রতি ঈমান রাখ।

١١٨- فَكُلُوْا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ بِاٰيٰتِهٖ مُؤْمِنِيْنَ ۝

১১৯। যে জন্তুর উপর যবাই করার সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয়েছে, তা ভক্ষণ না করার তোমাদের কাছে কি কারণ থাকতে পারে? অথচ আল্লাহ পাক তোমাদের উপর যা কিছু হারাম করেছেন, তা তিনি সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন, তবে নিরুপায় অবস্থায় তোমরা উক্ত হারাম বস্তুও আহার করতে পার, নিঃসন্দেহে কোন ইলম না থাকা সত্ত্বেও নিজেদের ইচ্ছা,

١١٩- وَمَا لَكُمْ اَلَّا تَاْكُلُوْا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ اِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ اِلَيْهِ وَاِنَّ كَثِيْرًا لَّيُضِلُّوْنَ بِاَهْوَآئِهِمْ

بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ ○

বাসনা ও ভ্রান্ত ধারণার ভিত্তিতে বহুলোক পথভ্রষ্ট হচ্ছে, নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক সীমালংঘনকারীগণ সম্পর্কে ভালভাবেই ওয়াকিফহাল।

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় মুমিন বান্দারদেরকে অনুমতি দিচ্ছেন যে, কোন জীবকে যবাই করার সময় বিসমিল্লাহ বলা হলে তারা সেই জীবের গোশত খেতে পারে। অর্থাৎ যে জন্তুকে আল্লাহর নাম না নিয়ে যবাই করা হয় তা হারাম। যেমন কাফির কুরায়শরা মৃত জন্তুকে ভক্ষণ করতো এবং যে জন্তুগুলোকে মূর্তি ইত্যাদির নামে যবাই করা হতো সেগুলোকেও খেতো। মহান আল্লাহ বলেন, যে জন্তুর উপর আল্লাহর নাম নেয়া হয়েছে তা তোমরা খাবে না কেন? তিনি তো হারাম জিনিসগুলো তোমাদের জন্যে বর্ণনা করে দিয়েছেন এবং স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন। কেউ কেউ ফাস্‌সালা অর্থাৎ তাশদীদসহ পড়েছেন এবং কেউ কেউ ফাসালা অর্থাৎ তাখফীফসহ পড়েছেন। দু'টোরই অর্থ হচ্ছে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা। আল্লাহ পাক বলেনঃ তবে হ্যাঁ, অত্যন্ত নিরুপায় অবস্থায় পতিত হলে সবকিছুই তোমাদের জন্যে হালাল।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের মিথ্যা ও ভিত্তিহীন মতবাদের উল্লেখ করে বলেনঃ তারা কিভাবে নিজেদের জন্যে এবং গায়রুল্লাহর নামে যবাইকৃত জন্তুকে হালাল করে নিয়েছে! তাদের অধিকাংশই অজ্ঞতার কারণে স্বীয় কুপ্রবৃত্তির পিছনে পড়ে পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে। আল্লাহ ঐ সব সীমা অতিক্রমকারীকে ভালরূপেই অবগত আছেন।

١٢٠- وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ ○

১২০। তোমরা প্রকাশ্য পাপকার্য পরিত্যাগ কর এবং পরিত্যাগ কর গোপনীয় পাপকার্যও, যারা পাপের কাজ করে, তাদেরকে অতিসত্বরই নিজেদের কৃতকার্যের প্রতিফল দেয়া হবে।

ইরশাদ হচ্ছে– তোমরা প্রকাশ্য ও গোপনীয় সমস্ত পাপকার্য পরিত্যাগ কর। মুজাহিদ (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, এর দ্বারা ঐ পাপকার্যকে বুঝানো হয়েছে যা কার্যে পরিণত করার নিয়ত কোন আমলকারী করেছে। কাতাদা (রঃ) বলেন যে, এর দ্বারা গোপনীয় ও প্রকাশ্য এবং কম বেশী গুনাহের কাজ বুঝানো হয়েছে। সুদ্দী (রঃ) বলেন যে, প্রকাশ্য পাপ হচ্ছে লজ্জাহীনা নারীদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা, আর গোপনীয় পাপকার্য হচ্ছে গুপ্তভাবে অসতী নারীদের সাথে কুকার্যে লিপ্ত হয়ে পড়া। ইকরামা (রঃ) বলেন যে, প্রকাশ্য পাপকার্য হচ্ছে বিবাহ-নিষিদ্ধ নারীদেরকে বিয়ে করা। কিন্তু সঠিক কথা এই যে, আয়াতটি 'আম বা সাধারণ। এটা কোন পাপকার্যকেই নির্দিষ্ট করে না। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, "হে নবী (সঃ)! তুমি বলে দাও– আমার প্রতিপালক সর্ব প্রকারের নির্লজ্জতাপূর্ণ কাজকে হারাম করে দিয়েছেন, সেগুলো প্রকাশ্যভাবেই হোক বা গোপনীয়ভাবেই হোক। এ জন্যেই আল্লাহ পাক বলেন, যারা পাপের কাজ করে, তাদেরকে সত্বরই তাদের কৃতকর্মের প্রতিফল দেয়া হবে, সেই কাজ প্রকাশ্যভাবেই হোক বা গোপনীয়ভাবেই হোক। নুওয়াস ইবনে সামআন (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে إِثْمٌ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, "যাতে তোমার অন্তরে খট্‌কা লাগে এবং তুমি এটা পছন্দ কর না যে, লোকের কাছে তা প্রকাশ হয়ে পড়ুক তাই إِثْمٌ বা গুনাহ।"[১]

১২১। আর যে জন্তু যবাই করার সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয়নি, তা তোমরা ভক্ষণ করো না, কেননা এটা গর্হিত বস্তু, শয়তানরা নিজেদের সঙ্গী সাথীদের মনে নানা প্রকার সন্দেহ ও প্রশ্ন সৃষ্টি করে থাকে, যেন তারা তোমাদের সাথে ঝগড়া ও বিতর্ক করতে পারে, যদি তোমরা তাদের আকীদা-বিশ্বাস ও কাজ-কর্মে আনুগত্য কর, তবে নিঃসন্দেহে তোমরা মুশরিক হয়ে যাবে।

١٢١- وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيٰطِيْنَ لَيُوْحُوْنَ إِلٰى أَوْلِيٰئِهِمْ لِيُجَادِلُوْكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوْهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُوْنَ ۝

---

১. এই হাদীসটি ইবনে আবি হাতিম (রঃ) নুওয়াস ইবনে সামআন (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন।

এই আয়াতে এটাই বলা হয়েছে যে, যখন কোন জন্তুকে যবাই করার সময় আল্লাহর নাম নেয়া হবে না তখন সেটা হালাল নয়, যদিও যবাইকারী মুসলমান হয়। ফিকাহ্ শাস্ত্রের ইমামগণ এই মাসআলায় তিনটি উক্তির উপর মতভেদ করেছেন। কেউ বলেছেন যে, যে যবাইকৃত জন্তুর উপর আল্লাহর নাম নেয়া হয়নি সেটা হালাল নয়, নাম না নেয়া ইচ্ছাপূর্বকই হোক বা ভুল বশতঃই হোক।"[১] আসহাবে মুতাকাদ্দেমীন ও মুতাআখ্‌খেরীনের একটি দল এ উক্তিকেই সমর্থন করেছেন। পরবর্তী শাফিঈ মাযহাবের লোকেরা তাঁদের 'আরবাঈন' নামক গ্রন্থে এই মতটাই গ্রহণ করেছেন। দলীল হিসেবে তাঁরা এ আয়াতটিই পেশ করেছেন। আরও পেশ করেছেন শিকার সম্পর্কীয় নিম্নের আয়াতটিঃ

فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ

অর্থাৎ "তোমাদের শিকারীজন্তু তোমাদের জন্যে যা আবদ্ধ রাখে তা তোমরা খাও এবং ওর উপর আল্লাহর নাম নিয়ে নাও।" (৫ঃ ৪) মহান আল্লাহ وَاِنَّهٗ لَفِسْقٌ দ্বারা আরও গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং বলা হয়েছে যে, اِنَّهٗ -এর 'ه' সর্বনামটি اَكْل -এর দিকে প্রত্যাবর্তিত হচ্ছে। অর্থাৎ এরূপ যবাইকৃত জন্তু খাওয়া গর্হিত কাজ। আবার এ কথাও বলা হয়েছে যে, ذُبِحَ لِغَيْرِ اللّٰهِ -এর দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়েছে। অর্থাৎ গায়রুল্লাহর নামে যবাই করা গর্হিত কাজ। আর যবাই করা ও শিকার করার সময় আল্লাহর নাম নেয়ার যে হাদীসগুলো এসেছে সেগুলো হচ্ছে আদী ইবনে হাতিম ও আবূ সা'লাবা বর্ণিত হাদীসের মতই। তা হচ্ছে নিম্নরূপঃ

"যখন তোমরা তোমাদের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুরকে শিকারের উদ্দেশ্যে পাঠাবে এবং পাঠাবার সময় বিসমিল্লাহ বলবে তখন যদি কুকুর তোমাদের জন্যে শিকারকে ধরে রাখে এবং তা থেকে কিছুই না খায় তবে তা তোমরা খেতে পার, যদিও তা যখমী হয়ে মারা যায়।" হাদীসটি সহীহ বুখারী ও মুসলিমেও রয়েছে। রাফি' ইবনে খাদীজ (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন– "যা রক্ত প্রবাহিত করে এবং আল্লাহর নাম নেয়া হয় তা তোমরা খাও।" এই হাদীসটিও সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) জ্বিনদেরকে বলেনঃ "তোমাদের জন্যে প্রত্যেক সেই অস্থি বা হাড্ডি হালাল যার উপর আল্লাহর নাম নেয়া হয়েছে।"[২] হযরত জুনদুব ইবনে সুফিয়ান (রাঃ) বর্ণিত

---

১. এটা ইবনে উমার (রাঃ), শা'বী (রাঃ), নাফি' (রঃ) এবং মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন (রঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে।

২. হাদীসটি ইমাম মুসলিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন– ঈদ-উল-আযহার দিনে যে ব্যক্তি ঈদের নামাযের পূর্বে কুরবানী করলো, তার উচিত যে, সে যেন ঈদের নামাযের পর পুনরায় কুরবানীর পশু যবাই করে। আর যে ব্যক্তি নামাযের পূর্বে কুরবানী করেনি সে যেন নামাযের পর আল্লাহর নাম নিয়ে কুরবানীর পশু যবাই করে।"

হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, জনগণ রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করেন, "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! লোকেরা আমাদের কাছে গোশতের উপঢৌকন পাঠিয়ে থাকে, তারা যে ওর উপর আল্লাহর নাম নিয়েছে কি নেয়নি তা আমাদের জানা নেই (সুতরাং তা খাওয়া আমাদের জন্যে বৈধ হবে কি?)।" রাসূলুল্লাহ (সঃ) উত্তরে বলেন, "যদি তোমাদের সন্দেহ হয় তবে তোমরা নিজেরাই আল্লাহর নাম নিয়ে তা খেয়ে নাও।" হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন যে, ঐ লোকগুলো নওমুসলিম ছিল।[১] জনগণের জিজ্ঞেস করার কারণ এই যে, তাঁদের ধারণায় বিসমিল্লাহ বলা তো জরুরী, কিন্তু লোকগুলো নওমুসলিম হওয়ার কারণে বিসমিল্লাহ নাও বলে থাকতে পারে। তাই তাঁরা জিজ্ঞেস করেন এবং রাসূলুল্লাহ (সঃ) সতর্কতামূলকভাবে খাওয়ার সময় তাদেরকে বিসমিল্লাহ বলার উপদেশ দেন, যাতে ওর উপর বিসমিল্লাহ বলা না হয়ে থাকলেও খাওয়ার সময় বিসমিল্লাহ বলে নেয়া ওর বিনিময় হয়ে যায়। আর তিনি জনগণকে নির্দেশ দেন যে, ঠিকভাবে যেন ইসলামের আহকাম জারী হয়ে যায়।

দ্বিতীয় মাযহাব এই যে, যবাই করার সময় বিসমিল্লাহ বলা মোটেই শর্ত নয়, বরং মুস্তাহাব। যদি ইচ্ছাপূর্বক বা ভুলবশতঃ আল্লাহর নাম না নেয়াও হয় তবুও কোন ক্ষতি নেই। এটাই ইমাম শাফিঈর মাযহাব। ইমাম আহমাদ (রঃ) এবং ইমাম মালিকও (রঃ) এ কথাই বলেন। ইমাম শাফিঈ (রঃ) وَلَا تَأْكُلُوْا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ ...... -এই আয়াতকে ذُبِحَ لِغَيْرِ اللّٰهِ -এর উপর مَحْمُوْلٌ করেছেন। যেমন আল্লাহ পাকের اَوْ فِسْقًا اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ ০এই উক্তি রয়েছে। ইবনে জুরাইজ (রঃ) বলেছেন যে, এখানে খেতে নিষেধ করণ দ্বারা ঐ যবাইকৃত জন্তু উদ্দেশ্য যাকে কুরায়েশরা মূর্তির জন্যে যবাই করে। অনুরূপভাবে মাজুসদের যবাইকৃত জীবও হালাল নয়। এটাই ঐ মাযহাব যার উপর ইমাম শাফিঈ (রঃ) চলেছেন এবং এটাই মজবুতও বটে। পরবর্তী কোন কোন মনীষী এই উক্তিটিকে এভাবে মজবুত বানাবার চেষ্টা করেছেন যে, وَاِنَّهٗ فِسْقٌ -এর وَاوْ টি حَالِيَّةْ রূপে

১. এই হাদীসটি ইমাম বুখারী (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

এসেছে। অর্থাৎ আল্লাহ্র নাম নেয়া হয়নি এরূপ যবাইকৃত জীব তোমরা খেয়ো না, অবস্থা এই যে, এটা হচ্ছে গর্হিত কাজ। আর গর্হিত বস্তু হচ্ছে ওটাই যাকে গায়রুল্লাহর নামে যবাই করা হয়। তারপর এই দাবী করা হয়েছে যে, এটা নির্দিষ্ট এবং وَاوْ টি সংযোগকারী وَاوْ হওয়া বৈধ নয়। কেননা এই অবস্থায় جُمْلَه اِسْمِيَّهٌ خَبَرِيَه-এর عَطْف বা সংযোগ جُمْلَهُ فِعْلِيَه -এর উপর অবশ্যম্ভাবী হয়ে যাবে। আর এটা ভুল। কেননা এই দলীল এর পরের বাক্য وَاِنَّ الشَّيٰطِيْنَ لَيُوْحُوْنَ اِلٰٓى اَوْلِيٰٓئِهِمْ দ্বারা ভেঙ্গে যাচ্ছে। কারণ এখানে তো নিশ্চিত রূপেই عَطْف বা সংযোগ আছে। তাহলে যেভাবে পূর্ববর্তী وَاوْ কে حَالِيَه বলা হয়েছে সেভাবেই যদি একেও حَالِيَه মেনে নেয়া হয় তবে এর উপর এই বাক্যের সংযোগ অবৈধ হবে। আর যদি এর পূর্বের جُمْلَهُ فِعْلِيَهٌ طَلَبِيَه -এর উপর عَطْف বা সংযোগ স্থাপন করা হয় তবে যে প্রতিবাদ এঁরা অন্যদের উপর আনয়ন করেছেন সেই প্রতিবাদ তাঁদের নিজেদের উপরই প্রত্যাবর্তিত হবে। তবে হ্যাঁ, যদি এই وَاوْ কে حَالِيَه না মানা হয় তবে এ প্রতিবাদ মিটে যেতে পারে। কিন্তু যে দাবী করা হচ্ছিল তা সম্পূর্ণরূপে বাতিল হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর উক্তি এই যে, এর দ্বারা ঐ মৃতজন্তুকে বুঝানো হয়েছে যে আপনা আপনিই মারা গেছে। এই মাযহাবের সমর্থনে ইমাম আবূ দাউদ (রঃ)-এর একটি 'মুরসাল' হাদীসও রয়েছে যাতে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন—"মুসলমান কর্তৃক যবাইকৃত জন্তু হালাল, সে ওর উপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করুক বা না-ই করুক তা সে খেতে পারে। কেননা, সে নাম নিলে আল্লাহরই নাম নিতো।" এ হাদীসটি মুরসাল। তবে এর পৃষ্ঠপোষকতায় দারে কুতনীর একটি হাদীস রয়েছে যা হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে। তা এই যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন—"যদি মুসলমান যবাই করে এবং সে আল্লাহর নাম নাও নেয় তবুও সে তা খেতে পারে। কেননা, সেই মুসলমান স্বয়ং যেন আল্লাহরই একটা নাম।" সে যখন যবাই করে তখন তার নিয়ত এটাই থাকে যে, সে আল্লাহর নামে যবাই করছে। ইমাম বায়হাকী (রঃ)-ও পূর্ব বর্ণিত হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর হাদীস থেকেই দলীল গ্রহণ করেছেন যে, জনগণ জিজ্ঞেস করলোঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! নওমুসলিম লোকেরা আমাদের কাছে গোশ্তের উপঢৌকন নিয়ে আসে। তারা (যবাই করার সময়) ওর উপর আল্লাহর নাম নেয় কি নেয় না তা আমরা জানি না (সুতরাং তা আমরা খেতে পারি কি-না?)।" রাসূলুল্লাহ (সঃ) উত্তরে তাদেরকে বলেন,

"তোমরা (খাওয়ার সময়) আল্লাহর নাম নিয়ে খেয়ে নাও।" কাজেই বুঝা গেল যে, যদি আল্লাহর নাম নিয়ে নেয়া জরুরীই হতো তবে রাসূলুল্লাহ (সঃ) প্রকৃত তত্ত্ব অনুসন্ধান করা ছাড়া ঐ গোশ্ত খাওয়ার অনুমতি দিতেন না। আল্লাহ পাকই সবচেয়ে বেশী জানেন।

এই মাসআলায় তৃতীয় উক্তি এই যে, যবাইকৃত জীবের উপর যদি বিসমিল্লাহ বলতে ভুলে যায় তবে তা ভক্ষণে কোন দোষ নেই। আর যদি ইচ্ছাপূর্বক বিসমিল্লাহ ছেড়ে দেয় তবে তা খাওয়া বৈধ হবে না। ইমাম মালিক (রঃ) এবং ইমাম আহমাদ (রঃ)-এর প্রসিদ্ধ মাযহাব এটাই। ইমাম আবূ হানীফা (রঃ) এবং তাঁর সহচরবৃন্দেরও এটাই উক্তি। ইমাম আবুল হাসান তাঁর 'হিদায়া' নামক গ্রন্থে লিখেছেনঃ "ইমাম শাফিঈ (রঃ)-এর পূর্বে এর উপর ইজমা ছিল যে, ইচ্ছাপূর্বক বিসমিল্লাহ ছেড়ে দেয়া হলে তা হারাম। এ জন্যে ইমাম আবূ ইউসুফ (রঃ) ও অন্যান্য গুরুজন বলেছেন যে, যদি কোন শাসনকর্তা এরূপ যবাইকৃত জন্তুর গোশ্ত বেচা কেনার অনুমতি দেয় তবে তা মান্য করা চলবে না। কেননা, এতে ইজমায়ে উম্মতের বিরোধিতা করা হবে। আর ইজমায়ে উম্মতের বিরোধিতার সাথে কোন কিছুই বৈধ হতে পারে না। হিদায়া গ্রন্থকারের এ কথা বিস্ময়করই বটে। কেননা, ইমাম শাফিঈ (রঃ)-এর পূর্বেও এরূপ মতভেদ হওয়া প্রমাণিত আছে। আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে বেশী জানেন।

ইমাম জা'ফর ইবনে জারীর (রঃ) বলেন যে, বিসমিল্লাহ বলতে ভুলে গেছে এমন ব্যক্তির যবাইকৃত গোশত খাওয়াকে যে হারাম বলে সে হুজ্জতের সমস্ত উক্তি হতে বেরিয়ে পড়লো এবং রাসূলুল্লাহ (সঃ) হতে যে হাদীসটি বর্ণিত আছে তার বিরোধিতা করলো। হাদীসটি এই যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন– "মুসলমানের জন্যে স্বয়ং তার মুসলমান হওয়াটাই যথেষ্ট, সুতরাং যদিও সে ভুলবশতঃ যবাই করার সময় বিসমিল্লাহ না বলে তবুও তোমরা আল্লাহর নাম নিয়ে তা খেতে পার।" এই হাদীসটিকে خَطَأٌ مَرْفُوْعٌ বলা হয়েছে এবং অন্যেরা একে দৃঢ় করেছেন। এর দ্বারা এটা সাব্যস্ত হচ্ছে যে, এ হাদীসটিকে মারফূ' বলে ভুল করেছেন মা'কাল ইবনে উবাইদুল্লাহ আল জাযারী। ইমাম বায়হাকী (রঃ)-এর উক্তি অনুসারে এই বর্ণনাটিই বিশুদ্ধতম। ইমাম ইবনে জারীর (রঃ)-এর নীতি এই যে, তিনি এমন দু'একটি উক্তির প্রতি মোটেই সম্মান প্রদর্শন করেন না যা জমহূরের উক্তির বিপরীত হয় এবং ঐ ইজমাকেই তিনি আমলের যোগ্য মনে করে থাকেন। একটি লোক হাসান বসরী (রঃ)-কে নিম্নের

মাসআলাটি জিজ্ঞেস করেঃ "একটি লোকের কাছে জবাইকৃত অনেক পাখী নিয়ে আসা হয়। ও গুলির মধ্যে কতকগুলোর উপর আল্লাহর নাম নেয়া হয়েছিল এবং কতকগুলোর উপর ভুলবশতঃ নাম নেয়া হয়নি। আর এই পাখীগুলো পরস্পর মিশ্রিত হয়ে গিয়েছিল (এখন ওগুলোর মাংস হালাল হবে কি?)" হযরত হাসান বসরী (রঃ) উত্তরে বলেন, "তোমরা সবগুলোই খেতে পার।"

মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন (রঃ)-কে এই প্রশ্নই করা হলে তিনি উত্তরে বলেনঃ "যেগুলোর উপর আল্লাহর নাম নেয়া হয়নি সেগুলো তোমরা খেয়ো না। কেননা, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– لَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ অর্থাৎ "যার উপর আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করা হয়নি তা তোমরা খেয়ো না।" আর ইবনে মাজায় যে হাদীসটি রয়েছে ওকে তিনি স্বীয় ফতওয়ার দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ এই তৃতীয় মাযহাবের দলীলরূপে নিম্নের হাদীসটিকেও পেশ করা হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন– "আল্লাহ আমার উম্মতের উপর থেকে ভুল ও বিস্মৃতিকে ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং বাধ্য হয়ে কৃত ভুল ও অপরাধকেও মাফ করেছেন।" কিন্তু এটা চিন্তাযোগ্য বিষয়। হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একটি লোক নবী (সঃ)-এর কাছে এসে জিজ্ঞাসা করেঃ "হে আল্লাহ্র রাসূল (সঃ)! যদি আমাদের মধ্যকার কোন লোক যবাই করে এবং বিসমিল্লাহ বলতে ভুলে যায় তবে হুকুম কি?" তিনি উত্তরে বলেনঃ "মুসলমানদের মুসলমান হওয়াটাই যথেষ্ট। সে স্বয়ং তো আল্লাহ্র নাম বা প্রত্যেক মুসলমানের উপর আল্লাহর নাম রয়েছে।" কিন্তু এই হাদীসটির ইসনাদ দুর্বল। এর বর্ণনাকারী হচ্ছে মারওয়ান ইবনে সালিম ও আবূ আবদিল্লাহ শামী। এদের সম্পর্কে বহু ইমাম সমালোচনা করেছেন। এই মাসআলার উপর আমি একটি পৃথক রিসালা লিখেছি এবং তাতে ইমামদের মাযহাব, ওর উৎস, তাঁদের দলীল ইত্যাদি সবকিছুর উপরই আলোকপাত করেছি। আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।

ইবনে জারীর (রঃ) বলেন, আহলুল ইল্ম এ ব্যাপারে মতভেদ করেছেন যে, এই আয়াতের হুকুম কি মানসূখ বা রহিত কি-না? কেউ কেউ বলেন যে, হুকুম মানসূখ নয় বরং এর হুকুম বাকী আছে এবং তা আমলের যোগ্য। মুজাহিদ (রঃ) ও সাধারণ আহলুল ইলমের এটাই উক্তি। যদি হুকুম মানসূখ হতো তবে মুজাহিদ (রঃ) প্রমুখের উক্তি এটা হতো না। ইকরামা (রঃ) এবং হাসান বসরী (রঃ) বলেন, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–যার উপর আল্লাহর নাম নেয়া হয়েছে তা তোমরা খাও যদি তোমরা আল্লাহর আয়াতসমূহের উপর ঈমান এনে থাক। এই

জায়গায় মহান আল্লাহ বলেনঃ যার উপর আল্লাহর নাম নেয়া হয়নি তা তোমরা খেয়ো না, কেননা এটা গর্হিত বস্তু। অতএব, এই আয়াতটি মানসূখ, কিন্তু নিম্নের আয়াতটি এর থেকে স্বতন্ত্র।

وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ অর্থাৎ "আহলে কিতাবের খাদ্য তোমাদের জন্যে হালাল এবং তোমাদের খাদ্য তাদের জন্যে হালাল।" (৫ঃ ৫) ইবনে আবি হাতিমের উক্তি এই যে, আল্লাহ তা'আলা কুরআন কারীমে বলেছেন–'যার উপর আল্লাহর নাম নেয়া হয়নি তা তোমরা খেয়ো না।' অতঃপর এটা তিনি মানসূখ করতঃ মুসলমানদের উপর দয়া করেছেন এবং এর পর তিনি বলেছেন, 'এখন সমস্ত পবিত্র জিনিস তোমাদের জন্যে বৈধ করা হলো এবং আহলে কিতাবের যবাইকৃত জীবও তোমাদের জন্যে হালাল।' সুতরাং প্রথম হুকুমকে তিনি এই আয়াত দ্বারা মানসূখ করলেন এবং আহলে কিতাবের যবাইকৃত জীবও হালাল ঘোষণা করলেন। ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বলেন–সঠিক কথা তো এটাই যে, আহলে কিতাবের খাদ্য হালাল হওয়া এবং আল্লাহর নাম নেয়া হয়নি এমন যবাইকৃত জীব হারাম হওয়ার মধ্যে পরস্পর কোন বৈপরীত্য নেই। এই বর্ণনাটিই বিশুদ্ধ হওয়ার দাবীদার। আর যিনি একে মানসূখ বলেছেন তিনি এটাকে খাস বা নির্দিষ্ট করে নিয়েছেন মাত্র, এ ছাড়া আর কিছুই নয়। আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

আল্লাহ পাক বলেনঃ إِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ অর্থাৎ "শয়তানরা তাদের বন্ধুদের কাছে তাদের কথাগুলো অহী করে থাকে, উদ্দেশ্য এই যে, তারা (তাদের বন্ধুরা) যেন তোমাদের (মুসলমানদের) সাথে বিতর্কে লিপ্ত হতে পারে।" একটি লোক হযরত ইবনে উমার (রাঃ)-কে বললোঃ 'মুখতারের এই দাবী যে, তার কাছে না কি অহী আসে?' হযরত ইবনে উমার (রাঃ) উত্তরে বলেনঃ 'সে সত্য কথাই বলেছে।' অতঃপর তিনি إِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ.......-এই আয়াতটি পাঠ করেন।

আবু যামীল হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ আমি একদা হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কাছে বসেছিলাম। সেই সময় মুখতার হজ্ব করতে এসেছিল। তখন একটি লোক হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কাছে এসে বলে– "হে ইবনে আব্বাস (রাঃ)! আবু ইসহাক (অর্থাৎ মুখতার) ধারণা করছে যে, আজ রাত্রে নাকি তার কাছে অহী এসেছে।" এ কথা শুনে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, "সে সত্য কথাই বলেছে।" আমি তখন উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লাম এবং

মনে মনে ভাবলাম যে, ইবনে আব্বাস (রাঃ) তাকে সত্যায়িত করছেন! অতঃপর হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, "অহী দু' প্রকার। একটি হচ্ছে আল্লাহর অহী এবং অপরটি হচ্ছে শয়তানের অহী। আল্লাহর অহী আসে হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)-এর নিকট এবং শয়তানের অহী এসে থাকে তার বন্ধুদের নিকট।" তারপর উপরোক্ত আয়াতটিই পাঠ করেন। ইকরামা (রঃ) হতে অনুরূপ উক্তিও পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলার لِيُجَادِلُوكُمْ -এ উক্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, ইয়াহূদীরা নবী (সঃ)-এর সাথে ঝগড়া করতো এবং বলতোঃ "এটা কি বিস্ময়কর ব্যাপার যে, যে জীবকে আমরা হত্যা করবো সেটা আমরা খেতে পারবো, আর আল্লাহ যেটা হত্যা করবেন সেটা আমরা খেতে পারবো না।" তখন وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاِنَّهُ لَفِسْقٌ -এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। এটাকে 'মুরসাল' রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। ইমাম আবু দাউদ (রঃ) 'মুত্তাসিল' রূপেই বর্ণনা করেছেন। কয়েকটি কারণে এটা চিন্তার ব্যাপার। প্রথমতঃ ইয়াহূদীরা মৃত প্রাণীকে তো খাওয়া বৈধই মনে করতো না। তাহলে এই ব্যাপারে তারা কেনই বা মতবিরোধ করতে যাবে। দ্বিতীয়তঃ এই আয়াতটি সূরায়ে আন'আমে রয়েছে আর সূরায়ে আন'আম হচ্ছে মক্কী সূরা। অথচ ইয়াহূদীরা বাস করতো মদীনায়। তৃতীয়তঃ এই হাদীসটি ইমাম তিরমিযী (রঃ) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। আর ইমাম তিরমিযী (রঃ) বলেন যে, লোকেরা অর্থাৎ ইয়াহূদীরা নবী (সঃ)-এর কাছে এসেছিল। তারপর তিনি এ হাদীসটি বর্ণনা করেন। আর এটা বিস্ময়কর কথাই বটে! হাসান (রঃ) বলেন যে, এ হাদীসটি 'গারীব'। সাঈদ ইবনে জুবাইর (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, এটা একটা 'মুরসাল' হাদীস।

তিবরানী (রঃ) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন-'যে যবাইকৃত জীবের উপর আল্লাহর নাম নেয়া হয়নি তা তোমরা খেয়ো না।' যখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় তখন পারস্যাবাসী মক্কায় কুরায়েশদেরকে লিখে পাঠায়ঃ "মুহাম্মাদের সাথে তোমরা এ বিষয়ে তর্ক বিতর্ক কর এবং তাঁকে বল- যে জীবকে তোমরা ছুরি দিয়ে হত্যা করলে তা হালাল হলো, আর যেটাকে আল্লাহ স্বীয় সোনালী তরবারী দিয়ে হত্যা করলেন সেটা হারাম হয়ে গেল, এটা কি ধরনের কথা?" সেই সময় এ আয়াতটি অবতীর্ণ হলো- শয়তানরা তাদের বন্ধুদেরকে শিখিয়ে থাকে যে, তারা যেন মুসলমানদের সাথে সদা সর্বদা ঝগড়া-বিবাদ ও তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত থাকে। সুতরাং হে

মুসলমানরা! যদি তোমরা তাদের কথা মত মৃতকেও হালাল মনে করতে থাক তবে তোমরাও মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। ভাবার্থ এই যে, পারস্যের শয়তানরা কুরায়েশদের কাছে অহী পাঠাতো। ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর হাদীসে ইয়াহূদীদের উল্লেখ নেই এবং প্রতিবাদ থেকে বাঁচবার একমাত্র রূপ এটাই। কেননা, আয়াতটি মক্কী এবং এটাও যে, ইয়াহূদীরা তো মৃতকে পছন্দ করতো না। আবার কোন কোন শব্দে ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে– "তোমরা যে জীবকে নিজেরা হত্যা কর তার উপর আল্লাহর নাম থাকে এবং যা নিজে নিজেই মরে যায় ওর উপর আল্লাহর নাম থাকে না (এটা কেমন কথা)!" পারস্যবাসীর শিকানোর ফলে মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাহাবীদের কাছে যখন এই প্রতিবাদ করলো তখন মুসলমানদের অন্তরে একটা সন্দেহ জেগে উঠলো, সেই সময় এই আয়াত অবতীর্ণ হলো। সুদ্দী (রঃ) এই আয়াতের তাফসীরে বলেছেন, মুশরিকরা মুসলমানদেরকে বলেছিল–"তোমরা এই দাবী তো করছো যে, তোমরা আল্লাহর সন্তুষ্টিই কামনা কর, অথচ আল্লাহর হত্যাকৃত জীব তোমরা খাও না, কিন্তু নিজের হত্যাকৃত জীব খাচ্ছ।" তাই আল্লাহ বলছেনঃ তোমরা যদি তাদের দলীলের প্রতারণায় পড়ে যাও তবে তোমরাও মুশরিক হয়ে যাবে। যেমন তিনি বলেনঃ

اِتَّخَذُوْٓا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ

অর্থাৎ "তারা আল্লাহকে ছেড়ে তাদের নেতা ও পুরোহিতদেরকে নিজেদের প্রভু বানিয়ে নিয়েছে (এবং তাদেরই ইবাদত করতে শুরু করেছে)।" (৯ঃ ৩১) তখন আদী ইবনে হাতিম (রাঃ) বলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! তারা ঐ পুরোহিত নেতাদের তো ইবাদত করে না।" তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "ঐ নেতা ও পুরোহিতরা হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল করে দিয়েছে, আর ঐ লোকগুলো এদের কথা মেনে নিয়েছে। এটাই হচ্ছে তাদের ইবাদত করা।"

১২২। এমন ব্যক্তি–যে ছিল প্রাণহীন তৎপর তাকে আমি জীবন প্রদান করি এবং তার জন্যে আমি এমন আলোকের (ব্যবস্থা) করে দেই, যার সাহায্যে সে জনগণের মধ্যে চলাফেরা করতে থাকে, সে কি

١٢٢- اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَاَحْيَيْنٰهُ وَجَعَلْنَا لَهٗ نُوْرًا يَّمْشِيْ بِهٖ فِي النَّاسِ كَمَنْ

مَّثَلُهٗ فِى الظُّلُمٰتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا ؕ كَذٰلِكَ زُيِّنَ لِلْكٰفِرِيْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○

এমন কোন লোকের মত হতে পারে যে (ডুবে) আছে অন্ধকার পুঞ্জের মধ্যে, তা হতে বের হওয়ার পথ পাচ্ছে না, এরূপেই কাফিরদের জন্যে তাদের কার্যকলাপ মনোহর বানিয়ে দেয়া হয়েছে।

এটা আল্লাহ তা'আলা দৃষ্টান্ত হিসাবে বর্ণনা করেছেন যে, মুমিন ব্যক্তি, যে প্রথমে মৃত ছিল অর্থাৎ পথভ্রষ্টতায় ধ্বংসপ্রাপ্ত ও হয়রান-পেরেশান ছিল, তাকে তিনি জীবিত করলেন, অর্থাৎ তার অন্তরে ঈমানরূপ সম্পদ দান করলেন এবং রাসূল (সঃ)-এর অনুসরণ করার তাওফীক প্রদান করলেন। তার জন্যে তিনি একটা নূর বা আলোকের ব্যবস্থা করলেন, যার সাহায্যে সে পথ চলতে পারছে। এই কুরআন নূর বা আলোকই বটে। এই মুমিন কি ঐ ব্যক্তির মত হতে পারে যে স্বীয় অজ্ঞতা ও বিভ্রান্তির অন্ধকারে নিমজ্জিত রয়েছে? সে সেই অন্ধকার থেকে কোনক্রমেই বের হতে পারছে না বা সেখান থেকে বের হওয়া তার জন্যে কখনও সম্ভবই নয়? যেমন নবী (সঃ) বলেছেন– "আল্লাহ তা'আলা স্বীয় মাখলূককে অন্ধকারের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন। তারপর তিনি ওর উপর আলো বর্ষণ করেছেন। যে ব্যক্তি ঐ নূর বা আলো পেয়ে গেলো সে হিদায়াত লাভ করলো। আর যে ওটা পেলো না সে দুনিয়াতে পথভ্রষ্টই থেকে গেলো।"[১] যেমন আল্লাহ পাক বলেনঃ "আল্লাহ ঐ লোকদের ওলী বা অভিভাবক, যারা ঈমান এনেছে, তিনি তাদেরকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোকের দিকে নিয়ে আনেন, আর যারা কাফির হয়েছে, তাদের ওলী হচ্ছে শয়তানের দল, তারা তাদেরকে আলো হতে বের করে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়, এই প্রকারের লোকই জাহান্নামবাসী, তারা ওর মধ্যে অনন্তকাল অবস্থান করবে।"

আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেনঃ "যে ব্যক্তি (হোঁচট খেয়ে) উপুড় হয়ে পড়তে পড়তে (পথ) চলছে, সে কি গন্তব্যস্থানে তাড়াতাড়ি পৌঁছতে পারে, না সেই ব্যক্তি, যে সোজা এক সমতল পথে গমন করছে?" মহান আল্লাহ আরও বলেনঃ "দু' প্রকারের লোকদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে এইরূপ যে, একজন অন্ধ ও বধির এবং অন্যজন চক্ষু ও কর্ণ বিশিষ্ট, এ দু'জন কি সমান হতে পারে? তোমরা কি

১. এটা তিবরানী (রঃ) হাকাম ইবনে আবান (রঃ)-এর হাদীস হতে বর্ণনা করেছেন।

এটা মোটেই বুঝছো না?” তিনি আর এক জায়গায় বলেনঃ “অন্ধ ও দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি সমান হতে পারে না এবং সমান হতে পারে না অন্ধকার ও আলো, ছায়া ও (রৌদ্রের) প্রখরতা, আর সমান হতে পারে না জীবিত ও মৃত, আল্লাহ যাকে চান তাকে শুনিয়ে থাকেন এবং যে ব্যক্তি কবরে রয়েছে তাকে তুমি শুনাতে পার না। তুমি তো শুধুমাত্র ভয় প্রদর্শক।” এই বিষয়ের উপর কুরআন কারীমের বহু আয়াত রয়েছে। এই দৃষ্টান্তগুলোতে وَجْهُ مُنَاسَبَتْ হচ্ছে আলো ও অন্ধকার, সূরার প্রথমে এই দৃষ্টান্ত দ্বারাই সূচনা করা হয়েছে অর্থাৎ وَجَعَلَ الظُّلُمٰتِ وَالنُّوْرَ দ্বারা শুরু করা হয়েছে।

কারও কারও ধারণা এই যে, এই দৃষ্টান্ত দ্বারা দু'টি নির্দিষ্ট লোককে বুঝানো হয়েছে। সুতরাং বলা হয়েছে যে, হযরত উমার ইবনে খাত্তাব (রাঃ) যিনি প্রথমে মৃত (পথভ্রষ্ট) ছিলেন, অতঃপর আল্লাহ তাঁকে জীবিত করেছেন (সুপথ দেখিয়েছেন) এবং তাঁকে নূর বা আলো দান করেছেন। তিনি সেই আলো নিয়ে লোকদের মধ্যে চলাফেরা করেছেন। আবার একথাও বলা হয়েছে যে, হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রাঃ)-কে বুঝানো হয়েছে। কিন্তু যে ব্যক্তি অন্ধকারের মধ্যে রয়েছে সে তা থেকে বের হতে পারে না। সে হচ্ছে আবূ জেহেল (আমর ইবনে হিশাম)। সঠিক কথা এই যে, এই আয়াতটি 'আম বা সাধারণ। সমস্ত মুমিন ও কাফিরই এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। كَذٰلِكَ زُيِّنَ لِلْكٰفِرِيْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ অর্থাৎ এরূপেই কাফিরদের জন্যে তাদের কার্যকলাপ চাকচিক্যময় বানিয়ে দেয়া হয়েছে। আর এটা হচ্ছে তাদের অজ্ঞতা ও পথভ্রষ্টতারই কারণ।

১২৩। আর এরূপভাবেই আমি প্রত্যেক জনপদে ওর শীর্ষস্থানীয় লোকদেরকে পাপাচারী করেছি, যাতে তারা সেখানে নিজেদের ধোঁকা, প্রতারণা ও ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করে, মূলতঃ তারা শুধু নিজেদেরকে নিজেরা প্রবঞ্চিত করে থাকে, অথচ তারা (এই সত্যটাকে) অনুভব করতে পারে না।

١٢٣- وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا فِيْ كُلِّ قَرْيَةٍ اَكٰبِرَ مُجْرِمِيْهَا لِيَمْكُرُوْا فِيْهَا وَمَا يَمْكُرُوْنَ اِلَّا بِاَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ ○

১২৪। তাদের সামনে যখন কোন নিদর্শন আসে তখন তারা বলে–আল্লাহর রাসূলদেরকে যা কিছু দেয়া হয়েছিল, আমাদের অনুরূপ জিনিস না দেয়া পর্যন্ত আমরা ঈমান আনবো না, নবুওয়াতের দায়িত্ব কার উপর অর্পণ করবেন তা আল্লাহ ভালভাবেই অবগত, এই অপরাধী লোকেরা অতিসত্বরই তাদের ষড়যন্ত্র ও প্রতারণার ফলে আল্লাহর নিকট লাঞ্ছনা ও কঠিন শাস্তি প্রাপ্ত হবে।

١٢٤- وَاِذَا جَاۤءَتْهُمْ اٰيَةٌ قَالُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ حَتّٰى نُؤْتٰى مِثْلَ مَاۤ اُوْتِىَ رُسُلُ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهٗ سَيُصِيْبُ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا صَغَارٌ عِنْدَ اللّٰهِ وَعَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا كَانُوْا يَمْكُرُوْنَ ○

আল্লাহপাক বলেন– হে মুহাম্মাদ (সঃ)! যেমন তোমার দেশের বড় বড় লোকেরা পাপী ও কাফির রূপে প্রমাণিত হয়েছে, যারা নিজেরাও আল্লাহর পথ থেকে বিমুখ হয়ে আছে এবং অন্যদেরকেও কুফরীর দিকে আহ্বান করতে রয়েছে, আর তোমার বিরোধিতায় ও শত্রুতায় অগ্রগামী হয়েছে, তদ্রূপ তোমার পূর্বের রাসূলদের সাথেও ধনী ও প্রভাবশালী লোকেরা শত্রুতা করে এসেছিল। অতঃপর তারা যে শাস্তি প্রাপ্ত হয়েছিল তা তো অজানা নয়। তাই মহান আল্লাহ বলেনঃ এভাবেই আমি প্রত্যেক জনপদে ওর প্রভাবশালী ও শীর্ষস্থানীয় লোকদেরকে পাপাচারী করেছিলাম এবং নবীদের শত্রু বানিয়ে রেখেছিলাম। অন্য জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "আমি যখন কোন জনপদকে ধ্বংস করার ইচ্ছা করি তখন তথাকার ধনী ও প্রভাবশালীদের ঐ জনপদে অশান্তি সৃষ্টি করার ও পাপকার্যে লিপ্ত হওয়ার সুযোগ ঘটে যায়।" ভাবার্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তাঁর আনুগত্য করার নির্দেশ দেন, কিন্তু তারা আনুগত্য স্বীকারের পরিবর্তে তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করতে শুরু করে দেয়। ফলে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ধ্বংস করে দেন। মহান আল্লাহ এক স্থানে বলেনঃ "যখনই আমি কোন জনপদে কোন ভয় প্রদর্শক পাঠাই তখনই সেখানকার সম্পদশালীরা বলে– আমরা তো তোমাকে মানি না।" তারা বলে–আমরা ধন মালে ও সন্তান সন্ততিতে তোমাদের উপরে রয়েছি, সুতরাং আমাদের শাস্তি দেয়া হবে না। মহান আল্লাহ কাফিরদের উক্তির উদ্ধৃতি দিয়ে বলেনঃ "জনপদে সম্পদশালী ও

প্রভাবশালী লোকেরা বলে–আমরা আমাদের বাপ-দাদা ও পূর্বপুরুষদেরকে এর উপরই পেয়েছি এবং আমরা তাদেরই পদাংক অনুসরণ করবো।" مَكْرٌ শব্দের এখানে ভাবার্থ হচ্ছে–তারা নিজেদের বাজে ও অসৎ কথা দ্বারা লোকদেরকে বিভ্রান্তির পথে ডেকে থাকে। যেমন হযরত নূহ (আঃ)-এর কওম সম্পর্কে আল্লাহ পাক বলেনঃ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا অর্থাৎ "তারা খুব বড় রকমের প্রতারণা ও ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করেছিল।" (৭১ঃ ২২) আর এক জায়গায় তিনি বলেনঃ "(হে মুহাম্মাদ সঃ)! যদি তুমি ঐ অত্যাচারীদেরকে দেখতে! যখন তারা তাদের প্রভুর সামনে দাঁড়িয়ে পরস্পর কথা বলাবলি করবে এবং শিষ্য গুরুকে ও অনুসারীরা অনুসৃতদেরকে বলবে যদি আমরা তোমাদের পদাংক অনুসরণ না করতাম তবে অবশ্যই আমরা মুমিন হতাম। তখন নেতারা অধীনস্থদেরকে বলবে–আমরা তোমাদেরকে হিদায়াত থেকে বাধা তো কমই দিয়েছিলাম, তোমরা নিজেরাই তো পাপী ও অপরাধী ছিলে, আর আমরা কুফরী অবলম্বন করি এবং আল্লাহর সাথে অংশী স্থাপন করি এটা তোমাদেরই পরামর্শ ছিল, সুতরাং তোমরা নিজেদের সাথে আমাদেরকেও জড়িয়ে ফেলেছো।" সুফিয়ান সাওরী (রঃ) বলেন যে, কুরআন কারীমে উল্লিখিত مَكْرٌ -এর ভাবার্থ হচ্ছে আমল বা কাজ।

আল্লাহ পাক বলেন– তারা শুধু নিজেদেরকে নিজেরা প্রবঞ্চিত করছে, অথচ তারা এই সত্যটাকে উপলব্ধি করতে পারছে না। অর্থাৎ এই প্রতারণা এবং অন্যদেরকে পথভ্রষ্ট করার শাস্তি তাদের নিজেদেরই উপর পতিত হবে এটা তারা মোটেই বুঝে উঠছে না। যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ "এই নেতারা নিজেদের পাপের বোঝার সাথে অন্যদের পাপের বোঝাও বহন করবে।" তিনি আরও বলেনঃ "পথভ্রষ্টকারীরা কতই নিকৃষ্ট বোঝা বহন করছে, অথচ তারা বুঝছে না তারা অন্যদের বোঝাও বহন করতে আছে!" আর এক জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "ঐ লোকদের কাছে যখন আমার কোন নিদর্শন আসে তখন তারা বলে–আমরা কখনও ঈমান আনবো না যে পর্যন্ত না আমাদের কাছে ঐ সমস্ত নিদর্শন পেশ করা হয় যেগুলো আল্লাহর (পূর্ববর্তী) রাসূলদের প্রদান করা হয়েছিল।" তারা বলতো– দলীল হিসেবে রাসূল (সঃ)-এর সাথে ফেরেশ্তাগণও কেন আগমন করেন না, যেমন তাঁরা রাসূলদের কাছে অহী পৌঁছিয়ে থাকেন? যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "যারা আমার সাথে সাক্ষাৎ করাকে বিশ্বাস করে না তারা বলে–আমাদের কাছে ফেরেশ্তাদেরকে কেন অবতীর্ণ করা হয় না অথবা কেন আমরা আমাদের প্রভুকে দেখতে পাই না?

اَللّٰهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهٗ অর্থাৎ নবুওয়াতের দায়িত্ব কার উপর অর্পণ করতে হয় এবং প্রকৃতপক্ষে রাসূল হওয়ার যোগ্য কে তা আল্লাহ ভালরূপেই জানেন। যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ "তারা বলে—এই কুরআন দু'টি বড় শহরের কোন এক ব্যক্তির উপর কেন অবতীর্ণ করা হয়নি? তারা কি আল্লাহর রহমত নিজেদের হাতেই বণ্টন করে নেবে?" এখানে দু'টি শহর বা গ্রাম বলতে মক্কা ও তায়েফকে বুঝানো হয়েছে। ঐ দুষ্ট লোকেরা রাসূলুল্লাহ (সঃ) -এর প্রতি শত্রুতা ও হিংসার বশবর্তী হয়ে এবং তাঁকে তুচ্ছ জ্ঞান করেই একথা বলতো। যেমন আল্লাহ পাক বলেনঃ "হে নবী (সঃ)! যখন কাফিররা তোমাকে দেখে তখন তারা তোমাকে বিদ্রূপ ও উপহাসের পাত্র বানিয়ে নেয় (এবং বলে) এই লোকটিই কি তোমাদের মা'বূদদের সম্পর্কে সমালোচনা করে থাকে? অথচ তারা রহমানের (আল্লাহর) যিকিরকে ভুলে বসেছে।" আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেনঃ "যখন তারা তোমাকে দেখে তখন তোমাকে (মুহাম্মাদ সঃ -কে) উপহাসের পাত্র বানিয়ে নেয় এবং বলে এটাই কি সেই লোক যাকে আল্লাহ রাসূল করে পাঠিয়েছেন?" আর এক জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "হে নবী (সঃ)! তোমার পূর্বেও রাসূলদের সাথে এরূপ বিদ্রূপ ও উপহাস করা হয়েছিল, কিন্তু তাদের সেই উপহাসের জন্যে তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে।" অথচ ঐ দুর্ভাগারা নবী মুহাম্মাদ (সঃ)-এর ফযীলত, বংশ মর্যাদা, গোত্রীয় সম্মান এবং তাঁর জন্মভূমি মক্কার শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল ছিল। আল্লাহ, সমস্ত ফেরেশ্‌তা এবং মুমিনদের পক্ষ থেকে তাঁর উপর দরূদ বর্ষিত হোক। এমন কি ঐ লোকগুলো তাঁর নবুওয়াত লাভের পূর্বেও তাঁর মধুর ও নির্মল চরিত্রের এমনভাবে স্বীকারোক্তি করেছিল যে, তাঁকে আল- আমীন (বিশ্বস্ত, সত্যবাদী ও আমানতদার) উপাধিতে ভূষিত করেছিল। কাফিরদের নেতা আবূ সুফিয়ান পর্যন্ত তাঁর সত্যবাদিতায় এতো প্রভাবান্বিত ছিলেন যে, যখন রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস তাঁর সম্পর্কে এবং তাঁর বংশ সম্পর্কে তাঁকে (আবূ সুফিয়ানকে) জিজ্ঞাসাবাদ করেন তখন তিনি নিঃসংকোচে উত্তর দেন—"আমাদের মধ্যে তিনি অতি সম্ভ্রান্ত বংশীয় লোক।" তারপর হিরাক্লিয়াস জিজ্ঞেস করেনঃ "এর পূর্বে কখনও তিনি মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হয়েছিলেন কি?" আবূ সুফিয়ান উত্তরে বলেছিলেনঃ "না।" যাহোক, এটা খুবই দীর্ঘ হাদীস। এর দ্বারা রোম সম্রাট প্রমাণ লাভ করেছিলেন যে, মুহাম্মাদ (সঃ) উত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তিনি মন্তব্য করেছিলেন যে, এসব হচ্ছে তাঁর নবুওয়াত ও সত্যবাদিতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীম (আঃ)-এর সন্তানদের মধ্য হতে ইসমাঈল (আঃ)-কে মনোনীত করেছেন, বানী ইসমাঈলের মধ্য হতে বানী কিনানাকে মনোনীত করেছেন, বানী কিনানার মধ্য হতে কুরায়েশকে বেছে নিয়েছেন, কুরায়েশের মধ্য হতে বানী হাশিমকে পছন্দ করেছেন এবং বানী হাশিমের মধ্য হতে আমাকে মনোনীত করেছেন।"[১] সহীহ বুখারীতে হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "বানী আদমের উত্তম যুগ একের পর এক আসতে রয়েছে। শেষ পর্যন্ত ঐ উত্তম যুগও এসে গেছে যার মধ্যে আমি রয়েছি।"

হযরত আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ (সঃ) মিম্বরের উপর আরোহণ করে বলেনঃ "আমি কে?" জনগণ উত্তরে বলেনঃ "আপনি আল্লাহর রাসূল।" তখন তিনি বলেনঃ "হ্যাঁ, আমি হচ্ছি মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল মুত্তালিব (সঃ)। আল্লাহ মাখলূকাত সৃষ্টি করেন এবং স্বীয় মাখলূকাতের মধ্যে আমাকে সবচেয়ে উত্তম করে সৃষ্টি করেন। লোকদেরকে তিনি দু' দলে ভাগ করেন এবং আমাকে উত্তম দলের অন্তর্ভুক্ত করেন। যখন তিনি গোত্রগুলো সৃষ্টি করেন তখন তিনি আমার গোত্রকেই উত্তম গোত্র বলে ঘোষণা করেন । তিনি বংশ সৃষ্টি করলে আমাকে তিনি সর্বোত্তম বংশের মধ্যেই সৃষ্টি করেন। আমি বংশের দিক দিয়ে তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম এবং ব্যক্তি হিসেবেও আমি তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ভাল।" রাসূলুল্লাহ (সঃ) সত্য কথাই বলেছেন।

হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ জিবরাঈল (আঃ) আমাকে বলেছেন– "হে মুহাম্মাদ (সঃ)! আমি ভূ-পৃষ্ঠের পূর্ব ও পশ্চিমে সব দিকেই ঘুরেছি, কিন্তু মুহাম্মাদ (সঃ)-এর চেয়ে উত্তম আর কাউকেও পাইনি। আমি সমস্ত পূর্ব ও পশ্চিমে অনুসন্ধান করেছি কিন্তু বানু হাশিমের বংশ অপেক্ষা মর্যাদা সম্পন্ন বংশ কোথাও পাইনি।"[২]

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ "আল্লাহ স্বীয় বান্দাদের অন্তরের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, তখন তিনি মুহাম্মাদ (সঃ)-এর অন্তরকে সমস্ত বান্দার অন্তর অপেক্ষা উত্তম পান। সুতরাং তিনি তাঁকে নিজের জন্যে মনোনীত করেন। অতঃপর তিনি মুহাম্মাদ (সঃ)-এর অন্তর দেখার পর অন্যান্য বান্দাদের অন্তরের প্রতি পুনরায় লক্ষ্য করেন। তখন তিনি মুহাম্মাদ

১. এ হাদীসটি ইমাম মুসলিম (রঃ) ও ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

২. হাদীসটি হাকিম (রঃ) ও বায়হাকী (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

(সঃ)-এর সাহাবীদের অন্তরকে সর্বাপেক্ষা উত্তম পান। সুতরাং তিনি তাঁদেরকে তাঁর রাসূলের উযীর মনোনীত করেন। তাঁরা তাঁর দ্বীনের উপর সংগ্রাম চালিয়ে যান। অতএব, মুসলমানরা যাকে ভাল মনে করে সে আল্লাহর কাছেও ভাল এবং মুসলমানরা যাকে মন্দ মনে করে সে আল্লাহর কাছেও মন্দ।"[১]

হযরত সালমান (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে বলেনঃ "হে সালমান (রাঃ)! তুমি আমার প্রতি হিংসা ও শত্রুতা পোষণ করো না এবং আমার প্রতি অসন্তুষ্ট থেকো না। নতুবা তুমি স্বীয় দ্বীন থেকে সরে পড়বে।" তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! কিরূপে আমি আপনার প্রতি হিংসা ও শত্রুতা পোষণ করতে পারি? আপনার মাধ্যমেই তো আল্লাহ আমাদেরকে হিদায়াত দান করেছেন! তখন তিনি বলেনঃ "তুমি যদি আরব সম্প্রদায়ের প্রতি শত্রুতা পোষণ কর তবে আমার প্রতিই শত্রুতা পোষণ করা হবে।"

বর্ণিত আছে যে, একটি লোক হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে মসজিদে প্রবেশ করতে দেখে। যখন তাঁর প্রতি তার দৃষ্টি পড়ে তখন সে ভয় পেয়ে যায় এবং লোকদেরকে জিজ্ঞেস করেঃ 'ইনি কে?' উত্তরে বলা হয়ঃ 'ইনি হচ্ছেন রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর চাচাতো ভাই হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)।' লোকটি তখন বলেঃ "নবুওয়াতের দায়িত্ব কার উপর অর্পণ করা উচিত এবং এর যোগ্য ব্যক্তি কে তা আল্লাহ ভালরূপেই অবগত আছেন।"[২]

سَيُصِيبُ الَّذِينَ اَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللّٰهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ -এটা রিসালাতের অনুসরণ করা থেকে অহংকারকারী এবং রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর আনুগত্য স্বীকার করা হতে গর্বকারীর জন্যে কঠিন ধমক। আল্লাহর কাছে তাকে চিরকালের জন্যে ঘৃণিত, অপমানিত ও লাঞ্ছিত হতে হবে। অনুরূপভাবে যেসব লোক অহংকার করবে, কিয়ামতের দিন তাদের ভাগ্যে লাঞ্ছনাই রয়েছে। যেমন আল্লাহ পাক বলেনঃ "যারা আমার ইবাদত করার ব্যাপারে অহংকার করে এবং মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাদেরকে উল্টো মুখে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।" আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "তাদের মন্দ কার্যের কারণে তাদেরকে কঠিন শাস্তি দেয়া হবে।" কেননা, প্রতারণা সাধারণতঃ গোপনীয়ই হয়ে থাকে। অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে ঠকবাজী ও প্রতারণা করাকে مَكْرٌ বলা হয়। এর প্রতিশোধ হিসেবেই মকরকারীকে

১. হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) ইবনে মাসঊদ (রাঃ) হতে মাওকূফ রূপে তাখরীজ করেছেন।
২. এটা ইবনে আবি হাতিম (রঃ) তাখরীজ করেছেন।

কিয়ামতের দিন পূর্ণ শাস্তি প্রদান করা হবে। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ وَعَذَابٌ شَدِيدٌۢ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ অর্থাৎ তাদের এই ষড়যন্ত্র ও প্রতারণার কারণেই আল্লাহর নিকট হতে তাদেরকে কঠিন শাস্তি দেয়া হবে। কিন্তু তাই বলে শাস্তি দেয়ার ব্যাপারে আল্লাহ কারও উপর মোটেই অত্যাচার করেন না। যেমন তিনি বলেনঃ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ অর্থাৎ "সেই দিন সমস্ত গোপনীয় কথা প্রকাশিত হয়ে পড়বে।" (৮৬ঃ ৯) সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "প্রত্যেক বিদ্রোহী ও বিশ্বাসঘাতকের জন্যে কিয়ামতের দিন একটা পতাকা থাকবে এবং ওটা তার নিতম্বের সাথে লেগে থাকবে। বলা হবে– ওটা হচ্ছে অমুকের পুত্র অমুক গাদ্দার বা বিশ্বাসঘাতক।" এতে হিকমত এই রয়েছে যে, প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতা যেহেতু গোপনীয়ভাবে থাকে সেহেতু জনগণ তার থেকে সতর্ক থাকার সুযোগ পায় না এবং সে যে প্রতারক এটা তারা জানতেই পারে না। এই কারণেই কিয়ামতের দিন ওটা একটা পতাকা হয়ে যাবে এবং সেটা প্রতারকের প্রতারণার কথা ঘোষণা করতে থাকবে।

১২৫। অতএব আল্লাহ যাকে হিদায়াত করতে চান, ইসলামের জন্যে তার অন্তঃকরণ খুলে দেন, আর যাকে পথভ্রষ্ট করার ইচ্ছা করেন, তার অন্তকরণ খুব সংকুচিত করে দেন, এমনভাবে সংকুচিত করেন যে, মনে হয় যেন সে আকাশে আরোহণ করছে, এমনিভাবেই যারা ঈমান আনে না তাদেরকে আল্লাহ কলুষযুক্ত করে থাকেন।

١٢٥- فَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَّهْدِيَهٗ يَشْرَحْ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ ۚ وَمَنْ يُّرِدْ اَنْ يُّضِلَّهٗ يَجْعَلْ صَدْرَهٗ ضَيِّقًا حَرَجًا كَاَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَآءِ ۚ كَذٰلِكَ يَجْعَلُ اللّٰهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ ○

এখানে আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, আল্লাহ যাকে হিদায়াত করার ইচ্ছা করেন তার অন্তরকে তিনি ইসলামের জন্যে খুলে দেন অর্থাৎ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করা তার জন্যে সহজ করে দেন। এটা ওরই নিদর্শন যে, তার ভাগ্যে মঙ্গল লিখিত আছে। যেমন তিনি বলেনঃ "ইসলামের জন্যে আল্লাহ যার অন্তর খুলে দেন, তার

জন্যে তার প্রভুর পক্ষ থেকে নূর বা আলো নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়।" মহান আল্লাহ আরও বলেনঃ "কিন্তু আল্লাহ তোমাদের অন্তরে ঈমানের ভালবাসা স্থাপন করেছেন এবং ওটা তোমাদের অন্তরে শোভনীয় করেছেন, আর কুফর, পাপ ও অন্যায়াচরণের প্রতি তোমাদের অন্তরে ঘৃণার উদ্রেক করেছেন, এসব লোকই সুপথ প্রাপ্ত।" হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এই আয়াতের ব্যাপারে বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা তাওহীদ ও ঈমান কবূল করার মত প্রশস্ততা তার অন্তরে আনয়ন করেন। আবূ মালিক ও অন্যান্যদের মতে এ ভাবার্থই বেশী প্রকাশমান। আবূ জা'ফর হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়ঃ 'মুমিনদের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি অধিক বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী?' তিনি উত্তরে বলেনঃ "যে ব্যক্তি খুব বেশী মৃত্যুকে স্মরণ করে এবং যে ব্যক্তি মৃত্যুর পরবর্তী সময়ের জন্যে সবেচেয়ে বেশী প্রস্তুতি গ্রহণ করে।" রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে فَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَّهْدِيَهٗ يَشْرَحْ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ -এই আয়াত সম্পর্কেই জিজ্ঞেস করা হয়। জনগণ তাঁকে জিজ্ঞেস করেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! কিভাবে অন্তরকে খুলে দেয়া হয়?" রাসূলুল্লাহ (সঃ) উত্তরে বলেনঃ "একটা নূর অন্তরে নিক্ষেপ করা হয় যার ফলে অন্তর খুলে যায় ও প্রশস্ত হয়ে পড়ে। অর্থাৎ মানুষের মধ্যে সংকীর্ণতা অবশিষ্ট থাকে না।" জনগণ পুনরায় জিজ্ঞেস করেনঃ "কারো অন্তর যে খুলে গেছে এটা কি করে জানা যায়?" তিনি জবাবে বলেনঃ "এর পরিচয় এইভাবে পাওয়া যায় যে, সে পরকালের দিকে ঝুঁকে পড়ে, দুনিয়ার প্রতি তার আসক্তি থাকে না এবং মৃত্যু আসার পূর্বেই ওর জন্যে সে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকে।"

وَمَنْ يُّرِدْ اَنْ يُّضِلَّهٗ يَجْعَلْ صَدْرَهٗ ضَيِّقًا حَرَجًا অর্থাৎ যাকে তিনি পথভ্রষ্ট করার ইচ্ছা করেন তার অন্তরকে তিনি খুবই সংকীর্ণ করে দেন। ضَيِّقٌ শব্দটির ض অক্ষরের উপর فتحه হবে, ى অক্ষরের উপর جَزم হবে। কিন্তু অধিকাংশ লোক ى অক্ষরে كَسْرَه ও تَشْدِيد দিয়ে পড়ে থাকেন। এ দু'টোর দৃষ্টান্ত হচ্ছে হাইয়্যিনুন ও হাইনুন শব্দ। حَرَج শব্দটিকে কেউ কেউ فَتْح حَاء ও كَسْرَه رَاء সহ পড়েছেন। আবার অন্য কিরআতে فَتْح حَاء এবং فَتْح رَاء সহ রয়েছে। অর্থাৎ সে এতদূর পথভ্রষ্ট হয়ে পড়ে যে, তার অন্তর হিদায়াতের জন্যে মোটেই প্রশস্ত থাকে না। ঈমান সেখানে পথ পায় না। হযরত উমার (রাঃ) একজন বেদুইনকে জিজ্ঞেস করেনঃ حَرَجَة কি জিনিস?" সে উত্তরে বলেঃ "ওটা একটা গাছ, গাছের ভিতরেই থাকে। কোন রাখাল ওটা পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না, কোন জীবজন্তু এবং অন্য কোন জিনিসও ওর পাত্তা পায় না।" তখন হযরত উমার (রাঃ) বলেনঃ

"মুনাফিকদের অন্তরও ঠিক এরূপই হয়ে থাকে। কোন ভাল কথা সেখানে প্রবেশই করতে পারে না।" হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা তার অন্তরের উপর ইসলামকে সংকীর্ণ করে দেন। কেননা, ইসলাম তো একটা প্রশস্ত জিনিস। আর কাফিরের অন্তর সংকীর্ণ হয়ে থাকে। সুতরাং সেখানে ইসলামের জায়গা হবে কিরূপে? যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ অর্থাৎ "দ্বীন কবূল করে নেয়ার পর তোমাদের অন্তরে কোন সংকীর্ণতা থাকতে পারে না। আর আল্লাহ তোমাদের দ্বীনের মধ্যে কোন সংকীর্ণতা রাখেননি।" (২২ ঃ৭৮) কিন্তু মুনাফিকের অন্তর সন্দেহের মধ্যে জড়িত থাকে এবং অন্তরের সংকীর্ণতার কারণে لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ -এর স্বীকারোক্তি সে করতেই পারে না। ঈমান আনয়ন করা তার উপর এমন কঠিন হয়ে পড়ে যেমন কারও উপর আকাশে আরোহণ কঠিন হয়ে থাকে। অর্থাৎ যেরূপ আদম সন্তান আকাশে আরোহণ করতে পারে না, তদ্রূপ তাওহীদের বিশ্বাস মুনাফিকের অন্তরে ঘর করতে পারে না। আওযায়ী (রঃ) বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা যার অন্তরকে সংকীর্ণ করে দিয়েছেন সে কিভাবে ঈমান আনতে পারে? কাফিরের অন্তর সম্পর্কে এটা দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা হয়েছে যে, তার অন্তরে ঈমানের আরোহণ এমনই কঠিন যেমন কারও আকাশে আরোহণ করা কঠিন অর্থাৎ যেমন আকাশে চড়া কারো পক্ষে সম্ভব নয় তদ্রূপ কাফিরের ঈমান আনয়নও সম্ভব নয়।

অতঃপর ইরশাদ হচ্ছে—যেমন তার অন্তরকে সংকীর্ণ করে দেয়া হয়েছে তদ্রূপ আল্লাহ শয়তানকে তার উপর বিজয়ী করে দিয়েছেন, যে তাকে আল্লাহর পথ থেকে বিভ্রান্ত করতে রয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, رِجْسٌ শব্দের অর্থ হচ্ছে শয়তান। আর মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, رِجْسٌ হচ্ছে প্রত্যেক ঐ জিনিস যাতে কোন মঙ্গল নিহিত নেই।

১২৬। আর এটাই হচ্ছে তোমার প্রতিপালকের সহজ সরল পথ, আমি উপদেশ গ্রহণকারী লোকদের জন্যে আয়াতসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করে দিয়েছি।

١٢٦- وَهٰذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيْمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّذَّكَّرُوْنَ ○

১২৭। তাদের জন্যে তাদের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে এক শান্তি নিকেতন তাদের কৃতকর্মের কারণে, তিনিই হচ্ছেন তাদের অভিভাবক।

١٢٧- لَهُمْ دَارُ السَّلٰمِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○

আল্লাহ তা'আলা পথভ্রষ্টদের বর্ণনা দেয়ার পর এখন দ্বীন ও হিদায়াতের মর্যাদার বর্ণনা দিচ্ছেন। তিনি বলেনঃ তোমাদের প্রতিপালকের এটাই সরল সহজ পথ। مُسْتَقِيْمًا শব্দটি حَال -এর ভিত্তিতে مَنْصُوْب হয়েছে। অর্থাৎ হে মুহাম্মাদ (সঃ)! এই দ্বীন, যা আমি তোমাকে প্রদান করেছি, সেই অহীর মাধ্যমে, যাকে কুরআন বলে, এটাই হচ্ছে সরল সঠিক পথ। যেমন হযরত আলী (রাঃ) কুরআনের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন যে, ওটা হচ্ছে সিরাতে মুসতাকীম, আল্লাহর দৃঢ় রজ্জু এবং বিজ্ঞানময় বর্ণনা।

قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّذَّكَّرُوْنَ অর্থাৎ আমি কুরআনের আয়াতগুলোকে বিশদভাবে বর্ণনা করে দিয়েছি। এর দ্বারা ঐ লোকেরাই উপকৃত হবে যাদের জ্ঞান ও বিবেক রয়েছে। যারা আল্লাহ ও রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কথাগুলোকে গভীর মনোযোগের সাথে চিন্তা করে দেখে এবং ওগুলো বুঝবার চেষ্টা করে, তাদের জন্যে কিয়ামতের দিন জান্নাত ও শান্তির ঘর রয়েছে। জান্নাতকে দারুস সালাম বা শান্তির ঘর বলার কারণ এই যে, যেমন তারা দুনিয়ায় শান্তির পথে চলছে, তেমনই কিয়ামতের দিনেও তারা শান্তির ঘর লাভ করবে। আল্লাহ তাদের রক্ষক, সাহয্যকারী ও শক্তিদানকারী। কেননা, তারা ভাল আমল করে থাকে।

১২৮। আর যেদিন আল্লাহ তাদের সকলকে একত্রিত করবেন, সেদিন তিনি বলবেন–হে জ্বিন সম্প্রদায়! তোমরা মানুষকে বিভ্রান্ত করতে বিরাট ভূমিকা পালন করেছো, আর ওদের মধ্যে যাদের মানুষের সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল তারা স্বীকারোক্তিতে বলবে–হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা

١٢٨- وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِّنَ الْاِنْسِ وَقَالَ اَوْلِيٰٓـؤُهُمْ مِّنَ الْاِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا

بِبَعْضٍ وَّبَلَغْنَآ اَجَلَنَا الَّذِیْٓ اَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوٰىكُمْ خٰلِدِیْنَ فِیْهَآ اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ اِنَّ رَبَّكَ حَكِیْمٌ عَلِیْمٌ ○

একে অপরের দ্বারা উপকৃত হয়েছি, যা আপনি আমাদের জন্যে নির্দিষ্ট করে রেখেছিলেন, তখন (কিয়ামতের দিন) আল্লাহ (সমস্ত কাফির জ্বিন ও মানুষকে) বলবেন– জাহান্নামই হচ্ছে তোমাদের বাসস্থান, তাতে তোমরা চিরস্থায়ীভাবে থাকবে, তবে আল্লাহ যাদেরকে চাইবেন (তারাই তা থেকে মুক্তি পেতে পারে), তোমাদের প্রতিপালক অতিশয় প্রজ্ঞাময় এবং অত্যন্ত জ্ঞানবান।

ইরশাদ হচ্ছে–হে মুহাম্মাদ (সঃ)! ঐ দিনকে স্মরণ কর, যখন আল্লাহ ঐ জ্বিন ও শয়তানদেরকে এবং তাদের মানব বন্ধুদেরকে, তারা দুনিয়ায় যাদের ইবাদত করতো এবং যাদের কাছে আশ্রয় গ্রহণ করতো, আর দুনিয়ার মজা উপভোগের ব্যাপারে একে অপরের কাছে অহী পাঠাতো, তাদের সকলকে সমবেত করবেন এবং বলবেনঃ হে জ্বিন ও শয়তানের দল! তোমরা মানব গোষ্ঠীকে বহু প্রকারে বিভ্রান্ত করেছিলে। যেমন আল্লাহ পাক বলেনঃ "হে আদম সন্তান! আমি কি তোমাদের কাছে এ অঙ্গীকার গ্রহণ করিনি যে, তোমরা শয়তানের উপাসনা করবে না, কেননা সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু? আর তোমরা আমারই ইবাদত করবে, এটাই হচ্ছে সিরাতে মুসতাকীম বা সরল সহজ পথ? তোমাদের বড় বড় দলকে এই শয়তানরাই পথভ্রষ্ট করেছে, তাহলে এখনও কি তোমাদের জ্ঞান লাভ হবে না?" আর তাদের মানব বন্ধুরা বলবেঃ "হে আমাদের প্রভু! নিশ্চয়ই আপনার কথা সত্য। আমরা প্রত্যেকেই একে অপরের দ্বারা উপকার লাভ করেছি।"

হাসান (রঃ) বলেন, এই প্রকার লাভ করা ছিল এই যে, ঐ শয়তানরা আদেশ করতো আর এই মূর্খ ও অজ্ঞ মানুষেরা ওর উপর আমল করতো। ইবনে জুরায়েজ (রাঃ) বলেন, অজ্ঞতার যুগে কোন লোক সফররত অবস্থায় কোন উপত্যকায় পথভ্রষ্ট হয়ে গেলে বলতোঃ 'আমি এই উপত্যকার সবচেয়ে বড়

জ্বিনের আশ্রয় প্রার্থনা করছি।' এটাই হতো ঐ সব মানুষের উপকার লাভ। কিয়ামতের দিন তারা এরই ওযর পেশ করবে। আর জ্বিনদের মানুষদের নিকট থেকে উপকার লাভ করা এই যে, মানুষ তাদের সম্মান করতো এবং তাদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করতো। ফলে মানুষদের নিকট থেকে তাদের মর্যাদা লাভ হতো। তাই তারা বলতোঃ "আমরা জ্বিন ও মানুষের নেতা। আর আপনি আমাদের জন্যে যে সময় নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন ঐ ওয়াদা পর্যন্ত আমরা পৌঁছে গেছি।" এর দ্বারা মৃত্যুকে বুঝানো হয়েছে। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেনঃ "এখন জাহান্নামই হচ্ছে তোমাদের ও তোমাদের বন্ধুদের বাসস্থান, যার মধ্যে তোমরা চিরকাল অবস্থান করবে। তারপর আল্লাহ যা চাইবেন তাই করবেন।" কেউ কেউ বলেন যে, এই ব্যতিক্রমের অর্থ হচ্ছে বারযাখের দিকে প্রত্যাবর্তন। কেউ কেউ এই মত পোষণ করেন যে, এই সময়কাল দুনিয়ার দিকে প্রত্যাবর্তন। আবার কেউ কেউ এমন কথা বলেছেন যার বর্ণনা সূরায়ে হূদে আসবে। সেখানে আল্লাহ পাক বলেছেনঃ "তারা জাহান্নামে ততকাল থাকবে যতকাল যমীন ও আসমান থাকবে। হ্যাঁ, তবে এ ছাড়া আল্লাহ যা চাইবেন তা তাঁর মর্জি। তিনি তো যা ইচ্ছা করেন তা কার্যে পরিণত করার অধিকার তাঁর রয়েছে।" এই আয়াতের তাফসীর ঐ আয়াত দ্বারা হচ্ছে—জাহান্নাম তোমাদের বাসস্থান, যার মধ্যে তোমরা চিরকাল অবস্থান করবে, হ্যাঁ, তবে আল্লাহ যা চান। এটা এমন একটি আয়াত যে, আল্লাহর মাখলূকের ব্যাপারে আল্লাহর উপর কোন হুকুম লাগানো এবং কাউকে জান্নাতী বা জাহান্নামী বলা কারো মোটেই উচিত নয়।

১২৯। এমনিভাবেই আমি যালিমদেরকে (কাফিরদেরকে) তাদের কৃতকর্মের ফলে পরস্পরকে পরস্পরের উপর প্রভাবশালী ও কর্তৃত্বশালী বানিয়ে দিবো।

١٢٩- وَكَذٰلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظّٰلِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۞ ع

আল্লাহ তা'আলা এমন লোকদেরকে একে অপরের বন্ধু বানিয়ে দেন যাদের আমল একই রূপ হয়ে থাকে। সুতরাং এক মুমিন অপর মুমিনের বন্ধু হয়ে থাকে, সে যেমনই হোক এবং যেখানেই থাক না কেন। পক্ষান্তরে এক কাফির অন্য এক কাফিরের বন্ধু হয়ে থাকে সে যেখানেই থাক এবং যেমনই হোক না কেন। ঈমান আশা আকাঙ্ক্ষা ও বাহ্যাড়ম্বরের নাম নয়। এ মত ইবনে জারীর

(রঃ) পোষণ করেন। মালিক ইবনে দীনার (রঃ) বলেন, আমি যাবূরে পড়েছি, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– "আমি মুনাফিকদের প্রতিশোধ মুনাফিকদের দ্বারাই গ্রহণ করবো, তারপর সমস্ত মুনাফিকের প্রতিশোধ গ্রহণ করবো।" এটা কুরআন কারীমেও রয়েছে। যেমন আল্লাহ পাক বলেনঃ "এভাবেই আমি এক যালিমকে অপর যালিমের বন্ধু বানিয়ে দেই।" অর্থাৎ জ্বিনের যালিমদেরকে মানব যালিমের বন্ধু বানিয়ে দেই। "আর যে ব্যক্তি আল্লাহর যিকির থেকে উদাসীন থাকে, আমি তার উপর শয়তানকে বিজয়ী করে দেই এবং সদা সর্বদা সে তারই সাথে অবস্থান করতে থাকে।" হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে একটি মারফূ' হাদীস বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি যালিমের সাহায্য করে, আল্লাহ তাকে তার উপর বিজয়ী করে দেন।"[১] কোন কবি বলেছেনঃ

وَمَا مِنْ يَّدٍ اِلَّا يَدُ اللّٰهِ فَوْقَهَا * وَلَا ظَالِمٍ اِلَّا سَيُبْلٰى بِظَالِمٍ

অর্থাৎ "এমন কোন হাত নেই যার পরে আল্লাহর হাত থাকে না এবং এমন কোন যালিম নেই যাকে অন্য যালিমের সাথে লেনদেন বা আদান প্রদান করতে হয় না।" আয়াতে কারীমার অর্থ এই দাঁড়ালোঃ যেভাবে আমি ঐ ক্ষতিগ্রস্ত মানবদের বন্ধু তাদেরকে পথভ্রষ্টকারী জ্বিন ও শয়তানদেরকে বানিয়েছি, তেমনিভাবে যালিমদের মধ্য হতে এককে অপরের বন্ধু বানিয়ে দেই এবং একে অপরের দ্বারা ধ্বংস হয়ে যায়। আর আমি তাদের অত্যাচার, দুষ্টামি এবং বিদ্রোহের প্রতিফল একে অপরের দ্বারা প্রদান করিয়ে থাকি।

১৩০। (কিয়ামতের দিন আল্লাহ জিজ্ঞেস করবেন) হে জ্বিন ও মানব জাতি! তোমাদের কাছে কি তোমাদের মধ্য হতে নবী রাসূল আসেনি, যারা তোমাদের কাছে আমার আয়াত সমূহ বর্ণনা করতো এবং আজকার দিনের সাথে তোমাদের সাক্ষাত হওয়ার ভীতি তোমাদেরকে প্রদর্শন করতো? তারা জবাব দিবে,

١٣٠- يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اَلَمْ يَاْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِيْ وَ يُنْذِرُوْنَكُمْ لِقَاۤءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا قَالُوْا شَهِدْنَا عَلٰۤى اَنْفُسِنَا

১. এই হাদীসটি হাফিয ইবনে আসাকির বর্ণনা করেছেন। ইবনে কাসীর (রঃ) বলেন যে, এ হাদীসটি গারীব।

وَغَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ اَنَّهُمْ كَانُوْا كٰفِرِيْنَ ○

হ্যাঁ, আমরাই আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছি (অর্থাৎ আমরা অপরাধ করেছি), পার্থিব জীবনই তাদেরকে ধোঁকায় নিপতিত রেখেছিল, আর তারাই নিজেদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে যে, তারা কাফির ছিল।

এখানে আল্লাহ্ পাক কাফির দানব ও মানবকে সতর্ক করে বলছেন—হে জ্বিন ও মানব গোষ্ঠী! আমি কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করবো, তোমাদের কাছে আমার নবীরা এসে কি তাদের নবুওয়াতের দায়িত্ব পালন করেনি? এটাকে اِسْتِفْهَام تَقْرِيْرِى বলা হয়। অর্থাৎ অবশ্যই তোমাদের কাছে আমার নবীরা এসে তোমাদেরকে কিয়ামতের দিন সম্পর্কে ভয় প্রদর্শন করেছিল। রাসূল শুধুমাত্র মানুষের মধ্যেই ছিলেন, জ্বিনদের মধ্যে কোন রাসূল হননি। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, রাসূল শুধু বানী আদমের মধ্যেই হয়ে থাকেন এবং জ্বিনদের মধ্যে থাকে ভয় প্রদর্শক, যারা তাদেরকে আল্লাহর শাস্তি থেকে ভয় প্রদর্শন করে থাকে। ইবনে মাযাহিমের ধারণা এই যে, জ্বিনদের মধ্যেও রাসূল আছে এবং স্বীয় দাবীর অনুকূলে এই আয়াতে কারীমা দলীল রূপে পেশ করেছেন। কিন্তু এটা বিশেষ চিন্তা করার বিষয়। কেননা এটা কোন নিশ্চিত কথা নয়। কারণ, কোন আয়াতেই এ বিষয়ের ব্যাখ্যা নেই। খুব বেশী বললে একথা বলা যেতে পারে যে, জ্বিনদের মধ্যে নবী হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে মাত্র। আল্লাহ্ই সবচেয়ে বেশী জানেন। এটা আল্লাহ্ পাকের নিম্নের আয়াতের মত। তিনি বলেনঃ

مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيٰنِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيٰنِ ـ

অর্থাৎ "তিনি দু'টি সমুদ্রকে সম্মিলিত করেছেন, ফলে পরস্পরে মিলিত হয়ে আছে। এতদুভয়ের মধ্যে একটি অনতিক্রমনীয় অন্তরায় রয়েছে।" (৫৫ঃ ১৯-২০) এরপর তিনি বলেনঃ

يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَ الْمَرْجَانُ ـ

অর্থাৎ "এতদুভয়ের মধ্য হতে মুক্তা ও প্রবাল-রত্নসমূহ বের হয়ে থাকে।" (৫৫ঃ ২২) এখন এটা স্পষ্ট কথা যে, মুক্তা ও প্রবাল-রত্ন লবণাক্ত সমুদ্রের মধ্যেই থাকে, মিষ্ট পানির সমুদ্রের মধ্যে থাকে না। তাহলে যেমন মুক্তা ও

প্রবাল-রত্নকে মিষ্ট ও লবণাক্ত উভয় সমুদ্রের সাথে সম্বন্ধযুক্ত করা হয়েছে, ঠিক তদ্রূপই রাসূলদেরকে দানব ও মানব উভয়ের মধ্যেই গণনা করা হয়েছে। ইবনে জারীর (রঃ)-ও এই উত্তরই দিয়েছেন। রাসূলগণ যে শুধু মানুষের মধ্য থেকেই হয়েছেন এটা আল্লাহ পাকের উক্তিতেই রয়েছে। তিনি বলেনঃ

اِنَّا اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ كَمَا اَوْحَيْنَا اِلٰى نُوْحٍ وَّ النَّبِيّٖنَ مِنْ بَعْدِهٖ হতে رُسُلًا مُّبَشِّرِيْنَ وَ مُنْذِرِيْنَ لِئَلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ পর্যন্ত (৪ঃ ১৬৩-১৬৫)। আর ইবরাহীম (আঃ)-এর যিক্‌র সম্পর্কিত আল্লাহ তা'আলার وَجَعَلْنَا فِىْ ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتٰبَ (২৯ঃ ২৭) এই উক্তিতেও রয়েছে। এর দ্বারা জানা গেল যে, হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর পরে নবুওয়াত ও কিতাবকে তাঁর সন্তানদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ করে দেয়া হয়েছে। আর কোন লোকেরই এই উক্তি নেই যে, হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর পূর্বে নবুওয়াত জ্বিনদের মধ্যে ছিল এবং তাঁকে প্রেরণ করার পরে তাদের নবুওয়াত শেষ হয়ে গেছে। মোটকথা জ্বিনদের মধ্যে নবুওয়াত থাকা হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর পূর্বেও প্রমাণিত হচ্ছে না এবং তাঁর পরেও না। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "হে রাসূল (সঃ)! তোমার পূর্বে আমি যেসব রাসূল পাঠিয়েছিলাম তারাও খাদ্য খেতো এবং বাজারে চলাফেরা করতো।" আর এক জায়গায় তিনি বলেনঃ "হে নবী (সঃ)! তোমার পূর্বে আমি যাদেরকে রাসূল হিসেবে পাঠিয়েছিলাম তাঁরা তাদের গ্রামবাসীদেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। আর এটা জানা কথা যে, রিসালাতের ব্যাপারে জ্বিনেরা মানুষের অনুসারী। এ জন্যেই জ্বিনদের সম্পর্কে খবর দিতে গিয়ে আল্লাহ পাক বলেন–"হে নবী (সঃ)! জ্বিনদের একটি দলকে আমি তোমার দিকে ফিরিয়ে দিয়েছি। তারা কুরআন শুনতে থাকে। যখন তারা কুরআনের মজলিসে হাযির হয় তখন পরস্পর বলাবলি করে–তোমরা নীরবতা অবলম্বন করে কুরআন শুনতে থাক। যখন কুরআন পাঠ শেষ হয় তখন তারা তাদের কওমের কাছে গিয়ে তাদেরকে আল্লাহ থেকে ভয় প্রদর্শন করে এবং বলে– হে আমার সঙ্গীরা, আমরা একটা কিতাব শুনেছি যা হযরত মূসা (আঃ)-এর পরে অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা তাওরাতের সত্যতা প্রতিপাদনকারী, আর সত্য কথা ও সোজা সরল পথের দিশা দিয়ে থাকে। হে বন্ধুরা! আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর আহ্বানে সাড়া দাও এবং তাঁর উপর ঈমান আন। তাহলে আল্লাহ তোমাদের পাপরাশি ক্ষমা করে দিবেন এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে তোমাদেরকে মুক্তি দান করবেন। আর যদি কেউ আল্লাহর আহ্বানকারীর আহ্বানে সাড়া না দেয় এবং কাফির থেকে যায় তবে সে আল্লাহকে অপারগ করতে পারে না এবং আল্লাহ তার ওলী হতে পারেন না।

এসব লোক বড়ই বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ে যাবে।" জামিউত তিরমিযীতে রয়েছে যে, নবী (সঃ) সূরায়ে আর রাহমান পাঠ করেন এবং তাতে নিম্নের আয়াত পড়েনঃ سَنَفْرُغُ لَكُمْ اَيُّهَ الثَّقَلٰنِ

অর্থাৎ "হে জ্বিন ও মানব! আমি তোমাদের (হিসাব গ্রহণের) নিমিত্ত শীঘ্রই অবসর গ্রহণ করবো।" (৫৫ঃ ৩১)

মহান আল্লাহ বলেনঃ "হে আমার মানব ও দানবের দল! তোমাদের কাছে কি আল্লাহর রাসূলগণ এসেছিল না, যারা আমার আয়াতগুলো তোমাদেরকে পড়ে শুনাতো এবং আজকের দিনের সাক্ষাৎ সম্পর্কে তোমাদেরকে সতর্ক করতো? তারা উত্তরে বলবে– হে আল্লাহ! আমরা স্বীকার করছি যে, আপনার রাসূলগণ আমাদের কাছে আপনার বাণী প্রচার করেছিলেন এবং আমাদেরকে আপনার সাথে সাক্ষাৎ হওয়া সম্পর্কে ভয়ও দেখিয়েছিলেন, আর তাঁরা আমাদেরকে এ কথাও বলেছিলেন যে, আজকের এ দিনটা (অর্থাৎ কিয়ামত) অবশ্যই সংঘটিত হবে।"

وَ غَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا অর্থাৎ পার্থিব জীবনই তাদেরকে ধোঁকায় নিপতিত রেখেছিল। পার্থিব জীবনে তারা 'ইফরাত' ও 'তাফরীত' অর্থাৎ অত্যধিক ও অত্যল্পের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছিল এবং রাসূলদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে ও মু'জিযাগুলোর বিরুদ্ধাচরণ করে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। কেননা, তারা পার্থিব জীবনের সুখ সম্ভোগে এবং প্রবৃত্তির অনুসরণে গ্রেপ্তার হয়ে পড়েছিল। আর কিয়ামতের দিন তারা নিজেদেরই বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে যে, তারা কাফির ছিল।

১৩১। এই রাসূল প্রেরণ এই জন্যে যে, তোমার প্রতিপালক কোন জনপদকে ওর অধিবাসীবৃন্দ সত্য সম্পর্কে অজ্ঞাত থাকা অবস্থায় অন্যায়ভাবে ধ্বংস করেন না।

١٣١- ذٰلِكَ اَنْ لَّمْ يَكُنْ رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرٰى بِظُلْمٍ وَّ اَهْلُهَا غٰفِلُوْنَ ○

১৩২। আর প্রত্যেক লোকই নিজ নিজ আমলের কারণে মর্যাদা লাভ করবে, তারা কি আমল করতো সে বিষয়ে তোমার প্রতিপালক উদাসীন নন।

١٣٢- وَلِكُلٍّ دَرَجٰتٌ مِّمَّا عَمِلُوْا ؕ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ ○

আল্লাহ পাক বলেনঃ হে রাসূল (সঃ)! এরূপ কখনও হতে পারে না যে, তোমার প্রভু আল্লাহ কোন গ্রাম বা শহরকে অন্যায়ভাবে এমন অবস্থায় ধ্বংস করবেন যখন ওর অধিবাসীবৃন্দ সত্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকে। তিনি বলেনঃ আমি এরূপভাবে ধ্বংস করি না, বরং তাদের কাছে রাসূল প্রেরণ করি এবং কিতাব অবতীর্ণ করি। এভাবে আমি তাদের ওযর পেশ করার সুযোগ হারিয়ে দেই, যাতে কাউকেও অন্যায়ভাবে পাকড়াও করা না হয় এবং তার কাছে তাওহীদের দাওয়াত না পৌঁছে থাকে। আমি লোকদের জন্যে কোন ওযর পেশ করার সুযোগ বাকী রাখিনি। আমি যদি কোন কওমের উপর শাস্তি পাঠিয়ে থাকি তবে তা তাদের কাছে রাসূল পাঠানোর পর। যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ "কোন জনপদ এমন নেই যেখানে আমি আমার পক্ষ থেকে কোন ভয় প্রদর্শক রাসূল প্রেরণ করিনি।" তিনি আরও বলেনঃ "আমি প্রত্যেক কওমের মধ্যে রাসূল পাঠিয়ে বলেছি–তোমরা আল্লাহরই ইবাদত কর এবং শয়তান থেকে বেঁচে থাক।" আর এক জায়গায় তিনি বলেনঃ "আমি শাস্তি প্রদানকারী নই যে পর্যন্ত না রাসূল প্রেরণ করি।" আল্লাহ পাক অন্য স্থানে বলেনঃ "যখন কাফিরদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে তখন সেই জাহান্নামের রক্ষকগণ তাদেরকে জিজ্ঞেস করবে– তোমাদের কাছে কি কোন ভয় প্রদর্শনকারী (নবী) আগমন করেননি? তারা উত্তরে বলবে–নিশ্চয়ই আমাদের কাছে ভয় প্রদর্শনকারী এসেছিলেন, কিন্তু আমরা অবিশ্বাস করেছিলাম।" এ বিষয় সম্পর্কীয় বহু আয়াত রয়েছে।

ইমাম আবূ জা'ফর (রঃ) বলেন যে, আল্লাহ তা'আলার بِظُلْمٍ এই উক্তির দু'টি যুক্তি বা কারণের সম্ভাবনা রয়েছে। প্রথম কারণ হচ্ছে–আল্লাহর এটা নীতি নয়, তিনি কোন কওমকে তাদের শিরকের কারণে এমন অবস্থায় তাদের ধ্বংস করবেন যে অবস্থায় তাদের নিজেদের শিরকের কোন সংবাদই থাকে না। অর্থাৎ তিনি শাস্তি প্রদানে তাড়াতাড়ি করেন না, যে পর্যন্ত না তাদের কাছে কোন রাসূল পাঠিয়ে তাদেরকে শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করেন এবং সেই রাসূল আল্লাহর হুজ্জত পূর্ণ করেন, আর আখিরাতের শাস্তি থেকে তাদেরকে ভয় প্রদর্শন করেন। তিনি যদি কাউকে তার অজ্ঞাত অবস্থায় পাকড়াও করতেন তবে সে বলতোঃ আমার কাছে তো কোন সুসংবাদদাতা এবং ভয় প্রদর্শনকারী আসেননি। দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে–আল্লাহ পাক বলছেন যে, তিনি তাদেরকে সতর্ক করা ছাড়া এবং রাসূল ও আয়াতের মাধ্যমে উপদেশ দান ব্যতীত ধ্বংস করেন না। নতুবা তাদের উপর এটা অত্যাচার হয়ে যেতো। আর আল্লাহ তো স্বীয় বান্দাদের উপর যুলুম করেন না। এর পরে আবূ জা'ফর (রঃ) প্রথম কারণকে প্রাধান্য দেন। এতে কোন

সন্দেহ নেই যে, এ কারণটিই বেশী প্রবল ও উত্তম। আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।

আল্লাহ তা'আলার উক্তি- وَلِكُلٍّ دَرَجٰتٌ مِّمَّا عَمِلُوْا অর্থাৎ প্রত্যেক সৎ ও অসৎ আমলকারীর জন্যে আমল হিসেবে মরতবা ও মর্যাদা রয়েছে। যার যেরূপ আমল সেই অনুপাতে সে প্রতিফল পাবে। যদি আমল ভাল হয় তবে পরিণাম ভাল হবে, আর যদি আমল খারাপ হয় তবে পরিণামও খারাপ হবে। আবার এ অর্থও হতে পারে যে, ঐ কাফির দানব ও মানবের কয়েকটি শ্রেণী বিভাগ রয়েছে। প্রত্যেক কাফিরের জন্যে জাহান্নামে তার পাপের পরিণাম অনুযায়ী শ্রেণীভেদ রয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ لِكُلٍّ ضِعْفٌ অর্থাৎ "প্রত্যেকের জন্যে দ্বিগুণ (শাস্তি) আছে।" (৭ঃ ৩৮) আর এক জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "যারা কুফরী করেছে এবং লোকদেরকে সরল সহজ পথ থেকে সরিয়ে রেখেছে, আমি তাদেরকে শাস্তির উপর শাস্তি বেশী বেশী করে প্রদান করবো, কেননা তারা নিজেরাও কুফরী করেছে এবং অন্যদেরকেও কুফরীর পথে পরিচালিত করেছে আর তারা বিশৃংখলা ও অশান্তি সৃষ্টি করেছে। তোমার প্রভু তো তাদের আমল থেকে উদাসীন নন।"এই লোকগুলো আল্লাহর ইলমের মধ্যে রয়েছে। যখন তারা তাঁর কাছে প্রত্যাবর্তন করবে তখন তিনি তাদেরকে শাস্তি দ্বারা জর্জরিত করবেন।

১৩৩। তোমার প্রতিপালক অমুখাপেক্ষী ও দয়াশীল, তাঁর ইচ্ছা হলে তোমাদেরকে অপসারিত করবেন এবং তোমাদের পর তোমাদের স্থানে যাকে ইচ্ছা স্থলাভিষিক্ত করবেন, যেমন তিনি তোমাদেরকে অন্য এক জাতির বংশধর হতে সৃষ্টি করেছেন।

১৩৪। তোমাদের নিকট যে বিষয় সম্পর্কে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তা অবশ্যম্ভাবী, তোমরা আল্লাহকে অক্ষম ও দুর্বল করতে পারবে না।

١٣٣- وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ ۖ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ ۝

١٣٤- إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَآتٍ ۖ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ۝

১৩৫। (হে মুহাম্মাদ সঃ)! তুমি বলে দাও–হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা নিজ নিজ অবস্থায় আমল করতে থাক, আমিও আমল করছি, অতঃপর শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে যে, কার পরিণাম কল্যাণকর, নিঃসন্দেহে অত্যাচারীরা কখনও মুক্তি ও সাফল্য লাভ করতে পারবে না।

١٣٥- قُلْ يٰقَوْمِ اعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ اِنِّيْ عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ مَنْ تَكُوْنُ لَهٗ عَاقِبَةُ الدَّارِ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ ○

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল (সঃ)-কে সম্বোধন করে বলছেন–হে মুহাম্মাদ (সঃ)! তোমার প্রতিপালক সমস্ত মাখলূকাত হতে সর্ব দিক দিয়েই অমুখাপেক্ষী। সমস্ত ব্যাপারে সবাই তাঁরই মুখাপেক্ষী। তাছাড়া তিনি মহান ও দয়ালুও বটে। যেমন তিনি বলেনঃ اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ অর্থাৎ "নিশ্চয়ই আল্লাহ লোকদের প্রতি অত্যন্ত করুণাময় ও দয়ালু।" (২ঃ ১৪৩)

ইরশাদ হচ্ছে–যদি তোমরা তাঁর আদেশ নিষেধ অমান্য কর তবে তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে ধ্বংস করে দিবেন, অতঃপর যে কওমকে চাইবেন তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন, যাতে এই অন্য কওম তাঁর বাধ্য ও অনুগত হয়ে যায়।

كَمَا اَنْشَاَكُمْ مِّنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ اٰخَرِيْنَ যেমন তিনি তোমাদেরকে অন্য এক জাতির বংশধর হতে সৃষ্টি করেছেন। অর্থাৎ এই কাজের উপর তিনি পূর্ণ ক্ষমতাবান, তাঁর কাছে এটা খুবই সহজ। যেমন তিনি পূর্ব যুগকে ধ্বংস করে ওদের স্থলে অন্য কওমকে আনয়ন করতে সক্ষম। তিনি বলেনঃ হে লোকসকল! তোমরা আল্লাহর মুখাপেক্ষী এবং তাঁর ফকীর। আর অমুখাপেক্ষী ও প্রশংসিত হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ। তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে ধ্বংস করে অন্য মাখলূক সৃষ্টি করবেন। এটা তাঁর কাছে মোটেই কঠিন কাজ নয়। তিনি বলেনঃ "যদি তোমরা তাঁর থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও তবে তোমাদের পরিবর্তে তিনি অন্য কওমকে আনয়ন করবেন, অতঃপর তারা তোমাদের মত হবে না।" আবান ইবনে উসমান এই আয়াত সম্পর্কে বলেন যে, ذُرِّيَّةٌ মূলকেও বলা হয় এবং বংশকেও বলা হয়।

আল্লাহ পাকের উক্তি- إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَآتٍ وَّمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ অর্থাৎ হে মুহাম্মাদ (সঃ)! তাদেরকে তুমি জানিয়ে দাও যে, কিয়ামত সম্পর্কে তাদেরকে যে কথার ওয়াদা দেয়া হয়েছে তা অবশ্য অবশ্যই পালিত হবে। তোমরা আল্লাহকে অপারগ করতে পারবে না। তিনি তো এ কাজের উপর ক্ষমাতাবান যে, তোমরা মাটি হয়ে যাওয়ার পর এবং তোমাদের হাড়গুলো পচে গলে নষ্ট হয়ে যাওয়ার পরও তোমাদেরকে তিনি পুনর্জীবিত করবেন। এই আয়াতের তাফসীরে ইবনে আবি হাতিম (রঃ) হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ "হে আদম সন্তান! যদি তোমরা জ্ঞানবান হও তবে নিজেদেরকে মৃতদের মধ্যে গণনা কর। কেননা, যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! তোমাদেরকে যে বিষয় সম্পর্কে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তা অবশ্যম্ভাবী এবং তোমরা আল্লাহকে অক্ষম ও দুর্বল করতে পারবে না।"

ইরশাদ হচ্ছে- হে নবী (সঃ)! তুমি তাদেরকে বলে দাও, তোমরা নিজ নিজ অবস্থায় আমল করতে থাক, আমিও আমল করছি। কার পরিণাম কল্যাণকর তা তোমরা শীঘ্রই জানতে পারবে। এটা ভয়ানক ধমক ও ভীতি প্রদর্শন। অর্থাৎ যদি তোমরা ধারণা করে থাক যে, তোমরা সঠিক পথেই রয়েছো তবে ঐ পথেই চল এবং আমিও আমার পথে চলছি। যেমন আল্লাহ পাক বলেনঃ "হে মুহাম্মাদ (সঃ)! যারা বিশ্বাস স্থাপন করে না তাদেরকে বলে দাও-তোমরা তোমাদের স্থানে আমল করে যাও এবং আমরাও আমল করে যাচ্ছি, তোমরা আমাদের জন্যে অপেক্ষা করতে থাক, আমরাও তোমাদের জন্যে অপেক্ষা করতে রয়েছি। শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে যে কার পরিণাম কল্যাণকর। জেনে রেখো যে, যালিমরা কখনও মুক্তি ও সাফল্য লাভ করতে পারবে না।" আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল (সঃ)-এর সাথে কৃত ওয়াদা পূর্ণ করেছেন, তাঁর জন্যে বহু শহর জয় করিয়েছেন, দেশসমূহের উপর তাঁকে ক্ষমতা প্রদান করেছেন, বিরুদ্ধবাদীদের মাথা নীচু করিয়েছেন, মক্কার উপর তাঁকে বিজয়ী করেছেন, সারা মক্কাবাসীর উপর তাঁকে বিজয় দান করেছেন এবং সমস্ত আরব উপদ্বীপের উপর তাঁর শাসন কায়েম করেছেন। অনুরূপভাবে ইয়ামন ও বাহরাইনের উপরও তাঁর ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এ সবকিছু তাঁর জীবদ্দশাতেই সংঘটিত হয়েছে। তাঁর ইন্তেকালের পর খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে শহরসমূহ এবং বিভিন্ন ভূখণ্ডগুলো বিজিত হতে থাকে। যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ "আল্লাহ লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন- আমি এবং আমার রাসূল (সঃ) অবশ্যই জয়যুক্ত হবো, আল্লাহ ক্ষমতাবান ও প্রতাপশালী।"

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "আমি অবশ্যই স্বীয় রাসূল (সঃ) এবং মুমিনদেরকে পার্থিব জীবনেও সাহায্য করবো এবং আখেরাতেও সাহায্য করবো, যেই দিন অত্যাচারীদের ওযর তাদের কোনই উপকার করবে না, তাদের জন্যে রয়েছে অভিসম্পাত ও জঘন্য বাসস্থান।" আর এক জায়গায় তিনি বলেনঃ "যিকরের পর যাবূরে আমি লিখে দিয়েছিলাম যে, আমার সৎ বান্দারা যমীনের উত্তরাধিকারী হবে।" আর তিনি স্বীয় রাসূলদের সম্পর্কে খবর দিতে গিয়ে বলেনঃ "আমি রাসূলদের কাছে অহী পাঠিয়েছিলাম যে, যালিমদেরকে আমি অবশ্যই ধ্বংস করে দেবো, অতঃপর তাদের পরে আমি তোমাদেরকে (মুমিনদেরকে) ভূ-পৃষ্ঠে রাজত্ব দান করবো, এটা ঐ লোকদের জন্যে যারা আমাকে ভয় করে।" অন্য জায়গায় তিনি বলেনঃ "তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে ও ভাল কাজ করেছে তাদের সাথে আল্লাহ ওয়াদা করেছেন যে, তিনি তাঁদেরকে যমীনে তাঁর খলিফা বানাবেন যেমন তাদের পূর্ববর্তী লোকদেরকে স্বীয় খলিফা বানিয়েছিলেন, আর যে দ্বীনকে তিনি পছন্দ করেছেন সেই দ্বীনের উপর তাদেরকে পরিচালিত করবেন এবং ভয়ের পরে তাদের জীবনকে শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে পরিবর্তন করবেন, কেননা তারা আমার ইবাদত করে এবং শির্ক করে না।" আল্লাহ তা'আলা উম্মতে মুহাম্মাদিয়াকে এই বিশেষত্ব দান করেছেন। সুতরাং প্রথম ও শেষ এবং প্রকাশ্য ও গোপনীয় সমস্ত প্রশংসা ও শুকরিয়া আল্লাহর জন্যে।

১৩৬। আর আল্লাহ যেসব শস্য ও পশু সৃষ্টি করেছেন, তারা (মুশরিকরা) ওর একটি অংশ আল্লাহর জন্যে নির্ধারিত করে থাকে, আর নিজেদের ধারণা মতে তারা বলে যে, এই অংশ আল্লাহর জন্যে এবং এই অংশ আমাদের শরীকদের জন্যে, কিন্তু যা তাদের শরীকদের জন্যে নির্ধারিত হয়ে থাকে, তা তো আল্লাহর দিকে পৌঁছতে পারে না, পক্ষান্তরে যা

١٣٦- وَجَعَلُوا لِلّٰهِ مِمَّا ذَرَاَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْاَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هٰذَا لِلّٰهِ بِزَعْمِهِمْ وَهٰذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ اِلَى اللّٰهِ وَمَا كَانَ لِلّٰهِ فَهُوَ

يَصِلُ اِلٰى شُرَكَائِهِمْ سَاۤءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ۝

আল্লাহর জন্যে নির্ধারণ করা হয়েছিল, তা তাদের শরীকদের কাছে পৌঁছে থাকে, এই লোকদের ফায়সালা ও বন্টন নীতি কতইনা খারাপ!

এখানে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে মুশরিকদেরকে তিরস্কার করা হচ্ছে যারা বিদআত, শির্ক ও কুফরী ছড়িয়ে দিয়েছিল এবং মাখলূকাতকে তাঁর শরীক বানিয়ে ছিল। অথচ প্রত্যেক জিনিসেরই সৃষ্টিকর্তা হচ্ছেন সেই পাক পরওয়ারদিগার। এজন্যেই আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–এ লোকগুলো জমির উৎপাদন এবং পশুর বংশ থেকে যা কিছু পাচ্ছে তার একটা অংশ আল্লাহর নামে নির্ধারণ করছে এবং নিজেদের ভিত্তিহীন ধারণামতে বলছে; এই অংশ আল্লাহর জন্যে এবং এই অংশ আমাদের শরীকদের জন্যে। কিন্তু শরীকদের নামে যেগুলো রয়েছে সেগুলো তো আল্লাহর জন্যে খরচ করা হয় না, পক্ষান্তরে যেগুলো আল্লাহর নামে রয়েছে সেগুলো তাদের শরীকদের প্রয়োজনে ব্যয় করা হচ্ছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এই আয়াতের তাফসীরে বলেন যে, আল্লাহ তা'আলার এই শত্রুরা যখন শস্যক্ষেত্র হতে শস্য উৎপাদন করতো কিংবা খেজুর বৃক্ষ হতে খেজুর লাভ করতো তখন তারা ওগুলোর কতক অংশ আল্লাহর বলে নির্ধারণ করতো এবং কতক অংশ মূর্তির নামে নির্ধারণ করতো। অতঃপর যেগুলো মূর্তির নামে নির্দিষ্ট করতো সেগুলো রক্ষিত রাখতো। অতঃপর আল্লাহর জন্যে নির্ধারিত অংশ হতে যদি কোন কিছু মূর্তির জন্যে নির্ধারিত অংশে পড়ে যেতো তবে তা ঐ ভাবেই রেখে দিতো এবং বলতো–আল্লাহ সম্পদশালী, তিনি মূর্তির মুখাপেক্ষী নন। পক্ষান্তরে মূর্তির জন্যে নির্ধারিত অংশ হতে কোন কিছু আল্লাহর জন্যে নির্ধারিত অংশে পড়ে গেলে আল্লাহর অংশ হতে ওটা নিয়ে মূর্তির অংশ পূরণ করতো এবং বলতো–এটা আমাদের দেবদেবীরই হক এবং এরা দরিদ্র ও মুখাপেক্ষী। আল্লাহর জন্যে নির্ধারিত জমির পানি বেড়ে গিয়ে মূর্তির জন্যে নির্ধারিত কর্ষণকৃত জমিকে ভিজিয়ে দিলে তারা এরূপ হতে দিতো এবং ওটাকে মূর্তির জন্যেই নির্দিষ্ট করে দিতো। তারা 'বাহিরা','সায়েবা', 'হাম' এবং 'ওয়াসীলা' পশুগুলোকে মূর্তির জন্যে নির্দিষ্ট করতো এবং দাবী করতো যে, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যেই তারা ঐ পশুগুলো দ্বারা উপকার লাভ করা

হারাম মনে করে থাকে। এই আয়াতে এই বিষয়ের উপরই আলোকপাত করা হয়েছে।[১]

ইবনে আসলাম বলেন যে, তারা আল্লাহর জন্যে নির্ধারিত কোন জন্তু যবাই করলে আল্লাহর নামের সাথে প্রতিমার নামও উচ্চারণ করতো। ঘটনাক্রমে যদি শুধু আল্লাহর নামই নেয়া হতো এবং প্রতিমার নাম না নেয়া হতো তবে তারা ঐ জবাইকৃত জন্তুর গোশত খেতো না। পক্ষান্তরে প্রতিমার জন্যে নির্ধারিত জন্তু যবাই করার সময় তারা আল্লাহর নাম নিতো না, শুধু প্রতিমার নাম নিতো। অতঃপর তিনি سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ (অর্থাৎ তাদের ফায়সালা ও বণ্টননীতি কতইনা জঘন্য!) এই আয়াতটি পাঠ করেন।

প্রথমে তো তারা বণ্টনেই ভুল করেছে। কেননা, আল্লাহ তা'আলাই প্রত্যেক জিনিসের প্রতিপালক ও সৃষ্টিকর্তা। তিনিই রাজ্যাধিপতি। সবকিছুই তাঁর ক্ষমতার মধ্যে। তিনি ছাড়া অন্য কেউ মা'বূদ নেই। সবকিছু তাঁর ইচ্ছাধীন। এরপর যে বিকৃত বণ্টন তারা করলো সেখানেও তারা সঠিক পন্থা অবলম্বন করলো না, বরং তাতেও যুলুম ও অন্যায় করলো। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "তারা আল্লাহর জন্যে নির্ধারণ করলো কন্যা, আর নিজেদের জন্যে নির্ধারণ করলো পুত্র!" আল্লাহ পাক আরও বলেনঃ "তারা আল্লাহর বান্দাদেরকেই তাঁর পুত্র বানিয়ে দিলো! মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ।" আর এক জায়গায় তিনি বলেনঃ "তোমাদের জন্যে ছেলে আর আল্লাহর জন্যে মেয়ে, এটা অত্যন্ত অপ্রীতিকর ও বেঢংগা বণ্টনই বটে!"

১৩৭। আর এমনিভাবে অনেক মুশরিকের দৃষ্টিতে তাদের শরীকরা তাদের সন্তান হত্যাকরণকে শোভনীয় করে দিয়েছে, যেন তারা তাদের সর্বনাশ করতে পারে এবং তাদের কাছে তাদের ধর্মকে	١٣٧ - وَكَذٰلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيْرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ قَتْلَ اَوْلَادِهِمْ شُرَكَآؤُهُمْ لِيُرْدُوْهُمْ وَلِيَلْبِسُوْا

---

১. খাওলান গোত্রের 'আম্মে আনাস' নামক একটি প্রতিমা ছিল। তারা ওর জন্যে অংশ নির্ধারণ করতো এবং আল্লাহর জন্যেও অংশ নির্ধারণ করতো। অতঃপর আল্লাহর জন্যে নির্ধারিত অংশের মধ্যে ওর অংশের কিছুটা পড়ে গেলে তারা ওকে ওটা ফিরিয়ে দিত এবং বলতোঃ 'এটা দুর্বল মা'বূদ।'এভাবেই সুহাইলী ইবনে ইসহাক হতে এটা বর্ণনা করেছেন। এই খাওলান গোত্রের লোকেরা হচ্ছে আমর ইবনুল হারিস ইবনে কুযাআর বংশধর।

عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ○

তারা সন্দেহময় করে দিতে পারে, আল্লাহ চাইলে তারা এসব কাজ করতে পারতো না, সুতরাং তুমি তাদেরকে এবং তাদের ভ্রান্ত উক্তিগুলোকে ছেড়ে দাও।

আল্লাহ পাক বলেনঃ শয়তানরা যেমন তাদেরকে বলেছে যে, আল্লাহর জন্যে প্রতিমাদের থেকে পৃথক একটা অংশ নির্ধারণ করা একটা পছন্দনীয় কাজ তদ্রূপ দরিদ্র হয়ে যাওয়ার ভয়ে সন্তানদেরকে হত্যা করা এবং লজ্জার ভয়ে কন্যাদেরকে জীবিত প্রোথিত করা তাদের কাছে শোভনীয় করেছে। তাদের শরীক শয়তানরাই তাদেরকে পরামর্শ দিতো যে, তারা যেন দরিদ্র হয়ে যাওয়ার ভয়ে তাদের সন্তানদেরকে জীবিত প্রোথিত করে। হয় তাদের ধ্বংস করার নিয়তই থাকতো অথবা ওটাকে তারা একটা ধর্মীয় কাজ মনে করতো। আর তাদের কাছে দ্বীন সন্দেহপূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "যখন তাদেরকে কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেয়া হয় তখন অসন্তুষ্টির কারণে তাদের মুখ কালো হয়ে যায়। লজ্জার কারণে লোকদের থেকে আত্মগোপন করে থাকে।" যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ "যখন জীবিত প্রোথিতা মেয়েদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে-কোন্ পাপের কারণে তোমাদেরকে হত্যা করা হয়েছিল। (তখন তোমরা কি জবাব দেবে)?" তাছাড়া তারা এজন্যেও সন্তানদেরকে হত্যা করতো যে, দরিদ্র হয়ে যাওয়ার ভয় তাদেরকে ধরে বসতো এবং তাদেরকে প্রতিপালন করতে মাল ধ্বংস হয়ে যাওয়ার তারা ভয় করতো। এসব ছিল শয়তানেরই কারসাজী।

এরপর আল্লাহ পাক বলেন ঃ যদি আল্লাহ চাইতেন তবে তারা এইরূপ করতো না। অর্থাৎ যা কিছু হচ্ছে সবই তাঁর ইচ্ছাতেই হচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে পূর্ণ নৈপুণ্য। তাঁর কাজে কেউ প্রতিবাদ করতে পারে না। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নবী (সঃ)-কে বলেনঃ হে নবী (সঃ)! তুমি তাদেরকেও ছেড়ে দাও এবং তাদের মিথ্যা মা'বূদদেরকেও ছেড়ে দাও। আল্লাহ তা'আলা তোমাদের ও তাদের ফায়সালা করবেন।

١٣٨- وَقَالُوا هٰذِهٖ اَنْعَامٌ وَّحَرْثٌ حِجْرٌ لَّا يَطْعَمُهَا اِلَّا مَنْ نَّشَاءُ

১৩৮। আর তারা (নিজেদের বাতিল ধারণা মতে) বলে থাকে যে, এই সব বিশেষিত পশু ও বিশেষিত ক্ষেতের ফসল সুরক্ষিত, কেউই তা

بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ○

ভক্ষণ করতে পারবে না, তবে যাদেরকে আমরা অনুমতি দিব (তারাই ভক্ষণ করতে পারবে), আর (তারা বলে) এই বিশেষ পশুগুলোর উপর আরোহণ করা ও ভার বহন নিষেধ করে দেয়া হয়েছে, আর কতগুলো বিশেষ পশু রয়েছে যেগুলোকে যবাই করার সময় তারা আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে না, (এসব কথা) শুধু আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করার উদ্দেশ্যে (বলে), আল্লাহ এসব মিথ্যা আরোপের প্রতিফল অতি-সত্বরই দান করবেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, حِجْرٌ শব্দের অর্থ হচ্ছে হারাম বা নিষিদ্ধ অর্থাৎ যাকে তারা 'ওয়াসীলা' রূপে হারাম করে নিয়েছিল।[১] তারা বলতোঃ এই পশু, এই ক্ষেত্রের ফসল হারাম, আমাদের অনুমতি ছাড়া এটা কেউ খেতে পারে না। তারা যে নিজেদের উপর এভাবে হারাম করে নিতো এবং কাঠিন্য আনয়ন করতো এটা শয়তানের পক্ষ থেকে ছিল, আল্লাহর পক্ষ থেকে ছিল না। ইবনে যায়েদ (রঃ) বলেন যে, তারা তাদের দেবতাদের খাতিরেই ওগুলো নিজেদের উপর হারাম করে নিয়েছিল। যেমন আল্লাহ পাক বলেনঃ "তোমাদের কি হয়েছে যে, যেটাকে আল্লাহ তোমাদের জীবিকা বানিয়েছিলেন সেটাকে তোমরা হারাম করে নিয়েছো এবং হারামকে হালাল করে নিয়েছো? হে নবী (সঃ)! তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর—আল্লাহ কি তোমাদেরকে এই নির্দেশ দিয়েছেন, না তোমরা তাঁর উপর মিথ্যারোপ করছো?" অন্য জায়গায় তিনি বলেনঃ "আল্লাহর কাছে 'বাহীরা', 'সায়েবা,' 'ওয়াসীলা' এবং 'হাম'-এর কোন সনদ নেই, কিন্তু এই কাফিররা আল্লাহর উপর মিথ্যারোপ করেছে এবং তাদের অধিকাংশই কিছুই বুঝে না।" সুদ্দী (রঃ) বলেন যে, ঐ পশুগুলোকে বাহীরা, সায়েবা, ওয়াসীলা এবং হাম বলা হতো যেগুলোর পিঠে সওয়ার হওয়াকে তারা

১. এটা হচ্ছে মুজাহিদ (রঃ), যহহাক (রঃ), সুদ্দী (রঃ), কাতাদাহ (রঃ), ইবনে যায়েদ (রঃ) প্রমুখ গুরুজনের উক্তি।

নিজেদের উপর হারাম করেছিল, কিংবা ঐ পশুগুলোকে বলা হতো যেগুলোর উপর তারা আল্লাহর নাম নিতো না, ভূমিষ্ট হওয়ার সময়েও নয় এবং যবাই করার সময়েও নয়। আবূ ওয়াইল বলেনঃ "কতগুলো পশুর উপর সওয়ার হওয়া হারাম ছিল এবং কতগুলো পশুর উপর আল্লাহর নাম নেয়া হতো না।" এই আয়াতে কোন্ পশু হারাম হওয়ার কথা বলা হয়েছে তা কি আপনারা জানেন? এর দ্বারা বাহীরা পশুগুলোকে বুঝানো হয়েছে, যেগুলোর উপর সওয়ার হয়ে তারা হজ্বে যেতো না, ওগুলোর উপর সওয়ার হতো না, বোঝা উঠাতো না, ওগুলোর দুধ পান করতো না এবং ওগুলোর দ্বারা বংশ বৃদ্ধিও করতো না। এ সবই হচ্ছে আল্লাহর উপর মিথ্যা অপবাদ। আল্লাহর এটা হুকুমও নয় এবং এটা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের মাধ্যমও নয়। অতএব আল্লাহ তাদেরকে এই মিথ্যা অপবাদের শাস্তি প্রদান করবেন।

১৩৯। আর তারা এ কথাও বলে থাকে যে, এইসব বিশেষ পশুগুলোর গর্ভে যা কিছু রয়েছে, তা বিশেষভাবে আমাদের পুরুষদের জন্যে রক্ষিত; আর আমাদের নারীদের জন্যে এটা হারাম, কিন্তু গর্ভ হতে প্রসূত বাচ্চা যদি মৃত হয়, তবে নারী-পুরুষ সবাই তা ভক্ষণে অংশী হতে পারবে, তাদের কৃত এইসব বিশেষণের প্রতিদান অতিসত্বরই আল্লাহ তাদেরকে দিবেন, নিঃসন্দেহে তিনি হচ্ছেন প্রজ্ঞাময়, সর্ববিদিত।

١٣٩- وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هٰذِهِ الْاَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُوْرِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلٰى اَزْوَاجِنَا وَاِنْ يَّكُنْ مَّيْتَةً فَهُمْ فِيْهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيْهِمْ وَصْفَهُمْ اِنَّهٗ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ○

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, কাফিররা যে বলতো, 'এই পশুগুলোর গর্ভে যা কিছু রয়েছে তা আমাদের পুরুষদের জন্যে নির্দিষ্ট।' এর দ্বারা পশুর দুধ উদ্দেশ্য। তারা কোন কোন পশুর দুধ স্ত্রী লোকদের উপর হারাম করে দিতো এবং পুরুষেরা পান করতো। যদি বকরীর নর বাচ্চা পয়দা হতো তবে তা যবাই করে শুধু পুরুষ লোকেরাই খেতো, নারীদেরকে দিতো না। তাদেরকে

বলতোঃ "তোমাদের জন্যে এটা হারাম।" মাদী বাচ্চা হলে ওটাকে যবাই করতো না, বরং পালন করতো। আর যদি মৃত বাচ্চা পয়দা হতো তবে পুরুষ নারী সবাই মিলিতভাবে খেতো। আল্লাহ্ এরূপ করতে নিষেধ করলেন।

শা'বী (রঃ) বলেন যে, 'বাহীরা' পশুর দুধ শুধুমাত্র পুরুষেরাই খেতো। কোন পশু মরে গেলে পুরুষদের সাথে নারীদেরকেও অংশ দেয়া হতো। তাই ইরশাদ হচ্ছে যে, তাদের কৃত এইসব বিশেষণের প্রতিদান অতিসত্বরই তাদেরকে প্রদান করা হবে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ –

وَ لَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ اَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هٰذَا حَلٰلٌ وَّ هٰذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ اِنَّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُوْنَ-

অর্থাৎ "তোমাদের রসনা যে মিথ্যা বলছে তা তোমরা বলো না যে, এটা হালাল এবং এটা হারাম, এই উদ্দেশ্যে যে, তোমরা আল্লাহর উপর মিথ্যা অপবাদ দেবে, নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর উপর মিথ্যা অপবাদ দেবে তারা কখনও সফলকাম হবে না।" (১৬ঃ ১১৬)

আল্লাহ্ পাক স্বীয় কাজে ও কথায় বড় বিজ্ঞানময় এবং তিনি স্বীয় বান্দাদের ভাল ও মন্দ কাজ সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল। সুতরাং তিনি তাদেরকে তাদের প্রতিদান পূর্ণরূপে প্রদান করবেন।

١٤٠- قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ قَتَلُوْا اَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّحَرَّمُوْا مَا رَزَقَهُمُ اللّٰهُ افْتِرَاءً عَلَى اللّٰهِ قَدْ ضَلُّوْا وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ ۝

১৪০। যারা নিজেদের সন্তানদেরকে মূর্খতা ও অজ্ঞানতার কারণে হত্যা করেছে, আর আল্লাহর সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করে তাঁর প্রদত্ত রিযিককে হারাম করে নিয়েছে, তারা বাস্তবিকই ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেল, তারা নিশ্চিতরূপে পথভ্রষ্ট হয়েছে, বস্তুতঃ তারা হিদায়াত গ্রহণ করার পাত্রও ছিল না।

আল্লাহ পাক বলছেন যে, যারা এসব কাজ করে তারা ইহকালেও ক্ষতিগ্রস্ত এবং পরকালেও ক্ষতিগ্রস্ত। দুনিয়ার ক্ষতি এই যে, সন্তানদেরকে হত্যা করে তারা ধ্বংসের মুখে নিপতিত হলো, তাদের ধন-সম্পদে সংকীর্ণতা এসে গেল, আর

নিজেদের পক্ষ থেকে তারা যে নতুন প্রথা চালু করলো তার ফলে ঐ উপকারী বস্তুগুলো হতে তারা বঞ্চিত হয়ে গেল। পরকালে তাদের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার স্বরূপ এই যে, তারা সবচেয়ে জঘন্য বাসস্থানের অধিকারী হলো। যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ "নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর উপর মিথ্যা অপবাদ দেয়, তারা কখনও সফলকাম হবে না, অল্প কয়েকদিন তারা দুনিয়ায় মজা উপভোগ করবে, অতঃপর তাঁরই কাছে তাদেরকে ফিরে যেতে হবে, তারপর তাদের কুফরীর কারণে তাদেরকে কঠিন শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করতে হবে।" হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ "যদি তোমরা আরবদের মূর্খতা ও অজ্ঞতার পরিচয় লাভ করতে আগ্রহী হও তবে সূরায়ে আন'আমের একশ' ত্রিশ আয়াতের পরে পাঠ কর قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ قَتَلُوْا اَوْلَادَهُمْ -এই আয়াত।" [১]

১৪১। আর সেই আল্লাহই নানা প্রকার বাগান ও গুল্মলতা সৃষ্টি করেছেন যার কতক স্বীয় কাণ্ডের উপর সন্নিবিষ্ট হয়, আর কতক কাণ্ডের উপর সন্নিবিষ্ট হয় না, আর খেজুর বৃক্ষ ও শস্যক্ষেত্র যাতে বিভিন্ন প্রকারের খাদ্যবস্তু উৎপন্ন হয়ে থাকে, আর তিনি যয়তুন (জলপাই) ও আনারের (ডালিমের) বৃক্ষও সৃষ্টি করেছেন যা দৃশ্যতঃ অভিন্ন হলেও স্বাদে বিভিন্ন, এইসব ফল তোমরা আহার কর যখন ওতে ফল ধরে, আর ওতে শরীয়তের নির্ধারিত যে অংশ

١٤١- وَهُوَ الَّذِيْٓ اَنْشَاَ جَنّٰتٍ مَّعْرُوْشٰتٍ وَّغَيْرَ مَعْرُوْشٰتٍ وَّالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا اُكُلُهٗ وَالزَّيْتُوْنَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَّغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ؕ كُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖٓ اِذَآ اَثْمَرَ وَاٰتُوْا حَقَّهٗ يَوْمَ حَصَادِهٖ ۖ ز

১. এটা ইমাম বুখারী (রঃ) মানাকিব বা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর পরিবারবর্গ ও সাহাবীগণের প্রশংসায় বর্ণনা করেছেন এবং ইবনে মিরদুওয়াই (রঃ) এই আয়াতের তাফসীরে এটা তাখরীজ করেছেন।

وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ○

রয়েছে তা ফসল কাটার দিন আদায় করে দাও, অপব্যয় করে সীমালজ্ঘন করো না, নিশ্চয়ই তিনি (আল্লাহ) অপব্যয়কারী ও সীমালজ্ঘন কারীকে ভালবাসেন না।

١٤٢- وَمِنَ الْاَنْعَامِ حَمُوْلَةً وَّفَرْشًا كُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ○

১৪২। আর চতুষ্পদ জন্তুগুলোর মধ্যে কতগুলো (উঁচু আকৃতির) ভারবাহী রয়েছে, আর কতগুলো রয়েছে ছোট আকৃতির গোশত খাওয়ার ও চামড়া দ্বারা বিছানা বানাবার যোগ্য, আল্লাহ যা কিছু দান করেছেন তোমরা তা ভক্ষণ কর, আর শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না, নিঃসন্দেহে সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

আল্লাহ তা'আলা সমস্ত জিনিসেরই সৃষ্টিকর্তা। শস্য, ফল-ফলাদি এবং চতুষ্পদ জন্তু, যেগুলো মুশরিকরা ব্যবহার করতো এবং বিকৃতভাবে ওগুলো বন্টন করতঃ কোনটাকে হালাল, আর কোনটাকে হারাম বানিয়ে নিতো। এ সবই আল্লাহ তা'আলাই সৃষ্টি করেছেন। এসব ফলের কতগুলো স্বীয় কাণ্ডের উপর সন্নিবিষ্ট হয় এবং কতগুলো কাণ্ডের উপর সন্নিবিষ্ট হয় না, এ সবগুলোরই তিনি সৃষ্টিকর্তা। مَعْرُوْشٰتٍ হচ্ছে ঐসব গুল্মলতা যেগুলো পর্দার উপর চড়ানো অবস্থায় থাকে, যেমন আঙ্গুর ইত্যাদি। আর غَيْرَ مَعْرُوْشٰتٍ ঐ সব ফলদার বৃক্ষ যেগুলো জংগলে ও পাহাড়ে জন্মে। ওগুলো এক রকমও এবং বিভিন্ন রকমও হয়। অর্থাৎ দেখতে একরূপ কিন্তু স্বাদে পৃথক। আল্লাহ পাক বলেনঃ যখন গাছগুলোতে ফল ধরে তখন তোমরা সেই ফলগুলো ভক্ষণ কর। আর ফসল কাটার সময় গরীব মিসকীনদেরকে দেয়ার যে হক আছে তা আদায় কর। কেউ কেউ এর দ্বারা ফরয যাকাত অর্থ নিয়েছেন। যখন সেই উৎপাদিত শস্য বা ফল ওযন বা পরিমাপ করা হবে সেই দিনই এই হক আদায় করতে হবে। পূর্বে লোকেরা এটা প্রদান করতো না। অতঃপর শরীয়ত এক দশমাংশ নির্ধারণ করে। আর যেটা শীষ বা গুচ্ছ থেকে খসে পড়বে সেটাও মিসকীনদের হক।

হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেন-যার (উৎপাদিত) খেজুরের পরিমাণ দশ ওয়াসাকের[১] বেশী হবে সে যেন একটা গুচ্ছ মিসকীনদের জন্যে মসজিদে লটকিয়ে দেয়।'[২]

হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেন যে, এটা হচ্ছে শস্য বা ফলের সদকাহ অথবা যাকাত। আর যাকাত ছাড়াও গরীবদের জন্যে অতিরিক্ত হক রয়েছে। শস্য কাটার সময় যাকাত ছাড়াও এই অতিরিক্ত হক প্রদান করা হতো। সেই দিন যদি মিসকীন এসে যায় তবে অবশ্য অবশ্যই তাকে কিছু না কিছু দিতে হবে। তিনি বলেন যে, কমপক্ষে এক মুষ্টি করে দেয়া উচিত। আর যা শীষ থেকে বা গুচ্ছ থেকে পড়ে যাবে সেটাও মিসকীনেরই হক। সাঈদ ইবনে জুবাইর (রঃ) বলেন যে, এটা হচ্ছে যাকাত ফরয হওয়ার পূর্বের হুকুম যে, মিসকীনদের জন্যে ছিল এক মুষ্টি পরিমাণ এবং জীব-জন্তুর জন্যে ছিল চারা-ভুষি, আর পতিতগুলোও ছিল মিসকীনদের হক। ইবনে মিরদুওয়াই (রঃ) বলেন যে, এগুলো ওয়াজিব ছিল। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা এটা মানসূখ করে দেন এবং ওশর বা অর্ধ ওশরকে ওর স্থানে নির্ধারণ করেন। ইবনে জারীর (রঃ)-ও এটাকেই পছন্দ করেছেন। আমি বলি যে, এটাকে মানসূখ বলা চিন্তা ভাবনার বিষয়ই বটে। কেননা, এটা এমনই একটা জিনিস যা মূলেই ওয়াজিব ছিল। তারপর বিস্তারিতভাবে ওর বর্ণনা দেয়া হয়েছে। আর কত দিতে হবে সেই পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, এই যাকাত হিজরী দ্বিতীয় সনে ফরয হয়েছিল। আল্লাহ তা'আলা ঐ লোকদের নিন্দে করেছেন যারা ফসল কাটতো কিন্তু তা থেকে গরীব মিসকীনদেরকে কিছুই দান করতো না। যেমন 'সূরায়ে নূন' -এ এক বাগানের মালিকের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "যখন তারা শপথ করলো যে, নিশ্চয়ই প্রত্যুষেই ওর ফল পেড়ে নেবে। কিন্তু ইনশাআল্লাহ (আল্লাহ যদি চান) বললো না। অতএব, তোমার প্রভুর পক্ষ হতে এক পরিভ্রমণকারী (আপদ) ওতে বয়ে গেল, আর তারা ঘুমন্ত ছিল। অতঃপর প্রভাতে বাগানটি এমন হয়ে রইলো, যেমন শস্য কাটা ক্ষেত। অনন্তর প্রাতে একে অন্যকে ডাকতে লাগলো। নিজ নিজ ক্ষেতের দিকে প্রত্যুষেই চল, যদি ফল পাড়তে হয়। অনন্তর চুপি চুপি বলতে বলতে চলল, আজ কোন দরিদ্র তোমাদের

১. ষাট সা'-এ এক ওয়াসাক। আর এক সা'-এ হয় পাকি দু'সের এগারো ছটাক বা মতান্তরে তিন সের ছ' ছটাক।

২. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) ও ইমাম আবূ দাউদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। এর ইসনাদ উত্তম ও মজবুত।

কাছে আসতে পারবে না এবং নিজেদেরকে ওটা না দিতে সক্ষম মনে করে চললো। অতঃপর যখন বাগান দেখলো তখন তারা বলতে লাগলো-নিশ্চয়ই আমরা পথ ভুলে গেছি। বরং আমাদের ভাগ্যই বিরূপ হয়ে গেছে। তাদের মধ্যকার ভাল লোকটি বললো, আমি কি তোমাদেরকে বলিনি? এখন কেন (তাওবা ও) তাসবীহ্ (পাঠ) করছো না? সবাই বললো, আমাদের প্রভু পবিত্র, নিশ্চয়ই আমরা অপরাধী। অতঃপর একে অপরকে সম্বোধন করে পরস্পর দোষারোপ করতে লাগলো। বলতে লাগলো, নিশ্চয়ই আমরা সীমালংঘনকারী ছিলাম। সম্ভবতঃ আমাদের প্রতিপালক আমাদেরকে প্রতিদানে এতদপেক্ষা উত্তম বাগান দান করতে পারেন, আমরা আমাদের প্রতিপালকের দিকে ফিরে যাচ্ছি এভাবেই শাস্তি হয়ে থাকে, আর পরকালের শাস্তি এটা অপেক্ষা গুরুতর, কি ভালো হতো, যদি তারা জানতো!"

আল্লাহ পাকের উক্তি وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ অর্থাৎ তোমরা অপব্যয় করে সীমালংঘন করো না, নিশ্চয়ই তিনি অপব্যয়কারী ও সীমালংঘনকারীকে ভালবাসেন না। অর্থাৎ দেয়ার ব্যাপারে প্রয়োজনের অতিরিক্ত দিতে শুরু করো না। কোন কোন লোক ফসল কাটার সময় এতো বেশী দান করতো যে, সেটা অপব্যয়ের মধ্যে পড়ে যেতো। তাই মহান আল্লাহ বলেনঃ وَلَا تُسْرِفُوا অর্থাৎ অপব্যয় করো না।

সাবিত ইবনে কায়েস স্বীয় খুরমা গাছের ফল পেড়ে ঘোষণা করে দেনঃ 'আজ যে কেউই আমার কাছে আসবে আমি তাকেই প্রদান করবো।' শেষ পর্যন্ত এতো বেশী লোক এসে নিয়ে গেল যে, একটা ফলও তাঁর কাছে অবশিষ্ট রইলো না। সেই সময় এই আয়াত অবতীর্ণ হয় যে, আল্লাহ তা'আলা অপব্যয়কারী ও সীমালংঘনকারীকে ভালবাসেন না। ইবনে জুরাইজ বলেন, এর ভাবার্থ এই যে, প্রত্যেক কাজেই অপব্যয় ও সীমালংঘন নিষিদ্ধ। আয়াস ইবনে মু'য়াবিয়া (রঃ) বলেন যে, আল্লাহ তা'আলার আদেশ পালনের ব্যাপারে সীমা ছাড়িয়ে গেলেই সেটা 'ইসরাফ' হয়ে যাবে। সুদ্দী (রঃ) বলেন, এর ভাবার্থ হচ্ছে-এতো বেশী দান করো না যে, নিজে সবকিছু থেকে বঞ্চিত হয়ে যাও এবং দরিদ্র হয়ে পড়। মুহাম্মাদ ইবনে কা'ব (রঃ) বলেন, যাকাত দেয়া বন্ধ করো না, নতুবা আল্লাহর অবাধ্যতা অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়বে। সঠিক কথা এটাই যে, প্রত্যেক ব্যাপারেই বাড়াবাড়ি ও সীমালংঘন দূষণীয়। তবে এখানে যে বাড়াবাড়ি না করার কথা বলা হয়েছে তা খাওয়ার দিকে প্রত্যাবর্তিত, যা আয়াতের ধরনে অনুমিত হয়। যেমন

আল্লাহ পাক বলেনঃ যখন ফল পেকে যাবে তখন সেই ফল ভক্ষণ কর এবং ফসল কাটার সময় গরীবদেরকে তাদের হক প্রদান কর, আর সীমালংঘন করো না অর্থাৎ তোমরা খাওয়ার ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না। কেননা, খুব বেশী খাওয়া বুদ্ধি-বিবেক ও দেহের পক্ষে ক্ষতিকর। যেমন মহান আল্লাহ আর এক জায়গায় বলেনঃ "তোমরা খাও,পান কর, কিন্তু বাড়াবাড়ি করো না।" সহীহ বুখারীতে রয়েছে– "তোমরা বাড়াবাড়ি ও অহংকার প্রদর্শন বাদ দিয়ে খাও, পান কর এবং পরিধান কর।"

মহামহিমান্বিত আল্লাহর উক্তি– وَمِنَ الْاَنْعَامِ حَمُوْلَةً وَّفَرْشًا অর্থাৎ আল্লাহ তোমাদের জন্যে চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছেন, যা তোমাদের বোঝা বহন ও সওয়ারীর কাজে লাগে, যেমন উট। فَرْشً দ্বারা ছোট ছোট গৃহপালিত জন্তু অথবা ছোট শ্রেণীর উট বুঝানো হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রঃ) বলেন যে, حَمُوْلَةً শব্দ দ্বারা উট, ঘোড়া, খচ্চর, গাধা এবং সর্ব প্রকারের ভারবাহী পশু বুঝানো হয়েছে এবং فَرْشً দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে ছাগল। মুজাহিদও (রঃ) এরূপই বলেছেন। ইবনে জারীর (রঃ) বলেন ঃ "আমার মনে হয় فَرْشً বলার কারণ এই যে, ওটা নিম্ন দেহ বিশিষ্ট হওয়ার ফলে যেন যমীনের 'ফারশ' বা বিছানা হয়ে গেছে। যহ্হাক (রঃ) এবং কাতাদা (রঃ) বলেন যে, حَمُوْلَةً হচ্ছে উট এবং গরু, আর فَرْشً হচ্ছে ছাগল। আব্দুর রহমান ইবনে যায়েদ (রঃ)-এর ধারণা এই যে, حَمُوْلَةً হচ্ছে সওয়ারীর জন্তু এবং فَرْشً হচ্ছে ঐ পশু যাকে যবাই করে গোশত ভক্ষণ করা হয় বা ওর দুধ পান করা হয়। ছাগল বোঝা বহন করে না, বরং ওর গোশত খাওয়া হয় এবং ওর পশম দিয়ে কম্বল ও বিছানা বানানো হয়। আব্দুর রহমান এই আয়াতের যে তাফসীর করেছেন সেটাই সঠিক বটে, আল্লাহ পাকের উক্তিও এর সাক্ষ্য বহন করে । তিনি বলেন–

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِّمَّا عَمِلَتْ اَيْدِيْنَا اَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مٰلِكُوْنَ وَ ذَلَّلْنٰهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوْبُهُمْ وَمِنْهَا يَاْكُلُوْنَ۔

অর্থাৎ "তারা কি লক্ষ্য করেনি যে, আমি তাদের জন্যে আমার (কুদরতের) হাতে বস্তুসমূহের মধ্যে চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছি, অতঃপর তারাই এসবের মালিক হয়ে যাচ্ছে। আর আমি এই চতুষ্পদ জন্তুগুলোকে তাদের বশীভূত করে দিয়েছি, অনন্তর ওর কতক তো তাদের বাহন এবং কতিপয়কে তারা ভক্ষণ করে

থাকে।” (৩৬ঃ ৭১-৭২) আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেনঃ “এই পশুগুলোর মধ্যে তোমাদের জন্যে বড়ই শিক্ষণীয় বিষয় ও উপদেশ রয়েছে। ওদের রক্ত দ্বারা তৈরীকৃত দুধ আমি তোমাদেরকে পান করিয়ে থাকি। এটা খাঁটি দুধ, পানকারীদের জন্যে এটা কতই না সুস্বাদু। ওদের লোম ও পশম তোমাদের জন্যে পোষাকের কাজ দেয় এবং তোমাদের অন্যান্য প্রয়োজনে তোমরা তা ব্যবহার করে থাক।” মহান আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেনঃ “তিনিই আল্লাহ যিনি তোমাদের জন্যে চতুষ্পদ জন্তুগুলো সৃষ্টি করেছেন যে তোমরা কতগুলোর উপর আরোহণ কর, কতগুলোর গোশত ভক্ষণ কর।” তোমাদের জন্যে অন্যান্য আরও উপকার রয়েছে। তোমরা ওদের দ্বারা তোমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করে থাক। তোমরা ওগুলোর উপর আরোহণ কর। আর তোমরা জাহাজে ও নৌকায় তোমাদের বোঝা চাপিয়ে থাক এবং সওয়ার হয়ে থাক। আল্লাহ তোমাদের কাছে নিজের কতই না নিদর্শন পেশ করছেন! তোমরা তাঁর কোন্ নিদর্শনকে অস্বীকার করবে?

আল্লাহ তা'আলার উক্তি- كُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ অর্থাৎ আল্লাহ তোমাদেরকে যে ফল ফলাদি, ফসল, চতুষ্পদ জন্তু ইত্যাদি প্রদান করেছেন সেগুলো তোমরা খাও, এগুলো আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের জীবিকা বানিয়েছেন। তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না যেমন এই মুশরিকরা তার পদাঙ্ক অনুসরণ করেছে। তারা কোন কোন আহার্যকে নিজেদের উপর হারাম করে নিয়েছে। হে লোক সকল! শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। অর্থাৎ তোমরা একটু চিন্তা করলেই তার শত্রুতা তোমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠবে। সুতরাং তোমরাও শয়তানকে নিজেদের শত্রু বানিয়ে নাও। সে নিজের শয়তানী সেনাবাহিনী নিয়ে তোমাদের উপর আক্রমণ চালাচ্ছে, যেন তোমরা জাহান্নামের অধিবাসী হয়ে যাও। হে বানী আদম! শয়তান যেন তোমাদেরকে ফিৎনায় না ফেলে, যেমন সে তোমাদের পিতা-মাতাকে (আদম ও হাওয়াকে) জান্নাত থেকে বের করে দিয়েছিল এবং তাদের দেহ থেকে পোশাক সরিয়ে দিয়েছিল। ফলে তারা উলঙ্গ হয়ে পড়েছিল। আল্লাহ পাক বলেনঃ “তোমরা কি আমাকে ছেড়ে শয়তানকে ও তার সন্তানদেরকে বন্ধু বানিয়ে নেবে? অথচ তারাতো তোমাদের শত্রু। অত্যাচারীদের জন্যে বড়ই জঘন্য বিনিময় রয়েছে।” কুরআন পাকে এই বিষয়ের বহু আয়াত রয়েছে।

১৪৩। এই পশুগুলো আট প্রকার রয়েছে, ভেড়ার একজোড়া স্ত্রী পুরুষ এবং বকরীর একজোড়া স্ত্রী পুরুষ, হে নবী (সঃ)! তুমি জিজ্ঞেস কর তো-আল্লাহ কি উভয় পুরুষ পশুগুলোকে হারাম করেছেন, না উভয় স্ত্রী পশুগুলোকে, না স্ত্রী দু'টির গর্ভে যা আছে তা হারাম করেছেন? তোমরা জ্ঞানের সাথে আমাকে উত্তর দাও- যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক।

١٤٣- ثَمٰنِيَةَ اَزْوَاجٍ مِنَ الضَّاْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ ءٰٓالذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ اَمِ الْاُنْثَيَيْنِ اَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ اَرْحَامُ الْاُنْثَيَيْنِ نَبِّـُٔوْنِيْ بِعِلْمٍ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝

১৪৪। আর উটের স্ত্রী পুরুষ দু'টি এবং গরুর স্ত্রী পুরুষ দু'টি পশু, তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর-আল্লাহ কি এ দু'টি পুরুষ পশুকে বা এ দু'টি স্ত্রী পশুকে হারাম করেছেন, অথবা স্ত্রী গরু ও উটের গর্ভে যা রয়েছে তা হারাম করেছেন? আল্লাহ যখন এসব পশু হালাল-হারাম হওয়ার বিধান জারি করেন তখন কি তোমরা হাযির ছিলে? যে ব্যক্তি বিনা প্রমাণে না জেনে মানুষকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে আল্লাহর নামে এরূপ মিথ্যা আরোপ করে তার চেয়ে বড় যালিম আর কে হতে পারে? আল্লাহ যালিমদেরকে সুপথ প্রদর্শন করেন না।

١٤٤- وَمِنَ الْاِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ ءٰٓالذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ اَمِ الْاُنْثَيَيْنِ اَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ اَرْحَامُ الْاُنْثَيَيْنِ اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَآءَ اِذْ وَصّٰىكُمُ اللّٰهُ بِهٰذَا فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا لِّيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۝ ع

ইসলামের পূর্বে অজ্ঞ আরবরা কতগুলো পশু নিজেদের উপর হারাম করে নিয়েছিল এবং ওগুলোর শ্রেণী বিভাগ নির্ধারণ করেছিল। অর্থাৎ 'বাহীরা', 'সায়েবা', 'ওয়াসীলা', 'হাম' ইত্যাদি পশুগুলো। তারা এরূপ হারাম করে নিয়েছিল পশুগুলোর মধ্যেও এবং ফসল ফলাদির মধ্যেও। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ তোমাদের এসব বাগান, শস্যক্ষেত্র, ভারবাহী পশু, আরোহণযোগ্য পশু ইত্যাদি সবকিছু আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর মহান আল্লাহ চতুষ্পদ জন্তুগুলোর প্রকার বর্ণনা করলেন এবং বকরিরও বর্ণনা দিলেন যা সাদা রং এর হয়ে থাকে, মেষের বর্ণনা দিলেন যা কাল রং এর হয়। ওগুলোর নর ও মাদীরও বর্ণনা করলেন। তারপর উট নর ও মাদী এবং গরু নর ও মাদীর বর্ণনা দিলেন। তিনি এ সমুদয় জন্তুর কোনটাই হারাম করেননি এবং এগুলোর বাচ্চাগুলোকেও না। কেননা, তিনি এগুলোকে বানী আদমের খাদ্য, সওয়ারী, বোঝা বহন, দুগ্ধপান ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকারের উপকার লাভের জন্যে সৃষ্টি করেছেন। যেমন তিনি বলেনঃ এই পশুগুলোর মধ্য হতে আট জোড়া তোমাদের জন্যে অবতীর্ণ করেছি। أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ –এটা দ্বারা কাফিরদের নিম্নের উক্তিকে খণ্ডন করা হয়েছেঃ "এই জন্তুগুলোর পেটে যা রয়েছে তা শুধু আমাদের পুরুষদের জন্যে, আমাদের স্ত্রীলোকদের জন্যে এটা হারাম।" এখন আল্লাহ পাক বলেনঃ তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে আমাকে নিশ্চিত রূপে বল যে, যে জিনিসগুলো হারাম হওয়ার তোমরা ধারণা করছো, আল্লাহ কিরূপে ওগুলো তোমাদের উপর হারাম করলেন? তোমরা 'বাহীরা', 'সায়েবা' ইত্যাদিকে কেন হারাম করে নিচ্ছ?

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, আট জোড়ার মধ্যে দু'টি মেষ এবং দু'টি বকরির চার জোড়া হলো। আল্লাহ পাক বলেন–এগুলোর কোনটিকেই আমি হারাম করিনি। এদের বাচ্চা, তা নরই হোক অথবা মাদীই হোক, কোনটাকে হালাল এবং কোনটাকে হারাম কিরূপে বানিয়ে নিচ্ছ? যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে নিশ্চিত রূপে বল। এগুলো তো সবই হালাল।

আল্লাহ পাকের উক্তিঃ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَٰذَا -এর দ্বারা কাফির ও মুশরিকদেরকে ভর্ৎসনা করা হচ্ছে যে, কিভাবে তারা মনগড়া নতুন নতুন কথা বলছে এবং নিজেরাই হারাম বানিয়ে নিয়ে আল্লাহ তা'আলার দিকে সম্বন্ধ লাগিয়ে দিচ্ছে। সুতরাং যারা আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করতঃ জনগণকে বিভ্রান্ত করে, তাদের মত অত্যাচারী আর কে হতে পারে? এটা আমর ইবনে লুহাই ইবনে কামআ' সম্পর্কে বলা হয়েছে। কেননা, সে-ই সর্বপ্রথম নবীদের দ্বীনকে

পরিবর্তন করে দিয়েছিল এবং 'সায়েবা', 'ওয়াসীলা', 'হাম' ইত্যাদির ই'তেকাদ বা বিশ্বাস সৃষ্টি করেছিল। হাদীস দ্বারাও এটা প্রমাণিত।

১৪৫। (হে মুহাম্মাদ সঃ)! তুমি বল–অহীর মাধ্যমে আমার কাছে যে বিধান পাঠানো হয়েছে তাতে কোন আহারকারীর জন্যে কোন বস্তু হারাম করা হয়েছে– এমন কিছু আমি পাইনি, তবে মৃতজন্তু, প্রবাহিত রক্ত ও শূকরের গোশত এবং যা আল্লাহর নামে যবাই করা হয়নি, তা হারাম করা হয়েছে। কেননা, এটা নাপাক ও শরীয়ত বিগর্হিত বস্তু, কিন্তু যদি কোন লোক স্বাদ আস্বাদন ও সীমালঙ্ঘনের উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে নিরুপায় হয়ে পড়ে, (তার পক্ষে এটাও খাওয়া বৈধ) কেননা, আল্লাহ ক্ষমাশীল ও অনুগ্রহশীল।

١٤٥- قُلْ لَّآ اَجِدُ فِىْ مَآ اُوْحِىَ اِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلٰى طَاعِمٍ يَّطْعَمُهٗٓ اِلَّآ اَنْ يَّكُوْنَ مَيْتَةً اَوْ دَمًا مَّسْفُوْحًا اَوْ لَحْمَ خِنْزِيْرٍ فَاِنَّهٗ رِجْسٌ اَوْ فِسْقًا اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَاِنَّ رَبَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

মহান আল্লাহ স্বীয় রাসূল (সঃ)-কে সম্বোধন করে বলছেনঃ হে মুহাম্মাদ (সঃ)! যারা আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করে তাঁর প্রদত্ত রিয্‌ককে হারাম করে নিয়েছে তাদেরকে তুমি বলে দাও–আমার উপর যে অহী অবতীর্ণ করা হয়েছে তাতে আমি এমন কিছুই হারাম পাইনি যা তোমরা হারাম করে নিয়েছো, ঐগুলো ছাড়া যেগুলো হারাম হওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। আবার এ কথাও বলা হয়েছে, এর অর্থ হচ্ছে জীবজন্তুগুলোর কোনটিই আমি হারাম পাচ্ছি না, ঐগুলো ব্যতীত যেগুলোর হারাম হওয়ার বর্ণনা দেয়া হয়েছে। সূরায়ে মায়েদায় এর বর্ণনা দেয়া হয়েছে এবং হাদীসেও ওগুলোর হারাম হওয়ার বর্ণনা রয়েছে। কেউ কেউ ওটাকেও মানসূখ বলেছেন। কিন্তু পরবর্তী অধিকাংশ মনীষীর মতে এটা মানসূখ

নয়। কেননা, এতে তো মূলের বৈধতাকেও উঠিয়ে দেয়া অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়বে। আর دَمٌ مَّسْفُوحٌ প্রবাহিত রক্তকে বলা হয়। যদি এই আয়াতটি না থাকতো তবে লোকেরা ঐ রক্তও নিয়ে নিতো যা শিরাগুলোতে চলাচল করছে। যেমন ইয়াহূদীরা সেই রক্তও নিয়ে থাকে।

ইমরান ইবনে জারীর (রঃ) বলেনঃ "আমি আবূ মুজলিয (রঃ)-কে রক্ত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম অর্থাৎ ঐ রক্ত সম্পর্কে যা মাথা, কণ্ঠ ইত্যাদির সাথে লেগে থাকে এবং রান্না করার সময় হাঁড়ির মধ্যে রক্তের যে লালিমা প্রকাশ পায়। তিনি উত্তরে বললেনঃ "আল্লাহ তো শুধু প্রবাহিত রক্ত খেতে নিষেধ করেছেন। যদি গোশতের সাথে রক্ত লেগে থাকে তবে তাতে কোন দোষ নেই।" হযরত কাসিম (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আয়েশা (রাঃ) বন্য পশুর গোশত এবং হাঁড়ির ভিতরের রক্তকে দূষণীয় মনে করতেন না এবং এই আয়াতটি পাঠ করতেন।[১]

হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হলোঃ "জনগণ ধারণা করছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) খায়বারের যুদ্ধের সময় পালিত গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছিলেন (এ সম্পর্কে আপনার অভিমত কি?)।" তিনি উত্তরে বললেনঃ "হাকাম ইবনে আমর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ) থেকে এরূপ বর্ণনা করে থাকেন বটে, কিন্তু তাফসীরের সমুদ্র অর্থাৎ হযরত আব্বাস (রাঃ) এটা অস্বীকার করেন এবং قُلْ لَّآ اَجِدُ فِيْ مَآ اُوْحِيَ اِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلٰى طَاعِمٍ يَّطْعَمُهٗ -এই আয়াতটি শুনিয়ে থাকেন।"[২]

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, অজ্ঞতার যুগের লোকেরা কোন জিনিস খেত এবং কোন জিনিসকে মাকরূহ ও অপবিত্র মনে করে পরিত্যাগ করত। তাই মহান আল্লাহ স্বীয় নবী (সঃ)-এর উপর আহকাম অবতীর্ণ করলেন। তিনি হালালকে হালাল এবং হারামকে হারাম বলে দিলেন। আর যেগুলো সম্পর্কে নীরবতা অবলম্বন করলেন সেগুলো খাওয়া মুবাহ। অতঃপর তিনি উক্ত আয়াতটিই পাঠ করলেন।[৩]

---

১. এটা ইবনে জারীর (রঃ) হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন এবং ইবনে কাসীর (রঃ) এটাকে সহীহ ও গারীব বলেছেন।

২. এটা ইমাম বুখারী (রঃ), ইমাম আবূ দাউদ (রঃ) এবং ইমাম হাকিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

৩. এটা ইবনে মিরদুওয়াই-এর ভাষা। ইমাম আবূ দাউদ (রঃ) এটা বর্ণনা করেছেন। আর ইমাম হাকিম (রঃ) বলেছেন যে, এর ইসনাদ বিশুদ্ধ কিন্তু তাঁরা দু'জন এটাকে তাখরীজ করেননি।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত সাওদা বিন্‌তে যামআ (রাঃ)-এর একটি বকরি মারা যায়। তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ) কে বলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমার বকরিটি মারা গেছে।" তখন তিনি বললেনঃ "তুমি এর চামড়া দ্বারা মশক বানিয়ে নিলে না কেন?" হযরত সাওদা (রাঃ) বলেনঃ "বকরি মারা গেলে আমরা ওর চামড়া দ্বারা মশক বানিয়ে নিতাম।" অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সঃ) এই আয়াতটি পড়ে হযরত সাওদা (রাঃ)-কে বলেনঃ "মৃতজন্তু, প্রবাহিত রক্ত এবং শূকরের মাংস খাওয়া হারাম। কিন্তু যদি তুমি মৃতজন্তুর চামড়া দাবাগাত বা সংস্কার করে নাও তবে তা ব্যবহার করতে পার।" হযরত সাওদা (রাঃ) তখন ঐ মৃত বকরিটির চামড়া দ্বারা মশক বানিয়ে নেন, যা বহুদিন পর্যন্ত তাঁর কাছে ছিল।[১]

সাঈদ ইবনে মানসূর (রঃ) নামীলা ফাযারী (রঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেনঃ "আমি (একদা) হযরত ইবনে উমার (রাঃ) -এর নিকটে ছিলাম, এমন সময় একটি লোক তাঁকে সজারুর গোশত খাওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। তিনি তখন উপরোক্ত আয়াতটিই পাঠ করেন (অর্থাৎ এ আয়াতে সজারু হারাম হওয়ার কোন উল্লেখ নেই।) তখন তাঁর পাশে উপবিষ্ট একজন বৃদ্ধ বললেনঃ "আমি হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, সজারু হচ্ছে খারাপ ও অশ্লীল জন্তুসমূহের মধ্যে একটি জন্তু।" তখন হযরত ইবনে উমার (রাঃ) বলেনঃ "নবী (সঃ) যদি এরূপ বলে থাকেন তবে সেরূপই হবে।"[২]

আল্লাহ পাকের উক্তি- فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ অর্থাৎ কেউ যদি হারাম বস্তু খেতে বাধ্য হয় এবং একেবারে নিরুপায় হয়ে পড়ে, সে যে প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে এটা করছে তা নয় এবং প্রয়োজনের অতিরিক্তও খাচ্ছে না, তবে তার জন্যে এটা খাওয়া বৈধ। কেননা, আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু। এই আয়াতের তাফসীর সূরায়ে বাকারায় হয়ে গেছে এবং সেখানে পূর্ণ আলোকপাত করা হয়েছে। এই আয়াতের ধরনে বুঝা যায় যে, এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে মুশরিকদের মতবাদ খণ্ডন করা। তারা নিজেদের উপর কতগুলো বস্তু হারাম করে নেয়ার বিদআত চালু করেছিল। যেমন 'বাহীরা', 'সায়েবা' ইত্যাদি পশুকে হারাম করণ। তাই

---

১. হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) তাখরীজ করেছেন এবং ইমাম বুখারী (রঃ) ও ইমাম নাসাঈ (রঃ) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

২. এটা ইমাম আবূ দাউদ (রঃ) সাঈদ ইবনে মানসূর (রঃ) হতে বর্ণনা করেছেন।

রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাদেরকে সংবাদ দিয়ে দেন যে, এসব পশু হারাম হওয়ার কথা কোন জায়গাতেই উল্লেখ নেই। সুতরাং মুসলমানদের এগুলো খাওয়া থেকে বিরত থাকার কোনই প্রয়োজন নেই। শুধুমাত্র মৃতজন্তু, প্রবাহিত রক্ত ও শূকরের মাংস খাওয়া নিষিদ্ধ। আর যে পশুকে গায়রুল্লাহর নামে জবাই করা হয়েছে সেটাও হারাম। এ কয়টি ছাড়া আল্লাহ আর কোনকিছুই হারাম করেননি। যা থেকে নীরবতা অবলম্বন করা হয়েছে সেটাও ক্ষমার্হ। তাহলে আল্লাহ যা হারাম করেননি ওটা তোমরা কোথা থেকে হারাম বানিয়ে নিচ্ছ? এরই ভিত্তিতে অন্যান্য জিনিসের অবৈধতা অবশিষ্ট থাকছে না, যেমন আলেমদের মশহূর মাযহাবে পালিত গাধা বা বন্য জন্তুর গোশত কিংবা থাবা বিশিষ্ট পাখীর গোশত বৈধ নয়, এ সবগুলোর অবৈধতা বাকী থাকছে না।

١٤٦- وَ عَلَى الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِيْ ظُفُرٍ وَ مِنَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُوْمَهُمَآ اِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُوْرُهُمَآ اَوِ الْحَوَايَآ اَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذٰلِكَ جَزَيْنٰهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَ اِنَّا لَصٰدِقُوْنَ ۝

১৪৬। ইয়াহূদীদের প্রতি আমি সর্বপ্রকার নখ বিশিষ্ট জীব হারাম করেছিলাম; আর গরু ও ছাগল হতে তাদের জন্যে উভয়ের চর্বি হারাম করেছিলাম, কিন্তু পৃষ্ঠদেশের চর্বি, নাড়িভুঁড়ির চর্বি ও হাড়ের সাথে মিশ্রিত চর্বি এই হারামের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। তাদের বিদ্রোহমূলক আচরণের জন্যে আমি তাদেরকে এই শাস্তি দিয়েছিলাম, আর আমি নিঃসন্দেহে সত্যবাদী।

ইরশাদ হচ্ছে—আমি ইয়াহূদীদের উপর সর্বপ্রকার নখ বিশিষ্ট জন্তু হারাম করে দিয়েছিলাম এবং গরু ও ছাগলের চর্বিও তাদের উপর হারাম করেছিলাম। কিন্তু পিঠের চর্বি, নাড়িভুঁড়ির চর্বি এবং হাড়ের সাথে মিশ্রিত চর্বি এই হারামের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। এই নখ বিশিষ্ট জীব হচ্ছে সেই পশু এবং পাখী যেগুলোর অঙ্গুলি কাটা কাটা এবং পৃথক পৃথক নয়। যেমন উট, উট পাখী, রাজ হাঁস এবং পাতি হাঁস। সাঈদ ইবনে জুবাইর (রঃ) বলেন যে, এর দ্বারা ঐ জন্তুগুলো উদ্দেশ্য যেগুলোর অঙ্গুলি চিরা ও ফাটা হয় না। আবার অন্য এক বর্ণনায় সাঈদ (রঃ)

হতে এটাও বর্ণিত আছে যে, এর দ্বারা ঐ জন্তুগুলোকে বুঝানো হয়েছে যেগুলোর অঙ্গুলি বিচ্ছিন্ন ও পৃথক পৃথক। যেমন মোরগ। কাতাদাহ (রঃ) বলেন যে, এর দ্বারা উট, উট পাখী, পাখী এবং মাছ উদ্দেশ্য। তাঁর থেকে আর একটি বর্ণনা আছে যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে পাখী ও পাতি হাঁস এবং অনুরূপভাবে ঐ জন্তুগুলো যেগুলো উন্মুক্ত অঙ্গুলি বিশিষ্ট নয়। সুতরাং ইয়াহূদীরা ঐসব জন্তু এবং পাখী খেত যেগুলো উন্মুক্ত থাবা বিশিষ্ট। তারা বন্য গাধাও খেত না। কেননা, ওর থাবাও উটের মতই উন্মুক্ত নয়।

গরু এবং ছাগলের চর্বি দ্বারা ঐ চর্বি বুঝানো হয়েছে যা পাছার উপর পৃথকভাবে জমা হয়ে থাকে। ইয়াহূদীরা বলত–'হযরত ইয়াকুব (আঃ) এগুলো হারাম মনে করতেন বলে আমরাও হারাম মনে করে থাকি।' পিঠের চর্বি হারাম ছিল না। ইমাম আবূ জা'ফর (রঃ) বলেন যে, حَوَايَا শব্দটি বহুবচন। একবচন হচ্ছে حَاوِيَة শব্দ। পেটের মধ্যকার জিনিসগুলোকে حَاوِيَة বলা হয়, যেমন নাড়িভুঁড়ি ইত্যাদি। হাড়ের সঙ্গে যে চর্বি মিশ্রিত থাকে সেটাও হালাল ছিল। অনুরূপভাবে পা, বক্ষ, মাথা এবং চোখের চর্বিও হালাল ছিল। আল্লাহ পাক বলেনঃ আমি যে তাদের উপর এই সংকীর্ণতা আনয়ন করেছিলাম তার একমাত্র কারণ ছিল তাদের বিদ্রোহ ও বিরুদ্ধাচরণ। যেমন তিনি বলেনঃ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا.... –অর্থাৎ "যে বস্তুগুলো তাদের উপর পূর্বে হালাল ও পবিত্র ছিল সেগুলো তাদের উপর হারাম করে দিয়েছিলাম, কারণ ছিল এই যে, তারা বিদ্রোহ ও বিরুদ্ধাচরণ করেছিল এবং অন্যদেরকে আল্লাহর পথে যেতে বাধা দিয়েছিল। সুতরাং এটা ছিল তাদের উপর আমার শাস্তি। আর এই শাস্তি প্রদানে আমি সত্যবাদী ও ন্যায়পরায়ণ।" (৪ঃ ১৬০)

ইবনে জারীর (রঃ) বলেন যে, وَإِنَّا لَصٰدِقُوْنَ -এর ভাবার্থ হচ্ছে–হে মুহাম্মাদ (সঃ)! এর অবৈধতা সম্পর্কে তোমাকে আমি যা বললাম এটাই সত্য ও সঠিক। আর ইয়াহূদীরা যে বলছে হযরত ইয়াকুব (আঃ) ওগুলো হারাম মনে করতেন বলেই তারা হারাম মনে করছে এটা মোটেই সত্য নয়।

হযরত উমার (রাঃ) যখন সংবাদ পান যে, সুমরা মদ বিক্রী করেছে তখন তিনি বলেন ঃ আল্লাহ সুমরাকে ধ্বংস করুন! সে কি জানে না যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "আল্লাহ ইয়াহূদীদের উপর অভিসম্পাত বর্ষণ করুন, কেননা তাদের উপর চর্বি হারাম করে দেয়া হয়েছিল, তখন তারা তা বের করে পরিষ্কার করতঃ বিক্রী করে দিতো।"

হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ "আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে মক্কা বিজয়ের বছরে বলতে শুনেছি, নিশ্চয়ই আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (সঃ) মদ্য, মৃত, শূকর এবং মূর্তির বিক্রয়ও হারাম করে দিয়েছেন।" তখন জিজ্ঞেস করা হলোঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! মৃতজন্তুর চর্বি দ্বারা চামড়ায় তেল লাগানো, নৌকায় ঐ চর্বি মাখানো এবং ওটা জ্বালিয়ে আলো লাভ করণ সম্পর্কে আপনার মত কি?" উত্তরে তিনি বললেনঃ "না, ওটা হারাম।" তারপর তিনি বললেনঃ "আল্লাহ ইয়াহূদীদেরকে ধ্বংস করুন! কেননা, যখন তাদের জন্যে চর্বি হারাম করে দেয়া হয় তখন তারা ওটা পরিষ্কার করে বিক্রী করতে শুরু করে এবং ওর মূল্য খেতে লাগে।"[১]

হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন—"আল্লাহ ইয়াহূদীদেরকে ধ্বংস করুন, তাদের উপর চর্বি হারাম করা হয়, তখন তারা ওটা বিক্রী করে এবং ওর মূল্য খেতে লাগে।"[২]

ইবনে মিরদুওয়াই (রঃ) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, (একদা) রাসূলুল্লাহ (সঃ) মাকামে ইবরাহীমের পিছনে বসেছিলেন। এমন সময় তিনি স্বীয় চক্ষু আকাশের দিকে উঠিয়ে বলেনঃ "আল্লাহ ইয়াহূদীদের উপর অভিসম্পাত বর্ষণ করুন।" একথা তিনি তিনবার বলেন। তার পর তিনি বলেনঃ "নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের উপর চর্বি হারাম করেছিলেন, তখন তারা ওটা বিক্রী করতঃ ওর মূল্য ভক্ষণ করে। অথচ আল্লাহ যখন কোন সম্প্রদায়ের উপর কোন জিনিস হারাম করেন তখন ওর মূল্যও তাদের উপর হারাম হয়ে যায়।"[৩]

ইমাম আহমাদ (রঃ) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) মসজিদে হারামে হাজরে আসওয়াদের দিকে মুখ করে বসেছিলেন। এমন সময় তিনি আকাশের দিকে তাকিয়ে হেসে উঠেন। অতঃপর বলেনঃ "আল্লাহ ইয়াহূদীদের উপর অভিসম্পাত বর্ষণ করুন! তাদের উপর চর্বি হারাম করা হলে তারা ওটা বিক্রী করে এবং ওর মূল্য ভক্ষণ করে। অথচ, নিশ্চয়ই আল্লাহ যখন কোন কওমের উপর কোন কিছু হারাম করেন তখন ওর মূল্যও তাদের উপর হারাম হয়ে যায়।"[৪]

১. একটি দল কয়েক পন্থায় এটা তাখরীজ করেছেন।
২. এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রঃ) ও ইমাম মুসলিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।
৩. এ হাদীসটি ইবনে মিরদুওয়াই (রঃ) ইবনে আব্বাস (রঃ) হতে মারফূ' রূপে বর্ণনা করেছেন।
৪. ইমাম আহমাদ (রঃ) তাঁর মুসনাদে এটা তাখরীজ করেছেন।

হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ "আমরা আল্লাহর রাসূল (সঃ)-এর নিকট আগমন করি। সে সময় তিনি রুগ্ন ছিলেন। আমরা তাঁর ইয়াদত (রোগী পরিদর্শন) করছিলাম। তিনি শায়িত ছিলেন এবং আপন চাদর দ্বারা স্বীয় মুখমণ্ডল ঢেকে ছিলেন। অতঃপর তিনি চাদর খানা সরিয়ে দিয়ে বলেনঃ "ইয়াহূদীদের উপর চর্বি হারাম করা হলে তারা ওটা বিক্রী করে ওর মূল্য খেতে শুরু করে, সুতরাং আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করুন! যা খাওয়া হারাম তা বিক্রী করাও হারাম।"

১৪৭। সুতরাং (হে নবী সঃ)! এ সব বিষয়ে যদি তারা তোমাকে মিথ্যাবাদী মনে করে তবে তুমি বলে দাও–তোমাদের প্রভু সুপ্রশস্ত করুণাময়, আর অপরাধী সম্প্রদায় হতে তাঁর শাস্তিবিধান কখনই প্রত্যাহার করা হবে না।

١٤٧- فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ○

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ হে মুহাম্মাদ (সঃ)! তোমার বিরুদ্ধবাদী দল ইয়াহূদী এবং মুশরিকরা যদি তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তবে তাদেরকে বলে দাও–তোমাদের প্রভু বড়ই করুণাময়! একথা বলে তাদেরকে উৎসাহিত করা হচ্ছে যে, তারাও যেন তাঁর সুপ্রশস্ত ও ব্যাপক করুণা যাচ্ঞা করে, তাহলে রাসূল (সঃ)-এর অনুসরণের তাদেরকে তাওফীক প্রদান করা হবে। কেননা, যদি তিনি অনুগ্রহ না করেন তবে পাপী ও অপরাধীদের থেকে আল্লাহর শাস্তি কেউই টলাতে পারবে না। এখানে আগ্রহ উৎপাদন ও ভয় প্রদর্শন উভয়ই হচ্ছে। ভাবার্থ হচ্ছে–তোমরা রাসূল (সঃ)-এর বিরুদ্ধাচরণ কর না, নতুবা তাঁর শাস্তিতে পাকড়াও হয়ে যাবে। সব জায়গাতেই আল্লাহ তা'আলা আগ্রহ উৎপাদন ও ভয় প্রদর্শন এক সাথেই এনেছেন। যেমন এই সূরার শেষে রয়েছে– "আল্লাহ সত্বর শাস্তি প্রদানকারী এবং ক্ষমাশীল।" অর্থাৎ তিনি লোকদের পাপরাশি ক্ষমাকারী আবার তাদেরকে কঠোর শাস্তি প্রদানকারীও বটে। অন্য জায়গায় তিনি বলেনঃ "হে নবী (সঃ)! আমার বান্দাদেরকে তুমি জানিয়ে দাও–আমি ক্ষমাশীল ও দয়ালু আর আমার শাস্তিও হচ্ছে অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক।" অন্য জায়গায় তিনি বলেনঃ "তিনি পাপ মার্জনাকারী, তাওবা কবূলকারী এবং কঠোর শাস্তি প্রদানকারী।" আল্লাহ তা'আলা আর এক জায়গায় বলেনঃ "নিশ্চয়ই তোমার প্রভুর পাকড়াও

অত্যন্ত কঠোর। তিনিই প্রথমবার সৃষ্টি করেন এবং পুনর্বারও সৃষ্টি করবেন। আর তিনি অতিশয় ক্ষমাশীল, অত্যন্ত স্নেহ পরায়ণ।" এ সম্পর্কীয় বহু আয়াত রয়েছে।

١٤٨- سَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا لَوْ شَاۤءَ اللّٰهُ مَاۤ اَشْرَكْنَا وَلَاۤ اٰبَاۤؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ ؕ كَذٰلِكَ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتّٰى ذَاقُوْا بَاْسَنَا ؕ قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوْهُ لَنَا ؕ اِنْ تَتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِنْ اَنْتُمْ اِلَّا تَخْرُصُوْنَ ۝

১৪৮। এই মুশরিকরা (তোমার কথার উত্তরে) অবশ্যই বলবে—আল্লাহ যদি চাইতেন তবে আমরা শির্‌ক করতাম না এবং আমার বাপ-দাদারাও করতো না, আর কোন জিনিসও আমরা হারাম করতাম না, বস্তুতঃ এভাবেই তাদের পূর্ব যুগের কাফিররা (রাসূলদেরকে) মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল, শেষ পর্যন্ত তারা আমার শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিল, তুমি জিজ্ঞেস কর—তোমাদের কাছে কি কোন দলীল প্রমাণ আছে? থাকলে আমার সামনে পেশ কর, তারা ধারণা ও অনুমান ব্যতীত আর কিছুরই অনুসরণ করে না, তোমরা সম্পূর্ণ আনুমানিক কথা ছাড়া আর কিছুই বলছো না।

١٤٩- قُلْ فَلِلّٰهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ ۚ فَلَوْ شَاۤءَ لَهَدٰىكُمْ اَجْمَعِيْنَ ۝

১৪৯। তুমি বলে দাও—সত্য ভিত্তিক পূর্ণাঙ্গ দলীল প্রমাণ তো একমাত্র আল্লাহরই রয়েছে, সুতরাং তিনি চাইলে তোমাদের সকলকেই হিদায়াত দান করতেন।

১৫০। তুমি আরও বলে দাও—আল্লাহ এসব পশু হারাম করেছেন, এর সাক্ষ্য যারা দেবে সেই সাক্ষীদেরকে তোমরা নিয়ে এসো, তারা যদি সাক্ষ্য দেয় তবে তুমি তাদের সাথে সাক্ষ্য দিবে না, তুমি এমন লোকদের বাতিল ধ্যান ধারণার অনুসরণ করবে না যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, পরকালের প্রতি ঈমান আনে না এবং তারা অন্যান্যদেরকে নিজেদের প্রতিপালকের সমমর্যাদা দান করে।

١٥٠- قُلْ هَلُمَّ شُهَدَآءَكُمُ الَّذِيْنَ يَشْهَدُوْنَ اَنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ هٰذَا فَاِنْ شَهِدُوْا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَ لَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ وَ هُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُوْنَ ○

এখানে একটা বিতর্কের অবতারণা করা হয়েছে এবং মুশরিকরা নিজেদের শির্ক ও হালালকে হারাম করে নেয়া সম্পর্কে যে সন্দেহ পোষণ করতো, আল্লাহ পাক তার বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি তাদের শির্ক ও হারাম করে নেয়া সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত করছেন। সেই সন্দেহ ছিল এই যে, তারা বলতো—আল্লাহ ইচ্ছা করলে আমাদের মনকে পরিবর্তন করতে পারতেন, তিনি আমাদেরকে ঈমানের তাওফীক প্রদানে সক্ষম ছিলেন এবং আমাদের প্রতিবন্ধক হয়ে তিনি আমাদেরকে কুফরী থেকে বিরত রাখতে পারতেন। কিন্তু এরূপ যখন তিনি করেননি তখন এটা প্রমাণিত হলো যে, তিনি এটাই চান এবং আমাদের এই কাজে তিনি সম্মত। তাই মহান আল্লাহ তাদের কথার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেনঃ لَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَآ اَشْرَكْنَا ..... অর্থাৎ আল্লাহ চাইলে আমরা শির্ক করতাম না এবং আমাদের বাপ-দাদারাও না, না আমরা কোন জিনিসকে হারাম করে নিতাম। অনুরূপভাবে তারা বলতোঃ

لَوْ شَآءَ الرَّحْمٰنُ مَا عَبَدْنٰهُمْ

অর্থাৎ "আল্লাহ যদি চাইতেন তবে আমরা তাদের ইবাদত করতাম না।" (৪৩ঃ ২০) সুতরাং আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ كَذٰلِكَ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ অর্থাৎ

"এরূপই তাদের পূর্ববর্তী লোকেরাও মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল।" ভাবার্থ এই যে, এভাবেই পূর্ববর্তী লোকেরাও পথভ্রষ্ট হয়েছিল। আর এটা হচ্ছে খুবই নিম্নমানের, ভিত্তিহীন ও ছেলেমি যুক্তি। যদি এটা সঠিক হতো তবে তাদের পূর্ববর্তীদের উপর কখনও আল্লাহর শাস্তি আসতো না এবং তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হতো না। আর মুশরিকদেরকে প্রতিশোধের শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করতে হতো না। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নবী (সঃ)-কে সম্বোধন করে বলেনঃ হে নবী (সঃ)! তুমি ঐ কাফির ও মুশরিকদেরকে বলে দাও–তোমরা কি করে জানতে পারলে যে, আল্লাহ তোমাদের কাজে সন্তুষ্ট? যদি তোমাদের এ দাবীর পিছনে কোন দলীল থাকে তবে তা পেশ কর। তোমরা কখনও এটা প্রমাণ করতে পারবে না। তোমরা শুধু অনুমান ও মিথ্যা ধারণার পিছনে পড়ে রয়েছ। ধারণা দ্বারা এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে বাজে বিশ্বাস। তোমরা শুধুমাত্র আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করছো। এই মুশরিকরা বলে– "আমরা শুধু এই উদ্দেশ্যে মূর্তির উপাসনা করছি যে, তাদের মাধ্যমে আমরা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করবো।" আল্লাহ বলেন যে, তারা তাদের মাধ্যমে কখনও আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে পারবে না।

وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا اَشْرَكُوْا আল্লাহ যদি চাইতেন তবে তারা শিরক করতো না। (৬ঃ ১০৭) ভাবার্থ এই যে, আল্লাহ ইচ্ছা করলে সবাই যে হিদায়াত লাভ করতো এতে কোন সন্দেহ নেই। সত্যভিত্তিক পূর্ণাঙ্গ দলীল প্রমাণ তো একমাত্র আল্লাহরই রয়েছে। তিনি ইচ্ছা করলে সবাই সুপথ প্রাপ্ত হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে মুহাম্মাদ (সঃ)! তুমি বলে দাও যে, আল্লাহর হুজ্জত বা দলীল হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ দলীল এবং তাঁর হিকমত হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ হিকমত। কে যে হিদায়াত লাভের অধিকারী এবং কে পথভ্রষ্ট হওয়ার যোগ্য তা তিনিই ভাল জানেন। সবকিছুই তাঁর ক্ষমতা ও ইচ্ছার মধ্যে রয়েছে। তিনি মুমিনদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং কাফিরদের প্রতি অসন্তুষ্ট। তিনি ইচ্ছা করলে ভূ-পৃষ্ঠের সমস্ত লোকই ঈমান আনতো। তিনি চাইলে সবকে একই কওম ও একই জাতি বানিয়ে দিতেন। তিনি যে ওয়াদা করেছেন যে, জাহান্নামকে তিনি দানব ও মানব দ্বারা পূর্ণ করবেন তাঁর এ ওয়াদা পূর্ণ হবেই। বিদ্রোহী ও বিরুদ্ধবাদীদের কোনই দলীল নেই। তাই আল্লাহ পাক স্বীয় রাসূল (সঃ)-কে সম্বোধন করে বলেনঃ তুমি তাদেরকে বলে দাও–যদি তোমাদের দাবীর অনুকূলে সাক্ষী থাকে তবে তাদেরকে হাযির কর, যারা সাক্ষ্য দেবে যে হ্যাঁ, আল্লাহ এসব জিনিস হারাম করেছিলেন। আর যদি তারা এ ধরনের মিথ্যাবাদী সাক্ষী হাযির করেও দেয় তবে হে নবী (সঃ)! তুমি

কিন্তু এরূপ সাক্ষ্য দেবে না। কেননা তাদের এ সাক্ষ্য সম্পূর্ণ মিথ্যা ও প্রতারণামূলক। তুমি ঐ লোকদের সঙ্গী হয়ো না যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, আখিরাতের উপর বিশ্বাস রাখে না এবং স্বীয় প্রভুর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে অন্যদেরকে তাঁর শরীক ও সমকক্ষ বানিয়ে নেয়।

১৫১। (হে মুহাম্মাদ সঃ)! এ লোকদেরকে বল–তোমরা এসো! তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের প্রতি কি কি বিধি-নিষেধ আরোপ করেছেন, তা আমি তোমাদেরকে পাঠ করে শুনাবো, আর তা এই যে, তোমরা তাঁর সাথে কাউকেও শরীক করবে না, পিতা মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে, দরিদ্রতার ভয়ে নিজেদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না, কেননা আমিই তোমাদেরকে ও তাদেরকে জীবিকা দিবো, আর অশ্লীল কাজ ও কথার নিকটেও যেও না, তা প্রকাশ্যই হোক বা গোপনীয়ই হোক, আর আল্লাহ যার হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন; যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করো না, এসব বিষয় আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তোমরা অনুধাবন করতে পার।

١٥١- قُلْ تَعَالَوْا اَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ اَلَّا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْـًٔا وَّ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَ لَا تَقْتُلُوْا اَوْلَادَكُمْ مِّنْ اِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَ اِيَّاهُمْ وَ لَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ مَا بَطَنَ وَ لَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ ذٰلِكُمْ وَصّٰكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ○

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন যে, যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর শেষ অসিয়তের প্রতি লক্ষ্য করতে চায় সে যেন উল্লিখিত আয়াতগুলো পাঠ করে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, সূরায়ে আন'আমে কতগুলো আয়াত

রয়েছে স্পষ্ট মর্ম বিশিষ্ট এবং ঐগুলোই হচ্ছে কিতাবের মূল। অতঃপর তিনি قل تَعَالَوْا .... -এই আয়াতটি পাঠ করেন। হযরত উবাদা ইবনে সামিত (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 'তোমাদের মধ্যে কে আমাদের কাছে তিনটি কাজের দীক্ষা গ্রহণ করবে?' অতঃপর তিনি উক্ত আয়াত পাঠ করলেন। পাঠ শেষ করে তিনি বললেনঃ "যে ব্যক্তি এই কথাগুলো যথাযথভাবে পালন করবে, তার প্রতিদান আল্লাহর কাছে রয়েছে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি এগুলো পালনে অবহেলা করবে, খুব সম্ভব আল্লাহ তাকে দুনিয়াতেই শাস্তি প্রদান করবেন। আর যদি তিনি শাস্তিটাকে পরকাল পর্যন্ত উঠিয়ে রাখেন তবে তখন তাঁর মর্জির উপর নির্ভর করবে। ইচ্ছা করলে তিনি তাকে শাস্তি দিবেন, অথবা ক্ষমা করে দিবেন।" এর তাফসীর নিম্নরূপঃ আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল (সঃ)-কে বলেছেনঃ হে মুহাম্মাদ (সঃ)! এই মুশরিকদেরকে বলে দাও, যারা গায়রুল্লাহর উপাসনা করছে এবং আল্লাহর হালাল জিনিসকে হারাম করে নিচ্ছে, আর নিজেদের সন্তানদেরকে হত্যা করছে। তাদেরকে শয়তান বিভ্রান্ত করেছে এবং তারা মনগড়া কথা বলছে, (তাদেরকে বলঃ) এসো, আমি তোমাদেরকে বলে দেই যে, আল্লাহ কোন্ জিনিসগুলোকে হারাম করেছেন। আমি এসব কথা ধারণা ও অনুমান করে বলছি না, বরং আল্লাহ আমার কাছে যে অহী করেছেন সেই অনুযায়ীই বলছি যে, তোমরা আল্লাহর সাথে অন্য কাউকেও শরীক বানিয়ে নিও না। আয়াতের ভাষার ধরনে বুঝা যাচ্ছে যে, এখানে اَوْصٰكُمْ শব্দটি উহ্য রয়েছে, অর্থাৎ اَوْصٰكُمْ اَنْ لَّا تُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ এইরূপ রয়েছে। এজন্যেই আয়াতের শেষে রয়েছে– ذٰلِكُمْ وَصّٰكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ অর্থাৎ এসব বিষয় আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তোমরা অনুধাবন করতে পার।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে হযরত আবূ যার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "হযরত জিবরাঈল (আঃ) আমার কাছে এসে এ সংবাদ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি শিরক না করা অবস্থায় মারা যাবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" আমি বললামঃ যদিও সে ব্যভিচার করে অথবা চুরি করে তবুও কি? তিনি উত্তরে বললেনঃ 'হ্যাঁ, যদিও সে ব্যভিচার করে অথবা চুরি করে।' আমি তিনবার এই প্রশ্ন করি। প্রতিবারেই তিনি এই উত্তরই দেন এবং তৃতীয়বারে বলেনঃ "যদিও সে ব্যভিচার করে, অথবা চুরি করে এবং মদ্যপান করে (তবুও সে জান্নাতে প্রবেশ করবে)। কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে তিনবার প্রশ্নকারী ছিলেন স্বয়ং হযরত আবূ যার (রাঃ)।

তৃতীয়বারে রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত আবূ যার (রাঃ)-কে বলেছিলেনঃ "হ্যাঁ, আবূ যার (রাঃ)-এর নাক ধূলায় ধূসরিত হোক, যদিও সে ব্যভিচার করে থাকে বা চুরি করে থাকে (তবুও জান্নাতে যাবে)।" হযরত আবূ যার (রাঃ) যখনই এ হাদীসটি শুনাতেন তখনই হাদীসটি পূর্ণরূপে বর্ণনা করার পর "আবূ যার (রাঃ)-এর নাক ধূলায় ধূসরিত হোক" এ কথাটিও অবশ্যই বলতেন।

হযরত আবূ যার (রাঃ) হতে আরও বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন– "হে আদম সন্তান! যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি আমার কাছে দু'আ করবে এবং আমার কাছে আশা করতে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি তোমাকে ক্ষমা করতে থাকবো যা কিছু গুনাহ তোমার দ্বারা হবে। আর আমি তোমার পাপরাশিকে মোটেই গ্রাহ্য করবো না। তুমি যদি আমার কাছে পৃথিবীপূর্ণ পাপরাশি নিয়ে আসো তবে আমি তোমাকে পৃথিবীপূর্ণ ক্ষমা প্রদান করবো, যদি তুমি আমার সাথে কাউকেও শরীক না করে থাক। যদি তোমার পাপরাশি আকাশ ভর্তিও হয় এবং তুমি আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর তবে আমি তোমাকে ক্ষমা করে দেবো।"

কুরআন কারীমে এর সাক্ষ্য মিলে। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "নিশ্চয়ই আল্লাহ শির্কের পাপ ক্ষমা করবেন না, অন্যসব পাপ তিনি ইচ্ছা করলে ক্ষমা করবেন।" সহীহ মুসলিমে হযরত ইবনে মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কাউকেও শরীক না করে মারা গেল সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। এ সম্পর্কীয় কুরআনের আয়াত এবং হাদীস বহু রয়েছে। হযরত আবূ দারদা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ "তোমরা শিরক করো না যদিও তোমাদেরকে কেটে টুকরো টুকরো করা হয় বা শূলে চড়ানো হয় অথবা আগুনে জ্বালিয়ে দেয়া হয়।" হযরত উবাদা ইবনে সামিত (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ "রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদেরকে সাতটি খাসলাতের বা অভ্যাসের অসিয়ত করেছিলেন। (তন্মধ্যে একটি এই যে,) তোমরা আল্লাহর সাথে কাউকেও শরীক করবে না, যদিও তোমাদেরকে জ্বালিয়ে দেয়া হয়, কেটে টুকরো টুকরো করে দেয়া হয় এবং শূলে চড়ানো হয়।" [১]

ইরশাদ হচ্ছে– وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا অর্থাৎ পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে। ভাবার্থ হচ্ছে–আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা তোমাদের পিতা-মাতার সাথে সৎ ও উত্তম ব্যবহার করবে। যেমন তিনি বলেনঃ

১. হাদীসটি ইবনে মিরদুওয়াই (রঃ) ও ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

وَ قَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْۤا اِلَّاۤ اِيَّاهُ وَ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا

অর্থাৎ "তোমাদের প্রভু তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা একমাত্র তাঁরই ইবাদত করবে এবং পিতা-মাতার সাথে ভাল ব্যবহার করবে।" (১৭ঃ২৩) আল্লাহ পাক সাধারণ ভাবে নিজের আনুগত্যের সাথে সাথে পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করাকে মিলিয়ে দিয়েছেন। যেমন বলেছেনঃ "আমার এবং স্বীয় পিতা-মাতার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, তোমাদেরকে আমারই কাছে ফিরে আসতে হবে। আর যদি তাঁরা উভয়ে তোমাকে এ কথার চাপ দেয় যে, তুমি আমার সাথে কোন বস্তুকে শরীক সাব্যস্ত কর, যার (উপাস্য হওয়ার) পক্ষে তোমার কাছে কোন প্রমাণ নেই, তবে তুমি তাদের কথা মানবে না এবং পার্থিব বিষয়ে সদ্ভাবে সাহচর্য করে যাবে, আর ঐ ব্যক্তির পথে চলবে যেই ব্যক্তি আমার দিকে 'রুজু' হয় (ফিরে আসে), অনন্তর আমার দিকে তোমাদের ফিরে আসতে হবে। অতঃপর পিতা-মাতার মুশরিক হওয়া সত্ত্বেও তাদের অবস্থা হিসেবে তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ আল্লাহ প্রদান করলেন। আল্লাহ তা'আলা আরও বলেনঃ "আমি বানী ইসরাঈলের কাছে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম-তোমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারো ইবাদত করবে না এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে।" এ বিষয় সম্পর্কীয় বহু আয়াত রয়েছে।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, ইবনে মাসউদ (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! কোন আমলটি উত্তম?" তিনি উত্তরে বললেনঃ "নামায সময় মত আদায় করা।" ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, আমি বললাম, তারপর কোন্টি? তিনি জবাব দিলেনঃ "পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা।" আমি বললাম, তারপর কোন্টি? তিনি উত্তরে বলেনঃ "আল্লাহর পথে জিহাদ করা।" হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, আমি যদি প্রশ্ন আরও বাড়াতাম তবে তিনি উত্তরও বাড়িয়ে দিতেন। হযরত উবাদা ইবনে সামিত (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে বলেনঃ "হে ইবনে সামিত (রাঃ)! তুমি তোমার পিতা-মাতার অনুগত হয়ে যাও। যদি তাঁরা 'আমাদেরকে সারা দুনিয়া দিয়ে দাও' একথাও বলে তবে সেটাও পালন কর।" এ হাদীসটির ইসনাদ দুর্বল। আল্লাহ তা'আলা সবচেয়ে ভাল জানেন।

وَ لَا تَقْتُلُوْۤا اَوْلَادَكُمْ مِّنْ اِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَ اِيَّاهُمْ দারিদ্রতার ভয়ে তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করো না, কেননা আমিই তোমাদেরকে ও তাদেরকে আহার্য দান করে থাকি।

পিতা-মাতাকে নির্দেশ দিচ্ছেন-তোমরা দারিদ্রের ভয়ে তোমাদের ছেলে মেয়েদেরকে হত্যা করো না। শয়তানরা মুশরিকদেরকে বিভ্রান্ত করেছিল বলে তারা নিজেদের সন্তানদেরকে জীবন্ত প্রোথিত করতো। তারা লজ্জার ভয়ে কন্যা সন্তানদেরকে জীবন্ত গেড়ে ফেলতো। আবার দারিদ্রতার ভয়ে কোন কোন পুত্র সন্তানকেও হত্যা করতো। এ জন্যেই সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি জিজ্ঞেস করেন, "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! কোন পাপটি সবচেয়ে বড়?" তিনি উত্তরে বলেনঃ "তা হচ্ছে এই যে, তুমি আল্লাহর জন্যে শরীক স্থাপন করবে, অথচ তিনিই তোমাকে (এবং ঐ শরীককে) সৃষ্টি করেছেন!" ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বলেনঃ আমি বললাম, তারপর কোনটি? তিনি বলেনঃ "তুমি তোমার সন্তানকে হত্যা করবে এই ভয়ে যে, সে তোমার সাথে আহার করবে।" আমি বললাম, তারপর কোনটি? তিনি বললেনঃ "তা এই যে, তুমি তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে পড়বে।" অতঃপর তিনি নিম্নের আয়াতটি পাঠ করলেনঃ

وَ الَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَ لَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَ لَا يَزْنُوْنَ -

অর্থাৎ "যারা আল্লাহর সাথে অন্য কোন মা'বূদের উপাসনা করে না এবং আল্লাহ যাকে (হত্যা করা) হারাম করে দিয়েছেন, তাকে হত্যা করে না শরীয়ত সম্মত কারণ ব্যতীত, এবং ব্যভিচার করে না।"[১] (২৫ঃ ৬৮)

উপরে বর্ণিত 'ফাকর' বা দারিদ্রকে 'ইমলাক' বলা হয়। এ জন্যেই আল্লাহ পাক সূরায়ে বানী ইসরাঈলে বলেনঃ "জীবিকা তো আমিই তাদেরকে এবং তোমাদেরকে দিয়ে থাকি।" ওখানে জীবিকার শুরুতে শিশুদের নাম নেয়া হয়েছে। কেননা, সেখানে ব্যবস্থাপনায় তারাই উদ্দেশ্য ছিল অর্থাৎ- তাদেরকে জীবিকা পৌঁছানোর কারণে তোমরা দরিদ্র হয়ে যাবে এই ভয়ে তাদেরকে হত্যা করো না। কারণ সকলেরই জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহর উপর রয়েছে। কিন্তু এখানে যেহেতু দারিদ্র্য বিদ্যমান রয়েছে এ জন্যে এখানে বলেছেন, আমি তোমাদেরকে ও তাদেরকে জীবিকা দান করে থাকি। কারণ, এখানে গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে তোমাদেরকে জীবিকা আমিই দান করেছি, সুতরাং নিজেদের জীবিকার ভয় করো না।

১. এটা ইমাম বুখারী (রঃ) ও ইমাম মুসলিম (রঃ) আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) হতে তাখরীজ করেছেন।

আল্লাহ তা'আলার উক্তি– وَ لَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ অর্থাৎ তোমরা অশ্লীল কাজ ও কথার নিকটেও যেয়ো না, তা প্রকাশ্যেই হোক বা গোপনীয়ই হোক। যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেছেনঃ "হে নবী (সঃ) ! তুমি বলে দাও–আমার প্রতিপালক প্রকাশ্য ও গোপনীয় সমস্ত অশ্লীলতাই নিষিদ্ধ করেছেন, আর তোমরা অন্যায়, পাপ ও বিদ্রোহ থেকে বেঁচে থাক। আর বিরত থাক শিরক থেকে যার কোন সনদ নেই এবং এমন কিছু আল্লাহর দিকে সম্বন্ধ করা থেকে দূরে থাক যা তোমরা জান না।" এর তাফসীর আল্লাহ পাকের وَ ذَرُوا ظَاهِرَ الْاِثْمِ وَ بَاطِنَهٗ -এই উক্তির মধ্যে করা হয়েছে। হযরত ইবনে মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "আল্লাহ অপেক্ষা লজ্জাশীল আর কেউ হতে পারে না। এ জন্যেই তিনি প্রকাশ্য ও গোপনীয় সমস্ত নির্লজ্জতাকে হারাম করে দিয়েছেন।"[১] সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে যে, হযরত সা'দ ইবনে উবাদা (রাঃ) বলেছেনঃ "আমি যদি আমার স্ত্রীর সাথে কোন পর পুরুষকে (ব্যভিচারে লিপ্ত) দেখতে পাই তবে অবশ্যই তাকে তরবারী দ্বারা হত্যা করে ফেলবো।" রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কানে এ সংবাদ পৌঁছলে তিনি বলেন, তোমরা কি সা'দ (রাঃ)-এর লজ্জাশীলতায় বিস্ময় বোধ করছো! আল্লাহর শপথ! আমি সা'দ (রাঃ) অপেক্ষা অধিক লজ্জাশীল এবং আল্লাহ আমার চেয়ে বেশী লজ্জাশীল। এ জন্যেই তিনি সমস্ত নির্লজ্জতাকে হারাম করে দিয়েছেন।

وَ لَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ অর্থাৎ আল্লাহ যার হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন, যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করো না। গুরুত্ব বুঝাবার জন্যেই আল্লাহ তা'আলা পৃথকভাবে এর নিষেধাজ্ঞা আনয়ন করেছেন। নতুবা এটা প্রকাশ্য ও গোপনীয় নির্লজ্জতার নিষিদ্ধতারই অন্তর্ভুক্ত। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে হযরত ইবনে মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "কোন মুসলমানের রক্ত হালাল নয় যে সাক্ষ্য প্রদান করে যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন মা'বূদ নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল। তবে তিনটির যে কোন একটি কারণে হত্যা করা যায়। (১) বিবাহিত ব্যভিচারী, (২) প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ (অর্থাৎ হত্যার বিনিময়ে হত্যা) এবং (৩) দ্বীন পরিত্যাগকারী ও দলের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা আনয়নকারী।" সহীহ মুসলিমের শব্দ নিম্নরূপ রয়েছে–

১. ইমাম বুখারী (রঃ) ও ইমাম মুসলিম (রঃ) এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

"যিনি ছাড়া কেউ উপাস্য নেই তাঁর শপথ! কোন মুসলমান ব্যক্তির রক্ত হালাল নয়" পরবর্তী ভাষা একইরূপ।[১] আর ইমাম আবূ দাঊদ (রঃ) এবং ইমাম নাসাঈ (রঃ) হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "কোন মুসলমান লোকের রক্ত হালাল নয় তিনটির কোন একটি কারণ ছাড়া। (১) যদি কোন বিবাহিত (পুরুষ বা স্ত্রী) লোক ব্যভিচার করে তবে তাকে প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা করা হবে। (২) যদি কোন লোক কোন লোককে ইচ্ছাপূর্বক হত্যা করে তবে সেই হত্যার বিনিময়ে তাকে হত্যা করা হবে। (৩) যদি কোন লোক ইসলাম থেকে বেরিয়ে যায় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ) -এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তবে তাকে হত্যা করা হবে অথবা শূলী দেয়া হবে কিংবা দেশান্তর করা হবে।"

আমীরুল মুমিনীন হযরত উসমান (রাঃ) যখন বিদ্রোহীগণ কর্তৃক পরিবেষ্টিত হন তখন তিনি তাদেরকে বলেনঃ "আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছি, তিনটির কোন একটি কারণ ছাড়া কোন মুসলমান লোকের রক্ত হালাল নয়। (১) যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণের পর পুনরায় কাফির হয়ে গেল, (২) যে ব্যক্তি বিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে পড়লো এবং (৩) যে ব্যক্তি কাউকে অন্যায় ভাবে হত্যা করলো। তাহলে আল্লাহর শপথ! আমি কখনও ব্যভিচার করিনি, অজ্ঞতার যুগেও না এবং ইসলামের যুগেও না। আমি কখনও এ ইচ্ছা পোষণ করিনি যে, ইসলাম গ্রহণের পর এ দ্বীনের পরিবর্তে অন্য দ্বীন গ্রহণ করবো। আর আমি কখনও কাউকে হত্যাও করিনি। সুতরাং তোমরা আমাকে কিসের উপর ভিত্তি করে হত্যা করতে চাচ্ছ?"[২] যে অমুসলিমের সাথে চুক্তি হয়ে যাবে এবং যে হারবীকে (অমুসলিম দেশের অমুসলিম) ইসলামী রাষ্ট্রে বাস করার জন্যে নিরাপত্তা দেয়া হবে, তাদেরকে হত্যা করতে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। এমন কি এ ব্যাপারে ধমক ও ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে। ইমাম বুখারী (রঃ) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি চুক্তিকৃত কোন লোককে হত্যা করবে সে জান্নাতের সুগন্ধও পাবে না, অথচ জান্নাতের সুগন্ধ চল্লিশ বছরের পথের দূরত্ব থেকেও পাওয়া

---

১. সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের শব্দের মধ্যে পার্থক্য এই যে,সহীহ বুখারীতে রয়েছেঃ وَالَّذِىْ لَآ اِلٰهَ غَيْرُهٗ لَا يَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ مُّسْلِمٍ সহীহ মুসলিমে রয়েছেঃ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُّسْلِمٍ পরবর্তী কথাগুলো একইরূপ।

২. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ), ইমাম তিরমীযী (রঃ), ইমাম নাসাঈ (রঃ) এবং ইমাম ইবনে মাজাহ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমীযী (রঃ) বলেন যে, হাদীসটি হাসান।

যায়।” হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ “যে ব্যক্তি এমন কোন চুক্তিকৃত ব্যক্তিকে হত্যা করবে যার নিরাপত্তার যিম্মাদার স্বয়ং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল হয়ে গেছেন, সে ব্যক্তি জান্নাতের খোশবু পর্যন্ত পাবে না।”[১] ذٰلِكُمْ وَصّٰكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ অর্থাৎ এসব বিষয় আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তোমরা অনুধাবন করতে পার।

১৫২। আর পিতৃহীনগণ বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত সদুদ্দেশ্য ব্যতীত তাদের বিষয় সম্পত্তির কাছেও যেও না, আর আদান প্রদানে পরিমাণ ও ওযন সঠিকভাবে করবে, আমি কারো ওপর তার সাধ্যাতীত ভার (দায়িত্ব-কর্তব্য) অর্পণ করি না, আর তোমরা যখন কথা বলবে তখন স্বজনের বিরুদ্ধে হলেও ন্যায়ানুগ কথা বলবে, আর আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার পূরণ করবে, আল্লাহ তোমাদেরকে এসব বিষয় নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তোমরা তাঁর এ নির্দেশ ও উপদেশ গ্রহণ কর।

١٥٢- وَ لَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّهٗ ۚ وَ اَوْفُوا الْكَيْلَ وَ الْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ۚ وَ اِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوْا وَ لَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى ۚ وَ بِعَهْدِ اللّٰهِ اَوْفُوْا ؕ ذٰلِكُمْ وَصّٰكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ۙ

যখন ‘ইয়াতীমের মাল খেয়ো না’ -এ আয়াত অবতীর্ণ হয় তখন যার বাড়ীতে কোন ইয়াতীম ছিল সে সেই ইয়াতীমের খাদ্য ও পানীয়কে নিজের খাদ্য ও পানীয় হতে পৃথক করে দেয় এই ভয়ে যে, না জানি ইয়াতীমের খাদ্য তার খাদ্যের সাথে মিশ্রিত হয়ে যাবে। এমন কি ইয়াতীমের আহার করার পর যা অবশিষ্ট থাকতো তা তারা তারই জন্যে উঠিয়ে রেখে দিতো, যেন সে আবার তা আহার করে। এর ফলে খাবার নষ্ট হয়ে যেতো। এটা ছিল উভয়ের জন্যেই

১. হাদীসটি ইমাম ইবনে মাজাহ (রঃ) ও ইমাম তিরমীযী বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম তিরমীযী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

অমঙ্গল। তারা তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে এ সম্পর্কে আলোচনা করে। সেই সময় মহান আল্লাহ স্বীয় রাসূল (সঃ)-এর কাছে অহী পাঠানঃ "লোকেরা তোমাকে ইয়াতীমদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করছে। তুমি তাদেরকে বলে দাও—তাদের মঙ্গল কামনাই হচ্ছে ভাল কাজ। সুতরাং যদি তোমরা তাদের সাথে একত্রিতভাবে খাও তবে তাতে কোন দোষ নেই, তারা তো তোমাদেরই ভাই, এটা ঐ পর্যন্ত চলবে যে পর্যন্ত তারা বালেগ বা বয়োঃপ্রাপ্ত না হয়।" সুদ্দী (রঃ) এর সময়কাল ত্রিশ বছর, চল্লিশ বছর এমন কি ষাট বছর পর্যন্তও নির্ধারণ করেছেন। এটা এখানকার আলোচ্য বিষয় নয়।

وَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَ الْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ অর্থাৎ আদান প্রদানে পরিমাণ ও ওযন তোমরা সঠিকভাবে করবে। মাপ ও ওযনে ইনসাফ করার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা খুবই গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং কঠোরভাবে শাস্তির ভয় দেখিয়েছেন। যেমন তিনি বলেছেনঃ "নিরতিশয় সর্বনাশ রয়েছে মাপে কমদাতাদের। যখন তারা মানুষের নিকট থেকে মেপে নেয়, তখন পুরোপুরিই নেয়। আর যখন তাদেরকে মেপে কিংবা ওযন করে দেয়, তখন কম দেয়। তাদের কি এ বিশ্বাস নেই যে, তাদেরকে এক অত্যন্ত কঠোর দিবসে উঠান হবে?" পূর্বে এক জাতি মাপে ও ওযনে বেঈমানী করার কারণে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল।

لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا আমি কারো উপর তার সাধ্যাতীত ভার (দায়িত্ব-কর্তব্য) অর্পণ করি না। যে ব্যক্তি হক আদায়ে পুরোপুরি চেষ্টা করলো, তথাপি পূর্ণ মাত্রায় আদায় করতে পারলো না, তার কোন দোষ নেই এবং এজন্যে তাকে জবাবদিহি করতে হবে না। রাসূলুল্লাহ (সঃ) এ আয়াতের ব্যাপারে বলেন ঃ "যে ব্যক্তি বিশুদ্ধ নিয়তে মাপলো বা ওযন করলো, আর আল্লাহ তো তার নিয়ত সম্পর্কে জানেনই, তাহলে তাকে পাকড়াও করা হবে না।" وَسِعَتْ শব্দের ব্যাখ্যা এটাই।

وَاِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَ لَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى যখন কথা বলবে তখন স্বজনের বিরুদ্ধে হলেও ন্যায়ানুগ বলবে । যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "হে মুমিনগণ! আল্লাহর জন্যে আদল ও ইনসাফের সাথে সাক্ষ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাক।" অনুরূপভাবে সূরা নিসায় আল্লাহ তা'আলা কথায় ও কাজে ইনসাফের নির্দেশ দিয়েছেন, নিকটবর্তীদের জন্যেই হোক বা দূরবর্তীদের জন্যেই হোক। আল্লাহ পাক প্রত্যেকের জন্যে, প্রত্যেক সময়ে এবং সর্বাবস্থায় ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন।

ইরশাদ হচ্ছে–وَبِعَهْدِ اللّٰهِ اَوْفُوْا অর্থাৎ আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার পূরণ করো। এটা পূরণ করার স্বরূপ হচ্ছে– তোমরা তাঁর আদেশ ও নিষেধ মেনে চল এবং তাঁর কিতাব ও সুন্নাতে রাসূল (সঃ)-এর উপর আমল করো। এটাই হচ্ছে আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার পূরণ করা।

ذٰلِكُمْ وَصّٰكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ আল্লাহ তোমাদেরকে এসব বিষয় নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তোমরা তাঁর এ নির্দেশ ও উপদেশ গ্রহণ কর এবং পূর্বের অন্যায় ও খারাপ কাজ থেকে বিরত থাক। কেউ কেউ تَذَكَّرُوْنَ শব্দের ذَالْ -কে تَشْدِيْد দিয়ে পড়েছেন এবং কেউ কেউ تَخْفِيْف করে পড়েছেন।

১৫৩। আর এ পথই আমার সরল পথ; এই পথই তোমরা অনুসরণ করে চলবে, এই পথ ছাড়া অন্যান্য কোন পথের অনুসরণ করে চলবে না, করলে তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দূরে সরিয়ে নিবে, আল্লাহ তোমাদেরকে এই নির্দেশ দিলেন, যেন তোমরা সতর্ক হও।

١٥٣- وَاَنَّ هٰذَا صِرَاطِيْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهٖ ذٰلِكُمْ وَصّٰكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ○

ইরশাদ হচ্ছে–তোমরা এদিক ওদিক অন্যান্য পথগুলোর উপর চলো না, নতুবা আল্লাহর পথ হতে সরে পড়বে। তোমরা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত রাখ এবং তাতে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করো না। এই প্রকারের আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলা মুমিনদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তারা যেন দল ছেড়ে না দেয় এবং দলে বিভেদ সৃষ্টি করা থেকে তারা যেন বেঁচে থাকে। পূর্ববর্তী লোকেরা দ্বীনের ব্যাপারে ঝগড়া-ফাসাদ ও যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হয়ে পড়েছিল এবং মতানৈক্য সৃষ্টি করেছিল। ফলে তারা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ (সঃ) মাটিতে স্বহস্তে একটি রেখা টানেন। তারপর বলেনঃ "এটা হচ্ছে আল্লাহর সরল সোজা পথ।" অতঃপর তিনি ডানে ও বামে আরও কতগুলো রেখা টানেন এবং বলেনঃ "এগুলো হচ্ছে ঐসব রাস্তা যেগুলোর প্রত্যেকটির উপর

একজন করে শয়তান বসে রয়েছে এবং ঐ দিকে (মানুষকে) আহ্বান করছে।" অতঃপর তিনি وَ اَنَّ هٰذَا صِرَاطِىْ مُسْتَقِيْمًا -এই আয়াতটি পাঠ করেন।[১]

হযরত জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী (সঃ)-এর কাছে উপবিষ্ট ছিলাম, এমন সময় তিনি এভাবে তাঁর সামনে একটা রেখা টানেন এবং বলেনঃ "এটা হচ্ছে আল্লাহর পথ।" অতঃপর ডানে ও বামে দু'টি করে রেখা টানেন এবং বলেনঃ "এগুলো হচ্ছে শয়তানের পথ।" তারপর মধ্যভাগের রেখার উপর স্বীয় হাতটি রাখেন এবং ....وَاَنَّ هٰذَا صِرَاطِىْ مُسْتَقِيْمًا এই আয়াতটিই পাঠ করেন।[২]

হযরত জাবির (রাঃ) হতেই বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) একটি রেখা টানেন। তারপর ডান দিকে একটি রেখা টানেন এবং বামদিকে একটি রেখা টানেন। অতঃপর স্বীয় হস্ত মুবারক মধ্যবর্তী রেখাটির উপর রেখে وَاَنَّ هٰذَا .....صِرَاطِىْ مُسْتَقِيْمًا -এই আয়াতটি পাঠ করেন।[৩]

হযরত আবান ইবনে উসমান (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একটি লোক হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেনঃ "সিরাতে মুস্তাকীম কি?" তিনি উত্তরে বলেনঃ "একদা রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদেরকে তাঁর নিকটে স্থান দিয়েছিলেন এবং তাঁর চক্ষু যেন জান্নাতের দিকে ছিল। তাঁর ডান দিকে একটা পথ ছিল এবং বাম দিকে একটা পথ ছিল। পথগুলোর উপর কতগুলো লোক অবস্থান করছিল এবং যাঁরা তাদের পার্শ্ব দিয়ে গমন করছিল তাদেরকে তারা নিজেদের দিকে আহ্বান করছিল। সুতরাং যারা তাদের ডাকে সাড়া দিয়ে তাদের পথ ধরলো তারা জাহান্নামে প্রবেশ করলো। আর যারা সরল সোজা পথ ধরলো তারা জান্নাতে প্রবেশ করলো।" অতঃপর ......وَ اَنَّ هٰذَا صِرَاطِىْ مُسْتَقِيْمًا -এই আয়াতটি পাঠ করলেন।

---

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ), ইমাম হাকিম (রঃ) এবং ইমাম নাসাঈ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। ইমাম হাকিম (রঃ) এটাকে বিশুদ্ধ বলেছেন। তারা দু'জন এটাকে তাখরীজ করেননি।

২. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ), ইমাম তিরমিযী (রঃ), ইবনে মাজাহ (রঃ) এবং বাযযার (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

৩. এ হাদীসটি ইবনে মিরদুওয়াই (রঃ) হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রঃ) হতে বর্ণনা করেছেন।

নাওয়াস ইবনে সামআ'ন (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ আল্লাহ তা'আলা সিরাতে মুস্তাকিমের দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন। এর দু'দিকে দু'টি প্রাচীর রয়েছে এবং তাতে খোলা দরজা রয়েছে। দরজাগুলোর উপর পর্দা লটকান রয়েছে। সোজা রাস্তাটির দরজার উপর আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী একটি লোক বসে আছে এবং বলছেঃ "হে লোক সকল! তোমরা সবাই এই সরল সোজা পথে চলে এসো। এদিক ওদিক যেয়ো না।" আর একটি লোক রাস্তার উপর থেকে ডাক দিতে রয়েছে। যখনই কোন লোক ঐ দরজাগুলোর কোন একটি দরজা খোলার ইচ্ছা করছে তখনই সে তাকে বলছে– "সর্বনাশ! ওটা খোলো না। কারণ যদি তুমি দরজাটি খুলে দাও তবে তুমি ওর মধ্যে প্রবেশই করে যাবে।"

এখন এই সরল সোজা পথটি হচ্ছে ইসলাম। আর প্রাচীরগুলো হচ্ছে আল্লাহর হুদূদ। এই খোলা দরজাগুলো হচ্ছে আল্লাহর নিষিদ্ধ বস্তুসমূহ। রাস্তার মাথায় যে বসে আছে ওটা হচ্ছে আল্লাহর কিতাব। আর রাস্তার উপর থেকে যে ডাক দিচ্ছে সে হচ্ছে আল্লাহর উপদেশদাতা যা প্রত্যেক মুসলমানের অন্তরে রয়েছে। অন্তর যেন তাকে খারাপ কাজ থেকে বাধা দিচ্ছে।[১]

হযরত উবাদা ইবনে সামিত (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "তোমাদের মধ্যে কে আমার কাছে এই তিনটি আয়াতের উপর দীক্ষা গ্রহণ করতে পার?" অতঃপর তিনি قُلْ تَعَالَوْا اَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ এখান থেকে শুরু করে তিনটি আয়াত পাঠ করলেন। আয়াত তিনটির পাঠ শেষ করে বললেনঃ "যে ব্যক্তি এগুলোর হক আদায় করলো, তার পুরস্কার আল্লাহর কাছে নির্ধারিত হয়ে গেল। আর যে ব্যক্তি এগুলোর আমলে অবহেলা করলো, তাকে হয়তো আল্লাহ দুনিয়াতেই শাস্তি দিয়ে দিবেন। আর যদি আল্লাহ তাকে শাস্তি প্রদানে বিলম্ব করেন তবে তিনি পরকালে ইচ্ছা করলে তাকে শাস্তি দিবেন অথবা ক্ষমা করে দিবেন।"

১৫৪। অতঃপর (আবার বলছি) মূসা (আঃ)-কে আমি এমন একখানা কিতাব প্রদান করেছিলাম, যা ছিল সৎ ও পুণ্য কর্মপরায়ণদের জন্যে পূর্ণাঙ্গ কিতাব, আর তা ছিল প্রত্যেকটি বস্তুর বিশদ বিবরণ,

١٥٤- ثُمَّ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ تَمَامًا عَلَى الَّذِيْٓ اَحْسَنَ وَتَفْصِيْلًا لِّكُلِّ

---

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ), তিরমীযী (রঃ) এবং নাসাঈ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

شَيْءٍ وَّ هُدًى وَّ رَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ۝

পথ নির্দেশ সম্বলিত আল্লাহর রহমতের প্রতীক স্বরূপ, (উদ্দেশ্য ছিল) যাতে তারা তাদের প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাৎ হওয়া সম্বন্ধে পূর্ণ বিশ্বাস লাভ করতে পারে।

١٥٥- وَ هٰذَا كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ مُبٰرَكٌ فَاتَّبِعُوْهُ وَ اتَّقُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ۝

১৫৫। আর (এমনিভাবে) আমি এই কিতাব অবতীর্ণ করেছি যা বরকতময় ও কল্যাণময়! সুতরাং তোমরা এটা অনুসরণ করে চল এবং এর বিরোধিতা হতে বেঁচে থাক, হয়তো তোমাদের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করা হবে।

ثُمَّ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ -এর অন্তর্নিহিত অর্থ হচ্ছে–হে মুহাম্মাদ (সঃ)! আমার সম্পর্কে আবার বলে দাও, আমি মূসা (আঃ)-কে কিতাব দিয়েছিলাম। এটা قُلْ تَعَالَوْا..... -এই উক্তি দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে। কিন্তু এটা চিন্তা ভাবনার বিষয় বটে। ثُمَّ শব্দটি এখানে শুধুমাত্র একটি خَبَرٌ -এর পর আর একটি خَبَرٌ -এর عطف বা সংযোগের জন্যে এসেছে। تَرْتِيْبٌ বুঝাবার জন্যে নয়। (ثُمَّ শব্দটি সাধারণতঃ تَرْتِيْبٌ বুঝাবার জন্যেই এসে থাকে)

এখানে আল্লাহ তা'আলা যখন স্বীয় উক্তি وَ اَنَّ هٰذَا صِرَاطِيْ مُسْتَقِيْمًا -এর মাধ্যমে কুরআন সম্পর্কে খবর দিলেন, তখন তিনি تَوْرَاتٌ -এর প্রশংসায় ثُمَّ দ্বারা عطف করে বললেন ঃ এখন আমি তোমাকে এ সংবাদও দিচ্ছি যে, আমি মূসা (আঃ)-কেও কিতাব দিয়েছিলাম। অধিকাংশ স্থানে আল্লাহ পাক মিলিতভাবে কুরআন ও তাওরাতের বর্ণনা দিয়েছেন। যেমন তিনি বলেছেনঃ “এর পূর্বে মূসা (আঃ)-এর কিতাব ইমাম ও রহমত স্বরূপ ছিল, আর এই কিতাব (কুরআন) আরবী ভাষায় এর সত্যতা প্রতিপাদন করছে।” এই সূরার প্রথম দিকে তিনি বলেছেনঃ “হে নবী (সঃ) তুমি জিজ্ঞেস কর–যে কিতাব আমি মূসা (আঃ)-কে দিয়েছিলাম, যেটাকে আমি লোকদের জন্যে নূর ও হিদায়াত করে পেশ করেছিলাম সেটা কে অবতীর্ণ করেছিলেন? যেটাকে তোমরা কাগজে লিখছো, যার মধ্য থেকে তোমরা কিছু গোপন করছো এবং কিছু ঠিক প্রকাশ করছো!”

এর পরেই তিনি বলেনঃ "এই কুরআনকে আমি কল্যাণময় রূপে পেশ করেছি।" এখন মুশরিকদের ব্যাপারে বলছেনঃ "যখন আমার পক্ষ থেকে সত্য অর্থাৎ কুরআন তাদের কাছে পেশ করা হলো তখন তারা বলতে লাগলো –যেরূপ কিতাব মূসা (আঃ)-কে দেয়া হয়েছিল সেরূপ কিতাব আমাদেরকে কেন দেয়া হয়নি?" তাই আল্লাহ তা'আলা এখন বলছেনঃ "মূসা (আঃ)-এর কিতাবের সাথে কি কুফরী করা হয়নি এবং এ কথা কি বলা হয়নি যে, এ দু'জন (মূসা আঃ ও হারূন আঃ) তো যাদুকর, আমরা তো তাদেরকে মানবো না?" এরপর মহান আল্লাহ জ্বিনদের সম্পর্কে খবর দিচ্ছেন, তারা তাদের কওমকে বলেছিলঃ "হে আমাদের কওম! আমরা একটা কিতাব শুনেছি যা মূসা (আঃ)-এর পরে অবতীর্ণ হয়েছে এবং তাওরাতের বিষয়বস্তুর সত্যতা প্রতিপাদন করছে; আর হকের পথ প্রদর্শন করছে।" অতঃপর কুরআন সম্পর্কে ইরশাদ হচ্ছে– تَمَامًا عَلَى الَّذِيْ اَحْسَنَ وَ تَفْصِيْلًا অর্থাৎ "এতে সমস্ত কথা সুন্দর ও বিস্তারিতভাবে লিখিত আছে এবং শরীয়তের সব কিছুরই উল্লেখ আছে।" যেমন তিনি বলেছেনঃ "তাওরাতে আমি সমস্ত কথা বর্ণনা করে দিয়েছিলাম।" অনুরূপভাবে কুরআনকে عَلَى الَّذِيْ اَحْسَنَ বলেছেন। যেমন তিনি বলেছেন ঃ

وَاِذِ ابْتَلٰى اِبْرٰهِيْمَ رَبُّهٗ بِكَلِمٰتٍ فَاَتَمَّهُنَّ قَالَ اِنِّيْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا

অর্থাৎ "যখন ইবরাহীম (আঃ)-কে তার প্রভু কতগুলো কথা দ্বারা পরীক্ষা করলেন তখন তিনি তা পূর্ণ করলেন, আল্লাহ বললেন–আমি তোমাকে লোকদের ইমাম নিযুক্তকারী।" (২ঃ ১২৪) আর এক জায়গায় বলেন ঃ وَ جَعَلْنَا مِنْهُمْ اَئِمَّةً يَّهْدُوْنَ .... অর্থাৎ "আমি তাদের মধ্যে বহু ধর্মীয় নেতা করেছিলাম–যারা আমার নির্দেশক্রমে হিদায়াত করতো, যখন তারা ধৈর্য ধারণ করেছিল, আর তারা আমার আয়াতসমূহকে বিশ্বাস করতো।"

ثُمَّ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ تَمَامًا عَلَى الَّذِيْ اَحْسَنَ- অর্থাৎ আমি মূসা (আঃ)কে এমন কিতাব দিয়েছিলাম যা দানসমূহের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম দান ছিল, যা দুনিয়াতেও উত্তম এবং পরকালেও কামিল বা পূর্ণ। ইবনে জারীর (রঃ) এর অন্তর্নিহিত ভাষা تَمَامًا عَلٰى اِحْسَانِهٖ বলেছেন। তিনি যেন الَّذِيْ -কে مَصْدَرِيَّةً ধরেছেন। অর্থাৎ ঐ কিতাবটি কামিল বা পূর্ণ ছিল اَحْسَنَ বা উত্তম হওয়ার দিক দিয়ে। যেমন আল্লাহ পাক বলেনঃ خُضْتُمْ كَالَّذِيْ خَاضُوْا এখন এখানে الَّذِيْ خَاضُوْا এর خَوْض হয়ে গেল। আবার কেউ কেউ বলেন যে, এখানে الَّذِيْ শব্দটি

تَمَامًا عَلَى الَّذِينَ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) تَمَامًا عَلَى الَّذِينَ اَحْسَنُوا এরূপ কিরআত করতেন। মুজাহিদ (রঃ) اَحْسَنَ দ্বারা مُؤْمِنِينَ ও مُحْسِنِينَ উদ্দেশ্য গ্রহণ করতেন। বাগাভী (রঃ) مُحْسِنِينَ এবং اَنْبِيَاء উদ্দেশ্য নিতেন। অর্থাৎ আমি মুমিন ও মুহসিনদের উপর তাওরাতের ফযীলত প্রকাশ করে দিয়েছিলাম। যেমন তিনি বলেছেন : قَالَ يٰمُوْسٰى اِنِّى اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسٰلٰتِى وَبِكَلَامِى অর্থাৎ "হে মূসা (আঃ)! আমি তোমাকে স্বীয় রিসালাত ও কালামের মাধ্যমে সমস্ত লোকের উপর মনোনীত করেছি।" (৭ঃ ১৪৪) আল্লাহ তা'আলার এ উক্তি দ্বারা এটা অবশ্যম্ভাবী হচ্ছে না যে, হযরত মূসার এই ফযীলত হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) এবং হযরত ইবরাহীম খলীল (আঃ)-এর উপরও রয়েছে। ইয়াহ্ইয়া ইবনে ইয়ামার (রঃ) اَحْسَنَ -কে زَبَرْ-এর পরিবর্তে پِيْش দিয়ে আহসানু পড়তেন এবং বলতেন যে, এটা اَلَّذِىْ هُوَ اَحْسَنُ -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং نُوْن কে پِيْش দিয়ে পড়াই যুক্তিযুক্ত। আবার কেউ এ কথাও বলেন যে, আরবী ভাষা হিসেবে এটা একটা বিশুদ্ধ রূপ হলেও এভাবে پِيْش দিয়ে পড়া উচিত নয়। কেউ কেউ একথাও বলেছেন যে, এটা تَمَامًا عَلَى اِحْسَانِ اللّٰهِ اِلَيْهِ -এই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

ইরশাদ হচ্ছে—এতে প্রত্যেকটি বস্তুর বিশদ বিবরণ রয়েছে। আর একটা হচ্ছে হিদায়াত ও রহমত। আশা যে, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাৎ হওয়া সম্বন্ধে পূর্ণ বিশ্বাস লাভ করবে।

মহান আল্লাহ বলেনঃ আমি যে কিতাব অবতীর্ণ করেছি তা হচ্ছে বরকতময় ও কল্যাণময়, সুতরাং তোমরা তার অনুসরণ করে চল এবং আল্লাহকে ভয় কর। তাহলে তোমাদের প্রতি দয়া করা হবে। এতে কুরআনের অনুসরণ করার প্রতি আহ্বান করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদেরকে স্বীয় কিতাবের দিকে ধাবিত হওয়ার প্রতি উৎসাহিত করেছেন এবং এতে চিন্তা ও গবেষণা করার নির্দেশ দিচ্ছেন।

১৫৬। (এটা নাযিল করার কারণ হলো এই যে,) যেন তোমরা না বলতে পার—সে কিতাব তো আমাদের পূর্ববর্তী দুই

١٥٦- اَنْ تَقُوْلُوْا اِنَّمَا اُنْزِلَ الْكِتٰبُ عَلٰى طَائِفَتَيْنِ مِنْ

قَبْلِنَا ۪ وَاِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغٰفِلِيْنَ ۝

সম্প্রদায়ের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছিল এবং আমরা তাদের পঠন পাঠনে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলাম।

١٥٧- اَوْ تَقُوْلُوْا لَوْ اَنَّآ اُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتٰبُ لَكُنَّآ اَهْدٰى مِنْهُمْ فَقَدْ جَآءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزِى الَّذِيْنَ يَصْدِفُوْنَ عَنْ اٰيٰتِنَا سُوْٓءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوْا يَصْدِفُوْنَ ۝

১৫৭। অথবা তোমরা যেন এ কথাও বলতে না পার–আমাদের প্রতি কিতাব নাযিল করা হলে আমরা তাদের তুলনায় বেশী হিদায়াত লাভ করতাম; এখন তো তোমাদের কাছে তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে এক সুস্পষ্ট দলীল এবং পথ পাবার দিক নির্দেশ ও রহমত সমাগত হয়েছে, অতএব (এর পর আল্লাহর) আয়াতকে যে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে এবং তা থেকে এড়িয়ে থাকবে তার চেয়ে বড় অত্যাচারী আর কে হতে পারে? যারা আমার আয়াতসমূহ এড়িয়ে চলে, তাদেরকে আমি কঠিন শাস্তি দ্বারা শায়েস্তা করবো।

ইবনে জারীর (রঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে, আমি এ কিতাব অবতীর্ণ করেছি এই কারণে যে, যেন তোমরা বলতে না পার –আমাদের পূর্বে তো ইয়াহূদী ও নাসারাদের উপর কিতাব অবতীর্ণ করা হয়েছিল এবং আমাদের উপর অবতীর্ণ করা হয়নি। তাদের ওযর আপত্তি শেষ করে দেয়ার জন্যেই এ বর্ণনা দেয়া হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "যদি ব্যাপার এটা না হতো যে, তাদের প্রতি আপতিত বিপদ তাদেরই কর্মের ফল তবে তারা বলতো–হে আমাদের প্রভু! যদি আপনি কোন রাসূল আমাদের কাছে পাঠাতেন তবে আমরাও

আপনার নির্দেশ পালন করতাম।" ইবনে আব্বাস (রাঃ)বলেন যে, طَائِفَتَيْنِ বা দু'টি দল হচ্ছে ইয়াহূদী ও নাসারা।[১]

وَإِن كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغٰفِلِيْنَ অর্থাৎ আমরা এই ইয়াহূদী ও নাসারাদের ভাষা তো বুঝি না, কাজেই আমরা গাফেল ছিলাম এবং তাদের মত সঠিক আমল করতে পারিনি। আর তোমরা যেন এ কথাও বলতে না পার–যদি আমাদের উপরও আমাদের ভাষায় কোন আসমানী কিতাব অবতীর্ণ হতো তবে আমরা এই ইয়াহূদী ও নাসারাদের চেয়ে বেশী হিদায়াত প্রাপ্ত হতাম। তাই আমি তাদের এই ওযর আপত্তি খতম করে দিলাম। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেনঃ "তারা শপথ করে করে বলে যে, যদি তাদের কাছে কোন রাসূল আসতেন তবে তারা সবচেয়ে বেশী ভাল আমল করতো এবং হিদায়াত প্রাপ্ত হতো।" তাই তিনি বলেনঃ "এখন তোমাদের কাছে তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে হিদায়াত ও রহমতযুক্ত কিতাব এসে গেছে।" এই কুরআনে আযীম তোমাদের ভাষাতেই অবতারিত, এতে হালাল ও হারাম সবকিছুরই বর্ণনা রয়েছে। এটা ঐ লোকদের জন্যে রহমত, যারা এর অনুসরণ করে এবং সদা আল্লাহর ইবাদতে নিয়োজিত থাকে।

فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَصَدَفَ عَنْهَا সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহর আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে এবং তার থেকে এড়িয়ে চলে তার চেয়ে বড় অত্যাচারী আর কে হতে পারে? সে নিজেও তো কুরআন থেকে উপকার লাভ করলো না বা আহকাম মেনে চললই না, এমন কি অন্যান্য লোকদেরকেও আল্লাহর আয়াতের অনুসরণ থেকে ফিরিয়ে দিলো এবং হিদায়াতের পথ প্রাপ্তি থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করলো। যেমন সূরার শুরুতে আল্লাহ পাক বলেছেনঃ "তারা নিজেরাও ঈমান আনয়ন থেকে বিরত থাকছে এবং অন্যদেরকেও বিরত রাখছে। তারা নিজেদের জীবনকে নিজেদের হাতেই ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে।"

ইরশাদ হচ্ছে–যারা কুফরী করে এবং আল্লাহর পথ থেকে অন্যান্য লোকদেরকেও বাধা প্রদান করে তাদের দ্বিগুণ শাস্তি হবে। আর এই আয়াতে কারীমায় বলেনঃ "আমি ঐ লোকদেরকে ভীষণ শাস্তি প্রদান করবো যারা আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে বাধা প্রদান করে।" যেমন তিনি বলেছেনঃ "সে বিশ্বাসও করেনি, নামাযও পড়েনি বরং মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে এবং মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।"

১. এটা হচ্ছে মুজাহিদ (রঃ), সুদ্দী (রঃ), কাতাদা (রঃ) প্রমুখ পূর্ববর্তী গুরুজনেরও উক্তি।

মোটকথা, বহু আয়াত এটা প্রমাণ করে যে, এই কাফিররা অন্তরে মিথ্যা প্রতিপন্ন ও অবিশ্বাস করে এবং বাহ্যিকও ভাল কাজ করে না।

১৫৮। তারা কি শুধু এ প্রতীক্ষায় রয়েছে যে, তাদের কাছে ফেরেশতা আসবে? কিংবা স্বয়ং তোমার প্রতিপালক আসবেন? অথবা তোমার প্রতিপালকের কোন কোন নিদর্শন প্রকাশ হয়ে পড়বে? যেদিন তোমার প্রতিপালকের কতক নিদর্শন প্রকাশ হয়ে পড়বে, সেই দিনের পূর্বে যারা ঈমান আনেনি, তাদের তখন ঈমান আনয়নে কোন উপকার হবে না, অথবা যারা নিজেদের ঈমান দ্বারা কোন নেক কাজ করেনি (তখন নেক কাজ দ্বারা কোন ফলোদয় হবে না), তুমি এসব পাপিষ্ঠকে জানিয়ে দাও—তোমরা (এরূপ আশা নিয়ে) প্রতীক্ষা করতে থাক, আমিও প্রতীক্ষা করছি।

١٥٨- هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلٰئِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ اٰيٰتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ اٰيٰتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ اٰمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِيْ إِيْمَانِهَا خَيْرًا قُلِ انْتَظِرُوْا إِنَّا مُنْتَظِرُوْنَ ○

রাসূল (সঃ)-এর বিরুদ্ধাচরণ কারীদেরকে ও কাফিরদেরকে হুমকি দেয়া হচ্ছে– তোমরা তো শুধু এরই অপেক্ষা করছো যে, তোমাদের কাছে ফেরেশতারা এসে যাবে কিংবা স্বয়ং তোমাদের প্রতিপালক এসে যাবেন, এটা কিয়ামতের দিন অবশ্যই হবে, অথবা আল্লাহর কোন কোন নিদর্শন তোমাদের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়বে! তাহলে যখন ঐ নিদর্শনগুলো প্রকাশ হয়ে পড়বে তখন কারো ঈমান আনয়ন তার কোন উপকারে আসবে না। আর এটা কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার পূর্বে কিয়ামতের আলামত হিসেবে অবশ্যই প্রকাশ পাবে। যেমন ইমাম বুখারী (রঃ) এই আয়াতের তাফসীরে হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "কিয়ামত সংঘটিত হবে না যে পর্যন্ত না পশ্চিম দিক হতে সূর্য উদিত হবে। আর যখন লোকেরা এ অবস্থা অবলোকন করবে

তখন সারা দুনিয়াবাসীর এটার প্রতি বিশ্বাস হয়ে যাবে এবং তারা ঈমান আনয়ন করবে। আর যদি পূর্বে ঈমান না এনে থাকে তবে তখনকার ঈমান আনয়নে কোনই ফল হবে না।" অতঃপর তিনি এই আয়াতটি পাঠ করেন।[১]

আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "যদি তিনটি জিনিস প্রকাশ হয়ে পড়ে তবে ওগুলো প্রকাশ পাওয়ার পূর্বে কেউ ঈমান এনে না থাকলে তখন ঈমান আনয়ন বিফল হবে এবং পূর্বে ভাল কাজ করে না থাকলে তখন ভাল কাজ করে কোনই লাভ হবে না। প্রথম নিদর্শন হচ্ছে পূর্ব দিকের স্থলে পশ্চিম দিক হতে সূর্য উদিত হওয়া। দ্বিতীয় নিদর্শন হচ্ছে দাজ্জালের আবির্ভাব এবং তৃতীয় নিদর্শন হুচ্ছে দাব্বাতুল আরদের প্রকাশ।" হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "কিয়ামত সংঘটিত হবে না যে পর্যন্ত না সূর্য পশ্চিম দিক হতে উদিত হবে। অতঃপর যখন সূর্য পশ্চিম দিক হতে উদিত হবে তখন সমস্ত লোক ঈমান আনবে। ওটা এমন এক সময় যখন এমন ব্যক্তির ঈমান আনয়ন কোন উপকারে আসবে না যে ব্যক্তি ওর পূর্বে ঈমান আনেনি।"[২]

আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি সূর্য পশ্চিম দিকে উদিত হওয়ার পূর্বেই তাওবা করবে তার তাওবা কবূল হবে, এর পরে আর তাওবা কবূল হবে না।"[৩]

হযরত আবূ যার আল গিফারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে বললেনঃ "সূর্য অস্তমিত হওয়ার পর কোথায় যায় তা তুমি জান কি?" আমি বললাম, না, আমি জানি না। তিনি বললেনঃ "ওটা আরশের সামনে পৌঁছে এবং সিজদায় পড়ে যায়। তারপর উঠে পড়ে, শেষ পর্যন্ত ওকে বলা হয়–ফিরে যাও। হে আবূ যার (রাঃ)! ঐদিন নিকটবর্তী যেই দিন ওকে বলা হবে–তুমি যেখান থেকে এসেছো সেখানেই ফিরে যাও। ওটা এমনই এক দিন, যেই দিন ঐ ব্যক্তির ঈমান আনয়নে কোনই উপকার হবে না যে ব্যক্তি ওর পূর্বে ঈমান আনেনি।"[৪]

---

১. এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রঃ) হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে কয়েকটি পন্থায় তাখরীজ করেছেন।

২. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন।

৩. বিশুদ্ধ ছ'খানা হাদীস গ্রন্থের একখানা ছাড়া সবগুলোর মধ্যেই এ হাদীসটি রয়েছে।

৪. এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রঃ) ও ইমাম মুসলিম (রঃ) আবূ যার গিফারী (রাঃ) হতে তাখরীজ করেছেন।

অপর একটি হাদীস– হুযাইফা ইবনে উসায়েদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সঃ) কক্ষ থেকে বের হয়ে আমাদের কাছে আসলেন, সেই সময় আমরা কিয়ামত সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। অতঃপর তিনি বললেনঃ "কিয়ামত সংঘটিত হবে না যে পর্যন্ত না তোমরা দশটি নিদর্শন অবলোকন করবে। (সেগুলো হচ্ছে) পশ্চিম দিক হতে সূর্য উদিত হওয়া, ধোঁয়া ওঠা, দাব্বাতুল আরদের আবির্ভাব হওয়া, ইয়াজূয মাজূযের আত্মপ্রকাশ ঘটা, ঈসা ইবনে মারইয়াম (আঃ)-এর আগমন হওয়া, দাজ্জাল বের হওয়া, তিনটি ভূমিকম্প হওয়া বা যমীন ধ্বসে যাওয়া, একটি পূর্ব দিকে, একটি পশ্চিম দিকে এবং একটি আরব উপদ্বীপে, আদনে এক আগুন প্রকাশিত হওয়া যার কারণে মানুষ দৌড়িয়ে পালাতে থাকবে, তারা রাত্রে কোন জায়গায় ঘুমাতে চাইলে সেখানেও ঐ আগুন বিদ্যমান, আবার দিনে কোন স্থানে শুইতে চাইলে সেখানেও ঐ আগুন হাজির।" [১]

হযরত হুযাইফা (রাঃ) বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম– হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত হওয়ার নিদর্শন কি? তিনি উত্তরে বললেনঃ "সেই দিন রাত্রি এতো দীর্ঘ হবে যে, দু'টি রাত্রির সমান অনুভূত হবে। রাত্রে যারা নামায পড়ে তারা জেগে উঠবে এবং যেভাবে তাহাজ্জুদের নামায পড়ে থাকে সেভাবেই পড়বে। তারকাগুলোকে স্ব স্ব স্থানে প্রতিষ্ঠিত দেখা যাবে, অস্ত যাবে না। এ লোকগুলো নামায শেষ করে ঘুমিয়ে পড়বে। পুনরায় জেগে উঠবে এবং নামায পড়বে। আবার শুয়ে যাবে এবং পুনরায় জেগে উঠবে ও নামায পড়বে। শুয়ে শুয়ে তাদের পার্শ্বদেশ অনড় হয়ে যাবে। রাত্রি এতো দীর্ঘ হয়ে যাবে যে, মানুষ হতভম্ব হয়ে পড়বে, সকাল হবে না। তারা অপেক্ষমান থাকবে যে, সূর্য পূর্ব দিক থেকেই উদিত হবে। অকস্মাৎ ওটাকে পশ্চিম দিক থেকে উদিত হতে দেখা যাবে। তখন ঈমান আনয়নে কোনই উপকার হবে না।"[২]

অপর একটি হাদীস সাফওয়ান ইবনে উসসাল (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছি– "আল্লাহ তা'আলা পশ্চিম দিকে একটি দরযা খুলে রেখেছেন যার প্রস্থ সত্তর বছরের পথ। এটা তাওবার দরযা। সূর্য বিপরীত দিক থেকে উদিত হওয়ার পূর্বে এটা বন্ধ করা হবে না।" [৩]

১. ইমাম আহমাদ (রঃ) ও আসহাবুস সুনানিল আরবা' এটাকে তাখরীজ করেছেন এবং ইমাম তিরমিযী (রঃ) এটাকে হাসান সহীহ বলেছেন।
২. ইবনে মিরদুওয়াই (রঃ) এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এই ঢঙ্গে ছ'খানা সহীহ হাদীস গ্রন্থের কোন একটাতেও বিদ্যমান নেই।
৩. ইমাম তিরমিযী (রঃ) এটা বর্ণনা করেছেন এবং নাসাঈ (রঃ) ও ইবনে মাজাহ (রঃ) এটাকে বিশুদ্ধ বলেছেন।

অপর একটি হাদীসঃ "একটি রাত্রি লোকদের উপর এমন আসবে যা তিন রাত্রির সমান হবে। যখন এরূপ ঘটবে তখন যারা তাহাজ্জুদের নামায পড়ে থাকে তারা এর পরিচয় পেয়ে যাবে। সুতরাং তারা নফল নামায পড়বে, তারপর শুয়ে যাবে, আবার উঠবে, আবার নামায পড়বে। তারা এরূপ বারবার করতে থাকবে এমন সময় হঠাৎ শোরগোল উঠবে। লোকেরা চীৎকার করতে থাকবে এবং ভয়ে মসজিদের দিকে দৌড়িয়ে যাবে। কেননা সূর্য সে সময় পশ্চিম দিক হতে উদিত অবস্থায় রইবে। এখন ওটা আকাশের মধ্যস্থলে এসে আবার পশ্চিম দিকে ফিরে যাবে। এরপরে যথা নিয়মে পূর্ব দিক থেকেই উদিত হতে থাকেবে। ঐ সময় ঈমান আনয়ন বিফল হবে।"[১]

অপর একটি হাদীসঃ তিনজন মুসলমান মদীনায় মারওয়ানের নিকট উপস্থিত ছিলেন এবং তিনি কিয়ামতের নিদর্শনাবলীর আলোচনা করতে গিয়ে বলছিলেন যে, দাজ্জাল বের হওয়া কিয়ামতের একটি আলামত। অতঃপর লোকগুলো হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ)-এর কাছে আগমন করেন এবং মারওয়ানের কাছে যা শুনেছিলেন তা তাঁর কাছে বর্ণনা করেন। তিনি তখন বললেনঃ "মারওয়ান তো কিছুই বলেননি। আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট থেকে যা শুনে স্মরণ করে রেখেছি তাই তোমাদেরকে শুনাচ্ছি। প্রথম নিদর্শন এই যে, সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে। তারপর দাব্বাতুল আরদের আবির্ভাব অথবা কোন একটি প্রথমে এবং অন্যটি এরপরে প্রকাশ পাবে।"

অপর একটি হাদীসঃ আমর ইবনুল আ'স (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, যখন সূর্য পশ্চিম দিক হতে উদিত হবে তখন ইবলীস শয়তান সিজদায় পড়ে যাবে এবং চীৎকার করে বলবে—"হে আমার প্রভু! এখন আপনি আমাকে যাকে সিজদা করার হুকুম করতেন তাকেই আমি সিজদা করতাম।" তখন তার দেহরক্ষীরা তাকে বলবে, এসব অনুনয় বিনয় কেন ? সে উত্তরে বলবে, আমি আল্লাহর কাছে আবেদন করেছিলাম, "আমাকে ওয়াক্তে মা'লূম পর্যন্ত অবসর দিন। আর আজকের দিনটিই হচ্ছে ওয়াক্তে মা'লূম।" তারপর দাব্বাতুল আর্দ বের হবে। তার প্রথম পা রাখার স্থান হবে ইনতাকিয়া। ইবলীস এসে তাকে চপেটাঘাত করবে।[২]

১. এ হাদীসটি গারীব এবং ছ'খানা সহীহ হাদীস গ্রন্থের কোনটাতেই নেই।
২. এ হাদীসটি গারীব। এর সনদ দুর্বল। সম্ভবতঃ ইবনুল আ'স (রাঃ) ঐ যখীরা থেকে হাদীসটি গ্রহণ করে থাকবেন যা আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) ইয়ারমুকের যুদ্ধে পড়ে পেয়েছিলেন। আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

ইবনুস্ সা'দী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "হিজরত লুপ্ত হবে না (বরং অব্যাহত থাকবে) যে পর্যন্ত শত্রু যুদ্ধ করতে থাকবে।" মুআ'বিয়া (রাঃ), আবদুর রহমান ইবনে আ'উফ (রাঃ) এবং আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আ'স (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ "হিজরত দু'প্রকারের রয়েছে। একটি হচ্ছে খারাপ কাজ থেকে হিজরত করে ভাল কাজের দিকে ধাবিত হওয়া এবং অপরটি হচ্ছে আল্লাহ ও রাসূল (সঃ)-এর দিকে হিজরত করা। আর এটা বাকী থাকবে যে পর্যন্ত না তাওবার দরযা বন্ধ হবে। সূর্য যখন পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে তখন প্রত্যেক লোকের অন্তরে মোহর লেগে যাবে। যা কিছু তার মধ্যে রয়েছে সেটাই থাকবে এবং যা কিছু আমল মানুষ করেছে ওটাই যথেষ্ট হয়েছে (অর্থাৎ এর পরে কোন আমল করলে তা কোনই কাজে আসবে না)।" [১]

হযরত ইবনে মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, কিয়ামতের নিদর্শনগুলো সবই ঘটে গেছে, শুধুমাত্র চারটি নিদর্শন আসতে বাকী আছে। (১) পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত হওয়া, (২) দাজ্জালের আবির্ভাব, (৩) দাব্বাতুল আর্দ বের হওয়া এবং (৪) ইয়াজূজ মাজূজের আগমন। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে একটি হাদীস মারফূ'রূপে বর্ণিত আছে। হাদীসটি দীর্ঘ এবং গারীব। তা এই যে, ঐ দিন সূর্য ও চন্দ্র মিলিতভাবে পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে এবং অর্ধ আকাশ পর্যন্ত এসে পুনরায় ঐ দিকেই ফিরে যাবে। এ হাদীসটি মুনকার ও মাওযু'। কিন্তু এর মারফূ' হওয়ার দাবী করা হয়েছে। ইবনে আব্বাস (রাঃ) এবং অহাব ইবনে মুনাব্বাহ্ (রঃ) পর্যন্ত এসে বর্ণনাকারীদের বিরতি হয়েছে। সুতরাং এটাকে সম্পূর্ণরূপে উড়িয়ে দেয়া যায় না। আল্লাহ্ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, প্রথম আলামত প্রকাশ পাওয়া মাত্রই কিরামান কাতেবীনের কাজ শেষ হয়ে যাবে এবং দেহের আমলের উপর সাক্ষ্য প্রদানের সময় এসে যাবে। ওর পূর্বেই যারা ঈমানদার ছিল এবং ভাল কাজ করতো তারা বড়ই উপকৃত হবে। পক্ষান্তরে যারা পূর্বে ভাল ছিল না, তারা তখন তাওবাহ্ করতে শুরু করবে। কিন্তু তখন তাওবাহ্ করে কি লাভ ? أَوْ كَسَبَتْ فِىٓ إِيمَٰنِهَا خَيْرًا এর ভাবার্থ এটাই। অর্থাৎ তখন আর ভাল কাজ কবূল করা হবে না যদি পূর্বে ভাল কাজ করে না থাকে। আল্লাহ পাক বলেনঃ "হে নবী (সঃ)! তুমি

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। ইবনে কাসীর (রঃ) বলেন, এ হদীসটির ইসনাদ উত্তম।

বলে দাও–তোমরা ঐ দিনের অপেক্ষা কর, আমিও অপেক্ষা করছি।" এটা কাফিরদের প্রতি কঠিন ভর্ৎসনা, যারা ঈমান ও তাওবাহ থেকে উদাসীন রয়েছে, শেষ পর্যন্ত ঐ সময় এসে গেছে। যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ "এরা শুধু কিয়ামতের সময়ের অপেক্ষা করছে, যেন তা তাদের কাছে হঠাৎ এসে পড়ে, অবশ্যই এর নিদর্শনগুলো তো এসেই পড়েছে, সুতরাং যখন তা সংঘটিত হয়েই যাবে তখন তাদের বুঝবার সুযোগ থাকবে কোথায় ?" ইরশাদ হচ্ছে–যখন তারা আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে তখন বলবে –আমরা একক আল্লাহর উপর ঈমান আনলাম এবং শরীকদেরকে অস্বীকার করলাম, কিন্তু শাস্তি দেখার পর ঈমানের এসব কথা বাজে ও ভিত্তিহীন।

১৫৯। নিশ্চয়ই যারা নিজেদের দ্বীনের মধ্যে নানা মতবাদ সৃষ্টি করে ওকে খণ্ড-বিখণ্ড করেছে এবং বিভিন্ন দলে উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে, তাদের সাথে কোন ব্যাপারে তোমার কোন সম্পর্ক নেই, তাদের বিষয়টি নিশ্চয়ই আল্লাহর হাওলায় রয়েছে, পরিশেষে তিনিই তাদেরকে তাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে অবহিত করবেন।

١٥٩- إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَ
كَانُوا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي
شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ
يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ○

এ আয়াতটি ইয়াহূদী ও খ্রীষ্টানদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)-এর নবুওয়াতের পূর্বে ইয়াহূদী ও খ্রীষ্টানেরা পরস্পর মতানৈক্য সৃষ্টি করতো এবং নিজ নিজ ধর্ম পৃথক সাব্যস্ত করতো। যখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) প্রেরিত হন তখন এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। বলা হয়, হে নবী (সঃ)! যারা নিজেদের ধর্মের মধ্যে নানা মতবাদ সৃষ্টি করতঃ ওকে খণ্ড-বিখণ্ড করেছে এবং বিভিন্ন দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে, তাদের সাথে তোমার কোন সম্পর্ক নেই এবং তোমার সাথে তাদেরও কোন সম্পর্ক নেই। এরা হচ্ছে বিদআতী, সন্দেহ পোষণকারী পথভ্রষ্ট সম্প্রদায়। কিন্তু এই হাদীসে একটি সনদ ঠিক নয়।

আবূ হুরাইরা (রাঃ) বলেন যে, এটা এই উম্মতের ব্যাপারেই অবতীর্ণ হয়। আর وَ كَانُوا شِيَعًا দ্বারা খারেজীদেরকে বুঝানো হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত

আয়েশা (রাঃ)-কে বলেছিলেন যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে বিদআতীরা। এ হাদীসটিও গারীব এবং মারফূ' রূপেও বিশুদ্ধ নয়।[১] তবে প্রকাশ্য কথা এই যে, এ আয়াতটি সাধারণ। এমন প্রত্যেক ব্যক্তির উপরই এটা প্রযোজ্য হতে পারে যে আল্লাহর দ্বীনে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করে এবং দ্বীনের বিরোধী হয়ে যায়। কেননা, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল (সঃ)-কে সত্য ধর্মের হিদায়াতসহ প্রেরণ করেছেন যেন তিনি সমস্ত দ্বীনের উপর দ্বীনে ইসলামকে জয়যুক্ত করেন। ইসলামের পথ একটাই। তাতে কোন মতভেদ ও বিচ্ছিন্নতা নেই। যারা পৃথক দল অবলম্বন করেছে, যেমন বাহাত্তর দল বিশিষ্ট লোকেরা, আল্লাহর রাসূল (সঃ) তাদের থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। এ আয়াতটি ঐ আয়াতের মতই, যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ "হে নবী (সঃ)! তোমাদের জন্যে আমি ঐ দ্বীনকেই পছন্দ করেছি যা নূহ (আঃ) -এর জন্যে ছিল।" হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "আমরা নবীরা বৈমাত্রেয় সন্তানদের মত। যেমন বৈমাত্রেয় সন্তানদের পিতা একজনই হয় তেমনই আমাদের সকলেরই দ্বীন বা ধর্ম একটাই। এটাই হচ্ছে সিরাতে মুসতাকীম এবং এটাই হচ্ছে ঐ হিদায়াত যা রাসূলগণ এক আল্লাহর ইবাদত সম্পর্কে পেশ করেছেন এবং সর্বশেষ রাসূল (সঃ)-এর শরীয়তকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করাকে সিরাতে মুসতাকীম বানিয়েছেন। এটা ছাড়া সমস্ত কিছুই পথভ্রষ্টতা ও মূর্খতা। রাসূলগণ ওগুলো থেকে মুক্ত। যেমন আল্লাহ পাক এখানে বলেছেনঃ لَّسْتَ مِنْهُمْ فِى شَىْءٍ অর্থাৎ হে নবী (সঃ)! তাদের সাথে কোন ব্যাপারে তোমার কোন সম্পর্ক নেই। এরপর ইরশাদ হচ্ছে–তাদের বিষয়টি আল্লাহর কাছে সোপর্দ করে দাও। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদেরকে তাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে অবহিত করবেন। যেমন তিনি এক জায়গায় বলেনঃ "যারা ঈমান এনেছে, আর যারা ইয়াহূদী রয়েছে বা তারকাপূজক, খ্রীষ্টান, মাজূস কিংবা মুশরিক রয়েছে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের মধ্যে ফায়সালা করবেন।" এখন এরপর আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন স্বীয় হুকুম এবং বিচারের মধ্যেও নিজের স্নেহ ও দয়ার বর্ণনা পরবর্তী আয়াতে দিচ্ছেন।

১৬০। কেউ কোন ভাল কাজ করলে সে ওর দশগুণ প্রতিদান পাবে, আর কেউ পাপ ও অসৎ কাজ করলে তাকে শুধু

١٦٠- مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ عَشْرُ اَمْثَالِهَا ۚ وَمَنْ جَآءَ

১. এটা হচ্ছে মুজাহিদ (রঃ), কাতাদাহ (রঃ), যহ্হাক (রঃ) এবং সুদ্দী (রঃ)-এর উক্তি।

بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزٰى اِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ○

ততটুকুই প্রতিফল দেয়া হবে যতটুকু সে করেছে, আর তারা অত্যাচারিত হবে না (অর্থাৎ বেশী প্রতিফল ভোগ করিয়ে তাদের প্রতি অত্যাচার করা হবে না)।

এ আয়াতে কারীমায় বিস্তারিতভাবে আলোকপাত করা হয়েছে এবং এর পরবর্তী আয়াত সংক্ষিপ্ত। এ আয়াতের সাথে সাদৃশ্যযুক্ত বহু হাদীস রয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) মহাকল্যাণময় আল্লাহ থেকে বর্ণনা করেছেনঃ "তোমাদের মহামহিমান্বিত আল্লাহ বড় করুণাময়। কেউ যদি কোন ভাল কাজের ইচ্ছা করে, কিন্তু ঐ কাজ সাধন করতে না পারে তবুও তার জন্যে একটা পুণ্য লিখে নেয়া হয়। আর যদি সে ঐ কাজটি সাধন করে তবে তার জন্যে দশটা পুণ্য লিখা হয় এবং তার ভাল নিয়তের কারণে এটা বৃদ্ধি হতে হতে সাতশ' পর্যন্ত পৌঁছে যায়। পক্ষান্তরে কেউ যদি কোন খারাপ কাজের ইচ্ছা করে, কিন্তু তা করে না বসে তবে ওর জন্যেও একটা পুণ্য লিখা হয়। আর যদি তা করে ফেলে তবে একটা মাত্র পাপ লিখা হয় এবং সেটাও ইচ্ছা করলে মহামহিমান্বিত আল্লাহ ক্ষমা করে দেন।"[১]

আবূ যার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, "মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন–যে ব্যক্তি একটি ভাল কাজ করবে তার জন্যে অনুরূপ দশটি পুণ্য রয়েছে এবং আমি তার চেয়েও বেশী প্রদান করবো। আর যে ব্যক্তি একটি খারাপ কাজ করবে, তার অনুরূপ একটি মাত্র পাপ তার জন্যে লিখা হবে অথবা আমি ওটাও ক্ষমা করে দেবো। যে ব্যক্তি ভূ-পৃষ্ঠ বরাবর পাপ করে আমার সাথে সাক্ষাৎ করবে, কিন্তু আমার সাথে কাউকেও শরীক করবে না, আমি সেই পরিমাণই ক্ষমা তার উপর নাযিল করবো। যে ব্যক্তি আমার দিকে অর্ধহাত অগ্রসর হবে, আমি তার দিকে এক হাত অগ্রসর হবো। যে ব্যক্তি আমার দিকে একহাত অগ্রসর হবে, আমি তার দিকে দু'হাত অগ্রসর হবো। যে ব্যক্তি আমার দিকে হেঁটে আসবে, আমি তার দিকে দৌড়িয়ে যাবো।"[২]

১. এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রঃ), ইমাম মুসলিম (রঃ) এবং ইমাম নাসাঈ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

২. এ হাদীসটি ইমাম মুসলিম (রঃ) ও ইবনে মাজাহ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি কোন ভাল কাজের ইচ্ছা করলো কিন্তু কাজটা করলো না তবে তার জন্যে একটা পুণ্য লিখা হবে। আর যদি কাজটি করে নেয় তবে তার জন্যে দশটি পুণ্য লিপিবদ্ধ করা হবে। পক্ষান্তরে কেউ যদি কোন খারাপ কাজের ইচ্ছা করে, কিন্তু করে না বসে তবে তার জন্যে কিছুই লিখা হবে না। আর যদি কাজটি করে ফেলে তবে তার জন্যে একটা পাপ লিখা হবে।"[১]

এখানে এটা জেনে নেয়া জরুরী যে, যে ব্যক্তি কোন পাপকার্যের ইচ্ছা করে তা করে বসলো না ওটা তিন প্রকার। (১) কখনও এরূপ হয় যে, সে আল্লাহর ভয়ে পাপের ইচ্ছা পরিত্যাগ করলো। এ প্রকারের লোককেও পাপকার্য থেকে বিরত থাকার কারণে একটি পুণ্য দেয়া হবে এবং এটা আমল ও নিয়তের উপর নির্ভরশীল। একারণেই তার জন্যে একটা পুণ্য লিখা হয়। যেমন সহীহ হাদীসে রয়েছে, সে আমারই কারণে পাপকার্য পরিত্যাগ করেছে। (২) কখনও এমন হয় যে, ঐ ব্যক্তি পাপকার্যের ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও ভুলে গিয়ে তা ছেড়ে দেয়। এ অবস্থায় তার জন্যে শাস্তিও নেই, প্রতিদানও নেই। কেননা, সে ভাল কাজেরও নিয়ত করেনি এবং খারাপ কাজও করে বসেনি। (৩) আবার কখনও এমনও হয় যে, কোন ব্যক্তি পাপকার্য করে ফেলার চেষ্টা করে থাকে, ওর উপকরণ সংগ্রহ করে, কিন্তু ওকে কার্যে পরিণত করতে সে অপারগ হয়ে যায় এবং বাধ্য হয়ে তাকে ওটা ছেড়ে দিতে হয়। এরূপ ব্যক্তি যদিও পাপকার্য করে বসলো না তবুও তাকে কার্যে পরিণত কারীরূপেই গণ্য করা হবে এবং শাস্তি দেয়া হবে। যেমন সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ "যখন দু'জন মুসলমান তরবারী নিয়ে যুদ্ধ করতে শুরু করে তখন হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তি উভয়ই জাহান্নামী।" সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! এটা হত্যাকারীর ব্যাপারে প্রযোজ্য, কিন্তু নিহত ব্যক্তি জাহান্নামী হবে কেন? তিনি উত্তরে বললেনঃ "নিশ্চয়ই সে তার সাথীকে হত্যা করতে উদ্যত ছিল (কিন্তু পারেনি)।"[২] রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি কোন সৎকার্যের ইচ্ছা করে, সেই কাজ সাধনের পূর্বেই তার জন্যে একটি পুণ্য লিখে নেয়া হয়। আর যদি সেই কার্য সাধন করে ফেলে তবে আল্লাহর পক্ষ থেকে তার আমলনামায় দশটি পুণ্য লিপিবদ্ধ করা হয়। কিন্তু কেউ যদি কোন খারাপ কাজের ইচ্ছা করে তবে শুধু তার ইচ্ছার উপর ভিত্তি করে তার নামে কোন পাপ লিখা হয় না যে পর্যন্ত না

১. হাদীসটি হাফিয আবূ ইয়ালা আল মুসিলী বর্ণনা করেছেন।
২. এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রঃ) ও ইমাম মুসলিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

সে তা কার্যে পরিণত করে। আর যদি সে ঐ কাজটি করে বসে তবে দশটি পাপের পরিবর্তে একটি মাত্র পাপ লিখা হয়। যদি সে ইচ্ছা সত্ত্বেও সেই পাপ কার্য থেকে বিরত থাকে তবে কোন আমল ছাড়াই তার জন্যে একটা পুণ্য লিখা হয়। কেননা, আল্লাহ পাক বলেনঃ "আমাকে ভয় করার করণেই সে পাপকার্য থেকে বিরত রয়েছে।"

খুরায়েম ইবনে ফাতিক আসাদী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ "মানুষ চার প্রকার এবং আমল ছয় প্রকার। (চার প্রকার মানুষ হচ্ছে) (১) কোন কোন লোক দুনিয়া ও আখিরাত উভয় স্থলেই সৌভাগ্যবান হয়ে থাকে। (২) কেউ কেউ দুনিয়ায় ভাগ্যবান কিন্তু পরকালে হতভাগ্য হয়। (৩) কোন ব্যক্তি দুনিয়ায় হতভাগ্য কিন্তু পরকালে ভাগ্যবান হয়। (৪) আবার কেউ কেউ দুনিয়া ও আখিরাত উভয় স্থলেই হতভাগ্য হয়ে থাকে। (ছয় প্রকারের আমল হচ্ছে) দু'প্রকারের আমল ওয়াজিবকারী অর্থাৎ আমলের সমান পুণ্য দান করা হবে বা দশগুণ বেশী অথবা সাতশ'গুণ বেশী পুণ্য দেয়া হবে। যে দু'টি কাজ ওয়াজিবকারী তা হচ্ছে এই যে, যদি কোন মুমিন লোক মারা যায় এবং সে আল্লাহর সাথে কাউকেও শরীক না করে থাকে, তবে এর ফলে তার জন্যে জান্নাত রয়েছে। পক্ষান্তরে যদি কোন কাফির মারা যায় তবে এর ফল স্বরূপ তার জন্যে জাহান্নাম রয়েছে। আর যে ব্যক্তি ভাল কাজের ইচ্ছা করে, কিন্তু কার্য সাধনে সক্ষম না হয় তবে আল্লাহ তো জানেন যে তার অন্তরে এটা ছিল এবং কার্য সাধনে সে উদ্যতও ছিল, তাই তার জন্যে একটি পুণ্য লিখা হয়। আর কেউ যদি কোন খারাপ কাজের ইচ্ছা করে তবে তার জন্যে কোন পাপ লিখা হয় না। কিন্তু সে যদি ওটা করে বসে তবে একটিমাত্র পাপ লিখা হয়, ওটা বৃদ্ধি করা হয় না। কেউ যদি কোন ভাল কাজ করে তবে তাকে দশগুণ পুণ্য দেয়া হয়। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে কিছু খরচ করে তখন কখনও তো তাকে দশগুণ পুণ্য দান করা হয়, আবার কোন কোন সময় তার সৎ নিয়ত অনুসারে তাকে তার পুণ্য বৃদ্ধি করতে করতে সাতশ'গুণ পর্যন্ত প্রদান করা হয়।"[১]

আমর ইবনে শু'আয়েব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতা থেকে এবং তিনি তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ "তিন ব্যক্তি জুমআ'র নামাযে হাযির হয়। একজন তো হাযির হয় প্রথা হিসেবে। তার আগমন বৃথা। সুতরাং তার জন্যে কোন অংশও নেই। দ্বিতীয় এমন ব্যক্তি মসজিদে হাযির হয়,

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ), তিরমীযী (রঃ) এবং নাসাঈ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

যে হাযির হয়ে দু'আ করে থাকে। সুতরাং আল্লাহ ইচ্ছা করলে তার দু'আ কবূল করে থাকেন এবং ইচ্ছা করলে কবূল করেন না। তৃতীয় এমন ব্যক্তি নামাযে হাযির হয়, যে হাযির হয়ে সম্পূর্ণ নীরব থাকে। সে নামাযীদেরকে ভেদ করে সামনে অগ্রসর হয় না, কাউকেও ধাক্কাও দেয় না এবং কাউকেও কষ্টও দেয় না। তাহলে এখন এই ব্যক্তির নামায আগামী জুমআ' পর্যন্ত এবং এর পরে আরও তিন দিন পর্যন্তও পাপের কাফ্ফারা হয়ে থাকে। এর কারণ এই যে, আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ "কেউ কোন ভাল কাজ করলে সে ওর দশগুণ প্রতিদান পাবে।" [১]

আবূ যার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি প্রতি মাসে তিনদিন রোযা রাখলো সে যেন সারা বছর রোযা রাখলো।" এই প্রতিদানও দেয়া হবে এই মূলনীতির উপর ভিত্তি করেই। কেননা, আল্লাহ তা'আলা এর সত্যতা স্বীয় কিতাবে বলে দিয়েছেন। তাই এক দিনের রোযা হবে দশ দিনের রোযার সমান। তাহলে এক বছরে ছত্রিশ দিনের রোযার প্রতিদান তিনশ' ষাট দিনের রোযার প্রতিদানের সমান হয়ে যায়। হযরত ইবনে মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে এবং পূর্ববর্তী গুরুজনের একটি দল থেকে নকল করা হয়েছে যে, مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ عَشْرُ اَمْثَالِهَا -এই আয়াতে حَسَنَةٌ শব্দ দ্বারা কালেমায়ে তাওহীদ অর্থাৎ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু বুঝানো হয়েছে এবং مَنْ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ.... দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে শিরক। এই আয়াতের তাফসীরে আরও বহু হাদীস এসেছে। কিন্তু আমি যে কয়টি বর্ণনা করলাম এটাই যথেষ্ট।

১৬১। (হে মুহাম্মাদ সঃ)! তুমি বল—নিঃসন্দেহে আমার প্রতিপালক আমাকে সঠিক ও নির্ভুল পথে পরিচালিত করেছেন, ওটাই সুপ্রতিষ্ঠিত দ্বীন, এবং ইবরাহীম (আঃ) -এর অবলম্বিত আদর্শ যা সে ঐকান্তিক নিষ্ঠার সাথে গ্রহণ করেছিল। আর সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

١٦١- قُلْ اِنَّنِيْ هَدٰىنِيْ رَبِّيْۤ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۚ دِيْنًا قِيَمًا مِّلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ۚ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ○

১. এ হাদীসটি ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

١٦٢- قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعٰلَمِينَ ○

১৬২। তুমি বলে দাও–আমার নামায, আমার সকল ইবাদত, আমার জীবন ও আমার মরণ সব কিছু সারা জাহানের রব আল্লাহর জন্যে।

١٦٣- لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ○

১৬৩। তার কোন শরীক নেই, আমি এর জন্যে আদিষ্ট হয়েছি, আর আত্মসমর্পণ কারীদের মধ্যে আমিই হলাম প্রথম।

এখানে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নবী (সঃ)-কে নির্দেশ দিচ্ছেন, তুমি সংবাদ দিয়ে দাও–আল্লাহ তাঁর নবী (সঃ)-এর উপর কিরূপ ইন'আম বর্ষণ করেছেন যে, তাঁকে সরল সোজা পথে পরিচালিত করেছেন, যার মধ্যে কোন বক্রতা নেই। ওটা হচ্ছে একটা সুপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম এবং ওটাই হচ্ছে মিল্লাতে ইবরাহীম (আঃ)। তিনি একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদত করতেন এবং তিনি কখনও শির্ক করেননি। যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ "নির্বোধেরা ছাড়া আর কেউই মিল্লাতে ইবরাহীম (আঃ) থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় না।" অন্যত্র আল্লাহ পাক বলেনঃ "তোমরা আল্লাহর পথে এমন চেষ্টা তদবীর কর যেমন চেষ্টা তদবীরের হক রয়েছে। তিনি তোমাদেরকে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং দ্বীনের ব্যাপারে তিনি তোমাদের উপর কোন সংকীর্ণতা রাখেননি, এটাই হচ্ছে তোমাদের পিতা ইবরাহীম (আঃ)-এর ধর্ম।" আর এক জায়গায় তিনি বলেনঃ "ইবরাহীম বড়ই আবেদ ছিল, সে ছিল নিষ্কলুষ অন্তরের অধিকারী এবং শির্ক থেকে বহু দূরে অবস্থানকারী। সে ছিল আল্লাহর নিয়ামতের বড়ই কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী। আমি তাঁকে সরল-সোজা পথে পরিচালিত করেছিলাম। দুনিয়াতেও সে বহু পুণ্য লাভ করেছিল এবং আখিরাতেও সে আল্লাহর সৎ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হবে। এখন আমি তোমার কাছে এই অহী করছি যে, তুমি মিল্লাতে ইবরাহীম (আঃ) এর অনুসরণ করো।" নবী (সঃ)-কে মিল্লাতে ইবরাহীম (আঃ)-এর অনুসরণ করতে বলা হলো বলে যে তাঁর উপর হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হলো তা নয়। কেননা, নবী (সঃ) হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর মাযহাবের অনুসরণের মাধ্যমে তাঁর মাযহাবকে আরও সুদৃঢ় করেছেন এবং তাঁর মাধ্যমেই হযরত

ইবরাহীম (আঃ)-এর দ্বীন পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছে। অন্য কোন নবী তাঁর দ্বীনকে পূর্ণতা দানে সক্ষম হননি। আমাদের নবী (সঃ) তো খাতেমুল আম্বিয়া। তিনি সাধারণভাবে আদম সন্তানের নেতা এবং মাকামে মাহ্মূদের উপর তিনি সমাসীন থাকবেন। কিয়ামতের দিন সমস্ত মাখলূক তাঁরই দিকে ফিরে আসবে, এমন কি স্বয়ং ইবরাহীম খলীল (আঃ)-ও। ইবনে ইবযী তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, যখন সকাল হতো তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলতেনঃ "আমরা মিল্লাতে ইসলাম ও কালেমায়ে ইখলাসের উপর এবং আমাদের নবী মুহাম্মাদ (সঃ)-এর দ্বীনের উপর ও আমাদের পিতা একনিষ্ঠ ইবরাহীমের মিল্লাতের উপর সকাল করলাম যিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।" ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়, "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আল্লাহর কাছে কোন দ্বীন সব চেয়ে প্রিয়?" তিনি উত্তরে বললেনঃ "ইবরাহীম হানীফ (আঃ)-এর ধর্ম।" [১]

হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি স্বীয় থুত্নী রাসূলুল্লাহ (সঃ)–এর কাঁধের উপর রাখতাম এবং তাঁর পৃষ্ঠদেশের পিছনে থেকে হাবশীদের নাচ দেখতাম। অতঃপর যখন ক্লান্ত হয়ে পড়তাম তখন সরে আসতাম। ঐ দিন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছিলেনঃ "ইয়াহূদীদের এটা জেনে নেয়া উচিত যে, আমাদের ধর্ম সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম এবং আমাকে এমন দ্বীন দিয়ে প্রেরণ করা হয়েছে যা শির্ক থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত।"

ইরশাদ হচ্ছে–হে নবী (সঃ)! তুমি বলে দাও, আমার নামায, আমার সকল ইবাদত, আমার জীবন এবং আমার মরণ সবই বিশ্বপ্রভু আল্লাহর জন্যে। যেমন অন্য জায়গায় আল্লাহ পাক বলেনঃ "হে নবী (সঃ)! তুমি তোমার প্রভুর জন্যেই নামায পড় এবং তাঁরই জন্যে কুরবানী কর।"

মুশরিকরা তো মূর্তির পূজা করতো এবং মূর্তির নামেই কুরবানী করতো। আল্লাহ তাদের বিরুদ্ধাচরণ করার নির্দেশ দিচ্ছেন এবং ওদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে কলুষমুক্ত অন্তঃকরণ নিয়ে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে আল্লাহর উপাসনায় নিমগ্ন থাকতে মুসলমানদেরকে হুকুম করছেন। যেমন তিনি স্বীয় নবী (সঃ)-কে বলতে বললেনঃ "নিশ্চয়ই আমার নামায, আমার ইবাদত-বন্দেগী সব কিছুই বিশ্ব প্রভু আল্লাহর জন্যে।" نُسُكٌ হজ্ব ও উমরা পালনের সময় কুরবানী করাকে বলা হয়। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) ঈদুল আযহার দিন দু'টি দুম্বা যবাই করেন এবং যবাই করার সময় বলেন ঃ

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) মুসনাদে আহমাদে তাখরীজ করেছেন।

إِنِّىْ وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّ مَآ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ-قُلْ اِنَّ صَلَاتِىْ وَ نُسُكِىْ وَ مَحْيَاىَ وَ مَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَ بِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَ اَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ -

অর্থাৎ "নিশ্চয়ই আমি আমার মুখমণ্ডল সেই সত্তার দিকে একনিষ্ঠভাবে ফিরাচ্ছি যিনি আকাশসমূহ ও ভূ-মণ্ডল সৃষ্টি করেছেন এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই। নিশ্চয়ই আমার নামায, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মরণ বিশ্বপ্রভু আল্লাহরই জন্যে। তাঁর কোন অংশীদার নেই, আমি এর জন্যেই আদিষ্ট হয়েছি এবং আত্মসমর্পণকারীদের মধ্যে আমিই হলাম প্রথম।"[১]

اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ দ্বারা ঐ উম্মতের প্রথম মুসলমান বুঝানো হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর পূর্ববর্তী সকল নবী ইসলামেরই দাওয়াত দিতেন। প্রকৃত ইসলাম হচ্ছে আল্লাহকে মা'বূদ মেনে নেয়া এবং তাঁকে এক ও শরীক বিহীন বলে বিশ্বাস করা। যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ "হে নবী (সঃ)! আমি তোমার পূর্বে যতজন নবী পাঠিয়েছিলাম তাদের সকলের কাছেই এই অহী করেছিলাম যে, আল্লাহ এক, তাঁর কোন অংশীদার নেই, সুতরাং তোমরা তাঁরই ইবাদত কর।" আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "নূহ তার কওমকে বললো–তোমরা যদি আমা থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও তবে বলতো– আমি কি তাবলীগ করার বিনিময়ে তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাচ্ছি? আমাকে পারিশ্রমিক তো আল্লাহই প্রদান করবেন। আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, আমি যেন সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করি।" আর এক জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "যে মিল্লাতে ইবরাহীম (আঃ) থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় সে বড়ই নির্বোধ। আমি তাকে দুনিয়াতেও মনোনীত করেছি এবং পরকালেও সে আল্লাহর ইবাদতকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।" যখন আল্লাহ ইবরাহীম (আঃ)-কে বললেনঃ ইসলাম গ্রহণ কর, তখন সে তৎক্ষণাৎ বলে উঠলো–আমি সারা জাহানের প্রভুর কাছে আত্মসমর্পণ করলাম। ইবরাহীম (আঃ) স্বীয় সন্তানদেরকে অসিয়ত করেছিলো এবং ইয়াকূব (আঃ)ঃ "হে আমার সন্তানগণ! আল্লাহ তোমাদের জন্যে এই দ্বীনকে নির্দিষ্ট করেছেন, সুতরাং তোমরা কখনও মুসলমান না হয়ে মরো না।" হযরত ইউসুফ (আঃ) বলেছিলেনঃ "হে আমার প্রভু! আপনি আমাকে রাজত্বের বিরাট অংশ দান করেছেন এবং আমাকে স্বপ্নফল বর্ণনা শিক্ষা দিয়েছেন, হে আকাশসমূহের ও ভূ-মণ্ডলের সৃষ্টিকর্তা! আপনি আমার

১. এটা ইবনে আবি হাতিম (রঃ) জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন।

কার্য নির্বাহক দুনিয়াতেও আখিরাতেও, আমাকে পূর্ণ আনুগত্যের অবস্থায় দুনিয়া হতে উঠিয়ে নিন এবং আমাকে বিশিষ্ট নেক বান্দাদের মধ্যে পরিগণিত করুন।” হযরত মূসা (আঃ) বলেছিলেনঃ “হে আমার কওম! যদি তোমরা আল্লাহর উপর ঈমান এনে থাক তবে তাঁরই উপর ভরসা কর যদি তোমরা মুসলমান হও।” তখন তাঁর উম্মত বলেছিলঃ “আমরা আমাদের প্রভুর উপরই ভরসা করছি। হে আমাদের প্রভু! আপনি আমাদেরকে যালিমদের লক্ষ্যস্থল বানাবেন না এবং স্বীয় রহমতে আমাদেরকে কফিরদের আধিপত্য হতে মুক্তি দান করুন!”

আল্লাহ পাক বলেনঃ “নিশ্চয়ই আমি তাওরাত অবতীর্ণ করেছিলাম যার মধ্যে হিদায়াত ও নূর রয়েছে, যার মাধ্যমে আত্মসমর্পণকারী নবীরা ইয়াহূদী, আল্লাহওয়ালা ও আলেমদের মধ্যে ফায়সালা করতো।” অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ “যখন আমি হাওয়ারীদের কাছে অহী করেছিলাম–তোমরা আমার উপর ও আমার রাসূলের উপর ঈমান আনয়ন কর, তখন তারা বললো– আমরা ঈমান আনলাম, আপনি সাক্ষী থাকুন যে, আমরা মুসলমান।” এসবের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিলেন যে, তিনি সমস্ত নবীকে ইসলাম দিয়ে পঠিয়েছিলেন। কিন্তু নবীদের উম্মতেরা নিজ নিজ শরীয়তের প্রতি লক্ষ্য রেখে পৃথক পৃথক ধর্মের উপর ছিল। কোন কোন নবী পূর্ববর্তী নবীর শাখা ধর্মকে রহিত করে দিয়ে নিজস্ব ধর্ম চালু করেন। শেষ পর্যন্ত শরীয়তে মুহাম্মাদীর মাধ্যমে অন্যান্য সমস্ত দ্বীন মানসূখ বা রহিত হয়ে যায় এবং দ্বীনে মুহাম্মাদী কখনও রহিত হবে না, বরং চির বিদ্যমান থাকবে। কিয়ামত পর্যন্ত এর পতাকা উঁচু হয়েই থাকবে। এ জন্যেই নবী (সঃ) বলেছেনঃ “আমরা নবীরা পরস্পর বৈমাত্রেয় সন্তান। অর্থাৎ বৈমাত্রেয় সন্তানদের পিতা একজনই হয় তদ্রূপ আমাদেরও সবারই দ্বীন একই। আমরা সবাই সেই আল্লাহকে মেনে থাকি যিনি এক ও অংশীবিহীন। আমরা তাঁরই ইবাদত করে থাকি। যদিও আমাদের শরীয়ত বিভিন্ন; কিন্তু এই শরীয়তগুলো মায়ের মত। যেমন বৈপিত্রেয় ভাই বৈমাত্রেয় ভাই এর বিপরীত হয়ে থাকে। অর্থাৎ মা এক এবং পিতা পৃথক পৃথক। আর প্রকৃত ভাই একই মা ও একই পিতার সন্তান হয়ে থাকে। তাহলে উম্মতের দৃষ্টান্ত পরস্পর এক মায়েরই সন্তানের মত।” হযরত আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) যখন নামায শুরু করতেন তখন তাকবীর বলতেন। তারপর إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ বলতেন। এরপর নিম্নের দু'আটি বলতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْمَلِكُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ رَبِّيْ وَ اَنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ وَ اعْتَرَفْتُ بِذَنْبِيْ فَاغْفِرْلِيْ ذُنُوْبِيْ جَمِيْعًا لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ وَ اهْدِنِيْ لِاَحْسَنِ الْاَخْلَاقِ لَا يَهْدِيْ لِاَحْسَنِهَا اِلَّا اَنْتَ وَ اصْرِفْ عَنِّيْ سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفُ عَنِّيْ سَيِّئَهَا اِلَّا اَنْتَ تَبَارَكْتَ وَ تَعَالَيْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَ اَتُوْبُ اِلَيْكَ -

অর্থাৎ "হে আল্লাহ! আপনি বাদশাহ্। আপনি ছাড়া অন্য কেউ উপাস্য নেই। আপনি আমার প্রভু এবং আমি আপনার দাস। আমি আমার নিজের উপর অত্যাচার করেছি এবং আমি আমার পাপের কথা স্বীকার করছি। সুতরাং আপনি আমার সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দিন। আপনি ছাড়া আর কেউ পাপরাশি ক্ষমা করতে পারে না। আমাকে উত্তম চরিত্রের পথ বাতলিয়ে দিন। আপনি ছাড়া অন্য কেউ আমাকে উত্তম চরিত্রের পথ বাতলিয়ে দিতে পরে না। আমা থেকে দুশ্চরিত্রতা দূর করে দিন। আপনি ছাড়া অন্য কেউ আমা থেকে দুশ্চরিত্রতা দূর করতে পারে না। আপনি কল্যাণময় ও উচ্চ মর্যাদার অধিকারী। আমি আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং (পাপকার্য থেকে) আপনার কাছে তাওবা করছি।" তারপর তিনি রুকূ' ও সিজদায় এবং তাশাহ্হুদে যা বলেছিলেন সেগুলো সম্বলিত সম্পূর্ণ হাদীসটি বর্ণনা করা হয়।[১]

১৬৪। (হে মুহাম্মাদ সঃ)! তুমি জিজ্ঞেস কর– আমি কি আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য প্রতিপালকের সন্ধান করবো? অথচ তিনিই হচ্ছেন প্রতিটি বস্তুর প্রতিপালক! প্রত্যেক ব্যক্তিই স্বীয় কৃতকর্মের জন্যে দায়ী হবে, কোন বোঝা বহনকারীই অপর কারো বোঝা বহন করবে না, পরিশেষে তোমাদের প্রতিপালকের নিকট তোমাদের প্রত্যাবর্তন করতে হবে, তৎপর তিনি তোমরা যে বিষয়ে মতবিরোধ করেছিলে সে বিষয়ের মূল তত্ত্ব তোমাদেরকে অবহিত করবেন।

١٦٤- قُلْ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْغِيْ رَبًّا وَّهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ اِلَّا عَلَيْهَا وَ لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ○

১. এ হাদীসটি ইমাম মুহাম্মাদ (রঃ) তাঁর সহীহ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

এখানে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নবী (সঃ)-কে সম্বোধন করে বলছেনঃ হে নবী (সঃ)! মুশ্‌রিকদেরকে নির্ভেজাল ইবাদত ও আল্লাহ্‌র উপর ভরসাকরণ সম্পর্কে তুমি বলে দাও–আমি কি আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যকে স্বীয় প্রতিপালক বানিয়ে নিবো ? অথচ তিনিই তো প্রত্যেক বস্তুর প্রতিপালক্‌। সুতরাং আমি তাঁকেই আমার প্রতিপালক বানিয়ে নিবো। আমার এই প্রতিপালক একাকীই আমাকে লালন-পালন করে থাকেন, আমার রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকেন এবং আমার প্রতিটি বিষয়ে তিনি আমার তদবীরকারী। তাই আমি তিনি ছাড়া আর কারও সামনে মাথা নত করবো না। কেননা, সমস্ত সৃষ্টবস্তু ও সৃষ্টজীব তাঁরই। নির্দেশ প্রদানের হক একমাত্র তাঁরই রয়েছে। মোটকথা, এ আয়াতে ইবাদতে আন্তরিকতা ও আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করার নির্দেশ রয়েছে। যেমন এর পূর্ববর্তী আয়াতে ইবাদতে আন্তরিকতা শিক্ষা দেয়া হয়েছিল। আর কুরআন কারীমে এই বিষয়ের পারস্পরিক মিলন অধিক পরিলক্ষিত হয়। যেমন আল্লাহ পাক বলেনঃ তোমরা বল– "আমরা আপনারই ইবাদত করি এবং আপনারই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি।" অন্য জায়গায় রয়েছেঃ "তাঁরই ইবাদত কর এবং তাঁরই উপর ভরসা কর।" অন্যত্র বলেনঃ "হে নবী (সঃ)! তুমি বল–তিনি পরম দাতা ও দয়ালু, আমরা তাঁরই উপর ঈমান এনেছি এবং তাঁরই উপর ভরসা করেছি।" আর এক জায়গায় বলেনঃ "তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের প্রভু, তিনি ছাড়া অন্য কোন মা'বূদ নেই, সুতরাং তাঁকেই ভরসার কেন্দ্রস্থল বানিয়ে নাও।" এর সাথে সাদৃশ্য যুক্ত আয়াত আরও রয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "কেউ কোন দুষ্কর্ম করলে ওর পাপের ফল তাকেই ভোগ করতে হবে, কারও পাপের বোঝা অপর কেউ বহন করবে না।" এই আয়াতগুলোর মাধ্যমে এই সংবাদ দেয়া হচ্ছে যে, কিয়ামতের দিন যে শাস্তি দেয়া হবে তা নিপুণতা ও ন্যায়ের ভিত্তিতেই হবে। আমলের প্রতিফল আমলকারীই পাবে। ভাল লোককে ভাল প্রতিদান এবং মন্দ লোককে মন্দ প্রতিদান দেয়া হবে। একজনের পাপের কারণে অপরজনকে শাস্তি দেয়া হবে না। যেমন মহান আল্লাহ্‌ বলেনঃ "পাপের বোঝা বহনকারী কেউ যদি তার সেই বোঝা বহনের জন্যে কাউকে আহ্বান করে তবে সে তার ঐ বোঝা বহন করবে না। যদিও সে তার নিকটতম আত্মীয়ও হয়।" فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَّلَا هَضْمًا (২০ ঃ১১২) -এর তাফসীরে আলেমগণ বলেন যে, কোন লোককে অপর কোন লোকের পাপের বোঝা বহন করতে বলে তার প্রতি অত্যাচার করা হবে না

এবং তার পুণ্য কিছু কমিয়ে দিয়েও তার উপর যুলুম করা হবে না । আল্লাহ পাক আরও বলেনঃ "প্রত্যেককেই তার কৃতকর্মের জন্যে আবদ্ধ রাখা হবে, শাস্তি প্রাপ্তির পূর্বে তাকে ছেড়ে দেয়া হবে না, তবে এটা ডানদিক ওয়ালাদের জন্যে প্রযোজ্য নয়।" কেননা, তাদের নেক আমলের বরকত তাদের সন্তান-সন্ততি ও আত্মীয়-স্বজন পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা সূরায়ে তূরে বলেছেনঃ "যারা ঈমান এনেছে এবং যাদের সন্তান-সন্ততিও ঈমান আনয়নে তাদের সঙ্গী হয়েছে, আমি তাদের সন্তান-সন্ততিদেরকেও (মর্যাদায়) তাদের সাথে শামিল করে দিবো, আর (এই জন্যে) আমি তাদের আমলসমূহ হতে কিছুমাত্রও কম করবো না।" অর্থাৎ পূর্ববর্তীরাও পরবর্তীদের সৎ আমলের পুণ্য লাভ করবে কিন্তু তাই বলে পরবর্তীদের প্রতিদান হতে একটুও কম করা হবে না এবং জান্নাতে উচ্চ আসনে সৎ সন্তানদের নিকটে তাদের পূর্ব পুরুষদেরকেও পৌঁছিয়ে দেয়া হবে। পুত্রের পুণ্য পিতাও লাভ করে থাকে, যদিও সে সৎ আমলে পুত্রের সাথে শরীক না থাকে। এ কারণে যে পুত্রের প্রতিদান কিছু কেটে নেয়া হবে তা নয়, বরং দু'জনকেই সমান সমান বিনিময় প্রদান করা হবে। এমন কি আল্লাহ তা'আলা পুত্রদেরকেও পিতাদের আমলের বরকতের কারণে তাদের মনযিল পর্যন্ত পৌঁছিয়ে থাকেন। এটা তাঁর বিশেষ অনুগ্রহ। আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, প্রত্যেকে তার কৃতকর্মের জন্যে আবদ্ধ থাকবে। অর্থাৎ তাকে তার কৃতকর্মের কারণে পাকড়াও করা হবে। এরপর আল্লাহ পাক বলেনঃ তোমাদেরকে তোমাদের প্রভুর কাছেই ফিরে যেতে হবে। অর্থাৎ তোমরা যা করতে চাও স্বীয় জায়গায় করতে থাক, আমিও আমার জায়গায় আমার কাজ করবো। শেষ পর্যন্ত একদিন তোমাদেরকে আমার কাছে আসতেই হবে। সেই দিন আমি মুমিন ও মুশরিক সবকেই তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবহিত করবো এবং তারা দুনিয়ায় অবস্থানরত অবস্থায় পরকাল সম্পর্কে যে মতানৈক্য রাখতো, সেই দিন সবকিছুই প্রতীয়মান হয়ে পড়বে।

মহান আল্লাহ বলেনঃ "হে নবী (সঃ)! তুমি মুশরিক ও কাফিরদেরকে বলে দাও–আমাদের কার্য সম্পর্কে তোমাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না এবং তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে আমরাও জিজ্ঞাসিত হবো না। তুমি আরও বল– আমাদের প্রভু আমাদের সকলকেই একত্রিত করবেন, অতঃপর তিনি আমাদের মধ্যে হক ও ন্যায়ের সাথে ফায়সালা করবেন, তিনি হচ্ছেন সবচেয়ে উত্তম ফায়সালাকারী, সবকিছু অবহিত।"

১৬৫। আর তিনি এমন, যিনি তোমাদেরকে দুনিয়ার প্রতিনিধি করেছেন এবং তোমাদের কতককে কতকের উপর মর্যাদায় উন্নত করেছেন, উদ্দেশ্য হলো তোমাদেরকে তিনি যা কিছু দিয়েছেন, তাতে তোমাদেরকে পরীক্ষা করা, নিঃসন্দেহে তোমার প্রতিপালক ত্বড়িত শাস্তিদাতা, আর নিঃসন্দেহে তিনি ক্ষমাশীল ও কৃপানিধান।

١٦٥- وَهُوَ الَّذِيْ جَعَلَكُمْ خَلٰٓئِفَ الْاَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِيْ مَآ اٰتٰىكُمْ اِنَّ رَبَّكَ سَرِيْعُ الْعِقَابِ وَاِنَّهٗ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

ইরশাদ হচ্ছে– তোমরা একের পর এক ভূ-পৃষ্ঠে বসতি স্থাপন করে আসছিলে এবং পূর্ববর্তীদের পর পরবর্তীদের যুগ আসতে রয়েছিল। আর একে অপরের স্থলাভিষিক্ত হচ্ছিল। যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ "যদি আমি ইচ্ছা করতাম তবে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত তোমাদের সন্তানদেরকে বা অন্য কাউকেও না বানিয়ে ফেরেশতাদেরকে বানাতাম এবং তারা তোমাদের পর তোমাদের স্থান দখল করে নিতো।" আর এক জায়গায় তিনি বলেনঃ "এ যমীনকে তিনি তোমাদেরকে পর্যায়ক্রমে একের পর অপরকে প্রদান করেছেন।" অন্যত্র তিনি বলেছেনঃ "ভূ-পৃষ্ঠে আমি নিজের প্রতিনিধি বানাতে চাই।" আর এক জায়গায় বলেনঃ "এ সম্ভাবনা রয়েছে যে, সত্বরই তোমাদের প্রভু তোমাদের শত্রুকে ধ্বংস করে দিবেন এবং তোমাদেরকে তাদের স্থানে বসাবেন, অতঃপর তিনি দেখবেন যে, তাদের স্থানে তোমরা এসে কিরূপ আমল পেশ করছো।"

আল্লাহ পাক বলেনঃ তিনি কতককে কতকের উপর মর্যাদায় উন্নত করেছেন, অর্থাৎ জীবিকা, চরিত্র, সৌন্দর্য, সমতা, দৃশ্য, দৈহিক গঠন, রং ইত্যাদিতে একে অপরের অপেক্ষা কম-বেশী রয়েছে। যেমন তিনি বলেছেনঃ "আমি তাদের পার্থিব জীবনে তাদের পারস্পরিক জীবিকা বন্টন করে দিয়েছি এবং একের মর্যাদা অপরের চেয়ে উচ্চ করেছি।" কেউ আমীর, কেউ গরীব, কেউ মনিব এবং কেউ

তার চাকর। মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেনঃ "লক্ষ্য কর, আমি কিভাবে একের উপরে অপরকে প্রাধান্য ও মর্যাদা দান করেছি, তবে পার্থিব জীবনের মর্যাদার তুলনায় পারলৌকিক মর্যাদা ও প্রাধান্য বহু গুণে গুরুত্বপূর্ণ।" আর এক জায়গায় তিনি বলেনঃ "এই মর্যাদার বিভিন্নতার উদ্দেশ্য হচ্ছে, আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে চাই, ধনীকে ধন দিয়ে জিজ্ঞেস করা হবে যে, সে ধন-সম্পদের শোকরিয়া কিভাবে আদায় করেছে এবং গরীবকে জিজ্ঞেস করা হবে যে, সে স্বীয় দারিদ্রের উপর ধৈর্যধারণ করেছে কি করেনি।"

সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "দুনিয়া হচ্ছে সুমিষ্ট, শ্যামল ও সবুজ। আল্লাহ তোমাদেরকে অন্যান্যদের পরে দুনিয়া ভোগ করার সুযোগ দিয়েছেন এবং তোমাদেরকে তাদের স্থলাভিষিক্ত বানিয়েছেন। এখন তিনি দেখতে চান তোমরা কিরূপ আমল করছো। তোমরা দুনিয়াকে ভয় কর এবং নারীদেরকেও ভয় করে চল। বানী ইসরাঈলের মধ্যে প্রথম যে ফিৎনা সৃষ্টি হয়েছিল তা ছিল নারী সম্পর্কীয়ই।"[১]

আল্লাহ তা'আলার উক্তি– إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ হে মুহাম্মাদ (সঃ)! নিঃসন্দেহে তোমার প্রতিপালক ত্বড়িত শাস্তিদাতা এবং অবশ্যই তিনি ক্ষমাশীল ও দয়ালুও বটে। অর্থাৎ তোমাদের পার্থিব জীবন সত্বরই শেষ হয়ে যাবে ও তোমাদেরকে কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে। তবে তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল এবং দয়ালুও বটে।

এখানে ভয়ও প্রদর্শন করা হচ্ছে এবং উৎসাহও প্রদান করা হচ্ছে যে, তাঁর হিসাব ও শাস্তি সত্বরই এসে যাবে এবং তাঁর অবাধ্যরা ও তাঁর রাসূল (সঃ)-এর বিরোধিতাকারীরা পাকড়াও হয়ে যাবে। আর যারা তাঁকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছে, আল্লাহ তাদের অলী এবং তাদের প্রতি তিনি ক্ষমাশীল ও কৃপানিধান। কুরআন কারীমের অধিকাংশ স্থানে এ দু'টি বিশেষণ অর্থাৎ ক্ষমাশীল ও দয়ালু এক সাথে এসেছে। যেমন তিনি বলেনঃ "তেমাদের প্রভু স্বীয় বান্দাদের পাপরাশি ক্ষমা করার ব্যাপারে বড় ক্ষমাশীল, কিন্তু এর সাথে সাথে তাঁর পাকড়াও খুবই কঠিন।" আর এক জায়গায় তিনি বলেনঃ "হে নবী (সঃ)! আমার বান্দাদেরকে তুমি বলে দাও–আমি ক্ষমাশীল ও দয়ালু এবং আমার শাস্তিও বড়ই কঠিন।" উৎসাহ ও আশা প্রদান এবং ভয় প্রদর্শনের আয়াত অনেক রয়েছে। কখনও তো

১. এ হাদীসটি ইমাম মুসলিম (রঃ) আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে মারফূ'রূপে বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহ পাক জান্নাতের গুণাবলী বর্ণনা করে বান্দাদেরকে উৎসাহ ও আশা প্রদান করেন, আবার কখনও জাহান্নামের বর্ণনা দিয়ে ওর শাস্তি এবং কিয়ামতের ভয়াবহ দৃশ্য থেকে ভয় প্রদর্শন করে থাকেন। মাঝে মাঝে আবার দু'টোর বর্ণনা একই সাথে দিয়েছেন। আল্লাহ যেন আমাদেরকে তাঁর বিধানসমূহ মেনে চলার তাওফীক প্রদান করেন এবং পাপীদের দল থেকে যেন আমাদেরকে দূরে রাখেন।

আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "আল্লাহর শাস্তি যে কত কঠিন তা যদি মুমিন জানতো তবে কেউ জান্নাতের লালসা করতো না (সে বলতো-যদি জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাই তবে এটাই যথেষ্ট)। পক্ষান্তরে আল্লাহর দয়া ও রহমত যে কত ব্যাপক তা যদি কাফির জানতো তবে কেউ জান্নাত থেকে নিরাশ হতো না (অথচ জান্নাত তো কাফিরের প্রাপ্যই নয়)। আল্লাহ একশ' ভাগ রহমত রেখেছেন। এর মধ্য থেকে একটি মাত্র অংশ সারা মাখলূকাতের মধ্যে বণ্টন করে দিয়েছেন। এই এক ভাগ রহমতের কারণেই মানুষ ও জীবজন্তু একে অপরের উপর দয়া করে থাকে। আর নিরানব্বই ভাগ রহমত আল্লাহর কাছেই রয়েছে।"[১] তাঁর রহমত যে কত বেশী তা এটা থেকেই অনুমান করা যেতে পারে!

আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকেই বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছেনঃ "আল্লাহ একশ' ভাগ রহমত রেখেছেন। এর মধ্য থেকে নিরানব্বই ভাগ তিনি নিজের কাছে রেখেছেন এবং এক ভাগ যমীনে অবতীর্ণ করেছেন। এই এক ভাগ রহমতের বরকতেই সৃষ্টজীবগুলো একে অপরের উপর দয়া করে থাকে, এমন কি চতুষ্পদ জন্তুও ওর বাচ্চাকে খুরের আঘাত থেকে রক্ষা করে থাকে এই ভয়ে যে, সে কষ্ট পাবে।"[২] রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, যখন আল্লাহ মাখলূকাতকে সৃষ্টি করেন তখন আরশের উপর অবস্থিত লাওহে মাহ্ফূযে তিনি লিপিবদ্ধ করেনঃ "আমার রহমত আমার গযবের উপর জয়যুক্ত থাকবে।"

সূরাঃ আন'আম এর তাফসীর সমাপ্ত

---

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে মারফূ'রূপে তাখরীজ করেছেন।

২. এ হাদীসটি ইমাম মুসলিম (রঃ) তাঁর সহীহ্ গ্রন্থে আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে মারফূ'রূপে তাখরীজ করেছেন।

সূরাঃ আ'রাফ মাক্কী

(আয়াত ঃ ২০৬, রুকূ' ঃ ২৪)

سُوْرَةُ الْاَعْرَافِ مَكِّيَّةٌ

(اٰيَاتُهَا : ٢٠٦، رُكُوْعَاتُهَا: ٢٤)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে শুরু করছি।

١- الٓمّٓصٓ ○

১। আলিফ লাম মীম সুয়াদ।

٢- كِتٰبٌ اُنْزِلَ اِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِيْ صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنْذِرَ بِهٖ وَ ذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ○

২। (হে মুহাম্মাদ সঃ)! তোমার নিকট এ জন্যে কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে যাতে তুমি এর দ্বারা মানুষকে সতর্ক করতে পার, আর এটা মুমিনদের জন্যে উপদেশ (ভাণ্ডার), অতএব, তোমার মনে যেন এটা সম্পর্কে কোনরূপ দ্বিধা-সন্দেহ না থাকে।

٣- اِتَّبِعُوْا مَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ لَا تَتَّبِعُوْا مِنْ دُوْنِهٖۤ اَوْلِيَآءَ قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ ○

৩। (হে বনী আদম)! তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে যা অবতারিত হয়েছে, তোমরা তার অনুসরণ কর, আর তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে অন্য কাউকে বন্ধু ও অভিভাবকরূপে অনুসরণ করো না, তোমরা খুব অল্পই উপদেশ গ্রহণ করে থাক।

حُرُوْفٌ مُقَطَّعَاتٌ এবং এগুলোর অর্থ ও এগুলো সম্পর্কে যেসব মতবিরোধ রয়েছে এ সবকিছু সূরায়ে বাকারায় আলোচিত হয়েছে। الٓمّٓصٓ অর্থাৎ اَنَا اللّٰهُ اُفَصِّلُ-এর অর্থ হচ্ছে আমি আল্লাহ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে থাকি। (হে নবী সঃ!) এই কিতাব (কুরআন) তোমার প্রতি তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ করা হয়েছে। এখন এর প্রচার এবং এর দ্বারা মানুষকে ভয় প্রদর্শনের ব্যাপারে তোমার মনে যেন কোন সংকীর্ণতা না আসে এবং এমন ধৈর্য অবলম্বন

কর যেমন দুঃসাহসী ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ নবীরা অবলম্বন করেছিল। এটা অবতরণের উদ্দেশ্য এই যে, তুমি এর মাধ্যমে কাফিরদেরকে ভয় প্রদর্শন করবে। আর মুমিনদের জন্যে তো এ কুরআন উপদেশবাণী। এই মুমিনরা তো কুরআনে অবতীর্ণ বিষয়ের অনুসরণ করেছে এবং উম্মী নবী (সঃ) যে কিতাব তাদের সামনে পেশ করেছেন তার তারা পদাংক অনুসরণ করেছে। এখন একে ছেড়ে অন্যের পিছনে পড়ো না এবং আল্লাহর হুকুমের সীমা ছাড়িয়ে অপরের হুকুমের উপর চলো না। কিন্তু উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণকারীর সংখ্যা খুবই কম হয়ে থাকে। হে নবী (সঃ)! তুমি যতই বাসনা, কামনা, লোভ ও চেষ্টা কর না কেন এদের সকলকে উপদেশ ও শিক্ষা লাভ করাতে পারবে না।

আল্লাহ পাক বলেনঃ হে নবী (সঃ)! তুমি যদি সকলকেই সন্তুষ্ট রাখার চেষ্টা কর তবে এই লোকেরা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে সরিয়ে দেবে এবং তুমি বিভ্রান্ত হয়ে পড়বে। অধিকাংশ লোকেই ঈমান আনয়ন করে না, বরং মুশরিকই থেকে যায়।

٤- وَكَمْ مِّنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَا فَجَآءَهَا بَاْسُنَا بَيَاتًا اَوْ هُمْ قَآئِلُوْنَ ○

৪। আর কত জনপদকেই না আমি ধ্বংস করেছি! আমার শাস্তি তাদের উপর রাত্রিকালে ঘুমন্ত অবস্থায় অথবা দ্বিপ্রহরে যখন তারা বিশ্রামরত ছিল তখনই আপতিত হয়েছে।

٥- فَمَا كَانَ دَعْوٰىهُمْ اِذْ جَآءَهُمْ بَاْسُنَآ اِلَّآ اَنْ قَالُوْٓا اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ○

৫। আমার শাস্তি যখন তাদের কাছে এসে পড়েছিল তখন তাদের মুখে "বাস্তবিকই আমরা অত্যাচারী ছিলাম" এই কথা ছাড়া আর কিছুই ছিল না।

٦- فَلَنَسْـَٔلَنَّ الَّذِيْنَ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ وَلَنَسْـَٔلَنَّ الْمُرْسَلِيْنَ ○

৬। অতঃপর আমি (কিয়ামতের দিন) যাদের কাছে রাসূল প্রেরণ করা হয়েছিল তাদেরকে এবং রাসূলদেরকেও অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করবো।

৭। তখন আমি তাদের সমস্ত বিবরণ অকপটে প্রকাশ করে দেবো, যেহেতু আমি পূর্ণরূপে জ্ঞাত আছি, আর আমি তো কোনকালে বে-খবর ছিলাম না।

٧- فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِم بِعِلْمٍ وَّمَا كُنَّا غَائِبِينَ ۝

আল্লাহ পাক বলেনঃ রাসূলের বিরুদ্ধাচরণের কারণে আমি কত লোকালয়কেই না ধ্বংস করেছি! আর দুনিয়া ও আখিরাতের লাঞ্ছনা ও অপমান তাদের উপর চাপিয়ে দিয়েছি। যেমন তিনি বলেনঃ "(হে নবী সঃ!) তোমার পূর্বে রাসূলদেরকে উপহাস করা হয়েছিল, ফলে ঐ উপহাসের শাস্তি হিসেবে সেই উপহাসকারীদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছিল।" যেমন তিনি আর এক জায়গায় বলেনঃ "যখন আমি পাপের কারণে বহু জনপদকে ধ্বংস করে দিলাম তখন তাদের বড় বড় অট্টালিকা ও মজবুত ঘরবাড়ী ভেঙ্গে চুরমার হয়ে পড়লো এবং তাদের প্রস্রবণ ও নদী-নালা তছনছ হয়ে গেল।" অন্য জায়গায় বলেনঃ "জীবিকার প্রাচুর্যের কারণে যখন তারা অহংকারে ফেটে পড়লো তখন আমি তাদেরকে ধ্বংস করে দিলাম, তাদের বাড়ীঘর এমন হয়ে গেল যে, যেন তারা তাতে কোন দিন বসবাসই করেনি, কিন্তু অল্প কয়েকজন বেঁচে গেল, এখন তাদের উত্তরাধিকারী একমাত্র আমিই।"

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ আমার শাস্তি তাদের উপর রাত্রিকালে ঘুমন্ত অবস্থায় অথবা ভরা দ্বিপ্রহরে যখন তারা বিশ্রামরত ছিল তখনই আপতিত হয়েছে। আর এ দু'টোই হচ্ছে উদাসীন থাকার সময়। যেমন তিনি অন্যত্র বলেনঃ "ঐ লোকদের কি এই ভয় নেই যে, আমার শাস্তি রাত্রিকালে ঘুমন্ত অবস্থায় অকস্মাৎ তাদেরকে ঘিরে ফেলে অথবা অতি প্রত্যুষে তাদের উপর এসে পড়ে যখন তারা অশ্লীল ও বাজে কাজে লিপ্ত থাকে? আর নিজেদের পাপরাশির মাধ্যমে চালবাজীকারীরা এটাকে কি ভয় করে না যে, আল্লাহ সম্পূর্ণরূপে তাদেরকে ভূ-গর্ভে ধ্বসিয়ে দিতে সক্ষম অথবা এমনভাবে তাদেরকে ভীষণ শাস্তি দ্বারা গ্রেফতার করতে পারেন যা তারা কল্পনা বা ধারণাও করতে পারবে না? কিংবা তাদের সফরে তাদেরকে পাকড়াও করবেন যা তারা প্রতিরোধ করতে পারবে না?" যেমন তিনি আরও বলেনঃ "যখন তাদের উপর শাস্তি এসেই পড়ে তখন 'বাস্তবিকই আমরা অপরাধী ছিলাম' একথা বলা ছাড়া তাদের আর কিছুই বলার

থাকে না।" যেমন তিনি আর এক জায়গায় বলেনঃ "যারা সীমালংঘন করেছিল এরূপ বহু গ্রামবাসীকে আমি সমূলে ধ্বংস করে দিয়েছি।" উপরোক্ত আয়াতগুলো নবী (সঃ)-এর নিম্নের হাদীসের স্পষ্ট দলীলঃ " কোন কওমকে ধ্বংস করে দেয়া হয়নি যে পর্যন্ত না তাদের সমস্ত শাস্তি শেষ করে দেয়া হয়েছে।" আবদুল মালিককে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলঃ "এটা কিরূপ হবে?" তখন তিনি "আমার শাস্তি যখন তাদের কাছে এসেই পড়েছিল তখন তাদের মুখে–'বাস্তবিকই আমরা অত্যাচারী ছিলাম' এই কথা ছাড়া আর কিছুই ছিল না" এই আয়াতটিই পাঠ করেছিলেন।

আল্লাহ পাকের উক্তি– فَلَنَسْئَلَنَّ الَّذِيْنَ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ অর্থাৎ "যাদের কাছে রাসূল পাঠানো হয়েছিল আমি তাদেরকে অবশ্যই জিজ্ঞাসবাদ করবো।" যেমন তিনি আর এক জায়গায় বলেনঃ "রাসূলগণ যখন প্রচারের দায়িত্ব পালন করতে গিয়েছিল তখন তোমরা তাদেরকে কি উত্তর দিয়েছিলে?" আরও এক জায়গায় তিনি বলেনঃ "সেইদিন আল্লাহ রাসূলদেরকে একত্রিত করে জিজ্ঞেস করবেন– তোমাদের কওম তোমাদেরকে কি জবাব দিয়েছিল? তারা উত্তরে বলবে–আমাদের জানা নেই, আপনিই গায়েবের সংবাদ রাখেন। তখন আল্লাহ কিয়ামতের দিন ঐ লোকদেরকে জিজ্ঞেস করবেন–তোমরা রাসূলদেরকে কি জবাব দিয়েছিলে?" তাই আল্লাহ তা'আলা এখানে বলেনঃ 'আমি রাসূলদেরকেও জিজ্ঞাসাবাদ করবো।' রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল নেতা। তোমাদের সকলকেই নিজ নিজ অধীনস্থ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। বাদশাহ্ তার প্রজাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে, পুরুষ লোককে তার স্ত্রী ও ছেলে মেয়েদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে, স্ত্রীলোক জিজ্ঞাসিত হবে তার স্বামী সম্পর্কে এবং খাদেমকে জিজ্ঞেস করা হবে তার মনিবের মাল সম্পর্কে।"

মহান আল্লাহ বলেনঃ "আমি তাদের সমস্ত বিবরণ অকপটে প্রকাশ করে দেবো, যেহেতু আমি পূর্ণরূপে জ্ঞাত আছি, আর আমি তো বে-খবর ছিলাম না।" কিয়ামতের দিন তাদের আমলনামা খুলে দেয়া হবে এবং তাদের আমল পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখা হবে। আল্লাহ তা'আলা সবকিছুই দেখতে রয়েছেন। তিনি তো গোপন দৃষ্টিপাত সম্পর্কেও পূর্ণ অবগত। তিনি অন্তরের গোপন কথাও জানেন। যদি গাছের কোন পাতা পড়ে যায় বা অন্ধকারে কোন বীজ পড়ে থাকে তবে সেটাও তাঁর দৃষ্টির অন্তরালে থাকে না। স্পষ্ট কিতাবের মধ্যে কী নেই? আর্দ্রতা ও শুষ্কতা সবকিছুই তো লিপিবদ্ধ রয়েছে এতে!

৮। আর সেই (কিয়ামতের) দিন ন্যায় ও সঠিকভাবে (প্রত্যেকের আমল) ওজন করা হবে, সুতরাং যাদের (পুণ্যের) পাল্লা ভারী হবে তারাই হবে কৃতকার্য ও সফলকাম।

٨- وَ الْوَزْنُ يَوْمَئِذِنِ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ○

৯। আর যাদের (পুণ্যের) পাল্লা হাল্‌কা হবে, তারা হবে সেইসব লোক যারা নিজেদের ধ্বংস ও ক্ষতি নিজেরাই করেছে, কেননা, তারা আমার নিদর্শনসমূহকে (বাণীকে) প্রত্যাখ্যান করতো।

٩- وَ مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهُ فَاُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَظْلِمُوْنَ ○

ইরশাদ হচ্ছে যে, কিয়ামতের দিন আমলসমূহ ওজন করা হবে এটা সত্য কথা, যেন কারো উপর যুলুম না হতে পারে। যেমন এক জায়গায় বলেনঃ “কিয়ামতের দিন আমি সত্য ও ন্যায়ের দাঁড়িপাল্লা স্থাপন করবো যাতে কারো উপর বিন্দুমাত্রও যুলুম না হতে পারে। সরিষার দানা পরিমাণও যদি কোন আমল থেকে থাকে সেটাও ছুটে যাবে না। গণনার জন্যে আমিই যথেষ্ট।” অন্য জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ “আল্লাহ অণু পরিমাণও কারো উপর অত্যাচার করবেন না। যদি একটি পুণ্য হয় তবে ওকে দ্বিগুন ত্রিগুণ করে দেয়া হবে। তাঁর এই বিরাট প্রতিদান তাঁর পক্ষ থেকে পুরস্কার স্বরূপ।” আর এক জায়গায় তিনি বলেনঃ “যার (পুণ্যের) পাল্লা ভারী হবে সে তো তার বাসনানুরূপ সুখে অবস্থান করবে। আর যার (পুণ্যের) পাল্লা হাল্‌কা হবে, তার বাসস্থান হবে হাবিয়া। তোমার কি জানা আছে, ওটা কি? ওটা হচ্ছে জ্বলন্ত অগ্নি।” আর এক স্থানে তিনি বলেনঃ “যখন শিঙ্গায় ফুঁ দেয়া হবে তখন আত্মীয়তার সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে। কেউ কাউকেও কিছুই জিজ্ঞেস করবে না। যার (পুণ্যের) ওজন ভারী হবে সে তো হবে কৃতকার্য ও সফলকাম, আর যার (পুণ্যের) ওজন হালকা হবে সে বড়ই ক্ষতিগ্রস্ত ও বিফল মনোরথ হবে। আর তার বাসস্থান হবে জাহান্নাম।” দাঁড়িপাল্লায় যা ওজন করা হবে তা হচ্ছে কারো কারো মতে স্বয়ং আমল। যদিও ওর কোন আকার নেই অর্থাৎ যদিও ওটা কোন দৃশ্যমান অস্তিত্ব বিশিষ্ট পদার্থ নয়, তবুও সেই দিন আল্লাহ তা'আলা ওকে পদার্থের আকার দান করবেন। এই

বিষয়েরই হাদীস হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, সূরায়ে 'বাকারা' এবং সূরায়ে 'আলে-ইমরান' কিয়ামতের দিন দু'টি মেঘখণ্ডের আকারে সামনে আসবে। অথবা দু'টি সামিয়ানার আকারে কিংবা আকাশে ছড়িয়ে পড়া পাখীদের ঝাঁকের আকারে আসবে। সহীহ্ হাদীসে রয়েছে যে, কুরআন পাঠকের কাছে কুরআন মাজীদ একজন নবযুবকের আকারে হজির হবে। কুরআনের পাঠক তাকে জিজ্ঞেস করবেঃ 'তুমি কে?' সে উত্তরে বলবেঃ "আমি কুরআন। আমি তোমাকে রাত্রিকালে জাগিয়ে রাখতাম এবং সারাদিন রোযার হুকুম পালনার্থে পিপাসার্ত রাখতাম।" কবরের প্রশ্নের ঘটনায় রয়েছে যে, কবরে মুমিনের কাছে একজন সুগন্ধময় সুন্দর যুবক আগমন করবে। কবরবাসী তাকে জিজ্ঞেস করবেঃ 'তুমি কে?' সে বলবেঃ "আমি তোমার সৎ আমল।"

হাদীসে বেতাকার মধ্যে রয়েছে যে, একজন লোককে একটি কাগজের টুকরা দেয়া হবে এবং ওটা তারাযুর এক পাল্লায় রাখা হবে। আর অপর পাল্লায় রাখা হবে কাগজের নিরানব্বইটি দফতর। এক একটি দফতর এতো বড় হবে যে, যতদূর দৃষ্টি যায় ততদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে থাকবে। ঐ কাগজের টুকরায় لَاإِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ লিখা থাকবে। লোকটি বলবেঃ "কোথায় এই কাগজের টুকরাটি এবং কোথায় ঐ বড় বড় দফতরগুলো।" তখন আল্লাহ্ পাক তাকে বলবেনঃ "আজ কিন্তু তোমার উপর অত্যাচার করা হবে না।" রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন যে, তার পাপরাশির বড় বড় দফতরের পাল্লা হাল্‌কা হয়ে যাবে এবং ঐ কাগজখণ্ডের পাল্লা ভারী হয়ে যাবে।

আবার এ কথাও বলা হয়েছে যে, আমল বা আমলনামা ওজন করা হবে না, বরং আমলকারীকে ওজন করা হবে। যেমন হাদীসে রয়েছে যে, কিয়ামতের দিন একজন মোটা লোকটে আনয়ন করা হবে, কিন্তু সে আল্লাহর কাছে পাখীর পালকের সমানও ওজনের হবে না। অতঃপর তিনি فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَزْنًا -এই আয়াতটি পাঠ করেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর প্রশংসা করতে গিয়ে বলেনঃ "তোমরা আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর সরু সরু পা দেখে কেন বিস্ময় বোধ করছো? আল্লাহর শপথ! এটা দাঁড়িপাল্লায় ওজন করলে এর ওজন উহুদ পাহাড়ের চেয়েও বেশী হবে।" এই তিনটি বর্ণনাকে এভাবে জমা করা যেতে পারে যে, কখনো ওজন করা হবে আমল, কখনো আমলনামা এবং কখনো আমলকারীকে।

❐ ১৭

১০। আর নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে ভূ-পৃষ্ঠে থাকবার জায়গা দিয়েছি এবং আমি তোমাদের জন্যে ওতে জীবিকা নির্বাহের উপকরণগুলো সৃষ্টি করেছি, তোমরা খুব কমই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাক।

١٠- وَلَقَدْ مَكَّنّٰكُمْ فِى الْاَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيْهَا مَعَايِشَ ۭ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ۝ع

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদের উপর নিজের অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করে বলেনঃ আমি তোমাদেরকে এতো ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি দান করেছি যে, তোমরা ভূ-পৃষ্ঠে শাসন কায়েম করেছো এবং দুনিয়ায় নিজেদের মূল শক্ত করে নিয়েছো। সেখানে তোমরা নদী-নালা প্রবাহিত করেছো, ঘর ও চাকচিক্যময় অট্টালিকা বনিয়েছো এবং নিজেদের জন্যে সমুদয় উপকারী জিনিস উৎপাদন করেছো। আমি আমার বান্দাদের জন্যে মেঘমালাকে কাজে লাগিয়ে রেখেছি, উদ্দেশ্য হচ্ছে তার থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করে তাদের জন্যে ফসল উৎপন্ন করা। যমীনে আমি তাদের জীবিকা লাভের বিভিন্ন মাধ্যম রেখেছি। সেখানে তারা ব্যবসা-বাণিজ্য করছে এবং নিজেদের জন্যে নানা প্রকারের সুখের সামগ্রী তৈরী করছে। তথাপি তারা এসব নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করছে না। যেমন তিনি এক জায়গায় বলেনঃ "যদি তোমরা আমার নিয়ামতরাজি গণনা করার ইচ্ছা কর তবে সেগুলো গণনা করতে পারবে না। মানুষ বড়ই অত্যাচারী ও অকৃতজ্ঞ।" مَعَايِشُ শব্দটিকে সবাই ى -এর সাথে পড়ে থাকেন অর্থাৎ هَمْزَة-এর সাথে مَعَائِشُ পড়েন না। কিন্তু আবদুর রহমান ইবনে হরমুয্ একে هَمْزَة দিয়ে পড়েন। অধিকাংশ লোক যেভাবে পড়েন সেটাই বিশুদ্ধতম অর্থাৎ هَمْزَة দিয়ে না পড়া। কেননা, مَعَايِشُ শব্দটি مَعِيْشَةٌ-এর বহুবচন। এটা হচ্ছে مَصْدَر এবং এটা عَاشَ يَعِيْشُ مَعِيْشَةً হবে। এই مَصْدَر-এর মূল হচ্ছে মায়ইশাতুন অর্থাৎ ى - তে كَسْرَة দিয়ে। ى - তে كَسْرَة ভারী হওয়ায় كَسْرَة টি ع - এ দেয়া হয়েছে এবং এভাবে মায়ইশাতুন শব্দটি মায়ীশাতুন হয়েছে। তারপর এর একবচনকে যখন বহুবচন বানানো হলো তখন ى -এর حَرَكَتْ টি আবার তাতে ফিরে আসলো। কেননা, কাঠিন্য আর অবশিষ্ট থাকলো না। বলা হয়েছে যে, مَعَايِشُ -এর ওযন হচ্ছে مَفَاعِلُ, কেননা এই শব্দে ى টি মূলে রয়েছে। এটা مَدَائِنُ، صَحَائِفُ এবং بَصَائِرُ -এর মত নয়। এগুলো

হচ্ছে যথাক্রমে مَدِينَةٌ، صَحِيفَةٌ এবং بَصِيرَةٌ -এর বহুবচন। কেননা, ى অক্ষরটি হচ্ছে এখানে অতিরিক্ত। সুতরাং এগুলোর বহুবচন فَعَائِلُ-এর ওযনে হবে। আর এখানে هَمْزَةٌ অক্ষরটিও আসবে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

১১। আমিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, অতঃপর তোমাদেরকে রূপ দান করেছি, তারপর আমি ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দিয়েছি- তোমরা আদম (আঃ)-কে সিজদা কর, তখন ইবলীস ছাড়া সবাই সিজদা করলো, যারা সিজদা করলো সে তাদের অন্তর্ভুক্ত হলো না।

١١- وَلَقَدْ خَلَقْنٰكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنٰكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ لَمْ يَكُنْ مِّنَ السّٰجِدِيْنَ ○

এখানে আল্লাহ পাক মানব-পিতা আদম (আঃ)-এর মর্যাদা এবং তাঁর শত্রু ইবলীসের বর্ণনা দিচ্ছেন, যে ইবলীস হযরত আদম (আঃ) ও তাঁর সন্তানদের সাথে শত্রুতা রাখে। যেন মানুষ তাদের শত্রু ইবলীস থেকে বেঁচে থাকে এবং তার পথে না চলে। তাই তিনি মানব জাতিকে সম্বোধন করে বলেনঃ আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদের আকৃতি দান করেছি। তারপর আমি ফেরেশ্তাদেরকে বলেছি-আদম (আঃ)-কে সিজদা কর। আমার এ নির্দেশ পালনার্থে সবাই সিজদা করলো। আল্লাহ তা'আলা ফেরেশ্তামণ্ডলীকে বলেছিলেন-আমি মানব সৃষ্টি করবো, যাকে আমি ঠনঠনে শুষ্ক মাটি দ্বারা তৈরী করবো। সুতরাং যখন আমি ওকে তৈরী করে ওতে রূহ ফুঁকে দিলাম এবং একটা জীবন্ত দেহ তৈরী হয়ে গেল, তখন আমার এই ক্ষমতা দেখে সবাই আদম (আঃ)-এর সিজদায় পড়ে গেল। আর এর প্রয়োজনীয়তা এজন্যেই ছিল যে, যখন আল্লাহ তা'আলা আদম (আঃ)-কে নিজের হাতে মসৃন চটচটে মাটি দ্বারা তৈরী করলেন এবং তাকে একটা সোজা দেহবিশিষ্ট মানবীয় রূপ দান করলেন আর তাঁর মধ্যে রূহ ফুঁকে দিলেন, তখন তিনি ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দিলেন- 'কুন' শব্দ দ্বারা বানানো মাখলূককে নয়, বরং স্বয়ং আমার হাতে বানানো পুতুলকে সিজদা কর। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটা ছিল কুদরতে ইলাহীকে সিজদা করা এবং তাঁর শান শওকতের সম্মান করা। এই নির্দেশ দেয়া মাত্রই

সমস্ত ফেরেশ্তা নির্দেশ পালনার্থে সিজদা করলেন। কিন্তু একমাত্র ইবলীস সিজদাহ করলো না। প্রথম সূরা অর্থাৎ সূরায়ে বাকারায় এর উপর যথেষ্ট আলোচনা হয়েছে। এখন এই স্থানে আমরা যা কিছু আলোচনা করলাম তা হচ্ছে ওটাই যা ইবনে জারীর (রঃ) অবলম্বন করেছেন।

خَلَقْنٰكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنٰكُمْ-এর তাফসীরে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, প্রথমে মানুষকে পুরুষ লোকদের পৃষ্ঠদেশে সৃষ্টি করা হয়। এরপর স্ত্রী লোকদের গর্ভাশয়ে তার আকৃতি দান করা হয়। কাতাদাহ (রঃ) এবং যহ্হাক (রঃ) এই আয়াতের তাফসীরে বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে–আমি আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করেছি। তারপর তার সন্তানের আকৃতি দান করেছি। কিন্তু এতে চিন্তা ভাবনার অবকাশ রয়েছে। কেননা, এর পরেই আল্লাহ পাক বলেছেন– قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ -এটা একথাই প্রমাণ করছে যে, এর দ্বারা আদম (আঃ)-কেই বুঝানো হয়েছে। আর এখানে বহুবচনের সাথে যে বলা হয়েছে, এর কারণ এই যে, আদম (আঃ) হচ্ছেন মানব জাতির পিতা। যেমন আল্লাহ তা'আলা তো সম্বোধন করছেন নবী (সঃ)-এর যুগের বানী ইসরাঈলদেরকে। অর্থাৎ ظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَ السَّلْوٰى, (২ঃ ৫৭) অর্থাৎ 'গামাম', 'মান' ও 'সালওয়া' তো এসেছিল বর্তমান যুগের বানী ইসরাঈলের পূর্বপুরুষদের উপর। তাহলে এর দ্বারা তো ঐ লোকদেরকেই বুঝানো হয়েছে যারা হযরত মূসা (আঃ)-এর যুগে ছিল। কিন্তু বাপ-দাদাদের উপর অনুগ্রহ করাও প্রকৃতপক্ষে তাদের বংশধরদের উপরও অনুগহ করা হয়ে থাকে। তাহলে এই অনুগ্রহ যেন সন্তানদের উপরও করা হয়েছিল। এ জন্যেই كُمْ দ্বারা সম্বোধন করেছেন। তাহলে যেন اٰدَمَ শব্দ দ্বারা আদম (আঃ) এবং তাঁর সন্তানগণ সকলকেই বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ সকলকেই একত্রিত করা হয়েছে। এটা আল্লাহ পাকের নিম্নের উক্তির বিপরীতঃ لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ (২৩ঃ ১২) এখানে اِنْسَان শব্দ দ্বারা جِنْسِ اِنْسَان উদ্দেশ্য। অর্থাৎ বহুবচন উদ্দেশ্য নয়, বরং একটি আত্মা অর্থাৎ হযরত আদম (আঃ)-এর সত্তা উদ্দেশ্য, যাকে মাটি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছিল। কিন্তু তাঁর সমস্ত সন্তানকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করা হয়নি, বরং 'নুৎফা' বা বীর্য থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। এখন যে বলা হয়–'মানুষকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে' তা শুধু এই কারণে যে, মানুষের পিতা আদম (আঃ)-কে মানুষের মত বীর্য থেকে নয়, বরং মাটি দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছিল। এসব বিষয়ে আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।

১২। তিনি (আল্লাহ) তাকে (ইবলীসকে) জিজ্ঞেস করলেন— আমি যখন তোমাকে আদমের নিকট নতশির হতে আদেশ করলাম, তখন কোন বস্তু তোমাকে নতশির হতে নিবৃত্ত করলো? সে উত্তরে বললো—আমি তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ, আপনি আমাকে আগুন দ্বারা সৃষ্টি করেছেন, আর তাকে সৃষ্টি করেছেন কাদামাটি দ্বারা।

١٢- قَالَ مَا مَنَعَكَ اَلَّا تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُكَ قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِيْ مِنْ نَّارٍ وَّ خَلَقْتَهُ مِنْ طِيْنٍ ○

কোন কোন আরবী ব্যাকরণবিদের উক্তি অনুসারে مَامَنَعَكَ اَلَّا تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُكَ -এই স্থানে لَا শব্দটি অতিরিক্ত এবং একে ইনকার বা অস্বীকৃতির প্রতি গুরুত্ব আরোপের জন্যে আনা হয়েছে। যেমন কোন কবি বলেছেন— مَااِنْ رَأَيْتُ وَلَا سَمِعْتُ بِمِثْلِهٖ এখানে اِنْ-শব্দটি نَفِیْ-এর জন্যে এসেছে এবং একে مَا نَافِيَةٌ-এর উপর গুরুত্ব বুঝাবার জন্যে আনা হয়েছে। এখানে যেন اِنْ শব্দটি অতিরিক্ত। لَمْ يَكُنْ مِّنَ السّٰجِدِيْنَ। আল্লাহ পাকের এই উক্তিটি এর পূর্বেই এসেছে। ইবনে জারীর (রঃ)-এর উক্তি এই যে, مَنَعَكَ অন্য একটি فِعْل-এর অন্তর্ভুক্ত। যার অর্থ হবে— "কোন জিনিসটি তোমাকে বাধ্য করেছিল যে, তুমি সিজদা করবে না, অথচ আমার নির্দেশ বিদ্যমান ছিল?" এ উক্তিটি সবল ও উত্তম। আল্লাহ তা'আলাই এসব বিষয়ে সবচেয়ে ভাল জানেন।

ইবলীস উত্তরে বলেছিল—"আমি আদম (আঃ)-এর চেয়ে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ। আর যে শ্রেষ্ঠ সে এমন কাউকে সিজদা করতে পারে না যার উপর তার শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। সুতরাং আমার প্রতি আদম (আঃ)-এর সিজদা করার হুকুম হল কেন?" সে দলীল পেশ করেছিল যে, তাকে আগুন দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে। আর আগুন হচ্ছে মাটি হতে বেশী মর্যাদা সম্পন্ন যা দ্বারা আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করা হয়েছে। সে লক্ষ্য করেছে উপাদানের প্রতি, কিন্তু ঐ শরীফ আদম (আঃ)-এর প্রতি লক্ষ্য করেনি যাঁকে মহান আল্লাহ নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর মধ্যে স্বীয় রূহ ভরে দিয়েছেন! সে একটা বিকৃত অনুমান কায়েম করেছে যা মহান আল্লাহর প্রকাশ্য হুকুমের বিরোধী।

মোটকথা, সমস্ত ফেরেশ্তা সিজদায় পড়ে গেলেন। ইবলীস সিজদা না করার কারণে ফেরেশ্তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লো এবং আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ হতে নিরাশ হয়ে গেল। এই নৈরাশ্য প্রকৃতপক্ষে হচ্ছে তার নিজের ভুলেরই প্রতিফল এবং সে কিয়াস বা অনুমানেও ভুল করেছিল। তার দাবী ছিল এই যে, আগুন মাটি হতে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু মাটির শান হচ্ছে ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, নম্রতা এবং কাজে স্থিরতা। তা ছাড়া মাটি হচ্ছে উদ্ভিদ ও লতাপাতা জন্মিবার স্থান। আগুনের শান হচ্ছে পুড়িয়ে দেয়া, ইন্দ্রিয়াবেগ এবং দ্রুততা। ইবলীসের উপাদান তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। আর আদম (আঃ)-এর উপাদান রুজূ, অপারগতা এবং আনুগত্য স্বীকার করে তাঁর উপকার সাধন করেছিল। হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "ফেরেশতাদেরকে নূর দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে, ইবলীসকে সৃষ্টি করা হয়েছে অগ্নিশিখা দ্বারা, আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করা হয়েছে মাটি দ্বারা এবং হূরদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে যা'ফরান দ্বারা।" ইবলীস কিয়াস বা অনুমান কায়েমকারী। আর সূর্য ও চন্দ্রের ইবাদতও কিয়াসের উপর ভিত্তি করেই শুরু হয়।

১৩। আল্লাহ বললেন– এই স্থান থেকে নেমে যাও, এখানে থেকে তুমি অহংকার করবে তা হতে পারে না; সুতরাং বের হয়ে যাও, নিশ্চয়ই তুমি অধর্ম ও ইতরদের অন্তর্ভুক্ত।

১٣- قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ اَنْ تَتَكَبَّرَ فِيْهَا فَاخْرُجْ اِنَّكَ مِنَ الصّٰغِرِيْنَ ○

১৪। সে বললো–(হে আল্লাহ!) আমাকে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত (বেঁচে থাকার) অবকাশ দিন!

١٤- قَالَ اَنْظِرْنِيْ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ○

১৫। আল্লাহ বললেন–(ঠিক আছে) তোমাকে অবকাশ দেয়া হলো।

١٥- قَالَ اِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ ○

আল্লাহ পাক এখানে ইবলীসকে এমন বিষয় সম্পর্কে সম্বোধন করলেন যা অবশ্যই সংঘটিত হবে। তিনি বললেন–তুমি আমার আদেশ অমান্য করা এবং আমার আনুগত্য থেকে বের হয়ে যাওয়ার কারণে এখান থেকে বেরিয়ে যাও। তোমার অহংকার করার কোন অধিকার ছিল না।

অধিকাংশ মুফাস্সির مِنْهَا -এর هَا সর্বনামটিকে جَنَّتْ -এর দিকে ফিরিয়ে থাকেন। আবার ইবলীসের مَلَكُوتِ اَعْلٰى -তে যে মর্যাদা ছিল সেইদিকে هَا সর্বনামটির ফিরারও সম্ভাবনা রয়েছে।

মহান আল্লাহ বলেন–তুমি বেরিয়ে যাও। নিশ্চয়ই তুমি লাঞ্ছিত ও ঘৃণিত। এটা ছিল ইবলীসের হঠকারিতারই প্রতিফল। এখানে ইবলীস একটা কথা চিন্তা করলো এবং কিয়ামতের দিবস পর্যন্ত অবকাশ চাইলো। সে আরয করলোঃ হে আল্লাহ! শাস্তি প্রদানে আমাকে কিয়ামত পর্যন্ত অবকাশ দিন। আল্লাহ পাক তখন তাকে বললেন–'যাও তোমাকে অবকাশ দেয়া হলো।' এর মধ্যেও আল্লাহ তা'আলার নিপুণতা লুকায়িত ছিল এবং তাঁর ইচ্ছাই কাজ করছিল। তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করা যেতে পারে না। তাঁর হুকুমের পর আর কারো হুকুম চলতে পারে না। তিনি সত্বর হিসাব গ্রহণকারী।

১٦- قَالَ فَبِمَاۤ اَغْوَيْتَنِيْ لَاَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝

১৬। (ইবলীস) বললো–আপনি যে আমাকে পথভ্রষ্ট করলেন এ কারণে আমিও শপথ করে বলছি–আমি তাদের (বিভ্রান্ত করার) জন্যে সরল পথের (মাথায়) অবশ্যই ওঁৎ পেতে বসে থাকবো।

١٧- ثُمَّ لَاٰتِيَنَّهُمْ مِّنْۢ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَآئِلِهِمْ ۗ وَلَا تَجِدُ اَكْثَرَهُمْ شٰكِرِيْنَ ۝

১৭। অতঃপর আমি (পথভ্রষ্ট করার উদ্দেশ্যে) তাদের সম্মুখ দিয়ে, পিছন দিয়ে, ডান দিক দিয়ে এবং বাম দিক দিয়ে তাদের কাছে আসবো, আপনি তাদের অধিকাংশকেই কৃতজ্ঞরূপে পাবেন না।

যখন ইবলীস কিয়ামতের দিন পর্যন্ত অবকাশ পেয়ে গেল এবং স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো তখন সে বিদ্রোহ ও একগুঁয়েমী শুরু করে দিলো। সে বললো–"হে আল্লাহ! যেমনভাবে আপনি আমাকে পথভ্রষ্ট করে দিলেন, তেমনভাবেই আমিও আপনার বান্দাদেরকে সরল সোজা পথ থেকে বিভ্রান্ত করে দেবো।" হযরত

ইবনে আব্বাস (রাঃ) اَغْوَيْتَنِىْ-এর অনুবাদ اَضْلَلْتَنِىْ করেছেন। আর অন্যেরা اَهْلَكْتَنِىْ করেছেন। সে বললো– "আমি আদম (আঃ)-এর প্রতিশোধ তাঁর বংশধর হতে গ্রহণ করবো। কেননা, তাঁরই কারণে আমি আপনার দরবার হতে বহিষ্কৃত হয়েছি।" সিরাতে মুসতাকীম দ্বারা সত্যপথ ও মুক্তির পথ বুঝানো হয়েছে। (ইবলীস বললোঃ) "আমি আপনার বান্দাদেরকে এইভাবে পথভ্রষ্ট ও বিভ্রান্ত করবো যে, তারা আপনার ইবাদত করবে না এবং আপনার একত্ববাদ থেকে দূরে থাকবে।" কোন্ কোন আরবী ব্যাকরণবিদ বলেন যে, এখানে فَبِمَا শব্দের ب আক্ষরটি কসমের জন্যে আনা হয়েছে। যেন বলা হয়েছে–আপনার কুপথে পরিচালনার শপথ, যা আমার প্রতি করা হয়েছে।

মুজাহিদ (রঃ) 'সিরাত' اَمْرِ حَقّ বুঝিয়েছেন। আর মুহাম্মাদ ইবনে সাওকার মতে এর দ্বারা 'মক্কার পথ' বুঝানো হয়েছে। আর ইবনে জারীর (রঃ) বলেন–সঠিক কথা তো এই যে, এই শব্দটি এই সমুদয় অর্থের জন্যে 'আম' বা সাধারণ।

সীরা ইবনে আবিল ফাকা' হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলতেন, শয়তান বিভিন্ন পন্থায় বানী আদমকে পথভ্রষ্ট করে থাকে। সে ইসলামের পথের উপর এসে বসে পড়ে এবং বলে– "তুমি কি ইসলাম গ্রহণ করবে এবং স্বীয় বাপ-দাদার ধর্ম ত্যাগ করবে?" কিন্তু ঐ লোকটি শয়তানের অবাধ্য হয় এবং ইসলাম গ্রহণ করে। তারপর সে লোকটির হিজরতের পথে এসে বসে যায় এবং বলে– "তুমি স্বীয় দেশ ছেড়ে কেন হিজরত করছো? মুহাজিরের মর্যাদা একটা জানোয়ার ও ঘোড়ার চেয়ে বেশী হয় না।" কিন্তু সে তার কথা অমান্য করে ও হিজরতের পথ অবলম্বন করে। এরপর শয়তান তার জিহাদে গমন বন্ধ করার জন্যে পথে বসে পড়ে। জিহাদ জীবন দিয়েও হতে পারে এবং মালধন দিয়েও হতে পারে। সে তাকে বলে– "তুমি কি যুদ্ধ করার জন্যে বের হচ্ছো? সাবধান! তুমি নিহত হয়ে যাবে এবং তোমার স্ত্রী অন্যের সাথে বিবাহিতা হয়ে যাবে। আর তোমার মালধন লোকেরা পরস্পরের মধ্যে ভাগ বন্টন করে নেবে।" কিন্তু তবুও সে জিহাদের জন্যে বেরিয়ে পড়ে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ " যে ব্যক্তি এই কাজ করে এবং মারা যায়, তাকে জান্নাতে স্থান দেয়া আল্লাহ পাকের জন্যে অবশ্যকর্তব্য হয়ে পড়ে, হয় সে নিহতই হোক বা পথে ডুবেই মরুক অথবা পথিমধ্যে কোন জীন-জন্তু দ্বারা পদদলিতই হোক।"

শয়তান বললো–আমি বানী আদমের সামনের দিক থেকেও আসবো এবং পিছনের দিক থেকেও আসবো। অর্থাৎ পরকাল সম্পর্কে তাদের মনে সন্দেহ সৃষ্টি করে দেবো এবং দুনিয়ার আসক্তির প্রতি তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করবো। আর ডান দিক থেকেও আসবো। অর্থাৎ 'আমরে দ্বীন' তাদের উপর সন্দেহপূর্ণ করে তুলবো। তাদের বাম দিক থেকেও আসবো। অর্থাৎ পাপ ও অবাধ্যতামূলক কার্যকলাপ তাদের জন্যে যোগ্য ও গ্রহণীয় বানিয়ে দেবো।

আবার বিভিন্ন লোক এর বিভিন্ন ভাবার্থ নিয়ে থাকেন, যেগুলো প্রায় কাছাকাছি। শয়তান 'আমি উপরের দিক থেকেও আসবো' এ কথা বলেনি। কেননা, উপর থেকে তো শুধুমাত্র আল্লাহর রহমতই আসতে পারে।

সে বললোঃ "হে আল্লাহ! আপনি আপনার বান্দাদের অধিকাংশকেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী অর্থাৎ একত্ববাদীরূপে পাবেন না" এ কথাটা শয়তান স্বীয় খেয়াল ও ধারণার ভিত্তিতেই বলেছিল বটে, কিন্তু সেটা সত্যে পরিণত হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ ইবলীসের এ ধারণা ঠিকই ছিল। কেননা, মুমিনরা ছাড়া সবাই তার অনুসরণ করছে। কিন্তু মুমিনদের উপর সে তার জাল বিস্তার করতে সক্ষম হয়নি। আর আমি যে শয়তানকে এই চেষ্টা-তদবীরের ক্ষমতা দিয়েছি তার উদ্দেশ্য এই যে, কে পরকালের উপর বিশ্বাস স্থাপনকারী এবং কে সন্দেহ পোষণকারী তা যেন প্রকাশ পেয়ে যায়। আর আল্লাহ তো প্রত্যেক জিনিসেরই রক্ষক।

এ জন্যেই তো হাদীসে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, আল্লাহর কাছে শয়তান থেকে এইভাবে আশ্রয় প্রার্থনা কর– "হে আল্লাহ! কোন দিক থেকেই সে যেন আমার উপর আধিপত্য বিস্তার করতে না পারে।" যেমন রাসূলুল্লাহ (সঃ) স্বয়ং প্রার্থনায় বলতেন– "হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে ক্ষমা ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি, দ্বীনের জন্যেও দুনিয়ার জন্যেও এবং পরিবার ও ধন-সম্পদের জন্যেও। হে আল্লাহ! আমার গুনাহগুলো মাফ করে দিন, ভয় থেকে আমাকে নিরাপদে রাখুন। আর সামনের দিক থেকেও আমাকে রক্ষা করুন, পিছনের দিক থেকেও রক্ষা করুন এবং ডান দিক থেকেও আমাকে হিফাযত করুন, বাম দিক থেকেও আমাকে হিফাযত করুন এবং উপর দিক থেকেও রক্ষা করুন! আর শয়তান নীচের দিক থেকে আমার উপর প্রতারণার জাল বিস্তার করে, এ থেকে আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি!"

১৮। তিনি (আল্লাহ) বলেন– তুমি এখান থেকে দুর্গত মরদূদ ও নাজেহাল অবস্থায় বের হয়ে যাও, তাদের (বানী আদমের) মধ্যে যারা তোমার অনুসরণ করবে, নিশ্চয়ই আমি তোমাদের সকলের দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করবো।

١٨- قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَّدْحُورًا لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ ○

আল্লাহ পাক মালায়ে আ'লার প্রাসাদ হতে বের হয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিতে গিয়ে ইবলীসকে বলেনঃ তুমি লাঞ্ছিত ও বিতাড়িত অবস্থায় এখান থেকে বেরিয়ে যাও। ইবনে জারীর (রঃ) বলেন যে, مَذْءُومٌ শব্দের অর্থ হচ্ছে দোষী ও অপমানিত। দোষের স্থলে ذَمٌ শব্দ ব্যবহার করা অপেক্ষা ذَيْمٌ শব্দের ব্যবহারই বেশী অলংকারপূর্ণ। مَدْحُورٌ শব্দের অর্থ হচ্ছে বিতাড়িত ও বহিষ্কৃত। প্রকৃতপক্ষে مَذْءُومٌ ও مَذْمُومٌ - এর অর্থ একই। আর শয়তানের প্রতি আল্লাহ পাকের "যারা তোমার অনুসরণ করবে, আমি এইসব লোক দ্বারা এবং তোমার দলবল দ্বারা জাহান্নামকে পূর্ণ করব" এই উক্তি তাঁর প্রতি নিম্নের উক্তিরই অনুরূপ।

"তুমি বেরিয়ে যাও, যে লোকেরা তোমার অনুসরণ করবে, জাহান্নাম তাদের পূর্ণ প্রতিফল। যাদের উপর তোমার ক্ষমতা চলে তাদেরকে ডেকে নাও, স্বীয় সেনাবাহিনী ও সন্তানদের মাধ্যমে তাদের উপর বিজয় লাভ কর এবং মালধন ও সন্তান-সন্ততিতে তাদের শরীক হয়ে যাও। আর তাদের সাথে খুব বেশী বেশী মিথ্যা অঙ্গীকার কর। শয়তানের অঙ্গীকার তো শুধুমাত্র প্রতারিত করার জন্যেই হয়ে থাকে। কিন্তু আমার বিশিষ্ট বান্দাদের উপর কখনও তোমার ক্ষমতা চলবে না। আল্লাহ তাদের দায়িত্বভার গ্রহণ ও প্রতিনিধিত্ব করবেন।"

১৯। আর হে আদম! তুমি এবং তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস কর এবং এখানে তোমাদের মনে যা চায় তাই খাও, কিন্তু এই বৃক্ষের নিকটবর্তী হয়ো না, অন্যথায় অত্যাচারীদের মধ্যে গণ্য হয়ে পড়বে।

١٩- وَيَادَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظّٰلِمِينَ ○

২০। অতঃপর তাদের লজ্জাস্থান যা পরস্পরের কাছে গোপন রাখা হয়েছিল তা প্রকাশ করার জন্যে শয়তান তাদেরকে কুমন্ত্রণা দিলো, আর বললো– তোমাদের প্রতিপালক এই বৃক্ষের কাছে যেতে নিষেধ করেছেন এর কারণ এ ছাড়া কিছুই নয় যে, তোমরা যেন মালাইকা হয়ে না যাও অথবা (এই জান্নাতে) চিরন্তন জীবন লাভ করতে না পার।

২০- فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطٰنُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وٗرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْاٰتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهٰكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَا مَلَكَيْنِ اَوْ تَكُوْنَا مِنَ الْخٰلِدِيْنَ ○

২১। সে তাদের উভয়ের নিকট শপথ করে বললো– আমি তোমাদের হিতাকাংখীদের অন্যতম।

২১- وَقَاسَمَهُمَآ اِنِّيْ لَكُمَا لَمِنَ النّٰصِحِيْنَ ○

ইরশাদ হচ্ছে– আদম (আঃ) ও তাঁর স্ত্রী হাওয়া (আঃ)-এর জন্যে জান্নাতকে বাসস্থান বানানো হয়েছিল এবং তাঁদেরকে বলা হয়েছিল, তোমরা জান্নাতের একটি গাছের ফল ছাড়া সমস্ত গাছের ফল খেতে পার। এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা সূরায়ে বাকারায় হয়ে গেছে। এ ব্যাপার দেখে শয়তানের তাঁদের দু'জনের উপর হিংসা হলো। সুতরাং সে প্রতারণার মাধ্যমে কাজ হাসিল করার চেষ্টা করতে লাগলো যেন যে নিয়ামত ও সুন্দর পোশাক পরিচ্ছদ তাঁরা লাভ করেছেন তা থেকে তাঁদেরকে বঞ্চিত করে দেয়। এখন ইবলীস আদম (আঃ) ও হাওয়া (আঃ)-কে বললোঃ "আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে যে এই গাছের ফল খেতে নিষেধ করেছেন এর মধ্যে যৌক্তিকতা এই রয়েছে যে, তোমরা যেন মালাইকা হয়ে না যাও এবং এখানে চিরকাল বসবাস করার অধিকারী হয়ে না পড়। সুতরাং যদি তোমরা এই গাছের ফল খেয়ে নাও তবে তোমরা এই সুযোগ লাভ করতে পারবে।" যেমন সে বলেছিলঃ "হে আদম (আঃ)! আমি কি তোমাকে এমন গাছের কথা ও এমন ভূ-সম্পত্তির কথা বলে দেবো যা কখনো ধ্বংস হবে না?" যেমন আল্লাহ পাক বলেছেনঃ "আল্লাহ তোমাদেরকে এ কথা খোলাখুলিভাবে এ জন্যে বুঝাতে রয়েছেন যে, যেন তোমরা পথভ্রষ্ট না হয়ে পড়।" এখানে اَنْ تَضِلُّوْا

-এর অর্থ হচ্ছে اَنْ لَّا تَضِلُّوْا অর্থাৎ যেন তোমরা পথভ্রষ্ট না হও। (৪ঃ ১৭৬) আর এক জায়গায় তিনি বলেছেনঃ "তিনি যমীনে পাহাড়ের পেরেক মেরে দিয়েছেন যেন তা হেলা দোলা ও টলমল না করে।" এখানেও اَنْ تَمِيْدَبِكُمْ -এর ভাবার্থ হচ্ছে اَنْ لَّاتَمِيْدَبِكُمْ অর্থাৎ যেন যমীন তোমাদেরকে নিয়ে টলমল না করে। (১৬ঃ ১৫)

ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও ইয়াহইয়া ইবনে আবী কাসীর (রঃ) 'মালাকাইনে' শব্দটিকে 'মালিকাইনে' অর্থাৎ كَسْرَة দিয়ে পড়তেন। কিন্তু জমহূর উলামা فَتْحَة দিয়ে পড়ে থাকেন।

وَقَاسَمَهُمَا অর্থাৎ ইবলীস হযরত আদম (আঃ) ও হযরত হাওয়া (আঃ)-এর সামনে আল্লাহর নামে শপথ করে বললোঃ "আমি তোমাদের শুভাকাংখী। তোমাদের পূর্বে আমি এখানে অবস্থান করতাম এবং আমি এই জান্নাতের জায়গাগুলোর সঙ্গে সম্যক পরিচিত।" قَاسَمَ ক্রিয়া পদটির بَابْ হচ্ছে مُفَاعَلَة এবং بَاب مُفَاعَلَة-এর একটি خَاصِيَّتْ হচ্ছে شِرْكَتْ বা মিলন। কিন্তু কোন কোন সময় একমুখীই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। অর্থাৎ আদম (আঃ) ও ইবলীস দু'জনে নয়; বরং শুধুমাত্র ইবলীসই শপথ করেছিল। শেষ পর্যন্ত সে প্রতারণায় সফলকাম হয়েছিল। আর আল্লাহর নাম নিয়ে মুমিনকে প্রতারিত করা যেতে পারে। কোন কোন পণ্ডিত ব্যক্তি বলেনঃ "যে আমাকে আল্লাহর নাম নিয়ে প্রতারণা করেছে, আমি সদা-সর্বদা তার কছে প্রতারিত হয়েছি। তাহলে আদম (আঃ) প্রতারিত হবেন না কেন?"

২২। অতঃপর সে (শয়তান) তাদের উভয়কে বিভ্রান্ত করলো, যখন তারা সেই নিষিদ্ধ গাছের ফলের স্বাদ গ্রহণ করলো, তখন তাদের লজ্জাস্থান তাদের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়লো এবং বাগানের বৃক্ষপত্র দ্বারা নিজেদেরকে আবৃত করতে লাগলো, এই সময় তাদের প্রতিপালক তাদেরকে সম্বোধন করে

۲۲- فَدَلّٰهُمَا بِغُرُوْرٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْاٰتُهُمَا وَ طَفِقَا يَخْصِفٰنِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ وَ نَادٰىهُمَا رَبُّهُمَآ اَلَمْ اَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا

الشَّجَرَةِ وَاَقُلْ لَّكُمَآ اِنَّ الشَّيْطٰنَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ○

বললেন-আমি কি এই বৃক্ষ সম্পর্কে তোমাদেরকে বিষেধ করিনি? আর শয়তান যে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু তা কি আমি তোমাদেরকে বলিনি?

٢٣- قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَآ اَنْفُسَنَا سكتة وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ○

২৩। তখন তারা বললো- হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা নিজেদের প্রতি অন্যায় করেছি, আপনি যদি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন এবং দয়া না করেন, তবে আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়বো।

হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) বলেন যে, হযরত আদম (আঃ) খেজুরবৃক্ষের ন্যায় দীর্ঘাকৃতির লোক ছিলেন। তাঁর মাথার চুল ছিল ঘন ও লম্বা । যখন তিনি ভুল করে বসলেন তখন তাঁর দেহাবরণ খুলে গেল। এর পূর্বে তিনি স্বীয় গুপ্তাঙ্গের প্রতি লক্ষ্য করতেন না। এখন তিনি ব্যাকুল হয়ে জান্নাতের মধ্যে এদিক ওদিক ফিরতে লাগলেন। জান্নাতের এক গাছের সঙ্গে তাঁর মাথার চুল জড়িয়ে পড়লো। তিনি বলতে লাগলেনঃ হে গাছ! আমাকে ছেড়ে দাও! গাছ বলে উঠলোঃ "আমি আপনাকে ছাড়বো না।" তখন মহামহিমান্বিত আল্লাহ তাঁকে ডাক দিয়ে বললেনঃ "তুমি কি আমার নিকট থেকে পালিয়ে যাচ্ছ?" আদম (আঃ) উত্তরে বললেনঃ "হে আমার প্রভু! আমি আপনার কাছে লজ্জা বোধ করছি। কেননা, আমার দেহাবরণ খুলে গেছে।"

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, আদম (আঃ)-কে যে গাছের ফল খেতে নিষেধ করা হয়েছিল তা ছিল গমের শীষ। যখন আদম (আঃ) ও হাওয়া (আঃ) ওটা খেয়ে ফেলেন তখন তাঁদের গুপ্তাঙ্গ প্রকাশিত হয়ে পড়ে। এখন তাঁরা গাছের পাতা দ্বারা দেহ আবৃত করতে থাকেন এবং একটিকে অপরটির সাথে জোড়া দিয়ে শরীরের উপর লাগাতে থাকেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁদের সম্বোধন করে বলেনঃ "হে আদম (আঃ)! আমি তোমাদেরকে জান্নাত দান করেছিলাম এবং তথাকার সব জিনিসই তোমাদের জন্যে বৈধ করে দিয়েছিলাম। একমাত্র একটি গাছ তোমাদের জন্যে অবৈধ করেছিলাম এবং ওর ফল খেতে নিষেধ

করেছিলাম, এটা কি সত্য নয়?” আদম (আঃ) উত্তরে বলেনঃ “হে আমার প্রতিপালক! হ্যাঁ এটা সত্য বটে, তবে আপনার মর্যাদার শপথ! আমার এটা ধারণাও ছিল না যে, আপনার নামে কসম খেয়ে কেউ মিথ্যা কথা বলতে পারে!” যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ

وَقَاسَمَهُمَآ اِنِّيْ لَكُمَا لَمِنَ النّٰصِحِيْنَ -

অর্থাৎ “আমি কসম খেয়ে বলছি যে আমি তোমাদের শুভাকাংখী।” (৭ঃ ২১) এরপর আল্লাহ তা'আলা আদম (আঃ)-কে বলেনঃ “ আমিও স্বীয় মর্যাদার শপথ করে বলছি যে, আমি তোমাদেরকে যমীনে পাঠিয়ে দেবো। সেখানে তোমাদেরকে পরিশ্রম করতে হবে ও বিপদ আপদে পড়তে হবে এবং সেখানে তোমরা কোন শান্তি পাবে না।” অতঃপর আল্লাহ পাক বলেনঃ “তোমরা জান্নাত থেকে বেরিয়ে নীচে নেমে যাও। জান্নাতে তোমরা সর্বপ্রকারের নিয়ামত ভোগ করছিলে, কিন্তু এখন খাদ্য ও পানীয়ের কোন সুস্বাদু নিয়ামত তোমরা প্রাপ্ত হবে না।” মহান আল্লাহ দুনিয়ায় আদম (আঃ)-এর লোহার উপকারিতা সম্পর্কে শিক্ষা দান করলেন এবং তাঁকে কৃষিকার্য শিক্ষা দিলেন। হযরত আদম (আঃ) কৃষিকার্য শুরু করে দিলেন। ক্ষেতে পানি সেচন করলেন। শস্য পেকে উঠলে তিনি তা কেটে নিলেন এবং ওটা মাড়াই করে দানা বের করলেন। তারপর তা পেষণ করলেন এবং ওটা ঠাসলেন। এরপর রুটি পাকিয়ে তা খেয়ে নিলেন। যে কষ্ট তাদের ভাগ্যে লিখা ছিল তা আল্লাহ পাকের ইচ্ছা অনুযায়ীই লিখিত হয়েছিল।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আদম (আঃ) জান্নাতের ডুমুরের পাতাকে পোশাকের আকারে দেহে জড়িয়েছিলেন। অহাব ইবনে মুনাব্বাহ্ বলেন যে, হযরত আদম (আঃ) ও হযরত হাওয়া (আঃ)-এর নূরানী পোশাক ছিল, ফলে একে অপরকে উলঙ্গরূপে দেখতে পেতেন না। যখন তাঁদের উলঙ্গরূপ প্রকাশ পেয়ে গেল তখন তা আবৃত করার খেয়াল তাঁদের অন্তরে প্রকৃতিগতভাবে জেগে উঠলো। হযরত কাতাদা (রঃ) বলেন যে, হযরত আদম (আঃ) বলেছিলেন—“হে আমার প্রতিপালক! আমার তাওবা ও ক্ষমাপ্রার্থনা করার কোন উপায় আছে কি?” উত্তরে আল্লাহ পাক বলেনঃ ‘হ্যাঁ, আছে। ঐ অবস্থায় আমি তোমাদেরকে পুনরায় জান্নাতে প্রবিষ্ট করবো।’ কিন্তু ইবলীস তাওবার অনুমতি চাওয়ার পরিবর্তে কিয়ামত পর্যন্ত বেঁচে থাকার অনুমতি চাইলো। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে দু'জনকেই তাদের প্রার্থিত জিনিস দান করা হলো।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, যখন হযরত আদম (আঃ) গম খেয়ে নিলেন তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁকে বললেনঃ "আমি তোমাকে এ গাছ থেকে নিষেধ করা সত্ত্বেও তুমি এর ফল খেলে কেন?" তখন তিনি জবাবে বললেনঃ "হাওয়া আমাকে এটা খাওয়ার পরামর্শ দিয়েছিল।" আল্লাহ পাক তখন বললেনঃ "আমি হাওয়াকে এ শাস্তি দিলাম যে, গর্ভবতী থাকা অবস্থায় সে ব্যথা ও কষ্ট পাবে এবং সন্তান প্রসবের সময়ও তাকে কষ্ট দেয়া হবে।" এ কথা শুনে হযরত হাওয়া (আঃ) কাঁদতে লাগলেন। আল্লাহ তা'আলা আরও বললেনঃ "যখন তুমি সন্তান প্রসব করবে তখন তুমি ও তোমার সন্তান উভয়েই কাঁদবে।" হযরত আদম (আঃ) তাঁর প্রতিপালকের নিকট থেকে ক্ষমা চাওয়ার জন্যে যে কথাগুলো শিখেছিলেন তা হচ্ছে নিম্নরূপঃ

رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْلَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ـ

অর্থাৎ " হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা নিজেদের প্রতি অন্যায় করেছি, আপনি যদি আমাদের ক্ষমা না করেন, তবে আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়বো।"

২৪। তিনি (আল্লাহ) বললেন- তোমরা একে অন্যের শত্রুরূপে এখান থেকে নেমে যাও, তোমাদের জন্যে পৃথিবীতে কিছুকালের জন্যে বসবাস করা এবং তথায় জীবন ধারণের উপযোগী সামগ্রীর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

٢٤- قَالَ اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِى الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَّمَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ ○

২৫। তিনি আরও বললেন- সেই পৃথিবীতেই তোমরা জীবন যাপন করবে, সেখানেই তোমাদের মৃত্যু সংঘটিত হবে এবং তথা হতেই তোমাদেরকে বের করা হবে।

٢٥- قَالَ فِيْهَا تَحْيَوْنَ وَفِيْهَا تَمُوْتُوْنَ وَمِنْهَا تُخْرَجُوْنَ ○ ع

জান্নাত হতে নীচে নেমে যাওয়ার এ সম্বোধন আদম (আঃ), হাওয়া (আঃ) ও ইবলীসকে করা হচ্ছে। আবার কেউ কেউ সাপকেও এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

কেননা সাপই আদম (আঃ) ও ইবলীসের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এ জন্যেই সূরায়ে তা'হায় আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ “তোমরা সবাই নেমে যাও।” হাওয়া (আঃ) তো আদম (আঃ)-এর বাধ্যই ছিলেন। আর সাপকেও যদি এদের অন্তর্ভুক্ত মনে করা হয় তবে সে ছিল ইবলীসের অনুগত। মুফাস্‌সিরগণ ঐ স্থানগুলোর উল্লেখ করেছেন যেগুলোতে তারা নিক্ষিপ্ত হয়েছিল। এসব খবর ইসরাঈলিয়াত হতে নেয়া হয়েছে। এগুলোর সত্যাসত্য সম্পর্কে একমাত্র আল্লাহই অবহিত রয়েছেন। যেসব স্থানে তারা পতিত হয়েছিল সেগুলোর নির্দিষ্ট করণে যদি কোন উপকারিতা থাকতো তবে অবশ্যই আল্লাহ পাক সেগুলো উল্লেখ করতেন অথবা হাদীসে কোন জায়গায় বর্ণিত হতো। ইরশাদ হচ্ছে- পৃথিবীই তোমাদের বাসস্থান হবে এবং মৃত্যু পর্যন্ত সেখানেই তোমাদের জীবন ধারণের উপযোগী সামগ্রীর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এটা ভাগ্যেও লিখা ছিল এবং লাওহে মাহ্‌ফূযেও তা লিপিবদ্ধ ছিল।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, مُسْتَقَرٌّ শব্দ দ্বারা কবর অথবা পৃথিবীর উপরিভাগ ও তলদেশ বুঝানো হয়েছে।

ঘোষিত হচ্ছে- এখন তোমাদেরকে পৃথিবীতেই জীবন-যাপন করতে হবে, সেখানেই তোমরা মৃত্যুবরণ করবে এবং সেখান থেকেই পুনরায় উত্থিত হবে। যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেনঃ

مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى

অর্থাৎ “আমি তোমাদেরকে মাটি দ্বারাই সৃষ্টি করেছি, মাটিতেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেবো এবং পুনরায় তোমাদেরকে মাটি থেকেই বের করবো।” (২০ঃ৫৫) আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, আদম (আঃ)-এর জীবন পর্যন্ত পৃথিবীকে বাসস্থান বানানো হয়েছে। জীবিতাবস্থায় সে এখানেই থাকবে, এখানেই মৃত্যুবরণ করবে, এখানেই তার কবর হবে এবং কিয়ামতের দিন তাকে এখান থেকেই উঠানো হবে। অতঃপর স্বীয় আমলের হিসাব দিতে হবে।

২৬। হে বানী আদম! আমি তোমাদের লজ্জাস্থান আবৃত করার ও বেশভূষার জন্যে তোমাদের পোশাক পরিচ্ছদের উপকরণ অবতীর্ণ করেছি, (বেশভূষার তুলনায়)	٢٦- يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَٰرِي سَوْءَٰتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ

আল্লাহ-ভীতির পরিচ্ছদই সর্বোত্তম পরিচ্ছদ, এটা আল্লাহর নিদর্শন সমূহের অন্যতন নিদর্শন, সম্ভবতঃ মানুষ এটা হতে উপদেশ গ্রহণ করবে।	التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ○

আল্লাহ্ পাক বান্দাদের উপর স্বীয় অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করে বলেনঃ আমি তোমাদেরকে পোশাকে ভূষিত করেছি। পোশাক পরিচ্ছদ তো দেহ ও গুপ্তস্থান আবৃত করার কাজে লেগে থাকে। আর رِيْشٌ হচ্ছে ঐ পোশাক যা সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্যে পরিধান করা হয়। প্রথমটা প্রয়োজনীয়তার অন্তর্ভুক্ত এবং দ্বিতীয়টা পরিপূর্ণতা ও অতিরিক্ততার অন্তর্ভুক্ত। ইবনে জারীর (রঃ) বলেন যে, আরবী ভাষায় বাড়ীর আসবাবপত্র ও প্রয়োজনের অতিরিক্ত পোশাককে رِيْشٌ বলা হয়ে থাকে। ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর অর্থ নিয়েছেন মালধন ও বিলাসিতা। আবূ উমামা (রঃ) যখন কোন নতুন কাপড় কণ্ঠ পর্যন্ত পরিধান করতেন তখন তিনি বলতেন– "আমি ঐ আল্লাহর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি যিনি আমাকে পোশাক পরিয়েছেন, যার দ্বারা আমি জরুরী ভিত্তিতে স্বীয় দেহ আবৃত করছি এবং সাথে সাথে নিজের সৌন্দর্যও বৃদ্ধি করছি।" রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন নতুন কাপড় পরিধান করে তা গলা পর্যন্ত জড়িয়ে নেয়ার পর বলে– "সেই আল্লাহর সমস্ত প্রশংসা যিনি আমাকে পোশাক পরালেন, যা দ্বারা আমি আমার অনাবৃত দেহ আবৃত করলাম এবং যা আমার জীবদ্দশায় আমার সৌন্দর্য বৃদ্ধির কারণ।" অতঃপর সে তার খুলে ফেলা কাপড় কোন গরীব দুঃখীকে দান করে দেয়, সে আল্লাহর দায়িত্বে এসে যায়, এটা জীবদ্দশাতেও এবং মৃত্যুর পরেও। হযরত আলী (রাঃ) একটি ছেলের কাছ থেকে তিন দিরহামের বিনিময়ে একটি জামা খরিদ করেছিলেন এবং হাতের কব্জি হতে পায়ের গিঁঠ পর্যন্ত ওটা পরিধান করে বলেছিলেনঃ " সেই আল্লাহর সমস্ত প্রশংসা যিনি আমাকে رِيْشٌ দ্বারা সৌন্দর্য মণ্ডিত করলেন এবং তা দ্বারা আমি আমার দেহের গুপ্তাংশকে আবৃত করলাম।" তখন তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলোঃ "এটা আপনি নিজের পক্ষ থেকেই বললেন, না রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর মুখ থেকে শুনেছেন?" উত্তরে তিনি বললেনঃ "রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর মুখে আমি এটা শুনেছি।"

ইরশাদ হচ্ছে– 'তাকওয়ার পোশাকই হচ্ছে সর্বোত্তম পোশাক।' কেউ কেউ لِبَاسٌ শব্দটিকে نَصَبْ দিয়ে পড়েছেন। আবার কেউ কেউ একে مُبْتَدَاءْ হিসেবে رَفَعْ

দিয়ে পড়েছেন। ذٰلِكَ خَيْرٌ হচ্ছে এর خَبَر বা বিধেয়। মুফাসসিরদের মধ্যে لِبَاسٌ শব্দের অর্থ নিয়েও মতানৈক্য রয়েছে। ইকরামা (রঃ) বলেন যে, এর দ্বারা ঐ পোশাক বুঝানো হয়েছে যা কিয়ামতের দিন মুত্তাকীদেরকে পরানো হবে। ইবনে জুরাইজ (রঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে 'ঈমান'। উরওরা (রঃ) لِبَاسُ التَّقْوٰى দ্বারা 'আল্লাহর ভয়' অর্থ নিয়েছেন। এসবের অর্থ প্রায় কাছাকাছিই। এটা নিম্নের হাদীসের সহায়কঃ

হযরত উসমান ইবনে আফফান (রাঃ) একদা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর মিম্বরের উপর উঠলেন। সেই সময় তিনি এমন একটি জামা পরিহিত ছিলেন যার বুতামগুলো খোলা ছিল। তিনি কুকুরগুলোকে মেরে ফেলার নির্দেশ দিচ্ছিলেন এবং কবুতরবাজি থেকে বিরত রাখছিলেন। তিনি বলছিলেনঃ হে লোক সকল! গোপনে গোপনে কাজ করা থেকে বেঁচে থাক। কেননা রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, "আল্লাহর শপথ! কেউ যদি লুকিয়ে চুকিয়ে কোন কাজ করে তবে আল্লাহ সেই কাজকে প্রকাশ করে দেবেন। সেই কাজ যদি ভাল হয় তবে তো সুনাম হবে, আর মন্দ হলে দুর্ণাম হবে।" অতঃপর তিনি উপরে বর্ণিত আয়াতটিই পাঠ করেন।

২৭। হে আদম সন্তানগণ! শয়তান যেন তোমাদেরকে সেইরূপ ফিৎনায় জড়িয়ে ফেলতে না পারে যেইরূপ তোমাদের পিতা-মাতাকে (ফিৎনায় জড়িয়ে ফেলে) জান্নাত হতে বহিষ্কৃত করেছিল এবং তাদেরকে তাদের লজ্জাস্থান দেখাবার জন্যে বিবস্ত্র করেছিল, সে নিজে এবং তার দল তোমাদেরকে এমনভাবে দেখতে পায় যে, তোমরা তাদেরকে দেখতে পাও না, নিঃসন্দেহে শয়তানকে আমি বেঈমান লোকদের বন্ধু ও অভিভাবক বানিয়ে দিয়েছি।

٢٧- يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطٰنُ كَمَآ اَخْرَجَ اَبَوَيْكُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْاٰتِهِمَا ۗ اِنَّهٗ يَرٰىكُمْ هُوَ وَقَبِيْلُهٗ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ ۗ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيٰطِيْنَ اَوْلِيَآءَ لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ ○

আল্লাহ তা'আলা এখানে আদম সন্তানদেরকে ইবলীস ও তার সন্তানদের থেকে ভয় প্রদর্শন করে বলছেন– মানব-পিতা আদম (আঃ)-এর প্রতি ইবলীসের পুরাতন শত্রুতা রয়েছে। এ কারণেই সে তাঁকে সুখময় স্থান জান্নাত থেকে বের করিয়ে কষ্টের জায়গা নশ্বর জগতে বসতি স্থাপন করিয়েছে। আদম (আঃ) ও হাওয়া (আঃ)-এর আবৃত দেহ অনাবৃত হয়ে পড়ে। এসব ছিল তাঁর প্রতি চরম শত্রুতারই পরিচায়ক। যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ

أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ ۚ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا-

অর্থাৎ "তোমরা কি আমাকে ছেড়ে ইবলীস ও তার সন্তানদেরকে নিজেদের বন্ধু বানিয়ে নিচ্ছ? অথচ তারা তো তোমাদের শত্রু! অত্যাচারীদের জন্যে জঘন্য প্রতিদান রয়েছে।"(১৮ঃ ৫০)

২৮। যখন তারা কোন লজ্জাকর ও অশ্লীল আচরণ করে, তখন তারা বলে– আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে এসব কাজ করতে পেয়েছি এবং আল্লাহও আমাদেরকে এটা করতে নির্দেশ দিয়েছেন, হে মুহাম্মাদ (সঃ)! তুমি ঘোষণা করে দাও যে, আল্লাহ অশ্লীল ও লজ্জাকর আচরণের নির্দেশ দেন না, তোমরা কি আল্লাহ সম্পর্কে এমনসব কথা বলছো যে বিষয়ে তোমাদের কোন জ্ঞান নেই?

٢٨- وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا ۗ قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ ۖ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ○

২৯। তুমি ঘোষণা করে দাও– আমার প্রতিপালক ন্যায় প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দিয়েছেন এবং (আরও নির্দেশ দিয়েছেন যে,) তোমরা প্রত্যেক নামাযের সময় তোমাদের মুখমণ্ডলকে স্থির রাখ

٢٩- قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ ۖ قف وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ

مُخۡلِصِيۡنَ لَهُ الدِّيۡنَ كَمَا بَدَاَكُمۡ تَعُوۡدُوۡنَ ○

ও তাঁরই আনুগত্যে বিশুদ্ধ মনে একনিষ্ঠভাবে তাঁকেই ডাক, তোমাদেরকে প্রথমে যেভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে, তোমরা তেমনিভাবে ফিরে আসবে।

٣٠- فَرِيۡقًا هَدٰى وَ فَرِيۡقًا حَقَّ عَلَيۡهِمُ الضَّلٰلَةُ اِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيٰطِيۡنَ اَوۡلِيَآءَ مِنۡ دُوۡنِ اللّٰهِ وَ يَحۡسَبُوۡنَ اَنَّهُمۡ مُّهۡتَدُوۡنَ ○

৩০। এক দলকে আল্লাহ সৎপথে পরিচালিত করেছেন এবং অপর দলের জন্যে সংগত কারণেই ভ্রান্তি নির্ধারিত হয়েছে, তারা আল্লাহকে ছেড়ে শয়তানকে অভিভাবক ও বন্ধু বানিয়েছিল এবং নিজেদেরকে সৎপথগামী মনে করতো।

আরবের মুশরিকরা উলঙ্গ হয়ে কা'বার তাওয়াফ করতো এবং বলতোঃ "জন্মের সময় আমরা যেমন ছিলাম তেমনভাবেই আমরা তাওয়াফ করবো।" স্ত্রীলোকেরা কাপড়ের পরিবর্তে চামড়ার কোন ছোট অংশ বা অন্য কোন বস্তু লজ্জাস্থানে বেঁধে নিতো এবং দেহের অবশিষ্ট অংশগুলো উলঙ্গই থাকতো। তাদেরকে বলা হতো– আজ দেহের কিছু অংশ অথবা সম্পূর্ণ অংশ খোলা রাখা হবে। কিন্তু যে অংশই খোলা থাকবে তা কারো জন্যে হালাল নয়। তখন আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত অবতীর্ণ করেনঃ "এই লোকগুলো যখন কোন লজ্জাজনক কাজ করে তখন বলে–আমরা আমাদের বাপ-দাদাদেরকে এরূপই করতে দেখেছি এবং আল্লাহর নির্দেশ এটাই।" কুরাইশরা ছাড়া সারা আরববাসী তাদের দিন ও রাত্রির পোশাক পরিধান করে তাওয়াফ করতো না এবং এর কারণ বর্ণনা করতো যে, যে কাপড় পরিধান করে তারা পাপ কাজ করেছে, সে কাপড় পরে কি করে তারা তাওয়াফ করতে পারে? কিন্তু কুরাইশ গোত্র কাপড় পরেই কা'বাঘর প্রদক্ষিণ করতো। স্ত্রীলোকেরাও প্রায় উলঙ্গ হয়েই তাওয়াফ করতো এবং তারা তাওয়াফ করতো রাত্রে। এগুলো তারা নিজেদের পক্ষ থেকেই আবিষ্কার করে নিয়েছিল এবং পূর্বপুরুষদের অনুসরণ করছিল। তাদের বিশ্বাস ছিল এই যে, তাদের পূর্বপুরুষদের এই কাজগুলো আল্লাহ তা'আলার হুকুমের ভিত্তিতেই ছিল। তাই মহান আল্লাহ তাদের এ দাবী খণ্ডন করে বলেনঃ হে মুহাম্মাদ (সঃ)!

তাদেরকে বলে দাও– তোমরা যে বেহায়াপনা, অশ্লীল ও অশোভনীয় কাজে লিপ্ত রয়েছো, আল্লাহ এ ধরনের কাজের কখনও হুকুম দেন না। তোমরা এমন বিষয়ে আল্লাহকে সম্বন্ধযুক্ত করছো যে বিষয়ে তোমাদের কোনই জ্ঞান নেই। হে নবী (সঃ)! তুমি ঘোষণা করে দাও– আমার প্রভু ন্যায় প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দিয়ে থাকেন এবং তিনি এই নির্দেশও দেন যে, তোমরা তাঁর ইবাদতের সময় তোমাদের মুখমণ্ডলকে স্থির রাখবে। এতেই রয়েছে রাসূলদের আনুগত্য, যারা আল্লাহর শরীয়ত পেশ করেছেন এবং মু'জিযা প্রদর্শন করে জোর দিয়ে বলেছেনঃ "এখন মনের বিশুদ্ধতা আনয়ন কর এবং যে পর্যন্ত এ দু'টো অর্থাৎ শরীয়তের অনুসরণ ও ইবাদতে বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ না হবে সে পর্যন্ত তোমাদের ইবাদত গৃহীত হবে না।"

আল্লাহ তা'আলার كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُوْدُوْنَ ـ فَرِيْقًا هَدٰى وَفَرِيْقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلٰلَةُ-এই উক্তির অর্থের ব্যাপারে মুফাস্‌সিরদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। অর্থাৎ মৃত্যুর পরে তিনি পুনর্জীবিত করবেন। তিনি দুনিয়ায় সৃষ্টি করেছেন এবং পরকালে উঠাবেন। যখন তোমরা কিছুই ছিলে না তখন তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমরা মরে যাবে, এরপর তোমাদেরকে তিনি পুনর্জীবিত করবেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ (সঃ) ওয়ায ও নসীহত করার জন্যে দাঁড়ালেন এবং জনগণকে সম্বোধন করে বললেনঃ "হে লোক সকল! তোমরা (কিয়ামতের দিন) উলঙ্গ ও খৎনা না করা অবস্থায় উত্থিত হবে। কেননা, তোমরা জন্মগ্রহণের সময় এই রূপই ছিলে। এটা আমাদের উপর ফরয। যদি আমাদেরকে করতে হয় তবে এটাই করবো।" মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে– মুসলমানকে মুসলমান অবস্থায় এবং কাফিরকে কাফির অবস্থায় উঠানো হবে। আবুল আলিয়া (রঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে – আল্লাহর ইল্‌ম্ অনুযায়ী কিংবা যেরূপ তোমাদের আমল ছিল সে অনুযায়ী তোমরা উত্থিত হবে। মুহাম্মাদ ইবনে কা'ব (রঃ)-এর ধারণায় এর অর্থ হচ্ছে– যদি কারো জন্ম হয় দুর্ভাগ্যের উপর তবে তাকে দুর্ভাগা অবস্থায় এবং যদি সৌভাগ্যের উপর তার জন্ম হয়ে থাকে তবে ভাগ্যবান অবস্থায় সে উত্থিত হবে। যেমন হযরত মূসা (আঃ)-এর আমলের যাদুকরগণ সারা জীবন ধরে পাপিষ্ঠদের আমল করতে রয়েছিল, কিন্তু মানবের সৃষ্টি সৌভাগ্যের ভিত্তির উপর হয়েছিল বলেই ঐ ভিত্তির উপরই তার উত্থান হবে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা কাউকে মুমিন করে এবং কাউকে কাফির করে সৃষ্টি করেছেন। যেমন তিনি বলেছেন–

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَّمِنْكُمْ مُّؤْمِنٌ

অর্থাৎ "তিনিই আল্লাহ যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ কাফির এবং কেউ মুমিন।" (৬৪ঃ ২)

"যেভাবে তোমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে তেমনিভাবে তোমরা ফিরে আসবে।" আল্লাহ পাকের এই উক্তিরই সহায়ক হচ্ছে হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণিত সহীহ বুখারীর নিম্নের হাদীসটি–

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "আল্লাহর শপথ! কোন লোক জান্নাতীদের আমল করতে থাকে এমন কি তার ও জান্নাতের মধ্যে মাত্র এক গজের ব্যবধান থেকে যায়। এমতাবস্থায় তকদীরের লিখন তার উপর জয়যুক্ত হয়ে যায়, ফলে সে জাহান্নামীদের আমল করতে শুরু করে এবং ওর উপরই মৃত্যুবরণ করে। সুতরাং সে জাহান্নামে প্রবেশ করে। পক্ষান্তরে কোন লোক সারা জীবন ধরে জাহান্নামীদের আমল করতে থাকে এবং জাহান্নাম হতে মাত্র এক গজ দূরে অবস্থান করে। এমন সময় আল্লাহর লিখন তার উপর জয়যুক্ত হয়, ফলে সে জান্নাতীদের আমল শুরু করে দেয় এবং ঐ অবস্থাতেই মারা গিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করে।

রাসূলুল্লাহ (সঃ) আরও বলেছেনঃ "কোন লোকের আমল জনগণের দৃষ্টিতে জান্নাতীদের আমলরূপে পরিদৃষ্ট হয়, অথচ প্রকৃতপক্ষে সে জাহান্নামের অধিবাসী। অন্য একটি লোকের আমল জাহান্নামীদের আমলরূপে পরিলক্ষিত হয়, অথচ প্রকৃতপক্ষে সে জান্নাতের অধিবাসী।" সনদ বা দলীল তো হবে ঐ আমল যা শেষ সময়ে প্রকাশ পাবে এবং কালেমায়ে শাহাদাতের উপর প্রাণবায়ু নির্গত হবে। যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ "মৃত্যুর সময় যেমন ছিল তেমনিভাবেই উত্থিত হবে।" এখন এই উক্তি ও .... فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا -এই আয়াতের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপিত হওয়া জরুরী।

আল্লাহ পাকের উক্তির পৃষ্ঠপোষকতায় নিম্নের হাদীসটিও রয়েছে– রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "প্রত্যেকটি শিশু ইসলামী স্বভাবের উপর জন্মগ্রহণ করে থাকে। কিন্তু তার পিতামাতাই তাকে ইয়াহূদী, খ্রীষ্টান এবং মজুসী (অগ্নিপূজক) বানিয়ে থাকে।" রাসূলুল্লাহ (সঃ) আরও বলেছেন– আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "আমি আমার বান্দাদেরকে তো সৎ স্বভাবের উপরই সৃষ্টি করেছিলাম, কিন্তু শয়তানরাই তাদেরকে বিভ্রান্ত করে দ্বীন থেকে সরিয়ে দিয়েছে।" মোটকথা, সামঞ্জস্য

বিধানের উপায় হচ্ছে এইরূপঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন যে, প্রথমে তো তারা মুমিনই হবে। কারণ, তাদের স্বভাবের মধ্যেই ঈমান রয়েছে। আবার তকদীরে এটাও লিপিবদ্ধ রয়েছে যে, পরে তারা কাফির হয়ে যাবে। যদিও সমস্ত মাখলূকের মধ্যে মা'রেফাত ও তাওহীদের স্বভাব রয়েছে, যেমন তাদের নিকট থেকে এরূপ অঙ্গীকারও নেয়া হয়েছিল এবং ওটাকে তাদের স্বাভাবিক জিনিস বানানো হয়েছিল, তথাপি তাদের তকদীরে এটা লিখিত ছিল যে, তারা পাপিষ্ঠ হবে অথবা পুণ্যবান হবে। অন্য হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)বলেছেনঃ "মানুষ সকালে উঠে হয় তো বা স্বীয় প্রাণকে মুক্তির হাতে সোপর্দ করে, নয়তো ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়।" তার মুক্তিতে আল্লাহরই হুকুম প্রকাশ পায়। তিনিই আল্লাহ, وَالَّذِیْ قَدَّرَ فَهَدٰی অর্থাৎ যিনি এই মীমাংসা করে দিয়েছেন যে, সে হিদায়াত প্রাপ্ত হবে। (৮৭ঃ ৩) اَلَّذِیْۤ اَعْطٰی كُلَّ شَیْءٍ خَلْقَهٗ ثُمَّ هَدٰی অর্থাৎ যিনি প্রত্যেক জিনিসকে ওর 'খল্‌কত' প্রদান করেছেন, অতঃপর ওকে পথ দেখিয়েছেন। (২০ঃ ৫০)

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি সৎ ও ভাগ্যবান তার কাছে ভাগ্যবানদের আমল কঠিন অনুভূত হয় না। আর যে ব্যক্তি পাপিষ্ঠ ও হতভাগ্য তার কাছে হতভাগ্যদের আমল সহজ হয়ে যায়।" এ জন্যেই আল্লাহ্ পাক বলেনঃ 'এক দলকে আল্লাহ্ সৎপথে পরিচালিত করেছেন এবং অপর দলের জন্যে সংগত কারণেই ভ্রান্তি নির্ধারিত হয়েছে।' অতঃপর আল্লাহ্ পাক এর কারণ বর্ণনায় বলেছেনঃ 'তারা আল্লাহকে ছেড়ে শয়তানকে অভিভাবক ও বন্ধু বানিয়ে নিয়েছিল।' এটা ঐ লোকদের ভুলের উপর স্পষ্ট দলীল যারা ধারণা করে থাকে যে, আল্লাহ্ কাউকেও নাফরমানীর কারণে বা ভুল বিশ্বাসের কারণে শাস্তি দিবেন না, যখন তার আমল সঠিক ও বিশুদ্ধ হওয়ার উপর তার পূর্ণ বিশ্বাস থাকবে। তবে যদি কেউ জ্ঞান ও বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও হঠকারিতা করে না মানে তাহলে তাকে শাস্তি দেয়া হবে। তাদের এ ধারণা ঠিক নয়। কেননা, যদি তাদের এ ধারণা ঠিক হয় তবে সেই পথভ্রষ্ট ব্যক্তি যে হিদায়াতের উপর আছে বলে বিশ্বাস রাখে এবং সেই ব্যক্তি, যে প্রকৃতপক্ষে ভ্রান্ত পথের উপর নেই, বরং হিদায়াতের উপর রয়েছে, এ দু'জনের মধ্যে কোনই পার্থক্য থাকে না। অথচ আল্লাহ্ তা'আলা বলে দিচ্ছেন যে, এই দু'ব্যক্তির মধ্যে অবশ্যই পার্থক্য রয়েছে।

৩১। হে আদম সন্তানগণ! প্রত্যেক নামাযের সময় সুন্দর পোশাক পরিচ্ছদ গ্রহণ কর, আর খাও এবং পান কর (তবে পরিচ্ছদ ও পানাহারে) অপব্যয় ও অমিতাচার করবে না, কেননা, আল্লাহ অমিতাচারীদের ভালবাসেন না।

٣١- يٰبَنِىٓ اٰدَمَ خُذُوۡا زِيۡنَتَكُمۡ عِنۡدَ كُلِّ مَسۡجِدٍ وَّكُلُوۡا وَاشۡرَبُوۡا وَلَا تُسۡرِفُوۡا ۚ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الۡمُسۡرِفِيۡنَ ۟

এই আয়াতে মুশরিকদের কাজের প্রতিবাদ করা হচ্ছে যে, তারা উলঙ্গ হয়ে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করতো। এটাকেই শরীয়তের বিধান বলে বিশ্বাস করতো। দিনে পুরুষ লোকেরা এবং রাত্রে স্ত্রীলোকেরা কাপড় খুলে ফেলে তাওয়াফ করতো। তাই আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেন– তোমরা প্রত্যেক নামাযের সময় (যার মধ্যে বায়তুল্লাহর তাওয়াফের ইবাদতও রয়েছে) শরীরকে উলঙ্গ অবস্থা থেকে রক্ষা কর এবং গুপ্তাঙ্গকে আবৃত করে ফেল। তাছাড়া নিজেদেরকে সুন্দর সুন্দর সাজে সজ্জিত কর। পূর্ববর্তী মনীষীগণ এটাই লিখেছেন যে, এ আয়াতটি মুশরিকদের উলঙ্গ হয়ে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করা সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয়েছে। হযরত আনাস (রাঃ) হতে মারফূ'রূপে বর্ণিত আছে যে, এটা নামাযের সময় জুতা পরিধান করা সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। কিন্তু এর বিশুদ্ধতার ব্যাপারে চিন্তাভাবনার অবকাশ রয়েছে। এর উপর ভিত্তি করেই হাদীসে বলা হয়েছে যে, নামাযের সময় সুন্দর সুন্দর সাজে সজ্জিত হওয়া মুসতাহাব, বিশেষ করে জুমআ' ও ঈদের দিন সুগন্ধি ব্যবহার করাও উত্তম। কেননা, এটাও সৌন্দর্যেরই অন্তর্ভুক্ত।

সবচেয়ে উত্তম পোশাক হচ্ছে সাদা পোশাক। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ তোমরা সাদা পোশাক পরিধান কর, কেননা, এটাই হচ্ছে সবচেয়ে উত্তম পোশাক। নিজেদের মৃতদেরকেও এই কাপড়ের কাফন পরাও। তোমরা চোখে সুরমা ব্যবহার কর। কেননা, এটা দৃষ্টিশক্তিকে তীক্ষ্ণ করে এবং ভ্রূ গজিয়ে থাকে।" এ হাদীসটির ইসনাদ খুবই উত্তম। তামীম দারী (রঃ) এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে একটি চাদর ক্রয় করেছিলেন এবং ওটা পরিধান করে নামায পড়তেন।

আল্লাহ পাক বলেনঃ كُلُوۡا وَاشۡرَبُوۡا وَلَا تُسۡرِفُوۡا অর্থাৎ 'তোমরা খাও ও পান কর, কিন্তু অপব্যয় ও অমিতাচার করো না'। এ আয়াতে সুরুচি সম্পন্ন ও পবিত্র সমুদয় জিনিসই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এর

ভাবার্থ হচ্ছে– তোমরা যা ইচ্ছা খাও এবং যা ইচ্ছা পান কর, তোমাদের উপর কোনই দোষারোপ করা হবে না। কিন্তু দু'টি জিনিস নিন্দনীয় বটে। একটি হচ্ছে অপব্যয় ও অমিতাচার এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে দর্প ও অহংকার। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ " তোমরা খাও, পর এবং অপরকেও দাও। কিন্তু অপব্যয় করো না এবং তোমাদের মধ্যে যেন অহংকার প্রকাশ না পায়। আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর স্বীয় নিয়ামতরাশি প্রতীয়মান দেখতে চান।" এটা হচ্ছে পরিধান সম্পর্কীয় কথা। এখন খাওয়া সম্পর্কীয় কথা এই যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "ঐ পাত্র অপেক্ষা জঘন্য পাত্র আর নেই যে পাত্রের আহার্য পেট পূর্ণ করে ভক্ষণ করা হয়। মানুষের জন্যে তো এমন কয়েক গ্রাস খাদ্যই যথেষ্ট যা তাকে স্বীয় অবস্থায় কায়েম রাখতে সক্ষম হয়। আর যদি সে আরও কিছু খেতে চায় তবে যেন পেটের এক তৃতীয়াংশে খাবার দেয়, এক তৃতীয়াংশে পানি রাখে এবং বাকী এক তৃতীয়াংশ সহজভাবে শ্বাস লওয়ার জন্যে ফাঁকা রেখে দেয়।" রাসূলুল্লাহ (সঃ) আরও বলেছেনঃ "ইসরাফ' বা অপব্যয় হচ্ছে এই যে, মানুষ মনে যা চাইবে তাই খাবে।"

সুদ্দী (রঃ) বলেন যে, যে লোকেরা উলঙ্গ হয়ে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করতো তারা হজ্বের মৌসুমে নিজেদের উপর চর্বি হারাম করে নিতো। এ জন্যেই আল্লাহ পাক বলেনঃ "চর্বি হারাম নয়। তোমরা খাও, পান কর এবং চর্বিকে হারাম করে নেয়ার ব্যাপারে যে বাড়াবড়ি করেছো তা আর করো না।" মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে– 'আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে যা কিছু দিয়েছেন তা তোমরা খাও এবং পান কর।' আব্দুর রহমান ইবনে যায়েদ (রঃ) বলেনঃ لَاتُسْرِفُوا-এর ভাবার্থ হচ্ছে– ' তোমরা খাও কিন্তু হারাম খেয়ো না। কেননা এটা বাড়াবাড়ি ।' হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে– তোমরা খাও পান কর, কিন্তু অতিরিক্ত পানাহার করো না। কেননা এটাই হচ্ছে 'ইসরাফ' বা অপব্যয়। আল্লাহ তা'আলা অপব্যয়কারীকে ভালবাসেন না। مُسْرِفِيْن শব্দ দ্বারা مُعْتَدِيْن বা সীমালংঘনকারীকে বুঝানো হয়েছে। যেমন আল্লাহ পাক বলেনঃ اِنَّ اللّٰهَ لَايُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ অর্থাৎ "আল্লাহ তা'আলা সীমালংঘন কারীদেরকে ভালবাসেন না।" কেননা, লোকেরা বাড়াবাড়ি করে সাবধানতা অবলম্বন করতঃ হালালকেও হারাম করে নিতো অথবা হারামকেও হালাল বানিয়ে নিতো। আল্লাহ পাকের অভিপ্রায় হচ্ছে– "তোমরা হালালকে হালাল রাখ এবং হারামকে হারাম রাখ। এটাই হচ্ছে ন্যায়পরায়ণতা এবং এরই নির্দেশ দেয়া হয়েছে।"

৩২। (হে মুহাম্মাদ সঃ)! তুমি জিজ্ঞেস কর যে, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্যে যেসব শোভনীয় বস্তু ও পবিত্র জীবিকা সৃষ্টি করেছেন, তা কে নিসিদ্ধ করেছে? তুমি ঘোষণা করে দাও– এই সব বস্তু পার্থিব জীবনে, বিশেষ করে কিয়ামতের দিনে ঐসব লোকের জন্যে, যারা মুমিন হবে, এমনিভাবে আমি জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্যে নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বিবৃত করে থাকি।

٣٢- قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللّٰهِ الَّتِىْٓ اَخْرَجَ لِعِبَادِهٖ وَالطَّيِّبٰتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِىَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ○

এই আয়াতে ঐ ব্যক্তির দাবী খণ্ডন করা হচ্ছে যে পানাহার বা পরিধানের কোন জিনিস নিজের উপরে হারাম করে থাকে, অথচ শরীয়তে তা হারাম নয়। মহান আল্লাহ নবী (সঃ)-কে সম্বোধন করে বলেনঃ হে নবী (সঃ)! যেসব মুশরিক বাতিল মতাদর্শের বশবর্তী হয়ে নিজেদের উপর এক একটা জিনিস হারাম করে নিয়েছে, তাদেরকে জিজ্ঞেস কর– আল্লাহর দেয়া এই শোভনীয় বস্তু ও পবিত্র জীবিকা কে হারাম করেছে? আল্লাহ এগুলো তো স্বীয় মুমিন বান্দাদের জন্যে সৃষ্টি করেছেন। যদিও এই পার্থিব নিয়ামতে কাফিরগণও শরীক রয়েছে, কিন্তু এই নিয়ামতগুলোর হক মুমিনরাই আদায় করে থাকে এবং বিশেষ করে এ নিয়ামতগুলো কিয়ামতের দিন তারাই লাভ করবে। সেখানে কাফিররা শরীক হবে না। কেননা জান্নাতের নিয়ামতসমূহ কাফিরদের জন্যে হারাম। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, আরববাসী উলঙ্গ অবস্থায় বায়তুল্লাহ যিয়ারত করার সময় বাঁশি ও তালি বাজাত। তখন আল্লাহ তা'আলা বললেনঃ এই পোশাক তো হচ্ছে আল্লাহর সৌন্দর্য । সুতরাং তোমরা পোশাক পরিধান করে তাওয়াফ কর।

৩৩। (হে মুহাম্মাদ সঃ)! তুমি ঘোষণা করে দাও–আমার প্রতিপালক প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অশ্লীলতা, পাপকাজ,

٣٣- قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّىَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا

بَطَنَ وَ الْاِثْمَ وَ الْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَ اَنْ تُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطٰنًا وَّ اَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝

অন্যায় ও অসংগত বিদ্রোহ ও বিরোধিতা এবং আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরীক করা যার পক্ষে আল্লাহ কোন দলীল প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি, আর আল্লাহ সম্বন্ধে এমন কিছু বলা যে সম্বন্ধে তোমাদের কোন জ্ঞান নেই; (ইত্যাদি কাজ ও বিষয়সমূহ) নিষিদ্ধ করেছেন।

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা অপেক্ষা বেশী লজ্জাশীল আর কেউ নেই। এ কারণেই প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সমুদয় পাপের কাজই তিনি হারাম করে দিয়েছেন। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন যে, اِثْمٌ শব্দের অর্থ হচ্ছে পাপকাজ এবং بَغْيٌ শব্দের অর্থ হচ্ছে অন্যায়ভাবে মানুষের মাল হরণ করা বা মানহানির কাজে বাড়াবাড়ি করা। মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, 'বাগী' হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যে স্বয়ং নিজের উপর বিদ্রোহ ঘোষণা করে। তাফসীরের সারাংশ এই যে, اِثْمٌ হচ্ছে ঐ পাপ যা পাপীর সত্তার সাথে সম্পর্কযুক্ত। আর بَغْيٌ হচ্ছে ঐ সীমালংঘন বা বাড়াবাড়ি যা জনগণ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। আল্লাহ তা'আলা এ দু'টো জিনিস হারাম করে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, আল্লাহর সাথে শির্ক করা হারাম যার কোন সনদ নেই। আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক বানানোর অধিকারই নেই। আল্লাহ এটাও হারাম করেছেন যে, তোমরা এমন কথা বলবে যা তোমাদের জানা নেই। অর্থাৎ তোমরা (নাউযুবিল্লাহ) বলবে যে, আল্লাহর সন্তান রয়েছে। আর এই প্রকারের কথা বলা যার সম্পর্কে কোন জ্ঞান ও বিশ্বাসই নেই। যেমন তিনি বলেনঃ "তোমরা মূর্তিপূজার অপবিত্রতা থেকে বেঁচে থাকো।"

٣٤- وَ لِكُلِّ اُمَّةٍ اَجَلٌ فَاِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّ لَا يَسْتَقْدِمُوْنَ ۝

৩৪। প্রত্যেক জাতির জন্যে একটি নির্দিষ্ট সময় রয়েছে, সুতরাং যখন সেই নির্দিষ্ট সময় সমুপস্থিত হবে তখন তা এক মুহূর্তকালও আগে এবং পরে হবে না।

৩৫। হে আদম সন্তান! স্মরণ রাখ, তোমাদের মধ্য হতে যদি এমন কোন রাসূল তোমাদের নিকট আসে এবং আমার বাণী ও নিদর্শন তোমাদের কাছে বিবৃত করে; তখন যারা সতর্ক হবে এবং নিজেদেরকে সংশোধন করে নেবে, তাদের কোন ভয়ভীতি থাকবে না এবং তারা দুঃখিত ও চিন্তিত হবে না।

٣٥- يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ اِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِيْ فَمَنِ اتَّقٰى وَ اَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ○

৩৬। আর যারা আমার নিদর্শন ও বিধানকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে এবং অহংকার করে ওটা হতে দূরে সরে রয়েছে, তারাই হবে জাহান্নামী, সেখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে।

٣٦- وَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَ اسْتَكْبَرُوْا عَنْهَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ○

ইরশাদ হচ্ছে– প্রত্যেক দলের জন্যে একটি নির্দিষ্ট দণ্ডায়মান-স্থান এবং নির্দিষ্ট সময় নির্ধারিত রয়েছে। যখনই সেই সময় এসে যাবে তখন মুহূর্তকালও আগা-পিছা হতে পারে না। অতঃপর আল্লাহ্ পাক আদম সন্তানকে ভয় প্রদর্শন করে বলছেন– দেখ! তোমাদের কাছে আমার রাসূলগণ যাবে। তারা তোমাদেরকে আমার আয়াতসমূহ শুনাবে, শুভ সংবাদও দেবে এবং ভয় প্রদর্শনও করবে। সুতরাং যারা ভয় করবে, নিজেদেরকে সংশোধন করে নেবে, নিষিদ্ধ জিনিসগুলো পরিত্যাগ করবে এবং আনুগত্যের কাজ করবে, তাদের কোন ভয়ও থাকবে না এবং তারা চিন্তিত হবে না। কিন্তু যারা আমার আয়াতগুলো অবিশ্বাস করবে ও মিথ্যা জানবে এবং অহংকার করবে, তারাই হবে জাহান্নামবাসী। তারা তথায় চিরকাল অবস্থান করবে।

৩৭। যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করে এবং তাঁর নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে; তার অপেক্ষা বড়

٣٧- فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِهٖ ؕ

اُولٰٓئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيْبُهُمْ مِّنَ الْكِتٰبِ حَتّٰٓى اِذَا جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوْٓا اَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ قَالُوْا ضَلُّوْا عَنَّا وَ شَهِدُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ اَنَّهُمْ كَانُوْا كٰفِرِيْنَ ○

অত্যাচারী আর কে হতে পারে? তাদের ভাগ্যলিপিতে লিখিত নির্ধারিত অংশ তাদের নিকট পৌঁছবেই, পরিশেষে যখন আমার প্রেরিত ফেরেশ্তা তাদের প্রাণ হরণের জন্যে তাদের নিকট আসবে, তখন ফেরেশ্তারা জিজ্ঞেস করবে– আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদেরকে তোমরা ডাকতে তারা কোথায়? তখন তারা উত্তরে বলবে– আমাদের হতে তারা অন্তর্হিত হয়েছে, আর নিজেরাই স্বীকারোক্তি করবে যে, তারা কাফির বা সত্য প্রত্যাখ্যানকারী ছিল।

ইরশাদ হচ্ছে– ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা বড় অত্যাচারী আর কেউই নেই যে আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করে অথবা তাঁর আয়াতসমূহকে এবং মু'জিযাগুলোকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। এই লোকগুলো তাদের তকদীরে লিখিত অংশ অবশ্যই পেয়ে যাবে। মুফাস্সিরগণ এর অর্থে মতভেদ করেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, তাদের মুখমণ্ডল কালো হয়ে যাবে, অথবা এর অর্থ এই যে, যে ভাল কাজ করবে সে ভাল প্রতিদান পাবে এবং যে মন্দ কাজ করবে সে পাবে মন্দ প্রতিদান। অথবা নিজের অংশ দ্বারা নিজের আমল, নিজের জীবিকা এবং নিজের বয়স বুঝানো হয়েছে। আর এই উক্তি রচনা ভঙ্গীর দিক দিয়ে বেশী মজবুত। আল্লাহ পাকের নিম্নের উক্তিটিকে এর প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারেঃ "আমার ফেরেশতারা যখন তাদের রূহ কব্য্ করার জন্যে আসবে।" এই আয়াতের অনুরূপ অর্থ বিশিষ্ট হচ্ছে মহান আল্লাহর এই উক্তিটিঃ "যারা আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করে, তারা পার্থিব উপভোগ হিসেবে কোনই সফলতা লাভ করবে না, অতঃপর তারা আমারই কাছে প্রত্যাবর্তন করবে, আমি তখন তাদেরকে তাদের কুফরীর কারণে কঠিন শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করাবো।" এরপর আল্লাহ পাক বলেনঃ যদি কেউ কুফরী করে তবে তাকে করতে দাও। তাদের

কুফরী যেন তোমাদেরকে চিন্তিত না করে। তাদেরকে শেষ পর্যন্ত আমার কাছে ফিরে আসতেই হবে। ঐ সময় তাদের আমল তাদের উপর খুলে যাবে। আল্লাহ অন্তরের খবর ভালরূপেই জানেন। আমি তো কিছুদিনের জন্যে তাদেরকে পার্থিব সম্পদ উপভোগ করতে দিয়েছি।

আল্লাহ পাক উপরোক্ত আয়াতে সংবাদ দিচ্ছেন- মুশরিকদের রূহ্ কব্‌য্ করার সময় ফেরেশ্‌তারা তাদেরকে ভয় প্রদর্শন করবে এবং রূহ কব্‌য্ করে নিয়ে জাহান্নামের দিকে তাদেরকে নিয়ে যাবে এবং বলবে- "যাদেরকে তোমরা আল্লাহর শরীক স্থাপন করতে তারা আজ কোথায়? তোমরা তো তাদের কাছে প্রার্থনা করতে এবং তাদেরই উপাসনা করতে! আজ তাদেরকে ডাক। তারা তোমাদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্তিদান করুক।" তখন তারা বলবে- "তাদেরকে আজ কোথায় পাবো? তারা তো আজ পালিয়ে গেছে। আজ আমরা তাদের খবরেরও কোন আশা করছি না।" তারা সেদিন স্বীকারোক্তি করবে যে, তারা কুফরী করতো।

৩৮। আল্লাহ বলবেন- তোমাদের পূর্বে মানব ও জ্বীন হতে যেসব সম্প্রদায় গত হয়েছে, তাদের সাথে তোমরাও জাহান্নামে প্রবেশ কর, যখন কোন দল তাতে প্রবেশ করবে তখনই অপর দলকে তারা অভিসম্পাত করবে, পরিশেষে যখন তাতে সকলে জামায়েত হবে, তখন পরবর্তীগণ পূর্ববর্তীদের সম্পর্কে বলবে- হে আমাদের প্রতিপালক! এরাই আমাদেরকে বিভ্রান্ত করেছে, সুতরাং আপনি এদের দ্বিগুণ আগুনের শাস্তি দিন! তখন আল্লাহ বলবেন- প্রত্যেকের জন্যেই দ্বিগুণ রয়েছে, কিন্তু তোমরা তা জ্ঞাত নও।

৩৮- قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ فِي النَّارِ ۖ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَّعَنَتْ أُخْتَهَا ۖ حَتَّىٰ إِذَا ادَّارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ رَبَّنَا هَٰؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ ۖ قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَٰكِن لَّا تَعْلَمُونَ ○

٣٩- وَقَالَتْ أُولٰهُمْ لِأُخْرٰىهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ○

৩৯। অতঃপর পূর্ববর্তী লোকেরা পরবর্তী লোকদেরকে বলবে– আমাদের উপর তোমাদের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই, তোমরা তোমাদের কৃতকর্মের ফলস্বরূপ শাস্তি ভোগ করতে থাক।

আল্লাহ পাক তাঁর উপর মিথ্যা আরোপকারী মুশরিকদের সম্পর্কে সংবাদ দিচ্ছেন যে, যখন তাদেরকে বলা হবে– তোমরা তোমাদের মত ঐ দলগুলোর সাথে মিলিত হয়ে যাও যাদের মধ্যে তোমাদের গুণাবলী বিদ্যমান ছিল এবং যারা তোমাদের পূর্বে দুনিয়া হতে বিদায় গ্রহণ করেছিল। তারা মানবের অন্তর্ভুক্তই হোক অথবা দানবেরই অন্তর্ভুক্ত হোক। অতঃপর তোমরা সবাই জাহান্নামের পথ ধর। مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ-এটা فِيْٓ اُمَمٍ-এর بَدَلْ হতে পারে আবার এও সম্ভাবনা রয়েছে যে, فِيْٓ اُمَمٍ ব্যবহৃত হয়েছে مَعَ اُمَمٍ-এর অর্থে।

আল্লাহ পাকের উক্তি ঃ كُلَّمَا دَخَلَتْ اُمَّةٌ لَّعَنَتْ اُخْتَهَا অর্থাৎ যখন একটা নতুন দলকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে তখন একদল অপর দলকে ভালমন্দ বলতে শুরু করবে। হযরত খলীল (আঃ) বলেছেন যে, কিয়ামতের দিন এক কাফির অন্য কাফিরের বিরোধী হয়ে যাবে এবং একে অপরকে ভালমন্দ বলবে। ইরশাদ হচ্ছে– যখন অনুসারী কাফিররা অনুসৃত কাফিরদের প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্টি প্রকাশ করবে এবং যখন তারা আল্লাহর শাস্তি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করবে, আর তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে, তখন এই অনুসারীরা বলবেঃ "যদি পুনরায় আমাদেরকে দুনিয়ায় ফিরিয়ে দেয়া হতো তবে যেমন আজ এরা আমাদের থেকে পৃথক হয়ে গেছে তেমনই আমরাও এদের প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে প্রতিশোধ নিয়ে নিতাম!" আল্লাহ তা'আলা এভাবেই তাদের আমল দুঃখ ও আফসোসরূপে তাদের সামনে পেশ করবেন। কিন্তু জাহান্নাম থেকে কোনক্রমেই তারা বের হতে পারবে না। শেষ পর্যন্ত তারা সবাই জাহান্নামে একত্রিত হবে। জাহান্নামে প্রবেশ করার পর অনুসারীরা অনুসৃতদের বিরুদ্ধে আল্লাহ পাকের নিকট অভিযোগ করবে। কারণ তাদের তুলনায় অনুসৃতদের অপরাধ বেশী ছিল এবং তারা তাদের পূর্বেই জাহান্নামে প্রবেশ করেছিল। তারা বলবেঃ "হে আমাদের প্রভু! এরাই আমাদেরকে সোজা-সরল পথ থেকে ভ্রষ্ট করেছিল। সুতরাং এদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি প্রদান করুন।" যেমন আল্লাহ পাক বলেনঃ "যেই দিন আগুনে পোড়ে তাদের

মুখমণ্ডল কালো হয়ে যাবে, তারা বলবে– যদি আমরা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (সঃ)-এর অনুসরণ করতাম! হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আমাদের বড়দের কথা মেনে চলেছিলাম। তারাই আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল। হে আল্লাহ! তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি প্রদান করুন! আল্লাহ তা'আলা তখন বলবেন– না, বরং তোমাদের সকলকেই আমি দ্বিগুণ শাস্তি প্রদান করবো।" যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেনঃ "যারা কুফরী করে এবং লোকদেরকে আল্লাহর পথে আসতে বাধা দেয়, আমি তাদের শাস্তি বৃদ্ধি করে দেবো, তারা নিজেদের পাপের বোঝাও বহন করবে এবং অন্যদের পাপের বোঝাও বহন করবে।" যা হোক, অনুসৃতেরা অনুসারীদেরকে বলবে–আজকে আমাদের উপর তোমাদের কি শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে? আমরা যেমন নিজে নিজেই পথভ্রষ্ট হয়েছিলাম, তোমরাও তদ্রূপ আপনা আপনি পথভ্রষ্ট হয়েছিল। সুতরাং এখন নিজেদের আমলের স্বাদ গ্রহণ কর। তাদের অবস্থা এই রূপই যার সংবাদ আল্লাহ পাক দিয়েছেনঃ "হে নবী (সঃ)! যদি তুমি ঐ কাফিরদেরকে দেখতে যে, তারা তাদের প্রভুর সামনে দণ্ডায়মান থাকবে এবং একে অপরের প্রতি দোষারোপ করবে। অনুসারীরা অনুসৃতদেরকে বলবে– তোমরা না থাকলে আমরা মুমিন হতাম। তখন অনুসৃতরা অনুসারীদেরকে বলবে– আমরা তো তোমাদেরকে হিদায়াত লাভে বাধা প্রদান করিনি বরং তোমরা নিজেরাই পথভ্রষ্ট হয়েছিলে। তোমরা নিজেদের বিবেক বুদ্ধি দ্বারা কাজ কেন করনি? তখন অনুসারীরা অনুসৃতদেরকে বলবে– এটাতো ছিল আমাদেরকে তোমাদের রাত দিন পথভ্রষ্ট করারই ফল! তোমরা আমাদেরকে কুফরী করতে বাধ্য করতে এবং আল্লাহর শরীক স্থাপন করতে! তারপর তারা মনে মনে লজ্জিত হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় তারা আল্লাহর শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে এবং আমি (আল্লাহ) তাদের স্কন্ধে গলাবন্ধ পরিয়ে দেবো এবং তারা যেরূপ কাজ করতো সেরূপই বিনিময় প্রাপ্ত হবে।"

৪০। নিশ্চয়ই যারা আমার আয়াতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে এবং অহংকার বশতঃ তা থেকে ফিরে থাকে, তাদের জন্যে আকাশের দ্বার উন্মুক্ত করা হবে না এবং তারা জান্নাতেও প্রবেশ করবে না– যতক্ষণ না সূঁচের ছিদ্র পথে উষ্ট্র প্রবেশ করে,

٤٠ - إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي

سَمِّ الْخِيَاطِ وَكَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُجْرِمِينَ ○

এমনিভাবেই আমি অপরাধীদেরকে প্রতিফল দিয়ে থাকি।

٤١- لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَّمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذٰلِكَ نَجْزِى الظّٰلِمِينَ ○

৪১। তাদের জন্যে হবে জাহান্নামের (আগুনের) শয্যা এবং তাদের উপরের আচ্ছাদন ও হবে (আগুনের তৈরী) জাহান্নামের, এমনিভাবেই আমি যালিমদেরকে প্রতিফল দিয়ে থাকি।

আল্লাহ্ পাক বলেনঃ যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে এবং অহংকার ভরে সেগুলো থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাদের জন্যে আকাশের দরজা খোলা হবে না, অর্থাৎ তাদের সৎ আমল এবং প্রার্থনা উপরে উঠানো হবে না। পাপী ব্যক্তির রূহ্ কব্য্ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "ফেরেশতা ঐ রূহকে নিয়ে আকাশে উঠবেন এবং মালায়ে আ'লার যে ফেরেশ্তাদের পার্শ্ব দিয়ে গমন করবেন তাঁরা জিজ্ঞেস করবেন এই অপবিত্র রূহ্ কার? তখন তার জঘন্যতম নাম নিয়ে বলা হবে, অমুকের। শেষ পর্যন্ত আকাশে পৌঁছে বলবেন, দরজা খুলে দাও। কিন্তু দরজা খোলা হবে না।" যেমন ইরশাদ হচ্ছে- لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ অর্থাৎ "তাদের জন্যে আকাশের দরজাসমূহ খোলা হবে না।"

হযরত বারা ইবনে আযিব (রাঃ) বলেন, আমরা একটি জানাযার অনুসরণ করে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে চলছিলাম। আমরা কবরের কাছে পৌঁছলে রাসূলুল্লাহ (সঃ) সেখানে বসে পড়েন। আমরাও তাঁর চারদিকে বসে পড়ি। আমরা এমনভাবে নীরবতা অবলম্বন করি যে, আমাদের মাথার উপর যেন পাখী বসে রয়েছে। (আমাদেরকে নীরব দেখে) তাঁর হাতে একটি লাঠি ছিল তা দিয়ে মাটিতে রেখা টানছিলেন। অতঃপর তিনি মাথা উঠিয়ে আমাদেরকে সম্বোধন করে বললেনঃ 'কবরের শাস্তি হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর!' এ কথাটি দু'বার বা তিনবার বললেন। এরপর তিনি বললেনঃ "মুমিন যখন দুনিয়া হতে বিদায় গ্রহণ করে আখিরাতের দিকে যাত্রা শুরু করে তখন আকাশ থেকে জ্যোতির্ময় ফেরেশতাগণ অবতীর্ণ হন। তাঁদের হাতে থাকে জান্নাতের কাফন।

জান্নাতের খোশবুও তাঁদের কাছে থাকে। তাঁদের সংখ্যা এতো অধিক থাকে যতদূর দৃষ্টি যায়, শুধু ফেরেশতাতেই ভরপুর থাকে। অতঃপর একজন ফেরেশ্তা এসে তার শিয়রে বসে পড়েন এবং বলেন– হে শান্ত ও নিরাপদ আত্মা! আল্লাহর ক্ষমার দিকে চলো। এ কথা শোনা মাত্রই আত্মা বেরিয়ে পড়ে যেমনভাবে মশকের মুখ দিয়ে পানি বের হয়ে থাকে। যেমনই আত্মা বের হয় তেমনই চোখের পলকে ফেরেশ্তা তাকে জান্নাতী কাফন পরিয়ে দেন এবং জান্নাতী সুগন্ধিতে তাকে সুরভিত করেন। মিশকের ঐ সুগন্ধি এতই উত্তম যে, দুনিয়ায় এর চেয়ে উত্তম সুগন্ধি আর হতে পারে না। তাকে নিয়ে ফেরেশ্তা আকাশে উঠে যান। যেখান দিয়েই তিনি গমন করেন সেখানেই ফেরেশ্তাগণ জিজ্ঞেস করেন, এটা কার পবিত্র আত্মা? উত্তরে বলা হয়, অমুকের পুত্র অমুকের। আকাশে পৌঁছে গিয়ে দরজা খুলতে বলা হলে তা খুলে দেয়া হয়। তাঁর সাথে অন্যান্য সমস্ত ফেরেশ্তাও দ্বিতীয় আসমান পর্যন্ত গমন করেন। এভাবেই এক এক করে সপ্তম আকাশে পৌঁছে যান। তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন– আমার এই বান্দার নামটি ইল্লীনের তালিকায় লিপিবদ্ধ কর। অতঃপর তাকে যমীনে ফিরিয়ে নিয়ে যাও। কেননা আমি তাকে মাটি দ্বারাই সৃষ্টি করেছি। ওর মধ্যেই তাকে ফিরিয়ে দেবো এবং ওর মধ্য থেকেই তাকে পুনরায় উত্থিত করবো। তখন যমীনে (কবরে) তার আত্মাকে ফিরিয়ে দেয়া হয়। ওখানে দু'জন ফেরেশ্তা আগমন করেন এবং তাকে জিজ্ঞেস করেন, তোমার প্রতিপালক কে? সে উত্তরে বলে, আমার প্রতিপালক হচ্ছেন আল্লাহ। আবার জিজ্ঞেস করেন, তোমার দ্বীন বা ধর্ম কি? সে উত্তর দেয়, আমার দ্বীন হচ্ছে ইসলাম। পুনরায় তাকে প্রশ্ন করেন, তোমার কাছে যে লোকটিকে পাঠানো হয়েছিল তিনি কে? জবাবে সে বলে, আমি আল্লাহর কিতাব পড়ে তাঁর উপর ঈমান এনেছিলাম। তখন আকাশ থেকে একটি শব্দ আসে– আমার বান্দা সত্য কথাই বলেছে। তার জন্যে জান্নাতের বিছানা বিছিয়ে দাও এবং তাকে জান্নাতের পোশাক পরিয়ে দাও। আর তার জন্যে জান্নাতের একটা দরজা খুলে দাও, যেন জান্নাতের হাওয়া ও সুগন্ধি সে পেতে পারে। তার কবরটি দৃষ্টির সীমা পর্যন্ত প্রশস্ত হয়ে যায়। একটি সুন্দর লোক উত্তম পোশাক পরিহিত হয়ে এবং সুগন্ধিতে সুরভিত অবস্থায় তার কাছে আগমন করে এবং বলে– তুমি সন্তুষ্ট হয়ে যাও যে, আজ তোমার সাথে যে ওয়াদা করা হয়েছিল তা পূর্ণ করা হচ্ছে। সে লোকটিকে জিজ্ঞেস করবে, তুমি কে? সে বলবে, আমি তোমার সৎ আমল। তখন মৃতব্যক্তি বলবে, হে আল্লাহ! আপনি এখনই কিয়ামত সংঘটিত করে দিন, আমি আমার পরিবারবর্গ ও ধনমালের সাথে মিলিত হবো। পক্ষান্তরে

কাফির ব্যক্তির যখন দুনিয়া হতে বিদায় গ্রহণের সময় হয় তখন কৃষ্ণবর্ণের এক ফেরেশতা চট নিয়ে তার কাছে হাজির হন। যতদূর দৃষ্টি যায় সেই ফেরেশ্তা ততো বড় হন। তারপর মৃত্যুর ফেরেশ্তা এসে তাকে বলেন, ওরে অপবিত্র আত্মা! বেরিয়ে আয় এবং আল্লাহর অসন্তুষ্টি ও ক্রোধের দিকে গমন কর। ঐ আত্মা তখন দেহের মধ্যে প্রবেশ করতে থাকে, কিন্তু ফেরেশতা ওকে টেনে বের করেন, যেমন লোহার পেরেককে ভিজা চুলের মধ্য থেকে বের করা হয়। ঐ ফেরেশ্তা ওকে ধরা মাত্রই চোখের পলকে ঐ চটের মধ্যে জড়িয়ে নেন। ওর মধ্য থেকে সড়া-পচা মৃতদেহের মত দুর্গন্ধ ছুটতে থাকে। ফেরেশতা ওকে নিয়ে আকাশে উঠে যান এবং যেখান দিয়েই গমন করেন সেখানেই ফেরেশ্তাগণ জিজ্ঞেস করেন, এই অপবিত্র আত্মা কার? উত্তরে বলা হয়, অমুকের পুত্র অমুকের। আসমানে পৌঁছে যখন বলেন, দরজা খুলে দাও। তখন দরজা খোলা হয় না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সঃ) لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ -এই আয়াতটি পাঠ করেন। তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'একে যমীনের নিম্নস্তরের সিজ্জিনে নিয়ে যাও। তখন তার আত্মাকে সেখানে নিক্ষেপ করা হয়। এরপর রাসূলুল্লাহ (সঃ) নিম্নের আয়াতটি পাঠ করেন, 'যে আল্লাহর সাথে শরীক স্থাপন করে সে যেন আসমান থেকে পড়ে গেল এবং পাখী তার মাংস ছিঁড়তে রয়েছে। অথবা বায়ু তাকে দূর দূরান্তে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে।' তার আত্মা তার দেহে ফিরিয়ে দেয়া হয়। দু'জন ফেরেশ্তা এসে জিজ্ঞেস করেন, তোমার প্রভু কে? সে উত্তর দেয়, আফসোস! আমি জানি না। আবার জিজ্ঞেস করেন, তোমার দ্বীন কি? জবাবে সে বলে, হায়! আমি তো এটা অবগত নই। তারপর জিজ্ঞেস করেন, তোমার কাছে কাকে পাঠানো হয়েছিল? সে উত্তরে বলে, হায়! হায়! আমি তা জানি না। তখন আকাশ থেকে শব্দ আসে, আমার বান্দা মিথ্যা বলছে। তার জন্যে জাহান্নামের বিছানা নিয়ে এসো এবং জাহান্নামের দরজা তার জন্যে খুলে দাও যাতে তার কাছে জাহান্নামের তাপ ও গরম বায়ু পৌঁছে যায়। তার কবর অত্যন্ত সংকীর্ণ হয়ে যায় এবং তাকে এমনভাবে চেপে ধরে যে, তার পার্শ্বদেশের অস্থি মড় মড় করে ভাঙ্গতে থাকে। একটি অত্যন্ত কদাকার ও বিশ্রি লোক ময়লাযুক্ত কাপড় পরিহিত হয়ে ও দুর্গন্ধ ছড়িয়ে তার কাছে হাযির হয় এবং বলে— আমি তোমাকে তোমার দুর্ভাগ্যের সংবাদ দিচ্ছি। এটা ঐ দিন যেদিনের ওয়াদা তোমাকে দেয়া হয়েছিল। সে জিজ্ঞেস করে, তুমি কে? সে বলে, আমি তোমার দুষ্কর্ম। সেই কাফির লোকটি তখন বলে ওঠে— আল্লাহ করুন যেন কিয়ামত সংঘটিত না হয় (তাহলে আমাকে জাহান্নামে যেতে হবে না)।"

হযরত বারা ইবনে আযিব (রাঃ) বলেনঃ "আমরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে বাইরে বের হই। আমরা জানাযার অনুসরণ করছিলাম (অবশিষ্ট বর্ণনা উপরোক্ত বর্ণনার মতই)।" যখন মুমিনের রূহ বের হয় তখন আকাশ ও পৃথিবীর ফেরেশতাগণ তার উপর দরূদ পাঠ করেন। তার জন্যে আসমানের দরজা খুলে যায়। সমস্ত ফেরেশ্তা এই প্রার্থনা করতে থাকেন যে, তার রূহ যেন তাঁদের সম্মুখ দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। কাফিরের আত্মার উপর এমন একজন ফেরেশ্তাকে নিযুক্ত করা হয় যিনি অন্ধ, বধির ও বোবা। তাঁর হাতে এমন একটি হাতুড় থাকে যে, যদি ওটা দ্বারা তিনি পাহাড়ের উপর মারেন তবে সেটা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। তা দ্বারা তিনি কাফিরকে এমন জোরে প্রহার করেন যে, সে উচ্চস্বরে চীৎকার করে ওঠে। দানব ও মানব ছাড়া সমস্ত মাখলূক সেই শব্দ শুনতে পায়। অতঃপর জাহান্নামের দরজা খুলে দেয়া হয়।

আল্লাহ পাকের উক্তিঃ وَلَا يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتّٰى يَلِجَ الْجَمَلُ فِىْ سَمِّ الْخِيَاطِ অর্থাৎ যদি সূঁচের ছিদ্র দিয়ে উট বের হতে পারে তবেই কাফির জান্নাতে প্রবেশ করতে পারে (কিন্তু এটা সম্ভব নয়!)। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) জামাল শব্দটিকে জুম্মাল অর্থাৎ ج-কে ضَمَّة দিয়ে ও مِيْم-কে تَشْدِيْد দিয়ে পড়তেন। জুম্মাল মোটা রজ্জুকে বলা হয় যার দ্বারা নৌকা বাঁধা হয়।

৪২। যারা ঈমান এনেছে ও ভাল কাজ করেছে এমন কোন ব্যক্তিকে আমি তার সাধ্যাতীত দায়িত্ব অর্পণ করি না; তারাই হবে জান্নাতবাসী, সেখানে তারা চিরকাল অবস্থানকারী।

٤٢- وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ○

৪৩। আর তাদের অন্তরে যা কিছু ঈর্ষা ও বিদ্বেষ রয়েছে তা আমি দূর করে দেবো, তাদের নিম্নদেশ দিয়ে নদী প্রবাহিত হবে, তখন তারা বলবে- সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্যে যিনি আমাদেরকে এর পথ প্রদর্শন করেছেন, আল্লাহ

٤٣- وَنَزَعْنَا مَا فِىْ صُدُوْرِهِمْ مِّنْ غِلٍّ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهِمُ الْاَنْهٰرُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ

هَدٰىنَا لِهٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَآ اَنْ هَدٰىنَا اللّٰهُ لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُوْدُوْٓا اَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ اُوْرِثْتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝

আমাদেরকে পথ প্রদর্শন না করলে আমরা পথ পেতাম না, আমাদের প্রতিপালকের প্রেরিত রাসূলগণ সত্যবাণী নিয়ে এসেছিলেন, আর তাদেরকে সম্বোধন করে বলা হবে– তোমরা যে (ভাল) আমল করতে তারই জন্যে তোমাদেরকে এই জান্নাতের উত্তরাধিকারী বানানো হয়েছে।

আল্লাহ পাক হতভাগা ও পাপীদের অবস্থা বর্ণনার পর এখন ভাগ্যবান ও সৎ লোকদের অবস্থা বর্ণনা করছেন। তিনি বলেনঃ যারা ঈমান এনেছে এবং ভাল কাজ করেছে তারা ঐ লোকদের থেকে পৃথক যারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে। এখানে এই বিষয়ের প্রতি আলোকপাত করা হচ্ছে যে, ঈমান ও আমল কোন কঠিন ব্যাপার নয়; বরং খুবই সহজ ব্যাপার। তাই ইরশাদ হচ্ছে– আমি যে শরঈ বিধান জারি করেছি এবং ঈমান ও সৎ আমল ফরয করে দিয়েছি তা মানুষের সাধ্যের অতিরিক্ত নয়। আমি কখনও কাউকে সাধ্যের অতিরিক্ত কষ্ট দেই না। এই লোকগুলোই হচ্ছে জান্নাতের অধিবাসী। মুমিনদের অন্তরে পারস্পরিক যা কিছু হিংসা ও বিদ্বেষ থাকবে তা আমি বের করে দেবো। যেমন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "মুমিনরা যখন জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেয়ে যাবে তখন তাদেরকে জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী পুলের উপর আটক করা হবে। অতঃপর তাদের ঐসব অত্যাচার সম্পর্কে আলোচনা করা হবে যা দুনিয়ায় তাদের পরস্পরের মধ্যে করা হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত ঐ অত্যাচার ও হিংসা বিদ্বেষ থেকে যখন তাদের অন্তরকে পাক সাফ করা হবে তখন তাদেরকে জান্নাতের পথ প্রদর্শন করা হবে। আল্লাহর শপথ! তাদের কাছে তাদের জান্নাতের ঘর তাদের পার্থিব ঘর থেকে বেশী পরিচিত হবে। জান্নাতবাসীকে যখন জান্নাতের দিকে প্রেরণ করা হবে তখন তারা জান্নাতের পার্শ্বে একটা গাছ পাবে যার নিম্নদেশ দিয়ে দু'টি নির্ঝরিণী প্রবাহিত হতে থাকবে। একটা থেকে যখন তারা পানি পান করবে তখন তাদের অন্তরে যা কিছু হিংসা বিদ্বেষ ছিল সব কিছু ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হয়ে যাবে। এটাই হচ্ছে শরাবে তহুর বা পবিত্র মদ। আর অন্য ঝরণায় তারা গোসল করবে। তখন জান্নাতের মতই সজীবতা ও প্রফুল্লতা তাদের

চেহারায় ফুটে উঠবে। এর পর না তাদের মাথার চুল এলোমেলো হবে, না চোখে সুরমা দেয়ার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেবে। অতঃপর এই লোকগুলো দলে দলে জান্নাতের দিকে রওয়ানা হয়ে যাবে।"

হযরত আলী (রাঃ) বলেনঃ "আমি আশা করি যে, ইনশাআল্লাহ আমি, হযরত উসমান (রাঃ), হযরত তালহা (রাঃ) এবং হযরত যুবাইর (রাঃ) ঐ লোকদের অন্তর্ভুক্ত হবো যাদের অন্তরে হিংসা-বিদ্বেষ ছিল, কিন্তু সমস্ত পরিষ্কার করে দেয়া হবে।" হযরত আলী (রাঃ) বলতেনঃ "আল্লাহর কসম! আমাদের মধ্যে আহলে বদরও রয়েছেন এবং তাঁদের সম্পর্কেই এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে।"

হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "প্রত্যেক জান্নাতীকে জাহান্নামের ঠিকানা বলে দেয়া হবে। সে বলবে– যদি আল্লাহ আমাকে সুপথ প্রদর্শন না করতেন তবে আমার ঠিকানা এটাই হতো। এ জন্যে আমি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি। আর প্রত্যেক জাহান্নামীকে জান্নাতের ঠিকানা বলে দেয়া হবে। সে বলবে– হায়! যদি আল্লাহ আমাকেও সুপথ প্রদর্শন করতেন তবে এটাই আমার ঠিকানা হতো। এভাবে দুঃখ ও আফসোস তাকে ছেয়ে ফেলবে। ঐ মুমিনদেরকে যখন জান্নাতের সুসংবাদ দেয়া হবে তখন তাদেরকে বলা হবে– এই জান্নাত হচ্ছে তোমাদের সৎকর্মের ফল স্বরূপ তোমাদের পুরস্কার। তোমাদেরকে যে জান্নাতে প্রবিষ্ট করা হয়েছে এটা সত্যি আল্লাহর রহমতই বটে। নিজেদের আমল অনুযায়ী আপন আপন ঠিকানা বানিয়ে নাও। আর এ সবকিছুই হচ্ছে আল্লাহর রহমতেরই কারণ।" সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "তোমাদের প্রত্যেকেই যেন এ কথা জেনে রাখে যে, তার আমল তাকে জান্নাতে পৌঁছায় না।" তখন জনগণ জিজ্ঞেস করলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আপনার আমলও কি নয়?" উত্তরে তিনি বললেনঃ "হ্যাঁ, আমার আমলও নয়, যদি না আল্লাহর রহমত আমার উপর বর্ষিত হয়।"

৪৪। আর তখন জান্নাতবাসীরা জাহান্নাম বাসীদেরকে (উপহাস) করে বলবে– আমাদের প্রতিপালক যেসব অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি আমাদেরকে দিয়েছিলেন, আমরা তা বাস্তবভাবে পেয়েছি,

٤٤- وَنَادٰٓى اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ اَصْحٰبَ النَّارِ اَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُّمْ

مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا ۖ قَالُوا نَعَمْ ۚ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَن لَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ۝

কিন্তু তোমাদের প্রতিপালক যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা কি তোমরা সত্য ও বাস্তবরূপে পেয়েছো? তখন তারা বলবে– হ্যাঁ, পেয়েছি, (এ সময়) এদের মধ্য হতে জনৈক ঘোষক ঘোষণা করে দেবেন যে, যালিমদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত।

٤٥- الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ ۝

৪৫। যারা আল্লাহর পথে চলতে (মানুষকে) বাধা দিতো এবং ওতে বক্রতা অনুসন্ধান করতো, আর তারা পরকালকে অস্বীকার করতো।

জাহান্নামবাসীকে জাহান্নামে যাওয়ার পর উপহাসমূলকভাবে সম্বোধন করা হচ্ছে যে, জান্নাতবাসী জাহান্নামবাসীকে সম্বোধন করে বলবেঃ “আমাদের প্রতিপালক আমাদের সাথে যে অঙ্গীকার করেছিলেন তা তিনি সত্যরূপে দেখিয়েছেন। তোমাদের সাথে আল্লাহ তা'আলা যে ওয়াদা করেছিলেন তা তোমরা সত্যরূপে পেয়েছো কি?” এখানে أَنْ হরফটি উহ্য উক্তির তাফসীর করছে এবং قَدْ শব্দটি নিশ্চয়তা বুঝাবার জন্যে এসেছে। সেই সময় কাফিররা উত্তরে বলবেঃ “হ্যাঁ (আমরা তা সত্যরূপে পেয়েছি)।” যেমন মহান আল্লাহ সূরায়ে সাফ্‌ফাতে বলেছেন এবং তিনি ঐ ব্যক্তি সম্বন্ধে সংবাদ দিয়েছেন যে ব্যক্তি দুনিয়ায় কোন কাফিরের বন্ধু ছিল। ঐ মুমিন ব্যক্তি যখন তার কাফির বন্ধুকে জাহান্নামে উঁকি মেরে দেখবে তখন বলবেঃ “আল্লাহর শপথ! তুমি তো আমাকেও ধ্বংস করারই উপক্রম করেছিলে, যদি না আমার প্রভুর অনুগ্রহ হতো তবে আমিও তোমার ন্যায় দণ্ডিতদের অন্তর্ভুক্ত হতাম।” এই কাফিররা বলতোঃ “এই যে, আমরা মরলাম তো মরলামই, আর আমরা উত্থিত হবো না এবং আমাদেরকে শাস্তিও দেয়া হবে না।” ফেরেশ্‌তা এখন তাদের কান খুলে দেবে এবং বলবে– দেখ, এটাই হচ্ছে সেই জাহান্নাম যা তোমরা অস্বীকার করতে। এটা কি কোন যাদু, না তোমরা এটা দেখতে পাচ্ছ না? এসো, জাহান্নামে প্রবেশ

কর। পেরে না পেরে তোমাদেরকে সহ্য করতেই হবে। তোমরা তোমাদের কৃতকর্মের প্রতিদান পাচ্ছ।

অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বদরের নিহতদেরকে সম্বোধন করে বলেছিলেন- "হে আবূ জেহেল ইবনে হিশাম, হে উৎবা ইবনে রাবীআ, হে শাইবা ইবনে রাবীআ এবং অন্যান্য মৃত কুরায়েশ নেতৃবর্গের নাম ধরে ধরে বলেছিলেন! আল্লাহ তোমাদের সাথে যে ওয়াদা করেছিলেন তা সত্যে পরিণত হয়েছে কি? আমার প্রভু আমার সাথে যে ওয়াদা করেছিলেন তা পূর্ণ হয়ে গেছে।" ঐ সময় হযরত উমার (রাঃ) জিজ্ঞেস করেছিলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আপনি মৃতদেরকে সম্বোধন করছেন (অথচ তারা তো শুনতেই পায় না)?" তিনি উত্তরে বলেছিলেনঃ "আল্লাহর কসম! তারা তোমাদের চেয়ে কম শুনতে পাচ্ছে না, কিন্তু তারা উত্তর দিতে সক্ষম নয়।"

অতঃপর ইরশাদ হচ্ছে- একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করবে- যালিমদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত। আল্লাহ পাক বলেনঃ এরা হচ্ছে ঐসব লোক যারা লোকদেরকে সরল সোজা পথে আসতে বাধা প্রদান করতো। তারা জনগণকে নবীদের শরীয়তের পথ থেকে ফিরিয়ে দিতো, যেন তারা বক্র পথে পরিচালিত হয় এবং নবীদের অনুসরণ না করে। তারা পরকালে আল্লাহর সামনে হাজির হওয়াকে অস্বীকার করতো। কেননা, তাদের হিসাবের দিনের কোন ভয়ই ছিল না। এরা ছিল বড়ই দুষ্ট প্রকৃতির লোক।

৪৬। এই উভয় শ্রেণীর লোকদের মাঝে পার্থক্যকারী একটি পর্দা রয়েছে, আর আ'রাফে (জান্নাত ও জাহান্নামের উর্ধ্বস্থানে) কিছু লোক থাকবে, তারা প্রত্যেককে লক্ষণ ও চিহ্ন দ্বারা চিনতে পারবে, আর জান্নাত বাসীদেরকে ডেকে বলবে- তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক, তখনো তারা জান্নাতে প্রবেশ করেনি বটে, কিন্তু তারা ওর আকাঙ্খা করে।

٤٦ - وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْاَعْرَافِ رِجَالٌ يَّعْرِفُوْنَ كُلًّا بِسِيْمٰهُمْ وَنَادَوْا اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ اَنْ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوْهَا وَهُمْ يَطْمَعُوْنَ ۝

৪৭। পরন্তু যখন জাহান্নামীদের প্রতি তাদের দৃষ্টি ফিরিয়ে দেয়া হবে, তখন তারা (আ'রাফবাসীরা) বলবে- হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদেরকে যালিম সম্প্রদায়ের সঙ্গী করবেন না।

٤٧ - وَاِذَا صُرِفَتْ اَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ اَصْحٰبِ النَّارِ قَالُوْا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ۝

জান্নাতবাসী যে জাহান্নামবাসীকে সম্বোধন করবে এটার বর্ণনা দেয়ার পর ইরশাদ হচ্ছে যে, জাহান্নাম ও জান্নাতের মধ্যভাগে একটা পর্দা থাকবে যা জাহান্নামীদের জন্যে জান্নাতে প্রবেশের প্রতিবন্ধক হবে। যেমন, আল্লাহ পাক বলেনঃ "ও দু'টোর মাঝখানে একটি প্রাচীর স্থাপন করা হয়েছে, যার ভিতরের দিকে একটি দরজা আছে, যাতে রহমত রয়েছে এবং ওর বাইরের দিকে রয়েছে শাস্তি।" ওটাই হচ্ছে আ'রাফ। এর সম্পর্কেই বলা হয়েছে যে, আ'রাফের উপর কতকগুলো লোক থাকবে। সুদ্দীর (রঃ) বর্ণনায় রয়েছে যে, আল্লাহ পাকের "ও দু'টোর মাঝে একটি পর্দা রয়েছে"- এই উক্তিতে যে পর্দা কথাটি রয়েছে এটা দ্বারা আ'রাফকেই বুঝানো হয়েছে। ইবনে জারীর (রঃ) বলেন যে, اَعْرَافٌ শব্দটি হচ্ছে عَرَفٌ শব্দের বহুবচন। প্রত্যেক উঁচু স্থানকেই عَرَفٌ বলা হয়। মোরগের মাথার পালককেও এ কারণেই عَرَفٌ বলা হয়ে থাকে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যভাগে একটি টিলা বা ছোট পাহাড় রয়েছে। সেখানেও মানুষ অবস্থান করবে। তারা পাপী। সুদ্দী (রঃ) বলেন যে, আ'রাফে অবস্থানকারী লোকেরা নিজেদের লোকদেরকে চিনতে পারবে বলেই ঐ জায়গার নাম আ'রাফ রাখা হয়েছে। আ'রাফবাসীদের ব্যাপারে মুফাস্সিরদের ব্যাখ্যা বিভিন্ন রূপ। সবগুলোরই অর্থ প্রায় কাছাকাছি। অর্থাৎ তারা হচ্ছে ঐসব লোক যাদের পাপ ও পুণ্য সমান সমান। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল- "যাদের পাপ ও পুণ্য সমান সমান হবে তারা কোথায় থাকবে?" উত্তরে তিনি বলেছিলেনঃ "এরাই হচ্ছে আ'রাফবাসী। তাদেরকে জান্নাতে প্রবিষ্ট করা হবে না বটে, তবে তারা জান্নাতে প্রবেশের আশা অবশ্যই করবে।" এই ধরনেরই আর একটি প্রশ্নের উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "আ'রাফের এই অধিবাসীরা হচ্ছে ওরাই যারা পিতা মাতার অনুমতি ছাড়াই আল্লাহর পথে জিহাদের জন্যে বের হয়েছিল এবং শহীদ

হয়েছিল।” তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করা থেকে বিরত রাখার কারণ এই যে, তারা পিতা মাতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করেছিল। আর জাহান্নাম থেকে এজন্যে বাঁচানো হয়েছে যে, তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে শহীদ হয়েছিল।” আর একটি হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “এরা হচ্ছে ঐ সব লোক যাদের পুণ্য ও পাপ সমান সমান ছিল। পাপগুলো তাদের জান্নাতে প্রবেশের পথে প্রতিবন্ধক হয়েছে এবং পুণ্যগুলো জাহান্নাম হতে রক্ষা করেছে। এখন লোকগুলো সেই প্রাচীরের পার্শ্বেই অবস্থান করছে এবং আল্লাহ তা'আলার ফায়সালা পর্যন্ত সেখানেই অবস্থান করবে। তাদের দৃষ্টি যখন জাহান্নামবাসীদের উপর পড়বে তখন তারা বলবেঃ হে আমাদের প্রভু! আমাদেরকে এই যালিমদের অন্তর্ভুক্ত করবেন না। এভাবেই তারা দু'আ করতে থাকবে। অবশেষে মহান আল্লাহ তাদেরকে বলবেনঃ আচ্ছা, যাও, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর। আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিলাম। কিয়ামতের দিন আল্লাহ পাক লোকদের হিসাব গ্রহণ করবেন। যার একটি পুণ্য বেশী হবে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। আর যার একটি পাপ বেশী হবে তাকে জাহান্নামে প্রবিষ্ট করা হবে।” অতঃপর তিনি فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهُ (২৩:১০২) এই আয়াতটি পাঠ করেন। এরপর রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ “দাঁড়িপাল্লা তো একটি দানার পার্থক্যের কারণে নীচে বসে যায় বা উপরে চড়ে উঠে। আর পুণ্য ও পাপ সমান হয়ে গেলে তাদেরকে পুলসিরাতের উপর আটক করে দেয়া হবে। তারা জান্নাতবাসী ও জাহান্নামবাসীকে চিনতে পারবে। তারা জান্নাতবাসীদেরকে দেখে সালাম জানাবে। আর বামে জাহান্নামীদেরকে দেখা যাবে। তাদেরকে দেখে আ'রাফবাসীরা বলবেঃ 'হে আল্লাহ! আমাদেরকে এদের অন্তর্ভুক্ত করবেন না।' পুণ্যবানদের সামনে একটা নূর থাকবে যার আলোতে তারা পথ চলবে। এরূপ নূর প্রত্যেক পুণ্যবান পুরুষ পুণ্যবতী নারীর সামনে থাকবে। যখন তারা পুলসিরাতের উপর পৌঁছবে তখন মুনাফিকদের সামনে থেকে এ নূর সরিয়ে নেয়া হবে। জান্নাতবাসীরা যখন মুনাফিকদেরকে দেখবে তখন বলবেঃ 'হে আল্লাহ! আমাদের নূরকে আপনি প্রতিষ্ঠিত রাখুন!' কিন্তু আ'রাফবাসীদের নূর তাদের সামনেই থাকবে, দূরে থাকবে না। ঐ সময় আল্লাহ তা'আলা বলবেনঃ এরা জান্নাতী নয় বটে, কিন্তু জান্নাতের আশা রাখে। বান্দা যখন একটি পুণ্যের কাজ করে তখন তার জন্যে দশটি পুণ্য লিখা হয়। আর যখন একটি পাপের কাজ করে তখন একটিমাত্র পাপ লিখা হয়। ঐ ব্যক্তি হতভাগ্য যার একক দশকের উপর জয়যুক্ত হয়। আল্লাহ পাক যখন তাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন তখন তাদেরকে

তিনি নদীর দিকে প্রেরণ করবেন। ঐ নদীকে 'নহরে হায়াত' বলা হয়। ঐ নদীর ধার সোনা দিয়ে বাঁধানো আছে এবং ওকে হীরা ও মনিমুক্তা দিয়ে এঁটে দেয়া হয়েছে। ওর মাটি হচ্ছে মিশ্‌ক। আ'রাফবাসীদেরকে ঐ নদীতে গোসল করানো হবে। তখন তাদের রং ঠিক হয়ে যাবে এবং তাদের গ্রীবায় সাদা ও উজ্জ্বল চিহ্ন প্রকাশিত হয়ে পড়বে। এই চিহ্ন দ্বারাই তাদের আ'রাফবাসী হওয়ার পরিচয় পাওয়া যাবে। যখন তাদের চেহারায় ঔজ্জ্বল্য প্রকাশ পাবে তখন মহান আল্লাহ তাদেরকে সম্বোধন করে বলবেনঃ 'কি চাইবে চাও।' তখন তারা তাদের মনের বাসনা প্রকাশ করবে। তাদের আশা পূর্ণ করা হবে। তাদেরকে বলা হবেঃ 'তোমাদের আবেদনের উপর আরও সত্তর ভাগ দেয়া হচ্ছে।' অতঃপর তাদেরকে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে এবং তাদের নাম দেয়া হবে 'মাসাকীনে আহ্‌লে জান্নাত' বা জান্নাতবাসীদের মিসকীনগণ।"

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন– আ'রাফবাসীর ফায়সালা হবে সর্বশেষে। সমস্ত বান্দার ফায়সালা করার পর আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সম্বোধন করে বলবেনঃ "হে আ'রাফবাসীগণ! তোমাদের পুণ্যগুলো তোমাদেরকে জাহান্নাম থেকে বাঁচিয়ে নিয়েছে। কিন্তু তোমাদেরকে জান্নাতের অধিবাসী করতে পারেনি। এখন তোমরা আমার আযাদকৃত হয়ে যাও। যেভাবেই চাও জান্নাত দ্বারা উপকৃত হও।"

এ কথাও বলা হয়েছে যে, আ'রাফবাসী হচ্ছে ঐসব লোক যারা অবৈধভাবে সৃষ্ট হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "জ্বিনদের মধ্যেও মুমিন রয়েছে এবং তাদের জন্যেও পুণ্য ও শাস্তি রয়েছে।" সাহাবীগণ তাদের মুমিনদের সম্পর্কে এবং পুণ্যের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেনঃ "তারা হবে আ'রাফের অধিবাসী। জান্নাতে তারা উম্মতে মুহাম্মাদিয়ার সাথে থাকবে না।" জিজ্ঞেস করা হয়ঃ "আ'রাফ কি?" উত্তরে তিনি বলেনঃ "ওটা হচ্ছে জান্নাতের নিকটবর্তী একটি প্রাচীর, যার মধ্যে নহরও রয়েছে, গাছও রয়েছে এবং ফলও রয়েছে।" মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, আ'রাফবাসী হচ্ছেন ঐসব সৎ লোক যাঁরা ফকীহ্ ও আলিম।

وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ এই আয়াত সম্পর্কে আবূ মুজলিয (রঃ) বলেন যে, যাঁরা আ'রাফের উপর নির্ধারিত থাকবেন তাঁরা হবেন ফেরেশতা। তাঁরা জান্নাতবাসী ও জাহান্নামবাসীকে চিনতে পারবেন এবং জান্নাতবাসীদেরকে তাঁরা ডাক দিয়ে বলবেনঃ "আস্‌সালামু আলাইকুম।" তাঁরা জান্নাতে থাকবেন না বটে, কিন্তু জান্নাতের জন্যে আশান্বিত হয়ে থাকবেন। আর তাঁরা জাহান্নামীদেরকে দেখে জাহান্নাম থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করবেন। আ'রাফবাসীরা

এমন লোকদেরকে ডাক দেবে যাদেরকে তারা তাদের উজ্জ্বল চেহারা দেখে চিনতে পারবে এবং তাদেরকে বলবেঃ ' তোমরা ফখর ও অহংকারের বশবর্তী হয়ে আল্লাহর হুকুম অমান্য করতে না।' যে পাপী লোকগুলো আল্লাহর রহমতপ্রাপ্ত হয়নি তারা জান্নাতী হতে পারে না। আর জান্নাতীদেরকে যখন জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে তখন তাদেরকে বলা হবেঃ 'যাও, এখন জান্নাতে তোমাদের কোন ভয়ও নেই এবং তোমরা চিন্তিতও হবে না।' এ উক্তিটি অত্যন্ত দুর্বল এবং বাকরীতিও প্রকাশ্য শব্দের উল্‌টো। জমহূরের উক্তিটিই অগ্রগণ্য। কেননা, ওটা আয়াতের প্রকাশ্য শব্দের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। হযরত মুজাহিদ (রঃ)-এর উপরোক্ত উক্তিটিও দুর্বলতামুক্ত নয়। কুরতুবী (রঃ) এতে বারোটি উক্তি নকল করেছেন। যেমন সৎ লোকগণ, নবীগণ, ফেরেশতাগণ ইত্যাদি। আ'রাফবাসীরা জান্নাতীদেরকে তাদের চেহারার ঔজ্জ্বল্য ও শুভ্রতা দেখে চিনে নেবে। আর জাহান্নামীদেরকে চিনে নেবে তাদের কালিমাময় চেহারা দেখে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ পাক তাদেরকে এই মর্যাদা এ জন্যেই দিয়েছেন যেন তারা জানতে পারে যে জান্নাতী কারা এবং জাহান্নামী কারা। তারা জাহান্নামীদেরকে তাদের মলিন ও কালিমাময় চেহারা দেখে চিনতে পারবে এবং আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে বলবে– হে আল্লাহ! আমাদেরকে এই অত্যাচারীদের অন্তর্ভুক্ত করবেন না। ঐ অবস্থাতেই তারা জান্নাতবাসীদেরকে সালাম জানাবে। তারা নিজেরা তখন পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করেনি বটে, কিন্তু তারা জান্নাতে প্রবেশ লাভের আশা রাখে এবং ইনশাআল্লাহ জান্নাতে প্রবেশ করবে। হাসান বসরী (রঃ) বলেনঃ "আল্লাহর শপথ! এই লোভ ও আশা তাদের অন্তরে শুধু সেই দয়া ও অনুগ্রহের কারণে রয়েছে যা আল্লাহ তাদের অবস্থার উপর যুক্ত রেখেছেন। আর তারা যে আশা রাখবে তা আল্লাহ তাদেরকে জ্ঞাত করেও দিয়েছেন। অর্থাৎ তিনি বলেছেনঃ "তারা জাহান্নামবাসীদেরকে দেখে বলবে– হে আল্লাহ! আমাদেরকে তাদের অবস্থা থেকে রক্ষা করুন!" ইকরামা (রঃ) বলেন যে, আ'রাফবাসীরা যখন জাহান্নামবাসীদের দিকে চেয়ে দেখবে তখন তাদের চেহারা ঝলসে উঠবে। অতঃপর যখন জান্নাতবাসীদের দিকে তাকাবে তখন তাদের ঐ অবস্থা দূরীভূত হয়ে যাবে।

৪৮। আ'রাফবাসীরা কয়েকজন জাহান্নামী লোককে তাদের লক্ষণ দ্বারা চিনতে পেরে ডাক দিয়ে বলবে– তোমাদের

٤٨- وَنَادٰۤى اَصْحٰبُ الْاَعْرَافِ رِجَالًا يَّعْرِفُوْنَهُمْ بِسِيْمٰهُمْ

قَالُوْا مَا اَغْنٰى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُوْنَ ۝

বাহিনী ও পার্থিব জীবনের ধন-সম্পদ এবং তোমাদের গর্ব-অহংকার তোমাদের কোনই উপকারে আসল না।

٤٩- اَهٰؤُلَاۤءِ الَّذِيْنَ اَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللّٰهُ بِرَحْمَةٍ ؕ اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَاۤ اَنْتُمْ تَحْزَنُوْنَ ۝

৪৯। আর এই জান্নাতবাসীরা কি সেই লোক যাদের সম্পর্কে তোমরা কসম করে বলতে যে, এদের প্রতি আল্লাহ দয়া প্রদর্শন করবেন না? (অথচ তাদের জন্যে এই ফরমান জারী হলো যে,) তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর, তোমাদের কোন ভয় নেই এবং তোমরা চিন্তিত ও দুঃখিত হবে না।

আল্লাহ তা'আলা এখানে সেই তিরস্কারের বর্ণনা দিচ্ছেন যা আ'রাফবাসীরা কিয়ামতের দিন মুশরিকদের নেতৃবর্গকে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত দেখে করবে। তারা তাদেরকে সম্বোধন করে বলবে– "আজকে তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদের কোন উপকারে আসলো না এবং তোমাদের গর্ব-অহংকার ও দুষ্টামি আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষা করার ব্যাপারে তোমাদের কোনই উপকার করলো না। তোমরা আজ শাস্তির শিকার হয়ে গেলে।" এই মুশরিকরাই আ'রাফবাসীদের সম্বন্ধে শপথ করে বলতো যে, তারা কখনো আল্লাহর অনুগ্রহ লাভ করবে না। এখন আল্লাহ তা'আলা আ'রাফবাসীদেরকে বলবেন– যাও, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর। তোমাদের কোন ভয়ও নেই এবং তোমরা দুঃখিত ও চিন্তিতও হবে না।

হযরত হুযাইফা (রাঃ) বলেন যে, আ'রাফবাসী হচ্ছে ঐসব লোক যাদের আমল সমান সমান। অর্থাৎ এতোটা নয় যে, জান্নাতে যেতে পারে এবং এরূপও নয় যে, জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হয়। সুতরাং তারা আ'রাফের মধ্যে থেকে জাহান্নামবাসী ও জান্নাতবাসীকে তাদের চেহারা দেখেই চিনে নেবে। কিয়ামতের দিন যখন সমস্ত বান্দার ফায়সালা হয়ে যাবে তখন আল্লাহ তা'আলা শাফাআত করার অনুমতি প্রদান করবেন। লোকেরা হযরত আদম (আঃ)-এর কাছে এসে বলবে– 'আপনি আমাদের পিতা। সুতরাং আপনি আল্লাহ পাকের নিকট আমাদের

জন্যে সুপারিশ করুন!' তিনি বলবেনঃ "তোমরা কি জান যে, আল্লাহ্ আমাকে ছাড়া আর কাউকেও স্বহস্তে বানিয়েছেন এবং ওর মধ্যে স্বীয় বিশেষ রূহ্ ফুঁকে দিয়েছেন? আর তোমরা এটাও কি জান যে, ফেরেশ্তারা আমাকে ছাড়া আর কাউকেও সিজদাহ করেছেন?" জনগণ উত্তরে বলবে– 'না।' তখন হযরত আদম (আঃ) বলবেনঃ "কিন্তু আমিও আল্লাহর সত্তার রহস্য সম্পর্কে অবহিত নই। আমার তো সুপারিশ করার ক্ষমতা নেই। তোমরা আমার সন্তান হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর কাছে যাও।" জনগণ হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর কাছে যাবে এবং তাঁকে সুপারিশ করার আবেদন জানাবে। তিনি বলবেনঃ "আল্লাহ আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে কি স্বীয় খলীল (দোস্ত) বলে ঘোষণা করেছেন? আর আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে কি তার কওম অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করেছে?" লোকেরা বলবেঃ 'না।' তিনি বলবেনঃ "আমি শাফাআত করতে পারছি না। আমি আল্লাহর রহস্য অবগত নই। তোমরা হযরত মূসা (আঃ)-এর কাছে যাও।" হযরত মূসা (আঃ) বলবেনঃ "আমাকে ছাড়া আল্লাহ আর কারো সাথে সরাসরি কথা বলেননি। তথাপি আমিও আল্লাহর হাকীকত সম্পর্কে জ্ঞান রাখি না। তোমরা হযরত ঈসা (আঃ)-এর কাছে যাও।" হযরত ঈসা (আঃ) বলবেনঃ "আল্লাহ আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে কি বিনা বাপে সৃষ্টি করেছেন? আমি ছাড়া অন্য কেউ কি কুষ্ঠরোগীকে আরোগ্য দান করতে পেরেছে, যার কোন চিকিৎসা নেই? আর আমি ছাড়া অন্য কেউ কি মৃতকে জীবিত করতে সক্ষম হয়েছে?" জনগণ উত্তরে বলবে– 'না।' তিনি বলবেনঃ "আমিও কিন্তু আল্লাহর সত্তা সম্পর্কে অজ্ঞ। আমি আমার নিজের চিন্তাতেই ব্যস্ত। তোমরা হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)-এর কাছে যাও।" (রাসূলুল্লাহ সঃ বলেন) জনগণ তখন আমার কাছে আসবে। আমি তখন বুকে হাত মেরে বলবো– হ্যাঁ, আমি তোমাদের জন্যে সুপারিশ করবো। তারপর আমি আল্লাহর আরশের সামনে দাঁড়াবো। সেই সময় আল্লাহ পাকের প্রশংসায় আমার মুখ এমনভাবে খুলে যাবে যে, এরূপ প্রশংসা তোমরা কখনও শুননি। অতঃপর আমি সিজদায় পড়ে যাবো। আল্লাহ তা'আলা বলবেনঃ "হে মুহাম্মাদ (সঃ)! তুমি মাথা উঠাও। কি চাও, বল। শাফাআত করলে তোমার শাফাআত কবূল করা হবে।" আমি তখন মাথা উঠিয়ে পুনরায় আল্লাহ পাকের গুণকীর্তন করবো। এরপর আবার সিজদায় পড়ে যাবো। আবার বলা হবে– "মাথা উঠাও এবং আবেদন পেশ কর।" আমি তখন মাথা উঠিয়ে আরয করবোঃ হে আমার প্রতিপালক! আমার উম্মতকে ক্ষমা করে দিন। আল্লাহ তা'আলা বলবেনঃ "হ্যাঁ ক্ষমা করে দিলাম।" এই অবস্থা দেখে এমন কোন প্রেরিত রাসূল এবং কোন ফেরেশতা থাকবেন না যিনি হিংসা করবেন না। এটাই হচ্ছে মাকামে মাহমূদ।

তারপর আমি সমস্ত উম্মতকে নিয়ে জান্নাতের দিকে পা বাড়াবো। আমার জন্যে জান্নাতের দরজা খুলে যাবে। এরপর এই সমস্ত উম্মতকে 'নাহরে হায়াত' নামক নদীতে নিয়ে যাওয়া হবে, যার উভয় তীর মনিমুক্তা ও হীরা জহরত দ্বারা বাঁধানো থাকবে। ওর মাটি হবে মিশ্ক এবং ওর পাথর হবে ইয়াকূত। এ লোকগুলো ঐ নদীতে গোসল করবে এবং তাদের দেহের রং জান্নাতীদের মত হয়ে যাবে। আর তাদের দেহ থেকে জান্নাতীদের সুগন্ধি ছড়িয়ে পড়বে। তাদেরকে দেখে মনে হবে যেন তারা উজ্জ্বল নক্ষত্র। কিন্তু তাদের বক্ষের উপর উজ্জ্বল চিহ্ন থাকবে, যা দ্বারা তাদেরকে চেনা যাবে। তাদেরকে 'মাসাকীনে আহলিল জান্নাহ' বলা হবে।

٥٠- وَنَادٰۤى اَصْحٰبُ النَّارِ اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ اَنْ اَفِيْضُوْا عَلَيْنَا مِنَ الْمَآءِ اَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ قَالُوْۤا اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ○

৫০। জাহান্নামীরা জান্নাতীদেরকে সম্বোধন করে বলবে– আমাদের উপর কিছু পানি ঢেলে দাও অথবা তোমাদের আল্লাহ প্রদত্ত জীবিকা হতে কিছু প্রদান কর, তারা বলবে– আল্লাহ এসব জিনিস কাফিরদের প্রতি হারাম করে দিয়েছেন।

٥١- الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَهُمْ لَهْوًا وَّلَعِبًا وَّغَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ نَنْسٰىهُمْ كَمَا نَسُوْا لِقَآءَ يَوْمِهِمْ هٰذَا وَمَا كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَجْحَدُوْنَ ○

৫১। যারা নিজেদের দ্বীনকে খেল তামাসার বস্তুতে পরিণত করেছিল এবং পার্থিব জীবন যাদেরকে প্রতারণা ও গোলক ধাঁধাঁয় নিমজ্জিত করে রেখেছিল, সুতরাং আজকের দিনে আমি তাদেরকে তেমনিভাবে ভুলে থাকবো যেমনিভাবে তারা এই দিনের সাক্ষাতের কথা ভুলে গিয়েছিল এবং যেমন তারা আমার নিদর্শন ও আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছিল।

জাহান্নামীদের লাঞ্ছনা এবং কিভাবে তারা জান্নাতবাসীদের নিকট খাদ্য ও পানীয় চাইবে আল্লাহ তা'আলা এখানে তারই বর্ণনা দিচ্ছেন; জান্নাতীরা তাদেরকে কিছুই দেবে না। ইরশাদ হচ্ছে– জাহান্নামীরা জান্নাতীদেরকে বলবে, তোমাদের খাদ্য ও পানীয় আমাদেরকেও কিছু প্রদান কর। পুত্র পিতার নিকট এবং ভাই ভাই-এর নিকট চাইবে এবং বলবে, আমি পিপাসায় কাতর হয়ে পড়েছি, সুতরাং আমাকে অল্পকিছু পানি দাও। কিন্তু তারা এই জবাবই দেবে–আল্লাহ এ দুটো জিনিস কাফিরদের উপর হারাম করে দিয়েছেন।

আবূ মূসা সাফফার (রঃ) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেন, উত্তম সাদকা কোনটি? তিনি উত্তরে বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "সর্বোত্তম সদকা হচ্ছে পানি। তোমরা কি শুননি যে, জাহান্নামবাসী জান্নাতবাসীর কাছে পানি ও খাদ্য চাইবে?" আবূ সালিহ্ হতে বর্ণিত আছে যে, যখন আবূ তালিব অসুস্থ হয়ে পড়ে তখন জনগণ তাকে বলে–"আপনি আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রকে বলে পাঠান যে, তিনি যেন একটি জান্নাতী আঙ্গুরগুচ্ছ নিয়ে আসেন, হয়তো এর বরকতে আপনি আরোগ্য লাভ করবেন।" তখন তার দূত রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে আগমন করেন। সেই সময় হযরত আবূ বকর (রাঃ) তাঁর নিকট উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি বললেনঃ "আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের উপর জান্নাতের প্রত্যেকটা জিনিস হারাম করে দিয়েছেন।" আল্লাহ্ পাক বলেনঃ কাফিররা কিভাবে দুনিয়ায় মাযহাব ও দ্বীনকে খেল-তামাসার বস্তুতে পরিণত করেছে এবং দুনিয়ার মধ্যে কিভাবে ভুলের মধ্যে পড়ে রয়েছে, আর কিরূপেই বা দুনিয়ার শোভা ও সৌন্দর্যের মধ্যে নিমগ্ন রয়েছে! কেমন করে তারা আখিরাতের পণ্য ক্রয় করা থেকে উদাসীন রয়েছে!

এরপর আল্লাহ্ পাক বলেনঃ "আজকে আমি তাদেরকে তেমনিভাবে ভুলে থাকবো যেমনিভাবে তারা এই দিনের সাক্ষাতের কথা ভুলে গিয়েছিল।" এই ভুলে যাওয়া শব্দটি পরস্পর আদান প্রদান ও বিনিময় হিসেবে বলা হয়েছে। নতুবা আল্লাহ্ তা'আলা কখনো কাউকেও ভুলে থাকতে পারেন না। যেমন তিনি এক জায়গায় বলেন فِىْ كِتٰبٍ لَّا يَضِلُّ رَبِّىْ وَ لَا يَنْسٰى (২০ঃ ৫২) এখানে উদ্দেশ্য শুধুমাত্র পাল্টা ভাবের কথা বলা। যেমন তিনি আর এক জায়গায় বলেনঃ

نَسُوا اللّٰهَ فَنَسِيَهُمْ অর্থাৎ "তারা আল্লাহকে ভুলে গিয়েছিল, সুতরাং তিনিও তাদেরকে ভুলে গেছেন।" (৯ঃ ৬৭) তিনি আরও বলেনঃ

وَ كَذٰلِكَ اَتَتْكَ اٰيٰتُنَا فَنَسِيْتَهَا وَ كَذٰلِكَ الْيَوْمَ تُنْسٰى

অর্থাৎ "এরূপই তোমার কাছে আমার নিদর্শনসমূহ এসে ছিল, অতঃপর তুমি সেগুলো ভুলে গিয়েছিলে, তদ্রূপ আজকে তোমাকেও ভুলে যাওয়া হলো।' (১২৬ঃ২০) অন্য এক জায়গায় আল্লাহ পাক বলেনঃ

فَالْيَوْمَ نَنْسٰهُمْ كَمَا نَسُوْا لِقَآءَ يَوْمِهِمْ هٰذَا

অর্থাৎ "যেমন তোমরা তোমাদের এদিনের সাক্ষাৎকে ভুলে গিয়েছিলে তদ্রূপ আমিও তোমাদেরকে আজকে ভুলে গেলাম।" (৫১ঃ ৭) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, আল্লাহ তাদের কল্যাণ করা ভুলে গেছেন, কিন্তু তাদেরকে শাস্তি দিতে ভুলেননি।

হাদীসে এসেছে যে, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন বান্দাদেরকে বলবেনঃ "আমি কি তোমাদেরকে স্ত্রী ও ছেলেমেয়ে প্রদান করিনি এবং তোমাদেরকে কি পুরস্কৃত করিনি? তোমাদেরকে কি আমি উট, ঘোড়া, হাতী ও সাজ-সরঞ্জাম প্রদান করেছিলাম না? তোমরা কি দুনিয়ায় নেতৃত্ব দিতে না?" বান্দা উত্তরে বলবেঃ "হে আল্লাহ! হ্যাঁ, আপনি আমাদেরকে সবকিছুই প্রদান করেছিলেন।" আল্লাহ পুনরায় তাদেরকে জিজ্ঞেস করবেনঃ "আমার সামনে তোমাদেরকে হাজির হতে হবে এটা কি তোমাদের বিশ্বাস ছিল?" তারা বলবেনঃ 'হে আল্লাহ! না, আমাদের এটার প্রতি বিশ্বাস ছিল না।' আল্লাহ তা'আলা তখন বলবেনঃ "তোমরা যেমন আমাকে ভুলে গিয়েছিলে তেমনি আজ আমি তোমাদেরকে ভুলে গেলাম।"

৫২। আর আমি তাদের নিকট এমন একখানা কিতাব পৌঁছিয়ে ছিলাম যাকে আমি জ্ঞান তথ্যে সমৃদ্ধ ও সুবিস্তৃত করেছিলাম এবং যা ছিল ঈমানদার সম্প্রদায়ের জন্যে পথ নির্দেশ ও রহমতের প্রতীক।

৫২- وَلَقَدْ جِئْنٰهُمْ بِكِتٰبٍ فَصَّلْنٰهُ عَلٰى عِلْمٍ هُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ○

৫৩। তারা আর কিছুর অপেক্ষা করছে না, শুধু এর সর্বশেষ পরিণতির অপেক্ষায় রয়েছে, যেই দিন এর সর্বশেষ পরিণতি এসে সমুপস্থিত হবে, সেই দিন যারা এর আগমনের কথা

৫৩- هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّا تَاْوِيْلَهٗ يَوْمَ يَاْتِيْ تَاْوِيْلُهٗ يَقُوْلُ الَّذِيْنَ نَسُوْهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ

ভুলে গিয়েছিল তারা বলবে- বাস্তবিকই আমাদের প্রতিপালকের রাসূলগণ সত্য কথা এনেছিলেন, সুতরাং (এখন) এমন কোন সুপারিশকারী আছে কি যারা আমাদের জন্যে সুপারিশ করবে? অথবা আমাদেরকে কি পুনরায় দুনিয়ায় পাঠানো যেতে পারে যাতে আমরা পূর্বের কৃতকর্মের তুলনায় ভিন্ন কিছু করতে পারি? নিঃসন্দেহে তারা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি করেছে, আর তারা যেসব মিথ্যা (মা'বূদ ও রসম রেওয়াজ) রচনা করেছিল, তাও তাদের হতে অন্তর্হিত হয়েছে।	جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَّنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا اَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا اَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٥٣﴾

আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের উপর দলীল পরিপূর্ণ করে দিয়েছিলেন। অর্থাৎ তিনি পয়গম্বর প্রেরণ করেছিলেন এবং কিতাবসমূহ পাঠিয়েছিলেন। যেগুলোর মধ্যে স্পষ্ট দলীলসমূহ বিদ্যমান ছিল। যেমন তিনি বলেনঃ كِتٰبٌ اُحْكِمَتْ اٰيٰتُهٗ ثُمَّ فُصِّلَتْ..... অর্থাৎ এমন কিতাব যার আয়াতগুলো স্পষ্ট মর্মবিশিষ্ট এবং প্রত্যেক কথাকে পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করে দেয়া হয়েছে। (১১ঃ ১) আর তার উক্তিঃ فَصَّلْنٰهُ عَلٰى عِلْمٍ অর্থাৎ যে যে বিষয়গুলোর উপর আমি আলোকপাত করেছি সেগুলো সম্পর্কে আমি সম্যক অবগত আছি। যেমন অন্য জায়গায় তিনি اَنْزَلَهٗ بِعِلْمِهٖ বলেছেন।

ইবনে জারীর (রঃ) বলেন যে, এই আয়াতটি আল্লাহ পাকের নিম্নের উক্তির সাথে সম্পর্ক রাখেঃ كِتٰبٌ اُنْزِلَ اِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِيْ صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ 'এই কিতাব যা তোমার উপর অবতীর্ণ করা হয়েছে, তাতে তোমার অন্তরে যেন কোন সন্দেহের উদ্রেক না হয়।' (৭ঃ ২) আর এটা উপরোক্ত وَلَقَدْ جِئْنٰهُمْ بِكِتٰبٍ ....-এই আয়াতের সঙ্গেও সম্পর্কযুক্ত। ইবনে জারীর (রঃ)-এর একথাটি আপত্তি মূলক।

কেননা এ দু'টি আয়াতের মধ্যে দীর্ঘ ব্যবধান রয়েছে। তাছাড়া তাঁর এ দাবীর উপর কোন দলীলও নেই। এখানে কথা তো শুধু এটাই যে, তারা আখিরাতে কিরূপ ক্ষতির সম্মুখীন হবে এই খবর দেয়ার পর এটা তিনি উল্লেখ করেছেন যে, দুনিয়ায় রাসূল পাঠিয়ে ও কিতাব অবতীর্ণ করে তাদের সমুদয় ওযরের সমাপ্তি ঘটিয়েছেন। যেমন তিনি বলেছেনঃ

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلًا

অর্থাৎ "আমি শাস্তি প্রদানকারী নই যে পর্যন্ত না রাসূল প্রেরণ করি।" (১৭ঃ১৫) এ জন্যেই উপরোক্ত আয়াতে তিনি বলেছেনঃ هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّا تَاْوِيْلَهٗ অর্থাৎ তারা তো শুধু ঐ শাস্তির এবং জান্নাত বা জাহান্নামের অপেক্ষায় রয়েছে যার অঙ্গীকার তাদের সাথে করা হয়েছে।

মুজাহিদ (রঃ) প্রমুখ মনীষীগণ বলেন যে, تَاْوِيْل দ্বারা বিনিময় ও প্রতিদান বুঝানো হয়েছে। রাবী (রঃ) বলেন যে, হিসাবের দিনের আগমন পর্যন্ত এই প্রতিদান তারা পেতে থাকবে, শেষ পর্যন্ত জান্নাতীরা জান্নাতে এবং জাহান্নামীরা জাহান্নামে পৌঁছে যাবে। ঐ সময় বিনিময় আদান প্রদান শেষ হয়ে যাবে। যখন কিয়ামতের এই অবস্থা হবে তখন যেসব লোক দুনিয়ায় আমল পরিত্যাগ করেছিল তারা বলবে– আল্লাহর রাসূলগণ তো সত্য বাণী নিয়ে এসেছিলেন, কিন্তু এখন তাঁরা কি আমাদের জন্যে আল্লাহর নিকট সুপারিশ করবেন বা অন্ততঃপক্ষে আমাদেরকে পুনরায় প্রেরণ করা হবে? তাহলে আমরা আর আমাদের পূর্বের ঐ আমল করবো না। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "(হে নবী সঃ)! যদি তুমি ঐ দৃশ্য দেখতে যখন পাপীদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করার জন্যে জাহান্নামের মুখে দাঁড় করানো হবে তখন তারা বলবে–হায়! যদি আমাদেরকে পুনরায় দুনিয়ায় ফিরিয়ে দেয়া হতো তবে আমরা কুরআনকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতাম না এবং মুমিন হয়েই থাকতাম। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার এই যে, পূর্ব থেকেই কোন্ কথাটি তাদের অন্তরে লুক্কায়িত ছিল তা তারা জেনে ফেলেছে। আর যদি তাদেরকে পুনরায় দুনিয়ায় ফিরিয়ে দেয়াও হয় তবে তখনও তারা সেখানে ঐ কাজই করবে যা থেকে তাদেরকে নিষেধ করা হবে। 'আমরা এরূপ কাজ আর করবো না' তাদের একথা সম্পূর্ণ মিথ্যা। যেমন এখানে আল্লাহ পাক বলেছেনঃ নিঃসন্দেহে তারা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি সাধন করেছে। এখন তো জাহান্নামে তাদের চিরস্থায়ী বাসের পালা এসেছে। তাদের মূর্তি তাদের জন্যে সুপারিশ করতে পারে না এবং তাদেরকে শাস্তি থেকে মুক্তি দিতেও সক্ষম নয়।

৫৪। নিশ্চয়ই তোমাদের প্রতিপালক হচ্ছেন সেই আল্লাহ যিনি আসমান ও যমীনকে ছয়দিনে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনি স্বীয় আরশের উপর সমাসীন হন, তিনি দিবসকে রাত্রি দ্বারা আচ্ছাদিত করেন-যাতে ওরা একে অন্যকে অনুসরণ করে চলে ত্বড়িত গতিতে; সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজী সবই তাঁর হুকুমের অনুগত, জেনে রাখো, সৃষ্টির একমাত্র কর্তা তিনিই আর হুকুমের একমাত্র মালিক তিনিই, সারা জাহানের প্রতিপালক আল্লাহ হলেন বরকতময়।

٥٤ - اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ قف يُغْشِى الَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهٗ حَثِيْثًا لا وَّ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ وَ النُّجُوْمَ مُسَخَّرٰتٍۭ بِاَمْرِهٖ اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَ الْاَمْرُ تَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ○

এখানে আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, তিনি আসমান ও যমীনের সৃষ্টিকর্তা। আসমান ও যমীনকে তিনি ছয়দিনে সৃষ্টি করেছেন। যার বর্ণনা কোরআন কারীমের কয়েক জায়গায় এসেছে। ঐ ছয়দিন হচ্ছে রবিবার সোমবার, মঙ্গলবার, বুধবার, বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার। শুক্রবারেই সমস্ত মাখলূক একত্রিত হয়। ঐ দিনেই হযরত আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করা হয়। দিনগুলো এই দিনের মতই ছিল কি এক হাজার বছর বিশিষ্ট দিনগুলো ছিল এ ব্যাপারেও মতানৈক্য রয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর ধারণা মতে দিনগুলো ছিল হাজার বছর বিশিষ্ট দিন। এখন থাকলো শনিবার। ঐদিনে কিছু সৃষ্টি করা হয়নি। ঐদিন সৃষ্টিকার্য বন্ধ ছিল। একারণেই ঐ সপ্তম দিন অর্থাৎ শনিবারের দিনকে يَوْمُ السَّبْتِ বলা হয়। আর سَبْتٌ শব্দের অর্থ হচ্ছে কাতা' বা কর্তন। হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমার হাত ধরে রয়েছিলেন, এমতাবস্থায় তিনি বলেনঃ "আল্লাহ তা'আলা শনিবারে সৃষ্টি করেন যমীন, রবিবারে সৃষ্টি করেন পাহাড়-পর্বত, সোমবারে সৃষ্টি করেন বৃক্ষরাজী, মন্দ ও অপছন্দনীয় জিনিসগুলো সৃষ্টি করেন মঙ্গলবারে, বুধবারে সৃষ্টি করেন আলো,

সমস্ত জীব-জন্তু সৃষ্টি করেন বৃহস্পতিবার এবং হযরত আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করেন শুক্রবারের শেষভাগে আসর ও মাগরিবের মধ্যবর্তী সময়ে।" এ হাদীস দ্বারা সপ্তম দিনেও ব্যস্ত থাকা সাব্যস্ত হচ্ছে। অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন যে, ব্যস্ততার দিনের সংখ্যা ছিল ছয়। এজন্যে বুখারী (রঃ) প্রমুখ মনীষী এ হাদীসের সঠিকতার ব্যাপারে সমালোচনা করেছেন এবং বলেছেন যে, সম্ভবতঃ আবূ হুরাইরা (রাঃ) এটা কা'ব আহবার থেকে শুনেই বলেছেন। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক অবগত।

এই ছয়দিনের ব্যস্ততার পর আল্লাহ তা'আলা আরশের উপর সমাসীন হন। এ স্থানে লোকেরা বহু মতামত পেশ করেছেন এবং বহু জল্পনা-কল্পনা করেছেন। এগুলোর ব্যাখ্যা দেয়ার সুযোগ এখানে নেই। এ ব্যাপারে আমরা শুধুমাত্র পূর্ববর্তী গুরুজনদের মাযহাব অবলম্বন করেছি। তাঁরা হচ্ছেন মালিক (রঃ), আওযায়ী (রঃ)-সাওরী (রঃ), লায়েস ইবনে সা'দ (রঃ), শাফিঈ (রঃ), আহমাদ (রঃ) ইসহাক ইবনে রাহওয়াই (রঃ) ইত্যাদি এবং নবীন ও প্রবীণ মুসলিম ইমামগণ। আর ঐ মাযহাব হচ্ছে এই যে, কোন অবস্থা ও সাদৃশ্য স্থাপন ছাড়াই ওটার ওপর বিশ্বাস রাখতে হবে। কোন জল্পনা-কল্পনা করাও চলবে না যার দ্বারা সাদৃশ্যের আকীদা মস্তিষ্কে এসে যায় এবং এটা আল্লাহ তা'আলার গুণাবলী হতে বহু দূরে। মোটকথা, যা কিছু আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ওটাকে কোন খেয়াল ও সন্দেহ ছাড়াই মেনে নিতে হবে এবং কোন -চুল চেরা করা চলবে না। কেননা, আল্লাহ পাক কোন বস্তুর সাথে সাদৃশ্যযুক্ত নন। তিনি হচ্ছেন শ্রোতা ও দ্রষ্টা। যেমন মুজতাহিদ বা চিন্তাবিদগণ বলেছেন। এঁদের মধ্যে নাঈম ইবনে হাম্মাদ আল খুযায়ীও (রঃ) রয়েছেন, যিনি হচ্ছেন ইমাম বুখারীর (রঃ) উস্তাদ। তিনি বলেনঃ "যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলাকে কোন মাখলূকের সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত করে সে কুফরীর দোষে দোষী হয়ে যায় এবং আল্লাহ তা'আলা নিজেকে যেসব গুণে ভূষিত করেছেন তা যে ব্যক্তি অস্বীকার করে সে কাফির হয়ে যায়। আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (সঃ) যেসব গুণে তাঁকে ভূষিত করেননি সেসব গুণে তাঁকে ভূষিত করাই হচ্ছে তাঁর সাদৃশ্য স্থাপন করা। কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্যে ঐ সব গুণ সাব্যস্ত করে যা স্পষ্টরূপে তাঁর আয়াতসমূহের মধ্যে ও বিশুদ্ধ হাদীসগুলোর মধ্যে বর্ণিত হয়েছে এবং যদদ্বারা তাঁর মহিমা প্রকাশ পেয়েছে ও তাঁর সত্তাকে সর্বপ্রকার ত্রুটি থেকে মুক্ত করেছে, সেই ব্যক্তিই সঠিক খেয়ালের উপর রয়েছে।

ইরশাদ হচ্ছে- তিনি দিনকে রাত্রি দ্বারা আচ্ছাদিত করেন অর্থাৎ রাত্রির অন্ধকারকে দিনের আলো দ্বারা এবং দিনের আলোকে রাত্রির অন্ধকার দ্বারা আচ্ছাদিত করেন। এই দিন রাত্রির প্রত্যেকটি অপরটিকে খুবই তড়িৎ গতিতে

পেয়ে যায়। অর্থাৎ একটি শেষ হতে শুরু করলে অপরটি ত্বড়িত গতিতে এসে পড়ে এবং একটি বিদায় নিলে অপরটি তৎক্ষণাৎ এসে যায়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وَ اٰيَةٌ لَّهُمُ الَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَاِذَا هُمْ مُّظْلِمُوْنَ ـ وَ الشَّمْسُ تَجْرِىْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ـ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنٰهُ مَنَازِلَ حَتّٰى عَادَ كَالْعُرْجُوْنِ الْقَدِيْمِ ـ لَا الشَّمْسُ يَنْۢبَغِىْ لَهَاۤ اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَ لَا الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِىْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ ـ

অর্থাৎ "রাত্রিও তাদের জন্যে একটি নিদর্শন, আমি ওটা হতে দিনকে অপসারণ করি, আর তৎক্ষণাৎ তারা অন্ধকারে থেকে যায়। আর সূর্য ওর নির্দিষ্ট কক্ষে ভ্রমণ করে চলছে, ওটা তাঁরই নির্ধারিত পরিমাণ যিনি মহাপরাক্রান্ত, জ্ঞানময়। আর (অন্যতম নিদর্শন) চন্দ্রের জন্যে আমি মনযিলসমূহ নির্ণীত করে রেখেছি। (এবং চন্দ্র ওটা অতিক্রম করছে) এমন কি ওটা (অতিক্রম শেষে ক্ষীণ হয়ে) এরূপ হয়ে যায় যে, যেন খেজুরের পুরাতন শাখা। সূর্যের সাধ্য নেই যে চন্দ্রকে গিয়ে ধরবে আর না রাত্রি দিবসের পূর্বে আসতে পারবে এবং প্রত্যেকে এক একটি চক্রের মধ্যে সন্তরণ করছে।" (৩৭ঃ ৪০) এজন্যেই আল্লাহ পাক شمس يطلبه حثيثا والشمس و القمر و النجوم مسخرت بامره বলেছেন। কেউ কেউ এবং قمر কে نصب দিয়ে পড়েছেন এবং কেউ কেউ পড়েছেন رفع দিয়ে । উভয় অবস্থাতেই অর্থ একই হবে। অর্থাৎ সমস্ত কিছুই তাঁর পরিচালনাধীন এবং ইচ্ছাধীন। এ জন্যেই তিনি বলেছেনঃ اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَ الْاَمْرُ অর্থাৎ 'জেনে রেখো যে, সৃষ্টির একমাত্র কর্তা তিনিই এবং হুকুমের একমাত্র মালিক ও তিনিই।' تَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ অর্থাৎ 'বিশ্বজাহানের প্রতিপালক আল্লাহ হচ্ছেন বরকতময়।' যেমন تَبٰرَكَ الَّذِىْ جَعَلَ فِى السَّمَآءِ بُرُوْجًا (২৫ঃ ৬১) বলেছেন।

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি সৎ আমল করে আল্লাহর নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলো না, বরং নিজের প্রশংসা করলো সে কুফরী করলো। তার আমল ছিনিয়ে নেয়া হবে। আর যে ব্যক্তি ধারণা করে যে, আল্লাহ তা'আলা নিজের কোন হুকুমত বা কোন ক্ষমতা বান্দার কাছে হস্তান্তর করেছেন সেও কুফরী করেছে। কেননা, আল্লাহ পাক বলেছেনঃ

اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَ الْاَمْرُ تَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ

অর্থাৎ "জেনে রেখো যে, সৃষ্টির একমাত্র কর্তা তিনিই এবং একমাত্র হুকুমের মালিকও তিনিই। বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ হলেন বরকমত।।" দুআয়ে মাসূরায় নিম্নলিখিতভাবে দুআ করার কথা বলা হয়েছে–

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْمُلْكُ كُلُّهٗ لَكَ الْحَمْدُ كُلُّهٗ وَ اِلَيْكَ يَرْجِعُ الْاَمْرُ كُلُّهٗ اَسْئَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهٖ وَ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهٖ -

অর্থাৎ "হে আল্লাহ! সমুদয় রাজ্য ও রাজত্ব আপনারই। সমুদয় প্রশংসা আপনারই জন্যে। সমস্ত বিষয় আপনারই কাছে প্রত্যাবর্তন করে। আমি আপনার কাছে সমস্ত কল্যাণ প্রার্থনা করছি এবং সমুদয় অকল্যাণ হতে আশ্রয় চাচ্ছি।"

٥٥- اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّ خُفْيَةً اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ○

৫৫। তোমরা বিনীতভাবে ও সংগোপনে তোমাদের প্রতিপালককে ডাকবে, তিনি সীমালংঘনকারীদেরকে ভাল বাসেন না।

٥٦- وَ لَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا وَ ادْعُوْهُ خَوْفًا وَّ طَمَعًا اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ ○

৫৬। দুনিয়ায় শান্তি শৃংখলা স্থাপনের পর ওতে বিপর্যয় ও বিশৃংখলা সৃষ্টি করো না, আল্লাহকে ভয়-ভীতি ও আশা-আকাঙ্ক্ষার সাথে ডাক, নিঃসন্দেহে আল্লাহর রহমত সৎকর্মশীলদের অতি সন্নিকটে।

আল্লাহ পাক স্বীয় বান্দাদেরকে প্রার্থনা করার নিয়ম-নীতি শিক্ষা দিচ্ছেন যা তাদের জন্যে দ্বীন ও দুনিয়ায় মুক্তি লাভের কারণ। তিনি বলেনঃ তোমরা অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে ও সংগোপনে তোমাদের প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা কর। যেমন তিনি বলেনঃ 'প্রভুকে স্বীয় অন্তরে স্মরণ কর।' জনগণ উচ্চ স্বরে প্রার্থনা করতে শুরু করে দিয়েছিল। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ "হে লোক সকল! তোমরা নিজেদের নফসের উপর দয়া কর। তোমরা কোন বধির ও অনুপস্থিত সত্তাকে ডাকছো না। তোমরা যাঁর নিকট প্রার্থনা করছো তিনি নিকটেই রয়েছেন এবং সবকিছু শুনছেন।" অত্যন্ত কাকুতি মিনতি এবং অনুনয় বিনয়ের সাথে দুআ' করবে। খুবই নত হয়ে সংগোপনে প্রার্থনা জানাবে এবং আল্লাহর একত্ববাদের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস রাখবে। বাগাড়ম্বর করে উচ্চ স্বরে দুআ' করা উচিত নয়। রিয়াকারী থেকে বাঁচবার জন্যে পূর্বকালের লোকেরা কুরআনের হাফিয হওয়া সত্ত্বেও জনগণ ঘুণাক্ষরেও তাঁদের হাফিয হওয়ার কথা জানতে পারতো না। তাঁরা

রাত্রে নিজ নিজ ঘরে দীর্ঘক্ষণ ধরে নামায পড়তেন এবং তাঁদের ঘরে মেহমান থাকতো, অথচ তারা তাঁদের নামাযের টেরই পেতো না। কিন্তু আজকাল আমরা এ ধরনের লোক দেখতে পাই যে, সংগোপনে ইবাদত করার যথেষ্ট সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তারা সদা-সর্বদা প্রকাশ্যভাবে ইবাদত করে থাকে। পূর্ব যুগের মুসলমানরা যখন দুআ' করতেন তখন শুধু ফিস্‌ফিস শব্দ ছাড়া তাঁদের মুখ থেকে কোন শব্দ শোনা যেতো না। কেননা আল্লাহ পাক বলেনঃ "তোমরা বিনীতভাবে ও সংগোপনে তোমাদের প্রভুকে ডাকো।" আল্লাহ পাক তাঁর এক মনোনীত বান্দার বর্ণনা দিচ্ছেন যে, যখন সে স্বীয় প্রভুকে ডাকতো তখন খুবই উচ্চ স্বরে ডাকতো। শব্দকে উচ্চ করা অত্যন্ত অপছন্দনীয়। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ -এর তাফসীরে বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে– প্রার্থনায় সীমালংঘনকে আল্লাহ তা'আলা পছন্দ করেন না। আবূ মুজলিয্ (রঃ) বলেনঃ 'তোমরা নবীদের পদ মর্যাদা লাভ করার জন্যে দুআ' করো না।'

সা'দ (রঃ) স্বীয় পুত্রকে দেখেন যে, সে প্রার্থনা করছেঃ "হে আল্লাহ! আমি জান্নাত, জান্নাতের নিয়ামতরাজি এবং তথাকার রেশমী বস্ত্রের জন্যে প্রার্থনা করছি, আর জাহান্নাম হতে, জাহান্নামের শৃংখল ও বেড়ি হতে আশ্রয় চাচ্ছি।" তখন তিনি পুত্রকে বলেনঃ হে বৎস! আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছি–"নিকটবর্তী যামানায় এমন লোক সৃষ্ট হবে যারা প্রার্থনা করতে গিয়ে সীমালংঘন করবে এবং অযু করার সময় প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি ব্যবহার করবে।" অতঃপর তিনি ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً -এই আয়াতটি পাঠ করেন। হে আমার পুত্র! তোমার জন্যে তো শুধু এটুকু বলাই যথেষ্ট, "হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে জান্নাত এবং জান্নাতের নিকটবর্তীকারী কথা ও কাজের জন্যে প্রার্থনা করছি এবং জাহান্নাম হতে ও জাহান্নামের নিকটবর্তীকারী কথা ও কাজ হতে আশ্রয় চাচ্ছি।"[১] আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফ্‌ফাল (রঃ) স্বীয় পুত্রকে দেখেন যে, সে দুআ' করছে– "হে আল্লাহ! আমি জান্নাতের ডান দিকের সাদা প্রাসাদটি যাচ্ঞা করছি।" তখন তিনি পুত্রকে বলেনঃ "হে বৎস! আল্লাহর কাছে শুধু জান্নাতের জন্যে প্রার্থনা কর এবং শুধু জাহান্নাম হতে আশ্রয় চাও।"[২]

১. এটা ইমাম আহমাদ (রঃ) ও ইমাম আবূ দাউদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

২. এটা ইমাম আহমাদ (রঃ), ইবনে মাজাহ (রঃ) এবং আবূ দাউদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন এবং ইবনে কাসীর (রঃ) বলেন যে, এর ইসনাদ উত্তম।

আল্লাহ পাকের উক্তিঃ দুনিয়ায় শান্তি শৃংখলা স্থাপনের পর ওতে বিপর্যয় ও বিশৃংখলা সৃষ্টি করো না। কেননা, শান্তি ও নিরাপত্তার পরে ফাসাদ বিশৃংখলা অত্যন্ত খারাপ। কারণ, কাজ-কারবার যখন শান্ত পরিবেশে চলতে থাকে তখন যদি বিশৃংখলা সৃষ্টি করা হয় তবে বান্দা ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যায়। এ জন্যেই আল্লাহ তা'আলা بَعْدَ اِصْلَاحِهَا কথাটি যোগ করেছেন। আর তিনি বিনয়ের সাথে দুআ' করতে বলেছেন। তিনি বলেনঃ وَادْعُوْهُ خَوْفًا وَّطَمَعًا অর্থাৎ শাস্তির ভয় করে এবং নিয়ামত ও সাওয়াবের আশা রেখে তোমরা প্রার্থনা কর। এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ আল্লাহর রহমত সৎকর্মশীলদের অতি সন্নিকটে। অর্থাৎ তাঁর রহমত সৎ লোকদের অপেক্ষায় রয়েছে। তারা হচ্ছে ঐসব লোক যারা আল্লাহর নির্দেশাবলী মান্য করে চলে এবং তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকে। যেমন তিনি বলেনঃ وَرَحْمَتِيْ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ..... অর্থাৎ "আমার রহমত প্রত্যেক জিনিসকে ধারণ করে রয়েছে। (৭ঃ ১৫৬) মহান আল্লাহ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ বলেছেন, قَرِيْبَةٌ বলেননি। অথচ رَحْمَةٌ শব্দটি مُؤَنَّثٌ বা স্ত্রীলিঙ্গ। সুতরাং صِيغَة টিও স্ত্রীলিঙ্গ হওয়া উচিত ছিল। এটাকে পুংলিঙ্গ ব্যবহার করার কারণ এই যে, رَحْمَةٌ শব্দটিকে ثَوَاب -এর অর্থে নিয়ে مَعْنَوِى হিসেবে পুংলিঙ্গ ধরা হয়েছে। অথবা এও হতে পারে যে, আল্লাহ পাকের সত্তার দিকে একে اِضَافَت করা হয়েছে বলে পুংলিঙ্গ ব্যবহার করা হয়েছে। আনুগত্যের কারণে সৎকর্মশীল লোকেরা আল্লাহ তা'আলার অঙ্গীকারের ছায়ায় আশ্রয় পেয়েছে এবং তাঁর রহমতের নিকটবর্তী হয়েছে।

৫৭। সেই আল্লাহই স্বীয় রহমতের (বৃষ্টির) আগে আগে বাতাসকে সুসংবাদ বহনকারী রূপে প্রেরণ করেন, যখন ঐ বাতাস ভারী মেঘমালাকে বহন করে নিয়ে আসে, তখন আমি এই মেঘমালাকে কোন নির্জীব ভূখন্ডের দিকে প্রেরণ করি, অতঃপর ওটা হতে বারিধারা বর্ষণ করি, তারপর সেই পানির সাহায্যে সেখানে সর্বপ্রকার

٥٧- وَهُوَ الَّذِيْ يُرْسِلُ الرِّيٰحَ
بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهٖ حَتّٰىٓ
اِذَآ اَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنٰهُ
لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَاَنْزَلْنَا بِهِ الْمَآءَ
فَاَخْرَجْنَا بِهٖ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ

كَذٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتٰى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ○

ফল-ফলাদি উৎপাদন করি, এমনিভাবেই আমি মৃতকে জীবিত করে থাকি, যাতে তোমরা এটা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পার।

৫৮- وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهٗ بِاِذْنِ رَبِّهٖ ۚ وَالَّذِىْ خَبُثَ لَا يَخْرُجُ اِلَّا نَكِدًا ؕ كَذٰلِكَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّشْكُرُوْنَ ○

৫৮। আর ভাল উৎকৃষ্ট ভূমি ওর প্রতিপালকের নির্দেশক্রমে খুব ভাল ফল ফলায়, আর যা নিকৃষ্ট ভূমি, তাতে খুব কমই ফসল ফলে থাকে, এমনিভাবেই আমি কৃতজ্ঞতা পরায়ণদের জন্যে আমার নিদর্শন বিবৃত করে থাকি।

আল্লাহই যে আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা, হুকুমের মালিক একমাত্র তিনিই এবং সবকিছুর পরিচালক শুধুমাত্র তিনিই, এগুলোর বর্ণনা দেয়ার পর এখানে তিনি অবহিত করেছেন যে, তিনিই হচ্ছেন আহার্যদাতা এবং মৃতকে কিয়ামতের দিন তিনিই উত্থিত করবেন। বায়ুকে তিনিই প্রেরণ করেন যা বৃষ্টিপূর্ণ মেঘকে চতুর্দিকে ছড়িয়ে দেয়। কেউ نُشُرًا শব্দকে بُشُرًا পড়েছেন। যেমন আল্লাহ পাক এক জায়গায় বলেনঃ وَمِنْ اٰيٰتِهٖۤ اَنْ يُّرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرٰتٍ.... অর্থাৎ "তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে এটাও নিদর্শন যে, তিনি (বৃষ্টির) সুসংবাদ বহনকারীরূপে বাতাস প্রেরণ করেন। (৩০ঃ ৪৬)

আল্লাহ পাকের উক্তিঃ بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهٖ এখানে رَحْمَة দ্বারা বৃষ্টিকে বুঝানো হয়েছে। যেমন তিনি এক জায়গায় বলেছেনঃ "আল্লাহ তিনিই যিনি মানুষের নিরাশ হয়ে যাওয়ার পর বৃষ্টি বর্ষণ করে থাকেন এবং তিনি তাঁর রহমত ছড়িয়ে দেন, তিনি হচ্ছেন প্রশংসিত বন্ধু।" অন্য জায়গায় তিনি বলেনঃ "সুতরাং আল্লাহর রহমতের লক্ষণের প্রতি লক্ষ্য কর যে, কিভাবে তিনি যমীনকে ওর মরে যাওয়ার (শুকিয়ে যাওয়ার) পর পুনর্জীবিত করেন! এভাবেই তিনি মৃতকে পুনর্জীবন দান করতে সক্ষম এবং তিনি প্রত্যেক জিনিসের উপরই ক্ষমতাবান।

আল্লাহ তা'আলার উক্তিঃ "যখন ঐ বাতাস ভারী মেঘমালাকে বহন করে নিয়ে আসে।" অর্থাৎ তাতে অধিক পানি থাকে, যা যমীনের নিকটবর্তী হয়। ইরশাদ

হচ্ছে- سُقْنٰهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ অর্থাৎ ঐ মেঘমালাকে কোন নির্জীব ভূখণ্ডের দিকে প্রেরণ করি এবং ওটা হতে বারিধারা বর্ষণ করে ওকে পরিতৃপ্ত করি। যেমন তিনি বলেনঃ

وَاٰيَةٌ لَّهُمُ الْاَرْضُ الْمَيْتَةُ اَحْيَيْنٰهَا....

অর্থাৎ "তাদের জন্যে একটি নিদর্শন হচ্ছে নির্জীব যমীন, আমি ওকে সঞ্জীবিত করেছি।" (৩৬ঃ ৩৩) এজন্যেই ইরশাদ হচ্ছে-

فَاَخْرَجْنَا بِهٖ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ كَذٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتٰى

অর্থাৎ যেমন আমি যমীনকে ওর মরে যাওয়ার পর সঞ্জীবিত করি, তদ্রূপ দেহকেও মাটি হয়ে যাওয়ার পর কিয়ামতের দিন জীবিত করবো। আল্লাহ পাক আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করবেন এবং চল্লিশ দিন পর্যন্ত যমীনে বৃষ্টি বর্ষিত হতেই থাকবে এবং মানবদেহ কবর থেকে এমনিভাবে উঠতে থাকবে যেমনিভাবে ভূমিতে জীব অঙ্কুরিত হয়। এ ধরনের আয়াত কুরআন কারীমে বহু রয়েছে যে, তিনি মৃত যমীনকে পুনর্জীবিত করবেন। এগুলো তিনি কিয়ামত সংঘটনের দৃষ্টান্ত হিসেবে বর্ণনা করেছেন। لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ উদ্দেশ্য এই যে, যেন তোমরা এটা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পার।

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهٗ بِاِذْنِ رَبِّهٖ ভাল ও উৎকৃষ্ট ভূমি ওর প্রতিপালকের নির্দেশক্রমে খুব ভাল ফসল ফলায়। অর্থাৎ উত্তম ভূমিতে অতিসত্বর ফসল উৎপন্ন হয়। যেমন তিনি এক জায়গায় وَاَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا (৩ঃ৩৭) বলেছেন। এরপর আল্লাহ পাক বলেনঃ

وَالَّذِىْ خَبُثَ لَا يَخْرُجُ اِلَّا نَكِدًا

অর্থাৎ যা খারাপ ভূমি, অর্থাৎ কংকরময় বা বালুকাময় ভূমি, তাতে খুব কমই ফসল হয়ে থাকে। এটা মুমিন ও কাফিরের জন্যে দৃষ্টান্ত স্বরূপ বর্ণনা করা হয়েছে।

ইমাম বুখারী (রঃ) হযরত আবূ মূসা আশআরী (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "আল্লাহ আমাকে যে হিদায়াত ও ইলম সহকারে পাঠিয়েছেন ওর দৃষ্টান্ত হচ্ছে মুষলধারার বৃষ্টি, যা কোন যমীনে পড়েছে। সেই যমীনের এক অংশ উৎকৃষ্ট ছিল যা সেই বৃষ্টি গ্রহণ করেছে এবং প্রচুর উদ্ভিদ ও তৃণরাশি জন্মিয়েছে। আর অপর একাংশ কঠিন (ও গভীর) ছিল যা পানি (শোষণ করেনি, কিন্তু) আটকিয়ে রেখেছে, যা দ্বারা আল্লাহ লোকের উপকার সাধন

করেছেন। তারা তা পান করেছে, পান করিয়েছে এবং তার দ্বারা ক্ষেতকৃষি করেছে। আর কতক বৃষ্টি যমীনের এমন অংশে পড়েছে যা সমতল (ও কঠিন); ওটা পানি আটকিয়ে রাখে না। অথবা (শোষণ করে) ঘাস পাতাও জন্মায় না। এটা ঐ ব্যক্তির দৃষ্টান্ত যে আল্লাহর দ্বীন সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেছে এবং যেটা সহকারে আল্লাহ আমাকে পাঠিয়েছেন ওটা তার উপকার সাধন করেছে–সে শিক্ষা করেছে ও শিক্ষা দিয়েছে এবং ঐ ব্যক্তির দৃষ্টান্ত যে ব্যক্তি ওর (অর্থাৎ যা সহ আল্লাহ আমাকে পাঠিয়েছেন) দিকে মাথা তুলেও দেখেনি এবং আল্লাহর যে হিদায়াত আমার প্রতি পাঠানো হয়েছে তা কবূল করেনি।"

৫৯। আমি নূহকে তার জাতির নিকট প্রেরণ করেছিলাম, সুতরাং সে তাদেরকে সম্বোধন করে বলেছিল–হে আমার জাতি! তোমরা শুধু আল্লাহর ইবাদত কর, তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন মা'বূদ নেই, আমি তোমাদের প্রতি এক গুরুতর দিবসের শাস্তির আশংকা করছি।

٥٩- لَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ اِنِّىْۤ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ۝

৬০। তখন তার জাতির প্রধান ও নেতাগণ বললো– আমরা তোমাকে স্পষ্ট বিভ্রান্তির মধ্যে দেখছি।

٦٠- قَالَ الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِهٖۤ اِنَّا لَنَرٰىكَ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝

৬১। সে বললো– হে আমার জাতি! আমি কোন ভুল-ভ্রান্তি ও গুমরাহীর মধ্যে লিপ্ত নই, বরং আমি সারা জাহানের প্রতিপালকের (প্রেরিত) একজন রাসূল।

٦١- قَالَ يٰقَوْمِ لَيْسَ بِىْ ضَلٰلَةٌ وَّلٰكِنِّىْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

৬২। আমি আমার প্রতিপালকের পয়গাম তোমাদের কাছে পৌঁছিয়ে দিচ্ছি, আর আমি তোমাদেরকে হিতোপদেশ দিচ্ছি, আর তোমরা যা জান না আমি তা আল্লাহর নিকট থেকে জেনে থাকি।

٦٢- اُبَلِّغُكُمْ رِسٰلٰتِ رَبِّيْ وَ اَنْصَحُ لَكُمْ وَ اَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ○

আল্লাহ তা'আলা এ সূরার প্রারম্ভে হযরত আদম (আঃ) এবং তাঁর সম্পর্কীয় ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন। এখন তিনি নবীদের ঘটনা বর্ণনা করছেন। হযরত নূহ (আঃ)-এর ঘটনাই তিনি প্রথম শুরু করেছেন। কেননা, তিনি ছিলেন সর্বপ্রথম রাসূল যাঁকে আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আঃ)-এর পরে দুনিয়ায় পাঠিয়েছিলেন। তিনি হচ্ছেন নূহ্ ইবনে লামুক ইবনে মুতাওয়াশলাখ ইবনে উখনূখ। উখনূখের নামই ইদরীস। তাঁর সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, লিখন রীতি তিনিই আবিষ্কার করেছিলেন। তিনি হচ্ছেন উখনূখ ইবনে বুরদ ইবনে মাহ্লীল ইবনে কানীন ইবনে ইয়ানিশ ইবনে শীস ইবনে আদম (আঃ)। মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক (রঃ) বলেন যে, কোন নবী তাঁর কওমের পক্ষ থেকে দেয়া ততো কষ্ট সহ্য করেননি যতো কষ্ট হযরত নূ'হ (আঃ) সহ্য করেছেন। তবে হ্যাঁ কোন কোন নবীকে হত্যা করাও হয়েছিল। ইয়াযীদ ইবনে রকাশী (রঃ) বলেন যে, হযরত নূহ (আঃ) স্বীয় নফসের উপর অত্যধিক বিলাপ করতেন বলে তাঁকে 'নূহ' নামে অভিহিত করা হয়। হযরত আদম (আঃ) থেকে হযরত নূহের যুগ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে দশ শতাব্দীকাল অতিবাহিত হয়েছে। এসব যুগের সব লোকই ইসলামের নীতির উপর কায়েম ছিলেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও তফসীরের পণ্ডিতগণ বলেনঃ প্রতিমা পূজার সূচনা এইভাবে হয়েছিল যে, সৎ ও পুণ্যাত্মা লোকগণ যখন মারা গেলেন তখন তাঁদের অনুসারীরা তাঁদের কবরের উপর মসজিদ বানিয়ে নেয় এবং তাঁদের ফটো তৈরী করে মসজিদের মধ্যে রেখে দেয়, যাতে ঐগুলো দেখে তাঁদের অবস্থা ও ইবাদতকে স্মরণ করতে পারে। আর এর ফলে যেন নিজেদেরকে তাদের মত করে গড়ে তোলার চেষ্টা করতে পারে। যখন কয়েক যুগ অতিবাহিত হয়ে গেল তখন ঐ ফটোগুলোর পরিবর্তে তাঁদের মূর্তি তৈরী করা হলো। কিছুদিন পর তারা ঐ মূর্তিগুলোকে সম্মান দেখাতে লাগলো এবং ওগুলোর ইবাদত শুরু করে দিলো।

ঐ পুণ্যবান লোকদের নামে তারা ঐ মূর্তিগুলোর নাম রাখলো। যেমন ওয়াদ, সুওয়া, ইয়াগুস, ইয়াউক, নাসর ইত্যাদি। যখন এই মূর্তিমানের পূজা বেড়ে চললো তখন আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল হযরত নূহ (আঃ)-কে প্রেরণ করলেন। তিনি তাদেরকে এক ও শরীক বিহীন আল্লাহর ইবাদত করার হুকুম করলেন। তিনি বললেনঃ "হে আমার কওম! তোমরা শুধুমাত্র আল্লাহরই ইবাদত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের অন্য কোন মা'বূদ নেই। আমি তোমাদের প্রতি ভীষণ দিনের শাস্তির আশংকা করছি।" অর্থাৎ আমি এই ভয় করছি যে, কিয়ামতের দিন যখন তোমরা মুশ্‌রিক অবস্থায় আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে তখন তোমাদেরকে কঠিন শাস্তি দেয়া হবে।

তখন তাঁর কওমের মধ্যকার প্রধান ও নেতৃস্থানীয় লোকেরা বললোঃ "নিশ্চয়ই আমরা আপনাকে প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতার মধ্যে দেখছি।" অর্থাৎ আপনি আমাদেরকে এসব প্রতিমার ইবাদত করতে নিষেধ করছেন, অথচ আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে এর উপরই পেয়েছি। এই ব্যাপারে তো আমরা আপনাকে বড়ই পথভ্রষ্ট মনে করছি।

আজকালকার ফাসিক-ফাজিরদের অবস্থাও অনুরূপ যে, তারা সৎকর্মশীলদের উপর পথভ্রষ্টতার অপবাদ দিয়ে থাকে। যেমন আল্লাহ পাক বলেনঃ

وَإِذَا رَاَوْهُمْ قَالُوْٓا اِنَّ هٰٓؤُلَاۤءِ لَضَآلُّوْنَ -

অর্থাৎ "এই দুষ্ট প্রকৃতির লোকেরা যখন সৎকর্মশীল লোকদেরকে দেখে তখন বলে যে, নিশ্চয়ই এরা অবশ্যই পথভ্রষ্ট।" (৮৩ঃ ৩২) কাফিররা মুমিনদেরকে বলে-"যদি তাদের কথা সত্য হতো তবে আমরা ইতিপূর্বেই এটা অবলম্বন করতাম।" আর যেহেতু তারা নিজেরা হিদায়াত প্রাপ্ত হয়নি, তাই তারা বলতে শুরু করলো- "এরা তো নিজেরাই পথভ্রষ্ট এবং এরা মিথ্যা বলছে।" এ ধরনের বহু আয়াত রয়েছে।

ইরশাদ হচ্ছে- "নূহ বললো, হে আমার জাতি! আমি কোন ভুলভ্রান্তি ও পথভ্রষ্টতার মধ্যে লিপ্ত নই। বরং আমি সারা জাহানের প্রতিপালকের প্রেরিত একজন রাসূল। আমি আমার প্রতিপালকের পয়গাম তোমাদের কাছে পৌঁছিয়ে দিচ্ছি এবং তোমাদেরকে হিতোপদেশ দিচ্ছি। আর তোমরা যা জান না তা আমি আল্লাহর নিকট থেকে জেনে থাকি।" রাসূলদের শান বা মাহাত্ম্য এটাই হয় যে, চারুবাক, বাগ্মী, উপদেষ্টা এবং প্রচারক হয়ে থাকেন। আল্লাহর মাখলূকাতের মধ্যে অন্য কেউ এসব গুণে গুণান্বিত হয় না। যেমন সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে,

আরাফার দিন (৯ই যিলহজ্ব) রাসূলুল্লাহ (সঃ) স্বীয় সাহাবীদেরকে সম্বোধন করে বলেনঃ "হে লোক সকল! আমার ব্যাপারে তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে (অর্থাৎ আমি আমার দায়িত্ব যথাযথ পালন করেছি কি-না তা তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে)। তখন তোমরা কি উত্তর দেবে?" তাঁরা সমস্বরে উত্তর করলেনঃ "আমরা সাক্ষ্য দানে প্রস্তুত আছি যে, আপনি যথাযথভাবে প্রচারকার্য চালিয়েছেন এবং রিসালাতের দায়িত্ব পূর্ণরূপে পালন করেছেন।" তখন তিনি স্বীয় অঙ্গুলি আকাশের দিকে উঠালেন। অতঃপর তাঁদের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন ঃ "হে আল্লাহ! আপনি সাক্ষী থাকুন। হে আল্লাহ! আপনি সক্ষী থাকুন।"

৬৩। তোমাদের মধ্যকার একজন লোকের মারফত তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে উপদেশ বাণী আসায় কি তোমরা বিস্মিত হয়েছো? যাতে সে তোমাদেরকে সতর্ক ও হুঁশিয়ার করতে পারে এবং তোমরা সাবধান হও, তাকওয়া অবলম্বন করতে পার, হয়তো তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করা হবে।

٦٣- اَوَ عَجِبْتُمْ اَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوْا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ○

৬৪। কিন্তু তারা তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করলো, ফলে তাকে এবং তার সাথে নৌকায় যারা ছিল তাদেরকে (আযাব হতে) রক্ষা করলাম, আর যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে অমান্য করেছিল, তাদেরকে (প্লাবনের পানিতে) ডুবিয়ে মারলাম, বস্তুতঃ নিঃসন্দেহে তারা ছিল এক অন্ধ সম্প্রদায়।

٦٤- فَكَذَّبُوْهُ فَاَنْجَيْنٰهُ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ فِى الْفُلْكِ وَاَغْرَقْنَا الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا عَمِيْنَ ○ ع

আল্লাহ তা'আলা হযরত নূহ (আঃ) সম্পর্কে খবর দিতে গিয়ে বলেন যে, তিনি তাঁর কওমকে সম্বোধন করে বললেনঃ "তোমরা এতে বিব্রত কেন হচ্ছ যে,

আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরই একজন লোকের উপর অহী প্রেরণ করেছেন। এটা তো তোমাদের উপর দয়া ও অনুগ্রহ। সে তোমাদেরকে আল্লাহর ভয় দেখাচ্ছে, যেন তোমরা তাঁর শাস্তি থেকে ভয় কর এবং শির্‌ক থেকে বিরত থাক। এর ফলে হয়তো তোমাদের উপর দয়া প্রদর্শন করা হবে।" কিন্তু হযরত নূহ (আঃ)-এর কওম তাঁকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করলো এবং তাঁর বিরোধিতা করতে শুরু করে দিলো। তাদের অতি অল্প সংখ্যক লোকই ঈমান আনয়ন করলো। যেমন আল্লাহ পাক বলেনঃ "সুতরাং আমি তাকে এবং তার সাথে নৌকায় যারা ছিল তাদেরকে (আমার শাস্তি হতে) রক্ষা করলাম, আর যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে অমান্য করেছিল, তাদেরকে ডুবিয়ে মারলাম। যেমন মহান আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেনঃ "তাদের পাপের কারণে তাদেরকে ডুবিয়ে দেয়া হয় এবং জাহান্নামে প্রবেশ করানো হয়, এখন তারা আল্লাহকে ছাড়া আর কাউকেও সাহায্যকারী পায়নি।

আল্লাহ পাক বলেনঃ এরা অন্ধ ছিল। সত্যকে তারা দেখতেই পাচ্ছিল না। আল্লাহর বন্ধুদের সাথে শত্রুতা পোষণকারীরা কেমন শাস্তি পেলো, এই ঘটনায় আল্লাহ এর বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি এটাও দেখিয়েছেন যে, রাসূল ও মুমিনগণ মুক্তি পেয়ে গেল। যেমন তিনি বলেনঃ আমি অবশ্যই আমার রাসূলদেরকে সাহায্য করবো। বিজয় ও সফলতা সৎ লোকেরাই লাভ করবে, দুনিয়াতে এবং আখিরাতেও। যেমন তিনি নূহ (আঃ)-এর কওমকে ডুবিয়ে দিয়ে ধ্বংস করলেন এবং নূহ্ (আঃ) ও তার সঙ্গীদেরকে মুক্তি দিলেন। যায়েদ ইবনে আসলাম (রঃ) বলেনঃ "নূহ (আঃ)-এর কওম এত বেশী ছিল যে, শহর ও জঙ্গল ভরে গিয়েছিল। যমীনের প্রতিটি অংশের উপর তাদের দখল ছিল। ইবনে অহাব (রঃ) বলেনঃ "ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে আমার কাছে সংবাদ পৌঁছেছে যে, হযরত নূহ (আঃ)-এর সাথে যারা নৌকায় অশ্রয় নিয়ে মুক্তি পেয়েছিল তাদের সংখ্যা ছিল আশিজন। তাদের মধ্যে 'জুরহুম' নামক একজন লোক ছিলেন যাঁর ভাষা ছিল আরবী।"[১]

৬৫। আর আমি আ'দ জাতির নিকট তাদের ভাই হূদকে (নবীরূপে) পাঠিয়েছিলাম, সে বললো–হে আমার জাতি!

٦٥- وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم

১. এটা ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ○

তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, আল্লাহ ছাড়া তোমাদের আর কোন মা:বূদ নেই, তোমরা কি (এখনো) সাবধান হবে না?

٦٦- قَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖۤ اِنَّا لَنَرٰىكَ فِيْ سَفَاهَةٍ وَّاِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ○

৬৬। তখন তার জাতির কাফির লোকদের নেতাগণ বললো– আমরা তোমাকে নির্বোধ দেখছি এবং আমরা তো তোমাকে নিশ্চিতরূপে মিথ্যাবাদী ধারণা করি।

٦٧- قَالَ يٰقَوْمِ لَيْسَ بِيْ سَفَاهَةٌ وَّلٰكِنِّيْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○

৬৭। সে (হূদ) বললো–হে আমার জাতি! আমি নির্বোধ নই, বরং আমি হলাম সারা জাহানের প্রতিপালকের মনোনীত রাসূল।

٦٨- اُبَلِّغُكُمْ رِسٰلٰتِ رَبِّيْ وَاَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ اَمِيْنٌ ○

৬৮। আমি আমার প্রতিপালকের পয়গাম তোমাদের নিকট পৌঁছিয়ে দিচ্ছি, আর আমি তোমাদের একজন বিশ্বস্ত হিতাকাঙ্ক্ষী।

٦٩- اَوَعَجِبْتُمْ اَنْ جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَاذْكُرُوْۤا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْۢ بَعْدِ قَوْمِ نُوْحٍ

৬৯। তোমরা কি এতে বিস্মিত হচ্ছো যে, তোমাদের জাতিরই একটি লোকের মাধ্যমে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে তাঁর বিধান ও উপদেশ তোমাদেরকে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে তোমাদের কাছে এসেছে, তোমরা সেই অবস্থার কথা স্মরণ কর, যখন নূহের সম্প্রদায়ের পর আল্লাহ তোমাদেরকে তাদের

وَّ زَادَكُمْ فِى الْـخَلْقِ بَصْۜطَةً ۚ فَـاذْكُــرُوْٓا اٰلَآءَ اللّٰهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ○	**স্থলাভিষিক্ত করেছেন এবং তোমাদের অবয়ব অন্যদের অপেক্ষা শক্তিতে অধিকতর সমৃদ্ধ করেছেন, সুতরাং তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ কর, হয়তো তোমরা সফলকাম হবে।**

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ যেমনভাবে আমি নূহ (আঃ)-এর কওমের কাছে রাসূল পাঠিয়েছিলাম তেমনিভাবে হূদ (আঃ)-কে আ'দ সম্প্রদায়ের নিকট রাসূলরূপে প্রেরণ করেছিলাম। তারা আ'দ ইবনে ইরামের বংশধর ছিল। তারা বড় বড় অট্টালিকায় বসবাস করতো। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "(হে নবী সঃ)! তোমার প্রতিপালক আ'দ সম্প্রদায়ের সাথে কি ব্যবহার করেছিলেন তা তোমার জানা নেই? অর্থাৎ ইরামদের সাথে, যারা সুউচ্চ ও বড় বড় প্রাসাদের মালিক ছিল? যার তুল্য (প্রাসাদ) কোন নগরে তৈরী হয়নি।" এটা ছিল তাদের ভীষণ দৈহিক শক্তির প্রকৃষ্ট প্রমাণ। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "কিন্তু আ'দ সম্প্রদায় ভূ-পৃষ্ঠে অন্যায়ভাবে অহংকারে ফেটে পড়লো এবং বললো—আমাদের চেয়ে অধিক শক্তিশালী আর কে আছে? তারা কি চিন্তা করেনি যে, যে আল্লাহ তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তিনি তাদের চেয়ে অধিক শক্তিশালী? তারা আমার আয়াতসমূহ ও মু'জিযাসমূহকে অস্বীকার করতো।" তাদের বাসভূমি ছিল ইয়ামান দেশের আহ্কাফ নামক জায়গায়। তারা ছিল মরুচারী ও পাহাড়ীয় লোক। হযরত আলী (রাঃ) হায্রামাউতের একজন অধিবাসীকে জিজ্ঞেস করেনঃ "তুমি কি হায্রা মাউতের সরযমীনে এমন কোন রঙ্গীন পাহাড় দেখেছো যার মাটি লাল বর্ণের? সেই পাহাড়ের অমুক অমুক ধারে কুল (বরই) ও পীলুর বহু গাছ রয়েছে?" লোকটি উত্তরে বললোঃ "হ্যাঁ। হে আমীরুল মুমিনীন! আল্লাহর শপথ! আপনি এমনভাবে বললেন যে, যেন আপনি স্বচক্ষে দেখেছেন।" তিনি বললেনঃ "আমি স্বচক্ষে দেখিনি বটে, কিন্তু এরূপ হাদীস আমার কাছে পৌঁছেছে।" লোকটি বললোঃ "হে আমীরুল মুমিনীন! এই ব্যাপারে আপনি কি বলতে চাচ্ছেন?" তিনি উত্তরে বললেনঃ "সেখানে হূদ (আঃ)-এর সমাধি রয়েছে।" এ হাদীস দ্বারা এটা জানা গেল যে, আ'দ সম্প্রদায়ের বাসস্থান ইয়ামানেই ছিল। হযরত হূদ (আঃ) সেখানেই সমাধিস্থ হয়েছিলেন। হযরত হূদ (আঃ) তাঁর কওমের মধ্যে সম্ভ্রান্ত বংশোদ্ভূত ছিলেন। সমস্ত রাসূলই মর্যাদা সম্পন্ন

ও সম্ভ্রান্ত বংশোদ্ভূত ছিলেন। হযরত হূদ (আঃ)-এর কওম দৈহিক ও অবয়বের দিক দিয়ে যেমন ছিল কঠিন তেমনই তাদের অন্তরও ছিল অত্যন্ত কঠিন। সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার কাজে তারা অন্যান্য সমস্ত উম্মতের ঊর্ধ্বে ছিল। এ কারণেই হূদ (আঃ) তাদেরকে এক আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্যের প্রতি আহ্বান জানান। কিন্তু তাঁর সেই কাফির দলটি তাঁকে বলে– "হে হূদ (আঃ)! আমরা তো তোমাকে বড়ই নির্বোধ ও পথভ্রষ্ট দেখছি, তুমি আমাদেরকে প্রতিমাপূজা ছেড়ে দিয়ে এক আল্লাহর ইবাদতের পরামর্শ দিচ্ছ!" যেমন কুরাইশরা নবী (সঃ) -এর এরূপ দাওয়াতের উপর বিস্ময় বোধ করে বলেছিলঃ "তিনি কি বহু মা'বূদকে একই মা'বূদ বানিয়ে দিয়েছেন?" মোটকথা, হযরত হূদ (আঃ) তাদেরকে সম্বোধন করে বলেনঃ "হে লোক সকল! আমার মধ্যে নির্বুদ্ধিতা নেই, বরং আমি সারা জাহানের প্রতিপালক আল্লাহর রাসূল। আমি আল্লাহর নিকট হতে সত্য বাণী নিয়ে এসেছি। সমস্ত কিছু তিনিই সৃষ্টি করেছেন। আমি তাঁরই পয়গাম তোমাদের কাছে পৌঁছিয়ে দিচ্ছি। সঠিক অর্থে আমি তোমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী।" এটা হচ্ছে ঐ গুণ যে গুণে রাসূলগণ ভূষিত থাকেন। অর্থাৎ সদুপদেশদাতা ও আমানতদার। তিনি আরো বলেনঃ "তোমরা কি এতে বিস্ময়বোধ করছো যে, তোমাদের জাতিরই একটি লোকের মাধ্যমে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে তাঁর বিধান ও উপদেশ তোমাদেরকে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে তোমাদের কাছে এসেছে?" অর্থাৎ তোমাদের তো এতে বিস্মিত হওয়া উচিত নয়, বরং তোমাদের তো এজন্যে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত যে, তিনি নূহ (আঃ)-এর কওমকে ধ্বংস করে দেয়ার পর তোমাদেরকে তাদের স্থলাভিষিক্ত করেছেন। তিনি সেই কওমকে ধ্বংস করে দিয়েছেন যারা তাদের রাসূলের অবাধ্য হয়েছিল। তাছাড়া তোমাদের এ জন্যেও আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত যে, তিনি তোমাদেরকে সবচেয়ে বেশী দৈহিক শক্তি প্রদান করেছেন। তোমরা অন্যান্য উম্মতের তুলনায় দৈহিক গঠনের দিক দিয়ে বেশী লম্বা ও চওড়া। এ ধরনের বর্ণনা তালূতের ঘটনায় বর্ণিত হয়েছে। সেখানে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন যে, ইলমী ও দৈহিক শক্তিতে তালূত (আঃ) বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছেন।

ইরশাদ হচ্ছে–তোমরা আল্লাহর নিয়ামতের কথা স্মরণ কর। অর্থাৎ তোমাদের উপর আল্লাহর যে নিয়ামত ও অনুগ্রহরাশি রয়েছে সেগুলোর কথা স্মরণ করে তাঁর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ অর্থাৎ সম্ভবতঃ তোমরা সফলকাম হবে।

٧٠- قَالُوْٓا اَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللّٰهَ وَحْدَهٗ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ اٰبَآؤُنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ○

৭০। তারা বললো– তুমি কি আমাদের নিকট শুধু এই উদ্দেশ্যে এসেছো, যেন আমরা একমাত্র আল্লাহরই ইবাদত করি এবং আমাদের পূর্বপুরুষগণ যাদের ইবাদত করতো তাদেরকে বর্জন করি? সুতরাং তুমি তোমার কথা ও দাবীতে সত্যবাদী হলে আমাদেরকে যে শাস্তির ভয় দেখাচ্ছ তা আনয়ন কর।

٧١- قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَّ غَضَبٌ ؕ اَتُجَادِلُوْنَنِيْ فِيْٓ اَسْمَآءٍ سَمَّيْتُمُوْهَآ اَنْتُمْ وَاٰبَآؤُكُمْ مَّا نَزَّلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ ؕ فَانْتَظِرُوْٓا اِنِّيْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ ○

৭১। সে বললো– তোমাদের প্রতিপালকের শাস্তি ও ক্রোধ তোমাদের উপর নির্ধারিত হয়ে আছে, তোমরা কি আমার সাথে এমন কতগুলো নাম সম্বন্ধে বিতর্ক করছো যার নামকরণ করেছো তোমরা এবং তোমাদের বাপ-দাদারা,আর যে বিষয়ে আল্লাহ কোন দলীল প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি? সুতরাং তোমরা (শাস্তির জন্যে) অপেক্ষা করতে থাক, আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষা করছি।

٧٢- فَاَنْجَيْنٰهُ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ

৭২। অতঃপর আমি তাকে (হূদকে) এবং তার সঙ্গী-সাথীদেরকে (শাস্তি হতে) আমার অনুগ্রহে রক্ষা করলাম, আর যারা আমার নিদর্শনকে

الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ ○

(বিধানকে) মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল এবং যারা ঈমানদার ছিল না তাদের মূলোৎপাটন করে ছাড়লাম।

কাফিরগণ হযরত হূদ (আঃ)-এর সাথে কিরূপ অবাধ্যতা ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ করেছিল তারই বর্ণনা আল্লাহ পাক এখানে দিচ্ছেন। তারা তাঁকে বলেছিল–"হে হূদ (আঃ)! আমাদের পূর্বপুরুষরা যাদের ইবাদত-বন্দেগী করতো তাদেরকে ছেড়ে আমরা একমাত্র আল্লাহরই ইবাদত করি এজন্যেই কি তুমি আমাদের কাছে এসেছো! আচ্ছা, তুমি যদি তোমার কথায় সত্যবাদী হও তবে যে শাস্তির ভয় দেখাচ্ছ তা আনয়ন কর।" যেমন কাফির কুরাইশরা বলছে– "তুমি আমাদেরকে শাস্তির যে ভয় দেখাচ্ছ তা যদি সত্য হয় তাহলে আকাশ থেকে পাথর বর্ষিয়ে নাও এবং আমাদেরকে বেদনাদায়ক শাস্তি দ্বারা পাকড়াও করেই ফেলো।" মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক (রঃ) বলেন যে, হযরত হূদ (আঃ)-এর কওম মূর্তিসমূহের পূজা করতো। একটি মূর্তির নাম ছিল 'সামাদ', একটির নাম ছিল 'সামুদ' এবং একটির নাম ছিল 'হাবা'! এজন্যেই হূদ (আঃ) তাদেরকে বলেছিলেন, তোমাদের একথা বলার কারণেই তোমাদের উপর আল্লাহর গযব ওয়াজিব হয়ে গেছে। বলা হয়েছে যে, رِجْسٌ শব্দটি رِجْزٌ -এরই প্রতিশব্দ। হূদ (আঃ) বলেনঃ "তোমরা কি আমার সাথে এমনসব মূর্তির ব্যাপার নিয়ে ঝগড়ায় লিপ্ত হচ্ছো যেগুলোর নাম তোমরা নিজেরা রেখেছো বা তোমাদের পূর্বপুরুষরা রেখেছে। এসব মূর্তি তো তোমাদের কোন লাভও করতে পারে না এবং কোন ক্ষতিও করতে পারে না। আল্লাহ তোমাদেরকে এগুলোর ইবাদত করার কোন সনদও দেননি এবং তোমাদের কাছে এর কোন দলীল প্রমাণও নেই। যদি কথা এটাই হয় তবে ঠিক আছে, তোমরা শাস্তির জন্যে অপেক্ষা কর, আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষা করছি।" এটা রাসূলের পক্ষ থেকে তাঁর কওমের প্রতি কঠিন হুমকি ও ভয় প্রদর্শন। সুতরাং এর পরই ইরশাদ হচ্ছে– আমি হূদ (আঃ)-কে এবং তার অনুসারী সঙ্গী সাথীদেরকে তো বাঁচিয়ে নিলাম, কিন্তু যারা তার উপর ঈমান আনেনি এবং আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছিল আমি তাদের মূলোৎপাটন করলাম।

আ'দ জাতির ধ্বংসের ঘটনা কুরআন মাজীদের অন্য জায়গায় এরূপ বর্ণিত আছে– "তাদের উপর আমি এক প্রচণ্ড ঘূর্ণিবায়ু প্রেরণ করলাম এবং যাদের উপর দিয়ে ওটা বয়ে গেল তাদের সবকেই তচ্‌নচ্‌ করে দিলো।" যেমন অন্য একটি

আয়াতে আছে- "আর আ'দ সম্প্রদায়কে এক প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবায়ু দ্বারা বিধ্বস্ত করা হয়েছে। যে বায়ুকে আল্লাহ সাত রাত্রি ও আট দিবস পর্যন্ত তাদের উপর একাধারে চাপিয়ে রেখেছিলেন, অতএব, তুমি ঐ সম্প্রদায়কে ওতে এমনভাবে ভূপতিত দেখতে পেতে, যেন তারা উৎপাটিত খেজুর বৃক্ষের কাণ্ডসমূহ। সুতরাং তাদের কাউকেও কি তুমি অবশিষ্ট দেখতে পাও?" তাদের ঔদ্ধত্যের কারণে তাদের উপর এক প্রচণ্ড ঘূর্ণিবার্তা প্রেরণ করে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। ঐ বায়ু তাদেরকে আকাশে নিয়ে উড়তেছিল এবং পরে মাথার ভরে যমীনে নিক্ষেপ করে দিচ্ছিলো। ফলে তাদের মাথাগুলো ভেঙ্গে দেহ থেকে পৃথক হয়ে গিয়েছিলো। এজন্যেই আল্লাহ পাক বলেছেন যে, তারা সেই খেজুর গাছের কাণ্ডের মত হয়ে গিয়েছিল যেগুলো সম্পূর্ণরূপে ডাল-পাতা শূন্য ছিল। ঐ লোকগুলো ইয়ামানে আম্মান ও হাযরামাউতের মধ্যবর্তী অঞ্চলে বসবাস করতো। তাছাড়া তারা সারা দুনিয়ায় দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়েছিল। তারা শক্তির দাপটে জনগণের উপর অত্যাচার চালাতো। তারা মূর্তিপূজা করতো। তাই আল্লাহ তা'আলা তাদের কাছে হূদ (আঃ)-কে পাঠালেন। তিনি তাদের মধ্যে সম্ভ্রান্ত বংশীয় ছিলেন। তিনি তাদেরকে উপদেশ দিতেন যে, তারা যেন আল্লাহকে এক বলে স্বীকার করে নেয় এবং তাঁর সাথে কাউকেও শরীক না করে। আর তারা যেন লোকদের উপর অত্যাচার করা থেকে বিরত থাকে। কিন্তু তারা তা অস্বীকার করে এবং তাঁকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতঃ বলে- "আমাদের অপেক্ষা বড় শক্তিশালী আর কে আছে?" অন্যান্য লোকেরাও তাদের অনুসরণ করে। হূদ (আঃ)-এর প্রতি ঈমান আনয়নকারী লোকের সংখ্যা ছিল অতি নগণ্য। যখন আ'দ সম্প্রদায় এরূপ অবাধ্যতা ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ করে এবং দুনিয়ায় অশান্তি ও বিশৃংখলা সৃষ্টি করতে শুরু করে, আর বিনা প্রয়োজনে বড় বড় অট্টালিকা ও প্রাসাদ নির্মাণ করে, তখন হযরত হূদ (আঃ) তাদেরকে সম্বোধন করে বলেনঃ "তোমরা সব জায়গায় বিনা প্রয়োজনে ঘরবাড়ী নির্মাণ করছো এবং ওগুলোকে এতো মজবুত করে তৈরী করছো যে, মনে হচ্ছে তোমরা এখানে চিরকাল থাকবে! যখন তোমরা কারো উপর ক্ষমতা প্রাপ্ত হচ্ছো তখন তার সাথে অত্যন্ত কঠোরতাপূর্ণ ব্যবহার করছো! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার কথা মেনে চল।" তারা তখন তাঁকে বললোঃ "হে হূদ (আঃ)! তুমি প্রমাণবিহীন কথা বলছো। তোমার কথায় আমরা আমাদের মা'বূদদেরকে ছেড়ে দিতে পারি না এবং তোমার উপর ঈমানও আনব না। আমাদের তো ধারণা হচ্ছে যে, তোমার উপর আমাদের কোন মা'বূদের গযব পতিত হয়েছে, ফলে তুমি পাগল হয়ে

গেছো।" হূদ (আঃ) তাদেরকে বললেনঃ "আমি আল্লাহকে সাক্ষী রাখছি এবং তোমরাও সাক্ষী থাক যে, আমি তোমাদের শির্কযুক্ত চিন্তা থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। এখন তোমরা সবাই মিলে আমার সাথে যা কিছু ছল-চাতুরী করতে চাও কর এবং আমাকে অবকাশ দিয়ো না। আমি আল্লাহর উপরই ভরসা করছি। তিনি আমার প্রভু এবং তোমাদেরও প্রভু। আমার প্রতিপালক যা কিছু বলেন ঠিকই বলেন।"

ঐ লোকগুলো যখন কুফরীর উপর অটল থাকলো তখন আল্লাহ তা'আলা তিন বছর পর্যন্ত তাদের উপর বৃষ্টি বন্ধ রাখলেন। তারা তখন কঠিন বিপদে পতিত হলো। যখন তারা কোন কঠিন বিপদের সম্মুখীন হতো তখন সেই বিপদ থেকে মুক্তি লাভের জন্যে আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা জানাতো। ঐ সময় তারা কাউকে বায়তুল্লাহ শরীফে পাঠিয়ে দিতো। ঐ যুগে তাদের গোত্রের আমালীক নামে পরিচিত কতকগুলো লোক মক্কায় বসবাস করছিল। তারা ছিল আমালীক ইবনে লাওয্ ইবনে সাম ইবনে নূহ (আঃ)-এর বংশধর। মুআ'বিয়া ইবনে বকর নামক একটি লোক ছিল তাদের নেতা। তার মা ছিল আ'দ সম্প্রদায়ভুক্ত এবং তার নাম ছিল জুলহিয়া। সে ছিল খাবীরীর কন্যা। যা হোক, আ'দ সম্প্রদায় সত্তরজন লোকের এক প্রতিনিধি দলকে হারাম শরীফের দিকে পাঠিয়ে দিলো, যেন তারা কা'বাতুল্লাহয় গিয়ে পানি বর্ষণের জন্যে প্রার্থনা করে। ঐ লোকগুলো মক্কার বাইরে তাদের গোত্রীয় লোক মুআ'বিয়ার নিকট অবস্থান করে। এক মাস পর্যন্ত তারা তার কাছেই অবস্থান করতে থাকে। তারা সেখানে মদ্যপান করতো এবং মুআ'বিয়ার দু'জন গায়িকা দাসীর গান শুনতো। এভাবে দীর্ঘদিন ধরে তাদের অবস্থান মুআ'বিয়ার কাছে অসহনীয় হয়ে উঠেছিল। কিন্তু অতিথিদেরকে বিদায় হয়ে যাওয়ার কথা বলতে সে লজ্জাবোধ করছিল। অবশেষে সে কতকগুলো ছন্দ রচনা করলো এবং ওগুলো তাদের সামনে গায়িকাদেরকে গাইতে বললো। ছন্দগুলোর অনুবাদ নিম্নরূপঃ

"হে কায়েল! তোমার উপর আফসোস! যাও, প্রার্থনা কর। হয়তো আল্লাহ বৃষ্টি বর্ষণের জন্যে মেঘ পাঠাবেন। ফলে আ'দ সম্প্রদায়ের ভূমি আদ্র ও সতেজ হয়ে উঠবে। কেননা, আ'দ সম্প্রদায়ের অবস্থা তো এখন এমন পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যে, তারা ভালভাবে কথা পর্যন্ত বলতে পারছে না। পিপাসায় এখন তাদের ওষ্ঠাগত প্রাণ। বুড়ো ও যুবক কারো জীবনের আশা নেই। তাদের মহিলাদেরও অবস্থা ভাল নয়। ক্ষুধা ও পিপাসায় এখন তাদের চলৎশক্তি রহিত। বন্য জন্তুগুলো

অতি সহজেই তাদের বস্তিতে ঢুকে পড়েছে। কেননা, আ'দ সম্প্রদায় সম্পর্কে তাদের এখন কোন ভয় নেই যে, তারা ওদেরকে তীর মেরে হত্যা করবে। কারণ, এখন তাদের তীর চালাবার শক্তিও নেই। সুতরাং জেনে রেখো যে, তাদের এখন দিবস ও রজনী শেষ হয়েই গেছে। কোন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি দল তোমাদের ন্যায় এতো নিষ্ঠুর হতে পারে না। তোমাদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত বর্ষিত হোক!" একথা শুনে ঐ প্রতিনিধি দলের লোকদের চৈতন্য ফিরলো। তারা কা'বা ঘরে গিয়ে কওমের জন্যে প্রার্থনা করতে শুরু করলো। ঐ প্রতিনিধি দলের নেতার নাম ছিল কায়েল। আল্লাহর হুকুমে তিন খণ্ড মেঘ প্রকাশিত হলো। এক খণ্ড সাদা, এক খণ্ড কালো এবং এক খণ্ড লাল। আকাশ থেকে একটা শব্দ শোনা গেল– "নিজের কওমের জন্যে এই তিন খণ্ড মেঘের যে কোন একখণ্ড পছন্দ করে নাও।"

কায়েল বললোঃ "আমি কালো মেঘখণ্ডই পছন্দ করলাম। কালো মেঘ থেকেই অধিক বৃষ্টি বর্ষিত হয়ে থাকে।" পুনরায় শব্দ আসলো–"তুমি তো ভষ্ম ও মাটিকে পছন্দ করলে। আ'দ সম্প্রদায়ের কেউ অবশিষ্ট থাকবে না। এ মেঘ তো পিতাকে ছাড়বে না এবং পুত্রকেও ছাড়বে না, বরং সবকে ধ্বংস করে দেবে। কিন্তু আ'দ সম্প্রদায়ের বানী আযিয়া গোত্র নিরাপত্তা লাভ করবে।" আ'দ সম্প্রদায়ের এ গোত্রটি মক্কায় অবস্থান করছিল। তারা শাস্তির কিছুই টের পায়নি। আ'দ সম্প্রদায়ের সবাই ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। যারা রক্ষা পেয়েছিল তারা ছিল এই বানী আযিয়া গোত্রেরই লোক। এর বংশ ও সন্তানদের মধ্য থেকে ঐ কওম অবশিষ্ট থাকে যাদেরকে 'আ'দে সানী' বা দ্বিতীয় আ'দ বলা হয়। কথিত আছে যে, আল্লাহ তা'আলা একটা কলো মেঘখণ্ড পাঠিয়েছিলেন যাকে কায়েল পছন্দ করেছিল এবং এটাই ঐ সম্প্রদায়ের ধ্বংসের কারণ হয়েছিল। ঐ মেঘখণ্ডটি মুগীস নামক একটি উপত্যকা হতে উঠেছিল। জনগণ ওটা দেখে খুব খুশী হয় এবং বলে– "এটা তো বর্ষণকারী মেঘ।" আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "প্রবল ঝটিকা এই মেঘ বয়ে নিয়ে আসে। এরই মধ্যে ছিল যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি, যা সব কিছুকেই ধ্বংস করে দেয়।" এই মেঘের মধ্যে একটি জিনিস সর্বপ্রথম যে দেখেছিল, সে ছিল একটি মহিলা। তার নাম ছিল মুমীদ। সে মেঘের মধ্যে যা দেখেছিল তা দেখে সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায়। জ্ঞান ফিরলে সে বলেঃ "এই মেঘের মধ্যে আগুনের শিখা ছিল। কতকগুলো লোককে দেখা যাচ্ছিল যারা ঐ শিখাগুলো টেনে আনছিল।" সাতরাত ও আটদিন পর্যন্ত ঐ মেঘ হতে পানি

বর্ষিতে থাকে। আ'দ সম্প্রদায়ের এমন লোক অবশিষ্ট ছিল না যে ধ্বংস হওয়া থেকে রক্ষা পেয়েছিল। হূদ (আঃ) এবং তাঁর সঙ্গী মুমিনগণ এখান থেকে সরে গিয়েছিলেন এবং একটি শস্যক্ষেত্রে আশ্রয় নিয়েছিলেন। সেখানে তাঁরা সম্পূর্ণ নিরাপদে ছিলেন। ঠাণ্ডা বায়ু তাদের দেহ স্পর্শ করছিল এবং তাঁদের আত্মাকে সতেজ ও পরিতৃপ্ত রাখছিল। কিন্তু আ'দ সম্প্রদায়ের প্রতি ঐ মেঘ ঝটিকা পাথর বর্ষণ করছিল। তাদের মাথাগুলো ভেঙ্গে গিয়েছিল। এ ঘটনার বর্ণনা খুবই দীর্ঘ এবং এর রচনাভঙ্গীও বেশ বিস্ময়কর। এর থেকে কয়েকটি ফলাফলও বের হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "আমার আযাব যখন এসে পৌঁছেই গেল তখন আমি হূদ (আঃ)-কে এবং তার সঙ্গীয় মুমিনদেরকে বাঁচিয়ে নিলাম। যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে তারা নিরাপদে থাকলো।"

হারিসুল বিকরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ আমি আ'লা ইবনে হাযরামীর অভিযোগ নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট যাচ্ছিলাম। আমি কওমের পার্শ্ব দিয়ে গমন করছিলাম। এমতাবস্থায় বানী তামীম গোত্রের একটি মহিলা যে তার গোত্র থেকে ছুটে গিয়ে একা পড়ে গিয়েছিল, আমাকে বললো– "হে আল্লাহর বান্দা! আমাকে আল্লাহর রাসূল (সঃ)-এর কাছে নিয়ে চলুন। তাঁর আমার প্রয়োজন রয়েছে।" আমি তখন তাকে আমার উটের উপর বসিয়ে নিয়ে মদীনায় পৌঁছলাম। মসজিদ লোকে পরিপূর্ণ ছিল এবং একটি কালো পতাকা উত্তোলিত ছিল। হযরত বিলাল (রাঃ) স্বীয় তরবারী লটকিয়ে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সামনে দাঁড়িয়েছিলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম– এ লোকগুলোর জমায়েত হওয়ার কারণ কি? উত্তর হলোঃ "আমর ইবনুল আস (রাঃ)-এর নেতৃত্বে সেনাবাহিনী প্রেরণ করা হচ্ছে।" আমি বসে পড়লাম। রাসূলুল্লাহ (সঃ) স্বীয় কক্ষে প্রবেশ করলেন। আমি তাঁর কাছে হাযির হওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করলাম। আমাকে অনুমতি দেয়া হলো। আমি তাঁর কাছে হাযির হয়ে সালাম করলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন– "তোমার ও তাদের মধ্যে মনোমালিন্য আছে কি?" আমি উত্তরে বললামঃ হ্যাঁ, তাদের বিরুদ্ধে আমার অভিযোগ রয়েছে। এখন আমি আপনার নিকট আসছিলাম, এমতাবস্থায় পথে বানী তামীম গোত্রের এক বুড়ীর সাথে আমার সাক্ষাত হয়। সে তার গোত্র থেকে ছাড়া পড়ে গিয়েছিল। সে আমাকে বলে– "আল্লাহর রাসূল (সঃ)-এর কাছে আমার প্রয়োজন রয়েছে। সুতরাং আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে চলুন।" সে দরজাতেই দাঁড়িয়ে রয়েছে। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (আঃ) তাকে ডেকে নিলেন।

সে এসে পড়লে আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমার ও বানী তামীমের মধ্যে আড়াল করে দিন। একথা শুনে বানী তামীম গোত্রের ঐ বুড়ীটি তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলো এবং বললোঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! তাহলে এই নিরাশ্রয়া কোথায় আশ্রয় নেবে?" আমি তখন বললাম, আমার এই দৃষ্টান্ত তো হচ্ছে "বকরী নিজেই নিজের মৃত্যুকে টেনে আনলো" -এই প্রবাদ বাক্যের মতই। আমি এই বুড়ীকে নিজের সোয়ারীর উপর চড়িয়ে আনলাম, আমি কি জানতাম যে, সেই আমার শত্রুরূপে সাব্যস্ত হবে! আমি আ'দ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি দলের মত হয়ে যাই এর থেকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নিকট আশ্রয় চাচ্ছি। আমার একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ "আ'দ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের ঘটনাটি কি?" অথচ তিনি এটা আমার চেয়ে অনেক বেশী জানতেন। কিন্তু তিনি এটা আমার নিকট থেকে শুনতে আগ্রহী ছিলেন। সুতরাং আমি বলতে লাগলাম, আ'দ সম্প্রদায় দুর্ভিক্ষের কবলে পতিত হয়েছিল। তাই তারা একটা প্রতিনিধি দল মক্কায় প্রেরণ করে। তাদের নেতা ছিল কায়েল নামক একটি লোক। তারা মক্কায় গিয়ে মুআ'বিয়া ইবনে বকরের নিকট অবস্থান করে। সেখানে তারা দীর্ঘ এক মাস ধরে বাস করে এবং মদ্যপানরত থাকে। তাছাড়া তারা জারাদাতান নাম্নী দু'টি দাসীর গান শুনতে থাকে। অতঃপর তাদের নেতা কায়েল মুহরার পাহাড়ের দিকে গমন করে এবং প্রার্থনা জানিয়ে বলে– "হে আল্লাহ! আপনি জানেন যে আমরা কোন রোগীর রোগ মুক্তির দুআ'র জন্যে আসিনি বা কোন বন্দীর মুক্তিপণের জন্যে প্রার্থনা করছি না। বরং আমাদের প্রার্থনা এই যে, আপনি আ'দ সম্প্রদায়ের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করুন।" তখন আল্লাহর হুকুমে তিনখণ্ড মেঘ প্রকাশিত হলো (মেঘখণ্ডগুলো ছিল সাদা, কালো ও লাল)। দৈববাণী হলো– "যে কোন একখণ্ড মেঘ গ্রহণ কর।" সে কালো মেঘ খণ্ডটি পছন্দ করল। পুনরায় শব্দ আসলো–"তুমি তো মাটি পাবে। আ'দ সম্প্রদায়ের একটি প্রাণীও রক্ষা পাবে না বরং সবাই ধ্বংস হয়ে যাবে।" অতঃপর আল্লাহ তা'আলা একটা প্রবল ঝটিকা প্রেরণ করেন। সেই বায়ু ছিল বায়ু ভাণ্ডারের মধ্যে যেন আমার আংটির বৃত্তের সমপরিমাণ। তাতে সমস্ত আ'দ সম্প্রদায় ধ্বংস হয়ে গেল। এখন আরবের লোকেরা কোন প্রতিনিধি দল পাঠালে প্রবাদ বাক্য হিসেবে বলে থাকেঃ আদ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি দলের মতো হয়ো না।[১]

১. এটা ইমাম তরমিযী (রঃ), ইমাম নাসাঈ (রঃ) ও ইমাম ইবনে মাজাহ (রঃ) বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) এটা তাখরীজ করেছেন।

٧٣- وَ اِلٰى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صٰلِحًا ۘ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ قَدْ جَآءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ ؕ هٰذِهٖ نَاقَةُ اللّٰهِ لَكُمْ اٰيَةً فَذَرُوْهَا تَاْكُلْ فِیْۤ اَرْضِ اللّٰهِ وَ لَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْٓءٍ فَيَاْخُذَكُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

৭৩। আর আমি সামুদ জাতির নিকট তাদের ভ্রাতা সালেহ (আঃ) কে প্রেরণা করেছিলাম, সে বলেছিল– হে আমার জাতি! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, আল্লাহ ছাড়া তোমাদের আর কোন মা'বূদ নেই, তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে এক স্পষ্ট নিদর্শন তোমাদের নিকট এসেছে, এই আল্লাহর (নামে উৎসর্গিত) উষ্ট্রী তোমাদের জন্যে একটি নিদর্শন স্বরূপ, আর তোমরা একে ছেড়ে দাও–আল্লাহর যমীনে চরে খাবে, ওকে খারাপ উদ্দেশ্যে স্পর্শ করো না, (ওকে কোন কষ্ট দিলে) এক যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তোমাদেরকে গ্রাস করে ফেলবে।

٧٤- وَ اذْكُرُوْۤا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْۢ بَعْدِ عَادٍ وَّ بَوَّاَكُمْ فِی الْاَرْضِ تَتَّخِذُوْنَ مِنْ سُهُوْلِهَا قُصُوْرًا وَّ تَنْحِتُوْنَ الْجِبَالَ بُيُوْتًا ۚ فَاذْكُرُوْۤا اٰلَآءَ اللّٰهِ وَ لَا تَعْثَوْا فِی الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ○

৭৪। তোমরা স্মরণ কর সেই বিষয়টি যখন তিনি আ'দ জাতির পর তোমাদেরকে তাদের স্থলাভিষিক্ত করেছেন, আর তিনি তোমাদেরকে পৃথিবীতে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন যে, তোমরা সমতল ভূমিতে প্রাসাদ ও পাহাড় কেটে আবাস গৃহ নির্মাণ করেছো, সুতরাং তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় ছড়িয়ে দিয়ো না।

٧٥- قَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ
اسْتَكْبَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ لِلَّذِيْنَ
اسْتُضْعِفُوْا لِمَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ
اَتَعْلَمُوْنَ اَنَّ صٰلِحًا مُّرْسَلٌ
مِّنْ رَّبِّهٖ قَالُوْٓا اِنَّا بِمَآ اُرْسِلَ
بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ ○

৭৫। (অতঃপর) তার সম্প্রদায়ের দাম্ভিক প্রধানরা তখন তাদের মধ্যকার দুর্বল ও উৎপীড়িত মুমিনদেরকে বললো–তোমরা কি বিশ্বাস কর যে, সালেহ (আঃ) তার প্রতিপালক কর্তৃক প্রেরিত হয়েছে? তারা উত্তরে বললো– নিশ্চয়ই যে পয়গামসহ তিনি প্রেরিত হয়েছেন, আমরা তা বিশ্বাস করি ও মানি।

٧٦- قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْٓا اِنَّا
بِالَّذِيْٓ اٰمَنْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ ○

৭৬। তখন দাম্ভিকরা বললো– তোমরা যা বিশ্বাস কর আমরা তা অবিশ্বাস করি।

٧٧- فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ
اَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوْا يٰصٰلِحُ
ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ اِنْ كُنْتَ مِنَ
الْمُرْسَلِيْنَ ○

৭৭। অতঃপর তারা সেই উষ্ট্রীটিকে মেরে ফেললো এবং গর্ব ও দাম্ভিকতার সাথে তাদের প্রতিপালকের নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করে চলতে লাগলো এবং বললো–হে সালেহ! তুমি সত্য রাসূল হয়ে থাকলে আমাদেরকে যে শাস্তির ভয় দেখাচ্ছ তা আনয়ন কর।

٧٨- فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ
فَاَصْبَحُوْا فِيْ دَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ ○

৭৮। সুতরাং তাদেরকে একটি প্রলয়ংকরী বিপদ এসে গ্রাস করে নিলো, ফলে তারা নিজেদের গৃহের মধ্যেই নতজানু হয়ে পড়ে গেল।

ইবরাহীম খলীল (আঃ)-এর পূর্বে প্রাচীন আরবীয় যে গোত্রগুলো ছিল, সামুদও তাদেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। তারা ছিল আ'দ সম্প্রদায়ের পরবর্তী কওম। হিজায ও শামের মধ্যবর্তী 'ওয়াদী কুরা' ও ওর চতুষ্পার্শ্বের এলাকা তাদের আবাসভূমি হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল! হিজরী নবম সনে নবী (সঃ) তাবূকের দিকে যাত্রা শুরু করেছিলেন। পথিমধ্যে তাদের আবাসভূমি ও ঘর-বাড়ীর ধ্বংসাবশেষ তাঁর সামনে পড়ে যায়। হাজর নামক একটি জায়গা ছিল তাদের আবাসভূমি। নবী (সঃ) সাহাবীগণসহ তথায় অবস্থান করলে তাঁরা ঐসব ঝরণা হতে পানি নেন যেগুলো সামুদ সম্প্রদায় ব্যবহার করতো। সাহাবীগণ ঐ পানি দ্বারা আটা মর্দন করলেন এবং তা হাঁড়িতে রাখলেন। নবী (সঃ) তাঁদেরকে নির্দেশ দিলেন যে, হাঁড়িগুলো যেন উল্টিয়ে ফেলা হয় এবং আটাগুলো উটকে খাইয়ে দেয়া হয়। অতঃপর তাঁরা সেখান হতে প্রস্থান করলেন এবং অন্য এক ঝরণার ধারে অবতরণ করলেন যা সামুদের পানি পানের ঝরণা ছিল না। বরং ওটা ছিল তাদের উটের পানি পানের ঝরণা। রাসূলুল্লাহ (সঃ) সাহাবীগণকে শাস্তিপ্রাপ্ত সম্প্রদায়ের পার্শ্ব দিয়ে গমন করতে নিষেধ করেছিলেন এবং বলেছিলেনঃ "আমি ভয় করছি যে, না জানি তোমরাও ঐ শাস্তিতে পতিত হও যে শাস্তিতে সামুদ সম্প্রদায় পতিত হয়েছিল। সুতরাং তোমরা তাদের মধ্যে প্রবেশ করো না।" ইমাম আহমাদ (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হতে এটাও বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) 'হাজরে' অবস্থানকালে বলেছিলেনঃ "তোমরা ক্রন্দনরত অবস্থা ছাড়া কোন অবস্থাতেই এসব শাস্তিপ্রাপ্ত কওমের পার্শ্ব দিয়ে গমন করো না। যদি তোমরা ক্রন্দনকারী না হও তবে তাদের মধ্যে প্রবেশ করো না, নতুবা তাদের প্রতি যে শাস্তি পৌঁছেছিল তা তোমাদের উপরও পৌঁছে যাবে।"[১]

তাবূকের যুদ্ধে গমনকালে জনগণ আহলে হাজরের দিকে দ্রুতগতিতে চলছিলেন। তথায় অবতরণ করাই ছিল তাঁদের উদ্দেশ্য। রাসূলুল্লাহ (সঃ) এটা জানতে পেরে ঘোষণা করেনঃ "নামায হাজির।" হযরত আবূ কাবশা (রাঃ) বলেন—আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট আসলাম। তাঁর হাতে একটা বর্শা ছিল। তিনি বলছিলেন— "তোমরা এমন কওমের দিকে যেয়ো না, যাদের উপর আল্লাহর শাস্তি পতিত হয়েছিল।" তাঁদের একজন বললেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমরা এ লোকদেরকে দেখে বিস্মিত হচ্ছি।" তিনি বললেনঃ "আমি কি তোমাদেরকে এর চেয়ে বিস্ময়কর কথা বলবো না? তোমাদেরই একটি লোক অর্থাৎ আমি তোমাদেরকে অদৃশ্যভাবে এমন লোকদের খবর শুনাচ্ছি যারা

১. এ হাদীসের মূলকে সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে তাখরীজ করা হয়েছে

তোমাদের পূর্বে ছিল। আর অতীত ছাড়া আমি তোমাদের কাছে ভবিষ্যতের কথাও শুনাচ্ছি। সুতরাং সোজা হয়ে যাও এবং নিজেদেরকে সংশোধন করে নাও। কেননা, তোমাদের উপরও যদি শাস্তি নেমে আসে তবে আল্লাহ এতে কোনই পরওয়া করবেন না এবং এমন কওমও আসবে যারা নিজেরাও নিজেদের থেকে কোন কিছুই টলাতে পারবে না।" মোটকথা, রাসূলুল্লাহ (সঃ) যখন হাজরের মধ্য দিয়ে গমন করলেন তখন তিনি বললেন– "তোমরা মু'জিযা ও নিদর্শনাবলী যাচ্ঞা করো না। সালেহ (আঃ)-এর কওমও এগুলো চেয়েছিল। মু'জিযা হিসেবে তাদেরকে একটি উষ্ট্রী দেয়া হয়েছিল। ওটা এক পথ দিয়ে আসতো এবং আর এক পথ দিয়ে যেতো। তারা আল্লাহর হুকুম অমান্য করে ঐ উষ্ট্রীটিকে মেরে ফেলে। ঐ উষ্ট্রীটি একদিন ঝরণা থেকে পানি পান করতো এবং পরের দিন তারা ওর দুধ পান করতো। যখন তারা ওকে মেরে ফেললো তখন আকাশ থেকে এমন ভীষণ বজ্রধ্বনি হলো, যাতে তারা সবাই মরে গেল। তাদের মধ্যকার মাত্র একটি লোক রক্ষা পেল। কেননা ঐ সময় কা'বাঘরের মধ্যে সে অবস্থান করছিল।" জনগণ জিজ্ঞেস করলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! ঐ লোকটি কে ছিল?" তিনি উত্তরে বললেনঃ "সে ছিল আবু রাগাল। কিন্তু যখন সে কা'বা ঘর থেকে বের হলো তখন সেও শাস্তিতে নিপতিত হয়ে মারা গেল।"[১]

ইরশাদ হচ্ছে– আমি সামুদ জাতির নিকট তাদের ভ্রাতা সালেহ (আঃ)-কে প্রেরণ করেছিলাম। অন্যান্য সমস্ত পয়গাম্বরের মত তিনিও জনগণকে আহ্বান জানিয়ে বললেন–হে আমার কওম! তোমরা এক আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি ছাড়া অন্য কোন মা'বূদই নেই। সমস্ত পয়গাম্বর তাঁরই ইবাদতের দাওয়াত দিয়েছেন। যেমন আল্লাহ পাক বলেনঃ "(হে মুহাম্মাদ সঃ)! তোমার পূর্বে আমি যতজন নবী পাঠিয়েছি তাদের সবারই কাছে এই অহী করেছি– আমি ছাড়া অন্য কোন মা'বূদ নেই, সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদত কর।" তিনি আরও বলেনঃ "তারা সবাই তাওহীদের শিক্ষা দিতো এবং শয়তানের অনুসরণ থেকে বিরত রাখতো।"

আল্লাহ পাক বলেন– 'আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে নিদর্শন এসে গেছে এবং সেই নিদর্শন হচ্ছে উষ্ট্রীটি।' লোকেরা স্বয়ং হযরত সালেহ (আঃ)-এর কাছে এই প্রার্থনা জানিয়েছিল যে, তিনি যেন তাদেরকে কোন মু'জিযা প্রদর্শন করেন এবং তারা তাঁর কাছে এই আবেদন পেশ করে যে, তিনি যেন তাদের বাতলানো বিশেষ একটা কংকরময় ভূমি হতে একটি উষ্ট্রী বের করে আনেন। ঐ কংকরময় ভূমি ছিল হাজর নামক স্থানের এক দিকে একটি নির্জন পাথুরে ভূমি। ওটার নাম ছিল 'কাতিবাহ'। উষ্ট্রীটি গর্ভবতীও হতে হবে এবং দুগ্ধবতীও হতে

১. এ হাদীসটি বিশুদ্ধ ছয়টি হাদীসের কোনটির মধ্যেই বর্ণিত হয়নি।

হবে। হযরত সালেহ্ (আঃ) তাদের কাছে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন যে, যদি আল্লাহ তা'আলা তাদের আবেদন কবুল করে নেন তবে অবশ্যই তাদেরকে ঈমান আনতে হবে এবং তাঁর কথার উপর তারা অবশ্যই আমল করবে। এই অঙ্গীকার গ্রহণ ও ভয় প্রদর্শনের পর্ব শেষ হলে হযরত সালেহ্ (আঃ) প্রার্থনার জন্যে দাঁড়ালেন। প্রার্থনা করা মাত্রই সেই কংকরময় ভূমি নড়ে উঠলো। তা ফেটে গেলে ওর মধ্য হতে এমন একটি উষ্ট্রী বেরিয়ে পড়লো যা গর্ভবতী হওয়ার কারণে চলার সময় এদিক ওদিক নড়াচড়া করতে লাগলো। এ দৃশ্য দেখে ঐ কাফিরদের নেতা জানদা ইবনে আমর এবং তার অধীনস্থ লোকেরা ঈমান আনলো। এরপর সামুদ সম্প্রদায়ের অন্যান্য সম্ভ্রান্ত লোকেরাও ঈমান আনয়নের ইচ্ছা করলে যাওয়াব ইবনে আমর, হাবাব পূজারী এবং রাবাব তাদেরকে এ কাজ থেকে বিরত রাখলো। শিহাব নামক জানদার এক চাচাতো ভাই, যে সামুদ সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্ভ্রান্ত বংশীয় ছিল, ঈমান আনয়নের সংকল্প গ্রহণ করেছিল। কিন্তু ঐ লোকদের কথায় ঈমান আনয়ন থেকে বিরত থাকে। এ সম্পর্কেই সামুদ সম্প্রদায়ের মুমিনদের মধ্যকার মাহূশ নামক একটি লোক বলেন, যার ভাবার্থ হচ্ছে নিম্নরূপঃ জানদা নবীর দ্বীনের দিকে শিহাবকে আহ্বান করেছিল এবং তার ঈমান আনয়নের ইচ্ছাও হয়েছিল। কিন্তু হাজারবাসীর পথভ্রষ্ট লোকেরা হিদায়াতের পর তাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল। মোটকথা, উষ্ট্রীটির একটি বাচ্চা হলো এবং কিছুকাল ওটা ঐ কওমের মধ্যেই অবস্থান করলো। একটি ঝরণা হতে ওটা একদিন পানি পান করতো এবং একদিন পানি পান করা হতে বিরত থাকতো, যাতে অন্যান্য লোক এবং তাদের জীবজন্তুগুলো তা থেকে পানি পান করতে পারে। লোকগুলো উষ্ট্রীটির দুধ পান করতো এবং ইচ্ছামত ঐ দুধ দ্বারা তাদের পাত্রগুলো পরিপূর্ণ করতো। যেমন অন্য একটি আয়াতে রয়েছেঃ "পানি পান করার একটি নির্ধারিত দিন রয়েছে উষ্ট্রীর জন্যে এবং একদিন তোমাদের জন্যে।" ঐ উপত্যকায় উষ্ট্রীটি চরবার জন্যে এক পথ দিয়ে যেতো এবং অন্য পথ দিয়ে ফিরে আসতো। ওকে অত্যন্ত চাকচিক্যময় দেখাতো এবং ওকে দেখে মানুষের মনে সন্ত্রাস সৃষ্টি হয়ে যেতো। ওটা অন্যান্য জন্তুগুলোর পার্শ্ব দিয়ে গমন করলে ওরা ভয়ে পালিয়ে যেতো। এভাবে কিছুকাল কেটে গেল এবং ঐ কওমের ঔদ্ধত্যপনা বৃদ্ধি পেল। এমন কি তারা উষ্ট্রীটিকে মেরে ফেলারই ইচ্ছা করলো, যেন তারা প্রতিদিনই পানি পান করতে পারে। সুতরাং ঐ কাফিরের দল সর্বসম্মতিক্রমে ওকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো।

হযরত কাদাতা (রঃ) বলেন যে, যে ব্যক্তি ওকে হত্যা করেছিল তার কাছে সবাই গিয়েছিল, এমন কি স্ত্রীলোকেরাও এবং বালকেরাও। তাদের সবারই

উদ্দেশ্য ছিল তার দ্বারা ওকে হত্যা করিয়ে নেয়া। তারা সমস্ত দলই যে এতে অংশ নিয়েছিল তা নিম্নের আয়াত দ্বারাই প্রমাণিত হয়। আল্লাহ্ পাক বলেনঃ

فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوّٰهَا

অর্থাৎ "তারা তাকে (তাদের নবীকে) মিথ্যা প্রতিপন্ন করলো, সুতরাং তারা ওকে (উষ্ট্রীকে) হত্যা করে ফেললো। তখন তাদের প্রতিপালক তাদেরকে তাদের পাপের কারণে ধ্বংস করে দিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিলেন।" (৯১ঃ ১৪) আল্লাহ তা'আলা আর এক জায়গায় বলেনঃ "সামুদ সম্প্রদায়কে আমি উষ্ট্রীর মু'জিযা প্রদান করেছিলাম এবং ওটাই তাদের চক্ষু খোলার জন্যে যথেষ্ট ছিল। কিন্তু ঐ অত্যাচারীরা অত্যাচারমূলক কাজ করলো। মোটকথা, এই উষ্ট্রী হত্যার সম্পর্ক সমস্ত দলের সাথেই লাগানো হয়েছে যে, তারা সবাই এই কাজে শরীক ছিল।

ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) প্রমুখ তাফসীরকারক আলেমগণ বর্ণনা করেছেনঃ উষ্ট্রীটির হত্যার কারণ ছিল এই যে, সেই সময় উনাইযা নাম্নী একটি বৃদ্ধা মহিলা ছিল। সে হযরত সালেহ (আঃ)-এর প্রতি ঈমান আনেনি, বরং তাঁর সাথে তার কঠিন শত্রুতা ছিল। তার ছিল কয়েকটি সুন্দরী কন্যা। ধন-দৌলতেরও সে অধিকারিণী ছিল। তার স্বামীর নাম ছিল যাওয়াব ইবনে আমর। সে ছিল সামুদ সম্প্রদায়ের একজন নেতৃস্থানীয় লোক। সাদকা বিনতে মাহ্ইয়া নাম্নী আর একজন মহিলা ছিল। সেও ছিল ধন-সম্পদ ও বংশগরিমার অধিকারিণী। সে একজন মুমিন ব্যক্তির স্ত্রী ছিল এবং স্বামীকে সে পরিত্যাগ করেছিল। উষ্ট্রীর হত্যাকারীর সাথে তারা উভয়ে অঙ্গীকার করেছিল। সাদকা হাবাব নামক একটি লোককে উত্তেজিত করে বলেছিল যে, যদি সে উষ্ট্রীটিকে হত্যা করে দেয় তবে সে তারই হয়ে যাবে। হাবাব তা অস্বীকার করে। তখন সে তার চাচাতো ভাই মিসদা ইবনে মাহ্রাজকে বললে সে তা স্বীকার করে। উনাইযাহ্ বিনতে গানাম কাদার ইবনে সালিফকে আহ্বান করে। সে ছিল লাল নীল বর্ণের বেঁটে গঠনের লোক। জনগণ তাকে যারজ সন্তান বলে ধারণা করতো এবং তাকে তার পিতা সালিফের সন্তান মনে করতো না। সে প্রকৃতপক্ষে যার পুত্র ছিল তার নাম ছিল সাহ্ইয়াদ। অথচ সেই সময় তার মা সালিফের স্ত্রী ছিল। এই স্ত্রীলোকটি উষ্ট্রীর হন্তাকে বলেছিল- "তুমি উষ্ট্রীটিকে হত্যা করে ফেল। এর বিনিময়ে তুমি তোমার ইচ্ছামত আমার যে কোন কন্যাকে বিয়ে করতে পার।" সুতরাং মিসদা ইবনে মাহরাজ ও কাদার ইবনে সালিফ উভয়ে মিলে সামুদ সম্প্রদায়ের গুন্ডাদের সাথে ষড়যন্ত্র করলো এবং সাত ব্যক্তি তাদের সাথে যোগ দিলো। এভাবে তাদের মোট সংখ্যা হলো নয়জন। তাদের সম্পর্কেই আল্লাহ পাক বলেনঃ "শহরের মধ্যে

নয় ব্যক্তি ছিল, যারা সংশোধন মূলক কার্যের পরিবর্তে বিশৃংখলা মূলক কার্যে লিপ্ত হয়ে পড়েছিল।” আর ওরাই ছিল কওমের নেতৃস্থানীয় লোক। ঐ কাফিররা অন্যান্য কাফির গোত্রের লোকদেরকেও তাদের সাথে নিয়ে নিলো। তারা সবাই মিলে বেরিয়ে পড়লো এবং উষ্ট্রীর জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলো। যখন উষ্ট্রীটি পানি পান করে ফিরে আসলো তখন কাদার ওর পথে একটা কংকরময় ভূমির আড়ালে ওঁৎ পেতে বসে থাকলো। আর মিসদা বসলো অন্য একটি পাহাড়ের আড়ালে। উষ্ট্রীটি মিসদার পার্শ্ব দিয়ে গমন করা মাত্রই সে ওর পায়ের গোছায় একটা তীর মেরে দিলো। গানামের কন্যা বেরিয়ে পড়লো এবং তার সবচেয়ে সুন্দরী কন্যাকে ঐ দলের লোকদের সামনে হাযির করে দিলো। এভাবে সে তার পরমা সুন্দরী কন্যার সৌন্দর্য প্রকাশ করলো। কাদার তখন তার সাথে মিলনের নেশায় উত্তেজিত হয়ে উষ্ট্রীটিকে তলোয়ার মেরে দিলো। সাথে সাথে উষ্ট্রীটি মাটিতে পড়ে গেল। মাটিতে পড়ে গিয়ে সে স্বীয় বাচ্চাকে এক নযর দেখে নিলো এবং ভীষণ জোরে চীৎকার করে উঠলো। ঐ চিৎকার দ্বারা ও যেন স্বীয় বাচ্চাকে পালিয়ে যাওয়ার ইঙ্গিত করলো। তারপর ওর হন্তা ওর বক্ষের উপর বর্শা মেরে দিলো এবং এরপর ওর গলা কেটে ফেললো। ওর বাচ্চাটি একটি পাহাড়ের দিকে পালিয়ে গেল এবং চূড়ায় উঠে জোরে একটা চীৎকার ছাড়লো। সে যেন বললোঃ “হে আমার প্রতিপালক! আমার মা কোথায়?” কথিত আছে যে, বাচ্চাটি ঐভাবে তিনবার চীৎকার করেছিল। তারপর সে ঐ পাথুরে ভূমির মধ্যে হারিয়ে গিয়েছিল। এটাও কথিত আছে যে, লোকেরা ওর পশ্চাদ্ধাবন করে ওকেও হত্যা করে ফেলেছিল। আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে বেশী জানেন।

হযরত সালেহ (আঃ) যখন এ সংবাদ পান তখন তিনি বধ্যভূমিতে গমন করেন। জনগণের সমাগম ছিল। তিনি উষ্ট্রীটিকে দেখে কান্না শুরু করে দেন এবং তাদেরকে সম্বোধন করে বলেনঃ “তোমরা আর তিন দিন তোমাদের বাড়ীতে বাস করে নাও।” (আল-আয়াত) উষ্ট্রী হত্যার ঘটনাটি বুধবার সংঘটিত হয়েছিল। রাত্রি হলে ঐ নয় ব্যক্তি হযরত সালেহ (আঃ)-কেও হত্যা করার সংকল্প করে এবং পরামর্শক্রমে বলে– “যদি এ ব্যক্তি সত্যবাদী হয় এবং তিন দিন পর আমরা ধ্বংস হয়ে যাই তবে আমাদের পূর্বে একেই হত্যা করে দিই না কেন? আর যদি মিথ্যাবাদী হয় তবে তাকে আমরা তার উষ্ট্রীর কাছেই কেন পাঠিয়ে দেবো না?” আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ “ঐ লোকগুলো কসমের দ্বারা নিজেদের প্রতিজ্ঞার গুরুত্ব বাড়িয়ে দিয়ে বলে– সালেহ (আঃ) ও তার স্ত্রীকে আমরা হত্যা করে ফেলবো এবং তার বন্ধুদেরকে বলবো, তাদের হত্যার খবর আমরা কি করে জানবো? আমরা তো তাদের হত্যার ঘটনার সময় হাজিরই ছিলাম না। সুতরাং তাদের হত্যাকারী কে তা আমরা কি করে বলতে পারি এবং আমরা অবশ্যই সত্যবাদী।

তারা চালবাজী করতে চাইল। কিন্তু আমি যে চালবাজীর উপর ছিলাম ওর খবর তাদের মোটেই ছিল না। লক্ষ্য কর, ষড়যন্ত্রকারীদের পরিণাম কিরূপ হয়ে থাকে।" যখন তারা প্রস্তুতি গ্রহণ করলো এবং একমত হয়ে রাত্রিকালে আল্লাহর নবীকে হত্যা করার জন্যে বেরিয়ে আসলো তখন আল্লাহ পাকের নির্দেশক্রমে পাথর বর্ষণ শুরু হয়ে গেল। বৃহস্পতিবার ছিল অবকাশের প্রথম দিন। ঐ দিন আল্লাহর কুদরতে তাদের চেহারা হলদে বর্ণ ধারণ করলো, যেমন নবী (আঃ) তাদেরকে বলে দিয়েছিলেন। দ্বিতীয় দিন শুক্রবার তাদের মুখমন্ডল লাল বর্ণের হয়ে গেল। তৃতীয় দিন শনিবার ছিল পার্থিব ফায়েদা লাভের শেষদিন। ঐ দিন সকলের চেহারা কালো হয়ে গেল। সেদিন ছিল রবিবার। ঐ লোকগুলো সুগন্ধি মেখে শাস্তির অপেক্ষা করছিল যে, তাদের উপর সেটা কি আকারে আসবে! সূর্য উদিত হলো এবং আকাশ থেকে এক ভীষণ শব্দ বেরিয়ে আসলো। পায়ের নীচ থেকে এক কঠিন ভূমিকম্প শুরু হয়ে গেল। সাথে সাথে সবারই প্রাণবায়ু বেরিয়ে পড়লো। সকলের লাশ নিজ নিজ ঘরে পড়ে থাকলো। ছোট, বড়, নারী, পুরুষ কেউই বাঁচলো না। শুধুমাত্র কালবা বিনতে সালাক নাম্নী একটি মহিলা বেঁচে গেল। সে বড়ই কাফিরা মেয়ে ছিল এবং নবী সালেহ (আঃ)-এর ভীষণতম শত্রু ছিল। সে শাস্তি অবলোকন করে দ্রুতবেগে পলায়নের শক্তি লাভ করলো। একটি গোত্রের নিকট পৌঁছে যা কিছু সে দেখেছিল তাদেরকে সংবাদ দিয়ে দিলো। সমস্ত কওম কিভাবে ধ্বংস হয়ে গেল তারও সে আলোচনা করলো। তারপর সে পান করার জন্যে পানি চাইলো। পানি পান করা মাত্রই সে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লো।

সামুদ সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে হযরত সালেহ্ (আঃ) এবং তাঁর উম্মতগণ ছাড়া আর কেউই রক্ষা পায়নি। ঐ কওমের মধ্যে আবূ রাগাল নামক একটি লোক ছিল। শাস্তির সময় সে মক্কায় অবস্থান করছিল বলে ঐ সময় সে নিরাপত্তা লাভ করেছিল। কিন্তু কোন এক প্রয়োজনে যখন সে মক্কার বাইরে বের হলো তখন আকাশ থেকে একটা পাথর তার উপর পতিত হলো এবং তাতেই সে মারা গেল। কথিত আছে যে, এই আবূ রাগাল তায়েফে বসবাসকারী সাকীফ গোত্রের পূর্বপুরুষ ছিল। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আবূ রাগালের কবরের পার্শ্ব দিয়ে গমনের সময় বলেনঃ "এই কবরটি কার তা কি তোমরা জান? এটা হচ্ছে সামুদ সম্প্রদায়ের আবূ রাগাল নামক এক ব্যক্তির কবর যে হারামে অবস্থান করছিল। হারাম তাকে শাস্তি থেকে রক্ষা করেছিল। হারাম থেকে বের হওয়া মাত্রই সে শাস্তির কবলে পতিত হয় এবং এখানে সমাধিস্থ হয়। তার সাথে তার সোনার ছড়িটিও এখানে প্রোথিত রয়েছে।" জনগণ তখন তরবারী দ্বারা তার কবরটি খনন করে ঐ ছড়িটি বের করে নেয়।

৭৯। অতঃপর সে (সালেহ আঃ) এই কথা বলে তাদের জনপদ হতে বের হয়ে গেল– হে আমার সম্প্রদায়! আমি আমার প্রতিপালকের পয়গাম তোমাদের কাছে পৌঁছিয়ে দিয়েছি, আর আমি তোমাদেরকে উপদেশ দিয়েছিলাম, কিন্তু তোমরা তো হিতৈষী বন্ধুদেরকে পছন্দ কর না।

৭৯- فَتَوَلّٰى عَنْهُمْ وَ قَالَ يٰقَوْمِ لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّىْ وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلٰكِنْ لَّا تُحِبُّوْنَ النّٰصِحِيْنَ ○

সালেহ (আঃ)-এর কওম যে তাঁর বিরোধিতা করার কারণে ধ্বংস হয়ে গেল, তাই তিনি সেই মৃত দেহকে সম্বোধন করে ধমকাচ্ছেন। তারা যেন শুনতে রয়েছে। কেননা, সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম দ্বারা এটা প্রমাণিত যে, বদর যুদ্ধে নবী (সঃ) যখন কাফিরদের উপর জয়যুক্ত হলেন তখন তিনি তিন দিন পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করলেন। অতঃপর শেষ দিন রাত্রে বিদায়ের প্রাক্কালে কালীবে বদরের (বদরের গর্তের) পার্শ্বে দাঁড়িয়ে যান। কুরায়েশ কাফিরদেরকে সেখানে দাফন করা হয়েছিল। তিনি দাফনকৃত ব্যক্তিদেরকে নাম ধরে ধরে ডাক দিয়ে বলেনঃ "হে আবূ জেহেল ইবনে হিশাম! হে উৎবা! হে শায়বা! হে অমুক! হে অমুক! তোমরা প্রতিপালকের ওয়াদা পূরণকৃত অবস্থায় পেয়েছ কি? আমি আমার প্রতিপালকের ওয়াদা সদা পূরণকৃত অবস্থায় পেয়েছি।" এ কথা শুনে হযরত উমার (রাঃ) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আপনি কি মৃতদের সাথে কথা বলছেন?" তিনি উত্তরে বললেনঃ "আল্লাহর শপথ! তোমরা তাদের চেয়ে বেশী শুনতে পাও না। অবশ্যই তারা শুনে তবে উত্তর দিতে পারে না।" সীরাতের গ্রন্থে রয়েছে যে, নবী (সঃ) তাদেরকে সম্বোধন করে বলেছিলেনঃ "নবী গোত্রীয় লোকদের মধ্যে তোমরা খুবই মন্দ লোক ছিলে। বাইরের লোক আমার সত্যতা স্বীকার করে নিয়েছে, অথচ তোমরা আমার গোত্রের লোক হয়েও আমাকে অবিশ্বাস করেছিলে। মদীনাবাসী আমাকে আশ্রয় দিয়েছে, অথচ তোমরা আমাকে আমার দেশ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলে। তোমরা আমাকে হত্যা করার সংকল্প করেছিলে, অথচ অন্যেরা আমাকে সাহায্য করেছে। নবীর জন্যে তোমরা অত্যন্ত মন্দ গোত্র হিসেবে পরিগণিত হয়েছো।" অনুরূপভাবে হযরত সালেহ (আঃ) তাঁর কওমকে সম্বোধন করে বলেনঃ "আমি তোমাদের কাছে আল্লাহর বাণী পৌঁছিয়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু তোমরা সত্য কথাকে

পছন্দই করতে না।" এ জন্যেই ইরশাদ হচ্ছে- আমি তোমাদেরকে উপদেশ দিয়েছিলাম। কিন্তু সেই উপদেশ তোমাদের কাছে মোটেই পছন্দনীয় হয়নি। কোন এক মুফাস্সির বর্ণনা করেছেন যে, যে নবীর উম্মত ধ্বংস হয়ে যেতো সেই নবী মক্কার হারামে এসে আশ্রয় গ্রহণ করতেন। আল্লাহই সবচেয়ে বেশী জ্ঞানের অধিকারী।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বার্ণিত আছে যে, হজ্ব মৌসুমে নবী (সঃ) যখন 'আসফান' উপত্যকার পার্শ্ব দিয়ে গমন করেন তখন তিনি হযরত আবূ বকর (রাঃ)-কে সম্বোধন করে বলেনঃ "হে আবূ বকর (রাঃ)! এটা কোন্ জায়গা?" হযরত আবূ বকর (রাঃ) উত্তরে বলেনঃ "এটা হচ্ছে আসফান উপত্যকা।" তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "হযরত সালেহ (আঃ) ও হযরত হূদ (আঃ) উষ্ট্রীতে আরোহণ করে কোন এক সময় এখান দিয়ে গমন করেন। উষ্ট্রীর লাগাম ছিল খেজুর গাছের রজ্জু। তাঁদের পরনে ছিল কম্বলের লুঙ্গী এবং চাদর ছিল পালক বা চামড়ার তৈরী। তাঁরা 'লাব্বায়েক' ধ্বনি উচ্চারণ করতে করতে 'বায়তে আতীক'-এর হজ্বের জন্যে যাচ্ছিলেন।"[১]

৮০। আর আমি লূত (আঃ)-কে নবুওয়াত দান করে পাঠিয়েছিলাম, যখন সে তার কওমকে বলেছিল- তোমরা এমন অশ্লীল ও কুকর্ম করছো; যা তোমাদের পূর্বে বিশ্বে আর কেউই করেনি।

৮১। তোমরা স্ত্রীলোকদের বাদ দিয়ে পুরুষদের দ্বারা নিজেদের যৌন ইচ্ছা নিবারণ করে নিচ্ছো। প্রকৃতপক্ষে তোমরা হচ্ছো সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়।

٨٠- وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖ اَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ○

٨١- اِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُوْنِ النِّسَاۤءِ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ ○

'ঐ সময়টিও স্মরণযোগ্য যখন আমি (আল্লাহ) লূত (আঃ)-কে নবীরূপে প্রেরণ করেছিলাম। সে তার কওমকে আল্লাহর পথে আহ্বান করেছিল।' লূত

১. এটা ইমাম আহমাদ (রঃ) তাখরীজ করেছেন। ইবনে কাসীর (রঃ) বলেন যে, এ পর্যায়ে এই হাদীসটি গারীব।

(আঃ) ছিলেন লূত ইবনে হারূন ইবনে আযর। তিনি হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ (আঃ)-এর ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন। হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর সাথে তিনিও ঈমান আনয়ন করেছিলেন এবং তাঁর সাথে সিরিয়ার দিকে হিজরত করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে আহ্লে সুদূমের নিকট পাঠিয়েছিলেন। তিনি সুদূমবাসীকে আল্লাহর দিকে ডাকতেন এবং সৎকাজের আদেশ ও মন্দ কাজ হতে নিষেধ করতেন। তারা এমন নির্লজ্জতাপূর্ণ কাজের আবিষ্কার করেছিল যা হযরত আদম (আঃ) থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত তাদের ছাড়া অন্য কোন জাতি সেই কাজে লিপ্ত হয়নি। তারা নারীদেরকে ছেড়ে পুরুষদের কাছে কু-কাজের জন্যে আসতো। এ কাজের কল্পনা আজ পর্যন্ত কারো মনেও জাগ্রত হয় নি এবং আজ পর্যন্ত বানী আদম এ কাজে কখনও জড়িত হয়নি। জামে' দামেশ্কের প্রতিষ্ঠাতা উমাইয়া খলীফা ওয়ালীদ ইবনে আব্দুল মালিক বলেছিলেনঃ "যদি আল্লাহ তা'আলা কুরআন কারীমে লূত সম্প্রদায়ের ঘটনা বর্ণনা না করতেন তবে আমার এ বিশ্বাসই হতো না যে, কোন পুরুষ লোক অন্য কোন পুরুষ লোকের সাথে এরূপ কাজ করতে পারে!" সুতরাং হযরত লূত (আঃ) স্বীয় সম্প্রদায়কে সম্বোধন করে বললেনঃ "তোমরা এমন অশ্লীল ও কুকর্মে লিপ্ত হয়ে পড়েছো যে কাজ তোমাদের পূর্বে বিশ্বে আর কেউই করে নি। তোমরা নারীদেরকে ছেড়ে পুরুষ লোকদের কাছে আসছো এবং তাদের দ্বারা নিজেদের যৌন ক্রিয়া নিবারণ করে নিচ্ছো? বাস্তবিকই এটা তোমাদের সীমালংঘন ও বড় রকমের অজ্ঞতাই বটে! যে জিনিসের যেটা স্থান নয় তোমরা ওকে ওরই স্থান বানিয়ে নিচ্ছো।" এরপর অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক (হযরত লূতের আঃ কথা নকল করে) বলেনঃ "এরা আমার কন্যা যার সাথে চাও সম্পর্ক স্থাপন কর।" তারা বললোঃ "(হে লূত আঃ)! তুমি তো জান যে, তোমার এই পার্থিব কন্যাদের কোনই প্রয়োজন আমাদের নেই। যাদের প্রয়োজন আমাদের রয়েছে তা তোমার জানা আছে।" মুফস্সিরগণ বর্ণনা করেছেন যে, পুরুষ নিজের প্রয়োজন পুরুষ দ্বারা পূর্ণ করে নিতো এবং নারীরাও তাদের প্রয়োজন নারীদের দ্বারাই পূর্ণ করে নিতো। আর ওটা ছাড়া তাদের কোন উপায়ও ছিল না।

৮২। কিন্তু তার জাতির লোকদের এটা ছাড়া আর কোন জওয়াবই ছিল না যে, এদেরকে তোমাদের জনপদ থেকে বের করে দাও, এরা নিজেদেরকে বড় পবিত্র লোক বলে প্রকাশ করছে।

٨٢- وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖٓ اِلَّآ اَنْ قَالُوْٓا اَخْرِجُوْهُمْ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ ۚ اِنَّهُمْ اُنَاسٌ يَّتَطَهَّرُوْنَ ○

হযরত লূত (আঃ)-এর কথার জবাবে তারা পরস্পর বলাবলি করে– তোমরা লূত (আঃ)-কে ও তার সঙ্গীদেরকে তোমাদের দেশ থেকে বের করে দাও। কিন্তু মহান আল্লাহ হযরত লূত (আঃ)-কে সেখান থেকে নিরাপদে বের করে আনেন এবং কাফিরদেরকে অপমানের মৃত্যু দান করেন। اِنَّهُمْ اُنَاسٌ يَّتَطَهَّرُوْنَ আল্লাহ পাকের এই উক্তি সম্পর্কে হযরত কাতাদা (রঃ) বলেন যে, হযরত লূত (আঃ)-এর কওম তাঁদেরকে দোষ ছাড়াই দোষী করে। তারা হযরত লূত (আঃ)-এর ঐ ভাল কাজকেই দোষ বলে যে, তিনি বড়ই পবিত্র লোক হিসেবে চলা ফেরা করছেন। অথবা ভাবার্থ এই যে, পুরুষদের গুহ্যদ্বার ও নারীদের গুহ্যদ্বার হতে বেঁচে থাকার দোষ অবশ্যই হযরত লূত (আঃ) এবং তাঁর সঙ্গীদের মধ্যে রয়েছে। এটা হযরত মুজাহিদ (রঃ) এবং হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর উক্তি।

٨٣- فَاَنْجَيْنٰهُ وَ اَهْلَهٗۤ اِلَّا امْرَاَتَهٗ ۖ كَانَتْ مِنَ الْغٰبِرِيْنَ ۝

٨٤- وَ اَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَّطَرًا ؕ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِيْنَ ۝

৮৩। পরিশেষে, আমি লূত (আঃ)-কে এবং তার পরিবারের লোকদেরকে তার স্ত্রী ছাড়া শাস্তি হতে রক্ষা করেছিলাম, তার স্ত্রী ছিল ধ্বংসপ্রাপ্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত।

৮৪। অতঃপর আমি তাদের উপর মুষলধারে বারিপাত করেছিলাম, সুতরাং অপরাধী লোকদের পরিণাম কি হয়েছিল তা লক্ষ্য কর।

আল্লাহ তা'আলা বলেন– আমি লূত (আঃ)-কে এবং তার পরিবারবর্গকে বাঁচিয়ে নিয়েছিলাম। তার পরিবারের লোক ছাড়া আর কেউই ঈমান আনেনি। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "যারা মুমিন ছিল তাদেরকে (শাস্তির স্থান হতে) বের করে এনেছিলাম।" একটি বাড়ী ছাড়া তো আর কোন মুসলমান বাড়ীই ছিল না। কিন্তু তার স্ত্রীকে বাঁচানো হয়নি। কেননা, সে ঈমান আনেনি, বরং তার কওমের ধর্মের উপরই রয়ে গিয়েছিল। সে লূত (আঃ) -এর বিরুদ্ধবাদীদের সাথে যোগাযোগ করতো। হযরত লূত (আঃ)-এর কাছে ফেরেশতাগণ যুবকদের রূপ ধরে যে আগমন করতেন এবং তাঁর কওমের লোকেরাও যে তা অবহিত হয়ে যেতো, এ সবকিছুই ঐ মহিলার গুপ্তচরগিরির কারণেই সম্ভব হতো। আল্লাহ

তা'আলা হযরত লূত (আঃ)-কে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, তিনি যেন রাত্রে স্বীয় পরিবারের লোকদেরকে নিয়ে গ্রাম ছেড়ে চলে যান। কিন্তু তাঁর স্ত্রী যেন সেটা জানতে না পারে। তাকে নিয়ে যেতে হবে না। আবার কেউ কেউ বলেন যে, তাঁর সেই স্ত্রীও তাঁদের সাথে গিয়েছিল। গ্রাম থেকে বের হওয়া মাত্রই যখন তাঁর কওমের উপর শাস্তি অবতীর্ণ হলো তখন ঐ মহিলাটি সহানুভূতির দৃষ্টিতে তাদের দিকে ঘুরে ঘুরে দেখছিল। শেষ পর্যন্ত সেও শাস্তিতে জড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু সঠিক কথা এই যে, সে গ্রাম থেকে বের হয়নি এবং হযরত লূত (আঃ) তাকে গ্রাম হতে বের হওয়ার সংবাদই দেননি। বরং সে কওমের সাথেই রয়ে গিয়েছিল। এ জন্যেই আল্লাহ পাক বলেনঃ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ অর্থাৎ الْبَاقِينَ আবার مِنَ الْهَالِكِينَ ও বলা হয়েছে এবং তাফসীর বিল লাযিম হচ্ছে এটাই।

وَامْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيلٍ... -এই আয়াতটি وَامْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا (১১ঃ ৮২) এই উক্তিরই তাফসীর করছে। এই জন্যেই আল্লাহ তা'আলা বলেন, পাপকার্য সম্পাদন ও মিথ্যা প্রতিপন্ন করণের ফলে অপরাধীদের উপর কিরূপে শাস্তি অবতীর্ণ হয়েছিল তা লক্ষ্য কর। ইমাম আবূ হানিফা (রঃ) বলেন যে, সমমৈথুনকারীকে উপর থেকে নীচে নিক্ষেপ করতে হবে এবং তার উপর পাথর বর্ষণ করতে হবে। কেননা, লূত (আঃ)-এর কওমের সাথেও শাস্তির এ পন্থাই অবলম্বন করা হয়েছিল। কোন কোন আলেমের মতে তাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করে দিতে হবে, সে বিবাহিত হোক বা অবিবাহিতই হোক। ইমাম শাফিঈ (রঃ)-এর একটি বর্ণনা এই রূপই রয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "তোমরা যাকেই কওমে লূত (আঃ)-এর আমলের ন্যায় আমল করতে দেখতে পাবে, তাকেই তোমরা হত্যা করে ফেলবে, যে ঐ রূপ আমল করবে তাকেও এবং যার সাথে করবে তাকেও।"[১] কেউ কেউ বলেন যে, সমমৈথুনকারী ব্যভিচারীর মতই। সুতরাং সে বিবাহিত হলে তাকে প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা করা হবে এবং অবিবাহিত হলে একশ' কোড়া মারতে হবে। স্ত্রী লোকদের সাথে এ কাজ করলেও সেটা সমমৈথুনরূপে পরিগণিত হবে। ইজমায়ে উম্মত দ্বারা এটাকেও অবৈধ করা হয়েছে। এর বিপরীত একটি মাত্র অতি বিরল উক্তি রয়েছে। এরও নিষিদ্ধতায় রাসূলুল্লাহ (সঃ) হতে কয়েকটি হাদীস বর্ণিত আছে। সূরায়ে বাকারায় এর বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে।

১. এ হাদীসটি ইমাম আবূ দাউদ (রঃ), ইমাম তিরমীযী (রঃ) এবং ইমাম ইবনে মাজাহ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

৮৫। আর আমি মাদিয়ানবাসীদের কাছে তাদেরই ভাই শু'আইব (আঃ)-কে পাঠিয়েছিলাম, সে তার স্বজাতিকে সম্বোধন করে বলেছিল– হে আমার জাতি! তোমরা (শিরক বর্জন করে) একমাত্র আল্লাহর ইবাদত কর, তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন মা'বূদ নেই, তোমাদের প্রভুর পক্ষ হতে তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট দলীল এসে গেছে সুতরাং তোমরা ওজন ও পরিমাপ পূর্ণ মাত্রায় দেবে, মানুষকে তাদের প্রাপ্য বস্তু কম দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত করবে না, আর দুনিয়ায় শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপনের পর ঝগড়া-ফাসাদ ও বিপর্যয় ঘটাবে না, তোমরা বাস্তবিক পক্ষে ঈমানদার হলে এই পথই হলো তোমাদের জন্যে কল্যাণকর।

৮৫- وَ اِلٰى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۗ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ قَدْ جَآءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَ الْمِيْزَانَ وَ لَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَآءَهُمْ وَ لَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۚ

সুরইয়ানী ভাষায় হযরত শু'আইব (আ)-এর প্রকৃত নাম ছিল ইয়াসরূন। মাদিয়ান শব্দটি গোত্রের উপরেও প্রয়োগ করা হতো এবং শহরের অর্থেও ব্যবহৃত হতো। এটা 'মাআন' নামক জায়গার নিকটে অবস্থিত, যা হিজাযের পথে রয়েছে।[১] যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "যখন সে (হযরত মূসা আঃ মাদিয়ানের ঝর্ণার কাছে পৌঁছালো তখন সেখানে এমন কতক লোককে পেলো যারা ঐ ঝর্ণা হতে পানি নিচ্ছিল।" তারা হচ্ছে আসহাবুল আয়কাত, যার বর্ণনা ইনশাআল্লাহ অতিসত্বরই দেয়া হবে। ইরশাদ হচ্ছে– 'সে (শু'আইব আঃ) বললো– হে আমার কওম! তোমরা আল্লাহরই ইবাদত কর, তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন মা'বূদ নেই।' সমস্ত রাসূলেরই তাবলীগ ও দাওয়াত এটাই ছিল। 'তোমাদের কাছে তোমাদের প্রভুর পক্ষ হতে সুস্পষ্ট দলীল এসে গেছে।'

১. বর্তমানে 'মাআন' হচ্ছে জর্দানের পূর্বে অবস্থিত একটি প্রসিদ্ধ শহর।

হযরত শু'আইব (আঃ) লোকদেরকে তাদের ব্যবহারিক জীবনের লেনদেন সম্পর্কে উপদেশ দিয়ে বলেনঃ তোমরা নিজেদের ওজন ও পরিমাপ ঠিক রাখবে, লোকদের ক্ষতি করবে না। অন্যদের মালে তোমরা খিয়ানত করবে না। পরিমাপ ও ওজনে চুরি করে কম করতঃ কাউকেও প্রতারিত করবে না। যেমন মহান আল্লাহ বলেন, "পরিমাপ ও ওজনে কমকারীদের জন্যে বড়ই ধ্বংস ও অকল্যাণ রয়েছে।" এটা হচ্ছে কঠিন ধমক ও হুমকি এবং ভীতি প্রদর্শন।

এরপর আল্লাহ্ তা'আলা হযরত শু'আইব (আঃ) সম্পর্কে সংবাদ দিচ্ছেন যে, তিনি স্বীয় কওমকে উপদেশ দিতেন। তাঁকে 'খতীবুল আম্বিয়া' বা নবীদের ভাষণদাতা বলা হতো। কেননা, তিনি অত্যন্ত বাকপটুতার সাথে ভাষণ দিতে পারতেন এবং জনগণকে অতি চমৎকার ভাষায় উপদেশ দিতেন।

৮৬। আর (জীবনের) প্রতিটি পথে এমনিভাবে ডাকাত হয়ে যেয়ো না যে, ঈমানদার লোকদেরকে ভয়-ভীতি প্রদর্শন ও আল্লাহর পথ হতে বিরত রাখতে থাকবে এবং সহজ সরল পথকে আঁকা বাঁকা করণে ব্যস্ত থাকবে, ঐ অবস্থাটির কথা স্মরণ কর, যখন তোমরা সংখ্যায় স্বল্প ছিলে, অতঃপর তিনি (আল্লাহ্) তোমাদের সংখ্যা বেশী করে দিলেন, আর এই জগতে বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণতি কি হয়েছে তা জ্ঞানচক্ষু খুলে লক্ষ্য কর।

٨٦- وَ لَا تَقْعُدُوْا بِكُلِّ صِرَاطٍ
تُوْعِدُوْنَ وَ تَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ
اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِهٖ وَ تَبْغُوْنَهَا
عِوَجًا ۚ وَ اذْكُرُوْۤا اِذْ كُنْتُمْ قَلِيْلًا
فَكَثَّرَكُمْ ۪ وَ انْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ
عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ ○

৮৭। আমার নিকট যা (আল্লাহর পক্ষ হতে) প্রেরিত হয়েছে তা যদি তোমাদের কোন দল বিশ্বাস করে এবং কোন দল অবিশ্বাস করে তবে (সেই

٨٧- وَ اِنْ كَانَ طَآئِفَةٌ مِّنْكُمْ
اٰمَنُوْا بِالَّذِيْۤ اُرْسِلْتُ بِهٖ وَ
طَآئِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوْا فَاصْبِرُوْا

পর্যন্ত) ধৈর্য ধারণ কর যতক্ষণ না আল্লাহ আমাদের মধ্যে চূড়ান্ত ফায়সালা করে দেন, তিনিই হলেন উত্তম ফায়সালাকারী।	حَتّٰى يَحْكُمَ اللّٰهُ بَيْنَنَا ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ ۝

হযরত শু'আইব (আঃ) জনগণকে ইন্দ্রিয়গতভাবে এবং মৌলিকভাবে ডাকাতি করতে নিষেধ করেছেন। অর্থাৎ তিনি তাদেরকে বলেছেন—তোমরা পথের উপর বসে জনগণকে ভীতিপ্রদর্শন করতঃ কিছু কেড়ে ও লুটপাট করে নিয়ো না এবং তাদের মাল তোমাদেরকে দিতে অস্বীকার করলে তোমরা তাদেরকে হত্যা করে ফেলার হুমকি দিয়ো না। এটা লুণ্ঠনকারীরা শুল্ক আদায়ের নাম দিয়ে লুণ্ঠন করতো আর যারা হিদায়াত লাভের উদ্দেশ্যে হযরত শু'আইব (আঃ)-এর কাছে আসতো তাদেরকে বাধা প্রদান করতো এবং আসতে দিতো না। এই দ্বিতীয়টি হচ্ছে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর উক্তি। প্রথম উক্তিটিই হচ্ছে বেশী স্পষ্ট এবং রচনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কেননা, সিরাতের অর্থ পথ। আর হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) যা বুঝেছেন তা তো মহান আল্লাহ অন্য আয়াতে স্বয়ং বলেছেনঃ "যারা ঈমান এনেছে, তোমরা তাদের পথে বসে যাচ্ছ এবং সৎলোকদেরকে আমার পথে আসতে বাধা প্রদান করতঃ ভুল পথে ফিরিয়ে দিচ্ছ।" (হযরত শু'আইব আঃ স্বীয় কওমের লোকদেরকে সম্বোধন করে বলেনঃ) হে আমার কওমের লোকেরা! তোমরা সংখ্যায় কম ছিলে, এবং দুর্বল ছিলে অতঃপর আল্লাহ তোমাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করতঃ তোমাদের শক্তিশালী করেছেন, এ জন্যে তোমাদের তাঁর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। কেননা, এটা তোমাদের প্রতি মহান আল্লাহর বড়ই অনুগ্রহ বটে। পূর্বযুগে পাপীদেরকে পাপের কারণে শাস্তি দ্বারা ধ্বংস করে দেয়া হয়েছিল। তারা বেপরোয়াভাবে আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণ করতো। এ কারণে তাদের পরিণাম এইরূপ হয়েছিল। এর থেকে তোমাদেরকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত যে, তোমরা এইরূপ কাজ করলে তোমাদের পরিণতিও ঐরূপই হবে। আমার প্রচারের মাধ্যমে যদি তোমাদের একটি দল ঈমান আনয়ন করে এবং অন্য দল ঈমান না আনে, তবে তোমরা অপেক্ষা কর এবং ধৈর্যের সাথে কাজ কর যে পর্যন্ত না আল্লাহ আমাদের ও তোমাদের মধ্যে ফায়সালা করে দেন। তিনিই হচ্ছেন সর্বোত্তম ফায়সালাকারী। মুত্তাকীদেরই পরিণাম হবে ভাল এবং কাফিরদের জন্য ধ্বংস অনিবার্য।

অষ্টম পারা সমাপ্ত

৮৮ । আর তার সম্প্রদায়ের দাম্ভিক ও অহংকারী প্রধানরা বলেছিল−হে শো'আইব (আঃ)! আমরা অবশ্যই তোমাকে ও তোমার সঙ্গী সাথী মুমিনদেরকে আমাদের জনপদ হতে বহিষ্কার করবো অথবা তোমরা আমাদের ধর্মাদর্শে ফিরে আসবে, তখন সে বললো−আমরা যদি তাতে রাযী না হই (তবুও কি জোর করে ফিরিয়ে নিবে)?

٨٨- قَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ لَنُخْرِجَنَّكَ يٰشُعَيْبُ وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَآ اَوْ لَتَعُوْدُنَّ فِيْ مِلَّتِنَا ؕ قَالَ اَوَ لَوْ كُنَّا كٰرِهِيْنَ ۟ۚ

৮৯ । তোমাদের ধর্মাদর্শ হতে আল্লাহ আমাদেরকে মুক্তি দেয়ার পর আমরা যদি তাতে আবার ফিরে যাই তবে নিশ্চিতভাবে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপকারী হবো, আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ না চাইলে ওতে আবার ফিরে যাওয়া আমাদের পক্ষে কোনক্রমেই সম্ভব নয়, প্রতিটি বস্তুই আমাদের প্রতিপালকের জ্ঞানায়ত্ত, আমরা আল্লাহর উপরই নির্ভর করছি, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের ও আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে সঠিকভাবে ফায়সালা করে দিন, আপনিই তো সর্বোত্তম ফায়সালাকারী।

٨٩- قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اِنْ عُدْنَا فِيْ مِلَّتِكُمْ بَعْدَ اِذْ نَجّٰىنَا اللّٰهُ مِنْهَا ؕ وَمَا يَكُوْنُ لَنَآ اَنْ نَّعُوْدَ فِيْهَآ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ رَبُّنَا ؕ وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ؕ عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا ؕ رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَاَنْتَ خَيْرُ الْفٰتِحِيْنَ ۝

কাফিররা তাদের নবী হযরত শোআ'ইব (আঃ)-এর সাথে এবং তার সময়ের মুসলমানদের সাথে যে দুর্ব্যবহার করেছিল এবং যেভাবে তাঁদেরকে হুমকি দিয়ে বলেছিল যে, হয় তাঁরা তাদের জনপদ ছেড়ে চলে যাবেন, না হয় তাদের ধর্মে দীক্ষিত হবেন, আল্লাহ পাক এখানে এসব সংবাদই দিচ্ছেন। বাহ্যতঃ এই সম্বোধন রাসূলের প্রতি হলেও প্রকৃতপক্ষে এটা তাঁর উম্মতের প্রতিই বটে। হযরত শো'আইব (আঃ)-এর কওমের অহংকারী ও দাম্ভিক লোকেরা তাঁকে সম্বোধন করে বলেছিলঃ "হে শোআ'ইব (আঃ)! আমরা তোমাকে ও তোমার সঙ্গীদেরকে জনপদ থেকে বের করে দেবো অথবা তোমাদেরকে আমাদের ধর্মে ফিরে আসতে হবে।" তখন হযরত শোআ'ইব (আঃ) উত্তরে বললেনঃ "যদিও আমরা তাতে সম্মত না হই তবুও কি? যদি আমরা তোমাদের ধর্মে ফিরে যাই এবং তোমাদের মতাদর্শকে গ্রহণ করি তবে নিশ্চিতরূপে আমরা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপকারী হব যে, মূর্তিগুলোকে আমরা আল্লাহর শরীক বানিয়ে নিচ্ছি!" এই রূপে কাফিরদের অনুসরণ করার প্রতি ঘৃণা জন্মানো হচ্ছে। হযরত শোআ'ইব (আঃ) বললেনঃ "এ কাজ আমাদের দ্বারা সম্পাদিত হতে পারে না যে, আমরা পুনরায় মুশরিক হয়ে যাবো। তবে, আল্লাহ যদি আমাদেরকে ফিরিয়ে দেন তাহলে সেটা অন্য কথা। কেননা, ভবিষ্যতের সমস্ত জ্ঞান তিনি পরিবেষ্টন করে রয়েছেন। আমরা যা অবলম্বন করি এবং যা অবলম্বন করি না সবকিছুতেই আমরা আল্লাহর উপর ভরসা করি। হে আল্লাহ! আপনি আমাদের মধ্যে ও আমাদের কওমের মধ্যে সত্যকে প্রকাশ করে দিন এবং আমাদেরকে তাদের উপর জয়যুক্ত করুন। আপনি হচ্ছেন উত্তম ফায়সালাকারী।" خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ এমন ন্যায়-বিচারককে বলা হয় যিনি অণু পরিমাণও অন্যায় ও যুলুম করেন না।

৯০। আর তাদের সম্প্রদায়ের কাফির লোকদের প্রধানগণ (সর্বসাধারণকে) বলেছিল– তোমরা যদি শোআ'ইব (আঃ) -কে অনুসরণ করে চল, তবে তোমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

٩٠- وَ قَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا اِنَّكُمْ اِذًا لَّخٰسِرُوْنَ ○

৯১। অতঃপর ভূ-কম্পন তাদেরকে গ্রাস করে ফেললো, ফলে তারা নিজেদের গৃহেই উপুড় হয়ে পড়ে রইলো।

٩١- فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَاَصْبَحُوْا فِيْ دَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ ○

৯২। অবস্থা দেখে মনে হলো–যারা শোআ'ইব (আঃ) -কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল, তারা যেন কখনো সেখানে বসবাস করেনি, শো'আইব (আঃ)-কে মিথ্যা প্রতিপন্নকারী লোকেরাই শেষ পর্যন্ত ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল।

٩٢- الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا شُعَيْبًا كَاَنْ لَّمْ يَغْنَوْا فِيْهَا اَلَّذِيْنَ كَذَّبُوْا شُعَيْبًا كَانُوْا هُمُ الْخٰسِرِيْنَ ○

তাদের কুফরী, একগুঁয়েমী ও পথভ্রষ্টতা কত কঠিন হয়ে পড়েছিল এবং সত্যের বিরোধিতাকরণ তাদের অন্তরে কিরূপ প্রাকৃতিক রূপ ধারণ করেছিল, আল্লাহ তা'আলা এখানে সেই সংবাদই দিচ্ছেন। এ জন্যেই তারা পরস্পর শপথ করে করে বলেছিল–দেখ, যদি তোমরা শোআ'ইব (আঃ)-এর কথা মেনে নাও তাহলে বড়ই ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে। তাদের এই দৃঢ় সংকল্পের পর আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, এই সংকল্পের কারণে তাদের প্রতি এমন এক ভূমিকম্প প্রেরিত হয়েছিল যার ফলে তারা নিজ নিজ গৃহে উপুড় হয়ে পড়ে রয়েছিল। আর এই শাস্তি ছিল তাদের সেই কর্মের প্রতিফল যে, তারা বিনা কারণে শোআ'ইব (আঃ)-কে এবং তাঁর সঙ্গী-সাথীদেরকে ভীতি প্রদর্শন করেছিল ও দেশ থেকে তাড়িয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। যেমন সূরায়ে হুদে বর্ণিত হয়েছে– "যখন আমার শাস্তি তাদের উপর এসে পড়লো তখন আমি শোআ'ইব (আঃ)-কে এবং তার সঙ্গী-সাথীদেরকে স্বীয় অনুগ্রহে বাঁচিয়ে নিলাম, আর ঐ যালিমদেরকে এমন বজ্রধ্বনি পেয়ে বসলো যে, তারা নিজেদের গৃহে নতজানু অবস্থায় বিনাশ হয়ে গেল।" এই দু'টি আয়াতের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ এই যে, যখন ঐ কাফিররা اَصَلٰوتُكَ تَاْمُرُكَ.... (১১ঃ ৮৭) বলে বিদ্রূপ করলো তখন এক ভীষণ বজ্রধ্বনি তাদেরকে চিরতরে নীরব করে দিল। সূরায়ে শু'আরার মধ্যে আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেছেন–"তারা যখন নবীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করলো, তখন মেঘাচ্ছন্ন দিবসের শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করলো, এটা ছিল এক ভয়ানক দিবসের শাস্তি।" এর একমাত্র কারণ ছিল এই যে, তারা শাস্তি চেয়ে বলেছিল–"তুমি যদি সত্যবাদী হও তবে আমাদের উপর আকাশের একটা খণ্ড ফেলে দাও।" তাই আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিলেন যে, তাদের উপর আসমানী আযাব পৌঁছে গেল। তাদের উপর তিনটি শাস্তি একত্রিত হলো। (১) আসমানী শাস্তি, তা এইভাবে

যে, তাদের উপর মেঘ হতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ও অগ্নিশিখা বর্ষিত হলো। (২) এক ভীষণ বজ্রধ্বনি হলো। (৩) এক ভীষণ ভূমিকম্প সৃষ্টি হলো, যার ফলে তাদের প্রাণবায়ু নির্গত হয়ে গেল এবং তাদের আত্মাবিহীন দেহ তাদের গৃহ-মধ্যে পড়ে রইলো। মনে হলো যেন তারা সেখানে কখনো বসবাসই করেনি। অথচ তারা তাদের নবীকে দেশ ছাড়া করেছিল। এখন আল্লাহ ঐ কথাগুলোরই পুনরাবৃত্তি করছেন যে, যারা শোআ'ইব (আঃ)-কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল শেষ পর্যন্ত তারাই ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল।

٩٣- فَتَوَلّٰى عَنْهُمْ وَ قَالَ يٰقَوْمِ لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ رِسٰلٰتِ رَبِّىْ وَ نَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ اٰسٰى عَلٰى قَوْمٍ كٰفِرِيْنَ ۝

৯৩। সে (শো'আইব আঃ) তাদের নিকট হতে এ কথা বলে বেরিয়ে আসলো–হে আমার জাতি! আমি আমার প্রভুর পয়গাম তোমাদের নিকট পৌঁছিয়েছি, সুতরাং আমি কাফির সম্প্রদায়ের জন্যে কি করে আক্ষেপ করতে পারি!

কাফিররা যখন কোনক্রমেই মানল না তখন হযরত শোআ'ইব (আঃ) সেখান হতে চলে গেলেন। যাওয়ার সময় তিনি তাদেরকে বললেনঃ "হে আমার কওমের লোকেরা! আমি তোমাদের কাছে আল্লাহ তা'আলার পয়গাম পৌঁছিয়ে দিয়েছি। আমি আমার দায়িত্ব পূর্ণরূপে পালন করেছি। আমি সদা তোমাদের মঙ্গল কামনা করেছি। এতদসত্ত্বেও তোমরা আমার দ্বারা উপকার লাভ করলে না। সুতরাং তোমাদের মন্দ পরিণতি দেখে দুঃখ করতঃ আমি নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেবো কেন? তোমাদের জন্যে অপেক্ষা করে আর লাভ কি!"

٩٤- وَمَآ اَرْسَلْنَا فِىْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّبِىٍّ اِلَّآ اَخَذْنَآ اَهْلَهَا بِالْبَاْسَآءِ وَ الضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُوْنَ ۝

৯৪। আমি কোন জনপদে নবী-রাসূল পাঠালে, ওর অধিবাসীদেরকে দুঃখ-দারিদ্র ও রোগ-ব্যধিতে আক্রান্ত করে থাকি, উদ্দেশ্য হলো –তারা যেন নম্র ও বিনয়ী হয়।

৯৫। অতঃপর আমি তাদের দুরবস্থাকে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দ্বারা পরিবর্তন করে দিয়েছি, অবশেষে তারা খুব প্রাচুর্যের অধিকারী হয়, আর তারা (অকৃতজ্ঞ স্বরে) বলে– আমাদের পূর্ব-পুরুষরাও এইভাবে সুখ-দুঃখ ভোগ করেছে (এটাই প্রাকৃতিক নিয়ম), অতঃপর অকস্মাৎ আমি তাদেরকে পাকড়াও করলাম কিন্তু তারা কিছুই বুঝতে পারলো না।

৯৫- ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتّٰى عَفَوْا وَّ قَالُوْا قَدْ مَسَّ اٰبَآءَنَا الضَّرَّآءُ وَالسَّرَّآءُ فَاَخَذْنٰهُمْ بَغْتَةً وَّ هُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ○

এখানে আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, পূর্ববর্তী যেসব উম্মতের কাছে নবীদেরকে প্রেরণ করা হয়েছিল তাদেরকে বিপদ-আপদ দিয়ে এবং সুখ-শান্তির মাধ্যমে পরীক্ষা করা হয়েছিল। بَاْسَآءُ শব্দের অর্থ হচ্ছে শারীরিক কষ্ট এবং দৈহিক রোগ অসুস্থতা। আর ضَرَّآءُ হচ্ছে ঐ কষ্ট যা দারিদ্রের কারণে হয়ে থাকে। মহান আল্লাহর উদ্দেশ্য এই যে, তারা হয়তো তার দিকে প্রত্যাবর্তন করবে, তাঁকে ভয় করবে এবং সেই বিপদ ও কষ্ট দূর হওয়ার জন্যে তাঁর কাছে আবেদন ও প্রার্থনা করবে। মূল বক্তব্য হচ্ছে এই যে, আল্লাহ তাদেরকে কষ্ট ও বিপদ-আপদের মধ্যে নিপতিত করেছিলেন, যেন তারা তাঁর সামনে বিনয় প্রকাশ করে। কিন্তু তারা তা করেনি। আল্লাহ পাক বলেনঃ এর পরেও আমি তাদের আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল করে দিলাম। এর দ্বারাও তাদেরকে পরীক্ষা করাই ছিল আমার উদ্দেশ্য। এজন্যেই তিনি বলেনঃ "অতঃপর আমি তাদের দুরবস্থাকে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দ্বারা পরিবর্তন করে দিলাম। রোগের স্থলে সুস্থতা দান করলাম। দারিদ্রের স্থলে ধন-সম্পদ প্রদান করলাম। এর দ্বারা আমার উদ্দেশ্য ছিল এই যে, হয়তো তারা আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। কিন্তু তারা তা করলো না।" حَتّٰى عَفَوْا অর্থাৎ তারা ধনে-মালে ও সন্তান-সন্ততিতে প্রাচুর্যের অধিকারী হয়ে গেল। ইরশাদ হচ্ছে–আমি তাদেরকে আনন্দ ও নিরানন্দ উভয় দ্বারাই পরীক্ষা করেছি, যেন তারা আমার দিকে ঝুঁকে পড়ে। কিন্তু না তারা আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলো এবং না ধৈর্য ও নম্রতা অবলম্বন করলো। বরং বলতে শুরু করলো–

আমরা কষ্ট ও বিপদে-আপদে পতিত হয়ে গেলাম। এর পরে আমি তাদেরকে শান্তি ও আনন্দ দান করলাম। এখন তারা বলে উঠলো– "এই সুখ-শান্তি ও বিপদ-আপদ তো আমাদের পূর্বপুরুষদের যুগ থেকে চলে আসছে এবং সদা-সর্বদা এরূপ চক্রই হতে থাকবে। যুগ কখনও এরূপ হয় এবং কখনও ঐরূপ হয়। অনুরূপভাবে আমরাও কখনো শান্তি লাভ করবো এবং কখনো বিপদ-আপদে পতিত হবো। এটা কোন নতুন কথা নয়।" তাদের উচিত ছিল এই ইংগিতেই আল্লাহর শাস্তি সম্পর্কে চিন্তা করা এবং তাঁর পরীক্ষার দিকে নিজেদের চিন্তার মোড় ফিরিয়ে নেয়া। কিন্তু মুমিনদের অবস্থা ছিল তাদের বিপরীত। তারা সুখ-শান্তির সময় আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানায় এবং বিপদ-আপদে ধৈর্যধারণ করে। যেমন সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "মুমিনের জন্যে বিস্মিত হতে হয় যে, আল্লাহ তার জন্যে যা কিছুরই ফায়সালা করেন তা তার জন্যে কল্যাণকরই হয়ে থাকে। যদি তার প্রতি বিপদ আপতিত হয় এবং সে ধৈর্যধারণ করে তবে সেটা তার জন্যে মঙ্গলজনক হয়। আর যদি তার উপর সুখ-শান্তি নেমে আসে এবং তখন সে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে তবে সেটাও তার জন্যে কল্যাণকর।" সুতরাং মুমিন তো ঐ ব্যক্তি যে সুখ ও দুঃখ উভয় অবস্থাতেই মনে করে যে, তাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষা করা হচ্ছে। এ জন্যেই হাদীসে এসেছে–"বিপদ-আপদ মুমিনকে সদা পাপ থেকে পবিত্র করতে থাকে।[১] আর মুনাফিকের দৃষ্টান্ত হচ্ছে গাধার ন্যায়। তার উপর কি চাপানো হয়েছে তা সে জানে না এবং এটাও জানে না যে, কি উদ্দেশ্যে তাকে কাজে লাগানো হয়েছে, আর কেনই বা তাকে বাঁধা হয়েছে এবং কেনই বা খুলে দেয়া হয়েছে।" এজন্যেই এর পরে আল্লাহ পাক বলেনঃ আকস্মিকভাবে আমি তাকে শাস্তিতে নিপতিত করেছি, যে শাস্তি সম্পর্কে তার কোন ধারণাও ছিল না। যেমন হাদীসে রয়েছে–"আকস্মিক মৃত্যু মুমিনের জন্যে রহমত এবং কাফিরের জন্যে দুঃখ ও আফসোসের কারণ।"

৯৬। জনপদের অধিবাসীগণ যদি ঈমান আনতো এবং তাকওয়া অবলম্বন করতো, তবে আমি তাদের জন্যে আকাশ ও

٩٦- وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرٰۤى اٰمَنُوْا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكٰتٍ

১. ইমাম তিরমীযীর (রঃ) বর্ণনায় রয়েছে–حَتّٰى يَلْقَى اللّٰهُ تَعَالٰى وَ مَا عَلَيْهِ خَطِيَّةٌ অর্থাৎ "শেষ পর্যন্ত সে আল্লাহর সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করে যে, তার কোনই পাপ থাকে না।"

مِّنَ السَّمَآءِ وَ الْاَرْضِ وَ لٰكِنْ كَذَّبُوْا فَاَخَذْنٰهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ○

পৃথিবীর বরকতের দ্বার খুলে দিতাম, কিন্তু তারা নবী-রাসূলদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, ফলে তাদের কৃতকর্মের জন্যে আমি তাদেরকে পাকড়াও করলাম।

৯৭- اَفَاَمِنَ اَهْلُ الْقُرٰٓى اَنْ يَّاْتِيَهُمْ بَاْسُنَا بَيَاتًا وَّ هُمْ نَآئِمُوْنَ ○

৯৭। রাত্রিকালে যখন তারা ঘুমন্ত থাকে তখন আমার শাস্তি এসে তাদেরকে গ্রাস করে ফেলবে এটা হতে কি জনপদের অধিবাসীগণ নির্ভয় হয়ে পড়েছে?

৯৮- اَوَ اَمِنَ اَهْلُ الْقُرٰٓى اَنْ يَّاْتِيَهُمْ بَاْسُنَا ضُحًى وَّ هُمْ يَلْعَبُوْنَ ○

৯৮। অথবা জনপদের লোকেরা কি এই ভয় রাখে না যে, আমার শাস্তি তাদের উপর তখন আপতিত হবে যখন তারা পূর্বাহ্নে আমোদ-প্রমোদে রত থাকবে?

৯৯- اَفَاَمِنُوْا مَكْرَ اللّٰهِ فَلَا يَاْمَنُ مَكْرَ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْخٰسِرُوْنَ ○ ع

৯৯। তারা কি আল্লাহর পাকড়াও থেকে নিরাপদ হয়ে গেছে? সর্বনাশগ্রস্ত সম্প্রদায় ছাড়া আল্লাহর পাকড়াও থেকে কেউই নিঃশঙ্ক হতে পারে না।

আল্লাহ তা'আলা এখানে জনপদবাসীদের ঈমানের স্বল্পতার বর্ণনা দিচ্ছেন যাদের কাছে রাসূলদেরকে প্রেরণ করা হয়েছিল। যেমন আল্লাহ তা'আলার উক্তিঃ "জনপদবাসী কেন ঈমান আনলো না যে, তাদের ঈমান দ্বারা তারা উপকৃত হতো? ইউনুসের কওম এর ব্যতিক্রম ছিল।" অর্থাৎ ইউনুস (আঃ)-এর কওম ছাড়া অন্য কোন জনপদের সমস্ত লোক ঈমান আনেনি। হযরত ইউনুস (আঃ)-এর কওমের সমস্ত লোকই ঈমান এনেছিল এবং ওটা ছিল তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করার পর। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "তারা ঈমান আনলো, তখন

আমি তাদেরকে সাময়িকভাবে পার্থিব সুখ শান্তি দান করলাম।" যেমন তিনি বলেনঃ "আমি তাকে এক লক্ষ বা তারও বেশী লোকের কাছে নবীরূপে প্রেরণ করেছিলাম।"

ইরশাদ হচ্ছে—যদি এই জনপদবাসী ঈমান আনতো এবং তাকওয়া অবলম্বন করতো তবে আমি তাদের উপর আকাশ ও যমীনের বরকত নাযিল করতাম। অর্থাৎ আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণ করতাম এবং যমীন হতে ফসল উৎপাদন করতাম। কিন্তু তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। এর শাস্তি স্বরূপ আমি তাদেরকে আযাবের স্বাদ গ্রহণ করিয়েছি। অর্থাৎ তারা রাসূলদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল, তখন আমি তাদের দুষ্কার্যের কারণে তাদেরকে শাস্তির যাঁতাকলে পিষ্ট করেছি। এর পর আল্লাহ পাক স্বীয় আদেশের বিরোধিতা এবং পাপকার্যে সাহসিকতা প্রদর্শন করা হতে ভীতি প্রদর্শন করছেন। তিনি বলেনঃ "এই জনপদবাসী কাফিররা কি আমার শাস্তি হতে নিরাপত্তা লাভ করেছে? তারা শুয়েই থাকবে এমতাবস্থায় রাত্রিকালেই আমি তাদের উপর আমার শাস্তি আপতিত করবো। অথবা তারা কি এ থেকে নির্ভয় হয়ে গেছে যে, দিবাভাগের কোন এক সময় শাস্তি তাদেরকে পরিবেষ্টন করবে এবং সেই সময় তারা নিজেদের কাজ কারবারে লিপ্ত থাকবে ও সম্পূর্ণ উদাসীন থাকবে? তারা কি এতটুকুও ভয় করে না যে, আমার প্রতিশোধ তাদেরকে যে কোন সময় পাকড়াও করবে এবং সেই সময় তারা খেল তামাশায় মগ্ন থাকবে? মনে রাখবে যে, হতভাগ্য সম্প্রদায় ছাড়া কেউই আল্লাহর শাস্তি থেকে নিশ্চিন্ত থাকতে পারে না।" এ জন্যেই হাসান বসরী (রঃ) বলেছেনঃ "মুমিন বান্দা আল্লাহর আনুগত্য করে এবং ভাল কাজ করতে থাকে, এর পরেও সে সদা আল্লাহর ভয়ে ভীত থাকে। পক্ষান্তরে পাপী ব্যক্তি পাপকার্যে লিপ্ত থাকে আবার এর পরেও সে নিজেকে মাহফুয ও নিরাপদ মনে করে।"

১০০। কোন এলাকার অধিবাসী ধ্বংস হওয়ার পর সেই এলাকার যারা উত্তরাধিকারী হয়, তাদের কাছে কি এটা প্রতীয়মান হয়নি যে, আমি ইচ্ছা করলে তাদের পাপের কারণে তাদেরকে শাস্তি দিতে

١٠٠- اَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْاَرْضَ مِنْۢ بَعْدِ اَهْلِهَآ اَنْ لَّوْ نَشَآءُ اَصَبْنٰهُمْ بِذُنُوْبِهِمْ

পারি? আর তাদের অন্তঃকরণের উপর মোহর করে দিতে পারি এবং যাতে তারা কিছুই শুনতে পাবে না?	وَنَطْبَعُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ ○

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে–তাদের কাছে কি এটা প্রতীয়মান হয় না যে, আমি (আল্লাহ) ইচ্ছা করলে তাদের পাপের কারণে তাদেরকে শাস্তি দিতে পারি? ইবনে জারীর (রঃ) এর তাফসীরে বলেনঃ কোন এলাকার অধিবাসীকে ধ্বংস করে দেয়ার পর ভূ-পৃষ্ঠে যাদেরকে তাদের স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে, যারা তাদেরই স্বভাব গ্রহণ করেছে, তাদেরই মত আমল করেছে এবং তাদেরই মত আল্লাহর অবাধ্য হয়েছে, তাদের কাছে কি এটা প্রতীয়মান হয় না যে, আমি ইচ্ছা করলে তাদেরকেও তাদের পাপের কারণে শাস্তি প্রদান করতে পারি? তাদের এই অবাধ্যতার শাস্তি স্বরূপ আমি তাদের অন্তরে মোহর লাগিয়ে দেবো। সুতরাং তারা কোন ভাল কথা শুনতেও পাবে না এবং বুঝতেও সক্ষম হবে না। অনুরূপভাবে অন্য জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "এ ঘটনা থেকে কি তারা শিক্ষা গ্রহণ করে না যে, তাদের পূর্বে আমি এমন বহু কওমকে ধ্বংস করে দিয়েছি যারা তাদের ঘরবাড়ীতে বসবাস ও চলাফেরা করত? এটা কি বিবেকবানদের জন্যে নিদর্শন নয়?" আর এক জায়গায় আল্লাহ পাক বলেনঃ "ইতিপূর্বে কি তোমরা দৃঢ় শপথ করে বলেছিলে না যে, তোমরা ধ্বংস হবেই না? অথচ তারা ধ্বংস হয়েই গেছে। আজ তোমরা ঐসব অত্যাচারীর জায়গা গ্রহণ করছো!" তিনি আরো বলেনঃ "এদের পূর্বে কতই না কওম ধ্বংস হয়ে গেছে, আজ তাদের কোন নাম-নিশানাও নেই, না তাদের কোন শব্দ আজ শোনা যাচ্ছে!" অন্য এক জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "এরা কি দেখছে না যে, এদের পূর্বে বহু কওম এখানে রাজত্ব করেছে, যে রাজত্ব করার সৌভাগ্য তোমাদের হয়নি, অতঃপর আকাশ থেকে বৃষ্টির শাস্তি নেমে আসলো এবং ভূমির নিম্নদেশ থেকে প্লাবন এসে গেল এবং এর মাধ্যমে তাদের সকলকেই ধ্বংস করে দেয়া হলো। এর পর অন্য কওমকে আমি তাদের জায়গায় বসালাম।" আদ সম্প্রদায়ের ধ্বংসের কথা উল্লেখ করে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "এখন শুধুমাত্র তাদের ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাওয়া যায়। পাপী ও অপরাধীদের পরিণাম এরূপই হয়ে থাকে। আজ আমি তোমাদেরকে যেখানে বসিয়েছি, একদিন তাদেরকে সেখানে বসিয়েছিলাম। তাদেরকে আমি শ্রবণকারী কান, দর্শনকারী চক্ষু এবং

অনুধাবনকারী অন্তর দিয়েছিলাম। কিন্তু তাদের কান, তাদের চক্ষু এবং তাদের অন্তঃকরণ তাদের কোনই উপকার করেনি। কেননা, তারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে বসে এবং যে উপহাস তারা করে তার শাস্তি তারা পেয়ে যায়। তোমাদের সরযমীনের চতুষ্পার্শ্বের কতইনা বসতি ধ্বংস হয়ে গেছে এবং কতইনা নিদর্শনের হেরফের হয়েছে! তোমরা চিন্তা করে দেখো, হয়তো কিছু শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে।" আল্লাহ পাক আরো বলেনঃ "এদের পূর্ববর্তী লোকেরা রাসূলদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল, সুতরাং তাদেরকে কেমন পরিণতি দেখতে হয়েছিল! তোমরা তো তাদের দশ ভাগের এক ভাগ শক্তিরও অধিকারী নও।" অন্য জায়গায় তিনি বলেনঃ "কতইনা লোকালয়কে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি, ওগুলোর অধিবাসীরা ছিল অত্যাচারী, তাদের ঘরের ছাদগুলো পড়ে গিয়েছিলো, কূপগুলো অকেজো হয়ে পড়েছিল, বড় বড় অট্টালিকাগুলো বিরান হয়ে গিয়েছিল।" আরো বলেনঃ "তারা ভূ-পৃষ্ঠে ঘুরেফিরে দেখে না কেন? তাহলে তারা অনুধাবনকারী অন্তর এবং শ্রবণকারী কান লাভ করতো, কেননা, তাদের চক্ষুগুলো অন্ধ নয়। বরং তাদের সেই অন্তর অন্ধ যা বক্ষের মধ্যে রয়েছে।" আর এক জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "রাসূলদের সাথে উপহাস করা হয়েছিল, তখন তাদের সেই উপহাসের শাস্তি তাদের প্রতি নাযিল হয়েছিল।" মোটকথা, এই ধরনের বহু আয়াত রয়েছে যেগুলো আল্লাহর শত্রুদের প্রতি প্রতিশোধ গ্রহণ এবং তাঁর বন্ধুদের প্রতি অনুগ্রহ করার উপর আলোকপাত করে।

١٠١- تِلْكَ الْقُرٰى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْۢبَآئِهَاۚ وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِۚ فَمَا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْا بِمَا كَذَّبُوْا مِنْ قَبْلُۚ كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِ الْكٰفِرِيْنَ ○

১০১। ঐ জনপদগুলোর কিছু বৃত্তান্ত আমি তোমার নিকট বর্ণনা করছি, তাদের কাছে রাসূলগণ সুস্পষ্ট দলীল প্রমাণসহ এসেছিল, কিন্তু পূর্বে তারা যা প্রত্যাখ্যান করেছিল তার প্রতি তারা ঈমান আনবার ছিল না, এমনিভাবেই আল্লাহ অবিশ্বাসীদের অন্তঃকরণের উপর মোহর মেরে দিয়েছেন।

১০২। আমি তাদের অধিকাংশকে অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি রক্ষাকারীরূপে পাইনি, তবে তাদের অধিকাংশকে পাপাচারীরূপে পেয়েছি।

١٠٢- وَمَا وَجَدْنَا لِاَكْثَرِهِمْ مِّنْ عَهْدٍ وَّاِنْ وَّجَدْنَآ اَكْثَرَهُمْ لَفٰسِقِيْنَ ○

নূহ্ (আঃ), হূদ (আঃ), সালিহ্ (আঃ), লূত (আঃ) ও শোআ'ইব (আঃ)-এর কওমের ধ্বংস সাধন, মুমিনদেরকে রক্ষাকরণ, রাসূলদের মাধ্যমে মু'জিযা ও দলীল প্রমাণাদি পেশ করতঃ হুজ্জত পূর্ণকরণ ইত্যাদি বিষয়ের বর্ণনা দেয়ার পর এখানে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "হে মুহাম্মাদ (সঃ)! ঐ বস্তিগুলোর অবস্থার কথা আমি তোমাকে শুনিয়ে দিচ্ছি। তাদের কাছে নবী রাসূলগণ সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী নিয়ে আগমন করেছিল। আমি তো রাসূল প্রেরণের মাধ্যমে হুজ্জত পূর্ণ করা ছাড়া কখনও কাউকে শাস্তি প্রদান করি না। এটা হচ্ছে ঐ বস্তিগুলোর ঘটনা যেগুলোর মধ্যে কতকগুলো এখনও বিদ্যমান রয়েছে এবং কতকগুলো ধ্বংস হয়ে গেছে। আমি এটা করে তাদের উপর অত্যাচার করিনি, বরং তারা নিজেরাই নিজেদের উপর অত্যাচার করেছিল। এজন্যে তারা নিজেরাই দায়ী।

فَمَا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْا بِمَا كَذَّبُوْا مِنْ قَبْلُ অর্থাৎ পূর্বে তারা যা প্রত্যাখ্যান করেছিল তার প্রতি তারা ঈমান আনবার ছিল না। بِمَا كَذَّبُوْا -এর ب অক্ষরটি হচ্ছে কারণ প্রকাশক। অর্থাৎ অহীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার কারণে তারা ঈমান আনয়ন করার হকদারই থাকলো না। যেমন অন্যত্র তিনি বলেনঃ "তোমরা তো জানই যে, মু'জিযা পেশ করলেও এরা ঈমান আনবে না।" এ জন্যেই এখানে তিনি বলেনঃ 'এভাবেই আল্লাহ অবিশ্বাসীদের অন্তঃকরণের উপর মোহর লাগিয়ে দেন।'

আমি তাদের অধিকাংশকে অর্থাৎ পূর্ববর্তী উম্মতের অধিকাংশকে অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি রক্ষাকারীরূপে পাইনি, বরং অধিকাংশকে পাপাচারীরূপে পেয়েছি। তারা ছিল আনুগত্য স্বীকার ও হুকুম মেনে চলার বহির্ভূত। এটা ছিল ঐ অঙ্গীকার যা রোযে আযলে আল্লাহ তা'আলা তাদের নিকট থেকে গ্রহণ করেছিলেন। ওরই উপর তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে এবং ঐ কথাটিই তাদের প্রকৃতি ও স্বভাবের মধ্যেও রাখা হয়েছে। সেই অঙ্গীকার ছিল এই–'আল্লাহই হচ্ছেন তাদের প্রতিপালক ও মালিক। তিনি ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই।' এটা তারা স্বীকার

করেও নিয়েছিল এবং সাক্ষ্য প্রদানও করেছিল। কিন্তু পরে তারা এর বিরুদ্ধাচরণ করতঃ ঐ অঙ্গীকারকে পৃষ্ঠ-পিছনে নিক্ষেপ করে এবং আল্লাহর সাথে অন্যদেরকেও শরীক করতে শুরু করে, যার না আছে কোন দলীল, না আছে কোন হুজ্জত। এটা জ্ঞান ও শরীয়ত উভয়েরই পরিপন্থী। নিষ্কলুষ প্রকৃতি তো এই প্রতিমা পূজাকে সমর্থন করে না। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সমস্ত নবী ও রাসূল এই প্রতিমা পূজা থেকে মানুষকে বিরত রেখেছেন। যেমন সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "আমি আমার বান্দাদেরকে মূর্তিপূজা থেকে পৃথক করে সৃষ্টি করেছিলাম। অতঃপর শয়তান এসে তাদেরকে সত্য দ্বীন থেকে সরিয়ে দেয় এবং আমি যা কিছু হালাল করেছিলাম তা তারা হারাম করে নেয়।" সহীহ বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "প্রত্যেক সন্তান স্বীয় ইসলামী প্রকৃতির উপর সৃষ্ট হয়। কিন্তু তার (ইয়াহূদী বা খ্রীষ্টান) পিতামাতাই তাকে ইয়াহূদী বা খ্রীষ্টান অথবা মাজুসী বানিয়ে দেয়।" আল্লাহ তা'আলা স্বীয় সম্মানিত গ্রন্থে বলেনঃ "আমি তোমাদের পূর্বে যতজন নবী পাঠিয়েছি তারা সবাই لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ -এর তলকীন করতে থেকেছে।" ইরশাদ হচ্ছে- হে মুহাম্মাদ (সঃ!) তোমার পূর্বে আমি যে রাসূলদেরকে পাঠিয়েছিলাম তাদেরকে আমি জিজ্ঞেস করবো- আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকেও কি উপাসনার যোগ্য বলা হয়েছিল? আর এক জায়গায় মহান আল্লাহ বলেনঃ "প্রত্যেক কওমের কাছে রাসূল পাঠিয়ে আমি বলেছিলাম- তোমরা শুধুমাত্র আল্লাহরই ইবাদত করবে এবং তাগুত ও শয়তান থেকে দূরে থাকবে।"

এই ধরনের বহু আয়াত রয়েছে। فَمَا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْا بِمَا كَذَّبُوْا مِنْ قَبْلُ -এই আয়াত সম্পর্কে হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) বলেন যে, অঙ্গীকার গ্রহণের দিন বান্দাগণ আল্লাহর একত্ববাদকে যে স্বীকার করে নিয়েছিল তা আল্লাহর গোচরে রয়েছে। এজন্যে আল্লাহর ইলমের ভিত্তিতেই তারা ঈমান আনছে না এবং এটাই হতে রয়েছে যে, দলীল প্রমাণাদি সামনে থাকা সত্ত্বেও তারা ঈমান আনছে না, যদিও তারা অঙ্গীকার গ্রহণের দিন ঈমান কবূল করেছিল। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা জানতেন যে, ওটা তাদের আন্তরিকতার সাথে ছিল না। যেমন আল্লাহ পাক বলেনঃ "যদি তাদেরকে দ্বিতীয়বার দুনিয়ায় পাঠিয়ে দেয়া হয় তবে পুনরায় তারা মূর্তিপূজা, শিরক ও পাপকার্য করতে থাকবে যা থেকে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল।"

১০৩। অতঃপর আমি মূসা (আঃ)-কে তাদের পর আমার আয়াত ও নিদর্শনসহ ফিরাউন ও তার পরিষদবর্গের নিকট পাঠালাম কিন্তু তারা যুলুম করলো (অর্থাৎ আমার নিদর্শন অস্বীকার করলো), সুতরাং এই বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কি হয়েছিল তা তুমি লক্ষ্য কর।

١٠٣- ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْۢ بَعْدِهِمْ مُّوْسٰى بِاٰيٰتِنَآ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَا۟ئِهٖ فَظَلَمُوْا بِهَا ۚ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ ○

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ পুর্ববর্তী রাসূল নূহ (আঃ), হূদ (আঃ), সালিহ (আঃ), লূত (আঃ) এবং শো'আইব (আঃ)-এর পরে আমি মূসা (আঃ)-কে আমার সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলীসহ ফিরাউনের নিকট পাঠিয়েছিলাম। ফিরাউন ছিল মিসরের বাদশাহ। সে এবং তার লোকজন অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করে। যেমন আল্লাহ পাক বলেনঃ "তারা ঔদ্ধত্য ও অবাধ্যতার কারণে অস্বীকার করে, অথচ তাদের অন্তঃকরণ বিশ্বাস করে।" অর্থাৎ হে মুহাম্মাদ (সঃ)! তুমি লক্ষ্য কর যে, যারা আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে সরিয়ে দিয়েছে এবং রাসূলদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, আমি তাদেরকে কেমন শাস্তিই না দিয়েছি! মূসা (আঃ)-এর চোখের সামনে আমি তাদেরকে ডুবিয়ে দিয়েছি। দেখ, সেই বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণতি কি হয়েছিল! ফিরাউন ও তার লোকজনকে শাস্তি প্রদান এবং আল্লাহর বন্ধু মূসা (আঃ) ও তাঁর সঙ্গীয় মুমিনদেরকে সান্ত্বনা দানের বর্ণনা কি সুন্দরভাবে দেয়া হয়েছে!

১০৪। মূসা (আঃ) বললো– হে ফিরাউন! আমি বিশ্বপ্রতিপালকের একজন রাসূল।

١٠٤- وَقَالَ مُوْسٰى يٰفِرْعَوْنُ اِنِّيْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○

১০৫। আমার পদমর্যাদা ও শান এই যে, আমি আল্লাহ সম্বন্ধে সত্য কথা ছাড়া আর কিছু বলবো না (অর্থাৎ আল্লাহ

١٠٥- حَقِيْقٌ عَلٰۤى اَنْ لَّاۤ اَقُوْلَ عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقَّ ؕ قَدْ جِئْتُكُمْ

بِبَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ○

সম্পর্কে সত্য কথা বলতে আমি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ) আমি তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট দলীল ও অবিসংবাদিত প্রমাণ নিয়ে এসেছি, সুতরাং বানী ইসরাঈলকে আমার সাথে পাঠিয়ে দাও।

١٠٦- قَالَ اِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِاٰيَةٍ فَأْتِ بِهَآ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ○

১০৬। তখন ফিরাউন বললো– তুমি যদি বাস্তবিকই (আল্লাহর পক্ষ হতে) স্পষ্ট দলীল ও অবিসংবাদিত কোন নিদর্শন এনে থাক তবে তুমি সত্যবাদী হলে তা উপস্থাপিত কর।

এখানে আল্লাহ তা'আলা মূসা (আঃ) ও ফিরাউনের মধ্যকার মুনাযারা বা তর্ক-বিতর্কের সংবাদ দিচ্ছেন। ফিরাউনের দরবারে ও তার সম্প্রদায়ের কিবতীদের সামনে স্পষ্ট নিদর্শনাবলী প্রকাশ করা হচ্ছে এবং দলীল ও হুজ্জত পেশ করা হচ্ছে। মূসা (আঃ) ফিরাউনকে সম্বোধন করে বললেনঃ "হে ফিরাউন! আমি সেই আল্লাহর পক্ষ থেকে রাসূলরূপে প্রেরিত হয়েছি যিনি সারা জাহানের সৃষ্টিকর্তা এবং সব কিছুরই মালিক। আমার অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে সত্য কথা পেশ করা।" কেউ কেউ حَقِيْقٌ عَلٰٓى اَنْ -এর অর্থ حَقِيْقٌ بِاَنْ নিয়েছেন এবং বলেছেন যে, ب ও عَلٰى অক্ষর দু'টি একে অপরের পরিবর্তে এসে থাকে। যেমন رَمَيْتُ بِالْقَوْسِ অথবা عَلَى الْقَوْسِ এবং جَاءَ عَلٰى حَالٍ حَسَنَةٍ বা بِحَالٍ حَسَنَةٍ ব্যবহৃত হয়। আবার কোন কোন মুফাসসির حَقِيْقٌ দ্বারা حَرِيْصٌ উদ্দেশ্য বা ভাব নিয়েছেন। অর্থাৎ 'আমি সত্য কথা বলারই লোভী।' কোন কোন মাদানী মুফাসসির বলেন যে, এ শব্দটি عَلٰى না হয়ে عَلَيَّ হবে। তখন অর্থ হবে– "আমার উপর ওয়াজিব ও হক যে, আমি সত্য কথা ছাড়া অন্য কিছুই বলবো না। আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে অকাট্য দলীল প্রমাণাদি নিয়ে তোমাদের নিকট আগমন করেছি। বানী ইসরাঈলকে আমার সাথে দিয়ে দাও। তাদেরকে বন্দী জীবন থেকে মুক্তি দিয়ে স্বাধীন জীবন দান কর। কেননা, তারা হচ্ছে ইসরাঈল (আঃ) অর্থাৎ ইয়াকূব ইবনে ইসহাক (আঃ)-এর বংশধর।" তখন ফিরাউন বললো– "আমি তোমার

রিসালাত ও নবুওয়াতের দাবী মানি না। যদি তুমি সত্য সত্যই নবী হও এবং কোন মু'জিযা এনে থাক তবে তা প্রদর্শন কর। তাহলে তোমার কথা ও দাবী সত্য বলে মেনে নেয়া যেতে পারে।"

১০৭। তখন মূসা (আঃ) তার লাঠি নিক্ষেপ করলো এবং সহসাই ওটা এক জীবিত অজগরে পরিণত হলো।

١٠٧- فَاَلْقٰى عَصَاهُ فَاِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِيْنٌ ۝

১০৮। আর সে তার হাত বের করলো, তৎক্ষণাৎই ওটা দর্শকদের দৃষ্টিতে শুভ্র ও উজ্জ্বল আলোকময় প্রতিভাত হলো।

١٠٨- وَّنَزَعَ يَدَهٗ فَاِذَا هِيَ بَيْضَآءُ لِلنّٰظِرِيْنَ ۝

হযরত মূসা (আঃ) স্বীয় লাঠিখানা সামনে নিক্ষেপ করলেন। তখনই ওটা আল্লাহর কুদরতে একটা বিরাট অজগর সাপে পরিণত হলো এবং ফিরাউনের দিকে বেগে ধাবিত হলো। ফিরাউন তখন সিংহাসন থেকে লাফিয়ে পড়লো এবং চীৎকার করে হযরত মূসা (আঃ)-কে বলে উঠলোঃ 'হে মূসা (আঃ)! ওকে টেনে নাও।' তিনি তখন ওকে টেনে ধরলেন। তৎক্ষণাৎ ওটা লাঠি হয়ে গেলো। সুদ্দী (রঃ) বলেন যে, যখন ঐ সাপটি হা করলো তখন ওর নীচের চোয়াল ছিল মাটিতে এবং উপরের চোয়াল ছিল দালানের দেয়ালের উপর। যখন ওটা ফিরাউনের দিকে ধাবিত হলো তখন সে কেঁপে উঠলো ও লাফিয়ে পড়ে পালাতে লাগলো এবং চীৎকার করে বলে উঠলো– "হে মূসা (আঃ)! ওকে ধরে নাও। আমি তোমার উপর ঈমান আনছি এবং বানী ইসরাঈলকে তোমার সাথে পাঠিয়ে দিচ্ছি।" হযরত মূসা (আঃ) তখন ওটাকে ধরে নিলেন। তেমনই ওটা পুনরায় লাঠি হয়ে গেল। মূসা (আঃ) যখন ফিরাউনের কাছে এসেছিলেন তখন সে বলেছিলঃ "হে মূসা (আঃ)! তুমি কে তা আমি বলবো কি?" হযরত মূসা (আঃ) বললেনঃ হ্যাঁ, বল। সে বললোঃ "তুমি তো ঐ ব্যক্তিই যে আমার কাছেই লালিত পালিত হয়ে বড় হয়েছো" হযরত মূসা (আঃ) তার উত্তর দিয়ে দিলে সে তাঁকে গ্রেফতার করার নির্দেশ দেয়। মূসা (আঃ) তখন তাঁর লাঠিখানা মাটিতে নিক্ষেপ করেন। তৎক্ষণাৎ ওটা বিরাট এক অজগরে পরিণত হয়ে চলতে শুরু করে এবং জনগণের উপর আক্রমণ করে বসে। জনগণের মধ্যে হট্টগোল শুরু হয়ে যায়। ঐ

হুড় হাঙ্গামার মধ্যে পঁচিশ হাজার লোক প্রাণ হারায়। ফিরাউন পালিয়ে গিয়ে স্বীয় প্রাসাদে প্রবেশ করে। এই বর্ণনাটি খুবই দুর্বল। আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক জ্ঞানের অধিকারী।

এখন ইরশাদ হচ্ছে–মূসা (আঃ)-এর দ্বিতীয় মু'জিযা ছিল এই যে, যখন তিনি জামার মধ্যে হাত ভরে তা বের করতেন তখন ওটা সীমাহীন আলোকময় হয়ে উঠতো এবং এমন চাকচিক্যময় ও উজ্জ্বল হতো যে, ওর দিকে চোখ ধরা যেতো না। ওর আলোর মধ্যে কোনই ত্রুটি ছিল না। যখন তিনি তাঁর সেই হাতকে আস্তিনের মধ্যে প্রবেশ করাতেন তখন ওটা পূর্বরূপ ধারণ করতো।

১০৯। এ দেখে ফিরাউন সম্প্রদায়ের প্রধানরা বললো– নিঃসন্দেহে এ ব্যক্তি বড় সুদক্ষ যাদুকর।

١٠٩- قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هٰذَا لَسٰحِرٌ عَلِيْمٌ ۙ

১১০। সে তোমাদেরকে তোমাদের জমি-জায়গা থেকে বে-দখল করতে চায়, এখন তোমাদের পরামর্শ কি?

١١٠- يُّرِيْدُ اَنْ يُّخْرِجَكُمْ مِّنْ اَرْضِكُمْ ۚ فَمَاذَا تَاْمُرُوْنَ

যখন ঐ লোকদের ভয় দূরীভূত হলো এবং স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসলো তখন ফিরাউন তার সভাষদবর্গকে একত্রিত করে বললোঃ মূসা তো একজন বড় সুদক্ষ যাদুকর। দরবারের লোকেরা সবাই তার কথা সমর্থন করলো এবং পরামর্শের জন্যে বসে পড়লো যে, এখন এই ব্যাপারে কি করা যায়? কিভাবে মূসা (আঃ)-এর আলো নিবিয়ে দেয়া যায়? কিরূপেই বা তাকে বশীভূত করা যায়? সে যে মিথ্যাবাদী এ কথা প্রমাণ করার তদবীর কি আছে? তারা আশঙ্কা করলো যে, জনগণ তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাঁর যাদুর দিকে ঝুঁকে পড়বে। ফলে তিনি জয়যুক্ত হবেন এবং তাদেরকে তাদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দিবেন। কিন্তু যে বিষয়ে তারা আশঙ্কা করছিল সেটাই হয়ে পড়লো। যেমন আল্লাহ পাক বলেনঃ "ফিরাউন ও হামান ঐ ভয়েরই সম্মুখীন হলো যে ভয় তারা করছিল।" যখন ঐ লোকগুলো হযরত মূসা (আঃ)-এর ব্যাপারে পরামর্শের কাজ শেষ করলো তখন সর্বসম্মতিক্রমে তাদের একটা সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো, যার বর্ণনা আল্লাহ তা'আলা নিম্নের আয়াতে দিচ্ছেন।

١١١- قَالُوْٓا اَرْجِهْ وَاَخَاهُ وَاَرْسِلْ فِى الْمَدَآئِنِ حٰشِرِيْنَ ○

১১১। তারা বললো– তাকে এবং তার ভাই (হারূন)-কে কিছুদিনের অবকাশ দাও, আর শহরে শহরে সংগ্রাহক পাঠিয়ে দাও।

١١٢- يَاْتُوْكَ بِكُلِّ سٰحِرٍ عَلِيْمٍ ○

১১২। যেন তারা তোমার (ফিরাউন) নিকট প্রত্যেক সুদক্ষ যাদুকরকে উপস্থিত করে।

সভাষদরা ফিরাউনকে পরামর্শ দিলো যে, মূসা (আঃ) এবং তাঁর ভাই হারূন (আঃ)-কে বন্দী রাখা হোক এবং রাজ্যের সমস্ত শহরে লোক পাঠিয়ে প্রসিদ্ধ যাদুকরদেরকে একত্রিত করা হোক। সেই যুগে যাদুর খুবই প্রচলন ছিল। সবারই এটা ধারণা হয়ে গেল যে, মূসা (আঃ)-এর এই মু'জিযা ছিল যাদু ও প্রতারণা। সুতরাং সে (ফিরাউন) এ বিষয়ে মূসা (আঃ)-এর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্যে সমস্ত যাদুকরকে একত্রিত করলো। যেমন আল্লাহ পাক ফিরাউনের কথা নকল করে বলেনঃ "হে মূসা (আঃ)! তুমি তোমার যাদুবলে আমাদেরকে আমাদের দেশ থেকে বের করে দেয়ার ইচ্ছা করছো। আমরাও তোমারই মত যাদু দ্বারা তোমার সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চাই। সুতরাং এখন যাদু পরীক্ষার একটা দিন ধার্য কর। তুমিও এর বাইরে যাবে না, আমরাও না।" তখন মূসা (আঃ) বললেনঃ "ঈদের দিন সকালে সমস্ত লোককে একত্রিত করা হোক।" তখন ফিরাউন প্রতারণামূলক তদবীর শুরু করে দিলো। শেষ পর্যন্ত সেই নির্ধারিত দিন এসে পড়লো। তাই আল্লাহ পাক নিম্নে ইরশাদ করছেন–

١١٣- وَجَآءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوْٓا اِنَّ لَنَا لَاَجْرًا اِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغٰلِبِيْنَ ○

১১৩। যাদুকররা ফিরাউনের কাছে এসে বললো– আমরা যদি বিজয় লাভ করতে পারি তবে আমাদের জন্যে পুরস্কার থাকবে তো?

١١٤- قَالَ نَعَمْ وَاِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ ○

১১৪। সে উত্তরে বললো– হ্যাঁ, তোমরাই হবে আমার দরবারের নিকটতম ব্যক্তি।

যে যাদুকররা হযরত মূসা (আঃ)-এর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্যে হাযির হয়েছিল তাদের মধ্যে এবং ফিরাউনের মধ্যে যে শর্ত হয়েছিল, আল্লাহ তা'আলা এখানে ওরই সংবাদ দিচ্ছেন। ফিরাউন যাদুকরদের সাথে ওয়াদা করেছিল যে, যদি তারা মূসা (আঃ)-এর উপর জয়যুক্ত হতে পারে তবে তাদেরকে বড় রকমের পুরস্কার দেয়া হবে এবং তারা যা চাবে তাই পাবে। তাছাড়া তাদেরকে দরবারের নিকটতম ব্যক্তি রূপে গণ্য করা হবে। যখনই সেই যাদুকরগণ ফিরাউনের কাছে ওয়াদা নিয়ে নিলো তখন তারা হযরত মূসা (আঃ)-কে বললোঃ

১১৫। অতঃপর যাদুকরগণ বললো- হে মূসা আঃ)! (প্রথমে) তুমিই কি তোমার লাঠি নিক্ষেপ করবে, না আমরাই (প্রথমে) নিক্ষেপ করবো?

١١٥- قَالُوْا يٰمُوْسٰٓى اِمَّآ اَنْ تُلْقِيَ وَاِمَّآ اَنْ نَّكُوْنَ نَحْنُ الْمُلْقِيْنَ ○

১১৬। সে (মূসা আঃ) উত্তরে বললো, প্রথমতঃ তোমরাই নিক্ষেপ কর, সুতরাং যখন তারা নিক্ষেপ করলো তখন লোকের চক্ষে যাদু করলো এবং তাদেরকে ভীত ও আতংকিত করলো, তারা খুব বড় রকমের যাদু দেখালো।

١١٦- قَالَ اَلْقُوْا فَلَمَّآ اَلْقَوْا سَحَرُوْٓا اَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوْهُمْ وَجَآءُوْ بِسِحْرٍ عَظِيْمٍ ○

এখানে হযরত মূসা (আঃ) ও যাদুকরদের মধ্যকার প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও সংগ্রাম সম্পর্কীয় কথোপকথনের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। যাদুকররা হযরত মূসা (আঃ)-কে সম্বোধন করে বললোঃ "হে মূসা (আঃ)! তুমিই কি প্রথমে তোমার বিস্ময়কর বস্তু নিক্ষেপ করবে, না আমরাই প্রথমে নিক্ষেপ করবো?" হযরত মূসা (আঃ) উত্তরে বললেনঃ "তোমরাই প্রথমে নিক্ষেপ কর।" এতে মূসা (আঃ)-এর নিপুণতা এই ছিল যে, প্রথমে জনগণ যাদুকরদের কলাকৌশল পর্যবেক্ষণ করবে এবং ঐ ব্যাপারে চিন্তা গবেষণা করবে। যখন তাদের এই প্রতারণামূলক কার্যকলাপের মহড়া শেষ হবে তখন তারা হযরত মূসা (আঃ)-এর সত্য ও বাস্তব কার্যকলাপের দিকে মনোযোগ দেবে যার জন্যে তারা অপেক্ষমান ছিল এবং সেটা তখন স্পষ্টরূপে তাদের সামনে প্রকাশিত হয়ে পড়বে। কেননা, সত্য ও বাস্তব জিনিস অনুসন্ধানের পর তা প্রাপ্ত হলে সেটা অন্তরের উপর বেশী দাগ কেটে থাকে। আর

হলোও তাই। এখন আল্লাহ বলেনঃ "যখন যাদুকরগণ তাদের দড়ি ও লাঠিগুলো মাটিতে নিক্ষেপ করলো তখন তারা যাদুর মাধ্যমে দর্শকদের নযরবন্দী করে দিলো। তারা তখন এমনভাবে দেখতে থাকলো যে, যা কিছু তারা দেখতে আছে তা যেন সবই বাস্তব। অথচ ঐ লাঠিগুলো ও রজ্জুগুলো প্রকৃতপক্ষে লাঠি ও রজ্জুই ছিল। দর্শকদের শুধুমাত্র এটা ধারণা ও খেয়াল ছিল যে, ঐগুলো সাপ।" তাই ইরশাদ হচ্ছে– "তাদের যাদুর কারণে মনে হচ্ছিল যে, ওগুলো পিল পিল করে চলছে। এ দেখে মূসা (আঃ) আতংকিত হয়। তখন আমি (আল্লাহ) বললাম, ভয় করো না, জয়যুক্ত তুমিই হবে। তোমার লাঠিখানা তুমিও মাটিতে ফেলে দাও। এটা সাপ হয়ে গিয়ে ঐ সাপগুলোকে গিলে ফেলবে। এ যাদু তো প্রতারণা মাত্র। এই যাদুকরগণ কৃতকার্য হতে পারে না।" মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক (রঃ) বলেন যে, পনেরো হাজার যাদুকর সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়েছিল। প্রত্যেক যাদুকরের সাথেই দড়ি ও লাঠি ছিল। মূসা (আঃ) তাঁর ভাই হারূন (আঃ)-কে নিয়ে লাঠি খাড়া করে বেরিয়ে পড়লেন এবং প্রতিযোগিতার মাঠে হাযির হলেন। ফিরাউন সভাষদবর্গসহ সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিল। যাদুকরগণ সর্বপ্রথম যাদু দ্বারা হযরত মূসা (আঃ)-এর নযরবন্দী করে। তারপর ফিরাউন ও জনগণের চোখে ভেলকি লাগিয়ে দেয়। তারপর প্রত্যেক যাদুকর স্বীয় রজ্জু ও লাঠি নিক্ষেপ করে। ওগুলো সাপ হয়ে যায়। সারা ময়দান সাপে ভরে যায়। একের উপর এক পিল পিল করে চলতে থাকে। সুদ্দী (রঃ) বলেন যে, যাদুকরদের সংখ্যা ছিল ত্রিশ হাজারেও বেশী। সবারই সাথে ছিল লাঠি ও রজ্জু। সর্ব সাধারণেরও নযরবন্দী হয়ে যায়। সুতরাং মাঠের এই দৃশ্য দেখে সবাই ভীত হয়ে পড়ে। ইবনে আবি বাররাহ (রাঃ) বলেন যে, ফিরাউন সত্তর হাজার যাদুকরকে আহ্বান করেছিল। সত্তর হাজার রজ্জু ও সত্তর হাজার লাঠি সর্পের আকার ধারণ করে পিল পিল করে চলছিল। এ জন্যেই আল্লাহ পাক বলেনঃ وَجَآءُوْ بِسِحْرٍ عَظِيْمٍ অর্থাৎ তারা খুব বড় রকমের যাদু দেখিয়েছিল।

১১৭। তখন আমি মূসা (আঃ)-এর নিকট এই প্রত্যাদেশ পাঠালাম– তুমি তোমার লাঠিখানা নিক্ষেপ কর, মূসা (আঃ) তা নিক্ষেপ করলে ওটা একটা বিরাট অজগর হয়ে সহসা ওদের অলীক সৃষ্টিগুলোকে গ্রাস করতে লাগলো।

١١٧- وَاَوْحَيْنَاۤ اِلٰى مُوْسٰۤى اَنْ اَلْقِ عَصَاكَ ۚ فَاِذَا هِىَ تَلْقَفُ مَا يَاْفِكُوْنَ ۚ

١١٨- فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

১১৮। পরিশেষে যা হক ছিল তা সত্য প্রমাণিত হলো, আর যা কিছু বানানো হয়েছিল তা বাতিল প্রতিপন্ন হলো।

١١٩- فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صٰغِرِيْنَ ۝

১১৯। আর ফিরাউন ও তার দলবলের লোকেরা মুকাবিলার ময়দানে পরাজিত হলো এবং লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়ে গেল।

١٢٠- وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سٰجِدِيْنَ ۝

১২০। যাদুকরগণ তখন সিজদায় পড়ে গেল।

١٢١- قَالُوْا اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

১২১। তারা পরিষ্কার ভাষায় বললো– আমরা বিশ্ব প্রতিপালকের প্রতি অকপটে ঈমান আনলাম।

١٢٢- رَبِّ مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ ۝

১২২। (জিজ্ঞেস করা হলো– কোন্ বিশ্ব প্রতিপালকের প্রতি? তারা উত্তরে বললো) মূসা ও হারূনের প্রতিপালকের প্রতি।

আল্লাহ্ তা'আলা এই ভীষণ পরীক্ষাক্ষেত্রে হযরত মূসা (আঃ)-এর নিকট অহী পাঠালেন যা হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য আনয়ন করলো। মূসা (আঃ) তাঁর লাঠিখানা নিক্ষেপ করলেন। ঐ দেখুন! ওটা ঐসব কাল্পনিক সাপকে গিলে ফেললো। ঐ খেয়ালী সাপগুলোর একটিও রক্ষা পেলো না। ঐ যাদুকরগণ জেনে ফেললো যে, এটা যাদু নয়, বরং কোন আসমানী সাহায্য ও আল্লাহ্ তা'আলারই কাজ। সুতরাং তারা সবাই আল্লাহর সামনে সিজদায় পড়ে গেল এবং বললোঃ "আমরা মূসা (আঃ) ও হারূন (আঃ)-এর আল্লাহর উপর ঈমান আনলাম।" হযরত মূসা (আঃ) যখন প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করলেন তখন তিনি লাঠির উপর হাত লাগানো মাত্রই ওটা পুনরায় লাঠি হয়ে গেল। যাদুকররা সিজদায় পড়ে গিয়ে বললোঃ "যদি তিনি নবী না হতেন, বরং যাদুকর হতেন তবে তিনি কখনই আমাদের উপর বিজয় লাভ করতে পারতেন না।" কাসিম ইবনে আবি বুররা (রঃ) বলেন যে, যাদুকরগণ সিজদা থেকে তাদের মাথা উঠাবার পূর্বেই জান্নাত ও জাহান্নাম দেখে নিয়েছিল।

১২৩। ফিরাউন বললো– অনুমতি দেয়ার আগেই তোমরা তার উপর ঈমান আনলে? তোমরা এ চক্রান্ত পাকিয়েছ শহরবাসীদের সেখান থেকে তাড়িয়ে দেয়ার জন্যে? বেশ তো চক্রান্ত! সত্বরই তোমরা এর পরিণাম জ্ঞাত হবে।

١٢٣- قَالَ فِرْعَوْنُ اٰمَنْتُمْ بِهٖ قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ اِنَّ هٰذَا لَمَكْرٌ مَّكَرْتُمُوْهُ فِى الْمَدِيْنَةِ لِتُخْرِجُوْا مِنْهَآ اَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ○

১২৪। অবশ্যই আমি তোমাদের হস্তপদ উল্টোভাবে কর্তন করবো, তারপর তোমাদের সবাইকে আমি শূলে চড়াবো।

١٢٤- لَاُقَطِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَاُصَلِّبَنَّكُمْ اَجْمَعِيْنَ ○

১২৫। তারা (যাদুকররা) বললো– নিশ্চয়ই আমরা আমাদের প্রতিপালক সদনে ফিরে যাবো।

١٢٥- قَالُوْٓا اِنَّآ اِلٰى رَبِّنَا مُنْقَلِبُوْنَ ○

বলা হয়েছে যে, তাদের নেতা ছিল চারজন। তারাই ছিল যাদুকরদের ইমাম, যেমন তাবারী ও দারে কুতনী বর্ণনা করেছেন, যাদুকরদের সংখ্যা ছিল সত্তর হাজার। আবার কেউ কেউ এর চেয়ে কমও বলেছেন।

১২৬। তুমি আমাদের মধ্যে এ ছাড়া কোনই দোষ পাচ্ছ না যে, আমাদের কাছে যখন আমাদের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী এসে গেল তখন আমরা ওগুলোর উপর ঈমান এনেছি, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ধৈর্য দান করুন এবং মুসলমানরূপে আমাদের মৃত্যু দান করুন!

١٢٦- وَمَا تَنْقِمُ مِنَّآ اِلَّآ اَنْ اٰمَنَّا بِاٰيٰتِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَتْنَا رَبَّنَآ اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّتَوَفَّنَا مُسْلِمِيْنَ ○

যাদুকরগণ যখন মুমিন হয়ে গেল এবং ফিরাউনের উদ্দেশ্য বিফল হলো তখন সে যাদুকরদেরকে হুমকি দিয়ে বললোঃ " আজ যে মূসা (আঃ) তোমাদের উপর জয়যুক্ত হয়েছে এটা প্রকৃতপক্ষে তোমাদের পারস্পরিক সমঝোতা ও চক্রান্তের কারণেই সম্ভব হয়েছে। তোমাদের উদ্দেশ্য ছিল যে, এইভাবে হুকুমতের উপর বিজয় লাভ করে দেশের মূল অধিবাসীকে তাদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দেয়া। নিঃসন্দেহে এই মূসা ছিল তোমাদের সকলেরই গুরু। সেই তোমাদেরকে যাদুবিদ্যা শিখিয়েছিল।" যার সামান্য বিবেকও রয়েছে সেও এটা বুঝে ফেলবে যে, হক্ক দ্বারা বাতিল প্রমাণিত হয়ে যায় দেখে ফিরাউন হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়েই এই অপবাদমূলক কথা বলছিল। হযরত মূসা (আঃ) তো মাদায়েন থেকে এসেই সরাসরি ফিরাউনের নিকট পৌঁছে তাকে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছিলেন এবং বাহ্যিক মু'জিযাগুলো প্রকাশ করতঃ নিজের রাসূল হওয়ার সত্যতা প্রমাণ করেছিলেন। এর পরে ফিরাউন স্বীয় সাম্রাজ্যের সমস্ত শহরে মনোনীত এলাকায় লোক প্রেরণ করে মিসরের বিভিন্ন যাদুকরদেরকে একত্রিত করেছিল, যাদেরকে সে এবং তার সম্প্রদায়ের লোকেরা নির্বাচন করেছিল, আর তাদের সাথে ভাল ভাল পুরস্কার ও মর্যাদা দানের অঙ্গীকার করেছিল। এ জন্যেই ঐ যাদুকরগণ সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়েছিল যে, কি করে মূসা (আঃ)-এর উপর বিজয় লাভ করতঃ ফেরাউনের নৈকট্য লাভ করা যায়। মূসা (আঃ) কোন এক যাদুকরের সাথেও পরিচিত ছিলেন না। না তিনি তাদের কাউকেও কখনও দেখেছিলেন। না তাদের কারো সাথে তাঁর কখনও সাক্ষাৎ ঘটেছিল। ফিরাউন নিজেও এটা জানতো। কিন্তু না জানি সর্বসাধারণ হযরত মূসা (আঃ)-এর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে, এটাকে রোধ করার জন্যেই সে এ কথা বলেছিল। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "ফিরাউনের কওম তার অনুগত ছিল এবং তার চিন্তাধারার সাথে একমত হয়েছিল। ঐ লোকগুলো সাংঘাতিক বিভ্রান্তির মধ্যে পতিত হয়েছিল যারা ফিরাউনের اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلٰى (৭৯ঃ ২৪) (আমিই তোমাদের বড় প্রভু) এই দাবী সমর্থন করেছিল।

সুদ্দী (রঃ) বলেন যে, যাদুকরের প্রধানের সাথে হযরত মূসা (আঃ)-এর সাক্ষাৎ হলে তিনি তাকে বলেনঃ "আমি যদি বিজয়ী হই এবং তোমরা পরাজিত হও তবে তোমরা আমার উপর ঈমান আনবে কি? আর এটা স্বীকার করবে কি যে, আমার পেশকৃত জিনিস হবে আল্লাহর মু'জিযা?" সেই যাদুকর প্রধান উত্তরে বললোঃ "আগামীকাল তো আমি এমন যাদু পেশ করবো যে, কোন যাদুই ওর

উপর জয়যুক্ত হতে পারে না। সুতরাং তুমি যদি জয়যুক্ত হও তবে আমি স্বীকার করে নেবো যে, তুমি আল্লাহর রাসূল।” ফিরাউন তাদের এই কথোপকথন শুনেছিল। এ জন্যেই সে পরে অপবাদ দিয়ে বলেছিলঃ “তোমরা এ জন্যেই একত্রিত হয়েছিলে যে, হুকুমতের উপর জয়লাভ করে তোমরা দেশের নেতৃস্থানীয় ও প্রধান প্রধান লোকদেরকে তাড়িয়ে দিয়ে নিজেরাই সিংহাসন দখল করবে। আমি তোমাদেরকে কি শাস্তি দেবো তোমরা শীঘ্রই জানতে পারবে। জেনে রেখো যে, আমি তোমাদের ডান হাত ও বাম পা কেটে নেবো অথবা এর বিপরীত। অতঃপর তোমাদের সকলকেই ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিয়ে দেবো। তোমাদের মৃতদেহগুলো গাছের ডালের সাথে বেঁধে লটকিয়ে দেয়া হবে।”

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, ফাঁসি এবং হাত পা কেটে নেয়ার শাস্তি-বিধান সর্ব প্রথম ফিরাউনই চালু করেছিল। যাদুকরগণ উত্তরে বলে– “আমরা তো এখন আল্লাহরই হয়ে গেছি এবং তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করছি। আজ তুমি আমাদেরকে যে শাস্তি প্রদানের হুমকি দিচ্ছ, আল্লাহর শাস্তি এর চেয়ে বহুগুণে কঠিন। আজ আমরা তোমার শাস্তির উপর ধৈর্য ধারণ করছি, যেন কাল কিয়ামতের মাঠে আল্লাহর শাস্তি হতে পরিত্রাণ পেতে পারি।” এ জন্যেই তারা বলে উঠলোঃ “হে আমাদের প্রভু! আমরা যেন দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারি এবং ফিরাউনের শাস্তির উপর ধৈর্যধারণ করতে পারি সে জন্যে আমাদেরকে ধৈর্য দান করুন। আর আপনার নবী হযরত মূসা (আঃ)-এর অনুসরণ করিয়ে আমাদেরকে মুসলমান অবস্থায় দুনিয়া হতে উঠিয়ে নিন।” অতএব, তারা ফিরাউনকে স্পষ্ট ভাষায় বলে দিলো– “তুমি যত পার আমাদের সর্বনাশ সাধন কর। এই অবস্থাতেই আমাদের পার্থিব জীবন শেষ হয়ে যাবে। আমরা তাঁরই উপর ঈমান আনছি যিনি আমাদের সত্য প্রভু। আমরা আশা করি যে, তিনি আমাদের পূর্ববর্তী সমস্ত পাপ মার্জনা করবেন এবং আমাদেরকে যাদু পেশ করতে বাধ্য হতে হয়েছে সেটাও তিনি ক্ষমা করে দিবেন। কেননা, যে ব্যক্তি কাফির অবস্থায় আল্লাহর নিকট হাযির হবে তার জন্যে জাহান্নাম অবধারিত। সে না জীবিতের মধ্যে গণ্য, না মৃতের মধ্যে গণ্য। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি মুমিন ও সৎকর্মশীল রূপে হাযির হবে সে পরকালে বড় বড় মর্যাদার অধিকারী হবে। যা হোক, এইসব যাদুকর ছিল সকাল বেলায় কাফির যাদুকর, আর সন্ধ্যা বেলায় হয়ে গেল সৎকর্মশীল মুমিন ও শহীদ।

١٢٧- وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ ○

১২৭। ফিরাউন সম্প্রদায়ের সরদারগণ তাকে বললো– তুমি কি মূসা (আঃ) ও তার সম্প্রদায়কে রাজ্যে অশান্তি ও বিপর্যয় সৃষ্টির জন্যে মুক্ত ছেড়ে দিবে এবং তোমাকে ও তোমার দেবতাগণকে বর্জন করে চলার সুযোগ দিবে? সে উত্তরে বললো– আমি তাদের সন্তানদের হত্যা করবো এবং তাদের নারীদেরকে জীবিত রাখবো, তাদের উপর আমাদের শক্তি ও ক্ষমতা প্রমাণ ও সুপ্রতিষ্ঠিত রয়েছে।

١٢٨- قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ○

১২৮। মূসা (আঃ) তার সম্প্রদায়কে বললো– তোমরা আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর এবং ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা অবলম্বন কর, এই পৃথিবীর সার্বভৌম মালিক আল্লাহ, তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা ওর উত্তরাধিকারী করে থাকেন, শুভ পরিণাম ও শেষ সাফল্য মুত্তাকী বান্দাদের জন্যে।

١٢٩- قَالُوا أُوذِينَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ

১২৯। তারা (মূসা আঃ-এর কওম) তাঁকে বললো–আপনি আমাদের নিকট (নবীরূপে) আগমনের পূর্বেও আমরা (ফিরাউন কর্তৃক) নির্যাতিত হয়েছি এবং আপনার আগমনের পরও নির্যাতিত

عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ۝ ١٥

হচ্ছি, তখন সে (মূসা আঃ) বললো—শীঘ্রই তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের শত্রুকে ধ্বংস করবেন এবং তোমাদেরকে রাজ্যে তাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন, অতঃপর তোমরা কিরূপ কাজ কর তা তিনি দেখবেন।

এখানে ফিরাউনও তার দলবলের পাম্পরিক পরামর্শের সংবাদ দেয়া হচ্ছে। ঐ লোকদের অন্তরে মূসা (আঃ)-এর প্রতি কত বেশী হিংসা ছিল তাদের এ পরামর্শের দ্বারা তা বুঝা যাচ্ছে। ফিরাউনকে তার পরিষদের লোকেরা বলছে—"আপনি কি মূসা (আঃ)-কে এমন মুক্ত অবস্থায় ছেড়ে দিবেন যে, সে পৃথিবীতে অশান্তি ও বিশৃংখলা সৃষ্টি করে বেড়াবে এবং দেশবাসীকে ফিৎনা ফাসাদের মধ্যে নিক্ষেপ করবে, আর তাদের মধ্যে আল্লাহর কথা প্রচার করবে? কি বিস্ময়কর ব্যাপার যে, এ লোকগুলো অন্যদেরকে মূসা (আঃ) ও মুমিনদের ফাসাদ থেকে সাবধান করছে, অথচ তারা নিজেরাই ফাসাদ ও বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী! তাদের নিজেদেরই খবর নেই! কেউ কেউ বলেন যে, وَيَذَرَكَ -এর وَاو অক্ষরটি এখানে 'এবং' -এর অর্থ প্রকাশক নয়, বরং حَال -এর অর্থ প্রকাশ করছে। ভাবার্থ হচ্ছে – "হে ফিরাউন! আপনি কি মূসা (আঃ) -কে এই অনুমতি দিয়েছেন যে, সে বিশৃংখলা সৃষ্টি করে বেড়াবে, অথচ সে আপনার আনুগত্য স্বীকার করে না এবং আপনার দেবতাদের উপাসনা পরিত্যাগ করেছে?" হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) এটাকে وَقَدْ تَرَكُوكَ أَنْ يَعْبُدُوا آلِهَتَكَ এভাবে পড়েছেন। এটা ইবনে জারীর (রাঃ)-এর বর্ণনা। কেউ কেউ আবার এই واو কে وَاو عَاطِفَة বলেছেন। তখন ভাবার্থ হবে– "হে ফিরাউন! আপনি কি মূসা (আঃ)-কে এমন মুক্তভাবে ছেড়ে দেবেন যে, সে বিশৃংখলা সৃষ্টি করে বেড়াবে এবং আপনাকে ও আপনার দেবতাদেরকে পরিত্যাগ করবে?" কেউ কেউ এটাকে إِلَاهَتَكَ পড়েছেন। এর অর্থ নেয়া হয়েছে عِبَادَتَكَ অর্থাৎ আপনার উপাসনা পরিত্যাগ করবে?[১] প্রথম কিরআতের উপর ভিত্তি করে কেউ কেউ এই ফলাফলে পৌঁছেছেন যে, ফিরাউনও

১. এটা ইবনে আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রঃ) এবং অন্যান্য হতে বর্ণিত হয়েছে।

গোপনীয়ভাবে একটি মূর্তির পূজা করতো। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে যে, তার গলায় একটি মূর্তি লটকানো থাকতো। ওকেই সে সিজদা করতো। এর উপর ভিত্তি করেই হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, ঐ লোকগুলো যখন কোন সুন্দর গাভী দেখতো তখন ফিরাউন তাদেরকে ওর পূজা করার নির্দেশ দিতো। এ জন্যেই সামেরী একটি গরু বানিয়েছিল যার মধ্য থেকে শব্দ বের হতো। মোটকথা, ফিরাউন তার দরবারের লোকদের কথা মেনে নিলো এবং বললোঃ "আমি তার বংশ কেটে ফেলার জন্যে তাদের পুত্র সন্তানদেরকে হত্যা করবো এবং মেয়েদেরকে জীবিত রাখবো।" এই প্রকারের এটা ছিল দ্বিতীয় অত্যাচার। ইতিপূর্বেও হযরত মূসা (আঃ)-এর জন্মের পূর্বে সে এরূপই করেছিল, যেন দুনিয়াতে তাঁর অস্তিত্বই না আসে। কিন্তু ঘটলো তার বিপরীত যা ফিরাউন কামনা করেছিল। শেষ পর্যন্ত মূসা (আঃ) জন্মগ্রহণও করেন এবং বেঁচেও থাকেন। দ্বিতীয়বারও সে এরূপ করারই ইচ্ছা করলো। সে বানী ইসরাঈলকে লাঞ্ছিত করে তাদের উপর বিজয় লাভের ইচ্ছা করেছিল। কিন্তু এখানেও তার বাসনা পূর্ণ হয়নি। আল্লাহ তা'আলা মূসা (আঃ)-কে সম্মান দেন এবং ফিরাউনকে লাঞ্ছিত করেন, আর তাকে ও তার দলবলকে নদীতে ডুবিয়ে দেন। ফিরাউন যখন বানী ইসরাঈলের ক্ষতিসাধন করার দৃঢ় সংকল্প করে বসে তখন মূসা (আঃ) স্বীয় সম্প্রদায়ের লোকদেরকে বলে– "তোমরা ধৈর্যধারণ কর এবং আল্লাহর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা কর।" হযরত মূসা (আঃ) তাদের সাথে শুভ পরিণামের ওয়াদা করলেন। তিনি বানী ইসরাঈলকে বললেনঃ "রাজ্য তোমাদেরই হয়ে যাবে। যমীন হচ্ছে আল্লাহর। তিনি যাকে চান তাকেই রাজ্যের শাসন ক্ষমতা অর্পণ করে থাকেন এবং ভাল পরিণাম মুত্তাকীদেরই বটে।" মূসা (আঃ)-এর সঙ্গী-সাথীগণ তাঁকে সম্বোধন করে বললোঃ "হে মূসা (আঃ)! আপনি আমাদের কাছে আগমনের পূর্বেও আমাদেরকে কঠিন দুঃখ দুর্দশার সম্মুখীন হতে হয়েছে এবং আপনি আসার পরেও স্বচক্ষে দেখছেন যে, আমাদেরকে কতইনা লাঞ্ছিত ও অপমানিত করা হচ্ছে!" বানী ইসরাঈল যে তাদের বর্তমান অবস্থার উপর ধৈর্যধারণ করছে সেই জন্যে হযরত মূসা (আঃ) তাদেরকে সতর্ক করে দিয়ে বলেনঃ "অতিসত্বরই আল্লাহ পাক তোমাদের শত্রুদেরকে ধ্বংস করে দিবেন।" এই আয়াতের মাধ্যমে বানী ইসরাঈলকে আল্লাহর নিয়ামতের শোকরিয়া আদায় করার জন্যে উত্তেজিত ও উৎসাহিত করা হচ্ছে।

১৩০। আমি ফিরাউনের অনুসারীদেরকে কয়েক বছর পর্যন্ত দুর্ভিক্ষ, অজন্মা ও ফসলহানির মধ্যে বিপন্ন রেখেছিলাম, উদ্দেশ্য ছিল, তারা হয়তো উপদেশ গ্রহণ করে ঈমান আনবে।

١٣٠- وَلَقَدْ اَخَذْنَا اٰلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِيْنَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرٰتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ○

১৩১। যখন তাদের সুখ শান্তি ও কল্যাণ হতো তখন তারা বলতো– এটা আমাদের প্রাপ্য, আর যদি তাদের দুঃখ, দৈন্য ও বিপদ-আপদ হতো তখন তারা ওটাকে মূসা (আঃ) ও তার সঙ্গী-সাথীদের মন্দভাগ্যের কারণরূপে নিরূপণ করতো, তোমরা জেনে রেখো যে, তাদের অকল্যাণ আল্লাহরই নিয়ন্ত্রণাধীন, কিন্তু তাদের অধিকাংশ সে সম্পর্কে কোন জ্ঞান রাখে না।

١٣١- فَاِذَا جَآءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوْا لَنَا هٰذِهٖ وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَّطَّيَّرُوْا بِمُوْسٰى وَمَنْ مَّعَهٗ اَلَاۤ اِنَّمَا طٰۤئِرُهُمْ عِنْدَ اللّٰهِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ○

আল্লাহ তা'আলা এখানে বলেনঃ আমি ফিরাউনের অনুসারীদেরকে দুর্ভিক্ষের মধ্যে ফেলে দিয়ে পরীক্ষা করতে চেয়েছিলাম। তাদের ক্ষেতে ফসল হয়নি, গাছে ফল ধরেনি এবং খেজুর গাছে একটি মাত্র খেজুর ধরেছিল। এর দ্বারা আমার উদ্দেশ্য ছিল যে, হয়তো তারা শিক্ষা গ্রহণ করবে। যখন তাদের ভূমি খুব সবুজ শ্যামল থাকতো এবং ফসল খুব বেশী হতো তখন তারা বলতোঃ "আমরা তো এরই অধিকারী ছিলাম। এটা তো আমাদেরই প্রাপ্য। আমাদেরকে এটা দেয়া না হলে আমাদের প্রতি অবিচার করা হতো।" আর যদি দুর্ভিক্ষের কবলে তারা পতিত হতো এবং ক্ষুধার তাড়নায় প্রাণ বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম হতো তখন তারা বলতো–এটা মূসা (আঃ) ও তার সঙ্গী-সাথীদের মন্দ ভাগ্যের কারণেই হয়েছে। জেনে রেখো, এটা স্বয়ং তাদের নিজেদেরই ভাগ্য বিড়ম্বনা। হযরত

ইবনে আব্বাস (রাঃ) طَائِرُ শব্দ দ্বারা বিপদ-আপদ উদ্দেশ্য নিয়েছেন। মন্দভাগ্যের প্রকৃত কারণ জনগণ বুঝত না। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) عِنْدَ اللّٰهِ থেকে مِنْ قِبَلِ اللّٰهِ উদ্দেশ্য নিয়েছেন। এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহর নিকট হতে।

১৩২। তারা বললো—আমাদেরকে যাদু করবার জন্যে যে কোন নিদর্শনই পেশ কর না কেন আমরা তাতে ঈমান আনবো না।

١٣٢- وَقَالُوْا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهٖ مِنْ اٰيَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا ۙ فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِيْنَ○

১৩৩। শেষ পর্যন্ত আমি তাদের উপর প্লাবন, পঙ্গপাল, উকুন, ভেকদল ও রক্তধারার শাস্তি পাঠিয়ে ক্লিষ্ট করি, এগুলো ছিল আমার সুস্পষ্ট নিদর্শন, কিন্তু তারা শেষ পর্যন্ত দাম্ভিকতা ও অহংকারেই মেতে রইলো, তারা ছিল একটি অপরাধী জাতি।

١٣٣- فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوْفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ اٰيٰتٍ مُّفَصَّلٰتٍ ۗ فَاسْتَكْبَرُوْا وَكَانُوْا قَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ○

১৩৪। তাদের উপর কোন বালা-মুসিবত ও বিপদ-আপদ আপতিত হলে তারা বলতো—হে মূসা (আঃ)! আমাদের এই বিপদ দূর হওয়ার নিমিত্ত তোমার প্রতিপালকের নিকট দু'আ কর, তার সাথে তোমার যে অঙ্গীকার রয়েছে তদানুযায়ী যদি আমাদের বিপদ দূর করে দিতে পার তবে আমরা তোমার প্রতি ঈমান আনবো এবং তোমার সাথে বানী ইসরাঈলগণকে পাঠিয়ে দিবো।

١٣٤- وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوْا يٰمُوْسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ ۚ لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ○

১৩৫। কিন্তু যখনই আমি তাদের উপর হতে শাস্তির সেই সময়টি অপসারিত করতাম যা তাদের জন্যে নির্ধারিত ছিল, তখনই আবার তারা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করতো।

١٣٥- فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ اِلٰى اَجَلٍ هُمْ بٰلِغُوْهُ اِذَا هُمْ يَنْكُثُوْنَ ○

এখানে মহা মহিমান্বিত আল্লাহ ফিরাউন সম্প্রদায়ের বিদ্রোহ ও বিরোধিতার সংবাদ দিচ্ছেন যে, কিভাবে তারা হক থেকে সরে গিয়ে একগুঁয়েমী ভাব দেখিয়েছিল এবং বাতিলের উপর থেকে হঠকারিতা করেছিল। তারা এ কথাও বলেছিল, "যদি মূসা (আঃ) এমন নিদর্শনও প্রদর্শন করেন যার মাধ্যমে তিনি আমাদের উপর যাদু করে দেন তবুও আমরা ঈমান আনবো না। না আমরা তাঁর কোন দলীল কবূল করবো, না তাঁর উপর ঈমান আনয়ন করবো, না তাঁর মু'জিযার উপর ঈমান আনবো।"

তাই আল্লাহ পাক বলেনঃ 'আমি তাদের উপর তুফান পাঠালাম।' طُوْفَانٌ-এর অর্থের ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এটা হচ্ছে অধিক বৃষ্টিপাত যা ডুবিয়ে দেয় বা ক্ষেত ও বাগানের ক্ষতি সাধন করে।[১] তিনি এর দ্বারা সাধারণ মহামারীও বুঝিয়েছেন। মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, তুফান হচ্ছে প্লাবন ও প্লেগ। হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, 'তুফান অর্থ হচ্ছে মৃত্যু।' অন্য একটি বর্ণনায় আছে যে, ওটা হচ্ছে আল্লাহর আকস্মিক ও আসমানী শাস্তি! যেমন আল্লাহ পাক বলেনঃ

فَطَافَ عَلَيْهَا طَآئِفٌ مِّنْ رَّبِّكَ وَ هُمْ نَآئِمُوْنَ ـ

অর্থাৎ "ওদের নিদ্রিত অবস্থায় সে উদ্যানে তোমার প্রভুর বিপর্যয় হানা দিলো।" (৬৮ঃ ১৯) جَرَادٌ -এর অর্থ হচ্ছে ফড়িং, যা একটা প্রসিদ্ধ পাখি, যা খাওয়া হালাল। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবি আওফা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ "আমরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে সাতটি যুদ্ধে শরীক ছিলাম। প্রত্যেক যুদ্ধেই আমরা ফড়িং খাওয়ার সুযোগ পেয়েছিলাম।" ইমাম শাফিঈ (রঃ), ইমাম আহমাদ (রাঃ) এবং ইমাম ইবনে মাজাহ (রঃ) হযরত ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ "আমাদের জন্যে দু'টো মৃত ও দু'টো রক্ত হালাল করা হয়েছে। (মৃত

১. এটা যহ্হাক ইবনে মাযাহিমও (রঃ) বলেছেন। এটাই বেশী প্রকাশমান।

দু'টো হচ্ছে) মাছ ও ফড়িং, আর (রক্ত দু'টো হচ্ছে) কলিজা ও প্লীহা।" রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "অধিকাংশ প্রাণী যেগুলো প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর সেনাবাহিনী, সেগুলোকে আমি নিজে খাই না বটে, কিন্তু অন্যদের জন্যে হারাম বলি না, বরং ওগুলো হালাল।" রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর না খাওয়ার কারণ ছিল এই যে, ওতে তাঁর রুচি হতো না। যেমন গোসাপ। ওটা খেতে তাঁর নিজের রুচি হতো না। কিন্তু অন্যদেরকে তিনি ওটা খাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) ফড়িং, গোসাপ এবং কোন প্রাণীর মূত্রস্থলী খেতেন না। কিন্তু ওগুলোকে হারামও বলতেন না। তাঁর ফড়িং খাওয়া থেকে বিরত থাকার কারণ ছিল এই যে, ওটা আল্লাহর একটি আযাব। ফড়িং যে ফসলের জমির উপর দিয়ে গমন করে সেই জমির ফসল সমূলে ধ্বংস হয়ে যায়। মূত্রস্থলী থেকে বিরত থাকার কারণ এই যে, ওটা প্রস্রাবের নিকটবর্তী অংশ। আর গোসাপ না খাওয়ার কারণ এই যে, ওটা হচ্ছে এমন একটি জাতি যা সুন্দর আকৃতি থেকে কদাকৃতিতে রূপান্তরিত হয়েছে। অতঃপর হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ "এই বর্ণনাটিও দুর্বল বটে, তবে গোসাপ খাওয়া থেকে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর বিরত থাকার কারণের প্রতি আলোকপাতের উদ্দেশ্যেই আমি এটা নকল করেছি।" আমীরুল মু'মিনীন হযরত উমার ইবনে খাত্তাব (রাঃ) অত্যন্ত আগ্রহের সাথে ফড়িং খেতেন। তাঁকে ফড়িং খাওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি উত্তরে বলেনঃ "আমি দু'একটি ফড়িং পেলে অত্যন্ত মজা করে খেয়ে থাকি।" হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর পত্নীগণ থালা ভর্তি ফড়িং তাঁর কাছে উপঢৌকন স্বরূপ প্রেরণ করতেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, ইমরানের কন্যা মারইয়াম (আঃ) আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'আ করেছিলেন, "হে আল্লাহ! আমাকে এমন মাংস খেতে দিন যাতে রক্ত নেই।" তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁকে ফড়িং খেতে দেন। তখন মারইয়াম (আঃ) বলেনঃ "হে আল্লাহ! লালন পালন ছাড়াই তাকে জীবন দান করুন এবং শব্দ ও শোরগোল ছাড়াই ওদের একে অপরের পিছনে রেখে দিন।" রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন—"ফড়িংকে মেরো না। এগুলো হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার এক বিরাট সেনাবাহিনী।" এ হাদীসটি খুবই গারীব।

فَاَرْسَلْنَا যুক্ত আয়াত সম্পর্কে মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, এই শাস্তি এই কারণে যে, অতীত যুগে এগুলো দরজার কীলকে খেয়ে ফেলতো এবং কাঠকে অবশিষ্ট রাখতো। আওযায়ী (রঃ) বলেনঃ "আমি একদা জঙ্গলের দিকে রওয়ানা হলাম। হঠাৎ দেখি যে, এক ঝাঁক ফড়িং যমীন ও আসমানকে ছেয়ে আছে। আর

একটি লোক ঐ ঝাঁকের মধ্যে বর্ম পরিহিত অবস্থায় রয়েছে। যেই দিকে সে ইশারা করছে সেই দিকে ঐ ফড়িংগুলো সরে যাচ্ছে। ঐ লোকটি বার বার বলতে রয়েছে– দুনিয়া ও ওর মধ্যস্থিত সবকিছুই বাতিল ও মিথ্যা।"

কাযী শুরাইহ্ (রঃ)-কে ফড়িং সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি উত্তরে বলেনঃ "আল্লাহ ওকে ধ্বংস করুন! তার মধ্যে সাতটি শক্তিশালীর মাহাত্ম্য রয়েছে। ওর মাথা হচ্ছে ঘোড়ার, গর্দান হচ্ছে বলদের, বক্ষ সিংহের, বাহু গৃধিনীর, পা উটের, লেজ সাপের এবং পেট হচ্ছে বৃশ্চিকের।"

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَ طَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ (৫ঃ ৯৬) এই আয়াতটি সম্পর্কে আলোচনার সময় নিম্নের হাদীসটি বর্ণনা করা হয়েছে, আমরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে হজ্ব বা উমরার জন্যে যাচ্ছিলাম। এক দল ফড়িং-এর আমরা সম্মুখীন হই। আমরা খড়ি দিয়ে ওগুলোকে মারছিলাম, অথচ ঐ সময় আমরা ইহরামের অবস্থায় ছিলাম। আমরা এ কথা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট বর্ণনা করলে তিনি বলেনঃ "ইহরামের অবস্থায় সামুদ্রিক শিকারে কোন বাধা নেই।" হযরত আনাস (রাঃ) ও হযরত জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) যখন ফড়িং-এর উপর বদদু'আ করে বলেনঃ "হে আল্লাহ! আপনি ছোট বড় সমস্ত ফড়িংকে ধ্বংস করে দিন, ওদের ডিমগুলো বরবাদ করে দিন, ওদের বংশ-সম্পর্ক ছিন্ন করুন এবং আমাদের থেকে কেড়ে নেয়া আহার্য ওদের মুখ থেকে ছিনিয়ে নিন! নিশ্চয়ই আপনি প্রার্থনা শ্রবণকারী।" তখন হযরত জাবির (রাঃ) তাঁকে বলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! এগুলো তো আল্লাহর সেনাবাহিনী। অথচ আপনি ওগুলোর বংশ সম্পর্ক কেটে দেয়ার প্রার্থনা করছেন!" তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "এগুলো সমুদ্রের মাছ থেকে সৃষ্ট হয়ে থাকে।"[১] যিয়াদ সংবাদ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি ফড়িংকে মাছ থেকে সৃষ্ট হতে দেখেছে সে বর্ণনা করেছে, মাছ যখন সমুদ্রের তীরবর্তী স্থানে ডিম ছাড়ে এবং তীরের পানি শুকিয়ে যায় ও তথায় সূর্যের আলো পতিত হয়, তখন ঐ ডিমগুলো হতে এই ফড়িং বেরিয়ে পড়ে উড়তে শুরু করে।" إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ -এর আলোচনায় আমরা নিম্নের হাদীসটি বর্ণনা করেছিঃ

"আল্লাহ তা'আলা হাজার প্রকারের মাখলূক সৃষ্টি করেছেন। ছয়শ' প্রকার হচ্ছে জলচর এবং চারশ' হচ্ছে স্থলচর। আর তাড়াতাড়ি ধ্বংস হয়ে যাবে এরূপ মাখলূক হচ্ছে ফড়িং।" রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "যুদ্ধে ধ্বংস প্রাপ্তদের সামনে প্লেগও কিছুই নয়। আর ফড়িং এর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কাঠেরও কোন হাকীকত নেই।" এই হাদীসটি গারীব।

---

১. এটা ইমাম ইবনে মাজাহ (রাঃ) তাঁর সুনানে তাখরীজ করেছেন।

قُمَّلَ সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, ওটা হচ্ছে গমের ভিতরের পোকা অথবা ওটা হচ্ছে ছোট ছোট ফড়িং যার পালক থাকে না এবং উড়ে না। মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, قُمَّلَ হচ্ছে কালো বর্ণের ক্ষুদ্র কীট বা মশা অথবা ওটা হচ্ছে এমন পোকা যা উটের গায়ে লেগে থাকা পোকা সদৃশ।

বর্ণিত আছে যে, যখন মূসা (আঃ) ফিরাউনকে বলেছিলেনঃ "হে ফিরাউন! বানী ইসরাঈলকে আমার সাথে পাঠিয়ে দাও"। সেই সময় আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে ঝড় তুফান শুরু হয়েছিল এবং মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষিত হচ্ছিল। ফিরাউন ও তার লোকেরা বুঝে নিয়েছিল যে, এটা আল্লাহর শাস্তি। তাই তারা বলেছিল– "হে মূসা! আল্লাহর নিকট দু'আ করে এই ঝড়-তুফান বন্ধ করে দাও। আমরা তোমার উপর ঈমান আনবো এবং বানী ইসরাঈলকে তোমার সাথে পাঠিয়ে দেবো।" মূসা (আঃ) তখন দু'আ করলেন। কিন্তু না তারা ঈমান আনলো, না বানী ইসরাঈলকে তাঁর সাথে পাঠালো। ঐ বছর বৃষ্টিপাতের ফলে প্রচুর ফসল উৎপন্ন হলো। তারা তখন বলতে লাগলো– "বাঃ বাঃ! আমাদের আকাঙ্ক্ষা তো এটাই ছিল।" কিন্তু ঈমান না আনার কারণে ফড়িংকে তাদের উপর চাপিয়ে দেয়া হলো। ওরা সমস্ত ক্ষেত খেয়ে ফেললো এবং শাক সব্জী নষ্ট করে দিলো। তারা বুঝে নিলো যে, এখন আর কোন ফসল অবশিষ্ট থাকবে না। সুতরাং তারা মূসা (আঃ)-এর শরণাপন্ন হয়ে বললোঃ "হে মূসা (আঃ)! এই শাস্তিকে সরিয়ে দাও। আমরা ঈমান আনবো।" মূসা (আঃ)-এর দু'আয় ফড়িং দূর হয়ে গেল। কিন্তু তথাপি তারা ঈমান আনলো না। বরং তারা ফসল ঘরে জমা করে রাখলো এবং বলতে শুরু করলো–"কি ভয়? শস্যের ঢেরি বাড়ীতে বিদ্যমান রয়েছে।" হঠাৎ গমের পোকার শাস্তি তাদের উপর পতিত হলো। এমন অবস্থা হলো যে, কেউ দশ সের গম পেষণের জন্যে নিয়ে গেলে তিন সেরও বাকী থাকতো না। আবার তারা হযরত মূসা (আঃ)-এর কাছে আযাব সরানোর দরখাস্ত করলো এবং ঈমান আনয়নের অঙ্গীকার করলো। কিন্তু সেই قُمَّلَ -এর শাস্তি দূর হওয়ার পরেও তারা বিরোধিতা করতেই থাকলো। কোন এক সময় হযরত মূসা (আঃ) ফিরাউনের সাথে মিলিত হয়েছিলেন এমন সময় ভেকের ডাক শোনা গেল। তিনি ফিরাউনকে বললেনঃ "তোমার উপর ও তোমার কওমের উপর একী শাস্তি!" সে বললোঃ "এতে তো ভয়ের কোনই কারণ নেই।" কিন্তু সন্ধ্যা হতে না হতেই জনগণের সারা দেহে ভেক লাফালাফি শুরু করে দিলো। কেউ কথা বলার জন্যে মুখ খুললে ভেক তার মুখে প্রবেশ করতো। পুনরায় তারা ঐ শাস্তি অপসারণের জন্যে মূসা (আঃ)-এর নিকট আবেদন জানালো। কিন্তু সেই শাস্তি দূর হওয়ার পরেও তারা ঈমান আনলো না। এরপর নাযিল হলো রক্ত আযাব! তারা নদী

থেকে বা কূপ থেকে পানি এনে রাখলে তা রক্তে পরিণত হয়ে যেতো। কোন পাত্রে রাখলেও সেই একই অবস্থা। ফিরাউনের কাছে লোকেরা এ অভিযোগ করলে সে তাদেরকে বললোঃ "তোমাদের উপর যাদু করা হয়েছে।" তারা বললোঃ "আমাদের উপর কে যাদু করলো? আমাদের পাত্রে শুধু আমরা রক্তই পাচ্ছি!" অতএব, আবার তারা মূসা (আঃ)-এর কাছে আসলো এবং ঐ আযাব দূর হলে ঈমান আনবে ও বানী ইসরাঈলকে তাঁর সাথে পাঠিয়ে দেবে এই ওয়াদা করলো। হযরত মূসা (আঃ)-এর দু'আয় তখন ঐ শাস্তি দূর হয়ে গেল। কিন্তু তবুও তারা ঈমানও আনলো না এবং বানী ইসরাঈলকে তাঁর সাথে পাঠালোও না।[১]

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, যখন যাদুকরগণ ঈমান আনলো এবং ফিরাউন পরাজিত হলো ও বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে গেল, তখনও সে অবাধ্যতা ও কুফরী থেকে ফিরলো না। ফলে তাদের উপর পর্যায়ক্রমে কয়েকটি নিদর্শন প্রকাশিত হলো। দুর্ভিক্ষ, বৃষ্টিযুক্ত ঝড়-তুফান, ফড়িং, গমের পোকা, ব্যাঙ এবং রক্ত। এসব শাস্তি পর্যায়ক্রমে তাদের উপর নাযিল হতে থাকলো। ঝড়-তুফানের ফলে সমস্ত ভূমি দলদলে হয়ে গেল। না তারা তাতে লাঙ্গল চালাতে পারলো, না কোন ফসলের বীজ বপন করতে সক্ষম হলো। ক্ষুধার তাড়নায় তাদের প্রাণ বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম হলো। তারা মূসা (আঃ)-এর কাছে আযাব সরানোর দরখাস্ত করলো এবং ঈমান আনয়নের অঙ্গীকারে আবদ্ধ হলো। মূসা (আঃ) আযাব সরানোর জন্যে আল্লাহ পাকের নিকট আবেদন জানালেন। আযাব সরে গেল বটে, কিন্তু তারা ঈমান আনয়নের অঙ্গীকার পুরো করলো না। তারপরে আসলো ফড়িং-এর শাস্তি, যা সমস্ত ক্ষেতের ফসল খেয়ে ফেললো এবং তাদের ঘরের দরজাগুলোর পেরেক চাটতে থাকলো। ফলে তাদের ঘরগুলো পড়ে গেল। এরপরে আসলো কীটের শাস্তি। হযরত মূসা (আঃ) বললেনঃ "এই টিলার দিকে এসো।" তারপর হযরত মূসা (আঃ) আল্লাহ তা'আলার নির্দেশক্রমে একটি পাথরের উপর লাঠি মারলেন। তখন ওর মধ্য থেকে অসংখ্য কীট বেরিয়ে পড়লো। ওগুলো ঘরের সর্বস্থানে ছড়িয়ে পড়লো। খাদ্যদ্রব্যের গায়ে ওগুলো লেগে থাকলো। লোকগুলো না ঘুমোতে পারছিল, না একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারছিল। তারপর তাদের উপর ব্যাঙ-এর শাস্তি নেমে আসলো। খাদ্যদ্রব্যে ব্যাঙ, ভাতের থালায় ব্যাঙ, কাপড়ে ব্যাঙ। এরপরে আসলো রক্তের শাস্তি। পানির প্রতিটি পাত্রে পানির পরিবর্তে রক্তই দেখা যায়। মোটকথা, তারা বিভিন্ন প্রকার শাস্তির শিকারে পরিণত হলো।

১. হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ), সুদ্দী (রঃ), কাতাদা (রঃ) এবং পূর্ববর্তী আলেমদের আরো কয়েকজন হতে অনুরূপ বর্ণনা বর্ণিত হয়েছে!

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "তোমরা ব্যাঙকে মেরো না। কেননা, ফিরাউনের কওমের উপর যখন ব্যাঙ-এর শাস্তি প্রেরণ করা হয় তখন একটি ব্যাঙ আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আগুনের এক চুল্লীর মধ্যে পড়ে যায়।" তাই আল্লাহ তা'আলা ঠাণ্ডা জায়গা অর্থাৎ পানির স্থানকে ব্যাঙ-এর বাসস্থান বানিয়েছেন এবং তাদের ডাককে তসবীহ হিসেবে গণ্য করেছেন। যায়েদ ইবনে আসলাম (রাঃ) دم -এর শাস্তি দ্বারা নাকসীর (গরমের প্রকোপে নাক দিয়ে রক্ত প্রবাহিত হয়) এর শাস্তি ভাব নিয়েছেন।

১৩৬। সুতরাং আমি (এই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের জন্যে) তাদের হতে প্রতিশোধ নিলাম এবং তাদেরকে অতল সমুদ্রে ডুবিয়ে মারলাম, কেননা তারা আমার নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, আর এই ব্যাপারে তারা ছিল সম্পূর্ণ গাফিল বা উদাসীন।

١٣٦- فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَاَغْرَقْنٰهُمْ فِي الْيَمِّ بِاَنَّهُمْ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَكَانُوْا عَنْهَا غٰفِلِيْنَ ○

১৩৭। যে জাতিকে দুর্বল ও দীনহীন ভাবা হতো আমি তাদেরকে আমার কল্যাণপ্রাপ্ত রাজ্যের পূর্ব ও পশ্চিমের উত্তরাধিকারী বানাই, আর বানী ইসরাঈল জাতি সম্পর্কে তোমার প্রতিপালকের শুভ ও কল্যাণময় বাণী (প্রতিশ্রুতি) পূর্ণ হলো, কেননা তারা ধৈর্যধারণ করেছিল, আর ফিরাউন ও তার সম্প্রদায়ের নির্মিত কীর্তিকলাপ ও উচ্চ প্রাসাদসমূহকে আমি ধ্বংসস্তুপে পরিণত করেছি।

١٣٧- وَاَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِيْنَ كَانُوْا يُسْتَضْعَفُوْنَ مَشَارِقَ الْاَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِيْ بٰرَكْنَا فِيْهَا ۗ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنٰى عَلٰى بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ۙ بِمَا صَبَرُوْا ۗ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهٗ وَمَا كَانُوْا يَعْرِشُوْنَ ○

ফিরাউনের কওমের উপর পর্যায়ক্রমে নিদর্শনাবলীর আগমন এবং একের পর এক শাস্তি অবতরণ সত্ত্বেও তারা অবাধ্যতা ও ঔদ্ধত্যের উপরেই প্রতিষ্ঠিত থাকলো। ফলে তাদেরকে সমুদ্রে ডুবিয়ে দেয়া হলো। সেখানে মূসা (আঃ)-এর জন্যে রাস্তা বানিয়ে দেয়া হলো। তিনি ঐ রাস্তায় নেমে পড়লেন। তাঁকে পার করিয়ে নেয়া হলো। তাঁর সাথে বানী ইসরাঈলও ছিল। অতঃপর ফিরাউন এবং তার সেনাবহিনীও তাদের অনুসরণ করে ঐ পথে নেমে পড়লো। যখনই তারা মাঝ দরিয়ায় পৌঁছেছে তখনই দু'দিকের পানি মিলে গেল এবং তারা ডুবে মরলো। এটা ছিল আল্লাহর আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা এবং ওগুলোর প্রতি উদাসীন থাকারই ফল। আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, তিনি বানী ইসরাঈলকে ফিরাউনের রাজ্যের পূর্ব ও পশ্চিমের উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেন, যাদেরকে অত্যন্ত দুর্বল মনে করা হতো এবং যারা দুর্বল হওয়ার কারণে ফিরাউনের গোলামী করতো। যেমন আল্লাহ পাক বলেনঃ "আমি ঐ কওমের উপর ইহসান করতে চাই যাদেরকে দুর্বল মনে করা হয়। আমি তাদেরকে বাদশাহ্ ও সরদার বানাতে চাই। তাদেরকে আমি আমার যমীনের উত্তরাধিকারীরূপে গণ্য করবো। আর ফিরাউন ও তার কওম যে শাস্তির আশংকা করতো ঐ শাস্তিই আমি তাদের উপর নাযিল করবো।" আর এক জায়গায় তিনি বলেনঃ "তারা ছেড়ে গিয়েছিল কতই না উদ্যান ও প্রস্রবণ! শস্যক্ষেত ও মনোরম আবাস! তারা সানন্দে উপভোগ করতো পার্থিব সম্পদ। আমি অপর গোত্রকে এর উত্তরাধিকারী বানিয়েছি।" হাসান বসরী (রঃ) ও কাতাদা (রঃ) شَرْقٌ ও غَرْبٌ দ্বারা শাম বা সিরিয়া দেশ বুঝিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলার কল্যাণময় বাণী বানী ইসরাঈল জাতি সম্পর্কে পূর্ণ হলো, কেননা তারা ধৈর্যধারণ করেছিল। আল্লাহ তা'আলার সেই কথা ও প্রতিশ্রুতি হচ্ছে–

وَ نُرِيدُ اَنْ نَّمُنَّ عَلَى الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا فِى الْاَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ اَئِمَّةً وَّ نَجْعَلَهُمُ الْوٰرِثِيْنَ ـ وَ نُمَكِّنَ لَهُمْ فِى الْاَرْضِ وَ نُرِيَ فِرْعَوْنَ وَ هَامٰنَ وَ جُنُوْدَهُمَا مِنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَحْذَرُوْنَ ـ

অর্থাৎ "আমি ঐ সম্প্রদায়ের উপর অনুগ্রহ করতে চাই যাদেরকে দুর্বল মনে করা হয়। আমি তাদেরকে বাদশাহ্ ও নেতা বানাতে চাই।[১] তাদেরকে আমি আমার যমীনের উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেবো। আর ফিরাউন ও তার কওম যে শাস্তির আশঙ্কা করতো ঐ শাস্তিই আমি তাদের উপর নাযিল করবো।" (২৮:৫-৬)

১. এটাও ইবনে জারীর (রঃ) ও অন্যান্য হতে বর্ণিত হয়েছে এবং এটাই প্রকাশমান।

وَ دَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَ قَوْمُهُ অর্থাৎ ফিরাউন ও তার কওম যে অট্টালিকা ও উদ্যানসমূহ তৈরী করেছিল এবং যেসব সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ করেছিল, সবগুলোকেই আমি ধ্বংসস্তুপে পরিণত করেছি।[১]

১৩৮। আমি বানী ইসরাঈলকে সমুদ্র পার করিয়ে দিলাম, অতঃপর তারা প্রতিমা পূজায় রত এক জাতির সংস্পর্শে আসলো, তখন তারা বললো– হে মূসা (আঃ)! তাদের যেরূপ মা'বূদ রয়েছে, আমাদের জন্যেও ঐরূপ মা'বূদ বানিয়ে দিন, তখন মূসা বললো– তোমরা একটি গণ্ডমূর্খ জাতি (এর ন্যায় কথা বলছো)।

١٣٨- وَجٰوَزْنَا بِبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ الْبَحْرَ فَاَتَوْا عَلٰى قَوْمٍ يَّعْكُفُوْنَ عَلٰٓى اَصْنَامٍ لَّهُمْ ۚ قَالُوْا يٰمُوْسَى اجْعَلْ لَّنَآ اِلٰهًا كَمَا لَهُمْ اٰلِهَةٌ ؕ قَالَ اِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ ○

১৩৯। এইসব লোক যে কাজে লিপ্ত রয়েছে, তা তো ধ্বংস করা হবে, আর তারা যা করছে তা অমূলক ও বাতিল বিষয়।

١٣٩- اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ مُتَبَّرٌ مَّا هُمْ فِيْهِ وَبٰطِلٌ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○

বানী ইসরাঈলের অজ্ঞ লোকদের বাসনার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, মূসা (আঃ) যখন তাদেরকে নিয়ে সমুদ্র পার হয়ে গেলেন এবং তারা আল্লাহ তা'আলার এই বিরাট নিদর্শন স্বচক্ষে দেখলো তখন তারা এমন এক সম্প্রদায়ের পার্শ্ব দিয়ে গমন করলো যারা মূর্তিপূজায় লিপ্ত হয়েছিল। কোন কোন মুফাস্সির বলেন যে, তারা ছিল কিনআনী গোত্র বা লাখম গোত্র। তারা গাভীর ন্যায় জন্তুর মূর্তি বানিয়ে নিয়েছিল এবং ওরই উপাসনায় লিপ্ত হয়ে পড়েছিল। এ জন্যেই পরবর্তীতে ওরই সাথে সাদৃশ্যযুক্ত একটি বাছুরের উপাসনায় তারা জড়িয়ে পড়েছিল এবং বলেছিল– "হে মূসা (আঃ)! আমাদের জন্যে একটি মা'বূদ বানিয়ে দিন, যেমন এই লোকগুলোর মা'বূদসমূহ রয়েছে।" মূসা (আঃ) বললেনঃ "তোমরা বড়ই মূর্খ। তোমরা আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ভুলে বসেছো। তিনি এসব ব্যাপার থেকে

১. এটা ইবনে আব্বাস ও মুজাহিদ বলেছেন।

সম্পূর্ণরূপে পবিত্র যে, তাঁর শরীক ও সমতুল্য কেউ হতে পারে। তাদের মাযহাবও ভিত্তিহীন এবং আমলও ভিত্তিহীন।"

আবূ ওয়াফিদিল লাইসী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে মক্কা থেকে হুনাইনের দিকে যাত্রা শুরু করেছিলাম। পথিমধ্যে কাফিরদের একটি কুল বৃক্ষ আমাদের সামনে পড়ে যার পার্শ্বে তারা আসর জমিয়ে বসেছিল। তারা তাদের অস্ত্রশস্ত্র ঐ গাছে বেঁধে রেখেছিল। এভাবে তারা ঐ গাছটির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করছিল। ঐ গাছটিকে ذَاتُ اَنْوَاطٍ বলা হতো। আমরা যখন ঐ গাছের নিকট পৌঁছি তখন দেখি যে, ওটা খুবই সবুজ ও জাঁকজমকপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে। তখন আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমাদের জন্যেও একটা ذَاتُ اَنْوَاطٍ -এর ব্যবস্থা করে দিন, যেমন তাদের রয়েছে। তখন তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! তোমরা তো ঐ কথাই বলেছো যে কথা মূসা (আঃ)-এর কওম তাঁকে বলেছিল। তারা বলেছিলঃ "হে মূসা (আঃ)! আপনি আমাদের জন্যেও একটি মা'বূদ বানিয়ে দিন, যেমন ঐ লোকদের রয়েছে।" তখন মূসা (আঃ) বলেছিলেনঃ "তোমরা তো বড়ই অজ্ঞ ও মূর্খ। তাদের পন্থা ও তাদের আমল সবই মিথ্যা ও বাতিল।" রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ "তোমরাও তাদেরই পদাংক অনুসরণ করতে চাচ্ছ।"[১]

১৪০। সে (মূসা আঃ) আরো বললো– আমি কি আল্লাহকে ছেড়ে তোমাদের জন্যে মা'বূদের সন্ধান করবো? অথচ তিনিই হলেন একমাত্র আল্লাহ যিনি তোমাদেরকে বিশ্বজগতে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন!

١٤٠- قَالَ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْغِيْكُمْ اِلٰهًا وَّهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ۝

১৪১। স্মরণ কর সেই সময়টির কথা, যখন আমি তোমাদেরকে ফিরাউনের অনুসারীদের দাসত্ব হতে মুক্তি দিয়েছি, তারা তোমাদেরকে অতিশয় মর্মান্তিক কষ্টদায়ক ও ন্যাক্কারজনক শাস্তি দিতো, তোমাদের

١٤١- وَاِذْ اَنْجَيْنٰكُمْ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْۤءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُوْنَ اَبْنَاۤءَكُمْ وَ

১. এটা ইমাম আহমাদ (রঃ) ও ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) এটা পেশ করেছেন।

يَسْتَحْيُوْنَ نِسَآءَكُمْ وَفِيْ ذٰلِكُمْ بَلَآءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ ۝

পুত্রদেরকে হত্যা করতো এবং নারীদেরকে জীবিত রাখতো, এটা ছিল তোমাদের জন্যে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এক বিরাট পরীক্ষা।

মূসা (আঃ) বানী ইসরাঈলকে আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতসমূহ স্মরণ করাতে গিয়ে বলছেনঃ "আল্লাহ তোমাদেরকে ফিরাউনের বন্দীত্ব ও প্রভুত্ব থেকে মুক্তি দিয়েছেন এবং রেহাই দিয়েছেন অপমানজনক কাজ থেকে। অতঃপর তিনি তোমাদেরকে দান করেছেন মর্যাদা ও সম্মান। তোমাদের শত্রুদেরকে তিনি তোমাদের চোখের সামনে ধ্বংস করে দিয়েছেন। সুতরাং তিনি ছাড়া ইবাদতের যোগ্য আর কে হতে পারে? এর বিস্তারিত বিবরণ সূরায়ে বাকারায় দেয়া হয়েছে।

١٤٢- وَوٰعَدْنَا مُوْسٰى ثَلٰثِيْنَ لَيْلَةً وَّاَتْمَمْنٰهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيْقَاتُ رَبِّهٖٓ اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوْسٰى لِاَخِيْهِ هٰرُوْنَ اخْلُفْنِيْ فِيْ قَوْمِيْ وَاَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيْلَ الْمُفْسِدِيْنَ ۝

১৪২। আর আমি মূসা (আঃ)-কে ওয়াদা দিয়েছিলাম ত্রিশ রাত্র ও দিনের (সীনাই পবর্তের উপর অবস্থান করার) জন্যে, পরে আরো দশদিন দ্বারা ওটা পূর্ণ করেছিলাম, এভাবে তার প্রতিপালকের নির্ধারিত সময়টি চল্লিশ দিন দ্বারা পূর্ণতা লাভ করে, (রওয়ানা হবার সময়) মূসা (আঃ) তার ভাই হারূন (আঃ)-কে বলেছিল– আমার অনুপস্থিতিতে আমার সম্প্রদায়ের মধ্যে তুমি আমার প্রতিনিধিত্ব করবে এবং তাদেরকে সংশোধন করার কাজ করতে থাকবে, (সাবধান!) বিপর্যয় ও ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের অনুসরণ করবে না।

আল্লাহ তা'আলা বানী ইসরাঈলের উপর যে ইহসান করেছেন তা তিনি তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলছেনঃ তোমাদেরকে আমি হিদায়াত দান

করেছি। তোমাদের নবী মূসা (আঃ) আমার সাথে কথা বলেছেন। আমি তাকে তাওরাত (আসমানী কিতাব) প্রদান করেছি। এর মধ্যে নির্দেশাবলী ও শরীয়তের যাবতীয় কথা বিস্তারিতভাবে লিবিপদ্ধ রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা মূসা (আঃ)-এর সাথে ত্রিশ রাত্রির ওয়াদা করেছিলেন। মুফাস্সিরগণ বলেন যে, হযরত মূসা (আঃ) ঐদিনগুলোতে রোযা রেখেছিলেন। যখন এই ত্রিশ দিন পূর্ণ হলো তখন আল্লাহ তা'আলা চল্লিশ দিন পূর্ণ করার নির্দেশ দিলেন। অধিকাংশ মুফাস্সির বলেন যে, যিকাদা মাসের ছিল ত্রিশ দিন এবং যিলহাজ্ব মাসের ছিল দশ দিন। এভাবে ঈদের দিন পর্যন্ত চল্লিশ দিন পূর্ণ হয়। এরপর মূসা (আঃ) আল্লাহ তা'আলার সাথে কথা বলেন এবং ঐ দিনেই দ্বীনে মুহাম্মাদী পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "আজ আমি তোমাদের দ্বীনকে তোমাদের জন্যে পূর্ণ করে দিয়েছি এবং আমার নিয়ামত তোমাদের জন্যে পরিপূর্ণ করেছি আর তোমাদের জন্যে ইসলামকে দ্বীন হিসেবে মনোনীত করেছি।" মোটকথা, যখন মেয়াদ পূর্ণ হলো এবং মূসা (আঃ) তূরের দিকে গেলেন, যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "হে বানী ইসরাঈল! আমি তোমাদেরকে শত্রু থেকে মুক্তি দিয়েছি এবং তূরের সোজা পথের দিকে আহ্বান করেছি।" তখন তিনি স্বীয় ভ্রাতা হারূন (আঃ)-কে তাঁর স্থলাভিষিক্ত বানিয়ে যান এবং অবস্থা ও পরিবেশ ভাল রাখার উপদেশ দেন, যেন ফাসাদ ও বিশৃংখলা সৃষ্টি না হয়। হারূন (আঃ)-কে তাঁর উপদেশ দান শুধু সতর্কতামূলক ছিল। নচেৎ, হারূনও (আঃ) স্বয়ং নবী ছিলেন এবং মহামর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী ছিলেন। তাঁর উপর এবং সমস্ত নবীর উপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক।

১৪৩। মূসা (আঃ) যখন নির্ধারিত স্থানে উপস্থিত হলো, তখন তার প্রতিপালক তার সাথে কথা বললেন, সে তখন নিবেদন করলো–হে আমার প্রতিপালক! আমাকে অনুমতি দিন, আমি আপনাকে দেখবো, তখন আল্লাহ বললেন–তুমি আমাকে আদৌ দেখতে পারবে না, তবে তুমি ঐ পাহাড়ের দিকে তাকাও, যদি ঐ পাহাড় স্বস্থানে স্থির থাকে তবে তুমি

١٤٣- وَلَمَّا جَآءَ مُوْسٰى
لِمِيْقَاتِنَا وَكَلَّمَهٗ رَبُّهٗ قَالَ رَبِّ
اَرِنِيْٓ اَنْظُرْ اِلَيْكَ قَالَ لَنْ
تَرٰىنِيْ وَلٰكِنِ انْظُرْ اِلَى الْجَبَلِ
فَاِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهٗ فَسَوْفَ

تَرٰىنِيْ ۚ فَلَمَّا تَجَلّٰى رَبُّهٗ لِلْجَبَلِ جَعَلَهٗ دَكًّا وَّخَرَّ مُوْسٰى صَعِقًا ۚ فَلَمَّاۤ اَفَاقَ قَالَ سُبْحٰنَكَ تُبْتُ اِلَيْكَ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُؤْمِنِيْنَ ○

আমাকে দেখতে পারবে, অতঃপর তার প্রতিপালক যখন পাহাড়ের উপর আলোক সম্পাৎ করলেন, তখন তা পাহাড়কে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিলো, আর মূসা (আঃ) সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে গেলো, যখন তার চেতনা ফিরে আসলো, তখন সে বললো—আপনি মহিমাময়, আপনি পবিত্র সত্তা, আমি তাওবা করছি, আমিই সর্বপ্রথম ঈমান আনলাম।

আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আঃ) সম্পর্কে সংবাদ দিচ্ছেন যে, যখন মূসা (আঃ) ওয়াদার স্থানে আসলেন এবং আল্লাহ পাকের সাথে কথা বলার মর্যাদা তাঁর লাভ হয় তখন তিনি আল্লাহ তা'আলার নিকট আবেদন জানিয়ে বলেনঃ "হে আমার প্রতিপালক! আমি আপনাকে দেখতে চাই। আপনাকে দেখার সুযোগ আমাকে দান করুন।" তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁকে বললেনঃ "তুমি কখনই আমাকে দেখতে পার না।" لَنْ تَرٰىنِيْ -এর মধ্যে যে لَنْ শব্দটি রয়েছে, এটা আলিমদের মধ্যে জটিলতা সৃষ্টি করেছে। কেননা, لَنْ শব্দটি চিরস্থায়ী অস্বীকৃতি বুঝাবার জন্যে এসে থাকে। এর উপর ভিত্তি করেই মু'তাযিলা সম্প্রদায় দলীল গ্রহণ করেছেন যে, দুনিয়া ও আখিরাত উভয় স্থলেই আল্লাহ তা'আলার দর্শন অসম্ভব। কিন্তু তাদের এই উক্তি খুবই দুর্বল। কেননা, এ ব্যাপারে ক্রমাগত হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, মুমিনরা আখিরাতে আল্লাহ তা'আলার দর্শন লাভ করবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "সেই দিন কতকগুলো মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হবে। তারা তাদের প্রতিপালকের পানে তাকাবে।" এর দ্বারা মুমিনদেরকে সুসংবাদ দেয়া হয়েছে যে, তারা আল্লাহকে পরকালে দেখতে পাবে। অতঃপর কাফিরদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা আল্লাহ তা'আলাকে দেখতে পাবে না। যেমন তিনি বলেনঃ "কখনই না, ওরা সেদিন ওদের রব থেকে থাকবে অন্তরীণ।" এ কথাও বলা হয়েছে যে, এই نَفِىْ বা অস্বীকৃতি দুনিয়ার জন্যে নির্দিষ্ট, আখিরাতের জন্যে নয়। এইভাবে এখন বাক্যের মধ্যে সামঞ্জস্য আসছে

যে, আখিরাতে আল্লাহর দর্শন সত্য ও সঠিক, দুনিয়ায় নয়। আবার এ কথাও বলা হয়েছে যে, এই স্থলে এই কথার অর্থ ঠিক এরূপই যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ

لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ وَ هُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ وَ هُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ -

অর্থাৎ "দৃষ্টিসমূহ তাঁকে দেখতে পায় না, কিন্তু তিনি দৃষ্টিসমূহকে দেখতে পান, তিনি সুক্ষ্মদর্শী ও সর্বজ্ঞাত।" (৬ঃ ১০৩) সূরায়ে আনআ'মে এর উপর যথেষ্ট আলোচনা করা হয়েছে।

পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আঃ)-কে বলেনঃ "হে মূসা (আঃ)! কোন জীবিত মৃত্যুর পূর্বে আমাকে দেখতে পারে না। শুষ্ক জিনিসও আমার আলোক সম্পাৎ করণে ধ্বংস হয়ে যায়।" এ জন্যেই আল্লাহ পাক বলেন যে, প্রতিপালক যখন পাহাড়ের উপর স্বীয় আলোকে সম্পাৎ করলেন তখন পাহাড় চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল এবং মূসা (আঃ) সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে গেলেন। হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "যখন আল্লাহ তা'আলা পাহাড়ের উপর স্বীয় আলোক সম্পাৎ করেন (সেই সময় তিনি স্বীয় অঙ্গুলি দ্বারা ইশারাও করেন) তখন ওটা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়।" বর্ণনাকারী বলেন– আবূ ইসমাঈলও (রঃ) এটা বলার সময় আমাদের দিকে স্বীয় শাহাদাত অঙ্গুলী দ্বারা ইশারা করেন। এই হাদীসের ইসনাদে একজন বর্ণনাকারীর নাম অজ্ঞাত আছে। নবী (সঃ) فَلَمَّا تَجَلّٰى -এ আয়াতটি পড়ার সময় স্বীয় বৃদ্ধাঙ্গুলিটি কনিষ্ঠাঙ্গুলির উপরের পোরের উপর রেখে বলেনঃ "এটুকু আলোক সম্পাতের কারণে পাহাড় চূর্ণ হয়ে যায়।"[১]

হামীদ সাবিতকে বলেনঃ 'দেখ, এইভাবে।' তখন সাবিত স্বীয় হাতখানা হামীদের বক্ষের উপর মেরে বলেনঃ "এ কথা রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন এবং আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, তাহলে আমি কি এটা গোপন করবো?" ইমাম আহমাদও (রঃ) এরূপই বর্ণনা করেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা শুধু কনিষ্ঠাঙ্গুলি বরাবর আলোক সম্পাৎ করেন, এর ফলেই পাহাড় জ্বলে উঠে এবং মাটি হয়ে যায়। সুফইয়ান সাওরী (রঃ) বলেন যে, পাহাড় যমীনের মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে যায় এবং নিমজ্জিত হতেই রয়েছে। কিয়ামত পর্যন্ত ওটা আর প্রকাশিত হবে না। হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, যখন পাহাড়গুলোর উপর আলোক সম্পাৎ করা হয় তখনই ছয়টি পাহাড় উড়ে যায়।

১. এটা ইবনে জারীর (রঃ) তাখরীজ করেছেন এবং ইমাম তিরমীযী (রঃ), আহমাদ (রঃ) এবং হাকিম (রঃ) এরই কাছাকাছি বর্ণনা করেছেন।

তিনটি মক্কায় এসে পড়ে এবং তিনটি পড়ে মদীনায়। মদীনায় পতিত পাহাড় তিনটি হচ্ছে–(১) উহুদ, (২) অরকান এবং রায্‌ওয়া। আর মক্কায় পতিত তিনটি পাহাড় হচ্ছে– (১) হেরা, (২) সাবীর এবং (৩) সাওর। এই হাদীসটি গারীব, এমন কি মুনকারও বটে।

আলোক সম্পাতের পূর্বে তূর পাহাড়টি চক্‌চকে ও পরিষ্কার ছিল। আলোক সম্পাতের পর তাতে গুহা হয়ে গেছে এবং ফাটল ধরে গেছে।[১] মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, আল্লাহ পাকের এ উক্তি– "হে মূসা (আঃ)! পাহাড়ের দিকে তাকাও, যদি ওটা প্রতিষ্ঠিত থাকে তবে বুঝবে যে, তুমি আমাকে দেখতে পারবে। নচেৎ, দেখতে পারবে না।" এটা তিনি এ কারণেই বলেছেন যে, পাহাড়ের সৃষ্টি ও মজবুতি তো মানুষের চাইতে বহুগুণে বড় ও শক্ত! সুতরাং সেই পাহাড়ও আল্লাহর আলোক সম্পাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হতে দেখে তিনি অজ্ঞান হয়ে গেলেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর তাফসীর মতে صَعِقَ শব্দের অর্থ হচ্ছে সংজ্ঞাহীনতা।[২] কাতাদা (রঃ) এর অর্থ নিয়েছেন মৃত্যু। আভিধানিক দিক দিয়ে এ অর্থটিও সঠিক। যেমন কুরআন মাজীদে রয়েছে– وَنُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَصَعِقَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ। অর্থাৎ "যখন সিঙ্গায় ফুঁ দেয়া হবে তখন যতকিছু আকাশে ও পৃথিবীতে রয়েছে, সবাই মরে যাবে বা ধ্বংস হয়ে যাবে।" মোটকথা, এখানে অর্থ মৃত্যুও হতে পারে এবং সংজ্ঞাহীনতাও হতে পারে। সংজ্ঞাহীনতা অর্থ এজন্যে হতে পারে যে, এরপরেই আল্লাহ পাক فَلَمَّاۤ اَفَاقَ বলেছেন। আর চৈতন্য তো সংজ্ঞাহীনতার পরেই হয়ে থাকে, মৃত্যুর পরে নয়। সুতরাং এখানে সংজ্ঞাহীনতার অর্থ নেয়াই ঠিক হবে।

চৈতন্য ফিরে আসলে হযরত মূসা (আঃ) বললেনঃ "হে আল্লাহ! আপনি পবিত্র। আপনার প্রতি কেউই দৃষ্টি রাখতে পারে না। দৃষ্টিপাত করলেই সে জ্বলে পুড়ে মরে যাবে। আপনাকে দেখতে চেয়ে আমি যে ভুল করেছি তার জন্যে তাওবা করছি। এখন আমার বিশ্বাস হয়ে গেছে এবং আমিই সর্বপ্রথম বিশ্বাস স্থাপনকারী।" এখানে ঈমান দ্বারা ঈমান ও ইসলাম উদ্দেশ্য নয়। বরং এখানে বুঝানো হয়েছে– "আমার এই বিশ্বাস জন্মেছে যে, আপনার মাখলূক আপনাকে দেখতে পারে না।"

---

১. এটা ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

২. এটা ইবনে জারীর আত্‌ তাবারী (রঃ) তাখরীজ করেছেন এবং হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে সুদ্দীরও (রঃ) এরূপ একটি বর্ণনা রয়েছে।

ইবনে জারীর (রঃ) এই আয়াতের তাফসীরে মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক (রঃ)-এর বর্ণনায় একটি বিস্ময়কর হাদীস নকল করেছেন এবং প্রধানতঃ তিনি একথাগুলো ইসরাঈলিয়াতের দফতর হতে পেয়েছেন। আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক জ্ঞানের অধিকারী।

خَرَّ مُوسٰى صَعِقًا -এই আয়াত সম্পর্কীয় হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ)-এর একটি বর্ণনা রয়েছে, তিনি বলেন যে, একজন ইয়াহূদী এসে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে অভিযোগ করলোঃ "আপনার একজন আনসারী সাহাবী আমার মুখের উপর এক থাপ্পড় মেরেছে।" ঐ সাহাবীকে ডেকে রাসূলুল্লাহ (সঃ) জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমি এই লোকটিকে বলতে শুনেছি – "আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আঃ)-কে সমস্ত মানুষের উপর ফযীলত দান করেছেন।" আমি তখন বললাম, হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)-এর উপরও কি? সে বললোঃ "হ্যাঁ।" এতে আমার ক্রোধ হয়ে যায়। তাই আমি তাকে এক থাপ্পড় মেরে দেই। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ "তোমরা আমাকে নবীদের উপর মর্যাদা দিয়ো না। মানুষ কিয়ামতের দিন অজ্ঞান হয়ে যাবে। সর্বপ্রথম চৈতন্য লাভ আমারই হবে। কিন্তু আমি দেখবো যে, হযরত মূসা (আঃ) আরশের পায়া ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। আমি জানি না যে, আমার পূর্বে তাঁরই চৈতন্য লাভ হয়েছে, অথবা তিনি অজ্ঞানই হননি। কেননা, তূরে আলোক সম্পাতের সময় তিনি একবার সংজ্ঞাহীন হয়েছিলেন। কাজেই মহান আল্লাহ কিয়ামতের দিন হয়তো তাঁকে সংজ্ঞাহীন হওয়া থেকে মুক্ত রাখবেন।"[১]

আবূ বকর ইবনে আবি দীনার বলেন যে, এই বিবাদের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ)। কিন্তু সহীহ বুখারী ও মুসলিমে এটা আলোচিত হয়েছে যে, উনি ছিলেন আনসারদের একটি লোক। আর হযরত আবূ বকর (রাঃ) তো আনসারদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। বরং তিনি ছিলেন মুহাজির।

রাসূলুল্লাহ (সঃ) لَا تُخَيِّرُونِىْ عَلٰى مُوسٰى -এ উক্তি তাঁর এই উক্তির মতই যে, তিনি বলেছেন لَا تُفَضِّلُونِىْ عَلَى الْاَنْبِيَاءِ وَ لَا عَلٰى يُونُسَ بْنِ مَتّٰى অর্থাৎ "তোমরা আমাকে নবীদের উপর ও ইউনুস ইবনে মাত্তার উপর মর্যাদা প্রদান করো না।" বলা হয়েছে যে, এ কথা তিনি বিনয়, নম্রতা ও ভদ্রতার খাতিরে বলেছিলেন! অথবা আল্লাহ তা'আলা যে তাঁকে অন্যান্য নবীদের উপর মর্যাদা দান করেছেন

১. এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রঃ), ইমাম মুসলিম (রঃ) এবং ইমাম আবূ দাউদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

এটা তা অবহিত হওয়ার পূর্বের কথা। অথবা তাঁর একথার উদ্দেশ্য ছিল– "তোমরা ক্রোধে পতিত হয়ে গোঁড়ামি বা বদ্ধমূল ধারণার উপর ভিত্তি করে আমাকে মর্যাদা প্রদান করো না।" অথবা তাঁর কথার ভাবার্থ ছিল– "তোমরা শুধুমাত্র স্বীয় মতানুসারে আমাকে ফযীলত প্রদান করো না।" আল্লাহ তা'আলাই সর্বাপেক্ষা অধিক জ্ঞানের অধিকারী।

কিয়ামতের দিন লোকেরা অজ্ঞান হয়ে পড়বে। এটা স্পষ্ট কথা যে, মানুষের এভাবে চৈতন্য হারিয়ে ফেলা কিয়ামতের ভয়াবহ দৃশ্যের কারণেই হবে। খুব সম্ভব যে, এটা ঐ সময়ের ঘটনা হবে যখন আল্লাহ তা'আলা লোকদের মধ্যে ফায়সালা করার জন্যে আসবেন। সেই সময় তাঁর আলোক সম্পাতের ফলে লোকেরা বেহুঁশ হয়ে যাবে। যেমন হযরত মূসা (আঃ) তাজাল্লী সহ্য করতে পারেননি। এ জন্যেই রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "না জানি হয়তো আমার চৈতন্য লাভের পূর্বেই মূসা (আঃ)-এর চৈতন্য লাভ হবে অথবা তূরের অচৈতন্য হয়ে যাওয়ার বিনিময়ে তিনি এখানে চেতনাই হারাবেন না।"

হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "যখন হযরত মূসা (আঃ)-এর উপর আলোক সম্পাৎ হয় তখন তার দৃষ্টিশক্তি এত তীব্র হয় যে, দশ ক্রোশ দূর হতে রাত্রির অন্ধকারে কোন কঙ্করময় ভূমিতে চলমান পিপীলিকাকেও তিনি দেখতে পেতেন।" হযরত আবূ বকর (রাঃ) বলেনঃ "এদিক দিয়ে এটা তো কোন অসম্ভব কথা নয় যে, এই বৈশিষ্ট্য আমাদের নবীও (সঃ) লাভ করেছেন। কেননা মেরাজে তিনি আয়াতে কুবরা বা বড় সব নিদর্শন স্বচক্ষে দেখেছিলেন।" এই কথার মাধ্যমে তিনি যেন এই হাদীসের সত্যতা সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু হাদীসের সত্যতার ব্যাপারে চিন্তা ভাবনার অবকাশ রয়েছে। কেননা, এই হাদীসে অপরিচিত বর্ণনাকারী রয়েছেন। আর এসব কথা যে পর্যন্ত ন্যায়পরায়ণ ও নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীর সাথে সম্পর্কযুক্ত না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

১৪৪। তিনি (আল্লাহ) বললেন– হে মূসা (আঃ)! আমি তোমাকেই আমার রিসালাত ও আমার সাথে বাক্যালাপের

١٤٤- قَالَ يٰمُوسٰٓى اِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ

بِرِسٰلٰتِيْ وَبِكَلَامِيْ فَخُذْ مَا اٰتَيْتُكَ وَكُنْ مِّنَ الشّٰكِرِيْنَ ○

জন্য লোকদের মধ্য হতে মনোনীত করেছি, অতএব, এখন আমি তোমাকে যা কিছু দেই তা তুমি গ্রহণ কর এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারীদের অন্তর্ভুক্ত হও।

١٤٥- وَكَتَبْنَا لَهٗ فِى الْاَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَّتَفْصِيْلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَّاْمُرْ قَوْمَكَ يَاْخُذُوْا بِاَحْسَنِهَا سَاُورِيْكُمْ دَارَ الْفٰسِقِيْنَ ○

১৪৫। অতঃপর আমি মূসা (আঃ)-কে ফলকের উপর সর্ববিষয়ের উপদেশ এবং সর্ববিষয়ের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা লিখে দিয়েছি, (অতঃপর তাকে বললাম) এই হিদায়াতকে দৃঢ় হস্তে শক্তভাবে গ্রহণ কর এবং তোমার সম্প্রদায়কে এর সুন্দর সুন্দর বিধানগুলো মেনে চলতে আদেশ কর, আমি ফাসেক বা সত্যত্যাগীদের আবাসস্থল শীঘ্রই তোমাদেরকে প্রদর্শন করবো।

এখানে আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আঃ)-কে সম্বোধন করে বলেছেনঃ "হে মূসা (আঃ)! আমি তোমাকে রিসালাতের জন্যে ও আমার সাথে বাক্যালাপের জন্যে সমস্ত লোকের মধ্য থেকে বেছে নিয়েছি।" এতে কোনই সন্দেহ নেই যে, মুহাম্মাদ (সঃ) হযরত আদম (আঃ)-এর সমস্ত সন্তানের সরদার বা নেতা। এজন্যেই তো আল্লাহ তা'আলা তাঁকে খাতেমুল আম্বিয়া বানিয়েছেন। তাঁর শরীয়ত কিয়ামত পর্যন্ত চালু থাকবে এবং তাঁর উম্মতের সংখ্যা সমস্ত নবীর উম্মতের সংখ্যা অপেক্ষা অধিক হবে। মর্যাদা ও ফযীলতের দিক দিয়ে তাঁর পরে হযরত ইবরাহীম খলীল (আঃ)-এর স্থান। অতঃপর হযরত মূসা ইবনে ইমরান কালীমুল্লাহ (আঃ)-এর স্থান।

আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আঃ)-কে সম্বোধন করে বলেনঃ "আমি তোমাকে যে কালাম ও মুনাজাত দান করেছি তা তুমি গ্রহণ কর এবং সে জন্যে

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। আর যা সহ্য করার তোমার শক্তি নেই তা যাচ্ঞা করো না।” এরপর সংবাদ দেয়া হচ্ছে যে, এই তাখতী বা ফলকে প্রত্যেক বিষয়ের উপদেশ এবং প্রত্যেক হুকুমের ব্যাখ্যা বিদ্যমান রয়েছে। কথিত আছে যে, এই ফলক ছিল মণি-মানিক্যের তৈরী। আল্লাহ পাক তাতে উপদেশাবলী ও নির্দেশাবলী বিস্তারিতভাবে লিখে দিয়েছিলেন এবং সমস্ত হারাম এবং হালালও নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। এই ফলকের উপর তাওরাত লিখিত ছিল। আল্লাহ পাক বলেনঃ “কুরূনে উলাকে ধ্বংস করে দেয়ার পর আমি মূসা (আঃ)-কে কিতাব প্রদান করেছি ,যার মধ্যে লোকদের জন্যে অন্তর্দৃষ্টি রয়েছে।” এটাও কথিত আছে যে, এই ফলক তাওরাত লিখার পূর্বেই দেয়া হয়েছিল। মোটকথা, এটা ছিল দর্শনের প্রার্থনা না মঞ্জুর করার বিনিময়।

‘দৃঢ় হস্তে শক্তভাবে গ্রহণ কর’ অর্থাৎ আনুগত্যের দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ কর এবং স্বীয় সম্প্রদায়কেও নির্দেশ দাও যে, তারা যেন, উত্তমরূপে এর উপর আমল করে। মূসা (আঃ)-এর হুকুমের সাথে قُوَّةٌ শব্দ রয়েছে ,আর তাঁর কওমের সাথে أَحْسَنَ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ মূসা (আঃ)-কে তাগিদ করা হচ্ছে যে, তিনি যেন সর্বপ্রথম দৃঢ়তার সাথে ওর উপর আমল করেন এবং এরপর যেন তাঁর কওম উত্তম পন্থায় আমল করে।

سَاُورِيْكُمْ دَارَ الْفٰسِقِيْنَ অর্থাৎ হে মূসা (আঃ)! যারা আমার বিরুদ্ধাচরণ করবে ও আমার আনুগত্যের বাইরে চলে যাবে তাদের পরিণাম কি হবে অর্থাৎ কিভাবে তারা ধ্বংস হয়ে যাবে তা আমি শীঘ্রই তোমাকে দেখাবো। একথাটি ঠিক ঐ কথার মত যেমন কেউ স্বীয় সম্বোধনকৃত ব্যক্তিকে বলে– ‘যদি তুমি আমার হুকুম অমান্য কর তবে কাল আমি তোমাকে দেখে নেবো।’ এখানে নির্দেশ অমান্যকারীদেরকে ভীতি প্রদর্শন করা হচ্ছে।[১] আবার একথাও বলা হয়েছে যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে–আমি আমার অনুগতদেরকে ফাসেকদের রাজ্য অর্থাৎ সিরিয়া দান করবো। অথবা এর দ্বারা ফিরাউন সম্প্রদায়ের মনযিলকে বুঝানো হয়েছে। কিন্তু প্রথম কথাটিই বেশী পছন্দনীয়। আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক জ্ঞানের অধিকারী। কেননা, এটা ছিল হযরত মূসা (আঃ)-এর মিসর ত্যাগ করার পরের ফরমান। আর এই দ্বিতীয় উক্তি দ্বারা তো বানী ইসরাঈলকে সম্বোধন করা হয়েছে এবং এটা হচ্ছে ‘তীহ’ ময়দানে প্রবেশ করার পূর্বের সম্বোধন।

১. এই অর্থ মুজাহিদ (রঃ) ও হাসান বসরী (রঃ) থেকে নকল করা হয়েছে।

১٤٦- سَاَصْرِفُ عَنْ اٰيٰتِيَ الَّذِيْنَ يَتَكَبَّرُوْنَ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۭ وَاِنْ يَّرَوْا كُلَّ اٰيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوْا بِهَا ۚ وَاِنْ يَّرَوْا سَبِيْلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوْهُ سَبِيْلًا ۚ وَاِنْ يَّرَوْا سَبِيْلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوْهُ سَبِيْلًا ۭ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَكَانُوْا عَنْهَا غٰفِلِيْنَ ۝

১৪৬। এই ধরণীর বুকে যারা অন্যায়ভাবে গর্ব অহংকার করে বেড়ায় আমি তাদেরকে আমার নিদর্শনসমূহ হতে ফিরিয়ে রাখবো, প্রত্যেকটি নিদর্শন দেখলেও তারা তাতে ঈমান আনবে না, তারা যদি সৎপথ দেখতে পায় তবুও সেই পথ গ্রহণ করবে না, কিন্তু তারা ভ্রান্ত ও গুমরাহীর পথ দেখলে তাকেই তারা জীবনপথ রূপে গ্রহণ করবে, এর কারণ হলো– তারা আমার নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে এবং তারা তা থেকে সম্পূর্ণরূপে অমনোযোগী ছিল।

١٤٧- وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَلِقَاۗءِ الْاٰخِرَةِ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ ۭ هَلْ يُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝ ع

১৪৭। যারা আমার নিদর্শনসমূহ ও পরকালের সাক্ষাৎকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তাদের সমুদয় আমল বিনষ্ট হয়ে যায়, তারা যা করে থাকে তদানুযায়ী তাদেরকে প্রতিফল দেয়া হবে।

আল্লাহ পাক বলেনঃ যারা আমার আনুগত্য অস্বীকার করে এবং বিনা কারণে মানুষের কাছে অহংকার প্রকাশ করে, তাদেরকে আমি শরীয়ত ও আহকাম অনুধাবন করা থেকে বঞ্চিত করে দেবো যা আমার শ্রেষ্ঠত্ব ও একত্বের উপর অকাট্য প্রমাণ। অজ্ঞতা ও মূর্খতা তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করেছেন। যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ "আমি তাদের অন্তর ও চক্ষুকে পরিবর্তন করে দিয়েছি, কেননা তাদেরকে বুঝানো সত্ত্বেও তারা প্রথমবারই ঈমান আনয়ন করেনি।" অন্য এক জায়গায়

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "যখন তারা বেঁকে গেল তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরকেও বাঁকা করে দিলেন, যেন যেমন তারা বুঝছে না তেমন কখনই না বুঝে।" কোন কোন পূর্ববর্তী গুরুজন বলেন যে, অহংকারী বিদ্যা ও আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ করতেই পারে না। সে তো গৌররেই ফেটে পড়ে। যে ব্যক্তি অল্প কিছুদিনের তরে জ্ঞান ও বিদ্যা শিক্ষার কষ্ট সহ্য করতে পারলো না, তাকে চিরদিনের জন্যে বিদ্যা থেকে বঞ্চিত থাকার লাঞ্ছনা সহ্য করতেই হবে।

এ জন্যেই আল্লাহ পাক তাদের থেকে কুরআন বুঝবার মূল পদার্থ ছিনিয়ে নিয়েছেন এবং স্বীয় নিদর্শনাবলী থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করেছেন। এই আয়াতের ইঙ্গিত এই উম্মতের দিকেও রয়েছে। এটা হচ্ছে ইবনে উয়াইনার চিন্তাধারা। কিন্তু এটা অবশ্যম্ভাবী নয়। ইবনে উয়াইনা তো এটাকে প্রত্যেক উম্মতের ব্যাপারেই প্রযোজ্য বলে থাকেন এবং উম্মতদের মধ্যে কোন পার্থক্য দেখান না। আল্লাহ তা'আলা সর্বাপেক্ষা অধিক জ্ঞানের অধিকারী।

ইরশাদ হচ্ছে– তারা যতই আয়াত শ্রবণ করুক না কেন, ঈমান আনবে না। যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ "যে লোকদের ব্যাপারে আল্লাহর কথা পূর্ণ হয়ে গেছে যে, তারা সঠিক পথের উপর আসবে না, তাদের কাছে যতই আয়াত আসুক না কেন তারা কখনও ঈমান আনবে না, যে পর্যন্ত না তারা বেদনাদায়ক শাস্তি অবলোকন করে।"

আল্লাহ পাক বলেনঃ "যদি তারা সৎ পথ দেখতেও পায় তবুও সেই পথ গ্রহণ করবে না, কিন্তু তারা যদি ভ্রান্ত ও গুমরাহীর পথ দেখতে পায় তবে ওকেই জীবন পথরূপে গ্রহণ করবে। এর কারণ এই যে, আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে এবং তা থেকে সম্পূর্ণরূপে অমনোযোগী থেকেছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "আমার আয়াতসমূহকে যারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে এবং পরকালের সাক্ষাৎকে অবিশ্বাস করেছে, আর মৃত্যু পর্যন্ত ঐ ধারণার উপরই প্রতিষ্ঠিত থেকেছে, তাদের নেক আমলের সাথে ঈমান না থাকার কারণে তাদের সমস্ত নেক আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে এবং এ সবগুলো ছিনিয়ে নেয়া হবে।" ইরশাদ হচ্ছে–"তাদের আমল অনুযায়ী আমি তাদেরকে প্রতিফল প্রদান করবো।" অর্থাৎ ঈমানের সাথে ভাল আমল করলে ভাল প্রতিফল দেয়া হবে এবং মন্দ আমল করলে মন্দ প্রতিফলই দেয়া হবে। যেমন কর্ম তেমনই ফল।

১৪৮। আর মূসা (আঃ)-এর চলে যাবার পর অলংকার দ্বারা একটি বাছুরের (মত) পুতুল তৈরী করলো, ওটা হতে গরুর মত শব্দ বের হতো, তারা কি দেখেনি যে, ওটা তাদের সাথে কথা বলে না এবং তাদেরকে কোন পথও দেখিয়ে দেয় না? তবুও তারা ওটাকে মা'বূদরূপে গ্রহণ করলো; বস্তুতঃ তারা ছিল বড় অত্যাচারী।

١٤٨- وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسٰى مِنْۢ بَعْدِهٖ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهٗ خُوَارٌؕ اَلَمْ يَرَوْا اَنَّهٗ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيْهِمْ سَبِيْلًاۘ اِتَّخَذُوْهُ وَكَانُوْا ظٰلِمِيْنَ ○

১৪৯। আর যখন তারা লজ্জিত হলো এবং দেখল যে, (প্রকৃতপক্ষে) তারা বিভ্রান্ত হয়েছে, তখন তারা বললো—আমাদের প্রভু যদি আমাদের প্রতি অনুগ্রহ না করেন ও ক্ষমা না করেন তবে তো আমরা সর্বনাশগ্রস্ত হয়ে যাবো।

١٤٩- وَلَمَّا سُقِطَ فِيْۤ اَيْدِيْهِمْ وَرَاَوْا اَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوْاۙ قَالُوْا لَئِنْ لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ○

বানী ইসরাঈলের বিভ্রান্ত লোকেরা বাছুর পূজা করেছিল। কিবতীদের নিকট থেকে যেসব অলংকার ধারে নেয়া হয়েছিল সেগুলো দ্বারা সামেরী একটি বাছুর তৈরী করেছিল। ওর পেটের মধ্যে ঐ মুষ্টির মাটি নিক্ষেপ করেছিল যা সে হযরত জিবরাঈল (আঃ)-এর ঘোড়ার পায়ের থেকে গ্রহণ করেছিল। সুতরাং ঐ বাছুরের মধ্য থেকে গাভীর মত শব্দ বের হতে লাগলো। এ সবকিছুই হযরত মূসা (আঃ)-এর অনুপস্থিতির সময় ঘটেছিল। তূরে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে এই ফিৎনা সম্পর্কে অবহিত করেছিলেন। তাই মূসা (আঃ)-কে সম্বোধন করা হচ্ছে– হে মূসা! তোমার অনুপস্থিতির সুযোগে আমি তোমার কওমকে পরীক্ষায় ফেলেছি। অর্থাৎ সামেরী তাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছে! ঐ বাছুরটিকে রক্ত-মাংস দ্বারা তৈরী করা হয়েছিল এবং ওর মধ্য থেকে শব্দ বের হচ্ছিল, না কি ওটাকে সোনা দ্বারা তৈরী করা হয়েছিল এবং ওর মধ্যে বাতাস প্রবেশ করেছিল, ফলে ওর মধ্য

থেকে গাভীর শব্দ বের হচ্ছিল, এ ব্যাপারে তাফসীরকারকদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। কথিত আছে যে, ঐ বাছুরটিকে তৈরী করার পর যখন ওটা গাভীর মত শব্দ করতে শুরু করলো তখন জনগণ ওর চতুর্দিকে নাচতে নাচতে প্রদক্ষিণ করতে লাগলো এবং তারা বড় রকমের ফিৎনায় পতিত হলো। তারা পরস্পর বলাবলি করতে শুরু করলোঃ "এটাই আমাদের মা'বূদ এবং মূসারও (আঃ) মা'বূদ। মূসা (আঃ) ভুলের মধ্যে পতিত হয়েছেন।" তাই ইরশাদ হচ্ছে– "তারা কি এটুকুও বুঝে না যে, ওটা শব্দ করছে তাতে কি হয়েছে? ওটাতো তাদের কোন কথার উত্তর দিতে পারে না! না তাদের কোন উপকার করতে পারে, না কোন ক্ষতি করতে পারে!" সুতরাং অত্র আয়াতে আল্লাহ পাক বলেছেনঃ "তারা কি দেখেনি যে, ওটা তাদের সাথে কথা বলে না এবং তাদেরকে কোন পথও দেখায় না? তবুও তারা ওটাকে মা'বূদরূপে গ্রহণ করে নিলো, বস্তুতঃ তারা ছিল বড় অত্যাচারী।" তারা বাছুরকে মা'বূদরূপে গ্রহণ করার ফলে পথভ্রষ্ট হয়ে গেল এবং আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তাকেও ভুলে বসলো। তাদের অন্তরে অজ্ঞতা ও মূর্খতার পর্দা পড়ে গেছে। যেমন ইতিপূর্বে হযরত আবূ দারদা (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "কোন কিছুর মহব্বত তোমাদেরকে অন্ধ ও বধির করে ফেলবে।"[১] অতঃপর যখন তারা নিজেদের কর্মের উপর লজ্জিত হলো এবং বুঝতে পারলো যে, বাস্তবিকই তারা পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে তখন বলতে লাগলোঃ "যদি আল্লাহ আমাদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে আমাদেরকে ক্ষমা না করেন এবং দয়া না করেন তবে আমরা বড়ই ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বো ও ধ্বংস হয়ে যাবো।" যাহোক তারা নিজেদের পাপকে স্বীকার করে নিলো এবং অনুশোচনা করলো। কেউ কেউ য়্যারহামনা এর স্থলে ت দ্বারা তারহামনা ও য়্যাগফিরলানা এর স্থলে তাগফিরলানা পড়েছেন। এইভাবে رَبُّنَا কর্তা হওয়ার পরিবর্তে مُنَادٰى বা সম্বোধন হয়ে যাচ্ছে।

১৫০। আর মূসা (আঃ) রাগান্বিত বিক্ষুব্ধ অবস্থায় নিজ জাতির নিকট ফিরে এসে বললো– আমার চলে যাওয়ার পর তোমরা খুব খারাপভাবে আমার প্রতিনিধিত্ব করেছো, তোমরা

١٥٠- وَلَمَّا رَجَعَ مُوسٰىٓ اِلٰى قَوْمِهٖ غَضْبَانَ اَسِفًا ۙ قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُوْنِیْ مِنْۢ بَعْدِیْ ؕ

১. এটা ইমাম আহমাদ (রঃ) ও ইমাম আবূ দাউদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

اَعَجِلْتُمْ اَمْرَ رَبِّكُمْ وَاَلْقَى الْاَلْوَاحَ وَاَخَذَ بِرَاْسِ اَخِيْهِ يَجُرُّهٗ اِلَيْهِ قَالَ ابْنَ اُمَّ اِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُوْنِيْ وَكَادُوْا يَقْتُلُوْنَنِيْ فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْاَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِيْ مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ○

তোমাদের প্রভুর নির্দেশের পূর্বেই কেন তাড়াহুড়া করতে গেলে? অতঃপর সে ফলকগুলো ফেলে দিলো এবং স্বীয় ভ্রাতার মস্তক (চুল) ধরে নিজের দিকে টানতে লাগলো, সে (ভাই হারূন) বললো–হে আমার মাতার পুত্র! এই লোকগুলো আমাকে পরাভূত করে ফেলেছিল এবং আমাকে মেরে ফেলতে উদ্যত হয়েছিল, অতএব তুমি আমাকে শত্রু সমক্ষে হাস্যস্পদ করো না, আর এই যালিম লোকদের মধ্যে আমাকে গণ্য করো না।

١٥١- قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَلِاَخِيْ وَاَدْخِلْنَا فِيْ رَحْمَتِكَ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ○ ع ١٨

১৫১। তখন মূসা (আঃ) বললেন– হে আমার প্রভু! আমাকে ও আমার ভাইকে ক্ষমা করুন! আর আমাদেরকে আপনার রহমতের মধ্যে দাখিল করুন! আপনি সবচেয়ে বড় দয়াবান।

মূসা (আঃ) যখন আল্লাহ তা'আলার সাথে বাক্যালাপ করে স্বীয় কওমের নিকট ফিরে আসেন তখন তিনি ছিলেন অত্যন্ত রাগান্বিত ও ভারাক্রান্ত। অত্যন্ত ব্যথিত হৃদয়ে তিনি তাদেরকে সম্বোধন করে বললেনঃ "তোমাদের নিকট থেকে আমার বিদায়ের পর বাছুর-পূজায় লিপ্ত হয়ে তোমরা বাস্তবিকই অত্যন্ত অন্যায় ও মন্দ কাজ করেছো। তোমরা কি অতি তাড়াতাড়ি আল্লাহর শাস্তি ডেকে আনার ইচ্ছা করেছিলে? আর আল্লাহর বাক্যালাপ থেকে সরিয়ে আমাকে সত্বর ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিলে?" কিন্তু এটাই ছিল ভাগ্যের লিখন। কঠিন রাগের ভরে তিনি ফলকগুলো মাটিতে ছুঁড়ে ফেলেন এবং ভাই হারূন (আঃ)-এর মাথা ধরে নিজের

দিকে সজোরে টেনে আনেন। কথিত আছে যে, এই ফলকগুলো মূল্যবান পাথর ও মণি-মানিক্য দ্বারা নির্মিত ছিল। এই ঘটনাটি নিম্নের হাদীসটিকে প্রমাণিত করছে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ لَيْسَ الْخَبَرُ كَالْمُعَايَنَةِ অর্থাৎ "শ্রুত সংবাদ দৃশ্যের মত নয়।" আর প্রকাশ্য বচন হচ্ছে এই যে, হযরত মূসা (আঃ) ক্রোধান্বিত হয়ে ফলকগুলো কওমের সামনে নিক্ষেপ করেন। এটা হচ্ছে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী গুরুজনদের উক্তি। ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন যে, এই উক্তিটি গারীব বা দুর্বল। এর ইসনাদ বিশুদ্ধ নয়। অধিকাংশ আলিম বলেছেন যে, এটা প্রত্যাখ্যান করার যোগ্য। সম্ভবতঃ কোন আহ্লে কিতাবের যখীরা হতে কাতাদা (রঃ) এটা নকল করেছেন। আর আহলে কিতাবের মধ্যে তো মিথ্যাবাদী, বানানো কথার কথক এবং যিন্দীক বহু রয়েছে। হযরত মূসা (আঃ) যে স্বীয় ভ্রাতা হারূন (আঃ)-কে তাঁর মাথা ধরে টেনেছিলেন তার কারণ ছিল এই যে, তাঁর ধারণায় হারূন (আঃ) জনগণকে বাছুর পূজায় বাধা দেয়ার ব্যাপারে অবহেলা করেছিলেন। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে– "হে হারূন (আঃ)! তুমি যখন দেখলে যে, জনগণ এই গুমরাহী অবলম্বন করেছে তখন তোমাকে আমার নির্দেশের উপর চলতে কিসে বাধা দিয়েছে? আমার হুকুম অমান্য করার সাহস তুমি পেলে কোথায়?" তখন হারূন (আঃ) বলেছিলেনঃ "হে আমার মায়ের পুত্র! আমার দাড়ি বা মাথার চুল ধরে টেনো না, আমার এ ভয় তো ছিলই যে, তুমি না জানি বলবে–তুমি আমার জন্যে কেন অপেক্ষা করনি এবং বানী ইসরাঈলকে বিচ্ছিন্নতার মধ্যে কেন নিক্ষেপ করেছো? হে আমার ভাই! এ লোকগুলো আমার কোনই পরওয়া করেনি। তারা আমাকে দুর্বল মনে করেছিল। এমন কি তারা আমাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল। শত্রুদের সামনে তুমি আমাকে হাস্যস্পদ করো না এবং আমাকে এই অত্যাচারীদের মধ্যে গণ্য করো না।" 'হে আমার মায়ের পুত্র' হারূন (আঃ)-এর এ ভাষা প্রয়োগের উদ্দেশ্য ছিল হযরত মূসা (আঃ)-এর মনকে আকর্ষণ করা। যেন তাঁর প্রতি দয়ার উদ্রেক হয়। নচেৎ, তিনি পিতা ও মাতা উভয়ের দিক থেকেই তো মূসা (আঃ)-এর ভাই ছিলেন। যখন মূসা (আঃ)-এর কাছে তাঁর ভাই হারুন নির্দোষ প্রমাণিত হলেন তখন তিনি হারুন (আঃ)-কে ছেড়েছিলেন। ইরশাদ হয়েছে যে, হারূন পূর্বেই লোকদেরকে বলে দিয়েছিলেনঃ "হে লোকেরা! তোমরা ফিৎনায় পড়তে যাচ্ছ। তোমাদের মা'বূদ গো-বৎস নয়, বরং মা'বূদ হচ্ছেন রহমান (আল্লাহ)। তোমরা আমাকেই অনুসরণ কর এবং আমার কথা মেনে চল।" এ জন্যেই মূসা (আঃ) বলেছিলেনঃ "হে আমার প্রভু! আমাকে ও আমার ভাইকে ক্ষমা করে দিন। আমাদের উভয়কে

আপনার রহমতের ছায়াতলে আশ্রয় দান করুন। আপনি হচ্ছেন সবচেয়ে বড় দয়ালু।" রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "আল্লাহ তা'আলা মূসা (আঃ)-এর উপর দয়া করেন। দর্শকের কথা ও শ্রোতার কথা পৃথক হয়ে থাকে। মহা মহিমান্বিত আল্লাহ মূসা (আঃ)-কে সংবাদ দিয়েছিলেন– "তোমার অনুপস্থিতির সুযোগে তোমার কওম শির্কের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছে।" একথা শুনে তিনি ফলকগুলো নিক্ষেপ করেননি। কিন্তু যখন তিনি স্বচক্ষে তাদেরকে শির্কের মধ্যে জড়িয়ে পড়তে দেখলেন তখন তিনি ক্রোধভরে ফলকগুলো ছুঁড়ে ফেললেন।"[১]

১৫২-إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَكَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ ○

১৫২। (উত্তরে বলা হলো) যারা গো-বৎসকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছে, অবশ্যই তারা এই পার্থিব জীবনে তাদের প্রতিপালকের গযব ও লাঞ্ছনায় নিপতিত হবে, মিথ্যা রচনাকারীদেরকে আমি এভাবেই প্রতিফল দিয়ে থাকি।

১৫৩-وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّاٰتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَاٰمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ○

১৫৩। যারা খারাপ কাজ করে, এরপর তাওবা করে ও ঈমান আনে (তাদের আশান্বিত হওয়া উচিত, কেননা) আল্লাহ এর পরেও ক্ষমাশীল ও দয়াশীল (হতে পারেন)।

গো-বৎস পূজার শাস্তিস্বরূপ বানী ইসরাঈলের উপর যে গযব নাযিল হয়েছিল তা ছিল এই যে, তাদের তাওবা ঐ পর্যন্ত কবূল হবে না যে পর্যন্ত না তারা আল্লাহর নির্দেশক্রমে পরস্পর একে অপরকে হত্যা করে ফেলে। যেমন সূরায়ে বাকারায় বলা হয়েছে– "তোমরা আল্লাহর বারগাহে এই তাওবা পেশ কর যে, তোমরা পরস্পর একে অপরকে হত্যা করে ফেল। আল্লাহ জানেন যে, এতেই তোমাদের মঙ্গল নিহিত রয়েছে। যখন তারা এরূপ করলো তখন তাদের তাওবা কবূল করে নেয়া হলো। তিনি তো হচ্ছেন দয়ালু প্রভু। কিন্তু দুনিয়ায় তারা লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবে।"

১. এ হাদীসটি ইবনে আবি হাতিম (রঃ) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে মারফূ'রূপে বর্ণনা করেছেন।

وَكَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُفْتَرِيْنَ অর্থাৎ 'মিথ্যা রচনাকারীদেরকে আমি এভাবেই প্রতিফল দিয়ে থাকি।' এই অপমান ও লাঞ্ছনা প্রত্যেক মিথ্যা রচনাকারীর জন্যে কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। সুফইয়ান ইবনে উয়াইনা (রঃ) বলেন যে, প্রত্যেক বিদআতপন্থী এভাবেই অপমানিত হবে। যে বিদআত বের করবে সে এই শাস্তিই পাবে। রাসূল (সঃ)-এর বিরোধিতা এবং বিদআতের বোঝা তার অন্তর থেকে বের হয়ে তার স্কন্ধের উপর এসে পড়বে। হাসান বসরী (রঃ) বলেন যে, সে পার্থিব জগতে জাঁকজমকপূর্ণ অবস্থায় অবস্থান করলেও তার চেহারায় অপমানের ছাপ লেগে যাবে। মিথ্যা রচনাকারী কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এ শাস্তি পেতে থাকবে।

আল্লাহ তা'আলা হচ্ছেন তাওবা কবূলকারী। যত বড়ই পাপী হোক না কেন, তাওবার পর আল্লাহ পাক সেই পাপীকে ক্ষমা করে দেবেন। যদি কেউ কুফরী, শিরক ও নিফাকের কাজও করে, অতঃপর আন্তরিকতার সাথে তাওবা করে তবে সেই পাপও আল্লাহ ক্ষমা করে দেবেন।

ইরশাদ হচ্ছে–যে ব্যক্তি পাপ কার্যে লিপ্ত হওয়ার পর তাওবা করে এবং ঈমান আনয়ন করে, হে রহমতের রাসূল (সঃ)! জেনে রেখো যে, এর পরেও তোমার প্রতিপালককে তুমি ক্ষমাশীল ও দয়ালু পাবে। হযরত ইবনে মাসঊদ (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, একটি লোক কোন একটি মহিলার সাথে ব্যভিচার করলো, অতঃপর তাকে সে বিয়ে করে নিলো, এর কি হবে? উত্তরে তিনি এ আয়াতটিই পাঠ করলেনঃ "যারা খারাপ কাজ করে, এরপর তাওবা করে ও ঈমান আনে (তাদের আশান্বিত হওয়া উচিত যে,) আল্লাহ এর পরেও ক্ষমাশীল ও দয়ালু (হতে পারেন)।" হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) দশবার এই আয়াতটি পাঠ করেন। তিনি তাদেরকে এর নির্দেশও দিলেন না এবং তা থেকে নিষেধও করলেন না।[১]

১৫৪। মূসা (আঃ)-এর ক্রোধ যখন প্রশমিত হলো তখন সে প্রস্তর ফলকগুলো তুলে নিলো, যারা তাদের প্রতিপালকের ভয় করে তাদের জন্যে তাতে যা লিখিত ছিল তা ছিল পথ নির্দেশ ও করুণা (বাণী)।

١٥٤- وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُّوْسَى الْغَضَبُ اَخَذَ الْاَلْوَاحَ وَفِىْ نُسْخَتِهَا هُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلَّذِيْنَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُوْنَ ۝

১. এ হাদীসটিও ইবনে আবি হাতিম (রঃ) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন।

সূচীপত্র

আল্লাহ পাক বলেন যে, যখন হযরত মূসা (আঃ)-এর ক্রোধ প্রশমিত হলো তখন তিনি প্রস্তর ফলকগুলো উঠিয়ে নিলেন যেগুলো তিনি কঠিন ক্রোধের কারণে ছুঁড়ে ফেলেছিলেন। তাঁর এ কাজটা ছিল মূর্তিপূজার প্রতি ঘৃণা ও ক্রোধের কারণে। ইরশাদ হচ্ছে– এর মধ্যে হিদায়াত ও রহমত ছিল ঐ লোকদের জন্যে যারা তাদের প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করে। অধিকাংশ মুফাস্সির বলেন যে, যখন তিনি ওগুলো নিক্ষেপ করেছিলেন তখন সেগুলো ভেঙ্গে গিয়েছিল। তারপর তিনি সেগুলো একত্রিত করেছিলেন। এর উপর ভিত্তি করেই পূর্ববর্তী কোন কোন গুরুজন বলেন যে, ঐ ভাঙ্গা ফলকগুলোতে হিদায়াত ও রহমতের আহকাম লিপিবদ্ধ ছিল। কিন্তু তফসীল সম্পর্কিত আহকাম নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ধারণা করা হয় যে, ইসরাঈলী বাদশাহদের পুস্তকাগারে ইসলামী শাসনের যুগ পর্যন্ত এই খণ্ডগুলো বিদ্যমান ছিল। আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক জ্ঞানের অধিকারী। কিন্তু এ কথার উপর স্পষ্ট দলীল রয়েছে যে, ছুঁড়ে ফেলার কারণে ঐ প্রস্তর ফলকগুলো ভেঙ্গে গিয়েছিল। এ ফলকগুলো জান্নাতের মূল্যবান পাথর দ্বারা নির্মিত ছিল। আল্লাহ পাক খবর দেন যে, যখন মূসা (আঃ) ওগুলো উঠিয়ে নেন তখন তিনি ওতে হিদায়াত ও রহমত প্রাপ্ত হন। رَهْبَتٌ -এর অর্থ হচ্ছে বিনয় ও নম্রতা। أَخَذَ الْاَلْوَاحَ -এর সম্পর্কে কাতাদা (রঃ) বলেন যে, হযরত মূসা (আঃ) বলেনঃ "হে আমার প্রতিপালক! আমি ফলকগুলোতে লিখিত পাচ্ছি যে, একটি সর্বোত্তম উম্মত হবে যারা সদা সর্বদা মানুষকে ভাল কাজের আদেশ করবে এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখবে। হে আমার প্রভু! ওদেরকে আমার উম্মত করুন!" আল্লাহ তা'আলা বললেনঃ "হে মূসা (আঃ)! এটা তো আহমাদ (সঃ)-এর উম্মত হবে।" পুনরায় মূসা (আঃ) বললেনঃ "হে আমার প্রভু! এই ফলকগুলোর মধ্যে এমন এক উম্মতকে দেখতে পাচ্ছি যারা সর্বশেষে আসবে কিন্তু সকলের পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে। হে আমার প্রভু! ওদেরকে আমার উম্মত করুন।" আল্লাহ তা'আলা বললেনঃ "ওরা হচ্ছে আহমাদ (সঃ)-এর উম্মত!" মূসা (আঃ) আবার বললেনঃ "হে আমার প্রভু! এই ফলকগুলোর মধ্যে এমন উম্মতকে দেখতে পাচ্ছি যাদের অন্তরে কুরআন থাকবে, অন্তর্চক্ষে তারা তা পাঠ করবে। অথচ তাদের পূর্ববর্তী সকল লোক তাদের কিতাব অন্তর্চক্ষে পাঠ করে না, এমন কি যদি তাদের কিতাবকে তাদের থেকে সরিয়ে নেয়া হয় তবে তাদের কিছুই স্মরণ থাকে না এবং কিছুই চিনতে পারে না। আল্লাহ এই উম্মতকে এমন স্মরণশক্তি দান করেছেন যা তিনি অন্য কোন উম্মতকে দান করেননি। হে আমার প্রতিপালক! এদেরকে আমারই উম্মত করুন।" আল্লাহ তা'আলা বললেনঃ "হে মূসা (আঃ)!

এটা তো আহমাদ (সঃ)-এর উম্মত হবে।" মূসা (আঃ) পুনরায় বললেনঃ "হে আমার প্রভু! ঐ উম্মত আপনার প্রত্যেক কিতাবের উপর ঈমান আনবে, তারা পথভ্রষ্ট ও কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করবে। এমন কি তারা কানা দাজ্জালের সাথেও যুদ্ধ করবে। হে আমার মা'বূদ! এদেরকে আমার উম্মত করুন!" আল্লাহ বললেনঃ "এরা হবে আহমাদ (সঃ)-এর উম্মত।" মূসা (আঃ) আবার বললেনঃ "হে আল্লাহ! এই ফলকগুলোতে এমন উম্মতের উল্লেখ রয়েছে যারা তাদের নযরানা ও সাদকা নিজেরাই খেতে পাবে। অথচ এই উম্মতের পূর্ববর্তী উম্মতবর্গের এই অবস্থা ছিল যে, তারা কোন সাদকা বা নযর পেশ করলে তা যদি কবূল হতো তবে আল্লাহ প্রেরিত আগুনে তা খেয়ে ফেলতো। আর কবূল না হলেও তারা তা খেতে পারতো না, বরং পশু পাখী এসে তা খেয়ে ফেলতো। ফলকের মধ্যে উল্লিখিত উম্মতের ধনী লোকদের নিকট থেকে সাদকা আদায় করে তা গরীবদের মধ্যে বন্টিত হবে। হে আল্লাহ! এদেরকে আমারই উম্মত করুন!" আল্লাহ বললেনঃ "এরা হবে আহমাদ (সঃ)-এর উম্মত।" হযরত মূসা (আঃ) পুনরায় আরয করলেনঃ "হে আমার প্রতিপালক! আমি এই ফলকগুলোর মধ্যে এমন উম্মত পাচ্ছি যে, তারা যদি কোন ভাল কাজের ইচ্ছা করে কিন্তু কার্যে পরিণত করতে না পারে তবুও তাদেরকে একটা পুণ্য দেয়া হবে। আর যদি কার্যে পরিণত করতে পারে তবে দশটি পুণ্য তাদেরকে প্রদান করা হবে, এমন কি তা বৃদ্ধি পেতে পেতে সাতশ' পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। হে আল্লাহ! এদেরকে আমার উম্মত করুন!" আল্লাহ বললেনঃ "তারা আহমাদ (সঃ)-এর উম্মত হবে।" আবার হযরত মূসা (আঃ) বললেনঃ "হে আমার প্রভু! ফলকগুলোর মধ্যে এমন উম্মত দেখা যাচ্ছে যারা অন্যদের জন্যে সুপারিশ করবে এবং অন্যদের পক্ষ থেকেও তাদের জন্যে সুপারিশ করা হবে। হে আল্লাহ! এদেরকে আমারই উম্মত করুন।" আল্লাহ বলেনঃ "না, বরং তারা হবে আহমাদ (সঃ)-এর উম্মত।" কাতাদা (রঃ) বলেন যে, মূসা (আঃ) তখন প্রস্তর ফলকগুলো রেখে দিলেন এবং বললেনঃ "হে আল্লাহ! আমাকে আহমাদ (সঃ)-এর উম্মতের অন্তর্ভুক্ত করে নিন।"

১৫৫। মূসা (আঃ) তার সম্প্রদায় হতে সত্তরজন নেতৃস্থানীয় লোক আমার নির্ধারিত স্থানে সমবেত হওয়ার জন্যে নির্বাচন করে নিলো, যখন এই লোকগুলো একটি কঠিন ভূকম্পনে আক্রান্ত হলো তখন

١٥٥- وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِّمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ

لَوْشِئْتَ اَهْلَكْتَهُمْ مِّنْ قَبْلُ وَاِيَّايَ اَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا اِنْ هِيَ اِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِيْ مَنْ تَشَاءُ اَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْلَنَا وَارْحَمْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الْغٰفِرِيْنَ۝

মূসা (আঃ) বললো—হে আমার প্রতিপালক! আপনি ইচ্ছা করলে এর পূর্বেও ওদেরকে ও আমাকে নিপাত করতে পারতেন, আমাদের মধ্যকার কতক নির্বোধ লোকের অন্যায়ের কারণে কি আপনি আমাদেরকে নিপাত করবেন? সেই অন্যায় কাজ তো ছিল আপনার পরীক্ষা, যা দ্বারা আপনি যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন এবং যাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন, আপনিই তো আমাদের অভিভাবক, সুতরাং আপনি আমাদেরকে ক্ষমা করুন, এবং আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করুন, ক্ষমাশীলদের মধ্যে আপনিই তো উত্তম ক্ষমাশীল।

١٥٦- وَاكْتُبْ لَنَا فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاٰخِرَةِ اِنَّا هُدْنَا اِلَيْكَ

১৫৬। অতএব, আমাদের জন্যে এই দুনিয়ায় ও পরকালের কল্যাণ নির্ধারিত করে দিন, আমরা আপনার নিকটই প্রত্যাবর্তন করেছি।

আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আঃ)-কে সত্তরজন লোক নির্বাচন করার অধিকার দিয়েছিলেন। সুতরাং মূসা (আঃ) এরূপ সত্তরজন লোক নির্বাচন করে তাদেরকে নিয়ে আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করার জন্যে রওয়ানা হন। কিন্তু যখন তারা আল্লাহর কাছে দু'আ করলো তখন নিম্নরূপ কথা বললোঃ

"হে আল্লাহ! আমাদেরকে এমন কিছু দান করুন যা আপনি ইতিপূর্বে কাউকে দান করেননি এবং না আমাদের পরে কাউকেও দান করবেন।" তাদের এই প্রার্থনা আল্লাহ তা'আলার কাছে পছন্দনীয় হলো না। সুতরাং ভূমিকম্প তাদেরকে

ঘিরে ফেললো। সুদ্দী (রঃ) বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আঃ)-কে এমন ত্রিশজনসহ আসতে বলেছিলেন যারা গো-বৎস পূজার কারণে ক্ষমা প্রার্থনা করেছিল এবং দু'আর জন্যে একটা সময় ও স্থান নির্ধারণ করেছিল। মূসা (আঃ) সত্তরজন লোক নির্বাচন করলেন, যাদেরকে নিয়ে তিনি ক্ষমা প্রার্থনার জন্যে বের হলেন। কিন্তু যখন তিনি তাদেরকে নিয়ে অঙ্গীকার স্থলে পৌঁছলেন তখন তারা তাকে বললোঃ "হে মূসা (আঃ)! আমরা যে পর্যন্ত না আল্লাহকে স্বচক্ষে দেখবো সেই পর্যন্ত আমরা ঈমান আনবো না। আপনি আল্লাহর সাথে কথা বলেছেন। এখন আমাদেরকে দেখিয়ে দিন।" এই আস্পর্দ্ধামূলক কথার শাস্তি হিসেবে তাদের উপর বিদ্যুত পতিত হলো এবং সবাই ওখানে মরে পড়ে থাকলো। হযরত মূসা (আঃ) ক্রন্দনরত অবস্থায় উঠে আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা জানিয়ে বললেনঃ "হে আমার প্রভু! আমি এখন বানী ইসরাঈলের কাছে ফিরে গিয়ে তাদেরকে কি জবাব দেবো? এরা তো তাদের মধ্যে ভাল লোক ছিল, আপনি তাদেরকেও ধ্বংস করে দিলেন। হে আল্লাহ! যদি আপনি তাদের সাথে আমাকেও ধ্বংস করে দিতেন।"[১]

হযরত মূসা (আঃ) বানী ইসরাঈলের মধ্য থেকে সত্তরজন খুবই ভাল লোককে বেছে নিয়েছিলেন এবং তাদেরকে বলেছিলেনঃ "চল, আল্লাহর কাছে যাই। তোমরা কওমের অবশিষ্ট লোকদের পক্ষ থেকে তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। তোমরা তাওবা কর, রোযা রাখ এবং শরীর ও কাপড় পবিত্র করে নাও।" অতঃপর তিনি নির্ধারিত দিনে তাদেরকে নিয়ে তূরে সাইনার দিকে চললেন। এর সবকিছুই আল্লাহর অবগতি ও অনুমতিক্রমে হয়েছিল। এখন এই সত্তরজন লোক যারা মূসা (আঃ)-এর পরিচালনাধীনে আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে এসেছিল তারা বললোঃ "হে মূসা (আঃ)! আল্লাহর সাথে আপনার বাক্যালাপ হয়ে থাকে, আমাদেরকে তা শুনতে দিন।" হযরত মূসা (আঃ) বললেনঃ "আচ্ছা, ঠিক আছে।" অতঃপর যখন হযরত মূসা (আঃ) পাহাড়ের নিকটবর্তী হলেন তখন তিনি একটা অত্যন্ত ঘন মেঘখণ্ডের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। পাহাড়টিও মেঘের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। হযরত মূসা (আঃ) মেঘের মধ্যে ঢুকে পড়লেন এবং তাঁর লোকগুলোকে বললেনঃ "তোমরাও আমার নিকটবর্তী হয়ে যাও।" মূসা (আঃ) যখন আল্লাহ তা'আলার সাথে কথা বলতেন তখন তাঁর মুখমণ্ডল এমন আলোকোজ্জ্বল হয়ে উঠতো যে, কেউই তাঁর চেহারার প্রতি দৃষ্টি রাখতে পারতো না। এজন্যে তিনি স্বীয় চেহারার উপর পর্দা ফেলে দিতেন। ঐলোকগুলো যখন

১. হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও কোন কোন পূর্ববর্তী গুরুজন হতে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

মেঘখণ্ডের নিকটে এসে ওর মধ্যে প্রবেশ করলো তখন তারা সিজদায় পড়ে গেল। তারা মূসা (আঃ) ও আল্লাহর কথা শুনতে লাগলো। তিনি মূসা (আঃ)-কে আদেশ ও নিষেধ করে বলেছিলেনঃ "এটা কর এবং ওটা করো না।" যখন তিনি ওটা থেকে মুক্ত হলেন এবং মেঘ সরে গেল তখন তিনি ঐ লোকদের দিকে মনঃসংযোগ করলেন। তারা তাঁকে বললোঃ "হে মূসা (আঃ)! যে পর্যন্ত না আপনি আমাদেরকে প্রকাশ্যভাবে আল্লাহকে দেখাবেন সে পর্যন্ত আমরা আপনার প্রতি ঈমান আনবো না।" তাদের এই ঔদ্ধত্যের কারণে বিজলী তাদেরকে পাকড়াও করলো। তাদের প্রাণপাখী দেহ থেকে বেরিয়ে গেল। তারা মৃত অবস্থায় পড়ে রইলো। এ দেখে হযরত মূসা (আঃ) বিলাপের সুরে বলতে লাগলেনঃ "হে আল্লাহ! আপনি যখন এদেরকে ধ্বংস করারই ইচ্ছে করেছিলেন তখন তাদের সাথে আমাকেও ধ্বংস করলেন না কেন? এরা বোকামীর কাজ করেছে। আমার পিছনে আপনি কি বানী ইসরাঈলকে ধ্বংস করে দিবেন?"

হযরত আলী ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, মূসা (আঃ), হারূন (আঃ), শাবর ও শাবীর প্রমুখ মিলে এক পাহাড়ের উপত্যকার দিকে গেলেন। হারূন (আঃ) একটি টিলার উপর দাঁড়িয়ে ছিলেন এমতাবস্থায় আল্লাহ তা'আলা তাঁকে মৃত্যু দান করেন। মূসা (আঃ) বানী ইসরাঈলের নিকট প্রত্যাবর্তন করলে তারা তাঁকে হারূন (আঃ) সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করে। মূসা (আঃ) উত্তরে বলেন যে, তিনি মারা গেছেন। তারা তখন বলে– "না, বরং সম্ভবতঃ আপনিই তাঁকে মেরে ফেলেছেন। তিনি অত্যন্ত নরম প্রকৃতির লোক ছিলেন।" মূসা (আঃ) তখন তাদেরকে বললেনঃ "আচ্ছা, তোমরা তোমাদের মধ্য থেকে কিছু লোক বেছে নাও।" তারা সত্তরজন লোক নির্বাচন করলো। অতঃপর তারা হারূন (আঃ)-এর মৃতদেহের নিকট গেল এবং জিজ্ঞেস করলোঃ "আচ্ছা বলুন তো আপনাকে কে হত্যা করেছে?" হারূন (আঃ)-এর মৃতদেহ থেকে শব্দ আসলোঃ "আমাকে কেউই হত্যা করেনি। আমি স্বাভাবিকভাবেই মৃত্যুবরণ করেছি।" লোকগুলো তখন বললোঃ "হে মূসা (আঃ)! এরপরে আর কখনো আমরা আপনার অবাধ্য হবো না।" তারা শাস্তি এই পেলো যে, বিদ্যুৎ তাদেরকে ধ্বংস করে দিলো। হযরত মূসা (আঃ) বিনা কারণে ডানে বামে ঘুরতেন এবং বলতেনঃ "হে আল্লাহ! আপনি কি এই বোকা লোকদের কথায় আমাদেরকে ধ্বংস করে দিবেন? এটা তো আপনার পরীক্ষা ছিল। আপনি যাকে চান পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে চান হিদায়াত দান করেন।" আল্লাহ তা'আলা তখন তাদের সকলকেই জীবিত করে দিলেন এবং সকলকেই নবী করলেন। এটা হচ্ছে অত্যন্ত গারীব ও অবিশ্বাসযোগ্য হাদীস। এই হাদীসের বর্ণনাকারীদের মধ্যে আম্মারা

ইবনে উবাইদ নামক একজন বর্ণনাকারী রয়েছেন। তিনি হচ্ছেন সম্পূর্ণরূপে অপরিচিত ব্যক্তি। ইবনে জারীর (রঃ) বলেনঃ "ঐ লোকগুলোর উপর শাস্তি অবতীর্ণ হওয়ার কারণ ছিল এই যে, তাদের সামনে গো-বৎসের পূজা চলছিল, অথচ তারা নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছিল। তাদের কওমকে তারা ঐ শিরকের কাজ থেকে নিষেধ পর্যন্ত করেনি।" এই জন্যেই হযরত মূসা (আঃ) তাদেরকে নির্বোধ নামে অভিহিত করেছেন। তাদের ব্যাপারে তিনি বলেছিলেনঃ "হে আল্লাহ! এটা আপনার একটা পরীক্ষা।" নিম্নরূপে তিনি আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা ও গুণকীর্তন করেছিলেনঃ

"হে আল্লাহ! এটাতো আপনার পক্ষ থেকে একটা পরীক্ষা। একমাত্র আপনারই হুকুম চলে থাকে। আপনি যা চান তাই হয়। হিদায়াত দান ও পথভ্রষ্টকরণ আপনারই হাতে। আপনি যাকে সুপথ প্রদর্শন করেন তাকে কেউ কুপথ দেখাতে পারে না। আপনি যাকে দান থেকে বিমুখ করেন তাকে কেউ দান করতে পারে না। পক্ষান্তরে আপনি যাকে দান করেন তা তার থেকে কেউ ছিনিয়ে নিতে পারে না। রাজ্যের মালিক আপনিই। হুকুম দেয়ার অধিকার একমাত্র আপনারই রয়েছে। খাল্‌ক ও আমর আপনার পক্ষ থেকেই হয়ে থাকে।"

এরপর মূসা (আঃ) আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করেনঃ "হে আল্লাহ! আপনিই আমাদের অলী বা অভিভাবক। সুতরাং আমাদেরকে ক্ষমা করে দিন ও আমাদের উপর দয়া করুন। কেননা, আপনিই তো হচ্ছেন সর্বোত্তম ক্ষমাশীল।"

غُفْرٌ শব্দের অর্থ হচ্ছে ঢেকে ফেলা, গোপন করা এবং পাপের কারণে পাকড়াও না করা। আর غُفْرَانٌ এর সঙ্গে যখন رَحْمَةٌ যুক্ত হয় তখন ভাবার্থ হয় ক্ষমা করে দেয়ার পর আল্লাহ তা'আলার তাকে আগামীতে পুনরায় পাপে জড়িত না করা।

"হে আল্লাহ! আমাদের জন্যে এই দুনিয়াতেও কল্যাণ নির্ধারিত করে দিন এবং আখেরাতেও কল্যাণ নির্ধারিত করুন।" حَسَنَةٌ -এর তাফসীর সূরায়ে বাকারায় হয়ে গেছে। "আমরা তাওবা করেছি এবং আপনার নিকটই প্রত্যাবর্তন করেছি।" হযরত আলী (রাঃ) বলেন যে, বানী ইসরাঈল هُدْنَا اِلَيْكَ বলেছিল বলেই তাদের নাম ইয়াহূদী হয়ে গেছে।[১]

১. এটা ইবনে জারীর তাখরীজ করেছেন। ইবনে কাসীর (রঃ) বলেন যে, এর জাবীর আলজাফী নামক বর্ণনাকারী দুর্বল।

তিনি (আল্লাহ) বললেন– যাকে ইচ্ছা আমি আমার শাস্তি দিয়ে থাকি, আর আমার করুণা ও দয়া প্রতিটি জিনিসকেই পরিব্যাপ্ত করে রয়েছে, সুতরাং কল্যাণ আমি তাদের জন্যেই অবধারিত করবো যারা পাপাচার হতে বিরত থাকে, যাকাত দেয় এবং আমার নিদর্শন সমূহের প্রতি ঈমান আনয়ন করে।

قَالَ عَذَابِيْٓ اُصِيْبُ بِهٖ مَنْ اَشَآءُ وَرَحْمَتِيْ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَاَكْتُبُهَا لِلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِاٰيٰتِنَا يُؤْمِنُوْنَ

মূসা (আঃ) বলেছিলেনঃ 'হে আল্লাহ! এটা আপনার পরীক্ষা।' তাই ইরশাদ হচ্ছে– শাস্তি সেই পায় যাকে শাস্তি দেয়ার আমি ইচ্ছা করি এবং মনে করি যে, তার শাস্তি হওয়াই উচিত। নচেৎ, আমার করুণা তো প্রতিটি জিনিসকেই পরিব্যাপ্ত করে রয়েছে। আমি যা চাই তাই করি। প্রতিটি কাজে নিপুণতা ও ন্যায় পরায়ণতার অধিকার আমারই। রহমতযুক্ত আয়াত খুবই বিরাট ও ব্যাপক এবং সবই এর অন্তর্ভুক্ত। যেমন আরশ বহনকারী ফেরেশতাদের মুখে উচ্চারিত হয়– "হে আমাদের প্রভু! আপনার করুণা ও জ্ঞান সব কিছুকেই পরিব্যাপ্ত করে রয়েছে।"

জুনদুব ইবনে আবদিল্লাহ আল বাজালী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, একজন বেদুইন আসলো। সে তার উটটি বসিয়ে বাঁধলো। অতঃপর সে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর পিছনে নামায পড়লো। নামায শেষে উষ্ট্রীটিকে খুলে সে ওর উপর সওয়ার হলো এবং দুআ' করতে লাগলোঃ "হে আল্লাহ! আপনি আমার উপর ও মুহাম্মাদ (সঃ)-এর উপর দয়া করুন। এই দয়ায় আপনি অন্য কাউকেও শরীক করবেন না।" তার একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সঃ) সাহাবীগণকে বললেনঃ "আচ্ছা বলতো, এই লোকটি বেশী পথভ্রষ্ট ও নির্বোধ, না তার উটটি? সে যা বলছে তা তোমরা শুনেছো কি?" সাহাবীগণ বললেনঃ 'হ্যাঁ শুনেছি।' তিনি বললেনঃ "আল্লাহর রহমত অতি প্রশস্ত। তিনি স্বীয় রহমতকে একশ' ভাগে ভাগ করেছেন। এক ভাগ তিনি সমস্ত মাখলূকের মধ্যে বন্টন করে দিয়েছেন। দানব, মানব এবং চতুষ্পদ জন্তু সবাই এই অংশ থেকেই অংশ পেয়েছে। বাকী

নিরানব্বই ভাগ তিনি নিজের জন্যে নির্দিষ্ট রেখেছেন। এখন বল তো, এই উভয়ের মধ্যে কে বেশী নির্বোধ?"[১]

হযরত সালমান (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ "আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রহমতকে একশ' ভাগে ভাগ করেছেন। এই একশ' ভাগের মধ্যে মাত্র এক ভাগ তিনি দুনিয়ায় অবতীর্ণ করেছেন। এই এক ভাগ দেয়ার কারণেই সৃষ্টজীব একে অপরের উপর করুণা ও মমতা দেখিয়ে থাকে। এ কারণেই সমস্ত প্রাণী নিজেদের সন্তান ও বাচ্চাদের উপর স্নেহ ও দয়া প্রদর্শন করে থাকে। বাকী নিরানব্বই ভাগ করুণা তাঁর কাছেই রয়েছে। এগুলোর প্রকাশ কিয়ামতের দিন ঘটবে। কিয়ামতের দিন এই একভাগ করুণার সাথে সঞ্চিত নিরানব্বই ভাগ করুণা মিলিয়ে দেয়া হবে।"

আবূ সাঈদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "আল্লাহর একশ' ভাগ রহমত রয়েছে। এর মধ্যে মাত্র এক ভাগ মাখলূকের মধ্যে বন্টন করে দিয়েছেন। এর দ্বারাই মানুষ, বন্য পশু এবং পাখী একে অপরের উপর দয়া দেখিয়ে থাকে।[২] আল্লাহর শপথ! ধর্মের দিক দিয়ে যে ব্যক্তি পাপী এবং জীবিকা উপার্জনের দিক দিয়ে যে ব্যক্তি নির্বোধ সেও এর অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহর কসম! ঐ ব্যক্তিও জান্নাতে প্রবেশ করবে যাকে পাপের কারণে আগুন পরিবেষ্টন করেছে। তাঁর রহমত কিয়ামতের দিন এমনভাবে ছেয়ে যাবে যে, ইবলীসও তার থেকে কিছু অংশ পাওয়ার আশা পোষণ করবে।"[৩]

আল্লাহ পাক বলেনঃ ঐ ব্যক্তিই আমার রহমতের হকদার হবে, যে আমাকে ভয় করে ও পরহেজগারী অবলম্বন করে। যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেনঃ "তোমার প্রভু নিজের জন্যে রহমতকে ফরয করে নিয়েছেন।"

'তারা তাকওয়া অবলম্বন করে' অর্থাৎ শির্ক ও কাবীরা গোনাহ থেকে বেঁচে থাকে। আর 'তারা যাকাত প্রদান করে।' বলা হয়েছে যে, এখানে যাকাত দ্বারা নফ্সের যাকাত বুঝানো অথবা মালের যাকাত বুঝানো হয়েছে কিংবা দু'টোকেই বুঝানো হয়েছে। কেননা, এটা হচ্ছে মক্কী আয়াত।

'তারা আমার আয়াত সমূহের প্রতি ঈমান আনয়ন করে' অর্থাৎ ওগুলোর সত্যতা স্বীকার করে।

১. এ হাদীসটি ইমাম আবূ দাউদ (রঃ) ও ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।
২. এ হাদীসটি ইমাম ইবনে মাজাহ্ (রঃ) ও ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।
৩. এ হাদীসটি অত্যন্ত গারীব। সা'দ নামক এর একজন বর্ণনাকারী অপরিচিত ব্যক্তি।

١٥٧- اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِيَّ الْاُمِّيَّ الَّذِيْ يَجِدُوْنَهٗ مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرٰىةِ وَالْاِنْجِيْلِ يَاْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهٰىهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰٓئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَالْاَغْلٰلَ الَّتِيْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ ؕ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِهٖ وَعَزَّرُوْهُ وَنَصَرُوْهُ وَاتَّبَعُوا النُّوْرَ الَّذِيْۤ اُنْزِلَ مَعَهٗۤ ۙ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۠ ع

১৫৭। (এই কল্যাণ তাদেরই প্রাপ্য) যারা সেই নিরক্ষর রাসূল নবী (সঃ)-এর অনুসরণ করে চলে যার কথা তারা তাদের নিকট রক্ষিত তাওরাত ও ইঞ্জীল কিতাবে লিখিত পায়, (সেই নিরক্ষর নবী সঃ) মানুষকে সৎকাজের নির্দেশ দেয় ও অন্যায় কাজ করতে নিষেধ করে, আর সে তাদের জন্যে পবিত্র বস্তুসমূহ বৈধ করে দেয় এবং অপবিত্র ও খারাপ বস্তুকে তাদের প্রতি অবৈধ করে, আর তাদের উপর চাপানো বোঝা ও বন্ধন হতে তাদেরকে মুক্ত করে, সুতরাং তাঁর প্রতি যারা ঈমান রাখে, তাঁকে সম্মান করে ও সাহায্য সহানুভূতি করে, আর সেই আলোককে অনুসরণ করে চলে যা তাঁর সাথে অবতীর্ণ করা হয়েছে, তারাই (ইহকাল ও পরকালে) সাফল্য লাভ করবে।

যারা নিরক্ষর নবী (সঃ)-এর অনুসরণ করে এবং মুসলমান হয়, তারা সেই ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে সম্যক অবগত যে ভবিষ্যদ্বাণী তাদের কিতাব তাওরাত ও ইঞ্জীলে নবী উম্মী (সঃ) সম্পর্কে করা হয়েছে। নবীদের গ্রন্থসমূহে নবী (সঃ)-এর গুণাবলী উল্লিখিত আছে। ঐসব গ্রন্থে নবীগণ নিজ নিজ উম্মতকে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নবুওয়াতের সুসংবাদ প্রদান করেছেন এবং তাঁর মাযহাব গ্রহণ করার হিদায়াত করে গেছেন। তাঁদের আলেমগণ ও ধর্মযাজকগণ তা অবগত আছেন।

মুসনাদে আহমাদে রয়েছে যে, একজন বেদুইন বর্ণনা করেছে, নবী (সঃ)-এর যুগে একবার আমি দুধ বিক্রি করার উদ্দেশ্যে মদীনায় গমন করি। বিক্রি শেষে আমি মনে মনে বলি, মুহাম্মাদ (সঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করেই নেই এবং তাঁর মুখের কিছু বাণী শুনাই যাক। আমি দেখি যে, হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) হযরত আবূ বকর ও হযরত উমার (রাঃ)-এর সাথে কোথায় যেন যাচ্ছেন। আমিও তাঁদের পিছু পিছু চললাম। তাঁরা তিনজন এমন এক ইয়াহূদীর বাড়ীতে পৌঁছলেন যে তাওরাতের জ্ঞান রাখতো। তার ছেলে মৃত্যুশয্যায় শায়িত ছিল। ছেলেটি ছিল নব যুবক এবং সৌন্দর্যের অধিকারী। ইয়াহূদীটি তার ছেলের পার্শ্বে বসে তাওরাত পাঠ করছিল। রাসূলুল্লাহ (সঃ) ঐ ইয়াহূদীর সাথে বাক্যালাপ করতে শুরু করলেন। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ "তাওরাত অবতীর্ণকারীর শপথ! সত্য করে বল তো, এতে আমার নবুওয়াতের কোন সংবাদ আছে কি নেই?" সে মাথা নেড়ে উত্তর দিলোঃ "না।" তখন তার মরণাপন্ন ছেলেটি বলে উঠলোঃ "তাওরাত অবতীর্ণকারীর শপথ! আমাদের কিতাবে আপনার গুণাবলী ও নবুওয়াতের সংবাদ বিদ্যমান রয়েছে এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি আল্লাহর রাসূল।" অতঃপর ছেলেটি মারা গেল। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ "এ মুসলমান। সুতরাং ইয়াহূদীদেরকে এখান থেকে সরিয়ে দাও।" তারপর তিনি তার কাফন ও জানাযার নামাযের ব্যবস্থা করলেন।[১]

হিশাম ইবনুল আ'স (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ "রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের নিকট ইসলাম প্রচারের জন্যে আমি ও অন্য একটি লোক প্রেরিত হই। আমরা উভয়ে গমন করি এবং দামেস্কের উপকণ্ঠ পর্যন্ত পৌঁছি। জিবিল্লাহ ইবনে আইহাম গাস্সানীর প্রাসাদে আমরা উপস্থিত হই। তিনি সিংহাসনের অধিকারী ছিলেন। আমরা কি বলতে চাই তা জানবার জন্যে তিনি আমাদের কাছে একজন দূত পাঠালেন। আমরা দূতকে বললামঃ "আমরা তোমার সাথে কথা বলবো না। বাদশাহর সাথে কথা বলার জন্যে আমরা প্রেরিত হয়েছি। তিনি যদি আমাদেরকে তাঁর কাছে ডেকে নেন তবে আমরা তাঁর সাথে কথা বলবো। তোমার কাছে আমাদের বলার কিছুই নেই।" সে তখন বাদশাহকে (প্রাদেশিক শাসনকর্তাকে) খবর দিলো। বাদশাহ আমাদেরকে ডেকে নিলেন এবং বললেনঃ "কি বলতে চাও বল।" হিশাম ইবনুল আ'স তাঁর সাথে আলাপ শুরু করলেন

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) জারীরী হতে এবং তিনি আবূ সখর আকীলী হতে তাখরীজ করেছেন। ইবনে কাসীর (রঃ) বলেন যে, এ হাদীসটি অতি উত্তম ও মজবুত। এটা সহীহ বুখারীতে হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে।

এবং তাঁকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। তিনি কালো রঙ্গের কাপড় পরিহিত ছিলেন। হিশাম তাঁকে জিজ্ঞেস করলেনঃ "আপনার পরনে কালো কাপড় কেন?" জিবিল্লাহ উত্তরে বললেনঃ "আমি শপথ করেছি যে, যে পর্যন্ত তোমাদেরকে সিরিয়া থেকে বহিষ্কার না করবো সে পর্যন্ত এই কালো পোশাক ছাড়বো না।" আমরা বললাম, আল্লাহর কসম! আমরা আপনার সিংহাসন দখল করে নেবো। শুধু তাই নয়, ইনশাআল্লাহ আপনাদের কেন্দ্রীয় সম্রাটের (হিরাক্লিাসের) রাজ্যও আমাদের অধিকারে এসে যাবে। আমাদের নবী (সঃ) এই ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। তিনি বললেনঃ "তোমরা সেই লোক নও। ওরা হচ্ছে এমন লোক যে দিনে রোযা রাখে ও রাত্রে নামায পড়ে। বল তো, তোমাদের রোযা কিরূপ?" আমরা পূর্ণভাবে এর বর্ণনা দিলাম। তখন লক্ষ্য করলাম যে, তাঁর চেহারা মলিন হয়ে গেছে। তিনি বললেনঃ "আচ্ছা যাও, সম্রাটের (হিরাক্লিয়াসের) সাথে সাক্ষাৎ কর।" এই বলে তিনি আমাদের সাথে একজন পথ প্রদর্শক পাঠালেন। আমরা তার পথ প্রদর্শনায় চলতে লাগলাম। যখন আমরা শহরের নিকটবর্তী হলাম তখন ঐ পথ প্রদর্শক আমাদেরকে বললোঃ "তোমরা এই সওয়ারী ও উষ্ট্রীগুলো নিয়ে শহরে প্রবেশ করতে পারবে না। তোমরা ইচ্ছা করলে আমি তোমাদের জন্যে ঘোড়া ও খচ্চরের ব্যবস্থা করে দিতে পারি।" আমরা বললাম, আল্লাহর শপথ! আমরা আমাদের এই উষ্ট্রীগুলোর উপরই সওয়ার হয়ে থাকবো। সে তখন বাদশাহকে লিখে পাঠালো যে, তারা নিজেদের ছাড়া অন্য কোন সওয়ারীতে সওয়ার হতে সম্মত নয়। সম্রাট তখন আমাদের উষ্ট্রীতেই আরোহণ করে আমাদেরকে শহরে প্রবেশের অনুমতি দিলেন। আমরা তরবারী লটকিয়ে সম্রাটের প্রাসাদ পর্যন্ত পৌঁছে নিজেদের সওয়ারীগুলো সেখানে বসিয়ে দিলাম। সম্রাট স্বীয় প্রাসাদের কক্ষ থেকে আমাদেরকে দেখতে ছিলেন। আমরা নেমেই لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ বললাম। আল্লাহ জানেন, আমাদের তাকবীরের শব্দে সারা প্রাসাদ কেঁপে উঠলো। মনে হলো যেন প্রবল ঝটিকা ওকে হেলিয়ে দিলো। বাদশাহ আমাদেরকে বলে পাঠালেনঃ "তোমাদের দ্বীনকে এভাবে প্রকাশ করা উচিত ছিল না।" তারপর তিনি আমাদেরকে ডেকে পাঠালেন। আমরা যখন দরবারে প্রবেশ করি তখন তিনি সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। আর তাঁর চারদিকে পোপ, ধর্মযাজক ও উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা বসেছিল। তাঁর মজলিসের সমস্ত জিনিসই ছিল লাল বর্ণের। সারা পরিবেশ ছিল লাল এবং তাঁর পোশাকও ছিল লাল। আমরা তাঁর নিকটবর্তী হলে তিনি হেসে ওঠেন এবং বলেনঃ "তোমরা পরস্পর যেমন সালামের আদান প্রদান কর তেমন আমাকে সালাম করলে না

কেন?" তাঁর কাছে একজন আরবী ভাষায় পারদর্শী দো-ভাষী বিদ্যমান ছিলেন। আমরা তাঁর মাধ্যমে বললাম, আমরা পরস্পর যে সালাম আদান প্রদান করি তা আপনার জন্যে শোভনীয় নয় এবং আপনাদের পারস্পরিক আদব ও সালামের রীতিও আমাদের জন্যে উপযুক্ত নয় যে, সেই রীতিতে আমরা আপনাকে সম্মান প্রদর্শন করবো। তিনি বললেনঃ "তোমাদের পারস্পরিক সালাম কিরূপ?" আমরা উত্তরে বললামঃ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ অর্থাৎ আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরা তোমাদের বাদশাহকে কিভাবে সালাম জানিয়ে থাক?" আমরা জবাবে বললাম, এভাবেই। তিনি আবার প্রশ্ন করলেনঃ "তিনি কিভাবে উত্তর দেন?" আমরা বললাম, তিনি এই শব্দগুলো দ্বারাই উত্তর দিয়ে থাকেন। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেনঃ "তোমাদের সম্মানিত না'রা কি?" আমরা উত্তর দিলামঃ

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اللّٰهُ اَكْبَرُ হচ্ছে আমাদের সম্মানিত ও প্রসিদ্ধ না'রা। যখন আমরা এটা উচ্চৈঃস্বরে বললাম তখন সারা প্রাসাদ কেঁপে উঠলো। শেষ পর্যন্ত তিনি মাথা উঠিয়ে দেখতে লাগলেন যে, না জানি ঘরের ছাদ ভেঙ্গেই পড়ে না কি! তিনি বললেনঃ "তোমরা যে এই কথাটি বললে যার ফলে ঘর নড়ে উঠলো, তাহলে যখন তোমরা নিজেদের বাড়ীতে এটা পড় তখন তোমাদের ঘরও কেঁপে উঠে না কি?" আমরা উত্তরে বললাম, না তো। আমরা আপনার প্রাসাদ ছাড়া এমনটি হতে তো আর কখনো দেখিনি। তিনি বললেনঃ "হায়! যদি তোমাদের সব জিনিসও কেঁপে উঠতো এবং এই না'রার জোরে আমার অর্ধেক রাজ্য হাত ছাড়া হয়ে যেতো এবং বাকী অর্ধেক টিকে থাকতো তবে কতইনা ভাল হতো।" আমরা জিজ্ঞেস করলাম, তা কেন? তিনি জবাবে বললেনঃ "নবুওয়াতের বিষয়টি মজবুত ও প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়া অপেক্ষা এটাই আমার কাছে সহজতর।" তারপর তিনি আমাদের আগমনের উদ্দেশ্য জিজ্ঞেস করলেন। আমরা তাবলীগের উদ্দেশ্যের কথা বলেদিলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ "তোমাদের নামায রোযা কেমন?" আমরা সবকিছুই জানিয়ে দিলাম। অতঃপর তিনি আমাদেরকে বিদায় দিলেন এবং অতিথিশালায় অবস্থান করতে বললেন। তিনি উত্তমরূপে আমাদের মেহমানদারী করলেন। তথায় আমরা তিন দিন অবস্থান করলাম। পুনরায় তিনি এক রাত্রে আমাদেরকে ডেকে পাঠালেন এবং আমাদের আগমনের কারণ জিজ্ঞেস করলেন। আমরা আমাদের আগমনের উদ্দেশ্যের কথা পুনরাবৃত্তি করলাম। অতঃপর তিনি স্বর্ণ-রৌপ্য জড়ানো একটা খুব বড় জিনিস চেয়ে পাঠালেন। তাতে ছোট ছোট প্রকোষ্ঠ নির্মিত ছিল এবং সবগুলো তালাবদ্ধ ছিল। তিনি একটি কক্ষের তালা খুললেন এবং ওর মধ্য থেকে একটি কালো রেশমী কাপড় বের

করলেন। তাতে একটি লাল ছবি নির্মিত ছিল এবং সেটা ছিল একটি মানুষের ছবি। মানুষটির চোখগুলো ছিল বড় বড়, উরু ছিল মোটা, দাড়ি ছিল লম্বা ও ঘন। চুলগুলো ছিল দু'ভাগে বিভক্ত, অত্যন্ত সুন্দর ও দীর্ঘ। সম্রাট আমাদেরকে জিজ্ঞেস করলেনঃ "ইনি কে তা জান কি?" আমরা উত্তর দিলাম, না। তিনি বললেনঃ "ইনি হলেন হযরত আদম (আঃ)। তাঁর দেহে অনেকগুলো চুল ছিল।" এরপর তিনি আর একটি বাক্সের তালা খুললেন। ওর মধ্য থেকে একটি কালো রেশমী কাপড় বের করলেন। তাতে একটি গৌর বর্ণের মানুষের ছবি বানানো ছিল। মানুষটির ছিল কুঞ্চিত কেশ, লাল চক্ষু, বড় মাথা এবং সুন্দর দাড়ি। বাদশাহ বললেনঃ "ইনি হচ্ছেন হযরত নূহ (আঃ)।" তারপর আর একটি বাক্স থেকে তিনি আর একটি ফটো বের করলেন। ওটার রং ছিল গৌর, চোখগুলো সুন্দর ছিল, কপাল ছিল চওড়া, চেহারা ছিল খাড়া, দাড়িগুলো ছিল সাদা এবং মুখটি ছিল হাস্যময়। সম্রাট জিজ্ঞেস করলেনঃ "জান ইনি কে? ইনি হলেন হযরত ইবরাহীম (আঃ)।" তিনি আর একটি বাক্স খুললেন। তাতে ছিল একটি উজ্জ্বল গৌর বর্ণের ছবি। ওটা ছিল হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)-এর ফটো। বাদশাহ জিজ্ঞেস করলেনঃ "এই লোকটিকে চেনো কি?" আমরা বললামঃ হ্যাঁ, ইনি হচ্ছেন হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) । তাঁর ছবিটি দেখে আমরা আবেগে অভিভূত হয়ে পড়লাম। বাদশাহ বললেনঃ "আল্লাহ জানেন যে, ইনিই হচ্ছেন হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)!" তারপর তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বলে উঠলেনঃ "আল্লাহর শপথ! ইনিই কি তিনি?" আমরা উত্তরে বললামঃ "হ্যাঁ, ইনিই তিনি। এই ছবিটি দেখে আপনি মনে করে নেন যে তাঁকেই দেখেছেন।" তারপর তিনি কিছুক্ষণ ধরে অত্যন্ত মনোযোগের সাথে ছবিটির দিকে তাকিয়ে থাকলেন। তারপর বললেনঃ "এটা ছিল শেষ বাক্স। কিন্তু এটাকে সর্বশেষ দেখাবার পরিবর্তে মধ্যভাগে দেখালাম তোমাদের সত্যতা পরীক্ষা করার জন্যে।" এরপর তিনি আর একটি ছবি বের করলেন। ওটা ছিল গোধূম বর্ণের এবং নরম ও পাতলা আকৃতি বিশিষ্ট। কেশগুলো ছিল কুঞ্চিত, চোখগুলো ছিল বসা বসা, দৃষ্টি ছিল তীক্ষ্ণ এবং ওষ্ঠ ছিল মোটা। তিনি বললেনঃ "ইনি হলেন হযরত মূসা (আঃ)!" ওরই সাথে মিলিত আর একটি ছবি ছিল। এটা ছিল আকারে ওরই সাথে সাদৃশ্যযুক্ত। কিন্তু এটার চুলগুলো ছিল তৈলাক্ত ও চিরুনীকৃত । কপাল ছিল চওড়া এবং চোখগুলো বড় বড়। তিনি বললেনঃ "ইনি হলেন হযরত হারূন ইবনে ইমরান (আঃ)।" তারপর আর একটি বাক্স থেকে তিনি আর একটি ফটো বের করলেন। ওটার ছিল গোধূম বর্ণ, দেহের উচ্চতা মধ্যম, সোজা কেশ এবং চেহারায় দুঃখ ও ক্রোধের

চিহ্ন প্রকাশমান। তিনি বললেনঃ "ইনি হলেন হযরত লূত (আঃ)।" তারপর তিনি একটা সাদা বর্ণের রেশমী কাপড় বের করলেন। তাতে যে মানুষের ফটো ছিল তা ছিল সোনালী বর্ণের। দেহ লম্বা ছিল না। গাল ছিল হালকা পাতলা এবং চেহারা ছিল সুন্দর। তিনি বললেনঃ "ইনি ইসহাক (আঃ)।" এরপর তিনি আর একটি দরজা খুললেন এবং ওর মধ্য থেকে একটি সাদা রেশমী কাপড় বের করে আমাদেরকে দেখালেন। এর আকৃতি হযরত ইসহাক (আঃ)-এর আকৃতির সাথে খুবই সাদৃশ্যযুক্ত ছিল। তিনি বললেনঃ "ইনি হযরত ইয়াকূব (আঃ)।" তারপর তিনি কালো রেশমী কাপড়ের আর একটি ফটো দেখালেন। ওটার ছিল গৌর বর্ণ, সুন্দর চেহারা, মুখমণ্ডলে ঔজ্জ্বল্য, আন্তরিকতা ও বিনয়ের লক্ষণ পরিস্ফুট এবং বর্ণ কতকটা লাল। বললেনঃ "ইনি হলেন হযরত ইসমাঈল (আঃ)।" এরপর আর একটি বাক্স হতে আর একটি সাদা রেশমী কাপড় বের করলেন যার মধ্যকার ছবিটি হযরত আদম (আঃ)-এর ছবির সাথে সাদৃশ্যযুক্ত ছিল। চেহারায় যেন সূর্য চমকাচ্ছে। বললেনঃ "ইনি হযরত ইউসুফ (আঃ)।" তারপর আর একটি ছবি বের করলেন। ওটার ছিল লাল রং, পুরু পায়ের গোছা, বড় বড় চোখ, বড় পেট ও বেঁটে দেহ। বললেনঃ "ইনি হযরত দাঊদ (আঃ)।" এরপর আরও একটি ছবি বের করলেন। ওটার ছিল মোটা উরু, লম্বা পা এবং তিনি ঘোড়ার উপর সওয়ার ছিলেন। বললেনঃ "ইনি হযরত সুলাইমান (আঃ)।" অতঃপর তিনি আরও একটি ছবি বের করলেন। ওটা ছিল বয়সে যুবক, দাড়ি ছিল কালো, চুলগুলো ছিল ঘন, চক্ষুগুলো সুন্দর এবং চেহারাতেও সৌন্দর্য বিরাজ করছিল। সম্রাট বললেনঃ "ইনি হলেন হযরত ঈসা ইবনে মারইয়াম (আঃ)।" আমরা তাকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি এই ছবিগুলো পেলেন কোথায়? আমাদের বিশ্বাস যে, এগুলো অবশ্যই নবীদেরই ছবি। কেননা, আমরা আমাদের নবী (সঃ)-এর ছবি সঠিকভাবেই পেয়েছি। উত্তরে তিনি বললেনঃ "হযরত আদম (আঃ) আল্লাহ তা'আলার নিকট আবেদন করেছিলেন– 'হে আল্লাহ! আমার নবী সন্তানদেরকে আমাকে দেখিয়ে দিন।' আল্লাহ তা'আলা তখন ঐ নবীদের ফটোগুলো হযরত আদম (আঃ)-কে প্রদান করেছিলেন। ঐগুলোকে হযরত আদম (আঃ) পাশ্চাত্য দেশে রক্ষিত রেখেছিলেন। যুলকারনাইন ওগুলোকে বের করেন এবং হযরত দানইয়াল (আঃ)-এর হাতে সমর্পণ করেন।" অতঃপর সম্রাট বললেনঃ "আমি তো চাচ্ছিলাম যে, নিজের রাজ্য ছেড়ে দিয়ে তোমাদের কোন এক নগণ্য লোকের গোলাম হয়ে থাকি যে পর্যন্ত না আমার মৃত্যু হয়।"

এরপর তিনি আমাদেরকে বিদায় দিলেন। বিদায়ের প্রাক্কালে তিনি আমাদেরকে বহু পুরস্কার ও উপঢৌকন প্রদান করলেন এবং গমনের সুব্যবস্থা করে দিলেন। যখন আমরা আবূ বকর (রাঃ)-এর কাছে আসলাম এবং ঘটনাটি বর্ণনা করলাম তখন তিনি আবেগে অভিভূত হয়ে পড়লেন এবং বললেনঃ “আল্লাহ তাকে তাওফীক দিলে এই রূপই করতো!” অতঃপর তিনি বললেনঃ “রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন যে, ইয়াহূদীরা তাদের কিতাবে নবী (সঃ)-এর গুণাবলী পেয়ে থাকে।”

হযরত আতা' ইবনে ইয়াসার (রাঃ) বলেনঃ “আমি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করি এবং তাওরাতে রাসূলুল্লাহ (সঃ) সম্পর্কে যে ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে তা জিজ্ঞেস করি। তিনি উত্তরে বললেনঃ “হ্যাঁ, আল্লাহর শপথ! তাওরাতে তাঁর গুণাবলীর এরূপই বর্ণনা রয়েছে যেরূপ কুরআনে রয়েছে।” আল্লাহ পাক বলছেন ঃ

إِنَّا أَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّ مُبَشِّرًا وَّ نَذِيْرًا -

অর্থাৎ নিশ্চয়ই আমি তোমাকে সাক্ষী, শুভ সংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারী রূপে পাঠিয়েছি।” (৪৮ঃ ৮) তদ্রূপ তাওরাতেও রয়েছে- “তুমি আমার বান্দা ও রাসূল। তোমার নাম মুতাওয়াক্কিল, তুমি কঠোরও নও এবং সংকীর্ণমনাও নও। আল্লাহ তা'আলা তোমাকে ঐ পর্যন্ত নিজের কাছে আহ্বান করবেন না যে পর্যন্ত না তুমি ভুল পথে পরিচালিত কওমকে সোজা পথে পরিচালিত করতে পার। আর যে পর্যন্ত না তারা ঈমান আনে এবং তাদের অন্তর থেকে পর্দা উঠে যায়, কান শ্রবণকারী ও চক্ষু দর্শনকারী হয়।” অতঃপর হযরত কা'ব (রঃ)-এর সাথে হযরত আতা' (রাঃ)-এর সাক্ষাৎ হলে তাকেও তিনি এই প্রশ্ন করেন। তিনি যা বর্ণনা করেন তাতে একটি অক্ষরেরও গরমিল হয়নি। গরমিল শুধু একটু হয় যে, তিনি নিজের ভাষায় غُلْفًا -কে غُلُوْفِيًّا ، صُمًّا -কে صُمُوْمِيًّا এবং عُمْيًا - কে عُمُوْمِيًّا বলতেন। কিন্তু তিনি নিম্নের বাক্যটুকু বাড়িয়ে দিয়েছেনঃ “তিনি বাজারে শোরগোল করেন না, মন্দের বদলা মন্দ দ্বারা দেন না, বরং ক্ষমা করে দেন।” এরপর তিনি আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ)-এর হাদীসটি বর্ণনা করলেন। তারপর বললেনঃ পূর্ববর্তী গুরুজনদের ভাষায়- 'তাওরাত' শব্দের প্রয়োগ সাধারণতঃ আহলে কিতাবের কিতাবগুলোর উপর হয়ে থাকে এবং হাদীসের কিতাবগুলোতেও এরূপই কিছু এসেছে। আল্লাহ তা'আলাই সর্বাপেক্ষা অধিক জ্ঞানের অধিকারী।

হযরত জুবাইর ইবনে মুতইম (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একবার ব্যবসা উপলক্ষে সিরিয়া অভিমুখে যাত্রা শুরু করি। যখন আমি সিরিয়ার নিকটবর্তী হই তখন একটি লোকের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়। সে আমাকে জিজ্ঞেস করে– "তোমাদের দেশে কোন একজন লোক নবী হয়ে এসেছেন কি?" আমি উত্তরে বলি, হ্যাঁ। সে জিজ্ঞেস করে–"তুমি তাঁর ছবি চিনতে পারবে কি?" আমি উত্তর দেই, হ্যাঁ। তখন সে আমাকে এমন একটি ঘরে নিয়ে গেল যেখানে অনেকগুলো ছবি ছিল। কিন্তু আমি সেখানে আমাদের নবী (সঃ)-এর ছবি দেখতে পেলাম না। আমরা ঐ সম্পর্কেই আলাপ আলোচনা করছিলাম এমন সময় একটি লোক এসে বললোঃ "ব্যাপার কি?" আমরা ঐ সংবাদ দিলে সে আমাদেরকে তার বাড়ীতে নিয়ে গেল। তার ঘরে প্রবেশ করেই আমি নবী (সঃ)-এর ছবি দেখতে পেলাম। ছবিতে এও দেখলাম যে, নবী (সঃ)-এর পেছনে একটি লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তাঁর পেছনে তাঁকে ধরে যে লোকটি দাঁড়িয়ে আছে সে কে? সে উত্তরে বললোঃ "ঐ লোকটি নবী নয়। কিন্তু যদি তাঁর পরে অন্য কেউ নবী হতো তবে এই লোকটিই হতো। তাঁর পরে অন্য কোন নবী আসবেন না। কিন্তু এই লোকটি তাঁর স্থলাভিষিক্ত হবে।"

হযরত উমার (রাঃ)-এর মুআয্যিন হযরত আকরা (রাঃ) বলেন, একদা হযরত উমার (রাঃ) আমাকে একজন খ্রীষ্টান পাদ্রীকে ডেকে আনার জন্যে প্রেরণ করেন। আমি তাকে ডেকে আনলে তিনি তাকে জিজ্ঞেস করেনঃ "তোমরা তোমাদের কিতাবে আমার বর্ণনাও পাও কি?" সে উত্তরে বলেঃ "হ্যাঁ। কিতাবে আপনাকে 'কারণ' বলা হয়েছে।" হযরত উমার (রাঃ) তখন স্বীয় ছড়িটি উঠিয়ে নিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ "কারণ এর অর্থ কি?" সে উত্তর দেয়, "এর অর্থ হচ্ছে লৌহ মানব।" হযরত উমার (রাঃ) পুনরায় তাকে জিজ্ঞেস করেনঃ "আমার পরে কে হবে?" সে জবাবে বলেঃ "হ্যাঁ, আপনার পরে আপনার স্থলাভিষিক্ত হবেন একজন সৎ লোক। কিন্তু তিনি স্বীয় আত্মীয়-স্বজনকে প্রাধান্য দিবেন।" একথা শুনে উমার (রাঃ) বলে উঠলেন, "আল্লাহ হযরত উসমান (রাঃ)-এর উপর দয়া করুন।" একথা তিনি তিনবার বললেন। তারপর তিনি ঐ পাদ্রীকে জিজ্ঞেস করলেনঃ "এরপর কে হবে?" সে উত্তর দিলোঃ "লৌহ খণ্ডের মতো এক ব্যক্তি।" হযরত উমার (রাঃ) বুঝে ফেললেন যে, এর দ্বারা হযরত আলীকে বুঝানো হয়েছে। তিনি স্বীয় মাথা ধরে আফসোস করতে লাগলেন। পাদ্রী বললোঃ "হে আমীরুল মুমিনীন! তিনি সৎ খলীফা হবেন। কিন্তু তিনি এমন এক সময় খলীফা হবেন যখন তরবারী কোষ থেকে বের করে নেয়া হবে এবং রক্ত প্রবাহিত হবে।"

আল্লাহ পাকের উক্তিঃ “নবী (সঃ) মানুষকে সৎ কাজের নির্দেশ দেন এবং অন্যায় কাজ করতে নিষেধ করেন।” এটা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর বিশেষণ যা পূর্ববর্তী কিতাবগুলোতে উল্লিখিত রয়েছে। বাস্তব ক্ষেত্রেও অবস্থা এই ছিল যে, তিনি কল্যাণকর কথা ছাড়া কিছুই বলতেন না এবং যা অকল্যাণকর ও ক্ষতিকর হতো তা থেকে তিনি মানুষকে বিরত রাখতেন। যেমন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বলেনঃ “যখন তোমরা আল্লাহ তা'আলাকে বলতে শুনঃ يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا তখন কান খাড়া করে দাও। হয়তো কোন কল্যাণকর জিনিসের হুকুম করা হচ্ছে অথবা কোন মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করা হচ্ছে। আর আল্লাহ সবচেয়ে বড় ও গুরুতপূর্ণ বিষয়ের যে নির্দেশ দিয়েছেন তা হচ্ছে এই যে, তোমরা অন্যকে অংশীদার করা ছাড়াই তাঁর ইবাদত করবে। কাউকেই তাঁর অংশীদার স্থাপন করবে না।” সমস্ত নবী এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই প্রেরিত হয়েছিলেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ “আমি প্রত্যেক কওমের মধ্যে স্বীয় রাসূল পাঠিয়েছি (যে, সে তাদেরকে বলবেঃ), তোমরা শুধুমাত্র আল্লাহরই ইবাদত করবে এবং প্রতিমা পূজা থেকে বিরত থাকবে।”

আবূ হুমাইদ (রাঃ) ও আবূ উসাদই (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “যখন তোমরা আমা হতে বর্ণিত কোন হাদীস শুন, যেটাকে তোমাদের অন্তর মেনে নেয় এবং যার দ্বারা তোমাদের বুদ্ধি বিবেক নরম হয়ে যায় এবং তোমরা অনুভব কর যে, এটা তোমাদের মন-মগজের নিকটতর। তখন তোমরা নিশ্চিতরূপে জেনে নেবে যে, আমার মন-মস্তিষ্ক তোমাদের অপেক্ষা ওর বেশী নিকটতম হবে অর্থাৎ ওটা আমার হাদীস হবে। আর যদি স্বয়ং তোমাদের অন্তর ঐ হাদীসকে অস্বীকার করে এবং ওটা তোমাদের মন-মগজ ও বুদ্ধি বিবেক থেকে দূরে হয় তবে জেনে রাখবে যে, তোমাদের চেয়ে আমার মন-মস্তিষ্ক ওর থেকে বেশী দূরে হবে অর্থাৎ ওটা আমার হাদীস হবে না।”[১] হযরত আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ “যখন তোমরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কোন হাদীস শুনতে পাবে তখন ওটার ব্যাপারে ঐ ধারণাই পোষণ করবে যা সঠিকতম ধারণা হয়, যা বেশী কল্যাণময় এবং পবিত্রময়।”[২]

১. ইবনে কাসীর (রঃ) বলেন যে, ইমাম আহমাদ (রঃ) এটা উত্তম ইসনাদের সাথে বর্ণনা করেছেন। সুনান কিতাব লেখকদের কেউই এটা তাখরীজ করেননি।

২. এটা ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

ইরশাদ হচ্ছে- "সে তাদের জন্যে পবিত্র বস্তুসমূহ বৈধ করে দেয় এবং অপবিত্র ও খারাপ বস্তুকে তাদের প্রতি অবৈধ করে।" অর্থাৎ তিনি তাদের এমন বস্তুসমূহ হালাল করেন যা তারা নিজেরাই নিজেদের উপর হারাম করে নিয়েছিল। যেমন 'বাহীমা', 'সায়েবা', 'ওয়াসীলা' এবং 'হাম'। এসব জন্তু হালাল কিন্তু তারা জোরপূর্বক এগুলোকে হারাম করে নিয়েছিল। এর দ্বারা তারা নিজেদের উপর সংকীর্ণতা আনয়ন করেছে। আর যে অপবিত্র ও খারাপ বস্তুগুলো আল্লাহ তা'আলা হারাম করেছেন যেমন শূকরের মাংস, সুদ এবং খাদ্য জাতীয় জিনিস যা আল্লাহ হারাম করেছেন, সেগুলোকে তারা হালাল করে নিয়েছে। আল্লাহ তা'আলা যেসব জিনিস হালাল করেছেন ওগুলো খেলে শরীরের উপকার হয় এবং দ্বীনের সহায়ক হয়। পক্ষান্তরে যেগুলো তিনি হারাম করেছেন ওগুলো দেহ ও দ্বীন উভয়ের পক্ষে ক্ষতিকর হয়ে থাকে। বিবেক বুদ্ধির মাধ্যমে যারা ভাল ও মন্দ যাচাই করে থাকেন তাঁরা এই আয়াতকেই দলীল হিসেবে গ্রহণ করে থাকেন। এই ধারণা ও অনুমানেরও উত্তর দেয়া হয়েছে কিন্তু এখানে এসবের ব্যাখ্যা দেয়ার তেমন সুযোগ নেই। এই আয়াতকে হুজ্জত রূপে কায়েম করেছেন ঐ আলেমগণও যাঁরা বলে থাকেন যে, কোন জিনিসের বৈধতা ও অবৈধতা সম্পর্কে কোন হাদীস না থাকলে ওটা হালাল কি হারাম তা যাচাই করার মাপকাঠি হলো এই যে, আরববাসী উপকারের দিক দিয়ে কোন জিনিসকে উপকারী ও পবিত্র মনে করে এবং কোন জিনিসকে অপবিত্র ও ক্ষতিকর মনে করে (এটা দেখতে হবে)। এই অনুমান ও ধারণার ব্যাপারেও অনেক কিছু সমালোচনা হয়েছে।

ঘোষিত হচ্ছে-"মানুষের অন্তরে যে বোঝা ছিল, রাসূল (সঃ) তা হাল্‌কা করে এবং প্রথার যে শিকলে তারা আবদ্ধ ছিল নবী (সঃ) তা দূর করে থাকে।" তিনি সহজ পন্থা, দান ও ক্ষমা নিয়ে এসেছেন। যেমন হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "আমি সহজ এবং ভেজালবিহীন দ্বীন নিয়ে প্রেরিত হয়েছি।"

নবী (সঃ) যখন হযরত মুআ'য (রাঃ) ও হযরত আবূ মূসা আশআ'রী (রাঃ)-কে আমির করে ইয়ামনে পাঠিয়েছিলেন তখন তিনি তাদেরকে উপদেশ দিয়েছিলেনঃ "তোমরা সদা প্রফুল্ল ও হাসিমাখা মুখে থাকবে। জনগণ যেন তোমাদেরকে দেখে ভয়ে পালিয়ে না যায়। তাদেরকে সহজ পন্থা বাতলিয়ে দিবে। সংকীর্ণতা আনয়ন করবে না। লোকদের যেন মেনে নেয়ার অভ্যাস হয়। তাদের মধ্যে যেন মতানৈক্য সৃষ্টির খেয়াল না জাগে।"

রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাহাবী হযরত আবূ বারযা আসলামী (রাঃ) বলেনঃ "আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে অবস্থান করেছি এবং তাঁর সহজ পন্থা বাতলানোর চিত্র সুন্দরভাবে অবলোকন করেছি।" পূর্ববর্তী উম্মতদের মধ্যে বড়ই কাঠিন্য ছিল। এই উম্মতের উপর সবকিছু হালকা করে দেয়া হয়েছে। এ জন্যেই রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "আল্লাহ আমার উম্মতকে তাদের অন্তরের খেয়াল ও বাসনার জন্যে পাকড়াও করেন না যে পর্যন্ত না তারা মুখে তা প্রকাশ করে অথবা কার্যে পরিণত করে।" তিনি বলেনঃ "আল্লাহ তা'আলা আমার উম্মতের ভুলত্রুটি ও বিস্মরণকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। তারা যদি ভুল বশতঃ কিছু করে বসে অথবা জোরপূর্বক তাদেরকে কোন অন্যায় কাজ করিয়ে নেয়া হয় তবে ক্ষমার্হ বলে গণ্য করা হবে।" এজন্যেই আল্লাহ তা'আলা এই উম্মতকে নিম্নরূপ কথা প্রার্থনা করতে বলেছেনঃ

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلٰنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِينَ۔

অর্থাৎ "হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে পাকড়াও করবেন না, যদি আমরা বিস্মরণ হই কিংবা ভুল করে বসি, হে আমাদের প্রভু! আমাদের প্রতি কোন কঠোর ব্যবস্থা পাঠাবেন না, যেমন আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর পাঠিয়েছিলেন, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের উপর এমন কোন গুরুভার চাপাবেন না যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই, আর ক্ষমা করে দিন আমাদেরকে এবং মার্জনা করে দিন, আর আমাদের প্রতি কৃপা করুন! আপনি আমাদের কর্মসম্পাদক, সুতরাং আমাদেরকে কাফির সম্প্রদায়ের উপর প্রাবল্য দান করুন।" (২ঃ ২৮৬)

সহীহ মুসলিম দ্বারা এটা প্রমাণিত যে, এ দুআ'র মাধ্যমে আল্লাহর কাছে চাওয়া হলে তিনি প্রত্যেক যাঞ্চ্ঞার সময় বলেনঃ "আচ্ছা, আমি দিলাম, আমি কবূল করলাম।"

আল্লাহ পাক বলেনঃ "যারা তাঁর প্রতি (রাসূল সঃ-এর প্রতি) ঈমান রাখে, তাঁকে সম্মান করে ও সাহায্য সহানুভূতি করে, আর সেই নূরকে অনুসরণ করে যা তাঁর সাথে অবতীর্ণ করা হয়েছে, তারাই ইহকালে ও পরকালে সাফল্য লাভ করবে।"

১৫৮। (হে মুহাম্মাদ সঃ)! তুমি ঘোষণা করে দাও- হে মানবমণ্ডলী! আমি তোমাদের সকলের জন্যে সেই আল্লাহর রাসূলরূপে প্রেরিত হয়েছি, যিনি আকাশমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সার্বভৌম একচ্ছত্র মালিক, তিনি ছাড়া আর কোন মা'বূদ নেই, তিনি জীবিত করেন ও মৃত্যু ঘটান, সুতরাং আল্লাহর প্রতি এবং তাঁর সেই বার্তাবাহক নিরক্ষর নবী (সঃ)-এর প্রতি ঈমান আনয়ন কর, যে আল্লাহ্তে ও তাঁর কালামে বিশ্বাস স্থাপন করে থাকে, তোমরা তারই অনুসরণ কর, আশা করা যায় তোমরা সরল সঠিক পথের সন্ধান পাবে।

١٥٨- قُلْ يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا الَّذِيْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِيْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَكَلِمٰتِهٖ وَاتَّبِعُوْهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ○

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নবী (সঃ)-কে সম্বোধন করে বলছেনঃ হে নবী (সঃ)! আরব, অনারব এবং দুনিয়া জাহানের লোকদেরকে বলে দাও, 'আমি সকলের জন্যে নবীরূপে প্রেরিত হয়েছি।' এটা তাঁর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের দলীল যে, তাঁর উপর নবুওয়াত শেষ হয়ে গেছে এবং তখন থেকে কিয়ামত পর্যন্ত তিনি সারা দুনিয়ার পয়গাম্বর। তাঁকে আরো বলতে বলা হচ্ছে-তুমি বলে দাও, আমার ও তোমাদের মধ্যে আল্লাহ সাক্ষী। তোমাদেরকে জ্ঞাত করাবার জন্যে আল্লাহ আমার উপর অহী নাযিল করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে- 'যে সম্প্রদায় নবীকে মানে না তার ঠিকানা হচ্ছে জাহান্নাম।' অন্য জায়গায় আল্লাহ্ পাক বলেনঃ "যারা আহ্লে কিতাব এবং যারা আহলে কিতাব নয় তাদের সকলকে বলে দাও- তোমরা ইসলাম গ্রহণ করছো কি করছো না? যদি তারা ইসলাম গ্রহণ করে তবে হিদায়াত পেয়ে যাবে, অন্যথায় তোমার কাজ হচ্ছে শুধু পৌঁছিয়ে দেয়া।" এই বিষয়ের এতো বেশী হাদীস বিদ্যমান রয়েছে যে, সেগুলো গণনা করা কঠিন।

আর একথা তো সবাই জানে যে, নবী (সঃ) সারা দুনিয়ার জন্যে প্রেরিত হয়েছিলেন। ইমাম বুখারী (রঃ) এই আয়াতের তাফসীরে বলেন, হযরত আবূ দারদা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত আবূ বকর (রাঃ) ও হযরত উমার (রাঃ)-এর মধ্যে কিছু বচসা হয়। আবূ বকর (রাঃ) উমার (রাঃ)-কে অসন্তুষ্ট করেন। উমার (রাঃ) দুঃখিত হয়ে ফিরে যান। হযরত আবূ বকর (রাঃ) এটা অনুভব করেন । সুতরাং তিনি তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনার জন্যে তাঁর পিছু পিছু গমন করেন। কিন্তু উমার (রাঃ) তাঁকে নিজ বাড়ীতে প্রবেশের অনুমতি না দিয়ে দরজা বন্ধ করে দেন। হযরত আবূ বকর (রাঃ) তখন সরাসরি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট গমন করেন। আবূ দারদা (রাঃ) বলেন, আমিও সেই সময় তাঁর কাছে উপস্থিত ছিলাম। রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে বললেনঃ 'তোমাদের এই সঙ্গী আজ রাগান্বিত রয়েছে।' অতঃপর উমারও (রাঃ) আবূ বকর (রাঃ)-কে বাড়ীতে প্রবেশের অনুমতি না দেয়ার কারণে লজ্জিত হন। সুতরাং তিনিও নবী (সঃ)-এর কাছে এসে হাজির হন। তিনি সালাম দিয়ে বসে পড়েন এবং তাঁর সামনে ঘটনাটি বর্ণনা করেন। আবূ দারদা (রাঃ) বলেন, এতে রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত উমার (রাঃ)-এর প্রতি রাগান্বিত হন। আর এদিকে হযরত আবূ বকর (রাঃ) বলতে থাকেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আল্লাহর কসম! বাড়াবাড়ি আমার পক্ষ থেকেই হয়েছিল।" কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ তোমরা কি আমার বন্ধু ও সঙ্গীকে (আবূ বরক রাঃ কে) ছেড়ে দিতে চাও? আমি বলেছিলাম, হে লোক সকল! আমি তোমাদের সকলের নিকট রাসূলরূপে প্রেরিত হয়েছি! তখন তোমরা আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলে। অথচ আবূ বকর (রাঃ) বলেছিল, 'আপনি সত্য কথাই বলছেন।'

রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাবুকের যুদ্ধে একদা রাত্রে তাহাজ্জুদের নামাযের উদ্দেশ্যে গাত্রোত্থান করেন। তখন তাঁর কয়েকজন সাহাবী তাঁর হিফাজত ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজে লেগে পড়েন। নামায শেষে তিনি তাঁদের মনঃসংযোগ করে বলেনঃ "আজ রাত্রে পাঁচটি জিনিস আমাকে বিশিষ্টভাবে দেয়া হয়েছে। ইতিপূর্বে এই বিশেষত্ব অন্য কোন নবীকে দেয়া হয়নি। (১) আমি সারা জাহানের লোকদের কাছে নবীরূপে প্রেরিত হয়েছি। আমার পূর্বে প্রত্যেক নবীকে তাঁর নিজের কওমের কাছেই পাঠানো হয়েছিল। (২) আমি শুধু প্রভাব ও ভক্তি প্রযুক্ত ভীতির মাধ্যমেই শত্রুর উপর সাহায্য লাভ করে থাকি, যদিও তার ও আমার মধ্যে এক মাসের পথের ব্যবধান হয়। (৩) যুদ্ধলব্ধ মাল আমার জন্যে ও আমার

উম্মতের জন্যে হালাল করা হয়েছে। অথচ আমার পূর্বে আর কারো জন্যে যুদ্ধলব্ধ মাল হালাল ছিল না। সমস্ত যমীনই আমার জন্যে পবিত্র ও সিজদার স্থান। (৫) আমাকে শাফাআ'তের অধিকার দেয়া হয়েছে। আমি এটা কিয়ামতের দিনের জন্যে আমার উম্মতের উদ্দেশ্যে উঠিয়ে রেখেছি। এই শাফাআ'তের সেই দিন প্রত্যেক ঐ ব্যক্তির জন্যে হবে যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অন্য কাউকেও শরীক করবে না।"[১]

হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! এই উম্মতের মধ্য হতে কোন ইয়াহূদী অথবা খ্রীষ্টান আমার কথা শুনলো, অথচ আমি যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছি তার উপর ঈমান না এনেই মারা গেল, নিঃসন্দেহে সে জাহান্নামী।[২]

আল্লাহ তা'আলার উক্তিঃ "তিনিই আকাশ ও পৃথিবীর সার্বভৌম একচ্ছত্র মালিক, তিনি ছাড়া আর কোন মা'বূদ নেই, তিনিই জীবিত করেন এবং তিনিই মৃত্যু ঘটিয়ে থাকেন।" তাই নির্দেশ হচ্ছে– 'তোমরা আল্লাহর প্রতি ও তাঁর সেই বার্তাবাহক নিরক্ষর নবী (সঃ)-এর প্রতি ঈমান আনয়ন কর।' আল্লাহ পাক খবর দিচ্ছেন– মুহাম্মাদ (সঃ) আল্লাহর রাসূল। তাঁকে তোমাদের নিকট পাঠানো হয়েছে। তোমরা তাঁর অনুসরণ কর। তাঁর উপর ঈমান আন। তোমাদের কাছে এরই ওয়াদা নেয়া হয়েছিল। পূর্ববর্তী কিবাতগুলোতে এরই শুভ সংবাদ রয়েছে। ঐ কিতাবগুলোতে 'নবী উম্মী' এই শব্দ দ্বারাই তাঁর প্রশংসা হয়েছে।

ইরশাদ হচ্ছে– যে (রাসূল সঃ) আল্লাহতে ও তাঁর কালামে বিশ্বাস স্থাপন করে থাকে, তোমরা তারই অনুসরণ কর, আশা করা যায় তোমরা সরল সঠিক পথের সন্ধান পাবে।

১৫৯। মূসা (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন একদল লোক রয়েছে যারা সঠিক ও নির্ভুল পথ প্রদর্শন করে এবং ন্যায় বিচার করে।	١٥٩- وَمِنْ قَوْمِ مُوسَىٰٓ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ○

---

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন।

২. ইমাম আহমাদ (রঃ) স্বীয় মুসনাদে ও ইমাম মুসলিম (রঃ) স্বীয় সহীহ গ্রন্থে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসের শব্দগুলো ইমাম আহমাদেরই (রঃ) বটে।

সংবাদ দেয়া হচ্ছে যে, বানী ইসরাঈলের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে যারা সঠিক ও সত্য কাজের অনুসরণ করে, নির্ভুল পথ প্রদর্শন করে এবং বিচার-আচার সত্য ও ন্যায়কে সামনে রেখে করে থাকে। যেমন মহান আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেনঃ "আহ্‌লে কিতাবের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে যারা রাত্রিকালে আল্লাহর আয়াতসমূহ পাঠ করে থাকে ও সেজদায় পতিত হয়।" অন্যত্র বলেনঃ "আহ্‌লে কিতাবের মধ্যে এমনও লোক আছে যারা আল্লাহর উপর বিশ্বাস রাখে, আর তোমাদের উপর যা অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং তাদের উপর যা অবতীর্ণ করা হয়েছে সবগুলোর উপরই বিশ্বাস স্থাপন করে, আর তারা আল্লাহর সামনে বিনয় প্রকাশ করে থাকে। অন্যান্য আহ্‌লে কিতাবের মত তারা আল্লাহর আয়াতগুলোকে টাকা পয়সার লোভে বিক্রী করে না। আল্লাহর কাছে তাদের প্রতিদান রয়েছে। আল্লাহ শীঘ্রই হিসাব গ্রহণকারী।" আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ "যাদেরকে আমি ইতিপূর্বে কিতাব দিয়েছিলাম তারা ওর উপর ঈমান আনে, যখন তাদের সামনে আমার আয়াতগুলো পাঠ করা হয় তখন তারা বলে– আমরা এখনও মুসলমান এবং এর পূর্বেও মুসলমান ছিলাম। তাদেরকে তাদের সবরের দু'বার প্রতিদান দেয়া হবে।" মহান আল্লাহ আর এক জায়গায় বলেনঃ "যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে, ওকে ওরা যথাযোগ্য পাঠ করে, ওরাই হচ্ছে মুমিন।" আরও বলেনঃ "যাদেরকে ইতিপূর্বে ইলম অর্থাৎ কিতাব দেয়া হয়েছে, যখন এই কিতাব তাদেরকে পাঠ করে শুনানো হয় তখন তারা মাথার ভরে সিজদায় পড়ে যায় এবং সিজদায় তাদের বিনয় ও নম্রতা বহুগুণে বেড়ে যায়।"

বানী ইসরাঈল যখন নবীদেরকে হত্যা করে ফেলে এবং কুফরী অবলম্বন করে তখন তাদের বারোটি দল ছিল। ওগুলোর মধ্যে একটি দল অবশিষ্ট এগারোটি দলের আকীদায় অসন্তুষ্ট ছিল এবং তারা তাদের প্রতি সম্পূর্ণরূপে বিমুখ ছিল। তারা আল্লাহ তা'আলার নিকট আবেদন করেছিল, "হে আল্লাহ! আমাদের ও তাদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা আনয়ন করুন।" তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্যে যমীনের মধ্যে একটি সুড়ঙ্গ করে দেন। তারা তার ভিতর চলা ফেরা করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত তারা ঐ সুড়ঙ্গ পথে চীনে প্রবেশ করে, সেখানে একত্ববাদী মুসলমান বিদ্যমান ছিল, যারা আমাদেরই কিবলার দিকে মুখ করে নামায পড়তো। ইরশাদ হচ্ছে–এরপর আমি বানী ইসরাঈলকে বললামঃ "এখন যমীনে বসবাস কর। অতঃপর যখন আখিরাতের ওয়াদা এসে পড়বে তখন আমি তোমাদেরকে হাজির করবো।" কথিত আছে যে, সুড়ঙ্গের মধ্যে তারা দেড় বছর ধরে বসবাস করেছিল।

১৬০। আর আমি বানী ইসরাঈলকে দ্বাদশ গোত্রে বিভক্ত করেছি, মূসা (আঃ) -এর সম্প্রদায়ের লোকেরা যখন তার কাছে পানি ব্যবহার করার দাবী জানালো, তখন আমি মূসা (আঃ)-এর কাছে প্রত্যাদেশ পাঠালাম- তোমার লাঠি দ্বারা পাথরে আঘাত কর, ফলে ওটা হতে দ্বাদশ প্রস্রবণ উৎসারিত হলো, প্রত্যেক গোত্র নিজ নিজ পান স্থান জেনে নিলো, আর আমি তাদের উপর মেঘ দ্বারা ছায়া বিস্তার করলাম, আর তাদের জন্যে আকাশ হতে 'মান্না' ও 'সালওয়া' খাদ্যরূপী নিয়ামত অবতীর্ণ করলাম, সুতরাং (আমি বললাম) তোমাদেরকে যা কিছু পবিত্র জীবিকা দান করা হয়েছে তা আহার কর, (কিন্তু ওরা আমার শর্ত উপেক্ষা করে জুলুম করলো) তারা আমার উপর কোন জুলুম করেনি, বরং তারা নিজেদের উপরই জুলুম করেছে।

١٦٠- وَقَطَّعْنٰهُمُ اثْنَتَیْ عَشْرَةَ اَسْبَاطًا اُمَمًا ؕ وَ اَوْحَیْنَاۤ اِلٰی مُوْسٰۤی اِذِ اسْتَسْقٰىهُ قَوْمُهٗۤ اَنِ اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ ۚ فَانْۢبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَیْنًا ؕ قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ؕ وَ ظَلَّلْنَا عَلَیْهِمُ الْغَمَامَ وَ اَنْزَلْنَا عَلَیْهِمُ الْمَنَّ وَ السَّلْوٰی ؕ كُلُوْا مِنْ طَیِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ ؕ وَ مَا ظَلَمُوْنَا وَ لٰكِنْ كَانُوْۤا اَنْفُسَهُمْ یَظْلِمُوْنَ ○

১৬১। (স্মরণ কর সেই সময়টির কথা) যখন আমি তাদেরকে বলেছিলাম-এই (বায়তুল মুকাদ্দাস ও তৎসংশ্লিষ্ট) জনপদে বসবাস কর এবং যথা

١٦١- وَ اِذْ قِیْلَ لَهُمُ اسْكُنُوْا هٰذِهِ الْقَرْیَةَ وَ كُلُوْا مِنْهَا حَیْثُ

ইচ্ছা আহার কর, আর তোমরা বল– (হে প্রভু!) ক্ষমা চাই, আর (শহরের) দ্বারদেশ দিয়ে নতশিরে প্রবেশ কর, (তাহলে) আমি তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করবো এবং সৎকর্মশীল লোকদের জন্যে আমার দান বৃদ্ধি করবো।

شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَّادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ○

১৬২। কিন্তু তাদের মধ্যে যারা যালিম ও সীমালংঘনকারী ছিল, তারা সেই কথা পরিবর্তন করে ফেললো যা তাদেরকে (বলতে) বলা হয়েছিল, সুতরাং তাদের সেই সীমালংঘনের কারণে আমি আসমান হতে তাদের উপর শাস্তি প্রেরণ করলাম।

١٦٢- فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ○ ع

এই সমুদয় আয়াতের তাফসীর সূরায়ে বাকারায় করা হয়ে গেছে। ঐ গুলো মাদানী আয়াত এবং এগুলো মক্কী আয়াত। ঐ আয়াতগুলো এবং এই আয়াতগুলোর পার্থক্যও আমরা বর্ণনা করে দিয়েছি। সুতরাং পুনর্বার বর্ণনা করার কোন আবশ্যকতা নেই।

১৬৩। আর তাদেরকে সেই জনপদের অবস্থাও জিজ্ঞেস কর যা সমুদ্রের তীরে অবস্থিত ছিল, (স্মরণ কর সেই ঘটনার কথা) যখন তারা শনিবারের আদেশ লংঘন করেছিল, শনিবার উদযাপনের দিন মাছ পানিতে ভেসে তাদের নিকট আসতো, কিন্তু যেদিন তারা শনিবার উদযাপন করতো না,

١٦٣- وَسْئَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ

সেদিন ওগুলো তাদের কাছে আসতো না, এইভাবে আমি তাদের নাফরমানীর কারণে তাদেরকে পরীক্ষা করতে ছিলাম।

كَذٰلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ۝

আল্লাহ পাকের উক্তি ছিলঃ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِيْنَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِى السَّبْتِ অর্থাৎ "ঐ লোকদের খবর তোমাদের জানা আছে যারা শনিবারের দিনের ব্যাপারে সীমালংঘন করেছিল।" (২ঃ ৬৫) এই আয়াতের আলোকেই এখানকার এই আয়াতটির ব্যাখ্যা দেয়া হচ্ছে। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নবী (সঃ)-কে ইরশাদ করছেনঃ "হে নবী (সঃ)! যেসব ইয়াহূদী তোমাদের পার্শ্বে রয়েছে তাদেরকে ঐলোকদের ঘটনা জানিয়ে দাও যারা আল্লাহর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করেছিল। ফলে তাদেরকে তাদের ঔদ্ধত্যপনার আকস্মিক শাস্তি প্রদান করা হয়েছিল। এসব ইয়াহূদীকে খারাপ পরিণাম থেকে ভয় প্রদর্শন কর যারা তোমার সেই গুণাবলীকে গোপন করছে যা তারা তাদের কিতাবে পাচ্ছে, না জানি তাদের উপরও ঐ শাস্তি এসে পড়ে যা তাদের পূর্ববর্তী ইয়াহূদীদের উপর এসে পড়েছিল।" ঐ বস্তি বা জনপদের নাম ছিল আয়লা। ওটা কুলযুম নদীর তীরে অবস্থিত ছিল। আর এই আয়াতে সমুদ্রের তীরবর্তী যে জনপদের কথা বলা হয়েছে, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর বর্ণনানুযায়ী ওর নাম হচ্ছে 'আয়লা' যা মাদইয়ান ও তূরের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত ছিল।[১] আবার এ উক্তিও রয়েছে যে, ওর নাম 'মাতনা' যা মাদইয়ান ও আয়নূনার মধ্যস্থলে অবস্থিত। يَعْدُوْنَ -এর ভাবার্থ হচ্ছে–তারা শনিবারের দিনের ব্যাপারে আল্লাহর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করেছিল। ঐদিন মাছগুলো স্বাধীনভাবে পানির উপর ভেসে উঠতো এবং কিনারায় ছড়িয়ে পড়তো। কিন্তু শনিবার ছাড়া অন্য দিনে পানির ধারে কখনই আসতো না। আল্লাহ পাক বলেনঃ আমি এরূপ কেন করেছিলাম? এর দ্বারা আমার উদ্দেশ্য ছিল শুধু তাদের আনুগত্যের পরীক্ষা করা যে, আমার আদেশ তারা মেনে চলছে কি-না! যেদিন মৎস্য শিকার হারাম ছিল সেদিন মাছগুলো আশাতীতভাবে নদীর ধারে এসে জমা হয়ে যেতো। আবার যেদিনগুলোতে মাছ ধরা হালাল ছিল ঐ সময় ঐগুলো লুকিয়ে যেতো। এটা ছিল একটা পরীক্ষা। কেননা, তারা আল্লাহর আনুগত্য স্বীকারের ব্যাপারে বিভিন্ন প্রকারের কৌশল অনুসন্ধান করেছিল এবং নিষিদ্ধ কাজে জড়িয়ে পড়ার জন্যে গোপন দরজা দিয়ে প্রবেশের ইচ্ছা করেছিল। তাই,

১. এটাই ইকরামা (রঃ), মুজাহিদ (রঃ), কাতাদা (রঃ) এবং সুদ্দীরও (রঃ) উক্তি।

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "তোমরা এমন কাজে জড়িয়ে পড়ো না যে কাজে ইয়াহূদীরা জড়িয়ে পড়েছিল যে, তারা কৌশল খুঁজে খুঁজে হারামকে হালাল করে নিয়েছিল।"[১]

১৬৪। (স্মরণ কর সেই সময়টির কথা) যখন তাদের একদল লোক অপর দলের নিকট বলেছিল– ঐ জাতিকে তোমরা কেন উপদেশ দিচ্ছ যাদেরকে আল্লাহ ধ্বংস করবেন অথবা কঠিন শাস্তি দিবেন? তারা উত্তরে বললো– তোমাদের প্রতিপালকের নিকট দোষ মুক্তির জন্যে আর এই আশা করছি যে, হয়তো বা এই লোকেরা তাঁর নাফরমানী হতে বেঁচে থাকবে।

١٦٤- وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللّٰهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ○

১৬৫। তাদেরকে যে উপদেশ দেয়া হয় তা যখন তারা বিস্মৃত হয় তখন যারা অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করতো তাদেরকে তো আমি বাঁচিয়ে নিলাম, আর যালিমদেরকে তাদের অসৎ কর্মপরায়ণতার কারণে কঠোর শাস্তি দ্বারা পাকড়াও করলাম।

١٦٥- فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ○

১৬৬। অতঃপর যখন তারা বেপরোয়াভাবে নিষিদ্ধ কাজ গুলো করতে থাকলো, তখন আমি বললাম– তোমরা ঘৃণিত ও লাঞ্ছিত বানর হয়ে যাও।

١٦٦- فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ○

১. ইবনে কাসীর (সঃ) বলেন যে, এ হাদীসের ইসনাদ উত্তম এবং এর বর্ণনাকারীরা মাশহূর ও নির্ভরযোগ্য।

ইরশাদ হচ্ছে যে, এই জনপদবাসী তিন ভাগে ভাগ হয়েছিল। প্রথম প্রকার হচ্ছে ঐসব লোক যারা শনিবারের দিন মাছ ধরার কৌশল অবলম্বন করতঃ নিষিদ্ধ কাজ করে বসেছিল। যেমন সূরায়ে বাকারায় আলোচিত হয়েছে। দ্বিতীয় প্রকার হচ্ছে ঐ লোকেরা যারা ঐ পাপী লোকদেরকে ঐ পাপ কার্য করতে নিষেধ করেছিল এবং নিজেরা ঐ কাজ থেকে দূরে রয়েছিল। আর তৃতীয় প্রকার হচ্ছে ঐ দল যারা এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নীরব ছিল। যারা নিজেরা ঐ কাজে লিপ্ত হয়নি বটে, কিন্তু যারা ঐ কাজে লিপ্ত হয়ে পড়েছিল তাদেরকে নিষেধও করেনি। বরং যারা নিষেধ করেছিল তাদেরকে তারা বলেছিলঃ "যে লোকদেরকে আল্লাহ ধ্বংস করতে চান বা শাস্তি দিতে চান তাদেরকে উপদেশ দিয়ে লাভ কি? তোমরা তো জানছো যে এরা শাস্তি পাওয়ার যোগ্য হয়ে গেছে। সুতরাং এদের ব্যাপারে উপদেশ মোটেই ক্রিয়াশীল হবে না।" নিষেধকারীরা জবাবে বলেছিলঃ "আমরা তো কমপক্ষে আল্লাহর কাছে এ কৈফিয়ত দিতে পারবো যে, আমরা তাদেরকে নিষেধ করেছিলাম। কেননা, ভাল কাজের আদেশ করা এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করা কর্তব্য তো বটে।" কেউ কেউ মায়্‌জেরাতান শব্দকে মায়্‌জেরাতুন পড়েছেন। অর্থাৎ এটা ওযর। আর মায়্‌জেরাতান পড়লে অর্থ হবে– "আমরা ওযরের খাতিরে নিষেধ করছি। আর এতে বিস্ময়ের কিছুই নেই যে, তারা হয়তো এ কাজ থেকে বিরত থাকবে এবং আল্লাহ তা'আলার কাছে তাওবা করবে।" আল্লাহ পাক বলেন–কিন্তু তারা যখন তাদের উপদেশ গ্রহণ করলো না, বরং ঐ পাপ কার্য করতেই থাকলো তখন ঐ কাজ করতে নিষেধকারীদেরকে তো আমি বাঁচিয়ে নিলাম, কিন্তু ঐ পাপ কার্যে লিপ্ত যালিমদেরকে আমি পাকড়াও করলাম এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রদান করলাম।

এখানে নিষেধকারীদের মুক্তি ও পাপীদের ধ্বংসের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু যারা ঐ পাপকার্যে জড়িতও হয়নি এবং নিষেধও করেনি তাদের ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করা হয়েছে। কেননা, কাজ যেমন হবে প্রতিদান তেমনই হবে। সুতরাং তারা প্রশংসার যোগ্য হলো না কারণ তারা প্রশংসার যোগ্য কাজ করেনি। আর তারা নিন্দারও পাত্র হলো না, কেননা, তারা ঐ পাপকার্যে জড়িত হয়নি। তবে তারা মুক্তি পেয়েছিল কি ধ্বংস হয়েছিল এ ব্যাপারে ইমামদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, মাছ শনিবারে খুবই বেশী আসতো, কিন্তু অন্যান্য দিনে আসতো না। এভাবে কিছুদিন কেটে যাওয়ার পর তাদের মধ্যে কতক লোক শনিবারও মাছ ধরতে শুরু করে। কতক লোক তাদেরকে বলেঃ "আজকের দিন তো মাছ ধরা হারাম।" কিন্তু তাদের অবাধ্যতা

ও ঔদ্ধত্যপনা ঠিকই থাকে। কিন্তু কতক লোক বরাবর নিষেধ করতেই থাকে। যখন এভাবেও কিছু দিন কেটে গেল তখন নিষেধকারীদেরকে তাদেরই মধ্যকার একটি দল বললোঃ এই দুষ্টদেরকে নিষেধ করে লাভ কি? আল্লাহর শাস্তি তাদের প্রাপ্য হয়ে গেছে! সুতরাং এখন আর তাদেরকে উপদেশ দিচ্ছ কেন? এই লোকগুলো নিষেধকারীদের তুলনায় আল্লাহর পথে বেশী কঠোর ও রাগান্বিত ছিল। তখন নিষেধকারীরা তাদেরকে বলেছিল, "আল্লাহ আমাদেরকে ক্ষমা করুন! আমরা ওযর পেশ করছি।" তাহলে এই দু'টি দলই যেন নিষেধকারী দল ছিল। সুতরাং যখন আল্লাহর শাস্তি নাযিল হয়ে গেল তখন এই দু'টি দলই রক্ষা পেলো।

ইকরামা (রাঃ) বলেন, আমি একদা হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর নিকট গমন করি। সেই সময় তাঁর চক্ষু দু'টি অশ্রুসিক্ত ছিল এবং দেখি যে, কুরআন কারীম তাঁর ক্রোড়ে রয়েছে। আমি সময়টি অতি গুরুত্বপূর্ণ মনে করে তাঁর সামনে বসে পড়লাম এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কাঁদছেন কেন? তিনি উত্তরে বললেনঃ "কুরআনের এ পৃষ্ঠা আমাকে কাঁদাচ্ছে।" তিনি সূরায়ে আ'রাফ পাঠ করছিলেন। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "আয়লা কি জান কি?" আমি উত্তরে বললামঃ হ্যাঁ। এবার তিনি বলতে শুরু করলেনঃ আয়লায় ইয়াহূদীরা বাস করতো। শনিবার মৎস্য শিকার তাদের উপর নিষিদ্ধ ছিল। তাদের পরীক্ষার জন্যে মাছগুলোকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যে, ওরা যেন শুধু শনিবারেই বের হয়। শনিবারের দিন নদী মাছে পরিপূর্ণ হয়ে যেতো। মোটাতাজা ও ভাল ভাল অধিক সংখ্যক মাছ পানির উপর লাফালাফি করতো। শনিবার ছাড়া অন্যান্য দিন কঠিন চেষ্টার পর কিছু মাছ পাওয়া যেতো। কিছুদিন পর্যন্ত ঐ লোকগুলো আল্লাহর আদেশের মর্যাদা দিলো এবং ঐ দিনে মাছ ধরা থেকে বিরত থাকলো। অতঃপর শয়তান তাদের অন্তরে এই অনুভূতি জাগিয়ে দিলো যে, শনিবার দিন মাছ খাওয়া নিষিদ্ধ বটে কিন্তু ধরা নিষিদ্ধ নয়। সেই দিনে ধরে অন্য দিনে খাওয়া যেতে পারে। একটি দলের অন্তরে এই খেয়াল জেগেই গেল। কিন্তু অন্য দল তাদেরকে বললোঃ "খাওয়া ও ধরা উভয়ই নিষিদ্ধ।" মোটকথা, যখন জুমআ'র দিন আসলো তখন ঐ লোকগুলো নিজেদের স্ত্রী ও শিশু সন্তানদেরকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লো। তাদের ডান দিকে ছিল নিষেধকারী দলটি এবং বাম দিকে ছিল ঐ দলটি যারা নীরবতা অবলম্বন করেছিল। ডানদিকের দলটি বললোঃ "দেখো, আমরা তোমাদেরকে নিষেধ করছি, না জানি হয়তো এরূপ ঘটবে যে, তোমরা আল্লাহর শাস্তির কবলে পড়ে যাবে।" তখন বাম দিকের দলটি নিষেধকারী দলটিকে

বললো, তোমরা এমন লোকদেরকে কেন উপদেশ দান করছো যারা ধ্বংস হয়ে যাবে এবং আল্লাহর শাস্তির কবলে পতিত হবে? এরা কি তোমাদের কথা মানবে? ডান দিকের লোকেরা উত্তরে বললো, "আল্লাহ আমাদেরকে ক্ষমা করুন। আমরা এ জন্যেই এদেরকে নিষেধ করছি যে, হয়তো তারা এ কাজ থেকে বিরত থাকবে। আমাদের তো আন্তরিক ইচ্ছা এটাই যে, তারা যেন আল্লাহর আযাবে পাকড়াও না হয়। যদি তারা এ কাজ থেকে বিরত না হয় তবে আল্লাহ আমাদেরকে তো ক্ষমা করবেন!" ঐলোকগুলো কিন্তু ঐ পাপ কাজের উপর কায়েম থাকলো। নিষেধকারীরা তখন তাদেরকে বললো, "হে আল্লাহর শত্রুরা! শেষ পর্যন্ত তোমরা মানলেই না। আল্লাহর কসম! আমাদের ভয় হচ্ছে যে, এই দিনের মধ্যেই হয়তো তোমাদেরকে যমীনে ধ্বসিয়ে দেয়া হবে, বা তোমাদের উপর পাথর বর্ষিত হবে অথবা অন্য কোন শাস্তি তোমাদের উপর এসে পড়বে।" এখন এ নিষেধকারী দল এবং নীরবতা অবলম্বনকারী দল আল্লাহর শাস্তির ভয়ে শহরের বাইরে অবস্থান করতে থাকলো। আর পাপীরা শহরের মধ্যেই রয়ে গেল। তারা শহরের সদর দরজা ভিতর থেকে বন্ধ করে দিলো। অতঃপর বাইরে অবস্থানকারীরা সকালেই নগর প্রাচীরের দরজার কাছে পৌঁছে গেল। লোকগুলো বাইরে বের হয়নি বলে দরজা ভিতর থেকে বন্ধই ছিল। বহুক্ষণ ধরে তারা দরজায় করাঘাত করলো। বহু ডাকাডাকি করলো। কিন্তু কোন উত্তর আসলো না। তখন তারা নগর প্রাচীরের উপর সিঁড়ি লাগিয়ে উপরে উঠলো। উঠে দেখলো যে, তারা সব বানরে পরিণত হয়েছে। তাদের লম্বা লম্বা লেজ রয়েছে। এখন তারা সদর দরজা খুলে ভিতরে প্রবেশ করলো। ঐ বানরগুলো তাদের বন্ধু বান্ধবদেরকে চিনে ফেললো। কিন্তু তারা তাদের বন্ধু বানরদেরকে চিনতে পারলো না। বানরগুলো তাদের কাছে এসে তাদের পায়ের উপর লুটিয়ে পড়লো । মানুষগুলো তাদেরকে বললোঃ "আমরা কি তোমাদেরকে নিষেধ করিনি?" তারা মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানালো। অতঃপর হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এ আয়াতটি পাঠ করলেনঃ "যখন তারা উপদেশ কবূল করলো না তখন আমি নিষেধকারীদেরকে বাঁচিয়ে নিলাম এবং ঐ পাপী অত্যাচারীদেরকে শাস্তিতে জড়িয়ে ফেললাম।" হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ "আমি তো জানতে পারছি যে, নিষেধকারীরা মুক্তি পেয়েছিল। কিন্তু অন্যদের ব্যাপারে এটা বুঝছি না। বিপদ তো এটাই যে, আমরাও লোকদেরকে পাপ করতে দেখছি, অথচ কিছুই বলছি না।" ইকরামা (রঃ) বলেন– তখন আমি বললাম, আমি আপনার উপর উৎসর্গীকৃত হই। এই দ্বিতীয় দলটিও তো ঐ পাপীদের উপর খুবই অসন্তুষ্ট

ছিল এবং তাদের বিরুদ্ধাচরণ করতো। তারা বলতোঃ "ধ্বংসের সম্মুখীন এই দলটিকে উপদেশ দিয়ে লাভ কি?" এর দ্বারা এটা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, এই দ্বিতীয় দলটিকে শাস্তিতে শরীক করা যেতে পারে না। আমার এ কথা শুনে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এতো খুশী হলেন যে, তিনি আমাকে দু'টি ভাল কাপড় পুরস্কার দিলেন।"[১]

কথিত আছে যে, শনিবার দিন মাছগুলোকে নদীর ধারে ধারে বহু সংখ্যায় দেখা যেতো। আর যখন সন্ধ্যা হয়ে যেতো তখন পরবর্তী শনিবার না আসা পর্যন্ত মাছগুলোকে আর দেখা যেতো না। একদা একটি লোক জালের দড়ি ও পেরেক নিয়ে নদীতে গেল এবং জাল পেতে আসলো। শনিবার দিন একটি বড় মাছ জালে আটকা পড়ে গেল। শনিবার গত হয়ে যখন রবিবারের রাত আসলো তখন সে মাছটি ধরে এনে রান্না করলো এবং খেতে লাগলো। রান্না করা মাছের সুগন্ধ পেয়ে লোকেরা তার কাছে দৌড়িয়ে আসলো এবং তাকে জিজ্ঞেস করলে সে অস্বীকার করলো যে, সে একটি মাছ ধরে এনেছিল। পরবর্তী শনিবার আসলে সে পুনরায় ঐ কাজই করলো এবং রবিবারে ওটাকে ভুনা করে খেলো। মাছের গন্ধ পেয়ে লোকেরা পুনরায় তার কাছে দৌড়িয়ে আসলো এবং সে মাছ কোথায় পেলো তা জিজ্ঞেস করলো। সে উত্তরে বললোঃ "আমি যা করছি তোমরাও তা-ই কর।" তারা জিজ্ঞেস করলোঃ "তুমি কি কি করে থাক?" উত্তরে সে নিজের কৌশলের কথা বলে দিলো। অন্যান্য লোকেরাও তখন ঐ কৌশলের উপর কাজ করতে লাগলো। শেষ পর্যন্ত কাজটি সাধারণভাবে হতে লাগলো। রবয নামে তাদের একটি শহর ছিল। রাত্রিকালে তারা শহরটির দরজা বন্ধ করে রাখতো। রাতের মধ্যেই তাদের আকৃতির পরিবর্তন ঘটে। তাদের প্রতিবেশী গ্রামের লোকেরা, যারা জীবিকা অন্বেষণে সকালে ঐ শহরের মধ্যে প্রবেশ করতো, দরজা বন্ধ দেখলো। বহুক্ষণ ধরে ডাকলো, কিন্তু কোন উত্তর পেলো না। বাধ্য হয়ে তারা দেয়ালের উপর চড়লো। দেখে যে, তারা বানরে পরিণত হয়েছে। তারা লোকগুলোর নিকটে এসে তাদেরকে জড়িয়ে ধরলো। সূরায়ে বাকারায় আমরা এটা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি। ওখানে দেখে নেয়াই যথেষ্ট।

অন্য একটি উক্তি এও রয়েছে যে, নীরবতা অবলম্বনকারী দলটিও শাস্তিতে পতিত হয়েছিল। কেননা, তারা পাপীদেরকে মাছ ভাজতে ও খেতে দেখেও নিষেধ করতো না। শুধু একটি দল নিষেধ করেছিল। শেষ পর্যন্ত পাপীদের কাজ

১.এটা আবদুর রাযযাক (রঃ) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে তাখরীজ করেছেন।

সাধারণভাবে অনুসৃত হতে শুরু হয়েছিল। তখন নীরবতা অবলম্বনকারী দলটি নিষেধকারী দলটিকে বলেছিলোঃ "এই অত্যাচারী দলটিকে আর নিষেধ করছো কেন? তারা তো কঠিন শাস্তিতে জড়িত হয়ে পড়বেই। আমরা তো তাদের এই আমলের প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট।" হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এই তিনটি দলের মধ্যে শুধুমাত্র নিষেধকারী দলটি মুক্তি পেয়েছিল। অবশিষ্ট দু'টি দলই শাস্তিতে জড়িত হয়েছিল কিন্তু ইকরামা (রঃ)-এর উপরোক্ত কথা বলার পর মনে হয় তিনি তাঁর এই উক্তি হতে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। কেননা, তিনি ইকরামা (রঃ)-কে খুশী হয়ে দু'টি পোশাক পুরস্কার দিয়েছিলেন। তাঁর এ উক্তির চাইতে প্রত্যাবর্তনকৃত উক্তিটিই বেশী উত্তম যে, নীরবতা অবলম্বনকারী লোকেরাও মুক্তি পেয়েছিল। কেননা, আল্লাহ পাকের اَخَذْنَا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا بِعَذَابٍ بَئِيْسٍ -এ কথা দ্বারাও এটাই প্রমাণিত হয় যে, ঐ পাপীদের ছাড়া অবশিষ্ট দু'টি দলই মুক্তি পেয়েছিল। بَئِيْسٌ শব্দের অর্থ شَدِيْدٌ (কঠিন) বা اَلِيْمٌ (যন্ত্রণাদায়ক)। এ অর্থগুলোর ভাবার্থ প্রায় একই। আল্লাহ তা'আলাই সর্বাপেক্ষা উত্তম জ্ঞানের অধিকারী। خٰسِئِيْنَ শব্দের অর্থ লাঞ্ছিত ও ঘৃণিত।

১৬৭। (আরো স্মরণ কর) তোমার প্রতিপালক ঘোষণা করলেন যে, তিনি তাদের (ইয়াহূদীদের) উপর কিয়ামত পর্যন্ত এমন সব লোককে শক্তিশালী করে প্রেরণ করতে থাকবেন, যারা তাদেরকে কঠিনতর শাস্তি দিতে থাকবে (এবং তারা সর্বদা নির্যাতিত ও নিপীড়িত হবে), নিঃসন্দেহে তোমার প্রতিপালক শাস্তিদানে ক্ষীপ্রহস্ত, আর নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল ও অনুগ্রহশীল।

١٦٧- وَاِذْ تَاَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَنْ يَّسُوْمُهُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِؕ اِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيْعُ الْعِقَابِ ۖۚ وَاِنَّهٗ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

تَاَذَّنَ শব্দটি تَفَعَّلَ ওযনে اَذَانٌ শব্দ হতে গৃহীত। অর্থাৎ হুকুম করেছেন বা জানিয়েছেন। আর যেহেতু এই আয়াতে কালামের শক্তির 'শান' রয়েছে, সেহেতু لَيَبْعَثَنَّ শব্দের ل কসমের ফায়েদা দিচ্ছে। এজন্যে ل -এর পরেই يَبْعَثَنَّ আনা

হয়েছে। هُمْ সর্বনামটি ইয়াহূদীদের দিকে ফিরছে। অর্থাৎ আল্লাহ হুকুম দিয়েছেন বা জানিয়ে দিয়েছেন যে, ঐ ইয়াহূদীদের উপর কিয়ামত পর্যন্ত কঠিন শাস্তি নাযিল হতে থাকবে। অর্থাৎ তাদের অবাধ্যতা, ঔদ্ধত্যপনা এবং প্রতিটি কাজে কর্মে প্রতারণার কারণে তারা লাঞ্ছনা ও অপমানজনক শাস্তি পেতে থাকবে। কথিত আছে যে, হযরত মূসা (আঃ) তাদের উপর সাত বছর বা তেরো বছর পর্যন্ত খেরাজ ধার্য করেছিলেন। আর তিনিই সর্বপ্রথম খেরাজ চালু করেছিলেন। অতঃপর ঐ ইয়াহূদীদের উপর ইউনানী, কাশদানী এবং কালদানীরা আধিপত্য লাভ করে। তারপর তারা খ্রীষ্টানদের ক্রোধের শিকার হয়। তারা তাদেরকে লাঞ্ছিত করতে থাকে। তাদের নিকট থেকে তারা জিযিয়া ও খেরাজ আদায় করতে থাকে। যখন ইসলামের আবির্ভাব ঘটে তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাদের উপর প্রাধান্য লাভ করেন। তারা যিম্মী ছিল এবং জিযিয়া কর প্রদান করতো।[১] সর্বশেষে তারা দাজ্জালের সাহায্যকারী রূপে বের হবে। কিন্তু মুসলমানরা তাদেরকে হত্যা করবে। এই উদ্দেশ্যে হযরত ঈসা (আঃ) মুসলমানদের সাথে সহযোগিতা করবেন। এসব কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে ঘটবে।

আল্লাহ পাকের উক্তিঃ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ অর্থাৎ নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা সত্বরই পাপীদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণকারী। وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ কিন্তু তিনি অবশ্যই ক্ষমাশীল ও দয়ালুও বটে। যে তাওবা করে তাকে তিনি ক্ষমা করে থাকেন। এখানেও একই কথা যে, আযাব ও রহমতের বর্ণনা সাথে সাথেই হয়েছে। যেন শাস্তি থেকে ভয় প্রদর্শনের কারণে মানুষ নৈরাশ্যের মধ্যে হাবুডুবু না খায়। তিনি উৎসাহ প্রদান ও ভয় প্রদর্শন একই সাথে করেছেন, যাতে মানুষ ভয় ও আশার মধ্যে থাকতে পারে।

১৬৮। (অতঃপর) আমি তাদেরকে খণ্ড খণ্ড করে বিভিন্ন দলে উপদলে দুনিয়ায় অসংখ্য জাতির মধ্যে বিস্তৃত করেছি, তাদের কতক লোক সদাচারী, আর কিছু লোক ভিন্নতর (অনাচারী), আর আমি ভাল ও

١٦٨- وَقَطَّعْنٰهُمْ فِى الْاَرْضِ
اُمَمًا مِنْهُمُ الصّٰلِحُوْنَ وَمِنْهُمْ
دُوْنَ ذٰلِكَ وَبَلَوْنٰهُمْ

১. সাঈদ ইবনে জুবাইর (রঃ), ইবনে জুরাইজ (রঃ), সুদ্দী (রঃ) এবং কাতাদা (রঃ) এরূপই বলেছেন।

بِالْحَسَنٰتِ وَالسَّيِّاٰتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ○

মন্দের মধ্যে নিপতিত করে তাদেরকে পরীক্ষা করে থাকি, যাতে তারা আমার পথে ফিরে আসে।

١٦٩- فَخَلَفَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَّرِثُوا الْكِتٰبَ يَاْخُذُوْنَ عَرَضَ هٰذَا الْاَدْنٰى وَيَقُوْلُوْنَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَاِنْ يَّاْتِهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُهٗ يَاْخُذُوْهُ اَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِّيْثَاقُ الْكِتٰبِ اَنْ لَّا يَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوْا مَا فِيْهِ وَالدَّارُ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ○

১৬৯। অতঃপর তাদের অযোগ্য উত্তরসুরীরা একের পর এক তাদের স্থলাভিষিক্ত হয় এবং তারা কিতাবেরও উত্তরাধিকারী হয়ে এই নিকৃষ্ট দুনিয়ার স্বার্থাবলী করায়ত্ত করে আর বলে– আমাদেরকে ক্ষমা করা হবে, কিন্তু ওর অনুরূপ সামগ্রী তাদের নিকট আসলে ওটাও তারা গ্রহণ করে, তাদের নিকট হতে কি কিতাবের প্রতিশ্রুতি নেয়া হয়নি যে, আল্লাহর নামে সত্য ছাড়া কিছুই বলবে না? আর কিতাবে যা রয়েছে তা তো তারা অধ্যয়নও করে, আর মুত্তাকী লোকদের জন্যে পরকালের সামগ্রীই উত্তম সামগ্রী, তোমরা কি এতটুকু কথাও অনুধাবন করতে পার না।

١٧٠- وَالَّذِيْنَ يُمَسِّكُوْنَ بِالْكِتٰبِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ اِنَّا لَا نُضِيْعُ اَجْرَ الْمُصْلِحِيْنَ ○

১৭০। যারা আল্লাহর কিতাবকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে এবং নামায কায়েম করে (তারা অবশ্যই তার প্রতিদান পাবে), আমি তো সৎকর্মশীলদের কর্মফল নষ্ট করি না।

ইরশাদ হচ্ছে– আল্লাহ তা'আলা বানী ইসরাঈলকে দলে দলে বিভক্ত করে দুনিয়ায় ছড়িয়ে দিয়েছেন। যেমন তিনি বলেনঃ "এরপর আমি বানী ইসরাঈলকে বলেছিলাম– ভু-পৃষ্ঠে অবস্থান করতে থাক, যখন পরকালের দিন আসবে তখন আমি তোমাদের সকলকেই একত্রিত করবো।" এই বানী ইসরাঈলের মধ্যে ভাল লোকও রয়েছে এবং মন্দ লোকও রয়েছে। যেমন জ্বীনেরা বলতো– "আমাদের মধ্যে ভাল জ্বীনও রয়েছে এবং মন্দ জ্বীনও রয়েছে। আমাদের মধ্যে বিভিন্ন দল রয়েছে।" আল্লাহ পাক বলেনঃ "আমি তাদেরকে শান্তি ও আরামের যুগ দিয়ে এবং ভয় ও বিপদের যুগ দিয়ে দু'প্রকারেই পরীক্ষা করেছি, যেন তারা শিক্ষা গ্রহণ করে খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকে।

আল্লাহ তা'আলার উক্তিঃ এরপর তাদের অযোগ্য উত্তরসুরীরা একের পর এক তাদের স্থলাভিষিক্ত হয় এবং তারা কিতাবেরও উত্তরাধিকারী হয়ে এই নিকৃষ্ট দুনিয়ার স্বার্থাবলী করায়ত্ত করে। এই স্থলাভিষিক্ত লোকদের মধ্যে কোনই মঙ্গল নিহিত নেই। তারা শুধু নিজেরাই তাওরাত পাঠ করার ওয়ারিস হয়। অপরকে তারা পাঠ করায়নি। মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, এর দ্বারা খ্রীষ্টানদেরকে বুঝানো হয়েছে। বরং এ আয়াতটিতো আরো সাধারণ। খ্রীষ্টান ও অখ্রীষ্টান সবাই সত্য কথা বিক্রী করে এবং এর দ্বারা পার্থিব সম্পদ উপার্জন করে। আর নিজেকে এইভাবে প্রতারিত করে যে, পরে তাওবা করে নেবে। কিন্তু আবার এরূপ কোন সুযোগ পেয়ে গেলে তখনও তারা পূর্বের ন্যায় দুনিয়ার বিনিময়ে দ্বীনকে বিক্রী করে ফেলে। কিতাবের আয়াতগুলোর পরিবর্তন ঘটিয়ে দেয় এবং ভুল ফতওয়া দিয়ে বসে। পার্থিব সম্পদ লাভ করার যখনই তারা সুযোগ পায় তখনই সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে। হারাম ও হালালের মোটেই পরওয়া করে না। দুনিয়ার হারাম বস্তু তারা গ্রহণ করে এবং পরে তাওবার কাজে বসে পড়ে। এভাবে তারা আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে। কিন্তু আবার যখন দুনিয়ার কোন সম্পদ তাদের সামনে আসে তখন তারা ঐদিকে পা বাড়িয়ে দেয়। আল্লাহর কসম! এরা অতি নিকৃষ্ট উত্তরসুরী। নবীদের পরে এরাইতো ছিল তাওরাত ও ইঞ্জীলের উত্তরাধিকারী। আর আল্লাহ তা'আলা কিতাবে তাদের কাছে অঙ্গীকারও নিয়েছিলেন। অন্য জায়গায় ইরশাদ হচ্ছে– "ঐ ভাল লোকদের পর এমন খারাপ লোকেরা তাদের স্থলাভিষিক্ত হয় যারা নামাযকে নষ্ট করে দেয়, আল্লাহর কাছে বহু দূরের আশা রাখে এবং নিজেকে প্রতারিত করে। দুনিয়া কামাবার কোন সুযোগ এসে গেলে তখন তারা (হারাম-হালাল) কিছুই দেখে না। কোন জিনিসই

তাদেরকে পাপকার্য থেকে বিরত রাখতে পারে না। যা পায় তা-ই খায়। না হালালের কোন পরওয়া করে, না হারামের প্রতি কোন লক্ষ্য রাখে।”

বানী ইসরাঈলের মধ্যে যে কাযী হতো সে ঘুষখোর হতো। তাদের ভাল লোকেরা ঐ ঘুষখোর কাযীকে সরিয়ে অন্য কাযী নিযুক্ত করতো। তার উপর চাপ দেয়া হতো যে, ঘুষ নিয়ে যেন মুকদ্দমার ফায়সালা না করা হয়। সে ওয়াদা অঙ্গীকার করে যখন কাযী নিযুক্ত হয়ে যেতো তখন দু'হাতে ঘুষ লুটতে শুরু করে দিতো এবং বলতোঃ “চিন্তার কোন কারণ নেই, আল্লাহ ক্ষমা করে দিবেন।” অন্যেরা তাতে আপত্তি করতো এবং তাকে লাঞ্ছনা, গঞ্জনা ও ভর্ৎসনা করতো। কিন্তু যখন এই ঘুষখোর মারা যেতো এবং ভর্ৎসনাকারীদের কাযী নিযুক্ত করে দেয়া হতো তখন তারাও ঘুষ খেতে শুরু করে দিতো। এজন্যেই আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, দুনিয়া তাদের কাছে আসলো, আর তারা ওকে একত্রিত করতে শুরু করে দিলো। আল্লাহ পাক বলেনঃ “তাদের নিকট হতে কি কিতাবের ওয়াদা নেয়া হয়নি যে, আল্লাহর নামে সত্য ছাড়া কিছুই বলবে না?” তাদের কাছে ওয়াদা নেয়া হয়েছিল যে, তারা মানুষকে সত্য বলার উপদেশ দেবে এবং সত্য কথাকে গোপন করবে না। কিন্তু তারা সেই হুকুমকে পৃষ্ঠের পিছনে ছুঁড়ে ফেলে এবং অল্প মূল্যের বিনিময়ে আয়াতগুলোকে বদলিয়ে দেয় বা ওগুলোর ভুল অর্থ করে। তাদের এই উপার্জন কতই না নিকৃষ্ট উপার্জন। তারা আল্লাহর কাছে পাপমোচনের আশা রাখে বটে, কিন্তু পাপকার্য ছাড়তে চায় না এবং তাওবার উপর কায়েম থাকে না।

ইরশাদ হচ্ছে– “যদি আল্লাহকে ভয় কর তবে আখিরাতের ঘর তোমাদের জন্যে উত্তম। দুনিয়ার উপর তোমরা জীবন দিচ্ছ কেন? তোমরা কি এতটুকু কথাও অনুধাবন করতে পার না?” আল্লাহ তা'আলা বড় ও উত্তম পুরস্কারের প্রতি উৎসাহ প্রদান করছেন এবং পাপের মন্দ পরিণাম থেকে ভয় দেখাচ্ছেন। তিনি বলছেন যে, এই দ্বীন বিক্রীকারীরা কি এতটুকুও জ্ঞান রাখে না? অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ঐ লোকদের প্রশংসা করছেন যারা আল্লাহর কিতাবকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করেছে, যে কিতাব তাদেরকে মুহাম্মাদ (সঃ)-এর অনুসরণের দিকে আহ্বান করছে। এ সবকিছু তাদের কিতাব তাওরাত এবং ইঞ্জীলে লিপিবদ্ধ রয়েছে। তাই আল্লাহ পাক বলেনঃ “যারা আল্লাহর কিতাবকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে এবং নামায কায়েম করে, তাঁর আদেশ নিষেধকে পূর্ণভাবে মেনে চলে, আর পাপকার্য থেকে বিরত থাকে, তাদের জেনে রাখা উচিত যে, এরূপ সৎকর্মশীলদের কর্মফল আমি কখনও বিনষ্ট করি না।”

١٧١- وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ○

১৭১। (ঐ সময়টিও স্মরণযোগ্য) যখন আমি বানী ইসরাঈলের ঊর্ধ্বে পাহাড়কে স্থাপন করি, ওটা ছিল কোন একটি ছায়ার ন্যায়, তারা তখন মনে করছিল যে, ওটা তাদের উপর পড়ে যাবে, (তখন আমি বললাম) তোমাদেরকে যা (যে কিতাব) দিয়েছি তা দৃঢ়ভাবে শক্ত হাতে ধারণ কর এবং ওতে যা রয়েছে তা স্মরণ রাখো, আশা করা যায় যে, তোমরা পাপাচার হতে বেঁচে থাকবে।

আল্লাহ পাক বলেনঃ আমি যখন বানী ইসরাঈলের মাথার উপর (তূর) পাহাড়কে ছাদের মত লটকিয়ে দিলাম। যেমন আল্লাহ তা'আলার وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ.... (অর্থাৎ "আমি তূর পাহাড়কে তাদের উপর উঠালাম") (২ঃ ৯৩) এই উক্তি দ্বারা এটা প্রকাশিত হয়েছে। ফেরেশ্তারা এই পাহাড়টিকে উঠিয়ে তাদের মাথার উপর খাড়া করে রেখেছিলেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, মূসা (আঃ) যখন বানী ইসরাঈলকে নিয়ে পবিত্র ভূমির দিকে যাচ্ছিলেন এবং ক্রোধ প্রশমিত হওয়ার পর ফলকগুলো উঠিয়ে নিয়েছিলেন, আর তাবলীগের কর্তব্য সম্পর্কিত আল্লাহর নির্দেশ তাদেরকে শুনিয়েছিলেন তখন তাদের কাছে কঠিন ঠেকেছিল বলে তারা তা প্রত্যাখ্যান করেছিল। ঐ সময় আল্লাহ তা'আলা তাদের মাথার উপর পাহাড়কে এনে খাড়া করে রেখেছিলেন, যেমন মাথার উপর ছাদ থাকে। ফেরেশতারা ঐ পাহাড়টিকে ধরে রয়েছিলেন এবং মূসা (আঃ) তাদেরকে বলেছিলেনঃ "দেখ, এটা হচ্ছে আল্লাহর অহী ও তার নির্দেশাবলী। এতে হালাল, হারাম, আদেশ ও নিষেধের উল্লেখ রয়েছে। তোমরা কবূল করছো কি না?"[১] তারা তাঁকে উত্তরে বলেছিলঃ "তাতে কি নির্দেশাবলী রয়েছে তা আমাদেরকে শুনিয়ে দিন। যদি এর বিধানগুলো সহজ হয় তবে অবশ্যই আমরা সেগুলো কবূল করবো।" হযরত মূসা (আঃ) বললেনঃ "যা আছে তা-ই তোমাদেরকে কবূল করতে হবে।" তারা বললোঃ "না, যে পর্যন্ত আমরা অবহিত

১. এটা ইমাম নাসাঈ (রঃ) সাঈদ ইবনে জুবাইর (রঃ) হতে এবং তিনি হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন।

না হবো সেই পর্যন্ত কবূল করবো না।” কয়েকবার এই প্রশ্ন ও উত্তর চলতে থাকে। শেষ পর্যন্ত পাহাড়কে আল্লাহ নির্দেশ দিলেন যে, ওটা যেন স্বীয় জায়গা হতে উঠে গিয়ে আকাশে উড়তে উড়তে তাদের মাথার উপর ছেয়ে যায়। পাহাড় তাই করলো। মূসা (আঃ) তাদেরকে বললেনঃ “মহা মহিমান্বিত আল্লাহ যা কিছু বলছেন তা মানছো কি না? যদি তোমরা তাওরাতের বিধানসমূহ না মানো তবে এই পাহাড় তোমাদের উপর পড়ে যাবে।” যখন তারা দেখলো যে, পাহাড় তাদের উপর পড়তেই চায় তখন মাথার বাম দিকের ভরে সিজদায় পড়ে গেল। আর ডান চক্ষু দিয়ে পাহাড়টির দিকে তাকাতে থাকলো যে, সত্যিই ওটা তাদের উপর পড়ে যায় না কি! এ কারণেই ইয়াহূদীরা যখনই সিজদা করে তখন বাম দিকের ভরেই করে এবং বলেঃ “শাস্তি উঠে যাওয়ার স্মারক হিসেবে আমরা এই সিজদা করলাম।” আবূ বকর (রঃ) বলেন যে, যখন হযরত মূসা (আঃ) ফলকগুলো ছুঁড়ে ফেলেছিলেন যা ছিল আল্লাহর কিতাব এবং যা তাঁর কাছেই লিখিত হয়েছিল, তখন যমীনের প্রত্যেক পাহাড়, প্রতিটি গাছ এবং সমস্ত পাথর কেঁপে উঠেছিল! এ কারণেই প্রত্যেক ইয়াহূদী তাওরাত পাঠের সময় স্বীয় মস্তক আন্দোলিত করে থাকে।[১] আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে বেশী জানেন।

১৭২। (হে নবী সঃ)! যখন তোমার প্রতিপালক বানী আদমের পৃষ্ঠদেশ হতে তাদের বংশধরকে বের করলেন এবং তাদেরকেই তাদের উপর সাক্ষী বানিয়ে জিজ্ঞেস করলেন– আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই? তারা সমস্বরে উত্তর করলো– হ্যাঁ! আমরা সাক্ষী থাকলাম; (এই স্বীকৃতি ও সাক্ষী বানানো এই জন্যে যে,) যাতে তোমরা কিয়ামতের দিন বলতে না পার– আমরা এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অনবহিত ছিলাম।

١٧٢- وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي
آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَ
أَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ
بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ
تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا
عَنْ هَذَا غَفِلِينَ ○

১. এটা সানীদ ইবনে দাঊদ (রঃ) স্বীয় তাফসীরে হাজ্জাজ ইবনে মুহাম্মাদ (রঃ) হতে তাখরীজ করেছেন এবং তিনি আবূ বকর ইবনে আবদুল্লাহ (রঃ) হতে বর্ণনা করেছেন।

১৭৩। অথবা তোমরা যেন কিয়ামতের দিন এ কথা বলতে না পার– আমাদের পূর্ব-পুরুষরাই তো আমাদের পূর্বে শির্‌ক করেছিল, আমরা ছিলাম তাদের পরবর্তী বংশধর, সুতরাং আপনি কি আমাদেরকে সেই ভ্রান্ত ও বাতিলদের কৃতকর্মের দরুন ধ্বংস করবেন।

١٧٣- اَوْ تَقُوْلُوْٓا اِنَّمَآ اَشْرَكَ اٰبَآؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنْۢ بَعْدِهِمْ اَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُوْنَ ۝

১৭৪। এভাবেই আমি নিদর্শনাবলী বিশদভাবে বিবৃত করে থাকি, যাতে তারা (কুফরী হতে তাওহীদের দিকে) ফিরে আসে।

١٧٤- وَكَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ۝

ইরশাদ হচ্ছে– আল্লাহ তা'আলা আদম (আঃ)-এর সন্তানদেরকে তারই পৃষ্ঠদেশ হতে রোযে আযলে বাইরে বের করেন। তারা নিজেরাই নিজেদের উপর সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ তাদের প্রতিপালক ও মালিক। তিনি ছাড়া অন্য কেউ উপাস্য নেই। এটাই হচ্ছে মানব প্রকৃতির স্বীকারোক্তি এবং এটাই তাদের স্বভাব। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "তোমরা তোমাদের পূর্ণ মনোযোগ সত্য দ্বীনের প্রতি প্রতিষ্ঠিত রাখ। আল্লাহ এই প্রকৃতির উপরই মানুষের স্বভাব বানিয়েছেন। আল্লাহ যে জিনিসকে যেভাবে সৃষ্টি করেছেন ওটা ঐভাবেই প্রতিষ্ঠিত থাকবে, ওতে কোন পরিবর্তন ঘটবে না।" রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ প্রত্যেক সন্তান স্বীয় প্রকৃতির উপর সৃষ্ট হয়।[১] রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ আল্লাহ তা'আলা বলেন– আমি আমার বান্দাদেরকে শির্‌ক থেকে দূরে সরিয়ে সৃষ্টি করেছি। কিন্তু শয়তানরা এসে তাদেরকে দ্বীনে হক থেকে সরিয়ে দেয় এবং আমি যা হালাল রেখেছি তা তারা হারাম করিয়ে দেয়। অন্য বর্ণনায় আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "প্রত্যেক সন্তান স্বীয় ইসলামী মাযহাবের উপর সৃষ্ট হয়ে থাকে। কিন্তু তার পিতা-মাতা তাকে ইয়াহূদী, খ্রীষ্টান এবং মাজূসী বানিয়ে দেয়। যেমন চতুষ্পদ জন্তু ভাল ও নিখুঁত ভাবেই সৃষ্ট হয়, কোনটি কি কানকাটা রূপে সৃষ্ট হয়?

১. এ হাদীসটি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে।

কিন্তু পরে তার কান কেটে নিয়ে তাকে বিগড়িয়ে দেয়া হয়।" আসওয়াদ ইবনে সারী (রাঃ) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে আমি চারটি জিহাদে শরীক ছিলাম। মুজাহিদরা কাফিরদেরকে হত্যা করে তাদের শিশু সন্তানদের ধরে নেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) এ সংবাদ পেয়ে খুবই অসন্তুষ্ট হন। তিনি বলেনঃ লোকদের কি হয়েছে যে, তারা শিশুদেরকে ধরতে রয়েছে? কোন একজন জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! এরা কি মুশরিকদের শিশু নয়? উত্তরে তিনি বললেনঃ তোমাদের মধ্যকার ভাল ভাল লোকেরাও তো মুশ্‌রিকদেরই সন্তান। কোন প্রাণ এমন নেই যা ইসলামের ভিত্তির উপর সৃষ্ট হয় না। যে পর্যন্ত না সে পিতা মাতার ভাষা শিখে নেয় সে পর্যন্ত মুসলমানই থাকে। অতঃপর তার পিতামাতাই তাকে খ্রীষ্টান বা ইয়াহূদী বানিয়ে দেয়।[১] হাদীসসমূহে বর্ণিত আছে যে, আদম (আঃ)-এর পৃষ্ঠদেশ হতে তার সন্তানদেরকে বের করা হয় এবং তাদেরকে ডানদিক ওয়ালা ও বামদিক ওয়ালা বানানো হয়। আর তাদের নিকট থেকে সাক্ষ্য নেয়া হয় যে, আল্লাহই তাদের প্রতিপালক।

হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) বলেছেন, কিয়ামতের দিন একজন জাহান্নামীকে জিজ্ঞেস করা হবে– যদি তুমি যমীনের সবকিছুর মালিক হয়ে যাও, তবে এ সবকিছু মুক্তিপণ হিসেবে দিয়েও কি তুমি জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভ করতে চাবে? সে উত্তরে বলবেঃ হ্যাঁ। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেনঃ "আমি তো তোমার কাছে এর চেয়ে বহু কম চেয়েছিলাম! আমি আদম (আঃ)-এর পৃষ্ঠদেশ থেকেই তোমার কাছে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম যে, তুমি আমার সাথে অন্য কাউকেও শরীক করবে না। কিন্তু তুমি শরীক করে বসেছিলে।"[২]

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেন– আরাফার দিন (৯ই যিলহজ্ব) নু'মান নামক স্থানে রূহসমূহের নিকট ওয়াদা নেয়া হয়েছিল। আদম (আঃ)-এর পৃষ্ঠদেশ হতে ওগুলোকে বের করে পিঁপড়ার মত ছড়িয়ে দেয়া হয়েছিল এবং ওগুলোকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলঃ "আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই?" সবগুলোই সমস্বরে উত্তর দিয়েছিলঃ "হ্যাঁ. অবশ্যই।"[৩]

১. এটা ইবনে জারীর বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম আহমাদ (রঃ) ও ইমাম নাসাঈ (রঃ) এটা তাখরীজ করেছেন।

২. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ), ইমাম বুখারী (রঃ) এবং ইমাম মুসলিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

৩. এটা ইমাম আহমাদ (রঃ), ইমাম নাসাঈ (রঃ) এবং ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। ইমাম হাকিমও (রঃ) এটা স্বীয় গ্রন্থ মুসতাদরিকে বর্ণনা করেছেন।

জাবির (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, যহ্হাক ইবনে মাযাহিম (রঃ)-এর একটি ছেলে মারা যায় যে মাত্র ছ'দিনের শিশু ছিল। তখন যহ্হাক (রঃ) বলেনঃ "হে জাবির? যখন তুমি একে কবরে রাখবে তখন তার চেহারাটি খোলা অবস্থায় রাখবে। কেননা, শিশুটিকে বসানো হবে এবং তাকে জিজ্ঞাসাবাদও করা হবে।" (জাবির বলেনঃ) আমি তখন তাই করলাম। অতঃপর আমি যহ্হাক (রঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনার ছেলেকে কি জিজ্ঞেস করা হবে এবং কে জিজ্ঞেস করবেন? উত্তরে তিনি বললেনঃ "তাকে রোযে আযলের অঙ্গীকারের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে, যখন আদম (আঃ)-এর পৃষ্ঠদেশে রূহ্সমূহের নিকট থেকে দাসত্বের স্বীকারোক্তি নেয়া হয়েছিল।" আমি পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম, ঐ অঙ্গীকার কি ছিল? তিনি উত্তর দিলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, "আল্লাহ তা'আলা যখন আদম (আঃ)-এর পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করলেন তখন ওর মধ্য থেকে ঐ রূহ্গুলো বেরিয়ে পড়লো যেগুলো কিয়ামত পর্যন্ত আদম (আঃ)-এর বংশ থেকে পৃথিবীতে আসবে। তারপর ওদের নিকট থেকে ওয়াদা নেয়া হয় যে, তারা ইবাদত শুধু আল্লাহরই করবে, অন্য কাউকেও তাঁর শরীক বানাবে না। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাদের জীবিকার জিম্মাদার হন। এরপর ঐ আত্মাগুলোকে আদম (আঃ)-এর পৃষ্ঠদেশে ফিরিয়ে দেয়া হয়। যে পর্যন্ত এই অঙ্গীকারাবদ্ধরা সৃষ্ট হতে থাকবে সে পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না। এখন যে ব্যক্তি পরবর্তী অঙ্গীকার গ্রহণের সুযোগ পাবে এবং ওটাকে সুন্দরভাবে আদায় করবে, পূর্ববর্তী অঙ্গীকারও তার পক্ষে লাভজনক হবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি পরবর্তী অঙ্গীকার পালনে ব্যর্থ হবে, পূর্ববর্তী অঙ্গীকার তার জন্যে মোটেই লাভজনক হবে না। আর যে ব্যক্তি পরবর্তী অঙ্গীকারে আবদ্ধ হওয়ার ও ভাল ভাল কাজ করার সুযোগ লাভের পূর্বেই মারা যাবে, তার ব্যাপারে বুঝতে হবে যে, পূর্ববর্তী অঙ্গীকার অনুযায়ী ইসলামী ফিতরাতের উপরই সে মারা গিয়েছে।" এ দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এ সবকিছু ভালভাবে অবগত ছিলেন। আল্লাহ তা'আলাই এ সম্পর্কে সবচেয়ে ভাল জানেন।

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, "আল্লাহ তা'আলা যখন হযরত আদম (আঃ) হতে তাঁর সন্তানদেরকে বের করেন তখন তারা এমনিভাবে বেরিয়ে পড়ে যেমনিভাবে চুলে চিরুণী করার সময় চুলগুলো চিরুণীর মধ্য চলে আসে। তখন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে জিজ্ঞেস করেনঃ আমি কি তোমাদের প্রভু নই? তারা সমস্বরে উত্তর দিলো– হ্যাঁ, অবশ্যই আপনি আমাদের প্রভু।" ফেরেশ্তারা বললেনঃ "কিয়ামতের দিন তোমরা যেন বলতে না পার যে, এটা তোমরা অবগত ছিলে না এ জন্যে আমরা সাক্ষী থাকলাম।"

এই আয়াতের ব্যাপারে হযরত উমার ইবনে খাত্তাব (রাঃ) বলেনঃ এ সম্পর্কে আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞাসিত হতে শুনেছি। উত্তরে তিনি বলেছিলেনঃ হযরত আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করার পর আল্লাহ তা'আলা তাঁর পৃষ্ঠদেশে হাত ফিরালে তাঁর সন্তানরা বের হতে শুরু করে। তখন তিনি বলেন, "এরা সব জান্নাতবাসী। কেননা, এরা জান্নাতবাসীরই আমল করবে।" আবার তিনি তাঁর পৃষ্ঠে হাত বুলালেন। এবারও অনেকগুলো সন্তান বেরিয়ে আসলো। তিনি বললেনঃ "এরা হচ্ছে জাহান্নামী। কেননা, এরা জাহান্নামীদেরই আমল করবে।" তখন একটি লোক জিজ্ঞেস করলোঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! তাহলে আমল করে লাভ কি"? রাসূলুল্লাহ (সঃ) উত্তরে বললেনঃ "আল্লাহ তা'আলা ঐ বান্দাকেই জান্নাতের জন্যে সৃষ্টি করেছেন যার আমল হবে জান্নাতবাসীর আমল এবং ওর উপরই সে মৃত্যুবরণ করবে। সুতরাং সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। পক্ষান্তরে তিনি তাঁর ঐ বান্দাকেই জাহান্নামের জন্যে সৃষ্টি করেছেন যার আমল হবে জাহান্নামবাসীর আমল এবং ওর উপরই সে মৃত্যুবরণ করবে। ফলে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।"[১]

হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ যখন হযরত আদম (আঃ)-এর পৃষ্ঠদেশ হতে তাঁর সন্তানগুলো বেরিয়ে আসে তখন প্রত্যেক মানুষের কপালে একটা আলোক চমকাচ্ছিল। সমস্ত সন্তানকে হযরত আদম (আঃ)-এর সামনে পেশ করা হয়। তিনি জিজ্ঞেস করেনঃ হে আমার প্রভু! এরা কারা? তিনি উত্তরে বলেনঃ এরা তোমারই বংশধর। একটি লোকের চেহারায় ঔজ্জ্বল্য খুবই বেশী ছিল। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, হে আমার প্রতিপালক! এটা কে? আল্লাহ উত্তর দিলেন, বহু যুগ পরে এটা তোমারই বংশের একটা লোক হবে যার নাম হবে দাঊদ (আঃ)। আদম (আঃ) জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহ! এর বয়স কত হবে? উত্তর হয়, ষাট বছর। তখন আদম (আঃ) বলেনঃ হে আমার প্রভু! আমি আমার বয়স থেকে চল্লিশ বছর একে দান করলাম। কিন্তু হযরত আদম (আঃ)-এর বয়স যখন শেষ হয়ে গেল তখন মালাকুল মাউত এসে তাঁর কাছে হাজির হলেন। তিনি ফেরেশ্তাকে বললেনঃ "এখনই কেন আসলেন? এখনও তো আমার বয়সের চল্লিশ বছর বাকী রয়েছে?" তখন তাঁকে বলা হয়, এই চল্লিশ বছর কি আপনি আপনার সন্তান দাঊদ (আঃ)-কে দান করেননি? তখন আদম (আঃ) তা অস্বীকার করলেন। এজন্যে

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ), ইমাম আবূ দাঊদ (রঃ), ইমাম নাসাঈ (রঃ) এবং ইমাম তিরমিযী (রঃ) বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী (রঃ) এ হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

তাঁর সান্তানদেরও অস্বীকার করার স্বভাব হয়ে গেছে। আদম (আঃ) ভুলে গিয়েছিলেন বলে তাঁর সন্তানরাও ভুলে যায়। আদম (আঃ) অপরাধ করেছিলেন বলে তাঁর সন্তানরাও অপরাধ করে।[১] আদম (আঃ) যখন তাঁর সন্তানদেরকে দেখেছিলেন তখন তাদের মধ্যে রুগ্ন, কুষ্ঠরোগী অন্ধ ইত্যাদি সবই ছিল। আদম (আঃ) বলেছিলেন– "হে আমার প্রতিপালক! এদেরকে এরূপ কেন করা হয়েছে?" আল্লাহ তা'আলা উত্তরে বলেছিলেন– "এর কারণ এই যে, যেন মানুষ সর্বাবস্থায় আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।" আদম (আঃ) পুনরায় জিজ্ঞেস করেন, "হে আমার প্রভু! আপাদমস্তক নূর বিশিষ্ট এই লোকগুলো কে?" উত্তর হয়েছিল– এরা হচ্ছে নবী।

কোন একটি লোক রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ) ! আমলগুলো নতুনভাবে কি ফলদায়ক, না যা হবার তা হয়েই গেছে? উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ আদম (আঃ) থেকে আল্লাহ তা'আলা তাঁর সন্তানদেরকে বের করেন। তারপর তিনি তাদের মুখ থেকেই তাঁর একত্ববাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি তাদেরকে স্বীয় দু' মুষ্টিতে ভরে নেন এবং বলেনঃ "এই মুষ্টির লোকগুলো জান্নাতী এবং ঐ মুষ্টির লোকগুলো জাহান্নামী। জান্নাত ও জাহান্নাম আমলের উপর নির্ভরশীল বটে, কিন্তু জান্নাতবাসীর আমল কার জন্যে সহজ হবে এবং জাহান্নামবাসীর আমল কার জন্যে সহজ হবে এটা আমার জানা আছে। এখন এর উপর ভিত্তি করেই কেউ জান্নাতী হবে এবং কেউ জাহান্নামী হবে। আযলের দিন আমি তাদেরকে জান্নাতী বা জাহান্নামী বানাইনি। তাদের আমলগুলোই তাদের যিম্মাদার। কিন্তু তখন থেকেই আমি তাদের আমল সম্পর্কে পূর্ণ অবহিত।"[২]

এজন্যেই আল্লাহ পাক বলেনঃ অমুক জান্নাতী হবে এবং অমুক জাহান্নামী হবে। এই ভাগ বন্টন আমার বলার উপর ভিত্তি করে নয়, বরং আমলের উপর ভিত্তি করে। আমরা হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ)-এর হাদীসটি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করলাম।

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন– "যখন আল্লাহ তা'আলা মাখলূককে সৃষ্টি করে ভাগ করে দিলেন, তখন আত্মাগুলো ডানদিকে ও বামদিকে অবস্থান করছিল। আল্লাহ তা'আলা উভয় দিকের আত্মাগুলোকেই জিজ্ঞেস করলেনঃ "আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই?" সবাই স্বীকারোক্তি করলোঃ "হ্যাঁ! আপনিই

১. এ হাদীসটি ইমাম তিরমিযী (রঃ) বর্ণনা করেছেন এবং তিনি এটাকে হাসান সহীহ বলেছেন।
২. এটা হিশাম ইবনে হাকীম (রঃ)-এর নীতিতে ইবনে জারীর (রঃ) ও ইবনে মিরদুওয়াই (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

আমাদের প্রতিপালক।" তারপর মহান আল্লাহ ডানদিকের ও বামদিকের আত্মাগুলোকে মিশ্রিত করে দিলেন। কেউ জিজ্ঞেস করলোঃ "হে আল্লাহ! এরা তো দু'ভাগে বিভক্ত ছিল, এদেরকে মিশ্রিত করলেন কেন?" আল্লাহ তা'আলা উত্তরে বললেনঃ তাতে কোন ক্ষতি নেই। নিজ নিজ আমলের কারণে এরা এখনও পৃথকই থাকবে। মিশ্রত করলেও ভাল ও মন্দের কখনও মিশ্রণ হতে পারে না। আমি এরূপ না করলে কিয়ামতের দিন পাপীরা বলতোঃ 'আমরা তো এটা অবগত ছিলাম না।' তবে ভাল লোকেরা কোন অবস্থাতেই এটা বলবে না। এখন ব্যাপার থাকলো শুধু আমলের উপর। তাহলে পাপীদের কোন আপত্তি করার বা অজানা থাকার ওযরের কোন সুযোগ থাকলো না । এটা আমরা আবূ উমামা (রাঃ)-এর হাদীসের ব্যাখ্যা দিলাম। কিয়ামত পর্যন্ত সৃষ্ট হতে থাকবে সেই সব আত্মার আকৃতি দান করলেন, কথা বলার শক্তি দিলেন, তাদের কাছে অঙ্গীকার নিলেন এবং ঐ অঙ্গীকারের উপর আসমান ও যমীনকে সাক্ষী বানানো হলো। আদমও (আঃ) সাক্ষী থাকলেন। নতুবা তারা তো কিয়ামতের দিন পরিষ্কারভাবে অস্বীকার করতো। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বললেনঃ "জেনে রেখো যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ মা'বূদ নেই। কাউকেই তোমরা আমার শরীক বানাবে না। আমি তোমাদের কাছে নবী-রাসূল প্রেরণ করবো। তারা তোমাদেরকে এই অঙ্গীকারের কথা স্মরণ করাবে। আমি কিতাবসমূহ প্রেরণ করবো। তখন আত্মাগুলো সমস্বরে বলবে ঃ "আপনি ছাড়া আমাদের অন্য কোন মা'বূদ নেই।" তারা আল্লাহর আনুগত্যের স্বীকারোক্তি করলো। আদম (আঃ)-কে তাদের সামনে আনা হলো। আদম (আঃ) দেখলেন যে, তাদের মধ্যে ধনী, গরীব, সুন্দর ও বিশ্রী সবই রয়েছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে আমার প্রভু! সমস্ত লোককে সমান করে সৃষ্টি করেননি কেন? তিনি উত্তরে বললেনঃ "কৃতজ্ঞ ও ধৈর্যশীল কে তা জানবার আমার খুবই আগ্রহ ছিল। সবাই এক হলে এ পরীক্ষা কিভাবে হতো।" তাদের মধ্যে নবীরা উজ্জ্বল প্রদীপের মত বিরাজ করছিলেন। এই রিসালাত ও নবুওয়াত ছিল দ্বিতীয় অঙ্গীকার যে, আল্লাহর একত্ববাদের স্বীকারোক্তির পর রিসালাতের স্বীকারোক্তিও হোক। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "আমি নবীদের কাছেও অঙ্গীকার নিয়েছিলাম। তা ছিল-দ্বীনে হানীফকে ছড়িয়ে দেয়ার জন্যে তোমরা দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হও, যা হচ্ছে একটা স্বাভাবিক ধর্ম।"এই সাক্ষ্য নেয়ার উদ্দেশ্য ছিল এই যে, মানুষ তাওহীদের প্রকৃতির উপর সৃষ্টি হয়েছে। এজন্যেই مِنْ اٰدَمَ না বলে مِنْ بَنِىْ اٰدَمَ বলা হয়েছে। অর্থাৎ শুধু আদম (আঃ) নয়, বরং আদম (আঃ)-এর সমস্ত সন্তানই তাওহীদের ফিতরাত বা প্রকৃতির উপর সৃষ্টি হয়েছে। আর এ জন্যেই مِنْ ظَهْرِهٖ না বলে مِنْ ظُهُوْرِهِمْ বলা হয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ

বলেনঃ "তিনি তোমাদের সকলকে এককভাবে যমীনের প্রতিনিধি বানিয়েছেন।" অন্য জায়গায় তিনি বলেছেন- "যেমন আমি তোমাদেরকে অন্য সম্প্রদায়ের সন্তানদের হতে সৃষ্টি করেছি।"

আর তাদেরকেই তাদের উপর সাক্ষী বানিয়ে জিজ্ঞেস করলেন- "আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই?" তারা সমস্বরে উত্তর করলোঃ "হ্যাঁ! আমরা সাক্ষী থাকলাম।" অর্থাৎ অবস্থা ও উক্তি উভয় রূপেই তারা স্বীকারোক্তি করলো। কেননা, সাক্ষ্য কোন সময় উক্তির মাধ্যমে হয়। যেমন- قَالُوْا شَهِدْنَا عَلٰٓى اَنْفُسِنَا অর্থাৎ "তারা বললো- আমরা নিজেদের উপর সাক্ষ্য দান করলাম।" (৬ঃ ১৩০) আবার কোন সময় অবস্থার মাধ্যমেও হয়ে থাকে। যেমনঃ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِيْنَ اَنْ يَّعْمُرُوْا مَسٰجِدَ اللّٰهِ شٰهِدِيْنَ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ অর্থাৎ "মুশরিকদের এই অধিকার নেই যে, তারা আল্লাহর মসজিদসমূহ আবাদ করবে এমন অবস্থায় যে, তারা নিজেদের উপর কুফরীর সাক্ষ্য দানকারী।" (৯ঃ ১৭) অর্থাৎ তাদের অবস্থাই তাদের কুফরীর সাক্ষ্য বহনকারী। এই সাক্ষ্য মুখের সাক্ষ্য নয়, বরং অবস্থার সাক্ষ্য। আর যাচ্ঞা কখনো قَالَ -এর মাধ্যমে হয়, আবার কখনো অবস্থার মাধ্যমে হয়। যেমন বলা হয়েছেঃ وَاٰتٰىكُمْ مِّنْ كُلِّ مَا سَاَلْتُمُوْهُ অর্থাৎ "তোমরা যা কিছু চেয়েছো আল্লাহ তোমাদেরকে তাই প্রদান করেছেন।" (১৪ঃ ৩৪) এই কথার উপর এই দলীলও হচ্ছে যে, তাদের শিরক করার উপর এই হুজ্জত তাদের বিপক্ষে পেশ করা হয়েছে। যদি এটা সত্যই হয়, যেমন একটা উক্তি রয়েছে, তবে সবারই এটা স্মরণ থাকা উচিত ছিল, যাতে ওটা তার উপর হুজ্জত হতে পারে। যদি এর উত্তর এই হয় যে, রাসূলদের ফরমান দ্বারা খবর পেয়ে যাওয়াই যথেষ্ট। তাহলে এর উত্তর হবে এই যে, যারা রাসূলদেরকে মানেই না তারা তাঁদের দেয়া খবরকে কিভাবে সত্য বলে মেনে নেবে? অথচ কুরআন কারীম রাসূলদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা ছাড়া স্বয়ং ঐ সাক্ষ্যকেই একটি পৃথক দলীল বলে ঘোষণা করেছে। সুতরাং এর দ্বারা এটাই সাব্যস্ত হচ্ছে যে, এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলার ফিতরাতকেই বুঝানো হয়েছে যার উপর তিনি সমস্ত মাখলূককে সৃষ্টি করেছেন। আর ওটাই হচ্ছে আল্লাহর তাওহীদের ফিতরাত। এ জন্যেই আল্লাহ পাক বলেনঃ "যেন তোমরা কিয়ামতের দিন একথা বলতে না পার- আমাদের পূর্বপুরুষরাই তো আমাদের পূর্বে শিরক করেছিল, আমরা ছিলাম তাদের পরবর্তী বংশধর। সুতরাং আপনি কি আমাদেরকে সেই ভ্রান্ত ও বাতিলদের কৃতকর্মের দরুন ধ্বংস করবেন?"

١٧٥- وَ اتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ الَّذِيْٓ اٰتَيْنٰهُ اٰيٰتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاَتْبَعَهُ الشَّيْطٰنُ فَكَانَ مِنَ الْغٰوِيْنَ ○

১৭৫। (হে মুহাম্মাদ সঃ)! তুমি এদেরকে সেই ব্যক্তির বৃত্তান্ত পড়ে শুনিয়ে দাও, যাকে আমি নিদর্শন দান করেছিলাম, কিন্তু সে এর দায়িত্ব পালন বর্জন করতে থাকে, ফলে শয়তান তার পিছনে লেগে যায়, আর সে পথভ্রষ্টদের মধ্যে শামিল হয়ে যায়।

١٧٦- وَ لَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنٰهُ بِهَا وَ لٰكِنَّهٗٓ اَخْلَدَ اِلَى الْاَرْضِ وَ اتَّبَعَ هَوٰىهُ فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ الْكَلْبِ اِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ اَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ○

১৭৬। আর আমি ইচ্ছা করলে তাকে এই আয়াতসমূহের সাহায্যে উন্নত করতাম, কিন্তু সে দুনিয়ার প্রতি অধিক ঝুঁকে পড়ে এবং স্বীয় কামনা বাসনার অনুসরণ করতে থাকে, তার উদাহরণ একটি কুকুরের ন্যায়, ওকে যদি তুমি কষ্ট দাও তবে জিহ্বা বের করে হাঁপায়, আবার কষ্ট না দিলেও জিহ্বা বের করে হাঁপাতে থাকে, যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, এই উদাহরণ হলো সেই সম্প্রদায়ের, তুমি কাহিনী বর্ণনা করে শুনাতে থাকো, হয়তো তারা এটা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করবে।

١٧٧- سَآءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَ اَنْفُسَهُمْ كَانُوْا يَظْلِمُوْنَ ○

১৭৭। এই উদাহরণটি সেই সম্প্রদায়ের জন্যে কতই না মন্দ উদাহরণ যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা মনে করে থাকে এবং তারা নিজেরাই নিজেদের উপর অত্যাচার করতে থাকে।

এটা ছিল বানী ইসরাঈলের মধ্যকার একটি লোক। তার নাম ছিল বালআ'ম ইবনে বাউর।[১] কাতাদা (রঃ) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, তার নাম ছিল সায়ফী ইবনে রাহিব। কা'ব (রঃ) বলেন যে, সে ছিল বালকাবাসী এক লোক। সে ইসমে আ'যম জানতো। সে ইয়াহূদী আলিমদের সাথে বায়তুল মুকাদ্দাসে অবস্থান করতো। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, সে ছিল ইয়ামনের অধিবাসী। আল্লাহ তা'আলা তাকে স্বীয় নিদর্শনাবলী ও কারামাত দান করেছিলেন। কিন্তু সে ঐগুলোর মর্যাদা দেয়নি। তার প্রার্থনা কবূল করা হতো। জনগণ বিপদ-আপদের সময় আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনার জন্যে তাকেই আগে বাড়িয়ে দিতো। আল্লাহর নবী হযরত মূসা (আঃ) দ্বীনের তাবলীগের জন্যে তাকে মাদইয়ান দেশে প্রেরণ করেন। সেখানকার বাদশাহ্ তাকে নিজের পক্ষে করে নেয় এবং বহু উপঢৌকন প্রদান করে। সে বাদশাহর দ্বীন কবূল করে নেয় এবং হযরত মূসা (আঃ)-এর দ্বীন পরিত্যাগ করে। তার নাম ছিল বালআ'ম। আবার এটাও বলা হয়েছে যে, সে হচ্ছে উমাইয়া ইবনে আবি সালাত। খুব সম্ভব এটা বলার উদ্দেশ্য এই হবে যে, এই উমাইয়াও ঐ লোকটির সাথে সাদৃশ্যযুক্ত ছিল। এই লোকটিও পূর্ববর্তী শরীয়তের জ্ঞান রাখতো। কিন্তু ওটা থেকে সে উপকার গ্রহণ করেনি। সে নবী (সঃ)-এর যুগও পেয়েছিল। রাসূলুল্লাহ (রঃ)-এর নিদর্শনগুলো সে স্বচক্ষে দেখেছিল এবং তাঁর মু'জিযাগুলো অবলোকন করেছিল। সে হাজার হাজার লোককে আল্লাহর দ্বীনের মধ্যে প্রবেশ করতে দেখেছে। কিন্তু মুশরিকদের সাথে মেলামেশা, তাদের মধ্যে তার সম্মান ও মর্যাদা এবং নেতৃত্ব লাভ তাকে ইসলাম ও সত্য গ্রহণ থেকে বিরত রাখে। বদর যুদ্ধে নিহত কাফিরদের জন্যে বড় বড় শোক গাঁথা সে রচনা করেছিল। তার মুখ তো ঈমান এনেছিল, কিন্তু তার অন্তর মুমিন হয়নি। খুব সম্ভব এই সমুদয় ঘটনা উমাইয়া ইবনে আবি সালাতের সাথেই সম্পর্কযুক্ত, বালআ'মের সাথে নয়।

বালআ'মের বর্ণনা কুরআন কারীমের মধ্যে এইভাবে হচ্ছে– 'আমি তাকে আমার নিদর্শনসমূহ অর্থাৎ কারামাত দান করেছিলাম। কিন্তু সে তা থেকে সরে পড়ে অর্থাৎ বঞ্চিত হয়।' আল্লাহ তা'আলা তাকে তিনটি দু'আর অধিকার দিয়েছিলেন যে, সেগুলো কবূল হবে। তার একটি স্ত্রী ও একটি পুত্র ছিল। তার স্ত্রী তাকে বললোঃ "তুমি আমার জন্যে একটি দু'আ নির্দিষ্ট করে নাও"। সে বললো, "আচ্ছা, কি দু'আ বল।" স্ত্রী বললোঃ "আল্লাহর নিকট দু'আ কর যে, আল্লাহ তা'আলা যেন আমাকে বানী ইসরাঈলের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দরী করে

১. এটা আব্দুর রায্যাক (রঃ) হযরত ইবনে মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন।

দেন।" সে তখন আল্লাহ তা'আলার নিকট ঐ দু'আই করলো। ফলে তার স্ত্রী সর্বাপেক্ষা সুন্দরী নারীতে পরিণত হয়ে গেল। তার স্ত্রী যখন অনুভব করলো যে, তার মত সুন্দরী নারী আর নেই তখন সে তার স্বামীকে অগ্রাহ্য করে বসলো এবং তার প্রতি অনীহা প্রকাশ করলো। আর তার ধারণা ও কার্যাবলী অন্যরূপ হয়ে গেল। তখন বালআ'ম দুআ' করলো যে, যেন তার স্ত্রী কুকুরী হয়ে যায়। সুতরাং সে কুকুরী হয়ে গেল। এভাবে দু'টি দুআ' শেষ হয়ে গেল। তার ছেলেটি তখন তাকে বললোঃ "আব্বা! আমার মা কুকুরী হয়ে থাকবে এটাতো আমাদের জন্যে মোটেই শোভনীয় নয়। জনগণ আমাদের নিন্দে করছে। সুতরাং আপনি দুআ' করুন যেন আমার মা পূর্বাবস্থায় চলে আসে। সে তখন দুআ' করলো। ফলে তার স্ত্রী পূর্বে যেমন ছিল তেমনি হয়ে গেল। এখন তিনটি দুআ'ই শেষ হয়ে গেল। এই বর্ণনাটি গারীব।

এই আয়াতটির প্রসিদ্ধ শানে নুযূল এই যে, বানী ইসরাঈলের যুগে একটি লোক ছিল। সে জাব্বারীন ইয়াহূদীদের শহরে বাস করতো। সে ইসমে আ'যম জানতো। কথিত আছে যে, তার দুআ' আল্লাহর পক্ষ থেকে গৃহীত হতো। আর সবচেয়ে বিস্ময়কর কথা, যা কোন কোন লোক বলে থাকে তা এই যে, সে নবী ছিল, কিন্তু নবুওয়াত তার থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয়েছিল। ইবনে জারীর (রঃ)-এর এরূপ উক্তি রয়েছে। কিন্তু এটা মোটেই সঠিক নয়।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, হযরত মূসা (আঃ) যখন জাব্বারীনদের শহরে আগমন করেন তখন বালআ'মের কাছে তার লোকেরা এসে বলেঃ "মূসা (আঃ) একজন লৌহমানব। তাঁর সাথে বিরাট সেনাবাহিনী রয়েছে। যদি তিনি আমাদের উপর জয়যুক্ত হন তবে আমরা সবাই ধ্বংস হয়ে যাবো। সুতরাং আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করুন যেন মূসা (আঃ) এবং তাঁর সঙ্গী-সাথীদের বিপদ আমাদের থেকে দূরীভূত হয়।" সে বললোঃ "যদি আমি এই দুআ' করি তবে আমার দ্বীন ও দুনিয়া উভয়ই নষ্ট হয়ে যাবে।" কিন্তু জনগণ পীড়াপীড়ি করায় সে ঐরূপ দুআ' করলো। ফলে আল্লাহ তা'আলা তার বুযুর্গী ও কারামাত ছিনিয়ে নেন। তাই আল্লাহ পাক বলেনঃ فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاَتْبَعَهُ الشَّيْطٰنُ অর্থাৎ সে কারামাত থেকে বঞ্চিত হয়ে গেল এবং শয়তান তার পিছনে লেগে পড়লো। সুদ্দী (রঃ) বলেন যে, যখন মূসা (আঃ)-এর জন্যে তীহের ময়দানে চল্লিশ বছরের চক্র শেষ হয়ে গেল তখন আল্লাহ তা'আলা ইউশা ইবনে নূন (আঃ)-কে নবী করে পাঠালেন। তিনি বানী ইসরাঈলকে নিজের নবী হওয়ার

সংবাদ দিলেন এবং এ খবরও দিলেন যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে জাব্বারীনদের সাথে যুদ্ধ করার নির্দেশ দিয়েছেন। জাব্বারীনরা হযরত ইউশা (আঃ)-এর বায়আত গ্রহণ করে এবং তাঁর সত্যতা স্বীকার করে নেয়। কিন্তু বানী ইসরাঈলের বালআ'ম নামক একটি লোক অবাধ্যাচরণ করতঃ জাব্বারীনদের কাছে গমন করে এবং তাদেরকে বলেঃ "ভয় করো না। যখন তোমরা যুদ্ধের জন্যে বের হবে তখন আমি বদ দুআ'র হাতিয়ার কাজে লাগাবো এবং তারা সবাই ধ্বংস হয়ে যাবে।" জাব্বারীনদের কাছে বালআ'মের পার্থিব সুখ-সম্ভোগের সব কিছুই বিদ্যমান ছিল। কিন্তু তাদের স্ত্রীদের নিকট থেকে কোনই উপকার লাভ করতে পারতো না। কেননা, ঐ স্ত্রীলোকদের শ্রেষ্ঠত্ব তার উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। সে শুধুমাত্র নিজের গর্দভী অর্থাৎ স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক রাখতো। এখন শয়তান তার পিছনে লেগে গেল। অর্থাৎ সে শয়তানের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে পড়লো। সুতরাং সে শয়তানের আদেশ পালন করতে শুরু করলো।

فَكَانَ مِنَ الْغٰوِيْنَ অর্থাৎ "সে পথভ্রষ্টদের বা ধ্বংসপ্রাপ্তদের অথবা উদ্ভ্রান্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।" ভাল লোকও কোন সময় মন্দ লোকে পরিণত হয়। এই আয়াতের অর্থের ব্যাপারে হাদীস এসেছে। হযরত হুযাইফা ইবনে ইয়ামান (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "তোমাদের ব্যাপারে আমি এই প্রকারের কিছুটা আশংকা করে থাকি। যেমন ঐ ব্যক্তি, যার কুরআনের জ্ঞান ছিল। কুরআনের বরকত ও সৌন্দর্য তার চেহারায় প্রকাশমান ছিল এবং তার ইসলামী শান-শওকতও ছিল। কিন্তু আল্লাহর দেয়া দুর্ভাগ্য তাকে ঘিরে ফেলে। ইসলামের নির্দেশাবলী সে পৃষ্ঠ-পিছনে ছুঁড়ে ফেলে। সে তার প্রতিবেশীর উপর তরবারী দ্বারা আক্রমণ চালায় এবং তাকে শিরকের অপবাদ দেয়।" বর্ণনাকারী বলেনঃ আমি বললাম, হে আল্লাহর নবী (সঃ)! অপবাদদাতা অপরাধী ছিল, না যার উপর অপবাদ দেয়া হয়েছিল সেই অপরাধী ছিল? তিনি উত্তরে বললেনঃ "অপবাদদাতাই অপরাধী ছিল।"[১]

ইরশাদ হচ্ছে– 'আমি ইচ্ছা করলে তাকে এই আয়াতসমূহের সাহায্যে উন্নত করতাম। কিন্তু সে দুনিয়ার প্রতি অধিক ঝুঁকে পড়ে এবং স্বীয় কামনা বাসনার অনুসরণ করতে থাকে।' সে এমনভাবে দুনিয়ার ফাঁদে পড়ে যায় যেমনভাবে কোন অজ্ঞান লোক পড়ে থাকে। সে শয়তানের সহকর্মী হয়ে যায় এবং নীচতা ও হীনতা অবলম্বন করে। তার সওয়ারী আল্লাহকে সিজদা করে, কিন্তু সে সিজদা

১. এটা হাফিয আবূ ইয়ালা আল মূসিলী (রঃ) তাখরীজ করেছেন। ইবনে কাসীর (রঃ) বলেন যে, এর ইসনাদ খুবই উত্তম।

করে শয়তানকে। এই আয়াতের ব্যাপারে ইবনে সিয়ার (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত মূসা (আঃ) বানী ইসরাঈলকে নিয়ে ঐ ভূ-খণ্ডের অভিমুখে রওয়ানা হন যেখানে বালআ'ম বাস করতো অথবা তিনি সিরিয়া অভিমুখে যাত্রা শুরু করেন। হযরত মূসা (আঃ) ও তাঁর সেনাবাহিনীর আগমন বার্তায় তথাকার লোক ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। তারা বালআ'মের কাছে এসে বলেঃ "মূসা (আঃ) ও তাঁর সেনাবাহিনীর জন্যে বদ দুআ' করুন।" তখন সে বলেঃ "তোমরা অপেক্ষা কর, আমি আমার প্রতিপালকের সাথে পরামর্শ করে নেই।" অতঃপর সে পরামর্শ করলে তাকে বলা হয়ঃ "না বদ দুআ' করো না। কেননা, তারা আমার বান্দা। তাছাড়া তাদের মধ্যে আমার নবীও বিদ্যমান রয়েছে।" তখন সে তার সম্প্রদায়ের লোকদেরকে বললোঃ "আমি আমার প্রভুর সাথে পরামর্শ করেছি। তিনি আমাকে বদ দুআ' করতে নিষেধ করেছেন।" এরপর জনগণ তার কাছে বহু উপঢৌকন পাঠিয়ে দেয়। তার উচিত ছিল ঐগুলো গ্রহণ না করা। কিন্তু সে ওগুলো গ্রহণ করে নেয়। তারপর লোকেরা আবার তাকে বদ দুআ' করার জন্যে পীড়াপীড়ি শুরু করে দেয়। সে বলেঃ "আচ্ছা, পুনরায় আমি পরামর্শ করে দেখি।" এবার কিন্তু তাকে কোনই পরামর্শ দেয়া হলো না। সে জনগণকে বললোঃ "এবার তো আমাকে কোনই পরামর্শ দেয়া হয়নি। কাজেই আমি বদ দুআ' করতে পারি না।" কিন্তু জনগণ তাকে বিভ্রান্ত করে ফেললো। তারা তাকে বললোঃ "যদি এতে আল্লাহর সম্মতি না থাকতো তবে পূর্বের ন্যায় এবারও বদ দুআ' করতে আপনাকে নিষেধ করে দিতেন। আল্লাহ তা'আলা যখন নীরব রয়েছেন তখন বুঝা যাচ্ছে যে, এতে তাঁর সম্মতি আছে।" তাদের এ কথায় বালআ'ম প্রতারিত হয়ে পড়লো। সুতরাং সে মূসা (আঃ) ও তাঁর সেনাবাহিনীর উপর বদ দুআ' করতে শুরু করলো। যখনই সে বদ দুআ'র শব্দ মূসা (আঃ)-এর জন্যে বের করতে চাইতো তখনই তার মুখ দিয়ে তার নিজের কওমের জন্যে বদদুআ'র শব্দ বেরিয়ে পড়তো। নিজের কওমের জন্যে বিজয়ের শব্দ বের করতে চাইলে হযরত মূসা (আঃ)-এর বিজয়ের শব্দ তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসতো। অথবা দুআ'র শেষে ইনশাআল্লাহ শব্দটি বেরিয়ে পড়তো। কাজেই বদ দুআ' শর্তযুক্ত হওয়ার কারণে ব্যর্থ হয়ে যেতো। লোকেরা তখন তাকে বললোঃ "আপনি যে মূসা (আঃ)-এর পরিবর্তে আমাদের উপরই বদ দুআ' করছেন।" সে বললোঃ "আমি করবো কি? অনিচ্ছাকৃত ভাবেই আমার মুখ দিয়ে এগুলো বেরিয়ে পড়ছে। আমার এখন পূর্ণ বিশ্বাস হয়ে গেছে যে, আমি বদ দুআ' করলেও তা কবূল হবে না। এখন আমি তোমাদেরকে একটি তদবীর শিখিয়ে দিচ্ছি। এটা করলে এ লোকগুলো ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। দেখো! আল্লাহ তা'আলা ব্যভিচারকে হারাম করেছেন। তিনি ব্যভিচার কার্যে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট। যদি এই লোকগুলোকে কোন রকমে ব্যভিচারে

জড়িত করে দেয়া যায় তবে অবশ্যই তাদের ধ্বংসের আশা রয়েছে। অতএব তোমরা এই কাজ কর যে, তোমাদের স্ত্রীদেরকে মূসা (আঃ)-এর সেনাবাহিনীর মধ্যে পাঠিয়ে দাও। এরা তো স্ত্রী ও ছেলেমেয়ে ছেড়ে বিদেশে পড়ে আছে, সুতরাং তারা যে ব্যভিচারে জড়িত হয়ে ধ্বংস হয়ে যাবে এতে বিস্ময়ের কিছুই নেই।" তার কথামত লোকগুলো ঐ কাজই করলো। তারা তাদের স্ত্রীদেরকে হযরত মূসা (আঃ)-এর সেনাবাহিনীর নিকট পাঠিয়ে দিলো। এমন কি তাদের বাদশাহর কন্যাও ছাড়া পড়লো না। শাহজাদীকে তার পিতা অথবা বালআ'ম বলে দিলো যে, সে যেন হযরত মূসা (আঃ) ছাড়া আর কারো ব্যবহারে না আসে। কথিত আছে যে, সত্যিই লোকগুলো ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে পড়েছিল। শাহজাদীর কাছে বানী ইসরাঈলের একজন সর্দার এসে গেল এবং তার থেকে কাম বাসনা পূর্ণ করতে চাইলো। বাদশাহর কন্যা তাকে বললো যে, সে মূসা (আঃ) ছাড়া আর কাউকেও তার সাথে জড়িত হতে দেবে না। সর্দার বললোঃ "আমি উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত রয়েছি এবং আমার এই শান-শওকত রয়েছে।" কন্যা তখন তার পিতাকে চিঠি লিখে এ ব্যাপারে পরামর্শ চাইলো। পিতা তাকে অনুমতি দিলো। তারা দু'জন তখন ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে পড়লো। এমতাবস্থায় হযরত হারূন (আঃ)-এর এক ছেলে তথায় উপস্থিত হলেন। তাঁর হাতে একটি বর্শা ছিল। তিনি তাদের উপর এমন জোরে বর্শা মেরে দিলেন যে তারা দু'জনই একই বর্শায় গেঁথে গেল। তিনি সেই বর্শাকে উঁচু করে ধরে জনগণের সামনে আসলেন এবং তারা ঐ দু'জনকে ঐ অবস্থায় স্বচক্ষে দেখে নিলো। আল্লাহ তা'আলা বানী ইসরাঈলের উপর মহামারীর শাস্তি নাযিল করলেন। ফলে সত্তর হাজার লোক মারা গেল।

ইবনে সিয়ার (রঃ) বর্ণনা করেছেন যে, বালআ'ম স্বীয় গর্দভীর ওপর সওয়ার হয়ে মা'লূলী নামক জায়গা পর্যন্ত আসলো। এখান থেকে তার সওয়ারী আর আগে বাড়ে না। সে ওকে মারতে শুরু করলো, কিন্তু ওটা বসেই যাচ্ছিল। আল্লাহ তা'আলা ওকে বাকশক্তি দান করলেন। গর্দভীটি তখন বালআ'মকে বললোঃ "তুমি আমাকে মারছো কেন? সামনে দেখো কে আছে?" সে দেখলো যে শয়তান দাঁড়িয়ে আছে। সে নেমে গিয়ে শয়তানকে সিজদা করলো। এ জন্যেই আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ فَانسَلَخَ مِنْهَا -

সালিম (রঃ) আবূ নযর (রঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত মূসা (আঃ) যখন সিরিয়া হতে বানী কিনআ'নে আসেন তখন বালআ'মকে তার কওমের লোকেরা বলেঃ "মূসা (আঃ) স্বীয় সম্প্রদায়সহ আমাদের দেশে আসছেন। তাঁর উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদেরকে হত্যা করে আমাদের এখানে তাঁর লোকদেরকে বসিয়ে

দেয়া। আমরা আপনার কওমেরই লোক। আমাদের অন্য কোন বাসস্থান নেই। আল্লাহ্ তা'আলা আপনার দুআ' কবূল করে থাকেন। সুতরাং আপনি তাদের জন্যে মহান আল্লাহর নিকট বদ দুআ' করুন।" সে বললোঃ "তোমরা নিপাত যাও! মূসা (আঃ) হচ্ছেন আল্লাহর নবী। তার সাহায্যার্থে ফেরেশ্তারাও রয়েছেন এবং মুমিনরাও রয়েছেন। সুতরাং আমি তাঁদের উপর কিরূপে বদ দুআ' করতে পারি? আমি যা জানি তা জানিই।" তার লোকেরা তখন বললোঃ "তাহলে আমরা থাকবো কোথায়?" এভাবে সব সময় তারা তার উপর চাপ দিতে থাকে এবং বিনীতভাবে বদ দুআ' করার জন্যে তার কাছে আবেদন জানাতে থাকে। শেষ পর্যন্ত সে পরীক্ষায় নিক্ষিপ্ত হয়। সে স্বীয় গর্দভীর উপর সওয়ার হয়ে একটি পাহাড় অভিমুখে গমন করে, যে পাহাড়ের উপর চড়ে সে বানী ইসরাঈলের সেনাবাহিনীকে দেখতে পাবে। ঐ পাহাড়টিকে হাসবান পাহাড় বলা হয়। কিছু দূর গিয়ে তার গর্দভীটি বসে পড়ে। সে তখন নেমে গর্দভীকে মারতে শুরু করে। কিছুদূর গিয়ে আবার সে বসে পড়ে। বার বার যখন তাকে মারতে থাকে তখন আল্লাহ তাকে বাক্শক্তি দান করেন। সে বলে ওঠে– "হে বালআ'ম! তুমি আমাকে কোন্ দিকে নিয়ে যাচ্ছ? তুমি কি দেখছো না যে, ফেরেশতা আমার সামনে রয়েছেন? তিনি আমাকে ধাক্কা দিয়ে পিছনে সরিয়ে দিচ্ছেন। তুমি আল্লাহর নবী ও মুমিনদের উপর বদ দুআ' করতে যাচ্ছ!" সে কিন্তু তবুও বিরত হলো না। পুনরায় সে গর্দভীকে মারতে শুরু করলো। এবার আল্লাহর নির্দেশক্রমে সে হাসবান নামক পাহাড়ের উপর উঠে গেল। ওখানে পৌঁছে বালআ'ম হযরত মূসা (আঃ) ও মুমিনদের উপর বদ দুআ' করতে শুরু করে দিলো। কিন্তু তার জিহ্বা উল্টে যাচ্ছিল। তার মুখ দিয়ে তার কওমের জন্যে বদ দুআ' এবং মূসা (আঃ)-এর জন্যে ভাল দুআ' বের হচ্ছিল। কথিত আছে যে, বদ দুআ' করার সময় তার জিহ্বা বাইরে বেরিয়ে পড়েছিল এবং তার বক্ষের উপর লম্বা হয়ে লটকে গিয়েছিল। তখন সে বলে উঠেছিলঃ "আমার দুনিয়াও গেল, দ্বীনও গেল।" কওমের লোককে সে বললোঃ "এখন শুধু প্রতারণা ও কৌশল দ্বারা কাজ নেয়া যেতে পারে। তোমরা নিজেদের মেয়েদেরকে সুন্দর সুন্দর সাজে সজ্জিত করে বানী ইসরাঈলের সৈন্যদের মধ্যে পাঠিয়ে দাও। তাদেরকে বলে দাও যে, তারা যেন ঐ পুরুষ লোকদেরকে তাদের দিকে আকৃষ্ট করে নেয়। যদি একটি লোকও ব্যভিচারে জড়িয়ে পড়ে তবে জেনে রেখো যে, তোমাদের উদ্দেশ্য সফল হয়েছে।" তার কথামত নারীদেরকে বানী ইসরাঈলের সেনাবাহিনীর মধ্যে পাঠিয়ে দেয়া হয়।

কিনআ'নবাসীর একটি স্ত্রীলোকের নাম ছিল কাসবতী। সুর নামক একটি লোক ছিল কওমের সর্দার ও বাদশাহ্। কাসবতী ছিল তারই কন্যা। এই কাসবতীর মিলন ঘটে যামরী ইবনে শালুম নামক বানী ইসরাঈলের এক সর্দারের সাথে। এই যামরী ছিল শামঊন ইবনে ইয়াকুব ইবনে ইসহাক ইবনে ইবরাহীমের পৌত্র। সে ছিল কওমের সর্দার। সে কাসবতীকে দেখে তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। সে তার হাত ধরে হযরত মূসা (আঃ)-এর নিকট নিয়ে গেল এবং তাঁকে বললোঃ "হে মূসা (আঃ)! আপনি হয়তো এ কথাই বলবেন যে, এ মেয়েটি তোমার জন্যে হারাম। সুতরাং তুমি তার কাছে যেয়ো না।" হযরত মূসা (আঃ) বললেনঃ "হ্যাঁ! এ নারী তোমার জন্যে হারাম।" সে তখন বললোঃ "হে মূসা (আঃ)! আল্লাহর কসম! এখানে তো আমি আপনার কথা মানবো না।" অতঃপর সে মেয়েটিকে তার তাঁবুতে নিয়ে গেল এবং তাকে নিয়ে একই বিছানায় রাত্রি কাটালো। আল্লাহ্ তা'আলা বানী ইসরাঈলের মধ্যে মহামারী ছড়িয়ে দিলেন। ফানহাস ইবনে আনীরার ইবনে হারূন নামক কওমের সর্দার যামরী ইবনে শালুমের এই কাজের সময় সেখানে উপস্থিত ছিল না। যামরীর এই দুষ্কার্যের ফলে বানী ইসরাঈলের সমস্ত কওমের মধ্যে মহামারী ছড়িয়ে পড়ে। পরে ফানহাস এই সমুদয় ঘটনা অবগত হয়। সে স্বীয় লৌহ-বর্শাটি উঠিয়ে নিয়ে যামরীর তাঁবুতে প্রবেশ করে। ঐ সময় তারা দু'জন শায়িত অবস্থায় ছিল। দু'জনকেই সে একই বর্শায় গেঁথে নেয় এবং ঐ অবস্থাতেই বর্শাটিকে মাথায় উঠিয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। ফানহাস ছিল যুবক ও শক্তিশালী লোক। সে বলতে বলতে যাচ্ছিলঃ "হে আল্লাহ্! আমি আপনার নাফরমান বান্দার সাথে এই ব্যবহার করলাম। সুতরাং আপনি মহামারী দূর করে দিন!" আল্লাহ্ পাক মহামারী দূর করলেন। ঐ মহামারীতে বানী ইসরাঈলের সত্তর হাজার লোক অথবা কমপক্ষে বিশ হাজার লোক মারা যায়।[১] ফানহাসের এই কার্যের কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে বানী ইসরাঈল যখনই কিছু যবেহ্ করতো তখন ওর মাথা ও সামনের পা এবং নিজেদের ফলমূলের প্রথম জিনিস তার (ফানহাসের) সন্তানদেরকে নযরানা স্বরূপ প্রদান করতো।

১. এটা মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক (রঃ) সালিম (রঃ) ও আবূ নযর (রঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। ইবনে জারীর (রঃ) অনুরূপভাবে এটা তাখরীজ করেছেন এবং তাতে রয়েছে যে, কিছু সংখ্যক সৈন্য কর্তৃক ব্যভিচার কার্য সংঘটিত হয় যারা হযরত মূসা (আঃ)-এর সঙ্গে ছিল। আল্লাহ্ তা'আলা তখন তাদেরকে মহামারী দ্বারা আক্রান্ত করেন। তাতে সত্তর হাজার লোক মারা যায়।

فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ اِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ اَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ - এই আয়াতের তাফসীরে মুফাস্সিরদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দিয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন যে, বালআ'মের জিহ্বা লটকে তার বক্ষে গিয়ে পড়েছিল। তাই, তার দৃষ্টান্ত দেয়া হয়েছে কুকুরের সঙ্গে যে, যদি তাকে কষ্ট দেয়া হয় তবে সে হাঁপাবে এবং কষ্ট না দিলেও হাঁপাবে। তদ্রূপ বালআ'মেরও অবস্থা যে, তার উপর কারামাত নাযিল হোক অথবা দুঃখ-বেদনা নাযিল হোক, একই কথা। অথবা এই দৃষ্টান্ত তার পথভ্রষ্টতা এবং তাকে ঈমানের দিকে ডাকা বা না ডাকা উভয় অবস্থাতেই তার দ্বারা উপকৃত না হওয়ার ব্যাপারে কুকুরের সাথে দেয়া হয়েছে যে, তাকে তাড়ালেও সে জিহ্বা লটকিয়ে হাঁপাবে এবং না তাড়ালেও হাঁপাবে। তদ্রূপ বালআ'মকেও যদি ঈমানের দিকে আহ্বান করা যায় তবে তার দ্বারা সে উপকার গ্রহণ করবে না এবং আহ্বান না করলেও উপকার লাভ করবে না। এই ধরনেরই একটি কথা আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেছেনঃ "তুমি তাদেরকে ভয় প্রদর্শন কর বা না কর, তারা ঈমান আনবে না।" এইরূপ আর একটি দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন আল্লাহ পাক বলেনঃ "তুমি তাদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা কর বা না কর, আল্লাহ কখনও তাদেরকে ক্ষমা করবেন না।" অথবা এর অর্থ এও হতে পারে যে, কাফির মুনাফিক এবং পথভ্রষ্ট লোকের অন্তর দুর্বল হয় এবং তা হিদায়াত শূন্য থাকে। যতই চেষ্টা করা যাক না কেন তারা হিদায়াত প্রাপ্ত হবে না।[১]

আল্লাহ পাক স্বীয় নবী হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)-কে সম্বোধন করে বলেনঃ হে রাসূল (সঃ)! তুমি জনগণকে এ ঘটনাগুলো শুনিয়ে দাও, যাতে তারা বানী ইসরাঈলের অবস্থা অবহিত হওয়ার পর চিন্তা-ভাবনা করতঃ আল্লাহর পথে এসে যায় এবং চিন্তা করে যে, বালআ'মের অবস্থা কি হয়েছিল। আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান রূপ মহামূল্যবান সম্পদকে সে দুনিয়ার নগণ্য আরাম ও বিলাসিতার বিনিময়ে বিক্রি করে দেয়। শেষে সে দুনিয়া ও আখিরাত উভয়ই হারিয়ে ফেলে। অনুরূপভাবে এই ইয়াহূদী আলেমরা যারা তাদের কিতাবসমূহে আল্লাহর হিদায়াত পাঠ করছে এবং তোমার গুণাবলী তাতে লিপিবদ্ধ দেখছে, তাদের উচিত হবে দুনিয়ার মোহে নিমজ্জিত হয়ে শিষ্যদেরকে ভুল পথে চালিত না করা। নতুবা তারাও ইহকাল ও পরকাল দু-ই হারাবে। তাদের কর্তব্য হবে যে, তারা যেন তাদের জ্ঞান দ্বারা উপকার লাভ করে এবং তোমার আনুগত্যের দিকে ঝুঁকে পড়ে। আর অন্যদের কাছেও যেন সত্য কথা প্রকাশ করে দেয়। দেখো! কাফিরদের দৃষ্টান্ত কতই না জঘন্য যে, তারা কুকুরের মত শুধু খাদ্য ভক্ষণ ও কুপ্রবৃত্তির মধ্যে পড়ে রয়েছে! সুতরাং যে কেউই ইল্ম ও হিদায়াতকে ছেড়ে দিয়ে

---

১. অনুরূপ বর্ণনা হাসান বসরী (রঃ) প্রমুখ গুরুজন হতে নকল করা হয়েছে।

কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করার কাজে লেগে পড়বে সে-ই হবে কুকুরের মত। যেমন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "জঘন্য দৃষ্টান্ত যেন আমাদের উপর প্রয়োগ করা না হয়। অর্থাৎ কাউকে দেয়ার পর তা যে ব্যক্তি পুনরায় ফিরিয়ে নেয় তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে ঐ কুকুরের মত যে বমি করার পর পুনরায় তা খেয়ে নেয়।"[১] ইরশাদ হচ্ছে– তারা নিজেরা নিজেদের উপর অত্যাচার করেছে। কেননা, তারা হিদায়াতের অনুসরণ করেনি। তারা দুনিয়া ও দুনিয়ার ভোগ বিলাসের মধ্যে পতিত হয়েছে। এটা আল্লাহর অত্যাচার নয়।

১৭৮। আল্লাহ যাকে পথ দেখান সে-ই পথ পায়, আর যাকে তিনি পথ প্রদর্শন হতে বঞ্চিত করেন সে ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

١٧٨- مَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِيْ ۚ وَمَنْ يُّضْلِلْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ○

আল্লাহ তা'আলা এখানে বলেন যে, যাকে তিনি সুপথ প্রদর্শন করেন তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না। আর যাকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন, কার এমন শক্তি আছে যে, তাকে পথ দেখাতে পারে? আল্লাহ যা চান তাই হয় এবং তিনি যা চান না তা হয় না। এ জন্যেই ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর হাদীসে বর্ণিত হয়েছেঃ

اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَ نَسْتَعِيْنُهٗ وَ نَسْتَهْدِيْهِ وَ نَسْتَغْفِرُهٗ وَ نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَ مَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَ اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ -

অর্থাৎ "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্যে। আমরা তাঁর প্রশংসা করছি; তাঁরই কাছে সাহায্য চাচ্ছি, তাঁরই নিকট হিদায়াত কামনা করছি এবং তাঁরই কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আমরা আমাদের নফসের অকল্যাণ হতে তাঁর নিকট আশ্রয় চাচ্ছি এবং মন্দ আমল হতেও আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আল্লাহ যাকে পথ প্রদর্শন করেন তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না এবং যাকে আল্লাহ পথভ্রষ্ট করেন তাকে কেউ পথ দেখাতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন মা'বূদ নেই। তিনি এক। তাঁর কোন অংশীদার নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (সঃ) তাঁর বান্দা ও রাসূল।"[২]

১. এ হাদীসটি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে।
২. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) ও আহলুস্ সুনান (রঃ) সম্পূর্ণরূপে বর্ণনা করেছেন।

১৭৯। আমি বহু জ্বিন ও মানুষকে জাহান্নামের জন্যে সৃষ্টি করেছি, তাদের হৃদয় রয়েছে কিন্তু তারা তদদ্বারা উপলব্ধি করে না, তাদের চক্ষু রয়েছে কিন্তু তারা তদদ্বারা দেখে না, তাদের কর্ণ রয়েছে কিন্তু তদদ্বারা তারা শোনে না, তারাই হলো পশুর ন্যায়, বরং তা অপেক্ষাও অধিক বিভ্রান্ত, তারাই হলো গাফিল বা অমনোযোগী।

١٧٩ - وَلَقَدْ ذَرَاْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيْرًا مِّنَ الْجِنِّ وَ الْاِنْسِ ۖ لَهُمْ قُلُوْبٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ بِهَا ۖ وَ لَهُمْ اَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُوْنَ بِهَا ۖ وَ لَهُمْ اٰذَانٌ لَّا يَسْمَعُوْنَ بِهَا ۗ اُولٰٓئِكَ كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ ۗ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَ ○

একবার রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কোন এক আনসারীর ছেলের জানাযায় হাযির হওয়ার সুযোগ ঘটে। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ "আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করি, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! এ ছেলেটি তো জান্নাতের একটি পাখী! সে কোন খারাপ কাজও করেনি এবং জাহান্নাম তার ঠিকানাও নয়।" তিনি তখন বলেনঃ "হে আয়েশা (রাঃ)! তা হলে শুনো। আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাত সৃষ্টি করেছেন এবং যারা জান্নাতবাসী হবে তাদেরকেও সৃষ্টি করেছেন। আর এই জান্নাতবাসীদের জান্নাতের অধিকারী হওয়ার ফায়সালা ঐ দিনই করা হয়েছে যেই দিন তারা আদম (আঃ)-এর পৃষ্ঠে ছিল। আবার তিনি জাহান্নাম ও জাহান্নামবাসীকে সৃষ্টি করেছেন যখন তারা আদম (আঃ)-এর পৃষ্ঠেই ছিল।" হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তা'আলা মায়ের গর্ভাশয়ে একজন ফেরেশ্তা পাঠিয়ে থাকেন যিনি ঐ গর্ভাশয়ের সন্তান সম্পর্কে চারটি বিষয় লিপিবদ্ধ করে নেন। (১) জীবিকা, (২) বয়স, (৩) ভাল আমল এবং (৪) মন্দ আমল। আর এ কথা তো পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, আদম (আঃ)-এর পৃষ্ঠদেশ থেকে আল্লাহ তা'আলা যখন তাঁর সন্তানদেরকে বের করেন তখন তাদেরকে ডানদিক বিশিষ্ট এবং বামদিক বিশিষ্ট এই দু'টি দলে বিভক্ত করেন। একদল জান্নাতবাসী এবং অন্য দল জাহান্নামবাসী। তিনি বলেনঃ আমি কোনই পরওয়া করি না যে, কে নিজেকে জান্নাতবাসী রূপে গড়ে তুলছে এবং

আমি এরও কোন পরওয়া করি না যে, কে নিজেকে জাহান্নামবাসী রূপে গড়ে তুলছে।" এ ব্যাপারে বহু হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আর তাকদীরের মাসআলাটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা। এখানে এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেয়ার তেমন কোন সুযোগ নেই।

ইরশাদ হচ্ছে– তাদের অন্তর তো রয়েছে কিন্তু তারা অনুধাবন করে না। চক্ষু রয়েছে কিন্তু দেখে না। কান রয়েছে কিন্তু শ্রবণ করে না। এ জিনিসগুলোকে হিদায়াত লাভ করার জন্যে কারণ বানানো হয়েছিল। কিন্তু ওগুলো দ্বারা তারা মোটেই উপকৃত হয়নি। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেনঃ "তাদেরকে কর্ণ, চক্ষু ও অন্তকরণ দেয়া হয়েছে, কিন্তু ওগুলো দ্বারা তাদের কোনই উপকার করেনি। কেননা, তারা ওগুলো দ্বারা কাজ নেয়নি এবং আল্লাহর আয়াতগুলোকে অস্বীকার করে বসে। মুনাফিকদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ "তারা বধির, মূক এবং অন্ধ। সুতরাং তারা ফিরবে না।" আর কাফিরদের ব্যাপারে বলা হয়েছেঃ "তারা বধির, মূক ও অন্ধ। সুতরাং তারা বুঝবে না।"

আল্লাহ পাক ঘোষণা করছেনঃ "যদি আল্লাহ মন্দ লোকদের মধ্যে কোন মঙ্গল জানতেন তবে অবশ্যই তাদেরকে শুনবার যোগ্য বানাতেন। তখন তারা নিশ্চিতরূপে হিদায়াত লাভ করতো।" অন্য জায়গায় তিনি বলেনঃ "চক্ষুগুলো অন্ধ নয়, বরং বক্ষের মধ্যস্থিত অন্তকরণগুলোই অন্ধ।" আরও বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি রহমানের (আল্লাহর) যিক্‌র হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়, শয়তান তার উপর আধিপত্য বিস্তার করে থাকে এবং সব সময় তার সঙ্গী হয়ে থাকে। এই লোকগুলো লোকদেরকে আল্লাহর পথ হতে সরিয়ে রাখে এবং ধারণা করে যে, তারা ঠিক পথেই রয়েছে।"

এখন এখানে ইরশাদ হচ্ছে–তারা চতুষ্পদ জন্তুর মত। তারা সত্য কথা শুনেও না এবং সত্যের পথে সাহায্যও করে না। তারা হিদায়াতও লাভ করে না। পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তারা কোন উপকার লাভ করে না। শুধুমাত্র পার্থিব জীবনে এর দ্বারা উপকার লাভ করে থাকে। যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ "কাফিরদের দৃষ্টান্ত ঐ জন্তুর মত যে রাখালের ডাক ও শব্দ শুনে থাকে মাত্র, কিন্তু কিছুই বুঝে না।" তদ্রূপ এই লোকগুলোকেও ঈমানের দিকে ডাকা হলে তারা এর উপকারিতা সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে, শুধু শব্দই শুনে থাকে। এ জন্যেই আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 'এই লোকগুলো জন্তুর চাইতেও অধিক পথভ্রষ্ট।' কেননা, জন্তু

রাখালের কথা না বুঝলেও কমপক্ষে তার দিকে মুখ তো করে। তাছাড়া ঐ জন্তুগুলো দ্বারা অনুধাবন করতে না পারার যে কাজ প্রকাশ পায় তা হচ্ছে তাদের প্রকৃতিগত ও সৃষ্টিগত ব্যাপার। পক্ষান্তরে কাফিরদেরকে তো কোন অংশী স্থাপন করা ছাড়াই আল্লাহর ইবাদতের জন্যে সৃষ্টি করা হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা কুফরী ও শির্ক করে বসেছে। আর এ জন্যেই তো যারা আল্লাহর আনুগত্য স্বীকার করেছে তারা কিয়ামতের দিন ফেরেশ্তাদের চাইতেও শ্রেষ্ঠ বলে গণ্য হবে। কিন্তু যারা কুফরী করেছে তারা পশুর মত বা তার চেয়েও নিকৃষ্ট বলে গণ্য হবে।

١٨٠- وَلِلّٰهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا ۖ وَذَرُوا الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فِيْٓ اَسْمَائِهٖ ؕ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○

১৮০। আর আল্লাহর জন্যে সুন্দর সুন্দর ও ভাল ভাল নাম রয়েছে, সুতরাং তোমরা তাঁকে সেই সব নামেই ডাকবে, আর তাদেরকে বর্জন কর যারা তাঁর নাম বিকৃত করে, সত্বরই তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের প্রতিফল দেয়া হবে।

হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "আল্লাহ তা'আলার নিরানব্বইটি নাম রয়েছে। যে ব্যক্তি এগুলোকে বিশেষ সময়ে পাঠ করবে বা গণনা করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং বেজোড় (এক)। তাই তিনি বেজোড়কেই পছন্দ করেন।" ঐ পবিত্র নামগুলো নিম্নরূপ ঃ

هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ الْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلَامُ
الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ الْغَفَّارُ الْقَهَّارُ
الْوَهَّابُ الرَّزَّاقُ الْفَتَّاحُ الْعَلِيْمُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الْخَافِضُ الرَّافِعُ الْمُعِزُّ الْمُذِلُّ
السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ الْحَكَمُ الْعَدْلُ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ الْحَلِيْمُ الْعَظِيْمُ الْغَفُوْرُ الشَّكُوْرُ
الْعَلِىُّ الْكَبِيْرُ الْحَفِيْظُ الْمُقِيْتُ الْحَسِيْبُ الْجَلِيْلُ الْكَرِيْمُ الرَّقِيْبُ الْمُجِيْبُ
الْوَاسِعُ الْحَكِيْمُ الْوَدُوْدُ الْمَجِيْدُ الْبَاعِثُ الشَّهِيْدُ الْحَقُّ الْوَكِيْلُ الْقَوِىُّ الْمَتِيْنُ
الْوَلِىُّ الْحَمِيْدُ الْمُحْصِى الْمُبْدِئُ الْمُعِيْدُ الْمُحْيِى الْمُمِيْتُ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ الْوَاجِدُ

الْمَاجِدُ الْوَاحِدُ الْاَحَدُ الْفَرْدُ الصَّمَدُ الْقَادِرُ الْمُقْتَدِرُ الْمُقَدِّمُ الْمُؤَخِّرُ الْاَوَّلُ الْاٰخِرُ الظَّاهِرُ الْبَاطِنُ الْوَالِيُ الْمُتَعَالِيُ الْبَرُّ التَّوَّابُ الْمُنْتَقِمُ الْعَفُوُّ الرَّءُوْفُ مَالِكُ الْمُلْكِ ذُوْ الْجَلَالِ وَ الْاِكْرَامِ الْمُقْسِطُ الْجَامِعُ الْغَنِيُّ الْمُغْنِي الْمَانِعُ الضَّارُ النَّافِعُ النُّوْرُ الْهَادِي الْبَدِيْعُ الْبَاقِي الْوَارِثُ الرَّشِيْدُ الصَّبُوْرُ-

এ হাদীসটি গারীব বা দুর্বল। এভাবে এই নামগুলো সুনানে ইবনে মাজাহ্‌তেও এসেছে। কোন কোন বুযুর্গ ব্যক্তির ধারণা এই যে, এই নামগুলো বর্ণনাকারিগণ কুরআন মাজীদ থেকে ছাঁটাই করে এনেছেন। আল্লাহ তা'আলাই সর্বাপেক্ষা সঠিক জ্ঞানের অধিকারী। একথা স্মরণ রাখতে হবে যে, আল্লাহ তা'আলার শুধু এই নিরানব্বইটি নাম রয়েছে, আর নেই, এটা নয়। মুসনাদে আহমাদে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ কাউকে যখন কোন দুঃখ-কষ্ট পৌঁছবে তখন সে যেন এ দুআ'টি পড়ে–

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ عَبْدُكَ وَ ابْنُ عَبْدِكَ وَ ابْنُ اَمَتِكَ نَاصِيَتِيْ بِيَدِكَ مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ عَدْلٌ فِيَّ قَضَاءُكَ اَسْئَلُكَ بِكُلِّ اِسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهٖ نَفْسَكَ وَ اَنْزَلْتَهٗ فِيْ كِتَابِكَ اَوْ عَلَّمْتَهٗ اَحَدًا مِّنْ خَلْقِكَ اَوِ اسْتَاْثَرْتَ بِهٖ فِيْ عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ اَنْ تَجْعَلَ الْقُرْاٰنَ الْعَظِيْمَ رَبِيْعَ قَلْبِيْ وَ نُوْرَ صَدْرِيْ وَ جِلَاءَ حُزْنِيْ وَ ذِهَابَ هَمِّيْ-

তাহলে আল্লাহ তা'আলা তার দুঃখ-চিন্তা দূর করে দিবেন এবং ঐ স্থানে খুশী আনয়ন করবেন। তখন জিজ্ঞেস করা হলোঃ "আমরা কি এটা মুখস্থ করবো না?" তিনি উত্তরে বললেনঃ "হ্যাঁ, বরং যেই এটা শুনবে তারই মুখস্থ করে নেয়া উচিত।" কোন কোন লোক তো কুরআন ও সুন্নাহ্ হতে আল্লাহ তা'আলার এক হাজার নাম বের করেছেন।

ইরশাদ হচ্ছে– 'যারা আল্লাহর নাম বিকৃত করে তাদেরকে বর্জন কর।' কাফিররা আল্লাহর নামের সাথে لَاتْ শব্দটিকেও যোগ করে দেয়। তারা 'লাত'-কে আল্লাহর স্ত্রীলিঙ্গ বলে (নাঊযুবিল্লাহি মিন যালিকা)। عُزّٰى শব্দটিকে তারা عَزِيْزٌ থেকে বের করে থাকে এবং এটাকেও স্ত্রী খোদা বলে। اَلْحَادٌ শব্দের অর্থ হচ্ছে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা। আর আরবদের পরিভাষায় মধ্যম পন্থা থেকে সরে যাওয়াকে اَلْحَادٌ বলা হয়। لَحَدٌ শব্দের অর্থ হচ্ছে কবর। কবরকে لَحَدٌ এজন্যেই বলা হয় যে, ওটাকে কিবলার দিকে ফিরিয়ে তৈরী করা হয়ে থাকে।

১৮১। আর আমি যাদেরকে সৃষ্টি করেছি তাদের মধ্যে এমন একটি দলও রয়েছে যারা সত্য (অর্থাৎ দ্বীন ইসলাম)-এর অনুরূপ হিদায়াত করে এবং ওরই অনুরূপ ইনসাফও করে।

١٨١- وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ○

আল্লাহ পাক বলেন– আমার সৃষ্ট কওমের মধ্যে কোন কোন কওম কথায় ও কাজে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। তারা সত্য কথা বলে, সত্যের দিকে মানুষকে আহ্বান করে এবং সত্যের হিসেবে ফায়সালাও করে। এই উম্মত দ্বারা উম্মতে মুহাম্মাদীয়াকে বুঝানো হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) যখন এই আয়াতটি পাঠ করতেন তখন বলতেনঃ "এই লোক তোমরাই। আর ঐ কওমও, যারা তোমাদের পূর্বে অতীত হয়েছে। তারাও লোকদেরকে সত্যের দিকে আহ্বান করতো।" রাসূলুল্লাহ (সঃ) আরো বলেছেনঃ আমার উম্মতের মধ্যে একটি কওম সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে, শেষ পর্যন্ত হযরত ঈসা (আঃ) অবতরণ করবেন। ঐ দলটি সত্যের উপর বিজয়ী থাকবে। তাদের কোন বিরুদ্ধবাদী দল কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। কিয়ামত আসা পর্যন্ত বা মৃত্যু পর্যন্ত তারা ওর উপরই প্রতিষ্ঠিত থাকবে।

১৮২। যারা আমার আয়াত সমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, আমি তাদের অজ্ঞাতে তাদেরকে ধীরে ধীরে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাবো।

১৮৩। আমি তাদেরকে অবকাশ দিচ্ছি, নিশ্চয়ই আমার কৌশল অতি শক্ত।

١٨٢- وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ○

١٨٣- وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ○

এর ভাবার্থ এই যে, তাদের জীবিকার দরযাগুলো খুলে যাবে এবং পার্থিব সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাবে। শেষ পর্যন্ত তারা এর দ্বারা প্রতারিত হবে এবং ধারণা করবে যে, তাদের ঐ অবস্থা চিরকালই থাকবে। যেমন আল্লাহ পাক বলেনঃ "তাদেরকে যে উপদেশ দেয়া হয়েছিল তা যখন তারা ভুলে গেল, আমি তখন

তাদের জন্যে সবকিছুর দরযা খুলে দিলাম। শেষ পর্যন্ত যখন তারা আনন্দে মেতে উঠলো তখন আমি তাদেরকে আকস্মিকভাবে পাকড়াও করলাম। সেই সময় তারা সম্পূর্ণরূপে নিরাশ হয়ে গেল।” প্রশংসার যোগ্য তো একমাত্র আল্লাহ! এ জন্যেই তিনি বলেনঃ আমি তাদেরকে অবকাশ দিয়ে রেখেছি। আমার কৌশলপূর্ণ ব্যবস্থাপনা খুবই বলিষ্ঠ ও অটুট।

১৮৪। তারা কি এটা চিন্তা করে না যে, তাদের সঙ্গী পাগল নয়? সে নিছক একজন সুস্পষ্ট ভীতি প্রদর্শনকারী!

١٨٤- اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوْا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِّنْ جِنَّةٍ اِنْ هُوَ اِلَّا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ○

এই মিথ্যা প্রতিপন্নকারীরা এটাও চিন্তা করেনি যে, তাদের বন্ধু ও সঙ্গী হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) মোটেই পাগল নন, বরং তিনি আল্লাহর রাসূল। যিনি মানুষকে সত্যের পথে আহ্বান করে থাকেন। যে ব্যক্তির স্থির বুদ্ধি রয়েছে এবং তা সে কাজে লাগিয়ে থাকে সেই পরিষ্কারভাবে এটা বুঝতে পারবে। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ “আমি তোমাদেরকে একটি কথার নসীহত করছি যে, তোমরা আল্লাহরই ইবাদত করবে এবং এর তাবলীগের জন্যে এক একজন ও দু'জন দু'জন মিলিত হয়ে দাঁড়িয়ে যাও। অতঃপর গভীরভাবে চিন্তা করে দেখো যে, তোমাদের সঙ্গী (হযরত মুহাম্মাদ সঃ) পাগল নয়। বরং তিনি তো তোমাদেরকে আল্লাহর ভীষণ শাস্তি থেকে ভয় প্রদর্শনকারী।” খাঁটি অন্তরে আল্লাহকে ডাকতে থাকো। গোঁড়ামি ও একগুঁয়েমি পরিত্যাগ কর। যদি তোমরা এরূপ কর তবে হাকীকত তোমাদের কাছে খুলে যাবে যে, এই রাসূল (সঃ) সত্য এবং তোমাদের শুভাকাঙ্খী।

রাসূলুল্লাহ (সঃ) একদা 'সাফা' পাহাড়ের উপর আরোহণ করেন। সেখানে তিনি কুরায়েশদেরকে একত্রিত করেন এবং এক এক গোত্রের নাম ধরে ডাকতে থাকেন। অতঃপর তিনি তাদেরকে আল্লাহর শাস্তি এবং আকস্মিক দুর্ঘটনা থেকে ভয় প্রদর্শন করেন। তখন কোন কোন নির্বোধ ব্যক্তি বলতে শুরু করে যে, তাঁকে তো পাগল বলে মনে হচ্ছে। সকাল পর্যন্ত তিনি বক্তৃতা করতে থাকেন। তখন আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত অবতীর্ণ করেন।

১৮৫। তারা কি আকাশসমূহ ও পৃথিবীর ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে কোন গভীর চিন্তা করে না? আর আল্লাহ যা কিছু সৃষ্টি

١٨٥- اَوَلَمْ يَنْظُرُوْا فِيْ مَلَكُوْتِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا خَلَقَ

اللّٰهُ مِنْ شَیْءٍ وَّ اَنْ عَسٰۤی اَنْ یَّكُوْنَ قَدِ اقْتَرَبَ اَجَلُهُمْ فَبِاَیِّ حَدِیْثٍۭ بَعْدَهٗ یُؤْمِنُوْنَ ○

করেছেন এবং তাদের জীবনের নির্দিষ্ট মেয়াদটি পূর্ণ হবার সময়টি হয়তো বা নিকটে এসে পড়েছে তারা কি এটাও চিন্তা করে না? এর পরও তারা কোন্ কথায় ঈমান আনবে?

ইরশাদ হচ্ছে– আমার নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারীরা একথা কি চিন্তা করে দেখে না যে, আকাশ, পৃথিবী এবং এ দু'য়ের মধ্যস্থলে যা কিছু রয়েছে সবগুলোর উপর আমার কিরূপ ক্ষমতা রয়েছে? তাদের উচিত ছিল এগুলো সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করা। তাহলেই তারা এ শিক্ষা লাভ করতো যে, এ সবকিছুই আল্লাহর আয়ত্ত্বাধীন। তাঁর সাথে কারো কোন তুলনা চলে না এবং তাঁর সাথে কারো কোন সাদৃশ্যও নেই। তিনিই একমাত্র ইবাদতের যোগ্য। তাদের আরো উচিত তাঁর রাসূল (সঃ)-এর সত্যতা স্বীকার করা, তাঁর অনুসরণে ঝুঁকে পড়া, প্রতিমাগুলোকে দূরে নিক্ষেপ করা এবং এই ভয় করা যে, মৃত্যু অতি নিকটবর্তী, সুতরাং যদি কুফরীর অবস্থাতেই মৃত্যু এসে পড়ে তবে বেদনাদায়ক শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে।

আল্লাহ পাক বলেনঃ এর পরও তারা কোন্ কথায় ঈমান আনবে? অর্থাৎ যে ভীতি প্রদর্শন মূলক হুমকি দেয়া হয়েছে এটা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকেই এসেছে। তারা যদি এই অহী ও কুরআনের সত্যতা স্বীকার না করে যা মুহাম্মাদ (সঃ) পেশ করেছেন, তবে তারা আর কোন কথার সত্যতা স্বীকার করবে?

হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ শবে মিরাজে গিয়ে যখন আমি সপ্তম আকাশ পর্যন্ত পৌঁছলাম তখন উপর দিকে তাকিয়ে বজ্র ও বিদ্যুৎ দেখতে পেলাম এবং এমন কতগুলো লোকের পার্শ্ব দিয়ে আমি গমন করলাম যাদের পেট মৃৎ পাত্রের মত ফুলে মোটা হয়েছিল। পেটের মধ্যে সাপ ভরা ছিল। বাইরে থেকেও সেই সাপ দেখা যাচ্ছিল। আমি জিবরাঈল (আঃ)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেনঃ "এরা হচ্ছে সুদখোর।" অতঃপর এই প্রথম আকাশে নেমে এসে নীচের দিকে তাকালে ধুঁয়ার মত দেখলাম এবং শোরগোল শুনতে পেলাম। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে জিবরাঈল (আঃ)! এটা কি? তিনি উত্তরে বললেনঃ "এরা হচ্ছে শয়তান, যারা মানুষের চোখের সামনে ঘুরতে থাকে এবং আড় হয়ে যায়, যেন মানুষ যমীন ও আসমানের আধ্যাত্মিক

বস্তুর দিকে দৃষ্টিপাতই করতে না পারে। যদি এই প্রতিবন্ধকতা না থাকতো তবে মানুষ আকাশের বহু বিস্ময়কর ব্যাপার দেখতে পেতো।” এই হাদীসের একজন বর্ণনাকারী হচ্ছেন আলী ইবনে যায়েদ। বহু মুনকার হাদীসের সাথে তাঁর সম্পর্ক রয়েছে।

১৮৬। যাদেরকে আল্লাহ বিপথগামী করেন, তাদের কোন পথ প্রদর্শক নেই, আর আল্লাহ তাদেরকে তাদেরই বিভ্রান্তির মধ্যে উদভ্রান্তের ন্যায় ঘুরে বেড়াতে ছেড়ে দেন।

١٨٦- مَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ ۚ وَ يَذَرُهُمْ فِيْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ○

আল্লাহ তা'আলা যাদের নাম পথভ্রষ্ট হিসেবে লিখে দিয়েছেন তাদেরকে কেউই পথপ্রদর্শন করতে পারে না। তারা যতই নিদর্শনসমূহ অবলোকন করুক না কেন, তাদের কোনই উপকার হবে না। আল্লাহ যাকে ফিৎনায় পতিত করেন তাকে কে সত্য পথে আনয়ন করবে? যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ “(হে নবী সঃ!) তুমি বলে দাও– দেখো! আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে আমার কি নিদর্শনসমূহ রয়েছে! কিন্তু নিদর্শনসমূহ, মু'জিযাসমূহ এবং ভয় প্রদর্শন ঐ কওমের কোনই উপকার সাধন করবে না যারা ঈমান আনে না।”

১৮৭। (হে মুহাম্মাদ সঃ)! তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করছে যে, কিয়ামত কখন সংঘটিত হবে? তুমি বলে দাও– এই বিষয়ে আমার প্রতিপালকই একমাত্র জ্ঞানের অধিকারী, শুধু তিনিই ওটা ওর নির্ধারিত সময়ে প্রকাশ করবেন, তা হবে আকাশ রাজ্য ও পৃথিবীতে একটি ভয়ংকর ঘটনা, তোমাদের উপর ওটা আকস্মিকভাবেই আসবে, তুমি যেন এ বিষয়ে সবিশেষ

١٨٧- يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسٰهَا ۚ قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّيْ ۚ لَا يُجَلِّيْهَا لِوَقْتِهَا اِلَّا هُوَ ۚ ثَقُلَتْ فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۚ لَا تَاْتِيْكُمْ اِلَّا بَغْتَةً ۚ يَسْـَٔلُوْنَكَ كَاَنَّكَ حَفِيٌّ

عَنۡهَا قُلۡ اِنَّمَا عِلۡمُهَا عِنۡدَ اللّٰهِ وَ لٰكِنَّ اَكۡثَرَ النَّاسِ لَا يَعۡلَمُوۡنَ ○

অবগত, এটা ভেবে তারা তোমাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে, তুমি বলে দাও– এর সম্পর্কে জ্ঞান একমাত্র আমার প্রতিপালকেরই রয়েছে, কিন্তু অধিকাংশ লোকই এ সম্পর্কে কোনই জ্ঞান রাখে না।

এই আয়াতটি কুরায়েশদের সম্পর্কে অথবা ইয়াহূদীদের একটি দলের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়। প্রথমটিই সঠিকতর। কেননা, এটা মক্কী আয়াত। আর ইয়াহূদীরা তো মদীনার অধিবাসী ছিল। আল্লাহ্ পাক বলেনঃ এই লোকগুলো যে কিয়ামতের সময় সম্পর্কে তোমাকে (নবী মুহাম্মাদ সঃ -কে) জিজ্ঞেস করছে তা কিন্তু বিশ্বাস করার উদ্দেশ্যে নয়, বরং তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করার দৃষ্টিকোণ নিয়েই প্রশ্ন করছে। যেমন নিম্নের আয়াতে দেখা যাচ্ছে– এ লোকগুলো বলে, আপনি যদি সত্যবাদী হন তবে বলুন তো কিয়ামত কখন সংঘটিত হবে এবং কোন্ তারিখে হবে? অন্য জায়গায় বলেনঃ "এই কাফির লোকেরা তাড়াতাড়ি কিয়ামত সংঘটন কামনা করছে। অথচ মুমিনরা তো কিয়ামতের ভয়াবহতা থেকে সদা ভীত-সন্ত্রস্ত থাকে এবং বিশ্বাস রাখে যে, ওর আগমন সত্য। যারা কিয়ামতের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করে তারা বড় ভ্রান্তির মধ্যে রয়েছে।"

আল্লাহ্ পাক বলেনঃ হে নবী (সঃ)! তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করছে– কিয়ামত কোন্ তারিখে সংঘটিত হবে এবং দুনিয়া শেষ হবে কখন? আর ওর নির্ধারিত সময় কোন্টা ? হে নবী (সঃ) ! তুমি তাদেরকে বলে দাও– এর জ্ঞান তো একমাত্র আমার প্রতিপালক আল্লাহ্রই রয়েছে! আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেউই এর সময় সম্পর্কে অবহিত নয়। আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় নবী (সঃ)-কে পরামর্শ দিচ্ছেন– হে নবী (সঃ)! তারা তোমাকে কিয়ামতের সময় সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করছে, তুমি এর উত্তর এটাই দাও যে, এর নির্দিষ্ট সময় আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেউ অবহিত নয়। এজন্যেই আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ ثَقُلَتۡ فِی السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضِ অর্থাৎ যমীন ও আসমানবাসী এর ব্যাপারে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। হযরত হাসান (রঃ)-এর ভাবার্থ এই বর্ণনা করেছেন যে, যখন কিয়ামত সংঘটিত হবে তখন যমীন ও আসমানবাসীর ওটা অত্যন্ত ভারী ও কঠিন বোধ হবে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর ভাবার্থ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন যে, এমন কোন জিনিস থাকবে না যার উপর কিয়ামতের কষ্ট পৌঁছবে না। আকাশ ফেটে যাবে,

তারকারাজী খসে পড়বে, সূর্য অন্ধকার হয়ে যাবে, পাহাড় উড়তে থাকবে এবং আল্লাহ তা'আলা যা কিছু বলেছেন সবই হবে। আকাশবাসীদেরও এর জ্ঞান নেই। যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ "ওটা এমনভাবে হঠাৎ এসে পড়বে যে, ওটার কোন ধারণাও করা হবে না।"

সহীহ বুখারীতে হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "কিয়ামত সংঘটিত হবে না যে পর্যন্ত না পশ্চিম দিক হতে সূর্য উদিত হবে। এক সময়ে যখন সূর্য পশ্চিম দিকে উদিত হবে তখন কাফিররা এই আশ্চর্যজনক ঘটনা এবং ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা অবলোকন করে ঈমান আনয়ন করবে। কিন্তু ঐ সময়ে ঈমান আনয়ন কারো কোন উপকারে আসবে না। পাপীদের সেই সময়ের সৎ কাজ মোটেই ফলদায়ক হবে না। দু'ব্যক্তি কাপড় আদান প্রদান করতে থাকবে, এই উদ্দেশ্যে কাপড়ের থান খুলে দেয়া হবে, দুধ দোহন করে পান করাও হবে না , মানুষ পান করার পানির পাত্র পরিষ্কার করতেই থাকবে এবং তারা খাদ্য গ্রাস মুখে উঠাতে যাবে ইত্যবসরে কিয়ামত শুরু হয়ে যাবে। "

يَسْئَلُوْنَكَ كَاَنَّكَ حَفِىٌّ عَنْهَا -এর অর্থের ব্যাপারে মুফাস্সিরগণের মতানৈক্য রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন যে, এর অর্থ হচ্ছে– হে নবী (সঃ)! তারা কিয়ামতের রহস্য তোমাকে এমনভাবে জিজ্ঞেস করছে যে, তুমি যেন তাদের বড় বন্ধু। আর তারা তোমাকে এটা এমন ভঙ্গীতে জিজ্ঞেস করছে যে, তুমি যেন কিয়ামত সংঘটনের তারিখ অবগত রয়েছো। এ জন্যেই আল্লাহ পাক বলেন যে, এর জ্ঞান আল্লাহ ছাড়া আর কারো নেই। আল্লাহ তা'আলা এই রহস্য তো নিজের নিকটতম কোন ফেরেশতা বা কোন রাসূলের উপরেও প্রকাশ করেননি। কাতাদা (রঃ) বলেন যে, কুরাইশরা নবী (সঃ)-কে বলেছিলঃ "আপনার এবং আমাদের মধ্যে তো আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে, অতএব কিয়ামত কখন হবে তা আমাদেরকে বলে দিন।" তাই আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতটি অবতীর্ণ করে বলেনঃ হে নবী (সঃ)! তুমি তাদেরকে বলে দাও–এর জ্ঞান শুধু আল্লাহ তা'আলারই আছে।

ঐ লোকগুলো নবী (সঃ)-কে কিয়ামত সংঘটনের সময় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতো, কিন্তু তারা জানতো না যে, ওর জ্ঞান তাঁর তো নেই। আল্লাহ ছাড়া কেউই ওর জ্ঞান রাখে না। একজন বেদুঈনের রূপ ধারণ করে একদা হযরত জিবরাঈল (আঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট আগমন করেন, যেন জনগণ দ্বীনী

শিক্ষা লাভ করতে পারে। অতঃপর তিনি হিদায়াত অনুসন্ধিৎসু একজন প্রশ্নকারীর ভঙ্গীতে তাঁর পার্শ্বে বসে পড়েন এবং তাঁকে ইসলাম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। এরপর জিজ্ঞেস করেন ঈমান ও ইহসান সম্পর্কে। তার পর জিজ্ঞেস করেনঃ "কিয়ামত কখন সংঘটিত হবে?" এই চতুর্থ প্রশ্নের উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "এই ব্যাপারে তো আপনার চেয়ে আমার জ্ঞান বেশী নেই। অর্থাৎ আপনি যেমন এটা জানেন না তেমনই আমিও জানি না। কোন লোকই এই ব্যাপারে কিছুই জানে না বা জানতে পারে না।" অতঃপর তিনি إِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ (৩১ঃ ৩৪) এই আয়াতটি পাঠ করেন। অন্য একটি রিওয়াইয়াতে আছে যে, হযরত জিবরাঈল (আঃ) একজন বেদুঈনের রূপ ধরে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট আগমন করেন এবং তাঁকে কিয়ামতের নিদর্শনাবলী সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। তখন তিনি নিদর্শনগুলো বলে দেন। তারপর তিনি বলেনঃ "পাঁচটি জিনিসের জ্ঞান আল্লাহ ছাড়া আর কারো নেই।" তাঁর প্রতিটি উত্তরের উপর হযরত জিবরাঈল (আঃ) বলে যাচ্ছিলেনঃ "আপনি সঠিক উত্তরই দিয়েছেন।" তাঁর কথার ধরনে বুঝা যাচ্ছিল যে, তিনি ওগুলো জানেন এবং জানেন বলেই তাঁর উত্তরের সত্যতার স্বীকারোক্তি করছেন। সুতরাং সাহাবাগণ এতে বিস্ময় প্রকাশ করেন যে, ইনি কি ধরনের প্রশ্নকারী? তিনি নিজেই প্রশ্ন করছেন, আবার উত্তরের সঠিকতা স্বীকার করছেন! যখন সেই প্রশ্নকারী চলে গেলেন তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) সাহাবাগণকে বললেনঃ "ইনি ছিলেন হযরত জিবরাঈল (আঃ)। তিনি তোমাদেরকে দ্বীনী মাসআলাগুলো শিক্ষা দেয়ার জন্যে এসেছিলেন। এর পূর্বে যখন তিনি রূপ পরিবর্তন করে আসতেন তখন আমি তাঁকে চিনতে পারতাম। এবার কিন্তু আমিও তাঁকে চিনতে পারিনি।"[১] যখন এক বেদুঈন তাঁকে জিজ্ঞেস করে এবং উচ্চৈঃস্বরে ডাক দেয়, হে মুহাম্মাদ (সঃ)! তখন তিনিও উচ্চৈঃস্বরেই উত্তর দেন, হ্যাঁ, কি বলতে চাও? তখন সে বলে, কিয়ামত কখন হবে? উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে বলেনঃ "ওরে মূর্খ! কিয়ামত তো আসবে এবং অবশ্যই আসবে। কিন্তু তুমি ওর জন্যে কি প্রস্তুতি গ্রহণ করেছো?" সে উত্তরে বলেঃ "আমি তো ভালরূপে নামায পড়তে এবং রোযা রাখতে পারিনি। তবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ)-এর প্রতি আমার অত্যন্ত ভালবাসা রয়েছে।" তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "কিয়ামতের দিন মানুষ ঐ মানুষের সাথেই থাকবে যাকে সে বেশী ভালবাসে।" এই কথা শুনে সাহাবাগণ অত্যন্ত খুশী হলেন। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে এ হাদীসটি বিভিন্ন পন্থায় অধিকাংশ সাহাবা হতে বর্ণিত হয়েছে।

১. ইমাম ইবনে কাসীর (রঃ) বলেন, আমি শরহে বুখারীর শুরুতে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছি।

রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর অভ্যাস ছিল এই যে, যখন কোন লোক তাঁকে এমন প্রশ্ন করতো যা তার জন্যে অর্থহীন, তখন তিনি উত্তরে এমন বিষয়ের দিকে তার মোড় ফিরিয়ে দিতেন যা জেনে নেয়া তার জন্যে ঐ প্রশ্ন হতে বেশী গুরুত্বপূর্ণ। যেন সে নিজেকে ওর সাথে জড়িয়ে ফেলে এবং পূর্ব থেকেই ওর জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করে, যদিও ওর নির্দিষ্ট সময় তার জানা না থাকে। হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, আরবের বেদুঈনরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে আসতো এবং প্রায়ই প্রশ্ন করতোঃ "কিয়ামত কখন সংঘটিত হবে?" তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) তার কোন এক শিশু সন্তানের দিকে ইঙ্গিত করে বলতেনঃ "যদি আল্লাহ একে পূর্ণ বয়স দান করেন তবে এ বৃদ্ধ হওয়ার পূর্বেই তোমার কিয়ামত এসে যাবে।" এখানে যেন কিয়ামত দ্বারা মৃত্যুকে বুঝানো হয়েছে, যা মানুষকে এই দুনিয়া হতে সরিয়ে আলমে বারযাখে নিয়ে যাবে। শব্দের কম বেশী কিছু পরিবর্তনসহ এ বিষয়ের আরো বহু হাদীস বর্ণিত হয়েছে। মোটকথা, এসব হাদীসের উদ্দেশ্য এই যে, কিয়ামত আসবে এবং অবশ্যই আসবে। কিন্তু সময়ের নির্ধারণ সম্ভব নয়।

"এই শিশুর বার্ধক্য আসার পূর্বেই কিয়ামত এসে যাবে" এ বাক্যের প্রয়োগও এই আবদ্ধ করণের উপরই মাহমূল হয়েছে। অর্থাৎ এর দ্বারা মানুষের মৃত্যুর সময় বুঝানো হয়েছে।

ইন্তেকালের এক মাস পূর্বে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছিলেনঃ "তোমরা আমাকে কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করতে রয়েছো, কিন্তু কিয়ামত আসতে আর কত দিন সময় আছে এর জ্ঞান তো একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই রয়েছে। তবে আমি কসম খেয়ে বর্ণনা করছি যে, বর্তমানে ভূ-পৃষ্ঠে যতগুলো প্রাণী রয়েছে, একশ' বছর পরে এগুলোর একটিরও অস্তিত্ব বাকী থাকবে না।" তা হলে ভাবার্থ যেন এই যে, কিয়ামতের দিন যেমন সমস্ত লোক মৃত্যুবরণ করবে, তদ্রূপ একশ' বছর পরে বর্তমানের সমস্ত লোকের জন্যে কিয়ামত এসে যাবে। সুতরাং তাঁর উদ্দেশ্য যেন এই যে, তোমরা যদি নির্ধারিত সময়ই জানতে চাও তবে এটাই হচ্ছে নির্ধারিত সময়। এভাবে কিয়ামত দ্বারা ঐ এক শতাব্দীর সমাপ্তি বুঝানো হয়েছিল। তিনি এই ঢঙ্গেই বর্ণনা দিয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, শবে মিরাজে আমি হযরত ইবরাহীম (আঃ), হযরত মূসা (আঃ) এবং হযরত ঈসা (আঃ)-এর পার্শ্ব দিয়ে গমন করি। লোকেরা কিয়ামত সম্পর্কে আলোচনা করছিল। সবাই এসে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-কে জিজ্ঞেস করলো। তিনি উত্তরে বললেনঃ "এ ব্যাপারে আমার কোনই জ্ঞান নেই।" এর পর তারা হযরত মূসা (আঃ)-এর কাছে গেল। তিনিও বললেন যে, এর জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কারো নেই। অতঃপর তারা হযরত ঈসা (আঃ)-এর কাছে গেল। তিনিও

বললেনঃ এর জ্ঞান একমাত্র আল্লাহরই আছে। তবে এর আলামত এই যে, দাজ্জাল বের হবে। আমার সাথে দু'একটি শাখা থাকবে। সে (দাজ্জাল) আমাকে দেখা মাত্রই সীসার মত গলে যাবে এবং আল্লাহ পাক তাকে ধ্বংস করে দিবেন। এমন কি গাছ ও পাথরও বলে উঠবে– হে মুসলমান! আমার আড়ালে একজন কাফির লুকিয়ে রয়েছে। সুতরাং তুমি এসে তাকে হত্যা কর। অতএব, আল্লাহ তা'আলা ঐ সব কাফিরকে ধ্বংস করে দিবেন। অতঃপর লোকেরা নিজ নিজ শহরে ও দেশে ফিরে যাবে। ইতিমধ্যে ইয়াজূজ ও মাজূজ প্রত্যেক প্রান্ত থেকে বেরিয়ে পড়বে। তারা শহর-পল্লী ধ্বংস করে চলবে। প্রতিটি জিনিস তাদের ঘোরা ফেরার কারণে ধ্বংস ও নষ্ট হতে থাকবে। শেষ পর্যন্ত তারা প্রস্রবণে পৌঁছবে এবং ওকে শূন্য করে ফেলবে। জনগণ তখন আমার কাছে তাদের অভিযোগ নিয়ে আসবে। আমি তাদের জন্যে আল্লাহর কাছে বদ দুআ' করবো। আল্লাহ তা'আলা ঐসব ইয়াজূজ ও মাজূজকে ধ্বংস করে দিবেন। অবশেষে প্রতিটি স্থান তাদের মৃতদেহে ভরে যাবে এবং ওগুলো সড়ে পচে দুর্গন্ধময় হয়ে পড়বে। তখন আল্লাহ তা'আলা বৃষ্টি বর্ষণ করে তাদের মৃতদেহগুলো বইয়ে নিয়ে সমুদ্রে ফেলে দিবেন। ঐ সময় পাহাড় স্থানচ্যুত হয়ে যাবে এবং যমীন বিস্তৃত হয়ে পড়বে। ঐ সময় কিয়ামত এমনই নিকটবর্তী হবে যেমন ন'মাসের গর্ভবতী মহিলা সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে যে, সে দিন-রাত কোন এক সময়ের মধ্যেই সন্তান প্রসব করবে। বড় বড় নবীরাও কিয়ামতের সময় সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না। হযরত ঈসা (আঃ)-ও শুধুমাত্র ওর আলামতগুলো বলে দিয়েছেন। কেননা, এই উম্মতের শেষ যুগে তিনি অবতরণ করবেন এবং নবী (সঃ)-এর আহকাম নাফিয করবেন। তিনি দাজ্জালকে হত্যা করবেন এবং আল্লাহ তা'আলা তাঁরই বদ দুআ'য় ইয়াজূজ-মাজূজকে ধ্বংস করবেন।

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "আমি তোমাদেরকে কিয়ামতের নিদর্শনগুলো বলছি। তা এই যে, ওর সামনে বড় বড় ফিৎনা ও 'হারাজ' সংঘটিত হবে।" সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমরা ফিৎনা তো বুঝলাম। কিন্তু 'হারাজ' কি?" তিনি উত্তরে বললেনঃ "হাবশের আরবী ভাষায় এর অর্থ হচ্ছে হত্যা।" অতঃপর তিনি বলেনঃ জনগণের মধ্যে অপরিচিতি ও বেপরওয়াঈ এতো বৃদ্ধি পাবে যে, এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে বলবেঃ 'আমি তোমাকে চিনি না।' বিশুদ্ধ ছ'খানা হাদীস গ্রন্থে এ কথাটিকে এভাবে বর্ণনা করা হয়নি।

আমাদের উম্মী নবী (সঃ) সাইয়্যেদুল মুরসালীন, খাতিমুন নাবিঈন, যিনি রহমত ও তাওবার নবী, বলেছেনঃ "আমি ও কিয়ামত এই দু'টি অঙ্গুলির মত।" ঐ সময় তিনি তাঁর শাহাদাত ও মধ্যমা অঙ্গুলি দু'টি মিলিত দেখিয়েছিলেন। তিনি যেন বলতে চেয়েছেন যে, তাঁর সাথে কিয়ামত লেগে রয়েছে। অর্থাৎ তাঁর

ও কিয়ামতের মধ্যভাগে কোন নবী আসবেন না। মোট কথা عِلْمُ السَّاعَةِ বা কিয়ামতের ইল্‌ম শুধু আল্লাহ্ পাকেরই রয়েছে।

১৮৮- قُلْ لَّآ اَمْلِكُ لِنَفْسِيْ نَفْعًا وَّ لَا ضَرًّا اِلَّا مَاشَآءَ اللّٰهُ ۭ وَلَوْ كُنْتُ اَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ ۚ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوْٓءُ ۚ اِنْ اَنَا اِلَّا نَذِيْرٌ وَّ بَشِيْرٌ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ۟

১৮৮। (হে মুহাম্মাদ সঃ)! তুমি ঘোষণা করে দাও– আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তা ছাড়া আমার নিজের ভাল-মন্দ, লাভ-ক্ষতি, মঙ্গল-অমঙ্গল ইত্যাদি বিষয়ে আমার কোন অধিকার নেই, আমি যদি অদৃশ্য তত্ত্ব ও খবর জানতাম তবে আমি প্রভূত কল্যাণ লাভ করতে পারতাম আর কোন অমঙ্গল ও অকল্যাণই আমাকে স্পর্শ করতে পারতো না। অতএব অদৃশ্য জগতের কোন খবরই আমি রাখি না, আমি শুধু মুমিন সম্প্রদায়ের জন্যে একজন ভয় প্রদর্শনকারী ও সুসংবাদবাহী।

এখানে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল (সঃ)-কে নির্দেশ দিচ্ছেন– হে নবী (সঃ)! তুমি সমস্ত বিষয়ের সম্পর্ক আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে দাও। নিজের সম্পর্কে তুমি বলে দাও–ভবিষ্যতের জ্ঞান আমারও নেই। হ্যাঁ, তবে আল্লাহ যেটা বলে দেন একমাত্র সেটাই আমি বলতে পারি। যেমন আল্লাহ পাক বলেনঃ

عٰلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلٰى غَيْبِهٖٓ اَحَدًا

অর্থাৎ "তিনি (আল্লাহ্) অদৃশ্যের সংবাদ জ্ঞাত, তাঁর অদৃশ্য বিষয় কারো উপর প্রকাশিত হয় না (তাঁর অদৃশ্য বিষয় কেউ জানতে পারে না) ।" (৭২ঃ ২৬)

আল্লাহ পাকের উক্তিঃ হে নবী (সঃ)! তুমি বলে দাও– আমি যদি অদৃশ্যের বিষয় জানতাম তবে আমি নিজের জন্যে অনেক কিছু কল্যাণ জমা করে নিতাম। অর্থাৎ যদি আমি আমার মৃত্যুর সংবাদ অবগত হতাম যে, কোন্ তারিখে আমি মারা যাবো, তবে তাড়াহুড়া করে অনেক সৎকাজ করে ফেলার চেষ্টা করতাম। এটা হচ্ছে মুজাহিদ (রঃ)-এর উক্তি। ইবনে জুরাইহও এটাই বলেন। কিন্তু এ কথায় চিন্তা ভাবনার অবকাশ রয়েছে। কেননা, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সমস্ত কাজ

ভালই ছিল এবং তিনি যে কাজই করতেন তা স্থায়ীভাবেই করতেন। তাঁর সমস্ত কাজ একই রকমের ছিল। প্রত্যেক আমলের সময় তাঁর দৃষ্টি আল্লাহর দিকেই থাকতো। মোটকথা, তাঁর কোন আমলই ভাল ছাড়া মন্দ হতো না। হ্যাঁ, ভাবার্থ এরূপ হতে পারে– আমি যদি অদৃশ্যের সংবাদ জানতাম যে, জনগণের কোন্ ধরনের মঙ্গল কোন্ কাজে রয়েছে, তবে আমি তাদেরকে তা অবহিত করতাম। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) خَيْر -এর অর্থ সম্পদ নিয়েছেন এবং এটাই উত্তমও বটে। অথবা ভাবার্থ হবে– যে জিনিস ক্রয়ে লাভ বা উপকার রয়েছে তা আমার জানা থাকলে ওটা অবশ্যই ক্রয় করতাম। আর কোন জিনিস বিক্রয় করতাম না যে পর্যন্ত না ওর লাভ জানতাম। মোটকথা, ব্যবসায়ে কখনও ক্ষতিগ্রস্ত হতাম না বা কাউকেও ক্ষতিগ্রস্ত হতে দিতাম না। অথবা দারিদ্র বা সংকীর্ণতা আমাকে কখনো স্পর্শ করতো না। কেউ কেউ এ অর্থও নিয়েছেন– দুর্ভিক্ষ আসার খবর জানলে পূর্বেই বহু খাদ্য জমা করে রাখতাম। সস্তার সময় কিনতাম এবং দুর্মূল্যের সময় বিক্রী করতাম। ফলে আমাকে দারিদ্র স্পর্শ করতে পারতো না। কেননা, আমার ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কোন সম্ভাবনাই থাকতো না।

اِنْ اَنَا اِلَّا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ আমি শুধু (জাহান্নাম হতে) ভয় প্রদর্শনকারী এবং (জান্নাতের) সুসংবাদদাতা। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "আমি কুরআনকে তোমার ভাষায় সহজ করে দিয়েছি, যেন এর মাধ্যমে মুত্তাকীদেরকে (জান্নাতের) সুসংবাদ দাও এবং বিবাদী ও ঝগড়াটে লোকদেরকে (জাহান্নাম হতে) ভয় প্রদর্শন কর।"

১৮৯। তিনিই আল্লাহ যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন এবং সেই ব্যক্তি হতেই তাঁর সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন যেন সে তার নিকট থেকে প্রশান্তি লাভ করতে পারে, অতঃপর যখন সে তার সাথে মিলনে প্রবৃত্ত হয় তখন সেই মহিলাটি এক গোপন ও লঘু গর্ভধারণ করে, আর (এই অবস্থায় সে দিন কাটাতে থাকে এবং) ওটা নিয়ে চলাফেরা

١٨٩- هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ اِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشّٰهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيْفًا فَمَرَّتْ بِهٖ فَلَمَّا اَثْقَلَتْ دَّعَوَا

اللّٰهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ اٰتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ○

করতে থাকে, যখন তার গর্ভ গুরুভার হয় তখন তারা উভয়েই তাদের প্রতিপালকের কাছে প্রার্থনা করে– যদি আপনি আমাদেরকে সৎ সন্তান দান করেন তবে আমরা আপনার কৃতজ্ঞ বান্দা হবো।

١٩٠- فَلَمَّآ اٰتٰـهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهٗ شُرَكَآءَ فِيْمَآ اٰتٰهُمَا فَتَعٰلَى اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ○

১৯০। অতঃপর তিনি যখন তাদেরকে সৎ ও সুস্থ সন্তান দান করেন তখন তারা আল্লাহর দেয়া এই দানে অংশী স্থাপন করে, কিন্তু তারা যাকে অংশী করে আল্লাহ তা অপেক্ষা অনেক উন্নত ও মহান।

ইরশাদ হচ্ছে যে, দুনিয়া জাহানের সমস্ত মানুষই আদম (আঃ)-এর বংশের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে এবং স্বয়ং তাঁর স্ত্রী হাওয়া তাঁরই মাধ্যমে সৃষ্ট হয়েছেন। তাঁদের দু'জনের মাধ্যমে বংশ বৃদ্ধি হতে থাকে। যেমন আল্লাহ পাক বলেনঃ "হে লোক সকল! আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন নারীর মাধ্যমে সৃষ্টি করেছি। আর তোমাদেরকে এমনভাবে বাড়িয়েছি যে, তোমরা বংশে বংশে ও গোত্রে গোত্রে পরিণত হয়েছো। এখন তোমাদের একে অপরের হকের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত । নিশ্চয়ই আল্লাহর দৃষ্টিতে তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তিই বেশী সম্মানিত যে বেশী মুত্তাকী।" لِيَسْكُنَ اِلَيْهَا -এর অর্থ হচ্ছে– যেন সে (পুরুষ) তার (স্ত্রীর) কাছে প্রশান্তি লাভ করে। এ জন্যেই আল্লাহ পাক وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً অর্থাৎ তিনি তোমাদের পরস্পরের মধ্যে প্রেম-প্রীতি ও মায়া-মহব্বত সৃষ্টি করেছেন। (৩০ঃ ২১) দু' আত্মার মধ্যে যে প্রেম-প্রীতি ও ভালবাসা জন্মে, এর চেয়ে অধিক ভালবাসা আর কোথায়ও হতে পারে না। তাই তো আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "যাদুকর তার যাদুর মাধ্যমে সর্বাত্মক চেষ্টা চালায় যে, কি করে সে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করতে পারে।" মোটকথা, স্বামী যখন তার প্রকৃতিগত প্রেমের ভিত্তিতে স্বীয় স্ত্রীর সাথে মেলা মেশা করে তখন তার স্ত্রী প্রথমতঃ তার গর্ভাশয়ে একটা হালকা বোঝার অস্তিত্ব অনুভব করে। এটা হলো গর্ভের সূচনার সময়। এই সময় নারীর কোন কষ্ট হয় না। কেননা, এই গর্ভ তো এখন সবেমাত্র

নুৎফা বা মাংসপিণ্ড। এখন ওটা হালকা পাতলা অবস্থায় রয়েছে। আইয়ূব (রঃ) বলেনঃ আমি হাসান (রঃ)-কে مَرَّتْ بِهٖ -এর অর্থ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেনঃ "যদি আমি আরববাসী হতাম এবং তাদের ভাষা বুঝতাম তবে এর অর্থ জানতাম। এর অর্থ এই হতে পারে যে, সে এই গর্ভ নিয়ে আরামেই চলাফেরা করে।" কাতাদা (রঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে– এই গর্ভ প্রকাশিত হয়েছে। ইবনে জারীর (রঃ) বলেন যে, ঐ গর্ভ নিয়ে সে সহজেই উঠাবসা করতে পারে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে– এই প্রাথমিক সময় হচ্ছে এমন এক সময় যখন তার নিজেরই এই সন্দেহ থেকে যায় যে, তার গর্ভ আছে কি নেই। মোটকথা এর পরে নারী তার পেটের গর্ভ সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়ে যায়। তখন পিতা-মাতা দু'জনই আল্লাহর কাছে এই কামনা করে যে, যদি তিনি তাদেরকে নিখুঁত ও সুন্দর সন্তান দান করেন তবে এটা তাঁর বড়ই ইহসান হবে! হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ "মা-বাপের এই ভয়ও থাকে যে, না জানি হয়তো কোন পশুর আকৃতি বিশিষ্ট বা কোন অঙ্গহানি যুক্ত সন্তান ভূমিষ্ট হয়ে যায় না কি! যেমন কোন কোন সময় এরূপ হয়েও থাকে।" হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে– 'যদি আল্লাহ আমাকে পুত্র সন্তান দান করেন।' কেননা, সন্তানের মধ্যে পুত্র সন্তানই বেশী উপযুক্ত বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। মোটকথা, আল্লাহ তা'আলা যখন তাদেরকে সহীহ সালেম ও নিখুঁত সন্তান দান করেন তখন তারা ওটাকে প্রতিমাগুলোর অংশ বানিয়ে দেয়। আল্লাহর সত্তা এরূপ শির্ক থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। মুফাস্সিরগণ এখানে বহু আসার ও হাদীস বর্ণনা করেছেন, সেগুলো আমরা ইনশাআল্লাহ বর্ণনা করবো। অতঃপর ইনশাআল্লাহ সঠিক কোনটি সেটাও বলে দেয়ার প্রয়াস পাবো। মহান আল্লাহর উপরই আমাদের ভরসা।

ইমাম আহমাদ (রঃ) স্বীয় মুসনাদে হাসান (রঃ) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি সামুরা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সঃ) বলেছেন, হাওয়া (আঃ) যখন সন্তান প্রসব করেন তখন ইবলীস তাঁর কাছে আগমন করে। তাঁর সন্তান বেঁচে থাকতো না। শয়তান তাকে পরামর্শ দিলো– "তোমার শিশুর নাম আব্দুল হারিস রাখো, তাহলে সে জীবিত থাকবে।" তখন তার নাম আব্দুল হারিস রাখা হয় এবং সে জীবিত থাকে। এটা ছিল শয়তানের পক্ষ থেকে অহী। হারিস শয়তানের নাম। এ হাদীসে তিনটি ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়। (১) এই হাদীসের বর্ণনাকারী উমার ইবনে ইবরাহীম একজন বসরী লোক। ইবনে মুঈন (রঃ) তাকে বিশ্বাসযোগ্য বললেও আবূ হাতিম (রঃ) বলেন যে, তার থেকে হুজ্জত গ্রহণ করা

যেতে পারে না। (২) এই রিওয়াইয়াতই মওকূফ রূপে হযরত সামুরা (রাঃ)-এর উক্তিতেই বর্ণিত হয়েছে, যা মারফূ' নয়। তাফসীরে ইবনে জারীরে স্বয়ং হযরত সামুরা (রাঃ)-এর উক্তি রয়েছে যে, হযরত আদম (আঃ) তাঁর ছেলের নাম আব্দুল হারিস রেখেছিলেন। (৩) এ হাদীসের বর্ণনাকারী হাসান (রঃ) থেকেও এই আয়াতের তাফসীর এর বিপরীত বর্ণনা করা হয়েছে! তাহলে এটা স্পষ্ট কথা যে, যদি এ মারফূ' হাদীসটি তার দ্বারা বর্ণনাকৃত হতো তাহলে স্বয়ং তিনি এর উল্টো তাফসীর করতেন না। ইবনে জারীর (রঃ) বলেন যে, এটা হযরত আদম (আঃ)-এর ঘটনা নয়, বরং এটা অন্য ধর্মাবলম্বীদের ঘটনা। আবার এটাও বর্ণনা করা হয়েছে যে, এর দ্বারা কোন মুশরিক ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে যে এরূপ করে থাকে। কথিত আছ যে, এটা হচ্ছে ইয়াহূদী ও খ্রীষ্টানের কাজের বর্ণনা, যারা নিজেদের সন্তানদেরকে নিজেদের রীতিনীতির উপর পরিচালিত করে বা তাদেরকে ইয়াহূদী ও খ্রীষ্টান বানিয়ে দেয়। এই আয়াতের যেসব তাফসীর বর্ণনা করা হয়েছে তন্মধ্যে এটাই উত্তম তাফসীর। মোটকথা, এটা ছিল অতি বিস্ময়কর ব্যাপার যে, একজন মুত্তাকী ব্যক্তি একটি আয়াতের তাফসীরে একটি মারফূ' হাদীস বা স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর উক্তিরূপে বর্ণনা করবেন, আবার নিজেই ওর বিপরীত তাফসীর করবেন! এর দ্বারা এটা প্রমাণিত হয় যে, এ হাদীসটি মারফূ' নয়, বরং এটা হযরত সামুরা (রাঃ)-এর নিজের উক্তি। এর পর এটা ধারণা করা যেতে পারে যে, সম্ভবতঃ সামুরা (রাঃ) এটা আহ্লে কিতাবের নিকট থেকে গ্রহণ করেছেন। যেমন কা'ব, অহাব প্রমুখ যাঁরা পরে মুসলমান হয়েছিলেন। ইনশাআল্লাহ এর বর্ণনা সত্বরই আসবে।

মোটকথা, এ হাদীসটিকে মারফূ' হাদীস রূপে গ্রহণ করা যেতে পারে না। তবে এই ব্যাপারে অন্যান্য হাদীসও রয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত হাওয়া (আঃ)-এর যেসব সন্তান জন্মগ্রহণ করতো তাদেরকে আল্লাহর ইবাদতের জন্যে নির্দিষ্ট করে দেয়া হতো এবং তাদের নাম আব্দুল্লাহ, উবাইদুল্লাহ ইত্যাদি রাখা হতো। এ সন্তানগুলো মারা যেতো! একদা ইবলীস হযরত আদম (আঃ) ও হযরত হাওয়া (আঃ)-এর কাছে এসে বললোঃ যদি তোমরা তোমাদের সন্তানদের অন্য নাম রাখো তবে তারা জীবিত থাকবে। অতঃপর হযরত হাওয়া (আঃ)-এর এক সন্তান ভূমিষ্ট হলো। তখন পিতা-মাতা তার নাম রাখলেন আব্দুল হারিস। এ সম্পর্কেই আল্লাহ পাক هُوَ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ .... -এ কথা বলেন।

গর্ভ ছিল কি ছিল না এ ব্যাপারে হযরত হাওয়া (আঃ)-এর মনে সন্দেহ ছিল। মোটকথা, যখন গর্ভ ভারী হয়ে উঠলো তখন দু'জনই আল্লাহ তা'আলার নিকট দুআ' করলেন যে, যদি তিনি সহীহ সালিম ও নিখুঁত সন্তান দান করেন তবে তাঁরা তাঁর নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করবেন। তখন শয়তান তাঁদের উভয়ের কাছে এসে বললোঃ তোমাদের কিরূপ সন্তান ভূমিষ্ট হবে তার কোন খবর তোমরা রাখো কি? সেই সন্তান মানুষের আকার বিশিষ্টও হতে পারে, আবার জন্তুর আকৃতি বিশিষ্টও হতে পারে। ভুল কথা তাঁদের সামনে সে শুভ রূপে পেশ করলো। সে তো প্রতারকই বটে। ইতোপূর্বে তাঁদের দু'টি সন্তান জন্মগ্রহণ করেই মারা গিয়েছিল। শয়তান তাঁদেরকে বুঝিয়ে বললোঃ "তোমরা যদি আমার নামে সন্তানের নাম না রাখো তবে তোমাদের সন্তান বিকলাঙ্গ হবে এবং জীবিতও থাকবে না।" সুতরাং তার কথামত তাঁরা সন্তানের নাম আব্দুল হারিস রেখে দিলো। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "যখন আল্লাহ তাদেরকে তাদের প্রার্থনা অনুযায়ী সহীহ সালিম ও নিখুঁত সন্তান দান করলেন তখন তারা আল্লাহর সাথে শরীক করে বসলো।" এই আয়াতে এরই বর্ণনা রয়েছে। অন্য একটি রিওয়াইয়াতে আছে যে, প্রথমবারের গর্ভের সময় সে (শয়তান) তাঁদের কাছে আগমন করে এবং তাঁদেরকে ভয় দেখিয়ে বলে– আমি তো সেই, যে তোমাদেরকে জান্নাত থেকে বের করিয়েছিল। এখন যদি তোমরা আমার কথামত কাজ না কর তবে আমি এমনভাবে ভেল্কী লাগিয়ে দিবো যে, এই সন্তানের শিং বেরিয়ে যাবে এবং সে পেট ফেড়ে বেরিয়ে পড়বে এবং এই হবে ঐ হবে। এইভাবে সে তাঁদেরকে আতংকগ্রস্ত করলো। কিন্তু তাঁরা তার কথা মানলেন না। আল্লাহর সদিচ্ছায় মৃত সন্তান ভূমিষ্ট হলো। দ্বিতীয়বার হযরত হাওয়া (আঃ) গর্ভধারণ করলেন। সেবার মৃত সন্তানই ভূমিষ্ট হলো। এবার শয়তান নিজেকে অত্যন্ত হিতাকাংখীরূপে তাদের সামনে পেশ করলো। তখন সন্তানের ভালবাসা প্রাধান্য লাভ করলো এবং তারা সন্তানের নাম আব্দুল হারিস রেখে দিলেন। এর উপর ভিত্তি করেই আল্লাহ তা'আলা বললেনঃ

جَعَلَا لَهٗ شُرَكَآءَ فِيْمَآ اٰتٰهُمَا

অর্থাৎ তারা আল্লাহর দেয়া এই দানে অংশী স্থাপন করে বসলো। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে এ হাদীসটি গ্রহণ করে তাঁর ছাত্রদের একটি দলও এ কথাই বলেছেন। যেমন মুজাহিদ (রঃ), সাঈদ ইবনে জুবাইর (রঃ), ইকরামা (রঃ), কাতাদা (রঃ) এবং সুদ্দী (রঃ)। অনুরূপভাবে পূর্ববর্তী থেকে নিয়ে পরবর্তী

পর্যন্ত বহু মুফাস্সির এই আয়াতের তাফসীরে এ কথাই বলেছেন। কিন্তু প্রকাশ্য ব্যাপার এই যে, এই ঘটনাটি আহলে কিতাব থেকেই গ্রহণ করা হয়েছে। এর একটি বড় দলীল এই যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) ওটা হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, যেমন তাফসীরে ইবনে আবূ হাতিমে রয়েছে। সুতরাং এটা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, এ কথাটি আহলে কিতাব হতে নকল করা হয়েছে। যে সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "তোমরা তাদের কথাকে সত্যও বলো না এবং মিথ্যাও বলো না।" এর বর্ণনা তিন প্রকারের হচ্ছে। (১) ঐসব কথা, যেগুলোর বিশুদ্ধতা কোন আয়াত বা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। (২) যেগুলোর অসত্যতা কোন আয়াত বা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়। (৩) ঐসব কথা, যেগুলোর ফায়সালা আমাদের ধর্মে মিলে না। হাদীসের নির্দেশ অনুযায়ী এগুলোর বর্ণনায় কোন দোষ নেই। কিন্তু এগুলো সত্য কি মিথ্যা এটা মন্তব্য করা চলবে না। আমার মতে এটা তো দ্বিতীয় প্রকারের হাদীস। অর্থাৎ মানবার যোগ্য নয়। আর যেসব সাহাবী ও তাবিঈ হতে এটা বর্ণিত আছে তাঁরা এটাকে তৃতীয় প্রকারের অন্তর্ভুক্ত মনে করে বর্ণনা করে দিয়েছেন। কিন্তু আমরা তো ওটাই বলি যা ইমাম হাসান (রঃ) বলে থাকেন। তা হচ্ছে এই যে, মুশরিকদের তাদের সন্তানদের মধ্যে আল্লাহর শরীক করার বর্ণনা এই আয়াতগুলোতে রয়েছে। এটা হযরত আদম (আঃ) ও হাওয়া (আঃ)-এর বর্ণনা নয়। আল্লাহ পাক বলেনঃ তারা যাকে অংশী করে আল্লাহ তা অপেক্ষা অনেক উন্নত ও মহান। এই আয়াতগুলোতে এই বর্ণনা এবং ইতোপূর্বে হযরত আদম (আঃ) ও হযরত হাওয়া (আঃ)-এর বর্ণনা ক্রমিক বর্ণনার মত। প্রথমে আসল মা-বাপের বর্ণনা দেয়ার পর মহান আল্লাহ অন্যান্য মা-বাপ ও তাদের শিরকের বর্ণনা দিয়েছেন।

এখন ব্যক্তিগত বর্ণনা শেষ করে শ্রেণীগত বর্ণনার দিকে মোড় ফিরানো হচ্ছে। যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ "আমি দুনিয়ার আকাশকে তারকারাজি দ্বারা সৌন্দর্য মণ্ডিত করেছি। আবার আমি ঐ তারকাগুলো দ্বারা শয়তানদেরকে মেরে তাড়াবার কাজ নিয়েছি।" আর এটা স্পষ্ট কথা যে, সৌন্দর্যের জন্যে যে তারকাগুলো নির্দিষ্ট রয়েছে সেগুলো ছিটকে পড়ে না। ঐগুলো দ্বারা শয়তানদেরকে মারা হয় না। এখানেও কথার মোড় ফিরানো হচ্ছে যে, তারকারাজির স্বাতন্ত্র্যের বর্ণনার পর শ্রেণীর বর্ণনা দেয়া হয়েছে। এর আরও বহু দৃষ্টান্ত কুরআন কারীমের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। আল্লাহ তা'আলাই এসব ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী জানেন।

১৯১। তারা কি এমন বস্তুকে (আল্লাহর সাথে) অংশী করে থাকে যারা কোন বস্তুই সৃষ্টি করে না বরং তারা নিজেরাই (আল্লাহর দ্বারা) সৃষ্টিকৃত?

١٩١- اَيُشْرِكُوْنَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَّ هُمْ يُخْلَقُوْنَ ۝

১৯২। এই শরীককৃত জিনিসসমূহ যেমন তাদের কোন সাহায্য করার ক্ষমতা রাখে না, তেমনি নিজেদেরকেও কোন সাহায্য করতে পারে না।

١٩٢- وَ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ لَهُمْ نَصْرًا وَّ لَآ اَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُوْنَ ۝

১৯৩। তোমরা যদি ওদেরকে সৎপথে ডাকো তবে তারা তোমাদের অনুসরণ করবে না। তাদেরকে ডাকতে থাকা অথবা তোমাদের চুপ করে থাকা উভয়ই তোমাদের পক্ষে সমান।

١٩٣- وَ اِنْ تَدْعُوْهُمْ اِلَى الْهُدٰى لَا يَتَّبِعُوْكُمْ سَوَآءٌ عَلَيْكُمْ اَدَعَوْتُمُوْهُمْ اَمْ اَنْتُمْ صَامِتُوْنَ ۝

১৯৪। আল্লাহ ছাড়া তোমরা যাদেরকেই ডাকো, তারা তো তোমাদেরই ন্যায় বান্দা, সুতরাং তোমরা তাদেরকে ডাকতে থাকো, যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে তো তারা তোমাদের ডাকে সাড়া দেবে।

١٩٤- اِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ عِبَادٌ اَمْثَالُكُمْ فَادْعُوْهُمْ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝

১৯৫। তাদের কি পা আছে যা দ্বারা চলছে? তাদের কি হাত আছে যা দ্বারা কোন কিছু ধরে থাকে? তাদের কি চক্ষু আছে যা দ্বারা দেখতে পারে? তাদের কি কর্ণ আছে যা দ্বারা শুনে

١٩٥- اَلَهُمْ اَرْجُلٌ يَّمْشُوْنَ بِهَآ اَمْ لَهُمْ اَيْدٍ يَّبْطِشُوْنَ بِهَآ اَمْ لَهُمْ اَعْيُنٌ يُّبْصِرُوْنَ بِهَآ اَمْ

لَهُمْ اٰذَانٌ يَّسْمَعُوْنَ بِهَا ؕ قُلِ ادْعُوْا شُرَكَآءَكُمْ ثُمَّ كِيْدُوْنِ فَلَا تُنْظِرُوْنِ ○

থাকে? (হে নবী সঃ!) তুমি বলে দাও– আল্লাহর সাথে তোমরা যাদেরকে অংশী করেছো, তাদেরকে ডাকো, তারপর (সকলে একত্রিত হয়ে) আমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করতে থাকো, আমাকে আদৌ কোন অবকাশ দিও না।

١٩٦- اِنَّ وَلِيِّۦَ اللّٰهُ الَّذِيْ نَزَّلَ الْكِتٰبَ ۖ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصّٰلِحِيْنَ ○

১৯৬। আমার অভিভাবক হলেন সেই আল্লাহ যিনি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, আর তিনিই সৎকর্মশীলদের অভিভাবকত্ব করে থাকেন।

١٩٧- وَالَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ نَصْرَكُمْ وَلَآ اَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُوْنَ ○

১৯৭। আল্লাহ ছাড়া তোমরা যাদেরকে ডাকো, তারা তোমাদের সাহায্য করার কোন ক্ষমতা রাখে না এবং নিজেদেরকেও সাহায্য করতে পারে না।

١٩٨- وَاِنْ تَدْعُوْهُمْ اِلَى الْهُدٰى لَا يَسْمَعُوْا ؕ وَتَرٰىهُمْ يَنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُوْنَ ○

১৯৮। যদি তুমি তাদেরকে হিদায়াতের পথে ডাকো, তবে সে ডাক তারা শুনবে না, আর তুমি দেখবে যে, তারা তোমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে, আসলে তারা কিছুই দেখছে না।

যে মুশরিকরা আল্লাহকে ছেড়ে প্রতিমা-পূজায় লিপ্ত হয়ে পড়ে তাদেরকে এখানে ভর্ৎসনা করা হচ্ছে যে, এই প্রতিমাগুলোও আল্লাহর সৃষ্ট এবং মানুষই এগুলো নির্মাণ করেছে। এদের কোনই ক্ষমতা নেই। এগুলো কারও কোন ক্ষতিও করতে পারে না এবং কোন উপকারও করতে পারে না। এদের দেখারও শক্তি নেই এবং যারা এদের ইবাদত করে তাদের এরা কোন সাহায্যও করতে

পারে না। বরং এ মূর্তিগুলো তো জড় পদার্থের অন্তর্ভুক্ত। এগুলো নড়াচড়া পর্যন্ত করতে পারে না। এমন কি যারা এদের ইবাদত করে তারাও এদের চেয়ে উত্তম। কেননা, তারা শুনতে পায়, দেখতে পায়, স্পর্শ করতে পারে এবং ধরতে পারে । এ জন্যেই আল্লাহ্ পাক বলেনঃ "তারা কি ঐ পাথরের মূর্তিগুলোকে আল্লাহর অংশীদার বানিয়ে নিচ্ছে যারা কোন কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না? বরং তারা নিজেরাই তো সৃষ্ট।" যেমন মহান আল্লাহ্ বলেনঃ "হে লোক সকল! একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা হচ্ছে দেখো! যারা আল্লাহকে ছেড়ে অন্যান্যের উপাসনা করছে ঐ উপাস্যগুলো তো একটি মাছি পর্যন্ত সৃষ্টি করতে পারে না যদিও তারা সবাই একত্রিত হয়ে চেষ্টা করে, এমন কি মাছিও যদি তাদের খাবারের কোন জিনিস ছিনিয়ে নেয় তবে তারা তার নিকট থেকে তা ফিরিয়ে নিতেও পারে না। আকাংখী ও আকাংখিত উভয়েই কতই না দুর্বল ও শক্তিহীন!" তারা আল্লাহর মর্যাদা বুঝেনি। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ বড়ই শক্তিশালী ও প্রবল পরাক্রান্ত। তাদের উপাস্যরা এতই দুর্বল ও শক্তিহীন যে, মাছি একটা নিকৃষ্ট খাবারও যদি তাদের নিকট থেকে ছিনিয়ে নিয়ে উড়ে যায় তবে তার নিকট থেকে তা কেড়ে নেয়ারও শক্তি এদের নেই। যাদের বিশেষণ এইরূপ তারা কি করে জীবিকা দান করতে পারে বা সাহায্য করতে পারে? যেমন হযরত ইবরাহীম (আঃ) বলেছিলেনঃ اَتَعْبُدُوْنَ مَا تَنْحِتُوْنَ অর্থাৎ "তোমরা কি এমন জিনিসের ইবাদত করছো যাকে তোমরা নিজেরাই নির্মাণ করছো?" (৩৭ঃ ৯৫)

ইরশাদ হচ্ছে– তারা তাদের উপাসনাকারীদের সামান্য পরিমাণও সাহায্য করতে পারে না। এমন কি কেউ যদি তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করে তবে তা থেকে তারা নিজেদেরকে রক্ষা করতেও পারে না। যেমন হযরত ইবরাহীম খলীল (আঃ) স্বীয় কওমের মূর্তিগুলোকে ভেঙ্গে ফেলতেন এবং এভাবে পূর্ণমাত্রায় ওদেরকে লাঞ্ছিত করতেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, মূর্তিগুলোকে ইবরাহীম (আঃ) মেরে মেরে টুকরো টুকরো করে ফেলেন। কিন্তু ভূতখানার সবচেয়ে বড় মূর্তিকে ছেড়ে দিলেন, যেন জনগণ এসে ঐ বড় মূর্তিটিকে জিজ্ঞেস করে যে, এটা কি হয়েছে এবং কে করেছে?

হযরত মুআয্ ইবনে আমর ইবনুল জামূহ (রাঃ) এবং হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাঃ) দু'জন যুবক লোক ছিলেন। তাঁরা মুসলমান হয়েছিলেন। রাত্রিকালে তাঁরা মদীনায় মুশরিকদের মূর্তিগুলোর নিকটে যেতেন এবং ওগুলোকে ভেঙ্গে ফেলতেন। ওগুলো কাঠ দ্বারা নির্মিত হয়ে থাকলে ওগুলো ভেঙ্গে দিয়ে জ্বালানী কাষ্ঠ রূপে ব্যবহারের জন্যে গরীব বিধবা নারীদেরকে ওগুলো দিয়ে দিতেন।

উদ্দেশ্য এই যে, যেন মুশরিকরা এর থেকে কিছু শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে এবং নিজেদের আমল ও আকীদার উপর চিন্তা ভাবনা করে। আমর ইবনে জামূহ (রাঃ) ছিলেন স্বীয় গোত্রের নেতা! তাঁর একটা প্রতিমা ছিল। তিনি ঐ প্রতিমার পূজা করতেন। ওর গায়ে তিনি সুগন্ধি মাখাতেন। রাত্রিকালে ঐ দু'যুবক তার ভুতখানায় যেতেন এবং ঐ প্রতিমার মাথার উপর ময়লা-আবর্জনা রেখে দিতেন। আমর ইবনে জামূহ মূর্তিটিকে ঐ অবস্থায় দেখতেন এবং আবর্জনা ধুয়ে মুছে পুনরায় সুগন্ধি মাখাতেন। অতঃপর ওর পার্শ্বে তরবারী রেখে দিয়ে বলতেনঃ "এর দ্বারা তুমি নিজেকে রক্ষা করবে।" দ্বিতীয় রাতে যুবকদ্বয় আবার ঐ কাজই করতেন এবং ইবনে জামূহ ওটা ধুয়ে মুছে সাফ করতেন এবং পুনরায় ওর পার্শ্বে তরবারী রেখে দিতেন। অবশেষে একদিন যুবকদ্বয় ঐ মূর্তিটিকে বের করে আনেন এবং একটি কুকুরের মৃত দেহের সাথে ওকে বেঁধে একটি রজ্জুর মাধ্যমে একটি কুয়ায় লটকিয়ে দেন। আমর ইবনে জামূহ এসে মূর্তিটিকে এ অবস্থায় যখন দেখলেন তখন তাঁর জ্ঞান আসলো যে, তিনি প্রতিমা পূজায় লিপ্ত থেকে এতোদিন বাতিল আকীদার মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছিলেন। তাই তিনি মূর্তিটিকে সম্বোধন করে বললেনঃ "তুমি যদি সত্যিই উপাস্য হতে তবে এই কুয়ার মধ্যে কুকুরটির সাথে পড়ে থাকতে না।" অতঃপর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং একজন ভাল মুসলিম রূপে জীবন অতিবাহিত করেন। উহুদের যুদ্ধে তিনি শহীদ হন।

ইরশাদ হচ্ছে– তুমি যদি ওদেরকে সৎপথে ডাকো তবে ওরা তোমার অনুসরণ করবে না। অর্থাৎ এই মূর্তিগুলো কারো ডাক শুনতে পায় না। ওদেরকে ডাকা এবং না ডাকা সমান কথা। হযরত ইবরাহীম (আঃ) বলেছিলেনঃ "হে পিতা! এমন মূর্তির উপাসনা করবেন না যা না শুনতে পায়, না দেখতে পায়, না আপনার কোন কাজ করে দেয়।" আল্লাহ পাক বলেনঃ মূর্তিপূজকের মত এই মূর্তিগুলোও আল্লাহরই সৃষ্ট। এমন কি এই মূর্তিপূজকরাই বরং মূর্তিগুলোর চেয়ে উত্তম। কেননা, তারা শুনতে পায়, দেখতে পায় এবং স্পর্শ করতে তো পারে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ হে নবী (সঃ)! তুমি বলে দাও– আল্লাহর সাথে তোমরা যাদেরকে অংশী করছো তাদেরকে ডাকো, তারপর সকলে সমবেত হয়ে আমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করতে থাকো এবং আমাকে আদৌ কোন অবকাশ দিয়ো না। আর আমার বিরুদ্ধে মন খুলে চেষ্টা চালিয়ে দেখো। আমার সাহায্যকারী হচ্ছেন ঐ আল্লাহ যিনি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। তিনি সৎকর্মশীলদের অভিভাবক। ঐ আল্লাহ্ই আমার জন্যে যথেষ্ট। তিনিই আমাকে সাহায্য করবেন। তাঁরই উপর আমি ভরসা করছি। আমি যদি বাধ্য হই তবে

তাঁরই বাধ্য হবো। তিনি দুনিয়া ও আখিরাতে শুধু আমার নয় বরং আমার পরেও সকল সৎকর্মশীল লোকেরই অভিভাবক ও বন্ধু। যেমন হূদ (আঃ) স্বীয় কওমের কথার প্রতি উত্তরে বলেছিলেন, যখন তারা তাকে অপবাদ দিয়ে বলেছিলঃ "তোমার উপর আমাদের দেবতাদের মার পড়েছে, এ জন্যেই তুমি এসব বিভ্রান্তি মূলক কথা বলছো।" তিনি উত্তরে তাদেরকে বলেছিলেনঃ "আমি তো আল্লাহ্‌রই সাক্ষ্য দান করছি এবং পরিষ্কারভাবে তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি যে, আমি তোমাদের শরীকদের প্রতি ঘৃণা ও অসন্তোষ প্রকাশ করছি। আচ্ছা, তোমরা সমবেতভাবে আমার ক্ষতি করার চেষ্টা করে দেখো এবং আমাকে আত্মরক্ষার সুযোগ পর্যন্ত দিয়ো না। তোমরা আমার কি ক্ষতি করবে? আমার ভরসাস্থল একমাত্র আল্লাহ। তিনি আমার তোমাদের সবারই প্রতিপালক। দুনিয়ায় এমন কোন প্রাণী নেই যার বাগডোর তাঁর হাতে নেই। আমার প্রতিপালক সরল ও সঠিক পথে রয়েছেন।" হযরত ইবরাহীম (আঃ) স্বীয় কওমকে বলেছিলেনঃ "যে প্রতিমাগুলোর পূজা তোমরা করছো এবং তোমাদের পূর্বপুরুষরা করতো সেগুলো সম্পর্কে তোমাদের ধারণা কি? এরা তো আমার শত্রু, আর আমার বন্ধু হচ্ছেন স্বয়ং আমার প্রতিপালক। তিনিই আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই আমাকে সঠিক পথে পরিচালিত করবেন।" আরো যেমন হযরত ইবরাহীম (আঃ) স্বীয় পিতা এবং কওমের লোককে সম্বোধন করে বলেছিলেনঃ "আমি তোমাদের দেবতাদের থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। আমি আমার আল্লাহ্‌রই ইবাদতকারী যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর আমাকে হিদায়াতের পথে চালিয়েছেন, আর এর পেছনে তিনি এটাকে একটা স্মারক হিসাবে রেখে দিয়েছেন, আশা এই যে, হয়তো এরা নিজেদের কার্যকলাপ থেকে ফিরে আসবে।" এ জন্যেই ইরশাদ হচ্ছে– এরা না তোমাদের সাহায্য করতে পারে, না পারে নিজেদেরকে সাহায্য করতে। যদি তুমি তাদেরকে হিদায়াতের দিকে আহ্বান কর তবে তারা তোমার ডাক শুনতে পাবে না। তুমি মনে করছো যে, ওরা (মূর্তিগুলো) তোমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে, কিন্তু আসলে কিছুই দেখে না। ওরা ছবির চক্ষু দ্বারা তোমাকে দেখছে। মনে হচ্ছে যেন প্রকৃতই তোমার প্রতি দৃষ্টিপাত করছে। কিন্তু বাস্তবে তো ওরা নির্জীব। এ জন্যেই ওদের সম্পর্কে এমন ভাষা প্রয়োগ করা হয়েছে যেমন জ্ঞান বুদ্ধির অধিকারীর ব্যাপারে প্রয়োগ করা হয়। কেননা, ওগুলো হচ্ছে মানুষের আকৃতি বিশিষ্ট এবং মানুষের মতই মনে হয়। আল্লাহ পাক বলেনঃ তুমি দেখছো যে, তারা যেন মনোযোগের সাথে তোমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। এ কারণেই ওদের ব্যাপারে هُمْ সর্বনাম ব্যবহার করা হয়েছে, যা মানুষের বেলায় প্রয়োগ করা হয়। অথচ ওগুলো তো জড় পদার্থ ও নির্জীব। আর নির্জীব ও জড়

পদার্থের ব্যাপারে ـه সর্বনাম ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সুদ্দী (রঃ) এর দ্বারা প্রতিমার পরিবর্তে মুশরিকদেরকে বুঝানো হয়েছে বলে মত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু প্রথম মতটিই সঠিকতর।

১৯৯। (হে নবী সঃ)! তুমি বিনয় ও ক্ষমা পরায়ণতার নীতি গ্রহণ কর এবং লোকদেরকে সৎকাজের নির্দেশ দাও, আর মূর্খদেরকে এড়িয়ে চল।

২০০। শয়তানের কুমন্ত্রণা যদি তোমাকে প্ররোচিত করে তবে তুমি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা কর, তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।

١٩٩- خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَ اَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ ○

٢٠٠- وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطٰنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ اِنَّهٗ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ○

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, خُذِ الْعَفْوَ-এর ভাবার্থ হচ্ছে– জনগণের যে মাল তাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত এবং যে মাল তারা নিজেরাই নিয়ে আসে, (হে মুহাম্মাদ সঃ!) তুমি তা গ্রহণ কর। সূরায়ে বারাআতে ফরয দানের যে ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে, এ নির্দেশ ছিল তার পূর্বেকার। সেই সময় সাদকা তাঁর কাছে পেশ করা হতো। যহহাক (রঃ) বলেন যে, خُذِ الْعَفْو -এর অর্থ হচ্ছে– যা অতিরিক্ত হয় তা খরচ করে দাও। عَفْوٌ শব্দের অর্থ করা হয়েছে 'অতিরিক্ত'। যায়েদ ইবনে আসলাম (রঃ) বলেন যে, এতে মুশরিকদেরকে ক্ষমা করে দেয়ার হুকুম হয়েছে। দশ বছর পর্যন্ত এই ক্ষমার নীতি কার্যকরী থাকে। এরপর তাদের প্রতি কঠোরতা অবলম্বনের নির্দেশ দেয়া হয়। এটা হচ্ছে হযরত ইবনে জারীর (রঃ)-এর উক্তি। মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে– লোকদেরকে তাদের চরিত্র ও কাজের ব্যাপারে ক্ষমার চোখে দেখ। অর্থাৎ তাদের স্বভাব চরিত্র ও কাজ কারবারের খোঁজ খবর নিয়ো না। ভাবার্থ হচ্ছে– লোকদেরকে ক্ষমা করে দাও এবং খারাপ সাহচর্য অবলম্বন করা থেকে বিরত থাক। আল্লাহর শপথ! আমি যার সাহচর্য অবলম্বন করবো, তার সুন্দর চরিত্র অবশ্যই গ্রহণ করবো। সকল উক্তির মধ্যে এই উক্তিটিই সর্বোত্তম।

হযরত উয়াইনা (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, যখন মহান আল্লাহ স্বীয় নবী (সঃ)-এর উপর خُذِ الْعَفْوَ وَ اْمُرْ بِالْعُرْفِ وَ اَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ -এ আয়াতটি

অবতীর্ণ করলেন তখন নবী (সঃ) হযরত জিবরাঈল (আ)ঃ-কে জিজ্ঞেস করলেন– "হে জিবরাঈল (আঃ)! এর উদ্দেশ্য কি?" জিবরাঈল (আঃ) উত্তরে বললেনঃ আল্লাহ আপনাকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, কেউ আপনার উপর অত্যাচার করলে আপনি তাকে ক্ষমা করে দিবেন, যে আপনাকে দান থেকে বঞ্চিত করে তাকে আপনি দান করবেন এবং যে আপনার আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করে আপনি তার সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রাখবেন।"[১] এই বিষয় সম্পর্কীয় আর একটি হাদীস হযরত উকবা ইবনে আমির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ আমি একদা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করি। আমি তাঁর হাত ধারণ করে বলি– হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! সর্বোত্তম আমল আমাকে বাতলিয়ে দিন। তিনি তখন আমাকে বললেনঃ "হে উকবা ইবনে আমির (রাঃ)! যে তোমার প্রতি সহানুভূতি দেখায় না তুমি তার প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন কর, যে তোমাকে দান থেকে বঞ্চিত রাখে তুমি তাকে দান থেকে বঞ্চিত করো না, যে তোমার প্রতি যুলুম করে তুমি তাকে ক্ষমা করে দাও।" خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ অর্থাৎ "হে নবী (সঃ)! তুমি বিনয় ও ক্ষমা পরায়ণতার নীতি গ্রহণ কর এবং লোকদেরকে সৎকাজের নির্দেশ দাও, আর জাহিল ও মূর্খদের সাথে জড়িয়ে পড়ো না বরং তাদেরকে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখো।" عُرْفٌ-এর অর্থ হচ্ছে مَعْرُوْفٌ বা সৎকাজ।[২]

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, উয়াইনা ইবনে হসন ইবনে হুযাইফা স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্র হুর ইবনে কয়েস (রাঃ)-এর নিকট আগমন করেন। হুর ইবনে কয়েস (রাঃ) হযরত উমার (রাঃ)-এর একজন দরবারী লোক ছিলেন। কুরআন কারীমে তাঁর গভীর জ্ঞান ছিল। তিনি হযরত উমার (রাঃ)-এর মজলিসের কারী ও আলিমদের অন্যতম কারী ও আলিম ছিলেন এবং তাঁর পরামর্শ সভার একজন সদস্য ছিলেন। হযরত উমার (রাঃ)-এর দরবারের আলিমগণ যুবকও ছিলেন, বৃদ্ধও ছিলেন। উয়াইনা স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্রকে বললেনঃ "হে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র! আমীরুল মুমিনীনের কাছে তোমার বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। সুতরাং তুমি তাঁর সাথে আমার সাক্ষাতের অনুমতি নিয়ে এসো।" তখন হুর (রাঃ) উয়াইনার জন্যে অনুমতি নিয়ে আসলেন এবং হযরত উমার (রাঃ) উয়াইনাকে হাযির হওয়ার অনুমতি দিলেন। উয়াইনা যখন আমীরুল মুমিনীন

১. এ হাদীসটি ইবনে জারীর (রঃ) এবং ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।
২. বুখারীর (রঃ) উক্তি হচ্ছেঃ عُرْفٌ -এর অর্থ مَعْرُوْفٌ এবং এর থেকে দলীল গ্রহণ করেছেন উরওয়া (রঃ), সুদ্দী (রঃ), কাতাদা (রঃ) এবং ইবনে জারীর (রঃ)।

হযরত উমার (রাঃ)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন তখন তিনি তাঁকে বললেনঃ "হে খাত্তাবের পুত্র! আপনি আমাকে যথেষ্ট টাকাও দেননি এবং আমার প্রতি আদল বা ন্যায় বিচারও করেনি।" আদলের কথা শোনা মাত্রই হযরত উমার তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন এবং উয়াইনাকে মারতে উদ্যত হলেন। তখন হুর (রাঃ) বলে উঠলেনঃ হে আমীরুল মুমিনীন! আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নবী (সঃ)-কে বলেছেনঃ "তুমি বিনয় ও ক্ষমাপরায়ণতার নীতি অবলম্বন কর, জনগণকে সৎকাজের নির্দেশ দাও এবং মূর্খদের সাথে জড়িয়ে পড়ো না (বরং তাদেরকে ক্ষমা করে দাও)। ইনি তো মূর্খদেরই অন্তর্ভুক্ত! আল্লাহর শপথ। যখন হযরত উমার (রাঃ)-এর সামনে এ আয়াতটি পাঠ করা হলো তখন তিনি থেমে গেলেন এবং উয়াইনাকে কোন শাস্তি দিলেন না। মহা মহিমান্বিত আল্লাহর কিতাবে তাঁর গভীর পাণ্ডিত্য ছিল।[১]

ইবনে আবি হাতিম (রঃ) আবদুল্লাহ ইবনে নাফি (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, একদা সালিম ইবনে আবদিল্লাহ ইবনে উমার (রঃ) সিরিয়াবাসী এক যাত্রী দলের পার্শ্ব দিয়ে গমন করেন। যাত্রী দলের মধ্যে ঘন্টা বাজছিল। তিনি বললেনঃ "ঘন্টা বাজানো নিষিদ্ধ। কাফিররা তাদের মন্দিরে ঘন্টা বাজিয়ে থাকে।" তখন সেই কাফেলার লোকেরা বললোঃ "এ ব্যাপারে আমাদের জ্ঞান আপনার চেয়ে বেশী আছে। বড় বড় ঘন্টা বাজানো নিষিদ্ধ বটে, কিন্তু ছোট ছোট ঘন্টায় কোন দোষ নেই।" তাদের একথা শুনে হযরত সালিম (রঃ) নীরব হয়ে যান। শুধু এতোটুকু তিনি বললেনঃ اَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ অর্থাৎ মূর্খদের সাথে বকাবকি না করাই উত্তম। বলা হয় যে, اُولِيَتُهُ مَعْرُوْفًا عَارِفًا وَّ عَارِفَةً এ সবগুলোরই অর্থ একই। অর্থাৎ সৎ কাজ। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নবী (সঃ)-কে নির্দেশ দিয়েছেন যে, তিনি যেন আল্লাহর বান্দাদেরকে সৎকাজের নির্দেশ দেন। مَعْرُوْفٌ শব্দের মধ্যে সমস্ত আনুগত্য নিহিত রয়েছে। আর তিনি তাঁকে মূর্খদের সাথে জড়িয়ে না পড়ারও নির্দেশ দিয়েছেন। এই নির্দেশ বাহ্যতঃ নবী (সঃ)-এর প্রতি হলেও সমস্ত বান্দাই এর অন্তর্ভুক্ত। এর মাধ্যমে বান্দাদেরকে আদব বা ভদ্রতা শিক্ষা দেয়া হচ্ছে যে, তাদের প্রতি কেউ যদি জুলুম করে তবে তাদেরকে তা সহ্য করতে হবে, এর অর্থ এটা নয় যে, কেউ যদি আল্লাহর ওয়াজেবী হকের ব্যাপারে অবহেলা প্রদর্শন করে বা তাঁর সাথে কুফরী করে অথবা তাঁর একত্ববাদ থেকে অজ্ঞ থেকে যায় তবুও তাকে ক্ষমা করে দিতে হবে। এর অর্থ এটাও নয় যে, মূর্খরা যদি মূর্খতা বশতঃ মুসলমানদের সাথে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় তবুও নীরব থাকতে হবে। মোটকথা, এটা হচ্ছে ঐ চরিত্র যা আল্লাহ স্বীয় নবী (সঃ)-কে শিক্ষা

১. এটা ইমাম বুখারী (রঃ) তাঁর সহীহ গ্রন্থে তাখরীজ করেছেন।

দিয়েছেন। এই বিষয়টিকে একজন জ্ঞানী কবি কবিতার মধ্যে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। তিনি বলেনঃ

خُذِ الْعَفْوَ وَ أْمُرْ بِعُرْفٍ كَمَا * أُمِرْتَ وَاَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيْنَ
وَ لِنْ فِي الْكَلَامِ لِكُلِّ الْاَنَامِ * فَمُتَحَسَّنٌ مِنْ ذَوِى الْجَاهِ لَيِّنٌ

অর্থাৎ "ক্ষমা করে দেয়ার নীতি অবলম্বন কর এবং সৎকাজের নির্দেশ দাও যেমন তোমাকে আদেশ করা হয়েছে। আর মূর্খদেরকে এড়িয়ে চল, তাদের সাথে জড়িয়ে পড়ো না। প্রত্যেক লোকের সাথে নরমভাবে কথা বল। আর উচ্চমর্যাদা সম্পন্ন লোকের প্রতি নরম ভাষা প্রয়োগ করা খুবই প্রশংসার্হ।"

কোন কোন আলিমের উক্তি রয়েছে যে, মানুষ দু' প্রকারের রয়েছে। প্রথম হচ্ছে উপকারী মানুষ। সে তোমাকে খুশী মনে যা কিছু দান করে তা তুমি কৃতজ্ঞতার সাথে গ্রহণ কর এবং সাধ্যের অতিরিক্ত ভার তার উপর চাপিয়ে দিয়ো না যার ফলে নিজেই সে পিষ্ট হয়ে যায়। দ্বিতীয় হচ্ছে হতভাগ্য ব্যক্তি। তুমি তাকে ভাল কাজের পরামর্শ দাও। কিন্তু যদি তার বিভ্রান্তি বেড়েই চলে এবং সে তার অজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে যায় তবে তাকে এড়িয়ে চল। সম্ভবতঃ এই ক্ষমাই তাকে তার দুষ্কার্য থেকে বিরত রাখবে। যেমন আল্লাহ পাক বলেনঃ "উত্তম পন্থায় খারাপকে দূরীভূত কর, এভাবে তোমার শত্রুও তোমার মিত্রতে পরিণত হবে। তারা যে খেয়াল প্রকাশ করছে তা আমি খুব ভালই জানি।" আল্লাহ পাক বলেনঃ "শয়তানের কুমন্ত্রণা যদি তোমাকে প্ররোচিত করে তবে তুমি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা কর, তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।" অন্য জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "নেকী ও বদী, সৎ ও অসৎ এবং ভাল ও মন্দ সমান হতে পারে না।" 'ভাল পন্থায় খারাপকে দূর কর।' এই আমল ঐ লোকেরাই অবলম্বন করতে পারে যারা প্রকৃতিগতভাবে ধৈর্যশীল। ভাগ্যবান লোকেরাই এর উপর আমল করতে পারে। পরিণামে তারা বড়ই সফলতা লাভ করবে। যদি শয়তান তোমাদের অন্তরে কোন কুমন্ত্রণা দেয় এবং বিভ্রান্ত করতে শুরু করে অথবা শত্রুর সাথে ঝগড়ার সময় তোমাকে রাগান্বিত করে এবং ঐ মূর্খ হতে এড়িয়ে চলা থেকে তোমাকে বিরত রাখে এবং তাকে দুঃখ দিতে তোমাকে উত্তেজিত করে, তাহলে তুমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা কর। মূর্খ যে তোমার উপর বাড়াবাড়ি করছে তা আল্লাহ দেখছেন এবং তোমার আশ্রয় প্রার্থনাও তিনি শুনছেন। তাঁর কাছে কোন কথাই গোপন নেই। শয়তানের বিভ্রান্তি এবং ফাসাদ সৃষ্টি তোমাদের যে পরিমাণ ক্ষতি সাধন করতে পারে আল্লাহ তা সম্যক অবগত।

যখন خُذِ الْعَفْوَ-এই আয়াত অবতীর্ণ হয় তখন বান্দা বলেঃ "হে আমার মা'বূদ! যদি ক্রোধ এসে পড়ে তবে কিভাবে ক্ষমা করার নীতি অবলম্বন করা যাবে?" তখন মহান আল্লাহ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ -এই আয়াত অবতীর্ণ করেন। ঐ দুই ব্যক্তির ঘটনা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, তারা উভয়ে নবী (সঃ)-এর সামনে লড়ে যায়। এমন কি একজনের নাসারন্ধ্র ক্রোধে ফুলে ওঠে। তখন নবী (সঃ) বলেনঃ 'আমি এমন একটি কালেমা জানি যে, যদি সে ওটা পাঠ করে তবে তার ক্রোধ প্রশমিত হয়ে যাবে! কালেমাটি হচ্ছে নিম্ন রূপঃ

أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ অর্থাৎ "আমি বিতাড়িত শয়তান হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।" লোকটিকে কালেমাটি বলে দেয়া হলো। তখন সে বললোঃ আমার মধ্যে কোন পাগলামি নেই। نَزْغٌ -এর প্রকৃত অর্থ হচ্ছে ফাসাদ। এই ফাসাদ ক্রোধের কারণেই হোক বা অন্য কোন কারণেই হোক। আল্লাহ পাক বলেনঃ "হে নবী (সঃ) ! উত্তম রীতিতে কথা বল। শয়তান পরস্পরের মধ্যে বিশৃংখলা সৃষ্টির চেষ্টা করতে রয়েছে। عَيَاذٌ-এর অর্থ হচ্ছে দুষ্টামি ও কুমন্ত্রণা থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করা। আর مَلَاذٌ শব্দটি মঙ্গল বা কল্যাণ কামনায় ব্যবহৃত হয়। إِسْتِعَاذَةٌ -এর হাদীসগুলো তাফসীরের শুরুতে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং পুনরাবৃত্তির কোন প্রয়োজন নেই।

২০১-إِنَّ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طٰٓئِفٌ مِّنَ الشَّيْطٰنِ تَذَكَّرُوْا فَإِذَا هُمْ مُّبْصِرُوْنَ ○

২০২-وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّوْنَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُوْنَ ○

২০১। যারা মুত্তাকী, শয়তান যখন তাদেরকে কুমন্ত্রণা দিয়ে খারাপ কাজে নিমগ্ন করে, সাথে সাথে তারা আত্মসচেতন হয়ে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং তাদের জ্ঞান চক্ষু ফিরে যায়।

২০২। শয়তানদের যারা অনুগত সাথী, তারা তাদেরকে বিভ্রান্তি ও গুমরাহীর মধ্যে টেনে নেয়, এ ব্যাপারে তারা আদৌ কোন ত্রুটি করে না।

যেসব বান্দা আল্লাহর নির্দেশ মেনে চলে এবং নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকে, তাদেরকে যদি কোন সময় শয়তান কুমন্ত্রণা দিয়ে খারাপ কাজে নিমগ্ন করে তবে সত্বরই তারা আল্লাহকে স্মরণ করে। طَائِفٌ শব্দটিকে কেউ কেউ طَيْفٌ

পড়েছেন। এই দু' কিরআতই প্রসিদ্ধ। এ দু'টোর অর্থও একই। আবার কেউ কেউ বলেছেন যে, অর্থে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। কেউ কেউ এর অর্থ 'ক্রোধ' বলেছেন। অন্য কেউ বলেছেন যে, এর অর্থ হচ্ছে– 'শয়তান যখন তাকে কোন দুর্ঘটনায় ফেলে'। আবার এর অর্থ 'পাপের কারণে লজ্জা ও দুঃখ' এরূপও করা হয়েছে। কোন কোন লোক এর অর্থ 'পাপ কার্যে লিপ্ত হয়ে পড়া' করেছেন। এই লোকদের আল্লাহর শাস্তি, দান, সওয়াব, তাঁর ওয়াদা, ভয় প্রদর্শন ইত্যাদি স্মরণ হয়ে যায়। ফলে তৎক্ষণাৎ তারা তাওবা করে ফেলে এবং আল্লাহর দিকে ঝুঁকে পড়ে। আর ঐ মুহূর্তেই তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করতঃ তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে শুরু করে। সাথে সাথেই তাদের অন্তর্দৃষ্টি খুলে যায়। অজ্ঞান থাকলে তাদের জ্ঞান ফিরে আসে।

কথিত আছে যে, একজন নারী নবী (সঃ)-এর নিকট আগমন করে। তার মৃগীর রোগ ছিল। সে আরয করেঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমার আরোগ্যের জন্যে আল্লাহর নিকট দুআ' করুন।" তিনি বললেনঃ "আমি যদি দুআ' করি তবে আল্লাহ তোমাকে আরোগ্য দান করবেন। কিন্তু তুমি যদি ধৈর্যধারণ কর তবে কিয়ামতের দিন তোমাকে হিসাব দিতে হবে না।" তখন ঐ মহিলাটি বললোঃ "আচ্ছা, ঠিক আছে, আমি রোগের উপর ধৈর্য অবলম্বন করবো, কেননা এর বিনিময়ে আমি জান্নাত পাবো। তবে আমার মৃগী ও মূর্ছা রোগ রয়েছে বলে আমার জ্ঞান লোপ পেয়ে যায় এবং শরীর থেকে কাপড় খুলে পড়ে। তাই আপনি আমার জন্যে দুআ' করুন যেন রোগ দূর না হলেও কমপক্ষে আমার দেহ থেকে কাপড় খুলে না যায়।" তার একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সঃ) তার জন্যে দুআ' করেন এবং তখন থেকে আর কখনও ঐ রোগ উঠার সময় তার দেহ থেকে কাপড় খুলে যেতো না।[১]

বর্ণিত আছে যে, একজন যুবক মসজিদে বসে ইবাদত করতো। একটি মহিলা তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে এবং তাকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করার চেষ্টা করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত সে একদা তার বাড়ীতে এসেই পড়ে। সাথে সাথে إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَٰئِفٌ مِّنَ الشَّيْطَٰنِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ তার এ আয়াতটি স্মরণ হয়ে যায় এবং তৎক্ষণাৎ সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায়। জ্ঞান ফিরলে আবার সে এ আয়াতটি পাঠ করে এবং এবার সে মারাই যায়। হযরত উমার (রাঃ) এসে তার

১. এ হাদীসটি ইবনে মিরদুওয়াই ও একাধিক আহলে সুনান বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম হাকিম (রঃ) এটা তাখরীজ করেছেন। তিনি বলেছেন যে, এ হাদীসটি ইমাম মুসলিম (রঃ)-এর শর্তের উপর বিশুদ্ধ।

পিতার নিকট সমবেদনা প্রকাশ করেন। রাত্রিকালে তাকে দাফন করা হয়। হযরত উমার (রাঃ) তাঁর কয়েকজন সাথীকে নিয়ে তার কবরের কাছে গমন করেন এবং তার জানাযার নামায আদায় করেন। অতঃপর তিনি তাকে সম্বোধন করে বলেনঃ হে যুবক!

وَ لِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ جَنَّتٰنِ

অর্থাৎ "যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করলো, তার জন্যে দু'টি জান্নাত রয়েছে।" (৫৫ঃ ৪৬) এ আয়াতটি শুনে যুবকটি কবরের মধ্য থেকেই উত্তর দিলোঃ "হে উমার (রাঃ)! মহা মহিমান্বিত আল্লাহ আমাকে দু'টি জান্নাতই দান করেছেন!"[১]

আল্লাহ পাকের উক্তিঃ وَ اِخْوَانُهُمْ يَمُدُّوْنَهُمْ অর্থাৎ তাদের সঙ্গী মানবরূপী শয়তানরা তাদেরকে বিভ্রান্তির পথে টেনে হেঁচড়ে নিয়ে যায়। যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ

اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْٓا اِخْوَانَ الشَّيٰطِيْنِ ـ

অর্থাৎ "অপব্যয়কারীরা হচ্ছে শয়তানদের ভাই।" (১৭ঃ ২৭) অর্থাৎ তাদের অনুসারীদেরকে ও তাদের কথা মান্যকারীদেরকে তারা গুমরাহীর দিকে নিয়ে যায়। পাপকাজ তাদের কাছে তারা সহজ করে দেয় এবং তাদের দৃষ্টিতে শোভনীয় করে তোলে। مَدٌّ শব্দের অর্থ হচ্ছে বাড়াবাড়ি। অর্থাৎ অজ্ঞতা ও বিভ্রান্তিতে তারা বাড়াবাড়ি করে।

ثُمَّ لَا يُقْصِرُوْنَ অর্থাৎ এই শয়তানরা তাদের চেষ্টায় মোটেই কোন ত্রুটি করে না। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে– মানুষ অসৎ কাজ সম্পাদনে আদৌ অবহেলা প্রদর্শন করে না এবং শয়তানরাও তাদেরকে বিপথে চালিত করার কাজে মোটেই ত্রুটি করে না। গুমরাহীর দিকে আকৃষ্টকারীরা হচ্ছে জ্বিন ও শয়তান , যারা নিজেদের মানব বন্ধুদের কাছে অহী পাঠিয়ে থাকে এবং ঐ কাজে মোটেই ত্রুটি করে না। কারণ তাদের প্রকৃতি ও স্বভাবই এই রূপ। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

اَلَمْ تَرَ اَنَّآ اَرْسَلْنَا الشَّيٰطِيْنَ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ تَؤُزُّهُمْ اَزًّا

অর্থাৎ "হে নবী (সঃ) ! তুমি কি দেখনি যে, আমি শয়তানদেরকে কাফিরদের নিকট পাঠিয়ে থাকি, যারা ঐ কাফিরদেরকে নাফরমানীর দিকে আকৃষ্ট করে থাকে?" (১৯ঃ ৮৩)

১. হাফিয ইবনে আসাকির (রঃ) এটা তাখরীজ করেছেন।

২০৩। (হে নবী সঃ)! তুমি যখন কোন নিদর্শন ও মু'জিযা তাদের কাছে পেশ কর না, তখন তারা বলে- আপনি এসব মু'জিযা কেন পেশ করেন না? তুমি তাদেরকে জানিয়ে দাও- আমার প্রতিপালকের নিকট থেকে আমার কাছে যা কিছু প্রত্যাদেশ পাঠানো হয়, আমি শুধুমাত্র তারই অনুসরণ করি, এই কুরআন তোমার প্রতিপালকের বিরাট দলীল ও নিদর্শন বিশেষ, আর এটা ঈমানদার সম্প্রদায়ের জন্যে হিদায়াত ও অনুগ্রহের প্রতীক বিশেষ।

٢٠٣- وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا ۚ قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِنْ رَبِّي ۚ هَٰذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ○

আল্লাহ পাক বলেনঃ হে নবী (সঃ)! যখন এই লোকগুলো কোন মু'জিযা এবং নিদর্শন দেখতে চায় এবং তা তুমি তাদের সামনে পেশ কর না তখন তারা বলে- 'কোন নিদর্শন আপনি পেশ করছেন না কেন? নিজের পক্ষ থেকে তা বানিয়ে নিচ্ছেন না কেন? অথবা কেন আপনি আকাশ থেকে কোন নিদর্শন টেনে আনছেন না?' এই আয়াত দ্বারা মু'জিযা বা অলৌকিক ব্যাপার বুঝানো হয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ আমি ইচ্ছে করলে আকাশ থেকে মু'জিযা অবতীর্ণ করতে পারি যা দেখে তাদের গ্রীবা ঝুঁকে পড়বে। এই কাফিররাও আমার রাসূল (সঃ)-কে বলে- আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন নিদর্শন লাভ করার চেষ্টা আপনি করেন না কেন? তাহলে আমরা তা দেখে ঈমান আনতাম! তাই আল্লাহ পাক বলেনঃ হে নবী (সঃ)! তুমি বলে দাও- আমি এই ব্যাপারে আমার কিছুই চেষ্টা করতে চাই না। আমি তো একজন আল্লাহর বান্দা মাত্র! আমার কাছে যে নির্দেশ পাঠানো হয়েছে আমি সেটাই পালনকারী। যদি তিনি স্বয়ং কোন মু'জিযা পাঠান তবে আমি তা পেশ করে দেবো। আর যদি তিনি তা প্রেরণ না করেন তবে আমি সেজন্যে জেদ বা হঠকারিতা করতে পারি না। তিনি আমাকে এ কথাই বলে দিয়েছেন যে, এই কুরআনই হচ্ছে সবচেয়ে বড় মু'জিযা। এর মধ্যে তাওহীদের

দলীলগুলো এমন স্পষ্ট ও খোলাখোলিভাবে রয়েছে যে, তা স্বয়ং মু'জিযা হয়ে গেছে। তাই আল্লাহ পাক বলেনঃ

هٰذَا بَصَآئِرُ مِنْ رَّبِّكُمْ وَ هُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ـ

অর্থাৎ এই কুরআনই হচ্ছে তোমার প্রতিপালকের বিরাট দলীল ও নিদর্শন বিশেষ, আর এটা ঈমানদার সম্প্রদায়ের জন্যে হিদায়াত ও অনুগ্রহের প্রতীক বিশেষ।

২০৪। যখন কুরআন পাঠ করা হয়, তখন তোমরা মনোযোগের সাথে তা শ্রবণ করবে এবং নীরব নিশ্চুপ হয়ে থাকবে, হয়তো তোমাদের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করা হবে।

٢٠٤- وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ وَاَنْصِتُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ○

যখন এই বর্ণনা সমাপ্ত হলো যে, কুরআন হচ্ছে হিদায়াত ও রহমত এবং লোকদের জন্যে বুঝবার জিনিস, তখন ইরশাদ হচ্ছে– তোমরা এই কুরআন পাঠের সময় নীরব থাকবে, যেন এর মর্যাদা রক্ষিত হতে পারে। এমন হওয়া উচিত নয় যেমন কুরাইশরা বললো। অর্থাৎ তারা বলতোঃ "তোমরা শুনো না, শুনতে দিয়ো না, বরং কুরআন পাঠের সময় গণ্ডগোল ও হৈ চৈ করতে থাকো।" কিন্তু এই নীরবতা অবলম্বনের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে ফরয নামাযের ব্যাপারে বা ঐ সময়, যখন ইমাম উচ্চৈঃস্বরে কিরআত পাঠ করেন। যেমন হযরত আবূ মূসা আশআরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "অনুসরণের জন্যেই ইমাম নিযুক্ত করা হয়। সুতরাং যখন সে তাকবীর পাঠ করে, আর সে যখন কিরআত পাঠ করে তখন তোমরা নীরব হয়ে যাও।"[১] হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) বলেন যে, এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে লোকেরা নামাযের সময় কথা বলতো। অতঃপর যখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয়– 'তোমরা নীরব থাকো ও কিরআত শ্রবণ কর' তখন নামাযে নীরব থাকার নির্দেশ দেয়া হয়। হযরত ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বলেনঃ "আমরা নামাযের মধ্যে একে অপরকে سَلَامٌ عَلَيْكَ বলতাম। এ জন্যে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়।" হযরত বাশীর

১. এ হাদীসটি ইমাম মুসলিম (রঃ) তাঁর সহীহ গ্রন্থে তাখরীজ করেছেন এবং আহলে সুনান এটা বর্ণনা করেছেন।

ইবনে জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ "একদা ইবনে মাসঊদ (রাঃ) নামায পড়াচ্ছিলেন। লোকদেরকে তিনি দেখলেন যে, তারা ইমামের সাথে নিজেরাও কিরআত পাঠ করছে। তিনি নামায শেষে বললেনঃ "তোমাদের কি হয়েছে যে, তোমরা কুরআন শুনছো না এবং বুঝছো না? অথচ আল্লাহ তা'আলা নীরব থেকে শুনতে বলেছেন?" যুহরী (রঃ) বলেন যে, এই আয়াতটি আনসারের একটি লোকের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয় (এই আয়াতটি মাক্কী এবং আনসারদের ইসলাম কবূলের পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছিল)। রাসূলুল্লাহ (সঃ) পড়তেন তখন তিনিও তাঁর পিছনে পিছনে পড়ে যেতেন।

হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) সশব্দ নামায শেষ করে বলেনঃ "তোমাদের মধ্যে কেউ নিজেও কি আমার সাথে সাথে পড়ছিল?" তখন একটি লোক উত্তরে বললোঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)। হ্যাঁ (আমি পড়ছিলাম বটে)।" তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "আমার কি হয়েছে যে, আমি মানুষকে আমার সাথে সাথে কুরআন পড়তে দেখছি?" তখন থেকে মানুষ সশব্দ নামাযে ইমামের পিছনে কিরআত পড়া হতে বিরত থাকেন।[১]

যুহরী (রঃ) বলেন যে, উচ্চ শব্দ বিশিষ্ট নামাযে ইমামের পিছনে কিরআত না পড়া উচিত। ইমামের কিরআতই মুকতাদীর জন্যে যথেষ্ট, যদিও তাঁর শব্দ শোনা না যায়। কিন্তু যদি উচ্চ শব্দ বিশিষ্ট নামায না হয় তবে পড়ে নেয়া যায়। কিন্তু এটা ঠিক নয় যে, কেউ সশব্দ নামাযে ইমামের পিছনে কিরআত পড়ে। না প্রকাশ্যে পড়ে, না গোপনে পড়ে। কেননা, আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "কুরআন পাঠের সময় তোমরা নীরবতা অবলম্বন কর।" আমি বলি– আলেমদের একটি দলের নীতি হচ্ছে, উচ্চ শব্দ বিশিষ্ট নামাযে মুকতাদীর উপর এটা ওয়াজিব নয় যে, নিজেও সে কিরআত পাঠ করবে। না ইমামের সূরায়ে ফাতেহা পাঠের সময়, না অন্য সূরা পাঠের সময়। ইমাম শাফিঈ (রঃ)-এর দু'টি উক্তি রয়েছে। এ দু'টি উক্তির মধ্যে একটি উক্তি এটাও রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা (রঃ) এবং ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রঃ) বলেন যে, মুকতাদী যেন কোন সময়েই কিরআত পাঠ না করে, আস্তের নামাযেও নয় এবং জোরের নামাযেও নয়। কেননা হাদীসে এসেছে– "যার জন্যে ইমাম রয়েছে, ইমামের কিরআতই তার কিরআত।"[২] এটা

---

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) ও আহলুস সুনান বর্ণনা করেছেন।

২. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) হযরত জাবির (রাঃ) হতে মারফূ' রূপে বর্ণনা করেছেন। এটা মুআত্তায় হযরত জাবির (রাঃ) হতে মাওকূফরূপে বর্ণিত আছে। ইবনে কাসীর (রঃ) বলেন যে, এটাই বিশুদ্ধমত।

অত্যন্ত জটিল ও মতভেদী মাসআলা। ইমাম বুখারী (রঃ) বলেন যে, ইমামের পিছনে কিরআত ওয়াজিব। নামায সিররী হোক অথবা জিহরী হোক। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সমধিক জ্ঞাত।

'যখন কুরআন পাঠ করা হয় তখন নীরবে শ্রবণ কর' অর্থাৎ ফরয নামাযে যখন কিরআত পাঠ করা হয় তখন চুপচাপ হয়ে শ্রবণ কর। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ ইবনে কারীয (রাঃ) বলেনঃ 'আমি একদা উবাইদুল্লাহ ইবনে উমাইর (রাঃ) এবং আতা' ইবনে রাবাহ্ (রাঃ)-কে পরস্পর কথাবার্তা বলতে শুনি। অথচ সেই সময় অন্য দিকে ওয়ায হচ্ছিল। তখন আমি তাঁদেরকে বললামঃ আল্লাহর যিকির হচ্ছে অথচ আপনারা শুনছেন না কেন? আপনারা তো শাস্তির যোগ্য হয়ে গেছেন! তখন তাঁরা আমার দিকে ঘুরে তাকালেন এবং পুনরায় কথা বলতে শুরু করলেন। আমি আবার তাঁদেরকে সতর্ক করলাম। তাঁরা এবারও আমার দিকে তাকালেন এবং পরস্পর কথা বলতেই থাকলেন। আমি তৃতীয়বার আমার কথার পুনরাবৃত্তি করলাম। তখন তাঁরা বললেনঃ "এটা হচ্ছে নামায সম্পর্কীয় নির্দেশ যে, নামাযে ইমাম যখন কুরআন পাঠ করেন তখন মুকতাদীকে নীরব হয়ে শুনতে হবে। তাদেরকে পড়তে হবে না।" মুজাহিদ (রঃ) এবং আরও কয়েকজন বর্ণনাকারীও কুরআনের এই হুকুমের ব্যাপারে এ কথাই বলেন। তাঁরা বলেন যে, কেউ যদি নামাযের মধ্যে না থাকে এবং কুরআন পাঠ হয় তবে তার কথা বলায় কোন দোষ নেই। যায়েদ ইবনে আসলামও (রঃ) এই ভাবই নিয়েছেন। মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, এই হুকুম নামায এবং জুমআ'র দিনের খুৎবার সাথে সম্পর্কযুক্ত। ইবনে জুবাইর (রঃ) বলেন যে, এটা ঈদুল আযহা, ঈদুল ফিৎর, জুমআ'র দিনের খুৎবা এবং জিহরী নামাযের সাথে সম্পর্কযুক্ত। জিহরী ছাড়া অন্য নামাযের সাথে এটা সম্পর্কযুক্ত নয়। ইবনে জারীরও (রঃ) এটাই অবলম্বন করেছেন যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে নামাযে ও খুৎবায় চুপ থাকা। আর এ হুকুমই হচ্ছে– তোমরা খুৎবায় ও ইমামের পিছনে নীরব থাক। হাদীসে হুবহু এই হুকুমই এসেছে। মুজাহিদ (রঃ) এটা খুবই খারাপ মনে করতেন যে, ইমাম যখন কোন ভয়ের বা রহমতের আয়াত পাঠ করেন তখন মুকতাদীরা কিছু বলতে শুরু করে দেয়। এটা ঠিক নয়, বরং মুকতাদীর উচিত হবে নীরব থাকা। ভয় এবং আশার আবেগে মুখে কোন কথা উচ্চারণ করা উচিত নয়। হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি কুরআনের কোন আয়াত

নীরব হয়ে শ্রবণ করে তার জন্যে দ্বিগুণ সওয়াব লিখা হয়। আর যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে, কিয়ামতের দিন এই কুরআন তার জন্যে নূর বা আলো হয়ে যাবে।"[১]

২০৫। তোমার প্রতিপালককে মনে মনে সবিনয় ও সশংকচিত্তে অনুচ্চস্বরে প্রত্যুষে ও সন্ধ্যায় স্মরণ করবে, আর (হে নবী সঃ!) তুমি এই ব্যাপারে গাফিল ও উদাসীন হবে না।

٢٠٥- وَ اذْكُرْ رَّبَّكَ فِىْ نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَّ خِيْفَةً وَّ دُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَ الْاٰصَالِ وَ لَا تَكُنْ مِّنَ الْغٰفِلِيْنَ○

২০৬। যারা তোমার প্রভুর সান্নিধ্যে থাকে (অর্থাৎ ফেরেশতারা) তারা অহংকারে তাঁর ইবাদত হতে বিমুখ হয় না, তারা তাঁরই গুণাগুণ ও মহিমা প্রকাশ করে এবং তাঁরই সম্মুখে সিজদাবনত হয়।

٢٠٦- اِنَّ الَّذِيْنَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهٖ وَ يُسَبِّحُوْنَهٗ وَ لَهٗ يَسْجُدُوْنَ○ ۩ السجدة

আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় রাসূল (সঃ)-কে নির্দেশ দিচ্ছেন– দিনের প্রথমভাগে এবং শেষ ভাগে আল্লাহকে খুব বেশী বেশী করে স্মরণ কর। যেমন তিনি এই দু' আয়াতের মাধ্যমে এই দু'সময়ে তাঁর ইবাদত করার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি স্বীয় নবী (সঃ)-কে বলেছেনঃ সূর্যোদয়ের পূর্বে এবং অনুরূপভাবে সূর্যাস্তের পূর্বে আল্লাহর প্রশংসা ও গুণকীর্তন কর। এটা শবে মিরাজে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয হওয়ার পূর্বের কথা। এটি মাক্কী আয়াত। গুদুব্বুন শব্দের অর্থ হচ্ছে দিনের প্রথম ভাগ। আর اٰصَالٌ শব্দটি اَصِيْلٌ শব্দের বহুবচন। যেমন يَمِيْنٌ-اَيْمَانٌ শব্দের বহুবচন।

অতঃপর নির্দেশ দেয়া হচ্ছে– তোমার প্রতিপালককে অন্তরেও স্মরণ কর এবং মুখেও স্মরণ কর। তাঁকে ডাকো জান্নাতের আশা রেখেও এবং জাহান্নামের ভয় করেও। উচ্চশব্দে তাকে ডেকো না। মুস্তাহাব এটাই যে, আল্লাহর যিকির হবে নিম্ন স্বরে, উচ্চৈঃস্বরে নয়।

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) তাঁর মুসনাদে বর্ণনা করেছেন।

রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জনগণ জিজ্ঞেস করেঃ "আল্লাহ আমাদের থেকে কাছে রয়েছেন, না দূরে রয়েছেন? যদি তিনি নিকটে থাকেন তবে আমরা তাঁকে চুপে চুপে সম্বোধন করবো। আর যদি দূরে থাকেন তবে তাকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকবো।" তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতটি অবতীর্ণ করেনঃ আমার বান্দারা তোমাকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করছে (আমি নিকটে আছি না দূরে আছি), তুমি তাদেরক বলে দাও– আমি খুবই নিকটে রয়েছি। যখন তারা আমাকে ডাকে তখন আমি তাদের ডাকে সাড়া দিয়ে থাকি।

হযরত আবূ মূসা আশআরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, কোন এক সফরে জনগণ উচ্চশব্দে দুআ' করতে শুরু করে। তখন নবী (সঃ) বলেনঃ "হে লোক সকল। নিজেদের জীবনের উপর দয়া প্রদর্শন কর। তোমরা কোন বধির বা অনুপস্থিত সত্তাকে ডাকছো না। যাঁকে ডাকছো তিনি শুনতে রয়েছেন এবং তিনি নিকটে রয়েছেন। তিনি তোমাদের গ্রীবার শাহ্ রগ থেকেও নিকটে রয়েছেন।" এই আয়াতের ভাবার্থ নিম্নের আয়াতের মতও হতে পারে– "তোমরা দুআ' ও নামায খুব উচ্চ শব্দেও পড়ো না এবং খুব নিম্ন শব্দেও না, বরং এর মাঝামাঝি শব্দে পড়।" কেননা, মুশরিকরা যখন কুরআন শুনতো তখন তারা কুরআনকে, কুরআন অবতীর্ণকারীকে এবং কুরআন আনয়নকারীকে ভালমন্দ বলতো। তখন আল্লাহ পাক নির্দেশ দান করলেনঃ তোমরা খুব উচ্চ শব্দে কুরআন পড়ো না যাতে মুশরিকরা কষ্ট না পায়। আবার এতো নিম্ন স্বরেও পড়ো না যে, তোমার সঙ্গীও শুনতে পায় না। এই আয়াতে কারীমায় এই বিষয়ই রয়েছে– তোমরা তোমাদের সকাল-সন্ধ্যার ইবাদতে উচ্চ স্বরে পড়ো না এবং মূর্খদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেয়ো না। উদ্দেশ্য হচ্ছে, কুরআনের শ্রোতাকে হুকুম দেয়া হবে যে, এই ঢঙ্গে নামায পড়া ও ইবাদত করা উচিত। এটা খুব দূরের কথা এবং এটা ধীরে পড়ার হুকুমের পরিপন্থী। আবার এর ভাবার্থ এটাও যে, এই হুকুম নামাযের সাথে সম্পর্কযুক্ত, যেমন পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। এটা নামায ও খুৎবার সাথে সম্পর্কযুক্ত। আর এটা স্পষ্ট কথা যে, এরূপ সময়ে যিকির অপেক্ষা নীবর থাকাটাই উত্তম। এই যিকির উচ্চ স্বরেই হোক বা নিম্ন স্বরেই হোক। এ দু'জন যা বর্ণনা করেছেন তা অনুসৃত নয়। বরং উদ্দেশ্য হচ্ছে বান্দাদেরকে সকাল-সন্ধ্যা সব সময় অধিক যিকিরের কাজে উৎসাহিত ও উত্তেজিত করা। যেন তারা কোন অবস্থাতেই আল্লাহর যিকির থেকে বিস্মরণ না হয় এবং উদাসীন না থাকে। এ জন্যেই ঐসব

ফেরেশ্তার প্রশংসা করা হয়েছে যাঁরা সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহ্র যিকিরের কাজে ঔদাসীন্য প্রদর্শন করেন না। তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ

অর্থাৎ "যারা তোমার প্রভুর সান্নিধ্যে থাকে (অর্থাৎ ফেরেশ্তামণ্ডলী) তারা অহংকারে তাঁর ইবাদত হতে বিমুখ হয় না।" যেমন হাদীসে এসেছে- "ফেরেশ্তারা যেমন আল্লাহ্র ইবাদতের জন্যে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে যান, তদ্রূপ তোমরা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াও না কেন। প্রথম সারিওয়ালাদের অন্যান্য সারিওয়ালাদের উপর প্রাধান্য ও মর্যাদা রয়েছে। তাঁরা সারি বা কাতারকে সোজা করার প্রতি খুবই খেয়াল রাখতেন।" এখানে যে সিজদায়ে তিলাওয়াত রয়েছে এটা হচ্ছে কুরআনের সর্বপ্রথম সিজদায়ে তিলাওয়াত। এটা আদায় করা পাঠক ও শ্রোতা সবারই জন্যে শরীয়তসম্মত কাজ। এতে সমস্ত আলিম একমত। সুনানে ইবনে মাজাহ্র হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) এই সিজদাহ্কে কুরআন কারীমের সিজদাহ্ সমূহের অন্তর্ভুক্ত বলেছেন।

সূরাঃ আ'রাফ এর তাফসীর সমাপ্ত

সূরাঃ আনফাল মাদানী سُوْرَةُ الْاَنْفَالِ مَدَنِيَّةٌ

(আয়াতঃ ৭৫, রুকূঃ ১০) (اٰيَاتُهَا: ٧٥، رُكُوْعَاتُهَا: ١٠)

দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর নামে শুরু করছি।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

১। (হে নবী সঃ!) লোকেরা তোমাকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে, তুমি ঘোষণা করে দাও– যুদ্ধলব্ধ সম্পদ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ)-এর জন্যে, অতএব তোমরা এ ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর এবং তোমাদের নিজেদের পারস্পরিক সম্পর্ক সঠিকরূপে গড়ে নাও, আর যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাক তবে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (সঃ)-এর আনুগত্য কর।

١- يَسْـئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ قُلِ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَ الرَّسُوْلِ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَ اَصْلِحُـوْا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَاَطِيْـعُـوا اللّٰهَ وَ رَسُــوْلَهٗ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ○

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, 'আনফাল' গনীমত বা যুদ্ধলব্ধ সম্পদকে বলা হয়। তিনি আরও বলেন যে, সূরায়ে আনফাল বদর যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। তিনি বলেনঃ "আনফাল হচ্ছে ঐ গনীমতের মাল যাতে একমাত্র নবী (সঃ) ছাড়া আর কারও অধিকার নেই।" তিনি বলেন যে, হযরত উমার ইবনে খাত্তাব (রাঃ)-কে যখন কোন কথা জিজ্ঞেস করা হতো তখন তিনি বলতেনঃ "আমি অনুমতিও দিচ্ছি না এবং নিষেধও করছি না।" অতঃপর হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ "আল্লাহর শপথ! আল্লাহ তা'আলা নবী (সঃ)-কে নিষেধকারী, আদেশকারী এবং হারাম ও হালালের ব্যাখ্যাদানকারী রূপে প্রেরণ করেছেন।" কাসিম (রঃ) বলেন যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কাছে একটি লোক এসে তাঁকে 'আনফাল' সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। তখন তিনি উত্তরে বলেনঃ "আনফাল এই যে, একটি লোক যুদ্ধে অপর একটি লোককে হত্যা করে তার ঘোড়া ও অস্ত্রশস্ত্র গনীমতের মাল হিসেবে নিয়ে নিলো।" লোকটি পুনরায়

জিজ্ঞেস করলো। তিনি ঐ উত্তরই দিলেন। সে আবার জিজ্ঞেস করলে তিনি রেগে ওঠেন এবং তাকে আক্রমণ করতে উদ্যত হন। অতঃপর তিনি বলেনঃ "এ লোকটির দৃষ্টান্ত তো ঐ ব্যক্তির মত যাকে হযরত উমার ইবনে খাত্তাব (রাঃ) প্রহার করেছিলেন, এমন কি তার দেহের রক্ত তার পায়ের গোড়ালি দিয়ে বইতে শুরু করেছিল।" তখন লোকটি তাঁকে বলে, "আপনি কি ঐ ব্যক্তি নন যে, আল্লাহ উমার (রাঃ)-এর প্রতিশোধ আপনার দ্বারা গ্রহণ করেছেন?" এই ইসনাদটি বিশুদ্ধ। ইবনে আব্বাস (রাঃ) নফলের তাফসীর ঐ গনীমতের মাল দ্বারা করেছেন যা যুদ্ধে ছিনিয়ে নেয়া হয়। আর ইমাম কোন কোন লোককে মূল গনীমত বন্টনের পরে আরও কিছু বেশী প্রদান করেন। অধিকাংশ ফকীহও 'আনফাল' -এর ভাবার্থ এটাই গ্রহণ করেছেন। জনগণ নবী (সঃ)-কে ঐ পঞ্চমাংশ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে যা চার অংশ বের করার পরে অবশিষ্ট থেকে যায়। তখন .... يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ -এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। ইবনে মাসঊদ (রাঃ) এবং মাসরূক (রঃ) বলেন যে, نَفَلٌ শব্দের প্রয়োগ যুদ্ধ দিবসে ছিনিয়ে নেয়া সম্পদের উপর নয়, বরং যুদ্ধের ব্যূহ রচনা করার পূর্বে হয়ে থাকে। কেননা, ওটাও তো এক প্রকারের বাড়াবাড়ি। ইবনে মুবারক (রঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে– হে নবী (সঃ) ! তোমাকে মানুষ ঐ ক্রীতদাসী, ক্রীতদাস, সওয়ারী, আসবাবপত্র ইত্যাদি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে যেগুলো বিনা যুদ্ধে মুসলমানরা মুশরিকদের নিকট থেকে লাভ করেছে। সুতরাং এর উত্তর এই যে, এ সবকিছুর অধিকারী হচ্ছেন নবী (সঃ) ! তিনি নিজের ইচ্ছামত ওগুলো বিলি বন্টন করতে পারেন। এর দ্বারা এই ফল বের হলো যে, তিনি 'মালে ফ়াই'কে اَنْفَالٌ মনে করতেন। আর 'মালে ফাই' ঐ মালকে বলা হয় যা বিনা যুদ্ধে কাফিরদের নিকট থেকে লাভ করা যায়। আর অন্যদের মত এই যে, সারিয়ার মাধ্যমে যে মাল মুসলমানদের হস্তগত হয় সেটাই আনফাল। অর্থাৎ মুসলমানগণ কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করার জন্যে গিয়েছেন এবং কাফিরগণ যুদ্ধ না করেই নিজেদের সম্পদ ও আসবাবপত্র ছেড়ে পালিয়ে গেল। আর সেই সম্পদ মুসলমানদের হাতে আসলো এবং নবী (সঃ) ঐ সেনাবাহিনীর সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি। আবার এ কথাও বলা হয়েছে যে, এর অর্থ হচ্ছে– মুসলিম সেনাবাহিনীর কোন অংশবিশেষকে সেই সময়ের ইমাম তাদের কর্মনৈপুণ্য ও উচ্চমনার প্রতিদান হিসেবে সাধারণ বন্টনের পরেও কিছু বেশী প্রদান করে থাকেন।

সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) বলেনঃ বদরের যুদ্ধে আমার ভাই উমাইর নিহত হয়। তখন আমিও সাঈদ ইবনুল আসকে হত্যা করে ফেলি এবং তার যুলকুতাইফা নামক তরবারী খানা নিয়ে নিই। ওটা আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে নিয়ে আসলে তিনি আমাকে বলেনঃ "ওটা অধিকৃত মালের স্তুপের মধ্যে রেখে দাও।" আমি তখন ওটা তাতে রেখে দেয়ার জন্যে যাচ্ছিলাম। ঐ সময় আমার মনের অবস্থা কিরূপ ছিল তা একমাত্র আল্লাহই জানেন। এক তো ভাই-এর হত্যা, দ্বিতীয়তঃ আমি যা কিছু ছিনিয়ে নিয়েছিলাম সেটাও আমাকে জমা দিতে হচ্ছে! কিন্তু আমি অল্প দূর গিয়েছি এমন সময় সূরায়ে আনফালের এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে ডেকে নিয়ে বলেনঃ "যাও, তুমি তোমার ছিনিয়ে নেয়া মাল নিয়ে নাও।"

সা'দ ইবনে মালিক হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত সা'দ (রাঃ) বলেনঃ আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আল্লাহ আজ আমাকে মুশরিকদের নিকট পরাজিত হওয়ার গ্লানি থেকে রক্ষা করেছেন। সুতরাং এখন এ তরবারী খানা আমাকে দান করুন। তখন তিনি বললেনঃ "এ তরবারী তোমারও নয় আমারও নয়। কাজেই ওটা রেখে দাও।" আমি তখন ওটা রেখে দিয়ে ফিরে আসলাম। আর আমি মনে মনে বললাম, আমি যদি এটা না পাই তবে কেউ অবশ্যই পেয়ে যাবে যে আমার মত এর হকদার নয় এবং আমার ন্যায় বিপদ আপদও সহ্য করেনি। এমন সময় কেউ একজন আমাকে পিছন থেকে ডাক দিলেন। আমি নবী (সঃ)-এর কাছে গেলাম এবং আরয করলামঃ হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! কোন অহী অবতীর্ণ হয়েছে কি? তিনি উত্তরে বললেনঃ "তুমি আমার কাছে তরবারী চেয়েছিলে। কিন্তু ওটা আমার ছিল না যে, তোমাকে দিতাম। এখন আল্লাহ পাক ...... يَسْـئَلُونَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ قُلِ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ -এই আয়াত অবতীর্ণ করেছেন। এ আয়াতের মাধ্যমে তিনি আমাকে ওটা প্রদান করেছেন। আমি এখন ওটা তোমাকে দিয়ে দিলাম"।"

সা'দ (রাঃ) বলেনঃ আমার ব্যাপারে চারটি আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। (১) বদরের যুদ্ধে একটি তরবারীর উপর আমি অধিকার লাভ করেছিলাম। আমি নবী (সঃ)-এর কাছে এসে বললাম, এ তরবারীটি আমাকে দান করুন। তিনি বললেনঃ "যেখান থেকে ওটা গ্রহণ করেছো। ওখানেই রেখে দাও।" তিনি দু'বার এ কথা বললেন। পুনরায় আমি আবেদন জানালে তিনি ঐ কথাই বলেন। সেই সময় সূরায়ে আনফালের এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (২) আমার ব্যাপারে দ্বিতীয়

যে আয়াতটি অবতীর্ণ হয় তা হচ্ছে .... وَوَصَّيۡنَا الۡاِنۡسَانَ بِوَالِدَيۡهِ (৪৬ঃ ১৫) -এই আয়াতটি। (৩) তৃতীয় হচ্ছে ...... اِنَّمَا الۡخَمۡرُ وَ الۡمَيۡسِرُ (৫ঃ ৯০) -এই আয়াতটি এবং (৪) চতুর্থ হচ্ছে অসিয়তের আয়াত।"

মালিক ইবনে রাবীআ' (রাঃ) বলেনঃ "বদরের যুদ্ধে ইবনে আ'ইযের 'বরযুবান' নামক তরবারীটি আমার হস্তগত হয়। রাসূলুল্লাহ (সঃ) যখন নির্দেশ দেন যে, প্রত্যেকে যেন নিজ লুটের মাল জমা দিয়ে দেয়, তখন আমিও এই তরবারীটি জমা দিয়ে দেই। আল্লাহর রাসূল (সঃ)-এর অভ্যাস ছিল এই যে, কেউ তাঁর কাছে কোন কিছু চাইলে তাকে তিনি বঞ্চিত করতেন না। আরকাম (রাঃ) এই তরবারীটি দেখে রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর কাছে তা চেয়ে বসেন। ফলে তিনি তাঁকে তা দিয়ে দেন।"

আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার দ্বিতীয় কারণ ঃ

আবূ উমামা (রাঃ) বলেনঃ আনফাল সম্পর্কে আমি আবূ উবাদা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, "আমাদের সাথে বদরের মুজাহিদগণও ছিলেন। আর আনফালের আয়াত ঐ সময় অবতীর্ণ হয় যখন আনফালের জন্যে আমাদের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি হয় এবং আমরা পরস্পর উচ্চবাচ্য করতে শুরু করি। তখন আল্লাহ তা'আলা এ ব্যাপারটা আমাদের হাত থেকে নিয়ে নেন এবং নবী (সঃ)-কে প্রদান করেন। এখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) এই গনীমতের মাল মুসলমানদের মধ্যে সমানভাবে বন্টন করে দেন।" উবাদা ইবনে সাবিত (রাঃ) বলেনঃ "আমি বদরের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে শরীক হয়েছিলাম। আল্লাহ্ শত্রুদেরকে পরাজিত করলেন। এখন একটি দল শত্রুদের পশ্চাদ্ধাবন করলো এবং পলাতকদের হত্যা করলো। আর একদল সৈন্যের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো এবং তাদেরকে পরিবেষ্টন করলো। আর একটি দল নবী (সঃ)-কে ঘিরে রেখে তাঁর হিফাযত করতে থাকলো যেন শত্রুরা তাঁর কোন ক্ষতি করতে না পারে। যখন রাত্রি হলো এবং তিনি গনীমতের মাল বন্টন করতে শুরু করলেন তখন যারা গনীমতের মাল একত্রিত করে রক্ষিত রেখেছিল তারা বলতে লাগলোঃ "এর হকদার একমাত্র আমরাই।" যারা শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন করেছিল তারা বললোঃ "শত্রুকে পরাজিত করার কারণ আমরাই। কাজেই এর হকদার শুধু আমরাই।" আর যারা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর রক্ষণাবেক্ষণ করছিল তারা বললোঃ "আমাদের এই আশংকা ছিল যে, না জানি রাসূলুল্লাহ (সঃ) কোন বিপদে পতিত হন। সুতরাং আমরা একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিয়োজিত ছিলাম।"

তখন .... يَسْــئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَنْفَـالِ قُلِ الْاَنْفَـالُ لِلّٰهِ وَ الرَّسُـوْلِ -এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। এর পর রাসূলুল্লাহ (সঃ) গনীমতের মাল মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করে দেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর অভ্যাস ছিল এই যে, তিনি শত্রুদের মধ্যে অবস্থানকালেই গনীমতের এক চতুর্থাংশ বন্টন করে দিতেন এবং যুদ্ধক্ষেত্র হতে ফিরে আসার পর এক তৃতীয়াংশ বন্টন করতেন। আর ওটা নিজের জন্যে গ্রহণ করা তিনি সমীচীন মনে করতেন না। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বদরের যুদ্ধের দিন বলেছিলেনঃ "যে ব্যক্তি এমন এমন কাজ করবে তার জন্যে তাকে এরূপ এরূপ পুরস্কার দেয়া হবে।" এ কথা শুনে যুবকদের দল বীরত্ব প্রমাণ করার জন্যে উঠে পড়ে লাগলেন। আর বৃদ্ধের দল মরিচা রক্ষা ও পতাকা ধারণ করে থাকলেন। অতঃপর যখন গনীমতের মাল আসলো তখন যার জন্যে যা ওয়াদা করা হয়েছিল তা নেয়ার জন্যে তিনি হাযির হন। বৃদ্ধগণ বললেনঃ "আমাদের উপর তোমাদের প্রাধান্য হতে পারে না। আমরা তোমাদের পিছনে আশ্রয়স্থল হিসেবে ছিলাম। যদি তোমাদের পরাজয় ঘটতো তবে তোমরা আমাদের কাছেই আশ্রয় লাভ করতে।" এভাবে তাদের মধ্যে কথা কাটাকাটি হতে থাকলো। তখন সূরায়ে আনফালের এ আয়াত অবতীর্ণ হলো। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, বদর যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ (সঃ) ঘোষণা করেনঃ "যে ব্যক্তি কাউকে হত্যা করেছে তাকে নিহত ব্যক্তির মাল থেকে এই এই পুরস্কার দেয়া হবে এবং যে ব্যক্তি কাউকে বন্দী করেছে তার জন্যে এই এই পুরস্কার রয়েছে।" সুতরাং আবুল ইয়াসার দু'জন বন্দীকে নিয়ে এসে বলেঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আপনি যা ওয়াদা করেছিলেন তা পূরণ করুন!" এ কথা শুনে হযরত সা'দ ইবনে উবাদা (রাঃ) বলে উঠলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! যদি আপনি এভাবে দিতে থাকেন তবে আপনার অন্যান্য সাহাবীদের জন্যে কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। আমরা যে যুদ্ধক্ষেত্রে অটল থেকেছি তার কারণ এটা ছিল না যে, আমাদের মাল বা অন্য কিছু পাওয়ার লোভ ছিল এবং কারণ এটাও ছিল না যে, আমরা শত্রু দেখে হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিলাম। আমরা তো এখানে শুধুমাত্র এ জন্যেই স্থির রয়েছিলাম যে, আপনার উপর যেন পিছন থেকে আক্রমণ না করা হয়। স্থায়ী হিফাযতেরও অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল।" মোটকথা, এ ধরনের কথা কাটাকাটি ও বচসা হয়ে গেল এবং এ আয়াত অবতীর্ণ হলো। ইরশাদ হচ্ছে–

وَاعْلَمُوْۤا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَیْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهٗ

অর্থাৎ “জেনে রেখো যে, তোমরা যে গনীমতের মাল লাভ করছো তার এক পঞ্চমাংশ হচ্ছে আল্লাহর জন্যে।” (৮ঃ ৪১) ইমাম আবূ উবাইদিল্লাহ (রঃ) তাঁর الْأَمْوَالُ الشَّرْعِيَّة নামক পুস্তকে লিখেছেন যে, গনীমতের মালকে আনফাল বলা হয় এবং ঐসব মালকে আনফাল বলা হয় যা মুসলমানরা অমুসলিম রাষ্ট্রের কাফিরদের নিকট থেকে লাভ করে থাকে। আনফালের উপর সর্বপ্রথম রাসূল (সঃ)-এর হক রয়েছে যেমন আল্লাহ তা'আলা কুরআন পাকে বলে দিয়েছেন। বদরের যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ (সঃ) গনীমতের মাল আল্লাহ তা'আলার হিদায়াত অনুযায়ী এক পঞ্চমাংশ বের না করেই বন্টন করেছিলেন। যেমন আমরা সা'দ (রাঃ)-এর হাদীসে উল্লেখ করেছি। এরপর এক পঞ্চমাংশ বের করে দেয়ার আয়াত অতীর্ণ হয়। তখন পূর্ব আয়াত মানসূখ বা রহিত হয়ে যায়। কিন্তু যায়েদের বর্ণনা রয়েছে যে, পূর্ব আয়াত মানসূখ হয়নি, বরং ওটাও ঠিকই রয়েছে। আবূ উবাইদাহ বলেন যে, এ ব্যাপারে আরও হাদীস রয়েছে।

জমাকৃত আনফাল গনীমতের মালকে বলা হয়। কিন্তু এর এক পঞ্চমাংশ নবী (সঃ)-এর পরিবারবর্গের জন্যে নির্দিষ্ট, যেমন কুরআন পাকে ও হাদীস শরীফে রয়েছে। আরবের পরিভাষায় আনফাল ঐ ইহসানকে বলা হয় যা শুধুমাত্র সৎ ব্যবহারের উদ্দেশ্যে করা হয়ে থাকে, ইহসান তার উপর ওয়াজিব থাকে না। এটাই হচ্ছে ঐ গনীমতের মাল যা আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের জন্যে হালাল করেছেন এবং এটা ঐ জিনিস যা শুধুমাত্র মুসলমানদের জন্যেই নির্দিষ্ট। মুসলমানদের পূর্বে অন্য কোন উম্মতের জন্যে এটা হালাল ছিল না। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ “আমাকে এক পঞ্চমাংশের অধিকারী বানিয়ে দেয়া হয়েছে এবং আমার পূর্বে আর কাউকেও এর অধিকারী করা হয়নি।” আবূ উবাইদাহ্ বলেন যে, যদি নেতা সেনাদলের কাউকে কোন পুরস্কার প্রদান করেন যা তার নির্দিষ্ট অংশ হতে অতিরিক্ত তবে ওটাকে নফল বা আনফাল বলা হয়। আর এটা তার কর্মনৈপুণ্য এবং শত্রুদের উপর প্রচণ্ড আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে দেয়া হয়ে থাকে। এই নফল, যা নেতার পক্ষ থেকে কারও কর্মকুশলতার কারণে দেয়া হয় তা চার পন্থায় হয়ে থাকে এবং প্রত্যেক পন্থা আপন স্থানে অন্য পন্থা হতে পৃথক। প্রথম হচ্ছে নিহত ব্যক্তির লুট করা মাল ও আসবাবপত্র। এটা হতে এক পঞ্চমাংশ বের করা হয় না। দ্বিতীয় হচ্ছে ঐ নফল যা পঞ্চমাংশ পৃথক করার পর দেয়া হয়ে থাকে। যেমন নেতা কোন ক্ষুদ্র সেনাবাহিনীকে শত্রুদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করলেন! তারা গনীমতের মাল নিয়ে ফিরে আসলো। তখন নেতা ঐ সেনাদলকে এর

থেকে চতুর্থাংশ বা তৃতীয়াংশ বন্টন করে দিলেন। তৃতীয় হচ্ছে এক পঞ্চমাংশ বের করার পর বাকীটা বন্টন করা হয়ে থাকে। এর মধ্য থেকে নেতা কাউকে তার কর্মতৎপরতা বিবেচনা করে যা দেয়া সমীচীন মনে করেন তা দিয়ে দেন। তারপর বাকীটা বন্টন করে দেন। চতুর্থ পন্থা এই যে, এক পঞ্চমাংশ বের করার পূর্বেই সমস্ত গনীমত থেকে অতিরিক্ত প্রদান করা হয়ে থাকে। আর এটা হচ্ছে পানি বহনকারী, রাখাল, সহিস ও অন্যান্য মজুরদের হক। মোটকথা, এটা কয়েকভাবে বন্টন করা হয়।

ইমাম শাফিঈ (রঃ) বলেন যে, গনীমতের মালের মধ্য থেকে এক পঞ্চমাংশ বের করার পূর্বে মুজাহিদগণকে নিহতদের যে আসবাবপত্র ও মালধন প্রদান করা হয় ওটা আনফালের অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয় কারণ এই যে, পাঁচ অংশের মধ্য থেকে যে এক পঞ্চমাংশ রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর জন্যে নির্ধারিত থাকতো তা থেকে তিনি যাকে যতটুকু দেয়ার ইচ্ছা করতেন তা দিয়ে দিতেন সেটাও নফল। সুতরাং নেতার উচিত যে, তিনি যেন শত্রুদের সংখ্যাধিক্য ও মুসলমানদের সংখ্যার স্বল্পতা প্রভৃতি জরুরী বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে সুন্নাত পন্থার অনুসরণ করেন। যদি এ ধরনের যৌক্তিকতার আবির্ভাব না ঘটে তবে নফল বের করা জরুরী নয়।

তৃতীয় কারণ এই যে, নেতা একটি দলকে কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে প্রেরণ করলেন এবং তাদেরকে নির্দেশ দিলেন যে, যে কেউ যা কিছু লাভ করবে তা থেকে যেন এক পঞ্চমাংশ পৃথক করে দিয়ে অবশিষ্ট গ্রহণ করে। আর এটা যুদ্ধে গমনের পূর্বেই পারস্পরিক সম্মতির মাধ্যমে মীমাংসিত হয়। কিন্তু তাঁদের এই বর্ণনায় যে বলা হয়েছে– 'বদরের গনীমত হতে এক পঞ্চমাংশ বের করা হয়নি', এতে প্রতিবাদের অবকাশ রয়েছে। হযরত আলী (রাঃ) বলেছিলেনঃ "এ উট দু'টি সেই উট যা আমরা বদরের দিন পাঁচ অংশের মধ্য থেকে লাভ করেছিলাম।" আমি 'কিতাবুস সীরাহ্' এর মধ্যে এটা পূর্ণভাবে বর্ণনা করেছি।

فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَ اَصْلِحُوْا ذَاتَ بَيْنِكُمْ অর্থাৎ তোমরা এ ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর এবং পরস্পর মিলেমিশে বাস কর। একে অপরের উপর অত্যাচার করো না এবং পরস্পর শত্রু হয়ে যেয়ো না। আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে যে হিদায়াত ও জ্ঞান দান করেছেন তা কি এই মাল হতে উত্তম নয় যার জন্যে তোমরা যুদ্ধ করছো? তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ)-এর অনুগত হয়ে যাও। নবী (সঃ) যে ভাগ বন্টন করছেন তা তিনি আল্লাহর ইচ্ছা অনুসারেই করছেন। তাঁর ভাগ

বন্টন ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। সুদ্দী (রঃ) বলেন যে, أَصۡلِحُواْ ذَاتَ بَيۡنِكُمۡ -এর অর্থ হচ্ছে– তোমরা পরস্পর ঝগড়া বিবাদ করো না এবং গালাগালিও করো না।

আনাস (রাঃ) বলেনঃ একদা আমরা নবী (সঃ)-কে দেখলাম যে, তিনি মুচকি হাসতে রয়েছেন। এ দেখে হযরত উমার (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আপনার হাসির কারণ কি?" রাসূলুল্লাহ (সঃ) উত্তরে বলেনঃ আমার উম্মতের দু'জন লোক আল্লাহর সামনে জানুর উপর ভর করে দাঁড়িয়ে গেছে। একজন আল্লাহকে বলছে– "হে আমার প্রভু! এ লোকটি আমার উপর অত্যাচার করেছে। আমি এর প্রতিশোধ চাই।" আল্লাহ পাক তখন তাকে বলছেনঃ "এ লোকটিকে অত্যাচারের বদলা দিয়ে দাও।" অত্যাচারী উত্তরে বলছে, "হে আমার প্রভু! এখন আমার কোন পুণ্য অবশিষ্ট নেই যে, আমি একে অত্যাচারের বিনিময়ে তা প্রদান করতে পারি।" তখন ঐ অত্যাচারিত ব্যক্তি বলছে– "হে আল্লাহ! আমার পাপের বোঝা তার উপর চাপিয়ে দিন।" এ কথা বলতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ (সঃ) কেঁদে ফেললেন এবং তিনি কান্না বিজড়িত কণ্ঠে বললেনঃ ওটা বড়ই কঠিন দিন হবে। লোক এর প্রয়োজন বোধ করবে যে, সে তার পাপের বোঝা অন্যের উপর চাপিয়ে দেয়। তখন আল্লাহ পাক প্রতিশোধ গ্রহণ করতে ইচ্ছুক ব্যক্তিকে সম্বোধন করে বলবেনঃ "তুমি মাথা উঠিয়ে জান্নাতের প্রতি লক্ষ্য কর!" সে তখন মাথা উঠিয়ে জান্নাতের দিকে তাকাবে এবং আরয করবেঃ "হে আমার প্রভু! এখানে স্বর্ণ, রৌপ্য এবং মণি-মুক্তার তৈরী অট্টালিকা রয়েছে! হে আল্লাহ! এ অট্টালিকা কোন নবী, সিদ্দীক ও শহীদের কি?" আল্লাহ তা'আলা উত্তরে বলবেনঃ "যে কেউ এর মূল্য আদায় করবে তাকেই এটা দিয়ে দেয়া হবে।" সে বলবেঃ "হে আমার প্রভু! কে এর মূল্য আদায় করতে সক্ষম হবে?" আল্লাহ তা'আলা বলবেনঃ "এর মূল্য তুমিই আদায় করতে পার।" তখন সে আরয করবেঃ "হে আল্লাহ! কিভাবে আমি এর মূল্য আদায় করতে পারি?" মহা মহিমান্বিত আল্লাহ তখন বলবেনঃ "এটা এভাবে যে, তুমি তোমার ভাইকে ক্ষমা করে দেবে।" সে বলবেঃ "হে আমার প্রভু! ঠিক আছে, আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম।" তখন আল্লাহ পাক বলবেনঃ "এখন তোমরা উভয়ে একে অপরের হাত ধরে জান্নাতে প্রবেশ কর!" এরপর রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ "তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং পরস্পরের মধ্যে সন্ধি ও মিল প্রতিষ্ঠিত কর। কেননা, ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলাও মুমিনদের পরস্পরের মধ্যে সন্ধি করিয়ে দিবেন।"

২। নিশ্চয়ই মুমিনরা এরূপই হয় যে, যখন (তাদের সামনে) আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয়, তখন তাদের অন্তরসমূহ ভীত হয়ে পড়ে, আর যখন তাদের সামনে তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করা হয় তখন সেই আয়াতসমূহ তাদের ঈমানকে আরও বৃদ্ধি করে দেয়, আর তারা নিজেদের প্রতিপালকের উপর নির্ভর করে।

٢- اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَ اِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّ عَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ۝

৩। যারা নামায সুপ্রতিষ্ঠিত করে এবং আমি যা কিছু তাদেরকে দিয়েছি তা থেকে তারা খরচ করে।

٣- الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَ مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۝

৪। এরাই সত্যিকারের ঈমানদার, এদের জন্যে রয়েছে তাদের প্রতিপালকের সন্নিধানে উচ্চ পদসমূহ, আরও রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা।

٤- اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجٰتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَّ رِزْقٌ كَرِيْمٌ ۝

মুনাফিকরা যখন নামায আদায় করে তখন কুরআন কারীমের আয়াতসমূহ তাদের অন্তরে মোটেই ক্রিয়াশীল হয় না। না তারা আল্লাহর আয়াতসমূহের উপর ঈমান আনে, না আল্লাহর উপর ভরসা করে। যখন তারা বাড়ীতে অবস্থান করে তখন নামায আদায় করে না। আর তারা যাকাতও দেয় না। আল্লাহ্ পাক এখানে জানিয়ে দিচ্ছেন যে, মুমিন কখনও এরূপ হয় না। এখানে মুমিনদের গুণাবলী এভাবে বর্ণনা করা হচ্ছে যে, যখন তারা কুরআন পাঠ করে তখন ভয়ে তাদের অন্তর কেঁপে উঠে। যখন তাদের সামনে কুরআনের আয়াতসমূহ পাঠ করা হয় তখন তারা ওগুলো বিশ্বাস করে বলে তাদের ঈমান আরও বৃদ্ধি পায় এবং তারা আল্লাহ ছাড়া আর কারও উপর ভরসা করে না। মুমিনের প্রকৃত পরিচয় এই যে,

কোন ব্যাপারে মধ্যভাগে আল্লাহর নাম এসে গেলে তাদের অন্তর কেঁপে ওঠে। তারা তাঁর নির্দেশ পালন করে থাকে এবং তাঁর নিষেধকৃত কাজ থেকে বিরত থাকে। যেমন আল্লাহ পাক বলেনঃ “তারা এমন লোক যে, যখন তারা এমন কাজ করে বসে যাতে অন্যায় হয় অথবা নিজেদের উপর অত্যাচার করে বসে তখন আল্লাহকে স্মরণ করে, অতঃপর নিজেদের পাপরাশির জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে, আর আল্লাহ ছাড়া আর কে আছে যে পাপসমূহ ক্ষমা করবে? আর তারা নিজেদের (মন্দ কর্মে) হঠকারিতা করে না এবং তারা অবগত।” অন্য জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ “আল্লাহর সামনে হাযির হওয়ার যাদের ভয় রয়েছে এবং যারা কুপ্রবৃত্তিকে অন্যায় ও অবৈধভাবে পূর্ণ করা থেকে বিরত থাকে, প্রকৃতপক্ষে তারাই জান্নাতের হকদার।”

সুদ্দী (রঃ) মুমিন ব্যক্তির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেনঃ “সে ঐ ব্যক্তি যে পাপ কার্যের ইচ্ছা করে, কিন্তু যখন তাকে বলা হয়– ‘আল্লাহকে ভয় কর’ তখন তার অন্তর কেঁপে ওঠে।”

উম্মু দারদা (রাঃ) বলেন, যে অন্তর আল্লাহর ভয়ে কাঁপতে শুরু করে এবং দেহে এমন এক জ্বালার সৃষ্টি হয় যে, লোম খাড়া হয়ে যায়। যখন এরূপ অবস্থার সৃষ্টি হয়ে যাবে তখন বান্দার উচিত যে, সে যেন সেই সময় স্বীয় মনোবাঞ্ছা পূরণের জন্যে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করে। কেননা, ঐ সময় দুআ' কবূল হয়ে থাকে।

ইরশাদ হচ্ছে– ‘কুরআন শুনে তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়’। যেমন তিনি বলেনঃ যখন কোন সূরা অবতীর্ণ হয় তখন কেউ বলে, এই আয়াত দ্বারা তোমাদের কার ঈমান বৃদ্ধি পেয়েছে? তাহলে কথা এই যে, ঐ ব্যক্তির ঈমান বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় যে পূর্ব থেকেই মুমিন। আর জান্নাতের সুসংবাদ ঐ ব্যক্তির জন্যেই। ইমাম বুখারী (রঃ) এবং অন্যান্য ইমামগণ এই প্রকারের আয়াতসমূহ দ্বারাই এই দলীল গ্রহণ করেছেন যে, ঈমানের মধ্যে হ্রাস বৃদ্ধি হতে পারে। জমহূর ইমামদের মাযহাব এটাই। এমন কি বলা হয়েছে যে, বহু ইমামের এর উপরই ইজমা রয়েছে। যেমন ইমাম শাফিঈ (রঃ), ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রঃ) এবং ইমাম আবূ উবাইদ (রঃ)। আমরা এটা শরহে বুখারীতে বর্ণনা করেছি।

وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ অর্থাৎ তারা তিনি ছাড়া আর কারো কাছে কোন আশাই করে না, আশ্রয়দাতা একমাত্র তাঁকেই মনে করে থাকে। কিছু চাইলে তাঁর

কাছেই চেয়ে থাকে। প্রতিটি কাজে তাঁর দিকেই ঝুঁকে পড়ে। তারা জানে যে, তিনি (আল্লাহ) যা চাইবেন তাই হবে এবং যা চাইবেন না তা হবে না। তিনি একক। তাঁর কোন অংশীদার নেই। সব কিছুরই মালিক একমাত্র তিনিই। তাঁর হুকুমের পর আর কারও হুকুম চলতে পারে না। তিনি সত্বর হিসাব গ্রহণকারী। সাঈদ ইবনে জুবাইর (রঃ) বলেন যে, আল্লাহর উপর ভরসা হচ্ছে ঈমানের বন্ধন।

اَلَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ মুমিনদের বিশ্বাস সম্পর্কে আলোচনা করার পর তাদের আমল সম্পর্কে আল্লাহ পাক সংবাদ দিচ্ছেন যে, তারা নামায পড়ে এবং তাদের প্রদত্ত মাল থেকে গরীব দুঃখীদেরকে দান করে থাকে। এ কাজ দু'টি এতো গুরুত্বপূর্ণ যে, সমস্ত মঙ্গলজনক কাজ এ দু'টি কাজের অন্তর্ভুক্ত। নামায প্রতিষ্ঠা হচ্ছে আল্লাহর হকসমূহের মধ্যে একটি হক। ইকামাতে সালাতের অর্থ হচ্ছে নামাযকে সময়মত আদায় করা, অযু করার সময় ভালরূপে হাত মুখ ধৌত করা, রুকূ'-সিজদায় তাড়াহুড়া না করা এবং আদব সহকারে কুরআন মাজীদ পাঠ করা এবং নবী (সঃ)-এর উপর তাশাহ্হুদ ও দরূদ পাঠ করা। এটাই ইকামাতে সালাত এবং يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ দ্বারা এটাই বুঝানো হয়েছে। আর يُنْفِقُوْنَ -এর ভাবার্থ এই যে, যা কিছু আল্লাহ তা'আলা দিয়েছেন তা যদি যাকাতের নেসাবে পৌঁছে যায় তবে যাকাত প্রদান করবে এবং যা কিছু রয়েছে তা থেকেই মানুষকে দান করতে থাকবে। বান্দাদের ওয়াজিব ও মুসতাহাব আর্থিক হক আদায় করবে। আল্লাহর প্রদত্ত সম্পদ হতে সকল বান্দাকে সাহায্য করতে থাকবে। কেননা, সমস্ত লোকই আল্লাহর পরিবার ও সন্তান সন্ততি। আল্লাহ তা'আলার নিকট ঐ বান্দা সবচেয়ে বেশী স্বীকৃত যে তাঁর সৃষ্টজীবের বেশী উপকার সাধন করে থাকে। তোমাদের মালধন আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে যেন আমানত স্বরূপ। অতিসত্বরই তোমাদের মাল তোমাদের থেকে পৃথক হয়ে যাবে। সুতরাং ওর প্রতি আকৃষ্ট হওয়া উচিত নয়।

اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا এসব গুণে যারা গুণান্বিত তারাই হচ্ছে প্রকৃত মুমিন। হারিস ইবনে মালিক (রাঃ) একদা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে আগমন করলে তিনি তাঁকে বলেনঃ "হে হারিস (রাঃ)! সকাল বেলা তোমার কিভাবে কেটেছে?" হারিস (রাঃ) উত্তরে বললেনঃ "একজন প্রকৃত মুমিন হিসেবে।" তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে বলেনঃ "খুব চিন্তা করে কথা বল। প্রত্যেক জিনিসেরই একটা হাকীকত বা মূলতত্ত্ব রয়েছে। বল তো, তোমার ঈমানের হাকীকত কি?" হারিস

(রাঃ) উত্তরে বললেনঃ "আমি দুনিয়ার মহব্বত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছি, রাত্রে জেগে জেগে ইবাদত করি, দিনে রোযার কারণে পিপাসার্ত থাকি এবং নিজেকে এরূপ পাই যে, যেন আমার সামনে আল্লাহর আরশ খোলা রয়েছে, আমি যেন জান্নাতবাসীদেরকে পরস্পর মিলিত হতে দেখছি এবং জাহান্নামবাসীদেরকে দেখছি যে, তারা কষ্ট ও বিপদে পতিত হয়েছে।" তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ "হ্যাঁ, হে হারিস (রাঃ)! তাহলে তুমি ঈমানের হাকীকতে পৌঁছে গেছো। এর উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার চেষ্টা কর।" একথা তিনি তিনবার বললেন।

কুরআন কারীম আরবী ভাষায় অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং حَقًّا শব্দটি সাহিত্যিক মর্যাদা রাখে। যেমন বলা হয়ে থাকে فُلَانٌ سَيِّدٌ حَقًّا অর্থাৎ 'অমুক ব্যক্তি প্রকৃত সরদার', যদিও কওমের মধ্যে অন্যান্য সরদারও রয়েছে। আরও বলা হয়– 'অমুক প্রকৃত ব্যবসিক', যদিও অন্যান্য ব্যবসিকও রয়েছে। 'অমুক ব্যক্তি প্রকৃত কবি', যদিও আরও বহু কবি রয়েছে।

لَهُمْ دَرَجٰتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ অর্থাৎ জান্নাতে তারা বড় বড় পদ লাভ করবে। যেমন অন্য জায়গায় আল্লাহ পাক বলেনঃ "আল্লাহর কাছে তাদের জন্যে বড় পদমর্যাদা রয়েছে এবং তারা যা কিছু করছে আল্লাহ তা সম্যক অবগত আছেন। আল্লাহ তাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দিবেন এবং তাদের পুণ্যগুলো কবূল করবেন।" জান্নাতবাসীরা একে অপরের অপেক্ষা উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হবে। কিন্তু উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন লোকেরা নিম্ন মর্যাদাসম্পন্ন লোকদেরকে দেখে অহংকার করবে না এবং নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা উচ্চ শ্রেণীর লোকদেরকে দেখে হিংসাও করবে না।

সহীহ মুসলিম ও সহীহ বুখারীতে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ "উপরের লোকদেরকে নীচের লোকেরা এরূপভাবে দেখবে যেমন তোমরা আকাশ প্রান্তে তারকারাজি দেখে থাক।" সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! এটা কি নবীদের মন্‌যিল, যা অন্য কেউ লাভ করবে না?" তিনি উত্তরে বললেনঃ "কেন লাভ করবে না? আল্লাহর শপথ! যারা আল্লাহর উপর ঈমান এনেছে এবং রাসূলদেরকে সত্য জেনেছে তারাও এর অধিকারী হবে।" রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "জান্নাতবাসীরা উপরের জান্নাতবাসীদেরকে এরূপ দেখবে যেমন আকাশের উপর তারকারাজি দেখা যায়। আবূ বকর (রাঃ) এবং উমার (রাঃ) তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। তারাও এই মর্যাদা লাভ করবে।"

৫। যেরূপে তোমার প্রতিপালক তোমাকে তোমার গৃহ হতে (বদরের দিকে) যথাযথভাবে বের করলেন, আর মুসলমানদের একটি দল একে দুর্বহ মনে করছিল।

٥- كَمَآ اَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْۢ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَاِنَّ فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَكٰرِهُوْنَ ○

৬। সেই যথার্থ বিষয় প্রকাশ হওয়ার পরও ওতে তারা তোমার সাথে এরূপে বিবাদ করছিল যেন কেউ তাদেরকে মৃত্যুর দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, আর তারা তা প্রত্যক্ষ করছে।

٦- يُجَادِلُوْنَكَ فِى الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَاَنَّمَا يُسَاقُوْنَ اِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُوْنَ ○

৭। আর তোমরা সেই সময়টিকে স্মরণ কর, যখন আল্লাহ তোমাদেরকে সেই দু'টি দলের মধ্য হতে একটি সম্বন্ধে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছিলেন যে, ওটা তোমাদের করতলগত হবে, আর তোমরা এই অভিপ্রায়ে ছিলে যেন নিরস্ত্র দলটি তোমাদের আয়ত্তে এসে পড়ে, আর আল্লাহর ইচ্ছা ছিল এই যে, তিনি স্বীয় নির্দেশাবলী দ্বারা সত্যকে সত্য রূপে প্রতিপন্ন করে দেন এবং সেই কাফিরদের মূলকে কর্তন করে দেন।

٧- وَاِذْ يَعِدُكُمُ اللّٰهُ اِحْدَى الطَّآئِفَتَيْنِ اَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّوْنَ اَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُوْنُ لَكُمْ وَيُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكٰفِرِيْنَ ○

৮। যেন সত্যকে সত্যরূপে এবং অসত্যকে অসত্যরূপে প্রমাণিত করে দেন, যদিও এটা অপরাধীরা অপ্রীতিকরই মনে করে।

٨- لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ ○

كَمَا اَخْرَجَكَ -এর মধ্যে كَمَا শব্দটি আনার কারণ কি এ ব্যাপারে মুফাস্‌সিরদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। কেউ কেউ বলেন যে, এর দ্বারা পরহেজগারী ও রাসূল (সঃ)-এর আনুগত্যের ব্যাপারে মুমিনদের পারস্পরিক সন্ধি স্থাপনের সাথে সাদৃশ্য প্রতিপাদন করা হয়েছে। সুতরাং কথার ধরন হচ্ছে- যেমন তোমরা গনীমতের মালের ব্যাপারে মতভেদ করেছিলে এবং তোমাদের মধ্যে বিবাদের সূচনা হয়েছিল, অতঃপর আল্লাহ তোমাদের মধ্যে ফায়সালা করে দিয়েছিলেন এবং ঐ মাল বন্টনের হক তোমাদের নিকট থেকে ছিনিয়ে নিয়ে স্বীয় রাসূল (সঃ)-কে প্রদান করেছিলেন, আর রাসূলুল্লাহ (সঃ) তোমাদের মধ্যে ওটা ইনসাফ ও সমতার সাথে বন্টন করে দিয়েছিলেন, এ সবগুলোই ছিল তোমাদের পূর্ণ কল্যাণের নিমিত্ত। তদ্রূপ এই স্থলে যখন তোমাদেরকে শত্রুদের সাথে মুকাবিলার জন্যে মদীনা থেকে বের হতে হয়েছিল তখন সেই শান শওকত বিশিষ্ট বিরাট সেনাবাহিনীর সাথে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া তোমাদের জন্যে অপছন্দনীয় ছিল অর্থাৎ তাদের সাথে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হতে তোমাদের মন চাচ্ছিল না। এই বিরাট সেনাবাহিনী ওরাই ছিল যারা তাদের স্বধর্মীয় কাফিরদের ব্যবসায়ের মাল হিফাযত করার জন্যে মক্কা থেকে যাত্রা শুরু করেছিল, যে কাফিররা ব্যবসা উপলক্ষে সিরিয়া গমন করেছিল। এই যুদ্ধকে অপছন্দ করার ফল এই দাঁড়ালো যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের সাথে যুদ্ধ করতে তোমাদেরকে বাধ্য করলেন এবং পরিণামে তিনি তোমাদেরকে হিদায়াত দান করলেন, আর তোমাদেরকে সাহায্য করতঃ তাদের উপর জয়যুক্ত করলেন। যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ "তোমাদের উপর যুদ্ধ ফরয করা হচ্ছে, আর এটা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয়। অথচ যা তোমরা অপছন্দ কর, খুব সম্ভব তাতেই তোমাদের কল্যাণ নিহিত রয়েছে। পক্ষান্তরে তোমরা কোন কাজকে পছন্দ কর, অথচ হয়তো তাতেই তোমাদের অমঙ্গল নিহিত আছে। কোন্‌টা তোমাদের জন্যে কল্যাণকর তা আল্লাহই জানেন, তোমরা জান না।" কেউ কেউ এই সাদৃশ্য প্রতিপাদনের অর্থ বলেছেন- যেমনভাবে তোমাদের প্রভু সত্যরূপে তোমাদেরকে মদীনার বাইরে আসায় সফলকাম করেছেন, অথচ কোন কোন মুমিন এই বের হওয়াতে অসম্মত ছিল, কিন্তু তাদেরকে বের হতেই হয়, অনুরূপভাবে তারা যুদ্ধ থেকে দূরে থাকতে চায় এবং তোমাদের সাথে মতবিরোধ করে, অথচ রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর মতের সত্যতা তাদের উপর প্রকাশিতই ছিল। মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে- যেমনভাবে তোমরা বাধ্য হয়ে মদীনা হতে বের হয়েছো, তেমনিভাবে সত্যের বিষয়ে রাসূল (সঃ)-এর সাথে ঝগড়া করছো। সুদ্দী (রঃ) বলেন যে, এ আয়াতটি

বদরের যুদ্ধে বের হওয়ার ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ সম্পর্কে কেউ কেউ বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে– হে নবী (সঃ)! এই মুমিনরা তোমার সাথে ঝগড়া করার নিয়তে যুদ্ধলব্ধ সম্পদের ব্যাপারে প্রশ্ন উত্থাপন করছে, যেমনভাবে বদর দিবসেও তারা তোমার সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হয়েছিল এবং বলেছিলঃ "আপনি তো আমাদেরকে যাত্রীদলের পথরোধ করার জন্যে বের করেছিলেন। আমাদের ধারণাও ছিল না যে, আমাদেরকে যুদ্ধ করতে হবে এবং আমরা যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করেও বাড়ী থেকে বের হইনি।" আমি বলি যে, নবী (সঃ) আবূ সুফিয়ানের যাত্রীদলের পথরোধ করার জন্যেই মদীনা থেকে বের হয়েছিলেন। কেননা, তাঁর জানা ছিল যে, এই যাত্রীদল কুরায়েশের জন্যে প্রচুর মাল সম্ভার নিয়ে সিরিয়া থেকে মক্কার পথে ফিরে আসছিল। সুতরাং তিনি মুসলমানদেরকে উত্তেজিত করেন এবং তিনশ' দশের কিছু অধিক লোক নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। তিনি বদর কূপের পথে উপকূলের দিকে রওয়ানা হন। ঐ যাত্রীদলের নেতা আবূ সুফিয়ান (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর এই উদ্দেশ্যের সংবাদ পেয়ে গিয়েছিলেন। তিনি যমযম ইবনে আমরকে মক্কা পাঠিয়ে মক্কাবাসীকে মদীনাবাসীদের উদ্দেশ্যের কথা জানিয়ে দেন। কাজেই মক্কাবাসীরা এক হাজার লোক নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। আবূ সুফিয়ান (রাঃ) যাত্রীদলকে নিয়ে সাইফুল বাহারের দিক দিয়ে আসছিলেন। সুতরাং সেই যাত্রীদল মুসলমানদের আক্রমণ থেকে রক্ষা পেয়ে যায়। এখন মক্কার ঐ এক হাজার সৈন্য সামনের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। শেষ পর্যন্ত তারা বদর কূপের নিকটে এসে শিবির স্থাপন করে। এখন পূর্বের কোন দিন তারিখ ঘোষণা ছাড়াই মুসলমান ও কাফির সৈন্যদল পরস্পর যুদ্ধের সম্মুখীন হয়। কেননা, আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের প্রাধান্য বিস্তার করতে চেয়েছিলেন এবং হক ও বাতিলের মধ্যে ফায়সালাকারী যুদ্ধ ঘটিয়ে দেয়ার তাঁর ইচ্ছা ছিল। যেমন এর বর্ণনা শীঘ্রই আসছে। মোটকথা, রাসূলুল্লাহ (সঃ) যখন এ সংবাদ অবহিত হন যে, মক্কা থেকে এক বিরাট সেনাবাহিনী তাঁদের সাথে যুদ্ধ করার জন্যে এগিয়ে আসছে তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর কাছে অহী পাঠালেনঃ "দুটোর মধ্যে একটা জিনিস তোমরা লাভ করবে। হয় তোমরা যাত্রীদলের মাল লুটে নিবে, না হয় ঐ সেনাবাহিনীর সাথে যুদ্ধ করবে। দুটোই লাভ করতে পারবে না। সুতরাং যে কোন একটি গ্রহণ করে সফলকাম হয়ে যাও।" মুসলমানদের অধিকাংশের মত ছিল এই যে, তাঁরা যাত্রীদলকে আক্রমণ করবেন এবং বিনা যুদ্ধেই প্রচুর মাল তাঁদের হাতে এসে যাবে। যার বর্ণনা দিতে গিয়ে আল্লাহ পাক বলেনঃ "স্মরণ কর সেই সময়ের কথা

যখন আল্লাহ তোমাদের কাছে অঙ্গীকার করেন– দু'দলের এক দল তোমাদের আয়ত্তাধীন হবে। কিন্তু নিরস্ত্র দলটি তোমাদের আয়ত্তাধীন হওয়া তোমরা পছন্দ করছিলে, আর আল্লাহ চাচ্ছিলেন তাঁর বাণী দ্বারা সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে এবং কাফিরদের মূল শিকড়কে (মূলশক্তিকে) কেটে দিতে।"

হযরত আবূ আইয়ুব আনসারী (রাঃ) বলেনঃ আমরা মদীনায় ছিলাম এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন– "আমি সংবাদ পেয়েছি যে, আবূ সুফিয়ান (রাঃ) যাত্রীদল নিয়ে আসতে রয়েছে। তোমাদের মত কি? আমরা কি এই যাত্রীদলের পথরোধ করার জন্যে বেরিয়ে পড়বো? সম্ভবতঃ এতে তোমরা বহু কিছু মালধন লাভ করতে পারবে?" আমরা আরয করলাম, আমরা অবশ্যই বের হতে চাই। সুতরাং আমরা বেরিয়ে পড়লাম। আমরা দু'একদিন চলতে থাকলাম। অতঃপর তিনি বললেনঃ "আচ্ছা বল তো, এসব কাফিরের সাথে যুদ্ধ করা সম্পর্কে তোমাদের মতামত কি? তারা সংবাদ পেয়ে গেছে যে, তোমরা যাত্রীদলের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েছো!" মুসলমানরা উত্তরে বললোঃ "আল্লাহর কসম! শত্রুদের এতো বড় সেনাবাহিনীর সাথে যুদ্ধ করার শক্তি আমাদের নেই। আমরা তো শুধু যাত্রীদলের মালধন লুটবার জন্যে বের হয়েছি।" রাসূলুল্লাহ (সঃ) দ্বিতীয়বার এ প্রশ্নই করেন। আমরা এবারও এ উত্তরই দিলাম। তখন হযরত মিকদাদ ইবনে আমর (রাঃ) বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমরা এ স্থলে এমন কথা বলবো না যেমন কথা হযরত মূসা (আঃ)-কে তাঁর উম্মতরা বলেছিল। তারা তাঁকে বলেছিল, "হে মূসা (আঃ)! আপনি ও আপনার প্রভু যান এবং শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করুন, আমরা এখানে বসে থাকছি।" আমরা আনসার দল আশা পোষণ করলাম এবং বললামঃ হযরত মিকদাদ (রাঃ) যে কথা বললেন, আমরাও যদি ঐ কথাই বলতাম তবে এই যাত্রীদলের প্রচুর মাল লুট করা অপেক্ষা ওটাই আমাদের জন্যে অধিক পছন্দনীয় হতো! তখন كَمَآ اَخۡرَجَكَ رَبُّكَ ..... لَكٰرِهُوۡنَ -এই আয়াত অবতীর্ণ হয়।"

ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) সাহাবীদেরকে নিয়ে বদর অভিমুখে যাত্রা শুরু করেন এবং 'রাওহা' নামক স্থানে পৌঁছে লোকদের সামনে ভাষণ দান করেন। তিনি বলেনঃ "তোমাদের মত কি?" তখন হযরত আবূ বকর (রাঃ) উত্তরে বলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমরা সংবাদ পেয়েছি যে, কাফিররা এই এই স্থান পর্যন্ত পৌঁছে গেছে।" রাসূলুল্লাহ (সঃ) পুনরায় বলেনঃ "তোমাদের মত কি?" এবার হযরত উমার (রাঃ) হযরত

আবূ বকর (রাঃ)-এর মতই জবাব দেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তৃতীয়বার এই প্রশ্ন করেন। তখন হযরত সা'দ ইবনে মুআয (রাঃ) বলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আপনি আমাদেরকে লক্ষ্য করেই বলছেন! তাহলে শুনুন! যিনি আপনাকে মর্যাদা দান করেছেন এবং আপনার উপর কিতাব অবতীর্ণ করেছেন তাঁর শপথ! আমরা না কখনও 'বারকুল গামাদ' গিয়েছি, না ওর পথ আমাদের জানা আছে। কিন্তু তবুও যদি আপনি ইমায়ন থেকে হাবশের (আবিসিনিয়ার) 'বারকুল গামাদ' পর্যন্তও গমন করেন তবে আমরাও আপনার সাথে গমন করবো এবং মূসা (আঃ)-এর উম্মতের মত বলবো নাঃ 'আপনি ও আপনার প্রভু যান ও যুদ্ধ করেন, আমরা এখানেই বসে থাকছি।' হয়তো আপনি বের হবার সময় একটা উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বের হচ্ছেন, অতঃপর আল্লাহ অন্য অবস্থার সৃষ্টি করছেন। তখন আপনি যেটা ইচ্ছা সেটাই গ্রহণ করুন। যে আপনার সাথে থাকতে চায় থাকবে, যে সরে পড়তে চায় সে সরে পড়বে। যে আপনার বিরোধিতা করতে চায় সে বিরোধিতা করুক এবং যে সন্ধি করতে চায় সে সন্ধি করুক। আমাদের যা কিছু মাল রয়েছে তা আপনি নিয়ে নিতে পারেন।" হযরত সা'দ (রাঃ)-এর এই কথার পরিপ্রেক্ষিতেই .... كَمَآ اَخْرَجَكَ رَبُّكَ -এই আয়াত অবতীর্ণ হয়।[১]

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, নবী (সঃ) বদর যুদ্ধের ব্যাপারে পরামর্শ করেন, তারপর কুরায়েশের সেনাবাহিনীর সাথে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেন, তখন এই যুদ্ধ মুসলমানদের কাছে অপছন্দনীয় মনে হয়েছিল। এ জন্যেই اِنَّ فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَكٰرِهُوْنَ -এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছিল। অর্থাৎ "মুমিনদের একদল একে পছন্দ করতে পারেনি। তাদের কাছে এটা খুবই দুঃসহ ছিল। সত্য সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ হওয়ার পর তারা তোমার সাথে তর্ক করছিল। তাদেরকে দেখে মনে হচ্ছিল যে, তারা যেন মৃত্যুর দিকে চালিত হচ্ছে এবং তারা তা প্রত্যক্ষ করছে।" মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, فِى الْحَقِّ দ্বারা فِى الْقِتَالِ বুঝানো হয়েছে। মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক (রঃ) বলেন যে, لَكٰرِهُوْنَ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে মুশ্‌রিকদের সাথে যুদ্ধ করা অপছন্দীয় হওয়া। সুদ্দী (রঃ) বলেন যে, بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ -এর ভাবার্থ হচ্ছে– তোমরা আল্লাহর হুকুম ব্যতিরেকে আর কোন কিছুকেই

১. এ হাদীসটি ইবনে আবি হাতিম (রঃ) মুহাম্মাদ ইবনে আমর ইবনে আলকামা ইবনে আবি অক্কালসি লাইসীর (রঃ) হাদীস হতে তাখরীজ করেছেন। আবূ লাইস (রঃ) তাঁর পিতা থেকে এবং তিনি তার দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন।

অগ্রাধিকার দেবে না এটা প্রকাশিত হয়ে যাবার পরেও আল্লাহর রাসূল (সঃ)-এর মতের বিরোধিতা করছো! ইবনে যায়েদ (রঃ) يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ -এর সম্পর্কে বলেন যে, এর দ্বারা মুশরিকদেরকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ এই মুশরিকরা সত্যের ব্যাপারে তর্ক করছে, যেন তাদেরকে মৃত্যুর দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তখন তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেয়া হচ্ছে। কারণ এই যে, মুমিনরা এরূপ নিন্দনীয় বিশেষণে ভূষিত হতে পারে না। এই বিশেষণ একমাত্র কাফিরদেরই হতে পারে। ইবনে জারীর (রঃ)-এর এই কথার উপর আপত্তি রয়েছে। তাঁর মতে ইবনে যায়েদ (রঃ)-এর এই উক্তির কোন গুরুত্ব নেই। কেননা, بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ -এই শব্দগুলোর পূর্বে ইবারতের ধারা মুমিনদের সম্পর্কেই রয়েছে। সুতরাং যে শব্দগুলো এর পরে রয়েছে তার এরই خَبَرٌ হওয়া প্রকাশমান। সত্য ব্যাপার তো এই যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর উক্তিই সঠিক। তা এই যে, এর দ্বারা মুমিনদেরকেই বুঝানো হয়েছে। ইবনে জারীর (রঃ) ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর এই উক্তিরই পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। এটাই সত্য এবং কালামের ধারা এরই পৃষ্ঠপোষকতা করছে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) যখন সফলতার সাথে বদর যুদ্ধ হতে অবকাশ লাভ করেন তখন তাঁকে বলা হয়ঃ "এখন আপনি মালধন আনয়নকারী যাত্রীদলের উপরও আক্রমণ চালিয়ে দিন। এখন তো আর কোন বাধা নেই।" তখন যুদ্ধবন্দীদের একজন হযরত আব্বাস বলেনঃ "এটা কখনও উচিত হবে না। কেননা, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আল্লাহ পাক তো আপনার সাথে দুটোর যে কোন একটার ওয়াদা করেছেন। আর একটা তো আপনি লাভ করেছেন। সুতরাং দ্বিতীয়টি লাভ করার আর কোন অধিকার নেই।"[১]

وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ অর্থাৎ তোমাদের অভিপ্রায় এই ছিল যে, যেন নিরস্ত্র দলটি তোমাদের আয়ত্তে এসে পড়ে। তাহলে কেউ প্রতিরোধ করবে না এবং যুদ্ধ করারও প্রয়োজন হবে না। অর্থাৎ আবূ সুফিয়ানের যাত্রীদলকে লুটে নেয়া। কিন্তু আল্লাহ চাচ্ছিলেন তোমাদেরকে এমন এক দলের সাথে ভিড়িয়ে দিতে যারা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত, যেন তিনি স্বীয় নির্দেশাবলী দ্বারা

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) তাখরীজ করেছেন। ইবনে কাসীর (রঃ) বলেন যে, এর ইসনাদ উত্তম। সিহাহ্ সিত্তাহ্র কোনটিতেই এটা তাখরীজ করা হয়নি।

সত্যকে সত্যরূপে প্রতিপন্ন করে দেন এবং সেই কাফিরদের মূলকে কর্তন করে ফেলেন। আল্লাহ ছাড়া কাজের পরিণাম সম্পর্কে কেউই অবহিত নয়। উত্তম তদবীরের তদবীরকারী একমাত্র তিনিই, যদিও মানুষ ঐ তদবীরের বিপরীত কামনা করে। যেমন তিনি বলেনঃ "তোমাদের উপর ফরয করা হয়েছে আর ওটা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয়, কিন্তু খুব সম্ভব তোমরা যা অপছন্দ কর ওতেই তোমাদের মঙ্গল নিহিত রয়েছে এবং তোমরা যা পছন্দ কর বা ভালবাস তাতেই তোমাদের অকল্যাণ নিহিত রয়েছে।" নিম্নের হাদীসটিও বদর সম্পর্কীয় হাদীস যে, নবী (সঃ) যখন সিরিয়া হতে আবূ সুফিয়ানের ফিরে আসার সংবাদ পেলেন তখন তিনি মুসলমানদেরকে ডেকে বললেনঃ "কুরায়েশের এই যাত্রীদলের সাথে প্রচুর মালপত্র রয়েছে। সুতরাং তোমরা তাদেরকে আক্রমণ কর। এতে বিস্ময়ের কিছুই নেই যে, আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের গনীমতের মাল তোমাদেরকে প্রদান করবেন।" তাঁর এ কথা শুনে সাহাবীগণ রওয়ানা হয়ে গেলেন। তাঁদের কেউ কেউ হালকা অস্ত্র নিলেন এবং কেউ কেউ ভারী অস্ত্রশস্ত্র নিলেন। তাঁদের এ ধারণা ছিল না যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) যুদ্ধ করবেন। আবূ সুফিয়ান যখন হিজাযের নিকটবর্তী হলেন তখন তিনি গুপ্তচর ছেড়ে ছিলেন এবং প্রত্যেক গমনাগমন কারীদেরকে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সংবাদ জিজ্ঞেস করতে থাকলেন। অবশেষে তিনি জানতে পারলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) যাত্রীদলের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে গেছেন। সুতরাং তিনি সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ যমযম ইবনে আমর গিফারীকে মক্কা পাঠিয়ে দিলেন যে, সে যেন কুরায়েশদের সাথে সাক্ষাৎ করে তাদেরকে অবস্থা অবহিত করতঃ যাত্রীদলের হিফাযতের ব্যবস্থা করে আসে। কেননা, রাসূলুল্লাহ (সঃ) যাত্রীদলকে আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে গেছেন। এদিকে রাসূলুল্লাহ (সঃ) স্বীয় সাথীদেরকে নিয়ে বেরিয়ে পড়েছেন এবং 'যাফরান' উপত্যকা পর্যন্ত পৌঁছে সেখানে অবস্থান করেছেন। ইতিমধ্যে তিনি সংবাদ পেলেন যে, কুরায়েশরা যাত্রীদলের হিফাযত ও মুসলমানদের আক্রমণ প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে মক্কা থেকে যাত্রা শুরু করেছে। সুতরাং তিনি সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করলেন। তখন হযরত আবূ বকর (রাঃ) দাঁড়ালেন এবং উত্তম কথা বললেন। অতঃপর হযরত উমারও (রাঃ) দাঁড়িয়ে ভাল কথা বললেন। তারপর হযরত মিকদাদ ইবনে আমর (রাঃ) বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আল্লাহ আপনাকে যে আদেশ করেছেন তা আপনি পালন করুন। আমরা আপনার সাথেই রয়েছি। আল্লাহর শপথ! বানী ইসরাঈল যে কথা হযরত

মূসা (আঃ)-কে বলেছিল সে কথা আমরা আপনাকে বলবো না। তারা মূসা (আঃ)-কে বলেছিলঃ “হে মূসা (আঃ)! আপনি ও আপনার প্রভু গমন করুন এবং যুদ্ধ করুন, আমরা এখানে বসে থাকছি।” আপনি যদি আমাদেরকে হাবশ পর্যন্ত নিয়ে যেতে চান তবে যে পর্যন্ত আপনি সেখানে না পৌঁছবেন সেই পর্যন্ত আমরা আপনার সাথ ছাড়বো না। হযরত মিকদাদ (রাঃ)-এর এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর কল্যাণের জন্যে দুআ' করলেন। অতঃপর তিনি বললেনঃ “হে লোক সকল! তোমরা আমাকে পরামর্শ দান কর।” এ কথা তিনি আনসারদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন। একটা কারণ তো এই যে, আনসারগণ সংখ্যায় বেশী ছিলেন। দ্বিতীয় কারণ ছিল এটাও যে, আকাবায় যখন আনসারগণ বায়আত গ্রহণ করেন তখন তাঁরা নিম্নরূপ কথার উপর তা গ্রহণ করেছিলেনঃ “যখন আপনি মক্কা ছেড়ে মদীনায় পৌঁছবেন তখন সর্বাবস্থাতেই আমরা আপনার সাথে থাকবো। অর্থাৎ যদি শত্রুরা আপনার উপর আক্রমণ চালায় তবে আমরা তাদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবো।” যেহেতু তাঁদের বায়আত গ্রহণের সময় এ কথা ছিল না যে, মুসলমানদের অগ্রগতির সময়ও তাঁরা তাঁদের সাথে থাকবেন, সেই হেতু রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁদেরও মত জানতে চাচ্ছিলেন, যেন তাঁদের নিকট থেকেও অঙ্গীকার নিয়ে তাঁদেরও সাহায্য সহানুভূতি লাভ করতে পারেন। হযরত সা'দ (রাঃ) বললেনঃ “সম্ভবতঃ আপনি আমাদের উদ্দেশ্যেই বলছেন।” রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ “হ্যাঁ, আমি তোমাদেরকে উদ্দেশ্য করেই বললাম।” তখন হযরত সা'দ (রাঃ) বললেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমরা আপনার উপর ঈমান এনেছি। আপনার আদেশ-নিষেধ মান্য করার বায়আত আমরা আপনার হাতে গ্রহণ করেছি। সুতরাং আমরা কোন অবস্থাতেই আপনার হাত ছাড়বো না। আল্লাহর শপথ! আপনি যদি সমুদ্র তীরে দাঁড়িয়ে তাতে ঘোড়াকে নামিয়ে দেন তাহলে আমরাও সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়বো। আমাদের মধ্যে কেউই এতে মোটেই দ্বিধাবোধ করবে না। যুদ্ধে আমরা বীরত্ব প্রদর্শনকারী এবং কঠিন বিপদ আপদে সাহায্যকারী। ইনশাআল্লাহ আপনি আমাদের উপর সন্তুষ্ট থাকবেন।” এই উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সঃ) অত্যন্ত খুশী হন। তৎক্ষণাৎ তিনি যাত্রা শুরু করার নির্দেশ দেন এবং বলেনঃ “আল্লাহ আমার সাথে দুটোর মধ্যে একটার ওয়াদা করেছেন এবং এতে বিস্ময়ের কিছুই নেই যে, ঐ একটি এই যুদ্ধই বটে। আমি যেন মুশরিকদের বধ্যভূমি এখান থেকেই স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছি।”

৯। স্মরণ কর সেই সংকট মুহূর্তের কথা, যখন তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট কাতর কণ্ঠে প্রার্থনা করছিলে, আর তিনি সেই প্রার্থনা কবূল করেছিলেন, (আর তিনি বলেছিলেন) আমি তোমাদেরকে এক সহস্র ফেরেশ্‌তা দ্বারা সাহায্য করবো, যারা একের পর এক আসবে।

৯- اِذْ تَسْتَغِيْثُوْنَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ اَنِّىْ مُمِدُّكُمْ بِاَلْفٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُرْدِفِيْنَ ○

১০। আল্লাহ এটা শুধু তোমাদের সুসংবাদ দেয়ার জন্যে এবং তোমাদের মনে প্রশান্তি আনয়নের জন্যে করেছেন, সাহায্য শুধুমাত্র আল্লাহর তরফ থেকেই আসে, আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়।

١٠- وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ اِلَّا بُشْرٰى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهٖ قُلُوْبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ○ (ع)

হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ “বদরের দিন নবী (সঃ) স্বীয় সহচরদেরকে গণনা করে দেখলেন যে, তাদের সংখ্যা ছিল তিনশ’র কিছু বেশী। আর মুশরিকদের দিকে দৃষ্টিপাত করে তিনি অনুমান করলেন যে, তাদের সংখ্যা ছিল এক হাজারেরও অধিক। নবী (সঃ) কিবলামুখী হয়ে দুআ’ করতে লাগলেন। তাঁর গায়ে একখানা চাদর ছিল এবং তিনি লুঙ্গি পরিহিত ছিলেন। তিনি বলছিলেনঃ “হে আল্লাহ! আপনি আমার সাথে যে ওয়াদা করেছিলেন তা আজ পুরো করুন! যদি আপনি মুসলমানদের এই ছোট দলটিকে আজ ধ্বংস করে দেন তবে দুনিয়ার বুকে আপনার ইবাদত করার কেউই থাকবে না এবং তাওহীদের নাম ও চিহ্নটুকুও মুছে যাবে।” তিনি আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করছিলেন ও প্রার্থনা জানাচ্ছিলেন, এমন কি তাঁর কাঁধ থেকে চাদরখানা পড়ে যাচ্ছিল। হযরত আবূ বকর (রাঃ) এসে চাদরখানা তাঁর কাঁধে উঠিয়ে দিলেন এবং তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে গিয়ে বললেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আল্লাহর কাছে আপনার প্রার্থনা যথেষ্ট হয়েছে। তিনি স্বীয় ওয়াদা পূর্ণ করবেন।” তখন

আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতটি অবতীর্ণ করলেনঃ "যখন তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট কাতর কণ্ঠে প্রার্থনা করছিলে, আর তিনি সেই প্রার্থনা কবূল করেছিলেন, (এবং তিনি বলেছিলেন) আমি তোমাদেরকে এক সহস্র ফেরেশ্তা দ্বারা সাহায্য করবো, যারা একের পর এক আসবে।" সুতরাং যখন যুদ্ধ সংঘটিত হলো তখন আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের পরাজয় ঘটালেন। তাদের সত্তরজন নিহত হলো এবং সত্তরজন বন্দী হলো। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত আবূ বকর (রাঃ), হযরত উমার (রাঃ) এবং হযরত আলী (রাঃ)-এর সঙ্গে বন্দীদের ব্যাপারে পরামর্শ করলেন। হযরত আবূ বকর (রাঃ) বললেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! এরা তো আপনার চাচাতো ভাই এবং আপনার গোত্রীয় ও বংশীয় লোক। সুতরাং এদেরকে মুক্তিপণের বিনিময়ে ছেড়ে দিন। মুক্তিপণের অর্থের মাধ্যমে আমাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হবে এবং কাফিরদের উপর জয়যুক্ত হওয়ার শক্তি আরও বৃদ্ধি পাবে। এতে বিস্ময়ের কিছুই নেই যে, আল্লাহ তা'আলা হয়তো তাদেরকে হিদায়াত দান করবেন। অতঃপর এরাই আমাদের শক্তি বাড়িয়ে দিবে।" এর পর রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত উমার (রাঃ)-কে সম্বোধন করে বলেনঃ "হে উমার (রাঃ)! এ ব্যাপারে তোমার মত কি?" তিনি উত্তরে বললেনঃ "আল্লাহর শপথ! হযরত আবূ বকর (রাঃ) যে মত পোষণ করেছেন আমি ঐ মত পোষণ করি না। আপনি আমাকে নির্দেশ দিন, আমি আমার আত্মীয় কাফিরদেরকে হত্যা করি এবং আলী (রাঃ)-কে হুকুম দিন তিনি যেন তাঁর ভাই আকীলের গর্দান উড়িয়ে দেন। আর হামযা (রাঃ) যেন তাঁর অমুক ভাইয়ের দেহ দ্বিখণ্ডিত করেন, যাতে আমরা আল্লাহর কাছে এটা প্রমাণ করতে পারি যে, মুশরিকদের ব্যাপারে আমাদের অন্তরে কোন করুণা নেই। এই বন্দী মুশরিকরা তো কাফিরদের নেতৃস্থানীয় লোক।" রাসূলুল্লাহ (সঃ) কিন্তু হযরত আবূ বকর (রাঃ)-এর মতকেই প্রাধান্য দেন এবং ঐ মুশরিক বন্দীদেরকে মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেন। হযরত উমার (রাঃ) বলেন, পরদিন সকালে আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর বাড়ীতে হাযির হয়ে দেখি যে, তিনি এবং হযরত আবূ বকর (রাঃ) ক্রন্দন করছেন। আমি আরয করলামঃ হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আপনার ও আপনার সঙ্গীর কাঁদার কারণ কি? যদি কান্না আসে তবে আমিও কাঁদবো, আর যদি কান্না না আসে তবে কান্নার ভান করবো, যাতে আপনাদের কান্নায় শরীক হতে পারি। নবী (সঃ) তখন বললেনঃ "এটা হচ্ছে মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেয়ার কারণে কান্না। আমি এই ভুলের কারণে ঐ শাস্তি প্রত্যক্ষ করছি যা এতো নিকটে রয়েছে যতো নিকটে রয়েছে এই গাছটি।" সেই সময় নবী (সঃ)-এর সম্মুখে একটি গাছ ছিল। তখন আল্লাহ

তা'আলা নিম্নের আয়াত অবতীর্ণ করেন—

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗۤ اَسْرٰى حَتّٰى يُثْخِنَ فِى الْاَرْضِ হতে فَكُلُوْا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلٰلًا طَيِّبًا পর্যন্ত। (৮ঃ ৬৭-৬৯) সুতরাং গনীমত হালাল করে দেয়া হয়। অতঃপর পরবর্তী বছর যখন উহুদের যুদ্ধ সংঘটিত হয় তখন আল্লাহ তা'আলা বদরের দিনের ভুলের প্রতিশোধ এভাবে গ্রহণ করেন যে, মুক্তিপণ নিয়ে সত্তরজন কাফির বন্দীকে ছেড়ে দেয়ার বিনিময়ে উহুদের যুদ্ধে সত্তরজন মুসলমান শাহাদাতবরণ করেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাহাবীগণ তাঁকে ছেড়ে পলায়ন করেন। তাঁর সামনের চারটি দাঁত ভেঙ্গে যায় এবং শিরস্ত্রাণ মাথার মধ্যে ঢুকে যায়। তাঁর চেহারা মুবারকের উপর রক্ত গড়িয়ে পড়ে। তখন আল্লাহ তা'আলা নিম্নের আয়াতটি অবতীর্ণ করেনঃ "তোমাদের উপর যখন বিপদ পৌঁছালো তখন তোমরা বলতে শুরু করলে— এ বিপদ কোথা থেকে আসলো? (হে নবী সঃ)! তুমি বলে দাও— এটা তোমাদের নিজেদের কর্মের ফল অর্থাৎ তোমাদের ফিদইয়া গ্রহণের কারণেই তোমরা এই বিপদের সম্মুখীন হয়েছো, নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রত্যেক জিনিসের উপরই ক্ষমতাবান।"[১]

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, اِذْ تَسْتَغِيْثُوْنَ رَبَّكُمْ দ্বারা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর প্রার্থনা করাকে বুঝানো হয়েছে। কেননা, বদরের দিন নবী (সঃ) অত্যন্ত একাগ্রতার সাথে আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করছিলেন। তখন হযরত উমার (রাঃ) তাঁর কাছে এসে বললেনঃ "আপনি দুআ'কে সংক্ষিপ্ত করুন! আল্লাহ তা'আলা আপনার সাথে যে ওয়াদা করেছিলেন তা তিনি অবশ্যই পূর্ণ করবেন।" হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, বদরের দিন নবী (সঃ) প্রার্থনায় বলেছিলেনঃ "হে আল্লাহ? আপনার অঙ্গীকার পূর্ণ করার দিকে আমি আপনার মনোযোগ আকর্ষণ করছি। নতুবা হে আল্লাহ! আপনার ইবাদতকারী আর কেউ থাকবে না।" তখন হযরত আবূ বকর (রাঃ) তাঁর হাত ধরে নিয়ে বলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! যথেষ্ট হয়েছে।" অতঃপর নবী (সঃ) দাঁড়িয়ে গিয়ে বললেনঃ "অতি অল্প সময়ের মধ্যেই কাফিররা পরাজিত হয়ে যাবে এবং তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করবে।"

---

১. এটা ইমাম আহমাদ (রাঃ) উমার ইবনে খাত্তাব (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন এবং এটাকে ইমাম মুসলিম (রঃ), ইমাম আবূ দাউদ (রঃ), ইমাম তিরমিযী (রঃ) ও ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) তাখরীজ করেছেন।

بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَٰٓئِكَةِ مُرْدِفِينَ অর্থাৎ ফেরেশ্‌তাদের সারি একের পিছনে এক মিলিতভাবে ছিল। আবার مُرْدِفِينَ -এর অর্থ সাহায্যও হতে পারে। অর্থাৎ ফেরেশ্‌তারা সাহায্যের উপর ছিলেন। হযরত আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ "হযরত জিবরাঈল (আঃ) হাজার ফেরেশ্‌তাসহ নবী (সঃ)-এর ডান দিকে ছিলেন, যেদিকে হযরত আবূ বকর (রাঃ) ছিলেন। আর হযরত মীকাঈল (আঃ) হাজার ফেরেশতাসহ নবী (সঃ)-এর বাম দিকে ছিলেন, যেদিকে আমি ছিলাম।" এর দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, হাজারের সাহায্যের উপর অপর হাজারও ছিলেন। এ জন্যেই কেউ কেউ مُرْدَفِينَ অর্থাৎ دَال -কে যবর দিয়ে পড়েছেন। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। আবার এটাও বর্ণিত আছে যে, হযরত জিবরাঈল (আঃ)-এর সাথে ছিলেন পাঁচশ জন ফেরেশ্‌তা। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, একজন মুসলমান একজন মুশরিকের পিছনে লেগে ছিলেন। উপর হতে মুশরিকের মাথায় একটি চাবুক মারার শব্দ শোনা গেল এবং একজন অশ্বারোহীরও পদক্ষেপের শব্দ শ্রুত হলো। তখন দেখা গেলো যে, মুশরিক মাটিতে পড়ে গেলো। চাবুকের আঘাতে তার মাথা ফেটে গেলো। অথচ কোন মানুষ তাকে লাঠির আঘাত করেনি। যখন পিছনের আনসারী এই সংবাদ রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট পৌঁছিয়ে দিলো। তখন তিনি বললেনঃ "তুমি সত্য বলেছ। এটা ছিল আসমানী সাহায্য।" এ কথা তিনি তিনবার বলেন। ঐ যুদ্ধে সত্তরজন কাফির নিহত হলো এবং সত্তরজন বন্দী হলো।[১] হযরত রাফি' (রাঃ) বদরী সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি বলেন যে, একদা হযরত জিবরাঈল (আঃ) এসে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করেনঃ "আপনি বদরী সাহাবীদেরকে কি মনে করেন?" রাসূলুল্লাহ (সঃ) উত্তরে বলেনঃ "বদরী সাহাবীরা মুসলমানদের মধ্যে সর্বোত্তম।" তখন হযরত জিবরাঈল (আঃ) বলেনঃ "বদরের যুদ্ধে যেসব ফেরেশ্‌তা মুসলমানদের সাহায্যের জন্যে এসেছিলেন তাঁদেরকেও অন্যান্য ফেরেশ্‌তাদের অপেক্ষা উত্তম মনে করা হয়।" সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, হযরত উমার (রাঃ) যখন হাতিব ইবনে আবি বুলতা (রাঃ)-কে হত্যা করার পরামর্শ দিয়েছিলেন তখন নবী (সঃ) হযরত উমার (রাঃ)-কে বলেছিলেনঃ এই হাতিব (রাঃ) বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। আর তুমি কি এই খবর রাখো যে, সম্ভবতঃ আল্লাহ তা'আলা বদরী সাহাবীদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন? কেননা, তিনি বলেছেনঃ "তোমরা যা ইচ্ছা তাই আমল কর, আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি।"

১. এটা ইমাম মুসলিম (রঃ) ও ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) তাখরীজ করেছেন।

وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ اِلَّا بُشْرٰى অর্থাৎ ফেরেশ্তাদেরকে পাঠানো শুধু তোমাদেরকে সুসংবাদ দেয়ার জন্যে এবং তোমাদের মনে প্রশান্তি আনয়নের জন্যে নতুবা আল্লাহ তা'আলা তো সর্বপ্রকারেই তোমাদেরকে সাহায্য করতে সক্ষম। সাহায্যের ব্যাপারে তিনি ফেরেশ্তাদের মুখাপেক্ষী মোটেই নন। এ সাহায্য তো প্রকৃতপক্ষে আল্লাহরই সাহায্য ছিল। ফেরেশ্তারা ছিল সাহায্যের বাহ্যিক রূপ। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেনঃ "যখন তোমরা কাফিরদের সম্মুখীন হও, তখন তাদের গর্দানে আঘাত করতে থাক (তাদেরকে হত্যা করতে থাক) এমন কি যখন তাদের রক্তস্রোত বইয়ে দিবে তখন তাদেরকে (বন্দী করে) দৃঢ় রূপে বেঁধে ফেলো, তখন হয়তো বা কোন মুক্তিপণ ছাড়াই তাদেরকে ছেড়ে দেবে, কিংবা মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেবে, যে পর্যন্ত না তারা তাদের অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ করে, তোমরা এই নির্দেশ পালন করবে, আর যদি আল্লাহ চাইতেন তবে তাদের থেকে (যুদ্ধ ছাড়াই) প্রতিশোধ গ্রহণ করতেন, কিন্তু (যুদ্ধের হুকুম এ কারণেই যে,) যেন তিনি তোমাদের একের দ্বারা অন্যের পরীক্ষা করেন, আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়, আল্লাহ তাদের আমল কখনো বিনষ্ট করবেন না। তিনি তাদেরকে সুপথ প্রদর্শন করবেন এবং তাদের অবস্থা ঠিক রাখবেন। আর তিনি তাদেরকে জান্নাতে দাখিল করবেন এবং তিনি ওটা তাদেরকে চিনিয়ে দেবেন।" আল্লাহ তা'আলা আর এক জায়গায় বলেনঃ

وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَ لِيَعْلَمَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ يَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَآءَ وَ اللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ - وَلِيُمَحِّصَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ يَمْحَقَ الْكٰفِرِيْنَ -

অর্থাৎ "এটা তো কালের উত্থান ও পতন মাত্র, যাকে আমি মানবমণ্ডলীর মধ্যে আবর্তিত করে থাকি, যাতে আল্লাহ মুমিনদেরকে জানতে পারেন এবং তোমাদের মধ্য থেকে কতিপয় লোককে শহীদ রূপে গ্রহণ করতে পারেন, আর আল্লাহ অত্যাচারীদেরকে মোটেই পছন্দ করেন না। আর যাতে আল্লাহ মুমিনদেরকে (গুনাহ থেকে) পাক-পবিত্র করেন এবং কাফিরদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত ও ধ্বংস করে দেন।" (৩ঃ ১৪০-১৪১) জিহাদের শরঈ দর্শন এটাই যে, আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদেরকে একত্ববাদীদের হাতে শাস্তি প্রদান করেন। ইতিপূর্বে তাদেরকে সাধারণ আসমানী শাস্তি দ্বারা ধ্বংস করে দেয়া হতো। যেমন হযরত নূহ (আঃ)-এর কওমের উপর তুফান এসেছিল, প্রথম আ'দ সম্প্রদায় ঘূর্ণি বাত্যায়

ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল এবং লূত (আঃ)-এর কওমকে পাথর বর্ষিয়ে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছিল। হযরত শুআ'ইব (আঃ)-এর কওমের মাথার উপর পাহাড়কে লটকিয়ে দেয়া হয়েছিল। আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আঃ)-কে পাঠিয়েছিলেন এবং তার শত্রু ফিরাউনকে ধ্বংস করেছিলেন, আর তার কওমকে নদীতে ডুবিয়ে দিয়েছিলেন। মূসা (আঃ)-এর উপর তাওরাত অবতীর্ণ করে কাফিরদেরকে হত্যা করা ফরয করে দেয়া হয়েছিল এবং এই নির্দেশই অন্যান্য শরীয়তের মধ্যেও কায়েম রয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "আমি পূর্ববর্তী উম্মতদেরকে ধ্বংস করার পর মূসা (আঃ)-কে কিতাব প্রদান করেছিলাম, এতে লোকদের জন্যে বাসীরাত রয়েছে (অর্থাৎ এর মাধ্যমে মানুষের অন্তর্দৃষ্টি খুলে যাবে)।"

মুমিনদের কাফিরদেরকেও বন্দী করার পরিবর্তে হত্যা করে দেয়া ঐ কাফিরদের কঠিন লাঞ্ছনার বিষয় ছিল। এতে মুমিনদের অন্তরেও প্রশান্তি নেমে আসতো। যেমন এই উম্মতের মুমিনদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিলঃ "ঐ কাফিরদেরকে হত্যাই করে দাও। আল্লাহ তোমাদের হাতে তাদেরকে অপদস্ত করতে ও শাস্তি দিতে চান এবং এ জন্যেও যে, এর ফলে তোমাদের অন্তর ঠাণ্ডা হবে।" কেননা, এই অহংকারী কুরায়েশ নেতৃবর্গ মুসলমানদেরকে অত্যন্ত ঘৃণার চক্ষে দেখতো এবং তাদেরকে নানাভাবে কষ্ট দিতো। সুতরাং যদি এরা নিহত হয়ে লাঞ্ছিত হয় তবে তাদের থেকে এই প্রতিশোধ গ্রহণের ফলে মুসলমানদের অন্তর কতই না ঠাণ্ডা হয়! তাই আবূ জেহেল যখন যুদ্ধক্ষেত্রে মারা গেল তখন তার মৃতদেহের বড়ই অবমাননা হলো। যদি বাড়ীতে বিছানায় মরতো তবে তার এই লাঞ্ছনা ও অবমাননা হতো না। অথবা যেমন, আবূ লাহাব যখন মারা গেল তখন তার মৃতদেহ এমনভাবে সড়ে পচে গেল যে, তার নিকটতম আত্মীয়েরাও তার মৃতদেহের কাছে আসতে পারছিল না। তারা তাকে গোসল দেয়ার পরিবর্তে দূর থেকে তার মৃতদেহের উপর পানি ছিটিয়ে দিয়েছিল এবং এক গর্তে তাকে দাফন করে ফেলেছিল। এ জন্যেই আল্লাহ পাক বলেনঃ إِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ (নিশ্চয়ই আল্লাহ মহা পরাক্রমশালী)। অর্থাৎ সম্মান ও মর্যাদা কাফিরদের জন্যে নয়, বরং দুনিয়া ও আখিরাতে মর্যাদা আল্লাহর জন্যে, তাঁর রাসূল (সঃ)-এর জন্যে এবং মুমিনদের জন্যে। তিনি আরো বলেনঃ "আমি পার্থিব জীবনে এবং কিয়ামতের দিন অবশ্যই আমার রাসূলদেরকে এবং মুমিনদেরকে সাহায্য করবো।" কাফিরদেরকে হত্যা করার নির্দেশ দেয়ার মধ্যেও মহান আল্লাহর বিশেষ নৈপুণ্য রয়েছে। নতুবা তিনি তো স্বীয় ক্ষমতা বলেই তাদেরকে ধ্বংস করে দিতে পারেন।

১১। (আর ঐ সময়ের কথা স্মরণ কর) যখন তিনি (আল্লাহ) তাঁর পক্ষ থেকে প্রশান্তির জন্যে তোমাদেরকে তন্দ্রায় আচ্ছন্ন করেন, আকাশ হতে তোমাদের উপর বারি বর্ষন করেন, (উদ্দেশ্য ছিল) তোমাদেরকে এর দ্বারা পবিত্র করবেন এবং তোমাদের হতে শয়তানের কুমন্ত্রণা দূরীভূত করবেন আর তোমাদের হৃদয়কে সুদৃঢ় করবেন এবং তোমাদের পা স্থির ও প্রতিষ্ঠিত রাখবেন।

١١- إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَ يُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَ يُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطٰنِ وَلِيَرْبِطَ عَلٰى قُلُوْبِكُمْ وَ يُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ ○

১২। (আর ঐ সময়ের কথাও স্মরণ কর) যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশ্‌তাদের নিকট প্রত্যাদেশ করলেন– আমি তোমাদের সাথে আছি, সুতরাং তোমরা ঈমানদারদেরকে সুপ্রতিষ্ঠিত ও অবিচল রাখো, আর যারা কাফির, আমি তাদের হৃদয়ে ভীতি সৃষ্টি করে দেবো, অতএব তোমরা তাদের স্কন্ধে আঘাত হানো, আর আঘাত হানো তাদের অঙ্গুলিসমূহের প্রতিটি জোড়ায় জোড়ায়।

١٢- إِذْ يُوْحِيْ رَبُّكَ إِلَى الْمَلٰٓئِكَةِ أَنِّيْ مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا سَأُلْقِيْ فِيْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوْا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوْا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ○

১৩। এটা এই কারণে যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ) -এর বিরোধিতা করে, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল

١٣- ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَآقُّوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَمَنْ يُّشَاقِقِ اللّٰهَ

(সঃ)-এর বিরোধিতা করে তার জেনে রাখা উচিত যে, আল্লাহ শাস্তি দানে খুবই কঠোর হস্ত।	وَرَسُوْلَهٗ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ○
১৪। এটাই তোমাদের শাস্তি, সুতরাং তোমরা এর স্বাদ গ্রহণ কর, তোমাদের জানা উচিত যে, সত্য অস্বীকারকারীদের জন্যে রয়েছে জাহান্নামের লেলিহান অগ্নির শাস্তি।	١٤- ذٰلِكُمْ فَذُوْقُوْهُ وَاَنَّ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابَ النَّارِ ○

আল্লাহ তা'আলা মুমিনদেরকে স্বীয় নিয়ামত ও অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে, যুদ্ধের সময় তিনি তাদেরকে তন্দ্রায় আচ্ছন্ন করে তাদের প্রতি ইহসান করেছেন। নিজেদের সংখ্যার স্বল্পতা এবং শত্রুদের সংখ্যাধিক্যের অনুভূতি তাদের মনে জেগেছিল বলে তারা কিছুটা ভীত হয়ে পড়েছিল। তখন মহান আল্লাহ তাদেরকে তন্দ্রায় আচ্ছন্ন করে তাদের মনে প্রশান্তি আনয়ন করেন। এরূপ তিনি উহুদের যুদ্ধেও করেছিলেন। যেমন তিনি বলেন ঃ

.... ثُمَّ اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ الْغَمِّ اَمَنَةً نُّعَاسًا অর্থাৎ "অনন্তর আল্লাহ সেই দুঃখের পর তোমাদের প্রতি নাযিল করলেন শান্তি অর্থাৎ তন্দ্রা যা তোমাদের একদলকে আচ্ছন্ন করেছিল।" (৩ঃ ১৫৪) হযরত আবূ তালহা (রাঃ) বলেনঃ "উহুদের যুদ্ধের দিন আমারও তন্দ্রা এসেছিল এবং আমার হাত থেকে তরবারী পড়ে যাচ্ছিল। আমি তা উঠিয়ে নিচ্ছিলাম। আমি জনগণকেও দেখছিলাম যে, তারা ঢাল মাথার উপর করে তন্দ্রায় ঢলে পড়ছে।" হযরত আলী (রাঃ) বলেনঃ "বদরের দিন হযরত মিকদাদ (রাঃ) ছাড়া আর কারো কাছে সওয়ারী ছিল না। আমরা সবাই নিদ্রিত অবস্থায় ছিলাম। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সঃ) একটি গাছের নীচে সকাল পর্যন্ত নামায পড়ছিলেন এবং আল্লাহর সামনে কান্নাকাটি করছিলেন।" হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন যে, যুদ্ধের দিন এই তন্দ্রা যেন আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে এক প্রকার শান্তি ও নিরাপত্তা ছিল। কিন্তু নামাযে এই তন্দ্রাই আবার শয়তানের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। হযরত কাতাদা (রঃ) বলেন যে, তন্দ্রা মাথায় হয় এবং ঘুম অন্তরে হয়। আমি বলি উহুদের যুদ্ধে মুমিনদেরকে তন্দ্রা আচ্ছন্ন করেছিল। আর এ খবর তো খুবই সাধারণ ও প্রসিদ্ধ। কিন্তু এখানে এই আয়াতে কারীমার সম্পর্ক রয়েছে বদরের ঘটনার সাথে। আর এ আয়াতটি এটা

প্রমাণ করে যে, বদরের যুদ্ধেও মুমিনদের তন্দ্রায় আচ্ছন্ন করা হয়েছিল এবং কঠিন যুদ্ধের সময় এভাবে মুমিনদের উপর তন্দ্রা ছেয়ে যেতো, যাতে তাদের অন্তর আল্লাহ তা'আলার সাহায্যে প্রশান্ত ও নিরাপদ থাকে। আর মুমিনদের উপর এটা মহান আল্লাহর অনুগ্রহ ও অনুকম্পা। যেমন আল্লাহ পাক বলেনঃ

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ـ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ـ

অর্থাৎ "নিশ্চয়ই বর্তমান মুশ্কিলসমূহের সাথেই আসানী রয়েছে।" এ জন্যেই সহীহ হাদীসে এসেছে যে, বদরের দিন নবী (সঃ) তাঁর জন্যে নির্মিত কুটিরে হযরত আবূ বকর (রাঃ)-এর সাথে অবস্থান করছিলেন। ইতিমধ্যে নবী (সঃ)-এর উপর তন্দ্রা ছেয়ে যায়। অতঃপর তিনি মুচকি হেসে তন্দ্রার ভাব কাটিয়ে উঠেন এবং বলেনঃ "হে আবূ বকর (রাঃ)! সুসংবাদ গ্রহণ কর। ঐ দেখ, জিবরাঈল (আঃ) ধূলিমলিন বেশে রয়েছেন!" অতঃপর তিনি কুটির হতে বেরিয়ে আসলেন এবং পাঠ করলেনঃ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَ يُوَلُّوْنَ الدُّبُرَ অর্থাৎ "শত্রুদের পরাজয় ঘটেছে এবং তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন পূর্বক পলায়ন করবে।" (৫৪ঃ ৪৫) ইরশাদ হচ্ছে–

وَ يُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً

অর্থাৎ "তিনি (আল্লাহ) তোমাদের উপর আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণ করলেন।" আলী ইবনে আবি তালহা (রাঃ) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, বদরে যেখানে নবী (সঃ) অবতরণ করেছিলেন সেখানে মুশরিকরা বদর ময়দানের পানি দখল করে নিয়েছিল এবং মুসলমান ও পানির মাঝখানে তারা প্রতিবন্ধক রূপে দাঁড়িয়েছিল। মুসলমানরা দুর্বলতাপূর্ণ অবস্থায় ছিলেন। ঐ সময় শয়তান মুসলমানদের অন্তরে কুমন্ত্রণা দিতে শুরু করে দেয়। সে তাঁদেরকে বলে– "তোমরা তো নিজেদেরকে বড়ই আল্লাহওয়ালা মনে করছো। আর তোমাদের মধ্যে স্বয়ং রাসূলও (সঃ) বিদ্যমান রয়েছেন। পানির উপর দখল তো মুশরিকদের রয়েছে। আর তোমরা পানি থেকে এমনভাবে বঞ্চিত রয়েছো যে, নাপাক অবস্থাতেই নামায আদায় করছো!" তখন আল্লাহ তা'আলা প্রচুর পানি বর্ষণ করলেন। মুসলমানরা পানি পানও করলেন এবং পবিত্রতাও অর্জন করলেন। মহান আল্লাহ শয়তানের কুমন্ত্রণাও খাটো করে দিলেন। পানির কারণে মুসলমানদের দিকের বালু জমে শক্ত হয়ে গেল। ফলে জনগণের ও জানোয়ারগুলোর চলাফেরার সুবিধা হলো। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নবী (সঃ) ও মুমিনদেরকে এক হাজার ফেরেশ্তা দ্বারা সাহায্য করলেন। হযরত জিবরাঈল (আঃ) একদিকে পাঁচশ' ফেরেশ্তা নিয়ে বিদ্যমান ছিলেন। হযরত

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, মুশরিক কুরায়েশরা যখন আবূ সুফিয়ানের কাফেলাকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে আসে তখন তারা বদর কূপের উপর এসে শিবির স্থাপন করে। আর মুসলমানরা পানি থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়। পিপাসায় তারা ছটফট করে। নামাযও তারা নাপাকী এবং হাদাসের অবস্থায় পড়তে থাকে। শেষ পর্যন্ত তাদের অন্তরে বিভিন্ন প্রকারের খেয়াল চেপে বসে। এমতাবস্থায় আল্লাহ তা'আলা বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং মাঠে পানি বইতে শুরু করে। মুসলমানেরা পানিতে পাত্র ভর্তি করে নেয় এবং জানোয়ারগুলোকে পানি পান করায়। তাতে তারা গোসলও করে। এভাবে তারা পবিত্রতা লাভ করে। এর ফলে তাদের পাগুলোও অটল ও স্থির থাকে।[১] মুসলমান ও মুশরিকদের মধ্য ভাগে বালুকারাশি ছিল। বৃষ্টি বর্ষণের ফলে বালু জমে শক্ত হয়ে যায়। কাজেই মুসলমানদের চলাফেরার সুবিধা হয়।

প্রসিদ্ধ ঘটনা এই যে, নবী (সঃ) বদর অভিমুখে রওয়ানা হয়ে পানির নিকটবর্তী স্থানে অবতরণ করেন। হাবাব ইবনে মুনযির (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর খিদমতে হাযির হয়ে আরয করেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আপনি যে এ স্থানে অবতরণ করেছেন এটা কি আল্লাহর নির্দেশক্রমে, যার বিরোধিতা করা যাবে না, না যুদ্ধের পক্ষে এটাকে উপযুক্ত স্থান মনে করেছেন?" উত্তরে তিনি বলেনঃ "যুদ্ধের জন্যে উপযুক্ত স্থান হিসেবেই আমি এখানে অবস্থান করেছি।" তখন হযরত হাবাব (রাঃ) বলেনঃ "তাহলে আরও সামনে অগ্রসর হোন এবং পানির শেষাংশ পর্যন্ত দখল করে নিন। ওখানে হাউয তৈরী করে এখানকার সমস্ত পানি জমা করুন। তাহলে পানির উপর অধিকার আমাদেরই থাকবে এবং শত্রুদের পানির উপর কোন দখল থাকবে না।" এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সঃ) সামনে বেড়ে যান এবং ঐ কাজই করেন।

বর্ণিত আছে যে, হাবাব (রাঃ) যখন এই পরামর্শ দেন তখন ঐ সময়ে একজন ফেরেশ্তা আকাশ থেকে অবতরণ করেন। হযরত জিবরাঈল (আঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে উপবিষ্ট ছিলেন। ঐ ফেরেশ্তা বলেনঃ "হে মুহাম্মাদ (সঃ)! আল্লাহ তা'আলা আপনাকে সালাম জানিয়েছেন এবং বলেছেন যে, হাবাব ইবনে মুনযির (রাঃ)-এর পরামর্শ আপনার জন্যে সঠিক পরামর্শই বটে।" তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত জিবরাঈল (আঃ)-কে জিজ্ঞেস করেনঃ "আপনি এই ফেরেশ্তাকে চিনেন কি?" হযরত জিবরাঈল (আঃ) তাঁকে দেখে বলেন, আমি সমস্ত ফেরেশ্তাকে চিনি না বটে, তবে এটা যে একজন ফেরেশতা এতে কোন সন্দেহ নেই। এটা শয়তান অবশ্যই নয়।

১. অনুরূপ বর্ণনা কাতাদা (রঃ) ও যহ্হাক (রঃ) হতে বর্ণিত আছে।

হযরত ইবনে যুবাইর (রাঃ) বলেনঃ "আল্লাহ তা'আলা বৃষ্টি বর্ষণ করেন, ফলে নবী (সঃ)-এর দিকের ভূমি জমে গিয়ে শক্ত হয়ে যায় এবং ওর উপর চলতে সুবিধা হয়। পক্ষান্তরে কাফিরদের দিকের ভূমি নীচু ছিল। কাজেই ওখানকার মাটি দলদলে হয়ে যায়। ফলে তাদের পক্ষে ঐ মাটিতে চলাফেরা কষ্টকর হয়। আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের প্রতি তন্দ্রার দ্বারা ইহসান করার পূর্বে বৃষ্টি বর্ষিয়ে ইহ্সান করেছিলেন। ধূলাবালি জমে গিয়েছিল এবং মাটি শক্ত হয়েছিল। সুতরাং মুসলমানরা খুব খুশী হয়েছিলেন এবং তাঁদের পায়ের স্থিরতা আরো বৃদ্ধি পেয়েছিল। অতঃপর তাদের চোখে তন্দ্রা নেমে আসে। তাঁদের মন মগজ তাজা হয়ে যায়। সকালে যুদ্ধ। রাত্রে হাল্কা বৃষ্টি হয়ে গেছে। আমরা গাছের নীচে গিয়ে বৃষ্টি থেকে আশ্রয় গ্রহণ করি। রাসূলুল্লাহ (সঃ) জেগে থেকে জনগণের সাথে যুদ্ধ সম্পর্কে আলাপ আলোচনা করতে থাকেন।"

لِيُطَهِّرَكُمْ بِهٖ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা হাদাসে আসগার (অযু না থাকা অবস্থা) এবং হাদাসে আকবার (গোসল ফরয হওয়ার অবস্থা) থেকে পবিত্র করার জন্যে বৃষ্টি বর্ষণ করেন, যেন তিনি তোমাদেরকে শয়তানের কুমন্ত্রণার পর পথভ্রষ্টতা থেকে রক্ষা করেন। এটা ছিল অন্তরের পবিত্রতা। যেমন জান্নাতবাসীদের সম্পর্কে আল্লাহ পাক বলেনঃ "পরিধানের জন্যে তাদেরকে রেশমী কাপড় দেয়া হবে, আর দেয়া হবে তাদেরকে সোনা ও রূপার অলংকার।" এটা হচ্ছে বাহ্যিক সৌন্দর্য। আর আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে পবিত্র সুরা পান করাবেন এবং হিংসা বিদ্বেষ থেকে তাদেরকে পাক-পবিত্র করবেন। এটা হচ্ছে আভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য। বৃষ্টি বর্ষণ করার এটাও উদ্দেশ্য ছিল যে, এর মাধ্যমে আল্লাহ তোমাদের অন্তরে প্রশান্তি আনয়ন করে তোমাদেরকে ধৈর্যশীল করবেন এবং যুদ্ধক্ষেত্রে তোমাদেরকে অটল রাখবেন। এই ধৈর্য ও মনের স্থিরতা হচ্ছে আভ্যন্তরীণ বীরত্ব এবং যুদ্ধে অটল থাকা হচ্ছে বাহ্যিক বীরত্ব। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। মহান আল্লাহর উক্তি–

إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلٰئِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا

অর্থাৎ হে নবী (সঃ)! ঐ সময়ের কথা স্মরণ কর যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশ্তাদের কাছে অহী করলেন আমি তোমাদের সাথে আছি, সুতরাং তোমরা ঈমানদারদেরকে সুপ্রতিষ্ঠিত ও অবিচল রাখো। এটা হচ্ছে গোপন নিয়ামত যা আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের উপর প্রকাশ করছেন, যেন তারা তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে। তিনি হচ্ছেন কল্যাণময় ও মহান। তিনি ফেরেশতাদেরকে

জোর দিয়ে বলেছেন যে, তাঁরা যেন নবী (সঃ)-কে, নবী (সঃ)-এর দ্বীনকে এবং মুসলিম জামাআতকে সাহায্য করেন। যাতে তাদের মন ভেঙ্গে না যায় এবং তারা সাহস হারা না হয়। সুতরাং হে ফেরেশ্তার দল! তোমরাও ঐ কাফিরদের সাথে যুদ্ধ কর। কথিত আছে যে, ফেরেশ্তা কোন মুসলমানের কাছে আসতেন এবং বলতেন, আমি এই কওমকে অর্থাৎ মুশরিকদেরকে বলতে শুনেছি– "যদি মুসলমানরা আমাদেরকে আক্রমণ করে তবে আমরা যুদ্ধের মাঠে টিকতে পারবো না।" এভাবে কথাটি এক মুখ হতে আর এক মুখে ছড়িয়ে পড়ে। এর ফলে সাহাবীদের মনোবল বাড়তে থাকে এবং তাঁরা বুঝতে পারেন যে, মুশরিকদের যুদ্ধ করার ক্ষমতা নেই। আল্লাহ্ পাক বলেনঃ "আমি কাফিরদের হৃদয়ে ভীতি সৃষ্টি করে দেবো।" অর্থাৎ হে ফেরেশ্তামণ্ডলী! তোমরা মুমিনদেরকে অটল ও স্থির রাখো এবং তাদের হৃদয়কে দৃঢ় কর।

فَاضْرِبُوْا فَوْقَ الْاَعْنَاقِ অর্থাৎ 'তোমরা তাদের স্কন্ধে আঘাত হানো।'

وَ اضْرِبُوْا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ অর্থাৎ 'তোমরা আঘাত হানো তাদের অঙ্গুলিসমূহের প্রতিটি জোড়ায় জোড়ায়।' মুফাস্সিরগণ فَوْقَ الْاَعْنَاقِ -এর অর্থের ব্যাপারে মতভেদ করেছেন। কেউ কেউ মাথায় মারা অর্থ নিয়েছেন, আবার কেউ কেউ অর্থ নিয়েছেন গর্দানে মারা। এই অর্থের সাক্ষ্য নিম্নের আয়াতে পাওয়া যায়ঃ

فَاِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتّٰۤى اِذَاۤ اَثْخَنْتُمُوْهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ ـ

অর্থাৎ "যখন তোমরা কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করবে তখন তাদের গর্দানে মারবে, শেষ পর্যন্ত যখন তাদেরকে খুব বেশী হত্যা করে ফেলবে তখন (হত্যা করা বন্ধ করে অবশিষ্টদেরকে) দৃঢ়ভাবে বেঁধে ফেলবে।" (৪৭ঃ ৪) হযরত কাসিম (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ "আমি আল্লাহর শাস্তিতে জড়িত করার জন্যে প্রেরিত হইনি। (অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত শাস্তি, যেমন পূর্ববর্তী উম্মতবর্গের উপর অবতীর্ণ হতো), বরং তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে আমি তাদের গর্দান উড়িয়ে দেবো এবং তাদেরকে শক্তভাবে শৃঙ্খলে আবদ্ধ করবো এ জন্যেই আমি প্রেরিত হয়েছি।" ইবনে জারীর (রঃ) বলেন যে, এর দ্বারা গর্দানে আঘাত করা ও মাথার খুলি উড়িয়ে দেয়া বুঝানো হয়েছে। 'মাগাযী উমভী'তে রয়েছে যে, বদরের যুদ্ধের দিন নবী (সঃ) নিহতদের পার্শ্ব দিয়ে গমনের সময় বলছিলেনঃ يُفَلِّقُ هَامًا অর্থাৎ 'মাথা কর্তিত অবস্থায় পড়ে আছে।' তখন

হযরত আবূ বকর (রাঃ) ঐ কথার সাথেই ছন্দ মিলিয়ে দিয়ে বলেনঃ

يُفَلِّقْنَ هَامًا مِنْ رِجَالٍ اَعِزَّةٍ عَلَيْنَا * وَ هُمْ كَانُوْا اَعَقَّ وَ اَظْلَمَا

অর্থাৎ "এমন লোকদের মাথাগুলো কর্তিত অবস্থায় পড়ে রয়েছে যারা আমাদের উপর অহংকার প্রকাশ করতো। কেননা, তারা ছিল বড় অত্যাচারী ও অবাধ্য।" এখানে রাসূলুল্লাহ (সঃ) একটি ছন্দের প্রাথমিক দু'টি শব্দ উচ্চারণ করলেন এবং অপেক্ষমান থাকলেন যে, আবূ বকর (রাঃ) একে কবিতা বানিয়ে ছন্দ পূর্ণ করে দিবেন। কেননা, কবি রূপে পরিচিত হওয়া তাঁর জন্যে শোভনীয় ছিল না। যেমন আল্লাহ পাক বলেনঃ

وَ مَا عَلَّمْنٰهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِيْ لَهٗ

অর্থাৎ "আমি তাকে কবিতা শিক্ষা দেইনি এবং এটা তার জন্যে উপযুক্তও নয়।" (৩৬ঃ ৬৯) বদরের দিন জনগণ ঐ নিহত ব্যক্তিদেরকে চিনতে পারতো যাদেরকে ফেরেশ্তাগণ হত্যা করেছিলেন। কেননা ঐ নিহতদের যখম ঘাড়ের উপর থাকতো বা জোড়ের উপর থাকতো। আর ঐ যখম এমনভাবে চিহ্নিত হয়ে যেতো যেন আগুনে দগ্ধ করা হয়েছে।

وَ اضْرِبُوْا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ অর্থাৎ হে মুমিনগণ! তোমরা তোমাদের শত্রুদেরকে তাদের জোড়ের উপর আঘাত কর, যেন তাদের হাত-পা ভেঙ্গে যায়। بَنَانٌ শব্দটি হচ্ছে بَنَانَةٌ শব্দের বহুবচন। প্রত্যেক জোড়কে بَنَانَةٌ বলা হয়। ইমাম আওযায়ী (রঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে– হে ফেরেশতামণ্ডলী! তোমরা ঐ কাফিরদের চেহারা ও চোখের উপর আঘাত কর এবং এমনভাবে আহত করে দাও যে, যেন ওগুলোকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দ্বারা পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে। আর কোন কাফিরকে বন্দী করে নেয়ার পর হত্যা করা জায়েয নয়। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বদরের ঘটনা বর্ণনা করেছেন যে, আবূ জেহেল বলেছিলঃ "তোমরা মুসলমানদেরকে হত্যা করার পরিবর্তে জীবিত ধরে রাখো, যেন তোমরা তাদেরকে আমাদের ধর্মকে মন্দ বলা, আমাদেরকে বিদ্রূপ করা এবং 'লাত' ও 'উয্যা'কে অমান্য করার স্বাদ গ্রহণ করাতে পার।" তাই আল্লাহ ফেরেশতাদেরকে বলে দিয়েছিলেনঃ "আমি তোমাদের সাথে রয়েছি। তোমরা মুমিনদেরকে অটল রাখো। আমি কাফিরদের অন্তরে মুসলমানদের আতঙ্ক সৃষ্টি করবো। তোমরা তাদের গর্দানে ও জোড়ে জোড়ে মারবে।" বদরের নিহতদের মধ্যে আবূ জেহেল ৬৯ (উনসত্তর) নম্বরে ছিল। অতঃপর উকবা ইবনে আবি মুঈতকে বন্দী করে হত্যা করে দেয়া হয় এবং এভাবে ৭০ (সত্তর) পূর্ণ হয়।

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ شَاۤقُّوا اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ -এর কারণ এই ছিল যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ)-এর বিরুদ্ধাচরণ করেছিল এবং শরীয়ত ও ঈমান পরিহারের নীতি অবলম্বন করেছিল। شُقٌّ শব্দটি شَقَّ عَصًا থেকে নেয়া হয়েছে। অর্থাৎ "সে লাঠিকে দু'টুকরো করেছে।" ইরশাদ হচ্ছে– "যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ)-এর বিরোধিতা করে, তার জেনে রাখা উচিত যে, আল্লাহ শাস্তি দানে খুবই কঠোর হস্ত। তিনি কোন কিছুই ভুলে যাবেন না। তাঁর গযবের মুকাবিলা কেউই করতে পারে না।"

ذٰلِكُمْ فَذُوْقُوْهُ وَ اَنَّ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابَ النَّارِ এটাই হচ্ছে তোমাদের শাস্তি, সুতরাং তোমরা এই শাস্তির স্বাদ গ্রহণ কর, তোমাদের জানা উচিত যে, সত্য অস্বীকারকারীদের জন্যে রয়েছে জাহান্নামের লেলিহান আগুনের শাস্তি। এখানে এ কথা কাফিরদেরকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে। অর্থাৎ তোমরা দুনিয়াতে এই শাস্তির স্বাদ গ্রহণ কর এবং জেনে রেখো যে, কাফিরদের জন্যে আখিরাতেও জাহান্নামের শাস্তি রয়েছে।

১৫। হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন সৈন্য বাহিনীরূপে কাফির বাহিনীর সম্মুখীন হবে, তখন তোমরা তাদের মুকাবিলা করা হতে কখনোই পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে না।

١٥- يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوْهُمُ الْاَدْبَارَ ۝

১৬। আর সেদিন যুদ্ধ কৌশল বা স্বীয় বাহিনীর কেন্দ্রস্থলে স্থান নেয়া ব্যতীত কেউ তাদেরকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করলে অর্থাৎ পালিয়ে গেলে সে আল্লাহর গযবে পরিবেষ্টিত হবে, তার আশ্রয়স্থল হবে জাহান্নাম, আর জাহান্নাম কতই না নিকৃষ্ট স্থান!

١٦- وَ مَنْ يُّوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهٗۤ اِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ اَوْ مُتَحَيِّزًا اِلٰى فِئَةٍ فَقَدْ بَآءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَ مَاْوٰىهُ جَهَنَّمُ وَ بِئْسَ الْمَصِيْرُ ۝

এখানে জিহাদের মাঠ থেকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন কারীদেরকে ধমক দেয়া হচ্ছে। ঘোষণা করা হচ্ছে– হে মুমিনগণ! যখন তোমরা কাফিরদের সাথে যুদ্ধের মুখোমুখী হবে তখন তোমাদের সাথীদের ছেড়ে যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়ে যাবে না। হ্যাঁ, তবে যদি কেউ চতুরতা করে পালিয়ে যায় যে, যেন ভয় পেয়ে পালিয়ে যাচ্ছে, আর এ ধারণা করে শত্রু তার পশ্চাদ্ধাবন করলো, তখন সে ঐ শত্রুকে একাকী পেয়ে তার দিকে ফিরে গেল এবং তাকে আক্রমণ করতঃ হত্যা করে দিলো। এই যৌক্তিকতায় পলায়ন করলে কোন দোষ নেই।[১] অথবা এই উদ্দেশ্যে পলায়ন করে যে, সে মুসলমানদের অন্য দলের সাথে মিলিত হবে এবং তাদেরকে সাহায্য করবে অথবা তারাই তাকে সাহায্য করবে। এই পলায়নও জায়েয। কেননা, সে স্বীয় ইমামের আশ্রয়ে যেতে চাচ্ছে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ) কর্তৃক প্রেরিত একটি ছোট সেনাবাহিনীর একজন সৈনিক ছিলাম। লোকদের মধ্যে পলায়নের হিড়িক পড়ে যায়। আমিও পালিয়ে যাই। অতঃপর আমরা অনুভব করি যে, আমরা যুদ্ধ হতে পলায়নকারী। সুতরাং আমরা আল্লাহর শাস্তির যোগ্য হয়ে পড়েছি। এখন আমরা কি করবো? আমরা পরামর্শক্রমে ঠিক করলাম যে, মদীনায় গিয়ে আমরা নিজেদেরকে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সামনে পেশ করবো। যদি তিনি আমাদের তাওবা কবূল করে নেন তবে তো ভাল কথা, নচেৎ আমরা দু'চোখ যেখানে যাবে সেখানেই চলে যাবো এবং কাউকেও মুখ দেখাবো না। অতএব আমরা ফজরের নামাযের পূর্বে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট হাযির হলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ "তোমরা কারা?" আমরা উত্তরে বললাম, আমরা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পলায়নকারী। তখন তিনি বললেনঃ "না, না বরং তোমরা নিজেদের কেন্দ্রস্থলে আগমনকারী। আমি তোমাদের ও তোমাদের মুমিন দলের বন্ধন।" এ কথা শুনে আমরা এগিয়ে গেলাম এবং তাঁর হস্ত চুম্বন করলাম।"[২] ইমাম আবূ দাউদ (রঃ) এটুকু বেশী বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) সেই সময় أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ -এ আয়াতটিও পাঠ করেন। আলেমগণ عَكَّارُونَ শব্দের অর্থ عَرَّافُونَ বা দূরদর্শী বলেছেন।

১. এটা সাঈদ ইবনে জুবাইর (রঃ) এবং সুদ্দীর (রঃ) উক্তি।

২. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ), ইমাম আবূ দাউদ (রঃ), ইমাম তিরমিযী (রঃ) এবং ইমাম ইবনে মাজাহ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

হযরত আবূ উবাইদা (রাঃ) ইরানের একটি পুলের উপর নিহত হন। তখন হযরত উমার ইবনে খাত্তাব (রাঃ) বলেনঃ “চতুরতা অবলম্বন করে তিনি পালিয়ে আসতে পারতেন। আমি তাঁর আমীর ও বন্ধন রূপে ছিলাম। তিনি আমার কাছে চলে আসলেই হতো!” অতঃপর তিনি বলেনঃ “হে লোক সকল! এ আয়াতটিকে কেন্দ্র করে তোমরা ভুল ধারণায় পতিত হয়ো না। এটা বদরের যুদ্ধের ব্যাপারে ছিল। এই সময় আমি প্রত্যেক মুসলমানের জামাআত বা দল!” হযরত নাফে’ (রাঃ) হযরত উমার (রাঃ)-কে বলেনঃ “শত্রুদের সাথে যুদ্ধের সময় আমরা যুদ্ধক্ষেত্রে অটল থাকতে পারি না। আর আমাদের কেন্দ্র কোন্‌টা তা আমরা জানি না। অর্থাৎ ইমাম আমাদের কেন্দ্র কি সেনাবাহিনী কেন্দ্র তা আমাদের জানা নেই।” তখন তিনি বলেনঃ “রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদের কেন্দ্র।” আমি বললাম যে, আল্লাহ পাক .... إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا-এ আয়াত যে নাযিল করেছেন! তখন তিনি বলেনঃ “এ আয়াতটি বদরের দিনের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। এটা বদরের পূর্বের সময়ের জন্যেও নয়, এর পরবর্তী সময়ের জন্যেও নয়।” مُتَحَيِّزًا -এর অর্থ হচ্ছে নবী (সঃ)-এর নিকট আশ্রয় গ্রহণকারী। অনুরূপভাবে এখনও কোন লোক তার আমীরের কাছে বা সঙ্গীদের কাছে আশ্রয় নিতে পারে। কিন্তু যদি এই পলায়ন এই কারণ ছাড়া অন্য কারণে হয় তবে তা হারাম এবং গুনাহে কাবীরার মধ্যে গণ্য হবে।

হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “তোমরা সাতটি ধ্বংসকারী জিনিস থেকে বেঁচে থাকো। (১) আল্লাহর সাথে কাউকেও শরীক করা, (২) জাদু করা, (৩) কাউকেও অন্যায়ভাবে হত্যা করা, (৪) সুদ ভক্ষণ করা, (৫) ইয়াতীমের মাল খেয়ে নেয়া, (৬) যুদ্ধক্ষেত্র হতে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পালিয়ে যাওয়া এবং (৭) সতী সাধ্বী সরলা মুমিনা নারীকে ব্যভিচারের অপবাদ দেয়া।”[১] এ কথাটি আরও কয়েকভাবে প্রমাণিত আছে যে, এ আয়াতটি বদর সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়। এ জন্যেই আল্লাহ পাক বলেনঃ “যে পালিয়ে যাবে সে আল্লাহর গযবে পরিবেষ্টিত হবে এবং তার আশ্রয়স্থল হবে জাহান্নাম। আর জাহান্নাম কতইনা নিকৃষ্ট স্থান!”

বাশীর ইবনে মা’বাদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, বাইআ’ত গ্রহণের জন্যে আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট আগমন করলাম। তখন তিনি বাইআ’তের ব্যাপারে কয়েকটি শর্ত আরোপ করলেন। তিনি বললেনঃ “তুমি

১. এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রঃ) ও ইমাম মুসলিম (রঃ) তাখরীজ করেছেন।

সাক্ষ্য দেবে যে, মুহাম্মাদ (সঃ) আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। নামায আদায় করবে। যাকাত প্রদান করবে। হজ্ব করবে। রমযানের রোযা রাখবে। আল্লাহর পথে জিহাদ করবে।" আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! এগুলোর মধ্যে দু'টি কাজ আমার কাছে কঠিন বোধ হচ্ছে। প্রথম হচ্ছে জিহাদ যে, যদি জিহাদের অবস্থায় কেউ পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পালিয়ে যায় তবে আল্লাহর গযব তার উপর পতিত হবে এবং আমার ভয় হচ্ছে যে, না জানি আমি হয়তো মৃত্যুর ভয়ে এই পাপে জড়িয়ে পড়বো। দ্বিতীয় হচ্ছে সাদকা। আল্লাহর শপথ! গনীমত ছাড়া আমার আর কোন আয়-উপার্জন নেই। আর আমার কাছে দশটি উষ্ট্রী রয়েছে যেগুলোকে দোহন করে দুধ আমি পান করি এবং পরিবারের লোকদেরকে পান করিয়ে থাকি। আর ওগুলোর উপর আরোহণ করি। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন আমার হাত চেপে ধরলেন এবং হাতকে আন্দোলিত করে বললেনঃ "তুমি জিহাদও করবে না এবং দান খায়রাতও করবে না, তাহলে জান্নাত লাভ করবে কিরূপে?" আমি জবাবে বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমি মেনে নিলাম এবং প্রত্যেক শর্তের উপরই দীক্ষা গ্রহণ করলাম। এ হাদীসটি গারীব। ছ'খানা সহীহ হাদীস গ্রন্থের মধ্যে এটা বর্ণিত হয়নি। হযরত সাওবান (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ "তিনটি জিনিসের অভাবে কোন সৎ আমলও ফলদায়ক হয় না। (১) আল্লাহর সাথে অন্য কাউকেও শরীক করা, (২) পিতা মাতার অবাধ্য হওয়া ও তাদের বিরুদ্ধাচরণ করা এবং (৩) যুদ্ধক্ষেত্র হতে পলায়ন করা।" এ হাদীসটিও গারীব।

হযরত জাদী (রঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি বলে–

أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ وَ اَتُوْبُ اِلَيْهِ

অর্থাৎ "আমি ঐ আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি যিনি ছাড়া কোন মা'বূদ নেই এবং আমি তাঁর কাছে তাওবা করছি।" তার পাপরাশি আল্লাহ ক্ষমা করে দেন যদিও সে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাওয়ার পাপও করে থাকে। এ হাদীসটিও গারীব বা দুর্বল। নবী (সঃ)-এর খাদেম হযরত যায়েদ (রাঃ) এ হাদীসটি ছাড়া অন্য কোন হাদীস বর্ণনা করেননি। কেউ কেউ এই হুকুম লাগিয়েছেন যে, জিহাদের মাঠ থেকে পলায়ন করা সাহাবীদের উপর হারাম ছিল। কেননা, ঐ সময় তাঁদের উপর জিহাদ ফরয ছিল। কেউ কেউ বলেছেন যে, জিহাদ শুধুমাত্র আনসারদের উপর ফরয ছিল। কেননা, তাঁরা কষ্ট ও আরাম সর্বাবস্থায় নবী (সঃ)-এর নির্দেশ পালনের উপর দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। আবার এ কথাও বলা

হয়েছে যে, এই হুকুম শুধু আহলে বদরের সাথে নির্দিষ্ট।[১] এর উপর এই দলীল পেশ করা হয়েছে যে, ঐ সময় পর্যন্ত মুসলমানদের কোন নিয়মিত শান শওকতযুক্ত দল ছিলেনই না। যা কিছু ছিলেন এই মুষ্টিপূর্ণ লোকই ছিলেন। এ জন্যে এইরূপ হুকুমের খুবই প্রয়োজন ছিল। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিম্নের হাদীসটি এই অবস্থার উপরই আলোকপাত করেঃ "হে আল্লাহ! যদি আপনি এই মুষ্টিপূর্ণ দলটিকেও ধ্বংস করে দেন তবে দুনিয়ায় আপনার ইবাদত করার কেউই থাকবে না!" হযরত হাসান বসরী (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, এটা বদরের দিন জরুরী ছিল। কিন্তু এখন যদি কেউ স্বীয় ইমাম বা স্বীয় দুর্গের কাছে আশ্রয় নেয় তবে কোন দোষ হবে না। কেননা, বদরের দিন পলায়নকারীদের জন্যে আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামকে বাসস্থান করেছেন বটে, কিন্তু ঐ পলায়নকারীদেরকে তিনি এই হুকুমের বহির্ভূত করেছেন যারা শত্রুদেরকে ধোঁকা দেয়ার উদ্দেশ্যে পালিয়ে যায় বা নিজেদের দলে মিলিত হওয়ার উদ্দেশ্যে পালিয়ে আসে! এর পরে উহুদের যুদ্ধ সংঘটিত হলে আল্লাহ তা'আলা ..... إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعٰنِ (৩ঃ ১৫৫) -এ আয়াত অবতীর্ণ করেন। এর সাত বছর পর হুনায়েনের যুদ্ধ সংঘটিত হলে তিনি ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُّدْبِرِيْنَ (৯ঃ ২৫) এবং ثُمَّ يَتُوبُ اللّٰهُ مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ عَلٰى مَنْ يَّشَاءُ (৯ঃ ২৭) এ কথাগুলো বলেন। আর এখানে وَمَنْ يُّوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهٗ -এ কথা বলেছেন। এ আয়াতটি আহলে বদরের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। এসব ব্যাখ্যায় এটাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, আহলে বদর ছাড়া অন্যেরাও যদি জিহাদের ময়দান থেকে পলায়ন করে তবে ওটাও হারাম হওয়া উচিত। যদিও এই আয়াত বদরের যুদ্ধের সময় অবতীর্ণ হয়েছিল তথাপি যখন এটাকে সাতটি ধ্বংসকারী জিনিসের মধ্যে গণ্য করা হয়েছে তখন এটা হারাম হওয়াই বাঞ্ছনীয়। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সঠিক জ্ঞানের অধিকারী।

১৭। তোমরা তাদেরকে হত্যা করনি, বরং আল্লাহই তাদেরকে হত্যা করেছেন, আর (হে নবী সঃ!) যখন তুমি (ধূলোবালি)

١٧- فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ

১. এটা আমর (রাঃ), ইবনে আব্বাস (রাঃ), আবূ হুরাইরা (রাঃ), আবূ সাঈদ (রাঃ), নাফে' (রঃ), হাসান বসরী (রঃ), সাঈদ ইবনে জুবাইর (রাঃ), ইকরামা (রাঃ), কাতাদা (রাঃ), যহহাক (রাঃ) প্রমুখ হতে বর্ণিত আছে।

وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِيْنَ مِنْهُ بَلَاۤءً حَسَنًا اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ○

নিক্ষেপ করেছিলে তখন তা মূলতঃ তুমি নিক্ষেপ করনি, বরং আল্লাহই তা নিক্ষেপ করেছিলেন, এটা করা হয়েছিল মুমিনদেরকে উত্তম পুরস্কার দান করার জন্যে, নিঃসন্দেহে আল্লাহ সব কিছু শোনেন ও সব কিছু জানেন।

১৮- ذٰلِكُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ مُوْهِنُ كَيْدِ الْكٰفِرِيْنَ ○

১৮। আর এমনিভাবেই আল্লাহ কাফিরদের চক্রান্ত দুর্বল ও নস্যাৎ করে থাকেন।

এখানে এই কথার উপর আলোকপাত করা হচ্ছে যে, বান্দাদের কার্যাবলীর সৃষ্টিকর্তা হচ্ছেন আল্লাহ। যে সৎ কাজ বান্দা হতে প্রকাশিত হয় তা আল্লাহই সৎ বানিয়ে থাকেন। কেননা, সেই কাজ করার ক্ষমতা তিনিই প্রদান করেছেন। ঐ কাজ করার সাহস ও শক্তি তিনিই যুগিয়েছেন। এ জন্যেই ইরশাদ হচ্ছে– ঐ কাফিরদেরকে তোমরা হত্যা করনি, বরং আল্লাহই হত্যা করেছেন। তোমাদের এ শক্তি কি করে হতো যে, তোমাদের সংখ্যা এতো কম হওয়া সত্ত্বেও তোমরা এতো অধিক সংখ্যক শত্রুকে পরাজিত করে দিলে? এই সফলতা আল্লাহই তোমাদেরকে প্রদান করেছেন। যেমন তিনি বলেনঃ

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

অর্থাৎ “বদরে তোমাদের সংখ্যা কম থাকা অবস্থাতেও আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করেছেন (এবং শত্রুদের উপর জয়যুক্ত করেছেন)।” (৩ঃ ১২৩) আল্লাহ পাক আর এক জায়গায় বলেছেনঃ

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ فِيْ مَوَاطِنَ كَثِيْرَةٍ وَّيَوْمَ حُنَيْنٍ اِذْ اَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْـًٔا وَّضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُّدْبِرِيْنَ-

অর্থাৎ “আল্লাহ অধিকাংশ স্থানে তোমাদেরকে সাহায্য করেছেন, হুনায়েনের যুদ্ধের দিন তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদেরকে অহংকারী করেছিল, কিন্তু ঐ সংখ্যাধিক্য তোমাদের কোনই উপকারে আসেনি, যমীন এতো প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও তোমাদের উপর তা সংকীর্ণ হয়ে পড়েছিল এবং তোমরা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে

পলায়ন করেছিলে।” (৯ঃ ২৫) আল্লাহ জানেন যে, যুদ্ধে বিজয় লাভ ও সফলতা সংখ্যাধিক্যের উপর নির্ভর করে না এবং অস্ত্রশস্ত্রের প্রাচুর্যের উপরও নয়। বরং কৃতকার্যতা ও সফলতা আল্লাহর পক্ষ থেকেই লাভ হয়ে থাকে। যেমন আল্লাহ পাক বলেনঃ كَمْ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيْرَةً অর্থাৎ “অনেক সময় এরূপ ঘটে থাকে যে, ছোট দল বৃহৎ দলের উপর জয়যুক্ত হয়।” (২ঃ ২৪৯)

وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى ঐ মুষ্টিপূর্ণ মাটি সম্পর্কে আল্লাহ পাক স্বীয় নবী (সঃ)-কে বলেছেন যে মাটি তিনি বদরের যুদ্ধে কাফিরদের মুখের উপর নিক্ষেপ করেছিলেন। ঘটনা এই যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) যুদ্ধক্ষেত্রের কুটির থেকে বেরিয়ে এসে অত্যন্ত বিনীতভাবে আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করলেন। অতঃপর তিনি এক মুষ্টি মাটি কাফিরদের দিকে নিক্ষেপ করলেন এবং বললেনঃ “তোমাদের চেহারা নষ্ট হোক।” তারপর তিনি সাহাবীদেরকে মুশরিকদের উপর হামলা করার নির্দেশ দেন। আল্লাহর হুকুমে এই মাটি ও কংকর মুশরিকদের চোখে গিয়ে পড়ে। এমন কেউ অবশিষ্ট থাকলো না যার চোখে তা পড়েনি এবং তাকে যুদ্ধ করতে অপারগ করেনি। এ জন্যেই আল্লাহ পাক বলেনঃ “হে নবী (সঃ)! যখন তুমি (ধুলাবালি) নিক্ষেপ করছিলে তখন প্রকৃতপক্ষে তুমি তা নিক্ষেপ করনি, বরং আল্লাহই তা নিক্ষেপ করেছিলেন।”

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বদরের দিন স্বীয় হাত দু'টি উঠিয়ে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করেনঃ “হে আল্লাহ! যদি এই মুষ্টিপূর্ণ লোকগুলো মরে যায় তবে আপনার নাম নেয়ার আর কে থাকবে?” তখন হযরত জিবরাঈল (আঃ) তাঁর কাছে হাযির হয়ে বললেনঃ “মুষ্টিপূর্ণ মাটি এই কাফিরদের প্রতি নিক্ষেপ করুন!” তিনি ঐরূপই করেন। এর ফলে কাফিরদের নাক, মুখ ও চোখ মাটিতে ভরে যায় এবং তারা ঐ ধূলিঝড়ে আতংকিত হয়ে পশ্চাদপদে পালিয়ে যায়। এইভাবে তাদের পরাজয় ঘটে। মুসলমানরা তাদেরকে হত্যা করতে করতে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করেন এবং বন্দী করে ফেলেন। কাফিরদের এই পরাজয় রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর মু'জিযার কারণেই ঘটেছিল।

আব্দুর রহমান ইবনে যায়েদ (রঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) তিনটি কংকর নিয়েছিলেন। একটি তিনি সামনে নিক্ষেপ করেছিলেন, একটি নিক্ষেপ করেছিলেন শত্রুদের ডান দিকে এবং একটি বাম দিকে। এটা হচ্ছে বদরের দিনের ঘটনা। রাসূলুল্লাহ (সঃ) এরূপ কাজ হুনায়েনের যুদ্ধেও করেছিলেন। হযরত হাকীম ইবনে হিযাম (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ “বদরের দিন আমরা আকাশ থেকে একটা শব্দ পতিত হতে শুনতে পাই, মনে হচ্ছিল যেন ওটা থালায় কংকর পতনের শব্দ। ওটা ছিল রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর মুষ্টি হতে কংকর নিক্ষেপের শব্দ।

শেষ পর্যন্ত কাফিরদের পরাজয় ঘটে।" এখানে আরো দু'টি উক্তি রয়েছে যা অত্যন্ত গারীব বা দুর্বল। উক্তি দু'টি নিম্নে দেয়া হলোঃ

(১) আব্দুর রহমান ইবনে জুবাইর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) একটি কামান আনতে বলেন। কামানটি ছিল খুবই লম্বা। অতঃপর তিনি আরেকটি কামান আনবার নির্দেশ দেন। তখন অন্য একটি কামান আনয়ন করা হয়। রাসূলুল্লাহ (সঃ) ওটার মাধ্যমে দুর্গের দিকে একটি তীর নিক্ষেপ করেন। তীরটি ঘুরতে ঘুরতে চললো এবং গোত্রপতি ইবনে আবি হাকীকের গায়ে লেগে গেল। সেই সময় সে দুর্গের মধ্যে বিছানায় শায়িত ছিল। এটাকে ভিত্তি করেই আল্লাহ পাক ...... وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ -এই আয়াতটি অবতীর্ণ করেন। এ হাদীসটি অতি দুর্বল। হয়তো বর্ণনাকারী সন্দেহের মধ্যে পতিত হয়েছেন, অথবা ভাবার্থ এই যে, এই আয়াতটি সাধারণ এবং এই ঘটনাটিও এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তা না হলে এটা তো স্পষ্ট কথা যে, সূরা আনফালের এ আয়াতটির মধ্যে বদরের যুদ্ধের বর্ণনা রয়েছে। তাহলে এই ঘটনাটি ঐ বদর যুদ্ধের ঘটনাই হবে। আর এটা সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার কথা। এসব ব্যাপারে আল্লাহ পাকই সবচেয়ে ভাল জানেন।

(২) সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব (রঃ) এবং যুহরী (রঃ) বলেন যে, উহুদ যুদ্ধের দিন উবাই ইবনে খালফকে লক্ষ্য করে নবী (সঃ) একটি বর্শা নিক্ষেপ করেছিলেন। লোকটি লৌহবর্ম পরিহিত ছিল। কিন্তু বর্শা ফলকটি তার তালুতে বিঁধে যায় এবং এর ফলে সে অশ্বপৃষ্ঠ হতে পড়ে যায়। এর কয়েকদিন পরেই সে ঐ ব্যাথায় জর্জরিত হয়ে মারা যায়। সে এই পার্থিক শাস্তি ছাড়াও পারলৌকিক শাস্তিরও যোগ্য হয়ে গেল। এই দুই ইমাম হতে এ ধরনের বর্ণনা খুবই গারীব বা দুর্বল। সম্ভবতঃ এই দুই মনীষীর উদ্দেশ্য এই হবে যে, আয়াতটি সাধারণ, কোন নির্দিষ্ট ঘটনার সাথে এটা সম্পর্কযুক্তই নয়। বরং প্রত্যেক ঘটনাই এই আয়াতের সাথে সম্পর্কযুক্ত হতে পারে।

وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِيْنَ مِنْهُ بَلَاۤءً حَسَنًا অর্থাৎ যেন মুমিনরা আল্লাহর এই নিয়ামত সম্পর্কে অবহিত হয় যে, শত্রুদের সংখ্যা তাদের চেয়ে বহু বেশী হওয়া সত্ত্বেও তিনি তাদেরকে শত্রুদের উপর জয়যুক্ত করলেন এবং এরপর হয়তো তারা তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। হাদীসে রয়েছে– "আল্লাহ আমাদেরকে উত্তমরূপে পরীক্ষা করেছেন।"

اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ অর্থাৎ নিশ্চয়ই আল্লাহ (প্রার্থনা) শ্রবণকারী এবং (কে তাঁর সাহায্য পাওয়ার যোগ্য এবং কে নয় এ) সবকিছু জানেন।

ذٰلِكُمْ وَ اَنَّ اللّٰهَ مُوْهِنُ كَيْدِ الْكٰفِرِيْنَ আর এমনিভাবেই আল্লাহ কাফিরদের চক্রান্ত দুর্বল ও নস্যাৎকারী। এটা হচ্ছে সাহায্য লাভের দ্বিতীয় সুসংবাদ। আল্লাহ পাক বলেন যে, তিনি কাফিরদের চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থতায় পর্যবসিতকারী। আর ভবিষ্যতেও তিনি তাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন এবং ধ্বংস করে দিবেন।

১৯-اِنْ تَسْتَفْتِحُوْا فَقَدْ جَآءَكُمُ الْفَتْحُ وَاِنْ تَنْتَهُوْا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاِنْ تَعُوْدُوْا نَعُدْ وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَّلَوْ كَثُرَتْ وَاَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

১৯। (হে কাফিরগণ!) তোমরা তো সত্যের বিজয় চাচ্ছ, বিজয় তো তোমাদের সামনেই এসেছে, তোমরা যদি এখনো (মুসলমানদের অনিষ্টকরণ হতে) বিরত থাকো, তবে তা তোমাদের পক্ষেই কল্যাণকর, আর যদি পুনরায় তোমরা এ হেন কাজ কর তবে আমিও তোমাদেরকে পুনরায় শাস্তি দিবো, আর তোমাদের বিরাট বাহিনী তোমাদের কোনই উপকারে আসবে না, নিঃসন্দেহে আল্লাহ মুমিনদের সাথে রয়েছেন।

এখানে আল্লাহ তা'আলা কাফিরদেরকে সম্বোধন করে বলছেনঃ তোমরা তো এটাই চাচ্ছিলে যে, আল্লাহ তা'আলা যেন তোমাদের মধ্যে ও মুসলমানদের মধ্যে ফায়সালা করে দেন। সুতরাং তোমরা যা প্রার্থনা করছিলে তাই হয়েছে। আবূ জেহেল বলেছিলঃ "হে আল্লাহ! যারা আমাদের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে এবং আমাদের সামনে এমন কথা পেশ করেছে যা আমাদের জানা নেই, আগামীকাল সকালে আপনি তাদেরকে লাঞ্ছিত করুন!" তখন اِنْ تَسْتَفْتِحُوْا فَقَدْ جَآءَكُمُ الْفَتْحُ -এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।[১] সুদ্দী (রঃ) বলেন যে, মুশরিকরা বদর যুদ্ধের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়ার প্রাক্কালে কা'বা ঘরের গেলাফ ধরে প্রার্থনা করে– "হে

১. এটা ইমাম আহমাদ (রঃ), ইমাম নাসাঈ (রঃ) এবং ইমাম হাকিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন যে, ইমাম বুখারী (রঃ) ও ইমাম মুসলিম (রঃ) -এর শর্তের উপর এটা সহীহ। তাঁরা দু'জন এটাকে তাখরীজ করেননি।

আল্লাহ! এই দুই দলের মধ্যে (মুসলিম দল ও কাফির দল) যে দলটি আপনার নিকট উত্তম এবং যে দলের কিবলা হচ্ছে উত্তম কিবলা, সেই দলকে আপনি সাহায্য করুন!” তাই, আল্লাহ পাক বলেনঃ “তোমরা যা বলেছিলে আমি তাই করেছি। আমি মুহাম্মাদ (সঃ)-এর দলকে সাহায্য করেছি। এটাই আমার কাছে উত্তম দল।” অতঃপর মহান আল্লাহ বলেনঃ

وَ اِنْ تَنْتَهُوْا فَهُوَ خَيْرٌلَّكُمْ وَ اِنْ تَعُوْدُوْا نَعُدْ

অর্থাৎ যদি তোমরা (মুসলমানদের ক্ষতি করা হতে) বিরত থাকো তবে তা তোমাদের পক্ষেই কল্যাণকর হবে। আর যদি পুনরায় তোমরা এ হেন কাজ কর তবে আমিও তোমাদেরকে পুনরায় শাস্তি প্রদান করবো, আর জেনে রেখো যে, তোমাদের বিরাট বাহিনী তোমাদের কোনই উপকার করতে পারবে না। কেননা আল্লাহ যাকে সাহায্য করেন তার উপর কে জয়যুক্ত হতে পারে?

اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনদের সাথেই রয়েছেন। আর এটাই হচ্ছে হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা (সঃ)-এর দল।

٢٠- يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَ لَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَ اَنْتُمْ تَسْمَعُوْنَ ۝ ۚ

২০। হে মুমিনগণ! আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ)-এর আনুগত্য কর, তোমরা যখন তাঁর কথা শুনছো তখন তোমরা তাঁর আনুগত্য হতে মুখ ফিরিয়ে নিয়ো না।

٢١- وَ لَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ قَالُوْا سَمِعْنَا وَ هُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ ۝

২১। তোমরা ঐ সব লোকের মত হয়ো না, যারা বলে– আমরা আপনার কথা শুনলাম, কার্যতঃ তারা কিছুই শোনে না।

٢٢- اِنَّ شَرَّ الدَّوَآبِّ عِنْدَ اللّٰهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ ۝

২২। আল্লাহর কাছে নিকৃষ্টতম জীব হচ্ছে ঐ সব মূক ও বধির লোক, যারা কিছুই বুঝে না (অর্থাৎ বিবেক বুদ্ধিকে কাজে লাগায় না)।

২৩। আল্লাহ যদি জানতেন যে, তাদের মধ্যে কল্যাণকর কিছু নিহিত রয়েছে তবে অবশ্যই তিনি তাদেরকে শুনবার তাওফীক দিতেন, তিনি যদি তাদেরকে শুনাতেনও তবুও তারা উপেক্ষা করতঃ মুখ ফিরিয়ে অন্য দিকে চলে যেতো।

٢٣- وَلَوْ عَلِمَ اللّٰهُ فِيْهِمْ خَيْرًا لَّاَسْمَعَهُمْ وَلَوْ اَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَّهُمْ مُّعْرِضُوْنَ

এখানে মুমিনদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ)-এর আনুগত্য করার এবং বিরোধিতা করা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। আর তাদেরকে বলা হচ্ছে যে, তারা যেন কাফিরদের সাথে সাদৃশ্য স্থাপন না করে। এ জন্যেই মহান আল্লাহ বলেনঃ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ অর্থাৎ 'তোমরা তাঁর আনুগত্য হতে মুখ ফিরিয়ে নিয়ো না।'

وَاَنْتُمْ تَسْمَعُوْنَ অর্থাৎ অথচ তোমরা জানছো যে, নবী (সঃ) তোমাদেরকে কোন্ কথার দিকে আহ্বান করছেন! আর তোমরা ঐ লোকদের মত হয়ো না যারা বলে– আমরা আপনার কথা শুনলাম, অথচ কার্যতঃ তারা কিছুই শোনে না। কেউ কেউ বলেন যে, এর দ্বারা মুনাফিকদেরকে বুঝানো হয়েছে। তাদের রীতিনীতি এই ছিল যে, তারা মুখে বলতো– আমরা শুনলাম ও কবূল করলাম। কিন্তু আসলে তারা কিছুই শুনতো না।

এরপর জানিয়ে দেয়া হচ্ছে যে, এই প্রকারের আদম সন্তানরা হচ্ছে নিকৃষ্টতম জীব। চতুষ্পদ জন্তু ও প্রাণীদের মধ্যে ওরাই হচ্ছে নিকৃষ্টতম যারা সত্য কথা শোনার ব্যাপারে বধির ও সত্য কথা বলার ব্যাপারে মূক। তারা কোন জ্ঞানই রাখে না। কেননা, তারা সত্য কথা মোটেই বুঝে না। এরা নিকৃষ্টতম প্রাণী, এরাই কাফির। চতুষ্পদ জন্তু যে প্রকৃতিতে সৃষ্ট হয়েছে ওরা ঐ ভাবেই চলাফেরা করে, কাজেই তারা যেন আল্লাহর অনুগত। কিন্তু মানুষ তো প্রকৃতিগতভাবে ইবাদতের জন্যে সৃষ্ট হয়েছে, অথচ তারা কুফরী করতে রয়েছে। অতএব প্রকৃতির বিপরীতরূপে চলার কারণে তারা চতুষ্পদ জন্তুর চেয়েও নিকৃষ্ট। এ জন্যেই তাদেরকে চতুষ্পদ জন্তুর সাথে তুলনা করা হয়েছে। আল্লাহ পাক বলেনঃ "কাফিরদের দৃষ্টান্ত ঐ জানোয়ারগুলোর মত যারা আহ্বানকারীদের উদ্দেশ্য

কিছুই বুঝে না, শুধু শব্দ শুনে থাকে।" আর এক জায়গায় বলেছেনঃ "বরং এই কাফিররা চতুষ্পদ জন্তুর চেয়েও নিকৃষ্ট, এরাই হচ্ছে সীমাহীন গাফেল।" বলা হয়েছে যে, এর দ্বারা কুরায়েশের বানু আবদিদ দারের লোকদেরকে বুঝানো হয়েছে। কারো কারো ধারণায় এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে মুনাফিকরা। কিন্তু মুশরিক ও মুনাফিকদের পার্থক্য কিছুই নেই। কেননা, এই দু'দলই হচ্ছে জ্ঞান-বিবেকহীন লোক। ভাল কাজ করার মত কোন যোগ্যতাই তাদের মধ্যে নেই। এরপর ইরশাদ হচ্ছে– "আল্লাহ যদি জানতেন যে, তাদের মধ্যে কল্যাণকর কিছু নিহিত রয়েছে তবে অবশ্যই তিনি তাদেরকে শুনবার (ও বুঝবার) তাওফীক দিতেন।" অন্তর্নিহিত কথা এই যে, যেহেতু তাদের মধ্যে কোন মঙ্গলই নিহিত নেই সেহেতু তারা কিছুই বুঝে না। আর যদি মহান আল্লাহ তাদেরকে শুনানও তবুও এই হতভাগারা সরল সোজা পথ অবলম্বন করবে না বরং তখনো তারা উপেক্ষা করতঃ মুখ ফিরিয়ে নিবে।

২৪। হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ ও রাসূল (সঃ)-এর হুকুম তামিল করো যখন রাসূল তোমাদেরকে তোমাদের জীবন সঞ্চারক বস্তুর দিকে আহ্বান করে, আর জেনে রেখো যে, আল্লাহ মানুষ ও তার অন্তরের মধ্যস্থলে অন্তরায় হয়ে থাকেন, পরিশেষে তাঁর কাছেই তোমাদেরকে সমবেত করা হবে।

٢٤- يَايُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيْكُمْ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَحُوْلُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهٖ وَاَنَّهٗٓ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ○

আল্লাহ পাক বলেনঃ হে মুমিনগণ! তোমাদেরই সংশোধনের উদ্দেশ্যে যখন নবী (সঃ) তোমাদেরকে আহ্বান করেন তখন তোমরা অতিসত্বর সাড়া দাও এবং হুকুম পালন কর। আবূ সাঈদ ইবনে মাআ'ল্লা (রাঃ) বলেন, আমি একদা নামায পড়ছিলাম, এমন সময় নবী (সঃ) আমার পার্শ্ব দিয়ে গমন করেন। তিনি আমাকে ডাক দেন, কিন্তু আমি নামাযে থাকায় সাথে সাথে তাঁর কাছে যেতে পারলাম না। নামায শেষে তাঁর কাছে পৌঁছলে তিনি আমাকে বলেন, তুমি এতক্ষণ আসনি কেন? আল্লাহ কি তোমাদেরকে বলেননি– "হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ ও

রাসূল (সঃ)-এর হুকুম পালন কর যখন রাসূল (সঃ) তোমাদেরকে তোমাদের জীবন সঞ্চারক বস্তুর দিকে আহ্বান করে?” অতঃপর তিনি আমাকে বলেনঃ “আমি এখান থেকে চলে যাওয়ার পূর্বে তোমাকে কুরআনের একটি মহা সম্মানিত সূরা শিখিয়ে দেবো।” এর পর তিনি যাওয়ার উদ্যোগ করলে আমি তাঁকে ঐ কথা স্মরণ করিয়ে দিলাম।” মোটকথা, এখানে আল্লাহ ও রাসূল (সঃ)-এর নির্দেশ সত্বর পালনের হুকুম দেয়া হয়েছে। অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, এটা হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ)-এর ঘটনা। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছিলেন যে, ঐ সূরাটি হচ্ছে সূরায়ে ফাতেহা। অতঃপর তিনি বলেনঃ “এটাই হচ্ছে سَبْعُ مَّثَانِيْ অর্থাৎ সাতটি আয়াত যা নামাযে সদা পুনরাবৃত্তি করা হয়।” এই হাদীসের বর্ণনা সূরায়ে ফাতেহার তাফসীরে দেয়া হয়েছে। মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, لِمَا يُحْيِيْكُمْ -এর অর্থ হচ্ছে ‘সত্যের খাতিরে’। কাতাদা (রঃ) বলেন যে, এটাই হচ্ছে কুরআন যাতে মুক্তি, স্থায়িত্ব এবং জীবন রয়েছে। সুদ্দী (রঃ) বলেন যে, ইসলাম গ্রহণের মধ্যেই জীবন রয়েছে এবং কুফরীর মধ্যে রয়েছে মৃত্যু। অথবা ভাবার্থ হচ্ছে– যখন নবী (সঃ) তোমাদেরকে সেই জিহাদের দিকে আহ্বান করেন যার মাধ্যমে তোমরা মর্যাদা লাভ করেছো, অথচ এর পূর্বে তোমরা দুর্বল ছিলে, অতঃপর আল্লাহ তোমাদেরকে শক্তিশালী করেছেন এবং তোমরা কাফিরদের কাছে পরাজিত হয়েছিলে, যার পর তিনি তোমাদেরকে তাদের উপর বিজয় দান করেছেন, তখন তোমরা তাড়াতাড়ি তাঁর ডাকে সাড়া দাও এবং হুকুম পালন কর।

আল্লাহ পাকের উক্তিঃ وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ يَحُوْلُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ قَلْبِهٖ অর্থাৎ জেনে রেখো যে, আল্লাহ মানুষ ও তার অন্তরের মাঝে আড়াল হয়ে রয়েছেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, তিনি আড়াল হয়ে আছেন মুমিন ও কুফরীর মাঝে এবং কাফির ও ঈমানের মাঝে। মুমিনকে তিনি কুফরী করতে দেন না এবং কাফিরকে ঈমান আনতে দেন না।[১] সুদ্দী (রঃ) বলেনঃ “এর অর্থ হচ্ছে– কেউই এই ক্ষমতা রাখে না যে, তাঁর অনুমতি ছাড়া ঈমান আনে বা কুফরী করে।” কাতাদা (রঃ) বলেন যে, এই আয়াতটি نَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ (৫০ঃ ১৬) -এই আয়াতটির মতই। এর সাথে সাদৃশ্যযুক্ত বহু হাদীস রয়েছে।

১. এটাই হচ্ছে মুজাহিদ (রঃ), ইকরামা (রঃ), যহহাক (রঃ), আতিয়্যা এবং মুকাতিল (রঃ)-এরও উক্তি। মুজাহিদ (রঃ)-এর এক রিওয়ায়াতে আছে যে, يَحُوْلُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ قَلْبِهٖ অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত তিনি তাকে এমন অবস্থায় ছেড়ে দেন যে, সে কিছুই বুঝতে পারে না।

হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলতেন– يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِىْ عَلٰى دِيْنِكَ অর্থাৎ "হে অন্তরকে পরিবর্তনকারী! আমার অন্তরকে আপনার দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখুন!" (হযরত আনাস রাঃ তখন বলেন) আমরা বললামঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমরা আপনার উপর এবং কুরআনের উপর ঈমান এনেছি। আমাদের ব্যাপারে আপনার কোন সন্দেহ রয়েছে কি?" তিনি উত্তরে বললেনঃ "হ্যাঁ কেননা এতে বিস্ময়ের কিছুই নেই যে, তোমাদের পরিবর্তন ঘটে যাবে। কারণ, মানুষের অন্তর আল্লাহ তা'আলার দু' অঙ্গুলির মাঝে রয়েছে। তিনি যখন ইচ্ছা করবেন তখন বদলিয়ে দিবেন।"

হযরত নাওয়াস ইবনে সামআ'ন (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলতেন– "প্রত্যেক অন্তর আল্লাহর দু'টি অঙ্গুলির মধ্যভাগে রয়েছে। আল্লাহ যখন ওটাকে সোজা রাখার ইচ্ছা করেন তখন তা সোজা থাকে। আর যখন বাঁকা করে দেয়ার ইচ্ছা করেন তখন তা বাঁকা হয়ে যায়।" অতঃপর তিনি বলেনঃ "মীযান আল্লাহর হাতে রয়েছে। ইচ্ছা করলে তিনি ওকে হালকা করে দিবেন এবং ইচ্ছা করলে ভারী করবেন।"[১]

হযরত উম্মু সালমা (রাঃ) বলেনঃ "আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! অন্তর কি পরিবর্তিত হয়?" তিনি উত্তরে বললেনঃ হ্যাঁ, আল্লাহ ইচ্ছা করলে মানুষের অন্তর সোজা রাখেন এবং ইচ্ছা করলে বাঁকা করে দেন। এ জন্যেই আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি–

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ -

অর্থাৎ "হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে হিদায়াত দানের পর আমাদের অন্তরগুলোকে বাঁকা করবেন না এবং আপনার নিকট থেকে আমাদেরকে করুণা দান করুন! নিশ্চয়ই আপনি বড় দাতা।" (৩ঃ ৮) আমি বললামঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমাকে এমন একটি দুআ' শিখিয়ে দিন যার মাধ্যমে আমি নিজের জন্যে প্রার্থনা করবো।" তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ

اَللّٰهُمَّ رَبَّ النَّبِىِّ مُحَمَّدٍ اِغْفِرْلِىْ ذَنْبِىْ وَ اَذْهِبْ غَيْظَ قَلْبِىْ وَ اَجِرْنِىْ مِنْ مُّضِلَّاتِ الْفِتَنِ مَا اَحْيَيْتَنِىْ -

১. এ হাদীসটি ইমাম নাসাঈ (রঃ) ও ইমাম ইবনে মাজাহ্ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

অর্থাৎ "হে আল্লাহ! হে নবী মুহাম্মাদ (সঃ)-এর প্রতিপালক! আমার গুনাহ্ মার্জনা করুন, আমার অন্তরের ক্রোধ দূরীভূত করুন এবং যতদিন আমাকে জীবিত রাখবেন ততদিন আমাকে বিভ্রান্তিকর ফিৎনা হতে বাঁচিয়ে রাখুন!"

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছেনঃ "বানী আদমের অন্তরগুলো আল্লাহর দু'টি অঙ্গুলির মাঝে একটি অন্তরের ন্যায়। তিনি যেভাবে চান সেভাবেই ওগুলোকে ফিরিয়ে থাকেন।" অতঃপর তিনি বলেনঃ اَللّٰهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوْبِ صَرِّفْ قُلُوْبَنَا اِلٰى طَاعَتِكَ অর্থাৎ "হে আল্লাহ! হে অন্তরগুলোকে পরিবর্তনকারী! আমাদের অন্তরগুলোকে আপনার আনুগত্যের দিকে ফিরিয়ে দিন।"

২৫। তোমরা সেই ফিৎনাকে ভয় কর যা তোমাদের মধ্যকার যালিম ও পাপিষ্ঠদেরকেই বিশেষভাবে ক্লিষ্ট করবে না (বরং সবারই মধ্যে ওটা সংক্রামিত হয়ে পড়বে এবং সবকেই বিপদগ্রস্ত করবে), তোমরা জেনে রেখো যে, আল্লাহ শাস্তিদানে খুব কঠোর।

২٥- وَاتَّقُوْا فِتْنَةً لَّا تُصِيْبَنَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْكُمْ خَاۤصَّةً وَّ اعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ○

এখানে মুমিনদেরকে পরীক্ষা থেকে ভয় প্রদর্শন করা হচ্ছে যে, আল্লাহর পরীক্ষা পাপী ও নেককার সবারই উপর পতিত হবে। এই পরীক্ষা শুধু পাপীদের উপর নির্দিষ্ট নয়। হযরত যুবাইর (রাঃ)-কে বলা হয়েছিল– "হে আবূ আব্দিল্লাহ (রাঃ)! আমীরুল মুমিনীন হযরত উসমান (রাঃ)-কে হত্যা করা হয়েছে। এভাবে আপনারা তাঁকে হারিয়ে ফেলেছেন। অতঃপর এখন তাঁর খুনের দাবীদার হচ্ছেন! খুনের যদি দাবীদারই হবেন তবে তাঁকে নিহত হতে দিলেন কেন?" হযরত যুবাইর (রাঃ) উত্তরে বলেছিলেনঃ "এটা ছিল আল্লাহর পরীক্ষা যার মধ্যে আমরা জড়িয়ে পড়েছি। আমরা নবী (সঃ), আবূ বকর (রাঃ), উমার (রাঃ) এবং উসমান (রাঃ)-এর যমানায় কুরআন কারীমের وَاتَّقُوْا فِتْنَةً لَّا تُصِيْبَنَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْكُمْ خَاۤصَّةً -এ আয়াতটি পাঠ করতাম। কিন্তু তখন আমাদের ধারণাও ছিল না যে, আমরাও এর মধ্যে পতিত হবো। শেষ পর্যন্ত ঐ পরীক্ষা আমাদের উপর এসে

পড়েছে এবং মুসলমানদের দু'টি দল পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে। হযরত উসমান (রাঃ)-এর হত্যাকে কেন্দ্র করেই এই পরীক্ষার সূচনা হয়েছে।"[১]

হযরত হাসান বসরী (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, এই আয়াতটি হযরত আলী (রাঃ), হযরত আম্মার (রাঃ), হযরত তালহা (রাঃ) এবং যুবাইর (রাঃ)-এর ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। হযরত যুবাইর (রাঃ) বর্ণনা করেনঃ "আমরা সদা সর্বদা এ আয়াতটি পাঠ করতাম। কিন্তু এটা যে আমাদের উপরই সত্যরূপে প্রমাণিত হবে তা আমরা জানতাম না।" সুদ্দী (রঃ)-এর ধারণা এই যে, এ আয়াতটি বিশেষভাবে আহ্‌লে বদরের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। উষ্ট্রের যুদ্ধে তাঁদের উপরই এটা সত্যরূপে প্রমাণিত হয় এবং তাঁদের পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ বেঁধে যায়। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর ধারণা মতে এর দ্বারা উদ্দেশ্য শুধু নবী (সঃ)-এর সাহাবীবর্গ। ইবনে আব্বাস (রাঃ) এই আয়াতের তাফসীরে বলেনঃ "মুমিনদের উপর নির্দেশ রয়েছে– পাপকে তোমরা নিজেদের মধ্যে আসতে দিয়ো না। যেখানেই কাউকেও কোন অসৎ কার্যে লিপ্ত দেখতে পাও, সত্বরই তাকে তা থেকে বিরত রাখো। নতুবা শাস্তি সবার উপরই আসবে।" এটাই উত্তম তাফসীর! মুজাহিদ (রঃ) বলেনঃ "এ হুকুম তোমাদের জন্যেও বটে।" হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেনঃ তোমাদের প্রত্যেকেই এই পরীক্ষায় পতিত হবে। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَ أَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ

অর্থাৎ "নিশ্চয়ই তোমাদের মালধন ও সন্তান সন্ততি হচ্ছে পরীক্ষা।" (৬৪ঃ ১৫) সুতরাং তোমাদের সকলেরই ফিৎনার বিভ্রান্তি থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা উচিত। কেননা, এই ভয় প্রদর্শন সাহাবা ও গায়ের সাহাবা সবার উপরই রয়েছে। তবে এটা সঠিক কথা যে, এর দ্বারা সাহাবীদেরকেই সম্বোধন করা হয়েছে। এই হাদীসটি ফিৎনা ও পরীক্ষাকে ভয় করার কথাই প্রমাণ করছে। এগুলো ইনশাআল্লাহ পৃথক পুস্তকে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হবে, যেমন ইমামগণও পৃথক পুস্তকের আকারে এই কাজ আঞ্জাম দিয়েছেন। এখানে বিশেষভাবে যেটা আলোচনা করা হয়েছে তা এই যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলতেনঃ "মহামহিমান্বিত আল্লাহ বিশেষ বিশেষ লোকের আমলের কারণে সর্ব-সাধারণের উপর শাস্তি নাযিল করেন না। কিন্তু যখন বিশিষ্ট লোকগুলো কওমের মধ্যে গর্হিত কাজকর্ম ছড়ানো অবস্থায় দেখতে পায় এবং ওগুলো বন্ধ করার ক্ষমতা থাকা

১. এটা ইমাম আহমাদ (রঃ) ও বায্যার (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

সত্ত্বেও বন্ধ করে না এবং লোকদেরকে ঐসব কাজ করতে বাধা দেয় না তখন শাস্তি সাধারণভাবে এসে পড়ে এবং বিশিষ্ট ও সাধারণ সবাই ঐ শাস্তির শিকারে পরিণত হয়।"[১]

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "আল্লাহর শপথ! যে পর্যন্ত তোমরা ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করতে থাকবে সেই পর্যন্ত তোমাদের উপর শাস্তি আসবে না। আর যখন তোমরা মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করা ছেড়ে দেবে এবং ভাল কাজের প্রতি উৎসাহ প্রদান থেকে বিরত থাকবে তখন আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর কঠিনতম শাস্তি অবতীর্ণ করতে পারেন। অতঃপর তোমরা লক্ষবার দুআ' করলেও সেই দুআ' কবূল হবে না। অথবা আল্লাহ তোমাদের উপর অন্য কওমকে বিজয়ী করবেন। এরপর তোমাদের সমস্ত দুআ' বিফল হয়ে যাবে।"[২]

আবূ রাকাদ (রঃ) বলেন, আমি আমার এক গোলামকে হযরত হুযাইফা (রাঃ)-এর নিকট পাঠালাম। সেই সময় তিনি বলেছিলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর যুগে কেউ এ ধরনের একটি মাত্র কথা বললেও তাকে মুনাফিক মনে করা হতো। কিন্তু আজ এক মজলিসে তোমাদের কোন একজনের মুখ থেকে আমি এরূপ চারটি কপটতাপূর্ণ কথা শুনতে পাচ্ছি! তোমাদের পক্ষে উচিত এই যে, তোমরা ভাল কাজের আদেশ করবে, মন্দ কাজ থেকে সত্বর বাধা দিবে এবং মানুষকে ভাল কাজে উৎসাহিত করবে। নতুবা তোমরা সবাই শাস্তিতে গ্রেফতার হয়ে যাবে অথবা এই ধরনের শাস্তি হবে যে, দুষ্ট লোককে তোমাদের উপর শাসনকর্তা বানিয়ে দেয়া হবে। অতঃপর ভাল লোকেরা লাখবার দুআ' করলেও তা বিফলে যাবে।

হযরত আমের (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি নু'মান ইবনে বাশীর (রাঃ)-কে ভাষণ দিতে শুনেছি, তিনি নিজের দু'টি অঙ্গুলি দ্বারা নিজের কানের দিকে ইশারা করছিলেন এবং বলছিলেন– আল্লাহর হুদূদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি এবং আল্লাহর হুদূদকে লংঘনকারী অথবা তাতে অবহেলা প্রদর্শনকারী ব্যক্তির দৃষ্টান্ত এইরূপ যে, কতকগুলো লোক নৌকায় চড়ে আছে। উপরের লোকেরা নীচের লোকদের কষ্টের কারণ হয়ে গেছে এবং নীচের লোকেরা উপরের

১. এটা ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। ইবনে কাসীর (রঃ) বলেন যে, সুনানের কিতাবগুলোতে কেউই এটাকে তাখরীজ করেননি।

২. এ হাদীস দু'টি হযরত হুযাইফা ইবনে ইয়ামান (রাঃ) এবং হযরত ইসমাঈল ইবনে জা'ফর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন।

লোকদেরকে কষ্ট দিচ্ছে। অর্থাৎ নীচের লোকদের পানির প্রয়োজন হওয়ায় তারা পানি আনার জন্যে উপরে গেল। কিন্তু এর ফলে উপরের লোকদের কষ্ট হতে লাগলো। তাই ঐ নীচের লোকেরা বলাবলি করলো– যদি আমরা নৌকার নীচের দিক থেকেই কোন তক্তা সরিয়ে দিয়ে পানির পথ করে দেই তবে উপরের লোকদের কোন কষ্ট হবে না। এর ফল তো জানা কথা যে, নৌকায় পানি উঠার কারণে নৌকার আরোহীরা সবাই ডুবে মরবে। সুতরাং নৌকায় ছিদ্র করা থেকে তাদেরকে বাধা দেয়া উচিত। অনুরূপভাবে এই পাপীদেরকে যদি তোমরা পাপকাজে বাধা না দিয়ে ঐ অবস্থাতেই ছেড়ে দাও তবে নৌকায় আরোহীদের মত তোমরা সবাই ধ্বংস হয়ে যাবে, যদিও নৌকার উপরের আরোহীদের মত তোমাদের কোন দোষ নেই। কিন্তু এটা এরই শাস্তি যে, তোমরা পাপ কাজ থেকে বাধা প্রদান করনি।[১]

উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি আল্লাহর রাসূল (সঃ)-কে বলতে শুনেছি– "আমার উম্মতের মধ্যে পাপ যখন সাধারণভাবে প্রকাশ পাবে তখন আল্লাহ সাধারণভাবে শাস্তি পাঠাবেন।" তখন আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! তাদের মধ্যে সৎ লোক থাকলেও কি? তিনি উত্তরে বললেনঃ "হ্যাঁ, তারাও শাস্তিতে জড়িয়ে পড়বে। কিন্তু (মৃত্যুর পর) তারা আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তুষ্টি লাভ করবে।"[২] অন্য একটি বর্ণনায় আছে– "কোন কওম পাপ কাজ করতে রয়েছে, আর তাদের মধ্যে কতকগুলো এমন লোকও রয়েছে যারা সম্ভ্রান্ত, তারা নিজেরা সেই পাপকার্যে লিপ্ত নয় বটে, কিন্তু তারা সেই কাজে বাধা প্রদান করে না, তখন আল্লাহ তাদের উপর সাধারণভাবে শাস্তি দিয়ে থাকেন।"

হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন– "যখন ভূ-পৃষ্ঠে পাপকার্য প্রকাশ পাবে তখন আল্লাহ দুনিয়াবাসীর উপর তাঁর শাস্তি নাযিল করবেন।" আমি জিজ্ঞেস করলাম, তাদের মধ্যে আল্লাহর অনুগত বান্দারাও থাকবে কি? তিনি উত্তরে বললেনঃ "হ্যাঁ, তবে (মৃত্যুর পর) তারা আল্লাহর করুণা লাভ করবে।"[৩]

১. এটা ইমাম বুখারী (রঃ) ও ইমাম তিরমিযী (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

২. এটা ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

৩. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) তাখরীজ করেছেন।

২৬। (সেই মর্মান্তিক মুহূর্তটির কথা) তোমরা স্মরণ কর, যখন তোমরা ভূ-পৃষ্ঠে খুব দুর্বলরূপে পরিগণিত হতে, আর তোমরা এই শংকায় নিপতিত থাকতে যে, লোকেরা অকস্মাৎ তোমাদেরকে ধরে নিয়ে যাবে, সুতরাং (এই অবস্থায়) আল্লাহই তোমাদেরকে (মদীনায়) আশ্রয় দেন, এবং স্বীয় সাহায্য দ্বারা তোমাদেরকে শক্তিশালী করেন, আর পবিত্র বস্তু দ্বারা তোমাদের জীবিকা দান করেন, যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

٢٦- وَاذْكُرُوْٓا اِذْ اَنْتُمْ قَلِيْلٌ
مُّسْتَضْعَفُوْنَ فِي الْاَرْضِ
تَخَافُوْنَ اَنْ يَّتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ
فَاٰوٰىكُمْ وَاَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهٖ وَ
رَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ لَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُوْنَ ○

আল্লাহ তা'আলা ঐ নিয়ামতরাজির কথা বলেছেন যা মুমিনদের উপর করা হয়েছে যে, তারা সংখ্যায় কম ছিল, তাদের সংখ্যা তিনি বাড়িয়ে দিয়েছেন। তারা দুর্বল ছিল ও ভীত সন্ত্রস্ত ছিল, তিনি তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন। তাদের ভয়ের কারণগুলো দূর করে দিয়েছেন। তারা গরীব ও ফকির ছিল, তিনি তাদেরকে পবিত্র জীবিকা দান করেছেন। তাদেরকে তিনি কৃতজ্ঞ বান্দা বানিয়েছেন। তারা অনুগত বান্দারূপে পরিগণিত হয়েছে। প্রতিটি কাজে তারা বাধ্য ও অনুগত হয়ে গেছে। এই ছিল মুমিনদের অবস্থা, যখন তারা মক্কায় ছিল এবং সংখ্যায় খুবই কম ছিল। তারা ছিল অত্যন্ত দুর্বল। মুশরিক, মাজুসী, রুমী সবাই তাদেরকে তাদের সংখ্যার স্বল্পতা ও শক্তিহীনতার কারণে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল। সব সময় তাদের এই ভয় ছিল যে, আকস্মিকভাবে তাদেরকে ধরে নিয়ে যাওয়া হবে। কিছুকাল পর্যন্ত তাদের এই অবস্থাই ছিল। অতঃপর তাদেরকে মদীনায় হিজরত করার নির্দেশ দেন। সেখানে তারা আশ্রয় লাভ করে। মদীনার লোকেরা তাদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। বদর ও অন্যান্য যুদ্ধে তাদের সাথে অংশগ্রহণ করে। জান ও মাল তাদের উপর কুরবান করে দেয়। কেননা, তারা চাচ্ছিল আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ)-এর আনুগত্য করতে।

وَاذْكُرُوا اِذْ اَنْتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُوْنَ فِى الْاَرْضِ -এ সম্পর্কে কাতাদা (রঃ) বলেন যে, আরবে এই লোকগুলো অত্যন্ত লাঞ্ছিত অবস্থায় ছিল। তাদের জীবন ছিল অত্যন্ত দুর্বিসহ। তাদের পেটে খাবার ছিল না, পরনে কাপড় ছিল না। সুপথ থেকেও তারা ছিল ভ্রষ্ট। তারা ছিল খুবই হতভাগা। তারা খাবার পেতো না, বরং তাদেরকেই খেয়ে নেয়া হচ্ছিল। দুনিয়ায় যে তাদের অপেক্ষা বেশী লাঞ্ছিত ও অপমানিত আর কেউ ছিল তা আমাদের জানা নেই। কিন্তু ইসলাম আনয়নের পর এই লাঞ্ছিত লোকেরাই দেশের পর দেশ দখল করে নেয় এবং আমীর ও বাদশাহ বনে যায়। রাজা বাদশাহদের উপরও হুকুম চালাতে থাকে। ঢেরি ঢেরি খাবার তারা পেতে শুরু করে। আল্লাহ তাদেরকে সব কিছুই দান করেন যা তোমরা আজ স্বচক্ষে দেখছো। সুতরাং এখন তোমরা নিয়ামতের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর। তিনিই হচ্ছেন প্রকৃত নিয়ামত দাতা। কৃতজ্ঞ বান্দাদেরকে তিনি ভালবাসেন এবং তাদের ধন-সম্পদ আরো বাড়িয়ে দেন।

২৭। হে মুমিনগণ! তোমরা জেনে শুনে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ)-এর সাথে বিশ্বাস ভঙ্গ করবে না, আর তোমাদের পরস্পরের গচ্ছিত দ্রব্যের সম্পর্কেও বিশ্বাসঘাতকতার প্রশ্রয় দিবে না।

٢٧- يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَخُوْنُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْا اَمٰنٰتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○

২৮। আর তোমরা জেনে রেখো যে, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি প্রকৃতপক্ষে পরীক্ষার সামগ্রী মাত্র, আর আল্লাহর নিকট (প্রতিফলের জন্যে) মহা পুরস্কার রয়েছে।

٢٨- وَاعْلَمُوْا اَنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَّاَنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ○ ع

এই আয়াতটি আবু লুবাবাহ ইবনে আবদিল মুনযির (রাঃ)-এর সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়, যখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে ইয়াহুদী বানূ কুরাইযার নিকট প্রেরণ করেন যেন তারা রাসূল (সঃ)-এর হুকুমের শর্ত মেনে নিয়ে দুর্গ খালি করে দেয়। তারা তখন আবু লুবাবাহর কাছেই পরামর্শ চায়। তখন তিনি তাদেরকে এ ব্যাপারে পরামর্শ দেন এবং তিনি স্বীয় হাত দ্বারা স্বীয় গলার প্রতি ইশারা করেন

অর্থাৎ ওটা হচ্ছে যবেহ্ বা হত্যা। এরপর আবূ লুবাবাহ্ (রাঃ) বুঝতে পারেন যে, তিনি আল্লাহ ও রাসূল (সঃ)-এর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। অতঃপর তিনি শপথ করে বসেন যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর তাওবা কবুল না করা পর্যন্ত তিনি মরে যাবেন সেও ভাল কিন্তু খাদ্য খাবেন না। এরপর তিনি মদীনার মসজিদে এসে থামের সাথে নিজেকে বেঁধে ফেলেন। নয় দিন এভাবেই কেটে যায়। ক্ষুধা ও পিপাসায় কাতর হয়ে তিনি অচৈতন্য হয়ে পড়ে যান। শেষ পর্যন্ত রাসূল (সঃ) -এর উপর আল্লাহ তা'আলা তাঁর তাওবা কবূলের আয়াত নাযিল করেন। জনগণ তাঁকে এই সুসংবাদ দেয়ার জন্যে তাঁর কাছে আসে এবং থামের বন্ধন খুলে দেয়ার ইচ্ছা করেন। আবূ লুবাবাহ্ (রাঃ) বলেনঃ "আমার বন্ধন শুধুমাত্র রাসূলুল্লাহ (সঃ) খুলতে পারেন।" তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) নিজে তাঁর বন্ধন খুলে দেন। ঐ সময় তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে সম্বোধন করে বলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমি আমার সমস্ত ধন-সম্পদ সাদকা করে দিলাম।" তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "তোমার জন্যে এক তৃতীয়াংশ সাদকা করাই যথেষ্ট হবে।"[১] হযরত মুগীরা ইবনে শু'বা (রাঃ) বলেন যে, এ আয়াতটি হযরত উসমান (রাঃ)-এর শাহাদাতের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। কেননা ফিৎনা-ফাসাদ সৃষ্টি করে হত্যা করে দেয়া হচ্ছে আল্লাহ ও রাসূল (সঃ)-এর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা।

হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, আবূ সুফিয়ান (রাঃ) মক্কা থেকে বের হন। হযরত জিবরাঈল (আঃ) এসে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে সংবাদ দেন যে, আবূ সুফিয়ান (রাঃ) অমুক জায়গায় রয়েছেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) সাহাবীদেরকে বলেনঃ "আবূ সুফিয়ান অমুক জায়গায় রয়েছে। তাকে গ্রেফতার করার জন্যে বেরিয়ে পড়। কিন্তু এ কথা সম্পূর্ণরূপে গোপন রাখতে হবে।" কিন্তু একজন মুনাফিক আবূ সুফিয়ানকে লিখে পাঠায়ঃ "মুহাম্মাদ (সঃ) ধরতে যাচ্ছেন, সুতরাং সাবধান হয়ে যাও।" তখন لَا تَخُونُوا اللّٰهَ وَ الرَّسُولَ -এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। এ হাদীসটি গারীব বা দুর্বল। আয়াতের ধরন হিসেবেও এটা প্রমাণিত হয় না। সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমে হাতিব ইবনে আবি বুলতাআ'র (রাঃ) ঘটনা নিম্নরূপ বর্ণিত আছেঃ তিনি কুরায়েশ কাফিরদেরকে নবী (সঃ)-এর পরিকল্পনা সম্পর্কে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে পত্র লিখেছিলেন। এটা ছিল মক্কা বিজয়ের সময়ের ঘটনা। আল্লাহ স্বীয় রাসূল (সঃ)-কে এ সংবাদ জানিয়ে

১. এটা আব্দুর রায্যাক ইবনে আবি কাতাদা (রঃ) ও যুহরী (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

দেন। সুতরাং তিনি পত্র বাহকের পিছনে লোক পাঠিয়ে দেন এবং ঐ পত্র ধরা পড়ে যায়। হাতিব (রাঃ)-কে ডাকা হয়। তিনি স্বীয় অপরাধ স্বীকার করেন। হযরত উমার ইবনে খাত্তাব (রাঃ) বলে উঠেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! এর গর্দান উড়িয়ে দিন। কেননা, সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ)-এর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।" তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ হে উমার (রাঃ)! যেতে দাও। কেননা, এ ব্যক্তি বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। তোমার কি জানা নেই যে, বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের সম্পর্কে আল্লাহ পাক বলেছেন- "তোমরা যা চাও তাই আমল কর, আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিলাম।" মোটকথা, সঠিক ব্যাপার এই যে, আয়াতটি সাধারণ। যদিও এটা সঠিক যে, আয়াতটির শানে নুযূল একটি বিশেষ কারণ। আর জমহূর আলেমের মতে শব্দের সাধারণত্বের দ্বারা উক্তি করা যেতে পারে, বিশেষ কারণ না থাকলে কোন আসে যায় না। খিয়ানতের সংজ্ঞার মধ্যে ছোট, বড়, সকর্মক ও অকর্মক সমস্ত পাপই মিলিত রয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এখানে 'আমানত' শব্দ দ্বারা ঐ সব আমলকে বুঝানো হয়েছে, যেগুলোকে আল্লাহ তাঁর বান্দাদের উপর ফরয করে রেখেছেন। ভাবার্থ হচ্ছে- ফরয ভেঙ্গে দিয়ো না, সুন্নাত তরক করো না এবং পাপকার্য থেকে দূরে থাকো।

উরওয়া ইবনে যুবাইর (রাঃ) বলেন যে, ভাবার্থ হচ্ছে- এমন কাজ করো না যে, সামনে তো কারো মর্জি মুতাবেক কথা বলবে, কিন্তু তার অনুপস্থিতিতে তার দুর্নাম করবে বা তার বিরোধিতা করবে। এটাই হচ্ছে প্রকৃত খিয়ানত। আমানত এর দ্বারাই শেষ হয়ে যায়। সুদ্দী বলেনঃ আল্লাহ ও রাসূল (সঃ)-এর খিয়ানত এটাই যে, মানুষ পরস্পরের সাথে খিয়ানত করে। জনগণ নবী (সঃ)-এর কথা শুনতো এবং তা অন্যদেরকে বলে দিতো। এর ফলে ঐ সংবাদ মুশরিকদের কানেও পৌঁছে যেতো। এ জন্যেই নবী (সঃ) বলেছিলেন- "দু'জনের মধ্যকার কথা একটা আমানত। কথা যেখানে শুনবে সেখানেই রেখে দেয়া উচিত। কারো সামনে কারো কথার পুনরাবৃত্তি করা উচিত নয়, যদিও সে নিষেধ না করে থাকে।"

وَاعْلَمُوْاۤ اَنَّمَاۤ اَمْوَالُكُمْ وَ اَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ফিৎনার অর্থ হচ্ছে আযমায়েশ বা পরীক্ষা। আল্লাহ সন্তান দ্বারা পরীক্ষা করে থাকেন যে, সন্তান পেয়ে মানুষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে কি-না এবং সন্তানদের দায়িত্ব পূর্ণভাবে পালন করছে কি-না। কিংবা হয়তো সন্তানের প্রতি ভালবাসার কারণে আল্লাহ থেকে গাফেল

থাকছে। যদি মানুষ এই পরীক্ষায় পূর্ণভাবে উত্তীর্ণ হতে পারে তবে আল্লাহর কাছে তাদের জন্যে বড় পুরস্কার রয়েছে। আল্লাহ পাক বলেনঃ "আমি তোমাদেরকে অকল্যাণ ও কল্যাণ দ্বারা পরীক্ষা করবো।" আর এক জায়গায় বলেনঃ "হে মুমিনগণ! তোমাদেরকে যেন তোমাদের মালধন ও সন্তান-সন্ততি আল্লাহর স্মরণ থেকে ভুলিয়ে না রাখে, আর যারা এরূপ করবে তারা হবে চরম ক্ষতিগ্রস্ত।" আল্লাহ তা'আলা আর এক জায়গায় বলেনঃ "হে ঈমানদারগণ! নিশ্চয়ই তোমাদের স্ত্রীরা এবং তোমাদের সন্তানরা তোমাদের শত্রু, সুতরাং তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাকবে।

وَ اَنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗۤ اَجْرٌ عَظِيْمٌ অর্থাৎ আল্লাহর নিকটে যে সাওয়াব ও জান্নাত রয়েছে তা এই ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি হতে বহুগুণে উত্তম। এগুলো শত্রুদের মত ক্ষতিকারক এবং এগুলোর অধিকাংশই মানুষের জন্যে কল্যাণকর নয়। আল্লাহ পাক দুনিয়া ও আখিরাতের মালিক। কিয়ামতের দিন তাঁর কাছে মহা পুরস্কার রয়েছে। হাদীসে রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "হে আদম সন্তান! তুমি আমাকে খোঁজ কর, পেয়ে যাবে। তুমি যদি আমাকে পেয়ে যাও তবে জানবে যে, সবকিছুই পেয়ে গেছো। আর যদি আমাকে হারিয়ে দাও তবে সবকিছুই হারিয়ে দিয়েছো। তোমার কাছে আমিই সর্বাপেক্ষা বেশী প্রিয় হওয়া উচিত।"

সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "তিনটি জিনিস যার মধ্যে রয়েছে সে ঈমানের আস্বাদ পেয়েছে। (১) যার কাছে সমস্ত জিনিস থেকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ) প্রিয়। (২) যে ব্যক্তি কোন লোককে শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যেই ভালবাসে। (৩) যে ব্যক্তির কাছে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়াও অধিক পছন্দনীয় সেই কুফরীর দিকে ফিরে যাওয়া অপেক্ষা যা থেকে আল্লাহ তাকে রক্ষা করেছেন।"[১] বরং সে রাসূল (সঃ)-এর মহব্বতকে ধনমাল ও সন্তান-সন্ততির উপরেও প্রাধান্য দিয়ে থাকে। যেমন সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! তোমাদের কেউই (পূর্ণ) মুমিন হতে পারে না যে পর্যন্ত না আমি তার কাছে তার নফস্ হতে, তার পরিবারবর্গ হতে, তার মাল হতে এবং সমস্ত লোক হতে বেশী প্রিয় হই।"

১. এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রঃ) ও ইমাম মুসলিম (রঃ) তাখরীজ করেছেন।

২৯। হে মুমিনগণ! তোমরা যদি আল্লাহকে ভয় কর তবে তিনি তোমাদেরকে ন্যায়-অন্যায় পার্থক্য করার একটি মানদণ্ড ও শক্তি দান করবেন, আর তোমাদের দোষত্রুটি তোমাদের হতে দূর করবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন, আল্লাহ বড় অনুগ্রহশীল ও মঙ্গলময়।

٢٩- يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنْ تَتَّقُوا اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّكُمْ فُرْقَانًا وَّ يُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَ يَغْفِرْلَكُمْ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ○

ইবনে আব্বাস (রাঃ), সুদ্দী (রঃ), মুজাহিদ (রঃ), ইকরামা (রঃ) যহ্হাক (রঃ), কাতাদা (রঃ) এবং মুকাতিল ইবনে হাইয়ান (রঃ) প্রমুখ মনীষীগণ বলেন যে, فُرْقَانًا -এর অর্থ হচ্ছে مَخْرَجًا অর্থাৎ বের হওয়ার স্থান। মুজাহিদ (রঃ) فُرْقَانًا فِى الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ -এটুকু বেশী করেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর একটি রিওয়াইয়াতে আছে যে, فُرْقَانًا -এর অর্থ হচ্ছে نَجَاةً অর্থাৎ মুক্তি। তাঁর আর একটি বর্ণনায় نَصْرًا অর্থাৎ সাহায্য রয়েছে। মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক (রঃ) বলেছেন যে, فُرْقَانًا দ্বারা فَصْلًا بَيْنَ الْحَقِّ وَ الْبَاطِلِ অর্থাৎ সত্য ও মিথ্যার মধ্যে ফায়সালা বুঝানো হয়েছে। ইবনে ইসহাক (রঃ)-এর এই তাফসীর পূর্ববর্তী তাফসীরগুলো হতে বেশী সাধারণ। কেননা, যে আল্লাহকে ভয় করবে এবং তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে দূরে থাকবে সে সত্য ও মিথ্যার পরিচয় লাভের তাওফীক প্রাপ্ত হবে। এটা হবে তার মুক্তি ও সাহায্য লাভের কারণ। তার পাপরাশি ক্ষমা করে দেয়া হবে। আল্লাহ তা'আলা গাফ্ফার (বড় ক্ষমাশীল) এবং সাত্তার (দোষত্রুটি গোপনকারী) হয়ে যাবেন। আল্লাহর কাছে বড় পুরস্কার পাওয়ার সে হকদার হয়ে যাবে। যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ "হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তাঁর রাসূল (সঃ)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, তিনি তোমাদেরকে তাঁর রহমত দ্বিগুণ প্রদান করবেন এবং তোমাদের জন্যে এমন নূরের ব্যবস্থা করে দিবেন যার আলোকে তোমরা পথ চলতে পারবে, আর তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন, তিনি বড় ক্ষমাশীল ও দয়ালু।"

وَاِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِيُثْبِتُوْكَ اَوْ يَقْتُلُوْكَ اَوْ يُخْرِجُوْكَ ۗ وَيَمْكُرُوْنَ وَيَمْكُرُ اللّٰهُ ۗ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمٰكِرِيْنَ ○ -৩০

৩০। আর (সেই সময়টিও স্মরণীয়) যখন কাফিররা তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে যে, তোমাকে বন্দী করবে অথবা হত্যা করবে কিংবা নির্বাসিত করবে, তারাও ষড়যন্ত্র করতে থাকে এবং আল্লাহও (স্বীয় নবীকে সঃ বাঁচাবার) তদবীর ও ফিকির করতে থাকেন, আল্লাহ হচ্ছেন সর্বাধিক দৃঢ় তদবীরকারক।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রঃ) এবং কাতাদা (রঃ) বলেন যে, اِثْبَاتٌ শব্দের অর্থ হচ্ছে কয়েদ বা বন্দী করা। আতা (রঃ) এবং ইবনে যায়েদ (রঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে হাব্স্ বা অবরোধ করা। আর সুদ্দী (রঃ) বলেন যে, اِثْبَاتٌ -এর অর্থ হচ্ছে حَبْسٌ ও وَثَاقٌ অর্থাৎ অবরোধ করা ও বেঁধে ফেলা। এর মধ্যে সবগুলো অর্থই রয়েছে। ভাবার্থ হচ্ছে– তারা তোমার সাথে কোন মন্দ ব্যবহারের ইচ্ছা পোষণ করে। আতা (রঃ) বলেনঃ "আমি উবায়েদ ইবনে উমায়েরকে বলতে শুনেছি যে, যখন কাফিররা নবী (সঃ)-কে বন্দী করার বা হত্যা করার অথবা দেশান্তরিত করার ষড়যন্ত্র করে তখন তাঁকে তাঁর চাচা আবূ তালিব জিজ্ঞেস করেন, কাফিররা তোমার বিরুদ্ধে কি ষড়যন্ত্র করেছে তা তুমি জান কি?" তিনি উত্তরে বলেনঃ "তারা আমাকে বন্দী করতে বা হত্যা করতে অথবা নির্বাসিত করতে চায়।" আবূ তালিব আবার জিজ্ঞেস করেন, এ সংবাদ তোমাকে কে জানিয়েছে? তিনি জবাব দেনঃ "আমার প্রতিপালক আমাকে এ সংবাদ জানিয়েছেন।" আবূ তালিব তখন বলেন, তোমার প্রতিপালক খুবই উত্তম প্রতিপালক। তাঁর কাছে উত্তম উপদেশ প্রার্থনা কর। তখন নবী (সঃ) বলেনঃ "আমি তাঁর কাছে উত্তম উপদেশই চাচ্ছি এবং তিনি সদা আমাকে উত্তম উপদেশই প্রদান করবেন।" সত্য কথা তো এই যে, এখানে আবূ তালিবের আলোচনা বড়ই বিস্ময়কর ব্যাপার এমন কি প্রত্যাখ্যান যোগ্য। কেননা, এটা হচ্ছে মাদানী আয়াত। আর এই ঘটনা এবং কুরায়েশদের এভাবে পরামর্শকরণ সংঘটিত হয়েছিল হিজরতের রাত্রে। অথচ আবূ তালিবের মৃত্যু ঘটেছিল এর তিন বছর পূর্বে। আবূ তালিবের মৃত্যুর কারণেই তো কাফিররা এতোটা দুঃসাহস

দেখাতে পেরেছিল। কেননা, আবূ তালিব সদা সর্বদা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাজে সাহায্য ও সহায়তা করতেন এবং তাঁকে রক্ষা করতে গিয়ে কুরায়েশদের সাথে মুকাবিলা করতেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, কুরায়েশ নেতৃবর্গের একটি দল রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্যে একটি পরামর্শ সভায় মিলিত হয়। ঐ সভায় ইবলীসও একজন মর্যাদা সম্পন্ন বৃদ্ধের বেশে উপস্থিত হয়। জনগণ তাকে জিজ্ঞেস করেঃ "আপনি কে?" সে উত্তরে বলেঃ "আমি নাজদবাসী একজন শায়েখ। আপনারা পরামর্শ সভা আহ্বান করেছেন জেনে আমিও সভায় হাযির হয়েছি, যেন আপনারা আমার উপদেশ ও সৎ পরামর্শ থেকে বঞ্চিত না হন।" তখন কুরায়েশ নেতৃবর্গ তাকে অভিনন্দন জানালো। সে তাদেরকে বললোঃ "আপনারা এই লোকটির (মুহাম্মাদ সঃ-এর) ব্যাপারে অত্যন্ত চিন্তাভাবনা ও তদবীরের সাথে কাজ করুন। নতুবা খুব সম্ভব সে আপনাদের উপর প্রভাব বিস্তার করে বসবে।" সুতরাং একজন মত প্রকাশ করলোঃ "তাকে বন্দী করা হোক, শেষ পর্যন্ত সে বন্দী অবস্থাতেই ধ্বংস হয়ে যাবে। যেমন ইতিপূর্বে কবি যুহাইর ও নাবেগাকে বন্দী করা হয়েছিল এবং ঐ অবস্থাতেই তারা ধ্বংস হয়ে গেছে। এও তো একজন কবি।" এ কথা শুনে ঐ নাজদী বৃদ্ধ চীৎকার করে বলে উঠলোঃ "আমি এতে কখনই একমত নই। আল্লাহর শপথ! তার প্রভু তাকে সেখান থেকে বের করে নেবে। ফলে সে তার সঙ্গীদের কাছে ফিরে যাবে। অতঃপর সে তোমাদের উপর আক্রমণ চালিয়ে তোমাদের সবকিছু ছিনিয়ে নেবে এবং তোমাদেরকে তোমাদের শহর থেকে বের করে দেবে।" লোকেরা তার এ কথা শুনে বললোঃ "শায়েখ সত্য কথা বলেছেন। অন্য মত পেশ করা হোক।" অন্য একজন তখন বললোঃ "তাকে দেশ থেকে বের করে দেয়া হোক, তা হলেই তোমরা শান্তি পাবে। সে যখন এখানে থাকবেই না তখন তোমাদের আর ভয় কিসের? তার সম্পর্ক তোমাদের ছাড়া অন্য কারো সাথে থাকবে। এতে তোমাদের কি হবে?" তার এ কথা শুনে ঐ বৃদ্ধ বললোঃ "আল্লাহর কসম! এ মতও সঠিক নয়। সে যে মিষ্টভাষী তা কি তোমাদের জানা নেই। সে মধু মাখানো কথা দ্বারা মানুষের মন জয় করে নেবে। তোমরা যদি এই কাজ কর তাহলে সে আরবের বাইরে গিয়ে সারা আরববাসীকে একত্রিত করবে। তারা সবাই সম্মিলিতভাবে তোমাদের উপর হামলা করে বসবে এবং তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দেবে। আর তোমাদের সম্ভ্রান্ত লোকদেরকে হত্যা করে ফেলবে।" লোকেরা বললোঃ "শায়েখ সাহেব ঠিক কথাই বলেছেন। অন্য

একটি মত পেশ করা হোক।” তখন আবূ জেহেল বললোঃ “আমি একটা পরামর্শ দিচ্ছি । তোমরা চিন্তা করে দেখলে বুঝতে পারবে যে, এর চেয়ে উত্তম মত আর হতে পারে না। প্রত্যেক গোত্র থেকে তোমরা একজন করে যুবক বেছে নাও যারা হবে বীর পুরুষ ও সম্ভ্রান্ত। সবারই কাছে তরবারী থাকবে। সবাই সম্মিলিতভাবে হঠাৎ করে তাকে তরবারীর আঘাত করবে। যখন সে নিহত হয়ে যাবে তখন তার রক্ত সকল গোত্রের মধ্যে বণ্টিত হয়ে যাবে। এটা কখনও সম্ভব নয় যে, বানু হাশিমের একটি গোত্র সমস্ত গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। বাধ্য হয়ে বানু হাশিমকে রক্তপণ গ্রহণ করতে হবে। আমরা তাদেরকে রক্তপণ দিয়ে দিবো এবং শান্তি লাভ করবো।” তার এ কথা শুনে নাজদী বৃদ্ধ বললোঃ “আল্লাহর কসম! এটাই হচ্ছে সঠিকতম মত। এর চেয়ে উত্তম মত আর হতে পারে না।” সুতরাং সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ে গেল এবং এরপর সভা ভঙ্গ হলো। অতঃপর হযরত জিবরাঈল (আঃ) আসলেন এবং রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বললেনঃ “আজকে রাত্রে আপনি বিছানায় শয়ন করবেন না।” এ কথা বলে তিনি তাঁকে কাফিরদের ষড়যন্ত্রের কথা অবহিত করলেন। সুতরাং রাসূলুল্লাহ (সঃ) ঐ রাত্রে নিজের বিছানায় শয়ন করলেন না এবং তখনই আল্লাহ তা'আলা তাঁকে হিজরতের নির্দেশ দিলেন। মদীনায় আগমনের পর আল্লাহ পাক তাঁর উপর সূরায়ে আনফাল অবতীর্ণ করলেন। স্বীয় নিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললেনঃ

وَ يَمْكُرُوْنَ وَ يَمْكُرُ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ خَيْرُ الْمٰكِرِيْنَ ـ

অর্থাৎ “তারা ষড়যন্ত্র করতে থাকে এবং আল্লাহ তা'আলাও (স্বীয় নবীকে সঃ রক্ষা করার) তদবীর ও ফিকির করতে থাকেন, আল্লাহ হচ্ছেন সর্বাধিক উত্তম তদবীরকারক।” তাদের উক্তি ছিলঃ تَرَبَّصُوْا بِهٖ رَيْبَ الْمَنُوْنِ حَتّٰى يَهْلِكَ অর্থাৎ “তার ব্যাপারে তোমরা মৃত্যু ঘটবার অপেক্ষা কর, শেষ পর্যন্ত সে ধ্বংস হয়ে যাবে।” ঐ দিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

اَمْ يَقُوْلُوْنَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهٖ رَيْبَ الْمَنُوْنِ ـ

অর্থাৎ “তারা কি বলে– এ ব্যক্তি কবি, আমরা তার ব্যাপারে মৃত্যু ঘটারই অপেক্ষা করছি।” (৫২ঃ ৩০) তাই ঐ দিনের নামই রেখে দেয়া হয় يَوْمُ الزَّحْمَةِ অর্থাৎ “দুঃখ-বেদনার দিন।” কেননা, ঐ দিন রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল। তাদের সেই দুরভিসন্ধির আলোচনা নিম্নের আয়াতে রয়েছে–

وَ إِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْاَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَ إِذًا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا -

অর্থাৎ "তারা এই ভূমি হতে তোমাকে উৎখাত করতে উদ্যত হয়েছিল, যেন তোমাকে তথা হতে বের করে দেয়, আর যদি এরূপ ঘটে যেতো তবে তারাও তোমার পর (এখানে) অতি অল্প সময় টিকে থাকতে পারতো।" (১৭ঃ ৭৬) নবী (সঃ) আল্লাহ তা'আলার নির্দেশের অপেক্ষায় ছিলেন। যখন কুরায়েশরা তাঁকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে নিলো তখন হযরত আলী (রাঃ)-কে ডেকে তিনি নির্দেশ দিলেনঃ "তুমি আমার বিছানায় শুয়ে পড়।" হযরত আলী (রাঃ) তখন সবুজ চাদর গায়ে দিয়ে তাঁর বিছানায় শুয়ে গেলেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বাইরে বের হলেন। লোকদেরকে তিনি দরজার উপর দেখতে পেলেন। তিনি এক মুষ্টি মাটি নিয়ে তাদের দিকে নিক্ষেপ করলেন। ফলে তাদের চক্ষু নবী (সঃ)-এর দিক থেকে ফিরে গেল। তিনি সূরায়ে ইয়াসীনের يٰسٓ-وَ الْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ হতে فَاَغْشَيْنٰهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُوْنَ (৩৬ঃ ১-৯) পর্যন্ত আয়াতগুলো পাঠ করতে করতে বেরিয়ে গেলেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত ফাতিমা (রাঃ) কাঁদতে কাঁদতে নবী (সঃ)-এর কাছে আসলেন। তিনি তাঁকে কাঁদার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেনঃ "আমি না কেঁদে পারি কি? কুরায়েশের লোকেরা লাত উয্যার নামে শপথ করে বলেছে যে, আপনাকে দেখা মাত্রই আক্রমণ চালিয়ে তারা হত্যা করে ফেলবে এবং তাদের প্রত্যেকেই আপনার হত্যায় অংশগ্রহণ করতে চায়।" এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত ফাতিমা (রাঃ)-কে বললেনঃ "হে আমার প্রিয় কন্যা! আমার জন্যে অযুর পানি নিয়ে এসো।" তিনি অযু করে বায়তুল্লাহর দিকে চললেন। কুরায়েশরা তাঁকে দেখেই বলে উঠলোঃ "এই যে তিনি।" কিন্তু সাথে সাথেই তাদের মাথাগুলো নীচের দিকে ঝুঁকে পড়লো এবং গর্দানগুলো বাঁকা হয়ে গেল। তারা তাদের চক্ষুগুলো উঠাতে পারলো না। রাসূলুল্লাহ (সঃ) এক মুষ্টি মাটি নিয়ে তাদের দিকে নিক্ষেপ করলেন এবং বললেনঃ "চেহারাগুলো নষ্ট হয়ে যাক।" যার গায়েই এই কংকর লেগেছিল সে-ই বদরের যুদ্ধে কাফির অবস্থায় নিহত হয়েছিল।[১] মোটকথা, রাসূলুল্লাহ (সঃ) হিজরত করে (সওরের) গুহায় পৌঁছেন। হযরত আবূ বকর (রাঃ) সাথে ছিলেন। মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর বাড়ী অবরোধ করে থাকে। হযরত আলী (রাঃ)-কেই তারা মুহাম্মাদ (সঃ) মনে করতে থাকে।

১. হাকিম (রঃ) বলেনঃ "এ হাদীসটি ইমাম মুসলিম (রঃ)-এর শর্তের উপর সহীহ। তাঁরা দু'জন এটা তাখরীজ করেননি এবং এর কোন দোষ-ত্রুটি আমার জানা নেই।"

সকাল হলে তারা তাঁর ঘরে ঢুকে পড়ে। কিন্তু ঘরে হযরত আলী (রাঃ)-কে দেখতে পায়। এভাবে আল্লাহ তাদের সমস্ত অভিসন্ধি নস্যাৎ করে দেন। তারা হযরত আলী (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেঃ "মুহাম্মাদ (সঃ) কোথায়?" তিনি উত্তরে বলেনঃ "আমি তাঁর কোন খবর জানি না।" তারা তখন তাঁদের পদচিহ্ন অনুসরণ করে চলতে থাকে। পাহাড়ের নিকটবর্তী হলে তাদের মনে সন্দেহের উদ্রেক হয়। সুতরাং তারা পাহাড়ের উপর উঠে পড়ে। গুহার সামনে দিয়ে চলার সময় তারা দেখতে পায় যে, গুহার মুখে মাকড়সায় জাল বুনিয়ে রেখেছে। তাই তারা পরস্পর বলাবলি করেঃ "গুহার মধ্যে মানুষ প্রবেশ করলে ওর মুখে কখনো মাকড়সার এত বড় জাল ঠিক থাকতো না।" রাসূলুল্লাহ (সঃ) ঐ গুহার মধ্যে তিনদিন পর্যন্ত অবস্থান করেন। তাই আল্লাহ পাক বলেনঃ "তারা ষড়যন্ত্র করতে থাকে এবং আল্লাহ তা'আলাও (স্বীয় নবীকে সঃ রক্ষা করার) তদবীর করতে থাকেন, আল্লাহ হচ্ছেন সর্বাধিক উত্তম তদবীরকারক।" অর্থাৎ হে নবী (সঃ)! তুমি লক্ষ্য কর যে, কিভাবে তদবীর করে আমি তোমাকে ঐসব কাফিরের আক্রমণ থেকে রক্ষা করেছি!

৩১। তাদেরকে যখন আমার আয়াতসমূহ পাঠ করে শুনানো হয় তখন তারা বলে– আমরা শুনেছি, ইচ্ছা করলে আমরাও এর অনুরূপ বলতে পারি, নিঃসন্দেহে এটা সেকালের উপাখ্যান ছাড়া কিছু নয়।

৩২। আর (সেই সময়টিও স্মরণ কর) যখন তারা বলেছিল– হে আল্লাহ! এটা (কুরআন ও নবুওয়াত) যদি আপনার পক্ষ হতে সত্য হয় তবে আকাশ থেকে আমাদের উপর প্রস্তর বর্ষণ করুন অথবা আমাদের উপর কঠিন পীড়াদায়ক শাস্তি এনে দিন।

٣١- وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا قَالُوْا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَآءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هٰذَآ اِنْ هٰذَآ اِلَّآ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ۝

٣٢- وَاِذْ قَالُوا اللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ هٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَاَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَآءِ اَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ۝

٣٣- وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ ۚ وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ ○

৩৩। (হে নবী সঃ!) তুমি তাদের মধ্যে থাকা অবস্থায় তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে এটা আল্লাহর অভিপ্রায় নয়, আর আল্লাহ এটাও চান না যে, তারা ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবে অথচ তিনি তাদেরকে শাস্তি প্রদান করবেন।

এখানে আল্লাহ তা'আলা কুরায়েশদের কুফরী ও একগুঁয়েমীর সংবাদ দিচ্ছেন যে, তারা কুরআন কারীম শ্রবণ করে কিরূপ মিথ্যা দাবী করছে। তারা বলছে– "আমরা যে কুরআন শুনলাম, ইচ্ছা করলে আমরাও এরূপ বলতে পারি।" তাদের এ দাবী একেবারে ভিত্তিহীন এবং এটা হচ্ছে কার্যবিহীন কথা। কেননা, এ ব্যাপারে কুরআন পাকে বার বার চ্যালেঞ্জ দেয়া হয়েছে যে, তারা কুরআনের সূরার মত একটি সূরা আনয়ন করুক তো? কিন্তু তারা তাতে সক্ষম হয়নি। এরূপ কথা বলে তারা নিজেদেরকে প্রতারিত করছে, আর প্রতারিত করছে তাদের বাতিলের অনুসারীদেরকে। কথিত আছে যে, এই উক্তি করেছিল নাযার ইবনে হারিস। ঐ বেদ্বীন ব্যক্তি পারস্যে গিয়েছিল এবং তথাকার ইরানী বাদশাহ রুস্তম ও ইসফিনদিয়ারের কাহিনী পড়েছিল। যখন সে সেখান থেকে ফিরে আসে তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর রিসালাত প্রকাশ হয়ে পড়েছিল। রাসূলুল্লাহ (সঃ) জনগণকে কুরআন কারীম পাঠ করে শুনাতেন। যখন তিনি মজলিস শেষ করতেন তখন ঐ দুরাচার নাযার ইবনে হারিস বসে পড়তো এবং ইরানী বাদশাহদের ইতিহাস বর্ণনা করে বলতোঃ "আচ্ছা বলতো, উত্তম গল্পকথক কে? আমি, না মুহাম্মাদ (সঃ)?" অতঃপর বদর যুদ্ধে আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে যখন বিজয় দান করলেন এবং মক্কার কতগুলো মুশরিক বন্দী হয় তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে হত্যাযোগ্য বলে ঘোষণা করেন এবং তাকে হত্যা করে দেয়া হয়। হযরত মিকদাদ ইবনে আসওয়াদ (রাঃ) তাকে বন্দী করেছিলেন। হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইর (রাঃ) বলেন যে, বদরের দিন রাসূলুল্লাহ (সঃ) তিনজন বন্দীকে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তারা হচ্ছে– (১) উকবা ইবনে আবি মুঈত, (২) তাঈমা ইবনে আদী এবং (৩) নাযার ইবনে হারিস।

নাযার ছিল হযরত মিকদাদ (রাঃ)-এর বন্দী। রাসূলুল্লাহ (সঃ) যখন তার হত্যার নির্দেশ দেন তখন হযরত মিকদাদ (রাঃ) বলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! এটা তো আমার বন্দী। সুতরাং একে তো আমারই পাওয়া উচিত।"

তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "সে আল্লাহর কিতাবের উপর বিরূপ মন্তব্য করেছে। সুতরাং তাকে হত্যা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।" হযরত মিকদাদ (রাঃ) স্বীয় কয়েদীর দিকে পুনরায় রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইলে তিনি প্রার্থনা করেনঃ "হে আল্লাহ! আপনি স্বীয় অনুগ্রহে মিকদাদ (রাঃ)-কে বহু কিছু প্রদান করুন!" তখন হযরত মিকদাদ (রাঃ) বলে উঠলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! জিদ করে চাওয়ার উদ্দেশ্য এটাই ছিল যে, আপনি আমার জন্যে প্রার্থনা করবেন।" এই নাযারের ব্যাপারেই وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا ... -এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইর (রাঃ) তাঈমার স্থলে মুতঈম ইবনে আদীর নাম বলেছেন। কিন্তু এটা ঠিক নয়। কেননা, বদরের দিন মুতঈম ইবনে আদী জীবিতই ছিল না। এ জন্যেই সেই দিন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছিলেনঃ "আজ যদি মুতঈম ইবনে আদী জীবিত থাকতো এবং এই নিহতদের মধ্যকার কারো জন্যে প্রার্থনা করতো তবে আমি তাকে এই কয়েদী দিয়ে দিতাম।" তাঁর এ কথা বলার কারণ ছিল এই যে, সে তাঁকে ঐ সময় রক্ষা করেছিল যখন তিনি তায়েফের অত্যাচারীদের পিছু ছেড়ে দিয়ে মক্কার পথে ফিরে আসছিলেন। اَسَاطِيْرُ শব্দটি اُسْطُوْرَةٌ শব্দের বহুবচন। অর্থাৎ ঐ সব পুস্তক ও সংকলন যেগুলো শিক্ষা করে জনগণকে শুনানো হয়ে থাকে। আর এগুলো হচ্ছে শুধু কিস্সা ও কাহিনী। যেমন অন্য জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وَقَالُوْٓا اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلٰى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَّ اَصِيْلًا ـ قُلْ اَنْزَلَهُ الَّذِيْ يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ اِنَّهٗ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ـ

অর্থাৎ "তারা (কাফিররা) বলে– এই কুরআন তো পূর্ববর্তীদের মিথ্যা কাহিনী মাত্র যেগুলোকে লিখে নেয়া হয়েছে এবং দিন-রাত্রি পাঠ করে শুনানো হচ্ছে। হে নবী (সঃ)! তুমি বলে দাও– এটা তিনিই অবতীর্ণ করেছেন যিনি আকাশসমূহের ও পৃথিবীর গুপ্ত রহস্য সম্পর্কে অবহিত রয়েছেন, আর তিনি ক্ষমাশীল ও দয়ালু।" (২৫ঃ ৫-৬) অর্থাৎ যারা আল্লাহর দিকে ফিরে আসে, আল্লাহ তাদের তাওবা কবূল করতঃ তাদেরকে ক্ষমা করে থাকেন।

ঘোষিত হচ্ছে– "যখন তারা (কাফিররা) বলেছিল– হে আল্লাহ! এটা (এই কুরআন ও নবুওয়াত) যদি আপনার পক্ষ হতে সত্য হয় তবে আকাশ থেকে আমাদের উপর প্রস্তর বর্ষণ করুন অথবা আমাদের উপর কঠিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি এনে দিন।" এই প্রার্থনা ছিল তাদের পূর্ণ অজ্ঞতা, মূর্খতা এবং বিরোধিতার কারণে। তাদের এই নির্বুদ্ধিতার কারণেই তাদের দুর্নাম হচ্ছে। তাদের তো

নিম্নরূপ প্রার্থনা করা উচিত ছিলঃ “হে আল্লাহ! এই কুরআন যদি আপনার পক্ষ থেকেই এসে থাকে তবে ওর অনুসরণ করার তাওফীক আমাদেরকে দান করুন!” কিন্তু তারা নিজেদের জীবনের উপর শাস্তি কিনে নেয় এবং শাস্তির জন্যে তাড়াহুড়া করে। যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ “(হে নবী সঃ!) তারা তোমার কাছে শাস্তির জন্যে তাড়াহুড়া করছে, যদি এর জন্যে একটা দিন নির্দিষ্ট না থাকতো তবে হঠাৎ করেই তাদের উপর শাস্তি এসে পড়তো এবং তারা কিছু বুঝতেই পারতো না।” আল্লাহ তা'আলা তাদের কথা আরো বলেনঃ

وَ قَالُوْا رَبَّنَا عَجِّلْ لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ (৩৮ঃ ১৬)এবং আর এক জায়গায় বলেনঃ

سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَّاقِعٍ - لِّلْكٰفِرِيْنَ لَيْسَ لَهٗ دَافِعٌ - مِّنَ اللّٰهِ ذِى الْمَعَارِجِ

অর্থাৎ “এক আবেদনকারী সেই আযাব সম্বন্ধে আবেদন করে যা সংঘটিত হবে কাফিরদের উপর, যার কোন প্রতিরোধকারী নেই। যা আল্লাহর তরফ হতে ঘটবে, যিনি ধাপসমূহের (আসমান সমূহের) অধিপতি।” (৭০ঃ ১-৩) পূর্ব যুগীয় উম্মতদের মূর্খ ও অজ্ঞ লোকেরাও অনুরূপ কথাই বলেছিল। হযরত শুআ'ইব (আঃ)-এর কওম তাঁকে বলেছিলঃ “হে শুআ'ইব (আঃ)! যদি তুমি সত্যবাদী হও তবে আমাদের উপর আকাশ নিক্ষেপ কর।” অথবা “হে আল্লাহ! যদি এটা আপনার পক্ষ হতে সত্য হয় তবে আমাদের উপর আকাশ হতে পাথর বর্ষণ করুন!” আবূ জেহেল ইবনে হিশামও এ কথাই বলেছিলঃ

اَللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ هٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَاَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاۤءِ اَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ -

অর্থাৎ “হে আল্লাহ! এটা যদি আপনার পক্ষ হতে সত্য হয় তবে আকাশ থেকে আমাদের উপর পাথর বর্ষণ করুন অথবা আমাদের কঠিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি এনে দিন!” তখন وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَ اَنْتَ فِيْهِمْ -এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।[১] অর্থাৎ (হে নবী সঃ!) তুমি তাদের মধ্যে থাকা অবস্থায় তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে এটা আল্লাহর অভিপ্রায় নয়, আর আল্লাহ এটাও চান না যে, তারা ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবে অথচ তিনি তাদেরকে শাস্তি প্রদান করবেন।” অন্য জায়গায় আল্লাহ পাক বলেনঃ ..... وَلَقَدْ جِئْتُمُوْنَا فُرَادٰى অর্থাৎ “আমার কাছে তোমরা একা একা আসবে যেমন আমি তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম।” (৬ঃ ৯৪) আতা (রঃ) বলেন যে, এই বিষয়ের দশটি আয়াত

১. এটা ইমাম বুখারী (রঃ) তাঁর সহীহ গ্রন্থে তাখরীজ করেছেন।

কুরআন পাকে রয়েছে। হযরত বুরাইদা (রাঃ) বলেনঃ উহুদের যুদ্ধে আমি দেখেছি যে, হযরত আমর ইবনুল আ'স (রাঃ) ঘোড়ার উপর সওয়ার অবস্থায় বলতে রয়েছেন– "হে আল্লাহ! মুহাম্মাদ (সঃ) যা বলেছেন তা যদি সত্য হয় তবে ঘোড়াসহ আমাকে যমীনে ধ্বংসিয়ে দিন।"[১]

এই উম্মতের মূর্খ লোকদেরও এরূপ উক্তিই ছিল। আল্লাহ পাক স্বীয় আয়াতের পুনরাবৃত্তি করছেন এবং তাদের উপর তাঁর রহমতের কথা উল্লেখ করছেনঃ "হে নবী! তুমি তাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকা অবস্থায় তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে এটা আল্লাহর অভিপ্রায় নয় এবং আল্লাহ এটাও চান না যে, তারা ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবে অথচ তিনি তাদেরকে শাস্তি প্রদান করবেন।" মুশরিকরা বায়তুল্লাহর তাওয়াফের সময় বলতো–

لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ

অর্থাৎ "আমরা আপনার নিকট হাযির আছি, হে আল্লাহ! আপনার নিকট আমরা হাযির আছি। আপনার কোন অংশীদার নেই। আমরা আপনার নিকট উপস্থিত আছি।" তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাদেরকে বলতেনঃ "এখানেই ক্ষান্ত হও, আর কিছুই বলো না।" কিন্তু ঐ মুশরিকরা সাথে সাথেই বলে উঠতো– إِلَّا شَرِيْكٌ هُوَ لَكَ تَمْلِكُهُ وَمَا مَلَكَ অর্থাৎ "আপনার একজন শরীকও রয়েছে, আপনি তারো মালিক এবং সে যা কিছুর মালিক, তারো মালিক আপনি।" এর সাথেই তারা বলতো– غُفْرَانَكَ غُفْرَانَكَ অর্থাৎ "আমরা আপনার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি, আমরা আপনার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি।" তখন আল্লাহ তা'আলা وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَ اَنْتَ فِيْهِمْ -এই আয়াত অবতীর্ণ করেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, তারা দু'টি কারণে নিরাপত্তা লাভ করেছিল। প্রথম হচ্ছে নবী (সঃ)-এর বিদ্যমানতা এবং দ্বিতীয় হচ্ছে তাদের ক্ষমা প্রার্থনা। এখন নবী (সঃ) তো বিদায় গ্রহণ করেছেন। কাজেই বাকী আছে শুধু ক্ষমা প্রার্থনা।[২]

কুরায়েশরা পরস্পর বলাবলি করতো– "আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদ (সঃ)-কে আমাদের মধ্যে মর্যাদাবান বানিয়েছেন।" দিনের বেলায় তারা আল্লাহর ব্যাপারে ঔদ্ধত্যপনা প্রকাশ করতো এবং রাত্রিকালে অনুতপ্ত হয়ে বলতো– غُفْرَانَكَ اللّٰهُمَّ

---

১. এটা ঐ সময়ের কথা যখন আমর ইবনুল আ'স (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করেননি।

২. এটা ইবনে আবি হাতিম তাখরীজ করেছেন।

অর্থাৎ "হে আল্লাহ! আমাদেরকে ক্ষমা করুন!" তখন আল্লাহ তা'আলা وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ.... -এ আয়াত অবতীর্ণ করেন। নবীরা যে পর্যন্ত জনপদ হতে বেরিয়ে না যান সেই পর্যন্ত কওমের উপর শাস্তি আসে না। তাদের মধ্যে কতকগুলো লোক এমনও ছিল যাঁরা পূর্ব থেকেই ঈমান আনয়ন করেছিলেন। তাঁরা ক্ষমা প্রার্থনা করতেন এবং নামায পড়তেন। তাঁরা ছিলেন মুসলমান। নবী (সঃ)-এর হিজরতের পরেও তাঁরা মক্কাতেই রয়ে গিয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) মক্কার জনপদ পরিত্যাগ করে চলে যাওয়ার পরেও যে মক্কাবাসীর উপর আল্লাহর আযাব নাযিল হয়নি তার কারণ ছিল এই যে, তখনও কতক মুসলমান মক্কায় অবস্থান করছিলেন। তাঁরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতেন। ফলে মক্কাবাসী শাস্তি থেকে রক্ষা পেয়েছিল। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "আল্লাহ আমার উম্মতের জন্যে নিরাপত্তার দু'টি কারণ রেখেছেন। প্রথম হচ্ছে তাদের মধ্যে আমার উপস্থিতি। আর দ্বিতীয় হচ্ছে তাদের ক্ষমা প্রার্থনা। সুতরাং আমার দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণের পরেও ক্ষমা প্রার্থনা কিয়ামত পর্যন্ত লোকদেরকে আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা করতে থাকবে।"[১] হযরত আবূ সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ শয়তান বলেছিল– "হে আল্লাহ! আপনার মর্যাদার কসম! যে পর্যন্ত আপনার বান্দাদের দেহে রূহ থাকবে সেই পর্যন্ত আমি তাদেরকে বিভ্রান্ত করতে থাকবো।" তখন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "আমার ইয্যতের কসম! যে পর্যন্ত তারা ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবে সেই পর্যন্ত আমিও তাদেরকে ক্ষমা করতে থাকবো।"

৩৪। কিন্তু এখন তাদের কি বলবার আছে যে, আল্লাহ তাদের শাস্তি দিবেন না, যখন তারা মসজিদুল হারামের পথরোধ করছে, অথচ তারা মসজিদুল হারামের তত্ত্বাবধায়ক নয়, মুত্তাকী লোকেরাই হলো ওর তত্ত্বাবধায়ক, কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোক এটা অবগত নয়।

٣٤- وَمَا لَهُمْ اَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللّٰهُ وَهُمْ يَصُدُّوْنَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوْۤا اَوْلِيَآءَهٗ ؕ اِنْ اَوْلِيَآؤُهٗۤ اِلَّا الْمُتَّقُوْنَ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ○

১. এ হাদীসটি ইমাম তিরমিযী (রঃ) তাঁর সুনানে বর্ণনা করেছেন।

৩৫। কা'বা ঘরের কাছে তাদের নামায হলো শিস ও করতালি প্রদান, সুতরাং তোমরা কুফরী করার কারণে এখন শাস্তির স্বাদ গ্রহণ কর।

٣٥- وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَّتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ○

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, মক্কাবাসী মুশরিকরা শাস্তি পাওয়ার যোগ্য তো অবশ্যই ছিল, কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর বরকতে শাস্তি থেকে বেঁচে যায়। এজন্যে যখন তিনি মক্কা ছেড়ে চলে যান তখন বদরের দিন তাদের উপর শাস্তি নেমে আসে। তাদের নেতারা নিহত এবং বড় বড় লোক বন্দী হয়। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ক্ষমা প্রার্থনা করার কথা বলে দেন, কিন্তু ওর সাথে তারা শিরক ও ফাসাদকেও মিলিয়ে দেয়। কাতাদা (রঃ) এবং সুদ্দী (রঃ) বলেন যে, এই নিহত কুরায়েশরা ক্ষমা প্রার্থনা করতো না। যদি তারা তা করে থাকতো তবে আল্লাহ তা'আলা বদরের যুদ্ধে তাদেরকে লাঞ্ছনার মৃত্যু দিতেন না। আর যদি এই দুর্বল মুসলমানরা মক্কায় অবস্থান করে ক্ষমা প্রার্থনা না করতেন তবে মক্কাবাসীর উপর এমন বিপদ এসে পড়তো যা কোনক্রমেই দূর করা যেতো না। ক্ষমা প্রার্থনার বরকতেই মক্কায় শাস্তি নাযিল হওয়া থেকে কুরায়েশরা রক্ষা পেয়েছে এবং মক্কার মুসলমানদের মাধ্যমেই তারা কিছুকাল পর্যন্ত আযাব থেকে মাহফুয থেকেছে। হুদায়বিয়ার দিন আল্লাহ পাক আয়াত নাযিল করেছিলেন–

هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ الْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَّبْلُغَ مَحِلَّهُ وَ لَوْ لَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَ نِسَاءٌ مُّؤْمِنٰتٌ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَئُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِّنْهُمْ مَّعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيُدْخِلَ اللّٰهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَّشَاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا-

অর্থাৎ “এরা ঐ লোক যারা কুফরী করেছে এবং তোমাদেরকে মসজিদে হারাম হতে প্রতিরোধ করেছে এবং প্রতিরুদ্ধ কুরবানীর জন্তুগুলো ওদের নির্দিষ্ট স্থানে হাযির করা হতে বাধাদান করেছে, আর যদি বহু মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী না থাকতো যাদের সম্বন্ধে তোমরা কিছুই জানতে না, অর্থাৎ তাদের নিষ্পেষিত হওয়ার আশংকা না থাকতো, যদ্দরুন তাদের কারণে অজ্ঞাতসারে তোমরাও ক্ষতিগ্রস্ত হতে, তবে সমস্ত ব্যাপারই চুকিয়ে দেয়া হতো, কিন্তু তা এ

জন্যে করা হয়নি, যেন আল্লাহ যাকে ইচ্ছা নিজ রহমতে দাখিল করেন, যদি তারা (ঐ মুসলমানরা মক্কা হতে) সরে পড়তো তবে আমি তাদের মধ্যকার কাফিরদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রদান করতাম।" (৪৮ঃ ২৫) নবী (সঃ)-এর অবস্থানের সময় আল্লাহ তা'আলা তাঁকে বলেছিলেনঃ "তোমার অবস্থানকালীন সময়ে আমি তাদের উপর শাস্তি অবতীর্ণ করবো না।" অতঃপর যখন নবী (সঃ) মদীনায় চলে যান তখন আল্লাহ পাক তাঁকে বলেনঃ "তোমার স্থলবর্তীরা এখনও মক্কায় রয়েছে, সুতরাং এখনও আমি আযাব নাযিল করবো না।" তারপর যখন মুসলমানরাও মক্কা থেকে বেরিয়ে আসে তখন মহান আল্লাহ বলেনঃ "এখন তাদেরকে কেন শাস্তি দেয়া হবে না? তারা তো তোমাদেরকে বায়তুল্লাহতে আসতে বাধা দিয়েছে, অথচ তারা তো আল্লাহর বন্ধু ছিল না?" অতএব আল্লাহ তাদের উপর মক্কা বিজয়ের শাস্তি অবতীর্ণ করেন। এ আয়াতটি وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ -এই আয়াতটিকে রহিতকারী। ইকরামা (রাঃ) এবং হাসান বসরী (রঃ) বলেন যে, সূরায়ে আনফালের ......وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ আয়াতটিকে ওর পরবর্তী .... وَمَا لَهُمْ اَنْ لَّا يُعَذِّبَهُمْ -এই আয়াতটি মানসূখ বা রহিতকারী। তাই তিনি ......فَذُوْقُوا الْعَذَابَ বলেছেন। সুতরাং দেখা যায় যে, মক্কাবাসীদের সাথে যুদ্ধ হয় এবং তারা ক্ষুধা ও ক্ষয়ক্ষতির শাস্তিতে জড়িয়ে পড়ে। এভাবে আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদেরকে শাস্তি প্রাপক হিসেবে বেছে নিয়েছেন এবং বলেছেনঃ "এখন তাদের কি বলবার আছে যে, আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দিবেন না, যখন তারা মসজিদুল হারামের পথরোধ করেছে?" অথচ তারা মসজিদুল হারামের তত্ত্বাবধায়ক নয়, মুত্তাকী লোকেরাই হলো ওর তত্ত্বাবধায়ক, কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোক এটা অবগত নয়।" অথচ যাদেরকে কা'বা ঘরে যেতে দিতে বাধা দেয়া হচ্ছে তারাই এর বেশী হকদার যে, তারা ওর মধ্যে নামায পড়বে এবং ওর চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করবে। আর এই কাফিরদেরই মসজিদুল হারামে যাওয়ার অধিকার নেই। যেমন আল্লাহ পাক বলেনঃ "মুশরিকদের এই অধিকার নেই যে, তারা আল্লাহর মসজিদ সমূহকে আবাদ করে, যে অবস্থায় তারা নিজেদের কুফরীর স্বীকারোক্তি করেছে, তাদের সমস্ত (সৎ) কাজ বিফল হয়ে গেল, আর তারা জাহান্নামে অনন্তকাল থাকবে। হ্যাঁ, আল্লাহর মসজিদগুলো আবাদ করা তাদেরই কাজ যারা আল্লাহর প্রতি এবং কিয়ামতের দিবসের প্রতি ঈমান আনয়ন করে, নামায কায়েম রাখে, যাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ ছাড়া আর কাউকেও ভয় করে না, বস্তুতঃ এই সকল লোক সম্বন্ধে আশা যে, তারা নিজেদের লক্ষ্যস্থলে পৌঁছে যাবে।" আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ

وَ صَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ وَ كُفْرٌۢ بِهٖ وَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاِخْرَاجُ اَهْلِهٖ مِنْهُ اَكْبَرُ عِنْدَ اللّٰهِ -

অর্থাৎ "আল্লাহর পথ থেকে বাধা প্রদান করা, তাঁর সাথে কুফরী করা, মসজিদুল হারাম হতে বাধা দেয়া ও মক্কার অধিবাসীকে মক্কা থেকে বের করে দেয়া আল্লাহর নিকট বড় রকমের পাপ বলে গণ্য।" (২ঃ ২১৭) হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলঃ "আপনার বন্ধু কারা?" উত্তরে তিনি বলেছিলেনঃ "প্রত্যেক মুত্তাকী ব্যক্তি (আমার বন্ধু)।" অতঃপর তিনি اِنْ اَوْلِيَاۤؤُهٗۤ اِلَّا الْمُتَّقُوْنَ -এ আয়াতটি পাঠ করেন। ইমাম হাকিম (রঃ) স্বীয় "মুসতাদরিক" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) কুরায়েশদেরকে একত্রিত করেন। অতঃপর তাদেরকে জিজ্ঞেস করেনঃ "তোমাদের মধ্যে তোমাদের (কুরায়েশ) ছাড়া আর কেউ আছে কি?" তারা উত্তরে বলেঃ "(আমরা ছাড়া) আমাদের মধ্যে রয়েছে আমাদের ভাগিনেয়, আমাদের মিত্র এবং আমাদের গোলাম।" তখন তিনি বললেনঃ "মিত্র, ভাগিনেয় এবং গোলাম একই গোত্রের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হয়ে থাকে। তোমাদের মধ্যে যারা মুত্তাকী তারাই আমার বন্ধু।" মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, এর দ্বারা জিহাদকারীদেরকে বুঝানো হয়েছে, তাঁরা যাঁরাই হন বা যেখানেই থাকুন না কেন। অতঃপর এই আলোচনা করা হয়েছে যে, ঐ লোকগুলো মসজিদুল হারামে কি কাজ করতো? আল্লাহ পাক ঘোষণা করছেন– "কা'বা ঘরের কাছে তাদের নামায হলো শিস ও করতালি প্রদান।" তারা উলঙ্গ অবস্থায় বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করতো, মুখে অঙ্গুলি ভরে দিয়ে বাঁশির মত শব্দ বের করতো, মুখ ঝুঁকাতো এবং তালি বাজাতো। আর এটাকেই তারা ইবাদত মনে করতো। বাম দিক থেকে তারা তাওয়াফ করতো। এর দ্বারা মুসলমানদেরকে কষ্ট দেয়াই হতো তাদের উদ্দেশ্য। এইভাবে তারা মুসলমানদেরকে ঠাট্টা ও উপহাস করতো। مُكَاۤءً শব্দের অর্থ হচ্ছে বাঁশি বাজানো।[১] আবদুর রহমান ইবনে যায়েদ (রঃ) বলেন যে, تَصْدِيَةً শব্দের অর্থ হচ্ছে আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে বাধা প্রদান করা।

فَذُوْقُوا الْعَذَابَ সুতরাং এখন শাস্তির স্বাদ গ্রহণ কর। এই শাস্তি এই যে, বদরের যুদ্ধে তারা নিহতও হয়েছিল এবং বন্দীও হয়েছিল। মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, স্বীকারোক্তিকারীদের শাস্তি তরবারী দ্বারা হয়ে থাকে এবং মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদের শাস্তি বিকট চীৎকার ও ভূমিকম্পের মাধ্যমে হয়ে থাকে।

১. এটা হচ্ছে ইবনে আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রঃ), ইকরামা (রঃ), সাঈদ ইবনে জুবাইর (রঃ) এবং কাতাদা (রঃ)-এর উক্তি।

৩৬। নিশ্চয়ই কাফির লোকেরা মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে নিবৃত্ত করার উদ্দেশ্যে তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে, তারা তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করতেই থাকবে, অতঃপর ওটাই শেষ পর্যন্ত তাদের জন্যে দুঃখ ও আফসোসের কারণ হবে এবং তারা পরাভূতও হবে, আর যারা কুফরী করে তাদেরকে জাহান্নামে একত্রিত করা হবে।

٣٦- اِنَّ الَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا يُنۡفِقُوۡنَ اَمۡوَالَهُمۡ لِيَصُدُّوۡا عَنۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ ؕ فَسَيُنۡفِقُوۡنَهَا ثُمَّ تَكُوۡنُ عَلَيۡهِمۡ حَسۡرَةً ثُمَّ يُغۡلَبُوۡنَ ؕ وَ الَّذِيۡنَ كَفَرُوۡۤا اِلٰى جَهَنَّمَ يُحۡشَرُوۡنَ ۙ

৩৭। এটা এই কারণে যে, আল্লাহ ভাল হতে মন্দকে পৃথক করবেন (কুজনকে সুজন হতে আলাদা করবেন), আর কুজনদের এককে অপরের উপর রাখবেন, অতঃপর সকলকে একত্রিত করে স্তুপীকৃত করবেন এবং জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন, এইসব লোকই চরম ক্ষতিগ্রস্ত লোক।

٣٧- لِيَمِيۡزَ اللّٰهُ الۡخَبِيۡثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَ يَجۡعَلَ الۡخَبِيۡثَ بَعۡضَهٗ عَلٰى بَعۡضٍ فَيَرۡكُمَهٗ جَمِيۡعًا فَيَجۡعَلَهٗ فِىۡ جَهَنَّمَ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الۡخٰسِرُوۡنَ ؑ

বদরের যুদ্ধে কুরায়েশদের উপর যখন বিপদ পৌঁছে এবং তারা মক্কা প্রত্যাবর্তন করে, আর আবূ সুফিয়ানও কাফেলাসহ মক্কা ফিরে যান তখন আবদুল্লাহ ইবনে আবি রাবিআহ, ইকরামা ইবনে আবি জেহেল, সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া এবং কুরায়েশদের আরো কয়েকজন লোক, যাদের পিতা, পুত্র এবং ভাই যুদ্ধে নিহত হয়েছিল তারা আবূ সুফিয়ানকে বললো এবং ঐ লোকদেরকেও বললো যাদের ব্যবসায়ের মাল ঐ কাফেলায় ছিলঃ "হে কুরায়েশের দল! মুহাম্মাদ (সঃ) তোমাদেরকে নীচে ফেলে দিয়েছে এবং তোমাদের সম্ভ্রান্ত

লোকদেরকে হত্যা করেছে। তার সাথে পুনরায় যুদ্ধ করার জন্যে তোমরা এই কাফেলার সমস্ত মাল দিয়ে দাও, যেন আমরা এর মাধ্যমে তাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারি।" সুতরাং তারা তাদের সমস্ত মাল দিয়ে দিলো। এ ব্যাপারেই আল্লাহ তা'আলা ..... إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ -এ আয়াতটি অবতীর্ণ করেন। অর্থাৎ কাফিররা আল্লাহর পথ থেকে নিবৃত্ত করার উদ্দেশ্যে তাদের মাল-ধন ব্যয় করে। তারা তাদের মাল-ধন ব্যয় করতেই থাকবে, অতঃপর ওটাই তাদের জন্যে দুঃখ ও আফসোসের কারণ হবে এবং তারা পুনরায় পরাজিত হবে এবং তাদেরকে জাহান্নামের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। যাহহাক (রঃ) বলেন যে, এ আয়াতটি আবূ সুফিয়ান এবং কুরায়েশদের মাল-ধন খরচ করার ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়নি, বরং আহলে বদরের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছিল। মোটকথা, যে ব্যাপারেই অবতীর্ণ হোক না কেন আয়াতটি সাধারণ, যদিও এর শানে নুযূল বিশিষ্ট হয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, সত্যের পথ অনুসরণকারীদেরকে বাধা দেয়ার উদ্দেশ্যে কাফিররা তাদের ধন-দৌলত ব্যয় করে থাকে। কিন্তু তাদের এই সমুদয় মাল বিনষ্ট হয়ে যাবে এবং পরিণামে তাদেরকে আফসোস করতে হবে। তারা আল্লাহর নূরকে নির্বাপিত করতে চায়, কিন্তু আল্লাহ চান তাঁর নূরকে পূর্ণ করতে–যদিও এটা কাফিরদের কাছে অপছন্দনীয় হয়। আল্লাহ স্বীয় দ্বীনের সাহায্যকারী ও স্বীয় কালেমাকে জয়যুক্তকারী থাকবেন। কাফিরদের জন্যে দুনিয়ায় রয়েছে অপমান ও লাঞ্ছনা এবং আখিরাতে রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি। যারা যুদ্ধের ময়দান থেকে জীবিত ফিরেছে তারা তাদের লজ্জাজনক পরিণাম স্বচক্ষে অবলোকন করেছে। আর যারা নিহত হয়েছে তারা তো চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামের অধিবাসী হয়ে গেছে।

لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে– যেন আল্লাহ ভাগ্যবানদের থেকে হতভাগাদেরকে পৃথক করে দেন। অর্থাৎ যেন মুমিনরা কাফিরদের থেকে পৃথক হয়ে যায়। আবার এ সম্ভাবনাও রয়েছে যে, এই পৃথককরণ দ্বারা আখিরাতের পৃথককরণ বুঝানো হয়েছে। যেমন আল্লাহ পাক বলেনঃ "আমি মুশরিকদেরকে বলবো– তোমরা ও তোমাদের শরীকরা তোমাদের স্থানে অবস্থান কর, আমি তাদের মাঝে স্বাতন্ত্র্য আনয়ন করবো।" অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেনঃ "সেই দিন তারা পৃথক পৃথক হয়ে যাবে।" আর এক জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "হে অপরাধীরা! আজ তোমরা (মুমিনদের হতে) পৃথক হয়ে যাও।" অথবা এর দ্বারা দুনিয়াতেই পৃথক হওয়া উদ্দেশ্য। তা

এভাবে যে, মুমিনদের আমল আলাদা এবং কাফিরদের আমল আলাদা। আর لِيَمِيْزَ -এর لَامْ টি سَبَبِيَّة বা কারণ সম্পর্কীয় হতে পারে। অর্থাৎ পাপ কার্যের উপর মাল খরচ করার কারণে আল্লাহ তা'আলা ভাল হতে মন্দকে পৃথক করে দিয়েছেন। অর্থাৎ এই স্বাতন্ত্র্য আনয়নের জন্যে যে, কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করার ব্যাপারে কে আল্লাহর আনুগত্য স্বীকার করছে এবং কে এর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে পাপী হয়ে যাচ্ছে। যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ দুটো সেনাবাহিনী মুখোমুখী হওয়ার সময় তোমাদের উপর যা কিছু পৌঁছেছিল তা আল্লাহর হুকুমেই ছিল, যেন তিনি মুমিনদেরকেও দেখে নেন। আর ঐ লোকদেরকেও দেখে নেন যারা কপটতাপূর্ণ কাজ করেছে। তাদেরকে বলা হয়েছিল– এসো, আল্লাহর পথে যুদ্ধ কর অথবা শত্রুদের প্রতিরোধকারী হয়ে যাও। তারা বললো– "যদি আমরা কোন নিয়মিত যুদ্ধ দেখতাম তবে অবশ্যই তোমাদের সঙ্গী হয়ে যেতাম।" আল্লাহ তা'আলা আর এক জায়গায় বলেনঃ "তোমরা কি ধারণা কর যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে? অথচ এখন পর্যন্ত আল্লাহ তাদেরকে তো দেখেই নেননি যারা তোমাদের মধ্যে জিহাদ করেছে এবং তাদেরকেও দেখেননি যারা জিহাদে দৃঢ়পদ থাকে।" মহান আল্লাহ আরো বলেনঃ আল্লাহ মুমিনদের এ অবস্থায় রাখতে চান না যে অবস্থায় তোমরা এখন রয়েছো, যে পর্যন্ত না তিনি অপবিত্রকে পবিত্র হতে পৃথক করেন এবং আল্লাহ এরূপ অদৃশ্য বিষয় তোমাদেরকে অবহিত করেন না।" এর দৃষ্টান্ত সূরায়ে বারাআতেও রয়েছে। সুতরাং এ আয়াতের ভাবার্থ হচ্ছে– আমি তোমাদেরকে কাফিরদের সাথে ভিড়িয়ে দিয়ে পরীক্ষা করবো। তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করবে এবং তোমাদের বিরুদ্ধে তাদের ধন-মাল খরচ করবে। এটা শুধু এই পৃথককরণের জন্যে যে, অপবিত্র কারা এবং পবিত্র কারা। رَكْم শব্দের অর্থ হচ্ছে একটা জিনিসের উপর একটা জিনিসকে একত্রিত করা। যেমন মেঘ সম্পর্কে আল্লাহ পাক বলেনঃ ثُمَّ يَجْعَلُهٗ رُكَامًا অর্থাৎ "অতঃপর ঐ মেঘকে তিনি স্তরে স্তরে সাজিয়ে দেন।" (২৪ঃ ৪৩) فَيَجْعَلَهٗ فِيْ جَهَنَّمَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ। অর্থাৎ "অতঃপর তিনি তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন, ঐসব লোকই হচ্ছে চরম ক্ষতিগ্রস্ত লোক।"

৩৮। (হে নবী সঃ)! তুমি কাফিরদেরকে বল–তারা যদি অনাচার থেকে বিরত থাকে (এবং আল্লাহর দ্বীনে ফিরে

٣٨- قُلْ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ يَّنْتَهُوْا يُغْفَرْ لَهُمْ مَّا قَدْ سَلَفَ وَاِنْ

يَّعُوْدُوْا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْاَوَّلِيْنَ ○

আসে) তবে পূর্বে যা হয়েছে তা আল্লাহ ক্ষমা করবেন, কিন্তু তারা যদি অন্যায়ের পুনরাবৃত্তি করে, তবে পূর্ববর্তী জাতিসমূহের সাথে কি আচরণ করা হয়েছিল তা তো অতীত ঘটনা।

٣٩- وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهٗ لِلّٰهِ فَاِنِ انْتَهَوْا فَاِنَّ اللّٰهَ بِمَا يَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ○

৩৯। তোমরা সদা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে থাকবে যতক্ষণ না ফিৎনার অবসান হয় এবং দ্বীন সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর জন্যেই হয়ে যায় (অর্থাৎ আল্লাহর দ্বীন ও শাসন সামগ্রিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়), আর তারা যদি ফিৎনা ও বিপর্যয় সৃষ্টি হতে বিরত তাকে তবে তারা কি করছে তা আল্লাহই দেখবেন।

٤٠- وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ مَوْلٰىكُمْ نِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ ○

৪০। আর যদি তোমাকে না-ই মানে ও দ্বীন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে জেনে রেখো যে, আল্লাহই তোমাদের (মুসলমানদের) অভিভাবক ও বন্ধু, তিনি কতইনা উত্তম অভিভাবক ও কতইনা উত্তম সাহায্যকারী!

আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদ (সঃ)-কে সম্বোধন করে বলছেন, তুমি কাফিরদেরকে বলে দাও– তোমরা যদি কুফরী ও বিরুদ্ধাচরণ হতে বিরত থেকে ইসলাম গ্রহণ করতঃ ক্ষমা প্রার্থনা কর তবে কুফরীর যুগে যেসব গুনাহ তোমরা করেছো সবই আল্লাহ ক্ষমা করে দিবেন। যেমন হযরত ইবনে মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "যে ব্যক্তি ইসলামে ভাল কাজ

করলো তাকে অজ্ঞতা যুগের কার্যাবলী সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি ইসলামের মধ্যে আসার পরেও খারাপ কাজ করতে থাকলো তাকে দু' যুগেরই আমল সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে।" সহীহ হাদীসে আরো রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "ইসলাম পূর্ববর্তী পাপরাশির জন্যে তাওবা স্বরূপ এবং এই তাওবা পূর্বের সমস্ত গুনাহ মিটিয়ে দেয়।" কিন্তু হে নবী (সঃ)! তারা যদি তাদের পূর্বের অবস্থার উপরই প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং কুফরী ও বিরোধিতা পরিত্যাগ না করে তবে পূর্ববর্তী লোকদের পরিণাম কি হয়েছিল তা কি তারা জানে না? জেনে রেখো যে, শাস্তিই হবে এর চিকিৎসা। سُنَّتُ الْاَوَّلِيْنَ দ্বারা মুজাহিদ (রঃ) এবং সুদ্দী (রঃ) "বদরের দিন" উদ্দেশ্য নিয়েছেন। তাঁরা বলেছেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে– তোমরা কাফিরদের সাথে খুব বেশী যুদ্ধ কর যে পর্যন্ত না ফিৎনা দূর হয় এবং দ্বীন আল্লাহর জন্যেই হয়ে যায়।

হযরত নাফে' (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একটি লোক হযরত ইবনে উমার (রাঃ)-এর নিকট এসে বলেনঃ হে আবদুর রহমান (রাঃ)! আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ 'যদি মুমিনদের দু'টি দল পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হয় .....।' এরূপ দু'টি জামাআতের উল্লেখ যখন কুরআন কারীমে রয়েছে তখন আপনি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করছেন না কেন? উত্তরে হযরত ইবনে উমার (রাঃ) তাঁকে বলেনঃ "হে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র! কোন মুমিনকে ইচ্ছাপূর্বক হত্যা করা অপেক্ষা যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করার ভর্ৎসনা সহ্য করা আমার পক্ষে অধিক সহজ। যেহেতু আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وَ مَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا .....

অর্থাৎ "যে ব্যক্তি কোন মুমিনকে ইচ্ছাপূর্বক হত্যা করবে .....।" (৪ঃ ৯৩) হযরত ইবনে উমার (রাঃ) বলেনঃ "রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর যুগে আমাদের অবস্থা এরূপই ছিল। ইসলামে লোকদের সংখ্যা খুবই কম ছিল। দ্বীনের ব্যাপারে লোকেরা পরীক্ষার মধ্যে পড়ে গিয়েছিল। তাদেরকে হত্যা করে দেয়া হতো অথবা বন্দী করা হতো। এভাবে তারা কঠিন বিপদের মধ্যে পতিত হয়েছিল। অতঃপর যখন ইসলামের উন্নতি লাভ হলো তখন ফিৎনা আর বাকী থাকলো না।" মোটকথা, ঐ আপত্তিকারী লোকটির মতের সাথে যখন হযরত ইবনে উমার (রাঃ)-এর মতের মিল খেলো না তখন সে কথার মোড় ফিরিয়ে দিয়ে বললোঃ "হযরত আলী (রাঃ) ও হযরত উসমান (রাঃ) সম্পর্কে আপনার ধারণা কি?"

উত্তরে তিনি বললেনঃ "হযরত উসমান (রাঃ) সম্পর্কে বলতে গেলে তো এটাই বলতে হয় যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে ক্ষমা করে দিয়েছেন, অথচ তোমরা তাঁকে ক্ষমা করে দেয়াকে অপছন্দ করছো। আর হযরত আলী (রাঃ) তো রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর চাচাতো ভাই ও জামাতা।" অতঃপর তিনি হাত দ্বারা ইশারা করে বললেনঃ "আর ঐ দেখো, ওখানে রয়েছেন রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কন্যা (হযরত ফাতিমা রাঃ)।"

হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইর (রাঃ) বলেন, হযরত ইবনে উমার (রাঃ) আমাদের কাছে আগমন করেন এবং বলেনঃ "ফিৎনার যুদ্ধের ব্যাপারে তোমাদের অভিমত কি? আর ফিৎনা কাকে বলে? নবী (সঃ) যেই সময় মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ করতেন সেই সময় ফিৎনা আত্মপ্রকাশ করেছিল। আর তোমাদের যুদ্ধ তো শুধু আধিপত্য ও ক্ষমতা লাভের জন্যেই চলছে।" হযরত ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইর (রাঃ)-এর ফিৎনার ব্যাপারে দু'টি লোক তাঁর কাছে আসে এবং বলে– "লোকেরা যেসব আমল করছে তা আপনার অজানা নয়। আপনি হযরত উমারের ছেলে এবং রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাহাবী। সুতরাং এ ব্যাপারে বের হতে আপনাকে কিসে বাধা দিচ্ছে?" উত্তরে তিনি বলেনঃ "আমাকে এটাই বাধা দিচ্ছে যে, আল্লাহ তা'আলা এক মুসলমানের রক্ত তার অপর মুসলমান ভাই-এর উপর হারাম করেছেন।" তখন জনগণ জিজ্ঞেস করেঃ "তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকবে যতক্ষণ না ফিৎনার অবসান হয় এবং দ্বীন সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর জন্যে হয়ে যায়" -একথা কি আল্লাহ তা'আলা বলেননি? উত্তরে তিনি বলেনঃ "আমরা তো ফিৎনাকে মিটিয়ে দেয়ার জন্যে বহু যুদ্ধ করেছি, শেষ পর্যন্ত ফিৎনা দূর হয়ে গেছে। আর তোমরা মুসলমানদের দু'টি দল এ কারণে যুদ্ধ করতে চাচ্ছ যে, যেন ফিৎনা সৃষ্টি হয়ে যায় এবং দ্বীন আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্যে হয়ে যায়।"

হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রাঃ) বলেনঃ "যে ব্যক্তি لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ বলেছে, আমি তো তাকে কখনো হত্যা করবো না।" তখন সা'দ ইবনে মালিকও (রাঃ) ঐ কথাই বলেন। তখন একটি লোক وَ قَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ.... -এ আয়াতটি পাঠ করলেন। তখন তাঁরা দু'জন বললেনঃ "ফিতনা অবসানের জন্যে আমরা যুদ্ধ করেছি এবং ফিৎনার অবসান ঘটেছে, আর দ্বীন একমাত্র আল্লাহর জন্যে হয়ে গেছে।"

وَيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهٗ لِلّٰهِ দ্বারা খাঁটি বা নির্ভেজাল তাওহীদ বুঝানো হয়েছে, যার মধ্যে শিরকের কোনই মিশ্রণ থাকবে না এবং আল্লাহর ক্ষমতায় কাউকে শরীক বানানো হবে না। হযরত যায়েদ ইবনে আসলাম (রঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে দ্বীনে ইসলামের বিদ্যমানতায় কুফরী অবশিষ্ট থাকবে না। এর সত্যতা এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "আমি কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে আদিষ্ট হয়েছি যে পর্যন্ত না তারা لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ বলে। যদি তারা তা বলে তবে তাদের জান-মালের নিরাপত্তা এসে যাবে, তবে কোন কারণে কিসাস গ্রহণ হিসেবে তাকে হত্যা করা যেতে পারে এবং তার হিসাব আল্লাহর দায়িত্বে রয়েছে।" হযরত আবূ মূসা আশআরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একটি লোক সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়, যে লোকটি স্বীয় বীরত্ব প্রকাশের উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করেছে বা গোত্র ও বংশের স্বার্থ রক্ষার্থে জিহাদ করেছে অথবা খ্যাতি লাভের উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করেছে, এগুলোর মধ্যে আল্লাহর পথে জিহাদ কোন্‌টি? উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "যে ব্যক্তি আল্লাহর কালেমা সমুন্নত করার উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করে সেই শুধু আল্লাহর পথে জিহাদকারী রূপে পরিগণিত।"

فَاِنِ انْتَهَوْا অর্থাৎ হে মুমিনগণ! তারা ভিতরে কুফরী রেখেই তোমাদের সাথে যুদ্ধ করা হতে বিরত থাকে তবে তোমরাও হাত উঠিয়ে নাও। কেননা, তোমরা তাদের অন্তরের কথা অবগত নও। তাদের অন্তরের কথা একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই জানেন। তিনি তাদেরকে সব সময় দেখতে রয়েছেন। যেমন আল্লাহ পাক বলেনঃ "যদি তারা তাওবা করে, নামায প্রতিষ্ঠিত করে এবং যাকাত দেয় তবে তোমরা তাদের পথ ছেড়ে দাও (অর্থাৎ তখন তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার কোনই প্রয়োজন নেই)।" আর এক জায়গায় মহান আল্লাহ বলেনঃ "ফিৎনার অবসান না হওয়া পর্যন্ত তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ কর যেন দ্বীন আল্লাহর জন্যে হয়ে যায়, অতঃপর তারা যদি বিরত থাকে তবে (যুদ্ধের আর প্রয়োজন নেই) বাড়াবাড়ি ও সীমালংঘনের অনুমতি শুধু অত্যাচারীদের ব্যাপারে রয়েছে।" সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, হযরত উসামা (রাঃ) একটি লোককে তলোয়ার মারতে উদ্যত হলে লোকটি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পাঠ করে। তবুও হযরত উসামা (রাঃ) তাকে তরবারী দ্বারা হত্যা করে দেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে এ সংবাদ পৌঁছলে তিনি হযরত উসামা (রাঃ)-কে বলেনঃ "সে লা ইলাহা

ইল্লাল্লাহ পাঠ করেছে এর পরও তুমি তাকে হত্যা করেছো কেন? কিয়ামতের দিন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর ব্যাপারে তুমি কি করবে?” উত্তরে হযরত উসামা (রাঃ) আরয করেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! সে শুধু প্রাণ বাঁচানোর জন্যে এ কথা বলেছিল।” তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ “তুমি কি তার অন্তর ফেড়ে দেখেছিলে?” অতঃপর ‘কিয়ামতের দিন তুমি কি করবে’ -এ কথা তিনি তাঁকে বার বার বলতে থাকেন। হযরত উসামা (রাঃ) তখন বলেনঃ “আমি আকাঙ্খা করতে লাগলাম যে, আমি যদি সে দিনের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ না করে থাকতাম (তবে ইসলামের ধারণায় তাকে হত্যা করতাম না)!”

আল্লাহ পাক বলেন, তারা যদি তোমাকে না-ই মানে ও দ্বীন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে জেনে রেখো যে, আল্লাহই তোমাদের অভিভাবক ও বন্ধু, তিনি কতই না উত্তম অভিভাবক ও কতই না উত্তম সাহায্যকারী! অর্থাৎ যদি তাদের স্বভাবের কোন পরিবর্তন না ঘটে এবং তারা তোমাদের বিরোধিতায় লেগেই থাকে তবে জেনে রেখো যে, তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহই তোমাদের সাহায্যকারী।

আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ান উরওয়া (রাঃ)-কে একটি পত্র লিখেন এবং তাতে তিনি তাঁকে কতগুলো কথা জিজ্ঞেস করেন। তখন হযরত উরওয়া (রাঃ) তাঁকে উত্তরে লিখেনঃ আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। প্রথমে আমি এক আল্লাহর প্রশংসা করছি। অতঃপর, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতের ঘটনাবলী আপনি আমার কাছে জানতে চেয়েছেন। আমি আপনাকে জানাচ্ছি যে, ক্ষমতা আল্লাহ ছাড়া আর কারোরই নেই। মহান আল্লাহ রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে নবুওয়াত দান করেছিলেন। তিনি কতই না ভাল নবী ও কতই না ভাল নেতা ছিলেন! আল্লাহ তাঁকে উত্তম পুরস্কার প্রদান করুন, জান্নাতে তাঁর চেহারা দর্শনের আমাদেরকে তাওফীক দান করুন, আমাদেরকে তাঁরই দ্বীন ও মিল্লাতের উপর জীবিত রাখুন, তাঁরই দ্বীনের উপর মৃত্যু দান করুন এবং তাঁরই সাথে আমাদের পুনরুত্থান ঘটিয়ে দিন। তিনি যখন জনগণকে হিদায়াত ও ইসলামের আলোকের দিকে আহ্বান করেন তখন তারা তাঁর সেই তাবলীগের প্রতি কোন গুরুত্ব দেয়নি। তারা তার উপর অবতারিত অহীও শুনতো। যখন তিনি তাদের মূর্তিগুলোর সমালোচনা শুরু করলেন তখন তায়েফ থেকে মক্কায় প্রত্যাবর্তনকারী ধনী কুরায়েশদের অধিকাংশ লোক তাঁর তাবলীগের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করলো এবং তাঁর উপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠলো। যে কেউই মুসলমান হতো তাকেই তারা

বিভ্রান্ত করতে থাকতো। সুতরাং ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট সাধারণ লোকদেরও আর আকর্ষণ থাকলো না। তথাপি কতক লোক তাদের মতের উপর দৃঢ় থাকলো এবং তাদের ধারণা ও চিন্তাধারা ইসলামের দিক থেকে বিক্ষিপ্ত হলো না। তখন কুরায়েশ নেতৃবর্গ পরস্পর পরামর্শ করলো যে, ইসলাম গ্রহণকারীদের উপর কঠোরতা অবলম্বন করা হোক। এই ফিৎনা ছিল একটা ভীষণ ভূ-কম্পন। যারা এই ফিৎনায় জড়িয়ে পড়ার ছিল তারা তাতে জড়িয়ে পড়লো এবং যাদেরকে আল্লাহ তা থেকে নিরাপদে রাখলেন তারা নিরাপদে থাকলো। মুসলমানদের উপর কুরায়েশদের অত্যাচার যখন চরমে উঠলো তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁদেরকে আবিসিনিয়ায় হিজরত করার পরামর্শ দিলেন। আবিসিনিয়ার বাদশাহ্ ছিলেন একজন সৎ লোক যাঁর নাম ছিল নাজ্জাশী। তিনি অত্যাচারী বাদশাহ্ ছিলেন না। চতুর্দিকেই তাঁর প্রশংসা করা হচ্ছিল। আবিসিনিয়া ছিল কুরায়েশদের ব্যবসা কেন্দ্র এবং ব্যবসায়ী কুরায়েশদের সেখানে ঘড়বাড়ীও ছিল। সেখানে ব্যবসা বাণিজ্য করে তারা প্রচুর ধন-সম্পদ লাভ করেছিল এবং তাদের ব্যবসা ছিল বেশ জাঁকজমকপূর্ণ। সুতরাং রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নির্দেশক্রমে কুরায়েশদের অত্যাচারে জর্জরিত সাধারণ মুসলমানরা আবিসিনিয়ায় হিজরত করলেন। কেননা, মক্কায় তাদের প্রাণের ভয় ছিল। আবিসিনিয়ায় তাঁরা চিরকাল অবস্থান করেননি, বরং শুধু কয়েক বছর তাঁরা সেখানে বসবাস করেছিলেন। সেখানেও মুসলমানরা ইসলাম ছড়িয়ে দেন। সেখানকার সম্ভ্রান্ত লোকেরাও ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন। কুরায়েশরা যখন দেখলো যে, মুসলমানদের উপর অত্যাচার করার ফলে তারা আবিসিনিয়ায় চলে যাচ্ছে এবং তথাকার নেতৃবর্গকে নিজেদের লোক বানিয়ে নিচ্ছে তখন তারা মুসলমানদের উপর নরম ব্যবহার করাই যুক্তিসঙ্গত মনে করলো। সুতরাং তারা নবী (সঃ) ও সাহাবীদের সাথে নরম ব্যবহার করতে শুরু করলো। কাজেই মুসলমানদের প্রথম পরীক্ষা ছিল এটাই যা তাঁদেরকে আবিসিনিয়ায় হিজরত করতে বাধ্য করেছিল।

যখন স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসলো এবং যে ফিৎনার ভূ-কম্পন মুসলমান সাহাবীদেরকে মাতৃভূমি ছেড়ে আবিসিনিয়ায় হিজরত করতে বাধ্য করেছিল, সেই ফিৎনা কিছুটা প্রশমিত হওয়ার সংবাদ আবিসিনিয়ার মুহাজির মুসলমানদেরকে পুনরায় মক্কায় ফিরে আসতে উত্তেজিত করলো। সুতরাং কম বেশী তাঁরা যতজন আবিসিনিয়ায় হিজরত করেছিলেন সবাই মক্কায় ফিরে আসলেন।

এদিকে মদীনার আনসারগণ মুসলমান হতে থাকেন এবং মদীনাতেও ইসলামের বিস্তৃতি ঘটতে থাকে। মদীনার লোকদের মক্কায় যাতায়াত শুরু হয়ে যায়। এতে মক্কাবাসী আরো চটে যায় এবং পুনরায় মুসলমানদের উপর কঠোরতা অবলম্বনের পরামর্শ গ্রহণ করে। সুতরাং মুসলমানদের উপর সাধারণভাবে অত্যাচার শুরু হয়ে যায়। মুসলমানরা ভীষণ অত্যাচারের শিকারে পরিণত হন। এটা ছিল মুসলমানদের দ্বিতীয় ফিৎনা ও পরীক্ষা। প্রথম ফিৎনা তো ওটাই যে, মুসলমানদেরকে আবিসিনিয়ায় পালাতে হয়। আর দ্বিতীয় ফিৎনা হচ্ছে– সেখান থেকে মুসলমানদের ফিরে আসার পর যখন মক্কাবাসী দেখলো যে, মদীনার লোক মক্কার সাথে যোগাযোগ করছে এবং মুসলমান হয়ে যাচ্ছে। একবার মদীনা থেকে সত্তরজন লোক মক্কা আসলেন, যাঁরা ছিলেন গণ্যমান্য ও নেতৃস্থানীয় লোক। তাঁরা সবাই মুসলমান হয়ে যান। তাঁরা হজ্ব পর্ব পালন করেন, 'আকাবা' নামক স্থানে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর হাতে দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং অঙ্গীকার করে বলেনঃ "আমরা আপনার হয়ে থাকবো এবং আপনি আমাদের হয়ে থাকবেন। যদি আপনার সাহাবীরা আমাদের শহরে গমন করেন বা আপনি আমাদের ওখানে তাশরীফ আনয়ন করেন তবে আমরা আপনার ও আপনার সাহাবীবর্গের এমনভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করবো যেমনভাবে নিজেদের লোকদের করে থাকি।" কুরায়েশরা এই অঙ্গীকারের কথা শুনতে পেয়ে মুসলমানদের উপর আরো বেশী কঠোরতা শুরু করে দিলো। সুতরাং রাসূলুল্লাহ (সঃ) সাহাবীদেরকে মদীনায় হিজরত করার নির্দেশ দিলেন। এটা ছিল দ্বিতীয় ফিৎনা, যা নবী (সঃ)-কে এবং তাঁর সহচরদেরকে মক্কা থেকে বের করে দিলো। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "তোমরা সদা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে থাকবে যতক্ষণ না ফিৎনার অবসান হয় এবং দ্বীন সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর জন্যে হয়ে যায়।" হযরত উরওয়া ইবনে যুবাইর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, এই চিঠিটি তিনি আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ানকে লিখেছিলেন। এসব ব্যাপারে আল্লাহ পাকই সবচেয়ে ভাল জানেন।

নবম পারা সমাপ্ত

٤١- وَ اعْلَمُوْا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهٗ وَ لِلرَّسُوْلِ وَ لِذِي الْقُرْبٰى وَ الْيَتٰمٰى وَ الْمَسٰكِيْنِ وَ ابْنِ السَّبِيْلِ اِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ وَ مَا اَنْزَلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعٰنِ وَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○

৪১। আর তোমরা জেনে রেখো যে, যুদ্ধে তোমরা যা কিছু গনীমতের মাল লাভ করেছো ওর এক পঞ্চমাংশ আল্লাহ, তাঁর রাসূল, নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম, মিসকীন এবং মুসাফিরের জন্যে, (এই নিয়ম তোমরা মেনে চলবে) যদি তোমরা ঈমান এনে থাকো আল্লাহর প্রতি এবং তার প্রতি যা আমি অবতীর্ণ করেছি আমার বান্দার উপর সেই চূড়ান্ত ফায়সালার দিন, যে দিন দু'দল পরস্পরের সম্মুখীন হয়েছিল, আর নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

এখানে আল্লাহ তা'আলা গনীমত বা যুদ্ধলব্ধ মালের ব্যাখ্যা দিচ্ছেন যা তিনি বিশেষভাবে উম্মতে মুহাম্মাদিয়ার জন্যেই হালাল করেছেন। পূর্ববর্তী উম্মতদের জন্যে এটা হারাম ছিল। গনীমত ঐ মালকে বলা হয় যা কাফিরদের উপর আক্রমণ চালানোর পর লাভ করা হয়। আর 'ফাই' হচ্ছে ঐ মাল যা যুদ্ধ না করেই লাভ করা হয়। যেমন তাদের সাথে সন্ধি করে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ কিছু আদায় করা হয় বা ঐ মাল যার কোন উত্তরাধিকারী নেই অথবা যে মাল জিযিয়া, খিরাজ ইত্যাদি হিসাবে পাওয়া যায়। ইমাম শাফিঈ (রঃ) এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী মাশায়েখদের একটি জামা'আতের অভিমত এটাই। কিন্তু কোন কোন আলেম গনীমতের প্রয়োগ ফাই-এর উপর এবং ফাই-এর প্রয়োগ গনীমতের উপর করে থাকেন। এ জন্যেই কাতাদা (রঃ) বলেন যে, এই আয়াত দ্বারা সূরায়ে হাশরের مَا اَفَآءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَ لِلرَّسُوْلِ وَ لِذِي الْقُرْبٰى وَ الْيَتٰمٰى وَ الْمَسٰكِيْنِ (৫৯ঃ ৭)-এই আয়াতটিকে রহিত করা হয়েছে। আর এভাবে গনীমতের মালের পাঁচ অংশের মধ্য হতে চার অংশ তো মুজাহিদদের মধ্যে বন্টিত হবে এবং এক অংশ তাঁদেরকে দেয়া হবে যাঁদের বর্ণনা এই আয়াতে

রয়েছে। কিন্তু এই উক্তিটি গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা, এই আয়াতটি বদর যুদ্ধের পরে অবতীর্ণ হয়, আর ঐ আয়াতটি ইয়াহূদ বানী নাযীরের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। আর জীবনী লেখক ও ইতিহাস লেখক আলেমদের কারো এ ব্যাপারে দ্বি-মত নেই যে, বানী নাযীরের ব্যাপারটি হচ্ছে বদর যুদ্ধের পরের ঘটনা। এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। কিন্তু যাঁরা 'গনীমত' ও 'ফাই'-এর মধ্যে পার্থক্য আনয়ন করে থাকেন তাঁরা বলেন যে, ঐ আয়াতটি 'ফাই' সম্পর্কে অবতীর্ণ হয় এবং এই আয়াতটি গনীমত সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়। আবার কতক লোক 'ফাই' ও 'গনীমত'-এর ব্যাপারটিকে ইমামের মতের উপর নির্ভরশীল বলে মনে করেন। ইমাম ঐ ব্যাপারে নিজের মর্জি মোতাবেক কাজ করবেন। এভাবেই এই দু'টি আয়াতের মধ্যে সামঞ্জস্য এসে যায়। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

এই আয়াতে বর্ণনা রয়েছে যে, গনীমতের মাল হতে এক পঞ্চমাংশ বের করে নিতে হবে, তা কমই হোক আর বেশীই হোক। তা সূঁচই হোক বা সূতাই হোক না কেন। বিশ্ব প্রতিপালক ঘোষণা করছেন যে, যে খিয়ানত করবে সে তা নিয়ে কিয়ামতের দিন হাযির হবে এবং প্রত্যেককেই তার আমলের পূর্ণ প্রতিদান দেয়া হবে। কারো উপর কোন প্রকার অত্যাচার করা হবে না। বলা হয়েছে যে, এক পঞ্চমাংশ হতে আল্লাহ তা'আলার অংশ কা'বা ঘরে দাখিল করা হবে। আবুল আলিয়া রাবাহী (রঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) যুদ্ধলব্ধ মালকে পাঁচ ভাগ করতেন। চার ভাগ তিনি মুজাহিদদের মধ্যে বন্টন করে দিতেন। তারপর এক পঞ্চমাংশ হতে মুষ্টি ভরে বের করতেন এবং তা কা'বা ঘরে দাখিল করে দিতেন। অতঃপর অবশিষ্টাংশকে আবার পাঁচ ভাগে ভাগ করতেন। এক ভাগ তাঁর, দ্বিতীয় ভাগ আত্মীয়দের, তৃতীয় ভাগ ইয়াতীমদের, চতুর্থ ভাগ মিসকীনদের এবং পঞ্চম ভাগ মুসাফিরদের। এ কথাও বলা হয়েছে যে, এখানে আল্লাহর অংশের নাম শুধুমাত্র বরকতের জন্যে নেয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর অংশ থেকেই যেন বর্ণনা শুরু হয়েছে। ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) যখন কোন সৈন্যবাহিনী পাঠাতেন এবং গনীমতের মাল লাভ করতেন তখন তিনি ওটাকে প্রথমে পাঁচ ভাগে ভাগ করতেন। তারপর পঞ্চমাংশকে আবার পাঁচ অংশে বিভক্ত করতেন। অতঃপর তিনি এ আয়াতটিই তিলাওয়াত করেন। সুতরাং فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهٗ وَلِلرَّسُوْلِ এটা শুধু বাক্যের শুরুর জন্যে বলা হয়েছে। আকাশসমূহে ও যমীনে যা কিছু রয়েছে সবই তো আল্লাহর। কাজেই এক পঞ্চমাংশ আল্লাহর রাসূল (সঃ)-এরই প্রাপ্য। বহু মনীষী ও গুরুজনের এটাই উক্তি যে, আল্লাহ ও

রাসূল (সঃ)-এর একটাই অংশ।[১] সহীহ সনদে বর্ণিত নিম্নের হাদীসটি এর পৃষ্ঠপোষকতা করছেঃ

আব্দুল্লাহ ইবনে শাকীক (রঃ) একজন সাহাবী হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন, ওয়াদীল কুরায় আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে এসে জিজ্ঞেস করি, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ) গনীমতের ব্যাপারে আপনি কি বলেন? নবী (সঃ) উত্তরে বলেনঃ "ওর এক পঞ্চমাংশ হচ্ছে আল্লাহর জন্যে এবং বাকী চার অংশ হচ্ছে মুজাহিদদের জন্যে।" আমি পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম, কারো উপর কারো কি অধিক হক নেই? তিনি জবাব দিলেন– "না, এমন কি তুমি তোমার বন্ধুর দেহ থেকে যে তীরটি বের করবে সেই তীরটিও তুমি তোমার সেই মুসলিম ভাই এর চেয়ে বেশী নেয়ার হকদার নও।"[২]

হাসান (রাঃ) স্বীয় মাল হতে এক পঞ্চমাংশের অসিয়ত করেন এবং বলেনঃ "আমি কি নিজের জন্যে ঐ অংশের উপর সম্মত হবো না যা আল্লাহ স্বয়ং নিজের জন্যে নির্ধারণ করেছেন?"

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, গনীমতের মালকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা হতো। চার ভাগ ঐ সৈন্যদের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হতো যাঁরা ঐ যুদ্ধে শরীক থাকতেন। আর পঞ্চম ভাগটি থাকতো আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ)-এর জন্যে। এটাকে আবার চারভাগে ভাগ করা হতো। এর এক চতুর্থাংশের প্রাপক হতেন আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ)। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ)-এর প্রাপ্য এই অংশটি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর আত্মীয়দের মধ্যে বণ্টন করে দেয়া হতো। এক পঞ্চমাংশ থেকে নবী (সঃ) নিজে কিছুই গ্রহণ করতেন না। আব্দুল্লাহ ইবনে বুরাইদা (রাঃ) বলেন যে, আল্লাহর অংশ হচ্ছে তাঁর নবী (সঃ)-এর অংশ এবং নবী (সঃ)-এর অংশ তাঁর স্ত্রীদের প্রাপ্য। আতা ইবনে আবি রাবাহ (রঃ) বলেন যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ)-এর যেটা অংশ সেটা শুধু রাসূল (সঃ)-এরই অংশ। ওটা তাঁর ইচ্ছাধীন, তিনি যে কোন কাজে তা ব্যয় করতে পারেন। মিকদাদ ইবনে মা'দীকারাব (রাঃ) একদা উবাদা ইবনে সামিত (রাঃ), আবূ দারদা (রাঃ) এবং হারিস ইবনে মুআবিয়া কান্দীর (রাঃ) সাথে বসেছিলেন। তাঁরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর হাদীসগুলোর আলোচনা করছিলেন। আবূ দারদা (রাঃ) উবাদা ইবনে সামিত (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেনঃ "অমুক অমুক যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (সঃ) এক

১. এটা নাখঈ (রঃ), হাসান বসরী (র), শা'বী (রঃ), আতা (রঃ) এবং কাতাদা (রঃ) প্রমুখ মনীষীর উক্তি।

২. এ হাদীসটি ইমাম হাফিয আবূ বকর আল-বায়হাকী (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

পঞ্চমাংশের ব্যাপারে কি কথা বলেছিলেন?” উত্তরে উবাদা ইবনে সামিত (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) এক যুদ্ধে গনীমতের এক পঞ্চমাংশের একটি উটের পিছনে সাহাবীদেরকে নামায পড়ান। সালাম ফিরাবার পর তিনি দাঁড়িয়ে যান এবং ঐ উটটির কিছু পশম হাতে নিয়ে বলেন– “গনীমতের এই উটটির এই পশমগুলোও গনীমতের মালেরই অন্তর্ভুক্ত। এ মাল আমার নয়। আমার অংশ তো তোমাদেরই সাথে এক পঞ্চমাংশ মাত্র। এটাও আবার তোমাদেরকেই ফিরিয়ে দেয়া হয়। সুতরাং সূঁচ, সূতা এবং ওর চেয়ে বড় ও ছোট প্রত্যেক জিনিসই পৌঁছিয়ে দাও। খিয়ানত করো না। খিয়ানত বড়ই দূষণীয় কাজ এবং খিয়ানতকারীর জন্যে দুনিয়া ও আখিরাত উভয় স্থানেই আগুন রয়েছে। নিকটবর্তী ও দূরবর্তী লোকদের সাথে আল্লাহর পথে জিহাদ জারী রাখো। শরীয়তের কাজে ভর্ৎসনাকারীর ভর্ৎসনার প্রতি কোন ভ্রুক্ষেপ করো না। স্বদেশে এবং বিদেশে আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত হদ জারী করতে থাকো। আল্লাহর ব্যাপারে জিহাদ করতে থাকো। জিহাদ হচ্ছে জান্নাতের বড় বড় দরজাসমূহের মধ্যে একটি দরজা। এই জিহাদের মাধ্যমেই আল্লাহ তা'আলা দুঃখ ও চিন্তা হতে মুক্তি দিয়ে থাকেন।”[১]

আমর ইবনে আনবাসা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁদেরকে নিয়ে গনীমতের একটি উটের কাছে নামায পড়েন। সালাম ফিরানোর পর তিনি ঐ উটের কিছু পশম নিয়ে বলেনঃ “তোমাদের গনীমতের মালের মধ্য হতে আমার জন্যে এক পঞ্চমাংশ ছাড়া এই পশম পরিমাণও হালাল নয়। আর এই পঞ্চমাংশও তোমাদেরকেই ফিরিয়ে দেয়া হয়।”[২] এই অংশের মধ্য হতে কিছুটা রাসূলুল্লাহ (সঃ) নিজের জন্যেও নির্দিষ্ট করতেন। যেমন দাস, দাসী, তরবারী, ঘোড়া ইত্যাদি। এটা মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন (রঃ), আমির শা'বী (রঃ) এবং অধিকাংশ আলেম বর্ণনা করেছেন। ইমাম আহমাদ (রঃ) এবং ইমাম তিরমিযী (রঃ) ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, ‘যুলফিকার’ তরবারীটি বদর যুদ্ধের গনীমতেরই অন্তর্ভুক্ত, যা নবী (সঃ)-এর কাছে ছিল এবং যার ব্যাপারে তিনি উহুদ যুদ্ধের দিন স্বপ্ন দেখেছিলেন। আয়েশা (রাঃ) বলেন যে, সাফিয়া (রাঃ) এভাবেই রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর হস্তগত হয়েছিলেন।[৩]

১. ইবনে কাসীর (রঃ) বলেন, এটা হচ্ছে অতি উত্তম হাদীস। আমি এটা এভাবে ছয়টি গ্রন্থে দেখিনি। তবে এর পক্ষে বহু সাক্ষ্য প্রমাণ রয়েছে।

২. এ হাদীসটি ইমাম আবূ দাউদ (রঃ) ও ইমাম নাসাঈ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

৩. ইমাম আবূ দাউদ (রঃ) এটা স্বীয় সুনানে বর্ণনা করেছেন।

ইয়াযীদ ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা একটা বেড়ার মধ্যে বসেছিলাম এমন সময় একটি লোক আমাদের কাছে আসলেন। তাঁর হাতে এক খণ্ড চামড়া ছিল। তাতে যা লিখিত ছিল আমরা তা পড়তে লাগলাম। তাতে লিখিত ছিল– "এটা আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ (সঃ)-এর পক্ষ হতে যুহাইর ইবনে আকীশের নিকট প্রেরিত। যদি তোমরা আল্লাহর একত্ব ও তাঁর রাসূল (সঃ)-এর রিসালাতের সাক্ষ্য প্রদান কর, নামায সুপ্রতিষ্ঠিত কর, যাকাত দাও, যুদ্ধলব্ধ মালের এক পঞ্চমাংশ আদায় কর এবং নবী (সঃ)-এর অংশ ও উৎকৃষ্ট অংশ আদায় করতে থাকো তবে তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ)-এর নিরাপত্তার মধ্যে থাকবে।" (বর্ণনাকারী বলেনঃ) আমরা জিজ্ঞেস করলামঃ "এটা কে লিখেছেন?" তিনি উত্তরে বললেনঃ "(এটা) রাসূলুল্লাহ (সঃ) (লিখেছেন)।"[১] সুতরাং এসব বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা এটাই প্রমাণিত হচ্ছে এবং এ জন্যেই অধিকাংশ গুরুজন এটাকে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর বিশিষ্টতার মধ্যে গণ্য করেছেন।

কেউ কেউ বলেন যে, এক পঞ্চমাংশ গনীমতের ব্যাপারে তৎকালীন সময়ের শাসনকর্তার স্বাধীনতা রয়েছে। তিনি মুসলমানদের কল্যাণার্থে তা ইচ্ছামত ব্যয় করতে পারেন। যেমন 'ফাই'-এর মালের ব্যাপারে তাঁর সব কিছু করার অধিকার রয়েছে। শায়েখ আল্লামা ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ (রঃ) বলেন যে, ইমাম মালিক (রঃ)-এর এটাই উক্তি। অধিকাংশ গুরুজনেরও উক্তি এটাই এবং এটাই সর্বাধিক সঠিক উক্তি। এটা যখন প্রমাণিত হয়ে গেল এবং জানাও হলো তখন এও মনে রাখা দরকার যে, পঞ্চমাংশ যা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর অংশ ছিল, এখন তাঁর পরে ওটা কি করতে হবে? এ ব্যাপারে কেউ কেউ বলেন যে, এখন এটা সমকালীন ইমাম অর্থাৎ খলীফাতুল মুসলিমীনের অধিকারে থাকবে। আবূ বকর (রাঃ), আলী (রাঃ), কাতাদা (রঃ) এবং একটি জামা'আতের এটাই উক্তি। আর এ ব্যাপারে একটি মারফূ' হাদীসও এসেছে।

অন্যান্যেরা বলেন যে, এটা মুসলমানদের কল্যাণে ব্যয় করা হবে। অন্য একটি উক্তি রয়েছে যে, এটাও অবশিষ্ট অন্যান্য শ্রেণীর মধ্যে খরচ করা হবে অর্থাৎ আত্মীয়, ইয়াতীম, মিসকীন ও মুসাফিরদের মধ্যে বণ্টিত হবে। ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) এটাই পছন্দ করেছেন। অন্যান্য বুযুর্গদের নির্দেশ এই যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর অংশ ও তাঁর আত্মীয়দের অংশ ইয়াতীম, মিসকীন ও মুসাফিরদেরকে

১. এটা ইমাম আবূ দাঊদ (রঃ) ও ইমাম নাসাঈ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

দিয়ে দেয়া হবে। ইরাকবাসী একটি দলের এটাই উক্তি। আবার এ কথাও বলা হয়েছে যে, পঞ্চমাংশের এই পঞ্চমাংশ সবই আত্মীয়দের প্রাপ্য। যেমন ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন যে, মিনহাল ইবনে আমর (রঃ) বলেন, আমি আব্দুল্লাহ্ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আলী (রঃ)-কে এবং আলী ইবনে হুসাইন (রঃ)-কে এক পঞ্চমাংশ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তাঁরা বলেনঃ "এটা আমাদেরই প্রাপ্য।" আমি তখন জিজ্ঞেস করলাম, আয়াতে ইয়াতীম ও মিসকীনদের বর্ণনাও তো রয়েছে? উত্তরে তাঁরা দু'জন বললেনঃ "এর দ্বারাও আমাদেরই ইয়াতীম ও মিসকীনদেরকে বুঝানো হয়েছে।"

ইমাম হাসান ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে হানাফিয়্যাহ্ (রঃ)-কে وَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَیْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهٗ وَلِلرَّسُوْلِ -এই আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি উত্তরে বলেনঃ "বাক্যটি এভাবে শুরু করা হয়েছে মাত্র, নচেৎ দুনিয়া ও আখিরাতের সব কিছুই তো আল্লাহরই।" রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর পরে এ দুটো অংশ কে পাবেন এ ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। কেউ কেউ বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর অংশ তাঁর খলীফাগণ পাবেন। কারো কারো মতে ওটা তাঁর আত্মীয়েরা পাবেন। আবার কেউ কেউ বলেন যে, ওটা খলীফার আত্মীয়েরা পাবেন। সম্মিলিতভাবে তাঁদের মত এই যে, এই অংশ দুটোকেই ঘোড়া ও অস্ত্রশস্ত্রের কাজে লাগানো হবে। আবূ বকর (রাঃ) ও উমার (রাঃ)-এর খিলাফতের যুগে এরূপই করা হয়েছিল। ইবরাহীম (রঃ) বলেন যে, আবূ বকর (রাঃ) এবং উমার (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর অংশটি জিহাদের কাজে খরচ করতেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলোঃ "আলী (রাঃ) এ ব্যাপারে কি করতেন?" উত্তরে তিনি বললেনঃ "এ ব্যাপারে তিনি সর্বাপেক্ষা কঠিন ছিলেন।" অধিকাংশ আলেমের এটাই উক্তি। হ্যাঁ, তবে আত্মীয়দের অংশটির প্রাপক আব্দুল মুত্তালিবের সন্তানরা। কেননা, তাঁরাই অজ্ঞতার যুগে এবং ইসলামের প্রাথমিক যুগে হাশিমের সন্তানদের সাথে সহযোগিতা করেছিল এবং তাঁদের সাথে তাঁরা ঘাঁটিতে বন্দী জীবন যাপনকেও স্বীকার করে নিয়েছিল। কারণ রাসূলুল্লাহ (সঃ) অত্যাচারিত হচ্ছিলেন বলে এ লোকগুলো রাগান্বিত হয়েছিল এবং তাঁর সাহায্যার্থে এগিয়ে এসেছিল। মুসলমানরা তাঁকে সাহায্য করেছিলেন আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ)-এর আনুগত্যের কারণে। আর এই কাফিররা তাঁকে সাহায্য করেছিল বংশীয় পক্ষপাতিত্ব এবং আত্মীয়তার খাতিরে। কিন্তু বানু আবদে শামস্ ও বানু নাওফিল রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর চাচাতো ভাই হলেও তাঁর সাথে সহযোগিতা করেনি, বরং বিরুদ্ধাচরণ করেছিল এবং তাঁকে পৃথক করে দিয়েছিল। তারা তাঁর

বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল এবং বলেছিল যে, কুরায়েশের অন্যান্য সমস্ত গোত্রই তাঁর বিরোধী। এ জন্যেই আবূ তালিব তাঁর ভর্ৎসনামূলক ও নিন্দাসূচক কবিতায় তাদেরকে বহু তিরস্কার ও নিন্দে করেছেন। কেননা, তারা ছিল রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকটতম আত্মীয়। তিনি বলেছেনঃ "অতিসত্বরই তারা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাদের অপকর্মের পূর্ণ বদলা পেয়ে যাবে। এই নির্বোধরা নিজের লোক হয়েও এবং একই বংশ ও রক্তের লোক হয়েও আমাদের দিক থেকে চক্ষু ফিরিয়ে নিচ্ছে!" ইত্যাদি। জুবাইর ইবনে মুতঈম ইবনে আদী ইবনে নওফেল (রাঃ) বলেন, আমি এবং উসমান ইবনে আফফান ইবনে আবিল আস ইবনে উমাইয়া ইবনে আবদে শাম্স্ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে গেলাম এবং বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আপনি খায়বারের যুদ্ধলব্ধ মালের এক পঞ্চমাংশ হতে বানু আবদিল মুত্তালিবকে দিলেন, কিন্তু আমাদেরকে ছেড়ে দিলেন। অথচ আপনার সাথে আত্মীয়তার সম্পর্কের দিক দিয়ে আমরা ও তারা সমান! তখন তিনি বললেনঃ "বানু হাশিম ও বানু মুত্তালিব তো একই জিনিস।"[১] কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে যে, তাঁরা বলেনঃ "তারা তো অজ্ঞতার যুগেও আমাদের থেকে পৃথক হয়নি এবং ইসলামের যুগেও না।" এটা হচ্ছে জমহূর উলামার উক্তি যে, তারা হলো বানু হাশিম ও বানু মুত্তালিব। কেউ কেউ বলেন যে, এরা হচ্ছে শুধু বানু হাশিম। মুজাহিদ (রঃ) বলেনঃ "আল্লাহ তা'আলা জানতেন যে, বানু হাশিমের মধ্যে দরিদ্র লোক রয়েছে। তাই সাদকার স্থলে গনীমতের মালে তাদের অংশ নির্ধারিত করেছেন। এরা হচ্ছে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ঐ আত্মীয় যাদের জন্যে সাদকা হারাম।" আলী ইবনে হুসাইন (রঃ) হতেও এরূপই বর্ণিত আছে। কেউ কেউ বলেন যে, এরা সবাই কুরায়েশ। ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলঃ "যাবীল কুরবা কারা?" তিনি উত্তরে বলেছিলেন– "আমরা তো বলতাম যে, আমরাই। কিন্তু আমাদের কওম তা স্বীকার করে না। তারা বলে যে, সমস্ত কুরায়েশই 'যাবিল কুরবা'।"[২] কোন কোন রিওয়াইয়াতে শুধু প্রথম বাক্যটিই রয়েছে। দ্বিতীয় বাক্যটির বর্ণনাকারী হচ্ছে আবূ মাশার নাজীহ্ ইবনে আবদির রহমান মাদানী। তাঁর বর্ণনাতেই এই বাক্যটি রয়েছে– তারা বলে যে, সমস্ত কুরায়েশই 'যাবীল কুরবা'। এতে দুর্বলতাও রয়েছে। ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "তোমাদের জন্যে লোকদের ময়লা থেকে আমি মুখ ফিরিয়ে নিয়েছি। তোমাদের

১. এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রঃ) কয়েকটি বাবে বা অনুচ্ছেদে বর্ণনা করেছেন।
২. এ হাদীসটি সহীহ মুসলিম ও অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে রয়েছে।

জন্যে এক পঞ্চমাংশের পঞ্চমাংশই যথেষ্ট।"[১] এই আয়াতে ইয়াতীমদের উল্লেখ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন যে, ইয়াতীমরা যদি দরিদ্র হয় তবে তারা হকদার হবে। আবার অন্য কেউ বলেন যে, ধনী দরিদ্র সব ইয়াতীমই এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত। মিসকীন শব্দ দ্বারা ঐ অভাবীদেরকে বুঝানো হয়েছে যাদের কাছে এই পরিমাণ মাল নেই যে, তা দ্বারা তাদের দারিদ্রতা ও অভাব দূর হতে পারে এবং তা তাদের জন্যে যথেষ্ট হয়। 'ইবনুস সাবীল' দ্বারা ঐ মুসাফিরকে বুঝানো হয়েছে যে দেশ থেকে বের হয়ে এতো দূরে যাচ্ছে যেখানে পৌঁছলে তার জন্যে নামায কসর করা জায়েয হবে এবং সফরের যথেষ্ট খরচ তার কাছে নেই। এর তাফসীর সূরায়ে বারাআতের إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ (৯ঃ ৬০) এই আয়াতে ইনশাআল্লাহ আসবে। আল্লাহ তা'আলার উপরই আমাদের ভরসা এবং তাঁরই কাছে আমরা সাহায্য প্রার্থনা করছি।

إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا

অর্থাৎ হে মুমিনগণ! তোমরা যদি আল্লাহর উপর এবং তাঁর বান্দার প্রতি নাযিলকৃত কিতাবের উপর ঈমান এনে থাকো তবে তিনি যা আদেশ করেছেন তা পালন কর। অর্থাৎ, যুদ্ধলব্ধ মাল হতে এক পঞ্চমাংশ পৃথক করে দাও। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) আবদে কায়েস গোত্রের প্রতিনিধিদলকে বলেছিলেনঃ "আমি তোমাদেরকে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়নের নির্দেশ দিচ্ছি। আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার অর্থ কি তা কি তোমরা জান? তা হচ্ছে সাক্ষ্য দান করা যে, আল্লাহ ছাড়া কেউ উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ (সঃ) তাঁর রাসূল। আর নামায সুপ্রতিষ্ঠিত করা, যাকাত দেয়া এবং গনীমতের মাল থেকে এক পঞ্চমাংশ আদায় করা"। সুতরাং এক পঞ্চমাংশ আদায় করাও ঈমানের অন্তর্ভুক্ত। ইমাম বুখারী (রঃ) স্বীয় কিতাব সহীহ বুখারীতে একটি বাব বা অনুচ্ছেদ বেঁধেছেন যে, 'খুমুস' বা এক পঞ্চমাংশ বের করা ঈমানের অন্তর্ভুক্ত। অতঃপর তিনি ঐ হাদীস আনয়ন করেছেন। আমরা শারহে সহীহ বুখারীর মধ্যে এর পূর্ণ ভাবার্থ আলোচনা করেছি। সুতরাং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্যে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাঁর একটা ইহসান ও ইনআমের কথা বর্ণনা করছেন যে, তিনি হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য আনয়ন করেছেন। তিনি স্বীয় দ্বীনকে জয়যুক্ত করেছেন, স্বীয় নবী (সঃ) ও তাঁর সেনাবাহিনীকে সাহায্য করেছেন

১. ইবনে কাসীর (রঃ) বলেন যে, এটা বড়ই উত্তম হাদীস। এর বর্ণনাকারী ইবরাহীম ইবনে মাহদীকে ইমাম আবূ হাতিম (রঃ) বিশ্বাসযোগ্য বলেছেন।

এবং বদরের যুদ্ধে তাঁদেরকে জয়যুক্ত করেছেন। তিনি ঈমানের কালেমাকে কুফরীর কালেমার উপর উঠিয়ে দিয়েছেন অর্থাৎ কুফরীর কালেমা ঈমানের কালেমার নীচে পড়ে গেছে। সুতরাং يَوْمُ الْفُرْقَانِ দ্বারা বদরের দিনকে বুঝানো হয়েছে, যেই দিন হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য সূচিত হয়েছে। বহু গুরুজন হতে এর তাফসীর এরূপই বর্ণিত হয়েছে। এটাই ছিল প্রথম যুদ্ধ। মুশরিক সেনাদলের নেতা ছিল উৎবা ইবনে রাবীআ'। ঐ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল ১৭ই বা ১৯শে রমযান, রোজ শুক্রবার। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাহাবীবর্গের সংখ্যা ছিল তিন শ'র কিছু বেশী। আর মুশরিকদের সৈন্যসংখ্যা ছিল প্রায় এক হাজার। এতদ্সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের পরাজয় ঘটিয়ে দেন। তাদের সত্তরজনেরও অধিক নিহত হয় এবং ততজনই বন্দী হয়।

মুসতাদরিকে হাকিমে রয়েছে যে, ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বলেনঃ "তোমরা একাদশ রাত্রিতেই লায়লাতুল কদরকে নিশ্চিতরূপে অনুসন্ধান কর। কেননা, ওর সকালই ছিল বদরের যুদ্ধের দিন।" হাসান ইবনে আলী (রাঃ) বলেন যে, লায়লাতুল ফুরকান, যেইদিন উভয় দলে ভীষণ ও ঘোরতর যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল ওটা ছিল রমযান মাসের সতের তারিখ এবং রাত্রিটিও ছিল জুমআ'র রাত্রি। ধর্মযুদ্ধ ও জীবনী গ্রন্থের লেখকদের মতে এটাই সঠিক কথা। তবে ইয়াযীদ ইবনে জাআ'দ (রঃ), যিনি তাঁর যুগের মিশরীয় এলাকার একজন ইমাম ছিলেন, তিনি বলেন যে, বদর যুদ্ধের দিনটি ছিল সোমবার। কিন্তু অন্য কেউই তাঁর অনুসরণ করেননি এবং জমহূরের উক্তিটিই নিশ্চিতরূপে তাঁর এই উক্তির উপর প্রাধান্য পাওয়ার যোগ্য। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক জ্ঞানের অধিকারী।

৪২। (আর স্মরণ কর সেই সময়টির কথা) যখন তোমরা প্রান্তরের এই দিকে ছিলে, আর তারা (কাফির বাহিনী) প্রান্তরের অপর দিকে শিবির রচনা করেছিল, আর উষ্ট্রারোহী কাফেলা তোমাদের অপেক্ষা নিম্নভূমিতে ছিল, যদি পূর্ব হতেই তোমাদের ও তাদের মধ্যে যুদ্ধ সম্পর্কে কোন

٤٢- اِذْ اَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوٰى وَ الرَّكْبُ اَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدْتُّمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي

الْمِيْعٰدِ وَلٰكِنْ لِّيَقْضِيَ اللّٰهُ اَمْرًا كَانَ مَفْعُوْلًا لِّيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْۢ بَيِّنَةٍ وَّيَحْيٰى مَنْ حَيَّ عَنْۢ بَيِّنَةٍ وَاِنَّ اللّٰهَ لَسَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ○

সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে চাইতে তবে তোমাদের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি হতো, কিন্তু যা ঘটাবার ছিল তা আল্লাহ সম্পন্ন করবার জন্যে উভয় দলকে যুদ্ধক্ষেত্রে সমবেত করলেন, তাতে যে ধ্বংস হবে সে যেন সত্য সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হওয়ার পর ধ্বংস হয়, আর যে জীবিত থাকবে সে যেন সত্য সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হওয়ার পর জীবিত থাকে, আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও মহাজ্ঞানী।

يَوْمَ الْفُرْقَانِ সম্পর্কে সংবাদ দিতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "ঐ দিন তোমরা ওয়াদীদ্ দুনিয়ায় ছিলে যা মদীনার নিকটবর্তী একটি জায়গা। আর মুশরিকরা মক্কার দিকে এবং মদীনার দূরবর্তী উপত্যকায় অবস্থান করছিল। এদিকে আবূ সুফিয়ান ও তার বাণিজ্যিক কাফেলা ব্যবসার মাল সম্ভারসহ নীচের দিকে সমুদ্রের ধারে ছিল। হে মুমিনরা! যদি তোমরা ও কাফির কুরায়েশরা প্রথম থেকেই যুদ্ধ করার ইচ্ছা পোষণ করতে তবে যুদ্ধ কোথায় সংঘটিত হবে এ নিয়ে তোমাদের মধ্যে অবশ্যই মতানৈক্য সৃষ্টি হতো।" ভাবার্থ নিম্নরূপও বর্ণনা করা হয়েছেঃ "হে মুমিনগণ! তোমরা যদি পরস্পরের সিদ্ধান্তক্রমে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে থাকতে তবে তোমরা মুশরিক সৈন্যদের আধিক্য ও তাদের রণ সম্ভারের আধিক্য সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পর খুব সম্ভব হতোদ্যম হয়ে পড়তে। এ জন্যেই মহান আল্লাহ কোন পূর্ব সিদ্ধান্ত ছাড়াই দু'টি দলকে আকস্মিকভাবে একত্রে মিলিয়ে দিলেন যাতে আল্লাহর ইচ্ছা পূর্ণ হয়ে যায় এবং ইসলাম ও মুসলিমদের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব এবং মুশরিকদের হীনতা ও নীচতা প্রকাশ পায়। সুতরাং আল্লাহ পাক যা করতে চেয়েছিলেন তা তিনি করেই ফেললেন।" কা'ব ইবনে মালিক (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) ও মুসলমানরা একমাত্র কাফেলার উদ্দেশ্যেই বের হয়েছিলেন। কোন তারিখ নির্ধারণ ও কোন যুদ্ধ প্রস্তুতি ছাড়াই তিনি মুসলমানদেরকে কাফিরদের সাথে মিলিয়ে দিলেন। আবূ সুফিয়ান (রাঃ) সিরিয়া হতে কাফেলাসহ ফিরছিলেন। এদিকে আবূ জেহেল কাফেলাকে

মুসলমানদের হাত থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে বের হয়েছিল। বাণিজ্যিক কাফেলা অন্য পথ ধরে আসছিল। অতঃপর মুসলমান ও কাফিরদের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়ে গেল। এর পূর্বে উভয় দল একে অপর থেকে সম্পূর্ণরূপে বে-খবর ছিল। পানি নেয়ার জন্যে আগমনকারীদেরকে দেখে এক দল অপর দলের অবস্থা অবগত হয়। মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক (রঃ)-এর 'সীরাত' গ্রন্থে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) স্বীয় উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে চলছিলেন। সাফরা নামক স্থানের নিকটবর্তী হয়ে বাসবাস ইবনে আমর (রাঃ) ও আদী ইবনে আবুয্ যা'বা জুহনী (রাঃ)-কে আবূ সুফিয়ান (রাঃ)-এর গতিবিধি লক্ষ্য করার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। তাঁরা দু'জন বদর প্রান্তরে উপস্থিত হয়ে বাতহার একটি টিলার উপর নিজেদের সওয়ারীকে বসিয়ে দেন। অতঃপর তাঁরা পানি নেয়ার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েন। পথিমধ্যে তাঁরা দু'টি মেয়েকে পরস্পর ঝগড়া করতে দেখতে পান। একজন অপরজনকে বলছিলঃ "তুমি আমার ঋণ পরিশোধ করছো না কেন?" অপর মেয়েটি উত্তরে বললোঃ "এতো তাড়াহুড়া করো না। আগামীকাল অথবা পরশু এখানে বাণিজ্যিক কাফেলার আগমন ঘটবে। আমি তখন তোমাকে তোমার প্রাপ্য দিয়ে দেবো।" মাজদা ইবনে আমর নামক একটি লোক মধ্য থেকে বলে উঠলোঃ "এ মেয়েটি সঠিক কথাই বলেছে।" ঐ সাহাবী দু'জন তাদের কথাগুলো শুনে নেন এবং তৎক্ষণাৎ উটের উপর সওয়ার হয়ে নবী (সঃ)-এর খিদমতে হাযির হয়ে যান ও তাঁর কাছে ঐ সংবাদ পরিবেশন করেন। ওদিকে আবূ সুফিয়ান (রাঃ) কাফেলার পূর্বে একাকীই ঐ জায়গায় পৌঁছেন এবং মাজদা ইবনে আমরকে জিজ্ঞেস করেনঃ "এই কূপের কাছে তুমি কাউকে দেখেছিলে কি?" সে উত্তরে বললোঃ "অবশ্যই দু'জন উষ্ট্রারোহী এসেছিল। তারা তাদের উট দু'টি ঐ টিলার উপর বসিয়ে রেখে এখানে এসে মশকে পানি ভর্তি করে নিয়ে চলে গেছে।" এ কথা শুনে আবূ সুফিয়ান (রাঃ) ঐ পাহাড়ের উপর গমন করেন এবং উটের গোবর নিয়ে ভেঙ্গে দেখেন যে, ওর মধ্যে খেজুরের আঁটি রয়েছে। ঐ আঁটি দেখে তিনি বলে ওঠেনঃ "আল্লাহর শপথ! এরা মদীনারই লোক।" সেখান থেকে তিনি কাফেলার কাছে ফিরে যান এবং পথ পরিবর্তন করে সমুদ্রের তীর ধরে চলতে থাকেন। সুতরাং এদিক থেকে তিনি আশ্বস্ত হলেন এবং তাদের রক্ষার্থে আগমনকারী কুরায়েশদেরকে দূত মারফত জানিয়ে দিলেনঃ "আল্লাহ তোমাদের বাণিজ্যিক কাফেলা ও মালধন রক্ষা করেছেন, সুতরাং তোমরা ফিরে যাও।" এ কথা শুনে আবূ জেহেল বলেঃ "না, এত দূর যখন এসেই গেছি তখন বদর পর্যন্ত অবশ্যই যাবো।" ওখানে একটি বাজার বসতো।

তাই সে বললোঃ "ওখানে আমরা তিনদিন অবস্থান করবো এবং উট যবেহ করবো, মদ পান করবো এবং গোশ্তের কাবাব তৈরী করবো যাতে সারা আরবে আমাদের ধুমধামের কথা ছড়িয়ে পড়ে এবং আমাদের বীরত্বপনার সংবাদ সবারই কানে পৌঁছে যায়। ফলে যেন তারা সদা সর্বদা আমাদের নামে ভীত-সন্ত্রস্ত থাকে।" কিন্তু আখনাস ইবনে শুরাইক নামক একটি লোক বললোঃ "হে বানী যুহরা গোত্রের লোকেরা! আল্লাহ তা'আলা তোমাদের মাল রক্ষা করেছেন। সুতরাং তোমাদের ফিরে যাওয়াই উচিত।" ঐ গোত্রের লোকেরা তার কথা মেনে নিলো এবং ফিরে গেল। তাদের সাথে বানু আদী গোত্রের লোকেরাও ফিরে গেল। এদিকে বদরের নিকটবর্তী হয়ে রাসূলুল্লাহ (সঃ) আলী ইবনে আবি তালিব (রাঃ), সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) এবং যুবাইর ইবনে আওয়াম (রাঃ)-কে খবর নেয়ার জন্যে পাঠিয়ে দেন। আরো কয়েকজন সাহাবীকেও তাঁদের সঙ্গী করে দেন। তাঁরা বানু সাঈদ ইবনে আস ও বানু হাজ্জাজের গোলামদ্বয়কে কূয়ার ধারে পেয়ে যান। দু'জনকেই গ্রেফতার করে তাঁরা নবী (সঃ)-এর খিদমতে হাযির করেন। ঐ সময় রাসূলুল্লাহ (সঃ) নামায পড়ছিলেন। তারা তাদেরকে প্রশ্ন করতে শুরু করলেন। তাঁরা প্রশ্ন করলেনঃ "তোমরা কে?" তারা উত্তরে বললোঃ "আমরা কুরায়েশদের পানি বহনকারী। তারা আমাদেরকে পানি নিতে পাঠিয়েছিল।" সাহাবীদের ধারণা ছিল যে, তারা আবূ সুফিয়ানের লোক। এ জন্যে তাঁরা তাদের প্রতি কঠোর হয়ে উঠলেন। তারা ভয় পেয়ে বলে উঠলো যে, তারা আবূ সুফিয়ানের কাফেলার লোক। তখন তাঁরা তাদেরকে ছেড়ে দেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) এক রাকাআত নামায পড়ে নিয়ে সালাম ফিরিয়ে দেন এবং সাহাবীদেরকে সম্বোধন করে বলেনঃ "তারা যখন সত্য কথা বললো তখন তোমরা তাদেরকে মারধর করলে, আর যখন তারা মিথ্যা কথা বললো তখন তোমরা তাদেরকে ছেড়ে দিলে? আল্লাহর কসম! এরা পূর্বে সত্য কথাই বলেছিল। এরা কুরায়েশেরই গোলাম।" অতঃপর তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেনঃ "আচ্ছা বলতো, কুরায়েশদের সেনাবাহিনী কোথায় রয়েছে?" তারা উত্তরে বললোঃ "কুসওয়া উপত্যকার ঐ দিকের ঐ পাহাড়ের পিছনে রয়েছে।" রাসূলুল্লাহ (সঃ) জিজ্ঞেস করলেনঃ "সংখ্যায় তারা কত হতে পারে?" তারা জবাব দিলোঃ "সংখ্যায় তারা অনেক।" তিনি বললেনঃ "সংখ্যায় তারা কত হতে পারে?" তারা বললোঃ "সংখ্যা তো আমাদের জানা নেই।" তিনি বললেনঃ "আচ্ছা, দৈনিক তারা কয়টা উট যবেহ্ করে থাকে তা তোমরা বলতে পার কি?" উত্তরে তারা বললোঃ "কোনদিন নয়টি এবং কোন দিন দশটি।" তিনি তখন মন্তব্য করলেনঃ "তাহলে সংখ্যায় তারা নয় হাজার থেকে দশ হাজার হবে।" তারপর তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেনঃ "তাদের মধ্যে কুরায়েশ নেতৃবর্গের কে কে আছে?" তারা উত্তর

দিলোঃ "তারা হচ্ছে উৎবা ইবনে রাবীআ', সায়বা ইবনে রাবীআ', আবুল বাখতারী ইবনে হিশাম, হাকীম ইবনে হিশাম, নাওফেল ইবনে খুয়াইলিদ, হারিস ইবনে আমির ইবনে নাওফেল, তায়ীমা ইবনে আদী, নাযার ইবনে হারিস, যামআ ইবনে আসওয়াদ, আবূ জেহেল ইবনে হিশাম, উমাইয়া ইবনে খালফ, নাবীহ্ ইবনে হাজ্জাজ, মুনাব্বাহ্ ইবনে হাজ্জাজ, সালাহ ইবনে আমর এবং আমর ইবনে আবদূদ।" এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সঃ) স্বীয় সাহাবীবর্গকে বললেনঃ "জেনে রেখো যে, মক্কা নগরী ওর কলিজার টুকরোগুলোকে তোমাদের দিকে নিক্ষেপ করেছে।"

বদরের দিন দু' দলের মধ্যে যখন মুকাবিলা শুরু হয়ে গেল তখন সা'দ ইবনে মুআয্ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বললেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আপনি যদি অনুমতি দেন তবে আপনার জন্যে একটা কুটির নির্মাণ করে দেই। সেখানে আপনি অবস্থান করবেন। আর আমরা আমাদের জন্তুগুলো এখানে বসিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করবো। যদি আমরা জয়যুক্ত হই তবে তো আলহামদুলিল্লাহ্, এটাই আমাদের কাম্য। আর যদি আল্লাহ না করুন, অন্য কিছু ঘটে যায় তবে আপনি আমাদের জানোয়ারগুলোর উপর সওয়ার হয়ে ওগুলোকে সাথে নিয়ে আমাদের কওমের ঐ মহান ব্যক্তিদের কাছে যাবেন যাঁরা মদীনায় রয়েছেন। আপনার প্রতি তাঁদের ভালবাসা আমাদের চেয়ে বেশী রয়েছে। এখানে কোন যুদ্ধ সংঘটিত হবে এটা তাঁদের অজানা ছিল। তা না হলে তাঁরা কখনো আপনার সঙ্গ ছাড়তেন না। আপনার সাহায্যার্থে অবশ্যই তাঁরা বেরিয়ে আসতেন।" রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর এ পরামর্শ মেনে নিলেন এবং তাঁর জন্যে দুআ' করলেন। অতঃপর তিনি ঐ তাঁবুর মধ্যে অবস্থান করলেন। তাঁর সাথে আবূ বকর (রাঃ) ছাড়া আর কেউই ছিলেন না। সকাল হতেই কুরায়েশ সেনাবাহিনীকে পাহাড়ের পিছন দিক থেকে বেরিয়ে আসতে দেখা গেল। তাদেরকে দেখে রাসূলুল্লাহ (সঃ) আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করতে লাগলেনঃ "হে আল্লাহ! এ লোকগুলো গর্বের সাথে আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে ও আপনার রাসূল (সঃ)-কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার মানসে এগিয়ে আসছে। হে আল্লাহ! আপনি তাদেরকে পরাজিত ও লাঞ্ছিত করুন।" ইবনে ইসহাকের সীরাতের মধ্যে এই আয়াতের শেষ বাক্যটির তাফসীর নিম্নরূপ এসেছেঃ "এটা এ কারণে যে, যেন কাফিররা কুফরীর উপর থেকেও আল্লাহর দলীল প্রমাণ দেখে নেয় এবং মুমিনরাও দলীল দেখেই ঈমানের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। অর্থাৎ কোন উত্তেজনা, শর্ত ও দিন নির্ধারণ ছাড়াই আকস্মিকভাবে আল্লাহ তা'আলা এখানে মুমিন ও কাফিরদেরকে মুকাবিলা করে

দিলেন, উদ্দেশ্য এই যে, তিনি সত্যকে মিথ্যার উপর জয়যুক্ত করে সত্যকে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করবেন, এভাবে যেন কারো মনে কোন সংশয় ও সন্দেহ অবশিষ্ট না থাকে। এখন যে কুফরীর উপর থাকবে সে কুফরীকে কুফরী মনে করেই থাকবে। আর যে মুমিন হবে সে দলীল প্রমাণ দেখেই ঈমানের উপর কায়েম থাকবে। ঈমানই হচ্ছে অন্তরের জীবন এবং কুফরীই হচ্ছে প্রকৃত ধ্বংস।" যেমন আল্লাহ পাক বলেনঃ

أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَٰهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ

অর্থাৎ "ঐ ব্যক্তি, যে মৃত ছিল, অতঃপর আমি তাকে জীবিত করেছি এবং আমি তার জন্যে একটা নূর বানিয়েছি। সে ঐ নূরের মাধ্যমে লোকদের মধ্যে চলাফেরা করছে।" (৬ঃ ১২২) তুহ্মাত বা অপবাদের ঘটনায় আয়েশা (রাঃ)-এর কথাগুলো ছিলঃ " যে ধ্বংস হওয়ার ছিল সে ধ্বংস হলো।" অর্থাৎ অপবাদ দেয়ার ব্যাপারে সে অংশ নিলো।

إِنَّ اللّٰهَ لَسَمِيعٌ অর্থাৎ আল্লাহ তোমাদের বিনয়, প্রার্থনা, ইস্তিগফার, ফরিয়াদ, মুনাজাত ইত্যাদি সবই শ্রবণকারী।

عَلِيمٌ অর্থাৎ তোমরা যে আহলে হক, তোমরা যে সাহায্য পাওয়ার যোগ্য এবং তোমরা এরও যোগ্য যে, তোমাদেরকে কাফির ও মুশরিকদের উপর জয়যুক্ত করা উচিত, এসব বিষয় আল্লাহ ভালভাবে অবগত আছেন।

٤٣- إِذْ يُرِيكَهُمُ اللّٰهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا ۖ وَلَوْ أَرَىٰكَهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَتَنَٰزَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَٰكِنَّ اللّٰهَ سَلَّمَ ۗ إِنَّهُ عَلِيمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝

৪৩। (আর স্মরণ কর সেই সময়ের কথা) যখন আল্লাহ তোমাকে স্বপ্নযোগে ওদের সংখ্যা অল্প দেখিয়েছিলেন, যদি তোমাদেরকে তাদের সংখ্যা অধিক দেখাতেন তবে তোমরা সাহস হারিয়ে ফেলতে এবং যুদ্ধ সম্পর্কে তোমাদের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি হতো, কিন্তু আল্লাহ তোমাদেরকে রক্ষা করেছেন, অন্তরে যা কিছু আছে সে সম্পর্কে তিনি সবিশেষ অবহিত।

৪৪। আর (স্মরণ কর ঐ সময়টির কথা) যা ঘটাবার ছিল তা চূড়ান্তভাবে সম্পন্ন করার জন্যে যখন দু'দল মুখোমুখী দণ্ডায়মান হয়েছিল, তখন তোমাদের দৃষ্টিতে ওদের সংখ্যা খুব স্বল্প দেখাচ্ছিল, আর ওদের চোখেও তোমাদেরকে খুব স্বল্প সংখ্যক পরিদৃষ্ট হচ্ছিল, সমস্ত বিষয় ও সমস্যাই আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করে।

٤٤- وَاِذْ يُرِيْكُمُوْهُمْ اِذِ الْتَقَيْتُمْ فِىْٓ اَعْيُنِكُمْ قَلِيْلًا وَّ يُقَلِّلُكُمْ فِىْٓ اَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِىَ اللّٰهُ اَمْرًا كَانَ مَفْعُوْلًا ۗ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ۝

মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নবী (সঃ)-কে স্বপ্নে মুশরিকদের সংখ্যা খুবই কম দেখান। রাসূলুল্লাহ (সঃ) সাহাবীবর্গের নিকট তা বর্ণনা করেন। এটা যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁদের পাগুলো অটল থাকার কারণ হয়ে যায়। কোন কোন বুযুর্গ ব্যক্তি বলেন যে, মুশরিকদের সংখ্যা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ঐ চোখে কম দেখানো হয় যে চোখে তিনি নিদ্রা যেতেন। কিন্তু এটা গারীব বা দুর্বল কথা। কেননা, কুরআন কারীমে যখন مَنَامٌ শব্দ রয়েছে তখন বিনা দলীলে ওর এরূপ ব্যাখ্যা দেয়ার প্রয়োজন কি? সম্ভাবনা ছিল যে, মুশরিকদের সংখ্যাধিক্য মুসলমানদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার করতো এবং তাদের সাথে যুদ্ধ করবেন কি করবেন না এ নিয়ে তাঁদের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি হতো। আল্লাহ তা'আলা এটা থেকে তাঁদেরকে বাঁচিয়ে দিলেন এবং মুশরিকদের সংখ্যা কম দেখালেন। আল্লাহ পাক অন্তরের গুপ্ত কথা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত। তিনি চক্ষুর খিয়ানত ও অন্তরের গুপ্ত রহস্য জানেন। তিনি এই দয়াও দেখালেন যে, মুসলমানদের দৃষ্টিতে যুদ্ধের সময়েও মুশরিকদের সংখ্যা কম দেখালেন, যাতে তাঁরা বীরবিক্রমে যুদ্ধ করেন এবং তাদেরকে খুবই নগণ্য মনে করেন। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, আমি আমার সঙ্গীকে মুশরিকদের আনুমানিক সংখ্যা বললাম যে, তারা প্রায় ৭০ (সত্তর) জন হবে। আমার সাথী তখন পূর্ণভাবে অনুমান করে বললেনঃ "না, তারা প্রায় ১০০ (একশ') জন হবে।" অতঃপর তাদের একজন লোক আমাদের হাতে বন্দী হয়। তাকে আমরা জিজ্ঞেস করলাম, তোমরা কতজন রয়েছো? সে উত্তরে বললোঃ "আমাদের সৈন্যসংখ্যা এক হাজার।"[১]

১. এ হাদীসটি ইবনে আবি হাতিম (রঃ) ও ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

৪৫। হে মুমিনগণ! যখন তোমরা কোন বাহিনীর সাথে প্রত্যক্ষ মুকাবিলায় অবতীর্ণ হবে তখন দৃঢ়রূপে দণ্ডায়মান থাক এবং আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ কর, আশা করা যায় যে, তোমরাই সাফল্য লাভ করবে।

٤٥- يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا لَقِيْتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوْا وَ اذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۚ

৪৬। আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের তোমরা আনুগত্য করবে এবং নিজেদের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ করবে না, অন্যথায় তোমরা সাহস হারিয়ে দুর্বল হয়ে পড়বে এবং তোমাদের মনের দৃঢ়তা ও প্রতিপত্তি বিলুপ্ত হবে, আর তোমরা ধৈর্যসহকারে সব কাজ করবে, আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন।

٤٦- وَ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ وَ لَا تَنَازَعُوْا فَتَفْشَلُوْا وَ تَذْهَبَ رِيْحُكُمْ وَ اصْبِرُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ۚ

এখানে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় মুমিন বান্দাদেরকে যুদ্ধের কৌশল এবং শত্রুদের সাথে মুকাবিলার সময় বীরত্ব প্রকাশ করার কথা শিক্ষা দিচ্ছেন। এক যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (সঃ) সূর্য পশ্চিম গগণে ঢলে পড়ার পর দাঁড়িয়ে গিয়ে বলেনঃ "হে লোকসকল! যুদ্ধে শত্রুদের সম্মুখীন হওয়ার আশা করো না। আল্লাহর নিকট নিরাপত্তার প্রার্থনা কর। কিন্তু যখন শত্রুদের সাথে মুকাবিলা হয়ে যাবে তখন যুদ্ধক্ষেত্রে অটল থাকো এবং বিশ্বাস রাখো যে, জান্নাত তরবারীর ছায়ার নীচে রয়েছে।" তারপর তিনি দাঁড়িয়ে গিয়ে আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করেনঃ "হে কিতাব অবতীর্ণকারী আল্লাহ! হে মেঘমালাকে চালনাকারী আল্লাহ! হে সেনাবাহিনীকে পরাজিতকারী আল্লাহ! এই কাফিরদেরকে পরাজিত করুন এবং তাদের উপর আমাদেরকে সাহায্য করুন।"[১]

আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "তোমরা শত্রুদের সাথে মুকাবিলা করার আকাঙ্ক্ষা করো না এবং

১. এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রঃ) ও ইমাম মুসলিম (রঃ) আবদুল্লাহ ইবনে আবি আউফা (রাঃ) হতে মারফূ'রূপে তাখরীজ করেছেন।

আল্লাহর নিকট নিরাপত্তার প্রার্থনা করো। আর তাদের সাথে মুকাবিলার সময় স্থির পদে থাকো ও বীরত্ব প্রদর্শন করো এবং আল্লাহকে স্মরণ করো। তারা যদিও হৈ হুল্লোড় ও চিৎকার করে তবে তোমরা নীরবতা অবলম্বন করো।"

তিবরানীর (রঃ) হাদীস গ্রন্থে যায়েদ ইবনে আরকাম (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, "রাসূল(সঃ) বলেছেন, তিন সময় আল্লাহ তা'আলা নীরবতা পছন্দ করেন– (১) কুরআন কারীম পাঠের সময়, (২) যুদ্ধের সময় এবং (৩) জানাযার সময়।" অন্য একটি মারফূ' হাদীসে রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "আমার কামেল বান্দা হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যে শত্রুর সাথে মুকাবিলার সময়েও আমার যিক্র করে অর্থাৎ ঐ অবস্থাতেও আমার যিক্র করতে, আমার কাছে প্রার্থনা জানাতে এবং আমার নিকট ফরিয়াদ করতে অমনোযোগী হয় না।" কাতাদা (রঃ) বলেন যে, পূর্ণ ব্যস্ততার সময়েও অর্থাৎ যখন তরবারী চলতে থাকে তখনও আল্লাহ তা'আলা তাঁর যিক্র ফরয করেছেন। আতা (রঃ)-এর উক্তি রয়েছে যে, যুদ্ধের সময়েও নীরবতা অবলম্বন করা এবং আল্লাহ তা'আলার যিক্র করা ওয়াজিব। অতঃপর তিনি এই আয়াতটি পাঠ করেন। তখন জুরাইজ (রঃ) তাঁকে জিজ্ঞেস করেনঃ "আল্লাহ তা'আলার যিক্র কি উচ্চ শব্দে করতে হবে?" তিনি উত্তরে বলেনঃ "হ্যাঁ।" কা'ব ইবনে আহবার (রঃ) বলেনঃ "কুরআন কারীমের তিলাওয়াত এবং আল্লাহ তা'আলার যিক্র হতে বেশী প্রিয় আল্লাহ পাকের নিকট আর কিছুই নেই। এর মধ্যে আবার ওটাই উত্তম যার হুকুম মানুষকে সালাতের মধ্যে ও জিহাদে দেয়া হয়েছে। তোমরা কি দেখছো না যে, আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা জিহাদের সময়েও তাঁর যিক্র করার হুকুম করেছেন?" তারপর তিনি এই আয়াতটিই পাঠ করেন। কোন কবি বলেনঃ "ঠিক যুদ্ধ ও লড়াইয়ের সময়েও আমার অন্তরে আপনার (আল্লাহর) স্মরণ হয়ে থাকে।" আনতারা বলেনঃ "বর্শা ও তরবারীর কাজ চালু থাকা অবস্থাতেও আমি আপনাকে (আল্লাহকে) স্মরণ করতে থাকি।" সুতরাং এই আয়াতে মহান আল্লাহ শত্রুদের সাথে মুকাবিলার সময় যুদ্ধক্ষেত্রে অটল থাকার ও ধৈর্যধারণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। তারা (মুমিনরা) যেন ভীরুতা প্রদর্শন না করে এবং ভয় না পায়। আল্লাহর উপরই যেন ভরসা করে এবং তাঁরই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে। তারা যেন সর্বদা আল্লাহকেই স্মরণ করে, কখনও যেন তাঁকে ভুলে না যায়। এটাই হচ্ছে সফলতার উপায়। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ)-এর আনুগত্য পরিত্যাগ না করে। তাঁরা যা বলেন তা-ই যেন পালন করে এবং যা করতে নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাকে। পরস্পর যেন ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত না হয় এবং মতানৈক্য সৃষ্টি না করে। নতুবা তারা লাঞ্ছিত হয়ে যাবে, তাদেরকে কাপুরুষতায় ঘিরে ফেলবে এবং

তারা শক্তিহীন হয়ে পড়বে। এর ফলে তাদের অগ্রযাত্রায় বাধা পড়বে। তারা ধৈর্যের অঞ্চল যেন ছেড়ে না দেয় এবং তারা যেন বিশ্বাস রাখে ধৈর্যশীলদের সাথে স্বয়ং আল্লাহ রয়েছেন। সাহাবায়ে কিরাম এই হুকুম এমন পুরোপুরিভাবে পালন করেছিলেন যে, তাঁদের তুলনা পূর্বেও ছিল না এবং পরবর্তীদের মধ্যে তো তুলনার কোন কথাই উঠতে পারে না। এই বীরত্ব, এই রাসূল (সঃ)-এর প্রতি আনুগত্য এবং এই ধৈর্য ও সহ্যই ছিল আল্লাহ তা'আলার সাহায্য লাভের কারণ। আর এর ফলেই অতি অল্প সময়ের মধ্যে সংখ্যার স্বল্পতা এবং যুদ্ধাস্ত্রের নগণ্যতা সত্ত্বেও মুসলিমরা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দেশগুলো জয় করে নেন। তাঁরা শুধুমাত্র বিজিত দেশগুলোর অধিপতিই হননি। বরং অধিবাসীদের অন্তরও জয় করে ফেলেন এবং তাদেরকে আল্লাহর পথে নিয়ে আসেন। রোমক, পারসিক, তুর্কী, সাকালিয়া, বার্বারী, হাবশী, সুদানী এবং কিবতীদেরকে তথা দুনিয়ার সমস্ত গৌর ও কৃষ্ণ বর্ণের লোককে বশীভূত করে ফেলেন। এভাবে তাঁরা আল্লাহর কালেমাকে সমুচ্চ করেন, সত্য দ্বীনকে ছড়িয়ে দেন এবং ইসলামী হুকুমত বিশ্বের প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছিয়ে দেন। মহান আল্লাহ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন এবং তাঁদেরকেও সন্তুষ্ট রাখুন। দেখে বিস্মিত হতে হয় যে, তাঁরা ত্রিশ বছরের মধ্যে দুনিয়ার মানচিত্র পরিবর্তন করে দেন এবং ইতিহাসের পৃষ্ঠা পরিবর্তিত করেন। আল্লাহ আমাদেরকেও তাঁদেরই দলভুক্ত করুন। তিনি পরমদাতা ও করুণাময়।

৪৭। তোমরা তাদের ন্যায় আচরণ করো না যারা নিজেদের গৃহ হতে সদর্পে এবং লোকদেরকে (নিজেদের শক্তি) প্রদর্শন করতঃ বের হয় ও মানুষকে আল্লাহর পথ হতে নিবৃত্ত রাখে, তারা যা করে আল্লাহ তা পরিবেষ্টন করে রয়েছেন।

٤٧- وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَّرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ○

৪৮। (ঐ সময়ের কথা স্মরণ কর) যখন শয়তান তাদের কার্যাবলীকে তাদের দৃষ্টিতে খুব চাকচিক্যময় ও শোভনীয় করে দেখাচ্ছিল, তখন সে গর্বভরে বলেছিল—কোন মানুষই আজ

٤٨- وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ

لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتٰنِ نَكَصَ عَلٰى عَقِبَيْهِ وَ قَالَ اِنِّيْ بَرِيْءٌ مِّنْكُمْ اِنِّيْ اَرٰى مَا لَا تَرَوْنَ اِنِّيْ اَخَافُ اللّٰهَ وَ اللّٰهُ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝

তোমাদের উপর বিজয় লাভ করতে পারবে না, আমি সাহায্যার্থে তোমাদের নিকটই থাকবো, কিন্তু উভয় বাহিনীর মধ্যে যখন প্রত্যক্ষ যুদ্ধ শুরু হলো তখন সে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে সরে পড়লো এবং বললো– তোমাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই, আমি যা দেখছি তোমরা তা দেখ না, আমি আল্লাহকে ভয় করি, আল্লাহ শাস্তিদানে খুবই কঠোর।

٤٩- اِذْ يَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ وَ الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ غَرَّ هٰۤؤُلَاۤءِ دِيْنُهُمْ وَ مَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۝

৪৯। (ঐ মুহূর্তটির কথা স্মরণ কর) যখন মুনাফিকরা এবং যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে তারা বলতে লাগলো–এদের দ্বীন এদেরকে প্রতারিত করেছে (অর্থাৎ এরা ধর্মান্ধ হয়ে পড়েছে), যারা আল্লাহর প্রতি পূর্ণমাত্রায় নির্ভরশীল হয় (তাদের বেলায়) আল্লাহ মহাপরাক্রমশীল ও প্রজ্ঞাময় (হিসেবে পরিচয় দিয়ে থাকেন)।

জিহাদে অটল থাকা, ভাল নিয়ত রাখা এবং খুব বেশী বেশী আল্লাহর যিক্র করার উপদেশ দানের পর আল্লাহ তা'আলা এখানে মুসলিমদেরকে মুশরিকদের সাথে সাদৃশ্যযুক্ত হতে নিষেধ করছেন। তিনি বলেন, মুশরিকরা যেমন সত্যকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া এবং জনগণের মধ্যে নিজেদের বীরত্ব প্রদর্শনের জন্যে গর্বভরে চলছে, তোমরা তদ্রূপ করো না। আবূ জেহেলকে যখন বলা হয়েছিল– "বাণিজ্যিক কাফেলাতো রক্ষা পেয়েছে, সুতরাং চলো, আমরা এখান থেকেই ফিরে যাই।" তখন সেই অভিশপ্ত লোকটি উত্তরে বলেছিলঃ "না, আল্লাহর

কসম! আমরা ফিরে যাবো না। বরং আমরা বদরের পানির কাছে অবতরণ করবো, সেখানে মদ পান করবো, কাবাব খাবো এবং গান শুনবো, যেন জনগণের মাঝে আমাদের সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে।" কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাদের বাসনার উল্টো অবস্থা ঘটিয়ে দিলেন। ওখানেই তাদের মৃতদেহ পড়ে রইলো এবং সেখানেই লাঞ্ছনা ও অপমানের সাথে তাদের মৃতদেহগুলো গর্তের মধ্যে নিক্ষেপ করে দেয়া হলো। এজন্যেই আল্লাহ পাক বলেনঃ "আল্লাহ তাদের কার্যাবলী পরিবেষ্টনকারী।" তাদের ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য তাঁর কাছে প্রকাশমান। এজন্যেই তিনি তাদেরকে জঘন্য প্রতিদান প্রদান করলেন। সুতরাং এখানে ঐ মুশরিকদের বর্ণনা দেয়া হয়েছে যারা আল্লাহর রাসূল (সঃ) ও রাসূলদের মাথার মুকুটের সাথে বদর প্রান্তরে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল।[১] তাদের সাথে গায়িকা মেয়েরাও ছিল এবং তারা গানবাজনাও করেছিল। অভিশপ্ত শয়তান তাদের পৃষ্টপোষকতা করেছিল। সে তাদেরকে মিষ্টি কথা দিয়ে ভুলাচ্ছিল এবং তাদের কার্যাবলী তাদের দৃষ্টিতে খুব চাকচিক্যময় ও শোভনীয় করে দেখাচ্ছিল। তাদের কানে কানে সে বলছিলোঃ "তোমাদেরকে কে পরাজিত করতে পারে? আমি তোমাদের সাহায্যকারী হিসেবে রয়েছি।" তাদের অন্তর থেকে সে বানু বকরের মক্কার উপর আক্রমণ করার ভয় দূর করছিল এবং সুরাকা ইবনে মালিক ইবনে জুসুমের রূপ ধারণ করে তাদের সামনে দাঁড়িয়ে বলছিলঃ "আমি তো ঐ এলাকার সরদার। বানু মুদলিজ গোত্রের লোকেরা সবাই আমার অনুগত। আমি তোমাদের সহায়তাকারী। সুতরাং তোমরা নিশ্চিন্ত থাকো।" শয়তানের কাজই তো হলো এটা যে, মিথ্যা অঙ্গীকার সে করে থাকে। পূরণ হবে না এমন আশা সে প্রদান করে এবং মানুষকে সে প্রতারণার জালে আটকিয়ে দেয়। বদরের দিন সে স্বীয় পতাকা ও সেনাবাহিনী নিয়ে মুশরিকদের দলে যোগদান করেছিল এবং তাদের অন্তরে এ বিশ্বাস বদ্ধমূল করে দিয়েছিল যে, কেউই তাদেরকে পরাজিত করতে পারবে না। সে তাদেরকে আরো বলেছিলঃ "তোমাদের কোনই ভয় নেই, আমি তোমাদের সাহায্যার্থে সর্বদা তোমাদের সাথেই থাকবো।" কিন্তু যখন উভয়পক্ষের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল এবং সেই পাপাচার শয়তান ফেরেশতাদেরকে মুসলিমদের সাহায্যার্থে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হতে দেখলো তখন সে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পালাতে শুরু করলো এবং বলতে লাগলোঃ "আমি এমন কিছু দেখতে পাচ্ছি যা তোমরা দেখতে পাও না।" ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, বদরের দিন ইবলীস স্বীয় পতাকা উঁচু করে মুদলিজ গোত্রের একটি লোকের রূপ ধারণ করতঃ তার

১. এটা কাতাদা (রঃ), যহহাক (রঃ) এবং সুদ্দী (রঃ) প্রমুখ গুরুজনদের উক্তি।

সেনাবাহিনীসহ উপস্থিত হয়। সে সুরাকা ইবনে মালিক ইবনে জুসুমের আকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করে এবং মুশরিকদের অন্তরে সাহস ও উৎসাহ উদ্দীপনা যোগাতে থাকে। যুদ্ধক্ষেত্রে যখন উভয় বাহিনী কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে যায় তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) এক মুষ্টি মাটি নিয়ে মুশরিকদের চেহারায় নিক্ষেপ করেন। সাথে সাথে তাদের মধ্যে অস্থিরতা সৃষ্টি হয় এবং পলায়নের হিড়িক পড়ে যায়। জিবরাঈল (আঃ) শয়তানের দিকে অগ্রসর হন। ঐ সময় সে একজন মুশরিকের হাতে হাত রেখে দাঁড়িয়েছিল। জিবরাঈল (আঃ)-কে দেখা মাত্রই সে লোকটির হাত থেকে নিজের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে নিজের সেনাবাহিনীসহ পালাতে শুরু করলো। ঐ লোকটি তখন তাকে বললোঃ “হে সুরাকা! তুমি তো বলেছিলে যে, আমাদের সাহায্যার্থে তুমি আমাদের সাথেই থাকবে, কিন্তু এখন এ করছো কি?” ঐ অভিশপ্ত যেহেতু ফেরেশতাদেরকে দেখতে পাচ্ছিল তাই সে বললোঃ “আমি এমন কিছু দেখতে পাচ্ছি যা তোমরা দেখতে পাচ্ছ না। আমি তো আল্লাহকে ভয় করছি। আল্লাহর শাস্তি খুবই কঠোর।” অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, শয়তানকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করতে দেখে হারিস ইবনে হিশাম তাকে ধরে ফেললো। সে তখন তার গালে এমন জোরে একটা চড় মেরে দিলো যার ফলে সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল। তখন অন্যান্যেরা তাকে বললোঃ “হে সুরাকা! তুমি এই অবস্থায় আমাদেররকে অপদস্থ করছো এবং আমাদেরকে ধোঁকা দিচ্ছ?” সে উত্তরে বললোঃ “হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোমাদের সাথে আমার কোনই সম্পর্ক নেই। আমি তাঁদেরকে দেখছি যাঁদেরকে তোমরা দেখতে পাচ্ছ না।”

ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, ক্ষণিকের জন্যে রাসূলুল্লাহ (সঃ) এক প্রকারের আত্মভোলা হয়ে পড়েন। অতঃপর তিনি সতর্ক হয়ে গিয়ে বলেনঃ “হে আমার সাহাবীর দল! তোমরা আনন্দিত হয়ে যাও যে, তোমাদের ডানদিকে রয়েছেন জিবরাঈল (আঃ) এবং বামদিকে রয়েছেন মীকাঈল (আঃ), আর এই যে ইস্রাফীল (আঃ)। এঁরা তিনজনই নিজ নিজ সেনাবাহিনীসহ বিদ্যমান রয়েছেন।” ইবলীস সুরাকা ইবনে মালিক ইবনে জুসুম মুদলিজীর আকৃতিতে মুশরিকদের মধ্যে অবস্থান করছিল। তাদের অন্তরে সে সাহস দিচ্ছিল এবং ভবিষ্যদ্বাণী করছিল– “তোমরা নিশ্চিন্ত থাকো, আজ তোমাদেরকে কেউই পরাজিত করতে পারবে না।” কিন্তু ফেরেশতাদের সেনাবাহিনীকে দেখা মাত্রই সে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং “তোমাদের সাথে আমার কোনই সম্পর্ক নেই, আমি তাঁদেরকে দেখছি যাঁদেরকে তোমরা দেখতে পাচ্ছ না” একথা বলতে বলতে পালিয়ে যায়। হারিস ইবনে হিশাম তাকে সুরাকা ভেবেই তার হাত ধরে ফেললো। তখন শয়তান তার

বক্ষে এতো জোরে ঘুষি মারে যে, সে মুখ থুবড়ে পড়ে যায়। অতঃপর শয়তান পালিয়ে গিয়ে সমুদ্রে লাফিয়ে পড়ে এবং নিজের কাপড় উঁচু করে ধরে বলতে থাকেঃ "হে আল্লাহ! আমি আপনাকে আপনার ঐ ওয়াদার কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যা আপনি আমার সাথে করেছিলেন।" তিবরানীতে রিফাআ'হ ইবনে রাফি (রাঃ) হতেও এরই কাছাকাছি বর্ণিত আছে।

উরওয়া ইবনে যুবাইর (রাঃ) বলেন যে, যখন কুরায়েশরা মক্কা থেকে বের হওয়ার ইচ্ছা করে তখন তাদের বানু বকরের যুদ্ধের কথা স্মরণ হয়ে যায় যে, হয়তো তাদের অনুপস্থিতির সুযোগে তারা মক্কার উপর আক্রমণ করে বসবে। কাজেই তারা তাদের ইচ্ছা ও পরিকল্পনা থেকে বিরত থাকতে উদ্যত হয়েছিল। ঐ সময়েই অভিশপ্ত ইবলীস সুরাকার রূপ ধারণ করে তাদের কাছে আসে। ঐ সুরাকা ছিল বানু কিনানা গোত্রের নেতৃস্থানীয় লোক। এই সুরাকার রূপ ধারণকারী শয়তান কুরায়েশদেরকে বলতে শুরু করলোঃ "আমার কওমের দায়িত্ব আমি নিচ্ছি। তোমরা তাদের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকো এবং মুসলমানদের সাথে মুকাবিলার জন্যে পূর্ণরূপে প্রস্তুত হয়ে যাও।" এ কথা বলে সেও তাদের সাথে চললো। প্রতিটি মনজিলেই কুরায়েশরা সুরাকারূপী শয়তানকে দেখতে পাচ্ছিল। তাদের সবারই মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছিল যে, সুরাকা স্বয়ং তাদের সাথে থাকবে। শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। তখন সেই বিতাড়িত শয়তান পলায়ন করলো। হারিস ইবনে হিশাম অথবা উমাইর ইবনে অহাব তাকে যেতে দেখে চেঁচিয়ে বললোঃ "হে সুরাকা! তুমি কোথায় পালিয়ে যাচ্ছ?" সুরাকারূপী শয়তান তাকে মৃত্যু ও জাহান্নামের মুখে ঠেলে দিয়ে পালিয়েই গেল। কেননা, সে আল্লাহর সৈনিক ফেরেশতাদেরকে মুসলমানদের সাহায্যার্থে আসতে দেখেছিল। পালাবার সময় সে স্পষ্টভাবে বলে গেলঃ "তোমাদের সাথে আমার কোনই সম্পর্ক নেই। আমি এমন কিছু দেখছি যা তোমরা দেখতে পাচ্ছ না।" ঐ কথায় নিঃসন্দেহে সে সত্যবাদী ছিল। তারপর সে বললোঃ "আমি আল্লাহকে ভয় করছি। নিশ্চয়ই আল্লাহ শাস্তিদানে অত্যন্ত কঠোর।" সে জিবরাঈল (আঃ)-কে ফেরেশতাদের সাথে অবতীর্ণ হতে দেখে বুঝতেই পেরেছিল যে, তাঁদের সাথে মুকাবিলা করার শক্তি তার নিজেরও নেই এবং মুশরিকদেরও নেই। সে যে আল্লাহকে ভয় করার কথা বলেছিল তাতে সে মিথ্যাবাদী ছিল। ওটা ছিল শুধু তার মুখের কথা। প্রকৃতপক্ষে তার মুকাবিলা করার শক্তিই ছিল না।

এটাই হচ্ছে আল্লাহর এই শত্রুর অভ্যাস যে, সে মানুষকে উত্তেজিত ও বিভ্রান্ত করে এবং সত্যের মুকাবিলায় এনে দাঁড় করে দেয়। অতঃপর সে গা ঢাকা দেয়।

কুরআন কারীম ঘোষণা করছে– "শয়তান মানুষকে বলে, তুমি কুফরী কর, অতঃপর যখন সে কুফরী করে বসে তখন সে বলে, তোমার সাথে আমার কোনই সম্পর্ক নেই, আমি বিশ্বপ্রভু আল্লাহকে ভয় করি।" অন্য জায়গায় রয়েছেঃ "যখন সমস্ত মুকদ্দমা মীমাংসা হয়ে যাবে তখন শয়তান বলবে–আল্লাহ তোমাদের সাথে সত্য ওয়াদা করেছিলেন, আর আমিও কিছু ওয়াদা করেছিলাম, কিন্তু আমি তোমাদের সাথে ওয়াদা খেলাফ করেছিলাম, আর তোমাদের উপর আমার কোন আধিপত্যও ছিল না, শুধু এইটুকু যে, আমি তোমাদেরকে ডেকেছিলাম, তখন তোমরা আমার কথা মেনে নিয়েছিলে। অতএব তোমরা আমার উপর (সমস্ত) দোষ চাপিয়ে দিয়ো না, বরং দোষ নিজেদের উপরই আরোপ কর; আমি না তোমাদের সাহায্যকারী হতে পারি; না তোমরা আমার সাহায্যকারী হতে পার; আমি নিজেও তোমাদের এ কাজে অসন্তুষ্ট যে, তোমরা ইতিপূর্বে আমাকে (আল্লাহর) অংশ সাব্যস্ত করতে; নিশ্চয়ই যালিমদের জন্যে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে।"

আবূ উসাইদ মালিক ইবনে রাবীআ (রাঃ) তাঁর চক্ষু নষ্ট হয়ে যাওয়ার পর বলেনঃ "এখনও যদি আমি তোমাদের সাথে বদর প্রান্তরে থাকতাম এবং আমার চক্ষু ঠিক থাকতো তবে আমি তোমাদেরকে অবশ্যই ঐ ঘাঁটির খবর দিতে পারতাম যেখান দিয়ে ফেরেশতাগণ বের হয়ে এসেছিলেন। ঐ ঘাঁটি অবশ্যই আমার চেনা আছে। তাঁদেরকে ইবলীস দেখেছিল। আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, তাঁরা যেন মুসলমানদের যুদ্ধক্ষেত্রে স্থির ও অটল রাখেন। তাঁরা মুসলমানদের পরিচিত লোকদের রূপ ধারণ করে এসেছিলেন এবং তাঁদেরকে বলেছিলেনঃ "তোমরা আনন্দিত হও। এ কাফিররা কিছুই নয়। তোমাদের সাথে আল্লাহর সাহায্য রয়েছে। নির্ভীকভাবে সিংহের ন্যায় আক্রমণ চালাও।" এ দেখে ইবলীস পগার পার হয়ে গেল। এতক্ষণ সে সুরাকার রূপ ধরে কাফিরদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। আবূ জেহেল এ অবস্থা দেখে স্বীয় সেনাবাহিনীর মধ্যে চক্কর দিতে শুরু করলো এবং তাদেরকে বলতে থাকলোঃ "তোমরা হতোদ্যম হয়ো না। সুরাকা পালিয়ে গেছে বলে মন খারাপ করো না। সে তো মুহাম্মাদ (সঃ)-এর নিকট থেকে কুপরামর্শ শিখে এসেছিল যে, সুযোগ বুঝে তোমাদের মন ভেঙ্গে দেবে। ঘাবড়ানোর কোন কারণ নেই। লাত ও উযযার শপথ! আজ আমরা মুসলমানদেরকে এবং তাদের নবীকে গ্রেফতার করে ফেলবো। সুতরাং ভীরুতা প্রদর্শন করো না, বরং মনোবল বৃদ্ধি কর। কঠিন আক্রমণ চালাও। সাবধান! তাদেরকে হত্যা করো না, বরং জীবিত ধরে রাখো,

যেন তাদেরকে মন খুলে শাস্তি দেয়া যায়।" এ লোকটাও (আবূ জেহেল) ছিল সে যুগের ফিরআউন। যাদুকরগণ ঈমান এনেছিল বলে সেও তাদেরকে বলেছিলঃ "এটা তো শুধু তোমাদের একটা চক্রান্ত ছিল যে, তোমরা আমাদেরকে এখান থেকে তাড়িয়ে দেবে।" সেও যাদুকরদেরকে বলেছিলঃ "এই মূসা (আঃ) তোমাদের ওস্তাদ।" অথচ ওটা ছিল তার একটা প্রতারণা মাত্র। এই উম্মতের ফিরআউন আবূ জেহেলও এ ধরনের কথাই বলেছিল।

আবদুল্লাহ ইবনে কুরায়েয (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "আরাফার দিন ইবলীস যত লাঞ্ছিত, অপদস্থ ও লজ্জিত হয়েছিল, আর কোন দিন এতটা হতে দেখা যায়নি। কেননা সে দেখছিল যে, আল্লাহ তা'আলার সাধারণ ক্ষমা ও সাধারণ রহমত বর্ষিত হচ্ছে। প্রত্যেকের গুনাহ প্রায়ই মাফ হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, তবে বদরের দিনে তার লাঞ্ছিত ও অপদস্থ হওয়ার কথা জিজ্ঞেস করো না, যখন সে দেখলো যে, ফেরেশতাদের সেনাবাহিনী জিবরাঈল (আঃ)-এর নেতৃত্বে আসতে শুরু করেছেন সেইদিন সে সবচেয়ে বেশী লজ্জিত ও অপমানিত হয়েছিল।"

اِذْ يَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ وَ الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ غَرَّ هٰۤؤُلَاۤءِ دِيْنُهُمْ

এ আয়াত সম্পর্কে আলী ইবনে আবি তালহা (রাঃ) ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, উভয় সেনাবাহিনী যখন কাতারবন্দী হয়ে মুখোমুখী দাঁড়িয়ে যায় তখন আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে মুশরিকদের চক্ষে কম দেখান। তখন মুশরিকরা মুসলমানদের সম্পর্কে বিদ্রূপ করে বলেঃ "এদের দ্বীন এদেরকে প্রতারিত করেছে।" তাদের একথা বলার কারণ ছিল এই যে, তারা মুসলমানদের সংখ্যা তাদের চোখে খুবই কম দেখছিল। তাই তারা ধারণা করছিল যে, নিঃসন্দেহে তারা মুসলমানদেরকে পরাজিত করবে। তারা পরস্পর বলাবলি করছিলঃ "দেখো, মুসলমানরা কত ধর্মের পাগল। মুষ্টিমেয় কয়েকটি লোক এক হাজার সৈন্যের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে যাচ্ছে। প্রথম আক্রমণেই তারা দ্বিখণ্ডিত হয়ে যাবে।" আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন যে, এরা হচ্ছে ভরসাকারী দল। তাদের ভরসা এমন সত্তার উপর রয়েছে যিনি বিজয়ের মালিক এবং হিকমতের মালিক। মুসলিমদের মধ্যে আল্লাহর দ্বীনের উপর দৃঢ়তা অনুভব করেই মুশরিকদের মুখে উচ্চারিত হয়েছিল যে, তারা দ্বীনের পাগল। আল্লাহর শত্রু অভিশপ্ত আবূ জেহেল পাহাড়ের উপর থেকে অবজ্ঞাভরে মুসলিমদের সংখ্যার স্বল্পতা ও অস্ত্র-শস্ত্রের নগণ্যতা লক্ষ্য করতঃ গাধার মত ফুলে উঠলো এবং বলতে

লাগলঃ “আল্লাহর কসম! আজ থেকে আল্লাহর ইবাদতকারী হতে জমিনকে শূন্য দেখা যাবে। এখনই আমরা তাদের এক একজনকে দু’ টুকরো করে রেখে দিবো।” ইবনে জুরায়েজ (রঃ) বলেন যে, মুসলিমদের ধর্মের প্রতি বিদ্রূপকারী ছিল মক্কার মুনাফেকরা। আমীর (রঃ) বলেন যে, এরা ছিল কতকগুলো লোক যারা শুধু মুখে মুসলিম হয়েছিল। কিন্তু বদরের প্রান্তরে তারা মুশরিকদের সাথে যোগ দিয়েছিল। মুসলিমদের সংখ্যার স্বল্পতা ও তাদের দুর্বলতা দেখে বিস্মিত হয়েছিল এবং বলেছিলঃ “এ লোকগুলো ধর্মের দ্বারা প্রতারিত হয়েছে।” মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, এটা ছিল কুরায়েশদের একটি দল। তারা হচ্ছে কায়েস ইবনে অলীদ ইবনে মুগীরা, আবুল কায়েস ইবনে ফাকাহ্ ইবনে মুগীরা, হারিস ইবনে যামআ, আসওয়াদ ইবনে আবদিল মুত্তালিব, আলী ইবনে উমাইয়া ইবনে খাল্ফ এবং আস ইবনে মুনাব্বাহ ইবনে হাজ্জাজ। এ লোকগুলো কুরায়েশদের সাথে ছিল। কিন্তু তারা সন্দেহের মধ্যে পতিত হয়েছিল এবং তাদের সন্দেহ তাদেরকে আবদ্ধ রেখেছিল। এখানে মুসলিমদের অবস্থা দেখে তারা বলতে শুরু করেঃ “এ লোকগুলো তো শুধু ধর্মীয় পাগল! নতুবা এই মুষ্টিমেয় রসদ ও হাতিয়ার বিহীন লোক এত শান-শওকতপূর্ণ বিরাট সেনাদলের সাথে কিভাবে যুদ্ধ করতে পারে?” হাসান (রঃ) বলেন যে, এই লোকগুলো বদরের যুদ্ধে আগমন করেনি। তাদের নাম মুনাফিক রাখা হয়েছে। কেউ কেউ বলেন যে, তারা মুখে ইসলামের স্বীকারোক্তি করেছিল এবং তারা মক্কাতে ছিল। মুশরিকদের সাথে তারা বদর অভিমুখে রওয়ানা হয়েছিল। যখন তারা মুসলিমদের সংখ্যা খুবই কম দেখলো তখন বলতে লাগলো, এদের ধর্ম এদেরকে প্রতারিত করেছে। মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন যে, যারা এই মালিকুল মুলকের (আল্লাহর) উপর ভরসা করে তিনি তাদেরকে মর্যাদার অধিকারী বানিয়ে দেন। কেননা সম্মান ও মর্যাদা দানের মালিক একমাত্র তিনিই। বিজয় দান তাঁরই হাতে। তিনি প্রবল পরাক্রান্ত এবং মহান বাদশাহ। তিনি মহান বিজ্ঞানময়। তাঁর সমস্ত কাজ হিকমতে পরিপূর্ণ। প্রত্যেক জিনিসকে তিনি যথাযোগ্য স্থানে রেখে থাকেন। যারা সাহায্য পাওয়ার যোগ্য তাদেরকেই তিনি সাহায্য করে থাকেন। আর যারা লাঞ্ছিত ও অপমানিত হওয়ার যোগ্য তাদেরকে তিনি লাঞ্ছিত ও অপমানিত করেন।

৫০। (হে নবী)! তুমি যদি ঐ অবস্থা দেখতে যখন ফেরেশতাগণ কাফিরদের মুখমণ্ডল ও পৃষ্ঠদেশে আঘাত

৫০- وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِيْنَ كَفَرُوا الْمَلٰٓئِكَةُ يَضْرِبُوْنَ

وُجُوْهَهُمْ وَاَدْبَارَهُمْ وَ ذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ ۝

হেনে তাদের মৃত্যু ঘটিয়েছে, (আর বলছে) তোমরা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির স্বাদ গ্রহণ কর।

٥١ - ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْكُمْ وَ اَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ۝

৫১। এই শাস্তি হলো তোমাদের সেই কাজেরই পরিনাম ফল যা তোমাদের দু'হাত পূর্বাহ্নেই আয়োজন করেছিল, (নতুবা) আল্লাহ তাঁর বান্দাদের উপর (কখনো) অত্যাচারী নন।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ হে মুহাম্মাদ (সঃ)! ফেরেশতারা কত জঘন্যভাবে কাফিরদের রূহ কবয করে থাকে তা যদি তুমি দেখতে! তারা ঐ সময় কাফিরদের মুখমণ্ডলে ও পৃষ্ঠদেশে মারতে থাকে এবং বলে−"নিজেদের দুষ্কার্যের প্রতিফল হিসেবে শাস্তির স্বাদ গ্রহণ কর।" এর এক ভাবার্থ এও বর্ণনা করা হয়েছে যে, এটাও বদরের দিনেরই ঘটনা। সামনের দিক থেকেই সেইদিন ঐ কাফিরদের চেহারায় তরবারীর আঘাত লাগছিল এবং যখন তারা পলায়ন করছিল তখন তাদের পিঠের উপর তলোয়ার পড়ছিল।

হাসান বসরী (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একটি লোক বলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল! আমি আবূ জেহেলের পিঠে কাঁটাসমূহের চিহ্ন দেখেছি।" তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "এটা ফেরেশতাদের মারের চিহ্ন।" আসল কথা এই যে, এই আয়াতটি বদরের সাথে নির্দিষ্ট নয়। শব্দগুলো সাধারণ। প্রত্যেক কাফিরেরই অবস্থা এরূপ হয়ে থাকে। সূরায়ে কিতালের মধ্যেও এ ঘটনা বর্ণিত হয়েছে এবং সূরায়ে আন'আমের ... وَلَوْ تَرٰى اِذِ الظّٰلِمُوْنَ فِىْ غَمَرٰتِ الْمَوْتِ (৬ঃ ৯৩)-এই আয়াতের মধ্যেও এর বর্ণনা তাফসীরসহ বর্ণিত হয়েছে। যেহেতু তারা ছিল নাফরমান লোক, সেহেতু তাদের মৃত্যুর সময় ফেরেশতাদের দ্বারা তাদেরকে খুবই কষ্ট দেয়া হয়। তাদের দুষ্কার্যের কারণে তাদের রূহসমূহ তাদের দেহের মধ্যে লুকিয়ে যায়। সুতরাং ফেরেশতাগণ ওগুলো জোরপূর্বক বের করেন এবং বলেনঃ "তোমার জন্যে আল্লাহর গজব রয়েছে।" যেমন বারা' (রাঃ)-এর হাদীসে রয়েছে যে, মৃত্যুর যাতনার সময় ঐ অশুভ অবস্থায় মৃত্যুর ফেরেশতা কাফিরের কাছে এসে বলেনঃ "হে কলুষিত আত্মা! গরম বাতাস, গরম পানি এবং গরম

ছায়ার দিকে চল।” তখন ঐ আত্মা দেহের মধ্যে লুকাতে থাকে। অবশেষে ফেরেশতা কোন জীবিত মানুষের গায়ের চামড়া খুলে নেয়ার মত ঐ আত্মাকে জোরপূর্বক টেনে বের করেন এবং সাথে সাথে শিরা উপশিরাও বেরিয়ে আসে। ফেরেশতা তাকে বলেনঃ “এখন দহনের স্বাদ গ্রহণ কর। এটা তোমার পার্থিব দুষ্কার্যাবলীর শাস্তি।” আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের উপর মোটেই অত্যাচার করেন না। তিনি তো ন্যায়পরায়ণ হাকিম। তিনি কল্যাণময়, সর্বোচ্চ, অমুখাপেক্ষী, পবিত্র, মহামর্যাদা সম্পন্ন এবং প্রশংসিত। এজন্যেই সহীহ মুসলিমে আবূ যার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ “হে আমার বান্দাগণ! আমি নিজের উপর অত্যাচার হারাম করে দিয়েছি এবং তোমাদের উপরও তা হারাম করেছি। সুতরাং তোমরা পরস্পর একে অপরের উপর অত্যাচার করো না। হে আমার বান্দারা! আমি তো শুধু তোমাদের কৃত আমলগুলোকে পরিবেষ্টন করেছি। সুতরাং যে ব্যক্তি কল্যাণ প্রাপ্ত হবে সে যেন আল্লাহর প্রশংসা করে। আর যে ব্যক্তি অন্য কিছু প্রাপ্ত হবে সে যেন নিজেকেই ভর্ৎসনা করে।”

৫২। এটা ফিরআউনের বংশ ও তাদের পূর্ববর্তী লোকদের অবস্থার ন্যায়, তারা আল্লাহর নিদর্শনকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে অস্বীকার করলো, ফলে আল্লাহ তাদের পাপের কারণে তাদেরকে পাকড়াও করলেন, নিঃসন্দেহে আল্লাহ মহা শক্তিমান ও কঠিন শাস্তিদাতা।

٥٢- كَدَأْبِ اٰلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ بِذُنُوْبِهِمْ اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ شَدِيْدُ الْعِقَابِ○

আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে মুহাম্মাদ (সঃ)! এই মুশারিকরা তোমার সাথে ঐ ব্যবহারই করছে যে ব্যবহার তাদের পূর্ববর্তী কাফির ও মুশরিকরা তাদের নবীদের সাথে করেছিল। সুতরাং আমিও এদের সাথে ঐ ব্যবহারই করেছি যে ব্যবহার এদের পূর্ববর্তীদের সাথে করেছিলাম, যারা এদের মতই ছিল। যেমন ফিরআউনের বংশ ও তাদের পূর্ববর্তী লোকেরা, যারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছিল। এই কারণে আল্লাহ তাদেরকে পাকড়াও করেছিলেন। সমস্ত শক্তির মালিক আল্লাহ এবং তাঁর শাস্তিও খুবই কঠিন। এমন কেউ নেই যে তাঁর উপর জয়যুক্ত হতে পারে এবং এমন কেউ নেই যে তাঁর নিকট থেকে পলায়ন করতে পারে।

৫৩। এই শাস্তির কারণ এই যে, আল্লাহ কোন জাতির উপর নিয়ামত দান করে সেই নিয়ামত ততক্ষণ পর্যন্ত পরিবর্তন করেন না (উঠিয়ে নেন না), যতক্ষণ পর্যন্ত সেই জাতি নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন না করে, নিঃসন্দেহে আল্লাহ মহাশ্রোতা ও মহাজ্ঞানী।

٥٣- ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً اَنْعَمَهَا عَلٰى قَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ وَاَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۝

৫৪। ফিরআউনের বংশধরও তৎপূর্বের জাতিসমূহের ন্যায় তাদের প্রতিপালকের নিদর্শনসমূহ মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। ফলে আমি তাদের পাপের কারণে তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছি এবং ফিরআউনের বংশধরদেরকে (সমুদ্রে) নিমজ্জিত করেছি, তারা প্রত্যেকেই ছিল সীমালংঘনকারী।

٥٤- كَدَاْبِ اٰلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ فَاَهْلَكْنٰهُمْ بِذُنُوْبِهِمْ وَاَغْرَقْنَا اٰلَ فِرْعَوْنَ وَكُلٌّ كَانُوْا ظٰلِمِيْنَ ۝

এখানে আল্লাহ তা'আলার আদল ও ইনসাফের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, তিনি তাঁর দেয়া নিয়ামতরাশি পাপকার্যের পূর্বে তাঁর বান্দাদের নিকট থেকে ছিনিয়ে নেন না। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে– "আল্লাহ কোন কওমের অবস্থা পরিবর্তন করেন না যে পর্যন্ত না তারা নিজেরাই নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে। আল্লাহ যখন কোন কওমের প্রতি (তাদের পাপের কারণে) অমঙ্গল পৌঁছানোর ইচ্ছা করেন তখন কেউই তাঁর সেই ইচ্ছাকে রদ করতে পারে না এবং তিনি ছাড়া তাদের কোন সাহায্যকারী নেই।"

আল্লাহ তা'আলা ফিরআউনের বংশধর এবং তাদের মত স্বভাব বিশিষ্ট তাদের পূর্ববর্তীদের সাথে এরূপ ব্যবহারই করেছিলেন। মহান আল্লাহ তাদেরকে নিয়ামতরাজি দান করেছিলেন। কিন্তু তারা দুষ্কার্যে লিপ্ত হয়ে পড়েছিল। ফলে তিনি তাদেরকে প্রদত্ত বাগান, প্রস্রবণ, ক্ষেত-খামার, কোষাগার, অট্টালিকা এবং

অন্যান্য নিয়ামত যা তারা উপভোগ করছিল সবই তাদের নিকট থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিলেন। এ ব্যাপারে তারা নিজেদের ক্ষতি নিজেরাই করেছিল। আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি মোটেই অত্যাচার করেননি।

৫৫। নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট নিকৃষ্ট জীব তারাই যারা কুফরী করে, সুতরাং তারা ঈমান আনে না।

٥٥- اِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللّٰهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ○

৫৬। ওদের মধ্যে যাদের সাথে তুমি চুক্তিবদ্ধ হয়েছো তারাও নিকৃষ্ট, তারা প্রতিবারই কৃত চুক্তি ভঙ্গ করছে (চুক্তি ভঙ্গের ব্যাপারে আল্লাহকে কিছুমাত্র) তারা ভয় করে না।

٥٦- اَلَّذِيْنَ عٰهَدْتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَهُمْ فِيْ كُلِّ مَرَّةٍ وَّ هُمْ لَا يَتَّقُوْنَ ○

৫৭। অতএব, তোমরা যদি তাদেরকে যুদ্ধের ময়দানে আয়ত্তে আনতে পার তবে তাদেরকে তাদের পিছনে যারা রয়েছে তাদের হতে বিচ্ছিন্ন করে এমনভাবে শায়েস্তা করবে যাতে তারা শিক্ষা পায়।

٥٧- فَاِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ○

আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিচ্ছেন– ভূ-পৃষ্ঠে যত প্রাণী চলাফেরা করছে ওদের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার নিকট সবচেয়ে নিকৃষ্ট তারাই যারা বেঈমান ও কাফির, যারা চুক্তি করে তা ভঙ্গ করে দেয়। এদিকে একটি কথা দিলো, আর ওদিকে তা থেকে ফিরে গেল। এদিকে শপথ করলো, ওদিকে তা ভেঙ্গে দিলো। তাদের না আছে আল্লাহর কোন ভয় এবং না আছে কৃত পাপের কোন পরওয়া। সুতরাং হে মুহাম্মাদ (সঃ)! যখন তুমি যুদ্ধে তাদের উপর জয়যুক্ত হবে তখন তাদেরকে এমন শাস্তি দিবে যে, যেন তাদের পরবর্তী লোকেরা তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। তারাও যেন ভয় পেয়ে যায়। তাহলে হয়তো তারা তাদের পূর্ববর্তীদের কৃত দুষ্কার্য থেকে বিরত থাকবে।[১]

১. এ কথা বলেছেন ইবনে আব্বাস (রাঃ), হাসান বসরী (রঃ), যহ্হাক (রঃ), সুদ্দী (রঃ), আতা খুরাসানী (রঃ) এবং ইবনে উয়াইনা (রঃ)।

৫৮। (হে নবী)! তুমি যদি কোন সম্প্রদায়ের বিশ্বাস ভঙ্গের আশংকা কর, তবে তোমার চুক্তিকেও প্রকাশ্যভাবে তাদের সামনে নিক্ষেপ করবে, নিশ্চয়ই আল্লাহ বিশ্বাস ভঙ্গকারীদেরকে পছন্দ করেন না।

৫৮- وَاِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ اِلَيْهِمْ عَلٰى سَوَآءٍ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْخَآئِنِيْنَ۠ ؑ

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল (সঃ)-কে সম্বোধন করে বলছেন– হে নবী! যদি কারো সাথে তোমার চুক্তি হয় এবং তোমার ভয় হয় যে, তারা এই চুক্তি ও অঙ্গীকার ভঙ্গ করবে তবে তোমাকে এ অধিকার দেয়া হচ্ছে যে, তুমি সমতা রক্ষা করে সেই চুক্তিনামা রদ করে দিবে। এ সংবাদ তাদের কানে পৌঁছিয়ে দিতে হবে, যেন তারাও সন্ধির ধারণা ত্যাগ করে। কিছুদিন পূর্বেই তাদেরকে এটা অবশ্যই জানাতে হবে। জেনে রেখো যে, আল্লাহ তা'আলা বিশ্বাস ভঙ্গ করা পছন্দ করেন না। সুতরাং কাফিরদের সাথেও তুমি খিয়ানত করো না।

মুসনাদে আহমাদে রয়েছে যে, আমীর মুআ'বিয়া (রাঃ) স্বীয় সেনাবাহিনী রোম সীমান্তে পাঠাতে শুরু করেন, যেন সন্ধিকাল শেষ হওয়া মাত্রই আকস্মিকভাবে তাদের উপর আক্রমণ চালানো যায়। তখন একজন বৃদ্ধ স্বীয় সওয়ারীতে আরোহিত অবস্থায় বলতে বলতে আসলেন–আল্লাহ সবচেয়ে বড়, আল্লাহ সবচেয়ে বড়। ওয়াদা-অঙ্গীকার পুরো করুন, বিশ্বাস ভঙ্গ করা ঠিক নয়। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "যখন কোন কওমের সাথে চুক্তি ও অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়ে যাবে তখন কোন গিরা খুলো না ও বেঁধো না যে পর্যন্ত না চুক্তিকাল শেষ হয় কিংবা তাদেরকে জানিয়ে দিয়ে অঙ্গীকার ও চুক্তিনামা ছিঁড়ে ফেলা হয়।" এ খবর মুআ'বিয়া (রাঃ)-এর কানে পৌঁছা মাত্রই তিনি সেনাবাহিনীকে ফিরে আসার নির্দেশ দেন। এই বৃদ্ধ লোকটি ছিলেন আমর ইবনে আমবাসা (রাঃ)।[১]

সালমান ফারসী (রাঃ) একটি শহরের দুর্গের নিকট পৌঁছে স্বীয় সঙ্গীদেরকে বলেনঃ "আপনারা আমাকে ছেড়ে দিন, আমি ওদেরকে (ইসলামের) দাওয়াত দেবো, যেমন আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে দাওয়াত দিতে দেখেছি।" অতঃপর তিনি তাদেরকে বললেনঃ "দেখো, আমি তোমাদের মধ্যকারই একজন ছিলাম।

১. এটা ইমাম আহমাদ (রঃ), ইমাম আবূ দাঊদ (রঃ), ইমাম তিরমিযী (রঃ), ইমাম নাসাঈ (রঃ) ও ইবনে হিব্বান (রঃ) বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী (রঃ) এ হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।

অতঃপর মহা মহিমান্বিত আল্লাহ্ আমাকে ইসলামের পথ প্রদর্শন করেছেন। যদি তোমরাও মুসলমান হয়ে যাও তবে আমাদের যে হক রয়েছে তোমাদেরও সেই হক হয়ে যাবে এবং আমাদের উপর যা রয়েছে তোমাদের উপরও তাই থাকবে। আর যদি তোমরা এটা স্বীকার না কর তবে লাঞ্ছনার সাথে তোমাদেরকে জিযিয়া কর প্রদান করতে হবে। যদি তোমরা এটাও না মান তবে আমরা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করবো এ কথা তোমাদেরকে এখন থেকেই জানিয়ে দিচ্ছি। এখন আমরা ও তোমরা সমান অবস্থায় রয়েছি। আল্লাহ্ তা'আলা খিয়ানতকারীদেরকে পছন্দ করেন না।" তিন দিন পর্যন্ত তাদেরকে এভাবেই দাওয়াত দিতে থাকেন। অবশেষে চতুর্থ দিন সকাল হওয়া মাত্রই তাদের উপর আক্রমণ চালিয়ে দেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদেরকে স্বীয় সাহায্যের মাধ্যমে জয়যুক্ত করেন।

---

৫৯ - وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا ۚ إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ ○

৫৯। যারা কাফির তারা (বদর প্রান্তরে প্রাণ বাঁচাতে পেরে) যেন মনে না করে যে, তারা পরিত্রাণ পেয়েছে, তারা মুমিনগণকে হতবল করতে পারবে না।

৬০ - وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ ۚ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ○

৬০। তোমরা কাফিরদের মুকাবিলা করার জন্যে যথাসাধ্য শক্তি ও সদা সজ্জিত অশ্ববাহিনী প্রস্তুত রাখবে, যদদ্বারা আল্লাহর শত্রু ও তোমাদের শত্রুদেরকে ভীত-সন্ত্রস্ত করবে, এ ছাড়া অন্যান্যদেরকেও, যাদেরকে তোমরা জান না কিন্তু আল্লাহ্ জানেন; আর তোমরা আল্লাহর পথে যা কিছু ব্যয় কর তার প্রতিদান তোমাদেরকে পুরোপুরি দেয়া হবে, তোমাদের প্রতি (কম দিয়ে) অত্যাচার করা হবে না।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ কাফিররা আমার হাত ছাড়া হয়ে যাবে এবং আমি তাদেরকে ধরতে সক্ষম নই এরূপ ধারণা যেন তারা না করে। বরং তারা সব সময় আমার ক্ষমতা ও আয়ত্তের মধ্যে রয়েছে। তারা আমাকে হারাতে পারবে না। অন্য আয়াতে রয়েছে– "যারা দুষ্কার্যে লিপ্ত রয়েছে তারা কি ধারণা করেছে যে, তারা আমাকে এড়িয়ে যাবে? তারা যা ধারণা করেছে তা কতই না জঘন্য!" আর এক জায়গায় মহান আল্লাহ বলেনঃ "তুমি এ ধারণা করো না যে, কাফিররা ভূ-পৃষ্ঠে (লুকিয়ে থেকে) আমাকে পরাভূত করবে, তাদের ঠিকানা হচ্ছে জাহান্নাম এবং এটা খুবই নিকৃষ্ট স্থান।" অন্য স্থানে আল্লাহ পাক বলেনঃ "কাফিরদের শহরে (জাঁকজমকের সাথে) ঘুরাফিরা যেন তোমাকে প্রতারিত না করে, এটা অল্প কয়েকদিনের উপভোগ মাত্র, অতঃপর তাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম এবং ওটা অতি নিকৃষ্ট বিছানা।"

এরপর আল্লাহ তা'আলা মুসলিমদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন– "তোমরা তোমাদের শক্তি মোতাবেক সদা সর্বদা ঐ কাফিরদের মুকাবিলার জন্যে প্রস্তুত থাকো। যারা যুদ্ধের ঘোড়া সংগ্রহ করতে সক্ষম তারা তা মওজুদ রাখো।" মুসনাদে আহমাদে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) মিম্বরে আরোহিত অবস্থায় বলেনঃ

وَاَعِدُّوا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ

অর্থাৎ "তোমরা কাফিরদের মুকাবিলা করার জন্যে যথাসাধ্য শক্তি প্রস্তুত রাখো।" এরপর তিনি বলেনঃ "জেনে রেখো যে, এই শক্তি হচ্ছে তীরন্দাজী, এই শক্তি হচ্ছে তীরন্দাজী।"[১] অন্য একটি হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "তোমরা তীরন্দাজী কর এবং ঘোড়ায় সওয়ার হও (ও যুদ্ধ কর), আর তীরন্দাজী করা ঘোড়ায় সওয়ার হওয়া অপেক্ষা উত্তম।"

আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "ঘোড়া পালনকারী তিন প্রকারের। প্রথম হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যে ঘোড়া পালন করার কারণে সওয়াবের অধিকারী হয়ে থাকে। দ্বিতীয় হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যে ওর কারণে পুণ্যও লাভ করে না এবং তার পাপও হয় না। তৃতীয় হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যে ঘোড়া পালন করার কারণে পাপের অধিকারী হয়ে থাকে। যে ব্যক্তি জিহাদের উদ্দেশ্যে ঘোড়া পালন করে, তার ঘোড়াটি যে চরে ফিরে খায়, এর উপর তাকে সওয়াব দেয়া হয়। এমন কি যদি ঐ ঘোড়াটি রশি ছিঁড়ে পালিয়ে যায় তবে ওর পদ চিহ্নের

১. এ হাদীসটি ইমাম মুসলিম (রঃ), ইমাম আহমাদ (রঃ), ইমাম ইবনে মাজাহ্ (রঃ) এবং ইমাম আবূ দাউদ (রঃ) তাখরীজ করেছেন।

বিনিময়ে এবং ওর লাদ বা মলের বিনিময়েও সে সওয়াব প্রাপ্ত হয়। যদি ঘোড়াটি কোন নদীর পার্শ্ব দিয়ে গমনের সময় পানি পান করে নেয় তবে এ কারণেও মুজাহিদ ব্যক্তি সওয়াব প্রাপ্ত হয়, যদিও সে ওকে পানি পান করাবার ইচ্ছাও না করে থাকে। সুতরাং এ ঘোড়াটি ঐ মুজাহিদের জন্যে সওয়াব বা পুণ্য লাভের কারণ। আর যে ব্যক্তি ঘোড়া পালন করে অন্যদের থেকে অমুখাপেক্ষী থাকার জন্যে, অতঃপর সে ওর ঘাড় ও সওয়ারীর ব্যাপারে আল্লাহর হকের কথা ভুলে না যায় তবে ওটা তার জন্যে পর্দা স্বরূপ। অর্থাৎ সে ওর কারণে নেকীও পাবে না এবং তার গুনাহ্ও হবে না। আর যে ব্যক্তি অহংকার ও রিয়া প্রকাশের উদ্দেশ্যে ঘোড়া পালন করে যে, সে মুসলমানদের সাথে মুকাবিলা করবে, ওটা তার জন্যে পাপের বোঝা স্বরূপ।"

রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে গাধা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি উত্তরে বলেনঃ "আল্লাহ তা'আলা এ সম্পর্কে নিম্নের আয়াতটি ছাড়া আর কিছুই অবতীর্ণ করেননি। আয়াতটি হচ্ছেঃ

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ - وَ مَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ -

অর্থাৎ যে ব্যক্তি (দুনিয়াতে) অণু পরিমাণ নেক কাজ করবে সে তা দেখতে পাবে, আর যে ব্যক্তি অণু পরিমাণ বদ কাজ করবে সে তা তথায় দেখতে পাবে।"[১] (৯৯ঃ ৭-৮) আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "ঘোড়া তিন প্রকারের রয়েছে। (১) রাহমানের (আল্লাহর) ঘোড়া, (২) শয়তানের ঘোড়া এবং (৩) মানুষের ঘোড়া। রাহমানের ঘোড়া হচ্ছে ঐ ঘোড়া যাকে আল্লাহর পথে বেঁধে রাখা হয়। সুতরাং ওর খড়, ওর গোবর, ওর প্রস্রাব এবং আল্লাহ যা চাইলেন তা তিনি বর্ণনা করলেন (অর্থাৎ সবগুলো আল্লাহর পথে)। আর শয়তানের ঘোড়া হচ্ছে ঐ ঘোড়া যাকে ঘোড় দৌড় ও জুয়াবাজীর উদ্দেশ্যে রাখা হয়। মানুষের ঘোড়া হচ্ছে ঐ ঘোড়া যাকে মানুষ শুধুমাত্র ওর পেটের উদ্দেশ্যে বেঁধে রাখে। সুতরাং ওটা হচ্ছে তার পক্ষে দারিদ্রের মুকাবিলায় পর্দা স্বরূপ।" অধিকাংশ আলেমের উক্তি এই যে, তীরন্দাজ যোদ্ধা অশ্বারোহী সৈনিক হতে উত্তম। ইমাম মালিক (রঃ) এর বিপরীত মত পোষণ করেন। কিন্তু জমহূর উলামার উক্তিটিই দৃঢ়তম। কেননা, হাদীসেও এসেছে যে, মুআ'বিয়া ইবনে জুরাইজ (রাঃ) আবূ যার (রাঃ)-এর নিকট আগমন

১. এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রঃ), ইমাম মুসলিম (রঃ) এবং ইমাম মালিক (রঃ) তাখরীজ করেছেন।

করেন। সেই সময় তিনি তাঁর ঘোড়ার খিদমত করছিলেন। মুআ'বিয়া (রাঃ) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেনঃ "এ ঘোড়ার দ্বারা কি কাজ করা হয়?" উত্তরে তিনি বললেনঃ "আমার ধারণা, আমার পক্ষে এই ঘোড়াটির দুআ' কবূল হয়েছে।" মুআ'বিয়া (রাঃ) আবার জিজ্ঞেস করলেন, পশুর দুআ' আবার কি? তিনি জবাবে বললেন, যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! প্রতিটি ঘোড়া প্রত্যহ সকালে দুআ' করে থাকে। দুআ'য় সে বলে– "হে আল্লাহ! আপনি আমাকে আপনার এক বান্দার হাতে সমর্পণ করেছেন। সুতরাং আমাকে তার কাছে তার ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির চেয়ে প্রিয়তম করুন।" রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "কিয়ামত পর্যন্ত ঘোড়ার কপালে কল্যাণ বাঁধা থাকবে। ঘোড়া পালনকারী আল্লাহ তা'আলার সাহায্য প্রাপ্ত হয়েছে। যে ব্যক্তি ভাল নিয়তে জিহাদের উদ্দেশ্যে ঘোড়া লালন পালন করে সে ঐ ব্যক্তির মত যে সদা সর্বদা হাত বাড়িয়ে দান খয়রাত করে থাকে।"[১] এ সম্পর্কে আরো বহু হাদীস রয়েছে। সহীহ বুখারীতে ঘোড়ার কল্যাণের ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে যে, ওটা হচ্ছে সওয়াব ও গনীমত।

تُرْهِبُوْنَ -এর অর্থ হচ্ছে– তোমরা ভয় প্রদর্শন করবে।

عَدُوَّ اللّٰهِ وَ عَدُوَّكُمْ আল্লাহর শত্রু ও তোমাদের শত্রু অর্থাৎ কাফিরগণ।

وَ اٰخَرِيْنَ مِنْ دُوْنِهِمْ মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, এর দ্বারা ইয়াহূদী বানু কুরাইযাকে বুঝানো হয়েছে। সুদ্দী (রঃ) এর দ্বারা পারস্যবাসীকে বুঝিয়েছেন। আর সুফিয়ান সাওরী (রঃ) বলেন যে, এরা হচ্ছে ঘরের মধ্যে অবস্থানকারী শয়তান। একটি মারফূ' হাদীসে রয়েছে যে, এর দ্বারা জ্বিনদেরকে বুঝানো হয়েছে। একটি মুনকার হাদীসে রয়েছে যে, যে ঘরে কোন আযাদ ঘোড়া রয়েছে সেই ঘর কখনো বদনসীব বা হতভাগ্য হয় না। কিন্তু এ হাদীসটির সনদও ঠিক নয় এবং এটা বিশুদ্ধও নয়। এর অর্থ মুনাফিকও নেয়া হয়েছে। আর এ উক্তিটি সর্বাপেক্ষা গ্রহণযোগ্যও বটে। যেমন আল্লাহ পাক বলেনঃ

وَ مِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِّنَ الْاَعْرَابِ مُنٰفِقُوْنَ وَمِنْ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ مَرَدُوْا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ ط

অর্থাৎ "তোমাদের চতুর্দিকে গ্রাম্য ও শহুরে মুনাফিক রয়েছে এবং মদীনাবাসীদের মধ্যেও কেহ কেহ মুনাফেকীতে অনঢ়, যাদেরকে তোমরা জান না বটে, কিন্তু আমি তাদেরকে ভালরূপেই জানি।" (৯ঃ ১০১)

ইরশাদ হচ্ছে– জিহাদে তোমরা যা কিছু খরচ করবে তার পূর্ণ প্রতিদান তোমাদেরকে দেয়া হবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

---

১. এ হাদীসটি ইমাম তিবরানী (রঃ) সাহল ইবনে হানযালিয়্যাহ্ (রঃ) হতে তাখরীজ করেছেন।

مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ-

অর্থাৎ "যারা আল্লাহর পথে নিজেদের ধন-সম্পদ খরচ করে, তাদের খরচ করা ধন-সম্পদের অবস্থা এইরূপ যে, যেমন একটি শস্য-বীজ, যা হতে সাতটি শীষ উৎপন্ন হয়, প্রতিটি শীষের মধ্যে একশ'টি দানা হয়, আর এই বৃদ্ধি আল্লাহ যাকে ইচ্ছা প্রদান করেন, আল্লাহ হচ্ছেন প্রশস্ততার মালিক, মহাজ্ঞানী।" (২ঃ২৬১)

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, প্রথমে রাসূলুল্লাহ (সঃ) শুধুমাত্র মুসলমানদেরকেই সদকার মাল প্রদানের নির্দেশ দিতেন। কিন্তু যখন আল্লাহ তা'আলা

وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ ... - এই আয়াতটি অবতীর্ণ করেন তখন তিনি বলেনঃ "যে কোন ধর্মের লোক হোক না কেন সে তোমার কাছে চাইলে তুমি তাকে প্রদান কর।" এ রিওয়াইয়াতটি গারীব। ইবনে আবি হাতিম (রঃ) এটা বর্ণনা করেছেন।

৬১। যদি তারা (কাফিররা) সন্ধির দিকে ঝুঁকে পড়ে তবে তুমিও সন্ধি করতে আগ্রহী হও, আর আল্লাহর উপর ভরসা করো, নিঃসন্দেহে তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞাতা।

৬১- وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ○

৬২। আর তারা যদি তোমাকে প্রতারিত করার ইচ্ছা করে তবে তোমার জন্যে আল্লাহই যথেষ্ট, তিনি এমন (মহা শক্তিশালী) যে, (গায়েবী) সাহায্য (ফেরেশ্তা) দ্বারা এবং (বাহ্যিক সাহায্য) মুমিনগণ দ্বারা তোমাকে শক্তিশালী করেছেন ও করবেন।

৬২- وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ ○

৬৩। আর তিনি মুমিনদের অন্তরে প্রীতি ও ঐক্য স্থাপন করেছেন, তুমি যদি পৃথিবীর সমুদয় সম্পদও ব্যয় করতে তবুও তাদের অন্তরে প্রীতি, সদ্ভাব ও ঐক্য স্থাপন করতে পারতে না, কিন্তু আল্লাহই ওদের পরস্পরের মধ্যে প্রীতি ও সদ্ভাব স্থাপন করে দিয়েছেন, নিঃসন্দেহে তিনি মহা শক্তিমান ও মহা কৌশলী।

٦٣- وَ اَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ لَوْ اَنْفَقْتَ مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا مَّآ اَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ وَ لٰكِنَّ اللّٰهَ اَلَّفَ بَيْنَهُمْ اِنَّهٗ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۝

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নবী (সঃ)-কে সম্বোধন করে বলছেনঃ "হে নবী! যদি তোমার মুশরিক ও কাফিরদের খিয়ানতের ভয় হয় তবে সমতা রক্ষা করে তাদেরকে চুক্তি ও সন্ধিপত্র বাতিল করে দেয়ার সংবাদ অবহিত করতঃ তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে দাও। অতঃপর তারা যদি যুদ্ধের প্রতি উত্তেজনা প্রকাশ করে তবে আল্লাহ তা'আলার উপর ভরসা করতঃ যুদ্ধ শুরু করে দাও। আর যদি আবার তারা সন্ধির প্রস্তাব দেয় তবে পুনরায় সন্ধি করে নাও।" এই আয়াতের উপর আমল করতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ (সঃ) হুদায়বিয়ায় মক্কার কুরায়েশদের সাথে কয়েকটি শর্তের উপর নয় বছরের মেয়াদে সন্ধি করেন। আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "সত্বরই মতভেদ সৃষ্টি হবে বা অন্য কোন ব্যাপার ঘটবে। সুতরাং পারলে সন্ধিই করে নাও।"[১]

মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, এ আয়াতটি বানু কুরাইযার ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। কিন্তু এতে চিন্তা ভাবনার অবকাশ রয়েছে। কেননা, এ সমুদয় হচ্ছে বদরের ঘটনা। ইবনে আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রঃ), যায়েদ ইবনে আসলাম (রঃ), আতা খুরাসানী (রঃ), ইকরামা (রাঃ), হাসান (রাঃ) এবং কাতাদা (রঃ) বলেন যে, এ আয়াতটি সূরায়ে বারাআ'তের 'সাঈফ'-এর

قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَ لَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ .... (৯ঃ ২৯)

এই আয়াত দ্বারা মানসূখ বা রহিত হয়ে গেছে। কিন্তু এটাও চিন্তার বিষয়। কেননা, এই আয়াতে শক্তি ও সাধ্যের উপর জিহাদের হুকুম রয়েছে। কিন্তু

১. এ হাদীসটি মুসনাদে আহমাদে রয়েছে।

শত্রুদের সংখ্যাধিক্যের সময় তাদের সাথে সন্ধি করে নেয়া নিঃসন্দেহে জায়েয, যেমন এই আয়াতে কারীমায় রয়েছে এবং যেমন রাসূলুল্লাহ (সঃ) হুদায়বিয়ার দিন করেছিলেন। সুতরাং কোন বৈপরীত্য, কোন বিশেষত্ব এবং কোন রহিতকরণ নেই। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

মহান আল্লাহ বলেনঃ "হে নবী, আল্লাহর উপর ভরসা কর, তিনিই তোমার জন্যে যথেষ্ট। তিনিই তোমার সাহায্যকারী। যদি এ মুশরিকরা তোমার সাথে প্রতারণা করে এই সন্ধির মধ্যে নিজেদের শান শওকত ও যুদ্ধাস্ত্র বৃদ্ধি করে তবে তুমি নিশ্চিন্ত থাকবে। আল্লাহ তোমার পক্ষ অবলম্বন করবেন। তোমার জন্যে তিনিই যথেষ্ট। তাঁর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার কেউই নেই।"

এরপর আল্লাহ তা'আলা নিজের বড় নিয়ামতের বর্ণনা দিচ্ছেন। তিনি বলছেন– "আমি স্বীয় ফযল ও করমে মুহাজির ও আনসারদের মাধ্যমে তোমার সাহায্য করেছি। তাদেরকে তোমার প্রতি ঈমান আনার ও তোমার আনুগত্য করার তাওফীক দান করেছি। তুমি যদি সারা দুনিয়ার ধন ভাণ্ডারও ব্যয় করে দিতে তবুও তাদের মধ্যে সেই প্রেম-প্রীতি সৃষ্টি করতে পারতে না যা আল্লাহ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা তাদের পুরাতন শত্রুতা দূর করে দিয়েছেন। আউস ও খাযরাজ নামক আনসারদের দু'টি গোত্রের মধ্যে অজ্ঞতার যুগে ঝগড়া বিবাদ লেগেই থাকতো। তারা সবসময় কাটাকাটি মারামারি করতো। ঈমানের আলো তাদের সেই শত্রুতাকে বন্ধুত্বে পরিণত করে। যেমন আল্লাহ পাক বলেনঃ "তোমরা আল্লাহর ঐ নিয়ামতের কথা স্মরণ কর যা তোমাদের উপর রয়েছে, যখন তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে, অতঃপর আল্লাহ তোমাদের অন্তরে ভালবাসা সৃষ্টি করে দিয়েছেন, ফলে তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহে পরস্পর ভাই ভাই হয়ে গিয়েছো, আর তোমরা জাহান্নামের গর্তের তীরে ছিলে, অতঃপর তিনি তোমাদেরকে তা থেকে রক্ষা করেছেন, এমনিভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে স্বীয় বিধানসমূহ পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করে থাকেন, যেন তোমরা (সঠিক) পথে থাকো।"

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, হুনায়েনের যুদ্ধলব্ধ মাল বন্টন করার সময় রাসূলুল্লাহ (সঃ) আনসারদেরকে সম্বোধন করে বলেনঃ "হে আনসারের দল! আমি কি তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট অবস্থায় পেয়ে আল্লাহর অনুগ্রহে সরল সঠিক পথ প্রদর্শন করিনি? তোমরা দরিদ্র ছিলে, অতঃপর আমার মাধ্যমে আল্লাহ কি তোমাদেরকে সম্পদশালী করেননি? তোমরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে

পড়েছিলে, তারপর আমার মাধ্যমে কি আল্লাহ তোমাদের পরস্পরের মধ্যে মিলন ঘটাননি? "এভাবে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর প্রত্যেকটি প্রশ্নের উত্তরে আনসারগণ বলতেছিলেনঃ "নিশ্চয়ই আমাদের উপর আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ)-এর ইহসান এর চেয়েও বেশী রয়েছে।" মোটকথা, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় ইনআ'ম ও ইকরামের বর্ণনা দেয়ার পর তাঁর মর্যাদা ও নৈপুণ্যের বর্ণনা দিয়েছেন যে, তিনি মহান ও সর্বোচ্চ এবং যে ব্যক্তি তাঁর রহমতের আশা রাখে সে নিরাশ হয় না। যে তাঁর উপর ভরসা করে তার ইহজীবন ও পরজীবন সুখময় হয়। তিনি স্বীয় কাজেকর্মে ও হুকুম দানে মহাজ্ঞানী ও বিজ্ঞানময়। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা হয় এবং নিয়ামতের প্রতিও কৃতঘ্নতা দেখা যায়, কিন্তু অন্তরের মিল মহব্বতের মত আর কিছুই দেখা যায়নি। আল্লাহ পাক বলেনঃ "হে নবী! তুমি যদি দুনিয়ার ধনভাণ্ডারও শেষ করতে তবুও তোমার এ শক্তি ছিল না যে, তুমি তাদের অন্তরে প্রেম-প্রীতি ও ভালবাসা সৃষ্টি করবে।" কবি বলেনঃ "তোমাকে প্রতারণাকারী এবং তোমার প্রতি অভ্রূক্ষেপকারী তোমার আত্মীয় নয়, বরং তোমার প্রকৃত আত্মীয় হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যে তোমার আহ্বানে সাড়া দেয় এবং তোমার শত্রুকে দমন করার কাজে তোমাকে সহায়তা করে।" অনুরূপভাবে অন্য এক কবি বলেনঃ "আমি লোকদের সাথে মেলামেশা করে তাদেরকে পরীক্ষা করেছি এবং বুঝেছি যে, অন্তরের মিল আত্মীয়তার চেয়েও বড়।" ইমাম বায়হাকী (রঃ) বলেনঃ "এসব উক্তি ইবনে আব্বাসেরই (রাঃ) না কি তাঁর পরবর্তী অন্য কোন বর্ণনাকারীর তা আমার জানা নেই।" ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বলেন যে, তাদের এ মহব্বত ছিল আল্লাহর পথে এবং সেটা ছিল তাওহীদ ও সুন্নাহর ভিত্তির উপর। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, আত্মীয়তার সম্পর্কও ছিন্ন হয়ে যায় এবং ইহসানেরও না শুকরী করা হয়, কিন্তু আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে অন্তরকে যে মিলিয়ে দেয়া হয় তা কেউই পৃথক করতে পারে না। অতঃপর তিনি .... لَوْ اَنْفَقْتَ -এই আয়াতটি পাঠ করেন।

আবদা ইবনে আবি লুবাবা (রঃ) বলেন, একদা মুজাহিদ (রঃ)-এর সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়। তিনি আমার সাথে মুসাফাহা (কর মর্দন) করে বলেনঃ "আল্লাহর পথে মহব্বতকারী দু'টি লোক যখন পরস্পর মিলিত হয় এবং হাসিমুখে একে অপরের হাতে হাত মিলায়, তখন গাছের শুষ্ক পাতা ঝরে পড়ার মত তাদের উভয়ের পাপরাশি ঝরে পড়ে।" তার এ কথা শুনে আমি বললাম, এটা তো খুবই সহজ কাজ। তখন তিনি বললেন, এ কথা বলো না। এটা হচ্ছে সেই মহব্বত যে সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেনঃ "(হে নবী)! তুমি যদি সারা

দুনিয়ার ধন ভাণ্ডারও খরচ করে দাও তবুও তোমার সাধ্য নেই যে, তুমি তাদের অন্তরে মহব্বত বা প্রেম-প্রীতি সৃষ্টি করতে পার।" তাঁর এ কথা শুনে আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে গেল যে, তিনি আমার চেয়ে অনেক বেশী বুদ্ধিমান। ওয়ালীদ ইবনে আবি মুগীস (রঃ) বলেনঃ "আমি মুজাহিদ (রঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, যখন দু'জন মুসলমান পরস্পর মিলিত হয় ও মুসাফাহা করে তখন তাদের গুনাহ মাফ হয়ে যায়।" আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করি– শুধু মুসাফাহা করলেই কি? তিনি উত্তরে বলেনঃ "তুমি কি আল্লাহর এই কথা শুননি?" অতঃপর তিনি এই আয়াতটি পাঠ করেন। তখন আমি বলি, আপনি আমার চেয়ে বড় আলেম। উমাইর ইবনে ইসহাক (রঃ) বলেন যে, মানুষের মধ্য থেকে প্রথম যে জিনিস উঠে যাবে তা হচ্ছে মহব্বত বা ভালবাসা। তিবরানী (রঃ)-এর হাদীস গ্রন্থে সালমান ফারসী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "যখন কোন মুসলমান তার কোন মুসলমান ভাইয়ের সাথে মিলিত হয়, অতঃপর তার সাথে মুসাফাহা করে তখন তাদের দু'জনের গুনাহ্ এমনভাবে ঝরে পড়ে যেমনভাবে প্রবল বাতাসের দিনে গাছের শুষ্ক পাতাগুলো ঝরে যায়। তাদের সমস্ত গুনাহ্ মাফ করে দেয়া হয় যদিও তা সমুদ্রের ফেনার সমানও হয়।"

٦٤- يٰاَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللّٰهُ وَ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝ ﴿ع﴾

৬৪। হে নবী! তোমার জন্যে ও তোমার অনুসারী মুমিনদের জন্যে (সর্বক্ষেত্রে) আল্লাহই যথেষ্ট।

٦٥- يٰاَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى الْقِتَالِ اِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ عِشْرُوْنَ صٰبِرُوْنَ يَغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ وَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ مِّائَةٌ يَّغْلِبُوْٓا اَلْفًا مِّنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ ۝

৬৫। হে নবী! মুমিনদেরকে জিহাদের জন্যে উদ্বুদ্ধ কর, তোমাদের মধ্যে যদি বিশজন ধৈর্যশীল মুজাহিদ থাকে তবে তারা দু'শ জন কাফিরের উপর জয়যুক্ত হবে, আর তোমাদের মধ্যে একশ' জন থাকলে তারা এক হাজার কাফিরের উপর বিজয়ী হবে, কারণ তারা এমন এক সম্প্রদায় যাদের বোধশক্তি নেই, কিছুই বোঝে না।

٦٦- اَلْئٰنَ خَفَّفَ اللّٰهُ عَنْكُمْ وَ عَلِمَ اَنَّ فِيْكُمْ ضَعْفًا ؕ فَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَّغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ ۚ وَ اِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ اَلْفٌ يَّغْلِبُوْۤا اَلْفَيْنِ بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ وَ اللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ○

৬৬। আল্লাহ এখন তোমাদের গুরুদায়িত্ব লাঘব করে দিলেন, তোমাদের মধ্যে যে দৈহিক দুর্বলতা রয়েছে সে সম্পর্কে তিনি অবগত আছেন, সুতরাং তোমাদের মধ্যে একশ'জন ধৈর্যশীল লোক থাকলে তারা দু'শজন কাফিরের উপর জয়যুক্ত হবে, আর এক হাজার জন থাকলে তারা আল্লাহর হুকুমে দু'হাজার জন কাফিরের উপর বিজয় লাভ করবে, আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন।

এখানে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নবী (সঃ) ও মুসলিমদেরকে জিহাদের প্রতি উৎসাহিত করছেন এবং তাঁদের অন্তরে প্রশান্তি দান করছেন যে, তিনি তাঁদেরকে শত্রুদের উপর জয়যুক্ত করবেন, যদিও তারা সংখ্যায় অধিক ও তাদের অস্ত্রশস্ত্রও বেশী, আর মুসলিমরা সংখ্যায় কম এবং তাঁদের যুদ্ধাস্ত্রও নগণ্য। মহান আল্লাহ স্বীয় রাসূল (সঃ)-কে সম্বোধন করে বলছেনঃ "আল্লাহই তোমার জন্যে যথেষ্ট এবং যে স্বল্প সংখ্যক মুসলিম তোমার সাথে রয়েছে তাদের দ্বারাই তুমি সফলতা লাভ করবে।" এরপর আল্লাহ পাক তাঁর নবী (সঃ)-কে নির্দেশ দিচ্ছেন- "তুমি মুমিনদেরকে জিহাদের প্রতি উৎসাহ দান করতে থাক।" রাসূলুল্লাহ (সঃ) সৈন্যদের শ্রেণী বিন্যাস করার সময় এবং মুকাবিলার সময় সৈন্যবাহিনীর মনে উৎসাহ-উদ্দীপনা যোগাতে থেকেছেন। বদর যুদ্ধের দিন তিনি তাঁদেরকে বলেনঃ "উঠো, ঐ জান্নাত লাভ কর যার প্রস্থ হচ্ছে আসমান ও যমীনের সমান।" এ কথা শুনে উমায়ের ইবনে হামাম (রাঃ) বলেনঃ "প্রস্থ এতো বেশী?" রাসূলুল্লাহ (সঃ) উত্তরে বলেনঃ "হ্যাঁ হ্যাঁ, এতোটাই বটে।" তখন তিনি বলেনঃ "বাঃ! বাঃ!" রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর এ কথা শুনে বলেনঃ "এ কথা তুমি কি উদ্দেশ্যে বললে?" তিনি উত্তরে বলেনঃ "আমি একথা এ আশায় বললাম যে, আল্লাহ তা'আলা আমাকেও জান্নাত দান করবেন।" তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "আমি ভবিষ্যদ্বাণী করছি যে, তুমি সত্যিই জান্নাত লাভ করবে।" তিনি তখন উঠে শত্রুদের দিকে অগ্রসর হলেন এবং তরবারীর কোষ ভেঙ্গে দিলেন। অতঃপর তাঁর কাছে যা কিছু খেজুর ছিল তা খেতে শুরু করলেন। তারপর তিনি বললেনঃ "এগুলো খাওয়া পর্যন্ত আমি বিলম্ব করতে পারি না। সুতরাং তিনি ওগুলো হাত

থেকে ফেলে দিলেন এবং আক্রমণে উদ্যত হয়ে সিংহের ন্যায় শত্রুদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লেন, আর সুতীক্ষ্ণ তরবারী দ্বারা কাফিরদেরকে হত্যা করতে করতে নিজেও শহীদ হয়ে গেলেন। আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন এবং তাঁকেও সন্তুষ্ট করুন!

ইবনুল মুসাইয়াব (রাঃ) এবং সাঈদ ইবনে জুবাইর (রাঃ) বলেন যে, এ আয়াত উমার (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণের সময় অবতীর্ণ হয়। ঐ সময় মুসলিমদের সংখ্যা মোট চল্লিশজন হয়েছিল। কিন্তু এ কথায় চিন্তা ভাবনার অবকাশ রয়েছে। কেননা, এটা মাদানী আয়াত। অথচ উমার (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণ হচ্ছে মক্কার ঘটনা। এটা হচ্ছে আবিসিনিয়ার হিজরতের পরের এবং মদীনায় হিজরতের পূর্বের ঘটনা। এসব বিষয় আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা মুমিনদেরকে সুসংবাদ প্রদান পূর্বক নির্দেশ দিচ্ছেন– "তোমাদের বিশজন কাফিরদের দু'শজনের উপর বিজয়ী হবে এবং একশজন এক হাজারের উপর জয়যুক্ত হবে। মোটকথা একজন মুসলিম দশজন কাফিরের উপর বিজয় লাভ করবে। অতঃপর এ হুকুম মানসূখ বা রহিত হয়ে যায়। কিন্তু সুসংবাদ বাকী রয়েছে। যখন মুসলিমদের এটা কঠিন ঠেকলো তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর হুকুম হালকা করে দিলেন এবং বললেন যে, আল্লাহ তা'আলা বোঝা হালকা করে দিলেন। কিন্তু সংখ্যা যতটা কম হয়ে গেল সেই পরিমাণ ধৈর্যও কম হলো। পূর্বে হুকুম ছিল যে, বিশজন মুসলিম যেন দু'শজন কাফির থেকে পিছে না সরে। এখন এই হুকুম হলো যে, তাদের দ্বিগুণ সংখ্যা অর্থাৎ একশজন মুসলিম যেন দু'শজন কাফির থেকে পলায়ন না করে। সুতরাং পূর্বের হুকুম মুমিনদের কাছে কঠিন হওয়ার কারণে তাদের দুর্বলতা কবূল করতঃ আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর হুকুম হালকা করে দেন। অতএব যুদ্ধের ময়দানে কাফিরদের সংখ্যা দ্বিগুণ হওয়া অবস্থায় মুসলিমদের পিছনে সরে যাওয়া উচিত নয়। হ্যাঁ, তবে তাদের সংখ্যা মুসলিমদের দ্বিগুণের বেশী হলে তাদের সাথে যুদ্ধ করা মুসলিমদের উপর ওয়াজিব নয় এবং ঐ অবস্থায় তাদের পিছনে সরে যাওয়া জায়েয।[১] ইবনে উমার (রাঃ) বলেন যে, এ আয়াতটি মুহাম্মাদ (সঃ)-এর সাহাবীদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। রাসূলুল্লাহ (সঃ) اَلْئٰنَ خَفَّفَ اللّٰهُ عَنْكُمْ وَ عَلِمَ اَنَّ فِيْكُمْ ضَعْفًا -এ আয়াতটি পাঠ করে বলেনঃ "পূর্বের হুকুমটি উঠে গেছে।"

১. মুজাহিদ (রঃ), ইকরামা (রঃ), হাসান (রঃ), যায়েদ ইবনে আসলাম (রঃ) যহহাক (রঃ) প্রমুখ গুরুজন হতে এরূপই বর্ণিত হয়েছে।

৬৭। কোন নবীর পক্ষে ততক্ষণ পর্যন্ত বন্দী লোক রাখা শোভা পায় না, যতক্ষণ পর্যন্ত ভূ-পৃষ্ঠ (দেশ) হতে শত্রুবাহিনী নির্মূল না হয়, তোমরা দুনিয়ার সম্পদ কামনা করছো, আর আল্লাহ চান পরকালের কল্যাণ, আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

٦٧- مَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗٓ اَسْرٰى حَتّٰى يُثْخِنَ فِي الْاَرْضِ تُرِيْدُوْنَ عَرَضَ الدُّنْيَا ۖ وَاللّٰهُ يُرِيْدُ الْاٰخِرَةَ ؕ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ○

৬৮। আল্লাহর লিপি পূর্বেই লিখিত না হলে তোমরা যা কিছু গ্রহণ করেছো তজ্জন্যে তোমাদের উপর মহা-শাস্তি আপতিত হতো।

٦٨- لَوْلَا كِتٰبٌ مِّنَ اللّٰهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيْمَآ اَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ○

৬৯। সুতরাং যুদ্ধে তোমরা যা কিছু গনীমতরূপে লাভ করেছো তা হালাল ও পবিত্ররূপে ভোগ কর, আর আল্লাহকে ভয় কর, নিঃসন্দেহে আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।

٦٩- فَكُلُوْا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلٰلًا طَيِّبًا ۖؗ وَّاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○ ع

মুসনাদে আহমাদে রয়েছে যে, বদরের বন্দীদের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সঃ) স্বীয় সাহাবীবর্গের সাথে পরামর্শ করেন। তিনি তাঁদের বলেনঃ "আল্লাহ তা'আলা এই বন্দীদেরকে তোমাদের অধিকারে দিয়েছেন। বল, তোমাদের ইচ্ছা কি?" উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) দাঁড়িয়ে গিয়ে বললেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! তাদেরকে হত্যা করা হোক।" রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। পুনরায় রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ "আল্লাহ তা'আলা এদেরকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন, এরা কাল পর্যন্তও তোমাদের ভাইই ছিলো।" উমার (রাঃ) দাঁড়িয়ে তাঁর উত্তরের পুনরাবৃত্তি করেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) এবারও মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং পুনরায় ঐ কথা বললেন। এবার আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ) দাঁড়িয়ে গিয়ে আরয করলেন– "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমার মত

এই যে, আপনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিন এবং তাদের নিকট থেকে মুক্তিপণ আদায় করুন।” এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর চেহারা থেকে চিন্তার লক্ষণ দূরীভূত হয়। তিনি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন এবং মুক্তিপণ নিয়ে সকলকেই মুক্ত করে দেন। তখন মহামহিমান্বিত আল্লাহ এ আয়াত অবতীর্ণ করেন। এই সূরারই শুরুতে ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর বর্ণনা বর্ণিত হয়েছে। সহীহ মুসলিমেও এরূপ একটি হাদীস আছে যে, বদরের দিন রাসূলুল্লাহ (সঃ) সাহাবীদের জিজ্ঞেস করেনঃ “এই বন্দীদের ব্যাপারে তোমরা কি চাও?” আবূ বকর (রাঃ) উত্তরে বলেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! এরা তো আপনার কওমের লোক এবং আপনার পরিবারেরই মানুষ। সুতরাং এদেরকে জীবিতই ছেড়ে দেয়া হোক এবং তাওবা করিয়ে নেয়া যাক। এতে বিস্ময়ের কিছুই নেই যে, হয়তো কাল আল্লাহ এদের উপর দয়া করবেন।” কিন্তু উমার (রাঃ) বলেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! এরা আপনাকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারী এবং আপনাকে দেশ থেকে বিতাড়নকারী। সুতরাং এদের গর্দান উড়িয়ে দেয়ার নির্দেশ দান করুন।” আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাঃ) বললেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! এ মাঠে বহু খড়ি রয়েছে। এগুলোতে আগুন ধরিয়ে দিন এবং এদেরকে এ আগুনে ফেলে দিয়ে জ্বালিয়ে দিন।” রাসূলুল্লাহ (সঃ) এঁদের কথা শুনে নীরব হয়ে যান। কাউকেও কোন জবাব না দিয়ে উঠে চলে গেলেন। এই তিন মহান ব্যক্তিরই পক্ষ অবলম্বনকারী লোক জুটে গেলেন। এমন সময় রাসূলুল্লাহ (সঃ) এসে বলতে লাগলেনঃ কারও কারও অন্তর দুধের চেয়েও নরম হয়ে গেছে এবং কারও কারও হৃদয় পাথরের চেয়েও শক্ত হয়ে গেছে। হে আবূ বকর! তোমার দৃষ্টান্ত হচ্ছে ইবরাহীম (আঃ)-এর মত। তিনি আল্লাহর নিকট আরয করেছিলেনঃ “যারা আমার অনুসরণ করেছে তারা তো আমারই লোক, আর যারা আমার অবাধ্য হয়েছে তাদের ব্যাপারেও আপনি ক্ষমাশীল ও দয়ালু।” হে আবূ বকর! তোমার দৃষ্টান্ত ঈসা (আঃ)-এর দৃষ্টান্তের ন্যায়ও বটে। যিনি বললেনঃ “হে আল্লাহ! আপনি যদি তাদেরকে শাস্তি প্রদান করেন তবে তারা আপনার বান্দা, আর যদি তাদেরকে ক্ষমা করে দেন তবে আপনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।” হে উমার! তোমার দৃষ্টান্ত হচ্ছে মূসা (আঃ)-এর ন্যায়। তিনি বলেছিলেনঃ “হে আমার প্রতিপালক! তাদের ধন-সম্পদ নিশ্চিহ্ন করে দিন এবং তাদের অন্তর কঠোর করে দিন, সুতরাং তারা ঈমান আনবে না যে পর্যন্ত না তারা বেদনাদায়ক শাস্তি অবলোকন করে।” হে আব্দুল্লাহ! তোমার দৃষ্টান্ত নূহ (আঃ)-এর ন্যায়ও বটে। তিনি বলেছিলেনঃ “হে আমার প্রভু! আপনি কাফিরদের মধ্য হতে যমীনের উপর একজনকেও অবশিষ্ট

রাখবেন না।” দেখো, তোমরা এখন দারিদ্র্যপীড়িত। সুতরাং এই বন্দীদের কেউই ফিদইয়া প্রদান ছাড়া মুক্তি পেতে পারে না। আর ফিদইয়া না দিলে তাদেরকে হত্যা করা হবে। তখন আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বললেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! এদের থেকে সাহীল ইবনে বায়যাকে বিশিষ্ট করে নিন। কেননা, সে ইসলামের আলোচনা করে থাকে।” এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সঃ) নীরব হয়ে যান। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেনঃ “আল্লাহর কসম! আমি সারা দিন ভীত-সন্ত্রস্ত থাকলাম যে, না জানি আমার উপর আকাশ থেকে পাথরই বর্ষিত হয়! শেষ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ “সাহীল ইবনে বায়যা ব্যতীত।” তখন আল্লাহ তা'আলা مَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗ اَسْرٰى ...... -এ আয়াতটি অবতীর্ণ করেন।”[১] এই কয়েদীদের মধ্যে আব্বাস (রাঃ) ছিলেন। তাঁকে একজন আনসারী গ্রেফতার করেছিলেন। এই আনসারীর ধরণা ছিল যে, তাঁকে হত্যা করা হবে। রাসূলুল্লাহও (সঃ) এ অবস্থা অবগত ছিলেন। তিনি বলেনঃ “এই চিন্তায় রাত্রে আমার ঘুম হয়নি।” উমার (রাঃ) তাঁকে বললেনঃ “আপনার অনুমতি হলে আমি এ ব্যাপারে আনসারদের নিকট গমন করি।” রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে অনুমতি দিলেন। সুতরাং উমার (রাঃ) আনসারদের নিকট গমন করে বললেনঃ “আব্বাস (রাঃ)-কে ছেড়ে দিন।” তাঁরা বললেনঃ “আল্লাহর কসম! আমরা তাঁকে ছাড়বো না।” তখন উমার (রাঃ) বললেনঃ “এতেই যদি আল্লাহর রাসূল (সঃ)-এর সন্তুষ্টি নিহিত থাকে তবুও কি ছাড়বেন না?” তাঁরা তখন বললেনঃ “যদি এটাই হয় তবে আপনি তাঁকে নিয়ে যান। আমরা খুশী মনে তাঁকে ছেড়ে দিচ্ছি।” উমার (রাঃ) আব্বাস (রাঃ)-কে বললেনঃ “হে আব্বাস (রাঃ)! আপনি ইসলাম গ্রহণ করুন। আল্লাহর কসম! আপনার ইসলাম গ্রহণ আমার কাছে আমার পিতার ইসলাম গ্রহণের চাইতেও বেশী আনন্দের কারণ হবে। কেননা, রাসূলুল্লাহ (সঃ) আপনার ইসলাম গ্রহণে খুশী হবেন।” এই সব কয়েদীর ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সঃ) আবূ বকর (রাঃ)-এর সাথে পরামর্শ করলেন। তখন তিনি বললেনঃ “এরা তো আমাদের গোত্রেরই লোক। সুতরাং এদেরকে ছেড়ে দিন।” অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সঃ) উমার (রাঃ)-এর সাথে পরামর্শ করলে তিনি বললেনঃ “এদের সকলকেই হত্যা করে দিন।” শেষ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (সঃ) বন্দীদের কাছে মুক্তিপণ নিয়ে সকলকেই ছেড়ে দেন। আলী (রাঃ) বলেন যে,

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) ও ইমাম তিরমিযী (রঃ) বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম হাকিম (রঃ) এটাকে তাঁর মুসতাদরিক গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, আর বলেছেন যে, এর ইসনাদ বিশুদ্ধ এবং তাঁরা দু'জন এটাকে তাখরীজ করেননি।

জিবরাঈল (আঃ) এসে বলেনঃ "হে রাসূল (সঃ)! আপনার সাহাবীদেরকে ইখতিয়ার দিন যে, তাঁরা দুটোর মধ্যে যে কোন একটি গ্রহণ করতে পারেন। হয় তাঁরা মুক্তিপণ নিয়ে বন্দীদেরকে ছেড়ে দিবেন, না হয় তাদেরকে হত্যা করে ফেলবেন। কিন্তু স্মরণ রাখতে হবে যে, মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেয়া হলে আগামী বছর বন্দীদের সমান সংখ্যক মুসলমান শহীদ হয়ে যাবেন।" সাহাবীগণ বলেন যে, তাঁরা প্রথমটিই গ্রহণ করলেন এবং বন্দীদেরকে মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দিবেন।[১]

এই বদরী বন্দীদের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ " হে সাহাবীর দল! যদি চাও তবে মুক্তিপণ আদায় করে তাদেরকে ছেড়ে দাও। অথবা ইচ্ছা করলে হত্যা করে দাও। কিন্তু মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দিলে তাদের সমান সংখ্যক তোমাদের লোক শহীদ হয়ে যাবে।" এই সত্তরজন শহীদের মধ্যে সর্বশেষ শহীদ হচ্ছেন সাবিত ইবনে কায়েস (রাঃ), যিনি ইয়ামামার যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন। এই রিওয়ায়াতটি মুরসালরূপে উবাইদাহ (রাঃ) হতেও বর্ণিত আছে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ পাকের জ্ঞানই সবচেয়ে বেশী।

মহান আল্লাহ বলেনঃ "আল্লাহর কিতাবে প্রথম থেকেই যদি তোমাদের জন্যে গনীমতের মাল হালাল রূপে লিপিবদ্ধ না করা হতো এবং বর্ণনা করে দেয়ার পূর্বে আমি শাস্তি প্রদান করি না– এটা যদি আমার নীতি না হতো তবে যে ফিদইয়া বা মুক্তিপণ তোমরা গ্রহণ করেছো তার কারণে আমি তোমাদেরকে কঠিন শাস্তি প্রদান করতাম। এভাবেই আল্লাহ তা'আলা ফায়সালা করে রেখেছিলেন যে, কোন বদরী সাহাবীকে তিনি শাস্তি দিবেন না। তাদের জন্যে ক্ষমা লিপিবদ্ধ করে দেয়া হয়েছে। উম্মুল কিতাবে তোমাদের জন্যে গনীমতের মাল হালাল বলে লিখে দেয়া হয়েছে। সুতরাং গনীমতের মাল তোমাদের জন্যে হালাল ও পবিত্র। ইচ্ছামত তোমরা তা খাও, পান কর এবং নিজেদের কাজে লাগাও।" পূর্বেই এটা লিখে দেয়া হয়েছিল যে, এই উম্মতের জন্যে এটা হালাল। এটাই ইবনে জারীর (রঃ)-এর নিকট পছন্দনীয় উক্তি। আর সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমেও এর সাক্ষ্য মিলে। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "আমাকে এমন পাঁচটি জিনিস প্রদান করা হয়েছে যা আমার পূর্বে অন্য কোন নবীকে প্রদান করা হয়নি। (১) এক মাসের পথ পর্যন্ত ভয় ও প্রভাব দ্বারা আমাকে সাহায্য করা হয়েছে। (২) যমীনকে আমার জন্যে মসজিদ ও পবিত্র বানানো হয়েছে। (৩) গনীমতের মাল আমার

১. এ হাদীসটি ইমাম তিরমিযী (রঃ) ও ইমাম নাসাঈ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। কিন্তু হাদীসটি অত্যন্ত গারীব ও দুর্বল।

জন্যে হালাল করা হয়েছে যা আমার পূর্বে আর কারো জন্যে হালাল ছিল না। (৪) আমাকে শাফাআ'তের অনুমতি দেয়া হয়েছে। (৫) প্রত্যেক নবীকে বিশেষভাবে তাঁর নিজের কওমের কাছে প্রেরণ করা হতো। কিন্তু আমি সাধারণভাবে সকল মানবের নিকট প্রেরিত হয়েছি।"

আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "আমাদের ছাড়া কোন কালো মাথা বিশিষ্ট মানুষের জন্যে গনীমতের মাল হালাল করা হয়নি।" এ জন্যেই আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ "তোমরা যে গনীমতের মাল লাভ করেছো তা হালাল ও পবিত্ররূপে ভক্ষণ কর।" সাহাবীগণ কয়েদীদের নিকট থেকে মুক্তিপণ আদায় করেছিলেন । সুনানে আবি দাউদে রয়েছে যে, প্রত্যেকের নিকট থেকে চারশ করে আদায় করা হয়েছিল। সুতরাং জমহূরে উলামার মতে প্রতি যুগের ইমামের এ ইখতিয়ার রয়েছে যে, তিনি ইচ্ছা করলে বন্দী কাফিরদেরকে হত্যা করতে পারেন, যেমন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বানু কুরাইযার বন্দীদেরকে হত্যা করেছিলেন। আর ইচ্ছা করলে মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দিতে পারেন, যেমন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বদরী বন্দীদেরকে মুক্তিপণের বিনিময়ে আযাদ করে দিয়েছিলেন। আবার ইচ্ছা করলে মুসলমান বন্দীদের বিনিময়ে মুক্ত করে দিতে পারেন, যেমন রাসূলুল্লাহ (সঃ) মাসলামা ইবনে আকওয়া গোত্রের একটি স্ত্রীলোক ও তার মেয়েকে মুশরিকদের নিকট বন্দী মুসলমানদের বিনিময়ে তাদেরকে প্রদান করেছিলেন। আর ইচ্ছা করলে ঐ বন্দীদেরকে গোলাম বানিয়ে রাখতে পারে। এটাই ইমাম শাফিঈ (রঃ) ও উলামায়ে কিরামের একটি দলের মাযহাব, যদিও অন্যেরা ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। এখানে এর বিস্তারিত আলোচনা করার তেমন কোন সুযোগ নেই।

৭০। হে নবী! তোমাদের হাতে যেসব বন্দী রয়েছে তাদেরকে বল, আল্লাহ যদি তোমাদের অন্তরে কল্যাণকর কিছু রয়েছে তা অবগত হন তবে তোমাদের হতে (মুক্তিপণরূপে) যা কিছু নেয়া হয়েছে তা অপেক্ষা উত্তম কিছু দান করবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন, আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু।

٧٠- يَاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّمَنْ فِيْ اَيْدِيْكُمْ مِّنَ الْاَسْرٰى اِنْ يَّعْلَمِ اللّٰهُ فِيْ قُلُوْبِكُمْ خَيْرًا يُّؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا اُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

৭১। আর তারা যদি তোমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করার ইচ্ছা রাখে তবে এর পূর্বে আল্লাহর সাথেও তারা বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল, সুতরাং (এর শাস্তি স্বরূপ) তিনি তাদের উপর তোমাকে শক্তিশালী করেছেন, আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়।

٧١- وَاِنْ يُّرِيْدُوْا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللّٰهَ مِنْ قَبْلُ فَاَمْكَنَ مِنْهُمْ وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ○

ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বদরের দিন বলেছিলেনঃ "নিশ্চিতরূপে আমি অবগত আছি যে, কোন কোন বানু হাশিমকে জোরপূর্বক এই যুদ্ধে বের করে আনা হয়েছে। আমাদের সাথে যুদ্ধ করার তাদের মোটেই ইচ্ছা ছিল না। সুতরাং বানু হাশিমকে হত্যা করো না, আবুল বাখতারী ইবনে হিশামকেও মেরে ফেলো না এবং আব্বাস ইবনে মুত্তালিবকেও হত্যা করো না। লোকেরা তাদেরকে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাদের সাথে টেনে এনেছে।" তখন আবূ হুযাইফা ইবনে উৎবা (রাঃ) বলেনঃ "আমরা আমাদের বাপ-দাদাদেরকে, আমাদের সন্তানদেরকে, আমাদের ভাইদেরকে এবং আমাদের আত্মীয় -স্বজনদেরকে হত্যা করবো, আর আব্বাস (রাঃ)-কে ছেড়ে দেবো? আল্লাহর কসম! যদি আমি তাকে পেয়ে যাই তবে তার গর্দান উড়িয়ে দেবো।" একথা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কানে পৌঁছলে তিনি বলেন "হে আবূ হাফ্স![1] রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর চাচার মুখে কি তরবারীর আঘাত করা হবে?" উমার ফারূক (রাঃ) বলেনঃ "এটাই ছিল প্রথম দিন যেই দিন রাসূলুল্লাহ আমাকে আমার কুনিয়াত দ্বারা সম্বোধন করেন।" তিনি বলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! অনুমতি হলে আমি আবূ হুযাইফা (রাঃ)-এর গর্দান উড়িয়ে দেবো। আল্লাহর কসম! সে মুনাফিক হয়ে গেছে।" আবূ হুযাইফা (রাঃ) বলেনঃ "আল্লাহর কসম! আমার সেই দিনের কথার খটকা আজ পর্যন্তও রয়েছে। ঐ কথার জন্যে আমি আজও ভীত আছি। আমি তো ঐ দিনই শান্তি লাভ করবো যেই দিন আমার এই কথার কাফফারা আদায় হয়ে যাবে। আর সেই কাফফারা হচ্ছে এই যে, আমি আল্লাহর পথে শহীদ হয়ে যাবো।" অতঃপর তিনি ইয়ামামার যুদ্ধে শহীদ হয়ে যান। আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন এবং তাঁকে সন্তুষ্ট করুন!

১. উমার (রাঃ)-এর কুনিয়াত বা উপনাম।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, যেই দিন বদরী বন্দীরা গ্রেফতার হয়ে আসে সেই রাত্রে রাসূলুল্লাহ (সঃ) -এর ঘুম হয়নি। সাহাবীগণ কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেনঃ "এই কয়েদীদের মধ্য থেকে আমার চাচা আব্বাস (রাঃ)-এর কান্নাকাটির শব্দ আমার কানে আসছে।" তখন সাহাবীরা তাঁর বন্ধন খুলে দেন। এরপর রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ঘুম হয়। আব্বাস (রাঃ)-কে একজন আনসারী সাহাবী গ্রেফতার করেছিলেন। তিনি খুব ধনী ছিলেন। মুক্তিপণ হিসেবে তিনি একশ আওকিয়া[১] সোনা প্রদান করেছিলেন। কোন কোন আনসারী নবী (সঃ)-কে বলেন ঃ "আমরা আপনার চাচা আব্বাস (রাঃ)-কে মুক্তিপণ ছাড়াই ছেড়ে দিতে চাই।" কিন্তু সমতা কায়েমকারী নবী (সঃ) বলেনঃ "না, আল্লাহর কসম! তোমরা এক দিরহাম কম করো না। বরং পূর্ণ মুক্তিপণ আদায় করো।" কুরায়েশরা মুক্তিপণের অর্থ দিয়ে লোক পাঠিয়েছিল। প্রত্যেকই ধার্যকৃত অর্থ দিয়ে নিজ নিজ কয়েদীকে ছাড়িয়ে নিয়েছিলেন। আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল! আমি তো মুসলমানই ছিলাম।" তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "আপনার ইসলাম গ্রহণের বিষয় আমি অবগত আছি। যদি আপনার কথা সত্য হয় তবে আল্লাহ আপনাকে এর বিনিময় প্রদান করবেন। কিন্তু আহকাম বাহ্যিকের উপর জারী হয়ে থাকে বলে আপনাকে আপনার মুক্তিপণ আদায় করতেই হবে। তাছাড়া আপনার দু'ভ্রাতুষ্পুত্র নওফেল ইবনে হারিস ইবনে আবদিল মুত্তালিব ও আকীল ইবনে আবি তালিব ইবনে আবদিল মুত্তালিবের মুক্তিপণ আপনাকে আদায় করতে হবে। আরো আদায় করতে হবে আপনার মিত্র উৎবা ইবনে আমরের মুক্তিপণ, যে বানু হারিস ইবনে ফাহরের গোত্রভুক্ত।" তিনি বললেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমার কাছে তো এতো মাল নেই।" রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন বললেন, আপনার ঐ মাল কোথায় গেল যা আপনি ও উম্মুল ফযল যমীনে পুঁতে রেখেছেন আর বলেছেন, "আমি যদি এই সফরে সফলকাম হই তবে এই মাল হবে বানুল ফযল, আবদুল্লাহ এবং কাসামের।" রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর একথা শুনে আব্বাস (রাঃ) স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলে উঠলেনঃ "আল্লাহর কসম! আমি জানি যে, আপনি আল্লাহর সত্য রাসূল। আমার এই মাল পুঁতে রাখার ঘটনা আমি ও উম্মুল ফযল (তাঁর স্ত্রী) ছাড়া আর কেউই জানে না! আচ্ছা, এ কাজ করুন যে, আমার নিকট থেকে আপনার সেনাবাহিনী বিশ আওকিয়া সোনা প্রাপ্ত হয়েছে, ওটাকেই আমার মুক্তিপণ হিসেবে গণ্য করা হোক।" একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ "কখনও নয়। ওটা তো আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহে দান

১. এক আওকিয়ার ওজন হচ্ছে এক তোলা সাত মাশা।

করেছেন।” সুতরাং আব্বাস (রাঃ) নিজের, তাঁর দুই ভাতুষ্পুত্রের এবং তাঁর মিত্রের মুক্তিপণ নিজের পক্ষ হতে আদায় করলেন। এই পরিপ্রেক্ষিতেই আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করেনঃ “তোমাদের অন্তরে কল্যাণকর কিছু রয়েছে তা যদি আল্লাহ অবগত হন তবে তোমাদের হতে (মুক্তিপণরূপে) যা কিছু নেয়া হয়েছে তা অপেক্ষা উত্তম কিছু দান করবেন।” আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ “আল্লাহ তা'আলার এই ঘোষণা কার্যকরী হয়েছে। আমার ইসলাম গ্রহণের কারণে আমার এই বিশ আওকিয়ার বিনিময়ে আল্লাহ আমাকে এমন বিশটি গোলাম দান করেছেন যারা সবাই ব্যবসায়ী ও সম্পদশালী। সাথে সাথে আমি এ আশাও করছি যে, মহামহিমান্বিত আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করে দিবেন।” তিনি বলেনঃ “আমার ব্যাপারেই এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে। আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে আমার ইসলাম গ্রহণের খবর দিলাম এবং বললাম, আমার বিশ আওকিয়ার বিনিময় আমাকে দেয়া হোক। তিনি তা অস্বীকার করলেন। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই যে, তিনি আমাকে আমার এই বিশ আওকিয়ার বিনিময়ে এমন বিশটি গোলাম দান করেন যারা সবাই ব্যবসায়ী।” তিনি এবং তাঁর সঙ্গীরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলেছিলেনঃ “আমরা তো আপনার অহীর উপর ঈমান এনেছি, আপনার রিসালাতের আমরা সাক্ষ্য দান করছি এবং আমাদের কওমের মধ্যে আমরা আপনার মঙ্গল কামনা করেছি।” তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করেন। আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ “সারা দুনিয়া লাভ করলেও আমি ততো খুশী হতাম না যতো খুশী হয়েছিলাম এই আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার কারণে। আল্লাহর কসম! আমার নিকট থেকে মুক্তিপণ হিসেবে যা নেয়া হয়েছিল তার চেয়ে একশ গুণ বেশী আল্লাহ আমাকে প্রদান করেছেন এবং এটাও আশা করছি যে, আমার পাপগুলোও মাফ করে দেয়া হবে।”

এ আয়াতের তাফসীরে কাতাদা (রঃ) বলেন, আমাদের কাছে বর্ণনা করা হয়েছে যে, বাহরাইন থেকে যখন রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে আশি হাজার পরিমাণ মাল এসে পৌঁছে তখন তিনি যোহরের সালাতের জন্যে অযু করছিলেন। অতঃপর তিনি প্রত্যেক অভিযোগকারীকেই সেই দিন ঐ মাল থেকে প্রদান করেন এবং কোন প্রার্থনাকারীকেই বঞ্চিত করেননি। সেইদিন তিনি (যোহরের) সালাতের পূর্বেই সমস্ত মাল আল্লাহর পথে বিলিয়ে দেন। আব্বাস (রাঃ)-কে তিনি ঐ মাল থেকে গ্রহণ করার নির্দেশ দেন এবং বোঝা বেঁধে নিতে বলেন। আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ “আমার থেকে যা নেয়া হয়েছিল তার থেকে এটা বহুগুণে উত্তম এবং আমি আশা করছি যে, আমার পাপরাশি ক্ষমা করে দেয়া হবে।”

হামীদ ইবনে হিলাল (রাঃ) বলেন যে, এই মাল ইবনে হাযরামী বাহরাইন থেকে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট পাঠিয়েছিলেন। এতো মাল নবী (সঃ)-এর নিকট এর পূর্বে এবং পরে কখনো আসেনি। এ মালের পরিমাণ ছিল আশি হাজার। এ মাল চাটাইর উপর ছড়িয়ে দেয়া হয়। অতঃপর নামাযের জন্যে আযান দেয়া হয়। রাসূলুল্লাহ (সঃ) আগমন করেন এবং মালের কাছে দাঁড়িয়ে যান। মসজিদের নামাযীরাও এসে পড়েন। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) প্রত্যেককে দিতে শুরু করেন। সেইদিন কোন ওজনও ছিল না এবং গণনাও ছিল না। যে আসে সেই নিয়ে যায়। তারা সবাই ইচ্ছামত নিয়ে যায়। আব্বাস (রাঃ) এসে তো চাদরের বোঝা বাঁধেন। কিন্তু উঠাতে সক্ষম না হয়ে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলেন, "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! একটু উঠিয়ে দিন।" এতে নবী (সঃ) হেসে উঠেন, এমন কি তাঁর দাঁতের ঔজ্জ্বল্য পরিলক্ষিত হয়। তিনি তাঁকে বলেনঃ "কিছু কম নিন। যা উঠাতে পারবেন তাই নিন।" সুতরাং তিনি কিছু কমিয়ে নিলেন এবং তা উঠিয়ে নিয়ে বলতে বলতে গেলেনঃ "আল্লাহ তা'আলার জন্যেই সমস্ত প্রশংসা। তাঁর একটি কথা তো পূর্ণ হলো। তাঁর দ্বিতীয় ওয়াদাও ইনশাআল্লাহ পূর্ণ হয়ে যাবে (অর্থাৎ তিনি আমাকে ক্ষমা করে দিবেন)। আমার নিকট থেকে মুক্তিপণ হিসেবে যা নেয়া হয়েছে, তার চেয়ে এটা বহুগুণে উত্তম।" রাসূলুল্লাহ (সঃ) ঐ মাল বন্টন করতেই থাকেন। শেষ পর্যন্ত ঐ মালের কিছুই অবশিষ্ট থাকলো না। তিনি ঐ মাল থেকে নিজের পরিবার-পরিজনকে একটি কানাকড়িও প্রদান করলেন না। অতঃপর তিনি নামাযের জন্যে সামনে এগিয়ে যান এবং নামায পড়িয়ে দেন।

এ ব্যাপারে অন্য একটি হাদীস আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট বাহরাইন হতে মাল আসে। তিনি সাহাবীদেরকে বলেনঃ "এগুলো আমার মসজিদে ছড়িয়ে দাও।" রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট অন্য সময় যে মাল এসেছিল, ওগুলোর চেয়ে এটাই ছিল অধিক মাল অর্থাৎ এর পূর্বে বা পরে এতো অধিক মাল তাঁর কাছে আসেনি। অতঃপর তিনি নামাযের জন্যে বেরিয়ে আসেন। কারো দিকে তিনি ফিরে তাকালেন না। নামায পড়িয়ে দিয়ে তিনি বসে পড়লেন। অতঃপর তিনি যাকেই দেখলেন তাকেই দিলেন। ইতিমধ্যে আব্বাস (রাঃ) এসে গেলেন এবং বললেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমাকেও প্রদান করুন। আমি আমার নিজের ও আকীলের মুক্তিপণ আদায় করেছি।" রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে বললেনঃ "আপনি নিজের হাতেই নিয়ে নিন।" তিনি চাদরে পুটলি বাঁধলেন। কিন্তু ওটা ওজনে ভারী হয়ে যাওয়ার কারণে উঠাতে পারলেন না। সুতরাং বললেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! কাউকে এটা

আমার কাঁধে উঠিয়ে দিতে বলুন।" নবী (সঃ) বললেনঃ "কাউকে আমি এটা উঠিয়ে দিতে বলবো না।" তখন তিনি বললেনঃ "তাহলে আপনিই উঠিয়ে দিন।" রাসূলুল্লাহ (সঃ) এবারও অস্বীকৃতি জানালেন। কাজেই বাধ্য হয়ে তাঁকে কিছু কম করতেই হলো। অতঃপর তিনি ওটা কাঁধে উঠিয়ে চলতে শুরু করলেন। তাঁর এ লোভ দেখে রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর দিকে চেয়েই থাকলেন যে পর্যন্ত না তিনি তাঁর দৃষ্টির অন্তরাল হলেন। যখন সমস্ত মাল বন্টিত হয়ে গেল এবং একটা কড়িও বাকী থাকলো না তখন তিনি ওখান থেকে উঠলেন। ইমাম বুখারীও (রঃ) স্বীয় কিতাব সহীহ বুখারীর মধ্যে এ বর্ণনাটিকে কয়েক জায়গায় এনেছেন।

আল্লাহ পাক বলেনঃ এ লোকগুলো যদি বিশ্বাসঘাতকতা করে তবে এটা কোন নতুন কথা নয়। এর পূর্বে তারা আল্লাহর সাথেও বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। সুতরাং তাদের দ্বারা এটাও সম্ভব যে, এখন মুখে তারা যা প্রকাশ করছে, অন্তরে হয়তো এর বিপরীত কিছু গোপন করছে। এতে ঘাবড়াবার কিছুই নেই। এখন যেমন আল্লাহ তা'আলা এদেরকে তোমার ক্ষমতাধীনে রেখেছেন, এরূপই তিনি সব সময়েই করতে সক্ষম। আল্লাহর কোন কাজই কোন জ্ঞান ও হিকমত থেকে শূন্য নয়। এদের সাথে এবং সমস্ত মাখলূকের সাথে তিনি যা কিছু করেন তা নিজের চিরন্তন পূর্ণ জ্ঞান ও পূর্ণ নিপুণতার সাথেই করে থাকেন।

কাতাদা (রঃ) বলেন যে, এ আয়াতটি লেখক আবদুল্লাহ ইবনে আবি সারাহ এর ব্যাপারে অবতীর্ণ হয় যে ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে মুশরিকদের সাথে মিলিত হয়েছিল। আতা খুরাসানী (রঃ) বলেন যে, এটা আব্বাস (রাঃ) এবং তাঁর সাথীদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়, যখন তাঁরা বলেছিলেনঃ "আমরা আপনার মঙ্গল কামনা করতে থাকবো।" সুদ্দী (রঃ) বলেন, এটা সাধারণ এবং সবগুলোই এর অন্তর্ভুক্ত। এটা সঠিকও বটে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

৭২। যারা ঈমান এনেছে, দ্বীনের জন্যে হিজরত করেছে, নিজেদের জানমাল দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে, এবং যারা আশ্রয় দান ও সাহায্য করেছে, তারা পরস্পরের বন্ধু, আর যারা

٧٢- إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ هَاجَرُوا وَ جٰهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَ الَّذِينَ آوَوا وَّ نَصَرُوا أُولٰئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ

بَعْضٍ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يُهَاجِرُوْا مَا لَكُمْ مِّنْ وَّلَايَتِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ حَتّٰى يُهَاجِرُوْا وَاِنِ اسْتَنْصَرُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ اِلَّا عَلٰى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

ঈমান এনেছে, কিন্তু হিজরত করেনি, তারা হিজরত না করা পর্যন্ত তাদের অভিভাবকত্বের কোন দায়িত্ব তোমাদের নেই, আর তারা যদি দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের নিকট সাহায্যপ্রার্থী হয় তবে তাদের সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য, কিন্তু তোমাদের ও যে জাতির মধ্যে চুক্তি রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে নয়, তোমরা যা করছো আল্লাহ তা খুব ভালরূপেই দ্রষ্টা।

এখানে আল্লাহ তা'আলা মুসলিমদের প্রকারভেদ বর্ণনা করেছেন। প্রথম হলেন মুহাজির যাঁরা আল্লাহর নামে স্বদেশ ত্যাগ করেছেন। তাঁরা একমাত্র আল্লাহর দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার উদ্দেশ্যে নিজেদের ঘরবাড়ী, ব্যবসা-বাণিজ্য, আত্মীয়-স্বজন এবং দোস্ত বন্ধুদের পরিত্যাগ করেছেন। তাঁরা জীবনকে জীবন মনে করেননি এবং মালকে মাল মনে করেননি। দ্বিতীয় হলেন মদীনার আনসারগণ, যাঁরা মুহাজিরদেরকে নিজেদের কাছে আশ্রয় দিয়েছেন, তাঁদের সম্পদের অংশ দিয়েছেন এবং তাঁদের সাথে মিলিত হয়ে তাঁদের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। তাঁরা সব পরস্পর একই। এ জন্যেই রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁদেরকে পরস্পর ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করেছিলেন। একজন মুহাজিরকে একজন আনসারীর ভাই বানিয়ে দিয়েছিলেন। এই বানানো ভাই আত্মীয়তাকেও হার মানিয়েছিল। তাঁরা একে অপরের উত্তরাধিকারী হয়ে যেতেন। পরে এটা মানসূখ (রহিত) হয়ে যায়। ইবনে আবদিল্লাহ আল বাজালী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "মুহাজির ও আনসার একে অপরের ওলী এবং মক্কা বিজয়ের আযাদকৃত কুরায়েশ ও আযাদকৃত বানু সাকীফ কিয়ামত পর্যন্ত একে অপরের ওলী।[১] অন্য রিওয়ায়াতে আছে যে, তারা দুনিয়া ও আখিরাতে একে অপরের ওলী। মুহাজির ও আনসারের প্রশংসায় আরো বহু আয়াত রয়েছে। যেমন আল্লাহ পাক বলেনঃ

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রাঃ) জারীর ইবনে আবদিল্লাহ বাজালী (রঃ) হতে তাখরীজ করেছেন এবং হাফিজ আবূ ইয়ালা (রঃ) এটা ইবনে মাসঊদ (রাঃ) হতে মারফূরূপে বর্ণনা করেছেন।

وَ السّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَ الْاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ رَّضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ وَاَعَدَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ تَحْتَهَا الْاَنْهٰرُ -

অর্থাৎ "পূর্ববর্তী (আল্লাহর) নৈকট্য লাভকারীরা হচ্ছে মুহাজির ও আনসার এবং ইহসানের সাথে যারা তাদের অনুসরণ করেছে, তাদের প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট, তিনি তাদের জন্যে এমন জান্নাতসমূহ তৈরী করে রেখেছেন যেগুলোর নীচ দিয়ে ঝর্ণাসমূহ প্রবাহিত হচ্ছে।" (৯ঃ ১০০) অন্য জায়গায় মহান আল্লাহ বলেন ঃ

لَقَدْ تَّابَ اللّٰهُ عَلَى النَّبِىِّ وَالْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ فِىْ سَاعَةِ الْعُسْرَةِ -

অর্থাৎ "আল্লাহ নবী (সঃ)-এর উপর এবং ঐ সব মুহাজির ও আনসারের উপর রহমতের দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন যারা কঠিন ও সংকটময় মহূর্তেও তাঁর অনুসরণ পরিত্যাগ করেনি।" (৯ঃ ১১৭) আল্লাহ পাক আরো বলেনঃ

لِلْفُقَرَاءِ الْمُهٰجِرِيْنَ الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَ اَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَ رِضْوَانًا وَّ يَنْصُرُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ - وَ الَّذِيْنَ تَبَوَّؤُ الدَّارَ وَ الْاِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُوْنَ فِىْ صُدُوْرِهِمْ حَاجَةً مِّمَّآ اُوْتُوْا وَ يُؤْثِرُوْنَ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ط

অর্থাৎ "(শুভ সংবাদ রয়েছে) ঐ দরিদ্র মুহাজিরদের জন্যে যাদেরকে তাদের মালধন থেকে এবং দেশ থেকে বের করে দেয়া হয়েছে, যারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁর সন্তুষ্টি অনুসন্ধান করে থাকে, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ)-এর সাহায্যের কাজে লেগে রয়েছে, এরাই হচ্ছে সত্যবাদী। আর যারা তাদেরকে স্থান দিয়েছে, তাদের প্রতি ভালবাসা রেখেছে, প্রশস্ত অন্তর দিয়ে তাদেরকে দান করেছে, এমন কি নিজেদের প্রয়োজনের উপর তাদের প্রয়োজনকে প্রাধান্য দিয়েছে অর্থাৎ যে হিজরতের ফযীলত আল্লাহ মুহাজিরদেরকে প্রদান করেছেন তার উপর তারা হিংসা করে না।" (৫৯ঃ ৮-৯) এসব আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, আনসারদের উপর মুহাজিরদের প্রাধান্য রয়েছে। মুসনাদে বাযযারে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) হুযাইফা (রাঃ)-কে 'হিজরত' ও 'নুসরত' এ দু'টির যে কোন একটিকে গ্রহণ করার ইখতিয়ার প্রদান করেন। তখন হুযাইফা (রাঃ) হিজরতকেই পছন্দ করেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "যারা ঈমান এনেছে, কিন্তু হিজরত করেনি, তারা হিজরত না করা পর্যন্ত তাদের অভিভাবকত্বের কোন দায়িত্ব তোমাদের নেই।" এটা হচ্ছে মুমিনদের তৃতীয় প্রকার। এরা হচ্ছে ওরাই যারা নিজেদের জায়গাতেই অবস্থানরত ছিল। গনীমতের মালে তাদের কোন অংশ ছিল না এবং এক পঞ্চমাংশেও ছিল না। হ্যাঁ, তবে তারা কোন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলে সেটা অন্য কথা।

মুসনাদে আহমাদে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) যখন কাউকে কোন সেনাবাহিনীর সেনাপতি করে পাঠাতেন তখন তিনি তাঁকে উপদেশ দিতেনঃ "দেখো, অন্তরে আল্লাহর ভয় রাখবে এবং মুসলমানদের সাথে সদা শুভাকাঙ্ক্ষামূলক ব্যবহার করবে। যাও, আল্লাহর নাম নিয়ে তাঁর পথে জিহাদ কর, আল্লাহর সাথে কুফরীকারীদের সঙ্গে যুদ্ধ কর। তোমাদের শত্রু মুশরিকদের সামনে তিনটি প্রস্তাব পেশ কর। এ তিনটির যে কোন একটি গ্রহণ করার তাদের ইখতিয়ার রয়েছে। প্রথমে তাদের সামনে ইসলাম গ্রহণের প্রস্তাব পেশ করবে। যদি তারা তা মেনে নেয় তবে তাদের থেকে বিরত থাকবে এবং তাদের ইসলাম গ্রহণকে স্বীকার করে নেবে। অতঃপর তাদেরকে বলবে যে, তারা যেন কাফিরদের দেশ ত্যাগ করে মুহাজিরদের দেশে চলে যায়। যদি তারা এ কাজ করে তবে মুহাজিরদের জন্যে যেসব হক রয়েছে, তাদের জন্যেও সেই সব হক প্রতিষ্ঠিত হবে এবং মুহাজিরদের উপর যা রয়েছে তাদের উপরও তা-ই থাকবে। অন্যথায় এরা গ্রামাঞ্চলের অন্যান্য মুসলমানদের মত হয়ে যাবে। ঈমানের আহকাম তাদের উপর জারী হবে। 'ফাই' ও গনীমতের মালে তাদের কোন অংশ থাকবে না। হ্যাঁ তবে যদি তারা কোন সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে কোন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে তবে সেটা অন্য কথা। আর যদি তারা ইসলাম গ্রহণে সম্মত না হয় তবে তাদেরকে জিযিয়া প্রদানে বাধ্য করবে। যদি তারা এটা মেনে নেয় তবে যুদ্ধ থেকে বিরত থাকবে এবং তাদের নিকট থেকে জিযিয়া আদায় করবে। যদি তারা এ দুটোই অস্বীকার করে তবে আল্লাহর সাহায্যের উপর ভরসা রেখে এবং সেই সাহায্য তাঁর কাছে প্রার্থনা করে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে দাও। যে গ্রাম্য মুসলিমরা তাদের জায়গাতেই মুকীম রয়েছে এবং হিজরত করেনি, তারা যদি কোন সময় তোমাদের কাছে দ্বীনের দুশমনের বিরুদ্ধে সাহায্যের প্রত্যাশী হয় তবে তাদের সাহায্য করা তোমাদের উপর ওয়াজিব। কিন্তু যদি তারা এমন জাতির মুকাবিলায় তোমাদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে যে জাতির ও তোমাদের মধ্যে চুক্তি রয়েছে, তবে সাবধান! তোমরা বিশ্বাস ভঙ্গ করো না এবং কসমও ভেঙ্গে দিয়ো না।"

৭৩। আর যারা কুফরী করছে তারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু, তোমরা যদি (উপরোক্ত) বিধান কার্যকর না কর তবে ভূ-পৃষ্ঠে ফিৎনা ও মহাবিপর্যয় দেখা দেবে।

٧٣- وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ اِلَّا تَفْعَلُوْهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْاَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيْرٌ ○

উপরে আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করলেন যে, মুমিনরা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু। আর এখানে তিনি বর্ণনা করছেন যে, কাফিররা একে অপরের বন্ধু এবং তিনি মুসলমান ও কাফিরের মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিন্ন করে দিলেন। যেমন মুসতাদরিকে হাকিমে উসামা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ "দু'টি ভিন্ন মাযহাবের লোক একে অপরের উত্তরাধিকারী হতে পারে না। না পারে মুসলিম কাফিরের উত্তরাধিকারী হতে এবং না পারে কাফির মুসলিমের ওয়ারিস হতে।" অতঃপর এ আয়াতটিই পাঠ করেন। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "মুসলিম কাফিরের এবং কাফির মুসলিমের ওয়ারিস হতে পারে না।" মুসনাদ ও সুনান গ্রন্থে রয়েছে যে, দু'টি ভিন্ন মাযহাবের লোক একে অপরের ওয়ারিস হয় না।[১] আবূ জা'ফর ইবনে জারীর (রঃ) যুহরী (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, একজন নবদীক্ষিত মুসলমানের নিকট অঙ্গীকার গ্রহণ করতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে বলেনঃ "তুমি নামায কায়েম করবে, যাকাত দিবে, বায়তুল্লাহ শরীফে হজ্ব করবে, রমযানুল মুবারাকের রোযা রাখবে এবং যেখানে শির্কের আগুন জ্বলে উঠবে সেখানে তুমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবে।" এ হাদীসটি মুরসাল। বিস্তারিত বর্ণনায় রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "আমি এমন মুসলমান হতে দায়িত্বমুক্ত যে মুশরিকদের মধ্যে অবস্থান করে। দু'ধারে প্রজ্বলিত আগুন কি সে দেখতে পায় না?"[২] সুনানে আবি দাউদে সামুরা ইবনে জুনদুব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি মুশরিকদের সাথে মেলামেশা করে এবং তাদের মধ্যে অবস্থান করে সে তারই মত।" হাফিয আবূ বকর ইবনে মিরদুওয়াই (রঃ) আবূ হাতিম আল মুযানী (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে,

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) ও আসহাবুস সুনান তাখরীজ করেছেন এবং ইমাম তিরমিযী (রঃ) এটাকে হাসান সহীহ বলেছেন।

২. এ হাদীসটিকে ইবনে জারীর (রঃ) মুরসাল ও মুত্তাসিলরূপে তাখরীজ করেছেন।

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ “যখন এমন ব্যক্তি তোমাদের কাছে আগমন করে যার দ্বীন ও চরিত্রে তোমরা সন্তুষ্ট, তোমরা তার বিয়ে দিয়ে দাও। যদি তোমরা এ কাজ না কর তবে ভূ-পৃষ্ঠে ফিৎনা ও মহাবিপর্যয় দেখা দেবে।” সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেনঃ “তার মধ্যে যদি কিছু থাকে?” তিনি পুনরায় বললেনঃ “যদি তোমাদের কাছে এমন ব্যক্তির বাগ্‌দান আসে যার দ্বীন ও চরিত্রে তোমরা সন্তুষ্ট, তবে তার বিয়ে দিয়ে দাও।” এ কথা তিনি তিনবার বললেন। আয়াতের এই শব্দগুলোর ভাবার্থ হচ্ছে– তোমরা যদি মুশরিকদের থেকে দূরে না থাকো এবং মুমিনদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন না কর তবে ভীষণ ফিৎনা সৃষ্টি হয়ে যাবে। কাফিরদের সাথে মুসলমানদের এই মেলামেশা খারাপ পরিণতি টেনে আনবে এবং ভূ-পৃষ্ঠে মহা বিপর্যয় দেখা দেবে।

৭৪। যারা ঈমান এনেছে, (দ্বীনের জন্যে) হিজরত করেছে এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে, আর যারা (মুমিনদেরকে) আশ্রয় দিয়েছে এবং যাবতীয় সাহায্য সহানুভূতি করেছে, তারাই হলো প্রকৃত মুমিন, তাদের জন্যে রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা।

٧٤- وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ هَاجَرُوْا وَ جٰهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ الَّذِيْنَ اٰوَوْا وَّ نَصَرُوْا اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّ رِزْقٌ كَرِيْمٌ ○

৭৫। আর যারা পরে ঈমান এনেছে ও হিজরত করেছে এবং তোমাদের সাথে একত্র হয়ে জিহাদ করেছে, তারা তোমাদেরই অন্তর্ভুক্ত, আল্লাহর বিধানে আত্মীয়গণ একে অন্যের অপেক্ষা বেশী হকদার, নিঃসন্দেহে আল্লাহ প্রতিটি বস্তু সম্পর্কে ভালরূপে অবহিত।

٧٥- وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْ بَعْدُ وَ هَاجَرُوْا وَ جٰهَدُوْا مَعَكُمْ فَاُولٰٓئِكَ مِنْكُمْ وَ اُولُوا الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ فِيْ كِتٰبِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ○

আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের পার্থিব হুকুম বর্ণনা করার পর আখিরাতে তাদের জন্যে কি রয়েছে তার বর্ণনা দিচ্ছেন। তিনি তাদের ঈমানের সত্যতা প্রকাশ করছেন। যেমন এই সূরার প্রথম দিকে এ বর্ণনা দেয়া হয়েছে। তারা দান প্রাপ্ত হবে, তাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করে দিবেন এবং তারা সম্মানজনক জীবিকা লাভ করবে, যা হবে চিরস্থায়ী এবং পাক ও পবিত্র। সেগুলো হবে বিভিন্ন প্রকারের উপাদেয় খাদ্য এবং সেগুলো কখনো নিঃশেষ হবে না। তাদের যারা অনুসারী এবং ঈমানে ও ভাল আমলে তাদের সাথে অংশগ্রহণকারী তারা আখিরাতেও সমমর্যাদা লাভ করবে। যেমন আল্লাহ পাক وَ السّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ (৯ঃ ১০০) এবং وَ الَّذِيْنَ جَآءُوْا مِنْۢ بَعْدِهِمْ (৫৯ঃ ১০) বলেছেন। এটা সর্বসম্মত মত এমন কি মুতাওয়াতির হাদীসেও রয়েছে যে, মানুষ তার সাথেই থাকবে যাকে সে ভালবাসে। অন্য একটি হাদীসে রয়েছে যে, যে ব্যক্তি কোন কওমের সাথে ভালবাসা রাখে সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। একটি রিওয়ায়াতে আছে যে, তার হাশরও ওদের সাথেই হবে। মুসনাদে আহমাদের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, মুহাজির ও আনসার একে অপরের ওলী বা অভিভাবক। মক্কা বিজয়ের পরের মুসলমান কুরায়েশী এবং সাকীফের আযাদকৃত ব্যক্তি কিয়ামত পর্যন্ত একে অপরের অভিভাবক।

এরপর উলুল আরহামের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। এখানে উলুল আরহাম দ্বারা ঐ আত্মীয়দের উদ্দেশ্য করা হয়নি যাদেরকে ফারায়েয শাস্ত্রবিদদের পরিভাষায় উলুল আরহাম বলা হয়ে থাকে। অর্থাৎ যাদের কোন অংশ নির্ধারিত নেই এবং যারা আসাবাও[১] নয়। যেমন মামা, খালা, ফুফু, কন্যার ছেলেমেয়ে, বোনের ছেলেমেয়ে ইত্যাদি। কারো কারো মতে এখানে উলুল আরহাম দ্বারা এদেরকেই বুঝানো হয়েছে। তাঁরা এ আয়াতটিকেই দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন এবং এই ব্যাপারে তাকে স্পষ্টভাবে ওলী বলে থাকেন। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার তা নয়। বরং সঠিক কথা এই যে, এ আয়াতটি আম বা সাধারণ। এটা সমস্ত আত্মীয়কেই অন্তর্ভুক্ত করে। যেমন ইবনে আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রঃ), ইকরামা (রঃ), হাসান (রঃ) এবং কাতাদা (রঃ) বলেন যে, মিত্রদের পরস্পর ওয়ারিশ হওয়া এবং বানানো ভাইদের পরস্পর ওয়ারিশ হওয়া, যা পূর্বে প্রথা ছিল, এ আয়াতটি এটাকে মানসূখ

১. আল্লাহ তা'আলার কিতাবে যেসব ওয়ারিসের অংশ নির্ধারিত রয়েছে তাদেরকে অংশ দেয়ার পর বাকী অংশ যেসব ওয়ারিস পেয়ে থাকে তাদেরকে ফারায়েযের পরিভাষায় আসাবা বলা

বা রহিতকারী। সুতরাং এটা বিশেষ নামের সাথে ফারায়েযের আলেমদের যাবিল আরহামকে অন্তর্ভুক্ত করবে। আর যাঁরা এদেরকে ওয়ারিস বলেন না তাঁদের কয়েকটি দলীল রয়েছে। তাঁদের সবচেয়ে মজবুত দলীল হচ্ছে নিম্নের হাদীসটিঃ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রত্যেক হকদারকে তার হক প্রদান করেছেন। সুতরাং কোন ওয়ারিসের জন্যে অসিয়ত নেই।" তাঁরা বলেন যে, এরা যদি হকদার হতো তবে আল্লাহর কিতাবে এদেরও হক নির্ধারিত হতো। কিন্তু তা যখন নেই তখন তারা ওয়ারিসও নয়। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

সূরা ঃ আনফাল এর তাফসীর সমাপ্ত

সূরা তাওবা মাদানী

سُوْرَةُ التَّوْبَةِ مَدَنِيَّةٌ

(আয়াত ঃ ১৯২, রুকু ঃ ১৬)

(اٰيَاتُهَا : ١٩٢، رُكُوْعَاتُهَا : ١٦)

١- بَرَآءَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖۤ اِلَى الَّذِيْنَ عٰهَدْتُّمْ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ؕ

১। আল্লাহর পক্ষ হতে ও তাঁর রাসূলের পক্ষ হতে অব্যাহতি (ঘোষণা করা) হচ্ছে ঐ মুশরিকদের (অঙ্গীকার) হতে যাদের সাথে তোমরা সন্ধি করে রেখেছিলে।

٢- فَسِيْحُوْا فِى الْاَرْضِ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّ اعْلَمُوْۤا اَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِى اللّٰهِ ۙ وَ اَنَّ اللّٰهَ مُخْزِى الْكٰفِرِيْنَ ○

২। সুতরাং (হে মুশরিকরা) তোমরা এই ভূ-মণ্ডলে চার মাস বিচরণ করে নাও এবং জেনে রেখো যে, তোমরা আল্লাহকে অক্ষম করতে পারবে না, আর নিশ্চয়ই আল্লাহ কাফিরদেরকে অপদস্থ করবেন।

এই সম্মানিত সূরাটি হচ্ছে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর উপর নাযিলকৃত সর্বশেষ সূরা। সহীহ্ বুখারীতে বারা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, সর্বশেষ আয়াত হচ্ছে- يَسْتَفْتُوْنَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلٰلَةِ (৪ঃ ১৭৬) এই আয়াতটি এবং সর্বশেষ সূরা হচ্ছে সূরায়ে বারাআত।[১] এই সূরার প্রথমে বিসমিল্লাহ লিখিত না থাকার কারণ এই যে, সাহাবীগণ আমীরুল মুমিনীন উসমান ইবনে আফফান (রাঃ)-কে অনুকরণ করে কুরআনে এই সূরার পূর্বে বিসমিল্লাহ লিখেননি। সুনানে তিরমিযীতে রয়েছে যে, ইবনে আব্বাস (রাঃ) উসমান (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেনঃ "আপনি مَثَانِى-এর অন্তর্ভুক্ত সূরায়ে আনফালকে مِئِيْن-এর অন্তর্ভুক্ত সূরায়ে বারাআতের সাথে মিলিয়ে দিয়েছেন এবং এ দু'টির মাঝে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' লিখেননি, আর এটাকে সাতটি দীর্ঘ সূরার মধ্যে রেখেছেন, এর কারণ কি?" উসমান (রাঃ) উত্তরে বলেন, কোন কোন সময় রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর উপর একই সাথে কয়েকটি সূরা অবতীর্ণ হতো। যখন কোন আয়াত

১. ইমাম বুখারী (রঃ) এটাকে বারা ইবনে আযিব (রাঃ) হতে তাখরীজ করেছেন।

অবতীর্ণ হতো তখন তিনি লেখকদের কাউকে ডেকে বলতেনঃ “এই আয়াতটিকে অমুক সূরার মধ্যে রেখে দাও যার মধ্যে এর বর্ণনা রয়েছে।” মদীনায় সর্বপ্রথম সূরায়ে আনফাল অবতীর্ণ হয়েছিল এবং সর্বশেষে অবতীর্ণ হয়েছিল সূরায়ে বারাআত। বর্ণনায় এ দুটো সূরার মধ্যে মিল ছিল। তাই আমি ভয় পেলাম যে, না জানি এটা হয়তো সূরায়ে আনফালেরই অন্তর্ভুক্ত। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ইনতিকাল হয়ে গেল এবং এ সূরাটি সূরায়ে আনফালের অন্তর্ভুক্ত কি-না তা তিনি বলে গেলেন না। এ জন্যেই আমি দু'টি সূরাকে মিলিতভাবে লিখেছি এবং মধ্যখানে “বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম” লিখিনি। আর এটাকে সাতটি দীর্ঘ সূরার মধ্যে রেখেছি। এই সূরার প্রথম অংশ ঐ সময় অবতীর্ণ হয় যখন নবী (সঃ) তাবূকের যুদ্ধ হতে ফিরে আসছিলেন। ওটা হজ্বের মওসুম ছিল। মুশরিকরা নিজেদের অভ্যাস মত হজ্ব করতে এসে উলঙ্গ হয়ে বায়তুল্লাহ শরীফের চারদিকে তাওয়াফ করতো। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাদের সাথে মিলিত হতে অপছন্দ করে আবূ বকর (রাঃ)-কে ঐ বছর হজ্বের ইমাম বানিয়ে মক্কা অভিমুখে রওয়ানা করান, যেন তিনি মুসলিমদেরকে হজ্বের আহকাম শিক্ষা দেন এবং মুশরিকদের মধ্যে ঘোষণা করে দেন যে, তারা যেন আগামী বছর হজ্ব করতে না আসে। আর জনসাধারণের মধ্যে তিনি যেন সূরা বারাআতেরও ঘোষণা শুনিয়ে দেন। তাঁর পিছনে রাসূলুল্লাহ (সঃ) আলী (রাঃ)-কেও পাঠিয়ে দেন যে, তাঁর নিকটতম আত্মীয় হিসেবে তিনিও যেন তাঁর পয়গাম পৌঁছিয়ে দেন। এর বিস্তারিত বর্ণনা ইনশাআল্লাহ আসছে।

ঘোষণা হচ্ছে– “এটা হচ্ছে সম্পর্ক ছিন্নতা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ)-এর পক্ষ হতে।” কেউ কেউ বলেন যে, এই ঘোষণা ঐ চুক্তি ও অঙ্গীকার সম্পর্কে, যার জন্যে কোন সময় নির্দিষ্ট ছিল না বা যাদের সাথে চার মাসের কম সময়ের জন্যে চুক্তি ছিল। কিন্তু যাদের সাথে চুক্তির মেয়াদ দীর্ঘ ছিল ওটা যথা নিয়মে বাকী থেকে যায়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ فَاَتِمُّوا اِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ اِلٰى مُدَّتِهِمْ অর্থাৎ “তোমরা তাদের অঙ্গীকার বা চুক্তি তাদের মেয়াদ পর্যন্ত পূর্ণ কর।” (৯ঃ৪) হাদীস শরীফেও রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “আমাদের সাথে যাদের সন্ধি বা চুক্তি রয়েছে, আমরা নির্ধারিত সময় পর্যন্ত ঐ চুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবো।” এই ব্যাপারে আরো উক্তি রয়েছে। কিন্তু এই উক্তিটিই সবচেয়ে বেশী উত্তম ও দৃঢ়। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, যাদের সাথে চুক্তি হয়েছিল, আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্যে চার মাসের সীমা নির্ধারণ করে দেন। আর যাদের সাথে চুক্তি ছিল না তাদের জন্যে হারাম মাসগুলো অতিক্রান্ত

হওয়াকে সীমা নির্ধারণ করেন। অর্থাৎ ১০ই যিলহজ্ব হতে মুহররম মাস শেষ হওয়া পর্যন্ত পঞ্চাশ দিন। এই মেয়াদ শেষ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে তাদের সাথে যুদ্ধ করার অনুমতি দেয়া হয় যে পর্যন্ত না তারা ইসলাম গ্রহণ করে। আর যাদের সাথে চুক্তি রয়েছে তারা ১০ই যিলহজ্ব ঘোষণার দিন থেকে নিয়ে ২০শে রবিউল আখির পর্যন্ত প্রস্তুতি গ্রহণ করবে। অতঃপর ইচ্ছা করলে মুকাবিলা করবে। এটা হচ্ছে নবম হিজরীর ঘটনা। রাসূলুল্লাহ (সঃ) আবূ বকর (রাঃ)-কে হজ্বের আমীর নিযুক্ত করে পাঠিয়েছিলেন এবং আলী (রাঃ)-কে কুরআনের এই সূরাটির ত্রিশটি অথবা চল্লিশটি আয়াতসহ পাঠিয়ে দেন যে, তিনি যেন চার মাসের মেয়াদের ঘোষণা করেন। তিনি তাদের তাঁবুতে, ঘরে এবং মনজিলে গিয়ে গিয়ে এ আয়াতগুলো তাদেরকে শুনিয়ে দেন। সাথে সাথে তাদেরকে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর এ নির্দেশও শুনিয়ে দেন যে, এ বছরের পর কোন মুশরিক যেন হজ্ব করতে না আসে এবং কোন উলঙ্গ ব্যক্তি যেন বায়তুল্লাহ তাওয়াফ না করে। খুযাআ' গোত্র, মুদলিজ কবিলা এবং অন্যান্য সকল গোত্রের জন্যেও এই ঘোষণাই বলবৎ ছিল। তাবূক থেকে প্রত্যাবর্তন করে রাসূলুল্লাহ (সঃ) হজ্ব করার ইচ্ছা করেছিলেন। কিন্তু সেখানে মুশরিকদের আগমন ও উলঙ্গ হয়ে তাওয়াফকরণ তাঁর নিকট অপছন্দনীয় ছিল। এই জন্যে তিনি হজ্ব করলেন না এবং ঐ বছর আবূ বকর (রাঃ) ও আলী (রাঃ)-কে প্রেরণ করেন। তাঁরা যিল মাজাযের বাজারসমূহে প্রত্যেক অলিতে-গলিতে, প্রত্যেক তাঁবুতে এবং মাঠে ময়দানে ঘোষণা করে দেন যে, চার মাস পর্যন্ত মুশরিকদেরকে অবকাশ দেয়া হলো, এর পরেই মুসলিমদের তরবারী তাদের উপর আঘাত হানবে। ঐ চার মাস হচ্ছে যিলহজ্ব মাসের বিশ দিন, মুহররম, সফর ও রবিউল আওয়াল এই তিন মাস পুরো এবং রবিউল আখির মাসের ১০ দিন। যুহরী (রঃ) বলেন যে, শাওয়াল থেকে মুহররম মাস পর্যন্ত অবকাশ ছিল। কিন্তু এই উক্তিটি গারীব বা দুর্বল এবং এটা মনেও ধরে না যে, হুকুম পৌঁছার পূর্বেই মেয়াদের গণনা কিভাবে হতে পারে?

٣- وَ اَذَانٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖۤ اِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْاَكْبَرِ اَنَّ اللّٰهَ بَرِیْٓءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۙ۬

৩। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে হজ্বে আকবারের দিন জনগণের সামনে ঘোষণা করা হচ্ছে যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল উভয়ই এই মুশরিকদের (নিরাপত্তা প্রদান করা) হতে

وَ رَسُوْلُهٗ ؕ فَاِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوْۤا اَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللّٰهِ ؕ وَ بَشِّرِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ۙ

নিঃসম্পর্ক হচ্ছেন; তবে যদি তোমরা তাওবা করে নাও তাহলে তা তোমাদের জন্যে উত্তম, আর যদি তোমরা বিমুখ হও তবে জেনে রেখো যে, তোমরা আল্লাহকে অক্ষম করতে পারবে না, আর (হে মুহাম্মাদ!) এই কাফিরদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সু-সংবাদ দিয়ে দাও।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ)-এর পক্ষ থেকে ঘোষণা দেয়া হয়েছে এবং এটা হয়েছে আবার বড় হজ্বের দিনে অর্থাৎ কুরবানীর ঈদের দিনে, যা হজ্বের সমস্ত দিন অপেক্ষা বড় ও উত্তম। ঐ ঘোষণা এই যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ) মুশরিকদের থেকে দায়িত্বমুক্ত, অসন্তুষ্ট ও পৃথক। তবে হে মুশরিকদের দল! এখনও যদি তোমরা পথভ্রষ্টতা, শির্ক এবং দুষ্কার্য পরিত্যাগ কর তবে তা তোমাদের পক্ষে উত্তম হবে। আর যদি পরিত্যাগ না কর এবং পথভ্রষ্টতার উপরই প্রতিষ্ঠিত থাকো তবে তোমরা আল্লাহর আয়ত্তের বাইরে এখনও নও এবং ভবিষ্যতেও থাকবে না। আর তোমরা আল্লাহকে অক্ষম করতে পারবে না। তিনি তোমাদের উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান। তিনি কাফিরদেরকে দুনিয়াতেও শাস্তি প্রদান করবেন এবং পরকালেও আযাবে নিপতিত করবেন।

আবূ হুরাইরা (রাঃ) বলেনঃ "কুরবানীর দিন (১০ই যিলহজ্ব) আবূ বকর (রাঃ) আমাকে লোকদের মধ্যে ঐ কথা প্রচার করতে পাঠালেন যার জন্যে তিনি প্রেরিত হয়েছিলেন। আমি ঘোষণা করে দিলাম– এই বছরের পর কোন মুশরিক যেন হজ্ব করতে না আসে এবং কেউ যেন উলঙ্গ হয়ে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ না করে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সঃ) আলী (রাঃ)-কে পাঠান যে, তিনি যেন জনগণের মধ্যে সূরায়ে তাওবাহ প্রচার করে দেন। সুতরাং তিনি মিনায় আমাদের সাথে ঈদের দিন ঐ আহকামই প্রচার করেন। হজ্বে আকবার হচ্ছে বকরা ঈদের দিন। কেননা, জনগণ এটাকে হজ্বে আসগার বলে থাকতো। আবূ বকর (রাঃ)-এর এই ঘোষণার পর হাজ্জাতুল বিদা বা বিদায় হজ্বে একজনও মুশরিক হজ্ব করতে আসেনি।"[১]

১. এ হাদীসটিকে ইমাম বুখারী (রঃ) কিতাবুল জিহাদের মধ্যে তাখরীজ করেছেন।

হুনাইনের যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ (সঃ) জিরানা থেকে উমরার ইহরাম বেঁধেছিলেন। অতঃপর ঐ বছর তিনি আবূ বকর (রাঃ)-কে হজ্বের আমীর নিযুক্ত করে প্রেরণ করেন। আবূ বকর (রাঃ) আবূ হুরাইরা (রাঃ)-কে ঘোষণা দেয়ার জন্যে পাঠান। তারপর রাসূলুল্লাহ (সঃ) আলী (রাঃ)-কে সূরায়ে বারাআতের প্রচারের জন্যে পাঠিয়ে দেন। আলী (রাঃ)-এর আগমনের পরেও হজ্বের আমীর আবূ বকর (রাঃ)-ই থাকেন। কিন্তু এই বর্ণনায় গুরবাত বা দুর্বলতা রয়েছে। কেননা, জিরানা থেকে উমরার ইহরাম বাঁধার বছরে হজ্বের আমীর ছিলেন ই'তা ইবনে উসাইদ (রাঃ)। আবূ বকর (রাঃ) তো নবম হিজরীতে হজ্বের আমীর ছিলেন। মুসনাদের রিওয়ায়াতে রয়েছে যে, আবূ হুরাইরা (রাঃ) বলেন, ঐ বছর আলী (রাঃ)-এর সাথে আমি ছিলাম। আমরা সশব্দে ঘোষণা করতে থাকিঃ "জান্নাতে শুধুমাত্র মুমিনরাই যাবে। আগামী বছর থেকে কোন ব্যক্তি উলঙ্গ হয়ে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করতে পারবে না। যাদের সাথে আমাদের চুক্তি ও সন্ধি রয়েছে তাদের মেয়াদ হচ্ছে আজ থেকে নিয়ে চার মাস পর্যন্ত। এই মেয়াদ অতিক্রান্ত হওয়ার পর আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ) মুশরিকদের থেকে দায়িত্বমুক্ত ও সম্পর্কহীন হয়ে যাবেন। এই বছরের পর থেকে কোন কাফিরের বায়তুল্লাহর হজ্ব করার অনুমতি নেই।" এই ঘোষণা দিতে দিতে আমার কণ্ঠস্বর বসে যায়। আলী (রাঃ)-এর গলা বসে যাওয়ার পর আমি ঘোষণা দিতে শুরু করেছিলাম। আর একটি বর্ণনায় আছে যে, যাদের সাথে চুক্তি রয়েছে তাদের মেয়াদ ওটাই। ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বলেনঃ "আমার তো ভয় হচ্ছে যে, না জানি এ বাক্যটি কোন বর্ণনাকারীর সন্দেহের কারণে হয় তো এসেছে। কেননা, মেয়াদের ব্যাপারে এর বিপরীত বহু রিওয়ায়াত রয়েছে।

মুসনাদে আহমাদে রয়েছে যে, সূরায়ে বারাআতের ঘোষণার জন্যে রাসূলুল্লাহ (সঃ) আবূ বকর (রাঃ)-কে প্রেরণ করেন। যখন তিনি যুলহুলাইফা নামক স্থানে পৌঁছেন তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "এটা প্রচার তো আমি নিজেই করবো অথবা আমার আহলে বায়তের কেউ করবে।" অতঃপর তিনি আলী (রাঃ)-কে প্রেরণ করেন।[১]

আলী (রাঃ) বলেন, সূরায়ে বারাআতের দশটি আয়াত যখন অবতীর্ণ হয় তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) আবূ বকর (রাঃ)-কে ডেকে বলেনঃ "তুমি এগুলো নিয়ে গিয়ে মক্কাবাসীকে শুনিয়ে দাও।" তারপর আমাকে ডেকে তিনি বলেনঃ "তুমি

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী (রঃ) এটাকে হাসান গারীব বলেছেন।

যাও এবং আবূ বকর (রাঃ)-এর সাথে মিলিত হও। যেখানে তাকে পাবে সেখানে তার নিকট থেকে কিতাব গ্রহণ করতঃ মক্কা চলে যাবে এবং লোকদেরকে তা পড়ে শুনাবে।" আমি রওয়ানা হলাম এবং 'জুহ্ফা' নামক স্থানে আবূ বকর (রাঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ লাভ করলাম। তাঁর নিকট থেকে আমি কিতাব নিয়ে নিলাম আর তিনি ফিরে গেলেন এবং রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেনঃ "আমার ব্যাপারে কোন আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে কি?" তিনি উত্তরে বললেনঃ না, জিবরাঈল (আঃ) আমার কাছে এসে বলেছেন- "এ পয়গাম হয় আপনি নিজেই প্রচার করুন, না হয় আপনার আহলে বায়তের কোন লোককে তা প্রচার করতে বলুন।" এই সনদে দুর্বলতা রয়েছে। আর এর দ্বারা এটাও উদ্দেশ্য নয় যে, আবূ বকর (রাঃ) তখনই ফিরে এসেছিলেন। বরং তাঁর নেতৃত্বেই ঐ হজ্ব পালিত হয়। হজ্ব পর্ব সমাপ্ত করে তিনি ফিরে আসেন। যেমন অন্যান্য রিওয়ায়াতে পরিষ্কারভাবে এটা বর্ণিত আছে। এক হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) যখন আলী (রাঃ)-কে এটা প্রচারের দায়িত্ব অর্পণ করেন তখন তিনি ওযর পেশ করে বলেনঃ "আমি বয়সের দিক থেকে এবং ভাষণ দেয়ার দিক দিয়ে নিজের মধ্যে ঘাটতি অনুভব করছি।" তাঁর এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "কিন্তু প্রয়োজন এটাই যে, হয় আমি নিজেই এটা প্রচার করবো, না হয় তুমি করবে।" তখন আলী (রাঃ) বলেনঃ "তা হলে ঠিক আছে, আমিই যাচ্ছি।" রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে বললেনঃ "যাও, আল্লাহ তোমার ভাষা ঠিক রাখুন এবং অন্তরে হিদায়াত দান করুন!" তারপর তিনি স্বীয় হস্ত মুবারক তাঁর মুখের উপর রাখলেন। জনগণ আলী (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেনঃ "রাসূলুল্লাহ (সঃ) আপনাকে আবূ বকর (রাঃ)-এর কি কথা প্রচারের উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছিলেন?" তিনি তখন উপরের চারটি বিষয়ের কথা বললেন। মুসনাদে আহমাদ ও অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে কয়েকটি পন্থায় এটা এসেছে। তাতে রয়েছে- "যাদের সাথে চুক্তি রয়েছে, তাদের চুক্তি মেয়াদ পর্যন্তই বলবৎ থাকবে।" অন্য হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জনগণ বলেছিলেনঃ "আপনি এই হজ্বে আবূ বকর (রাঃ)-কে আমীর করে পাঠিয়েছেন, তাঁকেই এই প্রচারের দায়িত্ব দিলেও তো চলতো!" তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "এটা হয় আমাকেই প্রচার করতে হবে, না হয় আমার আহলে বায়তের কাউকে করতে হবে।" আলী (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর 'আযবা' নাম্নী উষ্ট্রীর উপর সওয়ার হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁকে পথে দেখে আবূ বকর (রাঃ) জিজ্ঞেস করেনঃ "আপনি কি সরদার নিযুক্ত হয়ে এসেছেন, না অধীনস্থ হিসেবে?" আলী (রাঃ) উত্তরে বলেনঃ "না, বরং আমি অধীনস্থ হিসেবেই

এসেছি।” সেখানে পৌঁছে আবূ বকর (রাঃ) হজ্বের ব্যবস্থাপনায় লেগে পড়েন এবং ঈদের দিন (১০ই যিলহজ্ব) আলী (রাঃ) জনগণকে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর এই আহকাম জানিয়ে দেন। অতঃপর তাঁরা উভয়ে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট ফিরে আসেন। মুশরিকদের মধ্যে যাদের সাথে যতদিনের চুক্তি ছিল তা ঠিকই থাকলো। অন্য রিওয়ায়াতে আছে যে, আলী (রাঃ) বলেনঃ “রাসূলুল্লাহ (সঃ) আবূ বকর (রাঃ)-কে হজ্বের আমীর নিযুক্ত করে পাঠান এবং পরে আমাকে সূরায়ে বারাআতের চল্লিশটি আয়াতসহ তাঁর কাছে প্রেরণ করেন। আবূ বকর (রাঃ) আরাফার দিন (৯ই যিলহজ্ব) আরাফার মাঠে জনগণের সামনে ভাষণ দেন। অতঃপর আমাকে বলেন, উঠুন এবং জনগণকে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর পয়গাম শুনিয়ে দিন! আমি তখন দাঁড়িয়ে ঐ চল্লিশটি আয়াত পাঠ করি। তারপর মিনায় গিয়ে জামরার উপর কংকর নিক্ষেপ করি এবং কুরবানী করে মাথা মুণ্ডন করি। তারপর আমি অবগত হই যে, ভাষণের সময় সবাই উপস্থিত ছিলেন না। তাই আমি ডেরায় ডেরায় এবং তাঁবুতে তাঁবুতে গিয়ে ঘোষণা করতে থাকি। আমার ধারণা এই যে, সম্ভবতঃ এ কারণেই সাধারণ মানুষ এটাকে ১০ই যিলহজ্বের ঘটনা মনে করেছে অথচ আসল পয়গাম আরাফার দিন অর্থাৎ ৯ই যিলহজ্ব তারিখেই পৌঁছিয়ে দেয়া হয়েছিল।”

আবূ ইসহাক (রঃ) বলেনঃ “আমি আবূ হুজাইফা (রঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, হজ্বে আকবার কোন দিন? তিনি উত্তরে বলেনঃ ‘আরাফার দিন।’ আমি পুনরায় তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি এটা নিজের পক্ষ থেকে বলেছেন, না সাহাবীদের কাছ থেকে শুনেছেন? তিনি জবাব দিলেনঃ ‘সব কিছু এটাই বটে।’ আতাও (রঃ) এটাই বলেন। উমারও (রাঃ) একথাই বলার পর বলেনঃ “সুতরাং এই দিনে কেউ যেন রোযা না রাখে।” বর্ণনাকারী বলেন, আমি আমার পিতার পরে হজ্ব করেছি। মদীনায় পৌঁছে আমি জনগণকে জিজ্ঞেস করলাম, এখানে আজকাল সর্বাপেক্ষা উত্তম কে? তাঁরা উত্তরে সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব (রাঃ)-এর নাম বললেন। আমি তখন তাঁর খিদমতে হাযির হয়ে তাঁকে বললাম, আমি মদীনাবাসীকে এখানকার সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তাঁরা আপনারই নাম বললেন। তাই আমি আপনার নিকট এসেছি। আচ্ছা বলুন তো, আরাফার দিনে রোযা রাখা সম্পর্কে আপনার মতামত কি? তিনি উত্তরে বললেনঃ “আপনাকে আমি আমার চেয়ে একশগুণ বেশী উত্তম ব্যক্তির নাম বলছি এবং তিনি হচ্ছেন উমার (রাঃ)। তিনি এই দিনে রোযা রাখতে নিষেধ করতেন এবং

এই দিনকেই তিনি 'হজ্বে আকবার' বলতেন।"[১] একটি মুরসাল হাদীসেও রয়েছে যে, আরাফার দিন রাসূলুল্লাহ (সঃ) ভাষণ দেন এবং বলেনঃ "এটা হজ্বে আকবারের দিন।"

দ্বিতীয় উক্তি এই যে, এর দ্বারা বকরা ঈদের দিনকে বুঝানো হয়েছে। আলী (রাঃ) এ কথাই বলেছেন। একবার ঈদুল আযহার দিন তিনি তাঁর সাদা খচ্চরের উপর সওয়ার হয়ে যাচ্ছিলেন, এমন সময় একটি লোক এসে তাঁর খচ্চরের লাগাম ধরে নেন এবং হজ্বে আকবার কোন দিন তা জিজ্ঞেস করেন। তিনি উত্তরে বলেনঃ "আজকের দিনটিই হচ্ছে হজ্বে আকবারের দিন। সুতরাং লাগাম ছেড়ে দাও।" আবদুল্লাহ ইবনে আওফার (রাঃ) এটাই উক্তি। মুগীরা ইবনে শু'বা (রাঃ) তাঁর ঈদের ভাষণে বলেনঃ "আজকের দিনটি হচ্ছে আযহার দিন, আজই হচ্ছে কুরবানীর এবং আজকের দিনটিই হচ্ছে হজ্বে আকবারের দিন।" ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতেও এটাই বর্ণিত আছে। আরো বহু গুরুজন এটাই সাব্যস্ত করেছেন যে, হজ্বে আকবার হচ্ছে ঈদুল আযহার দিন। ইমাম ইবনে জারীরেরও (রঃ) পছন্দনীয় উক্তি এটাই। সহীহ বুখারীর উদ্ধৃতি দিয়ে পূর্বেই হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, আবূ বকর (রাঃ) ঈদের দিন মিনায় ঘোষণাকারীকে ঘোষণার জন্যে পাঠিয়েছিলেন। ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বিদায় হজ্বে ১০ই যিলহজ্ব তারিখে জামরাতের নিকটে দাঁড়িয়ে বলেনঃ 'আজকের দিনই হচ্ছে হজ্বে আকবারের দিন।' অন্য বর্ণনায় রয়েছে যে, তাঁর উষ্ট্রীটি ছিল লাল রং এর। তিনি জনগণকে জিজ্ঞেস করেনঃ "আজকে কোন্ দিন তা জান কি?" জনগণ উত্তরে বলেনঃ "আজকে কুরবানীর দিন।" রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন বলেনঃ "তোমরা সত্য কথাই বলেছো। আজকের দিনটিই হচ্ছে হজ্বে আকবারের দিন।" অন্য একটি রিওয়ায়াতে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) উষ্ট্রীর উপর সওয়ার ছিলেন। জনগণ ওর লাগাম ধরেছিল। তিনি সাহাবীদেরকে জিজ্ঞেস করলেনঃ "আজকে কোন্ দিন তা জান কি?" (বর্ণনাকারী বলেনঃ) আমরা এই ধারণায় নীরব থাকলাম যে, সম্ভবতঃ তিনি এই দিনের অন্য কোন নাম বলবেনঃ "এটা হজ্বে আকবারের দিন নয় কি?" অন্য একটি বর্ণনায় আছে যে, জনগণ তাঁর প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেনঃ "এটা হচ্ছে হজ্বে আকবারের দিন।"

১. এটা ইবনে জারীর (রঃ) ও ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। অনুরূপভাবে ইবনে আব্বাস (রাঃ), আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাঃ), মুজাহিদ (রঃ), ইকরামা (রঃ) এবং তাউস (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তাঁরা আরাফার দিনকে হজ্বে আকবারের দিন বলেছেন।

সাঈদ ইবন মুসাইয়াব (রাঃ) বলেন যে, হজ্বে আকবারের দিন হচ্ছে ঈদের দিনের পরের দিন। মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, হজ্বের সমস্ত দিনেরই নাম এটাই। সুফিয়ানও (রঃ) এ কথাই বলেন। যেমন 'ইয়াওমে জামাল' (উষ্ট্রের যুদ্ধের দিন) এবং 'ইয়াওমে সিফ্‌ফীন' (সিফ্‌ফীনের যুদ্ধের দিন) ঐ যুদ্ধগুলোর সমস্ত দিনেরই নাম। অনুরূপভাবে এটাও তাই। হাসান বসরী (রঃ)-কে এই সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি উত্তরে বলেনঃ "তোমাদের এটা জেনে লাভ কি? এটা তো ছিল ঐ বছর যে বছর আবূ বকর (রাঃ) হজ্বে আমীর নিযুক্ত হয়েছিলেন।" ইবনে সীরীন (রঃ) এই প্রশ্নের উত্তরে বলেনঃ "এটা ছিল ঐ দিন যেই দিন রাসূলুল্লাহ (সঃ) ও সাধারণ লোকদের হজ্ব পালিত হয়েছিল।"

৪। কিন্তু হ্যাঁ! ঐ সব মুশরিক হচ্ছে সতন্ত্র যাদের নিকট থেকে তোমরা অঙ্গীকার নিয়েছো, অতঃপর তারা তোমাদের সাথে (অঙ্গীকার পালনে) একটুও ত্রুটি করেনি এবং তারা তোমাদের বিরুদ্ধে কাউকেও সাহায্য করেনি, সুতরাং তাদের সন্ধি-চুক্তিকে তাদের নির্ধারিত সময় পর্যন্ত পূর্ণ কর; নিশ্চয়ই আল্লাহ সংযমশীলদেরকে পছন্দ করেন।

٤- اِلَّا الَّذِيْنَ عٰهَدْتُّمْ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوْكُمْ شَيْـًٔا وَّلَمْ يُظَاهِرُوْا عَلَيْكُمْ اَحَدًا فَاَتِمُّوْٓا اِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ اِلٰى مُدَّتِهِمْ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ○

পূর্বে বর্ণিত হাদীসগুলো এবং এই আয়াতের বিষয়বস্তু একই। এর দ্বারা পরিষ্কার হয়ে গেল যে, যাদের সাথে সাধারণভাবে সন্ধি (চুক্তি) ছিল তাদেরকে তো চার মাসের অবকাশ দেয়া হয়, এর মধ্যে তারা যা ইচ্ছা তাই করুক। আর যাদের সাথে কোন একটা নির্ধারিত সময় পর্যন্ত সন্ধি-চুক্তি হয়েছে ঐসব চুক্তি ঠিক থাকবে, যদি তারা চুক্তির শর্তাবলীর উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। তারা নিজেরাও মুসলিমদেরকে কোন কষ্ট দেয় না এবং মুসলিমদের শত্রুদেরকেও সাহায্য সহযোগিতা করে না। যারা ওয়াদা বা অঙ্গীকার পূর্ণ করে তাদেরকে আল্লাহ ভালবাসেন ও পছন্দ করেন।

৫। অতএব, যখন নিষিদ্ধ মাসগুলো অতীত হয়ে যায় তখন ঐ মুশরিকদেরকে যেখানে পাও বধ কর, তাদেরকে ধরে ফেল, তাদেরকে অবরোধ করে রাখো এবং ঘাঁটিস্থলসমূহে তাদের সন্ধানে অবস্থান কর, অতঃপর যদি তারা তাওবা করে নেয়, সালাত আদায় করে এবং যাকাত দেয়, তবে তাদের পথ ছেড়ে দাও, নিশ্চয়ই আল্লাহ অতিশয় ক্ষমাপরায়ণ, পরম করুণাময়।

٥- فَاِذَا انْسَلَخَ الْاَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ وَخُذُوْهُمْ وَاحْصُرُوْهُمْ وَاقْعُدُوْا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَخَلُّوْا سَبِيْلَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

সম্মানিত মাস দ্বারা এখানে ঐ চার মাসকে বুঝানো হয়েছে যার বর্ণনা– مِنْهَا اَرْبَعَةٌ حُرُمٌ .. (৯ঃ ৩৬) এই আয়াতে রয়েছে। সুতরাং তাদের ব্যাপারে শেষ সম্মানিত মাস হচ্ছে মুহাররামুল হারাম। ইবনে আব্বাস (রাঃ) এবং যহ্হাক (রঃ) হতেও এটাই বর্ণিত আছে। কিন্তু এতে কিছু চিন্তা ভাবনার অবকাশ রয়েছে। বরং এখানে ঐ চার মাস উদ্দেশ্য যে মাসগুলোতে মুশরিকরা মুক্তি লাভ করেছিল এবং তাদেরকে বলা হয়েছিল– এর পরে তোমাদের সাথে যুদ্ধ হবে। এই সূরারই অন্য আয়াতে এর বর্ণনা রয়েছে, যা পরে আসছে। মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেনঃ "যখন নিষিদ্ধ মাসগুলো অতীত হয়ে যাবে তখন ঐ মুশরিকদের যেখানেই পাও সেখানেই হত্যা কর, তাদেরকে পাকড়াও কর, অবরোধ কর এবং ঘাঁটিস্থলসমূহে তাদের সন্ধানে অবস্থান কর।" আল্লাহ পাক বলেনঃ 'যেখানেই পাও', সুতরাং এটা সাধারণ নির্দেশ। অর্থাৎ ভূ-পৃষ্ঠের যেখানেই পাওনা কেন, তাদেরকে বধ কর, পাকড়াও কর ইত্যাদি। কিন্তু প্রসিদ্ধ উক্তি এই যে, এটা সাধারণ নির্দেশ নয়, বরং বিশেষ নির্দেশ। হারাম শরীফে যুদ্ধ চলতে পারে না। কেননা, আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وَلَا تُقٰتِلُوْهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتّٰى يُقٰتِلُوْكُمْ فِيْهِ فَاِنْ قٰتَلُوْكُمْ فَاقْتُلُوْهُمْ ....

অর্থাৎ "তোমরা তাদের সাথে মসজিদুল হারামের পাশে যুদ্ধ করো না যে পর্যন্ত না তারা নিজেদের পক্ষ থেকে যুদ্ধের সূচনা করে। যদি তারা সেখানে তোমাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয় তবে তোমাদেরকেও সেখানে তাদের সাথে যুদ্ধ

করার অনুমতি দেয়া হলো। ইচ্ছা করলে তোমরা তাদেরকে হত্যা করতে পার, বন্দী করতে পার, তাদের দুর্গ অবরোধ করতে পার এবং তাদের প্রত্যেক ঘাঁটিতে ওঁৎ পেতে থেকে সামনে পেলেই মেরে ফেলতে পার। অর্থাৎ তোমাদেরকে শুধু এই অনুমতি দেয়া হচ্ছে না যে, তাদেরকে সামনে পেয়ে গেলে তাদের সাথে যুদ্ধ করবে, বরং তোমাদের জন্যে এ অনুমতিও রয়েছে যে, তোমরা নিজেদের পক্ষ থেকেই তাদের উপর আক্রমণ চালাবে, তাদের পথরোধ করে দাঁড়াবে এবং তাদেরকে ইসলাম গ্রহণ করতে অথবা যুদ্ধ করতে বাধ্য করবে। এ জন্যেই আল্লাহ পাক বলেনঃ "যদি তারা তাওবা করতঃ নামায প্রতিষ্ঠিত করে এবং যাকাত প্রদান করে তবে তাদের রাস্তা খুলে দেবে এবং তাদের উপর থেকে সংকীর্ণতা উঠিয়ে নেবে।" এই আয়াতটিকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করেই আবূ বকর (রাঃ) যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। যুদ্ধ করা এই শর্তে হারাম যে, তারা ইসলামের মধ্যে দাখিল হয়ে যাবে এবং ইসলামের অবশ্যকরণীয় কাজগুলো পালন করবে। মহান আল্লাহ এই আয়াতে ইসলামের রুকনগুলো তরতীব বা বিন্যাস সহকারে বর্ণনা করেছেন। বড় থেকে শুরু করে ছোটর দিকে এসেছেন। সুতরাং 'আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই এবং মুহাম্মাদ (সঃ) আল্লাহর রাসূল' এই সাক্ষ্যদানের পর ইসলামের সর্বাপেক্ষা বড় রুকন হচ্ছে সালাত, যা মহামহিমান্বিত আল্লাহর হক। সালাতের পরে হচ্ছে যাকাত, যার উপকার ফকীর, মিসকীন ও অভাবগ্রস্তেরা লাভ করে থাকে। এর মাধ্যমে মাখলূকের বিরাট হক, যা মানুষের দায়িত্বে রয়েছে তা আদায় হয়ে যায়। এ কারণেই অধিকাংশ জায়গাতেই আল্লাহ তা'আলা সালাতের সাথে সাথেই যাকাতের উল্লেখ করেছেন।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "আমি এই মর্মে আদিষ্ট হয়েছি যে, আমি লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকবো যে পর্যন্ত না তারা সাক্ষ্য প্রদান করে যে, আল্লাহ ছাড়া কেউ উপাস্য নেই ও মুহাম্মাদ (সঃ) আল্লাহর রাসূল এবং তারা সালাত প্রতিষ্ঠিত করে ও যাকাত দেয়।" আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেনঃ "তোমাদেরকে সালাত প্রতিষ্ঠিত করার এবং যাকাত প্রদান করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সুতরাং যে ব্যক্তি যাকাত দেবে না তার সালাতও হবে না।" আবদুর রহমান ইবনে যায়েদ ইবনে আসলাম (রঃ) বলেনঃ "আল্লাহ তা'আলা কারো সালাত কখনো কবূল করবেন না যে পর্যন্ত না সে যাকাত প্রদান করে। আল্লাহ তা'আলা আবূ বকর (রাঃ)-এর উপর দয়া করুন! তিনি সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী ছিলেন। (কেননা, তিনি যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন)।"

মুসনাদে আহমাদে আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "লোকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার জন্যে আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে পর্যন্ত না তারা সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই ও মুহাম্মাদ (সঃ) আল্লাহর রাসূল, আর তারা আমাদের কিবলার দিকে মুখ করে, আমাদের যবেহকৃত (প্রাণী) ভক্ষণ করে এবং আমাদের সালাতের ন্যায় সালাত পড়ে। (যখন তারা এরূপ করবে তখন) আমাদের উপর তাদের রক্ত এবং তাদের মাল হারাম হয়ে যাবে, ইসলামের হক ব্যতীত। তারা তখন ঐ সব হকের অধিকারী হয়ে যাবে যেসব হক অন্যান্য মুসলিমদের রয়েছে এবং অন্যান্য মুসলিমদের দায়িত্বে যা কিছু রয়েছে, তাদের দায়িত্বেও সেগুলো এসে যাবে।"[১]

ইমাম আবূ জা'ফর ইবনে জারীর (রঃ) স্বীয় গ্রন্থে রাবী ইবনে আনাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি দুনিয়া হতে এমন অবস্থায় বিদায় গ্রহণ করে যে, সে খাঁটি ভাবে আল্লাহরই ইবাদত করেছে এবং তাঁর সাথে আর কাউকেও অংশীদার করেনি, সে ঐ অবস্থায় গমন করলো যে, আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি সন্তুষ্ট রয়েছেন।" আনাস (রাঃ) বলেন, এটাই হচ্ছে আল্লাহর দ্বীন। সমস্ত নবী এটাই আনয়ন করেছিলেন এবং তাঁদের প্রভুর পক্ষ থেকে নিজ নিজ উম্মতের কাছে কথা এদিক ওদিক ছড়িয়ে যাওয়ার পূর্বে এবং ইচ্ছা ও প্রবৃত্তি বিভিন্ন হওয়ার পূর্বে দাওয়াত পৌঁছিয়ে দিয়েছিলেন। এর সত্যতার সাক্ষ্য আল্লাহ তা'আলার শেষ অহীর মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। আল্লাহ পাক বলেন–

فَإِنْ تَابُوا وَ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَخَلُّوا سَبِيْلَهُمْ

অর্থাৎ "অতঃপর যদি তারা সালাত প্রতিষ্ঠিত করে এবং যাকাত প্রদান করে তবে তাদের পথ ছেড়ে দাও।" অন্য আয়াতে এই তিনটি কাজের পরে রয়েছে– فَاِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ অর্থাৎ "তখন তারা তোমাদের দ্বীনী ভাই।" (৯ঃ ১১) যহ্হাক (রঃ) বলেন যে, এটা হচ্ছে তরবারীর আয়াত যা মুশরিকদের সাথে কৃত সমস্ত সন্ধি-চুক্তিকে কর্তন করে দিয়েছে। ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর উক্তি রয়েছে যে, সূরায়ে বারাআত অবতীর্ণ হওয়ার চার মাস পরে কোন সন্ধি ও চুক্তি অবশিষ্ট থাকেনি। পূর্বশর্তগুলো সমতার ভিত্তিতে ভেঙ্গে দেয়া হয়। এখন বাকী শুধু ইসলাম ও জিহাদ। আলী ইবনে আবূ তালিব (রাঃ) বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নবী (সঃ)-কে চারটি তরবারীসহ পাঠিয়েছেন। প্রথম তরবারী আরবের মুশরিকদের মধ্যে প্রয়োগের জন্যে। আল্লাহ পাক বলেনঃ

১. এ রিওয়ায়াতটি সহীহ বুখারীতে রয়েছে এবং সুনানে ইবনে মাজাহ ছাড়া অন্যান্য সুনানেও রয়েছে।

فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ

অর্থাৎ "তোমরা মুশরিকদেরকে যেখানেই পাও সেখানেই হত্যা কর।" এ রিওয়ায়াতটি এভাবে সংক্ষিপ্ত আকারেই আছে। (আলী রাঃ বলেনঃ) আমার ধারণা এই যে, দ্বিতীয় তরবারী হচ্ছে আহলে কিতাবের সাথে যুদ্ধের জন্যে। মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেনঃ

قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَ لَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَ لَا يُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَ رَسُوْلُهٗ وَ لَا يَدِيْنُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَّدٍ وَّ هُمْ صٰغِرُوْنَ

অর্থাৎ "আহলে কিতাবদের ঐ লোকদের সাথে তোমরা যুদ্ধ করতে থাকো, যারা আল্লাহর উপর ও পরকালের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে না, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ) যা হারাম করেছেন তা হারাম মনে করে না এবং দ্বীন কবূল করে না, যে পর্যন্ত না তারা লাঞ্ছিত অবস্থায় জিযিয়া প্রদানে স্বীকৃত হয়।" (৯ঃ ২৯) তৃতীয় তরবারী হলো মুনাফিকদের সাথে যুদ্ধের ব্যাপারে। প্রবল পরাক্রমশালী আল্লাহ বলেনঃ

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَ الْمُنٰفِقِيْنَ

অর্থাৎ "হে নবী! তুমি কাফির ও মুনাফিকদের সাথে যুদ্ধ কর।" (৯ঃ ৭৩) চতুর্থ তরবারী হচ্ছে বিদ্রোহীদের সাথে যুদ্ধের জন্যে। ইরশাদ হচ্ছে–

وَاِنْ طَآئِفَتٰنِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا فَاِنْۢ بَغَتْ اِحْدٰىهُمَا عَلَى الْاُخْرٰى فَقَاتِلُوا الَّتِيْ تَبْغِيْ حَتّٰى تَفِيْٓءَ اِلٰۤى اَمْرِ اللّٰهِ

অর্থাৎ "যদি মুমিনদের দু'টি দলের মধ্যে যুদ্ধ বেঁধে যায় তবে তোমরা তাদের মধ্যে সন্ধি আনয়ন কর, অতঃপর যদি একটি দল অপর দলটির উপর বিদ্রোহ ঘোষণা করে তবে তোমরা ঐ বিদ্রোহী দলটির সাথে যুদ্ধ কর যে পর্যন্ত না আল্লাহর হুকুমের দিকে ফিরে আসে।" (৪৯ঃ ৯) যহ্হাক (রঃ) ও সুদ্দী (রঃ) বলেন যে, এই তরবারীর আয়াতটি فَاِمَّا مَنًّۢا بَعْدُ وَاِمَّا فِدَآءً (অতঃপর হয় অনুগ্রহ করে ছেড়ে দাও অথবা ফিদইয়া নিয়ে ছেড়ে দাও।) (৪৭ঃ ৪) এই আয়াত দ্বারা মানসূখ বা রহিত হয়ে গেছে। আর কাতাদা (রঃ) এর বিপরীত বলেছেন।

৬। যদি মুশরিকদের মধ্য হতে কেউ তোমার কাছে প্রার্থনা করে, তবে তুমি তাকে আশ্রয় দান কর, যাতে সে আল্লাহর কালাম শুনতে পায়, অতঃপর তাকে তার নিরাপদ স্থানে পৌঁছিয়ে দাও, এ আদেশ এজন্যে যে, এরা এমন লোক, যারা পূর্ণ জ্ঞান রাখে না।

٦- وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتّٰى يَسْمَعَ كَلٰمَ اللّٰهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُوْنَ ○

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নবী (সঃ)-কে বলছেন, আমি তোমাকে যে কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করার নির্দেশ দিয়েছি তাদের মধ্য হতে কেউ যদি তোমার কাছে নিরাপত্তা প্রার্থনা করে তবে তুমি তাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবে ও নিরাপত্তা দেবে, যেন তারা কুরআন কারীম শুনতে পায় ও তোমার কথা শুনবার সুযোগ লাভ করে। আর তারা দ্বীনের তালীম অবগত হয় এবং আল্লাহর হুজ্জত পরিপূর্ণতা লাভ করে। অতঃপর নিরাপত্তার মাধ্যমেই তাকে তার স্বদেশে নির্ভয়ে পাঠিয়ে দেবে, যেন সে তার নিরাপদ স্থানে পৌঁছে যেতে পারে। এর ফলে হয়তো বুঝে সুঝে ও চিন্তা ভাবনা করে সে সত্য দ্বীন কবূল করে নেবে। এটা এই কারণে যে, তারা অজ্ঞ ও মূর্খ লোক। সুতরাং তাদের কাছে দ্বীনী শিক্ষা পৌঁছিয়ে দাও। আল্লাহর দাওয়াত তাঁর বান্দাদের কানে পৌঁছিয়ে দিতে কোন ক্রটি করো না।

এ আয়াতের তাফসীরে মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে– যে কেউই তোমার কাছে ধর্মীয় কথা শুনবার জন্যে আসে সে নিরাপত্তা লাভ করবে যে পর্যন্ত না সে আল্লাহর কালাম না শুনে, অতঃপর যেখান থেকে এসেছিল সেখানে নিরাপদে ফিরে যায়। এজন্যেই, যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে দ্বীন বুঝবার জন্যে বা কোন পয়গাম নিয়ে আসতো তাকে তিনি নিরাপত্তা দান করতেন। হুদায়বিয়ার সন্ধির বছর এটাই হয়েছিল। কুরায়েশের যতগুলো দূত এসেছিল তাদের কোন ভয় বা বিপদ ছিল না। উরওয়া ইবনে মাসউদ, মাকরাম ইবনে হাফস, সাহল ইবনে আমর প্রমুখ একের পর এক আসতে থাকে। এখানে এসে তাদের ঐ শান শওকত দৃষ্টিগোচর হয় যা রোম সম্রাট কায়সার এবং পারস্য সম্রাট কিসরার দরবারেও তারা দেখতে পায়নি। একথা তারা তাদের কওমের কাছে গিয়ে বর্ণনা করে। সুতরাং এ বিষয়টিও বহু লোকের হিদায়াতের মাধ্যম হয়েছিল। ভণ্ড নবী মুসায়লামা কায্যাবের দূত যখন রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর দরবারে

আগমন করে তখন তিনি তাকে জিজ্ঞেস করেনঃ "তুমি মুসায়লামার রিসালাতকে স্বীকার করেছো?" সে উত্তরে বললোঃ "হ্যাঁ।" তখন নবী (সঃ) বললেনঃ "আমার নিকট দূতকে হত্যা করা যদি নাজায়েয না হতো তবে আমি তোমার গর্দান উড়িয়ে দিতাম।" অবশেষে এ লোকটি ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর হাতে কুফার শাসন ক্ষমতায় থাকার সময় নিহত হয়। লোকটিকে ইবনে নাওয়াহা বলা হতো। ইবনে মাসউদ (রাঃ) যখন অবহিত হন যে, সে মুসায়লামাকে নবী বলে স্বীকারকারী তখন তাকে ডেকে পাঠান এবং বলেনঃ "এখন তুমি দূত নও। সুতরাং এখন তোমাকে হত্যা করার ব্যাপারে কোন প্রতিবন্ধকতা নেই।" অতঃপর তাকে হত্যা করা হয়। তার উপর আল্লাহর অভিসম্পাত বর্ষিত হোক!

মোটকথা, যদি কোন অমুসলিম দেশ থেকে কোন দূত বা ব্যবসায়ী অথবা সন্ধি করতে ইচ্ছুক ব্যক্তি কিংবা জিযিয়া আনয়নকারী ব্যক্তি কোন মুসলিম রাষ্ট্রে আগমন করে এবং ইমাম বা নায়েবে ইমাম তাকে নিরাপত্তা প্রদান করেন তবে যে পর্যন্ত সে ইসলামী রাষ্ট্রে অবস্থান করবে এবং স্বদেশে না পৌঁছবে সেই পর্যন্ত তাকে হত্যা করা হারাম। কিন্তু আলেমগণ বলেন যে, এরূপ ব্যক্তিকে বছর ধরে বাস করতে দেয়া চলবে না। বড়জোর তাকে চার মাস পর্যন্ত এখানে বাস করার অধিকার দেয়া যেতে পারে। আর চার মাসের অধিক ও এক বছরের কম সময় পর্যন্ত তাকে দারুল ইসলামে বাস করতে দেয়ার ব্যাপারে ইমাম শাফিঈ (রঃ) ও অন্যান্য ইমামদের (রঃ) দু'টি উক্তি রয়েছে।

৭। এই (কুরায়েশ), মুশরিকদের অঙ্গীকার আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নিকট কিরূপে (বলবৎ) থাকবে? কিন্তু যাদের থেকে তোমরা মসজিদুল হারামের সন্নিকটে অঙ্গীকার নিয়েছো, অতএব যে পর্যন্ত তারা তোমাদের সাথে সরলভাবে থাকে, তোমরাও তাদের সাথে সরলভাবে থাকবে, নিঃসন্দেহে আল্লাহ সংযমশীলদেরকে পছন্দ করেন।

٧- كَيْفَ يَكُوْنُ لِلْمُشْرِكِيْنَ عَهْدٌ عِنْدَ اللّٰهِ وَعِنْدَ رَسُوْلِهٖٓ اِلَّا الَّذِيْنَ عٰهَدْتُّمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوْا لَكُمْ فَاسْتَقِيْمُوْا لَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ۝

এখানে আল্লাহ তা'আলা উপরোক্ত হুকুমের হিকমত বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, মুশরিকদেরকে চার মাস অবকাশ দেয়ার পর তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অনুমতি দানের কারণ এই যে, তারা শির্‌ক ও কুফরী পরিত্যাগ করবে না এবং সন্ধি ও চুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিতও থাকবে না। হ্যাঁ, তবে হুদায়বিয়ার সন্ধি তাদের পক্ষ থেকে যে পর্যন্ত ভেঙ্গে না দেয়া হয় সেই পর্যন্ত তোমরাও তা ভেঙ্গে দেবে না। হুদায়বিয়ায় দশ বছরের জন্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। ষষ্ঠ হিজরীর যুলকাদা মাস হতে রাসূলুল্লাহ (সঃ) চুক্তির মেয়াদ অতিক্রম করে চলছিলেন। শেষ পর্যন্ত কুরায়েশদের পক্ষ থেকে এ চুক্তি ভেঙ্গে দেয়া হয়। তাদের মিত্র বানু বকর রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর মিত্র খুযাআ'র উপর আক্রমণ চালিয়ে দেয়। এমন কি হারাম শরীফের মধ্যেও তাদেরকে হত্যা করে। এটার উপর ভিত্তি করেই রাসূলুল্লাহ (সঃ) অষ্টম হিজরীর রমযান মাসে কুরায়েশদের উপর আক্রমণ চালান। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁকে মক্কা মুকাররমার উপর বিজয় দান করেন এবং তাদের উপর তাঁকে ক্ষমতার অধিকারী করেন। কিন্তু তিনি বিজয় ও ক্ষমতা লাভ করা সত্ত্বেও তাদের মধ্যে যারা ইসলাম কবূল করে তাদেরকে আযাদ করে দেন। তাদেরকেই طُلَقَاءُ বা মুক্ত বলা হয়। তারা সংখ্যায় প্রায় দু' হাজার ছিল। আর যারা কুফরীর উপরই ছিল এবং এদিক ওদিক পালিয়ে গিয়েছিল, বিশ্ব শান্তির দূত মুহাম্মাদ (সঃ) তাদেরকে সাধারণভাবে আশ্রয় প্রদান করেছিলেন এবং মক্কায় আগমনের ও সেখানে নিজ নিজ বাড়ীতে অবস্থানের অনুমতি দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে, চার মাস পর্যন্ত তারা যেখানে ইচ্ছা সেখানেই আসা-যাওয়া করতে পারে। তাদের মধ্যেই ছিলেন সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া (রাঃ) ও ইকরামা ইবনে আবি জেহেল (রাঃ) প্রমুখ। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে ইসলাম গ্রহণের তাওফীক দান করেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রতিটি কাজে ও পরিমাপ করণে প্রশংসিত।

৮। কি করে (কুরায়েশ মুশরিকরা চুক্তি রক্ষা করবে)? অথচ অবস্থা এই যে, যদি তারা তোমাদের উপর প্রাধান্য লাভ করে, তবে তোমাদের আত্মীয়তার মর্যাদাও রক্ষা করবে না এবং অঙ্গীকারেরও

٨- كَيْفَ وَإِنْ يَّظْهَرُوْا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوْا فِيْكُمْ إِلًّا وَّلَا ذِمَّةً يُرْضُوْنَكُمْ بِاَفْوَاهِهِمْ

وَتَأْبٰى قُلُوْبُهُمْ وَاَكْثَرُهُمْ فٰسِقُوْنَ

না, তারা তোমাদেরকে নিজেদের মুখের কথায় সন্তুষ্ট করছে এবং তাদের অন্তরসমূহ অস্বীকার করে, আর তাদের অধিকাংশ লোকই দুষ্ট।

আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের প্রতারণা এবং তাদের অন্তরের শত্রুতা থেকে মুসলিমদেরকে সতর্ক করেছেন, যেন তারা তাদের সাথে আন্তরিক বন্ধুত্ব না রাখে। তারা যেন তাদের কথা ও অঙ্গীকারের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত না থাকে। তাদের কুফরী ও শির্ক তাদেরকে তাদের ওয়াদার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে দেবে না। তারা তো সময়ের অপেক্ষায় রয়েছে। ক্ষমতা পেলে তারা তোমাদেরকে জ্যান্তই চিবিয়ে খেয়ে নেবে। তারা আত্মীয়তার মর্যাদাও রক্ষা করবে না এবং ওয়াদা অঙ্গীকারেরও কোন পরওয়া করবে না। তারা তাদের সাধ্যমত তোমদেরকে কষ্ট দেবে এবং এতে তৃপ্তি লাভ করবে। اِلّ শব্দের অর্থ হচ্ছে আত্মীয়তা। ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতেও এই অর্থ বর্ণিত আছে। কবি তামীর ইবনে মুকবিল ও কবি হাসসান ইবনে সাবিতও (রাঃ) তাঁদের কবিতায় اِلّ শব্দকে এই অর্থে প্রয়োগ করেছেন। আবার এর অর্থ এরূপও করা হয়েছে যে, যখন তারা বিজয় লাভ করবে তখন আল্লাহ তা'আলার প্রতিও লক্ষ্য রাখবে না এবং আর কারো প্রতিও না। এই اِلّ শব্দটিই اِيْل রূপ جِبْرَائِيْل, مِيْكَائِيْل ও اِسْرَافِيْل-এর মধ্যে এসেছে। অর্থাৎ এর অর্থ হচ্ছে "আল্লাহ।" কিন্তু প্রথম উক্তিটিই হচ্ছে বেশী স্পষ্ট ও প্রসিদ্ধ এবং অধিকাংশ মুফাসসিরেরও এটাই উক্তি। মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, এর দ্বারা অঙ্গীকার বুঝানো হয়েছে। আর কাতাদা (রঃ) বলেন যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে কসম বা শপথ।

٩- اِشْتَرَوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا فَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِهٖ اِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

৯। তারা আল্লাহর আহকামের বিনিময়ে অস্থায়ী সম্পদ বরণ করে নিয়েছে, ফলতঃ তারা আল্লাহর পথ থেকে (মুমিনদেরকে) সরিয়ে রেখেছে, নিশ্চয়ই তাদের কাজ অতি মন্দ।

১০। তারা কোন মুমিনের ব্যাপারে আত্মীয়তার মর্যাদাও রক্ষা করে না এবং অঙ্গীকারেরও না; আর তারা (বিশেষতঃ এ ব্যাপারে) খুবই বাড়াবাড়ি করছে।

١٠- لَا يَرْقُبُوْنَ فِيْ مُؤْمِنٍ اِلًّا وَّ لَا ذِمَّةً وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُوْنَ ○

১১। অতএব যদি তারা তাওবা করে নেয় এবং নামায পড়তে থাকে ও যাকাত দিতে থাকে, তবে তারা তোমাদের ধর্ম-ভাই হয়ে যাবে; আর আমি জ্ঞানী লোকদের জন্যে বিধানাবলী বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে থাকি।

١١- فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَاِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ وَنُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ○

আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের নিন্দার সাথে সাথে মুমিনদেরকে জিহাদের প্রতি উৎসাহিত করছেন। তিনি বলছেন যে, ঐ কাফিররা নগণ্য ও নশ্বর দুনিয়াকে মনোরম ও চিরস্থায়ী আখিরাতের বিনিময়ে পছন্দ করে নিয়েছে। তারা নিজেরাও আল্লাহর পথ থেকে সরে রয়েছে এবং মুমিনদেরকেও ঈমান থেকে ফিরিয়ে রেখেছে। তাদের আমল অতি জঘন্য। তারা মুমিনদের শুধু ক্ষতি করতেই চায়। তারা না কোন আত্মীয়তার খেয়াল রাখে, না চুক্তির কোন পরোয়া করে। তারা সীমালংঘন করেছে। হ্যাঁ, তবে হে মুমিনগণ! এখনও যদি তারা তাওবা করে এবং সালাত আদায় করে ও যাকাত দেয় তবে তারা তোমাদেরই লোক হয়ে যেতে পারে। হাফিজ আবূ বকর আল বায্যার (রঃ)-এর হাদীস গ্রন্থে আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি দুনিয়াকে এই অবস্থায় ছেড়েছে যে, সে আন্তরিকতার সাথে আল্লাহর ইবাদত করেছে, তার সাথে কাউকেও শরীক করেনি, সালাত প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং যাকাত দিয়েছে, সে দুনিয়া হতে এমন অবস্থায় বিচ্ছিন্ন হলো যে, আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট রয়েছেন।" এটাই হচ্ছে আল্লাহর ঐ দ্বীন যা নিয়ে নবীগণ (আলাইহিমুসসালাম) এসেছিলেন এবং আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে ওরই তাবলীগ করতে থাকেন। তাঁদের এই প্রচারকার্য ছিল কথা ছড়িয়ে পড়ার এবং ইচ্ছা ও প্রবৃত্তি বেড়ে যাওয়ার পূর্বে। এর সত্যতা আল্লাহর কিতাবের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে।

যদি তারা তাওবা করে অর্থাৎ মূর্তিগুলো ও মূর্তিপূজা পরিত্যাগ করে এবং সালাতী ও যাকাতদাতা হয়ে যায় তবে (হে মুসলিমগণ!) তোমরা তাদের পথ ছেড়ে দাও। তারা তখন তোমাদেরই দ্বীনী ভাই। ইমাম বাযযার (রঃ) বলেনঃ "আমার ধারণায় فَارَقَهَا وَهُوَ عَنْهُ رَاضٍ (অর্থাৎ সে দুনিয়া হতে এমন অবস্থায় বিচ্ছিন্ন হলো যে, আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট) এখান থেকেই মারফূ' হাদীস শেষ এবং বাকী অংশটুকু বর্ণনাকারী রাবী ইবনে আনাস (রঃ)-এর কথা। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

١٢- وَاِنْ نَّكَثُوْۤا اَيْمَانَهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ فَقَاتِلُوْۤا اَئِمَّةَ الْكُفْرِۙ اِنَّهُمْ لَاۤ اَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُوْنَ ○

১২। আর যদি তারা অঙ্গীকার করার পর নিজেদের শপথগুলোকে ভঙ্গ করে ফেলে এবং তোমাদের ধর্মের প্রতি দোষারোপ করে, তবে তোমরা কুফরের অগ্রনায়কদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, (এই অবস্থায়) তাদের শপথ রইলো না, হয়তো তারা বিরত থাকবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, যে মুশরিকদের সাথে নির্দিষ্ট মেয়াদে তোমাদের চুক্তি হয়েছে তারা যদি তাদের কসম ভেঙ্গে দিয়ে ওয়াদা ও চুক্তি ভঙ্গ করে এবং তোমাদের ধর্মের প্রতি দোষারোপ করে তবে তোমরা তাদের মাথা ভেঙ্গে দাও। এ জন্যেই আলেমগণ বলেছেন যে, যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে গালি দেবে বা দ্বীনের উপর দোষারোপ করবে কিংবা ঘৃণার সাথে এর উল্লেখ করবে তাকে হত্যা করে দিতে হবে।

তাদের শপথের কোনই মূল্য নেই। তাদেরকে কুফরী, শির্ক ও বিরুদ্ধাচরণ হতে ফিরিয়ে আনার এটাই পন্থা। কাতাদা (রঃ) প্রমুখ মুরুব্বীগণ বলেন যে, কুফরীর অগ্রনায়ক হচ্ছে আবূ জেহেল, উৎবা, শায়বা, উমাইয়া ইবনে খালফ প্রভৃতি ব্যক্তিবর্গ। একদা সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) খারেজীদের একটি লোকের পার্শ্ব দিয়ে গমন করেন। ঐ খারেজী সা'দ (রাঃ)-এর প্রতি ইঙ্গিত করে বলেঃ "ইনি হচ্ছেন কুফরীর অগ্রনায়ক।" তখন সা'দ (রাঃ) বলেনঃ "তুমি মিথ্যা বলছো। আমি বরং কুফরীর অগ্রনায়কদেরকে হত্যা করেছি।" হুযাইফা (রাঃ) বলেন যে, এর পরে এই আয়াতওয়ালাদেরকে হত্যা করা হয়নি। আলী (রাঃ) হতেও এরূপই বর্ণিত আছে। সঠিক কথা এই যে, শানে নুযূল হিসেবে এই

আয়াত দ্বারা মুশরিক কুরায়েশ উদ্দেশ্য হলেও আয়াতটি 'আম' বা সাধারণ। হুকুমের দিক দিয়ে তারা ও অন্যান্য সবাই এর অন্তর্ভুক্ত। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী। আবূ বকর (রাঃ) সিরিয়া অভিমুকে সেনাবাহিনী প্রেরণ করার সময় তাদেরকে বলেনঃ "তোমরা তথায় এমন কতকগুলো লোককে দেখতে পাবে যাদের মাথা কামানো রয়েছে। তোমরা ঐ শয়তানের দলকে তরবারী দ্বারা হত্যা করে ফেলবে। আল্লাহর কসম! তাদের একজন লোককে হত্যা করা অন্য সত্তরজন লোককে হত্যা করা অপেক্ষা আমার নিকট অধিক পছন্দনীয়। কেননা, আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "তোমরা কুফরের অগ্রনায়কদেরকে হত্যা করে দাও।"[১]

১৩। তোমরা এমন লোকদের বিরুদ্ধে কেন যুদ্ধ করবে না যারা নিজেদের শপথগুলো ভঙ্গ করে ফেলেছে, আর রাসূলকে দেশান্তর করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে এবং তারা তোমাদের বিরুদ্ধে নিজেরাই প্রথমে বিবাদ সৃষ্টি করেছে? তোমরা কি তাদেরকে ভয় করছো? বস্তুতঃ আল্লাহই হচ্ছেন এ বিষয়ে বেশী হকদার যে, তোমরা তাঁকে ভয় কর, যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাক।

١٣- اَلَا تُقَاتِلُوْنَ قَوْمًا نَّكَثُوْا اَيْمَانَهُمْ وَ هَمُّوْا بِاِخْرَاجِ الرَّسُوْلِ وَ هُمْ بَدَءُوْكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ اَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشَوْهُ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝

১৪। তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ কর, আল্লাহ তোমাদের হাতে তাদের শাস্তি প্রদান করবেন এবং তাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন, আর তোমাদেরকে তাদের উপর বিজয়ী করবেন এবং বহু মু'মিনের অন্তরসমূহকে প্রশান্ত ও ঠান্ডা করবেন।

١٤- قَاتِلُوْهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللّٰهُ بِاَيْدِيْكُمْ وَ يُخْزِهِمْ وَ يَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَ يَشْفِ صُدُوْرَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ ۝

১. এটা ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

১৫। আর তাদের অন্তরসমূহের ক্ষোভ (ও ক্রোধ) দূর করে দিবেন এবং (ঐ কাফিরদের মধ্যকার) যার প্রতি ইচ্ছা হয় আল্লাহ করুণা প্রদর্শন করবেন, আল্লাহ মহাজ্ঞানী প্রজ্ঞাময়।

١٥- وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللّٰهُ عَلٰى مَنْ يَّشَاءُ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ○

আল্লাহ তা'আলা এখানে মুসলমানদেরকে পূর্ণমাত্রায় জিহাদের প্রতি উৎসাহিত করে বলছেন, এই চুক্তি ও কসম ভঙ্গকারী কাফির ওরাই যারা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে দেশান্তর করার পূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। তাদের ইচ্ছা ছিল যে, তারা তাঁকে বন্দী করবে বা হত্যা করে ফেলবে অথবা দেশ থেকে বহিষ্কার করবে। তারা চক্রান্ত করলো, কিন্তু আল্লাহ তাদের চক্রান্ত বানচাল করলেন এবং আল্লাহ উত্তম চক্রান্ত (বানচাল) কারী। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "তারা রাসূল (সঃ)-কে ও তোমাদেরকে (মুমিনদেরকে) এ কারণেই বের করেছিল যে, তোমরা তোমাদের প্রভু আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছো।"

বিবাদ সৃষ্টি প্রথমে তারাই করেছে। বলা হয়েছে যে, এর দ্বারা বদরের দিনকে বুঝানো হয়েছে, যেই দিন তারা তাদের বাণিজ্যিক কাফেলাকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে বের হয়েছিল। তাদের যাত্রীদল রক্ষা পেয়ে গেল। কিন্তু তারা দম্ভ ও অহংকারের সাথে আল্লাহর সেনাবাহিনীকে পরাস্ত করার উদ্দেশ্যে মুসলমানদের বিরুদ্ধে বদর প্রান্তরে যুদ্ধ ঘোষণা করলো। এর পূর্ণ ঘটনা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

তারা সন্ধি-চুক্তি ভঙ্গ করতঃ তাদের মিত্রদের সাথে মিলিত হয়ে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর মিত্রদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। খুযাআ'র বিরুদ্ধে বানু বকরকে সাহায্য করে। এই ওয়াদা খেলাফের কারণে রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাদেরকে পদানত করেন। সুতরাং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্যে।

আল্লাহ পাক বলেন, তোমরা এই (অপবিত্র) লোকদেরকে ভয় করছো? তোমরা যদি মুমিন হও তবে আল্লাহ ছাড়া আর কাউকেও ভয় করা তোমাদের উচিত নয়। তিনি এরই হকদার যে, মুমিনরা শুধুমাত্র তাঁকেই ভয় করবে। অন্য জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "তাদেরকে ভয় করো না বরং আমাকেই ভয় কর। আমার প্রতাপ, আমার আধিপত্য, আমার শাস্তি, আমার ক্ষমতা এবং আমার অধিকার অবশ্যই এই যোগ্যতা রাখে যে, সর্বসময়ে প্রতিটি অন্তর আমার ভয়ে কাঁপতে থাকবে। সমুদয় কাজ কারবার আমার হাতে রয়েছে। আমি যা চাই তা করতে পারি এবং করে থাকি। আমার ইচ্ছা ছাড়া কিছুই হতে পারে না।"

মুসলিমদের উপর জিহাদ ফরয হওয়ার রহস্য বর্ণনা করা হচ্ছে যে, আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করলে এই কাফির ও মুশরিকদেরকে যে কোন শাস্তি দিতে পারতেন। কিন্তু হে মুমিনরা! তিনি তোমাদের হাত দ্বারা তাদেরকে শাস্তি দিতে চান। তাদেরকে তোমরা নিজেরাই ধ্বংস করে দাও। যাতে তোমাদের মনের ঝাল ও আক্রোশ মিটে যায় এবং তোমাদের মনে প্রশান্তি নেমে আসে ও প্রফুল্লতা লাভ কর। এটা সমস্ত মুমিনের জন্যে সাধারণ। মুজাহিদ (রঃ), ইকরামা (রঃ) এবং সুদ্দী (রঃ) বলেন যে, وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ দ্বারা খুযাআ গোত্রকে বুঝানো হয়েছে যাদের উপর কুরায়েশরা সন্ধি-চুক্তি ভঙ্গ করে তাদের মিত্রদের সাথে মিলিত হয়ে আক্রমণ চালিয়েছিল। وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ -এর هُمْ সর্বনামটিও তাদেরই দিকে প্রত্যাবর্তিত। ইবনে আসাকির (রঃ) বর্ণনা করেছেন যে, আয়েশা (রাঃ) যখন রাগান্বিত হতেন তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর নাকটি ধরে নিতেন এবং (আদর করে) বলতেন– হে উওয়ায়েশ! এ দু'আটি পাঠ করঃ

اَللّٰهُمَّ رَبَّ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ اِغْفِرْ ذَنْبِيْ وَ اَذْهِبْ غَيْظَ قَلْبِيْ وَ اَجِرْنِيْ مِنْ مُّضِلَّاتِ الْفِتَنِ۔

অর্থাৎ "হে আল্লাহ! নবী মুহাম্মাদ (সঃ)-এর প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা করে দিন। আমার অন্তরের ক্রোধ দূর করুন! আর আমাকে বিভ্রান্তিকর ফিৎনা থেকে রক্ষা করুন।"

ঐ আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদের মধ্যকার যার প্রতি ইচ্ছা হয় তার তাওবা কবূল করে থাকেন। বান্দাদের জন্যে কল্যাণকর কি তা তিনি ভালরূপেই জানেন। তিনি তাঁর সমস্ত কাজ-কর্মে, সমস্ত শরঈ বিধানে ও সমস্ত হুকুমকরণে অতি নিপুণ ও বিজ্ঞানময়। তিনি যা চান তাই করেন এবং যা ইচ্ছা করেন তাই নির্দেশ দেন। তিনি ন্যায় বিচারক ও হাকিম। তিনি অত্যাচার করা থেকে পবিত্র। তিনি অণু পরিমাণও ভাল বা মন্দ নষ্ট করেন না, বরং তার প্রতিদান দুনিয়ায় ও আখিরাতে দিয়ে থাকেন।

١٦- اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تُتْرَكُوْا وَ لَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جٰهَدُوْا مِنْكُمْ وَ لَمْ يَتَّخِذُوْا مِنْ دُوْنِ

১৬। তোমরা কি ধারণা করেছো যে, তোমাদেরকে এভাবেই ছেড়ে দেয়া হবে? অথচ আল্লাহ তো এখনও সেই সব লোককে (প্রকাশ্যভাবে) প্রকাশ

اللّٰهِ وَ لَا رَسُوْلِهٖ وَ لَا الْمُؤْمِنِيْنَ وَلِيْجَةً وَاللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ○ (১৬)

করেননি, যারা তোমাদের মধ্য হতে জিহাদ করেছে এবং আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুমিনগণ ছাড়া অন্য কাউকেও অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করেনি; আর আল্লাহ তোমাদের সমস্ত কর্মের পূর্ণ খবর রাখেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে মুমিনগণ! এটা সম্ভব নয় যে, আমি তোমাদেরকে ছেড়ে দেবো, অথচ তোমাদেরকে পরীক্ষা করবো না ও দেখবো না যে, তোমাদের মধ্যে ঈমানের দাবীতে কে সত্যবাদী ও কে মিথ্যাবাদী। وَلِيْجَةً শব্দের অর্থ হচ্ছে রহস্যবিদ ও দখলদার। সুতরাং ঈমানের দাবীতে সত্যবাদী ঐ ব্যক্তি যে জিহাদে আগে বেড়ে অংশ নেয় এবং প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ)-এর মঙ্গল কামনা করে ও তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতা করে। এক প্রকারের বর্ণনা দ্বিতীয় প্রকারকে প্রকাশ করে দিচ্ছিল, তাই দ্বিতীয় প্রকারের লোকদের বর্ণনা আল্লাহ তা'আলা ছেড়ে দিয়েছেন। এরূপ বর্ণনারীতি কবিদের কবিতাতেও পরিলক্ষিত হয়। অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "লোকেরা কি এটা ধারণা করেছে যে, আমরা ঈমান এনেছি একথা বললেই তারা অব্যাহতি পেয়ে যাবে এবং তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না? আমি ঐ লোকদেরকেও পরীক্ষা করেছিলাম যারা তাদের পূর্বে অতীত হয়ে গিয়েছে, সুতরাং আল্লাহ ঐ লোকদেরকে জেনে নিবেন যারা সত্যবাদী ছিল এবং তিনি মিথ্যাবাদীদেরকেও জেনে নিবেন।" আর এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা এ বিষয়টিকেই -اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ... এই শব্দে বর্ণনা করেছেন। অন্য একটি আয়াতে রয়েছে-

مَا كَانَ اللّٰهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلٰى مَا اَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتّٰى يَمِيْزَ الْخَبِيْثَ مِنَ الطَّيِّبِ

অর্থাৎ "আল্লাহ এরূপ নন যে, তিনি মুমিনদেরকে তোমাদের এ অবস্থাতেই ছেড়ে দিবেন এবং কে কলুষিত ও কে পবিত্র তা পরীক্ষা করে পৃথক করবেন না।" (৩ঃ ১৭৯) সুতরাং শরীয়তে জিহাদের বিধান দেয়ার এটাও একটা হিকমত যে, এর দ্বারা ভাল ও মন্দের মধ্যে পার্থক্য ও তারতম্য হয়ে যায়। যদিও আল্লাহ সবকিছুই অবগত আছেন, যা হবে সেটাও তিনি জানেন, যা হয়নি সেটাও জানেন, আর যখন হবে তখন ওটা কিভাবে হবে সেটাও তিনি অবগত রয়েছেন। কোন কিছু হওয়ার পূর্বেই ওর জ্ঞান তাঁর থাকে এবং প্রত্যেক জিনিসেরই অবস্থা সম্পর্কে

তিনি সম্যক অবগত। তবুও তিনি দুনিয়াতেও ভাল-মন্দ এবং সত্য ও মিথ্যা প্রকাশ করে দিতে চান। তিনি ছাড়া অন্য কোন মা'বূদও নেই এবং তিনি ছাড়া অন্য কোন প্রতিপালকও নেই। তাঁর ফায়সালা ও ইচ্ছাকে কেউই পরিবর্তন করতে পারে না।

১৭- مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِيْنَ اَنْ يَّعْمُرُوْا مَسٰجِدَ اللّٰهِ شٰهِدِيْنَ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ اُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ وَفِى النَّارِ هُمْ خٰلِدُوْنَ ○

১৭। মুশরিকরা যখন নিজেরাই নিজেদের কুফরী স্বীকার করে তখন তারা আল্লাহর মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ করবে এমন হতে পারে না। তারা এমন যাদের সমস্ত কর্ম ব্যর্থ এবং তারা জাহান্নামে স্থায়ীভাবে অবস্থান করবে।

১৮- اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسٰجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ وَلَمْ يَخْشَ اِلَّا اللّٰهَ فَعَسٰٓى اُولٰٓئِكَ اَنْ يَّكُوْنُوْا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ ○

১৮। হ্যাঁ, আল্লাহর মসজিদগুলো আবাদ করা তাদেরই কাজ, যারা আল্লাহর প্রতি ও কিয়ামতের দিবসের প্রতি ঈমান আনয়ন করে এবং সালাত কায়েম রাখে ও যাকাত প্রদান করে, আর আল্লাহ ছাড়া কাউকেও ভয় করে না, বস্তুতঃ এসকল লোক সম্বন্ধে আশা যে, তারা নিজেদের লক্ষ্যস্থলে পৌঁছে যাবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, যারা আল্লাহর সাথে শরীক স্থাপন করে তারা আল্লাহর মসজিদগুলো আবাদ করার যোগ্যই নয়। তারা তো মুশরিক! আল্লাহর ঘরের সাথে তাদের কি সম্পর্ক? مَسَاجِد শব্দটিকে مَسْجِد ও পড়া হয়েছে। এর দ্বারা মসজিদুল হারামকে বুঝানো হয়েছে, যা দুনিয়ার মসজিদসমূহের মধ্যে সবচেয়ে বেশী মর্যাদার অধিকারী। এটা প্রথম দিন থেকে শুধুমাত্র আল্লাহর ইবাদতের জন্যেই নির্মিত হয়েছে। আল্লাহর খলীল ইবরাহীম (আঃ) এ ঘরের

ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। এ লোকগুলো নিজেদের অবস্থার দ্বারা ও কথার দ্বারা নিজেদের কুফরীর স্বীকারোক্তিকারী। যেমন সুদ্দী (রঃ) বলেন, তুমি যদি খ্রীষ্টানকে জিজ্ঞেস কর – "তোমার ধর্ম কি?" সে অবশ্যই উত্তরে বলবেঃ "আমি খ্রীষ্টান ধর্মের লোক।" ইয়াহূদীকে তার ধর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে সে বলবেঃ "আমি ইয়াহূদী ধর্মাবলম্বী।" সাবীকে জিজ্ঞেস করলে সেও বলবেঃ "আমি সাবী।" এই মুশরিকরাও বলবে, "আমরা মুশরিক।" আল্লাহ পাক বলেনঃ তাদের সমস্ত আমল বিফল হয়ে গেল। কারণ তারা আল্লাহর সাথে শরীক স্থাপন করেছে। চিরদিনের জন্যে তারা জাহান্নামী হয়ে গেল। তারা অন্যদেরকে মসজিদুল হারাম থেকে বাধা প্রদান করে থাকে। তারা নিজেদেরকে আল্লাহর বন্ধু বললেও প্রকৃতপক্ষে তারা তা নয়। আল্লাহর বন্ধু তো ওরাই যারা তাঁকে ভয় করে চলে। কিন্তু অধিকাংশ লোকই এটা বুঝে না ও জানে না। হ্যাঁ, আল্লাহর ঘরের আবাদ হবে মুমিনদের দ্বারা। সুতরাং যাদের দ্বারা আল্লাহর ঘর আবাদ হয়, কুরআন কারীম হচ্ছে তাদের ঈমানের সাক্ষী।

আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "যখন তোমরা কোন লোককে দেখতে পাও যে, সে মসজিদে যেতে আসতে অভ্যস্ত হয়েছে তখন তোমরা তার ঈমানের সাক্ষ্য প্রদান কর।" অতঃপর তিনি اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ -এই আয়াতটি পাঠ করেন।[১]

আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "মসজিদসমূহের আবাদকারীরাই হলো আল্লাহওয়ালা।" আনাস (রাঃ) হতে মারফূ'রূপে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "আল্লাহ তা'আলা মসজিদমুখীদের প্রতি দৃষ্টিপাত করে গোটা কওমের উপর থেকেই আযাব সরিয়ে নেন।" আনাস (রাঃ) হতেই মারফূ'রূপে আরো একটি হাদীস বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "আমার সম্মান ও মর্যাদার কসম! আমি পৃথিবীবাসীর উপর শাস্তি প্রেরণের ইচ্ছা করি, কিন্তু যখন আমার ঘরসমূহের আবাদকারীদের প্রতি, আমারই সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে পরস্পর প্রেম বিনিময়কারীদের প্রতি এবং প্রাতঃকালে ক্ষমা প্রার্থনাকারীদের প্রতি দৃষ্টিপাত করি তখন ঐ আযাব তাদের উপর থেকে সরিয়ে থাকি।"[২]

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ), ইমাম তিরমিযী (রঃ), ইবনে মিরদুওয়াই (রঃ) এবং ইমাম হাকিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

২. ইবনে আসাকের (রঃ) বলেন যে, এ হাদীসটি গারীব বা দুর্বল।

মুআ'য ইবনে জাবাল (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ "শয়তান হচ্ছে মানুষের জন্যে নেকড়ে বাঘ স্বরূপ। যেমন বকরীর (শত্রু) নেকড়ে বাঘ দূরে পৃথক ও বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থানকারী বকরীকে ধরে নেয় (তদ্রূপ তোমরা দল ছাড়া হয়ে থাকলে তোমাদেরকেও শয়তান পথভ্রষ্ট করবে)। সুতরাং তোমরা মতভেদ সৃষ্টি করা থেকে বেঁচে থাক এবং নিজেদের জন্যে জামাআত, সর্বসাধারণ ও মসজিদসমূহ আঁকড়ে ধরাকে অপরিহার্য করে নও।"

আমর ইবনে মায়মূন আওদী (রঃ) বলেন, আমি মুহাম্মাদ (সঃ)-এর সাহাবীগণকে বলতে শুনেছি- "ভূ-পৃষ্ঠের মসজিদগুলো আল্লাহর ঘর। যারা এখানে আসবে, আল্লাহর হক হচ্ছে তাদেরকে মর্যাদা দেয়া।" ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি সালাতের আযান শোনার পর মসজিদে এসে জামাআতের সাথে সালাত আদায় করে না, তার সালাত হয় না। সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ)-এর নাফরমানী করলো। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "আল্লাহর মসজিদগুলো আবাদ করা তাদেরই কাজ, যারা আল্লাহর প্রতি ও কিয়ামতের দিনের প্রতি ঈমান আনয়ন করে।"[১] এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, তারা সালাত প্রতিষ্ঠিত করে। শারীরিক ইবাদত সালাতের তারা পাবন্দ হয়ে থাকে এবং আর্থিক ইবাদত যাকাতও তারা আদায় করে। তাদের কল্যাণ তাদের নিজেদের জন্যেও হয় এবং সাধারণ মাখলূকের জন্যেও হয়। তাদের অন্তর আল্লাহ ছাড়া আর কাউকেও ভয় করে না। এরাই হচ্ছে সুপথপ্রাপ্ত লোক এবং এরাই হচ্ছে একত্ববাদী ও ঈমানদার। কুরআন ও হাদীসের আলোকে প্রতীয়মান হয় যে, যারা পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের পাবন্দ, শুধুমাত্র আল্লাহকেই যারা ভয় করে এবং আল্লাহ ছাড়া অন্যের যারা ইবাদত করে না তারাই সুপথগামী এবং সফলকাম। এটা স্মরণ রাখার বিষয় যে, ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর মতে কুরআন কারীমের মধ্যে যেখানেই عَسٰى শব্দ এসেছে সেখানেই তা 'নিশ্চিত' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, 'আশা' অর্থে নয়।

যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ عَسٰۤى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا এখানে অর্থ হবে- "হে নবী (সঃ)! এটা নিশ্চিত কথা যে, আল্লাহ তোমাকে মাকামে মাহমূদে পৌঁছিয়ে দিবেন।" (১৭ঃ ৭৯) এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক (রঃ) বলেন যে, আল্লাহর কালামে عَسٰى শব্দটি সত্য ও নিশ্চয়তার জন্যে এসে থাকে।

১. এটা ইবনে মিরদুওয়াই তাখরীজ করেছেন।

١٩ - اَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَ عِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَ جٰهَدَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ لَا يَسْتَوٗنَ عِنْدَ اللّٰهِ ؕ وَ اللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۘ

১৯। তোমরা কি হাজীদের পানি পান করানোকে এবং মসজিদুল হারামের আবাদ রাখাকে সেই ব্যক্তির (কাজের) সমান সাব্যস্ত করে রেখেছো, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও কিয়ামতের দিবসের প্রতি ঈমান এনেছে ও আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে? তারা আল্লাহর সমীপে সমান নয়; যারা অবিচারক, আল্লাহ তাদেরকে সুবুদ্ধি দান করেন না।

٢٠ - اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ هَاجَرُوْا وَ جٰهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَ اَنْفُسِهِمْ ۙ اَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللّٰهِ ؕ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ ۘ

২০। যারা ঈমান এনেছে ও হিজরত করেছে, আর নিজেদের ধন ও প্রাণ দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে, তারা মর্যাদায় আল্লাহর সমীপে অতি বড় আর তারাই হচ্ছে পূর্ণ সফলকাম।

٢١ - يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَ رِضْوَانٍ وَّ جَنّٰتٍ لَّهُمْ فِيْهَا نَعِيْمٌ مُّقِيْمٌ ۙ

২১। তাদের প্রতিপালক তাদেরকে নিজের পক্ষ থেকে সুসংবাদ দিচ্ছেন বড় রহমতের ও অতি সন্তুষ্টির, আর এমন বাগানসমূহের, যার মধ্যে তাদের জন্যে চিরস্থায়ী নিয়ামত থাকবে।

٢٢ - خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ۘ

২২। ওর মধ্যে তারা অনন্তকাল থাকবে, নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট রয়েছে শ্রেষ্ঠ বিনিময়।

এর তাফসীরে ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, কাফিররা বলতোঃ "বায়তুল্লাহর খিদমত করা এবং হাজীদেরকে পানি পান করানো ঈমান ও জিহাদ হতে উত্তম। যেহেতু আমরা এ দুটো খিদমত আঞ্জাম দিচ্ছি সেহেতু আমাদের চেয়ে উত্তম আর কেউই হতে পারে না।" আল্লাহ তা'আলা এখানে তাদের অহংকার ও দম্ভ এবং সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার বর্ণনা দিচ্ছেন। তিনি বলেন, হে কাফিররা! যখন তোমাদের সামনে আমার আয়াতসমূহ পাঠ করা হয় তখন তোমরা বেপরোয়া ভাব দেখিয়ে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও এবং সম্পূর্ণ উদাসীন থাকো। সুতরাং তোমাদের এসব গর্ব ও অহংকার বাজে ও অযৌক্তিক। এমনিতেই তো আল্লাহর প্রতি ঈমান এবং তাঁর পথে জিহাদের গুরুত্ব অপরিসীম, তদুপরি তোমাদের মুকাবিলায় এর গুরুত্ব আরো বেশী। কেননা, তোমাদের যে কোন সৎকর্মকেই তো শির্ক খেয়ে ফেলে। তাই আল্লাহ পাক বলেন, এ দু'টি দল কখনো সমান হতে পারে না। এই মুশরিকরা নিজেদেরকে আল্লাহর ঘরের আবাদকারী বলছে বটে, কিন্তু আল্লাহ তাদের নামকরণ করছেন যালিমরূপে। তাঁর ঘরের যে তারা খিদমত করছে তা সম্পূর্ণ বৃথা বলে তিনি ঘোষণা করলেন।

আব্বাস (রাঃ) বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের হাতে বন্দী থাকার সময় মুসলিমরা তাঁকে শির্কের কারণে নিন্দে করলে তিনি তাঁদেরকে বলেনঃ "তোমরা যদি ইসলাম ও জিহাদে থেকে থাকো তবে আমরাও তো কা'বা ঘরের খিদমত এবং হাজীদেরকে পানি পান করানোর কাজে ছিলাম।" তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং বলা হয় যে, শির্কের অবস্থায় যে পুণ্যের কাজ করা হয় তার সবই বিফলে যায়। বর্ণিত আছে যে, সাহাবীগণ (রাঃ) যখন আব্বাস (রাঃ)-এর সাথে কথা কাটাকাটি শুরু করেন তখন তিনি তাঁদেরকে বলেনঃ "আমরা মসজিদুল হারামের মুতাওয়াল্লী ছিলাম, গোলামদেরকে আমরা আযাদ করতাম, আমরা বায়তুল্লাহর উপর গিলাফ চড়াতাম এবং হাজীদেরকে পানি পান করাতাম।" তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয়।

মুহাম্মাদ ইবনে কারীম (রঃ) বলেন যে, একদা তালহা ইবনে শায়বা (রাঃ), আব্বাস ইবনে আবদিল মুত্তালিব (রাঃ) এবং আলী ইবনে আবি তালিব (রাঃ) বসেছিলেন ও নিজ নিজ মর্যাদার কথা বর্ণনা করে গৌরব প্রকাশ করছিলেন। তালহা (রাঃ) বলেনঃ "আমি বায়তুল্লাহর চাবি রক্ষক। আমি ইচ্ছা করলে সেখানেই রাত্রি যাপন করতে পারি।" আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ "আমি হাজীদেরকে যমযমের পানি পান করিয়ে থাকি এবং আমি যমযম কূপের রক্ষক। আমি ইচ্ছা করলে সারারাত মসজিদেই কাটিয়ে দিতে পারি।" আলী (রাঃ) বলেনঃ "তোমরা

দু'জন যা বলছো তা আমার মোটেই বোধগম্য হচ্ছে না। আমি জনগণের ছয়মাস পূর্ব থেকে কিবলামুখী হয়ে সালাত পড়েছি। আমি একজন মুজাহিদও বটে।" তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। আব্বাস (রাঃ) আশংকা প্রকাশ করেন যে, না জানি তাঁকে হয়তো যমযম কূপের দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেয়া হবে। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে বলেনঃ "না, না, আপনি এ পদেই প্রতিষ্ঠিত থাকুন! আপনার জন্যে এতেই কল্যাণ নিহিত রয়েছে।" এ আয়াতের তাফসীরে একটি মারফূ' হাদীসও এসেছে। যা এখানেও উল্লেখ করা প্রয়োজন। নু'মান ইবনে বাশীর আল আনসারী (রাঃ) বলেনঃ "আমি একদা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর এক দল সাহাবীর সাথে তাঁর মিম্বরের নিকট বসেছিলাম। তাঁদের মধ্যে একজন লোক বলেনঃ "ইসলাম গ্রহণের পর হাজীদেরকে পানি পান করানো ছাড়া আমি আর কোন আমল না করলেও আমার কোন পরওয়া নেই।" অন্য একটি লোক মসজিদে হারামের আবাদ করার কথা বললেন। তৃতীয় এক ব্যক্তি বললেনঃ "তোমরা দু'জন যে আমলের কথা বললে তার চেয়ে জিহাদই উত্তম।" তখন উমার (রাঃ) তাঁদেরকে ধমক দিয়ে বললেনঃ "তোমরা আল্লাহর রাসূল (সঃ)-এর মিম্বরের নিকট উচ্চৈঃস্বরে কথা বলো না।" ওটা ছিল জুমআর দিন। উমার (রাঃ) তাঁদেরকে বলেনঃ "জুমআর সালাত আদায় হলে পর তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করছো তা আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করবো।" তিনি তাই করেন। তখন মহামহিমান্বিত আল্লাহ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ হতে وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ পর্যন্ত আয়াতটি অবতীর্ণ করেন।[১]

২৩। হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদের পিতৃদেরকে ও ভ্রাতাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না যদি তারা ঈমানের মুকাবিলায় কুফ্রকে প্রিয় মনে করে; আর তোমাদের মধ্য হতে যারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব রাখবে, বস্তুতঃ ঐ সব লোকই হচ্ছে বড় অত্যাচারী।

٢٣- يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْٓا اٰبَآءَكُمْ وَاِخْوَانَكُمْ اَوْلِيَآءَ اِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْاِيْمَانِ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ○

১. এ হাদীসটি আবদুর রায্যাক (রঃ) তাখরীজ করেছেন এবং ইমাম মুসলিম (রঃ), ইমাম আবূ দাঊদ (রঃ), ইবনে মিরদুওয়াই (রঃ), ইবনে হিব্বান (রঃ) এবং ইবনে জারীর (রঃ) এটা বর্ণনা করেছেন। আর এটা তাঁরই শব্দ।

٢٤- قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَ
أَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَ
أَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ
اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ
كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا
أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ
وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا
حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ
لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ع

২৪। (হে নবী)! তুমি তাদেরকে বলে দাও–যদি তোমাদের পিতৃবর্গ, তোমাদের পুত্রগণ, তোমাদের ভ্রাতাগণ, তোমাদের স্ত্রীগণ, তোমাদের স্বগোত্র, আর ঐ সব ধন-সম্পদ যা তোমরা অর্জন করছো, আর ঐ ব্যবসায় যাতে তোমরা মন্দা পড়বার আশংকা করছো এবং ঐ গৃহসমূহ যা তোমরা পছন্দ করছো, (যদি এই সব) তোমাদের নিকট অধিক প্রিয় হয় আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের চেয়ে এবং তাঁর পথে জিহাদ করার চেয়ে, তবে তোমরা প্রতীক্ষা করতে থাকো এই পর্যন্ত যে, আল্লাহ নিজের নির্দেশ পাঠিয়ে দেন, আর আল্লাহ আদেশ অমান্যকারীদেরকে তাদের উদ্দিষ্ট স্থল পর্যন্ত পৌঁছান না।

এখানে আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে মুমিনদেরকে নিষেধ করছেন, যদিও তারা তাদের মাতা, পিতা, ভাই, বোন প্রভৃতি হোক না কেন, যদি তারা ইসলামের উপর কুফরীকে পছন্দ করে নেয়। অন্য আয়াতে রয়েছে– لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ...... وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ অর্থাৎ "(হে নবী!) যারা আল্লাহর উপর ও পরকালের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে তাদেরকে তুমি পাবে না যে, তারা বন্ধুত্ব রাখবে এমন লোকদের সাথে যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ)-এর সাথে শত্রুতা রাখে, যদিও তারা তাদের পিতা হয় বা ছেলে হয় অথবা ভাই হয় কিংবা স্বগোত্রীয় হয়। এরা তারাই, যাদের অন্তরে আল্লাহ ঈমান লিপিবদ্ধ করে দিয়েছেন এবং স্বীয় বিশেষ রূহ দ্বারা তাদেরকে সাহায্য করেছেন, তিনি তাদেরকে এমন জান্নাতসমূহে প্রবিষ্ট করবেন যেগুলোর নীচ দিয়ে স্রোতস্বিনী প্রবাহিত হবে।" (৫৮ঃ ২২)

ইমাম বায়হাকী (রঃ) স্বীয় হাদীস গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, বদরের যুদ্ধের দিন আবূ উবাইদাহ্ ইবনে জাররাহ (রাঃ)-এর পিতা তাঁর সামনে এসে মূর্তির প্রশংসা করতে শুরু করে দেয়। তিনি তাকে বারবার বিরত রাখার চেষ্টা করেন। কিন্তু সে বেড়েই চলে। তখন পিতা-পুত্রে যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত আবূ উবাইদাহ (রাঃ) স্বীয় পিতাকে হত্যা করে দেন। তখন আল্লাহ তা'আলা لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ -এ আয়াতটি অবতীর্ণ করেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল (সঃ)-কে আদেশ করছেন যে, যারা তাদের পরিবারবর্গকে, আত্মীয়-স্বজনকে এবং স্বগোত্রীয়দেরকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ)-এর উপর প্রাধান্য দেয় তাদেরকে যেন তিনি ভীতি প্রদর্শন করে বলেনঃ "যদি তোমাদের পিতাগণ, তোমাদের পুত্রগণ, তোমাদের ভ্রাতাগণ, তোমাদের স্ত্রীগণ, তোমাদের স্বগোত্র, আর ঐ সব ধন-সম্পদ যা তোমরা অর্জন করেছো, আর ঐ ব্যবসা যাতে তোমরা মন্দা পড়বার আশংকা করছো, (যদি এই সব) তোমাদের নিকট অধিক প্রিয় হয় আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ)-এর চেয়ে, তবে তোমরা প্রতীক্ষা করতে থাকো এই পর্যন্ত যে, আল্লাহ নিজের নির্দেশ পাঠিয়ে দেন, আর আল্লাহ আদেশ অমান্যকারীদেরকে তাদের উদ্দিষ্ট স্থল পর্যন্ত পৌঁছান না।"

মা'বাদ (রাঃ) তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি (তাঁর দাদা) বলেছেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সঃ) -এর সাথে পথ চলছিলাম। রাসূলুল্লাহ (সঃ) উমার (রাঃ)-এর হাত ধরেছিলেন। উমার (রাঃ) তাঁকে বলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আল্লাহর কসম! আপনি আমার নিকট আমার প্রাণ ছাড়া অন্য সবকিছু থেকে প্রিয়তম।" তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ "তোমাদের কেউই (পূর্ণ) মুমিন হতে পারে না যে পর্যন্ত আমি তার কাছে তার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয় না হই।" উমার (রাঃ) তখন বললেনঃ "আপনি এখন আমার কাছে আমার জীবন থেকেও প্রিয়।" তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে বললেনঃ "হে উমার! তুমি এখন (পূর্ণ মুমিন হলে)।"[১]

সহীহ্ হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! তোমাদের কেউই (পূর্ণ) মুমিন হতে পারে না যে পর্যন্ত আমি তার কাছে তার পিতা, তার সন্তান এবং সমস্ত লোক অপেক্ষা প্রিয়তম না হই।" মুসনাদে আহমাদে ও সুনানে আবি দাউদে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "যখন তোমরা 'আয়ন'-এর ক্রয়-বিক্রয় শুরু করবে, বলদ-গাভীর লেজ ধারণ করবে এবং জিহাদ ছেড়ে দেবে তখন আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে লাঞ্ছনায় পতিত করবেন, আর তা দূর হবে না যে পর্যন্ত না তোমরা নিজেদের দ্বীনের দিকে ফিরে আসবে।"

১. ইমাম বুখারী (রঃ) একাই এ হাদীসটি তাখরীজ করেছেন।

٢٥- لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ فِيْ مَوَاطِنَ كَثِيْرَةٍ وَّ يَوْمَ حُنَيْنٍ اِذْ اَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَّ ضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُّدْبِرِيْنَ ۝

২৫। অবশ্যই আল্লাহ তোমাদেরকে (যুদ্ধে) বহুক্ষেত্রে (কাফিরদের উপর) বিজয়ী করেছেন এবং হুনায়েনের দিনেও, যখন তোমাদেরকে তোমাদের সংখ্যাধিক্য গর্বে উন্মত্ত করেছিল, অতঃপর সেই সংখ্যাধিক্য তোমাদের কোনই কাজে আসেনি, আর ভূ-পৃষ্ঠ (নিজের প্রশস্ততা সত্ত্বেও তো) তোমাদের উপর সংকীর্ণ হতে লাগলো, অতঃপর তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন পূর্বক পলায়ন করলে।

٢٦- ثُمَّ اَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَاَنْزَلَ جُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَ ذٰلِكَ جَزَآءُ الْكٰفِرِيْنَ ۝

২৬। অতঃপর আল্লাহ নিজ রাসূলের প্রতি এবং অন্যান্য মুমিনের প্রতি নিজের (পক্ষ হতে) সান্ত্বনা নাযিল করলেন এবং এমন সৈন্যদল (অর্থাৎ ফেরেশ্‌তা) নাযিল করলেন যাদেরকে তোমরা দেখনি, আর কাফিরদেরকে শাস্তি প্রদান করলেন: আর এটা হচ্ছে কাফিরদের কর্মফল।

٢٧- ثُمَّ يَتُوْبُ اللّٰهُ مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ وَ اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

২৭। অনন্তর আল্লাহ (ঐ কাফিরদের মধ্য হতে) যাকে ইচ্ছা সুযোগ দান করেন, আর আল্লাহ হচ্ছেন অতি ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়।

মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, সূরায়ে বারাআতের এটাই প্রথম আয়াত যাতে আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের উপর তাঁর বড় ইহসানের কথা বর্ণনা করেছেন। তিনি

স্বীয় নবী (সঃ)-এর সহচরদেরকে সাহায্য করতঃ তাঁদের শত্রুদের উপর তাঁদেরকে জয়যুক্ত করেছেন। এক জায়গায় নয়, বরং প্রতিটি জায়গায় তাঁদের উপর তাঁর সাহায্য থেকেছে। এ কারণেই বিজয় ও সফলতা কখনও তাঁদের সঙ্গ ছাড়েনি। এটা ছিল একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতার ফল, মাল ও যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্রের আধিক্যে নয়। আর এটা সংখ্যাধিক্যের কারণেও ছিল না। আল্লাহ পাক মুমিনদেরকে সম্বোধন করে বলেনঃ "তোমরা হুনায়েনের দিনটি স্মরণ কর। সেই দিন তোমরা তোমাদের সংখ্যাধিক্যের কারণে কিছুটা গর্ববোধ করেছিলে। তখন তোমাদের অবস্থা এই দাঁড়ালো যে, যুদ্ধক্ষেত্র থেকে তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলে! মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোক শুধু নবী (সঃ)-এর কাছে থাকলো। ঐ সময়েই আল্লাহর সাহায্য অবতীর্ণ হলো এবং তিনি তোমাদের অন্তরে প্রশান্তি নাযিল করলেন যাতে তোমরা অনুধাবন করতে পার যে, বিজয় লাভ শুধু আল্লাহর সাহায্যের মাধ্যমেই সম্ভব। তাঁর সাহায্যের ফলেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল বড় বড় দলের উপর বিজয়ী হয়ে থাকে। আল্লাহর সাহায্য ধৈর্যশীলদের সাথেই থাকে।" এ ঘটনাটি বিস্তারিতভাবে আমরা ইনশাআল্লাহ এখনই বর্ণনা করছি। মুসনাদে আহমাদে ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "উত্তম সহচর হচ্ছে চার জন। উত্তম ক্ষুদ্র সেনাবাহিনীর সংখ্যা হচ্ছে চারশ'। উত্তম বৃহৎ সেনাবাহিনীর সংখ্যা হলো চার হাজার। আর বারো হাজারের সেনাবাহিনীর তো স্বল্পতার কারণে পরাজিত হতেই পারে না।"[১]

অষ্টম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের পর শাওয়াল মাসে হুনায়েনের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মক্কা বিজয়ের ঘটনা হতে অবকাশ লাভের পর নবী (সঃ) প্রাথমিক সমুদয় কার্য সম্পাদন করেন, আর এদিকে মক্কার প্রায় সব লোকই ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়। রাসূলুল্লাহ (সঃ) সকলকে আযাদও করে দেন। এমতাবস্থায় তিনি অবহিত হন যে, হাওয়াযেন গোত্রের লোকেরা সম্মিলিতভাবে একত্রিত হয়েছে এবং তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে। তাদের নেতা হচ্ছে মালিক ইবনে আউফ নাসরী। সাকীফের সমস্ত গোত্রও তাদের সাথে যোগ দিয়েছে। অনুরূপভাবে বানু জাশম এবং বানু সা'দ ইবনে বকরও তাদের সাথে রয়েছে। বানু হিলালের কিছু লোকও ইন্ধন যোগাচ্ছে। বানু আমর ইবনে আমির এবং আউন ইবনে আমিরের কিছু লোকও তাদের সাথে আছে। এসব লোক

১. এ হাদীসটি সুনানে আবি দাউদ ও জামিউত তিরমিযীতেও রয়েছে। ইমাম তিরমিযী (রঃ) এ হাদীসটিকে হাসান গারীব বলেছেন। একজন বর্ণনাকারী ছাড়া অন্য সবাই এটাকে **'মুরসাল'** রূপে বর্ণনা করেছেন। ইমাম ইবনে মাজাহ (রঃ) ও ইমাম বায়হাকীও (রঃ) এটা বর্ণনা করেছেন। এসব বিষয় আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

একত্রিতভাবে নিজেদের স্ত্রী, ছেলেমেয়ে এবং বাড়ীর ধন-সম্পদ নিয়ে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্যে বেরিয়ে পড়লো। এমন কি তারা তাদের বকরী ও উটগুলোকে সাথে নিলো। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর সাথে মুহাজির ও আনসারদেরকে নিয়ে তাদের মুকাবিলার জন্যে রওয়ানা হয়ে গেলেন। মক্কার প্রায় দু'হাজার নওমুসলিমও তাঁর সাথে যোগ দেন। মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী উপত্যকায় উভয় সেনাবাহিনী মিলিত হলো। এ স্থানটির নাম ছিল হুনাইন। অতি সকালে আঁধার থাকতেই গুপ্তস্থানে গোপনীয়ভাবে অবস্থানকারী হাওয়াযেন গোত্র মুসলিমদের অজান্তে আকস্মিকভাবে তাঁদেরকে আক্রমণ করে বসে। তারা অসংখ্যা তীর বর্ষণ করতে করতে সম্মুখে অগ্রসর হয় এবং তরবারী চালনা শুরু করে দেয়। ফলে মুসলিমদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়ে যায় এবং তাঁদের মধ্যে পলায়নের হিড়িক পড়ে যায়। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাদের দিকে অগ্রসর হন। ঐ সময় তিনি সাদা খচ্চরের উপর সওয়ার ছিলেন। আব্বাস (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর জন্তুটির লাগামের ডান দিক ধরে ছিলেন এবং আবূ সুফিয়ান ইবনে হারিস ইবনে আবদিল মুত্তালিব (রাঃ) বাম দিক ধারণ করেছিলেন। এ দু'জন জন্তুটির দ্রুতগতি প্রতিরোধ করছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) উচ্চৈঃস্বরে নিজের পরিচয় দিচ্ছিলেন এবং মুসলিমদেরকে ফিরে আসার নির্দেশ দান করছিলেন। তিনি জোর গলায় বলছিলেনঃ "হে আল্লাহর বান্দারা! তোমরা কোথায় যাচ্ছ? এসো, আমি আল্লাহর সত্য রাসূল। আমি মিথ্যাবাদী নই। আমি আবদুল মুত্তালিবের বংশধর।" ঐ সময় তাঁর সাথে মাত্র আশি থেকে একশজন সাহাবা উপস্থিত ছিলেন। আবূ বকর (রাঃ), উমার (রাঃ), আব্বাস (রাঃ), আলী (রাঃ), ফযল ইবনে আব্বাস (রাঃ), আবূ সুফিয়ান ইবনে হারিস (রাঃ), আইমান ইবনে উম্মে আইমান (রাঃ), উসামা ইবনে যায়েদ (রাঃ) প্রমুখ মহান ব্যক্তিবর্গ তাঁর সাথেই ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর চাচা উচ্চৈঃস্বর বিশিষ্ট ব্যক্তি আব্বাস (রাঃ)-কে হুকুম দিলেন যে, তিনি যেন গাছের নীচে বায়আত গ্রহণকারীদেরকে পালাতে নিষেধ করে দেন। সুতরাং আব্বাস (রাঃ) উচ্চৈঃস্বরে ডাক দিলেনঃ "হে বাবলা গাছের নীচে দীক্ষা গ্রহণকারীগণ! হে সূরায়ে বাকারার বহনকারীগণ!" এ শব্দ যাঁদেরই কাছে পৌঁছলো তাঁরাই চারদিক থেকে লাব্বায়েক লাব্বায়েক বলতে বলতে ঐ শব্দের দিকে দৌড়িয়ে আসলেন এবং রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর পার্শ্বে এসে দাঁড়িয়ে গেলেন। এমন কি কারো উট ক্লান্ত হয়ে থেমে গেলে তিনি স্বীয় বর্ম পরিহিত হয়ে উটের উপর থেকে মাটিতে লাফিয়ে পড়েন এবং পায়ে হেঁটে নবী (সঃ)-এর সামনে হাযির হয়ে যান। যখন কিছু দল রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর চারদিকে একত্রিত হয়ে যান তখন তিনি আল্লাহ তা'আলার নিকট দুআ' করতে শুরু করেন। প্রার্থনায় তিনি বলেনঃ "হে আল্লাহ! আপনি আমার সাথে যে ওয়াদা

করেছেন তা পূর্ণ করুন!” অতঃপর তিনি এক মুষ্টি মাটি নেন এবং তা কাফিরদের দিকে নিক্ষেপ করেন। তাদের এমন কেউ বাকী থাকলো না যার চোখে ও মুখে ঐ মাটির কিছু না পড়লো। ফলে তারা যুদ্ধ করতে অপারগ হয়ে গেল এবং পরাজয় বরণ করলো। এদিকে মুসলিমরা তাদের পশ্চাদ্ধাবন করলেন। মুসলিমদের বাকী সৈন্য রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট চলে গেলেন। যাঁরা শত্রুদের পিছনে ছুটেছিলেন তাঁরা তাদের কিছু সংখ্যক লোককে হত্যা করে ফেলেন এবং অবশিষ্টদেরকে বন্দী করে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সামনে এনে হাযির করেন। মুসনাদে আহমাদে রয়েছে যে, আবূ আবদির রহমান ফাহরী, যাঁর নাম ইয়াযীদ ইবনে উসাইদ অথবা ইয়াযীদ ইবনে আনীস এবং যাঁকে কুরযও বলা হয়, তিনি বলেন, আমি এই যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে ছিলাম। আবহাওয়া ছিল অত্যন্ত গরম। দুপুরের সময় আমরা গাছের ছায়ায় বিশ্রাম গ্রহণ করি। সূর্য পশ্চিমে ঢলে যাওয়ার পর আমি আমার অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হই এবং ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর তাঁবুতে পৌঁছি। সালামের পর আমি তাঁকে বলি, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! এখন বাতাস ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। তিনি বলেনঃ “হ্যাঁ, ঠিক আছে।” অতঃপর তিনি ডাক দেনঃ “বিলাল!” ঐ সময় বিলাল (রাঃ) একটি গাছের ছায়ায় বিশ্রাম করছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ডাক শোনা মাত্রই لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَاَنَا فِدَائُكَ-এ কথা বলতে বলতে তিনি হাযির হয়ে যান। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে বলেনঃ “আমার সওয়ারী ঠিক কর।” তখনই তিনি তাঁর ঘোড়ার জিন কষে দেন, যার পাল্লা দু’টি ছিল খেজুর পাতার রজ্জু। সেখানে ছিল না কোন গর্ব ও অহংকারের বস্তু! জিন কষা শেষ হলে রাসূলুল্লাহ (সঃ) ঘোড়ার উপর আরোহণ করেন। আমরা কাতারবন্দী হয়ে যাই। সন্ধ্যা ও রাত্রি এভাবেই কেটে যায়। অতঃপর উভয় সৈন্যদল মুখোমুখী হয়ে পড়ে। ইতিমধ্যে মুসলিমরা পালাতে শুরু করেন, যেমন আল্লাহ পাক কুরআন কারীমে বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) সবাইকে ডাক দিয়ে বলেনঃ “হে আল্লাহর বান্দারা! আমি আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। হে মুহাজির দল! আমি আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।” এরপর তিনি ঘোড়া হতে অবতরণ করেন এবং এক মুষ্টি মাটি নিয়ে বলেনঃ “এটা যেন তাদের চেহারায় পতিত হয়।”এ কথা বলে তিনি ঐ মাটি কাফিরদের দিকে নিক্ষেপ করেন। এতেই মহান আল্লাহ তাদেরকে পরাজিত করেন। ঐ মুশরিকরাই বর্ণনা করেছে– “আমাদের মধ্যে এমন কেউই বাকী ছিল না যার চোখে ও মুখে এ মাটি পড়েনি। ঐ সময় আমাদের মনে হচ্ছিল যেন যমীন ও আসমানের মাঝে কোন লোহার থালায় লোহা পতিত হচ্ছে।”[১]

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) ও ইমাম হাফিয বায়হাকী (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

একটি বর্ণনায় আছে যে, পলায়নকারী মুসলিমদের মধ্যে একশজন যখন রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট ফিরে আসলেন তখন ঐ সময়েই তিনি কাফিরদেরকে আক্রমণ করার আদেশ দান করলেন। প্রথমতঃ তিনি আনসারদেরকে আহ্বান করেছিলেন। অতঃপর এ আহ্বান শুধু খাজরাজদের উপরেই রয়ে যায়। এ গোত্রটি যুদ্ধের সময় বড়ই ধৈর্যের পরিচয় দিতেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) স্বীয় সওয়ারীর উপর থেকে যুদ্ধক্ষেত্রের দৃশ্য অবলোকন করছিলেন। তিনি বলেনঃ "এখন ঘোরতর যুদ্ধ চলছে।" এতে এই হলো যে, আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের যাদেরকে চাইলেন হত্যা করালেন এবং যাদেরকে চাইলেন বন্দী করালেন। আর তাদের মাল ও সন্তানগুলো 'ফাই' হিসেবে স্বীয় নবী (সঃ)-কে দান করলেন।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বারা ইবনে আযিব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তাঁকে একটি লোক বলেনঃ "হে আবূ আম্মারাহ (রাঃ)! আপনারা কি হুনায়েনের যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন?" উত্তরে তিনি বলেনঃ "(এ কথা সত্য বটে) কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর পা মুবারক একটুও পিছনে সরেনি। ব্যাপার ছিল এই যে, হাওয়াযেন গোত্রের লোকেরা তীরন্দাজীতে উস্তাদ ছিল। আল্লাহর ফযলে আমরা প্রথম আক্রমণেই তাদেরকে পরাস্ত করে দেই। কিন্তু লোকেরা যখন গনীমতের মালের উপর ঝুঁকে পড়ে তখন হাওয়াযেন গোত্রের লোকেরা সুযোগ বুঝে পুনরায় তীর বর্ষণ শুরু করে দেয়। ফলে মুসলিমদের মধ্যে পলায়নের হিড়িক পড়ে যায়। সুবহানাল্লাহ! সেদিন দেখেছি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর পূর্ণ সাহস ও বীরত্বপণা! মুসলিম সৈন্যেরা পলায়ন করেছে। তিনি এমন কোন দ্রুতগামী সওয়ারীর আরোহী ছিলেন না যে, সেটা দৌড়িয়ে পালাতে কাজে আসবে। বরং তিনি একটি খচ্চরের উপর সওয়ার ছিলেন এবং মুশরিকদের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন। তিনি নিজেকে গোপন করে রাখেননি। বরং নিজের নাম উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ করতে করতে চলছিলেন। যেন তাঁকে যারা চিনে না তারাও চিনতে পারে। চিন্তা করে দেখুন যে, একক সত্তার উপর তাঁর কি পরিমাণ ভরসা! আর আল্লাহ তা'আলার সাহায্যের উপর তাঁর কত পূর্ণ বিশ্বাস! তিনি জানতেন যে, আল্লাহ তা'আলা রিসালাতের ব্যাপারটাকে অবশ্যই পূর্ণ করবেন এবং তাঁর দ্বীনকে দুনিয়ার সমস্ত দ্বীনের উপর বিজয়ী করে রাখবেন। সুতরাং সদা সর্বদা তাঁর উপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক!"

এখন আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নবী (সঃ)-এর উপর ও মুসলিমদের উপর প্রশান্তি অবতীর্ণ করার কথা বলছেন এবং আরো বলছেন যুদ্ধে ফেরেশ্তা প্রেরণের কথা যাঁদেরকে কেউই দেখতে পায়নি।

ইমাম আবূ জা'ফর ইবনে জারীর (রঃ) একজন মুশরিকের উক্তি নকল করেছেন যে, ঐ মুশরিক বর্ণনা করেছে– "হুনায়েনের দিন যখন আমরা যুদ্ধের জন্যে মুসলিমদের মুখোমুখী হই তখন তাদেরকে আমরা একটি বকরি দোহনে যে সময় লাগে এতটুকু সময়ও আমাদের সামনে টিকতে দেইনি, এর মধ্যেই তারা পরাজিত হয়ে যায় এবং তারা পালাতে শুরু করে। আমরা তাদের পশ্চাদ্ধাবন করি। এমতাবস্থায় একটি লোককে আমরা খচ্চরের উপর সওয়ার দেখতে পাই। আমরা আরো দেখতে পাই যে, কয়েকজন সুন্দর সাদা উজ্জ্বল চেহারার লোক তার চারদিকে রয়েছে এবং তাদের মুখে উচ্চারিত হচ্ছে, 'তোমাদের চেহারাগুলো নষ্ট হোক, তোমরা ফিরে যাও।' তাদের একথা বলার পরক্ষণেই আমাদের পরাজয় ঘটে যায়। শেষ পর্যন্ত মুসলিমরা আমাদের কাঁধে চেপে বসে।"

ইবনে মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুনায়েনের যুদ্ধের দিন আমিও রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথেই ছিলাম। তাঁর সাথে মাত্র আশিজন মুহাজির ও আনসার রয়ে গিয়েছিলেন। আমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিনি। রাসূলুল্লাহ (সঃ) সাদা খচ্চরের উপর সওয়ার হয়ে শত্রুদের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন। তাঁর জন্তুটি হোঁচট খেলো। সুতরাং তিনি জিনের উপর থেকে নিচের দিকে ঝুঁকে পড়লেন। আমি তাঁকে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আপনি উপরে উঠে যান। আল্লাহ আপনাকে উপরেই রাখবেন। তিনি তখন আমাকে বললেন, "এক মুষ্টিপূর্ণ মাটি নিয়ে এসো।" আমি তাঁকে এক মুষ্টিপূর্ণ মাটি এনে দিলাম। তিনি তা কাফিরদের দিকে নিক্ষেপ করলেন। ওটা তাদের চোখে পড়লো। অতঃপর তিনি বললেনঃ "মুহাজির ও আনসার কোথায়?" আমি উত্তরে বললাম, তারা এখানে আছে। তিনি বললেনঃ "তাদেরকে ডাক দাও।" আমি তাদেরকে ডাক দেয়া মাত্রই তারা তরবারী নিয়ে দ্রুত বেগে ধাবিত হলো। তখন মুশরিকরা দিশাহারা হয়ে পালাতে শুরু করলো।"[১]

শায়বা ইবনে উসমান (রাঃ) বলেন, হুনায়েনের যুদ্ধের দিন যখন রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে আমি এমন অবস্থায় দেখি যে, মুসলিম সৈন্যেরা পরাজিত হয়ে পালাতে শুরু করেছেন এবং তিনি একাকী রয়ে গেছেন, তখন আমার বদরের দিনের কথা স্মরণ হয়ে যায়। ঐদিন আমার পিতা ও চাচা আলী (রাঃ) ও হামযা (রাঃ)-এর হাতে মারা যায়। আমি মনে মনে বলি যে, এর প্রতিশোধ গ্রহণের এর চেয়ে বড় সুযোগ আর কি হতে পারে? অতঃপর আমি নবী (সঃ)-কে হত্যা করার উদ্দেশ্যে

১. এ হাদীসটি হাফিয বায়হাকী (রঃ) বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম আহমাদও (রঃ) তাঁর মুসনাদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

তাঁর ডান দিকে এগিয়ে গেলাম। গিয়ে দেখি যে, সেখানে আব্বাস ইবনে আব্দিল মুত্তালিব (রাঃ) চাঁদির ন্যায় সাদা বর্ম পরিহিত হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। আমি ভাবলাম যে, তিনি স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্রকে পূর্ণভাবে রক্ষা করার চেষ্টা করবেন। তাই আমি তাঁর বাম দিকে চলে গেলাম। সেখানেও দেখি যে, আবূ সুফিয়ান ইবনে হারিস ইবনে আবদিল মুত্তালিব (রাঃ) দাঁড়িয়ে আছেন। আমি চিন্তা করলাম যে, তিনি তাঁর চাচাতো ভাইকে অবশ্যই রক্ষা করার প্রাণপণ চেষ্টা করবেন। সুতরাং আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর পিছন দিকে চলে গেলাম। আমি তাঁকে তরবারী দ্বারা আঘাত করতে উদ্যত হয়েছি এমন সময় দেখি যে, একটি আগুনের কোড়া বিদ্যুতের মত চমকিত হয়ে আমার উপর পতিত হচ্ছে। আমি দু'চোখ বন্ধ করে নিলাম এবং পশ্চাদপদে পিছন দিকে সরতে লাগলাম। ঐ সময়েই রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমার দিকে ফিরে তাকালেন এবং বললেনঃ "হে শায়বা! আমার কাছে এসো।" অতঃপর বললেনঃ "হে আল্লাহ! তার সাথের শয়তানদেরকে দূর করে দিন!" চোখ খুলে আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর দিকে তাকালাম। আল্লাহর শপথ! ঐ সময় তিনি আমার কাছে আমার চক্ষু ও কর্ণ অপেক্ষাও অধিক প্রিয় ছিলেন। তিনি আমাকে বললেনঃ "হে শায়বা! যাও, কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করগে।" শায়বা (রাঃ) বলেন, ঐ যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে আমিও ছিলাম। কিন্তু ইসলামের কারণে বা ইসলামের পরিচয় লাভের ভিত্তিতে বের হইনি। বরং আমি এটা চাইনি যে, হাওয়াযেন গোত্র কুরায়েশ গোত্রের উপর জয়যুক্ত হোক। আমি তাঁর কাছেই দণ্ডায়মান ছিলাম, এমন সময় আমি সাদা কালো মিশ্রিত রং-এর ঘোড়া দেখে বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমি তো সাদা কালো মিশ্রিত রং-এর ঘোড়া দেখতে পাচ্ছি! তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ "হে শায়বা! এটা তো কাফিরগণ ছাড়া আর কারো দৃষ্টিগোচর হয় না!" অতঃপর তিনি আমার বক্ষে হাত রেখে দুআ' করলেনঃ "হে আল্লাহ! আপনি শায়বাকে সুপথ প্রদর্শন করুন!" তারপর তিনি দ্বিতীয়বার ও তৃতীয়বার এরূপই করলেন এবং এটাই বললেন। আল্লাহর শপথ! তাঁর হাত আমার বক্ষ হতে সরে যাওয়ার পূর্বেই আমার অন্তরে তার প্রতি সারা দুনিয়া অপেক্ষা বেশী ভালবাসা সৃষ্টি হয়।"[১] তিনি পূর্ণ হাদীসটি বর্ণনা করেন, যাতে রয়েছে প্রাথমিক অবস্থায় মুসলিমদের পরাজয় বরণ, আব্বাস (রাঃ)-এর তাঁদেরকে আহ্বান, আল্লাহর কাছে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাহায্য প্রার্থনা এবং শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলার মুশরিকদেরকে পরাজিতকরণ।

১. হাফিয বায়হাকী (রঃ)-এ হাদীসটি তাখরীজ করেছেন।

জুবাইর ইবনে মুতইম (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ “হুনায়েনের যুদ্ধে আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে ছিলাম। আমি লক্ষ্য করি যে, আকাশ থেকে যেন কালো পিঁপড়ার মত কিছু অবতীর্ণ হচ্ছে, যা সারা মাঠকে ঘিরে ফেললো। তখনই মুশরিকদের পরাজয় ঘটে গেল। ওটা যে আসমানী মদদ বা সাহায্য ছিল এতে আমাদের কোনই সন্দেহ নেই।

ইয়াযীদ ইবনে আমির সুওয়াঈ (রাঃ) তাঁর কুফরীর যুগে হুনায়েনের যুদ্ধে কাফিরদের সাথে ছিলেন। পরে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলঃ “ঐ সময় আপনাদের মনের ভীতি ও ত্রাসের অবস্থা কেমন ছিল?” তখন তিনি থালায় কংকর রেখে তা বাজাতে বাজাতে বলেনঃ “আমাদের অন্তরে এরূপ শব্দ অনুভূত হচ্ছিল। ফলে আমাদের হৃদপিণ্ড কেঁপে উঠছিল এবং অন্তরাত্মা শুকিয়ে যাচ্ছিল।” সহীহ মুসলিমে আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “আমাকে ‘রুব’ বা ভক্তিপ্রযুক্ত ভয় দ্বারা সাহায্য করা হয়েছে এবং আমাকে সমুদয় কালেমা প্রদান করা হয়েছে।” মোটকথা আল্লাহ তা'আলা কাফিরদেরকে এই শাস্তি প্রদান করেন এবং ওটা ছিল তাদের কুফরীরই বিনিময়। হাওয়াযেন গোত্রের বাকী লোকদের উপর আল্লাহর করুণা বর্ষিত হয়। তাদেরও সৌভাগ্য লাভ হয় যে, তারা ইসলাম গ্রহণ করে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর খিদমতে হাযির হয়। ঐ সময় তিনি বিজয়ী বেশে প্রত্যাবর্তনের পথে মক্কার নিকটবর্তী জেয়েররানা নামক স্থানে পৌঁছেছিলেন। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরে বিশদিন অতিক্রান্ত হয়েছিল। এ জন্যেই তিনি তাদেরকে বলেছিলেনঃ “দুটোর মধ্যে যে কোন একটি তোমরা পছন্দ করে নাও, বন্দী অথবা মাল!” তারা বন্দীদেরকে ফিরিয়ে নেয়াই পছন্দ করলো। ঐ বন্দীদের ছোট-বড়, নর-নারী, প্রাপ্ত বয়স্ক এবং অপ্রাপ্ত বয়স্ক প্রভৃতির মোট সংখ্যা ছিল ছয় হাজার। রাসূলুল্লাহ (সঃ) সব বন্দীকেই তাদেরকে ফিরিয়ে দেন এবং তাদের মালকে গনীমত হিসেবে মুসলিমদের মধ্যে বন্টন করে দেন। তিনি মক্কার আযাদকৃত নও মুসলিদেরকেও ঐ মাল থেকে কিছু কিছু প্রদান করেন, যেন তাদের অন্তর পুরোপুরিভাবে ইসলামের দিকে ঝুঁকে পড়ে। মালিক ইবনে আউফ নাসরীকেও তিনি একশটি উট প্রদান করেন এবং তাকেই তার কওমের নেতা বানিয়ে দেন, যেমন সে ছিল। এরই প্রশংসায় সে তার প্রসিদ্ধ কবিতায় বলেছিলঃ (অনুবাদ) “আমি তো মুহাম্মাদ (সঃ)-এর মত কাউকেও দেখিওনি, শুনিওনি। দান খায়রাতে এবং অপরাধ ক্ষমাকরণে তিনি হচ্ছেন বিশ্বের মধ্যে অদ্বিতীয়। কাল কিয়ামতের দিনে

যা কিছু ঘটবে তা সবই তিনি জানিয়ে দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, বীরত্ব ও সাহসিকতায়ও তিনি অতুলনীয়। যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি সিংহের ন্যায় গর্জন করতে করতে শত্রুদের দিকে অগ্রসর হয়ে থাকেন।”

২৮। হে মুমিনগণ! মুশরিকরা হচ্ছে একেবারেই অপবিত্র, অতএব তারা যেন এ বছরের পর মসজিদুল হারামের নিকটেও আসতে না পারে, আর যদি তোমরা দারিদ্রের ভয় কর তবে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তোমাদেরকে অভাবমুক্ত করে দিবেন, যদি তিনি চান, নিশ্চয়ই আল্লাহ অতিশয় জ্ঞানী বড়ই হিকমতওয়ালা।

٢٨- يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْمُشْرِكُوْنَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هٰذَا وَاِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيْكُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖٓ اِنْ شَآءَ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۝

২৯। যেসব আহলে কিতাব আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে না এবং কিয়ামতের দিবসের প্রতিও না, আর ঐ বস্তুগুলোকে হারাম মনে করে না যেগুলোকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল হারাম বলেছেন, আর সত্য ধর্ম (অর্থাৎ ইসলাম) গ্রহণ করে না, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকো যে পর্যন্ত না তারা অধীনতা স্বীকার করে প্রজারূপে জিযিয়া দিতে স্বীকৃত হয়।

٢٩- قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلَا يُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَلَا يَدِيْنُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَّدٍ وَّهُمْ صٰغِرُوْنَ ۝

আল্লাহ তা'আলা তাঁর পবিত্র দ্বীনের অনুসারী এবং পাক পবিত্র মুসলিম বান্দাদেরকে হুকুম করছেন যে, তারা যেন ধর্মের দিক থেকে অপবিত্র মুশরিকদেরকে বায়তুল্লাহর পাশে আসতে না দেয়। এই আয়াতটি নবম

হিজরীতে অবতীর্ণ হয়। ঐ বছরই রাসূলুল্লাহ (সঃ) আলী (রাঃ)-কে আবূ বকর (রাঃ) -এর সাথে প্রেরণ করেন এবং নির্দেশ দেনঃ "হজ্বের সমাবেশে ঘোষণা করে দাও যে, এ বছরের পরে কোন মুশরিক যেন হজ্ব করতে না আসে এবং কেউ যেন উলঙ্গ হয়ে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ না করে।" শরীয়তের এই হুকুমকে আল্লাহ তা'আলা এমনিতেই পূর্ণ করে দেন। সেখানে আর মুশরিকদের প্রবেশ লাভের সৌভাগ্য হয়নি এবং এরপরে উলঙ্গ অবস্থায় কেউ আল্লাহর ঘরের তাওয়াফও করেনি। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) গোলাম ও যিম্মী ব্যক্তিকে এই হুকুমের বহির্ভূত বলেছেন। মুসনাদে আহমাদে জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "এ বছরের পরে চুক্তিকৃতগণ ছাড়া এবং তাদের গোলামরা ছাড়া আর কেউই যেন আমাদের মসজিদে প্রবেশ না করে।" কিন্তু এই মারফূ' হাদীস অপেক্ষা বেশী সহীহ সনদযুক্ত মাওকুফ রিওয়ায়াত রয়েছে।

মুসলিমদের খলীফা উমার ইবনে আবদুল আযীয (রঃ) ফরমান জারী করেছিলেনঃ "ইয়াহূদী ও খ্রীষ্টানদেরকে মুসলমানদের মসজিদে আসতে দিবে না।" এই আয়াতকে কেন্দ্র করেই তিনি এই নিষেধাজ্ঞা জারী করেছিলেন। আতা (রঃ) বলেন যে, সম্পূর্ণ হারাম শরীফই মসজিদুল হারামের অন্তর্ভুক্ত। মুশরিকরা যে অপবিত্র, এই আয়াতটিই এর দলীল। সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, মুমিন অপবিত্র হয় না। বাকী থাকলো এই কথাটি যে মুশরিকদের দেহ ও সত্তাও কি অপবিত্র? এ ব্যাপারে জমহূরের উক্তি এই যে, তাদের দেহ অপবিত্র নয়। কেননা আল্লাহ তা'আলা আহলে কিতাবের যবেহকৃত জন্তু হালাল করেছেন। যাহেরিয়া মাযহাবের কোন কোন লোক মুশরিকদের দেহকে অপবিত্র বলেছে। হাসান (রঃ) বলেন যে, যে ব্যক্তি মুশরিকদের সাথে মুসাফাহা করবে সে যেন তার হাতটি ধুয়ে নেয়। এ হুকুম হলে লোকদের কেউ কেউ বললোঃ "তাহলে তো আমাদের বাজার মন্দা হয়ে যাবে এবং ব্যবসার জাঁকজমক নষ্ট হয়ে যাবে। ফলে আমাদের বহুবিধ ক্ষতি সাধিত হবে।"[১] তাদের এ কথার জবাবে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "তোমরা এ ব্যাপারে কোনই ভয় করো না। আল্লাহ তোমাদের আরো বহু পন্থায় দান করবেন। আহলে কিতাবের নিকট থেকে তোমাদের জন্যে তিনি জিযিয়া

১. লুবাব গ্রন্থে ইবনে আবি হাতিম (রঃ) তাখরীজ করেছেন যে, মুশরিকরা বায়তুল্লাহতে খাদ্য সম্ভার নিয়ে আসতো এবং ওর মধ্যে ওরা ব্যবসা করতো। অতঃপর যখন তাদেরকে বায়তুল্লাহতে আসতে নিষেধ করে দেয়া হলো তখন মুসলমানরা বললোঃ "আমাদের জন্যে খাদ্য কোথায়?" তখন আল্লাহ তা'আলা ... وَإِنْ خِفْتُمْ এ আয়াত অবতীর্ণ করেন।

আদায় করিয়ে দিবেন এবং তোমাদেরকে সম্পদশালী করবেন। তোমাদের জন্যে কোন্টা বেশী কল্যাণকর তা তোমাদের প্রতিপালকই ভাল জানেন। তাঁর নির্দেশ এবং নিষেধাজ্ঞা সবটাই নিপুণতাপূর্ণ। এ ব্যবসা তোমাদের জন্যে ততোটা লাভজনক নয় যতোটা লাভজনক তোমাদের জিযিয়া প্রাপ্তি ঐ আহলে কিতাবের নিকট থেকে যারা আল্লাহ, তাঁর রাসূল (সঃ) এবং কিয়ামতকে অস্বীকারকারী। প্রকৃত অর্থে তারা যখন মুহাম্মাদ (সঃ)-এর উপর ঈমান আনলো না তখন কোন নবীর উপরই তাদের ঈমান রইলো না। বরং তারা নিজেদের প্রবৃত্তির ও তাদের বড়দের অন্ধ বিশ্বাসের পিছনে পড়ে রয়েছে। যদি তাদের নিজেদের নবীর উপর এবং নিজেদের শরীয়তের উপর পূর্ণ বিশ্বাস থাকতো তবে তারা আমাদের এই নবী (সঃ)-এর উপরে অবশ্যই ঈমান আনতো। তাঁর শুভাগমনের সুসংবাদ তো প্রত্যেক নবীই দিয়ে গেছেন এবং তাঁর অনুসরণ করার হুকুমও সব নবীই প্রদান করেছেন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তারা এই সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল (সঃ)-কে অস্বীকার করছে। সুতরাং পূর্ববর্তী নবীদের শরীয়তের সাথেও তাদের কোন সম্পর্ক নেই। এ কারণেই ঐ নবীদেরকে মুখে স্বীকার করার কোনই মূল্য নেই। কেননা মুহাম্মাদ (সঃ) হলেন নবীদের নেতা সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল, সর্বশেষ নবী এবং রাসূলদের পূর্ণকারী। অথচ তারা তাঁকেই অস্বীকার করছে। সুতরাং তাদের সাথেও জিহাদ করতে হবে।

তাদের সাথে জিহাদের হুকুম হওয়ার এটাই প্রথম আয়াত। ঐ সময় পর্যন্ত আশে পাশের মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। তাদের অধিকাংশই তাওহীদের পতাকা তলে আশ্রয় নিয়েছিল। আরব উপদ্বীপে ইসলাম স্বীয় জায়গা করে নিয়েছিল। এখন ইয়াহূদী ও খ্রীষ্টানদের সংবাদ নেয়ার এবং তাদেরকে সত্য পথ দেখাবার নির্দেশ দেয়া হয়। এ হুকুম অবতীর্ণ হয় হিজরী নবম সনে। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) রোমকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। জনগণকে তিনি স্বীয় সংকল্পের কথা অবহিত করেন। মদীনার চতুষ্পার্শ্বের আরবীয়দেরকে যুদ্ধের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেন এবং প্রায় ত্রিশ হাজার সৈন্য নিয়ে রোম সাম্রাজ্য অভিমুখে রওয়ানা হন। এই যুদ্ধ থেকে বিমুখ থাকলো মুনাফিকরা এবং আরো কিছু সংখ্যক লোক। গরমের মৌসুম ছিল এবং গাছের ফল পেকে গিয়েছিল। রোমকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে গমনের ব্যাপারে সিরিয়ার পথ ছিল বহু দূরের পথ এবং ঐ সফর ছিল খুবই কঠিন সফর। তাঁরা তাবূক পর্যন্ত পৌঁছে যান। সেখানে প্রায় বিশ দিন অবস্থান করেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলার নিকট ইসতিখারা করে সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করেন। কেননা, তাঁদের অবস্থা ছিল অত্যন্ত সঙ্গীন এবং

তাঁরা খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। ইনশাআল্লাহ্ সত্বরই এর বর্ণনা আসছে। এই আয়াতকেই দলীল হিসেবে গ্রহণ করে কেউ কেউ বলেছেন যে, জিযিয়া শুধু আহলে কিতাবের নিকট থেকে এবং তাদের সাথে সাদৃশ্যযুক্ত লোকদের নিকট থেকে নেয়া যাবে, যেমন মাজুসীদের নিকট থেকে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) হিজরের মাজুসদের নিকট থেকে জিযিয়া আদায় করেছিলেন। ইমাম শাফিঈ (রঃ)-এর এটাই মাযহাব। ইমাম আহমাদ (রঃ)-এরও প্রসিদ্ধ মাযহাব এটাই। ইমাম আবূ হানীফা (রঃ) বলেন যে, সমস্ত আজমীর নিকট থেকে জিযিয়া আদায় করা হবে, তারা আহলে কিতাবই হোক অথবা মুশরিকই হোক। হ্যাঁ, তবে আরবের লোকদের মধ্যে শুধুমাত্র আহলে কিতাবের নিকট থেকে জিযিয়া আদায় করা হবে। ইমাম মালিক (রঃ) বলেন যে, সমস্ত কাফিরের নিকট থেকেই জিযিয়া আদায় করা জায়েয। তারা আহ্লে কিতাবই হোক বা মাজুসীই হোক অথবা মূর্তিপূজক প্রভৃতিই হোক। তাঁদের মাযহাবের দলীলগুলো বিস্তারিতভাবে আলোচনা করার এখানে তেমন কোন সুযোগ নেই। এসব ব্যাপার আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

আল্লাহ পাক বলেনঃ যে পর্যন্ত না তারা অধীনতা স্বীকার করে প্রজারূপে জিযিয়া দিতে স্বীকৃত হয়, তাদেরকে ছেড়ে দিয়ো না। সুতরাং মুসলিমদের উপর যিম্মীদের মর্যাদা দেয়া বৈধ নয়। সহীহ্ মুসলিমে আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ "তোমরা ইয়াহূদী ও নাসারাদেরকে প্রথমে সালাম দিয়ো না এবং যদি পথে তোমাদের সাথে তাদের সাক্ষাৎ হয়ে যায় তবে তাদেরকে সংকীর্ণ পথে যেতে বাধ্য করো।" এ কারণেই উমার (রাঃ) তাদের সাথে এরূপই শর্ত করেছিলেন।

আব্দুর রহমান ইবনে গানাম আশআরী (রাঃ) বলেন, আমি নিজের হাতে চুক্তিনামা লিখে উমার (রাঃ)-এর নিকট পাঠিয়েছিলাম যে, সিরিয়াবাসী অমুক অমুক শহুরে খ্রীষ্টানদের পক্ষ হতে এই চুক্তিনামা আল্লাহর বান্দা আমীরুল মুমিনীন উমার (রাঃ) -এর নিকট। চুক্তিপত্রের বিষয় বস্তু হচ্ছে– "যখন আপনারা আমাদের উপর এসে পড়লেন, আমরা আপনাদের নিকট আমাদের জান, মাল ও সন্তান-সন্ততির জন্যে নিরাপত্তার প্রার্থনা জানাচ্ছি। আমরা এ নিরাপত্তা চাচ্ছি এ শর্তাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে যে, আমরা এই শহরগুলোতে এবং এগুলোর আশে পাশে নতুন কোন মন্দির, গির্জা এবং খানকা নির্মাণ করবো না। এরূপ কোন নষ্ট ঘরের মেরামত ও সংস্কারও করবো না। এসব ঘরে যদি কোন মুসলিম মুসাফির

অবস্থানের ইচ্ছা করেন তবে আমরা তাঁদেরকে বাধা দেবো না। তাঁরা রাত্রেই অবস্থান করুন অথবা দিনেই অবস্থান করুন। আমরা পথিক ও মুসাফিরদের জন্যে ওগুলোর দরজা সব সময় খুলে রাখবো। যেসব মুসলিম আগমন করবেন আমরা তিন দিন পর্যন্ত তাঁদের মেহমানদারী করবো। আমরা ঐসব ঘরে বা বাসভূমি প্রভৃতিতে কোন গুপ্তচর লুকিয়ে রাখবো না। মুসলিমদের সাথে কোন প্রতারণা করবো না। নিজেদের সন্তানদেরকে কুরআন শিক্ষা দেবো না। নিজেরা শির্ক করবো না এবং অন্য কাউকেও শির্কের দিকে আহ্বান করবো না। আমাদের মধ্যে কেউ যদি ইসলাম গ্রহণ করার ইচ্ছা করে তবে আমরা তাদেরকে মোটেও বাধা দেবো না। মুসলিমদেরকে আমরা সম্মান করবো। যদি তাঁরা আমাদের কাছে বসার ইচ্ছা করেন তবে আমরা তাঁদের জন্যে জায়গা ছেড়ে দেবো। কোন কিছুতেই আমরা নিজেদেরকে মুসলিমদের সমান মনে করবো না। পোশাক পরিচ্ছদেও না, আমরা তাঁদের কথার উপর কথা বলবো না। আমরা তাঁদের পিতৃপদবী যুক্ত নামে নামকরণ করবো না। জিন্ বিশিষ্ট ঘোড়ার উপর আমরা সওয়ার হবো না। আমরা তরবারী লটকাবো না এবং নিজেদের সাথেও তরবারী রাখবো না। অঙ্গুরীর উপর আরবী নক্শা অংকন করাবো না এবং মাথার অগ্রভাগের চুল কেটে ফেলবো না। আমরা যেখানেই থাকি না কেন, পৈতা অবশ্য অবশ্যই ফেলে রাখবো। আমাদের গির্জাসমূহের উপর ক্রুশচিহ্ন প্রকাশ করবো না, আমাদের ধর্মীয় গ্রন্থগুলো মুসলিমদের যাতায়াত স্থানে এবং বাজারসমূহে প্রকাশিত হতে দেবো না। গীর্জায় উচ্চৈঃস্বরে শংখ বাজাবো না, মুসলিমদের উপস্থিতিতে আমাদের ধর্মীয় পুস্তকগুলো জোরে জোরে পাঠ করবো না, রাস্তাঘাটে নিজেদের চাল চলন ও রীতি নীতি প্রকাশ করবো না, নিজেদের মৃতদের উপর হায়! হায়!! করে উচ্চৈঃস্বরে শোক প্রকাশ করবো না এবং মুসলিমদের চলার পথে মৃতদেহের সাথে আগুন নিয়ে যাবো না। যেসব গোলাম মুসলিমদের অংশে পড়বে তা আমরা গ্রহণ করবো না। আমরা অবশ্যই মুসলিমদের শুভাকাঙ্ক্ষী হয়ে থাকবো। মুসলিমদের ঘরে আমরা উঁকি মারবো না।” যখন এই চুক্তি পত্র উমার (রাঃ)-এর সামনে পেশ করা হলো তখন তিনি তাতে আরো একটি শর্ত বাড়িয়ে নিলেন। তা হচ্ছে– “আমরা কখনো কোন মুসলিমকে প্রহার করবো না।” অতঃপর তারা বললোঃ “এসব শর্ত আমরা মেনে নিলাম। আমাদের ধর্মাবলম্বী সমস্ত লোকই এসব শর্তের উপর নিরাপত্তা লাভ করলো। এগুলোর কোন একটি যদি আমরা ভঙ্গ করি তবে আমাদেরকে নিরাপত্তা দানের ব্যাপারে আপনার কোন দায়িত্ব থাকবে না এবং আপনি আপনার শত্রুদের সাথে যা কিছু করেন, আমরাও ওরই যোগ্য ও উপযুক্ত হয়ে যাবো।”

৩০। ইয়াহূদীরা বললো– উযায়ের আল্লাহর পুত্র এবং নাসারারা বললো– মাসীহ্ আল্লাহর পুত্র, এটা তাদের মুখের কথা মাত্র (বাস্তবে তা কিছুই নয়), তারা তো তাদের ন্যায়ই কথা বলছে যারা তাদের পূর্বে কাফির হয়েছে, আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করুন! তারা উল্টো কোন দিকে যাচ্ছে!

٣٠- وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرُ ابْنُ اللّٰهِ وَقَالَتِ النَّصٰرَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللّٰهِ ذٰلِكَ قَوْلُهُمْ بِاَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُوْنَ قَوْلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَبْلُ قٰتَلَهُمُ اللّٰهُ اَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ○

৩১। তারা আল্লাহকে ছেড়ে নিজেদের আলেম ও ধর্ম-যাজকদেরকে প্রভু বানিয়ে নিয়েছে এবং মারইয়ামের পুত্র মাসীহ্কেও, অথচ তাদের প্রতি শুধু এই আদেশ করা হয়েছে যে, তারা শুধুমাত্র এক মা'বূদের ইবাদত করবে যিনি ব্যতীত মা'বূদ হওয়ার যোগ্য কেউই নেই, তিনি তাদের অংশী স্থির করা হতে পবিত্র।

٣١- اِتَّخَذُوْٓا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَالْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَآ اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوْٓا اِلٰهًا وَّاحِدًا لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ سُبْحٰنَهٗ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ○

এ আয়াতগুলোতেও মহা মহিমান্বিত আল্লাহ মুমিনদেরকে মুশরিক, কাফির, ইয়াহূদী ও খ্রীষ্টানদের সাথে যুদ্ধ করার প্রতি উৎসাহ প্রদান করছেন। মহান আল্লাহ বলেন, দেখো! আল্লাহর শত্রুরা কেমন ঔদ্ধত্যপূর্ণ ব্যবহার করছে! ইয়াহূদীরা উযায়ের (আঃ)-কে আল্লাহর পুত্র বলছে (নাঊযুবিল্লাহি মিন যালিক)। আল্লাহ এটা থেকে পবিত্র ও বহু ঊর্ধে যে, তাঁর কোন পুত্র থাকবে! ঐ লোকেরা যে ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে উযায়ের (আঃ) সম্পর্কে এ ধারণা পোষণ করেছিল তা এই যে, যখন আমালিকা সম্প্রদায় বানী ইসরাঈলের উপর জয়যুক্ত হয় এবং তাদের আলেমদেরকে হত্যা করে ও নেতৃস্থানীয় লোকদেরকে বন্দী করে ফেলে তখন ইল্ম উঠে যাওয়া, কিছু সংখ্যক আলেমের নিহত হওয়া এবং বানী ইসরাঈলদের ধ্বংস হয়ে যাওয়ার কারণে উযায়ের (আঃ) অত্যন্ত মর্মাহত হন।

তিনি এমনভাবে কাঁদতে শুরু করেন যে, তাঁর চোখের অশ্রু বন্ধই হয় না। কাঁদতে কাঁদতে তাঁর চোখের পাতাগুলোও ঝরে পড়ে। একদা এভাবে ক্রন্দনরত অবস্থায় একটি মাঠের মধ্য দিয়ে গমন করেন। এমন সময় দেখতে পান যে, একজন মহিলা একটি কবরের পার্শ্বে বসে ক্রন্দন করছে এবং মুখে উচ্চারণ করছে– "হায়! এখন আমার খাওয়া ও পরার ব্যবস্থা কি করে হবে?" এ দেখে উযায়ের (আঃ) সেখানে দাঁড়িয়ে যান এবং মহিলাটিকে জিজ্ঞেস করেনঃ "এই লোকটির পূর্বে তোমার খাওয়া ও পরার ব্যবস্থা কে করতেন?" সে উত্তরে বলেঃ "আল্লাহ তা'আলা।" তখন তিনি তাকে বলেনঃ "তাহলে আল্লাহ তা'আলা তো এখনো জীবিত রয়েছেন। তাঁর তো কখনো মৃত্যু হয় না।" তাঁর এ কথা শুনে মহিলাটি উযায়ের (আঃ)-কে জিজ্ঞেস করেঃ "তাহলে হে উযায়ের (আঃ)! আপনি বলুনতো– বানী ইসরাঈলের পূর্বে আলেমদেরকে বিদ্যা শিক্ষা দিতেন কে?" তিনি উত্তরে বলেনঃ "আল্লাহ তা'আলা।" তখন মহিলাটি বলেঃ "তাহলে আপনি এভাবে কেঁদে কেটে সময় কাটাচ্ছেন কেন?" তিনি এবার বুঝে নেন যে, এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাঁকে সতর্ক করা হয়েছে। অতঃপর তাঁকে বলা হয়ঃ "তুমি অমুক নদীতে গিয়ে গোসল কর এবং দু'রাকআত সালাত আদায় কর। সেখানে তুমি একজন লোককে দেখতে পাবে। সে তোমাকে যা কিছু খেতে দেবে তা তুমি খেয়ে নিবে।"

কথামত উযায়ের (আঃ) সেখানে গমন করেন। গোসল করে তিনি সালাত আদায় করেন। অতঃপর তিনি সেখানে একটি লোককে দেখতে পান। লোকটি তাঁকে বলেনঃ "মুখ খুলুন!" তিনি মুখ খুলে দেন। তখন লোকটি পাথরের মত কি একটি জিনিস তিন বার তাঁর মুখে নিক্ষেপ করেন। তৎক্ষণাৎ আল্লাহ তা'আলা তাঁর বক্ষ খুলে দেন। ফলে তিনি তাওরাতের সবচেয়ে বড় আলেম হয়ে যান। তারপর তিনি বানী ইসরাঈলের কাছে গিয়ে বলেনঃ "আমি তোমাদের কাছে তাওরাত নিয়ে এসেছি।" তারা তাঁকে বলেঃ "হে উযায়ের (আঃ)! আপনি মিথ্যাবাদী ছিলেন না।" এরপর তিনি অঙ্গুলির সাথে কলমকে জড়িয়ে ধরেন এবং ঐ অঙ্গুলি দ্বারাই একই সময় সম্পূর্ণ তাওরাত লিখে ফেলেন। এদিকে লোকেরা যুদ্ধ হতে ফিরে আসে। তাদের সাথে তাদের আলেমগণও ফিরে আসেন। তাঁরা উযায়ের (আঃ)-এর ব্যাপারটা জানতে পারেন। সুতরাং তাঁরা পাহাড়ে ও গুহার মধ্যে তাওরাতের যে পুস্তিকাগুলো লুকিয়ে রেখে এসেছিলেন সেগুলো বের করে আনেন। ঐ পুস্তিকাগুলোর সাথে উযায়ের (আঃ)-এর লিখিত পুস্তিকাগুলো তাঁরা মিলিয়ে দেখেন। দেখা যায় যে, ওগুলোর সাথে তাঁর 'নুসখা' সম্পূর্ণরূপে মিলে

গেছে। এতে কোন কোন অজ্ঞ লোকের অন্তরে এই শয়তানী 'ওসওয়াসা' পয়দা হয়ে যায় যে, তিনি আল্লাহর পুত্র। (নাঊযুবিল্লাহি মিন যালিক)।

খ্রীষ্টানরা ঈসা (আঃ)-কে আল্লাহর পুত্র বলতো (আমরা এর থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি)। তাঁর ঘটনা তো সর্বজন বিদিত। সুতরাং এ দু'টি দলের ভুল বর্ণনা কুরআন কারীমে বর্ণিত হচ্ছে। আল্লাহ পাক বলেন, এটা তাদের মুখের কথা মাত্র। তাদের কাছে এর কোন দলীল নেই। ইতিপূর্বে তাদের পূর্ববর্তী লোকেরা যেমন কুফরী ও বিভ্রান্তির মধ্যে নিমজ্জিত ছিল, তদ্রূপ এরাও তাদের মুরীদ ও অন্ধ বিশ্বাসী। আল্লাহ তাদের প্রতি অভিসম্পাত বর্ষণ করুন! হক থেকে তারা কেমন বিভ্রান্ত হচ্ছে!

আদী ইবনে হাতিম (রাঃ)-এর কাছে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর দ্বীন যখন পৌঁছে তখন তিনি সিরিয়ার দিকে পালিয়ে যান। অজ্ঞতার যুগেই তিনি খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। এখানে তাঁর ভগ্নি ও তাঁর দলের লোকেরা বন্দী হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ (সঃ) দয়া পরবশ হয়ে তাঁর ভগ্নিকে মুক্তি দেন এবং তাকে কিছু অর্থও প্রদান করেন। সে তখন সরাসরি তার ভাই-এর কাছে চলে যায় এবং তাঁকে ইসলাম গ্রহণে উৎসাহিত করে ও মদীনায় গমনের অনুরোধ করে। সুতরাং আদী (রাঃ) মদীনায় চলে আসেন। তিনি তাঁর 'তাঈ' গোত্রের নেতা ছিলেন। তাঁর পিতার দানশীলতা দুনিয়াব্যাপী প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। জনগণ রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে তাঁর আগমনের সংবাদ অবহিত করেন। তিনি স্বয়ং তাঁর কাছে আসেন। ঐ সময় আদী (রাঃ)-এর স্কন্ধে রৌপ্য নির্মিত ক্রুশ লটকানো ছিল। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর পবিত্র মুখে اِتَّخَذُوْا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ-এ আয়াতটি উচ্চারিত হচ্ছিল। তখন আদী (রাঃ) বলেনঃ "ইয়াহূদী খ্রীষ্টানরা তো তাদের আলেম ও দরবেশদের উপাসনা করেনি।" রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন বলেনঃ "তাহলে শুন! তারা তাদের আলেম ও দরবেশদের হারামকৃত বিষয়কে হারাম বলে মেনে নেয় এবং হালালকৃত বিষয়কে হালাল বলে স্বীকার করে নেয়। এটাই তাদেরকে তাদের উপাসনা করার শামিল।" অতঃপর তিনি বলেনঃ "হে আদী! আল্লাহ সবচেয়ে বড় এটা কি তুমি মেনে নিতে পার না? তোমার ধারণায় আল্লাহর চেয়ে বড় কেউ আছে কি? 'আল্লাহ ছাড়া উপাসনার যোগ্য আর কেউ নেই' এটা কি তুমি অস্বীকার করছো? তোমার মতে কি তিনি ছাড়া অন্য কেউ ইবাদতের যোগ্য আছে?" অতঃপর তিনি তাঁকে ইসলামের দাওয়াত দেন। আদী (রাঃ) তা কবূল করে নেন এবং আল্লাহর একত্ববাদ ও রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর রিসালাতের সাক্ষ্য প্রদান করেন। এ দেখে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর চেহারা মুবারক খুশীতে উজ্জ্বল হয়ে

ওঠে। তিনি বলেনঃ "ইয়াহূদীদের উপর আল্লাহর ক্রোধ পতিত হয়েছে এবং খ্রীষ্টানরা পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে।"[১]

হুযাইফা ইবনে ইয়ামান (রাঃ) এবং আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতেও এ আয়াতের তাফসীর এরূপই বর্ণিত আছে যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে হারাম ও হালালের মাসআলায় আলেম ও ইমামদের কথার প্রতি তাদের অন্ধ অনুকরণ। সুদ্দী (রঃ) বলেন যে, তারা তাদের বুযুর্গদের কথা মানতে শুরু করে এবং আল্লাহর কিতাবকে এক দিকে সরিয়ে দেয়। এ জন্যেই আল্লাহ পাক বলেন, তাদেরকে তো শুধু এ নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যে, তারা আল্লাহ ছাড়া আর কারো ইবাদত করবে না। তিনি যেটা হারাম করেছেন সেটাই হারাম এবং তিনি যেটা হালাল করেছেন সেটাই হালাল। তাঁর ফরমানই হচ্ছে শরীয়ত। তাঁর হুকুমই মান্য করার যোগ্য। তাঁরই সত্তা ইবাদতের দাবীদার। তিনি শির্ক ও শরীক হতে পবিত্র। তাঁর কোন শরীক, কোন নযীর ও কোন সাহায্যকারী নেই। তাঁর বিপরীতও কেউ নেই। তিনি সন্তান-সন্ততি থেকে পবিত্র। তিনি ছাড়া না আছে কোন উপাস্য, না আছে কোন প্রতিপালক।

৩২- يُرِيدُونَ أَن يُطْفِـُٔوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ○

৩২। তারা এরূপ চাচ্ছে যে, আল্লাহর নূরকে নিজেদের মুখের ফুৎকার দ্বারা নির্বাপিত করে দেয়, অথচ আল্লাহ স্বীয় নূর (দ্বীন-ইসলাম) কে পূর্ণত্বে পৌঁছানো ব্যতীত নিরস্ত হবেন না, যদিও কাফিররা অপ্রীতিকরই মনে করে।

৩৩- هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ○

৩৩। সেই আল্লাহ এমন যে, তিনি নিজ রাসূলকে হিদায়াত (কুরআন) এবং সত্য ধর্ম সহকারে প্রেরণ করেছেন, যেন ওকে সকল ধর্মের উপর প্রবল করে দেন, যদিও মুশ্রিকরা অপ্রীতিকর মনে করে।

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ), ইমাম তিরমিযী (রঃ) এবং ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, সর্ব শ্রেণীর কাফিরদের মনের ইচ্ছা এটাই যে, তারা আল্লাহর নূরকে নিভিয়ে দিবে এবং তাঁর হিদায়াত ও সত্য দ্বীনকে দুনিয়ার বুক থেকে মুছে ফেলবে। তাহলে তাদের চিন্তা করে দেখা উচিত যে, যদি কেউ তার মুখের ফুৎকার দ্বারা সূর্যের বা চন্দ্রের রশ্মিকে নিভিয়ে দেয়ার ইচ্ছা করে তবে তা কখনো সম্ভব হবে কি? কখনই না। অনুরূপভাবে এ লোকগুলোও আল্লাহর নূরকে নিভিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে। কিন্তু শেষে অপারগ হয়ে গেছে। এটা অবশ্যম্ভাবী বিষয় এবং আল্লাহর ফায়সালা যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে যে সত্য দ্বীনসহ প্রেরণ করা হয়েছে তা সদা বিজয়ী থাকবেই। হে কাফির ও মুশরিকের দল! তোমরা আল্লাহর দ্বীনকে মিটিয়ে দিতে চাচ্ছ, কিন্তু আল্লাহ চাচ্ছেন তা উন্নত রাখতে। আর স্পষ্ট কথা যে, আল্লাহর ইচ্ছা তোমাদের ইচ্ছার উপর নিঃসন্দেহে বিজয়ী থাকবে। যদিও তোমাদের কাছে অপ্রীতিকর হয় তবুও কিন্তু হিদায়াতের সূর্য মধ্য গগণে পৌঁছে যাবেই।

আরবী অভিধানে কোন জিনিস গোপনকারীকে কাফির বলা হয়। এ কারণেই রাত্রি সব জিনিসকে গোপন করে দেয় বলে ওকেই কাফির বলা হয়। কৃষককেও কাফির বলা হয়ে থাকে, কেননা সে শস্য-বীজকে মাটির মধ্যে গোপন করে দেয়। যেমন কুরআন কারীমে أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ (৫৭ঃ ২০) বলা হয়েছে।

ঐ আল্লাহ তা'আলাই স্বীয় রাসূল (সঃ)-কে হিদায়াত ও দ্বীনে হকসহ পাঠিয়েছেন। সুতরাং রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সত্য সংবাদ, সঠিক ঈমান এবং উপকারী ইল্মই হচ্ছে হিদায়াত। আর উত্তম কার্যাবলী, যেগুলো দুনিয়া ও আখিরাতে ফায়দা দেয় সেটাই হচ্ছে দ্বীনে-হক। এটা দুনিয়ার সমুদয় দ্বীনের উপর বিজয়ীরূপে থাকবে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ “আমার জন্যে ভূ-পৃষ্ঠের পূর্ব ও পশ্চিম দিককে জড়িয়ে দেয়া হয়েছে। আমার উম্মতের রাজ্য এই সমুদয় স্থান পর্যন্ত পৌঁছে যাবে।” নবী (সঃ) বলেছেনঃ “তোমাদের হাতে পূর্ব ও পশ্চিম বিজিত হবে। তোমাদের নেতারা জাহান্নামী হবে, তারা ব্যতীত যারা পরহেজগার হবে এবং আমানতদাতার কাছে আমানত পৌঁছিয়ে দেবে।” তামীমুদদারী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছি– “অবশ্যই এই দ্বীন ঐ সব জায়গায় পৌঁছবে যেখানে রাত ও দিন পৌঁছে থাকে। এমন কোন কাঁচা ঘর ও পাকা ঘর বাকী থাকবে না যেখানে মহা মহিমান্বিত আল্লাহ ইসলামকে পৌঁছাবেন না। আল্লাহ তা'আলা সম্মানিতদেরকে সম্মান দেবেন এবং লাঞ্ছিতদেরকে লাঞ্ছিত করবেন। যারা ইসলামের মর্যাদা দেয় তারা সম্মান পাবে

এবং কাফিররা লাঞ্ছিত হবে।” তামীমুদদারী (রাঃ) বলেনঃ “এটা তো আমি স্বয়ং আমার বাড়ীতেই দেখতে পেয়েছি। যে মুসলিম হয়েছে সে কল্যাণ ও বরকত এবং সম্মান ও মর্যাদা লাভ করেছে, আর যে কাফির হয়েছে সে লাভ করেছে ঘৃণা ও অভিসম্পাত। তাদেরকে অপমানের সাথে জিযিয়া প্রদান করতে হয়েছে।”

মিকদাদ ইবনে আসওয়াদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছি– “ভূ-পৃষ্ঠে এমন কোন কাঁচা ও পাকা ঘর বাকী থাকবে না যেখানে আল্লাহ তা'আলা ইসলামের কালেমাকে প্রবিষ্ট করবেন না। তিনি মর্যাদাবানদেরকে মর্যাদা দিবেন এবং লাঞ্ছিতদেরকে লাঞ্ছিত করবেন। যাদেরকে তিনি মর্যাদা দানের ইচ্ছা করবেন তাদেরকে তিনি ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য দান করবেন। আর যাদেরকে তিনি লাঞ্ছিত করতে চাইবেন তারা তা মানবে না, কিন্তু তাদেরকে ঐ মুসলিমদের অধীনস্থ হয়ে থাকতে হবে।” আদী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমার নিকট আগমন করে আমাকে বলেনঃ “তুমি ইসলাম কবূল কর, তাহলে নিরাপত্তা লাভ করবে।” আমি বললাম, আমি তো একটা দ্বীন মেনে চলছি। তিনি বললেনঃ “তোমার দ্বীন সম্পর্কে তোমার চেয়ে আমারই জ্ঞান বেশী আছে।” আমি বললাম, সত্যই কি? তিনি উত্তরে বললেনঃ “সম্পূর্ণরূপে সত্য। তুমি কি রাকূসিয়া'র অন্তর্ভুক্ত নও? তুমি কি তোমার কওমের নিকট থেকে ট্যাক্স আদায় কর না?” আমি জবাব দিলাম, হ্যাঁ, এ কথা সত্য বটে। তিনি বললেনঃ “তোমার ধর্মে এটা তোমার জন্যে হালাল নয়।” তাঁর এ কথা শুনামাত্রই আমি তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে গেলাম। অতঃপর তিনি আমাকে বললেনঃ “তোমাকে ইসলাম গ্রহণে কিসে বাধা দিচ্ছে তা আমি বেশ ভাল রূপেই জানি। দেখো, তুমি শুধু এ কারণেই বাধা প্রাপ্ত হচ্ছো যে, মুসলিমরা খুবই দুর্বল ও শক্তিহীন। সারা আরববাসী তাদেরকে ঘিরে রয়েছে। কিন্তু বলতো তুমি হীরা (রাজ্য) চেনো কি?” আমি উত্তরে বললাম, আমি হীরা (রাজ্য) কোন দিন দেখিনি বটে, তবে শুনেছি নিশ্চয়ই। তিনি তখন বললেনঃ “যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! আল্লাহ তা'আলা এই দ্বীনকে পূর্ণ করবেন। এমন কি একজন পর্দানাশীল নারী উষ্ট্রীর উপর আরোহণ করে হীরা হতে যাত্রা শুরু করবে এবং কারো আশ্রয় ছাড়াই নিরাপদে মক্কা পৌঁছে যাবে ও বায়তুল্লাহ শরীফের তাওয়াফ করবে। আল্লাহর কসম! তোমরা কিসরার (পারস্য সম্রাট) কোষাগারগুলো জয় করে নিবে।” আমি জিজ্ঞেস করলাম, কিসরা ইবনে হরমূযের (কোষাগার)? তিনি উত্তরে বললেনঃ “হ্যাঁ, হ্যাঁ, কিসরা ইবনে হরমূযের (কোষাগার)। তোমাদের কাছে ধন-সম্পদের এতো প্রাচুর্য হবে যে, তা গ্রহণ

করার লোক পাওয়া যাবে না।” এ হাদীসটি বর্ণনা করার সময় আদী (রাঃ) বলেনঃ “রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ঐ ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়ে গেছে। দেখো, আজ হীরা সাম্রাজ্য হতে উষ্ট্রারোহীরা নির্ভয়ে ও কারো আশ্রয় ছাড়াই নিরাপদে মক্কায় পৌঁছে বায়তুল্লাহ শরীফের তাওয়াফ করছে। সত্যবাদী ও সত্যায়িত নবী (সঃ)-এর দ্বিতীয় ভবিষ্যদ্বাণীও সত্যে পরিণত হয়েছে। কিসরার কোষাগার বিজিত হয়েছে। আমি স্বয়ং ঐ সেনাবাহিনীতে ছিলাম যারা ইরানের ইট দ্বারা ইট বাজিয়েছে, অট্টালিকাগুলো মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়েছে এবং কিসরার গুপ্ত কোষাগার দখল করে নিয়েছে। আল্লাহর শপথ! আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, সত্যবাদী ও সত্যায়িত রাসূল (সঃ)-এর তৃতীয় ভবিষ্যৎদ্বাণীও সত্যে পরিণত হবে।”

আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “দিন ও রাত্রির গমনাগমন অব্যাহত থাকবে যে পর্যন্ত না পুনরায় ‘লাত’ ও ‘উযযা’র ইবাদত শুরু হবে।” আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ) هُوَ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ ....-এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত আমার ধারণা তো এই রয়েছে যে, এটা পূর্ণ কথা।” তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ “হ্যাঁ, এটা পূর্ণ হয়ে গেছে এবং যতদিন পর্যন্ত আল্লাহ তা‘আলার ইচ্ছা হবে তা পূর্ণই থাকবে। অতঃপর তিনি একটা পবিত্র বায়ু প্রেরণ করবেন, যার ফলে যে ব্যক্তির অন্তরে এক সরিষার দানা পরিমাণও ঈমান থাকবে তার প্রাণবায়ু নির্গত হয়ে যাবে। তারপর শুধুমাত্র ঐ লোকগুলোই অবশিষ্ট থাকবে যাদের মধ্যে কোন পুণ্য ও কল্যাণ নিহিত থাকবে না। সুতরাং তারা তাদের বাপ দাদাদের ধর্মের দিকে ফিরে যাবে।”[১]

৩৪। হে মুমিনগণ! অধিকাংশ আহবার এবং রুহবান (ইয়াহূদী ও খ্রীষ্টানদের আলেম ও ধর্মযাজক) মানুষের ধন-সম্পদ শরীয়ত বিরুদ্ধ উপায়ে ভক্ষণ করে এবং আল্লাহর পথ হতে বিরত রাখে, আর যারা (অতি লোভের বশবর্তী হয়ে) স্বর্ণ ও রৌপ্য

٣٤- يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْاَحْبَارِ وَ الرُّهْبَانِ لَيَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَ يَصُدُّوْنَ عَنْ

১. এ হাদীসটি ইমাম মুসলিম (রঃ) তাঁর সহীহ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

سَبِيْلِ اللّٰهِ ۙ وَ الَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۙ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ۙ

জমা করে রাখে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না, (হে মুহাম্মাদ!) তুমি তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক এক শাস্তির সুসংবাদ শুনিয়ে দাও।

٣٥- يَّوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَ جُنُوْبُهُمْ وَ ظُهُوْرُهُمْ ؕ هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ ○

৩৫। যা সেদিন ঘটবে, যে দিন জাহান্নামের আগুনে ঐগুলোকে উত্তপ্ত করা হবে, অতঃপর ওগুলো দ্বারা তাদের ললাটসমূহে, পার্শ্বদেশসমূহে এবং পৃষ্ঠদেশসমূহে দাগ দেয়া হবে, (আর বলা হবে) এটা হচ্ছে ওটাই যা তোমরা নিজেদের জন্যে সঞ্চয় করে রেখেছিলে, সুতরাং এখন নিজেদের সঞ্চয়ের স্বাদ গ্রহণ কর।

সুদ্দী (রঃ) বলেন যে, ইয়াহূদী আলেমদেরকে আহবার এবং খ্রীষ্টান আবেদদেরকে রুহবান বলা হয়। لَوْ لَا يَنْهٰهُمُ الرَّبّٰنِيُّوْنَ وَ الْاَحْبَارُ (৫ঃ ৬৩) এই আয়াতে ইয়াহূদী আলেমদেরকে 'আহবার' আর কুরআন কারীমের ذٰلِكَ بِاَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيْسِيْنَ وَ رُهْبَانًا (৫ঃ ৮২) এই আয়াতে খ্রীষ্টানদের আবেদদেরকে 'রুহবান' এবং তাদের আলেমদেরকে 'কিস্সীস' বলা হয়েছে। উপরোক্ত আয়াতের উদ্দেশ্য হচ্ছে জনগণকে পথভ্রষ্ট দরবেশ ও সুফীদের থেকে সতর্ক ও ভয় প্রদর্শন করা। সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা (রঃ) বলেন যে, আমাদের আলেমদের মধ্যে যারা ফাসাদ সৃষ্টি করে তাদের ইয়াহূদীদের সাথে কিছু না কিছু সাদৃশ্য রয়েছে। আর আমাদের সুফী ও দরবেশদের মধ্যে যারা অনৈক্য সৃষ্টি করে তাদের খ্রীষ্টানদের সাথে সাদৃশ্য রয়েছে। সহীহ হাদীসে রয়েছে– "নিশ্চিতরূপে তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তীদের গতির উপর চলবে। তাদের সাথে তোমাদের চলনগতি এমন সাদৃশ্যযুক্ত হবে যে, মোটেই পার্থক্য থাকবে না।" জনগণ জিজ্ঞেস করলেনঃ "ইয়াহূদী ও খ্রীষ্টানদের গতির উপর কি?" রাসূলুল্লাহ (সঃ) উত্তরে বললেনঃ "হ্যাঁ,

তাদেরই চলন গতির উপর।” অন্য বর্ণনায় আছে যে, জনগণ জিজ্ঞেস করেনঃ “পারসিক ও রোমকদের গতির উপর কি?” উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ “এরা ছাড়া আর কে হবে?” সুতরাং তাদের কথা ও কাজের সাথে সাদৃশ্য হওয়া থেকে বেঁচে থাকা অপরিহার্য কর্তব্য। তাদের এসবের উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের মধ্যে বড় বড় পদ লাভ করা ও প্রভাব বিস্তার করা। আর এর মাধ্যমে তারা চায় জনগণের মাল আত্মসাৎ করতে। অজ্ঞতার যুগে ইয়াহূদী আলেমদের জনগণের মধ্যে খুবই মর্যাদা ছিল। তাদের জন্যে উপঢৌকন এবং ফকির দরবেশদের মাযারে বাতি জ্বালাবার উদ্দেশ্যে দান নির্দিষ্ট ছিল। এগুলো তাদেরকে চাইতে হতো না, বরং জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাদের কাছে ওগুলো পৌঁছিয়ে দিতো। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নবুওয়াতের পর এ লালসাই তাদেরকে ইসলাম গ্রহণ থেকে বিরত রেখেছিল। কিন্তু সত্যের মুকাবিলা করার কারণে ওদিক থেকেও তারা আনকোরা থেকে যায় এবং আখিরাতের সুখ থেকেও বঞ্চিত রয়ে যায়। তারা আল্লাহর গজবে পতিত হয়েছে। দুনিয়ায় তারা লাঞ্ছিত ও ঘৃণিত হয়েছে এবং পরকালেও তারা কঠিন শাস্তি ভোগ করবে। হারাম ভক্ষণকারী এই দলটি নিজেরা হক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে অন্যদেরকেও ফিরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করতো। সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করে দিয়ে জনগণকেও তারা সত্যের পথ থেকে বিরত রাখতো। মূর্খদের মধ্যে বসে চড়া গলায় তারা বলতোঃ “জনগণকে আমরা সত্যের পথে আহ্বান করছি।” অথচ এটা স্পষ্ট প্রতারণা মাত্র। তারা তো লোকদেরকে জাহান্নামের দিকে ডাকতে রয়েছে। কিয়ামতের দিন এদেরকে এমন অবস্থায় ছেড়ে দেয়া হবে যে তাদের কোন বন্ধু ও সহায়ক থাকবে না।

আলেম ও সুফী-দরবেশ অর্থাৎ বক্তা ও আবেদদের বর্ণনা দেয়ার পর এখন আমীর, সম্পদশালী এবং নেতাদের অবস্থা বর্ণনা করা হচ্ছে যে, যেমন এই দুই শ্রেণীর লোকদের মধ্যে হীন প্রবৃত্তির লোক রয়েছে, তদ্রূপ এই তৃতীয় শ্রেণীর লোকদের মধ্যেও হীন ও সংকীর্ণমনা লোক রয়েছে। সাধারণতঃ মানুষের মধ্যে এই তিন শ্রেণীর লোকদের বিশেষ প্রভাব পড়ে থাকে। বহু সংখ্যক লোক তাদের অনুসারী হয়। সুতরাং যখন এই তিন শ্রেণীর লোকের অবস্থা বিগড়ে যাবে তখন সাধারণ মানুষের অবস্থাও বিগড়ে যাবে। যেমন ইবনুল মুবারক (রঃ) বলেনঃ

وَهَلْ أَفْسَدَ الدِّيْنَ إِلَّا الْمُلُوكُ * وَأَحْبَارُ سُوْءٍ وَرُهْبَانُهَا

অর্থাৎ “দ্বীনকে বিগড়িয়ে থাকে বাদশাহগণ এবং নিকৃষ্ট ও হীন প্রকৃতির আলেম, সুফী ও দরবেশগণ।”

শরীয়তের পরিভাষায় كَنْز ঐ মালকে বলা হয় যে মালের যাকাত আদায় করা হয় না। ইবনে উমার (রাঃ) হতে এটাই বর্ণিত আছে। তিনি বলেন যে, যে মালের যাকাত দেয়া হয় তা যদি সপ্তম যমীনের নীচেও থাকে তবুও তা كَنْز নয়। আর যে মালের যাকাত দেয়া হয় না সেই মাল যমীনের উপর প্রকাশ্যভাবে ছড়িয়ে থাকলেও তা كَنْز-এর অন্তর্ভুক্ত হবে।[১] উমার ইবনে খাত্তাব (রাঃ)-ও এ কথাই বলেন এবং তিনি বলেন যে, যে মালের যাকাত আদায় করা হয় না ঐ মাল দ্বারা মালদারকে দাগ দেয়া হবে। তাঁর ছেলে আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, এ হুকুম যাকাত ফরয হওয়ার পূর্বে ছিল। যাকাতের হুকুম অবতীর্ণ করে আল্লাহ তা'আলা ওটাকে মাল পবিত্রকারী বানিয়ে দিয়েছেন। ন্যায়পরায়ণ খলীফা উমার ইবনে আবদিল আযীয (রঃ) এবং ইরাক ইবনে মালিক (রঃ)-ও এ কথাই বলেছেন, ... خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ (৯ঃ ১০৩) আল্লাহ পাকের এ উক্তি দ্বারা এটাকে মানসূখ বা রহিত করে দেয়া হয়েছে। আবূ উমামা (রাঃ) বলেন যে, তরবারীর যেওরও كَنْز -এর অন্তর্ভুক্ত। তিনি বলেনঃ "জেনে রেখো যে, আমি তোমাদেরকে ঐ কথাই শুনাচ্ছি যা আমি আল্লাহর রাসূল (সঃ)-এর মুখে শুনেছি।" আলী (রাঃ) বলেন যে, চার হাজার এবং তদপেক্ষা কম হচ্ছে 'নাফকাহ', আর এর অধিক হলেই ওটা হবে 'কানয্।' কিন্তু এ উক্তিটি গারীব বা দুর্বল। মালের আধিক্যের নিন্দা এবং স্বল্পতার প্রশংসায় বহু হাদীস এসেছে। নমুনা হিসেবে আমরাও এখানে ওগুলোর মধ্য থেকে কয়েকটি হাদীস নকল করছি।

মুসনাদে আবদির রাযযাকে আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ-এ আয়াতকে কেন্দ্র করে নবী (সঃ) বলেনঃ "সোনা ও চাঁদির (মালিকের) জন্যে ধ্বংস (অনিবার্য)।" এ কথা তিনি তিনবার বলেন। এটা সাহাবীদের কাছে খুবই কঠিন ঠেকে। তাই তাঁরা প্রশ্ন করেনঃ "তাহলে আমরা কোন মাল রাখবো?" তখন উমার (রাঃ) তাঁদেরকে বলেনঃ "আচ্ছা, আমি এটা তোমাদের জন্যে জেনে নেবো।" অতঃপর তিনি বলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আপনার এ কথাটি আপনার সাহাবীদের কাছে খুবই কঠিন বোধ হয়েছে এবং তাঁরা কি মাল রাখবেন তা জানতে চেয়েছেন।" রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন বললেনঃ "(তারা রাখবে), যিকিরকারী জিহ্বা, শোকরকারী অন্তর এবং দ্বীনের কাজে সাহায্যকারিণী স্ত্রী।"

১. অনুরূপ বর্ণনা ইবনে আব্বাস (রাঃ), জাবির (রাঃ), আবূ হুরাইরা (রাঃ) প্রমুখ হতেও বর্ণিত হয়েছে।

মুসনাদে আহমাদে রয়েছে যে, স্বর্ণ ও রৌপ্যের নিন্দায় যখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং সাহাবীগণ এ নিয়ে পরস্পর আলোচনা করেন তখন উমার (রাঃ) বলেনঃ "আচ্ছা, এটা আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছি।" অতঃপর তিনি স্বীয় সওয়ারীর গতি দ্রুত করে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন। অন্য একটি বর্ণনায় আছে যে, সোনা ও চাঁদির নিন্দায় এ আয়াত অবতীর্ণ হলে সাহাবীগণ বলেনঃ "তাহলে আমরা আমাদের সন্তানদের জন্যে ছেড়ে যাবো কি?" এতে রয়েছে যে, উমার (রাঃ)-এর সাথে সাওবানও (রাঃ) ছিলেন। উমার (রাঃ) নবী (সঃ)-কে বলেনঃ "হে আল্লাহর নবী (সঃ)! এ আয়াতটি আপনার সাহাবীদের কাছে কঠিন বোধ হয়েছে।" তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "তোমাদের বাকী মালকে পবিত্র করার জন্যেই আল্লাহ তা'আলা যাকাত ফরয করেছেন এবং তোমাদের (মৃত্যুর) পরে যে মাল থাকবে তার উপর তিনি মীরাস নির্ধারণ করে দিয়েছেন।" এ কথা শুনে উমার (রাঃ) খুশীতে তাকবীর পাঠ করেন। এরপর রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "আমি কি তোমাকে মানুষের সর্বোত্তম সঞ্চিত ধনের সংবাদ দেবো না? তা হচ্ছে সতী-সাধ্বী নারী। যখন তার স্বামী তার দিকে প্রেমের দৃষ্টিতে তাকায় আর তখন সে তাকে (স্বামীকে) সন্তুষ্ট করে, যখন তাকে কোন হুকুম করে তখন সে তৎক্ষণাৎ তা পালন করে এবং যখন সে (স্বামী) অনুপস্থিত থাকে তখন সে তার (সবকিছু) হিফাযত করে।"[১]

মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত আছে যে, হাস্সান ইবনে আতিয়া (রাঃ) বলেন, শাদ্দাদ ইবনে আউস (রাঃ) এক সফরে ছিলেন। এক মন্জিলে অবতরণ করে তিনি স্বীয় গোলামকে বলেনঃ "ছুরি নিয়ে এসো, আমরা খেলা করবো।" এ কথা আমার কাছে খারাপ বোধ হলো। অতঃপর তিনি দুঃখ প্রকাশ করে বললেন, ইসলাম গ্রহণের পর এমন অসতর্ক কথা আমি আর কখনো বলিনি। আপনি এটা ভুলে যান। আমি একটি হাদীস বর্ণনা করছি তা স্মরণ রাখুন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "যখন জনগণ সোনা-রূপা জমা করতে শুরু করে দেবে তখন তোমরা নিম্নের কালেমাগুলো খুব বেশী বেশী করে পাঠ করবেঃ

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) ও ইমাম আবূ দাউদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম হাকিম (রঃ) তাঁর মুসতাদরিক গ্রন্থে এটা রিওয়ায়াত করেছেন এবং তিনি বলেছেন যে, এটা ইমাম বুখারী (রঃ) ও ইমাম মুসলিম (রঃ)-এর শর্তের উপর সহীহ্, তাঁরা দু'জন এটা তাখরীজ করেননি।

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ الثَّبَاتَ فِی الْاَمْرِ وَ الْعَزِیْمَةَ عَلَی الرُّشْدِ وَ اَسْئَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ وَ اَسْئَلُكَ حُسْنَ عِبَادَتِكَ وَ اَسْئَلُكَ قَلْبًا سَلِیْمًا وَ اَسْئَلُكَ لِسَانًا صَادِقًا وَ اَسْئَلُكَ مِنْ خَیْرِ مَا تَعْلَمُ وَ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ وَ اَسْتَغْفِرُكَ مِمَّا تَعْلَمُ اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوْبِ -

অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট কাজে অটলতা ও সৎ কাজের উপর দৃঢ়তা প্রার্থনা করছি। আর প্রার্থনা করছি আপনার নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ও আপনার উত্তম ইবাদতের। আপনার নিকট প্রার্থনা করছি সুষ্ঠু অন্তরের ও সত্যবাদী জিহ্বার। আর আমি আপনার কাছে ঐ মঙ্গল যাঞ্ছা করছি যা আপনি মঙ্গলরূপে জানেন এবং ঐ দোষ ও অন্যায় হতে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি যা আপনি দোষ বলে জানেন। আর যে পাপগুলোকে আপনি জানেন সেগুলো থেকে আমি আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি, নিশ্চয়ই আপনি অদৃশ্য বিষয়গুলো ভালরূপে অবগত আছেন।"

আয়াতে বলা হয়েছে যে, যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য জমা করে রাখে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না তাদেরকে যেন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ শুনিয়ে দেয়া হয়। কিয়ামতের দিন ঐ মালকেই আগুনের মত অত্যধিক গরম করা হবে এবং তা দ্বারা তাদের কপালে, পার্শ্বদেশে এবং পৃষ্ঠদেশে দাগ দেয়া হবে। অতঃপর তাদেরকে ধমকের সুরে বলা হবে– আজকে তোমাদের সঞ্চিত মালের স্বাদ গ্রহণ কর। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে– "(ফেরেশতাদেরকে বলা হবে) তোমরা তার (জাহান্নামীর) মাথায় গরম পানি ঢেলে দাও এবং (তাকে বল) শাস্তির স্বাদ গ্রহণ কর। তুমি নিজেকে বড়ই মর্যাদাবান ও বুযুর্গ মনে করতে!" এর দ্বারা এটা প্রমাণিত হলো যে, যে ব্যক্তি যে জিনিসকে ভালবেসে আল্লাহর আনুগত্যের উপর ওকে প্রাধান্য দেবে, ওর দ্বারাই তাকে শাস্তি দেয়া হবে। ঐ মালদারেরা মালের মহব্বতে আল্লাহর ফরমান ভুলে গিয়েছিল। তাই আজ ঐ মাল দ্বারাই তাদেরকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে। যেমন আবূ লাহাব খোলাখুলিভাবে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে শত্রুতা করতো এবং তার স্ত্রী তার সাহায্য করতো। কিয়ামতের দিন আগুনকে আরো প্রজ্বলিত করার জন্যে সে তার গলায় রশি লটকিয়ে দিয়ে কাঠ এনে এনে ঐ আগুনকে প্রজ্বলিত করবে এবং ঐ আগুনে তারা জ্বলতে থাকবে। এই মাল, যা এখানে সবচেয়ে বেশী প্রিয়, এটাই কিয়ামতের দিন সবচেয়ে বেশী ক্ষতিকারক প্রমাণিত হবে। ওটাকেই গরম করে ওর দ্বারা দাগ দেয়া হবে।

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বলেন যে, এরূপ মালদারদের দেহ এতো লম্বা-চওড়া করে দেয়া হবে যে, এক একটি দীনার ও দিরহাম ওর উপর এসে যাবে, অতঃপর সমস্ত মাল আগুনের মত করে দিয়ে পৃথক পৃথকভাবে সারা দেহে ছড়িয়ে দেয়া হবে। এটা নয় যে, একটার পর একটা দাগ পড়বে, বরং একই সাথে সমস্ত দাগ পড়বে। মারফূ' রূপেই এ রিওয়ায়াত এসেছে বটে, কিন্তু এর সনদ সঠিক নয়। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক জ্ঞানের অধিকারী।

তাঊস (রঃ) বলেন যে, কিয়ামতের দিন সঞ্চিত মাল একটা বিরাট অজগর হয়ে মালদারের পিছনে ধাবিত হবে আর সে ওর থেকে পালাতে থাকবে। ঐ সময় সাপটি তার পিছনে ছুটবে ও বলতে থাকবেঃ "আমি তোমার সঞ্চিত ধন।" অতঃপর সাপটি তার যে অঙ্গকেই পাবে ওটাকেই কামড়িয়ে ধরবে।

মুসনাদে আহমাদে সাওবান (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলতেন, যে ব্যক্তি তার পিছনে সঞ্চিত ধন ছেড়ে যাবে, কিয়ামতের দিন তার ঐ ধন বিষাক্ত অজগর সাপের রূপ ধারণ করবে, যার চক্ষুদ্বয়ের উপর দু'টি বিন্দু থাকবে। সাপটি মালদারের পিছনে ছুটবে। লোকটি তখন পালাতে পালাতে বলবেঃ "তোমার অমঙ্গল হোক! তুমি কে?" সাপটি উত্তরে বলবেঃ "আমি তোমার জমাকৃত মাল, যা তুমি তোমার পিছনে ছেড়ে এসেছিলে।" শেষ পর্যন্ত সাপটি তাকে ধরে ফেলবে এবং তার হাত চিবাতে থাকবে, এরপর তার সারা দেহকেও চিবাবে।

সহীহ মুসলিমে আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি তার মালের যাকাত আদায় করবে না, কিয়ামতের দিন তার মালকে আগুনের তক্তা বানানো হবে এবং তা দ্বারা তার পার্শ্বদেশে, কপালে ও পিঠে দাগ দেয়া হবে। পঞ্চাশ হাজার বছর ধরে লোকদের ফায়সালা না হওয়া পর্যন্ত তার এ অবস্থা থাকবে। অতঃপর তাকে তার মনযিলের পথ দেখানো হবে, হয় জাহান্নামের পথ না হয় জান্নাতের পথ।" তাতে সম্পূর্ণ হাদীসটি বর্ণনা করা হয়েছে।

ইমাম বুখারী (রঃ) এই আয়াতেরই তাফসীরে বলেন যে, যায়েদ ইবনে অহাব (রাঃ) রাবযায় আবূ যার (রাঃ) -এর সাথে মিলিত হন এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করেনঃ "এখানে আপনি কিরূপে এলেন?" তিনি উত্তরে বলেনঃ "আমি সিরিয়ায় অবস্থান করছিলাম। সেখানে আমি وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ .... -- আয়াতটি পাঠ করি। তখন মুআ'বিয়া (রাঃ) বলেনঃ "এ আয়াত আমাদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়নি, বরং আহলে কিতাবের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে।" আমি তখন বলি, আমাদের

এবং তাদের সকলের ব্যাপারেই অবতীর্ণ হয়েছে। এভাবে আমার ও তাঁর মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি হয়। তিনি আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে উসমান (রাঃ)-এর দরবারে চিঠি লিখেন। সুতরাং খলীফার পক্ষ থেকে আমার নামে ফরমান আসে যে, আমি যেন মদীনায় চলে আসি। মদীনায় পৌঁছে আমি দেখি যে, জনগণ চতুর্দিক থেকে আমাকে ঘিরে নিয়েছে। তারা যেন ইতিপূর্বে আমাকে দেখেনি। যা হোক, আমি মদীনাতেই অবস্থান করতে থাকি। কিন্তু সব সময় জনগণের যাতায়াতের কারণে আমি খুবই অস্বস্তি বোধ করি। শেষে আমি উসমান (রাঃ)-এর কাছে এই অভিযোগ করি। ফলে তিনি আমাকে বলেনঃ "মদীনার নিকটবর্তী কোন বিজন বনে আপনি চলে যান।" আমি তাঁর এ হুকুমও পালন করি। কিন্তু তাঁকে আমি এ কথা বলে দেই যে, আল্লাহর শপথ! আমি যা বলতাম তা কখনো ছাড়তে পারি না। আবূ যার (রাঃ)-এর ধারণা ছিল এই যে, ছেলেমেয়েদের ভরণ পোষণের পর যা বেঁচে যাবে তা জমা রাখা সাধারণভাবে হারাম। তিনি এটাই ফতওয়া দিতেন এবং জনগণের মধ্যে এ কথাই ছড়াতেন। জনগণকে তিনি এর উপরই উদ্বুদ্ধ ও উত্তেজিত করতেন এবং তাদের এরই হুকুম দিতেন। আর যারা এর বিরুদ্ধাচরণ করতো তাদের প্রতি বড়ই কঠোরতা অবলম্বন করতেন। মুআ'বিয়া (রাঃ) তাঁকে এ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করেন যাতে লোকদের মধ্যে সাধারণভাবে এই ক্ষতিকর কথা ছড়িয়ে না পড়ে। তিনি যখন কোনক্রমেই মানলেন না তখন বাধ্য হয়ে তিনি খলীফা উসমান (রাঃ)-এর কাছে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। আমীরুল মুমিনীন উসমান (রাঃ) তখন তাঁকে রাবযা নামক স্থানে একাকী অবস্থানের নির্দেশ দেন। উসমান (রাঃ)-এর খিলাফতকালেই সেখানে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

মুআ'বিয়া (রাঃ) একবার পরীক্ষামূলকভাবে আবূ যার (রাঃ)-এর কাছে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা প্রেরণ করেন। সন্ধ্যার পূর্বেই তিনি সমস্তই এদিক ওদিক আল্লাহর পথে খরচ করে দেন। সকালে যে লোকটি তাঁর কাছে স্বর্ণমুদ্রাগুলো পৌঁছিয়ে দিয়েছিলেন, সন্ধ্যাতেই তিনি তাঁর কাছে গমন করেন এবং বলেনঃ "আমার ভুল হয়ে গেছে। আমীরে মুআ'বিয়া (রাঃ) স্বর্ণমুদ্রাগুলো অন্য লোককে দেয়ার জন্যে আমাকে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু আমি ভুলক্রমে আপনাকে দিয়ে ফেলেছি। সুতরাং ওগুলো ফিরিয়ে দিন।" তখন আবূ যার (রাঃ) বলেনঃ "আপনার জন্যে আমার দুঃখ হচ্ছে! এখন তো আমার কাছে ওগুলোর এক পাইও অবশিষ্ট নেই! আচ্ছা, যখন আমার মাল আসবে তখন আমি আপনাকে আপনার স্বর্ণমুদ্রাগুলো ফিরিয়ে দেবো।" সুদ্দী (রঃ) বলেন যে, এ আয়াত আহলে কিবলার ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে।

আহ্নাফ ইবনে কায়েস (রঃ) বলেনঃ “একবার আমি মদীনা শরীফে গিয়ে দেখি যে, কুরায়েশদের একটি দল মজলিস করে বসে রয়েছে। আমিও ঐ মজলিসে গিয়ে বসে পড়ি। এমন সময় ময়লা ও মোটাসোটা কাপড় পরিহিত একটি লোক অত্যন্ত জীর্ণশীর্ণ অবস্থায় এসে দাঁড়িয়ে যান এবং বলেনঃ “টাকা-পয়সা জমাকারীরা যেন সতর্ক হয় যায় যে, কিয়ামতের দিন জাহান্নামের আগুনের অঙ্গার তাদের বক্ষস্থলে রাখা হবে যা কাঁধের হাড় পার হয়ে যাবে। তারপর পিছন দিক থেকে সামনের দিকে ছিদ্র করতে করতে এবং জ্বালাতে জ্বালাতে বের হয়ে যাবে।” একথা শুনে সমস্ত লোক মাথা নীচু করে বসে থাকলো, কেউ কোন কথা বললো না। ঐ লোকটি কথাগুলো বলে ফিরে চলে গেলেন এবং একটি স্তম্ভের সাথে পিঠ লাগিয়ে বসে পড়লেন। আমি তাঁর কাছে গিয়ে বললাম, এ লোকগুলোর কাছে আপনার কথাগুলো খারাপ লেগেছে। তিনি বললেনঃ ‘এরা কিছুই জানে না।’

একটি সহীহ হাদীসে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) আবূ যার (রাঃ)-কে বলেনঃ “আমার কাছে যদি উহুদ পাহাড়ের সমানও সোনা থাকে তবুও আমি এটা পছন্দ করি না যে, তিন দিন অতিবাহিত হওয়ার পর ওগুলোর কিছু আমার কাছে অবশিষ্ট থেকে যাবে। হ্যাঁ, তবে যদি ঋণ পরিশোধের উদ্দেশ্যে দু’ একটা দীনার রেখে দেই সেটা অন্য কথা।” খুব সম্ভব এই হাদীসই আবূ যার (রাঃ)-কে উপরোক্ত উক্তি করতে উত্তেজিত করেছিলে। এসব ব্যাপারে আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।

আবদুল্লাহ ইবনে সামিত (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একবার তিনি আবূ যার (রাঃ) -এর সাথে ছিলেন। আবূ যার (রাঃ) তাঁর অংশ প্রাপ্ত হন। তাঁর দাসী তখনই প্রয়োজনীয় দ্রব্য ক্রয় করতে শুরু করে। ওগুলো ক্রয়ের পর সাতটি (মুদ্রা) বেঁচে যায়। তখন তিনি দাসীকে হুকুম করেন যে, সে যেন ওগুলোর বিনিময়ে তাম্র মুদ্রা নিয়ে নেয়। আবদুল্লাহ ইবনে সামিত (রাঃ) তখন তাঁকে বলেনঃ “ওগুলো আপনার কাছে রেখে দিন, তাহলে প্রয়োজনের সময় কাজে লাগবে কিংবা কোন অতিথি আসলে তার সেবা করা যাবে।” একথা শুনে আবূ যার (রাঃ) তাঁকে বলেনঃ “না, আমার দোস্ত মুহাম্মাদ (সঃ) আমার নিকট থেকে অঙ্গীকার নিয়েছেন যে, যে সোনা ও রূপা জমা করে রাখা হবে তা জমাকারীর জন্যে আগুনের অঙ্গার হবে যে পর্যন্ত না সে তা আল্লাহর পথে খরচ করে দেয়।”[১]

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) তাঁর মুসনাদে বর্ণনা করেছেন।

হাফিয ইবনে আসাকির (রঃ) বর্ণনা করেছেন যে, আবূ সাঈদ (রাঃ)-কে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "দরিদ্র হয়ে আল্লাহর সাথে মিলিত হও, ধনী হয়ে নয়।" তিনি জিজ্ঞেস করেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! এটা কিরূপে হবে?" রাসূলুল্লাহ (সঃ) উত্তরে বলেনঃ "ভিক্ষুককে ফিরিয়ে দিয়ো না এবং যা পাবে তা গোপন করো না।" তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! এটা আমার দ্বারা কিরূপে হতে পারে?" রাসূলুল্লাহ (সঃ) জবাব দেনঃ "এটাই হতে হবে, নচেৎ জাহান্নামে যেতে হবে।" এর সনদ দুর্বল।

মুসনাদে আহমাদে আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, আহ্‌লে সুফ্‌ফার মধ্যকার একটি লোক মারা যান এবং তিনি দু'টি দীনার বা দিরহাম ছেড়ে যান। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "এ দু'টি হলো জাহান্নামের দু'টি দাগ। তোমরা তোমাদের সঙ্গীর জানাযার নামায পড়ে নাও।" অন্য একটি বর্ণনায় আছে যে, আহ্‌লে সুফ্‌ফার একটি লোক মারা গেলে তাঁর লুঙ্গির গাঁট হতে একটি দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) বেরিয়ে পড়ে। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "এটা আগুনের একটি দাগ।" অতঃপর আর একটি লোক মারা যান এবং তাঁর নিকট থেকে দু'টি দীনার বের হয়। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "এ দু'টি হলো আগুনের দু'টি দাগ।"

ইবনে আবি হাতিম (রঃ) সাওবান (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি লাল ও সাদা অর্থাৎ সোনা ও রূপা ছেড়ে মারা যাবে, ওগুলোর এক একটি কীরাতের[১] বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা আগুনের এক একটি তক্তা তৈরী করবেন এবং তা দ্বারা তার পা থেকে তুথ্নি পর্যন্ত (সারা দেহে) দাগ দেয়া হবে।"

হাফিয আবূ ইয়ালা (রঃ) আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, যে ব্যক্তি দীনারের উপর দীনার এবং দিরহামের উপর দিরহাম মিলিয়ে জমা করে রাখবে (ও তা ছেড়ে মারা যাবে), তার (দেহের) চামড়া প্রশস্ত করে কপালে, পার্শ্বদেশে এবং পৃষ্ঠদেশে ওগুলো দ্বারা দাগ দেয়া হবে এবং তাকে বলা হবেঃ "এটা হচ্ছে ঐ জিনিস যা তুমি নিজের জীবনের জন্যে জমা করে রেখেছিলে। এখন তার স্বাদ গ্রহণ কর।"[২]

১. এক কীরাত হলো এক আউন্সের চব্বিশ ভাগের এক ভাগ পরিমাণ ওজন।
২. এর বর্ণনাকারী সায়েফ চরম মিথ্যাবাদী ও পরিত্যক্ত।

৩৬। নিশ্চয়ই মাসসমূহের সংখ্যা হচ্ছে আল্লাহর নিকট বারো (চান্দ্র) মাস আল্লাহর কিতাবে (শরীয়তের বিধানে), আল্লাহর যমীন ও আসমানসমূহ সৃষ্টি করার দিন হতেই, এর মধ্যে বিশেষরূপে চারটি মাস হচ্ছে সম্মানিত, এটাই হচ্ছে সুপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম, অতএব তোমরা এ মাসগুলো সম্বন্ধে (ধর্মের বিরুদ্ধাচরণ করে) নিজেদের ক্ষতি সাধন করো না, আর এই মুশরিকদের সকলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, যেমন তারা তোমাদের সকলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, আর জেনে রেখো যে, আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে রয়েছেন।

٣٦- اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُوْرِ عِنْدَ اللّٰهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِيْ كِتٰبِ اللّٰهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ مِنْهَآ اَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوْا فِيْهِنَّ اَنْفُسَكُمْ وَ قَاتِلُوا الْمُشْرِكِيْنَ كَآفَّةً كَمَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ كَآفَّةً وَ اعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ ○

আবূ বাকরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) তাঁর (বিদায়) হজ্বের ভাষণে বলেনঃ “যামানা ঘুরে ঘুরে নিজের মূল অবস্থায় এসে গেছে। বছরের বারোটি মাস হয়ে থাকে। এগুলোর মধ্যে চারটি হচ্ছে সম্মানিত ও মর্যাদা সম্পন্ন মাস। তিনটি ক্রমিকভাবে রয়েছে। সেগুলো হচ্ছে যুলক্বাদ, যুলহাজ্বা ও মুহাররম। আর চতুর্থটি হচ্ছে মুযার গোত্রের (কাছে অতি সম্মানিত) রজব মাস, যা জামাদিউল উখরা ও শা'বানের মধ্যভাগে রয়েছে।”[১] অতঃপর তিনি জিজ্ঞেস করেনঃ “আজ কোন্ দিন?” (বর্ণনাকারী বলেন) আমরা উত্তরে বললামঃ “আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই (সঃ) ভাল জানেন।” রাসূলুল্লাহ (সঃ) কিছুক্ষণ চুপ থাকলেন। আমরা মনে করলাম যে, তিনি হয়তো এর অন্য কোন নাম বলবেন। এরপর তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ “আজ কি ‘ইয়াওমুন নাহর’ বা কুরবানীর ঈদের দিন নয়?” আমরা উত্তর দিলামঃ হ্যাঁ। পুনরায় তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ “এটা কোন্

১. এটা ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম বুখারী (রঃ) এটাকে তাঁর তাফসীরে পূর্ণতার সাথে তাখরীজ করেছেন।

মাস?” আমরা জবাব দিলাম, এ সম্পর্কে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলেরই (সঃ) ভাল জ্ঞান আছে। এবারও তিনি চুপ থাকলেন। সুতরাং আমরা ধারণা করলাম যে, তিনি এ মাসের অন্য কোন নাম রাখবেন। তারপর তিনি প্রশ্ন করলেনঃ “এটা কি যুলহাজ্বাহ্ মাস নয়?” আমরা জবাব দিলামঃ হ্যাঁ। এরপর তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ “এটা কোন্ শহর?” আমরা উত্তরে বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই (সঃ) এটা ভাল জানেন। তিনি এবারও নীরব হয়ে যান এবং আমরা এবারও মনে করলাম যে, তিনি হয় তো এর অন্য কোন নাম রাখবেন। অতঃপর তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ “এটা কি বালাদা (মক্কা) নয়?” আমরা জবাবে বললামঃ হ্যাঁ। এরপর তিনি বললেনঃ “জেনে রেখো যে, তোমাদের রক্ত, তোমাদের মাল, তোমাদের মান-মর্যাদা তোমাদের পরস্পরের মধ্যে এরূপই মর্যাদাসম্পন্ন যেমন মর্যাদাসম্পন্ন তোমাদের এ দিনটি, এ মাসটি এবং এ শহরটি। সত্বরই তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাৎ করবে। তখন তিনি তোমাদেরকে তোমাদের আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। সাবধান! আমার পরে যেন তোমরা পথভ্রষ্ট না হও এবং যেন একে অপরকে হত্যা না কর! আমি কি (শরীয়তের সমস্ত কথা তোমাদের কাছে) পৌঁছিয়ে দিয়েছি? জেনে নাও, তোমাদের যারা এখানে বিদ্যমান রয়েছে তারা যেন অনুপস্থিত লোকদের কাছে এসব কথা পৌঁছিয়ে দেয়। কেননা, হতে পারে যে, যারা উপস্থিত নেই তাদের কেউ কেউ শ্রোতাদের অপেক্ষা বেশী স্মরণশক্তির অধিকারী।”

অন্য রিওয়ায়াতে আছে যে, এটা হচ্ছে ‘মিনা’ নামক স্থানে ‘আইয়ামুত তাশরীক’[১] এর মধ্যভাগে বিদায় হজ্বের ভাষণের আলোচনা। আবূ হামযা রুকাশী (রঃ) তাঁর চাচা হতে বর্ণনা করেন যিনি একজন সাহাবী ছিলেন। তিনি বলেনঃ “রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর এ খুৎবার সময় আমি তাঁর উষ্ট্রীর লাগাম ধরে ছিলাম এবং মানুষের ভীড় ঠেকিয়ে রাখছিলাম।” তাঁর “যামানা ঘুরে ফিরে নিজের আসল অবস্থায় ফিরে এসেছে” এ উক্তির ভাবার্থ এই যে, অজ্ঞতার যুগে মুশ্‌রিকরা মাসগুলোর ব্যাপারে যে কম বেশী করতো এবং এগিয়ে দিতো বা পিছিয়ে দিতো, সেগুলো ঘুরে ফিরে এখন সঠিক অবস্থায় এসে গেছে। যে মাস এখন আছে তা প্রকৃত অবস্থাতেই আছে। যেমন মক্কা বিজয়ের সময় রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছিলেনঃ “এই শহর (মক্কা) সৃষ্টির শুরু থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত মর্যাদাসম্পন্ন ও সম্মানিত রয়েছে। আর কিয়ামত পর্যন্ত সম্মানিতই থাকবে।” সুতরাং আরবদের মধ্যে যে এই প্রথা চালু হয়েছিল যে, তারা তাদের অধিকাংশ

১. যিলহজ্ব মাসের ১১, ১২ ও ১৩ তারিখকে আইয়ামুত তাশরীক বলা হয়।

হজ্ব যিলহজ্ব মাসে করতো না, ঐ বছর রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর হজ্বের ব্যাপারে এটা ঘটেনি, বরং হজ্ব সঠিক মাসেই হয়েছিল। কেউ কেউ এর সাথে একথাও বলেছেন যে, আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর হজ্ব যুলকা'দা মাসে হয়েছিল। কিন্তু এ উক্তির ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনার অবকাশ রয়েছে। আমরাএটা ... إِنَّمَا النَّسِيْٓءُ-এর আয়াতের তাফসীরে প্রমাণসহ বর্ণনা করবো। পূর্ববর্তী কোন কোন গুরুজনের এ উক্তিও রয়েছে যে, ঐ বছর ঘটনাক্রমে ইয়াহূদী, খ্রীষ্টান ও মুসলমান সবারই হজ্ব একই দিনে হয়েছিল। অর্থাৎ ঈদুল আয্হার দিনে। কিন্তু এ উক্তিটি আরো বেশী গারীব বা দুর্বল।

'ফস্ল' বা পরিচ্ছেদ ঃ শায়েখ ইলমুদ্দীন সাখাভী (রঃ) তাঁর اَلْمَشْهُوْرُ فِىْ اَسْمَاءِ الْاَيَّامِ وَ الشُّهُوْرِ নামক গ্রন্থে লিখেছে– মুহাররম মাসকে ওর সম্মানের কারণে মুহাররম বলা হয়ে থাকে। কিন্তু আমার মতে তো এই নামের কারণ হচ্ছে ওর সম্মানের প্রতি গুরুত্বারোপকরণ। কেননা, অজ্ঞতা যুগের আরবরা ওকে বদলিয়ে দিতো। কখনো হালাল করতো, আবার কখনো হারাম করতো। এর বহুবচন مُحَرَّمَاتٌ, مَحَارِمُ এবং مَحَارِيْم এসে থাকে।

'সফর' এর নামকরণের কারণ এই যে, এই মাসে সাধারণতঃ তাদের ঘর খালি বা শূন্য থাকতো। কেননা, এই মাসটি তারা যুদ্ধ বিগ্রহে ও ভ্রমণে কাটিয়ে দিতো। ঘর শূন্য হয়ে গেলে আরবরা صَفَرُ الْمَكَانِ বলে থাকে। اَصْفَارٌ হচ্ছে এর বহুবচন। যেমন جَمَلٌ - এর বহুবচন اَجْمَالٌ এসে থাকে।

'রাবীউল আওয়াল' এর নামকরণের কারণ এই যে, এই মাসে আরবরা বাড়ীতেই অবস্থান করে থাকে। অবস্থান করাকে اِرْتِبَاعٌ বলা হয়। এর বহুবচন اَرْبِعَاءُ এসে থাকে। যেমন نَصِيْبٌ-এর বহুবচন اَنْصِبَاءُ এসে থাকে। এর বহুবচন اَرْبِعَةٌ ও হয়, যেমন رَغِيْفٌ-এর বহুবচন اَرْغِفَةٌ হয়।

'রাবীউল আখির' এর নামকরণের কারণও এটাই। এটা যেন বাড়ীতে অবস্থানের দ্বিতীয় মাস।

'জামাদিউল উলা' এর নামকরণের কারণ এই যে, এই মাসে পানি জমে যেতো। তাদের হিসাবে মাস আবর্তিত হতো না। অর্থাৎ ঠিক প্রতি মৌসুমেই প্রতিটি মাস আসতো। কিন্তু এ কথাটি যুক্তিসঙ্গত নয়। কেননা, ঐ মাসগুলোর হিসাব যখন চন্দ্রের উপর নির্ভরশীল তখন এটা পরিষ্কার কথা যে, প্রতি বছর প্রতি মাসে মৌসুমী অবস্থা একরূপ থাকবে না। হ্যাঁ, তবে খুব সম্ভব, যে বছর এই

মাসের নাম রাখা হয় ঐ বছর ঐ মাসটি খুব কন্কনে শীতে এসেছিল এবং পানি জমে গিয়েছিল। যেমন একজন কবিও বলেছেনঃ

وَلَيْلَةٍ مِنْ جُمَادَى ذَاتِ أَنْدِيَةٍ * لَا يُبْصِرُ الْعَبْدُ فِي ظَلْمَاءِ هَا الطُّنُبَا
لَا يَنْبَحُ الْكَلْبُ فِيهَا غَيْرَوَاحِدَةٍ * حَتَّى يَلُفَّ عَلَى خُرْطُومِهِ الذَّنَبَا

অর্থাৎ "জামাদিউর কঠিন অন্ধকার রাত, যার অন্ধকারে গোলাম তাঁবুর খুঁটি পর্যন্ত দেখতে পায় না। ঐ রাতে কুকুর একবার ছাড়া ঘেউ ঘেউ করতে পারে না, এমন কি শেষ পর্যন্ত সে (কন্কনে শীতের কারণে) তার লেজকে নাকের উপর গুটিয়ে নেয়।" এর বহুবচন جُمَادَيَاتٌ আসে। যেমন حُبَارَى ও حُبَارَيَاتٌ -এর ব্যবহার। এটা পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ উভয় রূপেই ব্যবহৃত হয়।

'জামাদিউল উখরা' এর নামকরণের কারণও এটাই। এটা যেন পানি জমে যাওয়ার দ্বিতীয় মাস।

'রজব' শব্দটি رَجِيْبٌ শব্দ থেকে গৃহীত। رَجِيْب বলা হয় تَعْظِيْم বা সম্মান। এই মাসটি মর্যাদাপূর্ণ মাস বলে একে রজব বলা হয়। এর বহুবচন أَرْجَابٌ, رِجَابٌ এবং رَجَبَاتٌ আসে।

'শা'বান' এর নামকরণের কারণ এই যে, এই মাসে আরবরা লুটপাট করার জন্য বিচ্ছিন্নভাবে এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়তো। تَشَعُّبٌ -এর অর্থ হচ্ছে পৃথক পৃথক হওয়া। এজন্যেই এই মাসের এই নাম রাখা হয়েছে। এর বহুবচন شَعَابِيْنُ ও شَعْبَانَاتٌ এসে থাকে।

'রমাদান' এর নামকরণের কারণ এই যে, এই মাসে অত্যাধিক গরমের কারণে উটের পা পুড়ে যায়। رَمِضَتِ الْفِصَالُ ঐ সময় বলা হয় যখন উষ্ট্রীর বাচ্চা খুবই পিপাসার্ত থাকে। এর বহুবচন رَمَضَانَاتٌ, رَمَاضِيْنُ এবং أَرْمِضَةٌ এসে থাকে। কারো কারো মতে এটা আল্লাহ তা'আলার নামসমূহের একটি নাম। কিন্তু এটা ভুল ও অযৌক্তিক কথা মাত্র। আমি বলি যে, এই ব্যাপারে একটি হাদীসও এসেছে। কিন্তু ওটা দুর্বল। كِتَابُ الصِّيَامِ-এ আমি এটা বর্ণনা করেছি।

'শাওয়াল' شَالَتِ الْإِبِلُ থেকে গৃহীত। এই মাসটি হচ্ছে উটের উত্তেজনার মাস। এই মাসে উট লেজ পিঠে করে দৌড়াতে শুরু করতো। এজন্যেই এই মাসের এই নাম হয়ে যায়। এর বহুবচন شَوَاوِلُ - شَوَاوِيْلُ এবং شَوَّالَاتٌ এসে থাকে।

'যুলক্বাদা' নাম হওয়ার কারণ এই যে, এই মাসে আরবের লোকেরা বাড়ীতে বসে থাকতো। তারা এই মাসে যুদ্ধের জন্যেও বের হতো না এবং সফরের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করতো না। এর বহুবচন ذَوَاتُ الْقَعْدَةِ এসে থাকে।

'যুলহাজ্বা' মাসে হজ্বব্রত পালিত হতো বলেই এর নাম 'যুলহাজ্বা' হয়ে যায়। এর বহুবচন ذَوَاتُ الْحِجَّةِ এসে থাকে।

এতো হলো এই মাসগুলোর নামকরণের কারণ। এখন সপ্তাহের সাত দিনের নাম এবং এ নামগুলোর বহুবচন বর্ণনা করা হচ্ছে–

রবিবারকে يَوْمُ الْاَحَدِ বলে। এর বহুবচন اٰحَادٌ ـ وُحَادٌ এবং وُحُوْدٌ এসে থাকে।

সোমবারকে يَوْمُ الْاِثْنَيْنِ বলা হয়। এর বহুবচন اَثَانِيْنَ আসে।

মঙ্গলবারকে يَوْمُ الثَّلَثَاءِ বলে। এটা পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ উভয়রূপেই কথিত হয়। এর বহুবচন ثَلَاثَاوَاتٌ এবং اَثَالِثُ আসে।

বুধবারকে يَوْمُ الْاَرْبَعَاءِ বলা হয়। এর বহুবচন اَرْبِعَاوَاتٌ এবং اَرَابِيْعُ এসে থাকে।

বৃহস্পতিবারকে يَوْمُ الْخَمِيْسِ বলে। এর বহুবচন اَخْمِسَةٌ ও اَخَامِسُ এসে থাকে।

শুক্রবারকে يَوْمُ الْجُمُعَةِ বলে। এর বহুবচন جُمَعٌ এবং جُمُعَاتٌ আসে।

শনিবারকে يَوْمُ السَّبْتِ বলা হয়। سَبْتٌ এর অর্থ হচ্ছে শেষ হওয়া। সপ্তাহের গণনা এখানেই শেষ হয় বলে একে سَبْتٌ বলা হয়।

প্রাচীন আরবে সপ্তাহের দিনগুলোর নাম ছিল নিম্নরূপঃ

আওয়াল, আহ্ওয়ান, জুবার, দুবার, মুনাস, উরূবা এবং শিয়ার। প্রাচীন খাঁটি আরব কবিদের কবিতার মধ্যেও সপ্তাহের এ নামগুলোর ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়।

আল্লাহ পাক বলেনঃ مِنْهَا اَرْبَعَةٌ حُرُمٌ অর্থাৎ এই বারো মাসের মধ্যে চারটি মাস (বিশেষ) মর্যাদাপূর্ণ। অজ্ঞতার যুগের আরবরাও এ চার মাসকে সম্মানিত মাসরূপে স্বীকার করতো। কিন্তু 'বাসল' নামক একটি দল তাদের গোঁড়ামীর কারণে আটটি মাসকে সম্মানিত মাস মনে করতো। রাসূলুল্লাহ (সঃ) ভাষণে **'রজব'** মাসকে 'মুযার' গোত্রের দিকে সম্পর্কযুক্ত করার কারণ এই যে, যে **মাসকে** তারা 'রজব' মাস হিসেবে গণনা করতো, প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর নিকটেও **ওটাই রজব** মাস ছিল, যা জামাদিউল উখরা এবং শা'বানের মাঝে রয়েছে। কিন্তু

রাবীআ' গোত্রের নিকট 'রজব' মাস শাবান ও শাওয়াল মাসের মধ্যবর্তী মাস অর্থাৎ রমযানের নাম ছিল। তাই রাসূলুল্লাহ (সঃ) স্পষ্টভাবে বলে দিলেন যে, সম্মানিত মাস হচ্ছে মুযার গোত্রের রজব মাস, রাবীআ' গোত্রের রজব মাস নয়।

সম্মানিত এই চারটি মাসের মধ্যে তিনটি ক্রমিকরূপে হওয়ার যৌক্তিকতা এই যে, হাজীরা যুলক্বাদা মাসে বাড়ী হতে বের হন। ঐ সময় যুদ্ধ-বিগ্রহ, মারপিট, ঝগড়া-বিবাদ এবং খুনাখুনি বন্ধ করে লোকেরা বাড়ীতে বসে থাকে। অতঃপর যুলহাজ্বা মাসে তাঁরা হজ্বের আহকাম নিরাপত্তার সাথে এবং উত্তমরূপে আদায় করেন। তারপর মর্যাদাপূর্ণ মুহাররম মাসে তাঁরা নিরাপদে বাড়ীর দিকে প্রত্যাবর্তন করে থাকেন। বছরের মধ্যভাগে রজব মাসকে সম্মানিত বানানোর উদ্দেশ্য হচ্ছে যেন যিয়ারতকারিগণ বায়তুল্লাহ শরীফের তাওয়াফের আকাঙ্ক্ষা উমরার আকারে পূর্ণ করতে পারে। যারা বহু দূরের লোক তারাও যেন সারা মাস ধরে নিরাপদে যাতায়াত করতে পারে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, এটাই হচ্ছে সুপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম। সুতরাং তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী তোমরা এই মাসগুলোর যথাযথ মর্যাদা দান কর। বিশেষভাবে এই মাসগুলোতে পাপকার্য থেকে দূরে থাকো। কেননা, এতে পাপের দুষ্ক্রিয়া আরো বৃদ্ধি পায়। যেমন হারাম শরীফে কৃত পাপ অন্যান্য স্থানে কৃত পাপ অপেক্ষা বেশী হয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "যে ব্যক্তি ওর মধ্যে (হারাম শরীফের মধ্যে) অত্যাচার ও বাড়াবাড়ি করে ধর্মদ্রোহীতার কাজে লিপ্ত হবে, আমি তাকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করাবো।" অনুরূপভাবে এই মাগুলোর মধ্যে পাপকার্য করলে আন্যান্য মাসে কৃত পাপকার্যের চেয়ে গুনাহ্ বেশী হয়। এ কারণেই ইমাম শাফিঈ (রঃ) এবং আলেমদের একটি বৃহৎ দলের মতে এই মাসগুলোর মধ্যে কেউ কাউকেও হত্যা করলে ওর রক্তপণও কঠিন হবে। এ রকমই হারাম শরীফের ভিতরের হত্যা ও নিকটতম আত্মীয়ের হত্যা। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, فِيهِنَّ শব্দ দ্বারা বছরের সমস্ত মাসকে বুঝানো হয়েছে। সুতরাং আল্লাহ পাকের এ উক্তির মর্মার্থ হচ্ছে- তোমরা সমস্ত মাসে পাপকার্য থেকে বিরত থাকবে, বিশেষ করে এই চার মাসে। কেননা, এগুলো বড়ই মর্যাদা সম্পন্ন মাস। এ মাসগুলোতে পাপ শাস্তির দিক দিয়ে এবং পুণ্য বা সাওয়াব প্রাপ্তির দিক দিয়ে বৃদ্ধি পেয়ে থাকে।

কাতাদা (রাঃ) বলেন যে, এই সম্মানিত মাসগুলোতে পাপের শাস্তির বোঝা বেড়ে যায়, যদিও অত্যাচার সর্বাবস্থাতেই খারাপ। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাঁর যে

কাজকে ইচ্ছা বড় করে থাকেন। তিনি বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় সৃষ্টির মধ্য থেকেও বাছাই ও মনোনীত করেছেন। তিনি ফেরেশতাদের মধ্য থেকে দূত মনোনীত করেছেন, মানব জাতির মধ্য থেকে রাসূলদেরকে মনোনীত করেছেন, কালামের মধ্য থেকে তাঁর যিক্রকে পছন্দ করেছেন, যমীনের মধ্যে মসজিদসমূহকে পছন্দ করেছেন, মাসগুলোর মধ্যে রমযান ও হারাম মাসগুলোকে মনোনীত করেছেন, দিনগুলোর মধ্যে শুক্রবারকে পছন্দ করেছেন এবং রাতগুলোর মধ্যে লায়লাতুল কদরকে মনোনীত করেছেন। এভাবে মহান আল্লাহ যেটাকে ইচ্ছা করেছেন একটির উপর অন্যটিকে প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। সুতরাং যেগুলোকে আল্লাহ তা'আলা মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন সেগুলোর মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রাখা অপরিহার্য কর্তব্য। বুদ্ধিমান ও বিবেচক লোকদের মতে কোন বিষয়ের ঐ পরিমাণ সম্মান করা উচিত যে পরিমাণ সম্মান আল্লাহ পাক ওতে দান করেছেন। ওগুলোর সম্মান না করা হারাম। এ মাসগুলোতে যা করা হারাম তা হালাল করা চলবে না এবং যা হালাল তা হারাম করা উচিত নয়, যেমন মুশ্রিকরা করতো। ওটা তাদের কুফরীর মধ্যে বৃদ্ধিরই শামিল।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, তোমরা এই মুশরিকদের সকলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, যেমন তারা তোমাদের সকলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। মর্যাদা সম্পন্ন এই চার মাসের মধ্যে যুদ্ধের সূচনা করা হারাম হওয়ার হুকুম মানসূখ বা রহিত হয়ে গেছে কি এখনও এ হুকুম বিদ্যমান আছে এ ব্যাপারে আলেমদের দু'টি উক্তি রয়েছে। প্রথম উক্তি এই যে, এ হুকুম রহিত হয়ে গেছে। এটাই প্রসিদ্ধতর উক্তি। এ আয়াতের শব্দগুলোর প্রতি চিন্তাযুক্ত দৃষ্টিতে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, প্রথমে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে–এ মাসগুলোতে যুলুম করো না। অতঃপর হুকুম করা হচ্ছে–তোমরা মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কর। বাহ্যিক শব্দ দ্বারা তো জানা যায় যে, এ হুকুম আ'ম বা সাধারণ। এতে হারাম মাসগুলোও এসে গেল। যদি এ মাসগুলো স্বতন্ত্র হতো তবে এগুলো অতিক্রান্ত হওয়ার শর্ত অবশ্যই আরোপিত হতো। আল্লাহর রাসূল (সঃ) যুলক্বাদা মাসে তায়েফ অবরোধ করেছিলেন যা সম্মানিত মাসগুলোর মধ্যে একটি মাস। যেমন সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) শাওয়াল মাসে হাওয়াযেন গোত্রের বিরুদ্ধে অভিযানে বের হন। তারা পরাজিত হয়। তাদের মধ্যে যারা প্রাণে বেঁচে যায় তারা পালিয়ে তায়েফে আশ্রয় গ্রহণ করে। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) সেখানে গমন করেন এবং চল্লিশ দিন পর্যন্ত তায়েফ অবরোধ করে রাখেন। তারপর ওটা জয় না করেই তিনি সেখান থেকে ফিরে আসেন। তাহলে জানা গেল যে, তিনি হারাম মাসে তায়েফ অবরোধ করেছিলেন।

দ্বিতীয় উক্তি এই যে, হারাম মাসগুলোতে যুদ্ধের সূচনা করা হারাম এবং এই মাসগুলোর হুরমতের হুকুম মানসূখ হয়নি। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর প্রতীকসমূহের অসম্মান করো না এবং সম্মানিত মাসসমূহেরও না।" অন্য জায়গায় আল্লাহ পাক বলেনঃ "সম্মানিত মাস সম্মানিত মাসের বিনিময়ে, আর এসব সম্মান তো পারস্পরিক বিনিময়ের বস্তু, সুতরাং যে ব্যক্তি তোমাদের উপর উৎপীড়ন করে, তোমরাও তাদের উপর উৎপীড়ন করবে, যেরূপ সে তোমাদের প্রতি উৎপীড়ন করেছে।" আর এক জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "অতএব যখন নিষিদ্ধ মাসগুলো অতীত হয়ে যায় তখন সেই মুশরিকদেরকে যেখানে পাও বধ কর।"

এ কথা পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, এই নির্ধারিত চারটি মাস প্রতি বছরেই থাকবে, দু'টি উক্তির মধ্যে একটি উক্তি অনুযায়ী শুধুমাত্র সফরের মাসগুলোতে নয়।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "তোমরা সমস্ত মুসলিম ঐ মুশরিকদের সকলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর যেমন তারা তোমাদের সকলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে।" হতে পারে যে, এটা পূর্ব হুকুম থেকে একটা স্বতন্ত্র হুকুম নয়। আবার এও হতে পারে যে, এটা একটা পৃথক ও নতুন হুকুম। আল্লাহ তা'আলা হয়তো মুসলিমদেরকে উৎসাহিত ও জিহাদের প্রতি উত্তেজিত করার উদ্দেশ্যে বলছেন–তারা যেমন তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে সবাই চতুর্দিক থেকে সমবেতভাবে তোমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে, তদ্রূপ তোমরাও সমস্ত মুমিনকে সঙ্গে নিয়ে তাদের মুকাবিলা কর। এটাও সম্ভব যে, এই বাক্যে মুসলিমদেরকে নিষিদ্ধ মাসগুলোতেও যুদ্ধ করার অনুমতি দেয়া হয়েছে, যখন আক্রমণের সূচনা তাদের পক্ষ থেকে হবে। যেমন اَلشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمٰتُ قِصَاصٌ (২ঃ১৯৪) এ আয়াতে রয়েছে এবং আরো রয়েছে وَلَا تُقٰتِلُوْهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتّٰى يُقٰتِلُوْكُمْ فِيْهِ فَاِنْ قٰتَلُوْكُمْ فَاقْتُلُوْهُمْ এই আয়াতে। অর্থাৎ "আর তোমরা তাদের (মুশরিকদের) সাথে মসজিদুল হারামের নিকট যুদ্ধ করো না, যে পর্যন্ত না তারা তথায় তোমাদের সাথে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। যদি তারাই তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতে অগ্রসর হয় তবে তোমরাও তাদেরকে হত্যা কর।" (২ঃ১৯১) সম্মানিত মাসে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর তায়েফ অবরোধ করার জবাব এটাই যে, এটা ছিল হাওয়াযেন গোত্র ও তাদের মিত্র বানু সাকীফ গোত্রের যৌথ শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ। যুদ্ধের সূচনা তাদের পক্ষ থেকেই হয়েছিল। তারা এদিক ওদিক

থেকে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর বিরোধী লোকদেরকে একত্রিত করে যুদ্ধের আহ্বান জানিয়েছিল। সুতরাং নবী (সঃ) তাদের দিকে অগ্রসর হয়েছিলেন। তাঁর এই অগ্রযাত্রাও আবার সম্মানিত মাসে ছিল না। এখানে পরাজিত হয়ে ঐ লোকগুলো পালিয়ে গিয়ে তায়েফে আশ্রয় নিয়েছিল এবং সেখানে দুর্গ স্থাপন করেছিল। রাসূলুল্লাহ (সঃ) ঐ কেন্দ্রকে খালি করার উদ্দেশ্যে আরো সামনে অগ্রসর হন। তারা মুসলমানদের ক্ষতি সাধন করে এবং মুসলমানদের একটি দলকে হত্যা করে ফেলে। এদিকে মিনজীক প্রভৃতি গোত্রসমূহের মাধ্যমে অবরোধ অব্যাহত থাকে। প্রায় চল্লিশ দিন পর্যন্ত তাদেরকে ঘিরে রাখা হয়। মোটকথা, যুদ্ধের সূচনা সম্মানিত মাসে হয়নি। কিন্তু যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হওয়ায় সম্মানিত মাসও চলে আসে। কিছুদিন অতিবাহিত হলে রাসূলুল্লাহ (সঃ) অবরোধ উঠিয়ে নেন। সুতরাং যুদ্ধ জারি রাখা এক কথা এবং যুদ্ধের সূচনা হওয়া আর এক কথা। এর বহু নযীর রয়েছে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। এ সম্পর্কে যেসব হাদীস এসেছে সেগুলো আমি "সীরাত"-এর মধ্যে বর্ণনা করেছি। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সর্বাপেক্ষা বেশী জ্ঞানের অধিকারী।

৩৭। এই (মাসগুলোর) স্থানান্তর কুফরের মধ্যে আরো বৃদ্ধি মাত্র, যদদ্বারা, কাফিরদরকে পথভ্রষ্ট করা হয় (এইরূপে) যে, তারা সেই হারাম মাসকে কোন বছর হালাল করে নেয় এবং কোন বছর হারাম মনে করে, আল্লাহ যেই মাসগুলোকে হারাম করেছেন, যেন তারা ওগুলোর সংখ্যা পূর্ণ করে নিতে পারে, অতঃপর তারা আল্লাহর নিষিদ্ধ মাসগুলোকে হালাল করে নেয়, তাদের দুষ্কর্মগুলো তাদের কাছে ভাল মনে হয়, আর আল্লাহ এইরূপ কাফিরদেরকে হিদায়াত (এর তাওফীক দান) করেন না।

٣٧- إِنَّمَا النَّسِيٓءُ زِيَادَةٌ فِى الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَّ يُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِّيُوَاطِـُٔوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللّٰهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوٓءُ اَعْمَالِهِمْ وَ اللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكٰفِرِينَ ۝

এখানে আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের কুফরী বৃদ্ধির বর্ণনা দিচ্ছেন যে, কিভাবে তারা নিজেদের বিকৃত মত এবং নাপাক প্রবৃত্তিকে আল্লাহর শরীয়তের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিয়ে তাঁর দ্বীনের আহ্কামকে পরিবর্তন করে দিচ্ছে! তারা হারামকে হালাল এবং হালালকে হারাম বানিয়ে নিতো। তিনটি মাসের মর্যাদা তারা ঠিক রাখে বটে, কিন্তু চতুর্থ মাসের সম্মান এভাবে পরিবর্তন করে যে, মুহাররম মাসকে সফর মাসের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেয় এবং ওকে মর্যাদা দেয় না, যাতে বছরের চার মাসের হুরমাতও পূর্ণ হয়ে যায়, আর ওদিকে প্রকৃত হুরমাতপূর্ণ মুহাররম মাসে লুটপাট, হত্যা এবং লুণ্ঠনও চলতে থাকে। তারা যে হারাম মাসকে হালাল করে দিতো এবং হালাল মাসকে হারাম করতো তা তারা ফখর করে তাদের কবিতাতে প্রকাশ করতো। জানাদা ইবনে আমর ইবনে উমাইয়া কিনানী নামক তাদের এক নেতা প্রতি বছর হজ্ব করতে আসতো। তার কুনইয়াত বা পিতৃপদবীযুক্ত নাম ছিল আবূ সুমামা। সে সকলের সামনে ঘোষণা করে– "জেনে রেখো যে, কেউ আবূ সুমামার সামনে কোন শব্দ উচ্চারণ করতে পারে না বা কেউ তার উক্তির প্রতি কোনরূপ দোষারোপ করতে পারে না। জেনে রেখো যে, প্রথম বছরের সফর মাস হালাল এবং দ্বিতীয় বছরের সফর মাস হারাম।" সুতরাং এক বছর মুহাররম মাসের সম্মান করতো না এবং পর বছর সম্মান করতো। এ আয়াতে তার কুফরীর এই বৃদ্ধির প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে। এ লোকটি গাধার উপর সওয়ার হয়ে আসতো। যে বছর সে মুহাররম মাসকে সম্মানিত মাস বলতো, জনগণ ঐ বছর ঐ মাসের সম্মান করতো। আর যে বছর সে বলতো যে, সে মুহাররম মাসকে সরিয়ে দিয়ে সফর মাসের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিয়েছে এবং সফর মাসকে আগে বাড়িয়ে দিয়ে মুহাররম মাসের মধ্যে প্রবেশ করিয়েছে, ঐ বছর আরবরা কেউই মুহাররম মাসের সম্মান করতো না।

একটি উক্তি এও আছে যে, বানু কিনানা গোত্রের ঐ লোকটিকে আলমাস বলা হতো। সে ঘোষণা করতো যে, এ বছর মুহাররম মাসের সম্মান করা হবে না। আগামী বছর মুহাররম ও সফর উভয় মাসেরই সম্মান দেয়া হবে। অজ্ঞতার যুগে তার কথার উপরই আমল করা হতো। এখন প্রকৃত সম্মানিত মাস, যে মাসে মানুষ তার পিতৃহন্তাকে পেলেও তার দিকে দৃষ্টিপাত করতো না, সেই মানুষ পরস্পরের মধ্যে গৃহযুদ্ধ, লুটপাট প্রভৃতি শুরু করে দিতো।

এই উক্তিটি কিন্তু সঠিক বলে অনুভূত হয় না। কেননা, কুরআন কারীমে বলা হয়েছে যে, তারা গণনা ঠিক রাখতো। কিন্তু এতে তো গণনা ঠিক থাকছে না। কারণ এর ফলে এক বছর সম্মানিত মাসগুলোর সংখ্যা হচ্ছে তিন এবং পরবর্তী বছর ওগুলোর সংখ্যা দাঁড়াচ্ছে পাঁচ।

আর একটি উক্তি এটাও আছে যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে তো হজ্ব ফরয ছিল যিলহজ্বের মাসে। কিন্তু মুশরিকরা যিলহজ্ব মাসের নাম মুহাররম রেখে দিতো। তারপর তারা বরাবর গণনা করে যেতো। আর এই হিসাবে যে যিলহজ্ব মাস আসতো ঐ মাসেই তারা হজ্বব্রত পালন করতো। মুহাররম মাসের ব্যাপারে তারা নীরব থাকতো। ওর কোন উল্লেখই করতো না। আবার ফিরে এসে 'সফর' নাম রেখে দিতো। তারপর রজবকে জামাদিউল আখির, শাবানকে রমযান, রমযানকে শাওয়াল, তারপর যুলক্বাদাকে শাওয়াল, যুলহাজ্বাকে যুলক্বাদা এবং মুহাররমকে যিলহজ্ব বলতো। আবার এর পুনরাবৃত্তি করতো। আর উপর্যুপরি দু' বছর প্রতি মাসেই বরাবর হজ্ব করে যেতো। যে বছর আবূ বকর (রাঃ) হজ্ব করেন সেই বছর মুশ্‌রিকদের গণনা অনুসারে ওটা পরবর্তী বছরের যুলক্বাদা মাস ছিল। রাসূলুল্লাহ (সঃ) যে বছর হজ্ব করেন, ঐ বছর হজ্ব ঠিক যিলহজ্ব মাসেই হয়েছিল। আর তিনি তাঁর ভাষণে ঐ দিকেই ইঙ্গিত করে বলেছেনঃ "আসমান যমীন সৃষ্টিকালে আল্লাহ তা'আলা বার্ষিক গণনার যে নিয়ম দান করেছিলেন, যুগ বা সময় ঘুরে ফিরে সেই পর্যায়ে আবার ফিরে এসেছে।"

কিন্তু এ উক্তিটি সঠিক বলে মনে হয় না। কেননা, আবূ বকর (রাঃ) -এর হজ্ব যদি যুলক্বাদা মাসে হয়ে থাকে তবে তাঁর ঐ হজ্ব কিরূপে শুদ্ধ হতে পারে? অথচ আল্লাহ তা'আলা ফরমান জারি করেনঃ

وَ اَذَانٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖۤ اِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْاَكْبَرِ اَنَّ اللّٰهَ بَرِیْٓءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۙ۬ وَ رَسُوْلُهٗ

অর্থাৎ "আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ)-এর পক্ষ হতে বড় হজ্বের দিন জনসাধারণের সামনে ঘোষণা করা হচ্ছে যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ) উভয়ই এই মুশ্‌রিকদের (নিরাপত্তা প্রদান করা) হতে নিঃসম্পর্ক হচ্ছেন।" (৯ঃ৩) এই ঘোষণা সিদ্দীকে আকবার (রাঃ)-এর হজ্বেই করা হয়েছিল। সুতরাং তাঁর এ হজ্ব যদি যিলহজ্ব মাসে না হয়ে থাকতো, তবে আল্লাহ তা'আলা ঐ দিনকে হজ্বের দিন বলতেন না। এ আয়াতে মাসগুলোকে এগিয়ে দেয়া বা পিছিয়ে দেয়ার যে বর্ণনা রয়েছে, শুধু এটাকেই প্রমাণ করার জন্যে এতো কষ্ট স্বীকার করারও কোন প্রয়োজন নেই। কেননা, এ ছাড়াও তো এটা সম্ভব। কারণ মুশ্‌রিকরা এক বছরতো মুহাররামুল হারামকে হালাল করে নিতো এবং ওর বিনিময়ে সফর মাসকে হারাম করে নিতো। বছরের অবশিষ্ট মাসগুলো স্ব স্ব স্থানেই থাকতো। তারপর দ্বিতীয় বছরে মুহাররম মাসকে হারাম মনে করতো

এবং ওর মর্যাদা ঠিক রাখতো, যেন আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত সম্মানিত মাসগুলোর সংখ্যা ঠিক থাকে। সুতরাং কখনো তারা পরপর বা ক্রমিকভাবে অবস্থিত তিনটি মাসের শেষ মাস মুহাররমকে সম্মানিত মাস হিসেবেই রাখতো, আবার কখনো সফরের দিকে সরিয়ে দিতো। এখন বাকী থাকলো রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর এ ফরমান যে, সময় ঘুরে ফিরে নিজের প্রকৃত অবস্থায় এসে গেছে অর্থাৎ তাদের নিকটে যে মাস, সঠিক গণনাতেও ঐ মাসই বটে, এর পূর্ণ বর্ণনা আমরা পূর্বেই দিয়েছি। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

ইবনে আবি হাতিম (রাঃ) ইবনে উমার (রাঃ)-এর উক্তি নকল করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) আকাবা নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন। জনগণ তাঁর আশে পাশে একত্রিত হন। তিনি আল্লাহর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করেন। অতঃপর বলেনঃ " মাসগুলোকে পিছনে সরিয়ে দেয়া শয়তানের পক্ষ থেকে ছিল কুফরীর বৃদ্ধি, যেন কাফিররা বিভ্রান্ত হয়। মুশ্‌রিকরা এক বছর মুহাররম মাসকে সম্মানিত হিসেবে রাখতো এবং সফর মাসকে হালাল রূপে রাখতো। আবার কোন বছর তারা মুহাররমকে হালাল করে নিতো।"এই ছিল তাদের এগিয়ে দেয়া ও পিছিয়ে নেয়া। এ আয়াতে এরই বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক (রঃ) তাঁর 'কিতাবুস সীরাহ্' নামক গ্রন্থে এ সম্পর্কে খুব ভাল কথা বলেছেন, যা অত্যন্ত উপকারী ও উত্তম। তিনি লিখেছেন যে প্রথম ব্যক্তি আল্লাহর হারামকৃত মাসকে হালাল এবং তাঁর হালালকৃত মাসকে হারাম করার রীতি আরবে চালু করেছিল সে হলো কালমাস। আর সে-ই হচ্ছে হুযায়ফা ইবনে আব্‌দ। তারপর কাসীম ইবনে আদী ইবনে আমির ইবনে সালাবা ইবনে হারিস ইবনে মালিক ইবনে কিননা ইবনে খুযায়মা ইবনে মুদরিকা ইবনে ইলইয়াস ইবনে মুযার ইবনে নাযার ইবনে মাদ ইবনে আদনান। তারপর তার ছেলে আব্বাদ, এরপর তার ছেলে কালা, তারপর তার ছেলে উমাইয়া, তারপর ওর ছেলে আউফ, তারপর তার ছেলে আবূ সুমামা জানাদা। তার যুগেই ইসলাম বিস্তার লাভ করে। আরবের লোকেরা হজ্বপর্ব শেষ করে তার পাশে জমা হতো। সে তখন দাঁড়িয়ে বক্তৃতা শুরু করতো এবং রজব , যুলক্বাদা ও যুলহাজ্বা এ তিনটি মাসের মর্যাদা বর্ণনা করতো। আর এক বছর মুহাররমকে হালাল করতো এবং সফরকে মুহাররম বানিয়ে দিতো। আবার অন্য বছর মুহাররমকেই সম্মানিত মাস বলে দিতো। যেন আল্লাহর নিষিদ্ধ মাসগুলোর সংখ্যা ঠিক থেকে যায় এবং তার হারাম হালালও হয়ে যায়।

٣٨- يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَا لَكُمْ اِذَا قِيْلَ لَكُمُ انْفِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اثَّاقَلْتُمْ اِلَى الْاَرْضِ اَرَضِيْتُمْ بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا مِنَ الْاٰخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فِي الْاٰخِرَةِ اِلَّا قَلِيْلٌ ۝

৩৮। হে মুমিনগণ! তোমাদের কি হলো যে, যখন তোমাদেরকে বলা হয়–(জিহাদের জন্যে) বের হও আল্লাহর পথে, তখন তোমরা মাটিতে লেগে থাকো (অলসভাবে বসে থাকো); তবে কি তোমরা পরকালের বিনিময়ে পার্থিব জীবনের উপর পরিতুষ্ট হয়ে গেলে? বস্তুতঃ পার্থিব জীবনের ভোগবিলাস তো আখিরাতের তুলনায় কিছু নয়, অতি সামান্য!

٣٩- اِلَّا تَنْفِرُوْا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ۙ وَّ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَ لَا تَضُرُّوْهُ شَيْـًٔا ۗ وَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝

৩৯। যদি তোমরা বের না হও, তবে আল্লাহ তোমাদেরকে কঠোর শাস্তি প্রদান করবেন। (অর্থাৎ ধ্বংস করে দিবেন), এবং তোমাদের পরিবর্তে অন্য এক জাতি সৃষ্টি করে দিবেন, আর তোমরা আল্লাহর (দ্বীনের) কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্ব শক্তিমান।

ঘটনা এই যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বহু দূরের সফর তাবূকের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করার জন্যে সাহাবীদেরকে এমন সময়ে নির্দেশ দেন যখন প্রচন্ড গরম পড়েছিল, গাছের ফল পেকে উঠেছিল এবং গাছের ছায়া বেড়ে গিয়েছিল। কিছু লোক রয়ে গিয়েছিল, তাদেরকেই তিরস্কার করে বলা হচ্ছে–যখন তোমাদেরকে আল্লাহর পথে যুদ্ধ করার জন্যে ডাক দেয়া হচ্ছে তখন তোমরা মাটি আঁকড়ে বসে থাকছো কেন? তোমরা কি দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী ভোগ্য বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে আখিরাতের চিরস্থায়ী নিয়ামতকে ভুলে বসেছো? জেনে রেখো যে, পরকালের তুলনায় দুনিয়ার কোন মূল্যই নেই।

রাসূলুল্লাহ (সঃ) স্বীয় তর্জনীর দিকে ইশারা করে বলেনঃ “এ অঙ্গুলিটি কেউ সমুদ্রে ডুবিয়ে উঠালে তাতে যতটুকু পানি উঠবে, ঐ পানিটুকু সমুদ্রের তুলনায় যেমন, আখিরাতের তুলনায় দুনিয়াও তেমন।”[১]

আবূ হুরাইরা (রাঃ)-কে কেউ জিজ্ঞেস করেন– আমি শুনেছি যে, আপনি নাকি হাদীস বর্ণনা করে থাকেনঃ “আল্লাহ তা'আলা একটি পুণ্যের বিনিময়ে এক লাখ সওয়াব দিয়ে থাকেন।” এটা কি সত্য? তিনি উত্তরে বলেনঃ “হ্যাঁ, এটা তো সত্যই, তাছাড়া আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে এ কথাও বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ তা'আলা একটা পুণ্যের বিনিময়ে দু'লাখ সওয়াব দান করবেন।” অতঃপর তিনি فَمَا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فِى الْاٰخِرَةِ اِلَّا قَلِيْلٌ -এ বাক্যটি পাঠ করে বলেনঃ “দুনিয়ার যা অতীত হয়েছে এবং যা বাকী আছে সমস্তই আখিরাতের তুলনায় অতি অল্প।” আবদুল আযীয ইবনে আবি হাসিম (রঃ) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, আবদুল আযীয ইবনে মারওয়ান (রঃ)-এর যখন মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসলো তখন তিনি বললেনঃ “যে কাপড়ে আমাকে কাফন পরানো হবে ওটা আমার কাছে নিয়ে এসো তো, আমি একটু দেখে নিই।” কাপড়টি তাঁর সামনে রাখা হলে তিনি ওটার দিকে তাকিয়ে বলেনঃ “দুনিয়ায় তো আমার অংশ এটাই ছিল। এটুকু দুনিয়া নিয়ে আমি যাচ্ছি!” অতঃপর তিনি পিঠ ফিরিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলেনঃ “হায় দুনিয়া! তোমার অধিকও অল্প এবং তোমার অল্পতো খুবই ছোট! আফসোস! আমরা ধোঁকার মধ্যেই পড়ে রয়েছি!”

আল্লাহ তা'আলা জিহাদ পরিত্যাগ করার উপর ভীতি প্রদর্শন করে বলছেন–'যদি তোমরা (যুদ্ধের জন্যে) বের না হও তবে আল্লাহ তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রদান করবেন।' একটি গোত্রকে রাসূলুল্লাহ (সঃ) জিহাদের জন্যে আহ্বান করেন। কিন্তু তারা তাঁর আহ্বানে সাড়া দেয়নি। তখন আল্লাহ তাদের থেকে বৃষ্টি বন্ধ করে দেন।

আল্লাহ পাক বলেন–'তিনি তোমাদের পরিবর্তে অন্য এক জাতি সৃষ্টি করে দিবেন।' অর্থাৎ তোমরা গর্বে ফুলে ওঠো না যে, তোমরাই তো রাসূল (সঃ)-এর সাহায্যকারী। জেনে রেখো যে, তোমরা যদি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাহায্যকারীরূপে না থাকো তবে আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে ধ্বংস করে দিয়ে অন্যদেরকে তাঁর সাথী ও সাহায্যকারী বানিয়ে দেবেন যারা তোমাদের মত হবে না। তোমরা আল্লাহর দ্বীনের কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। এটা মনে করো না যে, তোমরা জিহাদ না করলে মুজাহিদরা জিহাদ করতেই পারবে না। আল্লাহ সব কিছুর উপরই পূর্ণ ক্ষমতাবান। তোমাদের ছাড়াই তিনি তাঁর মুজাহিদ বান্দাদেরকে শত্রুদের উপর বিজয় দান করতে পারেন।

১. এ হাদীসটি ইমাম মুসলিম (রঃ) তাঁর সহীহ গ্রন্থে এবং ইমাম আহমাদ (রঃ) তাঁর মুসনাদ গ্রন্থে তাখরীজ করেছেন।

বলা হয়েছে যে, এই আয়াতটি ও اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّ ثِقَالًا (৯ঃ ৪১) এই আয়াতটি এবং مَا كَانَ لِاَهْلِ الْمَدِيْنَةِ وَ مَنْ حَوْلَهُمْ مِّنَ الْاَعْرَابِ اَنْ يَّتَخَلَّفُوْا عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ وَ مَا كَانَ الْمُؤْمِنُوْنَ لِيَنْفِرُوْا كَآفَّةً فَلَوْ لَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ (৯ঃ১২০) এই আয়াতটি مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ (৯ঃ১২২) এ আয়াত দ্বারা মানসূখ বা রহিত হয়ে গেছে। কিন্তু ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) এর প্রতিবাদ করে বলেন যে, এই আয়াতগুলো মানসূখ হয়নি, বরং এগুলোর ভাবার্থ এই যে, যাদেরকে রাসূলুল্লাহ (সঃ) জিহাদে বের হওয়ার জন্যে ডাক দেবেন তাদেরকে তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে যেতে হবে। যদি তারা তা পরিত্যাগ করে তবে তাদেরকে ঐ কারণে শাস্তি প্রদান করা হবে। এটাই খুব উত্তম ব্যাখ্যা বটে। আল্লাহ তা'আলাই সঠিক জ্ঞানের অধিকারী।

৪০। যদি তোমরা তাকে (রাসূলুল্লাহকে) সাহায্য না কর তবে আল্লাহই (তার সাহায্য করবেন যেমন তিনি) তার সাহায্য করেছিলেন সেই সময়ে যখন কাফিররা তাকে দেশান্তর করে দিয়েছিল, যখন দু'জনের মধ্যে একজন ছিল সে (রাসূল সঃ) যেই সময় উভয়ে গুহার মধ্যে ছিল যখন তিনি স্বীয় সঙ্গীকে (আবূ বকরকে রাঃ) বলতেছিলেন–তুমি বিষণ্ন হয়ো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ (তাঁর সাহায্য) আমাদের সঙ্গে রয়েছেন, অতঃপর আল্লাহ তার প্রতি স্বীয় সান্ত্বনা নাযিল করলেন এবং তাকে শক্তিশালী করলেন এমন সেনাদল দ্বারা যাদেরকে তোমরা দেখতে পাওনি এবং আল্লাহ কাফিরদের বাক্য নীচু (অর্থাৎ প্রচেষ্টা ব্যর্থ) করে দিলেন, আর আল্লাহর বাণীই সমুচ্চ রইলো, আর আল্লাহ হচ্ছেন প্রবল প্রজ্ঞাময়।

٤٠- اِلَّا تَنْصُرُوْهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّٰهُ اِذْ اَخْرَجَهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ثَانِيَ اثْنَيْنِ اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُوْلُ لِصَاحِبِهٖ لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلَيْهِ وَ اَيَّدَهٗ بِجُنُوْدٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَ جَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا السُّفْلٰى وَ كَلِمَةُ اللّٰهِ هِيَ الْعُلْيَا وَ اللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ○

আল্লাহ তা'আলা (জিহাদ পরিত্যাগকারীদের সম্বোধন করে) বলছেন–তোমরা যদি আমার রাসূল (সঃ)-এর সাহায্য সহযোগিতা ছেড়ে দাও তবে জেনে রেখো যে, আমি কারো মুখাপেক্ষী নই। আমি নিজেই তাঁর সহায়ক ও পৃষ্ঠপোষক। ঐ সময়ের কথা তোমরা স্মরণ কর অর্থাৎ হিজরতের বছর যখন কাফিররা আমার রাসূল (সঃ)-কে হত্যা করা বা বন্দী করা অথবা দেশান্তর করার ষড়যন্ত্র করেছিল তখন তিনি প্রিয় ও বিশ্বস্ত সহচর আবূ বকর (রাঃ)-কে সাথে নিয়ে অতি সন্তর্পণে মক্কা থেকে বেরিয়ে যান। সেই সময় তাঁর সাহায্যকারী কে ছিল? তিন দিন পর্যন্ত 'সাওর' পর্বতের গুহায় তাঁরা আশ্রয় নেন। উদ্দেশ্য এই যে, তাঁদের পশ্চাদ্ধাবনকারীরা তাঁদেরকে না পেয়ে যখন নিরাশ হয়ে ফিরে যাবে তখন তাঁরা মদীনার পথ ধরবেন। ক্ষণে ক্ষণে আবূ বকর (রাঃ) ভীত বিহ্বল হয়ে ওঠেন যে, না জানি কেউ হয়তো জানতে পেরে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে কষ্ট দেয়! রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেনঃ "হে আবূ বকর (রাঃ)! দু'জনের কথা চিন্তা করছো কেন? তৃতীয়জন যে আল্লাহ রয়েছেন!"

আবূ বকর ইবনে আবূ কুহাফা (রাঃ) গুহায় নবী (সঃ)-কে বলেনঃ "এই কাফিরদের কেউ যদি পায়ের দিকে তাকায় তবেই তো আমাদেরকে দেখে নেবে!" তখন তিনি বলেনঃ "হে আবূ বকর! তুমি ঐ দু'জনকে কি মনে কর যাঁদের তৃতীয়জন আল্লাহ রয়েছেন?"[১] মোটকথা, এই জায়গাতেও মহান আল্লাহ তাঁর রাসূল (সঃ)-কে সাহায্য করেছিলেন। কোন কোন গুরুজন বলেছেন যে, এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলা নিজের পক্ষ থেকে আবূ বকর (রাঃ)-এর উপর সান্ত্বনা ও প্রশান্তি নাযিল করা বুঝানো হয়েছে। ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও অন্যান্যদের তাফসীর এটাই। তাঁদের দলীল এই যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর মধ্যে তো প্রশান্তি ছিলই। কিন্তু এই বিশেষ অবস্থায় প্রশান্তি নতুনভাবে নাযিল করার মধ্যেও তো কোন বৈপরীত্য নেই। এ জন্যেই আল্লাহ পাক এরই সাথে বলেন–আমি আমার অদৃশ্য সেনাবাহিনী পাঠিয়ে অর্থাৎ ফেরেশতাদের মাধ্যমে তাঁকে সাহায্য করেছি।

আল্লাহ তা'আলা কালেমায়ে কুফরকে দাবিয়ে দিয়েছেন এবং নিজের কালেমাকে সমুন্নত করেছেন। তিনি শিরককে নীচু করেছেন এবং তাওহীদকে উপরে উঠিয়েছেন। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আবূ মূসা আশআরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়ঃ "একটি লোক

১. এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রঃ) ও ইমাম মুসলিম (রঃ) আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) হতে তাখরীজ করেছেন।

বীরত্ব প্রকাশের উদ্দেশ্যে এবং আর একটি লোক মানুষকে খুশী করার জন্যে যুদ্ধ করছে, অন্য একটি লোক যুদ্ধ করছে জাতীয় মর্যাদা রক্ষার উদ্দেশ্যে, এ তিনজনের মধ্যে আল্লাহর পথের মুজাহিদ কে?" তিনি উত্তরে বললেনঃ "যে ব্যক্তি আল্লাহর কালেমাকে সমুন্নত করার নিয়তে যুদ্ধ করে সেই হচ্ছে আল্লাহর পথের মুজাহিদ।"

প্রতিশোধ গ্রহণে আল্লাহ প্রবল পরাক্রান্ত। তিনি যাকে ইচ্ছা সাহায্য করে থাকেন। তাঁর ইচ্ছায় কেউ পরিবর্তন আনয়ন করতে পারে না। কে এমন আছে যে, তাঁর সামনে মুখ খুলতে পারে বা চক্ষু উঠাতে পারে? তাঁর সমস্ত কথা ও কাজ নিপুণতা, যুক্তিসিদ্ধতা, কল্যাণ ও সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ।

৪১। বের হয়ে পড় স্বল্প সরঞ্জামের সাথে (-ই হোক) আর প্রচুর সরঞ্জামের সাথে (-ই হোক) এবং আল্লাহর পথে নিজেদের ধন-সম্পদ ও প্রাণ দ্বারা যুদ্ধ কর, এটা তোমাদের জন্যে অতি উত্তম, যদি তোমরা জানতে।

٤١- اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّ ثِقَالًا وَّ جَاهِدُوْا بِاَمْوَالِكُمْ وَ اَنْفُسِكُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○

সুফিয়ান সাওরী (রঃ) তাঁর পিতা হতে, তিনি আবুয যুহা মুসলিম ইবনে সাবীহ (রঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, সূরায়ে বারাআতের এ আয়াতটিই সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হয়। এতে রয়েছে যে, তাবূকের যুদ্ধের জন্যে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে সমস্ত মুসলিমের গমন করা উচিত। আহলে কিতাবদের কাফির রোমকদের সাথে জিহাদ করার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করা অবশ্য কর্তব্য। এতে তাদের মনের ইচ্ছা থাক আর নাই থাক এবং এটা তাদের কাছে সহজ কিংবা কঠিনই মনে হোক। বৃদ্ধেরা ও রুগ্ন ব্যক্তিরা বলছিলঃ "আমরা এ যুদ্ধে গমন না করলে পাপ হবে না।" তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করেন।

বৃদ্ধ ও যুবক সবারই জন্যে এ হুকুম সাধারণ হয়ে গেল। কারো কোন ওযর চললো না। আবূ তালহা (রাঃ) এ আয়াতের এই তাফসীরই করেছেন। এই হুকুম পালনার্থে এই মনীষী সিরিয়ার ভূমিতে চলে যান এবং খ্রীষ্টানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে জীবনদাতা আল্লাহর কাছে নিজের জীবন উৎসর্গ করে দেন। আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন এবং তাঁকে সন্তুষ্ট রাখুন!

আর একটি রিওয়ায়াতে আছে যে, আবূ তালহা (রাঃ) একদা اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّ ثِقَالًا وَّ جَاهِدُوْا بِاَمْوَالِكُمْ وَ اَنْفُسِكُمْ فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ-এই আয়াতটি পাঠ করে বলেনঃ "আমার ধারণায় তো আমাদের প্রতিপালক যুবক বৃদ্ধ সকলকেই জিহাদে অংশগ্রহণের দাওয়াত দিয়েছেন। হে আমার প্রিয় ছেলেরা! তোমরা আমার জন্যে যুদ্ধের সরঞ্জাম প্রস্তুত কর। আমি সিরিয়ার জিহাদে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে অবশ্যই যাত্রা শুরু করবো।" তাঁর ছেলেরা তখন তাঁকে বললেনঃ "আব্বা! রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নেতৃত্বাধীন আপনি তাঁর জীবদ্দশায় জিহাদ করেছেন। আবূ বকর (রাঃ)-এর খিলাফতের আমলেও আপনি মুজাহিদদের সাথে থেকেছেন। উমার (রাঃ)-এর খিলাফত কালেও আপনি একজন বিখ্যাত বীর হিসেবে পরিচিত হয়েছেন। এখন আপনার জিহাদ করার বয়স আর নেই। সুতরাং আপনি এখন বাড়ীতেই বিশ্রাম করুন। আমরাই আপনার পক্ষ থেকে জিহাদের ময়দানে যোগদান করছি।" কিন্তু তিনি তাঁদের কথা মানলেন না এবং ঐ মুহূর্তেই জিহাদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে গেলেন। সমুদ্র পার হওয়ার জন্যে তিনি নৌকায় আরোহণ করলেন। গন্তব্যস্থানে পৌঁছাতে তখনও কয়েকদিনের পথ বাকী। সমুদ্রের মাঝপথেই তাঁর প্রাণ পাখী উড়ে যায়। নয় দিন পর্যন্ত নৌকা চলতে থাকে, কিন্তু কোন দ্বীপ পাওয়া গেল না যে সেখানে তাঁকে দাফন করা যায়। নয় দিন পর যাত্রীরা স্থলভাগে অবতরণ করে এবং তাঁকে দাফন করা হয়। তখন পর্যন্ত মৃতদেহের কোনই পরিবর্তন ঘটেনি।

আরো বহু গুরুজন হতে خِفَافًا وَّ ثِقَالًا -এর তাফসীর যুবক ও বৃদ্ধ বর্ণিত হয়েছে। মোটকথা যুবক হোক, বৃদ্ধ হোক, কাজ থেকে অবসর প্রাপ্ত হোক, কাজের মধ্যে নিয়োজিত থাক, ধনী হোক বা গরীব হোক, ভারী হোক বা হালকা হোক, অভাবী হোক, কারীগর হোক, সুখী হোক বা দুঃখী হোক, পেশাদার হোক বা ব্যবসায়ী হোক, শক্তিশালী হোক বা দুর্বল হোক, যে অবস্থাতেই থাকুক না কেন, কোন ওযর না করেই দাঁড়িয়ে যেতে হবে এবং জিহাদের জন্যে যাত্রা শুরু করতে হবে।

এই মাসআলার বিস্তারিত ব্যাখ্যা হিসেবে ইমাম আবূ আমর আওযায়ী (রঃ) বলেন যে, যদি রোমের ভিতরে আক্রমণ হয় তবে মুসলিমরা হালকা ও সওয়ার অবস্থায় চলবে। আর যদি বন্দরের ধারে আক্রমণ হয় হবে হালকা, ভারী, সওয়ার ও পদব্রজ সব রকমভাবে বের হয়ে যাবে। কোন কোন গুরুজনের উক্তি এই যে, فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ (৯ঃ ১২২) এ আয়াত দ্বারা এই আয়াতটি

মানসূখ হয়ে গেছে। এর উপর আমরা ইনশাআল্লাহ পূর্ণভাবে আলোকপাত করবো।

বর্ণিত আছে যে, মিকদাদ (রাঃ) বড় ও মোটা দেহ বিশিষ্ট লোক ছিলেন। সুতরাং তিনি নিজের অবস্থা প্রকাশ করে যুদ্ধে না যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করেন। কিন্তু তাঁকে অনুমতি দেয়া হলো না এবং এ আয়াত অবতীর্ণ হলো। তখন এ হুকুম সাহাবীদের কাছে খুবই কঠিন ঠেকলো। আল্লাহ তা'আলা তখন لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى... (৯ঃ ৯১) এই আয়াতটি অবতীর্ণ করে উক্ত আয়াতটি মানসূখ করে দেন। অর্থাৎ " দুর্বল, রুগ্ন, অভাবী, যাদের কাছে খরচ করার কিছুই নেই, তারা যদি আল্লাহর দ্বীন ও রাসূল (সঃ)-এর শরীয়তের পক্ষপাতী ও শুভাকাঙ্ক্ষী হয় তবে তারা যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত না হলেও কোন দোষ নেই।"

আবূ আইয়ুব (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। অতঃপর তিনি একটি বছর ছাড়া কোন জিহাদেই অনুপস্থিত ছিলেন না। আর তিনি বলতেন যে, আল্লাহ তা'আলা ভারী ও হালকা উভয়কেই যুদ্ধে গমনের নির্দেশ দিয়েছেন। আর মানুষের অবস্থা তো এ দুটোই হয়ে থাকে।

আবূ রাশিদ হিরানী (রঃ) বর্ণনা করেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর অশ্বারোহী মিকদাদ ইবনে আসওয়াদ (রাঃ)-কে হিমস -এ দেখতে পাই। তাঁর হাড়ের জোড় ছুটে গিয়েছিল (তিনি অত্যন্ত বৃদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন)। তবুও দেখি যে, তিনি শিবিকার উপর সওয়ার হয়ে জিহাদের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেছেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনারতো শরীয়তসম্মত ওযর রয়েছে। তবুও আপনি এতো কষ্ট করছেন কেন? তিনি উত্তরে আমাকে বললেনঃ "দেখো, সূরাতুল বাঊস অর্থাৎ সূরায়ে বারাআত আমাদের সামনে অবতীর্ণ হয়েছে। তাতে হালকা, ভারী অর্থাৎ যুবক ও বৃদ্ধ সকলকেই যুদ্ধে গমনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।"

হাইয়ান ইবনে যায়েদ শারআবী (রঃ) বলেন, আমি হিমসের শাসনকর্তা সাফওয়ান ইবনে আমরের সাথে জারাজিমা অভিমুখে জিহাদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই। আমি দামেস্কের একজন অতি বয়স্ক বুযুর্গকে দেখলাম যিনি আক্রমণকারীদের সাথে নিজের উটের উপর সাওয়ার হয়ে আসছেন। তাঁর ভ্রূগুলো চোখের উপর পড়ে রয়েছে। তিনি অত্যন্ত বৃদ্ধ হয়ে গেছেন। আমি তাঁর নিকটে গিয়ে বললাম, চাচাজান! আল্লাহ তা'আলার কাছে তো আপনার ওযর করার অবকাশ রয়েছে। একথা শুনে তিনি চোখের উপর থেকে ভ্রূগুলো সরালেন

এবং বললেনঃ “দেখো, আল্লাহ তা'আলা হালকা ও ভারী উভয় অবস্থাতেই আমাদেরকে জিহাদে বের হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। জেনে রেখো, আল্লাহ তা'আলা যাকে ভালবাসেন তাকে তিনি পরীক্ষাও করে থাকেন। অতঃপর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে তিনি তার উপর রহমত বর্ষণ করেন। দেখো, আল্লাহর পরীক্ষা শোক্‌র, সবর, তাঁর যিক্‌র এবং খাঁটি তাওহীদের মাধ্যমেই হয়ে থাকে।”

জিহাদের হুকুম দেয়ার পর আল্লাহ তা'আলা তাঁর পথে ও রাসূল (সঃ)-এর সন্তুষ্টির কাজে মাল ও জান খরচ করার নির্দেশ দিচ্ছেন। তিনি বলছেন যে, এতেই দুনিয়া ও আখিরাতের মঙ্গল রয়েছে। পার্থিব মঙ্গল ও লাভ এই যে, সামান্য কিছু খরচ করে বহু গনীমতের মাল লাভ করা যাবে। আর আখিরাতের লাভ এই যে, এর চেয়ে বড় পুণ্য আর নেই। যেমন আল্লাহর নবী (সঃ) বলেনঃ “আল্লাহ তা'আলা তাঁর পথে জিহাদকারীর জন্যে এ দায়িত্ব গ্রহণ করেন যে, হয় তাকে শহীদ করে তিনি তাকে জান্নাতে প্রবিষ্ট করাবেন, না হয় গনীমতসহ নিরাপদে বাড়ীতে ফিরিয়ে আনবেন।” এই জন্যেই আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ “তোমাদের উপর যুদ্ধ ফরয করা হয়েছে এমতাবস্থায় যে, ওটা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয়, আর তোমরা কোন কিছু হয়তো অপছন্দ করে থাকো অথচ ওটাই তোমাদের জন্যে কল্যাণকর। পক্ষান্তরে তোমরা হয়তো কোন জিনিস পছন্দ করে থাকো অথচ ওটাই তোমাদের জন্যে ক্ষতিকর, আর (কোন্‌টা তোমাদের জন্যে ভাল এবং কোন্‌টা খারাপ তা) আল্লাহই জানেন, তোমরা জান না।” আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) একটি লোককে বলেনঃ “তুমি ইসলাম গ্রহণ কর।” লোকটি বললোঃ “আমার মন যে চায় না।” তখন তিনি তাকে বললেনঃ “মন না চাইলেও তুমি ইসলাম কবূল কর।”

৪২। যদি কিছু আশু লভ্য হতো এবং সফরও সহজ হতো, তবে তারা অবশ্যই তোমার সহগামী হতো, কিন্তু তাদের তো পথের দূরত্বই দীর্ঘতর বোধ হতে লাগলো; আর তারা এখনই আল্লাহর নামে শপথ করে বলবে– যদি আমাদের সাধ্য থাকতো তবে আমরা নিশ্চয়ই	٤٢- لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَّ سَفَرًا قَاصِدًا لَّاتَّبَعُوكَ وَ لٰكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللّٰهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا

لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُوْنَ اَنْفُسَهُمْ وَ اللّٰهُ يَعْلَمُ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ۝

তোমাদের সাথে বের হতাম, তারা (মিথ্যা বলে) নিজেরাই নিজেদেরকে ধ্বংস করছে, আর আল্লাহ জানেন যে, তারা মিথ্যাবাদী।

যারা তাবূকের যুদ্ধে গমন না করে বাড়ীতেই রয়েছিল এবং পরে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে এসে বানানো মিথ্যা ওযর পেশ করেছিল এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ধমকের সুরে বলছেন– প্রকৃতপক্ষে তাদের কোনই ওযর ছিল না। যদি সহজ লভ্য গনীমতের আশা থাকতো এবং নিকটের সফর হতো তবে এই লোভীদের দল অবশ্যই সঙ্গে যেতো। কিন্তু সিরিয়া পর্যন্ত দীর্ঘ সফর তাদের মন ভেঙ্গে দেয়। তাই তারা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে এসে মিথ্যা শপথ করে করে তাঁকে প্রতারিত করছে যে, তাদের যদি ওযর না থাকতো তবে অবশ্যই তারা তাঁর সঙ্গে যুদ্ধে গমন করতো। আল্লাহ তা'আলা বলছেন, তারা মিথ্যা কথা বলে নিজেদেরকে ধ্বংস করছে। তিনি জানেন যে, তারা মিথ্যাবাদী।

٤٣- عَفَا اللّٰهُ عَنْكَ لِمَ اَذِنْتَ لَهُمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَ تَعْلَمَ الْكٰذِبِيْنَ ۝

৪৩। আল্লাহ তোমাকে মার্জনা করলেন, (কিন্তু) তুমি তাদেরকে (এত শীঘ্র) কেন অনুমতি দিয়েছিলে যে পর্যন্ত না সত্যবাদী লোকেরা তোমার কাছে প্রকাশ হয়ে পড়তো এবং তুমি মিথ্যাবাদীদেরকে জেনে নিতে।

٤٤- لَا يَسْتَاْذِنُكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ اَنْ يُّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَ اَنْفُسِهِمْ وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالْمُتَّقِيْنَ ۝

৪৪। যারা আল্লাহর প্রতি ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে, তারা নিজেদের ধন-সম্পদ ও প্রাণ দ্বারা জিহাদ করার ব্যাপারে তোমার কাছে অব্যাহতি প্রার্থনা করবে না, আর আল্লাহ এই পরহেযগার লোকদের সম্বন্ধে খুব অবগত আছেন।

৪৫। অবশ্য ঐসব লোক তোমার কাছে অব্যাহতি চেয়ে থাকে, যারা আল্লাহর প্রতি ও আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে না, আর তাদের অন্তরসমূহ সন্দেহে নিপতিত রয়েছে, অতএব তারা নিজেদের সন্দেহে হতবুদ্ধি হয়ে রয়েছে।

٤٥- اِنَّمَا يَسْتَاْذِنُكَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَ ارْتَابَتْ قُلُوْبُهُمْ فَهُمْ فِيْ رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُوْنَ ○

ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন যে, আউন (রাঃ) স্বীয় সাথীদেরকে জিজ্ঞেস করেন, আপনারা কি এর চেয়ে উত্তম তিরস্কারের কথা শুনেছেন? মহান আল্লাহ স্বীয় রাসূল (সঃ)-কে তিরস্কারপূর্ণ কথা বলার পূর্বেই তাঁকে ক্ষমা করে দেয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। তিনি বলেছেনঃ "(হে নবী!) আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন বটে, কিন্তু কেন তুমি তাদেরকে যুদ্ধ হতে অব্যাহতির অনুমতি দিয়েছো?"[১] এরপর তিনি সূরায়ে নূরে আয়াত অবতীর্ণ করে তাঁর রাসূল (সঃ)-কে অবকাশ দেন যে, তিনি ইচ্ছা করলে তাদেরকে অনুমতি দিতে পারেন। তিনি বলেনঃ

فَاِذَا اسْتَاْذَنُوْكَ لِبَعْضِ شَاْنِهِمْ فَأْذَنْ لِّمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ ....

অর্থাৎ "তাদের কেউ যদি কোন কাজ ও ব্যস্ততার কারণে তোমার কাছে যুদ্ধের অব্যাহতির অনুমতি প্রার্থনা করে তবে তুমি তাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা অনুমতি দিতে পার।" (২৪ঃ ৬২)

মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, সূরায়ে তাওবার এ আয়াতটি ঐ লোকদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয় যারা পরস্পর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, তারা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে যুদ্ধ হতে অব্যাহতির অনুমতি প্রার্থনা করবে। যদি অনুমতি মিলে যায় তবে তো ভাল কথা। আর যদি তিনি অনুমতি নাও দেন তবুও তারা যুদ্ধে গমন করবে না। এ জন্যেই আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, যদি তারা অনুমতি লাভ না করতো তবে এটুকু লাভ তো অবশ্যই হতো যে, সত্য ওযরকারী ও মিথ্যা

১. ইবনে জারীর (রঃ) তাখরীজ করেছেন যে, পূর্বে কোন নির্দেশ ছাড়াই নবী দু'টি কাজ করেছেন। একটি হলো মুনাফিকদের যুদ্ধ হতে অব্যাহতির অনুমতি দান এবং দ্বিতীয় হলো বদরের বন্দীদের নিকট থেকে ফিদিয়া গ্রহণ। তখন আল্লাহ তা'আলা ঐ আয়াত অবতীর্ণ করেন।

বাহানাকারীদের মধ্যে পার্থক্য প্রকাশ পেয়ে যেতো। ভাল ও মন্দ এবং সৎ ও অসতের মধ্যে প্রভেদ সৃষ্টি হতো। অনুগত লোকেরা তো হাযির হয়েই যেতো। আর অবাধ্য লোকেরা যুদ্ধ হতে অব্যাহতি লাভের অনুমতি না পেয়েও বের হতো না। কেননা, তারা তো এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েই ছিল যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাদেরকে অনুমতি দিন আর নাই দিন, তারা যুদ্ধে গমন করবেই না। এ জন্যেই আল্লাহ তা'আলা পরবর্তী আয়াতে ঘোষণা করেন– এটা সম্ভব নয় যে, খাঁটি ঈমানদার লোকেরা তোমার কাছে যুদ্ধ হতে অব্যাহতি লাভের অনুমতি প্রার্থনা করবে। তারা তো জিহাদকে আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপায় মনে করে নিজেদের জান ও মালকে আল্লাহর পথে উৎসর্গ করতে সর্বদা আকাঙ্ক্ষী। আল্লাহ তা'আলা এই পরহেযগার লোকদেরকে ভালরূপেই অবগত আছেন। আর এ লোকগুলো, যাদের শরীয়ত সম্মত কোনই ওযর নেই, যারা শুধু বাহানা করে যুদ্ধ হতে অব্যাহতি লাভের অনুমতি প্রার্থনা করছে তারা বে-ঈমান লোক। তারা আখিরাতের পুরস্কারের কোন আশা রাখে না। হে নবী! তারা এখনও তোমার শরীয়তের ব্যাপারে সন্দিহান রয়েছে এবং তারা সদা উদ্বিগ্ন হয়ে ফিরছে। তারা এক পা সামনের দিকে বাড়িয়ে দিচ্ছে তো আর এক পা পিছনের দিকে সরাচ্ছে। তাদের কোন ধৈর্য ও মনের স্থিরতা নেই। তারা না আছে এদিকে, না আছে ওদিকে। হে নবী! আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তুমি কখনো তার জন্যে কোন পথ পাবে না।

৪৬। আর যদি তারা (যুদ্ধে) যাত্রা করার ইচ্ছা করতো, তবে ওর কিছু সরঞ্জাম তো প্রস্তুত করতো, কিন্তু আল্লাহ তাদের যাত্রাকে অপছন্দ করেছেন, এ জন্যে তাদেরকে তাওফীক দেননি এবং বলে দেয়া হলো– তোমরাও এখানেই অক্ষম লোকদের সাথে বসে থাকো।

٤٦- وَلَوْ اَرَادُوا الْخُرُوْجَ لَاَعَدُّوْا لَهٗ عُدَّةً وَّلٰكِنْ كَرِهَ اللّٰهُ انْۢبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيْلَ اقْعُدُوْا مَعَ الْقٰعِدِيْنَ ○

৪৭। যদি তারা তোমাদের সাথে বের হতো, তবে দ্বিগুণ বিভ্রাট সৃষ্টি করা ব্যতীত আর কি হতো? আর তারা তোমাদের

٤٧- لَوْ خَرَجُوْا فِيْكُمْ مَّا زَادُوْكُمْ اِلَّا خَبَالًا وَّ لَا اَوْضَعُوْا خِلٰلَكُمْ

يَبْغُوْنَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيْكُمْ سَمّٰعُوْنَ لَهُمْ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالظّٰلِمِيْنَ ○

মধ্যে ফাসাদ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে দৌড়াদৌড়ি করে ফিরতো, আর তোমাদের মধ্যে তাদের কতিপয় গুপ্তচর বিদ্যমান রয়েছে; আল্লাহ এই যালিমদের সম্বন্ধে খুব অবগত রয়েছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে নবী! তাদের ওযর যে মিথ্যা ও ভিত্তিহীন তার বাহ্যিক প্রমাণ এটাও যে, তাদের যুদ্ধে গমনের ইচ্ছা থাকলে কমপক্ষে তারা যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম তো প্রস্তুত করতো। কিন্তু তারাতো যুদ্ধে গমনের ঘোষণা ও নির্দেশের পরেও এবং দিন অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পরেও হাতের উপর হাত রেখে বসে রয়েছে। তারা একটা খড়কুটাকেও এদিক থেকে ওদিকে নিয়ে যায়নি। অবশ্য তাদের তোমাদের সাথে বের হওয়াকে আল্লাহ তা'আলা পছন্দও করেননি। এ কারণেও তিনি তাদেরকে পিছনে সারিয়ে রেখেছেন। আর স্বাভাবিকভাবে তাদেরকে বলে দিয়েছিলেন, যুদ্ধ থেকে দূরে অবস্থানকারীদের সাথে তোমরাও অবস্থান কর। হে মুসলিমরা! তোমাদের সাথে তাদের বের হওয়া আল্লাহ তা'আলার নিকট অপছন্দনীয় হওয়ার কারণ এই যে, তারা তো ভীরু ও বড় রকমের কাপুরুষ। যুদ্ধ করার সাহস তাদের মোটেই নেই। তোমাদের সাথে গেলেও তারা দূরে দূরেই থাকতো। তা ছাড়া তারা তোমাদের পরস্পরের মধ্যে বিবাদ বাঁধিয়ে দিতো। তারা এদিকের কথা ওদিকে এবং ওদিকের কথা এদিকে লাগিয়ে দিয়ে পরস্পরের মধ্যে শত্রুতার সৃষ্টি করতো এবং কোন একটা নতুন ফিৎনা খাড়া করে তোমাদের অবস্থাকে জটিল করে তুলতো। তোমাদের মধ্যে এমন লোকও বিদ্যমান রয়েছে যারা ঐসব লোককে মান্য করে চলে, তাদের মতামত সমর্থন করে এবং তাদের কার্যক্রমকে সুনজরে দেখে থাকে। তারা ভুলের মধ্যে নিমজ্জিত রয়েছে বলে ঐসব লোকের দুষ্কার্যের ব্যাপারে সম্পূর্ণরূপে বে-খবর থাকে। মুমিনদের পক্ষে এর ফল খুবই খারাপ হয়। তাদের পরস্পরের মধ্যে অনাচার ও ঝগড়া-বিবাদ ছড়িয়ে পড়ে। মুজাহিদ (রঃ) প্রমুখ গুরুজনের উক্তি এই যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে– হে মুমিনগণ! ঐ সব লোকের গুপ্তচরও তোমাদের মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে, যারা তোমাদের খুঁটিনাটি সংবাদও তাদের কাছে পৌঁছিয়ে থাকে। কিন্তু এ অর্থ করাতে ঐ সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যাচ্ছে যা আয়াতের

শুরুতে ছিল। অর্থাৎ ঐ লোকদের তোমাদের সাথে বের হওয়া এ জন্যেও অপছন্দনীয় যে, তোমাদের মধ্যে এমন কতকগুলো লোকও রয়েছে যারা তাদের কথা মেনে থাকে। এটা তো খুবই সঠিক কথা। কিন্তু তাদের বের না হওয়ার কারণের জন্যে গোয়েন্দাগিরির কোন বিশেষত্ব থাকতে পারে না। এ জন্যেই কাতাদা (রঃ) প্রমুখ মুফাস্সিরদের উক্তি এটাই।

ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক (রঃ) বলেন যে, অনুমতি প্রার্থনাকারীদের মধ্যে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুল এবং জাদ ইবনে কায়েসও ছিল। এরাই ছিল বড় বড় নেতা ও প্রভাবশালী মুনাফিক। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে দূরে নিক্ষেপ করে দেন। যদি তারা মুসলিমদের সাথে বের হতো তবে তাদের অনুগত লোকেরা সময় সুযোগে তাদের সাথে যোগ দিয়ে মুসলিমদের ক্ষতি সাধন করতো। মুহাম্মাদী সেনাবাহিনীর মধ্যে বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে যেতো। কেননা, এই মুনাফিকরা বাহ্যিক সৌন্দর্যের অধিকারী ছিল। কিছু কিছু মুসলিম তাদের প্রকৃত অবস্থা অবহিত ছিল না। তাই তারা তাদের বাহ্যিক ইসলাম ও মুখরোচক কথায় পাগল ছিল এবং তখন পর্যন্ত তাদের অন্তরে তাদের প্রতি ভালবাসা বিদ্যমান ছিল। এটা সত্য কথা যে, তাদের এ অবস্থা মুনাফিকদের আসল অবস্থা অবগত না হওয়ার কারণেই ছিল। পূর্ণ জ্ঞান তো আল্লাহ তা'আলারই রয়েছে। তিনি অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সমস্ত খবরই রাখেন। তিনি অদৃশ্যের সংবাদ রাখেন বলেই মুসলিমদেরকে বলছেন– হে মুসলিমরা! এই মুনাফিকদের যুদ্ধে গমন না করাকে তোমরা গনীমত মনে কর। যদি তারা তোমাদের সাথে থাকতো তবে ফিৎনা-ফাসাদ সৃষ্টি করতো। তারা নিজেরাও ভাল কাজ করতো না এবং তোমাদেরকেও করতে দিতো না।

এ জন্যেই আল্লাহ পাক বলেনঃ "যদি তাদেরকে (কাফিরদেরকে) দ্বিতীয়বার দুনিয়ায় পাঠিয়ে দেয়া হয় তবে তারা আবার নতুনভাবে ঐ কাজই করবে যা থেকে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে এবং নিশ্চয়ই তারা মিথ্যাবাদী।" অন্য জায়গায় মহান আল্লাহ বলেনঃ "যদি তাদের অন্তরে কোন কল্যাণ নিহিত থাকতো তবে অবশ্যই তিনি তাদেরকে শুনিয়ে দিতেন, আর যদি তিনি তাদেরকে শুনাতেনও তবে তারা তাচ্ছিল্যভরে ফিরে যেতো।" আর এক স্থানে আল্লাহ পাক বলেনঃ "যদি আমি তাদের উপর ফরয করে দিতাম (দিয়ে বলতাম)– তোমরা আত্মহত্যা কর কিংবা নিজেদের দেশ থেকে বেরিয়ে যাও, তবে অল্প কয়েকজন ব্যতীত এই আদেশ কেউই পালন করতো না, আর যদি তারা তাদেরকে যেরূপ

উপদেশ দেয়া হয় তদনুযায়ী কাজ করতো, তবে তাদের জন্যে উত্তম হতো এবং ঈমানকে অধিকতর দৃঢ়কারী হতো। আর এ অবস্থায় আমি তাদেরকে বিশেষ করে আমার পক্ষ থেকে মহা পুরস্কার প্রদান করতাম। আর আমি অবশ্যই তাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করতাম।" এ ধরনের আয়াত আরো অনেক রয়েছে।

٤٨- لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَ قَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتّٰى جَاءَ الْحَقُّ وَ ظَهَرَ أَمْرُ اللّٰهِ وَ هُمْ كٰرِهُونَ ○

৪৮। তারা তো পূর্বেও ফাসাদ সৃষ্টির চেষ্টা করেছিল, আর তোমার (ক্ষতি সাধনের) জন্যে কর্মসমূহ উলট পালট করতেছিল, এ পর্যন্ত যে, সত্য অঙ্গীকার এসে পড়লো এবং আল্লাহর হুকুম বিজয় লাভ করলো, অথচ তাদের কাছে এটা অপ্রীতিকরই বোধ হচ্ছিল।

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নবী (সঃ)-এর অন্তরে মুনাফিকদের প্রতি ঘৃণার উদ্রেক করার জন্যে বলেন, হে নবী! তুমি কি ভুলে গেছ যে, এই মুনাফিকরা বহুদিন ধরে ফিৎনা ও ফাসাদের অগ্নি প্রজ্বলিত করতে রয়েছে এবং তোমার কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি করার সব রকমের তদবীর চালিয়েছে। মদীনায় তোমার প্রতিষ্ঠা লাভের পরই সমস্ত আরব এক হয়ে বিপদের বৃষ্টি তোমার উপর বর্ষণ করেছে। মদীনার ইয়াহূদী ও মুনাফিকরা মদীনায় বিদ্রোহ ঘোষণা করে দেয়। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা এক দিনেই তাদের সকলের কামান ভেঙ্গে চুরমান করে দেন। তিনি তাদের জোড় ঢিলা করে দেন এবং তাদের উত্তেজনা ঠাণ্ডা করে দেন। বদরের যুদ্ধ তাদেরকে হতবাক করে দেয় এবং তাদের মনের কামনা ও বাসনা মুছে ফেলেন অর্থাৎ তারা তাদের সফল হওয়ার ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে যায়। মুনাফিকদের নেতা আবদুল্লাহ ইবনে উবাই তো পরিষ্কারভাবে বলে দেয়– "এ লোকগুলো এখন আমাদের ক্ষমতার বাইরে চলে গেছে। এখন আমাদের এ ছাড়া কোন উপায় নেই যে, আমরা বাহ্যতঃ ইসলামের অনুকূলে থাকবো, কিন্তু অন্তরে যা আছে তা তো আছেই। সময় সুযোগ আসলে দেখা যাবে এবং দেখানো যাবে।" তারপর যতোই সত্যের উন্নতি হতে থাকে এবং তাওহীদ বিকাশ লাভ করতে থাকে, ততোই তারা হিংসার আগুনে দগ্ধীভূত হতে থাকে। অবশেষে সত্য

প্রতিষ্ঠিত হয় এবং আল্লাহর কালেমার বিজয় ডংকা বেজে ওঠে। আর এদিকে এই মুনাফিকদের পেট ফুলতে থাকে এবং এটা তাদের কাছে খুবই অপ্রীতিকর বোধ হয়।

৪৯। আর তাদের মধ্যে কেউ কেউ এমন আছে, যে বলে- আমাকে (যুদ্ধে গমন না করার) অনুমতি দিন এবং আমাকে বিপদে ফেলবেন না, ভালরূপে বুঝে নাও যে, তারা তো বিপদে পড়েই গেছে, আর নিশ্চয়ই জাহান্নাম এই কাফিরদেরকে বেষ্টন করবেই।

٤٩- وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ ائْذَنْ لِّيْ وَلَا تَفْتِنِّيْ ؕ اَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوْا ؕ وَاِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيْطَةٌ ۢبِالْكٰفِرِيْنَ ○

আল্লাহ তা'আলা বলেন, মুনাফিকদের মধ্যে এমন লোকও আছে, যে বলে- হে মুহাম্মাদ (সঃ)! আমাকে (বাড়ীতেই) বসে থাকার অনুমতি দিন এবং আপনার সাথে যুদ্ধে গমনের নির্দেশ দিয়ে আমাকে বিপদে ফেলবেন না। কেননা, রোমক যুবতী নারীদের প্রেমে হয়তো আমি পড়ে যাব। আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, এ কথা বলার কারণে তারা তো বিপদে পড়েই গেছে। যেমন একদা রাসূলুল্লাহ (সঃ) যুদ্ধে গমনের প্রস্তুতি গ্রহণের অবস্থায় জাদ ইবনে কায়েসকে বলেনঃ "তুমি এ বছর কি বানী-আসফারকে দেশান্তর করার কাজে আমাদের সঙ্গী হবে?" সে উত্তরে বলেঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমাকে যুদ্ধে গমন না করার অনুমতি দিন এবং আমাকে বিপদে ফেলবেন না। আল্লাহর কসম! আমার কওম জানে যে, আমার চেয়ে স্ত্রীলোকদের প্রতি বেশী আকৃষ্ট আর কেউ নেই। আমি আশংকা করছি যে, আমি যদি বানী আসফারের নারীদের দেখতে পাই তবে ধৈর্যধারণ করতে পারবো না।" তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন এবং বলেনঃ "আমি তোমাকে অনুমতি দিলাম।" এই জাদ ইবনে কায়েসের সম্পর্কেই এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।[১] এ আয়াতে বলা হয়েছে- এই মুনাফিক এই বাহানা বানিয়ে নিয়েছে, অথচ সে তো ফিৎনার মধ্যে পড়েই রয়েছে।

১. এ হাদীসটি মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক (রঃ) যুহরী (রঃ) হতে তাখরীজ করেছেন এবং এটা ইবনে আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রঃ) প্রমুখ একাধিক বর্ণনাকারী হতে বর্ণিত হয়েছে। আর জাদ ইবনে কায়েস ছিল বানু সালামা গোত্রের সম্ভ্রান্ত ও নেতৃস্থানীয় লোক।

রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সঙ্গ ছেড়ে দেয়া এবং জেহাদ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া কি কম ফিৎনা? এই মুনাফিক বানু সালামা গোত্রের বড় নেতা ছিল। যখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) এই গোত্রের লোকদেরকে জিজ্ঞেস করেনঃ "তোমাদের নেতা কে?" তারা তখন উত্তরে বলেঃ "আমাদের নেতা হচ্ছে জাদ ইবনে কায়েস, সে বড়ই কৃপণ।" রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন বলেনঃ "কৃপণতা অপেক্ষা জঘন্য রোগ আর কি আছে? জেনে রেখো যে, তোমাদের নেতা হচ্ছে সাদা দেহ ও সুন্দর চুল বিশিষ্ট নব যুবক বিশর ইবনে বারা ইবনে মা'রূর।"

নিশ্চয়ই জাহান্নাম কাফিরদেরকে পরিবেষ্টনকারী। তারা জাহান্নাম থেকে রক্ষাও পাবে না, পালাতেও পারবে না এবং মুক্তিও পাবে না।

৫০। যদি তোমার প্রতি কোন মঙ্গল উপস্থিত হয় তবে তাদের জন্যে তা চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ায়, আর যদি তোমার উপর কোন বিপদ এসে পড়ে, তখন তারা বলে- আমরা তো প্রথম থেকেই নিজেদের সাবধানতার পথ অবলম্বন করেছিলাম, এবং তারা খুশী হয়ে চলে যায়।

٥٠- إِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَ يَتَوَلَّوْا وَّهُمْ فَرِحُونَ○

৫১। তুমি বলে দাও- আল্লাহ আমাদের জন্যে যা নির্ধারণ করে দিয়েছেন তা ছাড়া অন্য কোন বিপদ আমাদের উপর আসতে পারে না, তিনিই আমাদের কর্মবিধায়ক, আর সকল মুমিনেরই কর্তব্য হলো যে, তারা যেন নিজেদের যাবতীয় কাজে আল্লাহর উপরই নির্ভর করে।

٥١- قُلْ لَّنْ يُّصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا هُوَ مَوْلٰنَا وَ عَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ○

এখানে আল্লাহ তা'আলা ঐ মুনাফিকদের অন্তরের কুটিলতার বর্ণনা দিচ্ছেন যে, মুসলিমদের বিজয়, সাহায্য, কল্যাণ ও উন্নতি লাভে তারা অত্যন্ত চিন্তান্বিত

ও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে, আর আল্লাহ না করুন, যদি মুসলিমদের উপর কোন বিপদ এসে পড়ে তখন তারা মনে খুবই আনন্দ লাভ করে এবং নিজেদের চতুরতার প্রশংসা করে। তারা বলেঃ "এই কারণেই তো আমরা তাদের থেকে দূরে রয়েছি।" এই বলে তারা আনন্দে উৎফুল্ল হয়। আল্লাহ তা'আলা, মুসলিমদেরকে বলেন, তোমরা ঐ মুনাফিকদেরকে উত্তর দাও– দুঃখ ও অশান্তি আমাদের তকদীরের লিখন এবং আমরা স্বয়ং আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছার অধীন। তিনিই আমাদের অভিভাবক, তিনিই আমাদের প্রতিপালক, তিনিই আমাদের আশ্রয়স্থল। আমরা মুমিন, আর মুমিনদের ভরসা আল্লাহর উপর। তিনি আমাদের জন্যে যথেষ্ট। তিনিই উত্তম কার্যসম্পাদনকারী।

৫২। (হে নবী!) তুমি বলে দাও– তোমরা তো আমাদের জন্যে দু'টি মঙ্গলের মধ্যে একটি মঙ্গলের প্রতীক্ষায় রয়েছো; আর আমরা তোমাদের জন্যে এই প্রতীক্ষা করছি যে, আল্লাহ তোমাদের উপর কোন শাস্তি সংঘটন করবেন নিজের পক্ষ হতে অথবা আমাদের দ্বারা, অতএব তোমরা অপেক্ষা করতে থাকো, আমরা তোমাদের সাথে অপেক্ষমান রইলাম।

٥٢- قُلْ هَلْ تَرَبَّصُوْنَ بِنَآ اِلَّآ اِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ اَنْ يُّصِيْبَكُمُ اللّٰهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهٖٓ اَوْ بِاَيْدِيْنَا فَتَرَبَّصُوْٓا اِنَّا مَعَكُمْ مُّتَرَبِّصُوْنَ ○

৫৩। তুমি (আরও) বলে দাও– তোমরা সন্তুষ্টির সাথে ব্যয় কর কিংবা অসন্তুষ্টির সাথে, তোমাদের পক্ষ থেকে তা কখনই গৃহীত হবে না; নিঃসন্দেহে তোমরা হচ্ছ আদেশ লঙ্ঘনকারী সমাজ।

٥٣- قُلْ اَنْفِقُوْا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا لَّنْ يُّتَقَبَّلَ مِنْكُمْ اِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فٰسِقِيْنَ ○

৫৪। আর তাদের দান-খয়রাত গ্রহণ করতে নিষেধ করা হয়েছে এ জন্যে যে, তারা আল্লাহর সাথে ও তাঁর রাসূলের সাথে কুফরী করেছে, আর তারা সালাত শৈথিল্যের সাথে ছাড়া পড়ে না, আর তারা দান করে না, কিন্তু অনিচ্ছার সাথে (করে)।

٥٤- وَ مَا مَنَعَهُمْ اَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقٰتُهُمْ اِلَّاۤ اَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَ بِرَسُوْلِهٖ وَ لَا يَاْتُوْنَ الصَّلٰوةَ اِلَّا وَ هُمْ كُسَالٰى وَ لَا يُنْفِقُوْنَ اِلَّا وَ هُمْ كٰرِهُوْنَ○

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল (সঃ)-কে সম্বোধন করে বলছেনঃ হে রাসূল! ঐ মুনাফিকদেরকে বলে দাও– তোমরা আমাদের জন্যে দু'টি মঙ্গলের মধ্যে একটি মঙ্গলেরই প্রতীক্ষায় রয়েছো। অর্থাৎ যদি আমরা যুদ্ধে শহীদ হয়ে যাই তবে আমাদের জন্যে রয়েছে জান্নাত। এটাও আমাদের জন্যে মঙ্গল। আর যদি বিজয় লাভ করি ও গনীমতের অধিকারী হই তবে এটাও মঙ্গল। সুতরাং হে মুনাফিকের দল! তোমরা যে আমাদের ব্যাপারে অপেক্ষা করছো যে, দেখা যাক কি ঘটে, তবে জেনে রেখো যে, আমাদের জয়-পরাজয় যাই ঘটুক না কেন, দুটোই আমাদের জন্যে মঙ্গলজনক। আর আমরা তোমাদের ব্যাপারে যার অপেক্ষা করছি তা হচ্ছে দু'টি মন্দের একটি মন্দ। অর্থাৎ হয়তো তোমাদের উপর আল্লাহর আযাব সরাসরি এসে যাবে অথবা আমাদের হাতে তোমাদের উপর আল্লাহর মার পড়বে। তা এই ভাবে যে, তোমরা আমাদের হাতে নিহত হবে অথবা বন্দী হবে। আচ্ছা, এখন তোমরা ও আমরা নিজ নিজ জায়গায় প্রতীক্ষায় থাকি, দেখা যাক গায়েবের পর্দা থেকে কি প্রকাশ পায়!

জেনে রেখো যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের দান-খয়রাতের আশাবাদী নন। তোমরা খুশী মনে খরচ কর বা অসন্তুষ্ট চিত্তে, কোন অবস্থাতেই আল্লাহ তোমাদের দান কবূল করবেন না।[১] কেননা তোমরা তো ফাসেক বা আল্লাহর আদেশ লংঘনকারী সমাজ। তোমাদের দান-খয়রাত কবূল না করার কারণ হচ্ছে তোমাদের কুফরী। আর আমল কবূল হওয়ার শর্ত হচ্ছে কুফরী না থাকা, বরং

১. লুবাব গ্রন্থে রয়েছে, ইবনে জারীর (রঃ) তাখরীজ করেছেন যে, জাদ ইবনে কায়েস বলে– "আমি দেখি যে, ধৈর্যধারণের শক্তি আমার নেই। তবে হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমি আপনাকে অর্থ দিয়ে সাহায্য করবো।" তখন আল্লাহ তা'আলা .... قُلْ اَنْفِقُوْا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا আয়াতটি অবতীর্ণ করেন।

ঈমান থাকা। তা ছাড়া কোন কাজেই তোমাদের সদিচ্ছা ও সৎ সাহস নেই। সালাত আদায় করলেও তোমরা উদাসীনতার সাথে আদায় করে থাকো। তাতে তোমাদের কোন মনোযোগ থাকে না। অলসভাবে তোমরা লোককে দেখিয়ে জামাআতে হাযির হও এবং দু'চার সিজদা দিয়ে দাও। কিন্তু তোমাদের মন থাকে সালাত থেকে সম্পূর্ণ গাফেল। সত্যবাদী ও সত্যায়িত রাসূল (সঃ) সংবাদ দিয়েছেনঃ "আল্লাহ বিরক্ত হন না যে পর্যন্ত না তোমরা বিরক্ত হও। আল্লাহ পবিত্র এবং তিনি পবিত্র জিনিসই কবূল করে থাকেন।" এ জন্যেই আল্লাহ তা'আলা এসব ফাসেকের দান-খয়রাত ও আমল কবূল করবেন না। কেননা, তিনি একমাত্র পরহেযগার লোকদের আমলই কবূল করে থাকেন।

৫৫। অতএব তাদের ধন-সম্পদ এবং সন্তানাদি যেন তোমাকে বিস্মিত না করে; আল্লাহর ইচ্ছা শুধু এটাই যে, এসব বস্তুর কারণে তাদেরকে পার্থিব জীবনে আযাবে আবদ্ধ রাখেন; এবং তাদের প্রাণ কুফরীরই অবস্থায় বের হয়।

٥٥- فَلَا تُعْجِبْكَ اَمْوَالُهُمْ وَلَاۤ اَوْلَادُهُمْ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ اَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كٰفِرُوْنَ ۝

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল (সঃ)-কে বলেন, তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান সন্ততির প্রাচুর্য যেন তোমাকে বিস্মিত না করে। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেনঃ "তুমি কদাচ ঐসব বস্তুর প্রতি চোখ তুলেও দেখো না, যদদ্বারা আমি কাফিরদের বিভিন্ন সম্প্রদায়কে উপভোগী করে রেখেছি, এটা শুধু পার্থিব জীবনের চাকচিক্য, তাদেরকে পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে, আর তোমার প্রতিপালকের দান বহুগুণে শ্রেয় এবং অধিক স্থায়ী।" হাসান বসরী (রঃ) বলেন যে, এ আয়াতের ভাবার্থ হচ্ছে– এটা তাদের পক্ষে ভাল ও খুশীর ব্যাপার নয়। এটা তো তাদের জন্যে পার্থিব শাস্তিও বটে। কেননা, না এর দ্বারা যাকাত আদায় করা যাবে, না আল্লাহর পথে খরচ করা চলবে। কাতাদা (রঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হবে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী, অর্থাৎ হে নবী (সঃ)! তাদের পার্থিব ধন-সম্পদ ও সন্তান সন্ততি যেন তোমাকে বিস্মিত না করে, আল্লাহর উদ্দেশ্য শুধু এটাই যে, এসব বস্তুর কারণে তিনি পরকালে তাদেরকে শাস্তি প্রদান করবেন। ইবনে জারীর (রঃ) হাসান (রঃ)-এর উক্তিকেই পছন্দ করেছেন এবং এ উক্তিটিই দৃঢ় ও উত্তমও বটে।

তারা ধন-সম্পদ ও সন্তান সন্ততির মধ্যে এমনভাবে জড়িত হয়ে পড়বে যে, মৃত্যু পর্যন্ত হিদায়াত তাদের ভাগ্যে জুটবে না। এমনভাবে ধীরে ধীরে তাদেরকে পাকড়াও করা হবে যে, তারা টেরও পাবে না। এই ধন-সম্পদই জাহান্নামের আগুনে পরিণত হবে। আমরা এর থেকে আল্লাহ তা'আলার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

৫৬। আর তারা আল্লাহর কসম করে বলে যে, তারা (মুনাফিকরা) তোমাদেরই অন্তর্ভুক্ত; অথচ তারা তোমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়, বরং তারা হচ্ছে কাপুরুষের দল।

٥٦- وَ يَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ اِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَ مَا هُمْ مِّنْكُمْ وَ لٰكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَّفْرَقُوْنَ ○

৫৭। যদি তারা কোন আশ্রয়স্থল পেতো, অথবা গুহা কিংবা লুকিয়ে থাকার একটু স্থান পেতো, তবে তারা অবশ্যই ক্ষিপ্রগতিতে সেই দিকে ধাবিত হতো।

٥٧- لَوْ يَجِدُوْنَ مَلْجَاً اَوْ مَغٰرٰتٍ اَوْ مُدَّخَلًا لَّوَلَّوْا اِلَيْهِ وَ هُمْ يَجْمَحُوْنَ ○

এখানে আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদের অস্থিরতা, হতবুদ্ধিতা, উদ্বেগ, সন্ত্রাস ও ব্যাকুলতার সংবাদ দিচ্ছেন। তিনি বলছেন– হে মুসলিমরা! এই মুনাফিকরা তোমাদের কাছে এসে তোমাদের মন জয় করার উদ্দেশ্যে এবং তোমাদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে লম্বা চওড়া কসম করে করে বলেঃ "আল্লাহর শপথ! আমরা তোমাদের সাথেই রয়েছি, আমরা মুসলিম।" অথচ প্রকৃত ব্যাপার এর বিপরীত। এটা শুধু ভয় ও সন্ত্রাস, যা তাদের পেটে ব্যথা সৃষ্টি করছে। আজ যদি তারা নিজেদের রক্ষার জন্যে কোন দুর্গ পেয়ে যায় বা অন্য কোন সুরক্ষিত স্থান দেখতে পায় অথবা কোন সুড়ঙ্গের সংবাদ পায় তবে তারা সবাই উন্নতশিরে ঊর্ধ্বশ্বাসে ঐ দিকে ধাবিত হবে। তাদের একজনকেও তোমার কাছে দেখা যাবে না। কেননা, প্রকৃতপক্ষে তোমার সাথে তাদের কোন ভালবাসা ও বন্ধুত্বই নেই। তারা তো শুধু ভয়ে বাধ্য হয়ে তোমাদেরকে তোষামোদ করতে আসছে। একমাত্র এই কারণেই যতোই ইসলামের উন্নতি হচ্ছে ততোই তারা মনঃক্ষুণ্ণ হচ্ছে। মুসলিমদের কল্যাণে ও খুশীতে তারা জ্বলে পুড়ে মরছে। তোমাদের উন্নতি এদের সহ্য হচ্ছে না। সুযোগ পেলেই তারা আশ্রয়স্থলের দিকে দৌড়িয়ে পালাবে।

৫৮। আর তাদের মধ্যে এমন কতক লোক রয়েছে যারা সাদকার (বণ্টন) ব্যাপারে তোমার প্রতি দোষারোপ করে, অতঃপর যদি তারা ঐ সমস্ত সাদকা হতে (অংশ) প্রাপ্ত হয় তবে তারা সন্তুষ্ট হয়, আর যদি তারা তা থেকে (অংশ) না পায় তবে তারা অসন্তুষ্ট হয়ে যায়।

٥٨- وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّلْمِزُكَ فِى الصَّدَقٰتِ ۚ فَاِنْ اُعْطُوْا مِنْهَا رَضُوْا وَاِنْ لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَآ اِذَا هُمْ يَسْخَطُوْنَ ○

৫৯। তাদের জন্যে উত্তম হতো যদি তারা ওর প্রতি সন্তুষ্ট থাকতো যা কিছু তাদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল দান করেছিলেন, আর বলতো– আমাদের পক্ষে আল্লাহই যথেষ্ট, ভবিষ্যতে আল্লাহ স্বীয় অনুগ্রহে আমাদেরকে আরো দান করবেন এবং তাঁর রাসূলও, আমরা আল্লাহরই প্রতি আগ্রহান্বিত রইলাম।

٥٩- وَلَوْ اَنَّهُمْ رَضُوْا مَآ اٰتٰهُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ ۙ وَقَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ سَيُؤْتِيْنَا اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ وَرَسُوْلُهٗۤ ۙ اِنَّآ اِلَى اللّٰهِ رٰغِبُوْنَ ○ ع

কোন কোন মুনাফিক রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে এই অপবাদ দিতো যে, তিনি যাকাতের মালের সঠিক বণ্টন করেন না ইত্যাদি। আর এর দ্বারা তাঁর থেকে কিছু লাভ করা ছাড়া তাদের আর কিছুই উদ্দেশ্য ছিল না। তাঁর থেকে কিছু পেলে তো তারা খুবই সন্তুষ্ট হয়, আর না পেলে মনঃক্ষুণ্ন হয়।

রাসূলুল্লাহ (সঃ) যাকাতের মাল যখন এদিক ওদিক বণ্টন করে দেন, তখন আনসারদের একজন উচ্চৈঃস্বরে বলেঃ "এটা ইনসাফ নয়।" তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয়।

অন্য একটি রিওয়ায়াতে আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ (সঃ) সোনা রূপা বণ্টন করছিলেন। এমতাবস্থায় একজন গ্রাম্য নওমুসলিম তাঁর কাছে এসে বলেঃ "হে মুহাম্মাদ (সঃ)! আল্লাহর কসম! আল্লাহ যদি আপনাকে ইনসাফের নির্দেশ দিয়ে

থাকেন তবে কিন্তু আপনি ইনসাফ করছেন না।” তখন নবী (সঃ) বলেনঃ “তুমি ধ্বংস হও। আমিই যদি ইনসাফকারী না হই তবে যমীনে ইনসাফকারী আর কে হবে?” অতঃপর তিনি বলেনঃ “তোমরা এই ব্যক্তি থেকে এবং এর সাথে সাদৃশ্যযুক্ত লোক থেকে বেঁচে থাকো। আমার উম্মতের মধ্যে এর মত লোক হবে। তারা কুরআন পাঠ করবে বটে, কিন্তু তা তাদের কণ্ঠ থেকে নীচে নামবে না। তারা যখন বের হবে তখন তাদেরকে হত্যা করে ফেলবে। আবার যখন বের হবে তখন তাদেরকে মেরে ফেলো। পুনরায় যখন প্রকাশ পাবে তখন তাদের গর্দান উড়িয়ে দেবে।” এরপর তিনি বলেনঃ “আল্লাহর কসম! আমি তোমাদেরকে কিছু প্রদানও করবো না এবং তোমাদেরকে তা থেকে বাধাও দিবো না, আমি তো একজন খাজাঞ্চী মাত্র।”

আবূ সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) যখন হুনায়েনের গনীমতের মাল বণ্টন করছিলেন তখন যুলখুওয়াইসিরা হারকুস নামক একটি লোক আপত্তি করে বলেঃ “ইনসাফ করুন, কেননা আপনি ইনসাফ করছেন না।” তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে বলেনঃ “তুমি ধ্বংস হও, যদি না আমি ইনসাফ করে থাকি।” অতঃপর তিনি তাকে চলে যেতে দেখে বললেনঃ “এর বংশ থেকে এমন এক কওম বের হবে যাদের সালাতের তুলনায় তোমাদের সালাত নগণ্য মনে হবে এবং যাদের রামাদানের তুলনায় তোমাদের রামাদান তুচ্ছ মনে হবে। কিন্তু তারা দ্বীন থেকে এমনভাবে বেরিয়ে যাবে যেমনভাবে তীর নিক্ষেপকারীর নিকট থেকে তীর বেরিয়ে যায়। তাদেরকে তোমরা যেখানেই পাবে হত্যা করবে। আকাশের নীচে তাদের অপেক্ষা নিকৃষ্টতম হত্যাযোগ্য আর কেউ নেই।” পরে অবশিষ্ট হাদীস বর্ণনা করেন।

ইরশাদ হচ্ছে– তাদেরকে আল্লাহ স্বীয় রাসূল (সঃ)-এর মাধ্যমে যা কিছু দান করেছেন, ওর উপর যদি তারা তুষ্ট থাকতো এবং ধৈর্যধারণ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলতো– “আল্লাহই আমাদের জন্যে যথেষ্ট। তিনি স্বীয় অনুগ্রহে তাঁর রাসূল (সঃ)-এর মাধ্যমে আমাদেরকে আরো দান করবেন। আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা আমাদের প্রতিপালকের সত্তার সাথেই জড়িত।” তাহলে এটা তাদের পক্ষে খুবই উত্তম হতো। সুতরাং মহান আল্লাহ এখানে এই শিক্ষা দিলেন যে, তিনি যা কিছু দান করবেন তার উপর মানুষের সবর ও শোক্‌র করা উচিত। সকল কাজে তাঁরই উপর ভরসা করতে হবে এবং তাঁকেই যথেষ্ট মনে করতে হবে। আগ্রহ, মনোযোগ, লোভ, আশা ইত্যাদির সম্পর্ক তাঁর সাথেই রাখা উচিত। রাসূলুল্লাহ

(সঃ)-এর আনুগত্যের ব্যাপারে চুল পরিমাণও যেন ত্রুটি না হয়। আর আল্লাহ তা'আলার কাছে এই তাওফীক চাইতে হবে যে, তিনি যেন তাঁর হুকুম পালনের, নিষিদ্ধ কাজ বর্জনের, ভাল কথা মেনে নেয়ার এবং সঠিক আনুগত্যের দিকে পথ প্রদর্শন করেন!

৬০। (ফরয) সাদকাগুলো তো হচ্ছে শুধুমাত্র গরীবদের এবং অভাবগ্রস্তদের, আর এই সাদকা (আদায়ের) জন্যে নিযুক্ত কর্মচারীদের এবং যাদের মন রক্ষা করতে (অভিপ্রায়) হয় (তাদের), আর গোলামদের আযাদ করার কাজে এবং করজদারদের কর্জে (কর্জ পরিশোধে), আর জিহাদে (অর্থাৎ যুদ্ধ সরঞ্জাম সংগ্রহের জন্যে), আর মুসাফিরদের সাহায্যার্থে, এ হুকুম আল্লাহর পক্ষ হতে নির্ধারিত, আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী অতি প্রজ্ঞাময়।

٦٠- اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَ الْمَسٰكِيْنِ وَ الْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَ فِي الرِّقَابِ وَ الْغٰرِمِيْنَ وَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ ابْنِ السَّبِيْلِ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ○

পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ঐ অজ্ঞ মুনাফিকদের বর্ণনা দিয়েছেন যারা সাদকা বণ্টনের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর উপর আপত্তি উঠিয়েছিল। এখন এই আয়াতে বর্ণনা করছেন যে, যাকাতের মাল বণ্টন রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল নয়। বরং যাকাত বণ্টন করার ক্ষেত্রগুলো স্বয়ং আল্লাহ বাতলিয়ে দিয়েছেন।

সুনানে আবি দাউদে যিয়াদ ইবনে হারিস সুদাঈ (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, আমি নবী (সঃ)-এর দরবারে হাযির হয়ে তাঁর হাতে বায়আত গ্রহণ করেছি, এমন সময় একটি লোক এসে তাঁর কাছে আবেদন করে– "সাদকার (যাকাতের) মাল থেকে আমাকে কিছু দান করুন!" তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "সাদকার ব্যাপারে আল্লাহ নবী বা অন্য কারো ইচ্ছার উপর সন্তুষ্ট নন,

বরং তিনি নিজেই তা বণ্টনের আটটি ক্ষেত্র নির্ধারণ করে দিয়েছেন। সুতরাং যদি তুমি এই ৮টি ক্ষেত্রের কোন একটির মধ্যে পড় তবে আমি তোমাকে দিতে পারি।"

এখন যাকাতের মাল এই আট প্রকার লোকের মধ্যেই বণ্টন করা ওয়াজিব, নাকি যে কোন এক প্রকারের লোককে দিলেই চলবে, এ ব্যাপারে আলেমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ইমাম শাফিঈ (রঃ) ও একদল আলেম বলেন যে, যাকাতের মাল এই আট প্রকারের সমস্ত লোকের উপর বণ্টন করা ওয়াজিব। দ্বিতীয় উক্তি হচ্ছে এই যে, সকল প্রকার লোকের উপর বণ্টন করা ওয়াজিব নয়, বরং যে কোন এক প্রকারের লোককে দিলেই যথেষ্ট হবে যদিও অন্য প্রকারের লোকও বিদ্যমান থাকে। এ উক্তি হচ্ছে ইমাম মালিক (রঃ) এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী এক দল গুরুজনের। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন উমার (রাঃ), হুযাইফা (রাঃ), ইবনে আব্বাস (রাঃ), আবুল আলিয়া (রঃ) সাঈদ ইবনে জুবাইর (রঃ) এবং মাইমুন ইবনে মাহরান (রঃ)।

ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বলেন যে, সাধারণ আহলুল ইলমের উক্তিও এটাই। এ আয়াতে যাকাত খরচের ক্ষেত্র বর্ণনা করা হয়েছে, সমস্ত প্রকারের লোককে দেয়ার কথা বর্ণিত হয়নি। এসব উক্তির দলীল প্রমাণাদি ও তর্ক-বিতর্কের স্থান এ কিতাব নয়। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

সর্বপ্রথম ফকীরদের বর্ণনা দেয়ার কারণ এই যে, তাদের প্রয়োজন অত্যন্ত বেশী, যদিও ইমাম আবূ হানীফা (রঃ)-এর মতে মিসকীনের অবস্থা ফকীরের চাইতেও কঠিন। উমার (রাঃ) বলেন যে, যার হাতে কোন মাল নেই শুধু তাকেই ফকীর বলা হয় না, বরং যে ব্যক্তি অভাবগ্রস্ত অবস্থায় রয়েছে, কিছু পানাহারও করছে এবং কিছু আয় উপার্জনও করছে সেও ফকীর। ইবনে আলিয়্যাহ (রঃ) বলেন যে, এই রিওয়ায়াতে اَخْلَقُ শব্দ রয়েছে। আর আমাদের মতে اَخْلَقُ বলা হয় তিজারত বা ব্যবসাকে। কিন্তু জমহূর এর বিপরীত মত পোষণ করেন। বহু গুরুজন বলেন যে, ফকীর হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যে ভিক্ষাবৃত্তি থেকে বেঁচে থাকে। আর মিসকীন বলা হয় ভিক্ষুককে, যে লোকদের পিছু ধরে এবং ঘরে ঘরে ও অলিতে গলিতে ঘুরে বেড়ায়। কাতাদা (রঃ) বলেন যে, ফকীর হচ্ছে রোগাক্রান্ত ব্যক্তি এবং মিস্কীন হচ্ছে সুস্থ সবল লোক। ইবরাহীম (রঃ) বলেন যে, এখানে ফকীর দ্বারা মুহাজির ফকীরদেরকে বুঝানো হয়েছে। সুফইয়ান সাওরী (রঃ) বলেন যে,

এর ভাবার্থ হচ্ছে– পল্লীবাসীরা এর থেকে কিছুই পাবে না। ইকরামা (রঃ) বলেনঃ “দরিদ্র মুসলিমদেরকে মিসকীন বলো না, মিসকীন তো হচ্ছে আহ্লে কিতাবের লোক।”

এখন ঐ হাদীসগুলো বর্ণনা করা হচ্ছে যেগুলো এই আট প্রকারের সম্পর্কে এসেছেঃ

(১) فُقَرَاءُ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ “সাদকা ধনী ও সুস্থ সবলের জন্যে হালাল নয়।” দু'টি লোক রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে সাদকার মাল চাইলো। তিনি তখন তাদের পা থেকে মাথা পর্যন্ত সারা দেহ ভালভাবে দেখে বুঝতে পারলেন যে, তারা সুস্থ ও বলবান লোক। সুতরাং তিনি তাদেরকে বললেনঃ “তোমরা যদি চাও তবে আমি তোমাদেরকে দিতে পারি। তবে জেনে রেখো যে, ধনী, শক্তিশালী ও উপার্জনক্ষম ব্যক্তির এতে কোন অংশ নেই।”

(২) مَسَاكِيْن আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “এই ঘোরাফেরাকারী ব্যক্তি মিসকীন নয়, যে লোকদের কাছে ঘোরাফেরা করে অতঃপর তাকে সে এক গ্রাস বা দু'গ্রাস (খাদ্য) এবং একটি বা দু'টি খেজুর প্রদান করে।” জনগণ জিজ্ঞেস করলোঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! তা হলে মিসকীন কে?” তিনি উত্তরে বললেনঃ “যার কাছে এমন কিছু নেই যার দ্বারা সে অমুখাপেক্ষী হতে পারে, যার এমন অবস্থা প্রকাশ পায় না যা দেখে মানুষ তার অবস্থা বুঝতে পেরে তাকে কিছু দান করে এবং যে কারো কাছে ভিক্ষা চায় না।”

(৩) اَلْعَامِلِيْنَ عَلَيْهَا এরা হচ্ছে তহ্সীলদার। তারা ঐ সাদকার (যাকাতের) মাল থেকেই মজুরী পাবে। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর আত্মীয়-স্বজন, যাদের উপর সাদকা হারাম, এই পদে আসতে পারেন না। আব্দুল মুত্তালিব ইবনে রাবীআ ইবনে হারিস (রাঃ) এবং ফযল ইবনে আব্বাস (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট এসে আবেদন করেনঃ “আমাদেরকে সাদকা আদায়কারী নিযুক্ত করুন।” রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন তাঁদেরকে বলেনঃ “মুহাম্মাদ (সঃ) ও তাঁর বংশধরদের জন্যে সাদকা হারাম। এটা তো লোকদের ময়লা-আবর্জনা।”[১]

১. এ হাদীসটি ইমাম মুসলিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

(৪) الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُ এর কয়েকটি প্রকার রয়েছে। কাউকে এই কারণে দেয়া হয় যে, এর ফলে সে ইসলাম গ্রহণ করবে। যেমন রাসূলুল্লাহ (সঃ) সাফওয়ান ইবনে উমাইয়াকে হুনায়েনের যুদ্ধে প্রাপ্ত গনীমত়ের মাল থেকে প্রদান করেছিলেন। অথচ ঐ সময় সে কুফরী অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে বের হয়েছিল। সে নিজেই বর্ণনা করেছেঃ "তাঁর দান ও সুবিচার আমার অন্তরে সবচেয়ে বেশী তাঁর প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি করেছিল। অথচ ইতিপূর্বে তাঁর সবচেয়ে বড় শত্রু আমিই ছিলাম।"[১] আবার কাউকে এ জন্যে দেয়া হয় যে, এর ফলে তার ইসলাম দৃঢ় হয়ে যাবে। আর ইসলামের উপর তার মন বসে যাবে। যেমন রাসূলুল্লাহ (সঃ) হুনায়েনের যুদ্ধে প্রাপ্ত গনীমতের মাল থেকে মক্কার আযাদকৃত লোকদের সর্দারদেরকে শত শত উট দান করেছিলেন এবং বলেছিলেনঃ "আমি একজনকে দিয়ে থাকি এবং তার চেয়ে আমার নিকট প্রিয়জনকে দিই না এই ভয়ে যে (তাকে না দিলে সে ইসলাম থেকে ফিরে যাবে, ফলে) তাকে উল্টো মুখে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।"

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আবূ সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একবার আলী (রাঃ) ইয়ামন থেকে মাটি মিশ্রিত কাঁচা সোনা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর খিদমতে প্রেরণ করেন। তিনি তা শুধুমাত্র চারজন লোকের মধ্যে বণ্টন করে দেন। তারা হলেনঃ (১) আকরা ইবনে হাবিস (রাঃ), (২) উয়াইনা ইবনে বদর (রাঃ), (৩) আলকামা ইবনে আলাসা (রাঃ) এবং (৪) যায়েদ আল খায়ের (রাঃ)। তিনি বলেনঃ "তাদের মন জয় করার উদ্দেশ্যে আমি এটা তাদেরকে প্রদান করেছি।" কাউকে এ জন্যেও দেয়া হয় যে, সে পার্শ্ববর্তী লোকদের কাছে তা পৌঁছিয়ে দিবে অথবা আশেপাশের শত্রুদের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখবে এবং তাদেরকে মুসলিমদের উপর আক্রমণ করার সুযোগ দিবে না। এসব বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ দেয়ার স্থান হচ্ছে আহ্কাম ও ফুরূ'র কিতাবগুলো, এই তাফসীর নয়। আল্লাহ তা'আলাই এসব বিষয়ে সঠিক ও সর্বাধিক জ্ঞানের অধিকারী।

উমার (রাঃ), আমির শা'বী (রঃ) এবং এক দল আলেমের উক্তি এই যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ইন্তেকালের পর সাদকা (যাকাত) খরচের এ ক্ষেত্রগুলো আর বাকী নেই। কেননা, আল্লাহ তা'আলা ইসলামের মর্যাদা দান করেছেন। মুসলিমরা আজ দেশসমূহের মালিক হয়ে বসেছে এবং আল্লাহর বহু বান্দা তাদের

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ), ইমাম মুসলিম (রঃ) এবং ইমাম তিরমিযী (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

অধীনস্থ রয়েছে। কিন্তু অন্যান্য গুরুজনদের উক্তি এই যে, মন জয়ের উদ্দেশ্যে এখনও যাকাতের মাল খরচ করা জায়েয। মক্কা বিজয় এবং হাওয়াযেন বিজয়ের পরেও রাসূলুল্লাহ (সঃ) ঐ লোকদেরকে সাদকার মাল প্রদান করেছিলেন। দ্বিতীয়তঃ এখনও এরূপ প্রয়োজন দেখা দিয়ে থাকে।

(৫) فِى الرِّقَابِ গোলাম আযাদ করার ব্যাপারে বহু বুযুর্গ ব্যক্তি বলেন যে, এর দ্বারা ঐ গোলামদেরকে বুঝানো হয়েছে যারা টাকার একটা অংক নির্ধারণ করে তাদের মনিবদের সাথে আযাদী লাভের শর্ত করে নিয়েছে। যাকাতের মাল থেকে এই গোলামদেরকে এই পরিমাণ টাকা দেয়া যাবে, যাতে তারা তা আদায় করে আযাদী লাভ করতে পারে। অন্যান্য বুযুর্গগণ বলেন যে, যে গোলাম মনিবের সাথে এরূপ গোলামকেও যাকাতের মাল দিয়ে খরিদ করে নিয়ে আযাদ করে দিতে কোনই অসুবিধা নেই। মোটকথা, মুকাতাব গোলাম[১] বা সাধারণ গোলামকে আযাদকরণও যাকাত খরচের একটি ক্ষেত্র। হাদীসেও এর অনেক ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে। এমন কি বলা হয়েছে যে, আযাদকৃত গোলামের প্রতিটি অঙ্গের বিনিময়ে আযাদকারীর প্রতিটি অঙ্গকে আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবেন, এমন কি লজ্জাস্থানের বিনিময়ে লজ্জা স্থানকেও। কেননা, প্রত্যেক পুণ্যের বিনিময় ঐরূপই হয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "তোমরা যে আমল করতে তোমাদেরকে তারই প্রতিদান দেয়া হবে।"

আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ "তিন প্রকার লোকের সাহায্য করা আল্লাহ তা'আলার দায়িত্বে রয়েছে। প্রথম ঐ গাযী, যে আল্লাহর পথে জিহাদ করে। দ্বিতীয় ঐ মুকাতাব গোলাম, যে তার চুক্তির টাকা আদায়ের ইচ্ছা করে। তৃতীয় ঐ বর বা বিয়ের পাত্র, যার বিয়ে করার উদ্দেশ্য হচ্ছে দুষ্কার্য থেকে রক্ষা পাওয়া।"[২]

বারা ইবনে আযিব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একটি লোক এসে বললোঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমাকে এমন আমলের কথা বাতলিয়ে দিন যা আমাকে জান্নাতের নিকটবর্তী করবে এবং জাহান্নাম থেকে দূরে রাখবে।"

১. মুকাতাব ঐ গোলামকে বলা হয় যার মনিব তাকে তার ক্রয় মূল্য উপার্জন করে দেয়ার শর্তে মুক্তির কথা দিয়েছে।
২. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) এবং ইমাম আবূ দাউদ (রঃ) ছাড়া অন্যান্য আসহাবে সুনান বর্ণনা করেছেন।

রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন বললেনঃ “তুমি ‘নাস্মা’ আযাদ কর ও গর্দান মুক্ত কর।” সে বললোঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! দুটো তো একই।” তিনি বললেনঃ “না, ‘নাসমা’ আযাদ করার অর্থ এই যে, তুমি একাই কোন গোলাম আযাদ করবে। আর গর্দান মুক্ত করার অর্থ এই যে, তুমি ওর মূল্যের ব্যাপারে সাহায্য করবে।”[১]

(৬) اَلْغَارِمِيْنَ এটাও কয়েক প্রকার। যেমন একটি লোক কারো বোঝা নিজের ঘাড়ে নিয়ে নিলো বা কারো কর্জের সে যামিন হয়ে গেল। অতঃপর সে দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হয়ে গেল অথবা নিজেই ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়লো, কিংবা কেউ কোন নাফরমানীমূলক কাজ করার শাস্তিস্বরূপ তার উপর ঋণের বোঝা চেপে বসলো। তারপর সে তাওবাহ্ করলো। এমতাবস্থায় তাকে যাকাতের মাল দেয়া যাবে, যাতে সে এর দ্বারা তার এ ঋণ আদায় করতে পারে। এই মাসআলাটির মূল হচ্ছে কুবাইসা ইবনে মাখরিক আল্ হিলালি (রাঃ)-এর নিম্নের রিওয়ায়াতটিঃ

তিনি বলেন, আমি অন্যের (ঋণের) বোঝা নিজের ঘাড়ে নিয়ে ফেলেছিলাম। অতঃপর আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর দরবারে হাযির হয়ে এ ব্যাপারে আবেদন নিবেদন করি। তিনি বলেনঃ “অপেক্ষা কর, আমার কাছে সাদকার (যাকাতের) মাল আসলে তা থেকে তোমাকে প্রদান করবো।” এরপর তিনি বলেনঃ “হে কুবাইসা! জেনে রেখো যে, তিন প্রকার লোকের জন্যেই শুধু ভিক্ষা হালাল। এক তো হচ্ছে যামিন ব্যক্তি যার জামানতের অর্থ পুরো না হওয়া পর্যন্ত তার জন্যে ভিক্ষা জায়েয। দ্বিতীয় হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যার মাল কোন দৈব দুর্বিপাকে নষ্ট হয়ে গেছে, তার জন্যেও ভিক্ষা জায়েয যে পর্যন্ত না তার স্বচ্ছলতা ফিরে আসে। তৃতীয় হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যার ক্ষুধার্ত অবস্থায় দিন কাটে এবং তার কওমের তিনজন বিবেকবান লোক সাক্ষ্য দেয় যে, নিঃসন্দেহে অমুক ব্যক্তির ক্ষুধার্ত অবস্থায় দিন কাটে। তার জন্যেও ভিক্ষা করা জায়েয যে পর্যন্ত না সে কোন আশ্রয় লাভ করে এবং তার জীবিকার ব্যবস্থা হয়ে যায়। এই তিন প্রকারের লোক ছাড়া অন্যান্যদের জন্যে ভিক্ষা হারাম। যদি তারা ভিক্ষা করে কিছু খায় তবে অবৈধ উপায়ে হারাম খাবে।”[২]

---

১. এ কথার ভাবার্থ এই যে, একজন লোক একাকী একটা গোলাম আযাদ করতে পারছে না, তখন কয়েকজন মিলে এ গোলামের মূল্য সংগ্রহ করে ওকে ক্রয় করে আযাদ করে দিলো। এটাই হলো তার মূল্যের ব্যাপারে সাহায্য করা।

২. এ হাদীসটি ইমাম মুসলিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

আবূ সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ)-এর যুগে একটি লোক একটি বাগান খরিদ করে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে বাগানের ফল নষ্ট হয়ে যায়। ফলে সে ভীষণভাবে ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ে। নবী (সঃ) (জনগণকে) বললেনঃ "তোমরা তার উপর সাদকা কর।" জনগণ সাদকা করলো, কিন্তু তাতেও তার ঋণ পরিশোধ হলো না। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) ঋণ দাতাদেরকে বললেনঃ "তোমরা যা পেলে তাই গ্রহণ কর, এ ছাড়া তোমরা আর কিছু পাবে না।"[১]
আব্দুর রহমান ইবনে আবি বকর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, আল্লাহর রাসূল (সঃ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন একজন ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে ডেকে তাঁর সামনে হাযির করবেন, অতঃপর বলবেনঃ "হে আদম সন্তান! তুমি কি কাজে কর্জ নিয়েছিলে এবং কিভাবে জনগণের হক নষ্ট করেছিলে?" সে উত্তরে বলবেঃ "হে আমার প্রভু! আপনি তো জানেন যে, আমি তা গ্রহণ করে নিজে খাইনি, পানও করিনি এবং নষ্টও করিনি। বরং আমার হাত থেকে হয় তো চুরি হয়ে গেছে বা পুড়ে গেছে অথবা কোন দৈব দুর্বিপাকে নষ্ট গেছে।" তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেনঃ "আমার বান্দা সত্য কথা বলেছে। আজ তোমার কর্জ আদায় করার সবচেয়ে বড় হকদার আমি।" অতঃপর আল্লাহ তা'আলা কোন জিনিস চেয়ে পাঠাবেন। ওটা তার নেকির পাল্লায় রাখা হবে। এর ফলে তার নেকির পাল্লা পাপের পাল্লার চেয়ে ভারী হয়ে যাবে। তখন আল্লাহ তা'আলা স্বীয় দয়া ও অনুগ্রহে তাকে জান্নাতে প্রবিষ্ট করবেন।"[২]

(৭) فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ঐ মুজাহিদ ও গাযীরা এর অন্তর্ভুক্ত যাদের দফতরে কোন হক থাকে না। হজ্বও فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ-এর অন্তর্ভুক্ত।

(৮) اِبْنُ السَّبِيْل বা মুসাফির, যার সাথে কোন অর্থ নেই, তাকেও যাকাতের মাল থেকে এই পরিমাণ দেয়া যাবে যাতে সে নিজ শহরে পৌঁছাতে পারে। যদিও সে নিজের জায়গায় একজন ধনী লোকও হয়। ঐ ব্যক্তির জন্যেও এই হুকুম যে নিজের শহর থেকে অন্য জায়গায় সফর করতে ইচ্ছুক, কিন্তু তার কাছে মালধন নেই বলে সফরে বের হতে পারছে না। তাকেও সফরের খরচের জন্যে যাকাতের মাল দেয়া জায়েয, যা তার যাতায়াতের জন্যে যথেষ্ট হবে।

এ আয়াতটি ছাড়াও নিম্নের হাদীসটি এর দলীল ঃ

আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, আল্লাহর রাসূল (সঃ) বলেছেনঃ "পাঁচ প্রকারের মালদার ব্যতীত কোন মালদারের জন্যে সাদকা হালাল নয়। (১) ঐ ধনী যাকে যাকাত আদায় করার কাজে নিযুক্ত করা হয়েছে। (২) ঐ

১. এ হাদীসটিও ইমাম মুসলিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।
২. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন।

মালদার, যে যাকাতের মালের কোন জিনিস নিজের মাল দিয়ে কিনে নিয়েছে। (৩) ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি। (৪) আল্লাহর পথের গাযী। (৫) ঐ সম্পদশালী লোক, যাকে কোন মিসকীন তার যাকাত হতে প্রাপ্ত কোন মাল উপঢৌকন হিসেবে দিয়েছে।[১] অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "যাকাত ধনীর জন্যে হালাল নয়, কিন্তু যে (ধনাঢ্য) ব্যক্তি আল্লাহর পথে রয়েছে বা মুসাফির অবস্থায় আছে কিংবা তার কোন মিসকীন প্রতিবেশী হাদিয়া স্বরূপ তার কাছে পাঠিয়েছে বা বাড়ীতে যিয়াফত দিয়ে ডেকে নিয়েছে (তাদের জন্যে হালাল)।"

যাকাতের মাল খরচের এই আটটি ক্ষেত্র বর্ণনা করার পর আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করছেন– "এ হুকুম আল্লাহর পক্ষ হতে নির্ধারিত। আল্লাহ তা'আলা যাহের ও বাতেনের পূর্ণ জ্ঞান রাখেন। তিনি বান্দাদের উপযোগিতা সম্পর্কে অবহিত রয়েছেন। তিনি তাঁর কথায়, কাজে, শরীয়তে ও হুকুমে অতি প্রজ্ঞাময়। তিনি ছাড়া ইবাদতের যোগ্য আর কেউই নেই এবং তিনি ছাড়া কারো কোন পালনকর্তা নেই।

৬১। আর তাদের মধ্যে এমন কতিপয় লোক আছে, যারা নবীকে যাতনা দেয় এবং বলে যে, তিনি প্রত্যেক কথায় কর্ণপাত করে থাকেন; তুমি বলে দাও– এই নবী তো কর্ণপাত করে থাকে সেই কথাতেই যা তোমাদের জন্যে কল্যাণকর, সে আল্লাহর (কথাগুলো অহী মারফত জ্ঞাত হয়ে তার) প্রতি ঈমান আনয়ন করে, আর মুমিনদের (কথাকে) বিশ্বাস করে, আর সে ঐসব লোকের প্রতি অনুগ্রহ করে যারা তোমাদের মধ্যে ঈমান আনয়ন করে; আর যারা আল্লাহর রাসূলকে যাতনা দেয়, তাদের জন্যে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে।

٦١- وَمِنْهُمُ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ النَّبِيَّ وَيَقُوْلُوْنَ هُوَ اُذُنٌ قُلْ اُذُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

১. এ হাদীসটি ইমাম আবূ দাঊদ (রঃ) ও ইমাম ইবনে মাজাহ্ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা এখানে বলেন যে, মুনাফিকদের একটি দল রয়েছে, তারা বড়ই কষ্টদায়ক। তারা কথার দ্বারা নবী (সঃ)-কে দুঃখ দিয়ে থাকে। তারা বলে– "নবী (সঃ) তো সবারই কথায় কর্ণপাত করে থকেন। তিনি যার কাছে যা শুনেন তাই মেনে নেন। তিনি আমাদের মিথ্যা কসম করে বলার কথাও বিশ্বাস করে নিবেন।" আল্লাহ পাক বলেন, নবী (সঃ)-এর কান খুবই ভাল কান এবং খুব ভালই শুনে থাকেন। কে সত্যবাদী আর কে মিথ্যাবাদী তা তিনি ভালরূপেই জানেন। তিনি আল্লাহর কথা মেনে থাকেন এবং ঈমানদার লোকদের সত্যবাদিতা সম্পর্কেও তিনি পূর্ণ অবহিত। তিনি মুমিনদের জন্যে রহমত স্বরূপ। আর বেঈমান লোকদের জন্যে তিনি আল্লাহর হুজ্জত স্বরূপ। আল্লাহর রাসূল (সঃ)-কে যারা কষ্ট দেয় তাদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

٦٢- يَحْلِفُونَ بِاللّٰهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللّٰهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ ۝

৬২। তারা তোমাদের কাছে আল্লাহর শপথ করে থাকে, যেন তারা তোমাদেরকে সন্তুষ্ট করতে পারে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল হচ্ছেন বেশী হকদার (এই বিষয়ে) যে, তারা যদি সত্যিকারের মুমিন হয়ে থাকে, তবে তারা যেন তাঁকে সন্তুষ্ট করে।

٦٣- أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذٰلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ ۝

৬৩। তারা কি জানে না যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে, তবে এটা সুনিশ্চিত যে, এমন লোকের ভাগ্যে রয়েছে জাহান্নামের আগুন এরূপভাবে যে, সে তাতে অনন্তকাল থাকবে, এটা হচ্ছে চরম লাঞ্ছনা।

কাতাদা (রঃ) এ আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে বলেন, বর্ণিত আছে যে, মুনাফিকদের একটি লোক বলে– "আল্লাহর শপথ! আমাদের এসব সর্দার ও নেতা খুবই জ্ঞানী ও অভিজ্ঞ লোক। যদি মুহাম্মাদ (সঃ)-এর কথা সত্যই হতো

তবে কি এরা এতই বোকা যে, তা মানতো না?” তার এ কথা খাঁটি মুসলিম সাহাবী শুনতে পান। তিনি তৎক্ষণাৎ বলে ওঠেনঃ “আল্লাহর কসম! রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সব কথাই সত্য। আর যারা তাকে মেনে নিচ্ছে না তারা যে নির্বোধ এতে কোন সন্দেহ নেই।” ঐ সাহাবী নবী (সঃ)-এর দরবারে হাযির হয়ে ঘটনাটি বর্ণনা করেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) ঐ লোকটিকে (মুনাফিক) ডেকে পাঠান। কিন্তু সে শক্ত কসম করে বলে– “আমি তো এ কথা বলিনি। এ লোকটি আমার উপর অপবাদ দিচ্ছে।” তখন ঐ সাহাবী দুআ' করেনঃ “হে আল্লাহ! আপনি সত্যবাদীকে সত্যবাদীরূপে এবং মিথ্যাবাদীকে মিথ্যাবাদীরূপে দেখিয়ে দিন!” তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করেন। আল্লাহ পাক বলেন, তাদের কি এ কথা জানা নেই যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ)-এর বিরুদ্ধাচরণকারী চিরকাল জাহান্নামে অবস্থান করবে? সেখানে তারা অপমানজনক শাস্তি ভোগ করবে। এর চেয়ে বড় লাঞ্ছনা ও দুর্ভাগ্য আর কি হবে?

৬৪। মুনাফিকরা আশংকা করে যে, তাদের (মুসলিমদের) প্রতি না জানি এমন কোন সূরা নাযিল হয়ে পড়ে যা তাদেরকে সেই মুনাফিকদের অন্তরের কথা অবহিত করে দেয়, (হে নবী সঃ!) তুমি বলে দাও– হ্যাঁ, তোমরা বিদ্রূপ করতে থাকো, নিশ্চয়ই আল্লাহ সেই বিষয়কে প্রকাশ করেই দিবেন, যে সম্বন্ধে তোমরা আশংকা করছিলে।	٦٤- يَحْذَرُ الْمُنٰفِقُوْنَ اَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُوْرَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ قُلِ اسْتَهْزِءُوْا اِنَّ اللّٰهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُوْنَ ○

কাতাদা (রঃ) বলেন যে, তারা (মুনাফিকরা) পরস্পর আলাপ আলোচনা করতো, কিন্তু সাথে সাথে এ আশংকাও করতো যে, না জানি আল্লাহ তা'আলা হয়তো অহীর মারফত মুসলিমদেরকে তাদের গুপ্ত কথা জানিয়ে দিবেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে বলেনঃ “(হে নবী)! যখন তারা (মুনাফিকরা) তোমার কাছে আগমন করে তখন তোমাকে এমনভাবে সম্বোধন করে যেভাবে আল্লাহ তোমাকে সম্বোধন করেন না, অতঃপর তারা মনে মনে বলে– আমরা যা বলছি তার কারণে আল্লাহ আমাদেরকে শাস্তি দিচ্ছে না কেন? (এই মুনাফিকদের

জেনে রাখা উচিত যে,) জাহান্নামই তাদের জন্যে যথেষ্ট, ওর মধ্যে তারা প্রবেশ করবে, আর ওটা খুবই নিকৃষ্ট স্থান।" এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে মুনাফিকরা! তোমরা মুসলিমদের অবস্থার উপর মন খুলে উপহাসমূলক কথা বলে নাও। কিন্তু জেনে রেখো যে, তোমাদের মনের সমস্ত গুপ্ত কথা আল্লাহ প্রকাশ করে দিবেন। আরো স্মরণ রেখো যে, একদিন তোমরা লাঞ্ছিত ও অপদস্থ হবেই। যেমন আল্লাহ পাক আর এক জায়গায় বলেনঃ "অন্তরে ব্যাধিযুক্ত এই লোকগুলো কি ধারণা করেছে যে, আল্লাহ তাদের অন্তরের শত্রুতাকে কখনো প্রকাশ করবেন না? আর হে নবী (সঃ)! আমি যদি ইচ্ছা করতাম তবে তোমাকে তাদের পূর্ণ পরিচয় বলে দিতাম, তখন তুমি তাদেরকে তাদের আকৃতি দ্বারাই চিনতে পারতে, তবে তুমি তাদেরকে তাদের কথার ধরনে অবশ্যই চিনতে পারবে; আর আল্লাহ তোমাদের সকলের কার্যাবলী অবগত আছেন।" এ জন্যেই কাতাদা (রঃ) বলেন যে, এই সূরারই নাম হচ্ছে "সূরায়ে ফাযিহাহ্।" কেননা, এই সূরায় মুনাফিকদের মুখোশ খুলে দেয়া হয়েছে।

৬৫। আর যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর, তবে তারা বলে দেবে- আমরা তো শুধু আলাপ আলোচনা ও হাসি তামাসা করছিলাম; তুমি বলে দাও- তবে কি তোমরা আল্লাহ, তাঁর আয়াতসমূহ এবং তাঁর রাসূলের প্রতি হাসি তামাসা করছিলে?

٦٥- وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ۚ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ ○

৬৬। তোমরা এখন (বাজে) ওযর দেখিও না, তোমরা তো নিজেদেরকে মুমিন প্রকাশ করার পর কুফরী করেছো; যদিও আমি তোমাদের মধ্য হতে কতককে ক্ষমা করে দেই, তবুও কতককে শাস্তি দিবই, কারণ তারা অপরাধী ছিল।

٦٦- لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ۚ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ○ (ع ٨ / ١٤)

আবূ মা'শার আল মাদীনী (রঃ) মুহাম্মাদ ইবনে কা'ব আল কারাযী (রঃ) প্রমুখ হতে বর্ণনা করেছেন, তাঁরা বলেছেন যে, মুনাফিকদের মধ্যকার একটি লোক বলে– "আমাদের এই কুরআন পাঠকারী লোকদেরকে দেখি যে, তারা আমাদের মধ্যে বড় পেটুক, বড় মিথ্যাবাদী এবং যুদ্ধের সময় বড়ই কাপুরুষ।" রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে এর আলোচনা হলে লোকটি তাঁর কাছে এমন এক সময় আগমন করে যখন তিনি স্বীয় উষ্ট্রীর উপর সওয়ার হয়ে কোন জায়গায় যাচ্ছিলেন। সে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলে– "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমরা শুধু হাসি তামাসা করছিলাম।" তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ "তোমরা আল্লাহ, তাঁর আয়াতসমূহ এবং তাঁর রাসূল (সঃ)-এর সাথে তামাসা করছিলে" ঐ মুনাফিক রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর তরবারীর উপর হাত রেখে পাথরের সাথে টক্কর খেতে খেতে তার সাথে সাথে চলছিল এবং ঐ কথা বলতেছিল। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তার দিকে চেয়েও দেখছিলেন না। যে মুসলিম তার এই কথা শুনছিলেন তিনি তখনই তার কথার উত্তর দিয়ে বলছিলেনঃ "তুমি যা বলছো মিথ্যা বলছো। তুমি তো একজন মুনাফিক।" এটা হচ্ছে তাবূকের যুদ্ধের ঘটনা। তিনি মুনাফিক লোকটিকে মসজিদে এ কথা বলেছিলেন।

সীরাতে ইবনে ইসহাকে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) যখন তাবূকের উদ্দেশ্যে গমন করছিলেন সেই সময় তাঁর সাথে মুনাফিকদের একটি দলও ছিল। তাদের মধ্যে ওয়াদীয়া ইবনে সাবিত এবং মাখশী ইবনে হুমাইর প্রমুখও ছিল। তারা পরস্পর বলতে বলতে যাচ্ছিলঃ "খ্রীষ্টানদের সাথে যুদ্ধ করাকে আরবদের পরস্পরের সাথে যুদ্ধ করার ন্যায় মনে করা চরম ভুল। আল্লাহর কসম! আগামীকাল আমরা খ্রীষ্টানদের কাছে মুসলিমদের মার খাওয়া দেখবো এবং দূরে দূরে থেকে আনন্দ উপভোগ করবো।" তার একথা শুনে তাদের অন্য নেতা মাখশী বললোঃ "এসব কথা বলো না, নতুবা এর বর্ণনা কুরআন কারীমে এসে যাবে। আল্লাহর কসম! এতে অপমানিত হওয়া অপেক্ষা আমার কাছে এটাই বেশী পছন্দনীয় যে, আমাদের প্রত্যেককে একশ চাবুক মারা হবে।" আগে আগে এ লোকগুলো এসব কথা বলতে বলতে চলছিল। রাসূলুল্লাহ (সঃ) আম্মার ইবনে ইয়াসির (রাঃ)-কে বললেনঃ "দেখো! এ লোকগুলো জ্বলে পুড়ে মরছে। তুমি গিয়ে তাদেরকে জিজ্ঞেস কর যে, তারা কি আলোচনা করছিল। যদি তারা অস্বীকার করে তবে তুমি তাদেরকে বলবে, তোমরা এরূপ এরূপ বলছো।" আম্মার (রাঃ) তাদের কাছে গিয়ে একথা বললে তারা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে এসে ওযর পেশ করতে থাকে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর সওয়ারীর উপর উপবিষ্ট ছিলেন এমতাবস্থায় ওয়াদীয়া ইবনে সাবিত তাঁর সওয়ারীর লাগাম ধরে বললোঃ

"হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমরা শুধু হাসি তামাসা করছিলাম।" আর মাখশী ইবনে হুমাইর বললোঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমার পিতার নামের প্রতি লক্ষ্য করুন। এ কারণেই আমার মুখ দিয়ে এরূপ বাজে ও নির্বুদ্ধিতার কথা বেরিয়ে গেছে। সুতরাং আমাকে ক্ষমা করা হোক!" আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্ষমা করেও দেন। আর এ আয়াতে তাকে ক্ষমা করে দেয়ার বর্ণনাও রয়েছে। এরপরে সে তার নাম পরিবর্তন করে আবদুর রহমান রাখে এবং খাঁটি মুসলিম হয়ে যায়। অতঃপর সে আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করে যে, যেন তাকে শহীদরূপে হত্যা করা হয় এবং তার স্থান অজানা থাকে। এরপর ইয়ামামার যুদ্ধে তিনি শহীদ হন এবং তাঁর মৃতদেহ পাওয়া যায়নি।

এই আয়াত সম্পর্কে কাতাদা (রঃ) বলেন যে, নবী (সঃ) তাবূকের যুদ্ধে গমন করছিলেন এবং মুনাফিকদের একটি দল তাঁর আগে আগে চলছিল। তারা পরস্পর বলাবলি করছিলঃ "দেখো! এ ব্যক্তি (নবী সঃ) ধারণা করছেন যে, তিনি রোমের প্রাসাদ ও দুর্গ জয় করে নিবেন। এটা তো বহু দূরের কথা!" তাদের এই উক্তি নবী (সঃ)-এর কাছে প্রকাশ করে দেয়া হয়। তিনি তাদেরকে ডেকে পাঠান এবং বলেনঃ "তোমরা কি এসব কথা বলেছিলে?" তারা তখন শপথ করে করে বলে যে, তারা শুধু হাসি তামাসা করছিল। তবে তাদের মধ্যে একটি লোক, যাকে হয়তো আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করে থাকবেন, বলেঃ "হে আল্লাহ! আমি আপনার পাক কালামের একটি আয়াত শুনতে পাচ্ছি, যাতে আমার পাপ কার্যের বর্ণনা রয়েছে, যখনই তা শুনি তখনই আমার গায়ের পশম খাড়া হয়ে যায় এবং ভয়ে আমার অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে। হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমার তাওবা কবূল করুন এবং আমাকে আপনার পথে এমনভাবে শহীদ করুন যে, না কেউ আমাকে গোসল দেয়, না কাফন পরায়, না দাফন করে।" ইয়ামামার যুদ্ধে এ ঘটনাই ঘটে যায়। এ লোকটি শহীদদের সাথে শাহাদাত বরণ করেন। সমস্ত শহীদের মৃতদেহ পাওয়া যায়। কিন্তু এ লোকটির মৃতদেহের কোন পাত্তা পাওয়া যায়নি।

অন্যান্য মুনাফিকদেরকে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে জবাব দেয়া হচ্ছে– এখন তোমরা কোন বাজে ওযর করো না। যদিও তোমরা মুখে ঈমানদার ছিলে, কিন্তু এখন ঐ মুখেই তোমরা কাফির হয়ে গেলে। এটা হচ্ছে কুফরী কালেমা যে, তোমরা আল্লাহ, তাঁর রাসূল (সঃ) এবং কুরআন কারীমের সাথে হাসি তামাসা করবে। আমি যদি কাউকে ক্ষমা করেও দেই, তবুও জেনে রেখো যে, সকলের সাথে এরূপ ব্যবহার করা হবে না। তোমাদের এই অপরাধ, এই জঘন্য পাপ এবং কুফরী কালেমার শাস্তি তোমাদেরকে ভোগ করতেই হবে।

٦٧- اَلْمُنٰفِقُوْنَ وَ الْمُنٰفِقٰتُ بَعْضُهُمْ مِّنْۢ بَعْضٍ يَاْمُرُوْنَ بِالْمُنْكَرِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوْفِ وَ يَقْبِضُوْنَ اَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللّٰهَ فَنَسِيَهُمْ اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ○

৬৭। মুনাফিক পুরুষরা এবং মুনাফিক নারীরা সবাই এক রকম, অসৎকর্মের (অর্থাৎ কুফর ও ইসলাম বিরোধিতা) শিক্ষা দেয় এবং সৎকর্ম হতে বিরত থাকে, আর নিজেদের হাতসমূহকে (আল্লাহর পথে ব্যয় করা হতে) বন্ধ করে রাখে, তারা আল্লাহকে ভুলে গিয়েছে, সুতরাং তিনিও তাদেরকে ভুলে গিয়েছেন, নিঃসন্দেহে এই মুনাফিকরা হচ্ছে অতি অবাধ্য।

٦٨- وَعَدَ اللّٰهُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَ الْمُنٰفِقٰتِ وَ الْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ وَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ ○

৬৮। আল্লাহ মুনাফিক পুরুষদের, মুনাফিক নারীদের ও কাফিরদের সাথে জাহান্নামের আগুনের অঙ্গীকার করেছেন, যাতে তারা চিরকাল থাকবে, এটা তাদের জন্যে যথেষ্ট, আর আল্লাহ তাদেরকে লানত করেছেন এবং তাদের জন্যে রয়েছে চিরস্থায়ী শাস্তি।

এখানে আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করছেন যে, মুনাফিকদের আচরণ মুমিনদের সম্পূর্ণ বিপরীত। মুমিনরা ভাল কাজের আদেশ করে থাকে এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করে থাকে। পক্ষান্তরে মুনাফিকরা মন্দ কাজের আদেশ করে থাকে এবং ভাল কাজ থেকে নিষেধ করে থাকে। মুমিনরা দানশীল হয়, আর মুনাফিকরা হয় কৃপণ। মুমিনরা আল্লাহর যিকিরে মগ্ন থাকে এবং মুনাফিকরা আল্লাহর যিকির থেকে উদাসীন থাকে। এর ফলে আল্লাহও তাদের সাথে ঐরূপ ব্যবহারই করেন, যেমন একজন অন্যজনকে ভুলে থাকে। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদেরকে একথাই বলবেন– আজ আমি তোমাদেরকে ঐরূপই ভুলে যাবো

যেরূপ তোমরা আজকের দিনে আমার সাথে সাক্ষাৎ করাকে দুনিয়ায় ভুলে গিয়েছিলে। মুনাফিকরা সরল সঠিক পথ থেকে সরে পড়েছে এবং বিভ্রান্তির পথে প্রবেশ করেছে। এই মুনাফিক ও কাফিরদের এসব দুষ্কার্যের শাস্তিস্বরূপ আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্যে জাহান্নাম নির্ধারণ করে রেখেছেন, যেখানে তারা চিরস্থায়ী শাস্তি ভোগ করতে থাকবে। সেখানে এই শাস্তিই তাদের জন্যে যথেষ্ট। তাদেরকে মহান ও দয়ালু আল্লাহ স্বীয় রহমত থেকে দূর করে দিয়েছেন। তাদের জন্যে তিনি ঠিক করে রেখেছেন চিরস্থায়ী শাস্তি।

৬৯। তোমাদের অবস্থা ওদের ন্যায় যারা তোমাদের পূর্বে গত হয়েছে, যারা ছিল তোমাদের চেয়ে অধিকতর শক্তিশালী এবং ধন-সম্পদ ও সন্তানাদির প্রাচুর্যও ছিল তোমাদের চেয়ে অনেক বেশী; ফলতঃ তারা নিজেদের (পার্থিব) অংশ দ্বারা যথেষ্ট উপকার লাভ করেছে, অতঃপর তোমরাও তোমাদের (পার্থিব) অংশ দ্বারা খুব উপকার লাভ করলে, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীগণ নিজেদের অংশ দ্বারা ফলভোগ করেছিল, আর তোমরাও ব্যাঙ্গাত্মক হাসি তামাসায় এরূপভাবে নিমগ্ন হয়েছো, যেমন তারা নিমগ্ন হয়েছিল; আর তাদের (নেক) কার্যসমূহ বিনষ্ট হয়ে গিয়েছে দুনিয়াতে ও আখিরাতে, আর তারা ভীষণ ক্ষতির মধ্যে রয়েছে,(অর্থাৎ উভয় জগতেই আনন্দ ও সুখ স্বাচ্ছন্দ্য হতে বঞ্চিত থাকবে।)

٦٩- كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُوٓا أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُم بِخَلَاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُم بِخَلَاقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوٓا أُولَٰٓئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰٓئِكَ هُمُ الْخَٰسِرُونَ ○

আল্লাহ তা'আলা বলেন, এই লোকদের উপরেও আল্লাহর শাস্তি পৌছে, যেমন এদের পূর্ববর্তীদের উপর তাঁর শাস্তি পৌঁছেছিল। হাসান (রঃ) বলেন যে, خَلَاق-এর অর্থ হচ্ছে দ্বীন। পূর্ববর্তী লোকেরা যেমন মিথ্যা ও বাতিলের মধ্যে নিমজ্জিত ছিল, তেমনই এরাও ওর মধ্যে নিমজ্জিত রয়েছে। এদের এই অসৎ আমল অকেজো ও মূল্যহীন হয়ে গেল। তারা না দুনিয়ায় উপকৃত হলো, না আখিরাতে। এটাই হচ্ছে প্রকাশ্য ক্ষতি যে, আমল করলো অথচ ফল পেলো না। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, যেমন আজকের রাতের সাথে কালকের রাতের সাদৃশ্য রয়েছে, তদ্রূপ এই উম্মতের মধ্যেও ইয়াহূদীদের সাদৃশ্য এসে গেছে। তিনি বলেন, আমার তো ধারণা এই যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! তোমরা অবশ্যই তাদের অনুসরণ করবে, এমন কি যদি তাদের কেউ গো সাপের গর্তে প্রবেশ করে থাকে তবে তোমরাও তাতে প্রবেশ করবে।" আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তাঁর কসম! তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তীদের পন্থা অনুসরণ করবে বিঘতে বিঘতে, হাতে হাতে ও গজে গজে। এমন কি তারা যদি কোন গো সাপের গর্তে ঢুকে গিয়ে থাকে তবে তোমরাও অবশ্যম্ভাবীরূপে তাতে ঢুকে পড়বে।" তখন জনগণ জিজ্ঞেস করলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! তারা কারা? আহ্‌লে কিতাব কি?" তিনি উত্তরে বললেনঃ "আর কারা হবে?" এ হাদীসটি বর্ণনা করার পর আবূ হুরাইরা (রাঃ) বলেনঃ "তোমরা ইচ্ছা করলে ....كَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ-এ আয়াতটি পড়ে নাও।" আবূ হুরাইরা (রাঃ) বলেনঃ خَلَاق শব্দ দ্বারা دِيْن বুঝানো হয়েছে। وَخُضْتُمْ كَالَّذِىْ خَاضُوْا সম্পর্কে জনগণ জিজ্ঞেস করেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)? পারসিক ও রোমকদের মত কি?" রাসূলুল্লাহ (সঃ) উত্তরে বলেনঃ "লোকদের মধ্যে এরা ছাড়া আর কেউ নয়।" এ হাদীসের সত্যতার সাক্ষ্য সহীহ হাদীসসমূহেও পাওয়া যায়।

৭০। তাদের কাছে কি ঐসব লোকের সংবাদ পৌঁছেনি যারা তাদের পূর্বে গত হয়েছে? (যেমন) নূহ সম্প্রদায় এবং আ'দ ও সামূদ সম্প্রদায়, এবং মাদইয়ানের অধিবাসীগণ এবং

٧٠- اَلَمْ يَاْتِهِمْ نَبَاُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوْحٍ وَّ عَادٍ وَّ ثَمُوْدَ ۙ۵ وَ قَوْمِ اِبْرٰهِيْمَ وَاَصْحٰبِ مَدْيَنَ

وَ الْمُؤْتَفِكٰتِ اَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ○

বিধ্বস্ত জনপদগুলোর। তাদের কাছে তাদের রাসূলগণ স্পষ্ট নিদর্শনসমূহ নিয়ে এসেছিল, বস্তুতঃ আল্লাহ তো তাদের প্রতি অত্যাচার করেননি, বরং তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি অত্যাচার করছিল।

আল্লাহ তা'আলা বদকার মুনাফিকদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন– হে মুনাফিকের দল! তোমরা তোমাদের মতো লোকদের অবস্থার উপর গভীরভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ কর এবং দেখো, নবীদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার ফল কি হয়েছিল! নূহ (আঃ)-এর কওমের ডুবে মরা এবং মুসলিম ছাড়া অন্য কেউ রক্ষা না পাওয়ার ব্যাপারটা স্মরণ কর! আ'দ সম্প্রদায়ের হূদ (আঃ)-কে না মানার কারণে প্রবল ঝটিকায় ধ্বংস হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা একটু চিন্তা করে দেখো! সামূদ সম্প্রদায়ের সালেহ্ (আঃ)-কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা এবং আল্লাহর নিদর্শনের উষ্ট্রীটিকে হত্যা করার কারণে এক গগণ বিদারী শব্দ দ্বারা তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়ার ঘটনাটি মনে কর। আরো স্মরণ কর–কিভাবে ইবরাহীম (আঃ) শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা পান, আর তাঁর শত্রুরা ধ্বংস হয়ে যায়। নমরূদ ইবনে কিনআন ইবনে কুশ এর মত পরাক্রান্ত সম্রাট তার সৈন্য সামন্তসহ সমূলে বিনাশ হয়ে যায়। তোমরা ভুলে যেয়ো না যে, তারা আল্লাহর অভিশাপে পড়ে দুনিয়ার বুক থেকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এই দুষ্কার্য ও কুফরীর প্রতিফল হিসেবেই শুআইব (আঃ)-এর কওমকে ভূমিকম্প দ্বারা এবং ছায়ার দিনের শাস্তি দ্বারা ধ্বংস করে দেয়া হয়। তারা ছিল মাদায়েনের অধিবাসী। লূত (আঃ)-এর কওমের বসতি হচ্ছে বিধ্বস্ত জনপদ। তারা মাদায়েনে বসবাস করতো। আবার বলা হয়েছে যে, সেটা হচ্ছে সুদুম। মোটকথা, তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নবী লূত (আঃ)-কে না মানা এবং দুষ্কার্য পরিত্যাগ না করার কারণে ধ্বংস ও বরবাদ করে দিয়েছেন। আল্লাহ পাক বলেনঃ তাদের কাছে আমার রাসূলগণ আমার কিবাতসমূহ, মু'জিযা এবং স্পষ্ট দলীল প্রমাণাদিসহ গমন করেছিল। কিন্তু তারা তাদেরকে মোটেই মানেনি। অবশেষে তারা নিজেরা নিজেদের উপর যুলুম করার কারণে ধ্বংস হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা তো সত্য প্রকাশ করে দিয়েছেন, কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, রাসূলদেরকে পাঠিয়েছেন এবং হুজ্জত খতম করে

দিয়েছেন। কিন্তু তারা রাসূলদের বিরুদ্ধাচরণ করে, আল্লাহর কিতাবের প্রতি আমল ছেড়ে দেয় এবং সত্যের মুকাবিলা করে। ফলে তাদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত অবতীর্ণ হয় এবং তারা সমূলে ধ্বংস হয়ে যায়।

৭১। আর মুমিন পুরুষরা ও মুমিনা নারীরা হচ্ছে পরস্পর একে অন্যের বন্ধু, তারা সৎ বিষয়ের শিক্ষা দেয় এবং অসৎ বিষয় হতে নিষেধ করে, আর সালাতের পাবন্দী করে ও যাকাত প্রদান করে, আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ মেনে চলে, এসব লোকের প্রতি আল্লাহ অবশ্যই করুণা বর্ষণ করবেন, নিঃসন্দেহে আল্লাহ অতিশয় ক্ষমতাবান, হিকমতওয়ালা।

٧١- وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَامُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكٰوةَ وَيُطِيعُونَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ اُولٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ○

আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদের বদভ্যাসের বর্ণনা দেয়ার পর এখানে মুমিনদের উত্তম স্বভাবের বর্ণনা দিচ্ছেন। তিনি বলছেন– এই মুমিনরা পরস্পর একে অপরের সাহায্য করে থাকে এবং একে অন্যের বাহু স্বরূপ হয়ে থাকে। যেমন সহীহ হাদীসে এসেছে– "এক মুমিন অপর মুমিনের জন্যে দেয়াল স্বরূপ যার এক অংশ অপর অংশকে শক্ত ও মজবুত করে।"

তিনি এ কথা বলে তাঁর এক হাতের অঙ্গুলিগুলোকে অন্য হাতের অঙ্গুলিগুলোর মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেখিয়ে দেন। অপর একটি সহীহ হাদীসে রয়েছেঃ "মুমিনদের পারস্পরিক বন্ধুত্ব ও ভালবাসার দৃষ্টান্ত হচ্ছে একটি দেহের মত, দেহের একটি অংশে কষ্ট পৌঁছলে সমস্ত অংশে তা সঞ্চারিত হয় ও সর্বাঙ্গই অসুস্থ হয়ে পড়ে।"

আল্লাহ তা'আলা বলেন, তারা ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজ হতে নিষেধ করে থাকে। অর্থাৎ মুমিনরা অন্যদের শিক্ষা দীক্ষার ব্যাপারেও উদাসীন থাকে না। বরং তারা সকলকেই ভাল বিষয়ের শিক্ষা দেয় এবং মন্দ কাজ হতে

সাধ্যমত বিরত রাখার চেষ্টা করে। যেমন আল্লাহ তা'আলার উক্তিঃ "তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল হওয়া উচিত যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে, ভাল কাজের আদেশ করবে এবং মন্দ কাজ হতে নিষেধ করবে।"

আল্লাহ পাকের উক্তিঃ তারা সালাত সুপ্রতিষ্ঠিত করে ও যাকাত দিয়ে থাকে। অর্থাৎ একদিকে তারা আল্লাহর আনুগত্য স্বীকার করে তাঁর ইবাদত করে, আর অন্য দিকে তাঁর মাখলূকের প্রতি ইহসান করে।

তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ)-এর আদেশ ও নিষেধ মেনে চলে। অর্থাৎ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ) যা করতে আদেশ করেছেন তা তারা পালন করে এবং যা করতে নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকে।

এসব লোকের প্রতি আল্লাহ অবশ্যই করুণা বর্ষণ করবেন। অর্থাৎ যারা উপরোক্ত গুণের অধিকারী হবে তারা অবশ্যই আল্লাহর করুণা লাভের হকদার।

আল্লাহ তা'আলা হচ্ছেন মহাক্ষমতাবান। অর্থাৎ যারা তাঁর অনুগত হয় তাদেরকে তিনি মর্যাদা দিয়েই থাকেন। কেননা, মর্যাদা হচ্ছে আল্লাহর জন্যে, তাঁর রাসূল (সঃ)-এর জন্যে এবং মুমিনদের জন্যে।

আল্লাহ হচ্ছেন হিকমতওয়ালা। এটা তাঁর হিকমত ও নিপুণতা যে, তিনি মুমিনদেরকে এসব গুণের অধিকারী করেছেন এবং মুনাফিকদের ঐ সব বদ স্বভাবের অধিকারী করেছেন। তাঁর প্রতিটি কাজ নিপুণতায় পরিপূর্ণ। তিনি বড়ই কল্যাণময় ও মর্যাদাবান।

٧٢- وَعَدَ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَ مَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِيْ جَنّٰتِ عَدْنٍ وَ رِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ اَكْبَرُ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ○

৭২। আল্লাহ মুমিন পুরুষ ও মুমিনা নারীদেরকে এমন উদ্যানসমূহের ওয়াদা দিয়ে রেখেছেন যেগুলোর নিম্নদেশে বইতে থাকবে নহরসমূহ, যে (উদ্যান) গুলোর মধ্যে তারা অনন্তকাল থাকবে, আরও (ওয়াদা দিয়েছেন) ঐ উত্তম বাসস্থানসমূহের যা চিরস্থায়ী উদ্যানসমূহে অবস্থিত হবে, আর আল্লাহর সন্তুষ্টি হচ্ছে সর্বাপেক্ষা বড় (নিয়ামত), এটা হচ্ছে অতি বড় সফলতা।

মুমিন পুরুষ এবং মুমিনা নারীদের জন্যে আল্লাহ তা'আলা যে কল্যাণ ও চিরস্থায়ী নিয়ামতরাজি প্রস্তুত রেখেছেন, এখানে তিনি তারই বর্ণনা দিচ্ছেন। তিনি তাদের জন্যে এমন জান্নাতসমূহ তৈরী করে রেখেছেন যেগুলোর নিম্নদেশে নির্মল পানির প্রস্রবণ বইতে থাকে। সেখানে রয়েছে সুউচ্চ, সুন্দর, ঝকঝকে এবং সাজসজ্জাপূর্ণ প্রাসাদসমূহ! যেমন সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "দু'টি জান্নাত শুধু সোনার তৈরী, ও দু'টির পাত্র এবং ও দু'টির মধ্যে যা কিছু রয়েছে সবই সোনার তৈরী। আর দু'টি জান্নাত রয়েছে রূপার তৈরী, ও দু'টির পাত্র এবং অন্য যা কিছু রয়েছে সবই রূপার তৈরী। তারা (জান্নাতবাসীরা) তাদের প্রতিপালকের দিকে এমন অবস্থায় তাকাবে যে, তাঁর চেহারার ঔজ্জ্বল্যময় চাদর ছাড়া অন্য কোন পর্দা থাকবে না। এটা আদন নামক জান্নাতের মধ্যে হবে।" অন্য হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, মুমিনদের জন্যে জান্নাতে একটি তাঁবু থাকবে যা একটি মাত্র মুক্তা দ্বারা নির্মিত হবে। ওর দৈর্ঘ্য হবে ষাট মাইল। সেখানে মুমিনদের স্ত্রীরা থাকবে যাদের কাছে তারা যাতায়াত করবে, কিন্তু তারা একে অপরকে দেখতে পাবে না।

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (সঃ)-এর উপর ঈমান এনেছে, সালাত কায়েম করেছে ও রমযানের রোযা রেখেছে, আল্লাহ তা'আলার উপর এ হক রয়েছে যে, তিনি তাকে জান্নাতে প্রবিষ্ট করাবেন, সে হিজরত করে থাকুক বা বাড়ীতে বসেই থাকুক।"

লোকেরা জিজ্ঞেস করলোঃ "আমরা অন্যদেরকেও এ হাদীস শুনিয়ে দিবো কি?" তিনি উত্তরে বললেনঃ "জান্নাতে একশটি শ্রেণী রয়েছে, যেগুলোকে আল্লাহ তাঁর পথে জিহাদকারীদের জন্যে বানিয়েছেন। প্রতি দু'শ্রেণীর মাঝে এতোটা দূরত্ব রয়েছে যতটা দূরত্ব রয়েছে আসমান ও যমীনের মাঝে। সুতরাং যখনই তোমরা আল্লাহর কাছে জান্নাতের জন্যে প্রার্থনা করবে তখন জান্নাতুল ফিরদাউসের জন্যে প্রার্থনা করবে। ওটা সবচেয়ে উঁচু ও সর্বাপেক্ষা উত্তম জান্নাত। জান্নাতসমূহের সমস্ত নহর ওখান থেকেই বের হয়। ওর উপরেই রহমানের (আল্লাহর) আরশ রয়েছে।"

সাহল ইবনে সাদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "জান্নাতবাসীরা জান্নাতী প্রাসাদগুলোকে ঐরূপ দেখবে যেরূপ তোমরা আকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্রগুলো দেখে থাকো।" প্রকাশ থাকে যে, জান্নাতে একটি সুউচ্চ স্থান রয়েছে, যাকে 'ওয়াসীলা' বলা হয়, যা আরশের নিকটবর্তী স্থানে

রয়েছে। ওটাই হচ্ছে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর জান্নাতের বাসস্থান। যেমন আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "যখন তোমরা আমার উপর দুরূদ পাঠ করবে তখন আল্লাহর কাছে আমার জন্যে 'ওয়াসীলা' চাইবে।" জিজ্ঞেস করা হলোঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! 'ওয়াসীলা' কি?" তিনি উত্তরে বললেনঃ "ওটা হচ্ছে জান্নাতের একটি উচ্চতম শ্রেণী (প্রকোষ্ঠ), যা একটি মাত্র লোক লাভ করবে। আমি প্রবল আশা রাখি যে, ঐ লোকটি আমিই।" আমর ইবনুল আস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি নবী (সঃ)-কে বলতে শুনেছেনঃ "যখন তুমি মুআয্যিনের আযান শুনবে তখন যে শব্দগুলো সে উচ্চারণ করে তুমিও সেগুলো উচ্চারণ করবে। অতঃপর তোমরা আমার প্রতি দুরূদ পাঠ করবে। যে ব্যক্তি আমার উপর দুরূপ পাঠ করে, আল্লাহ্ তা'আলা তার প্রতি দশটি রহমত নাযিল করেন। অতঃপর আমার জন্যে ওয়াসীলা চাও। এটা জান্নাতের এমন একটি মনযিল যা আল্লাহ তা'আলার সমস্ত সৃষ্টির মধ্য হতে একটি মাত্র লোক লাভ করবে। আমি আশা রাখি যে, ওটা আমাকেই দান করা হবে। যে ব্যক্তি আমার জন্যে এ ওয়াসীলা চাবে তার জন্যে কিয়ামতের দিন আমার শাফাআত বৈধ হবে।"[১]

ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "তোমরা আমার জন্যে ওয়াসীলা যাঞ্চ্ঞা কর। যে কেউ আমার জন্যে ওয়াসীলা যাঞ্চ্ঞা করবে, কিয়ামতের দিন আমি তার সাক্ষী ও সুপারিশকারী হবো।"

আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমাদের কাছে জান্নাতের বর্ণনা দিন! ওর ভিত্তি কোন জিনিসের হবে? তিনি উত্তরে বললেনঃ "ওর ভিত্তি হবে স্বর্ণ ও রৌপ্যের ইটের। ওর গারা হবে খাঁটি মিশক। ওর কংকর হবে মুক্তা ও ইয়াকূত। ওর মাটি হবে জাফরান। সেখানে যে যাবে সে ঐ সুখ সম্ভোগের মধ্যে থাকবে যা কখনও শেষ হবে না। সেখানে সে চিরস্থায়ী জীবন লাভ করবে, যার পরে মৃত্যুর কোন ভয় নেই। না তার কাপড় খারাপ হবে, না যৌবনে কোন ভাটা পড়বে।" আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) একদা বলেনঃ "জান্নাতে এমন প্রকোষ্ঠ বা কক্ষ রয়েছে যার ভিতরের অংশ বাহির থেকে দেখা যাবে এবং বাইরের অংশ ভিতর থেকে দেখা যাবে।" একথা শুনে একজন বেদুইন উঠে জিজ্ঞেস করেঃ "হে

১. এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রঃ) ও ইমাম মুসলিম (রঃ) আবূ হুরাইরা (রঃ) হতে তাখরীজ করেছেন।

আল্লাহর রাসূল (সঃ)! এ প্রকোষ্ঠ কার জন্যে?” রাসূলুল্লাহ (সঃ) উত্তরে বলেনঃ “যে ভাল কথা বলে, খানা খেতে দেয়, রোযা রাখে এবং রাত্রে লোকদের নিদ্রা অবস্থায় (তাহাজ্জুদের) সালাত আদায় করে।”

উসামা ইবনে যায়েদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ “জান্নাতের আকাঙ্ক্ষী এবং ওর জন্যে পরিশ্রমকারী কেউ আছে কি? জান্নাতকে সীমাবদ্ধকারী ওর চতুষ্পার্শ্বে কোন প্রাচীর নেই। কা'বার প্রতিপালকের (আল্লাহর) শপথ! ওটা তো উজ্জ্বল নূর, সুগন্ধময় ফুলের বাগান, সুউচ্চ ও চাকচিক্যময় প্রাসাদ, তরঙ্গযুক্ত প্রবহমান নদী, পরিপুষ্ট ও পাকা পাকা ফলের গুচ্ছ, সুন্দর দেহ বিশিষ্টা ও পবিত্র চরিত্রের অধিকারিণী হুর, মূল্যবান রঙ্গীন রেশমী পোশাক, চিরস্থায়ী স্থান, শান্তি নিকেতন, ফল মূল, সবুজ শ্যামল পরিবেশ, প্রশস্ততা, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, নিয়ামত, রহমত এবং সুউচ্চ ও সুদৃশ্য প্রাসাদ।” এ কথা শুনে জনগণ বলে উঠলেনঃ “হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমরা এই জান্নাতের আকাঙ্ক্ষী ও এর জন্যে পরিশ্রমকারী।” তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁদেরকে বললেনঃ “ইন্‌শাআল্লাহ্ বল।” লোকেরা তখন ইনশাআল্লাহ বললেন।[১]

আল্লাহর সন্তুষ্টি হচ্ছে সর্বাপেক্ষা বড় (নিয়ামত)– অর্থাৎ তাদের প্রতি আল্লাহর সন্তুষ্টি যা তাদের সমুদয় ভোগ্য বস্তু অপেক্ষা বড় ও মর্যাদাপূর্ণ। মুসনাদে আহমাদে আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মহা মহিমান্বিত আল্লাহ জান্নাত বাসীদেরকে ডাক দিয়ে বলবেনঃ “হে জান্নাতবাসীরা!” তখন তারা (সমস্বরে) বলে উঠবেঃ “হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আপনার দরবারে হাযির আছি। আপনার হাতেই কল্যাণ রয়েছে।” আল্লাহ তা'আলা তখন বলবেনঃ “তোমরা সন্তুষ্ট হয়েছো কি?” তারা উত্তরে বলবেঃ “হে আমাদের প্রতিপালক! কেন আমরা সন্তুষ্ট হবো না? অথচ আপনি আমাদেরকে এমন জিনিসই দান করেছেন যা আপনার সৃষ্টির মধ্যে আর কাউকেই দান করেননি।” আল্লাহ্ তা'আলা জিজ্ঞেস করবেনঃ “এর চেয়ে উত্তম জিনিস কি আমি তোমাদেরকে দান করবো না?” তারা জবাব দেবেঃ “হে আমাদের প্রতিপালক! এর চেয়ে উত্তম জিনিস আর কি আছে?” আল্লাহ তা'আলা বলবেনঃ “হ্যাঁ, হ্যাঁ আছে, জেনে রেখো যে, আমি তোমাদের উপর আমার সন্তুষ্টি নাযিল করলাম। আজকের পর আমি তোমাদের উপর কখনো অসন্তুষ্ট হবো না।”

---

১. এ হাদীসটি ইমাম ইবনে মাজাহ (রঃ) উসামা ইবনে যায়েদ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন।

জাবির ইবনে আবদিল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, জান্নাতবাসীরা যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে তখন মহিমান্বিত আল্লাহ তাদেরকে জিজ্ঞেস করবেনঃ "তোমরা আর কিছু চাও কি? চাইলে আমি অতিরিক্ত আরো দেবো।" তারা উত্তরে বলবেঃ "হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদেরকে যা দিয়েছেন এর চেয়ে উত্তম আর কি হতে পারে?" আল্লাহ তা'আলা তখন বলবেনঃ "ওটা হচ্ছে আমার সন্তুষ্টি, যা সবচেয়ে বড় (নিয়ামত)।" ইমাম হাফিজ যিয়া মাকদিসি (রঃ) জান্নাতের বৈশিষ্ট্য ও গুণাগুণ বর্ণনায় একটি নির্ভরযোগ্য কিতাব লিখেছেন। সেখানে তিনি বলেছেনঃ "এ হাদীসটি আমার নিকট সহীহ এর শর্তের উপর রয়েছে।" এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

٧٣- يٰاَيُّهَا النَّبِىُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ○

৭৩। হে নবী! কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর এবং তাদের প্রতি কঠোর ব্যবহার অবলম্বন কর, আর তাদের বাসস্থান হবে জাহান্নাম; এবং ওটা হচ্ছে নিকৃষ্ট স্থান।

٧٤- يَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ مَا قَالُوْا وَلَقَدْ قَالُوْا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوْا بَعْدَ اِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوْا بِمَا لَمْ يَنَالُوْا وَمَا نَقَمُوْا اِلَّا اَنْ اَغْنٰىهُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ مِنْ فَضْلِهٖ فَاِنْ يَّتُوْبُوْا يَكُ خَيْرًا

৭৪। তারা আল্লাহর নামে শপথ করে বলছে যে, তারা (অমুক কথা) বলেনি, অথচ নিশ্চয়ই তারা কুফরী কথা বলেছিল এবং নিজেদের ইসলাম গ্রহণের পর কাফির হয়ে গেল, আর তারা এমন বিষয়ের সংকল্প করেছিল যা তারা কার্যকরী করতে পারেনি; আর তারা এটা শুধুমাত্র এই বিষয়েই প্রতিদান দিয়েছিল যে, তাদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল নিজ অনুগ্রহে

لَّهُمْ وَ اِنْ يَّتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللّٰهُ عَذَابًا اَلِيْمًا فِي الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ وَ مَا لَهُمْ فِي الْاَرْضِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّ لَا نَصِيْرٍ ○

সম্পদশালী করে দিয়েছিলেন, অনন্তর যদি তারা তাওবা করে নেয় তবে তা তাদের জন্যে উত্তম হবে; আর যদি তারা বিমুখ হয় তবে আল্লাহ তাদেরকে ইহকালে ও পরকালে যন্ত্রণাময় শাস্তি প্রদান করবেন, আর ভূ-পৃষ্ঠে তাদের না কোন অলী হবে, আর না কোন সাহায্যকারী।

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল (সঃ)-কে কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার এবং তাদের প্রতি কঠোর হওয়ার নির্দেশ দিচ্ছেন। আর তাঁর অনুসারী মুমিনদের সাথে নম্র ব্যবহার করার আদেশ করছেন। তিনি সংবাদ দিচ্ছেন যে, কাফিরদের মূল স্থান হচ্ছে জাহান্নাম। ইতিপূর্বে আমীরুল মুমিনীন আলী ইবনে আবি তালিব (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে চারটি তরবারীসহ প্রেরণ করা হয়েছে। একখানা মুশরিকদের (বিরুদ্ধে ব্যবহারের) জন্যে। আল্লাহ পাক বলেন ঃ

فَاِذَا انْسَلَخَ الْاَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ

অর্থাৎ "যখন নিষিদ্ধ মাসগুলো অতীত হয়ে যাবে তখন মুশরিকদেরকে যেখানে পাও বধ কর।" (৯ঃ ৫) দ্বিতীয় তরবারী আহ্লে কিতাবের কাফিরদের (বিরুদ্ধে চালনার) জন্যে। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَ لَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَ لَا يُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَ لَا يَدِيْنُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَّدٍ وَّهُمْ صٰغِرُوْنَ ـ

অর্থাৎ "যেসব আহ্লে কিতাব আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে না এবং কিয়ামতের দিবসের প্রতিও না, আর ঐ বস্তুগুলোকে হারাম মনে করে না যেগুলোকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ) হারাম বলেছেন, এবং সত্য ধর্ম (ইসলাম) গ্রহণ করে না, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকো, যে পর্যন্ত না তারা অধীনতা স্বীকার করে প্রজারূপে জিযিয়া দিতে স্বীকৃত হয়।" (৯ঃ ২৯) তৃতীয় তরবারী মুনাফিকদের (বিরুদ্ধে ব্যবহারের) জন্যে। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَ الْمُنٰفِقِيْنَ

অর্থাৎ “কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর।” আর চতুর্থ তরবারী বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে (যুদ্ধের জন্যে)। মহা পরাক্রান্ত আল্লাহ বলেনঃ

فَقَاتِلُوا الَّتِىْ تَبْغِىْ حَتّٰى تَفِىْٓءَ اِلٰٓى اَمْرِ اللّٰهِ

অর্থাৎ “তোমরা বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর যে পর্যন্ত না তারা আল্লাহর হুকুমের দিকে ফিরে আসে।” (৯ঃ ৪৯) এর দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, মুনাফিকরা যখন তাদের নিফাক (কপটতা) প্রকাশ করতে শুরু করবে তখন তাদের বিরুদ্ধে তরবারী দ্বারা যুদ্ধ ঘোষণা করা উচিত। ইমাম ইবনে জারীর (রঃ)-এর পছন্দনীয় মতও এটাই। ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বলেন যে, হাত দ্বারা না পারলে তাদেরকে তাদের মুখের উপর ধমক দিতে হবে। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের বিরুদ্ধে তরবারী দ্বারা যুদ্ধ করার নির্দেশ দিয়েছেন, আর মুনাফিকদের সাথে মুখে জিহাদ করার হুকুম করেছেন এবং তাদের সাথে নম্র ব্যবহার করার কথা বলেছেন। মুজাহিদ (রঃ)-এরও উক্তি প্রায় এটাই। তাদের উপর শরঈ হদ জারী করাও তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাই বটে। ভাবার্থ এই যে, প্রয়োজন বোধে মাঝে মাঝে তাদের বিরুদ্ধে তরবারীও উঠাতে হবে। তবে কাজ চললে তাদেরকে মুখে বলাই যথেষ্ট। পরিস্থিতি বুঝে কাজ করতে হবে।

আল্লাহ তা'আলার উক্তিঃ “তারা শপথ করে করে বলে যে, তারা (অমুক কথা) বলেনি, অথচ নিশ্চয়ই তারা কুফরী কথা বলেছিল এবং নিজেদের (বাহ্যিক) ইসলাম গ্রহণের পর খোলাখুলিভাবে কুফরী করেছে।” কাতাদা (রঃ) বলেন যে, এ আয়াতটি আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই এর সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়। ঘটনা এই যে, এক জুহনী ও এক আনসারীর মধ্যে লড়াই বেঁধে যায়। জুহনী আনসারীর উপর চেপে বসে (আনসারীকে কাবু করে ফেলে) তখন আব্দুল্লাহ (মুনাফিকদের নেতা) আনসারদেরকে বলে, তোমরা কি তোমাদের ভাই আনসারীকে সাহায্য করবে না? আল্লাহর শপথ! আমাদের দৃষ্টান্ত ও মুহাম্মাদ (সঃ)-এর দৃষ্টান্ত হচ্ছে ঠিক উক্তিকারীর নিম্নের উক্তির মতঃ “তোমার কুকুরটি মোটা তাজা হয়েছে (অর্থাৎ তুমি খাওয়ায়ে মোটা তাজা করেছো), ওটা কিন্তু তোমাকেই খাবে (কামড়াবে)।” আল্লাহর কসম! যদি আমরা এখন মদীনায় ফিরে যাই তবে সম্মানিতরা হীন লোকদেরকে তথা হতে বহিষ্কার করে দেবে। একজন মুসলিম রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে গিয়ে তার এ কথা বলে দেয়। তিনি তাকে ডেকে এটা জিজ্ঞেস করলে সে কসম করে তা সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করে। তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করেন।

আনাস (রাঃ) বলেন, আমার কওমের যেসব লোক হুররার যুদ্ধে শহীদ হন তাঁদের জন্যে আমি খুবই দুঃখ প্রকাশ করি। এ সংবাদ যায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ)-এর কাছে পৌঁছলে তিনি আমার কাছে একখানা চিঠি পাঠান। তাতে তিনি লিখেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছেনঃ "হে আল্লাহ! আপনি আনসারদেরকে এবং তাদের সন্তানদেরকে ক্ষমা করে দিন।" রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর এ দুআ'য় আনসারদের পৌত্রদের উল্লেখ করেছিলেন কি না এ ব্যাপারে বর্ণনাকারী ইবনুল ফযল (রঃ) সন্দেহ করেছেন। আনাস (রাঃ) তাঁর পাশের একটি লোককে যায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন ঃ "তিনি হচ্ছেন সেই যায়েদ যাঁর কানে শোনা কথার সত্যতার সাক্ষ্য স্বয়ং সর্বজ্ঞাতা আল্লাহ তা'আলা দিয়েছেন।" ঘটনা এই যে, একদা রাসূলুল্লাহ (সঃ) ভাষণ দিচ্ছিলেন। এমতাবস্থায় এক মুনাফিক বলে ওঠেঃ "যদি এ ব্যক্তি সত্যবাদী হন তবে আমরা গাধার চেয়েও বেশী নির্বোধ।" তখন যায়েদ (রাঃ) বলেনঃ "আল্লাহর শপথ! নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ (সঃ) সত্যবাদী এবং অবশ্যই তুমি গাধার চাইতেও নির্বোধ।" অতঃপর তিনি এ সংবাদ রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কানে পৌঁছিয়ে দেন। কিন্তু ঐ মুনাফিক ওটা অস্বীকার করে বসে এবং বলে যে, যায়েদ (রাঃ) মিথ্যা কথা বলেছেন। তার এ কথার প্রতিবাদে আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করেন এবং যায়েদ (রাঃ)-এর সত্যবাদিতা প্রকাশ করে দেন।

কিন্তু প্রসিদ্ধ উক্তি এই যে, এটা হচ্ছে বানী মুসতালিক যুদ্ধের ঘটনা। খুব সম্ভব এই আয়াতের উল্লেখের ব্যাপারে বর্ণনাকারীর সন্দেহ হয়েছে এবং অন্য আয়াতের পরিবর্তে এ আয়াতটিকে বর্ণনা করে দিয়েছেন। এই হাদীসই সহীহ বুখারীতেও রয়েছে। কিন্তু তাতে নিম্নের বাক্য পর্যন্ত রয়েছে– "যার কানে শোনা কথার সত্যতার সাক্ষ্য দিয়েছেন স্বয়ং সর্বজ্ঞাতা আল্লাহ।" সম্ভবতঃ পরের অংশটুকু বর্ণনাকারী মূসা ইবনে উকবা (রঃ)-এর নিজের উক্তি। তাঁরই একটি বর্ণনায় পরবর্তী এ অংশটুকু ইবনে শিহাব (রঃ)-এর উক্তিতে বর্ণিত আছে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

উমুভী (রঃ) তাঁর 'মাগাযী' গ্রন্থে কা'ব ইবনে মালিক (রাঃ)-এর তাবূক সম্পর্কীয় ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তাতে রয়েছে যে, কা'বকে তাঁর কওমের লোকেরা বলেঃ "আপনি তো একজন কবি মানুষ। আপনি ইচ্ছা করলে কোন কারণ দর্শিয়ে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে ওযর পেশ করতে পারেন। অতঃপর ঐ পাপের জন্যে আপনি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবেন।" এরপর বিশদভাবে

হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। তাতে এ কথাও রয়েছে যে, যেসব মুনাফিক পিছনে রয়ে গিয়েছিল এবং যাদের ব্যাপারে কুরআন কারীমের আয়াত নাযিল হয়, তাদের মধ্যে কেউ কেউ রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথেও ছিল। জাল্লাস ইবনে সাভীদ ইবনে সামিতও ছিল তাদের মধ্যে একজন। উমাইর ইবনে সাদ (রাঃ)-এর মাতা তার ঘরে (স্ত্রীরূপে) ছিলেন, যিনি সা'দকেও (রাঃ) সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন।[১] যখন ঐ মুনাফিকদের ব্যাপারে কুরআনের আয়াত অবতীর্ণ হয় তখন জাল্লাস বলেঃ "আল্লাহর কসম! যদি এ ব্যক্তি (মুহাম্মাদ সঃ) তাঁর কথায় সত্যবাদী হন তবে তো আমরা এই গাধার চেয়েও নিকৃষ্ট!" এ কথা শুনে উমাইর ইবনে সা'দ (রাঃ) বলে উঠলেনঃ "আপনি তো আমার কাছে অত্যন্ত প্রিয় এবং আপনার কষ্ট আমার কষ্টের চাইতেও আমার কাছে বেশী পীড়াদায়ক। কিন্তু এখন আপনি আপনার মুখ থেকে এমন একটা কথা বের করলেন যে, যদি আমি তা পৌঁছিয়ে দেই তবে আমার জন্যে রয়েছে লাঞ্ছনা, আর না পৌঁছালে রয়েছে ধ্বংস। তবে লাঞ্ছনা অবশ্যই ধ্বংস হতে হাল্কা।" একথা বলেই তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর দরবারে হাযির হয়ে ঐ কথা বলে দিলেন। জাল্লাস এ সংবাদ পেয়ে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট এসে শপথ করে বলেঃ "উমাইর ইবনে সা'দ (রাঃ) মিথ্যা কথা বলেছে। আমি কখনও এ কথা বলিনি।" তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। বর্ণিত আছে যে, এরপর জাল্লাস তাওবাহ্ করে নেয় এবং ঠিক হয়ে যায়। তবে সম্ভবতঃ তার তাওবাহ্ করার কথাটা ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক (রঃ)-এর নিজের উক্তি হবে, কা'ব (রাঃ)-এর উক্তি নয়। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

উরওয়া ইবনে যুবাইর (রঃ) বলেন যে, এ আয়াতটি জাল্লাস ইবনে সাভীদ ইবনে সামিতের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। ঘটনা এই যে, সে এবং তার স্ত্রীর (পূর্ব স্বামীর ঔরসজাত) পুত্র মুসআ'ব (রাঃ) কুবা থেকে আসছিল। হঠাৎ করে জাল্লাস বলে ফেলেঃ "মুহাম্মাদ (সঃ) যা নিয়ে এসেছেন তা যদি সত্য হয় তবে তো আমরা যে গাধার উপর সওয়ার হয়ে আছি এর থেকেও আমরা নির্বোধ!" তখন মুসআ'ব (রাঃ) তাকে বলেনঃ "ওরে আল্লাহর শত্রু! আল্লাহর কসম! আমি অবশ্যই আল্লাহর রাসূল (সঃ)-কে এ সংবাদ দিয়ে দেবো। আমি ভয় পাচ্ছি যে, না জানি আমার ব্যাপারে কুরআনের আয়াত নাযিল হয়ে যায় বা আমার উপর

১. উমাইর ইবনে সা'দ (রাঃ) তাঁর মাতার অন্য স্বামীর ঔরসজাত পুত্র ছিলেন। উমাইর (রাঃ)-এর পিতার মৃত্যুর পর তাঁর মাতার সাথে জাল্লাসের দ্বিতীয় বিয়ে হয় এবং বিয়ের পর তিনি তাঁর পুত্র উমাইরকেও (রাঃ) সঙ্গে নিয়ে জাল্লাসের বাড়ীতে আসেন।

আল্লাহর কোন শাস্তি এসে পড়ে, অথবা এই পাপে আমার বৈপিত্রের সাথে আমাকেও শরীক করে নেয়া হয়!" তাই আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে হাযির হয়ে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমি এবং জাল্লাস কুবা থেকে আসছিলাম। ঐ সময় সে এরূপ এরূপ বলেছে। আমি যদি এ ভয় না করতাম যে, এ অপরাধে আমাকেও জড়িয়ে ফেলা হবে, তবে আমি আপনাকে এ খবর দিতাম না। বর্ণনাকারী বলেন যে, মুসআ'ব (রাঃ)-এর এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সঃ) জাল্লাসকে ডেকে পাঠান এবং তাকে জিজ্ঞেস করেনঃ "মুসআ'ব (রাঃ) যে কথা বলেছে সে কথা কি তুমি (সত্যি) বলেছো?" তখন সে আল্লাহর কসম করে তা অস্বীকার করে বসে। তখন আল্লাহ তা'আলা يَحْلِفُونَ بِاللّٰهِ مَا قَالُوا -এ আয়াত অবতীর্ণ করেন।

তাফসীরে ইবনে জারীরে ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ (সঃ) একটি গাছের ছায়ায় বসেছিলেন। ঐ সময় তিনি (সাহাবীদেরকে) বলেনঃ "এখনই তোমাদের কাছে একটি লোক আসবে এবং সে তোমাদের দিকে শয়তানের দৃষ্টিতে তাকাবে। যখন সে আসবে তখন তোমরা তার সাথে কথা বলবে না।" তখনই কয়রা চক্ষু বিশিষ্ট একটি লোক এসে গেল। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ "তুমি ও তোমার সঙ্গীরা আমাকে গালি দাও কেন?" তৎক্ষণাৎ সে গিয়ে তার সঙ্গী সাথীদেরকে নিয়ে আসলো এবং সবাই আল্লাহর নামে শপথ করে বললো যে, তারা ওসব কথা বলেনি। শেষ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাদেরকে ক্ষমা করে দেন। তখন মহা মহিমান্বিত আল্লাহ يَحْلِفُونَ بِاللّٰهِ مَا قَالُوا -এ আয়াত অবতীর্ণ করেন।

আল্লাহ পাকের وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا (তারা এমন বিষয়ের সংকল্প করেছিল যা তারা কার্যকরী করতে পারেনি) এ উক্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এর দ্বারা জাল্লাসের সংকল্পকে বুঝানো হয়েছে। সে সংকল্প করেছিল যে, তার স্ত্রীর পূর্ব স্বামীর ঔরসজাত যে ছেলেটি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে তার কথা বলে দিয়েছিলেন তাঁকে সে হত্যা করবে। একটি উক্তি এই যে, আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে হত্যা করার সংকল্প করেছিল। একটি উক্তি এও আছে যে, কতকগুলো লোক ইচ্ছা করেছিল, মুহাম্মাদ (সঃ) সম্মত না হলেও তারা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইকে তাদের সরদার বানাবে। এটাও বর্ণিত আছে যে, দশজনের বেশী লোক তাবূকের যুদ্ধে গমনের সময় পথে প্রতারণা করে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে হত্যা করার সংকল্প করেছিল। হুযাইফা (রাঃ) বলেনঃ "আমি এবং আম্মার (রাঃ)

রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর উষ্ট্রীর আগে ও পিছনে চলছিলাম। একজন পিছন থেকে হাঁকাচ্ছিলাম এবং অন্যজন আগে আগে লাগাম ধরে টানছিলাম। আমরা আকাবা নামক স্থানে ছিলাম। এমন সময় দেখি যে, বারোজন লোক মুখের উপর ঢাকনা দিয়ে আসলো এবং রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর উষ্ট্রীটিকে ঘিরে ধরলো। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাদেরকে ভয় প্রদর্শন করলেন। সুতরাং তারা পালিয়ে গেল। তিনি আমাদেরকে জিজ্ঞেস করলেনঃ "তোমরা তাদেরকে চিনতে পেরেছো কি?" আমরা উত্তর দিলামঃ না, তবে তাদের সওয়ারীগুলো আমাদের চোখের সামনে রয়েছে (অর্থাৎ তাদের সওয়ারীগুলো আমরা চিনতে পেরেছি)। তিনি বললেনঃ "এরা হচ্ছে মুনাফিক এবং কিয়ামত পর্যন্ত এদের অন্তরে নিফাক (কপটতা) থাকবে। এরা কোন্ উদ্দেশ্যে এসেছিল তা তোমরা জান কি?" আমরা উত্তরে বললামঃ না। তিনি বললেনঃ "এরা এসেছিল আকাবায় আল্লাহর রাসূল (সঃ)-কে পেরেশান করা ও কষ্ট দেয়ার উদ্দেশ্যে।" আমরা বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমরা কি তাদের গোত্রগুলোর কাছে এ সংবাদ পাঠাবো না যে, প্রত্যেক কওম যেন তাদের এই প্রকারের লোকের (কর্তিত) মস্তক আপনার কাছে পাঠিয়ে দেয় (অর্থাৎ তার গর্দান উড়িয়ে দেয়) ? তিনি উত্তরে বললেনঃ "না, (এটা করা যায় না) তাহলে লোকেরা সমালোচনা করবে যে, মুহাম্মাদ (সঃ) প্রথমে তো এই লোকদেরকে নিয়েই শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে জয়লাভ করেছেন, আবার নিজের সেই সঙ্গীদেরকে হত্যা করে দিলেন।" অতঃপর তিনি বদ্ দুআ' করলেনঃ "হে আল্লাহ! আপনি এদের অন্তরে আগুনের ফোঁড়া সৃষ্টি করে দিন!"

মুসনাদে আহমাদে আবুত্ তুফাইল (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাবূকের যুদ্ধ হতে ফিরবার পথে ঘোষণা করে দেনঃ "আমি আকাবার পথে গমন করবো। কেউ যেন এই পথে না আসে।" হুযাইফা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সওয়ারীর লাগাম ধরেছিলেন এবং আম্মার (রাঃ) পিছন থেকে হাঁকিয়ে যাচ্ছিলেন। এমতাবস্থায় এক দল লোক তাদের উষ্ট্রীগুলোর উপর সওয়ার হয়ে উপস্থিত হয়। আম্মার (রাঃ) তাদের উষ্ট্রীগুলোকে মারতে শুরু করেন। আর হুযাইফা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নির্দেশক্রমে তাঁর সওয়ারীকে নীচের দিকে চালাতে শুরু করেন। যখন নীচের মাঠে এসে পড়ে তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) সওয়ারী হতে নেমে পড়েন। ইতিমধ্যে আম্মারও (রাঃ) ফিরে আসেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) আম্মার (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেনঃ "ঐ লোকগুলোকে চিনতে পেরেছো কি?" তিনি উত্তরে বলেনঃ "তাদের মুখ তো ঢাকা ছিল, তবে তাদের সওয়ারীগুলো আমি চিনতে পেরেছি।" রাসূলুল্লাহ (সঃ) জিজ্ঞেস করলেনঃ "তারা

কি উদ্দেশ্যে এসেছিল তা জান কি?" তিনি জবাবে বললেনঃ "না।" তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ "তারা চেয়েছিল গোলমাল ও চীৎকার করে আমার উষ্ট্রীকে উত্তেজিত করতে, যাতে আমি উষ্ট্রী থেকে পড়ে যাই।" আম্মার (রাঃ) একজন লোককে জিজ্ঞেস করেনঃ "আমি তোমাকে আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি– আকাবার ঐ লোকগুলো কতজন ছিল?" সে উত্তরে বলেঃ "চৌদ্দজন।" তখন আম্মার (রাঃ) তাকে বলেনঃ "তুমি যদি তাদের অন্তর্ভুক্ত হও তবে পনেরো জন হবে।" রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাদের মধ্যে তিনজনের নাম গণনা করেন। তারা বলেঃ "আল্লাহ্র শপথ! না আমরা আল্লাহর রাসূল (সঃ)-এর আহ্বানকারীর আহ্বান শুনেছি, না আমরা আমাদের সঙ্গীদের কুমতলব অবগত ছিলাম।" আম্মার (রাঃ) বলেনঃ "অবশিষ্ট বারোজন লোক আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ)-এর বিরুদ্ধে জিহাদকারী, দুনিয়াতেও এবং আখিরাতেও। ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক (রঃ) অনেক লোকের নামও বলেছেন। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী।

সহীহ্ মুসলিমে রয়েছে যে, আহলে আকাবার মধ্যকার একটি লোকের সাথে আম্মার (রাঃ)-এর কিছুটা সম্পর্ক ছিল। তাই তিনি লোকটিকে আল্লাহর কসম দিয়ে আহলে আকাবার সংখ্যা জিজ্ঞেস করেন। তখন লোকেরাও তাকে তাদের সংখ্যা বলতে বলে। সে বলেঃ "আমি জানতে পেরেছি যে, তারা ছিল চৌদ্দজন। আর আমাকেও যদি তাদের অন্তর্ভুক্ত ধরা যায় তবে সংখ্যা দাঁড়াবে পনেরো।" রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাদের তিনজনের নাম বলে দিলে তারা বলেঃ "আল্লাহর শপথ! আমরা আল্লাহর রাসূল (সঃ)-এর আহ্বানকারীর আহ্বানও শুনিনি এবং ঐ কওমের কি উদ্দেশ্য ছিল সেটাও আমরা জানতাম না।" অবশিষ্ট বারোজন দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণাকারী। গরমের মৌসুম ছিল। পানি ছিল খুবই কম। তাই তিনি বলেছিলেনঃ "আমার পূর্বে কেউ যেন সেখানে না পৌঁছে।" কিন্তু তবুও কিছু লোক সেখানে পৌঁছে গিয়েছিল। তিনি তাদের উপর অভিশাপ দেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "আমার সহচরদের মধ্যে বারোজন মুনাফিক রয়েছে। তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না এবং ওর সুগন্ধও পাবে না। আটজনের কাঁধে আগুনের ফোঁড়া হবে যা বক্ষ পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। তা তাদেরকে ধ্বংস করে দিবে।" রাসূলুল্লাহ (সঃ) একমাত্র হুযায়ফা (রাঃ)-কে ঐ মুনাফিকদের নাম বলেছিলেন বলেই তাঁকে তার রাযদার (যিনি গোপন কথা জানেন) বলা হতো। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

ইমাম তিবরানী (রঃ) তাঁর কিতাবে আসহাবে আকাবার নিম্নরূপ নাম দিয়েছেনঃ

(১) মু'তাব ইবনে কুশাইর, (২) ওয়াদীআ' ইবনে সাবিত, (৩) জাদ্দ ইবনে আবদিল্লাহ ইবনে নাবীল, এ ছিল আমর ইবনে আউফের গোত্রের লোক, (৪) হারিস ইবনে ইয়াযীদ আত্তায়ী, (৫) আউস ইবনে কাইযী, (৬) হারিস ইবনে সাভীদ, (৭) সা'দ ইবনে যারারা, (৮) কায়েস ইবনে ফাহদ, (৯) বানু হুবলা গোত্রের সাভীদ ইবনে দাইস, (১০ কায়েস ইবনে আমর ইবনে সাহল, (১১) যায়েদ ইবনে লাসীত এবং (১২) সালালা ইবনে হামাম। শেষোক্ত দু'ব্যক্তি বানু কাইনুকা গোত্রের লোক। তারা সবাই বাহ্যিকভাবে ইসলাম গ্রহণ করেছিল।

এ আয়াতেই এর পরে বলা হয়েছে- তারা শুধু এরই প্রতিশোধ গ্রহণ করেছে যে, আল্লাহ স্বীয় অনুগ্রহে তাঁর রাসূল (সঃ)-এর মাধ্যমে তাদেরকে মালদার করেছেন। যদি তাদের উপর আল্লাহ তা'আলার পূর্ণ অনুগ্রহ হতো তবে তাদের ভাগ্যে হিদায়াতও জুটতো। যেমন রাসূলুল্লাহ (সঃ) আনসারদেরকে বলেনঃ "আমি কি তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট অবস্থায় পাইনি, অতঃপর আমার মাধ্যমে আল্লাহ তোমাদেরকে হিদায়াত দান করেছেন? তোমরা কি বিচ্ছিন্ন ছিলে না, অতঃপর আল্লাহ আমার মাধ্যমে তোমাদেরকে প্রেমের সূত্রে আবদ্ধ করেছেন? তোমরা কি দরিদ্র ছিলে না, অতঃপর আল্লাহ আমার মাধ্যমে তোমাদেরকে ধনী করেছেন?" রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর প্রতিটি প্রশ্নের জবাবে আনসাররা বলছিলেনঃ "নিশ্চয়ই আমাদের উপর আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ)-এর এর চেয়েও বেশী ইহসান রয়েছে।" মোটকথা, বর্ণনা এই যে, বিনা কারণে ও বিনা দোষে এই লোকগুলো শত্রুতা ও বেঈমানী করে বসেছে। যেমন আল্লাহ পাক বলেনঃ "কাফিররা মুমিনদের শুধু এরই প্রতিশোধ নিয়েছিল যে, তারা প্রবল পরাক্রান্ত ও মহা প্রশংসিত আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছিল।" রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "ইবনে জামীল শুধু এরই প্রতিশোধ নিচ্ছে যে, সে দরিদ্র ছিল, অতঃপর আল্লাহ তাকে সম্পদশালী করেছেন।"

এরপর আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তাওবার দিকে ডাক দিয়ে বলেনঃ "এখনও যদি তারা তাওবা করে নেয় তবে তা তাদের জন্যে কল্যাণকর হবে। আর যদি তারা তাদের নীতির উপরই অটল থাকে তবে আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে বেদনাদায়ক শাস্তি প্রদান করবেন।" অর্থাৎ যদি তারা তাদের পন্থা ও নীতিকেই আঁকড়ে ধরে থাকে তবে আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়ায় যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিবেন হত্যা, দুঃখ এবং চিন্তার দ্বারা, আর পরকালে জাহান্নামের অপমানজনক ও কষ্টদায়ক আযাব দ্বারা।

আল্লাহ তা'আলার উক্তিঃ "দুনিয়ায় তাদের কোন বন্ধু ও সাহায্যকারী নেই।" অর্থাৎ দুনিয়ায় এমন কেউ নেই যে তাদেরকে কোন সাহায্য করতে পারবে। না পারবে তারা তাদের কোন উপকার করতে এবং না পারবে তাদের কোন কষ্ট দূর করতে। অসহায়ভাবেই তারা জীবন কাটাবে।

৭৫। আর তাদের মধ্যে এমন কতিপয় লোক রয়েছে যারা আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার করে–আল্লাহ যদি আমাদেরকে নিজ অনুগ্রহে (প্রচুর সম্পদ) দান করেন, তবে আমরা খুব দান খয়রাত করবো এবং ভাল ভাল কাজ করবো।

٧٥- وَمِنْهُمْ مَّنْ عٰهَدَ اللّٰهَ لَئِنْ اٰتٰنَا مِنْ فَضْلِهٖ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُوْنَنَّ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ○

৭৬। কার্যতঃ যখন আল্লাহ তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে (প্রচুর সম্পদ) দান করলেন, তখন তারা তাতে কার্পণ্য করতে লাগলো এবং (আনুগত্য করা হতে) পরাঙ্মুখ হতে লাগল, আর তারা তো মুখ ফিরিয়ে রাখতেই অভ্যস্ত।

٧٦- فَلَمَّاۤ اٰتٰهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ بَخِلُوْا بِهٖ وَتَوَلَّوْا وَّهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ○

৭৭। অনন্তর আল্লাহ তাদের শাস্তি স্বরূপ তাদের অন্তরসমূহে নিফাক (উৎপন্ন) করে দিলেন, যা আল্লাহর সামনে হাযির হওয়ার দিন পর্যন্ত থাকবে, এই কারণে যে, তারা আল্লাহর সাথে নিজেদের ওয়াদার খিলাফ করেছে, আর এই কারণে যে, তারা (পূর্ব হতেই) মিথ্যা বলছিল।

٧٧- فَاَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِىْ قُلُوْبِهِمْ اِلٰى يَوْمِ يَلْقَوْنَهٗ بِمَاۤ اَخْلَفُوا اللّٰهَ مَا وَعَدُوْهُ وَبِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ ○

৭৮। তাদের কি জানা নেই যে, আল্লাহ তাদের মনের গুপ্ত কথা এবং গোপন পরামর্শ সবই অবগত আছেন? আর তাদের কি এই খবর নেই যে, আল্লাহ সমস্ত গায়েবের কথা খুবই জ্ঞাত আছেন?

٧٨- اَلَمْ يَعْلَمُوْاۤ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوٰىهُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ ۝

আল্লাহ তা'আলা বলেন, এই মুনাফিকদের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে যারা আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার করেছে যে, যদি তিনি তাদেরকে সম্পদশালী করে দেন তবে তারা খুবই দান-খয়রাত করবে এবং সৎ লোক হয়ে যাবে। অতঃপর যখন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ধনী বানিয়ে দিলেন এবং তাদের অবস্থা স্বচ্ছল হয়ে গেল তখন সে অঙ্গীকার ভঙ্গ করে দিলো ও কৃপণতা করতে শুরু করলো। এর শাস্তি স্বরূপ আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরে চিরদিনের জন্যে নিফাক বা কপটতা সৃষ্টি করে দিলেন।

এ আয়াতটি সা'লাবা ইবনে হাতিব আনসারীর ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। যে নবী (সঃ)-কে বলেঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করুন, তিনি যেন আমাকে ধন-সম্পদ দান করেন।" তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে বলেনঃ "যে অল্প মালের তুমি শোকরিয়া আদায় করবে তা ঐ অধিক মাল হতে উত্তম যার তুমি শোকরিয়া আদায় করতে সক্ষম হবে না।" সে দ্বিতীয়বার ঐ প্রার্থনাই করলো। তখন নবী (সঃ) তাকে বললেনঃ "তুমি কি নিজের অবস্থা আল্লাহর নবী (সঃ)-এর মত রাখা পছন্দ কর না? যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! আমি যদি ইচ্ছা করি যে, পাহাড়গুলো সোনা ও রূপা হয়ে আমার সাথে চলতে থাকুক তবে অবশ্যই সেগুলো সেভাবেই চলতে থাকবে।" সে বললোঃ "যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন তাঁর শপথ! যদি আপনি আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করেন, অতঃপর তিনি আমাকে ধন-সম্পদ দান করেন তবে আমি অবশ্যই প্রত্যেক হকদারকে তার হক প্রদান করবো।" তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ "হে আল্লাহ! আপনি সা'লাবাকে ধন-সম্পদ দান করুন।" ফলে তার বকরীগুলো এতো বেশী বৃদ্ধি পায় যেমনভাবে পোকা মাকড়গুলো বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। এমন কি মদীনা শরীফ তার পশুগুলোর পক্ষে সংকীর্ণ হয়ে গেল। সুতরাং সে মদীনা থেকে দূরে চলে গেলো। যোহর ও আসরের সালাত সে জামাআতের সাথে আদায় করতো বটে, কিন্তু অন্যান্য

সালাত জামাআতের সাথে আদায় করতে পারতো না। তার পশুগুলো আরো বৃদ্ধি পায়, ফলে তাকে আরো দূরে চলে যেতে হয়। এখন শুধু জুমআ ছাড়া তার সমস্ত জামাআত ছুটে যায়। মাল আরো বেড়ে গেল। ক্রমে ক্রমে সে জুমআর জামাআতে হাযির হওয়াও ছেড়ে দিলো। যেসব যাত্রীদল জুমআয় হাযির হতো তাদেরকে সে জুমআর আলোচিত বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করতো। একদা রাসূলুল্লাহ (সঃ) সম্পর্কে লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলে তারা সব কিছু বর্ণনা করে দেয়। তখন তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন। আর এদিকে আয়াত নাযিল হয়ে যায়। خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً অর্থাৎ "তাদের মাল থেকে সাদকা (যাকাত) নিয়ে নাও।" (৯ঃ ১০৩) সাদকার আহকামও নাযিল হয়। সুতরাং রাসূলুল্লাহ (সঃ) মুসলিমদের নিকট থেকে যাকাত আদায় করার জন্যে দু'জন লোককে প্রেরণ করেন। একজন ছিলেন জুহাইনা গোত্রের লোক এবং অপরজন ছিলেন সুলাইম গোত্রের লোক। কিভাবে তাঁরা মুসলিমদের নিকট থেকে যাকাত আদায় করবেন তা তিনি তাঁদেরকে লিখে দেন। আর তাঁদেরকে বলেনঃ "তোমরা দু'জন সা'লাবার নিকট থেকে এবং বানু সুলাইমের অমুক ব্যক্তির নিকট থেকে যাকাত গ্রহণ কর।" সুতরাং তাঁরা দু'জন সা'লাবার কাছে গিয়ে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নির্দেশনামা দেখালেন এবং যাকাত চাইলেন। সে তখন বললোঃ "এটা তো জিযিয়ার বোন ছাড়া কিছুই নয়! এটা কি তা আমি বুঝতে পারছি না। আচ্ছা এখন যাও, ফিরবার পথে এসো।" তখন তাঁরা দু'জন চলে আসলেন। তাঁদের সংবাদ সুলাইম গোত্রের লোকটির নিকট পৌঁছলে তিনি উত্তম উটগুলো বের করে আনলেন এবং ওগুলো নিয়ে নিজেই তাঁদের কাছে আসলেন। তাঁরা ঐ জন্তুগুলোর দিকে দৃষ্টিপাত করে বললেনঃ "এগুলো তোমার উপর ওয়াজিবও নয় এবং আমরা এগুলো তোমার নিকট থেকে গ্রহণ করতেও চাই না।" তিনি বললেনঃ "আমি তো খুশী মনে আমার উত্তম পশুগুলো দিতে চাচ্ছি, সুতরাং আপনারা এগুলো কবূল করে নিন।" শেষ পর্যন্ত তাঁরা ওগুলো গ্রহণ করলেন। অন্যান্যদের নিকট থেকেও তাঁরা যাকাত আদায় করলেন। ফিরবার পথে তাঁরা সা'লাবার কাছে আসলেন। সে বললোঃ "যে নির্দেশনামা তোমাদেরকে দেয়া হয়েছে তা আমাকে পড়তে দাও দেখি।" পড়ে সে বলতে লাগলোঃ "এটা তো স্পষ্ট জিযিয়া। কাফিরদের উপর যে ট্যাক্স নির্ধারণ করা হয় এটাতো একেবারে ঐরূপই। আচ্ছা, তোমরা এখন যাও, আমি চিন্তা ভাবনা করে দেখি।" তাঁরা দু'জন ফিরে চলে আসলেন। তাঁদেরকে দেখা মাত্রই রাসূলুল্লাহ (সঃ) সা'লাবার উপর দুঃখ প্রকাশ করলেন এবং সুলাইম গোত্রের লোকটির উপর বরকতের দুআ' করলেন। এখন

তাঁরাও সা'লাবা ও সুলাইম গোত্রের লোকটির ঘটনা বর্ণনা করে শুনালেন। তখন মহামহিমান্বিত আল্লাহ এ আয়াত অবতীর্ণ করলেন। সা'লাবার একজন নিকটতম আত্মীয় এ সবকিছু শুনে সালাবার কাছে গিয়ে বর্ণনা করলো এবং আয়াতটিও পড়ে শুনিয়ে দিলো। সা'লাবা তখন নবী (সঃ)-এর কাছে এসে যাকাত কবূল করার প্রার্থনা জানালো। নবী (সঃ) তাকে বললেনঃ "আল্লাহ তা'আলা আমাকে তোমার যাকাত কবূল করতে নিষেধ করে দিয়েছেন।" সে তখন নিজের মাথার উপর মাটি নিক্ষেপ করতে লাগলো। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে বললেনঃ "এটা তো তোমারই কর্মের ফল। আমি তোমাকে আদেশ করেছিলাম। কিন্তু তুমি আমার আদেশ অমান্য করেছো।" সে তখন নিজের জায়গায় ফিরে আসলো। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত সা'লাবার কোন কিছুই কবূল করেননি। অতঃপর সে আবূ বকর (রাঃ)-এর খিলাফতকালে তাঁর কাছে আগমন করে এবং বলেঃ "রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট আমার যে মর্যাদা ছিল এবং আনসারদের মধ্যে আমার যে সম্মান রয়েছে তা আপনি ভালরূপেই জানেন। সুতরাং আমার সাদকা কবূল করুন।" তিনি উত্তর দিলেনঃ "রাসূলুল্লাহ (সঃ) যখন কবূল করেননি তখন আমি কে?" মোটকথা, তিনি অস্বীকার করলেন। অতঃপর যখন তিনি ইন্তেকাল করলেন এবং উমার (রাঃ) মুসলিমদের খলীফা নির্বাচিত হলেন তখন সা'লাবা তাঁর কাছে এসে বললোঃ "হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি আমার সাদকা কবূল করুন!" উমার (রাঃ) উত্তর দিলেনঃ "রাসূলুল্লাহ ও প্রথম খলীফা যখন কবূল করেননি তখন আমি কিরূপে কবূল করতে পারি?" সুতরাং তিনিও অস্বীকৃতি জানালেন। তারপর উসমান (রাঃ)-এর খিলাফতকালে আবার ঐ চিরদিনের মুনাফিক তাঁর কাছে আসলো এবং তার সাদকা কবূল করার জন্যে তাঁকে অনুরোধ করলো। কিন্তু তিনি জবাব দিলেনঃ "স্বয়ং আল্লাহর রাসূল (সঃ) এবং তাঁর দু'জন খলীফা যখন তোমার সাদকা গ্রহণ করেননি তখন আমি কি করে তা গ্রহণ করতে পারি? সুতরাং তিনিও তা কবূল করলেন না। ঐ অবস্থাতেই লোকটি ধ্বংস হয়ে যায়। মোটকথা, প্রথমে তো সে শপথ করে বলেছিল যে, সে সাদকা ও দান-খয়রাত করবে, কিন্তু পরে ফিরে গেল এবং দান-খয়রাতের পরিবর্তে কার্পণ্য করতে শুরু করলো ও অঙ্গীকার ভঙ্গ করে দিলো। এই অঙ্গীকার ভঙ্গের প্রতিফল হিসেবে তার অন্তরে নিফাক বা কপটতা জড়িয়ে পড়লো, যা ঐ সময় থেকে নিয়ে তার পূর্ণ জীবন পর্যন্ত তার সাথে থেকেই গেল। হাদীসে রয়েছে যে, মুনাফিকের লক্ষণ হচ্ছে তিনটি– (১) যখন সে কথা বলে মিথ্যা বলে, (২) যখন কোন ওয়াদা করে তখন তা খিলাফ করে এবং (৩) তার কাছে কোন কিছু আমানত রাখা হলে তা খিয়ানত করে।

আল্লাহ পাক বলেনঃ ‘তারা কি জানে না যে, আল্লাহ্ তাদের মনের গুপ্ত কথা এবং গোপন পরামর্শ সবই অবগত আছেন?’ তিনি পূর্ব হতেই জানতেন যে, এটা শুধু তাদের মুখের কথা যে, তারা সম্পদশালী হয়ে গেলে এরূপ এরূপ দান-খয়রাত করবে, এমন এমন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে এবং এরূপ সৎকাজ করবে। কিন্তু তাদের অন্তরের উপর দৃষ্টিপাতকারী তো হচ্ছেন আল্লাহ। তিনি তো জানেন যে, মালধন পেলেই তারা তাতে মত্ত হয়ে যাবে, আমোদ আহ্লাদ করবে, অকৃতজ্ঞ হবে এবং কার্পণ্য করতে শুরু করবে।

আল্লাহ তা‘আলা সমস্ত গায়েবের খবর খুবই জ্ঞাত আছেন। তিনি সমস্ত প্রকাশ্য ও গোপনীয় বিষয় সম্পর্কে সম্যক অবগত। সব কিছুই তাঁর সামনে উজ্জ্বল। কিছুই তাঁর অগোচরে নেই।

৭৯- اَلَّذِيْنَ يَلْمِزُوْنَ الْمُطَّوِّعِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فِى الصَّدَقٰتِ وَ الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ اِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُوْنَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللّٰهُ مِنْهُمْ وَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝

৭৯। নফল সাদকা প্রদানকারী মুসলমানদের প্রতি সাদকা সম্বন্ধে দোষারোপ করে এবং (বিশেষ করে) সেই লোকদের প্রতি যাদের পরিশ্রম ও মজুরী করা ছাড়া আর কোনই সম্বল নেই, তারা তাদেরকে উপহাস করে, আল্লাহ তাদেরকে এই উপহাসের প্রতিফল দিবেন এবং তাদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

এটাও মুনাফিকদের একটি বদ অভ্যাস যে, তাদের মুখের ভাষা থেকে দাতা বা কৃপণ কেউই বাঁচতে পারে না। এই দোষযুক্ত ও কর্কশভাষী লোকগুলো খুবই নিকৃষ্ট শ্রেণীর লোক। যদি কোন ব্যক্তি একটা মোটা অংকের অর্থ আল্লাহর পথে দান করে তবে এরা তাকে রিয়াকার বলতে থাকে। আর কেউ যদি সামান্য মাল নিয়ে আসে তবে তারা বলে যে, এই ব্যক্তির দানের আল্লাহ মুখাপেক্ষী নন। যখন সাদকা দেয়ার আয়াত অবতীর্ণ হয় তখন সাহাবীগণ নিজ নিজ সাদকা নিয়ে হাযির হয়ে যান। এক ব্যক্তি প্রাণ খুলে খুব বড় অংকের সাদকা দেন। তখন ঐ মুনাফিকরা তাঁর উপাধি দেয় রিয়াকার। অতঃপর একজন দরিদ্র লোক শুধুমাত্র

এক সা'[১] শস্য নিয়ে আসেন। তা দেখে মুনাফিকরা বলে যে, তার এটুকু জিনিসের আল্লাহ তা'আলার কি প্রয়োজন ছিল। এরই বর্ণনা এই আয়াতে রয়েছে।

একদা রাসূলুল্লাহ (সঃ) 'বাকী'তে বলেনঃ "যে ব্যক্তি সাদকা প্রদান করবে, আমি কিয়ামতের দিন তার ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান করবো।" ঐ সময় একজন সাহাবী নিজের পাগড়ীর মধ্য থেকে কিছু দিতে চাইলেন। কিন্তু পরক্ষণেই তিনি তা বেঁধে নিলেন। ইত্যবসরে একজন অত্যন্ত কালো বর্ণের বেঁটে লোক একটি উষ্ট্রী নিয়ে আসলেন, যার চেয়ে উত্তম উষ্ট্রী সারা বাকীতে ছিল না। এসে তিনি বলতে লাগলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! এটা আমি আল্লাহর নামে খয়রাত করলাম।" রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন বললেনঃ "বেশ, বেশ, খুব ভালো।" লোকটি বললেনঃ "নেন, এটা গ্রহণ করুন!" তখন একটি লোক বললোঃ "উষ্ট্রীটি তো এর চেয়ে উত্তম।" রাসূলুল্লাহ (সঃ) এটা শুনতে পেয়ে বলেনঃ "তুমি মিথ্যা বলছো। সে বরং তোমার চেয়ে এবং উষ্ট্রীটির চেয়ে বহুগুণে উত্তম।" অতঃপর তিনি বললেনঃ "তোমার মত শত শত উটের মালিকের জন্যে আফসোস!" এ কথা তিনি তিনবার বললেন। তারপর বললেনঃ "শুধুমাত্র ঐ ব্যক্তি দায়িত্বমুক্ত যে তার মাল দ্বারা এরূপ এরূপ করে (অর্থাৎ দান-খয়রাত করে)।"এ কথা বলার সময় তিনি অঞ্জলি ভরে ভরে নিজের হাত দ্বারা ডানে ও বামে ইশারা করেন। অর্থাৎ আল্লাহর পথে প্রত্যেক ভাল কাজে খরচ করে। অতঃপর তিনি বলেনঃ "ঐ ব্যক্তি সফলকাম হয়েছে যে অল্প মালের অধিকারী এবং অধিক ইবাদতকারী।" এ কথা তিনি তিনবার বলেন।

এ আয়াতের ব্যাপারে আলী ইবনে আবি তালহা (রাঃ) ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ) চল্লিশ উকিয়া[২] সোনা নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট আগমন করেন এবং একজন (দরিদ্র) আনসারী এক সা' খাদ্য নিয়ে আসেন। তখন কোন কোন মুনাফিক বলেঃ "আল্লাহর শপথ! আব্দুর রহমান (রাঃ) যা এনেছে তা রিয়া (লোক-দেখানো) ছাড়া কিছুই নয়।" আর ঐ আনসারী সম্পর্কে তারা বলেঃ "নিশ্চয়ই আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (সাঃ) এই সা'-এর মুখাপেক্ষী নন।"

১. ঐ সময় আরবে দু'প্রকার সা'-এর প্রচলন ছিল। একটি হিজাযী সা', যার ওজন ছিল পাকা দু'সের এগারো ছটাক। আর একটি ছিল ইরাকী সা', যার ওজন ছিল পাকা তিন সের ছয় ছটাক।

২. উকিয়ার ওজন হচ্ছে এক তোলা সাত মাশা

ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ (সঃ) জন-সম্মুখে বের হয়ে ঘোষণা করেনঃ "তোমরা তোমাদের সাদকাগুলো জমা কর।" তখন জনগণ তাঁদের সাদকাগুলো জমা করেন। সর্বশেষ একটি লোক এক সা' খেজুর নিয়ে হাযির হন এবং বলেন– "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! রাত্রে বোঝা বহন করার বিনিময়ে আমি দু'সা' খেজুর লাভ করেছিলাম। এক সা' আমার সন্তানদের জন্যে রেখে বাকী এক সা' আপনার কাছে নিয়ে এসেছি।" রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন তাঁর ঐ মালকে জমাকৃত মালের মধ্যে ঢেলে দিতে বললেন। মুনাফিকরা তখন বলাবলি করতে লাগলো যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ)-এই এক সা' খেজুরের মুখাপেক্ষী নন। অতঃপর আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বললেনঃ "সাদকা দানকারীদের আর কেউ অবশিষ্ট আছে কি?" রাসূলুল্লাহ (সঃ) উত্তরে বললেনঃ "তুমি ছাড়া আর কেউ অবশিষ্ট নেই।" তখন আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ) বললেনঃ, "আমার কাছে একশ' উকিয়া সোনা রয়েছে, সবগুলো আমি সাদকা করে দিলাম।" উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) তখন তাঁকে বললেনঃ "তুমি কি পাগল?" তখন তিনি উত্তরে বললেনঃ "আমার মধ্যে পাগলামি নেই। আমি যা করলাম সজ্ঞানেই করলাম।" উমার (রাঃ) বললেনঃ "তুমি যা করলে তা চিন্তা করে দেখেছো কি?" তিনি উত্তর দিলেনঃ "হ্যাঁ শুনুন! আমার মাল রয়েছে আট হাজার। চার হাজার আমি আল্লাহ তা'আলাকে ঋণ দিচ্ছি এবং বাকী চার হাজার নিজের জন্য রাখছি।" তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ "তুমি যা রাখলে এবং যা দান করলে তাতে আল্লাহ বরকত দান করুন!" মুনাফিকরা তখন বলতে লাগলোঃ "আল্লাহর কসম! আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ) যা দান করলেন তা রিয়া ছাড়া কিছুই নয়।" আল্লাহ তা'আলা আয়াত নাযিল করে বড় ও ছোট দানকারীদের সত্যবাদিতা এবং মুনাফিকদের কষ্টদায়ক কথা প্রকাশ করে দিলেন।

বানু আজলান গোত্রের আসিম ইবনে আদী (রাঃ) নামক একটি লোকও মোটা অংকের দান করেছিলেন। তিনি দান করেছিলেন একশ' অসক খেজুর। মুনাফিকরা তাঁকে রিয়াকার বলেছিল। আবূ আকীল (রাঃ) নিজের পারিশ্রমিক ও মজুরীর অংশ হতে সামান্য দান করেছিলেন। তিনি ছিলেন বানু আনীফ গোত্রের লোক। তিনি এক সা' পরিমাণ জিনিস দান করলে মুনাফিকরা তাঁকে উপহাস ও নিন্দা করে। অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) মুজাহিদদের একটি দলকে যুদ্ধে প্রেরণ করার উদ্দেশ্যে এই চাঁদা আদায় করেছিলেন। তাতে রয়েছে যে, আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ) দু'হাজার দিয়েছিলেন এবং দু'হাজার

রেখেছিলেন। অন্য একজন দরিদ্র লোক সারা রাত্রির পরিশ্রমের বিনিময়ে দু'সা' খেজুর লাভ করেছিলেন। এক সা' নিজের জন্যে রেখে বাকী এক সা' তিনি দান করেন। এ লোকটির নাম ছিল আবূ আকীল (রাঃ)। সারারাত ধরে তিনি নিজের পিঠের উপর বোঝা বহন করেছিলেন। কেউ কেউ বলেন যে, তাঁর নাম ছিল হাবাব (রাঃ), আর একটি উক্তি আছে যে, তাঁর নাম ছিল আব্দুর রহমান ইবনে সা'লাবা (রাঃ)।

ঐ মুনাফিকদের এই উপহাসের শাস্তিস্বরূপ আল্লাহ তা'আলা তাদের থেকে এই প্রতিশোধই গ্রহণ করলেন। পরকালে তাদের জন্যে রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি। কেননা আমলের শাস্তি তো আমল অনুযায়ীই হয়ে থাকে।

৮০। (হে মুহাম্মাদ!) তুমি তাদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা কর অথবা তাদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা না কর (উভয়ই সমান) যদি তুমি তাদের জন্যে সত্তর বারও ক্ষমা প্রার্থনা কর তবুও আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করবেন না; এর কারণ এই যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে কুফরী করেছে। আর আল্লাহ এরূপ অবাধ্য লোকদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না।

٨٠- اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ اَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ اِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً فَلَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ○ ع

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন– হে নবী (সঃ)! কাফিররা এ যোগ্যতা রাখে না যে, তুমি তাদের জন্যে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে। একবার নয় বরং সত্তর বারও যদি তুমি তাদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা কর তথাপি আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ক্ষমা করবেন না। এখানে যে সত্তরের উল্লেখ করা হয়েছে তা দ্বারা শুধু গণনার আধিক্য বুঝানো হয়েছে। সত্তরের কমই হোক বা আরো বেশী হোক। কেউ কেউ বলেছেন যে, এর দ্বারা সত্তরই বুঝানো হয়েছে। যেমন ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "আমি তো তাদের জন্যে সত্তর বারেরও বেশী ক্ষমা প্রার্থনা করবো যে, হয়তো আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন।" তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর ভীষণ ক্রোধ ভরে ঘোষণা

করলেনঃ "হে নবী (সঃ)! তোমার তাদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করা বা না করা সমান কথা, আল্লাহ তাদেরকে কখনও ক্ষমা করবেন না।"

শা'বীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন যে, মুনাফিক আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই যখন মৃত্যুযন্ত্রণায় ছটফট করে তখন তার পুত্র নবী (সঃ)-এর দরবারে হাযির হয়ে আরয করেঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমার পিতা মৃত্যুর শিয়রে শায়িত। আমার মনের আকাঙ্ক্ষা এই যে, আপনি তার কাছে তাশরীফ নিয়ে যাবেন এবং তার জানাযার নামায পড়াবেন।" রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ "তোমার নাম কি?" সে উত্তরে বলেঃ "আমার নাম হাবাব।" তিনি বললেনঃ "তোমার নাম আব্দুল্লাহ (রাখা হলো)। হাবাব তো শয়তানের নাম।" অতঃপর তিনি তার সাথে গেলেন। তার পিতাকে স্বীয় ঘর্ম মাখানো জামাটি পরিধান করালেন এবং তার জানাযার নামায পড়ালেন। তাঁকে বলা হলোঃ "আপনি এর (মুনাফিকের) জানাযার সালাত পড়ছেন?" তিনি উত্তরে বললেন, আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ 'তুমি যদি সত্তর বারও ক্ষমা প্রার্থনা কর তবুও আল্লাহ তাদেরকে কখনও ক্ষমা করবেন না।' তাই আমি সত্তর বার, আবার সত্তর বার এবং আবারও সত্তর বার ক্ষমা প্রার্থনা করবো।[১]

৮১। এই পশ্চাদবর্তী লোকেরা উৎফুল্ল হয়ে গেল রাসূলুল্লাহর (যুদ্ধে গমনের) পর নিজেদের গৃহে বসে থাকার প্রতি এবং তারা আল্লাহর পথে নিজেদের ধন ও প্রাণ দিয়ে জিহাদ করাকে অপছন্দ করলো, অধিকন্তু বলতে লাগলো– তোমরা (এই ভীষণ) গরমের মধ্যে বের হয়ো না; (হে নবী!) তুমি বলে দাও– জাহান্নামের আগুন (এর চেয়ে) অধিকতর গরম, কত ভাল হতো যদি তারা বুঝতে পারতো!

٨١- فَرِحَ الْمُخَلَّفُوْنَ بِمَقْعَدِهِمْ
خِلٰفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ وَكَرِهُوْٓا اَنْ
يُّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ
فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَقَالُوْا لَا
تَنْفِرُوْا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ
اَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوْا يَفْقَهُوْنَ ○

১. উরওয়া ইবনে যুবায়ের (রঃ), মুজাহিদ (রঃ) এবং কাদাতা ইবনে দাআ'মা (রঃ) হতে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। আর ইবনে জারীর (রঃ) এটাকে তাঁর ইসনাদসহ বর্ণনা করেছেন।

৮২। অতএব, তারা অল্প কয়েকদিন হেসে (খেলে) কাটিয়ে দিক, আর (আখিরাতে) বহুদিন (অনন্তকাল) কাঁদতে থাকুক, ঐসব কাজের বিনিময়ে যা তারা অর্জন করছিল।

٨٢- فَلْيَضْحَكُوْا قَلِيْلًا وَّلْيَبْكُوْا كَثِيْرًا جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ○

এখানে আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদের প্রতি নিন্দা জ্ঞাপন করছেন যারা তাবূকের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে গমন করেনি এবং বাড়ীতে বসে থাকায় আনন্দিত হয়েছিল। আল্লাহর পথে জান ও মাল দিয়ে জিহাদ করা তাদের কাছে ছিল অপছন্দনীয়।

তারা পরস্পর বলাবলি করছিলঃ "এই কঠিন গরমের সময় কোথায় যাবে?" তাবূকের যুদ্ধে বের হওয়ার সময়টা এমনই ছিল যে, একদিকে গরম ছিল অত্যন্ত কঠিন, অপরদিকে ফলগুলো সব পেকে গিয়েছিল। আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্পর্কে বলেন, তোমরা তোমাদের দুষ্কর্মের মাধ্যমে যে দিকে যাচ্ছ, তার মধ্যে এর চেয়ে বহুগুণ গরমের প্রখরতা রয়েছে। তা হচ্ছে জাহান্নামের আগুন। দুনিয়ার আগুনতো ঐ আগুনের সত্তর ভাগের এক ভাগ। যেমন সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে।

মুসনাদে আহমাদে আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ "তোমাদের এই আগুন জাহান্নামের আগুনের সত্তর ভাগের এক ভাগ মাত্র। অধিকন্তু এই আগুনকে সমুদ্রের পানি দ্বারা দু'বার নিভিয়ে দেয়া হয়েছে। এরূপ করা না হলে তোমরা এ আগুন দ্বারা কোনই উপকার লাভ করতে পারতে না।"

আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "আল্লাহ তা'আলা এক হাজার বছর (জাহান্নামের) আগুনকে উত্তপ্ত করেন, তখন তা লাল বর্ণ ধারণ করে। তারপর আবার এক হাজার বছর উত্তপ্ত করেন, তখন তা সাদা হয়ে যায়। এরপর পুনরায় এক হাজার বছর তাপ দেন তখন তা কালো বর্ণ ধারণ করে। আর ওটা রাতের আঁধারের মত ভীষণ কালো হয়ে যায়।"[১]

১. এ হাদীসটি ইমাম তিরমিযী (রঃ) ও ইমাম ইবনে মাজাহ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী (রঃ) বলেনঃ "আমি জানি না যে, ইয়াহ্ইয়া (রঃ) ছাড়া অন্য কেউ এটাকে মারফূ' পর্যন্ত পৌঁছিয়েছেন।"

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ (২ঃ ২৪) এ আয়াতটি পাঠ করে বলেনঃ "(জাহান্নামের) আগুনকে এক হাজার বছর উত্তপ্ত করা হয়, তখন তা সাদা হয়ে যায়। তারপর আরো এক হাজার বছর তাপ দেয়া হয়, তখন তা লাল বর্ণ ধারণ করে। তারপর আরো এক হাজার বছর উত্তপ্ত করা হয়, তখন তা রাতের আঁধারের মত কালো হয়ে যায়। ওর শিখায় কোন ঔজ্জ্বল্য অবশিষ্ট নেই।"[১]

একটি হাদীসে এসেছে যে, জাহান্নামের আগুনের একটি স্ফুলিঙ্গ যদি পূর্ব দিকে থাকে তবে ওর উষ্ণতা পশ্চিম দিক পর্যন্ত পৌঁছে যাবে।[২] আবূ ইয়ালার (রঃ) একটি দুর্বল রিওয়ায়াতে রয়েছে যে, যদি এই মসজিদে এক লক্ষ বা এর চেয়েও বেশী লোক থাকে এবং কোন জাহান্নামী এখানে এসে শ্বাস গ্রহণ করে তবে ওর উষ্ণতায় মসজিদ ও মসজিদে অবস্থিত সমস্ত লোক পুড়ে ভস্ম হয়ে যাবে। অন্য একটি হাদীসে আছে যে, জাহান্নামে যে লোকটির শাস্তি সবচেয়ে হাল্‌কা হবে তা হবে এই যে, তার পায়ে আগুনের জুতা পরানো হবে, যার ফলে তার মাথার খুলি টগবগ করে ফুটতে থাকবে। সে তখন মনে করবে যে, তাকেই সর্বাপেক্ষা কঠিন শাস্তি দেয়া হচ্ছে। অথচ প্রকৃতপক্ষে ওটাই হচ্ছে সর্বাপেক্ষা হাল্কা শাস্তি। কুরআন কারীমে ঘোষিত হচ্ছে– "নিশ্চয়ই ওটা (জাহান্নামের অগ্নি) হচ্ছে জ্বলন্ত হল্‌কা যা চর্ম পর্যন্ত খসিয়ে ফেলবে।" আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেনঃ "তাদের মাথার উপর ফুটন্ত গরম পানি ঢেলে দেয়া হবে, যার ফলে তাদের পেটের সমস্ত জিনিস এবং চামড়া ঝলসে যাবে। তারপর লোহার হাতুড়ী দ্বারা তাদের মস্তক পিষ্ট করা হবে। তারা যখন সেখান থেকে বের হতে চাইবে তখন তাদেরকে সেখানেই ফিরিয়ে দেয়া হবে এবং বলা হবে– দাহনকারী শাস্তির স্বাদ গ্রহণ কর।" অন্য স্থানে আল্লাহ পাক বলেনঃ "যারা আমার নিদর্শনাবলী অস্বীকার করেছে আমি তাদেরকে জ্বলন্ত অগ্নিতে নিক্ষেপ করবো, যখন তাদের (গায়ের) চামড়া ঝলসে যাবে তখন আমি ওর পরিবর্তে অন্য চামড়া আনয়ন করবো, যেন তারা পূর্ণভাবে শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করে।" এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "(হে নবী!) তুমি বলে দাও– জাহান্নামের আগুন (এর চেয়ে) অধিকতর গরম, কি ভাল হতো যদি তারা বুঝতে পারতো!" অর্থাৎ যদি তারা এটা অনুধাবন করতো যে, জাহান্নামের আগুনের প্রখরতা অত্যন্ত বেশী, তবে অবশ্যই গ্রীষ্মের মৌসুম হওয়া সত্ত্বেও খুশী মনে তারা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে যুদ্ধে গমন করতো এবং নিজেদের জান ও মাল আল্লাহর পথে উৎসর্গ করতে মোটেই দ্বিধাবোধ করতো না।

১. এ হাদীসটি আবূ বকর ইবনে মিরদুওয়াই (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

২. এ হাদীসটি আবুল কাসিম তিবরানী (রঃ) তাম্মাম ইবনে নাজীহ্ (রঃ)-এর হাদীস থেকে বর্ণনা করেছেন।

আরবের একজন কবি বলেন ঃ

عُمْرَكَ بِالْحَمِيَّةِ اَفْنَيْتَهُ * خَوْفًامِّنَ الْبَارِدِ وَ الْحَارِّ
وَ كَانَ اَوْلٰى لَكَ اَنْ تَتَّقِىْ * مِنَ الْمَعَاصِىْ حَذَرَ النَّارِ

অর্থাৎ "তুমি তোমার জীবনকে ঠাণ্ডা ও গরম হতে বাঁচানোর চেষ্টায় কাটিয়ে দিয়েছো, অথচ তোমার উচিত ছিল যে, তুমি আল্লাহর নাফরমানী থেকে বিরত থাকবে, তাহলে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা পেতে।"

এখন আল্লাহ তা'আলা এই মুনাফিকদের সম্পর্কে সাবধান বাণী উচ্চারণ করছেন যে, অল্পদিন তারা এই নশ্বর জগতে হাসি-তামাশা ও আমোদ আহ্লাদ করে জীবনটা কাটিয়ে দিক, অতঃপর ভবিষ্যতের চিরস্থায়ী জীবনে তাদেরকে শুধু কাঁদতেই হবে যা কখনো শেষ হবে না।

আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছেনঃ "হে লোক সকল! তোমরা ক্রন্দন কর। যদি তোমাদের ক্রন্দন না আসে তবে ক্রন্দনের ভান কর। কেননা, জাহান্নামবাসীরা কাঁদতে থাকবে, এমন কি কেঁদে তাদের গণ্ডদেশে নদীর মত গর্ত হয়ে যাবে। শেষ পর্যন্ত অশ্রু শুকিয়ে যাবে। অতঃপর তাদের চক্ষুগুলো রক্ত বর্ষণ করতে শুরু করবে। তাদের চক্ষু দিয়ে এতো বেশী অশ্রু ও রক্ত বর্ষিত হবে যে, কেউ যদি ওর উপর দিয়ে নৌকা চালানোর ইচ্ছে করে তবে চালাতে পারবে।"[১]

অন্য একটি হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, জাহান্নামীরা জাহান্নামে প্রবেশের পর কাঁদতে থাকবে। এতো বেশী কাঁদবে যে, অশ্রু শেষ হবার পর পুঁজ বের হতে থাকবে। ঐ সময় জাহান্নামের দারোগা তাদেরকে ডাক দিয়ে বলবেঃ "ওরে হতভাগ্যের দল! করুণার জায়গাতে তো তোমরা কখনো ক্রন্দন করনি। এখন এখানে কান্নাকাটি করা বৃথা।" তখন তারা উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করে জান্নাতবাসীদের নিকট ফরিয়াদ করবেঃ "হে জান্নাতবাসিগণ! হে পিতা, মাতা ও পুত্রদের দল! আমরা কবর থেকে পিপাসার্ত অবস্থায় উঠেছিলাম। তারপর হাশরের ময়দানেও পিপাসার্ত রয়েছিলাম এবং আজ পর্যন্ত এখানেও পিপাসার্ত অবস্থায় রয়েছি। সুতরাং আমাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন কর। কিছু পানি আমাদের দিকে বহিয়ে দাও এবং যে আহার্য আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে দান করেছেন তার থেকে আমাদেরকে কিছু দান কর।" চল্লিশ বছর পর্যন্ত তারা এভাবে (কুকুরের মত) চীৎকার করতে থাকবে। চল্লিশ বছর পর তাদেরকে উত্তর দেয়া হবেঃ "তোমাদেরকে এ অবস্থাতেই অবস্থান করতে হবে।" শেষ পর্যন্ত তারা সমস্ত কল্যাণ থেকে নিরাশ হয়ে যাবে।

১. এ হাদীসটি হাফিয আবুল ইয়ালা আল মুসিলী (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

৮৩। তখন যদি আল্লাহ তোমাকে (মদীনায়) তাদের কোন সম্প্রদায়ের কাছে ফিরিয়ে আনেন, অতঃপর তারা (কোন জিহাদে) বের হতে অনুমতি চায়, তবে তুমি বলে দাও- তোমরা কখনো আমার সাথে (কোন জিহাদে) বের হবে না এবং আমার সাথী হয়ে কোন শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধও করবে না; তোমরা পূর্বেও বসে থাকাকে পছন্দ করেছিলে, অতএব তোমরা ঐসব লোকের সাথে বসে থাকো যারা পশ্চাদবর্তী থাকার যোগ্য।

٨٣- فَاِنْ رَّجَعَكَ اللّٰهُ اِلٰى طَآئِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَاْذَنُوْكَ لِلْخُرُوْجِ فَقُلْ لَّنْ تَخْرُجُوْا مَعِيَ اَبَدًا وَّ لَنْ تُقَاتِلُوْا مَعِيَ عَدُوًّا اِنَّكُمْ رَضِيْتُمْ بِالْقُعُوْدِ اَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوْا مَعَ الْخٰلِفِيْنَ○

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল (সঃ)-কে নির্দেশ দিচ্ছেন- হে রাসূল! যদি আল্লাহ তা'আলা তোমাকে এই যুদ্ধ হতে নিরাপদে মদীনায় ফিরিয়ে আনেন এবং এই মুনাফিকদের কোন দল অন্য কোন যুদ্ধে তোমার সাথে গমনের জন্যে প্রার্থনা জানায় তবে তুমি শাস্তি দান হিসেবে স্পষ্টভাবে তাদেরকে বলে দেবে- আমার সাথে যুদ্ধে গমনকারীদের সাথে তোমরা গমন করতে পারবে না এবং আমার সাথী হয়ে তোমরা শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেও সক্ষম হবে না। তোমরা যখন যথা সময়ে প্রতারণা করেছো এবং প্রথমবার যুদ্ধে গমন না করে বাড়ীতেই বসে থেকেছো তখন এ সময়ে যুদ্ধ প্রস্তুতির কি অর্থ হতে পারে? সুতরাং এই আয়াতটি وَنُقَلِّبُ اَفْـِٕدَتَهُمْ وَاَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوْا بِهٖۤ اَوَّلَ مَرَّةٍ (৬ঃ ১১০) এই আয়াতটির মতই। পাপের প্রতিফল পাপকার্যের পরেই পাওয়া যায়। যেমন পুণ্যের প্রতিদান পুণ্য কার্যের পরেই লাভ করা যায়। হুদায়বিয়ার উমরার পর কুরআন কারীমে ঘোষিত হয়েছিল ঃ

سَيَقُوْلُ الْمُخَلَّفُوْنَ اِذَا انْطَلَقْتُمْ اِلٰى مَغَانِمَ لِتَاْخُذُوْهَا ذَرُوْنَا نَتَّبِعْكُمْ

অর্থাৎ “হে মুমিনগণ! তোমরা যখন গনীমতের মাল গ্রহণ করতে যাবে তখন (যুদ্ধে গমন না করে) পিছনে অবস্থানকারী এই লোকগুলো বলবে- আমাদেরকে

অনুমতি দাও, আমরাও তোমাদের সাথে যাবো।" (৪৮ঃ ১৫) এখানে বলা হচ্ছে– হে মুহাম্মাদ (সঃ)! এই (মুনাফিক) লোকদেরকে বলে দাও, যারা তোমার সাথে জিহাদে গমন না করে বাড়ীতেই বসেছিল, বাড়ীতে অবস্থানকারীদের সাথে তোমরাও অবস্থান কর, যারা স্ত্রীলোকদের মত বাড়ীতেই লেজ গুটিয়ে বসে থাকে।

٨٤- وَلَا تُصَلِّ عَلٰٓى اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ اَبَدًا وَّلَا تَقُمْ عَلٰى قَبْرِهٖ ؕ اِنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَمَاتُوْا وَهُمْ فٰسِقُوْنَ ○

৮৪। আর তাদের মধ্য হতে কেউ মরে গেলে তার উপর কখনো (জানাযার) নামায পড়বে না এবং তার কবরের কাছেও দাঁড়াবে না; তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে কুফরী করেছে এবং তারা কুফরীর অবস্থাতেই মৃত্যুবরণ করেছে।

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল (সঃ)-কে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তিনি যেন মুনাফিকদের সাথে কোনই সম্পর্ক না রাখেন, তাদের কেউ মারা গেলে যেন তার জানাযার নামায না পড়ান এবং তার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা বা দুআ' করার উদ্দেশ্যে যেন তার কবরের কাছে না দাঁড়ান। কেননা তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ)-এর সাথে কুফরী করেছে এবং ঐ অবস্থাতেই মারা গেছে।

এ আয়াতটি মুনাফিকদের নেতা ও ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালূলের ব্যাপারে বিশেষভাবে অবতীর্ণ হলেও এটা ব্যাপক ও সাধারণ হুকুম। যার মধ্যেই নিফাক বা কপটতা পাওয়া যাবে তারই ব্যাপারে এই হুকুম প্রযোজ্য হবে। সহীহ বুখারীতে ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই মারা গেলে তার পুত্র আব্দুল্লাহ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ) -এর দরবারে হাযির হয়ে আবেদন করেঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমার পিতার কাফনের জন্যে আপনার গায়ের জামাটি দান করুন!" রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর আবেদন মঞ্জুর করে তাঁকে জামাটি দিয়ে দেন। অতঃপর তিনি নবী (সঃ)-কে তাঁর পিতার জানাযার নামায পড়াবার জন্যে অনুরোধ করেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর এ আবেদনও কবূল করেন এবং তার জানাযা পড়াবার জন্যে দাঁড়িয়ে যান। তখন উমার (রাঃ) তাঁর কাপড়ের অঞ্চল টেনে ধরে বলেনঃ "আপনি এর জানাযার নামায পড়াবেন? অথচ আল্লাহ তা'আলা আপনাকে এ থেকে নিষেধ করেছেন!"

রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন তাঁকে বলেনঃ "দেখো, আল্লাহ তা'আলা আমাকে ইখতিয়ার দিয়ে বলেছেন- 'তুমি তাদের (মুনাফিকদের) জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা কর বা নাই কর (সমান কথা), যদি তুমি তাদের জন্যে সত্তর বারও ক্ষমা প্রার্থনা কর তবুও আল্লাহ তাদেরকে কখনো ক্ষমা করবেন না।' সুতরাং আমি সত্তরেরও অধিক বার ক্ষমা প্রার্থনা করবো।" উমার (রাঃ) বললেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! এ লোকটি তো মুনাফিক ছিল।" তথাপিও রাসূলুল্লাহ (সঃ) তার জানাযার নামায পড়ালেন। তখন মহা মহিমান্বিত আল্লাহ এ আয়াতটি অবতীর্ণ করেন। অন্য রিওয়ায়াতে আছে যে, ইবনে উমার (রাঃ) বলেনঃ "রাসূলুল্লাহ (সঃ) আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই এর জানাযার নামায পড়ান এবং আমরাও তাঁর সাথে নামায পড়ি। তখন আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত অবতীর্ণ করেন।"

ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ)-কে বলতে শুনেছেনঃ "যখন আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই মারা যায় তখন তার জানাযার নামায পড়াবার জন্যে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে ডাকা হয়। তিনি নামাযের জন্যে দাঁড়িয়ে গেলে আমি 'সফ' বা সারির মধ্য থেকে বের হয়ে তাঁর সামনে হাযির হই এবং বলি, আপনি কি আল্লাহর শত্রু আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই এর জানাযার নামায পড়াবেন? অথচ অমুক দিন সে এ কথা বলেছিল এবং অমুক দিন ঐ কথা বলেছিল! তিনি তার কথাগুলোর পুনরাবৃত্তি করেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) মুচ্কি হেসে সবই শুনতে থাকেন। অবশেষে তিনি বলেনঃ "হে উমার! আমাকে ছেড়ে দাও। আল্লাহ তা'আলা আমাকে ক্ষমা প্রার্থনা করার ইখতিয়ার দিয়েছেন। আমি যদি জানতে পারি যে, সত্তরের অধিকবার ক্ষমা প্রার্থনা করলে তার পাপরাশি ক্ষমা করিয়ে নিতে পারবো তবে অবশ্যই আমি সত্তরেরও অধিকবার তার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করবো।" এ কথা বলে তিনি তার জানাযার নামায পড়ান, জানাযার সাথেও চলেন এবং দাফন কার্যেও শরীক থাকেন। উমার (রাঃ) বলেনঃ "এরপর আমার এই ঔদ্ধত্যপনার কারণে আমি দুঃখ করতে লাগলাম যে, এসব ব্যাপারে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই (সঃ) খুব ভাল জানেন। সুতরাং এরূপ হঠকারিতা করা আমার পক্ষে মোটেই উচিত হয়নি। অল্পক্ষণ পরেই এ দু'টি আয়াত অবতীর্ণ হয়ে যায়। এরপরে শেষ জীবন পর্যন্ত নবী (সঃ) না কোন মুনাফিকের জানাযার নামায পড়িয়েছেন, না তার কবরে এসে দুআ' ইসতিগফার করেছেন।"[১]

১. হাদীসটি মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হয়েছে।

জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, যখন আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই মারা যায় তখন তার পুত্র রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কছে এসে আরয করেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! যদি আপনি আমার পিতার জানাযা না পড়ান তবে এটা চিরদিনের জন্যে আমাদের পক্ষে দুর্ভাগ্যের কারণ হবে।" তিনি যখন হাযির হন তখন উবাইকে কবরে নামিয়ে দেয়া হয়েছিল। তিনি বললেনঃ "এর পূর্বেই কেন আমাকে নিয়ে আসনি?" অতঃপর তাকে কবর থেকে উঠিয়ে নেয়া হলো। তখন তিনি তার সারা দেহে নিজের মুখের থুথু দিয়ে দম করলেন। আর তাকে জামাটি পরিয়ে দিলেন।[১] সহীহ বুখারীতে আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই-এর কাছে এমন সময় আগমন করেন যখন তাকে কবরে প্রবেশ করিয়ে দেয়া হয়েছিল। তিনি তাকে কবর থেকে বের করার নির্দেশ দেন। সুতরাং তাকে কবর হতে বের করা হয়। তিনি তাকে স্বীয় জানুদ্বয়ের উপর রাখেন এবং তার উপর থুথু দিয়ে দম করেন। অতঃপর তাকে নিজের জামাটি পরিয়ে দেন। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, মৃত্যুর পূর্বে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই নিজেই অসিয়ত করে গিয়েছিল যেন তার জানাযা স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সঃ) পড়িয়ে দেন। তার মৃত্যুর পর তার পুত্র রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর দরবারে হাযির হয়ে বলেনঃ "আমার পিতা অসিয়ত করে গেছেন যে, আপনি যেন তার জানাযার নামায পড়িয়ে দেন। তার এ অসিয়তও রয়েছে যে, আপনার জামা দ্বারা যেন তাকে কাফন পরানো হয়।" রাসূলুল্লাহ (সঃ) যেই মাত্র তার জানাযা শেষ করেছেন, তখনই জিবরাঈল (আঃ) এ আয়াতগুলো নিয়ে অবতীর্ণ হন। আর একটি রিওয়ায়াতে আছে যে, জিবরাঈল (আঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাপড়ের অঞ্চল ধরে তাঁর সালাতের ইচ্ছার সময়েই তাঁকে এ আয়াত শুনিয়ে দেন। কিন্তু এই রিওয়ায়াতটি দুর্বল। আর একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই রোগাক্রান্ত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে তার কাছে যাওয়ার নিবেদন করে ডেকে পাঠায়। তিনি তার নিকট গমন করেন। নবী (সঃ) তাকে বলেনঃ "ইয়াহূদীদের প্রেম তোমাকে ধ্বংস করে দিয়েছে।" সে বলেঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! এখন ধমক ও তিরস্কারের সময় নয়। বরং আমার আকাঙ্ক্ষা এই যে, আপনি আমার জন্যে দুআ' ও ক্ষমা প্রার্থনা করবেন এবং যখন আমি মারা যাব তখন আপনার জামা দ্বারা আমাকে কাফন পরাবেন।" সুতরাং তার মৃত্যুর পর তার ছেলে আব্দুল্লাহ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট তাঁর জামাটি চাইলেন, যেন তা দ্বারা স্বীয় পিতার কাফন বানাতে পারেন।

১. এ হাদীসটিও ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

কোন কোন গুরুজন আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইকে জামা প্রদানের কারণ প্রসঙ্গে বলেছেন যে, আব্বাস (রাঃ) যখন আগমন করেন তখন তাঁর জন্যে একটি জামা চাওয়া হয়। কিন্তু তিনি খুব লম্বা চওড়া দেহ বিশিষ্ট লোক ছিলেন বলে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই এর জামা ছাড়া অন্য কারো জামা তাঁর গায়ে ঠিক হয়নি। তখন তার জামাটিই তাঁকে দেয়া হয়। এরই প্রতিদান হিসাবে রাসূলুল্লাহ (সঃ) আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই-এর কাফনের জন্যে তাঁর জামাটি দান করেন। এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সঃ) কোন মুনাফিকের জানাযা পড়াননি এবং কারো জন্যে ক্ষমা প্রার্থনাও করেননি।

মুসনাদে আহমাদে রয়েছে যে, যখন রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে কোন জানাযার জন্যে ডাকা হতো তখন তিনি ঐ মৃতব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করতেন। জনগণ তার সম্পর্কে ভাল মন্তব্য করলে তিনি গিয়ে তার জানাযা পড়াতেন। আর যদি তার সম্পর্কে এরূপ ওরূপ কথা তাঁর কানে আসতো তবে তিনি স্পষ্টভাবে যেতে অস্বীকার করতেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ইন্তিকালের পর উমার (রাঃ)-এর নীতি এই ছিল যে, যার জানাযা হুযাইফা (রাঃ) পড়তেন, তিনিও তার জানাযায় শরীক হতেন। আর হুযাইফা (রাঃ) যার জানাযা পড়তেন না, তিনিও পড়তেন না। কেননা রাসূলুল্লাহ হুযাইফা (রাঃ)-কে মুনাফিকদের নাম নির্দিষ্টভাবে বলে দিয়েছিলেন। ঐ নামগুলো শুধু তাঁরই জানা ছিল। এ জন্যেই তাঁকে "রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর বিশ্বস্তজন" আখ্যা দেয়া হয়েছে। এমন কি একদিন এটাও ঘটেছিল যে, উমার (রাঃ) এক ব্যক্তির জানাযার জন্যে দাঁড়িয়েছেন, এমন সময় হুযাইফা (রাঃ) তাঁকে চিমটি কেটে এ থেকে বিরত রাখেন।

মুনাফিকদের ব্যাপারে জানাযা এবং ক্ষমা প্রার্থনা থেকে মুসলিমদেরকে বিরত রাখা এই বিষয়েরই দলীল যে, মুসলিমদের ব্যাপারে এ দুটো বিষয়ের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এতে মৃতদের জন্যেও পূর্ণ উপকার রয়েছে এবং জীবিতদের জন্যেও পূর্ণ প্রতিদান রয়েছে, যেমন বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা এটা প্রমাণিত। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি জানাযায় হাযির হয়ে সালাত আদায় করা পর্যন্ত তথায় উপস্থিত থাকে তার জন্যে রয়েছে এক কীরাত (সওয়াব)। আর যে ব্যক্তি দাফন করা পর্যন্ত হাযির থাকে তার জন্যে রয়েছে দু'কিরাত (সওয়াব)।" জিজ্ঞেস করা হলোঃ "কীরাত কি?" উত্তরে তিনি বললেনঃ "সবচেয়ে ছোট কীরাত হচ্ছে উহুদ পাহাড়ের মত।" রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর অভ্যাস ছিল এই যে, মৃতব্যক্তির দাফনকার্য শেষ করার পর তিনি তার কবরের পাশে দাঁড়িয়ে সাহাবীদেরকে হুকুম করতেনঃ "তোমাদের সাথীর জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং কবরে তার অটল ও স্থির থাকার দুআ' কর। এই সময় কবরে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।"

٨٥- وَلَا تُعْجِبْكَ اَمْوَالُهُمْ وَ اَوْلَادُهُمْ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَ تَزْهَقَ اَنْفُسُهُمْ وَ هُمْ كٰفِرُوْنَ ○

৮৫। আর তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান সন্ততি তোমাকে যেন বিস্মিত না করে; আল্লাহ শুধু এটাই চাচ্ছেন যে, এ সমস্ত বস্তুর কারণে দুনিয়ায় তাদেরকে শাস্তিতে আবদ্ধ রাখেন এবং তাদের প্রাণবায়ু কুফরীর অবস্থাতেই বের হয়।

এই বিষয়েরই আয়াত ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে এবং সেখানে এর পূর্ণ তাফসীরও লিখিত হয়েছে। সুতরাং এখানে পুনরাবৃত্তির কোন প্রয়োজন নেই। সমস্ত প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা আল্লাহরই জন্যে।

٨٦- وَ اِذَاۤ اُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ اَنْ اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَجَاهِدُوْا مَعَ رَسُوْلِهِ اسْتَاْذَنَكَ اُولُوا الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَ قَالُوْا ذَرْنَا نَكُنْ مَّعَ الْقٰعِدِيْنَ ○

৮৬। আর যখনই কুরআনের কোন অংশ এই বিষয়ে অবতীর্ণ করা হয় যে, তোমরা আল্লাহর উপর ঈমান আন এবং তাঁর রাসূল (সঃ)-এর সঙ্গী হয়ে জিহাদ কর, তখন তাদের মধ্যকার ক্ষমতাবান ব্যক্তিরা তোমার কাছে অব্যাহতি চায় ও বলে– আমাদেরকে অনুমতি দিন, আমরাও এখানে অবস্থানকারীদের সাথে থেকে যাই।

٨٧- رَضُوْا بِاَنْ يَّكُوْنُوْا مَعَ الْخَوَالِفِ وَ طُبِعَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُوْنَ ○

৮৭। তারা অন্তঃপুরবাসিনী নারীদের সাথে থাকতে সম্মত হলো এবং তাদের অন্তরসমূহের উপর মোহর লাগিয়ে দেয়া হলো, কাজেই তারা বুঝে না।

এখানে আল্লাহ তা'আলা ঐ লোকদের কটাক্ষ করছেন যারা ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও জিহাদে না গিয়ে গা ঢাকা দিয়ে থাকে এবং আল্লাহর নির্দেশ শোনার পরেও রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে এসে বাড়ীতে থাকার অনুমতি প্রার্থনা করে। তারা এতই নিষ্ক্রিয় যে, নারীদের সাথে তাদের সাদৃশ্য রয়েছে। সেনাবাহিনী অভিযানে বের হয়ে পড়েছে, অথচ তারা অন্তঃপুরবাসিনী মহিলাদের মত পিছনে রয়ে গেছে। যুদ্ধের সময় তারা ভীরু ও কাপুরুষের মত লেজ গুটিয়ে ঘরে অবস্থানকারী। আর শান্তি ও নিরাপত্তার সময় তারা বড় বড় কথা বলে এবং বীরত্বপনা প্রকাশ করে থাকে। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেনঃ

فَاِذَا جَآءَ الْخَوْفُ رَاَيْتَهُمْ يَنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ تَدُوْرُ اَعْيُنُهُمْ كَالَّذِىْ يُغْشٰى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَاِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوْكُمْ بِاَلْسِنَةٍ حِدَادٍ (৩৩:১৯)

অর্থাৎ “যখন তারা ভয়ের (যুদ্ধের) সম্মুখীন হয় তখন তুমি তাদেরকে দেখতে পাও যে, তারা তোমার প্রতি এমনভাবে তাকাতে থাকে যে, তাদের চক্ষুসমূহ ঘুরতে থাকে, যেমন কারো উপর মরণ-বিভীষিকা আচ্ছন্ন হয়, অতঃপর সেই ভয় যখন দূরীভূত হয় তখন তোমাদেরকে অতি তীব্র ভাষায় তিরস্কার করতে থাকে।” তারা শান্তি ও নিরাপত্তার সময় শক্তিশালী বীরপুরুষ, কিন্তু যুদ্ধের সময় অত্যন্ত ভীরু ও কাপুরুষ। যেমন কোন কবি বলেনঃ

اَفِى السِّلْمِ اَعْيَارٌ اَجْفَاءٍ وَّ غِلْظَةٍ * وَفِى الْحَرْبِ اَشْبَاهُ النِّسَاءِ الْفَوَارِكِ

অর্থাৎ “তারা শান্তি ও নিরাপত্তার সময় অত্যন্ত ধূর্ত, উদ্দমশীল ও বড় বড় বক্তব্য পেশকারী, কিন্তু যুদ্ধের সময় তারা অন্তঃপুরবাসিনী মহিলাদের সাথে সাদৃশ্যযুক্ত।” শান্তির সময় তারা মুসলিমদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী এবং বীরত্ব প্রকাশকারী। কিন্তু যুদ্ধের সময় তারা নারীদের মত চুড়ি পরিধান করে পর্দানশীন বনে যায় এবং খাল ও ছিদ্র খুঁজে খুঁজে গা ঢাকা দেয়ার চেষ্টা করে থাকে। মুসলিমরাতো সূরা অবতীর্ণ হওয়ার ও আল্লাহর হুকুম নাযিল হওয়ার দিকে অপেক্ষমান থাকে। কিন্তু রোগাক্রান্ত হৃদয়ের লোকেরা যখন জিহাদের নির্দেশ সম্বলিত কোন আয়াত অবতীর্ণ হতে দেখে তখন চক্ষু বন্ধ করে নেয়। তাদের জন্যে শত আফসোস! তাদের জন্যে ধ্বংসাত্মক বিপদ। যদি তারা অনুগত হতো এবং তাদের মুখ হতে ভাল কথা বের হতো, আর তাদের উদ্দেশ্য সৎ হতো তবে অবশ্যই তারা আল্লাহর কথার সত্যতা স্বীকার করতো। এটাই হতো তাদের জন্যে কল্যাণকর। কিন্তু তাদের দুষ্কার্যের দরুন তাদের অন্তরের উপর মোহর লেগে গেছে। এখন তাদের মধ্যে এই যোগ্যতাই নেই যে, তারা নিজেদের লাভ ও লোকসান বুঝতে পারে।

৮৮। কিন্তু রাসূল ও তাঁর সঙ্গীদের মধ্যে যারা মুসলিম ছিলো তারা (অবশ্যই এই আদেশ মানলো এবং) নিজেদের ধন-সম্পদ ও প্রাণ দ্বারা জিহাদ করলো; আর তাদেরই জন্যে রয়েছে যাবতীয় কল্যাণ এবং তারাই হচ্ছে সফলকাম।

٨٨- لٰكِنِ الرَّسُوْلُ وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ جٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَ اَنْفُسِهِمْ ؕ وَ اُولٰٓئِكَ لَهُمُ الْخَيْرٰتُ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝

৮৯। আল্লাহ তাদের জন্যে এমন জান্নাত প্রস্তুত করে রেখেছেন সেগুলোর নিম্নদেশ দিয়ে নহরসমূহ বয়ে চলবে, আর তারা ওর মধ্যে অনন্তকাল অবস্থান করবে; এটা হচ্ছে (তাদের) বিরাট সফলতা।

٨٩- اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝ ع

মুনাফিকদের প্রতি নিন্দা জ্ঞাপন করার পর আল্লাহ তা'আলা মুসলিমদের প্রশংসা ও তাদের পারলৌকিক কল্যাণ ও সুখের বর্ণনা দিচ্ছেন। মুমিনরা জিহাদের জন্যে কোমর বেঁধে উঠে পড়ে লেগে যায়। তারা নিজেদের জান ও মাল আল্লাহর পথে উৎসর্গ করে দেয়। তাদের ভাগ্যেই মঙ্গল ও কল্যাণ। তারাই হচ্ছে সফলকাম। তাদেরই জন্যে রয়েছে জান্নাতুল ফিরদাউস। আর তাদেরই জন্যে রয়েছে উচ্চতম মর্যাদা। তারা তাদের গন্তব্যস্থানেও সফলতায় পৌঁছে যাবে।

৯০। আর গ্রামবাসীদের মধ্য হতে কতিপয় বাহানাকারী লোক আসলো, যেন তারা অনুমতি পায়, আর যারা আল্লাহর সাথে ও তাঁর রাসূলের সাথে সম্পূর্ণরূপেই মিথ্যা বলেছিল, তারা একেবারেই বসে রইল; তাদের মধ্যে যেসব লোক কাফির থাকবে, তাদের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হবে।

٩٠- وَجَآءَ الْمُعَذِّرُوْنَ مِنَ الْاَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَ قَعَدَ الَّذِيْنَ كَذَبُوا اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ ؕ سَيُصِيْبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝

এখানে আল্লাহ তা'আলা ঐ লোকদের বর্ণনা দিচ্ছেন যারা বাস্তবিকই শরঈ ওযরের কারণে জিহাদে অংশগ্রহণে অক্ষম ছিল। মদীনার চার পাশের এ লোকগুলো এসে নিজেদের দুর্বলতা ও অক্ষমতার কথা বর্ণনা করে আল্লাহর রাসূল (সঃ)-এর কাছে অনুমতি প্রার্থনা করে যে, যদি তিনি তাদেরকে বাস্তবিকই মা'যুর মনে করেন তবে যেন অনুমতি দান করেন। তারা ছিল বানু গিফার গোত্রের লোক। ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কিরআতে وَجَاءَ الْمُعْذِرُونَ রয়েছে। অর্থাৎ ওযর বিশিষ্ট লোকেরা (অনুমতি প্রার্থনা করেছিল)। এই অর্থটিই বেশী স্পষ্ট। কেননা, এই বাক্যের পরে ঐ লোকদের বর্ণনা রয়েছে যারা ছিল মিথ্যাবাদী। তারা না আগমন করেছিল, না জিহাদ থেকে বিরত থাকার কোন কারণ দর্শিয়েছিল, না রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে বিরত থাকার অনুমতি প্রার্থনা করেছিল। কোন কোন গুরুজন বলেন যে, ওযর পেশকারীরাও প্রকৃতপক্ষে ওযর বিশিষ্ট ছিল না। এ কারণেই তাদের ওযর গৃহীত হয়নি। কিন্তু প্রথম উক্তিটি গ্রহণযোগ্য বটে এবং ওটাই বেশী প্রকাশ্য। এর একটি কারণ ওটাই যা আমরা উপরে বর্ণনা করেছি। আর দ্বিতীয় কারণ এই যে, শাস্তির অঙ্গীকারও ঐ লোকদের সাথেই করা হয়েছে যারা যুদ্ধে গমন না করে বাড়ীতে বসেই রয়েছিল। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সঠিক জ্ঞানের অধিকারী।

৯১। দুর্বল লোকদের উপর কোন গুনাহ নেই, আর না রুগ্নদের উপর, আর না **ঐসব লোকের উপর যাদের খরচ করার সামর্থ্য নেই, যখন এসব লোক আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি নিষ্ঠা রাখে (এবং আন্তরিকতার সাথে আনুগত্য স্বীকার করে); এসব সৎ লোকের প্রতি কোন প্রকার অভিযোগ নেই; আর আল্লাহ অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়।**

৯১- لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

৯২। আর ঐ লোকদের উপরও নয়, যখন তারা তোমার নিকট এই উদ্দেশ্যে আসে যে, তুমি তাদেরকে বাহন দান করবে,

৯২- وَّلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ

مَآ اَحۡمِلُكُمۡ عَلَيۡهِ تَوَلَّوۡا وَّ اَعۡيُنُهُمۡ تَفِيۡضُ مِنَ الدَّمۡعِ حَزَنًا اَلَّا يَجِدُوۡا مَا يُنۡفِقُوۡنَ ○

আর তুমি বলে দিয়েছো– আমার নিকট তো কোন কিছু নেই যার উপর আমি তোমাদেরকে আরোহণ করাই, তখন তারা এমন অবস্থায় ফিরে যায় যে, তাদের চক্ষুসমূহ হতে অশ্রু বইতে থাকে এই অনুতাপে যে, তাদের ব্যয় করার মত কোন সম্বল নেই।

৯৩ اِنَّمَا السَّبِيۡلُ عَلَى الَّذِيۡنَ يَسۡتَاۡذِنُوۡنَكَ وَ هُمۡ اَغۡنِيَآءُ ۚ رَضُوۡا بِاَنۡ يَّكُوۡنُوۡا مَعَ الۡخَوَالِفِ ۙ وَ طَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوۡبِهِمۡ فَهُمۡ لَا يَعۡلَمُوۡنَ ○

৯৩। অভিযোগ তো শুধুমাত্র ঐ লোকদের উপরই যারা সরঞ্জামওয়ালা হওয়া সত্ত্বেও (যুদ্ধে গমন না করার) অনুমতি চাচ্ছে, তারা অন্তঃপুরবাসিনী মহিলাদের সাথে থাকতে সম্মত হয়ে গেল এবং আল্লাহ তাদের অন্তরসমূহের উপর মোহর মেরে দিলেন, কাজেই তারা (পাপ-পুণ্যকে) জানেই না।

এখানে আল্লাহ তা'আলা ঐ শরীয়ত সম্মত ওযরসমূহের বর্ণনা দিচ্ছেন যে ওযরগুলো কোন মানুষের মাঝে থাকলে সে যদি জিহাদে অংশগ্রহণ না করে তবে শরীয়তের দৃষ্টিতে তার কোন অপরাধ হবে না। ঐ ওযরগুলোর মধ্যে এক প্রকারতো হচ্ছে এই যে, তা সব সময়ই থাকবে, কোন অবস্থাতেই মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না। যেমন জন্মগতভাবে দুর্বল হওয়া, খোঁড়া হওয়া, অন্ধ হওয়া, বিকলাঙ্গ হওয়া, সম্পূর্ণরূপে শক্তিহীন হওয়া ইত্যাদি। দ্বিতীয় প্রকারের ওযর হচ্ছে ঐ সব ওযর যেগুলো কখনো থাকে আবার কখনো থাকে না। ওগুলো হচ্ছে আকস্মিক কারণ। যেমন কেউ রুগ্ন হয়ে পড়লো বা অভাবগ্রস্ত হলো অথবা সফরের ও জিহাদের সরঞ্জাম জোগাড় করতে পারছে না ইত্যাদি। সুতরাং এসব ওযর বিশিষ্ট লোকেরা জিহাদে অংশগ্রহণ না করলে শরীয়তের দৃষ্টিতে তাদের কোন অপরাধ হবে না। কিন্তু তাদের আন্তরিকতা থাকতে হবে। তাদেরকে হতে হবে মুসলিমদের ও আল্লাহর দ্বীনের শুভাকাঙ্ক্ষী। তাদের কর্তব্য হবে অন্যদেরকে জিহাদের প্রতি উৎসাহিত করা। বাড়ীতে বসে বসে যতটুকু সম্ভব মুজাহিদদের

খিদমত করতে হবে। এরূপ সৎ প্রকৃতির লোকদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। আল্লাহ তা'আলা ক্ষমাশীল ও দয়ালু।

ঈসা (আঃ)-এর সাহায্যকারী হাওয়ারীগণ তাঁকে প্রশ্ন করেছিলঃ "আল্লাহর শুভাকাঙ্ক্ষী কারা বলুন তো?" তিনি উত্তরে বলেছিলেনঃ "যারা আল্লাহর হককে মানুষের হকের উপর প্রাধান্য দেয় এবং যখন একটি দ্বীনের কাজ এবং একটি দুনিয়ার কাজ সামনে এসে যায় তখন যারা দ্বীনের কাজের গুরুত্বের প্রতি পূর্ণ খেয়াল রাখে। তারপর দ্বীনের কাজ শেষ করে দুনিয়ার কাজ আনজাম দেয়।"

একবার দুর্ভিক্ষের সময় জনগণ ইসতিস্কার সালাত পড়ার জন্যে মাঠের দিকে বের হয়। তাদের সাথে বিলাল ইবনে সা'দও (রাঃ) ছিলেন। তিনি দাঁড়িয়ে আল্লাহ তা'আলার হামদ ও সানার পর জনগণকে সম্বোধন করে বলেনঃ "হে উপস্থিত ভ্রাতৃবৃন্দ! আপনারা কি এটা স্বীকার করেন যে, আপনারা সবাই আল্লাহ তা'আলার পাপী বান্দা?" সবাই সমস্বরে বলে উঠলেনঃ "হ্যাঁ।" অতঃপর তিনি প্রার্থনার জন্যে হাত উঠিয়ে বলতে লাগলেন– হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আপনার কালামে পাকে বলেছেনঃ "সৎ লোকদের প্রতি কোন প্রকারের অভিযোগ নেই।" আমরা আমাদের দুষ্কার্যের স্বীকারোক্তি করছি। সুতরাং আপনি আমাদের ক্ষমা করুন! আমাদের উপর আপনার করুণা বর্ষণ করুন! আমাদের উপর দয়াপরবশ হয়ে বৃষ্টি বর্ষণ করুন! তিনি হাত উঠালেন এবং জনগণও তাঁর সাথে হাত উঠালো। আল্লাহর করুণা উথলিয়ে উঠলো এবং মুষলধারে রহমতের বৃষ্টি বর্ষিত হতে শুরু হলো।

যায়েদ ইবনে সাবিত (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর লেখক ছিলাম। সূরায়ে বারাআত যখন অবতীর্ণ হচ্ছিল তখন আমি ঐ সূরাটিও লিখছিলাম। আমি আমার কলমটি আমার কানের উপর রাখতাম। জিহাদের আয়াতগুলো অবতীর্ণ হচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর উপর কি অবতীর্ণ হতে যাচ্ছে সে জন্যে তিনি অপেক্ষমান ছিলেন। এমন সময় একজন অন্ধ এসে বলতে লাগলোঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমি তো একজন অন্ধ লোক। সুতরাং আমি জিহাদের নির্দেশ কিরূপে পালন করতে পারি?" তখন এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

এরপর ঐ লোকদের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যারা জিহাদে অংশগ্রহণের জন্যে সদা উদ্বিগ্ন, কিন্তু স্বভাবগত কারণে বিরত থাকতে বাধ্য হয়। জিহাদের হুকুম অবতীর্ণ হলে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ঘোষণা অনুযায়ী মুজাহিদগণ জমা হতে শুরু করেন। একটি দল আগমন করলেন যাদের মধ্যে আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল ইবনে মাকরান মুযানীও (রাঃ) ছিলেন। তাঁরা বললেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)!

আমাদের সওয়ারী নেই। সুতরাং আপনি আমাদের সওয়ারীর ব্যবস্থা করে দিন, যাতে আমরাও জিহাদের সওয়াব লাভ করতে পারি।” তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁদেরকে বললেনঃ “আল্লাহর কসম! আমার কাছে তো একটিও সওয়ারী নেই যাতে আমি তোমাদেরকে আরোহণ করাতে পারি।” সুতরাং তাঁরা নিরাশ হয়ে কাঁদতে কাঁদতে ফিরে যান। তাঁদের এর চেয়ে বড় দুঃখ আর ছিল না যে, তাঁরা জিহাদের মর্যাদা লাভে বঞ্চিত হয়ে গেলেন এবং নারীদের মত তাঁদেরকে ঐ সময়টা বাড়ীতেই কাটাতে হবে। তাঁদের না আছে নিজেদের কোন জিনিস, না কারো কাছ থেকে কোন বাহন পাচ্ছেন। তাই মহান আল্লাহ এ আয়াত নাযিল করে তাঁদেরকে সান্ত্বনা দান করেন। এ আয়াতটি মুযাইনা গোত্রের শাখা বানু মাকরানের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। মুহাম্মাদ ইবনে কা'ব (রঃ) বর্ণনা করেছেন যে, তাঁরা সাতজন ছিলেন। তাঁরা ছিলেন বানু আমির গোত্রের লোক। তাঁরা হচ্ছেন–(১) বানু ওয়াকিফ গোত্রের সালিম ইবনে আউফ, (২) বানু মাযিল গোত্রের হারামী ইবনে আমর, (৩) বানু মুআল্লা গোত্রের আব্দুর রহমান ইবনে কা'ব, (৪) বানু সালমা গোত্রের ফাযলুল্লাহ, (৫) আমর ইবনে উকবা, (৬) আব্দুল্লাহ ইবনে আমর মুযানী, (৭) বানু হারিসা গোত্রের আলিয়্যাহ ইবনে যায়েদ। কোন কোন রিওয়ায়াতে কতকগুলো নামের হেরফেরও রয়েছে। মহৎ হৃদয়ের অধিকারী এই বুযুর্গদের ব্যাপারেই রাসূলগণের মাথার মুকুট মুহাম্মাদ (সঃ) বলেছেনঃ “হে আমার মুজাহিদ সাহাবীবর্গ! তোমরা মদীনায় যেসব লোককে পিছনে ছেড়ে এসেছো তাদের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে যারা তোমাদের খরচ করার মধ্যে, তোমাদের মাঠে-ময়দানে চলাফেরার মধ্যে, তোমাদের জিহাদ করার মধ্যে শরীক রয়েছে। এতে তোমাদের যে সওয়াব হবে তাতে তারাও শরীক থাকবে।” অতঃপর তিনি এই আয়াতটিই পাঠ করেন। অন্য এক রিওয়ায়াতে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর এ কথা শুনে সাহাবীগণ বলেনঃ “তারা বাড়ীতে বসে থেকেও সওয়াবে আমাদের শরীক হবে?” রাসূলুল্লাহ (সঃ) উত্তরে বলেনঃ “হ্যাঁ, কেননা তাদের ওযর রয়েছে। ওযরের কারণেই তারা জিহাদে অংশগ্রহণ করতে পারেনি।” অন্য হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ “রোগ তাদেরকে জিহাদে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত রেখেছে।” অতঃপর প্রকৃতপক্ষে যাদের কোন ওযর নেই, আল্লাহ তা'আলা তাদের বর্ণনা দিচ্ছেন। তিনি বলছেনঃ অভিযোগ তো শুধু ঐ লোকদের উপরই যারা ধন-সম্পদের মালিক ও হৃষ্টপুষ্ট হওয়া সত্ত্বেও যুদ্ধে গমন না করার অনুমতি চাচ্ছে। তারা অন্তঃপুরবাসিনী মহিলাদের মত বাড়ীতেই অবস্থান করতে ইচ্ছুক। তারা মাটি কামড়ে বসে থাকে। তাদের দুষ্কার্যের কারণে আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরসমূহের উপর মোহর মেরে দেন। সুতরাং তারা এখন নিজেদের ভাল মন্দ কিছুই জানতে পারছে না।

দশম পারা সমাপ্ত

٩٤- يَعْتَذِرُوْنَ اِلَيْكُمْ اِذَا رَجَعْتُمْ اِلَيْهِمْ ؕ قُلْ لَّا تَعْتَذِرُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّاَنَا اللّٰهُ مِنْ اَخْبَارِكُمْ ؕ وَ سَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُوْلُهٗ ثُمَّ تُرَدُّوْنَ اِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ○

৯৪। তারা তোমাদের কাছে ওযর পেশ করবে যখন তোমরা তাদের কাছে ফিরে যাবে; (হে নবী) তুমি বলে দাও– তোমরা ওযর পেশ করো না, আমরা কখনো তোমাদেরকে সত্যবাদী বলে মনে করবো না, আল্লাহ আমাদেরকে তোমাদের (জিহাদে না যাওয়ার) বৃত্তান্ত জানিয়ে দিয়েছেন, আর ভবিষ্যতেও আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল তোমাদের কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করবেন, অতঃপর তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে এমন সত্তার কাছে যিনি অদৃশ্য এবং প্রকাশ্য সকল বিষয়েই অবগত আছেন, অনন্তর তিনি তোমাদেরকে জানিয়ে দিবেন যা কিছু তোমরা করতেছিলে।

٩٥- سَيَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ لَكُمْ اِذَا انْقَلَبْتُمْ اِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوْا عَنْهُمْ ؕ فَاَعْرِضُوْا عَنْهُمْ ؕ اِنَّهُمْ رِجْسٌ ؗ وَّ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ۚ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ○

৯৫। হ্যাঁ, তারা তখন তোমাদের সামনে শপথ করে বলবে, যখন তোমরা তাদের কাছে ফিরে যাবে, যেন তোমরা তাদেরকে তাদের অবস্থার উপর ছেড়ে দাও; অতএব তোমরা তাদেরকে তাদের অবস্থার উপর ছেড়েই দাও; তারা হচ্ছে অতিশয় অপবিত্র, আর তাদের ঠিকানা হচ্ছে জাহান্নাম, ঐসব কর্মের বিনিময়ে যা তারা করতো।

٩٦- يَحْلِفُوْنَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَاِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يَرْضٰى عَنِ الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْنَ ○

৯৬। তারা এ জন্যে শপথ করবে যেন তোমরা তাদের প্রতি রাজী হয়ে যাও, অনন্তর যদি তোমরা তাদের প্রতি রাজী হয়ে যাও তবে আল্লাহ তো এমন দুষ্কর্মকারী লোকদের প্রতি রাজী হন না।

আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদের সম্পর্কে সংবাদ দিচ্ছেন যে, মুমিনরা যখন মদীনায় ফিরে আসবে তখন ঐ মুনাফিকরা তাদের কাছে ওযর পেশ করবে। তাই আল্লাহ পাক স্বীয় রাসূলকে বলেছেনঃ হে নবী (সঃ)! ঐ মুনাফিকদেরকে বলে দাও– তোমরা আমাদের কাছে মিথ্যা ওযর পেশ করো না। তোমাদের কথা কখনো আমরা সত্য বলে বিশ্বাস করবো না। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে তোমাদের সংবাদ অবহিত করেছেন। অতিসত্বরই তিনি দুনিয়ায় তোমাদের আমল লোকদের সামনে প্রকাশ করে দিবেন এবং তোমাদের ভাল মন্দ কার্যাবলীর খবর প্রদান করবেন। অতঃপর তোমাদেরকে তোমাদের কর্মের ফলও দেখতে হবে।

এরপর মহান আল্লাহ তাদের সম্পর্কে আরো সংবাদ দিচ্ছেন– তারা তাদের ওযরের কথা শপথ করে করে বর্ণনা করবে, যেন তাদেরকে ক্ষমা করে দাও। কিন্তু হে মুমিনগণ! তোমরা কখনো তাদের কথার সত্যতা স্বীকার করো না এবং ঘৃণার সাথে তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও। এসব ব্যাপার ঐ সময় ঘটবে যখন তোমরা যুদ্ধ শেষে মদীনায় ফিরে আসবে। জেনে রেখো যে, তাদের নফস্ কলুষিত হয়ে গেছে। তাদের ভিতর খুবই খারাপ এবং তাদের ধারণা ও বিশ্বাস অপবিত্র। পরকালে তাদের ঠিকানা জাহান্নাম। এটাই তাদের দুষ্কর্মের সঠিক প্রতিফল। আল্লাহ তা'আলা মুমিনদেরকে আরো বলে দেন– তোমরা যদি এই মুনাফিকদের কথা ও কসম বিশ্বাস করে তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যাও তবে জেনে রেখো যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি কখনো সন্তুষ্ট হবেন না। তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ)-এর আনুগত্য হতে বেরিয়ে গেছে। তারা ফাসেক। فِسْقٌ শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে বাইরে বের হওয়া। যেমন বলা হয়ঃ اَلْفَارِقَةُ فُوَيْسِقَةٌ অর্থাৎ "ইঁদুর দুষ্কৃতি ও ফাসাদ দৃষ্টি করার উদ্দেশ্যেই স্বীয় গর্ত হতে বের হয়ে থাকে।" আরো বলা হয়ঃ فَسَقَتِ الرُّطَبَةُ অর্থাৎ "শাখা বা ডাল হতে খেজুরের গুচ্ছ বের হয়ে এসেছে।"

৯৭। পল্লীবাসী লোকেরা কুফরী ও কপটতায় অতি কঠোর, আর তাদের এইরূপ হওয়াই উচিত যে, তাদের ঐসব আহকামের জ্ঞান না হয় যা আল্লাহ তাঁর রাসূলের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন; আর আল্লাহ হচ্ছেন মহা জ্ঞানী, অতি প্রজ্ঞাময়।

৯৭- اَلْاَعْرَابُ اَشَدُّ كُفْرًا وَّ نِفَاقًا وَّ اَجْدَرُ اَلَّا يَعْلَمُوْا حُدُوْدَ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ ؕ وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ○

৯৮। আর এই গ্রামবাসীদের মধ্যে এমন লোক রয়েছে যে, তাঁরা যা কিছু ব্যয় করে ওকে জরিমানা মনে করে এবং তোমাদের প্রতি (কালের) আবর্তনসমূহের প্রতীক্ষায় থাকে; (বস্তুতঃ) অশুভ আবর্তন তাদের উপরই পতিত প্রায়, আর আল্লাহ খুব শুনেন, খুব জানেন।

৯৮- وَ مِنَ الْاَعْرَابِ مَنْ يَّتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَّ يَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَآئِرَ ؕ عَلَيْهِمْ دَآئِرَةُ السَّوْءِ ؕ وَ اللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ○

৯৯। আর গ্রামবাসীদের মধ্যে কতিপয় লোক এমনও আছে, যারা আল্লাহর প্রতি এবং কিয়ামত দিবসের প্রতি (পূর্ণ) ঈমান রাখে, আর যা কিছু ব্যয় করে ওকে আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের উপকরণ ও রাসূলের দুআ' লাভের উপকরণরূপে গ্রহণ করে; স্মরণ রেখো তাদের এই ব্যয়কার্য নিঃসন্দেহে তাদের জন্যে (আল্লাহর) নৈকট্য লাভের কারণ; নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদেরকে নিজের রহমতে দাখিল করে নিবেন; নিশ্চয়ই আল্লাহ হচ্ছেন অতি ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়।

৯৯- وَ مِنَ الْاَعْرَابِ مَنْ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبٰتٍ عِنْدَ اللّٰهِ وَ صَلَوٰتِ الرَّسُوْلِ ؕ اَلَآ اِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ ؕ سَيُدْخِلُهُمُ اللّٰهُ فِيْ رَحْمَتِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○ ع

আল্লাহ তা'আলা এখানে সংবাদ দিচ্ছেন যে, গ্রাম্য লোকদের মধ্যে কাফিরও রয়েছে, মুনাফিকও রয়েছে। আর তাদের কুফরী ও নিফাক অন্যদের তুলনায় খুবই বড় ও কঠিন এবং তারা এরই যোগ্য যে, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল (সঃ)-এর উপর যে হুকুম ও আহ্কাম নাযিল করেছেন তা থেকে তারা বে-খবর থাকে। যেমন– আমাশ (রঃ) ইবরাহীম (রঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, একজন গ্রাম্য বেদুঈন যায়েদ ইবনে সাওহান (রঃ)-এর নিকট উপবিষ্ট ছিল। তিনি তাঁর সঙ্গীদের সাথে আলাপ-আলোচনা করছিলেন। নাহাওয়ান্দের যুদ্ধে তাঁর হাত কেটে গিয়েছিল। বেদুঈনটি তাঁকে বললোঃ "আপনার কথাগুলো তো খুবই ভাল এবং আপনাকে ভাল লোক বলেই মনে হচ্ছে। কিন্তু আপনার কর্তিত হাত আমাকে সন্দেহের মধ্যে ফেলে দিয়েছে।" তখন যায়েদ (রঃ) বললেনঃ "আমার কর্তিত হাত দেখে তোমার সন্দেহ হচ্ছে কেন? এটা তো বাম হাত।" বেদুঈন বললোঃ "আল্লাহর শপথ! চুরির অপরাধে ডান হাত কাটা হয় কি বাম হাত কাটা হয় তা আমার জানা নেই।" তখন যায়েদ ইবনে সাওহান (রঃ) বলে উঠলেন যে, আল্লাহ সত্য বলেছেনঃ

الْاَعْرَابُ اَشَدُّ كُفْرًا وَّنِفَاقًا وَّاَجْدَرُ اَلَّا يَعْلَمُوْا حُدُوْدَ مَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ

অর্থাৎ "গ্রামবাসী লোকেরা কুফরী ও কপটতায় অতি কঠোর, আর তাদের এরূপ হওয়াই উচিত কারণ, তাদের ঐসব আহকামের জ্ঞান নেই যা আল্লাহ তাঁর রাসূল (সঃ)-এর প্রতি অবতীর্ণ করেছেন।"

ইমাম আহমাদ (রঃ) ইসনাদসহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "যারা পল্লীতে বাস করে তারা যেন নির্বাসিত লোক, যারা শিকারের পিছে দৌড়াদৌড়ি করে তারা নির্বোধ এবং যারা কোন বাদশাহ্র সাহচর্য গ্রহণ করে তারা ফিৎনায় পতিত হয়ে থাকে।"[১] বেদুঈনরা সাধারণতঃ বদ মেযাজী, বোকা এবং অভদ্র হয়ে থাকে, তাই আল্লাহ তা'আলা তাদের মধ্যে কোন রাসূলের জন্ম দেননি। নবুওয়াতের অধিকারী একমাত্র শহুরে ও ভদ্র লোকেরাই হয়ে থাকেন। যেমন– আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وَ مَاۤ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِيْۤ اِلَيْهِمْ مِّنْ اَهْلِ الْقُرٰى

অর্থাৎ "(হে নবী সঃ)! তোমার পূর্বে জনপদবাসীদের মধ্য হতে পুরুষগণকেই প্রেরণ করেছিলাম যাদের নিকট ওহী পাঠাতাম।" (১২ঃ ১০৯)

১. সুনানে আবি দাউদ, জামেউত তিরমিযী এবং সুনানে নাসাঈতেও সুফইয়ান সাওরী (রঃ) হতে এ হাদীসটি বর্ণিত আছে। ইমাম তিরমিযী (রঃ) এটাকে হাসান গারীব বলেছেন। সাওরী (রঃ)-এর রিওয়ায়াত ছাড়া আর কারো রিওয়ায়াত আমাদের জানা নেই।

একবার এক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে কিছু হাদিয়া পাঠায়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সঃ) যে পর্যন্ত তার কাছে ওর কয়েকগুণ বেশী হাদিয়া না পাঠান সেই পর্যন্ত সে খুশী হয়নি। ঐ সময় তিনি বলেছিলেনঃ "আমি এখন সংকল্প করেছি যে, কারাশী, সাকাফী, আনসারী এবং দাওসী ছাড়া আর কারো হাদিয়া কবূল করবো না। কেননা, এরা হচ্ছে শহুরে লোক। এরা মক্কা, তায়েফ, মদীনা এবং ইয়ামনের অধিবাসী। বেদুঈনের তুলনায় এদের চরিত্র বহুগুণে উত্তম। বেদুঈনরা সাধারণতঃ বোকাই হয়।"

সন্তানকে চুম্বন করার ব্যাপারে বেদুঈনের হাদীসঃ

সহীহ মুসলিমে আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, বেদুঈনদের কতকগুলো লোক রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে এসে বললোঃ "তোমরা তোমাদের শিশুদেরকে চুম্বন করে থাকো?" তাঁরা (সাহাবীগণ) উত্তরে বললেনঃ "হ্যাঁ।" তখন তারা বললোঃ "আল্লাহর শপথ! আমরা কিন্তু (আমাদের) শিশুদেরকে চুম্বন করি না।" রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন তাদেরকে বললেনঃ "আল্লাহ যদি তোমাদের অন্তর থেকে রহমত বের করে নেন তবে আমি কি করে তার যিম্মাদার হতে পারি?"[১]

আল্লাহ পাকের উক্তিঃ "আল্লাহ হচ্ছেন মহাজ্ঞানী, অতি প্রজ্ঞাময়।" অর্থাৎ আল্লাহ ঐ লোকদেরকে ভালরূপেই জানেন যারা এর যোগ্য যে, তাদেরকে জ্ঞান ও ঈমানের তাওফীক দেয়া হবে। তিনি স্বীয় বান্দাদের মধ্যে জ্ঞান, অজ্ঞতা, ঈমান, কুফরী এবং নিফাকের বন্টন অত্যন্ত বিজ্ঞতা ও বিচক্ষণতার সাথে করেছেন। তিনি তাঁর জ্ঞান ও নৈপুণ্যের ভিত্তিতে যা কিছু করেন এর বিরুদ্ধে কেউ মুখ খুলতে পারে না।

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন– তাদের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে যারা আল্লাহর পথে কিছু খরচ করলে ওটাকে জরিমানা মনে করে থাকে এবং মুমিনরা কোন দৈব দুর্বিপাকে পতিত হোক তারা এরই প্রতীক্ষায় থাকে। কিন্তু তারা নিজেরাই সেই দুর্বিপাকে পতিত হবে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের কথা খুবই ভাল শুনেন ও জানেন। অপমান ও ব্যর্থতার যোগ্য কারা এবং কারা সাহায্য প্রাপ্তি ও সফলতার যোগ্য এটাও তিনি ভালরূপেই জানেন।

---

১. সহীহ বুখারীর ইবারত হচ্ছেঃ اَوَ اَمْلِكُ لَكَ اَنْ نَزَعَ اللّٰهُ مِنْ قَلْبِكَ الرَّحْمَةَ অর্থাৎ "আমি কি তোমার জন্যে যিম্মাদার হতে পারি যদি আল্লাহ তোমার অন্তর থেকে রহমত বের করে নেন?"

পল্লীবাসীদের আর এক শ্রেণীর লোক প্রশংসার পাত্র। তারা হচ্ছে ওরাই যারা আল্লাহর পথে খরচ করাকে তাঁর নৈকট্য লাভ ও সন্তুষ্টির মাধ্যম মনে করে থাকে। তারা এটা কামনা করে যে, এর কারণে তারা তাদের জন্যে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর দুআ'য়ে খায়ের লাভ করবে। হ্যাঁ, অবশ্যই এই খরচ তাদের জন্যে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের কারণ হবে এবং আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে স্বীয় রহমতের মধ্যে প্রবেশ করাবেন। আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও দয়ালু।

১০০। আর যেসব মুহাজির ও আনসার (ঈমান আনয়নে) অগ্রবর্তী এবং প্রথম, আর যেসব লোক সরল অন্তরে তাদের অনুগামী, আল্লাহ তাদের প্রতি রাজি হয়েছেন এবং তারাও তাঁর প্রতি রাজি হয়েছেন, আর আল্লাহ তাদের জন্যে এমন উদ্যানসমূহ প্রস্তুত করে রেখেছেন যার তলদেশে নহরসমূহ বইতে থাকবে, যার মধ্যে তারা চিরস্থায়ীভাবে অবস্থান করবে, তা হচ্ছে বিরাট কৃতকার্যতা।

١٠٠- وَالسّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ رَّضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ وَاَعَدَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ تَحْتَهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ○

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন- আমি ঐসব মুহাজির, আনসার ও তাদের অনুসারীদের প্রতি সন্তুষ্ট যারা আমার সন্তুষ্টি লাভ করার ব্যাপারে অগ্রবর্তী হয়েছে। আমি যে তাদের প্রতি সন্তুষ্ট রয়েছি তা এইভাবে প্রমাণিত যে, আমি তাদের জন্যে সুখময় জান্নাত প্রস্তুত করে রেখেছি।

শা'বী (রঃ) বলেন যে, মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে অগ্রবর্তী ও প্রথম তাঁরাই যাঁরা হুদায়বিয়ায় বায়আ'তে রিযওয়ানের মর্যাদা লাভ করেছিলেন। আর আবূ মূসা আশ্আরী (রাঃ), সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব (রঃ), মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন (রঃ), হাসান (রঃ) এবং কাতাদা (রঃ) বলেন যে, তাঁরা হচ্ছেন ঐসব লোক যাঁরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে দুই কিবলার (বায়তুল মুকাদ্দাস ও কা'বা) দিকে মুখ করে সালাত আদায় করেছেন।

মুহাম্মাদ ইবনে কা'ব আল কারাসী (রঃ) বলেন যে, উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) এমন একজন লোকের পার্শ্ব দিয়ে গমন করেন যিনি নিম্নের আয়াতটি পাঠ করছিলেনঃ ...... وَالسّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَ الْاَنْصَارِ তখন উমার (রাঃ) তাঁর হাতখানা ধরে নেন এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করেনঃ "কে তোমাকে এটা এরূপে পাঠ করালেন?" লোকটি উত্তরে বললেনঃ "উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ)।" তখন উমার (রাঃ) তাঁকে বললেনঃ "চলো, আমরা উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ)-এর কাছে যাই এবং তাঁকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করি।" অতঃপর উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ)-এর কাছে গিয়ে তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করেনঃ "আপনি কি এই আয়াতটিকে এভাবে পড়তে বলেছেন?" উত্তরে তিনি বললেনঃ "হ্যাঁ।" তখন পুনরায় উমার (রাঃ) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেনঃ "রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে কি আপনি এভাবেই পড়তে শুনেছেন?" জবাবে তিনি বলেনঃ "হ্যা।" উমার (রাঃ) তখন বললেনঃ "তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, আমরা এমন এক মর্যাদা লাভ করেছি যা আমাদের পরে কেউ লাভ করতে পারবে না।" এ কথা শুনে উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) বলেন যে, এই আয়াতের সত্যতা প্রমাণকারী সূরায়ে জুমাআ'র প্রথম দিকের আয়াতটিও বটে। তা হচ্ছে–

وَاٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

অর্থাৎ "আর (উপস্থিতরা ব্যতীত) অন্যান্য লোকদের জন্যেও, যারা তাদের সাথে শামিল হবে, কিন্তু এখনও শামিল হয়নি, আর তিনি মহাপরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।"(৬২ঃ ৩) সূরায়ে হাশরেও রয়েছেঃ

وَ الَّذِيْنَ جَآءُوْ مِنْۢ بَعْدِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا وَ لِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ وَ لَا تَجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَا اِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ۔

অর্থাৎ "আর (তাদের জন্যেও) যারা (ইসলাম ধর্মে) তাদের (আনসার ও মুহাজিরদের) পরে এসেছে, যারা প্রার্থনা করে–হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ক্ষমা করুন, আর আমাদের ঐ ভাইদেরকেও যারা আমাদের পূর্বে ঈমান এনেছে এবং ঈমানদারদের প্রতি আমাদের অন্তরে যেন ঈর্ষা না হয়। হে আমাদের রব! আপনি বড় স্নেহশীল, করুণাময়।" (৫৯ঃ ১০) সূরায়ে আনফালেও রয়েছেঃ

وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْۢ بَعْدُ وَ هَاجَرُوْا وَ جَاهَدُوْا مَعَكُمْ فَاُولٰٓئِكَ مِنْكُمْ

অর্থাৎ "আর যারা (নবী সঃ-এর হিজরতের) পরবর্তীকালে ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং তোমাদের সাথে একত্রে জিহাদ করেছে, বস্তুতঃ তারা

তোমাদেরই অন্তর্ভুক্ত।” (৮ঃ ৭৫) ইবনে জারীর (রঃ) এটা রিওয়ায়াত করেছেন এবং বলেছেন যে, হাসান বসরী (রঃ) اَنْصَارُ শব্দটিকে পেশ দিয়ে অর্থাৎ اَنْصَارُ পড়তেন এবং اَلسّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ -এর উপর عَطْفٌ করতেন। তখন অর্থ দাঁড়াবেঃ “মুহাজিরদের মধ্যে যারা অগ্রবর্তী ও প্রথম এবং আনসার ও তাদের অনুসারীদের প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট।” আফসোস্ ঐ হতভাগ্যদের প্রতি যারা এই সাহাবীদের প্রতি হিংসা পোষণ করে থাকে, তাঁদেরকে গালি দেয়। অথবা কোন কোন সাহাবীকে গালি দিয়ে থাকে, বিশেষ করে ঐ সাহাবীকে যিনি সমস্ত সাহাবীর নেতা, নবী (সঃ)-এর স্থলাভিষিক্ত, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর পরেই যাঁর মর্যাদা, যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ সাহাবী হওয়ার গৌরব অর্জন করেছেন অর্থাৎ মহান খলীফা আবূ বকর ইবনে আবি কুহাফা (রাঃ)! এরা হচ্ছে রাফেযী সম্প্রদায়ের বিভ্রান্ত দল। তারা সর্বশ্রেষ্ঠ সাহাবীর প্রতি শত্রুতা পোষণ করে থাকে। তাঁকে তারা গালি-গালাজ করে। আমরা এই দুষ্কার্য থেকে মহান আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। এটা এ কথাই প্রমাণ করে যে, এদের বুদ্ধি-বিবেক লোপ পেয়েছে এবং অন্তর বিগড়ে গেছে। যদি এই দুর্বৃত্তের দল এমন লোকদেরকে গালি দেয় যাঁদের প্রতি আল্লাহ তা'আলা সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং পবিত্র কুরআনে তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকার সনদ দিয়েছেন, তবে কোন্ মুখে তারা কুরআনের প্রতি ঈমান আনার দাবী করে? এখন কুরআনের উপর ঈমানই আর কি করে থাকলো? আর আহ্লে সুন্নাত ঐ লোকদেরকে সম্মান করেন এবং ঐ লোকদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন যাঁদের প্রতি আল্লাহ তা'আলা সন্তুষ্ট রয়েছেন। এই আহ্লে সুন্নাত ঐ লোকদেরকে মন্দ বলেন যাদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ) মন্দ বলেছেন। আর তাঁরা ঐ লোকদেরকে ভালবাসেন যাঁদেরকে আল্লাহ তা'আলা ভালবাসেন। তাঁরা ঐ লোকদের বিরুদ্ধাচরণ করেন স্বয়ং আল্লাহ যাদের বিরুদ্ধাচরণ করেছেন। তাঁরা হিদায়াতের অনুসারী। তাঁরা বিদআ'তী নন। তাঁরা নবী (সঃ)-এরই অনুসরণ করে থাকেন। তাঁরাই হচ্ছেন আল্লাহর দল এবং তাঁরাই সফলকাম। তাঁরাই হচ্ছেন আল্লাহর মুমিন বান্দা।

১০১। আর তোমাদের চতুর্দিকস্থ লোকদের মধ্য হতে কতিপয় লোক এবং মদীনাবাসীদের মধ্য হতেও কতিপয় লোক এমন মুনাফিক রয়েছে যারা নিফাকের চরমে পৌঁছে গেছে,	١٠١- وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِّنَ الْاَعْرَابِ مُنٰفِقُوْنَ وَمِنْ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ مَرَدُوْا عَلَى النِّفَاقِ قف

لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّوْنَ اِلٰى عَذَابٍ عَظِيْمٍ ۚ	তুমি তাদেরকে জান না, আমিই তাদেরকে জানি, আমি তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি প্রদান করবো, তৎপর (পরকালেও) তারা মহা শাস্তির দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে।

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল (সঃ)-কে খবর দিচ্ছেন– মদীনার চতুষ্পার্শ্বে অবস্থানকারী আরব গোত্রগুলোর মধ্যে কতকগুলো লোক মুনাফিক রয়েছে এবং স্বয়ং মদীনায় বসবাসকারীদের মধ্যে কিছুসংখ্যক মুসলমানও প্রকৃতপক্ষে মুনাফিক। তারা কপটতা থেকে বিরত থাকছে না। বলা হয় شَيْطٰنٍ مَّرِيْدٍ (২২ঃ৩) এবং شَيْطٰنٍ مَّارِدٍ । আরো বলা হয় تَمَرَّدَ فُلَانٌ عَلَى اللّٰهِ অর্থাৎ 'অমুক ব্যক্তি আল্লাহর অবাধ্য হয়েছে'। আল্লাহ তা'আলার لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ এই উক্তি এবং وَلَوْ نَشَاءُ لَاَرَيْنٰكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيْمٰهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِيْ لَحْنِ الْقَوْلِ (৪৭ঃ ৩০) এই উক্তির মধ্যে কোনই বৈপরীত্য নেই। কেননা, এটা এই প্রকারের জিনিস যে, এর মাধ্যমে তাদের গুণাবলী চিহ্নিত করা হয়েছে, যেন তাদেরকে চেনা যায়। এর অর্থ এটা নয় যে, নবী (সঃ) নির্দিষ্টভাবে সমস্ত মুনাফিককেই চিনতেন। তিনি মদীনাবাসীদের মধ্যে শুধুমাত্র ঐ কতিপয় মুনাফিককেই চিনতেন যারা রাত-দিন তাঁর সাথে উঠা-বসা করতো এবং সকাল-সন্ধ্যায় তিনি তাদেরকে দেখতেন। নিম্নের রিওয়ায়াতটির দ্বারাও এ কথার সত্যতা প্রমাণিত হয়। ইমাম আহমাদ (রঃ) ইসনাদসহ জুবাইর ইবনে মুতইম (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, জুবাইর (রাঃ) বলেনঃ "আমি আরয করলাম, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! ঐ লোকগুলো ধারণা করে যে, মক্কায় তারা কোনই প্রতিদান পায়নি।" তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "হে জুবাইর (রাঃ)! তোমাদেরকে তোমাদের (কর্মের) প্রতিদান অবশ্যই দেয়া হবে, শুধু মক্কায় নয়, এমন কি যদিও তোমরা শৃগালের গর্তেও বাস কর না কেন।" অতঃপর তিনি আমার দিকে মাথা ঝুঁকিয়ে গোপনীয়ভাবে বললেনঃ "আমার সাহাবীদের মধ্যে কিছু কিছু মুনাফিকও রয়েছে।" ভাবার্থ এই যে, কোন কোন মুনাফিক এরূপ এরূপ সুরে কথা বলে থাকে যা মোটেই সত্য নয়। সুতরাং এটাও এই ধরনেরই কথা ছিল যা জুবাইর ইবনে মুতইম (রাঃ) শুনেছিলেন।

وَهَمُّوْا بِمَا لَمْ يَنَالُوْا (৯ ঃ ৭৪) অংশের তাফসীরে এটা বর্ণিত হয়েছে যে, নবী (সঃ) হুযাইফা (রাঃ)-কে ১৪ বা ১৫ জন লোকের নাম বলে দিয়েছিলেন যারা

প্রকৃতপক্ষে মুনাফিক ছিল। এই বিশিষ্টকরণ এটা দাবী করে না যে, তিনি সমস্ত মুনাফিকেরই নাম জানতেন। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জ্ঞান রাখেন।

হাফিয ইবনে আসাকির (রঃ) 'তারজুমাতু আবি উমার আল বাইরূতী' এর মধ্যে ইসনাদসহ রিওয়ায়াত করে বলেছেনঃ 'হারমালা' নামক একটি লোক নবী (সঃ)-এর কাছে এসে বলেঃ "ঈমান তো এখানে রয়েছে।" ঐ সময় সে তার জিহ্বার দিকে ইশারা করে। তারপর বলেঃ "আর নিফাক বা কপটতা থাকে এখানে।" এ কথা বলার সময় সে অন্তরের দিকে ইশারা করে। আল্লাহর নাম কিন্তু সে খুব কমই নেয়। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "হে আল্লাহ! আপনি তার জিহ্বাটিকে যিকরকারী বানিয়ে দিন, তার অন্তরকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী করে দিন, তার মধ্যে আমার প্রতি মহব্বত পয়দা করুন, যারা আমাকে ভালবাসে, তার মধ্যে তাদের প্রতি ভালবাসা দিয়ে দিন এবং তাদের সমস্ত কাজ উত্তম করে দিন।" সাথে সাথে তার সমস্ত কপটতা দূর হয়ে গেল এবং সে বলতে লাগলোঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমার অধিকাংশ সঙ্গী মুনাফিক এবং আমি তাদের নেতা ছিলাম। আমি তাদেরকে আপনার কাছে ধরে আনবো কি?" নবী (সঃ) উত্তরে বললেনঃ "যে স্বেচ্ছায় আমার কাছে আসবে, আমি তার জন্যে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবো। আর যে নিফাককেই আঁকড়ে ধরে থাকবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে দেখে নিবেন। তুমি কারো গোপন তথ্য প্রকাশ করো না।"[1]

আবূ আহমাদ হাকিমও (রঃ) এরূপই রিওয়ায়াত করেছেন। এই আয়াতের ব্যাপারে কাতাদা (রাঃ) বলেনঃ "ঐ লোকদের কি হয়েছে যারা কৃত্রিমভাবে মানুষের ব্যাপারে নিজেদের নিশ্চিত জ্ঞান প্রকাশ করে বলে যে, অমুক ব্যক্তি জান্নাতী ও অমুক ব্যক্তি জাহান্নামী? অথচ যদি স্বয়ং তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হয়– আচ্ছা বলতো, তোমরা জান্নাতী, না জাহান্নামী? তখন তারা বলে– আমরা এটা জানি না। অথচ যারা অন্যদের সম্পর্কে বলতে পারে যে, তারা জান্নাতী কি জাহান্নামী, তারা তো নিজেদের সম্পর্কে আরো ভাল জানতে পারবে। আসলে তারা এমন কিছু দাবী করছে যে দাবী নবীরাও করেননি।"

আল্লাহর নবী নূহ (আঃ) বলেছিলেনঃ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ অর্থাৎ "তারা কি করছে তা আমি জানি না।" (২৬ ঃ ১১২) আল্লাহ তা'আলার নবী শুআ'ইব (আঃ) বলেছিলেনঃ

১. এ হাদীসটি শায়েখ আবূ উমার বায়রূতী (রঃ) আবূ দারদা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন।

بَقِيَّتُ اللّٰهِ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ وَ مَا اَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيْظٍ

অর্থাৎ "আল্লাহর নিকট তোমাদের জন্যে কল্যাণ রয়েছে যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাকো। আর আমি তোমাদের উপর রক্ষক নই।" (১১ ঃ ৮৬) আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নবী (সঃ)-কে এখানে বলেছেনঃ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ অর্থাৎ "হে নবী (সঃ)! তুমি তাদেরকে জান না, আমি তাদেরকে জানি।"

এই আয়াতের ব্যাপারে ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা নবী (সঃ) জুমআর খুতবার উদ্দেশ্যে দাঁড়ালেন এবং বললেনঃ " হে অমুক অমুক ব্যক্তি! তোমরা মসজিদ থেকে বেরিয়ে যাও। কেননা, তোমরা মুনাফিক।" সুতরাং তারা অত্যন্ত লাঞ্ছনা ও অপমানের সাথে মসজিদ থেকে বের হয়ে যাচ্ছিল। ঐ সময় উমার (রাঃ) মসজিদের দিকে আসছিলেন। তখন উমার (রাঃ) মনে করলেন যে, হয়তো জুমআর সালাত শেষ হয়ে গেছে তাই লোকেরা ফিরে আসছে। সুতরাং তিনি খুবই লজ্জিত হলেন এবং লজ্জাবশতঃ নিজেকে ঐলোকগুলো হতে গোপন করতে লাগলেন। আর ওদিকে ঐ লোকগুলো মনে করলো যে, উমারও (রাঃ) হয়তো তাদের নিফাকের কথা জেনে ফেলেছেন, তাই তারাও নিজেদেরকে উমার (রাঃ) থেকে গোপন করতে লাগলো। মোটকথা, উমার (রাঃ) যখন মসজিদে আসলেন তখন তিনি জানতে পারলেন যে, তখনও জুমআর সালাত পড়া হয়নি। একজন মুসলিম তাঁকে খবর জানিয়ে দিয়ে বললেনঃ "হে উমার (রাঃ) খুশী থাকুন যে, আজ আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদেরকে অপমানিত করেছেন।" ইবনে আব্বাস (রাঃ)! বলেন যে, এভাবে মসজিদ থেকে বের করে দেয়া হচ্ছে প্রথম শাস্তি এবং দ্বিতীয় শাস্তি হবে কবরের শাস্তি।

সাওরীও (রঃ) ইসনাদসহ একথাই বলেছেন। মুজাহিদ (রঃ) سَنُعَذِّبُهُمْ مَّرَّتَيْنِ আল্লাহ তা'আলার এই উক্তি সম্পর্কে বলেন যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে হত্যা ও বন্দী। অন্য এক রিওয়ায়াতে ক্ষুধা ও কবরের আযাব অর্থ নেয়া হয়েছে। অতঃপর বড় আযাবের দিকে ফিরানো হবে। ইবনে জুরাইজ (রঃ)-এর উক্তি এই যে, এর দ্বারা দুনিয়ার আযাব ও কবরের আযাব বুঝানো হয়েছে। অতঃপর "আযাবে আযীম" অর্থাৎ জাহান্নামের শাস্তিতে জড়িয়ে দেয়া হবে। হাসান বসরী (রঃ) বলেন যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে দুনিয়ার শাস্তি ও কবরের শাস্তি। আবদুর রহমান ইবনে যায়েদ (রঃ) বলেন যে, দুনিয়ার শাস্তি হচ্ছে ধন-সম্পদ ও সন্তান সন্ততির ফিৎনার শাস্তি। অতঃপর তিনি আল্লাহ তা'আলার নিম্নের উক্তিটি পাঠ করে শুনালেন–

فَلَا تُعْجِبْكَ اَمْوَالُهُمْ وَلَاۤ اَوْلَادُهُمْ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا -

অর্থাৎ “তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান সন্ততি যেন তোমাকে বিস্মিত না করে, আল্লাহ চান যে, এগুলোর মাধ্যমে পার্থিব জীবনেই তিনি তাদেরকে আযাবে জড়িয়ে ফেলেন।” (৯ঃ ৫৫) কেননা এই বিপদসমূহ তাদের জন্যে শাস্তি কিন্তু মুমিনদের জন্যে প্রতিদানের কারণ। আর আখিরাতের শাস্তি দ্বারা জাহান্নামের শাস্তি বুঝানো হয়েছে।

মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক (রঃ) বলেন যে, প্রথম শাস্তি দ্বারা বুঝানো হচ্ছে ঐ শাস্তি যা ইসলাম প্রসার লাভ করার মাধ্যমে তাদের উপর পতিত হয়েছিল এবং সীমাহীন দুঃখ ও আফসোস তাদের উপর জারী হয়েছিল। দ্বিতীয় শাস্তি হচ্ছে কবরের শাস্তি। আর “আযাবে আযীম” (বড় শাস্তি) হচ্ছে ঐ শাস্তি যা আখিরাতে তারা ভোগ করবে এবং তা চিরস্থায়ীভাবে ভোগ করতে থাকবে।

সাঈদ (রঃ) কাতাদা (রঃ) হতে বর্ণনা করে বলেছেন যে, নবী (সঃ) হুযাইফা (রাঃ)-এর কানে কানে বলেছিলেনঃ “বারোজন মুনাফিক রয়েছে। তাদের মধ্যে ছয়জনের জন্যে ‘দাবীলা’ যথেষ্ট। তা হচ্ছে জাহান্নামের একটি অগ্নিশিখা যা তাদের স্কন্ধে লেগে যাবে এবং বক্ষ পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। অর্থাৎ পেটের ব্যথা ও অভ্যন্তরীণ রোগে মৃত্যুবরণ করবে। আর বাকী ছয়জনের স্বাভাবিক মৃত্যু হবে।”

সাঈদ (রঃ) আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন যে, যখন কেউ মারা যেতো এবং উমার ইবনে খাত্তাব (রাঃ)-এর দৃষ্টিতে সে সন্দেহযুক্ত হতো তখন তিনি হুযাইফা (রাঃ)-এর দিকে তাকাতেন। তিনি ঐ মৃতের জানাযার সালাত আদায় করলে তিনিও পড়তেন এই বিশ্বাস করে যে, ঐ মৃতব্যক্তি ঐ বারোজন মুনাফিকের অন্তর্ভুক্ত নয়। আর হুযাইফা (রাঃ) জানাযার সালাত না পড়লে তিনিও পড়তেন না। জানা গেছে যে, উমার (রাঃ) হুযাইফা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেনঃ “আল্লাহর কসম! আমাকে বলুন, ঐ বারোজনের মধ্যে আমি একজন নই তো?” হুযাইফা (রাঃ) উত্তরে তাঁকে বলেনঃ “আপনি তাদের অন্তর্ভুক্ত নন। কিন্তু আপনি ছাড়া আমি আর কারো যিম্মাদারী নিচ্ছি না।”

১০২। এবং আরো কতকগুলো লোক আছে যারা নিজেদের অপরাধসমূহ স্বীকার করেছে, যারা মিশ্রিত আমল করেছিল, কিছু ভালো আর কিছু মন্দ,

١٠٢- وَاٰخَرُوْنَ اعْتَرَفُوْا بِذُنُوْبِهِمْ خَلَطُوْا عَمَلًا صَالِحًا وَّاٰخَرَ

আশা রয়েছে যে, আল্লাহ তাদের প্রতি করুণা-দৃষ্টি করবেন, নিঃসন্দেহে আল্লাহ অতিশয় ক্ষমাশীল পরম করুণাময়।	سَيِّئًا عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّتُوْبَ عَلَيْهِمْ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

আল্লাহ তা'আলা যখন ঐসব মুনাফিকের অবস্থার বর্ণনা শেষ করলেন যারা মুসলিমদের সাথে জিহাদে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত রয়েছিল এবং যুদ্ধে শরীক হওয়া থেকে অনাগ্রহ দেখিয়েছিল, আর মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল ও সন্দেহ প্রকাশ করেছিল, তখন তিনি ঐ পাপীদের বর্ণনা শুরু করলেন যারা শুধুমাত্র অলসতা ও আরামপ্রিয়তার কারণেই জিহাদে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত ছিল। কিন্তু তারা প্রকৃতপক্ষে হক পন্থী ও ঈমানদার ছিল। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা বলেন–ঐ মুনাফিকদের ছাড়া অন্যেরা যে জিহাদে শরীক হওয়া থেকে বিরত ছিল তারা নিজেদের দোষ ও অপরাধ স্বীকার করে নিয়েছে। তারা এমনই লোক যে, তাদের ভালো আমলও রয়েছে। আর ঐ সৎ আমলের সাথে কিছু দোষক্রটিও জড়িয়ে দিয়েছে, যেমন জিহাদে শরীক হওয়া থেকে বিরত থাকা। কিন্তু তাদের এই দোষ-ক্রটিকে আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করে দিয়েছেন। আর ঐ মুনাফিকদের অপরাধ আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। তাদের কোন নেক আমলও নেই।

এ আয়াতটি কতকগুলো নির্দিষ্ট ব্যক্তির ব্যাপারে অবতীর্ণ হলেও সমস্ত অপরাধী ও পাপী মুমিনদের জন্যেও এটা সাধারণ এবং তাদের সকলের ব্যাপারেই এটা প্রযোজ্য। মুজাহিদ (রঃ)-এর উক্তি এই যে, এটা আবূ লুবাবার ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়, যখন সে বানু কুরাইযা গোত্রকে বলেছিল যে, ওটা যবেহ করার স্থান এবং স্বীয় হাত দ্বারা সে তার গলার দিকে ইশারা করেছিল। ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর উক্তি এই যে, اٰخَرُوْنَ দ্বারা আবূ লুবাবা ও তার দলকে বুঝানো হয়েছে, যারা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে তাবূকের যুদ্ধে না গিয়ে পিছনে রয়ে গিয়েছিল। কেউ কেউ বলেন যে, আবূ লুবাবার সাথে আরো পাঁচজন বা সাতজন অথবা নয়জন লোক ছিল। যখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাবূক হতে ফিরে আসেন তখন তারা নিজেদেরকে মসজিদের থামের সাথে বেঁধে ফেলে এবং কসম করে বলে– "যে পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদেরকে স্বয়ং না খুলবেন সেই পর্যন্ত আমাদেরকে খোলা হবে না।" অতঃপর যখন وَاٰخَرُوْنَ اعْتَرَفُوْا بِذُنُوْبِهِمْ -এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয় তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাদেরকে খুলে দেন এবং তাদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করার অপরাধ ক্ষমা করে দেন।

ইমাম বুখারী (রঃ) বলেন, সামুরা ইবনে জুনদুব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, আজ রাত্রে দু'জন আগন্তুক আমার নিকট আগমন করে এবং আমাকে এমন এক শহর পর্যন্ত নিয়ে যায় যা স্বর্ণ ও রৌপ্যের ইট দ্বারা নির্মিত ছিল। সেখানে আমি এমন কতগুলো লোক দেখতে পেলাম যাদের দেহের অর্ধাংশ খুবই সুন্দর ছিল। কিন্তু বাকী অর্ধাংশ ছিল অত্যন্ত কুৎসিত। ওদিকে তাকাতেই মন চাচ্ছিল না। আমার সঙ্গীদ্বয় তাদেরকে বললোঃ "তোমরা এই নদীতে ডুব দিয়ে এসো।" তারা ডুব দিয়ে যখন বের হয়ে আসলো তখন তাদের দেহের সর্বাংশ সুন্দর দেখালো। আমার সঙ্গীদ্বয় আমাকে বললোঃ "এটা হচ্ছে জান্নাতে আদন। এটাই হচ্ছে আপনার মনযিল।" অতঃপর তারা বললোঃ "এই যে লোকগুলো, যাদের দেহের অর্ধাংশ ছিল খুবই সুন্দর এবং বাকী অর্ধাংশ ছিল অত্যন্ত কুৎসিত, তার কারণ এই যে, তারা নেক আমলের সাথে বদ আমলও মিশিয়ে দিয়েছিল। আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।" ইমাম বুখারী (রঃ) এ আয়াতের তাফসীরে সংক্ষেপে এরূপই রিওয়ায়াত করেছেন।

১০৩। (হে নবী!) তুমি তাদের ধন-সম্পদ হতে সাদকা গ্রহণ কর, যদদ্বারা তুমি তাদেরকে পাক-সাফ করে দেবে, আর তাদের জন্যে দুআ' কর, নিঃসন্দেহে তোমার দুআ' হচ্ছে তাদের জন্যে শান্তির কারণ, আর আল্লাহ খুব শুনেন, খুব জানেন।

١٠٣- خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَ اللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ○

১০৪। তারা কি এটা অবগত নয় যে, আল্লাহই নিজ বান্দাদের তাওবা কবূল করেন, আর তিনিই দান খয়রাত কবূল করে থাকেন আর এটাও যে, আল্লাহ হচ্ছেন তাওবা কবূল করতে এবং অনুগ্রহ করতে পূর্ণ সমর্থবান?

١٠٤- اَلَمْ يَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ وَ يَاْخُذُ الصَّدَقٰتِ وَ اَنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ○

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল (সঃ)-কে নির্দেশ দিচ্ছেন—হে নবী! তুমি তাদের মালের যাকাত আদায় কর। এটা তাদেরকে পাক পবিত্র করবে। কতকগুলো লোক اَمْوَالِهِمْ - এর সর্বনাম ঐ লোকদের দিকে ফিরিয়েছেন যারা নিজেদের পাপ ও অপরাধ স্বীকার করে নিয়েছিল এবং ভালো ও মন্দ উভয় আমল করেছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই হুকুম বিশিষ্ট নয়, বরং এটা সাধারণ হুকুম। এ কারণেই আরব গোত্রগুলোর মধ্যে কতকগুলো লোক যাকাত দিতে অস্বীকার করে বসেছিল। তাদের মনে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়েছিল যে, ইমামের যাকাত নেয়ার অধিকার নেই। এটা শুধু রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর জন্যেই নির্দিষ্ট ছিল। আর এ জন্যেই তারা আল্লাহ তা'আলার خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً -এই উক্তিকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছিল। কিন্তু আবূ বকর (রাঃ) এবং অন্যান্য সমস্ত সাহাবী তাদের ভুল ব্যাখ্যা ও বাজে অনুভূতি খণ্ডন করে দিয়েছেন এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। তখন বাধ্য হয়ে তারা সেই সময়ের খলীফাকে যাকাত প্রদান করেছে যেমন তারা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে প্রদান করতো। এমন কি আবূ বকর (রাঃ) ঘোষণা করেছিলেনঃ "যদি তারা যাকাতের মালের একটি উষ্ট্রীর বাচ্চা বা রজ্জুর একটা খণ্ডও আদায় করা থেকে বিরত থাকে তবুও আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো।"

আল্লাহ পাকের উক্তি وَصَلِّ عَلَيْهِمْ অর্থাৎ "হে নবী (সঃ)! তুমি তাদের জন্যে দুআ' কর এবং ক্ষমা প্রার্থনা কর।" যেমন সহীহ মুসলিমে আব্দুল্লাহ ইবনে আবি আওফা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, যখন কারো কাছে যাকাতের মাল আসতো তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ অনুযায়ী তার জন্যে দুআ' করতেন। আমার পিতা যখন যাকাতের মাল পেশ করলেন তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) দুআ' করলেনঃ "হে আল্লাহ! আবূ আওফার (রাঃ) বংশধরের উপর দয়া করুন।" অন্য একটি হাদীসে আছে যে, একটি স্ত্রীলোক বলেঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমার জন্যে ও আমার স্বামীর জন্যে দুআ' করুন।" তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে বললেনঃ "আল্লাহ তোমার উপর ও তোমার স্বামীর উপর রহম করুন।"

আল্লাহ তা'আলার উক্তি—اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ অর্থাৎ "নিশ্চয়ই তোমার দুআ' হচ্ছে তাদের জন্যে শান্তির কারণ।" কেউ কেউ صَلٰوةَ কে বহুবচন করে صَلَوٰتَ পড়েছেন। আবার অন্যেরা একবচন ধরে اِنَّ صَلَاتَكَ পড়েছেন। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, سُكُوْنٌ শব্দের অর্থ হচ্ছে রহমত। আর কাতাদা (রঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে وَقَارٌ বা পদমর্যাদা।

وَاللّٰهُ سَمِيعٌ অর্থাৎ হে নবী! তোমার দুআ' আল্লাহ শ্রবণকারী। عَلِيمٌ অর্থাৎ (হে নবী সঃ)! কে তোমার দুআ'র দাবীদার তা আল্লাহ খুব ভালই জানেন।

মুসনাদে আহমাদে রয়েছে– ওয়াকী (রঃ) ইসনাদসহ বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সঃ) যখন কারো জন্যে দুআ' করতেন তখন তা তার পক্ষে, তার পুত্রদের পক্ষে এবং তার পৌত্রদের পক্ষে কবূল হয়ে যেতো। আবূ নাঈম (রঃ) হতে ইসনাদসহ বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ)-এর দুআ' কোন মানুষের পক্ষে, তার পুত্রদের পক্ষে এবং তার পৌত্রদের পক্ষে অবশ্যই কবূল হয়ে যেতো। আল্লাহ তা'আলার উক্তিঃ

اَلَمْ يَعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ وَ يَاْخُذُ الصَّدَقٰتِ

অর্থাৎ তারা কি এটা অবগত নয় যে, আল্লাহই নিজ বান্দাদের তাওবা কবূল করেন, আর তিনিই দান-খয়রাত কবূল করে থাকেন? এর উদ্দেশ্য হচ্ছে তাওবা ও দান খয়রাতের উপর মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা। কেননা এ দুটোই মানুষ থেকে পাপকে সরিয়ে দেয় এবং নাফরমানী নিশ্চিহ্ন করে দেয়। আল্লাহ তা'আলা খবর দিয়েছেন যে, যে তাঁর কাছে তাওবা পেশ করে তিনি তার সেই তাওবা কবূল করে থাকেন। যে ব্যক্তি হালাল উপার্জন থেকে একটি খণ্ডও সাদকা করে, আল্লাহ সেটা তাঁর ডান হাতে গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি ওটাকে সাদকাকারীর জন্যে বিনিয়োগ করতে থাকেন এবং ছোট থেকে বড় করে দেন। শেষ পর্যন্ত সাদকার ঐ একটি মাত্র খেজুর উহুদ পাহাড়ের মত হয়ে যায়। যেমন এই হাদীসেই রাসূলুল্লাহ (সঃ) হতে বর্ণিত আছে এবং যেমন ওয়াকী (রঃ) ইসনাদসহ আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "আল্লাহ তা'আলা সাদকা কবূল করে থাকেন এবং ওটাকে নিজের দক্ষিণ হস্তে গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি ওটাকে বড় করতে থাকেন, যেমন তোমরা ঘোড়ার বাচ্চাকে লালন পালন করে বড় করে থাকো। শেষ পর্যন্ত সাদকার এক লুকমাও উহুদ পাহাড় হয়ে যায়।" আল্লাহর কিতাবের দ্বারাও এর সত্যতা প্রমাণিত হয়। মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ "তারা কি জানে না যে, আল্লাহ স্বীয় বান্দাদের তাওবা কবূল করে থাকেন এবং যাকাত ও সাদকাও নিয়ে থাকেন?" মহান আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেন ঃ

يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَ يُرْبِي الصَّدَقٰتِ

অর্থাৎ "আল্লাহ সুদকে বরবাদ করে দেন এবং যাকাতকে বহুগুণে বাড়িয়ে দেন।" (২ঃ ২৭৬)

সাওরী (রঃ) ইসনাদসহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, সাদকার মাল ভিক্ষুকের হাতে পড়ার পূর্বেই আল্লাহর হাতে পড়ে যায়। অতঃপর আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) আল্লাহ তা'আলার اَلَمْ يَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ وَ يَاْخُذُ الصَّدَقٰتِ -এ উক্তিটি পাঠ করেন।

ইবনে আসাকির (রঃ) স্বীয় ইতিহাসের মধ্যে আব্দুল্লাহ ইবনুশ শাইর আসসাকীর (রঃ) ইতিহাসকে অন্তর্ভুক্ত করে (যিনি দেমাশ্‌কী ছিলেন, কিন্তু তাঁর প্রকৃত দেশ ছিল হিম্‌স এবং তিনি ফকীহ্‌দের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন) বর্ণনা করেছেন যে, মুআ'বিয়া (রাঃ) -এর যুগে জনগণ জিহাদে গমন করেন, যাঁদের নেতা ছিলেন আব্দুর রহমান ইবনে খালিদ ইবনে ওয়ালীদ (রাঃ)। তখন একজন মুসলিম গনীমতের মালের মধ্য থেকে একশ দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) আত্মসাৎ করে। অতঃপর যখন সেনাবাহিনী ফিরে যায় এবং লোকেরা নিজ নিজ বাড়ীতে গমন করে তখন ঐ (আত্মসাৎকারী) মুসলিমটি খুবই লজ্জিত হয়। সে তখন ঐ দীনারগুলো সেনাপতির কাছে পৌঁছিয়ে দিতে যায়। কিন্তু সেনাপতি ওগুলো নিতে অস্বীকার করেন এবং বলেনঃ "সৈন্যরা তো নিজ নিজ বাড়ী চলে গেছে যাদের মধ্যে এগুলো বণ্টন করা যেতো। সুতরাং আমিতো এখন এগুলো নিতে পারি না। এগুলো তুমি কিয়ামতের দিন আল্লাহর সামনে পেশ করবে।" লোকটি তখন সাহাবীদের প্রত্যেককে জিজ্ঞেস করতে থাকে। কিন্তু সবাই ঐ কথাই বলে। সে তখন দামেস্ক আসে এবং মুআ'বিয়া (রাঃ)-কে তা কবূল করতে বলে। কিন্তু তিনিও তা কবূল করতে অস্বীকার করেন। সে সেখান থেকে কাঁদতে কাঁদতে ফিরে আসে এবং আব্দুল্লাহ ইবনুশ্ শাইর আসসাকীর (রঃ) পার্শ্ব দিয়ে গমন করে। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করেনঃ "কাঁদছো কেন?" উত্তরে সে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করে এবং বলে যে, কোন আমীরই তার আত্মসাৎকৃত একশ'টি দীনার গ্রহণ করলেন না। তখন আব্দুল্লাহ (রঃ) তাকে বললেনঃ "তুমি আমার কথা শুনবে কি?" সে উত্তর দিলোঃ "হ্যাঁ অবশ্যই।" তিনি বললেনঃ "তুমি মুআ'বিয়া (রাঃ)-এর কাছে গিয়ে বল-বায়তুল মালের হক এক পঞ্চমাংশ আপনি নিয়ে নিন। সুতরাং বিশ দীনার তাঁকে দিয়ে দাও। আর অবশিষ্ট আশি দীনার ঐ সৈন্যদের পক্ষ থেকে খয়রাত করে দাও যারা এর হকদার ছিল। কেননা, আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের তাওবা কবূল করে থাকেন। তিনি ঐ সৈন্যদের নাম, বাসস্থান ইত্যাদি সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফ হাল। তিনি তাদেরকে এর সাওয়াব পৌঁছিয়ে দিবেন।" ঐ লোকটি তখন এই কাজই করলো। মুআ'বিয়া (রাঃ) বললেনঃ "আমি যদি তাকে এই ফতওয়া দিতাম তবে এটা আমার কাছে আমার সাম্রাজ্যের চাইতেও প্রিয় ছিল। তিনি খুব সুন্দর তদবীর বাতলিয়ে দিয়েছেন।"

১০৫। হে নবী! তুমি বলে দাও– তোমরা কাজ করতে থাকো, অনন্তর তোমাদের কার্যকে অচিরেই দেখে নিবেন আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও ঈমানদারগণ, আর নিশ্চয়ই তোমাদেরকে প্রত্যাবর্তিত হতে হবে এমন এক সত্তার নিকট যিনি হচ্ছেন সকল অদৃশ্য ও প্রকাশ্য বিষয়ের জ্ঞাতা, অতঃপর তিনি তোমাদেরকে তোমাদের সকল কৃতকর্ম জানিয়ে দিবেন।

١٠٥- وَقُلِ اعْمَلُوْا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُوْلُهٗ وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَسَتُرَدُّوْنَ اِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ○

মুজাহিদ (রঃ)-এর উক্তি এই যে, এটা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণকারীদের জন্যে ভীতি প্রদর্শন যে, তাদের কার্যাবলী আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলার সামনে পেশ করা হবে। আর রাসূলুল্লাহ (সঃ) ও মুমিনদের মধ্যেও তাদের কার্য প্রকাশিত হয়ে পড়বে। কিয়ামতের দিন এটা অবশ্যই হবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُوْنَ لَا تَخْفٰى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ

অর্থাৎ "সেই দিন (কিয়ামতের দিন) তোমাদের কোন গোপন বিষয়ও গোপন থাকবে না।" (৬৯ঃ ১৮) অন্য জায়গায় আল্লাহ পাক বলেনঃ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ অর্থাৎ "যেই দিন সকলের গুপ্ত বিষয় প্রকাশ হয়ে যাবে।" (৮৬ঃ ৯) আর এক জায়গায় বলেনঃ وَحُصِّلَ مَا فِى الصُّدُوْرِ অর্থাৎ "আর যা কিছু অন্তরসমূহের মধ্যে রয়েছে তা প্রকাশ হয়ে পড়বে।" (১০০ঃ ১০) দুনিয়ার লোক তা জেনে নিবে। যেমন ইমাম আহমাদ (রঃ) বলেন– হাসান ইবনে মূসা (রঃ) আবূ সাঈদ (রাঃ) হতে মারফূ' রূপে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "তোমাদের কেউ যদি দরযা ও ছিদ্র বিহীন কোন শক্ত পাথরের মধ্যে গোপনে কোন কাজ করে তবুও আল্লাহ তা'আলা ওটাকে লোকদের সামনে এমনভাবে প্রকাশ করে দিবেন যে, যেন সে ঐ কাজ তাদের সামনেই করেছে। হাদীসে এসেছে যে, জীবিতদের আমলগুলো তাদের মৃত বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন এবং গোত্রীয় লোকদের সামনে পেশ করা হয়, যারা আলমে বারযাখে রয়েছে।

সাতাত ইবনে দীনার (রঃ) হাসান (রঃ) হতে এবং তিনি জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "তোমাদের আমলগুলো তোমাদের মৃত আত্মীয়-স্বজন ও গোত্রীয় লোকদের কবরে পেশ করা হয়। আমলগুলো ভাল হলে তারা খুশী হয়। আর সেগুলো খারাপ হলে তারা বলেঃ "হে আল্লাহ! তাদেরকে আপনার অনুগত হওয়ার তাওফীক প্রদান করুন।"[১]

সুফইয়ান (রঃ) আনাস (রাঃ)-কে বলতে শুনেছেন যে, নবী (সঃ) বলেছেন, তোমাদের আমলগুলো তোমাদের মৃত আত্মীয়-স্বজন ও গোত্রীয় লোকদের সামনে পেশ করা হয়। আমলগুলো ভাল হলে ঐ মৃত লোকগুলো খুশী হয়। আর সেগুলো ভাল না হলে তারা বলেঃ "হে আল্লাহ! আপনি তাদেরকে মৃত্যু মুখে পতিত করবেন না যে পর্যন্ত না তারা ঐ রূপ হিদায়াত লাভ করে যেরূপ হিদায়াত আপনি আমাদেরকে দান করেছেন।"[২]

ইমাম বুখারী (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, আয়েশা (রাঃ) বলেন, যখন তোমরা কোন মুসলিমের নেক আমলে সন্তুষ্ট হও তখন তাদেরকে বলঃ "তোমরা আমল করে যাও, অনন্তর তোমাদের আমল অচিরেই আল্লাহ, তাঁর রাসূল (সঃ) এবং মুমিনগণ দেখে নিবেন।" এ ধরনের আর একটি হাদীস এসেছে, ইমাম আহমাদ (রঃ) বলেন, ইসনাদসহ আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "তোমরা কারো ভাল আমল দেখে খুশী হয়ো না, বরং অপেক্ষা কর, তার সমাপ্তি ভাল আমলের উপর হচ্ছে কি না। কেননা, একজন আমলকারী দীর্ঘদিন পর্যন্ত নেক আমল করতে থাকে এবং ঐ নেক আমলের উপর মারা গেলে সে জান্নাতে চলে যেতো। কিন্তু হঠাৎ করে তার অবস্থার পরিবর্তন ঘটে যায় এবং সে খারাপ আমল করতে শুরু করে। আর এক বান্দা এরূপই হয় যে, কিছুকাল ধরে সে খারাপ আমল করতে থাকে। ঐ আমলের উপর মারা গেলে নিশ্চিতরূপে সে জাহান্নামে চলে যেতো। কিন্তু অকস্মাৎ তার কার্য পরিবর্তন হয়ে যায় এবং সে ভাল আমল করতে শুরু করে। আল্লাহ যখন কোন বান্দার প্রতি কল্যাণের ইচ্ছা করেন তখন মৃত্যুর পূর্বে তিনি তাকে পুণ্য লাভের তাওফীক দান করেন এবং সে ঐ পুণ্যের উপরই মৃত্যুবরণ করে।" জনগণ জিজ্ঞেস করলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! এটা কিরূপে হয়?" তিনি উত্তরে বললেনঃ "তাকে ভাল কাজের তাওফীক দান করা হয়, তারপর তার রূহ কব্য করা হয়।"[৩]

---

১. এ হাদীসটি আবূ দাঊদ তায়ালেসী (রঃ) বর্ণনা করেছেন।
২. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।
৩. এ হাদীসটি এই ধারায় ইমাম আহমাদ (রঃ) একাকী বর্ণনা করেছেন।

১০৬। এবং আরও কতক লোক আছে যাদের ব্যাপার মূলতবী রয়েছে আল্লাহর আদেশ আসা পর্যন্ত, হয় তিনি তাদেরকে শাস্তি প্রদান করবেন, অথবা তাদের তাওবা কবূল করবেন, আর আল্লাহ মহা জ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।

١٠٦ - وَاٰخَرُوْنَ مُرْجَوْنَ لِاَمْرِ اللّٰهِ اِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَاِمَّا يَتُوْبُ عَلَيْهِمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ○

ইবনে আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রঃ), ইকরামা (রঃ), যহ্হাক (রঃ) প্রমুখ গুরুজন বলেন যে, তাঁরা ছিলেন তিন ব্যক্তি যাঁদের তাওবা কবূল হওয়ার ব্যাপারটা পিছিয়ে গিয়েছিল। তারা হচ্ছেন মারারা ইবনে রাবী (রাঃ), কাব ইবনে মালিক (রাঃ) এবং হিলাল ইবনে উমাইয়া (রাঃ)। তাঁরা তাবূকের যুদ্ধে ঐ লোকদের সাথেই রয়ে গিয়েছিলেন যাঁরা অলসতা ও আরামপ্রিয়তার কারণে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি। আর একটি কারণ ছিল এই যে, তাঁদের বাগানের ফল পেকে গিয়েছিল এবং সময়টা ছিল মনোমুগ্ধকর ও চিত্তাকর্ষক বসন্তকাল। তাঁদের যুদ্ধের প্রতি অবহেলা সন্দেহ ও নিফাকের কারণে ছিল না। তাঁদের মধ্যে কতক লোক এমনও ছিলেন যাঁরা নিজেদেরকে স্তম্ভের সাথে বেঁধে ফেলেছিলেন। যেমন আবূ লুবাবাহ্ ও তাঁর সঙ্গীরা। অন্যান্য কতকগুলো লোক এরূপ করেননি। তাঁরা ছিলেন উপরোল্লিখিত তিন ব্যক্তি। আবূ লুবাবাহ (রাঃ) ও তাঁর সঙ্গীদের তাওবা এঁদের পূর্বেই কবূল হয়েছিল। এই তিন ব্যক্তির তাওবা কবূল হওয়ার ব্যাপারে বিলম্ব হয়েছিল। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা আয়াত অবতীর্ণ করেনঃ

لَقَدْ تَابَ اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ............... وَعَلَى الثَّلٰثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوْا حَتّٰى اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ اَنْفُسُهُمْ

অর্থাৎ "আল্লাহ নবী (সঃ), মুহাজির এবং আনসারের তাওবা কবূল করে নিয়েছেন (আয়াতের শেষ পর্যন্ত) আর ঐ তিন ব্যক্তির তাওবাও আল্লাহ কবূল করে নিয়েছেন যারা যুদ্ধ থেকে পিছনে রয়ে গিয়েছিল, এমন কি এতো প্রশস্ত যমীনও তাদের কাছে সংকীর্ণ হয়ে পড়েছিল এবং কোন জায়গাতেই তারা আশ্রয় পাচ্ছিল না।" (৯ঃ ১১৭-১১৮) যেমন কা'ব ইবনে মালিক (রাঃ)-এর হাদীসের বর্ণনা আসছে।

আল্লাহ তা'আলার উক্তিঃ اِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَ اِمَّا يَتُوْبُ عَلَيْهِمْ অর্থাৎ এটা আল্লাহর ইচ্ছাধীন রয়েছে, তিনি ইচ্ছা করলে তাদেরকে শাস্তি প্রদান করবেন এবং ইচ্ছা করলে তাদের তাওবা কবূল করবেন (এবং ক্ষমা করে দিবেন)। কিন্তু আল্লাহর রহমত তাঁর গযবের উপর জয়যুক্ত। কে শাস্তি পাওয়ার যোগ্য এবং কে ক্ষমা পাওয়ার যোগ্য তা তিনি ভালরূপেই জানেন। তিনি তাঁর কাজে ও কথায় বিজ্ঞানময় এবং তিনি ছাড়া অন্য কোন মা'বূদ ও প্রতিপালক নেই।

١٠٧- وَ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَّ كُفْرًا وَّ تَفْرِيْقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ اِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ مِنْ قَبْلُ ؕ وَ لَيَحْلِفُنَّ اِنْ اَرَدْنَا اِلَّا الْحُسْنٰى ؕ وَ اللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ○

১০৭। আর কেউ কেউ এমন আছে যারা এ উদ্দেশ্যে মসজিদ নির্মাণ করেছে যেন তারা (ইসলামের) ক্ষতি সাধন করে এবং কুফরীর কথাবার্তা বলে, আর মুমিনদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে, আর ঐ ব্যক্তির অবস্থানের ব্যবস্থা করে যে এর পূর্ব হতেই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধী, আর তারা শপথ করে বলবে–মঙ্গল ভিন্ন আমাদের আর কোন উদ্দেশ্য নেই; আর আল্লাহ সাক্ষী আছেন যে, তারা সম্পূর্ণ মিথ্যাবাদী।

١٠٨- لَا تَقُمْ فِيْهِ اَبَدًا ؕ لَمَسْجِدٌ اُسِّسَ عَلَى التَّقْوٰى مِنْ اَوَّلِ يَوْمٍ اَحَقُّ اَنْ تَقُوْمَ فِيْهِ ؕ فِيْهِ رِجَالٌ يُّحِبُّوْنَ اَنْ يَّتَطَهَّرُوْا ؕ وَ اللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ ○

১০৮। (হে মুহাম্মাদ!) তুমি কখনো ওতে (সালাতের জন্যে) দাঁড়াবে না; অবশ্য যে মসজিদের ভিত্তি প্রথম দিন হতেই তাকওয়ার উপর স্থাপিত হয়েছে তা এর উপযোগী যে, তুমি তাতে সালাতের জন্যে দাঁড়াবে; ওতে এমন সব লোক রয়েছে যারা উত্তমরূপে পাক হওয়াকে পছন্দ করে, আর আল্লাহ উত্তমরূপে পবিত্রতা সম্পাদনকারীদেরকে পছন্দ করেন।

এই আয়াতগুলোর শানে নুযূল (অবতীর্ণ হওয়ার কারণ) এই যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর মদীনায় আগমনের পূর্বে সেখানে খাযরাজ গোত্রের একটি লোক বাস করতো যার নাম ছিল আবূ আমির রাহিব। অজ্ঞতার যুগে সে খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিল এবং আহলে কিতাবের জ্ঞান লাভ করেছিল। জাহিলিয়াতের যুগে সে বড় আবিদ লোক ছিল। নিজের গোত্রের মধ্যে সে খুব মর্যাদা লাভ করেছিল। নবী (সঃ) যখন হিজরত করে মদীনায় আসেন এবং মুসলিমরা তাঁর কাছে একত্রিত হতে শুরু করে ও ইসলামের উন্নতি সাধিত হয় এবং বদরের যুদ্ধে আল্লাহ তা'আলা মুসলিমদেরকে জয়যুক্ত করেন, তখন এটা আবূ আমিরের কাছে খুবই কঠিন বোধ হয়। সুতরাং সে খোলাখুলিভাবে ইসলামের প্রতি শত্রুতা প্রকাশ করতে শুরু করে এবং মদীনা হতে পলায়ন করে মক্কার কাফির ও মুশরিক কুরায়েশদের সাথে মিলিত হয়। তাদেরকে সে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে উদ্বুদ্ধ করে। ফলে আরবের সমস্ত গোত্র একত্রিত হয় এবং উহুদ যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকে। অবশেষে যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং মুসলিমদের উপর যে বিপদ ও কষ্ট পৌঁছার ছিল তা পৌঁছে যায়। মহা মহিমান্বিত আল্লাহ এই যুদ্ধে মুসলিমদেরকে পরীক্ষা করেন। তবে পরিণাম ফল তো আল্লাহ্ভীরুদের জন্যেই বটে। এ পাপাচারী (আবূ আমির) উভয় দিকের সারির মাঝে কয়েকটি গর্ত খনন করে রেখেছিল। একটি গর্তে রাসূলুল্লাহ (সঃ) পড়ে যান এবং আঘাতপ্রাপ্ত হন। তাঁর চেহারা মুবারক যখম হয়ে যায় এবং নীচের দিকের সামনের চারটি দাঁত ভেঙ্গে যায়। তাঁর পবিত্র মস্তকও যখম হয়। যুদ্ধের শুরুতে আবূ আমির তার কওম আনসারের দিকে অগ্রসর হয়ে তাঁদেরকে সম্বোধন করে তাকে সাহায্য সহযোগিতার জন্যে দাওয়াত দেয়। যখন আনসারগণ আবূ আমিরের এসব কার্যকলাপ লক্ষ্য করলেন তখন তাঁরা তাকে বললেনঃ "ওরে নরাধম ও পাপাচারী! ওরে আল্লাহর শত্রু! আল্লাহ তোকে ধ্বংস করুন!" এভাবে তাঁরা তাকে গালি দেন ও মর্যাদা ক্ষুণ্ন করেন। তখন সে বলেঃ "আমার পরে আমার কওম আরো বিগড়ে গেছে।" এ কথা বলে সে ফিরে যায়। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে তার মদীনা হতে পলায়নের পূর্বে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছিলেন এবং কুরআনের অহী শুনিয়েছিলেন। কিন্তু সে ইসলাম গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায় এবং ইসলামের বিরুদ্ধাচরণ করে। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) তার প্রতি বদ দুআ' দেন যে, সে যেন নির্বাসিত হয় এবং বিদেশেই যেন সে মৃত্যুবরণ করে। এই বদ দুআ' তার প্রতি কার্যকরী হয়ে যায় এবং এটা এভাবে সংঘটিত হয় যে, জনগণ যখন উহুদ যুদ্ধ শেষ করলো এবং সে লক্ষ্য করলো যে, ইসলাম দিন দিন উন্নতির দিকেই এগিয়ে

যাচ্ছে তখন সে রোমক সম্রাট হিরাক্লিয়াসের কাছে গমন করলো এবং রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর বিরুদ্ধে তার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করলো। সম্রাট তাকে সাহায্য করার অঙ্গীকার করলো। সে তার আশা পূর্ণ হতে দেখে হিরাক্লিয়াসের কাছেই অবস্থান করলো। সে তার কওম আনসারদের মধ্যকার মুনাফিকদেরকে এ বলে মক্কা পাঠিয়ে দিলোঃ "আমি সেনাবাহিনী নিয়ে আসছি। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে ভীষণ যুদ্ধ সংঘটিত হবে। আমরা তাঁর উপর জয়যুক্ত হবো এবং ইসলামের পূর্বে তাঁর অবস্থা যেমন ছিল তিনি ঐ অবস্থাতেই ফিরে যাবেন।"

সে ঐ মুনাফিকদের কাছে চিঠি লিখলো যে, তারা যেন তার জন্যে একটা আশ্রয়স্থান নির্মাণ করে রাখে। আর যেসব দূত তার নির্দেশনামা নিয়ে যাবে তাদের জন্যেও যেন অবস্থানস্থল ও নিরাপদ জায়গা বানানো হয়, যাতে সে নিজেও যখন যাবে তখন সেটা গুপ্ত অবস্থান রূপে কাজ দেয়।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে ঐ মুনাফিকরা মসজিদে কুবার নিকটেই আর একটি মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করে এবং ওটাকে পাকা করে নির্মাণ করে। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর তাবূক অভিমুখে বের হওয়ার পূর্বেই তারা ওর নির্মাণ কার্য শেষ করে ফেলে। অতঃপর তারা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে এসে আবেদন করেঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আপনি আমাদের ওখানে চলুন এবং আমাদের মসজিদে সালাত পড়ুন, যাতে এই সনদ হয়ে যায় যে, এই মসজিদটি স্বীয় স্থানে অবস্থানযোগ্য এবং এতে আপনার সমর্থন রয়েছে। তাঁর সামনে তারা বর্ণনা করে যে, দুর্বল লোকদের জন্যেই তারা এই মসজিদটি নির্মাণ করেছে এবং ঠাণ্ডার রাত্রিতে যেসব রোগগ্রস্ত লোক দূরের মসজিদে যেতে অক্ষম হবে তাদের পক্ষে এই মসজিদে আসা সহজ হবে, এই উদ্দেশ্যেই তারা মসজিদটি নির্মাণ করেছে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তো স্বীয় নবী (সঃ)-কে ঐ মসজিদে সালাত আদায় করা থেকে রক্ষা করতে চাচ্ছিলেন। সুতরাং রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাদেরকে বললেনঃ "এখন তো আমরা সফরে বের হওয়ার জন্যে ব্যস্ত রয়েছি, ফিরে আসলে আল্লাহ চান তো দেখা যাবে।" রাসূলুল্লাহ (সঃ) যখন তাবূক হতে মদীনার দিকে প্রত্যাবর্তন করেন এবং মদীনায় পৌঁছতে একদিনের পথ বাকী থাকে বা তার চেয়ে কিছু কম, তখন জিবরাঈল (আঃ) মসজিদে যিরারের খবর নিয়ে তাঁর কাছে হাযির হন এবং মুনাফিকদের গোপন তথ্য প্রকাশ করে দেন যে, মসজিদে কুবার নিকটে আর একটি মসজিদ নির্মাণ করে মুসলিমদের দলের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করাই হচ্ছে ঐ কাফির ও মুনাফিকদের আসল উদ্দেশ্য। মসজিদে কুবা হচ্ছে এমন এক মসজিদ যার ভিত্তি প্রথমদিন হতেই তাক্ওয়ার উপর স্থাপিত হয়েছে।

এটা জানার পর নবী (সঃ) মদীনা পৌঁছার পূর্বেই কতকগুলো লোককে মসজিদে যিরার বিধ্বস্ত করার জন্যে পাঠিয়ে দেন। যেমন আলী ইবনে আবি তালহা (রাঃ) এই আয়াতের তাফসীরে ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করে বলেন যে, তারা ছিল আনসারের লোক যারা একটি মসজিদ নির্মাণ করেছিল এবং আবূ আমির তাদেরকে বলেছিলঃ "তোমরা একটি মসজিদ নির্মাণ কর এবং সম্ভব মত সেখানে অস্ত্রশস্ত্র ও যুদ্ধের আসবাবপত্র লুকিয়ে রাখো, আর ওটাকে আশ্রয়স্থল ও গুপ্তস্থান বানিয়ে দাও। কেননা আমি রোমক বাদশাহর নিকট যাচ্ছি। রোম থেকে আমি সৈন্য-সামন্ত নিয়ে আসবো এবং মুহাম্মাদ (সঃ) ও তাঁর সঙ্গী সাথীদেরকে মদীনা হতে বের করে দেবো।" সুতরাং মুনাফিকরা মসজিদে যিরারের নির্মাণ কার্য সমাপ্ত করে নবী (সঃ)-এর দরবারে হাযির হয় এবং আবেদন করেঃ "আমাদের আন্তরিক ইচ্ছা এই যে, আপনি আমাদের মসজিদে গিয়ে সালাত পড়বেন এবং আমাদের জন্যে বরকতের দুআ' করবেন।" তখন মহামহিমান্বিত আল্লাহ لَا تَقُمْ فِيْهِ اَبَدًا হতে الظّٰلِمِيْنَ পর্যন্ত আয়াত অবতীর্ণ করেন।

মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক (রঃ) ইসনাদসহ এই রিওয়ায়াত করেছেন যে, নবী (সঃ) তাবূক হতে ফিরার পথে "যীরাওমান" নামক স্থানে অবতরণ করেন। মদীনা এখান থেকে কয়েক ঘন্টার পথ। নবী (সঃ) যখন তাবূকের সফরের জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণে ব্যস্ত ছিলেন সেই সময় মসজিদে যিরারের নির্মাণকারীরা তাঁর কাছে এসে বলেছিলঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমরা রুগ্ন, অভাবী এবং বর্ষা ও ঠাণ্ডার রাত্রে আগমনকারী মুসলিম জামাআতের উপকারার্থে একটি মসজিদ নির্মাণ করেছি। আমরা চাই যে, আপনি সেখানে তাশরীফ এনে আমাদেরকে নামায পড়াবেন।" তিনি তাদেরকে বলেছিলেনঃ "এখন তো সফর যাত্রায় খুবই ব্যস্ত রয়েছি।" অথবা তিনি বলেছিলেনঃ "ফিরে আসার পর ইনশাআল্লাহ আমি তোমাদের ওখানে যাবো এবং তোমাদের সাথে সালাত আদায় করব।" সুতরাং যখন তিনি তাবূক হতে মদীনায় ফিরবার পথে "যীরাওমান" নামক স্থানে অবতরণ করেন তখন তিনি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে ঐ মসজিদে যিরারের খবর পান। তিনি তখন বানু সালিমের ভাই মালিক ইবনে দাখশামকে ও মাআন ইবনে আদী অথবা তার ভাই আমির ইবনে আদীকে আহ্বান করেন। তিনি তাদেরকে বলেনঃ "তোমরা দু'জন ঐ যালিমদের মসজিদটির নিকট গমন কর এবং ওটাকে বিধ্বস্ত কর ও জ্বালিয়ে দাও।" তৎক্ষণাৎ তারা দু'জন বানু সালিম ইবনে আউফের নিকট আগমন করে। সে ছিল মালিক ইবনে দাখনানের গোত্রের লোক। মালিক মাআনকে বললোঃ "থামো, আমি আমার লোকদের নিকট থেকে

আগুন নিয়ে আসি।” এ কথা বলে মালিক নিজের লোকদের কাছে আসলো। গাছের একটি বড় ডাল নিল এবং তাতে আগুন ধরিয়ে দিলো। ওটা নিয়ে তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে পড়লো। তারা উভয়ে মসজিদে পৌঁছলো। মসজিদে তখন কাফিররা মওজুদ ছিল। ঐ দু’জন ঐ মসজিদকে জ্বালিয়ে দিলো। লোকেরা সেখান থেকে পালিয়ে গেল এবং ঐ মুনাফিকদের ব্যাপারে وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَّ كُفْرًا ... এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়ে গেল। যারা এই মসজিদটি নির্মাণ করেছিল তারা ছিল বারোজন। তারা হচ্ছে−(১) খুযাম ইবনে খালিদ, তারই বাড়ী থেকে মসজিদে শিকাকের রাস্তা বের হয়ে এসেছে। (২) বানু উমাইয়ার খাদেম সা’লাবা ইবনে হাতিব। (৩) মাতআব ইবনে কুশায়ের। (৪) আবূ হাবীবাহ্ ইবনে আজআর। (৫) আব্বাদ ইবনে হানীফ। (৬) হারিসা ইবনে আমির। (৭) মাজমা ইবনে হারিসা। (৮) যায়েদ ইবনে হারিসা। (৯) নাবতাল আল হারিসা। (১) নাজরা। (১১) বাজ্জাদ ইবনে ইমরান এবং (১২) আবূ লুবাবার গোত্রের খাদেম ওয়াদীআহ ইবনে সাবিত। যারা এ মসজিদটি নির্মাণ করেছিল তারা শপথ করে করে বলেছিলঃ “আমরা তো সৎ উদ্দেশ্যেই এর ভিত্তি স্থাপন করেছি। আমাদের লক্ষ্য শুধু জনগণের মঙ্গল কামনা।” কিন্তু আল্লাহ তা‘আলা বলছেনঃ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ অর্থাৎ “আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, নিশ্চয়ই তারা মিথ্যাবাদী।” অর্থাৎ তারা তাদের যে উদ্দেশ্য ও নিয়তের কথা বলছে তাতে তারা মিথ্যাবাদী। তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে শুধু মসজিদুল কুবার ক্ষতি সাধন করা, কুফরী ছড়িয়ে দেয়া, মুসলিমদের মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করা এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে গুপ্ত স্থান বানিয়ে রাখা, যেখানে তাদের পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হবে। ঐ লোকটি হচ্ছে আবূ আমির, সে পাপাচারী, যাকে রাহিব বা আবিদ বলা হতো, আল্লাহ তার উপর লা’নত বর্ষণ করুন।

আল্লাহ তা‘আলার উক্তিঃ لَا تَقُمْ فِيْهِ اَبَدًا আল্লাহ তা‘আলা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে ঐ মসজিদে সালাত পড়তে নিষেধ করে দিয়েছেন। সালাত না পড়ার মধ্যে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর অনুসারী এবং উম্মতও শামিল রয়েছে। সুতরাং মুসলিমদের প্রতিও এই গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে যে, তারাও যেন ঐ মসজিদে কখনো সালাত আদায় না করে। অতঃপর মসজিদে কুবায় সালাত পড়তে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। প্রথম থেকেই মসজিদে কুবার ভিত্তি আল্লাহ্‌ভীরুতার উপর স্থাপন করা হয়েছে। তাকওয়া বলা হয় আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ)-এর আনুগত্য করাকে। এখানে মুসলিমরা পরস্পর মিলিত হয় এবং ধর্মীয় পরামর্শ করে। এটা

হচ্ছে ইসলাম ও আহলে ইসলামের আশ্রয়স্থল। এ জন্যেই আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ

لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوٰى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُوْمَ فِيْهِ

অর্থাৎ "অবশ্য যে মসজিদের ভিত্তি প্রথম দিন হতেই তাক্ওয়ার উপর স্থাপিত হয়েছে তা এরই উপযোগী যে, তুমি তাতে সালাতের জন্যে দাঁড়াবে।" আর ইবাদতের হিসাব মসজিদে কুবার সাথে সম্পর্কযুক্ত। এ জন্যেই সহীহ হাদীসে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "মসজিদে কুবায় সালাত পড়া (সওয়াবের দিক দিয়ে) একটি উমরা আদায় করার মত।" আরো সহীহ হাদীসে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) মসজিদে কুবায় সওয়ার হয়েও আসতেন এবং পদব্রজেও আসতেন। বিশুদ্ধ হাদীসে আরো এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) যখন মসজিদে কুবা নির্মাণ করেন এবং ওর ভিত্তি স্থাপন করেন তখন তিনি সর্বপ্রথম আমর ইবনে আউফ গোত্রের নিকট অবস্থান করতে শুরু করেন এবং জিবরাঈল (আঃ) কিবলার দিক নির্ধারিত করে দেন। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক জ্ঞানের অধিকারী।

আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ فِيْهِ رِجَالٌ يُّحِبُّوْنَ أَنْ يَّتَطَهَّرُوْا -এ আয়াতটি আহলে কুবার ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। তিনি বলেন যে, তারা পানি দ্বারা পবিত্রতা লাভ করতো। সুতরাং তাদের প্রশংসায় এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।[১] ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, যখন فِيْهِ رِجَالٌ يُّحِبُّوْنَ أَنْ يَّتَطَهَّرُوْا -এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় তখন তিনি উওয়াইম ইবনে সাঈদা (রাঃ)-এর নিকট লোক পাঠিয়ে জিজ্ঞেস করেনঃ "তোমাদের এটা কোন পবিত্রতা যার কারণে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের প্রশংসা করেছেন?" উত্তরে তিনি বলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমাদের কোন পুরুষ বা স্ত্রী লোক যখন পায়খানার কাজ সেরে বেরিয়ে আসে তখন সে তার লিঙ্গ ও গুহ্যদ্বারকে পানি দ্বারা উত্তমরূপে ধৌত করে।" তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ "হ্যাঁ, (প্রশংসার কারণ) এটাই বটে।"

উওয়াইম ইবনে সাঈদা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) মসজিদে কুবায় তাঁদের নিকট আগমন করেন এবং জিজ্ঞেস করেনঃ "তোমাদের মসজিদের ঘটনায় তোমাদের পবিত্রতার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা অতি উত্তম ভাষায় প্রশংসা করেছেন। তোমরা যদদ্বারা পবিত্রতা লাভ করে থাকো সেটা কি?" তাঁরা

১. এ হাদীসটি সুনানে আবি দাউদে আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে।

উত্তরে বলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আল্লাহর শপথ, আমরা তো এটা ছাড়া আর কিছুই জানি না যে, ইয়াহূদীরা আমাদের প্রতিবেশী ছিল। তারা পায়খানার কাজ সেরে পানি দ্বারা তাদের গুহ্যদ্বার ধৌত করতো। সুতরাং আমরাও তদ্রূপ করে থাকি।"[১]

ইবনে খুযাইমা (রঃ) স্বীয় সহীহ গ্রন্থে লিখেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) উওয়াইম ইবনে সাঈদা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেনঃ "আল্লাহ তা'আলা তোমাদের কি প্রকারের পবিত্রতার কারণে তোমাদের প্রশংসা করেছেন?" তিনি জবাবে বলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! পানি দ্বারা আমরা আমাদের গুহ্যদ্বার ধৌত করে থাকি।" ইবনে জারীর (রঃ) বলেন যে,

فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ

এই আয়াতটি ঐ লোকদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয় যারা (পায়খানার কাজ সেরে) তাদের গুহ্যদ্বার পানি দ্বারা ধৌত করতো।

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রঃ) ইসনাদসহ বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) মসজিদে কুবাতে এসে (আহলে কুবাকে) বলেনঃ "আল্লাহ তা'আলা তোমাদের পবিত্রতার খুবই প্রশংসা করেছেন, সেটা কি?" উত্তরে তাঁরা বলেনঃ "আমরা তাওরাতে পানি দ্বারা ইসতিনজা করার নির্দেশ লিখিত পেয়েছি।" তাঁদের মধ্যে একজন বর্ণনাকারী ছিলেন আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ), যিনি আহলে তাওরাত ছিলেন।

সহীহ হাদীসে এসেছে যে, মদীনার মধ্যস্থলে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর যে মসজিদটি রয়েছে ওটাই হচ্ছে সেই মসজিদ যার ভিত্তি তাকওয়ার উপর স্থাপন করা হয়েছে। এটা সঠিক কথাও বটে। এই আয়াত এবং এই হাদীসের মধ্যে কোনই বৈপরীত্য নেই। কেননা প্রথম দিন থেকে মসজিদে কুবার ভিত্তি যখন তাকওয়ার উপর স্থাপন করা হয়েছে তখন মসজিদে নববীর ভিত্তি যে তাকওয়ার উপর স্থাপিত এটা তো বলাই বাহুল্য। এ জন্যেই মুসনাদে আহমাদে উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ "যে মসজিদের ভিত্তি তাকওয়ার উপর স্থাপন করা হয়েছে তা আমার এই মসজিদই বটে।"[২]

সাহল ইবনে সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর যুগে দু'টি লোকের মধ্যে ঐ মসজিদের ব্যাপারে মতানৈক্য হয় যার ভিত্তি

১. এ হাদীসটি ইমাম আহ্মাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।
২. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) একাকী বর্ণনা করেছেন।

তাকওয়ার উপর স্থাপিত। একজন বলে যে, এটা হচ্ছে মসজিদে নববী (সঃ)। আর অপরজন বলে যে, ওটা হচ্ছে মসজিদে কুবা। অতঃপর তারা উভয়ে নবী (সঃ)-এর কাছে এসে ঐ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) উত্তর দেনঃ "ওটা হচ্ছে আমার এই মসজিদ।"[১]

আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, দু'টি লোকের মধ্যে ঐ মসজিদ সম্পর্কে মতভেদ সৃষ্টি হয় যার ভিত্তি প্রথম দিন হতেই তাকওয়ার উপর স্থাপিত। একজন বলে যে, ওটা হচ্ছে মসজিদে কুবা এবং অপরজন বলে যে, ওটা হচ্ছে মসজিদে নববী। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "ওটা হচ্ছে আমার মসজিদ।"[২]

এর পরে এ বিষয়েরই আরো কয়েকটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। হামীদ আল খারাত আল মাদানী (রঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবূ সালমা ইবনে আবদির রহমান ইবনে আবি সাঈদ (রঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, মসজিদে তাকওয়ার ব্যাপারে আপনি আপনার পিতা থেকে কি শুনেছেন? তিনি উত্তরে (পিতার উদ্ধৃতি দিয়ে) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট আগমন করি এবং তাঁর কোন এক স্ত্রীর বাড়ীতে তাঁর কাছে প্রবেশ করি। অতঃপর তাঁকে জিজ্ঞেস করি, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! যে মসজিদের ভিত্তি তাকওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত সেটা কোথায়? তিনি তখন এক মুষ্টি কংকর উঠিয়ে নিয়ে যমীনে মেরে বললেনঃ "ওটা হচ্ছে এই মসজিদটি (অর্থাৎ মসজিদে নববী)।" ইমাম মুসলিম (রঃ) ইসনাদসহ হামীদ আল খারাত (রঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, পূর্ববর্তী ও পরবর্তী গুরুজনদের একটি দলের এটাই উক্তি যে, ওটা মসজিদে নববী। উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ), তাঁর পুত্র আব্দুল্লাহ (রাঃ), যায়েদ ইবনে সাবিত (রাঃ) এবং সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব (রঃ) হতেও এটাই বর্ণিত আছে। ইবনে জারীরও (রঃ) এটাকে পছন্দ করেছেন। لَمَسْجِدٌ اُسِّسَ... -এই আয়াতটি এ কথার দলীল যে, যে প্রাচীন মসজিদগুলোর প্রথম ভিত্তি এক ও লা-শারিক আল্লাহর ইবাদতের উপর প্রতিষ্ঠিত সেগুলোতে সালাত পড়া মুসতাহাব। এই মুসতাহাব হওয়ারও দলীল এই যে, জামাআতে সালেহীন ও ইবাদে আমেলীনের সাথে সালাত পড়া উচিত এবং যথানিয়মে পূর্ণ মাত্রায় অযু করা দরকার, আর সালাতে ময়লা ও অপবিত্র কাপড় পরিধান না করা উচিত।

১. এ হাদীসটিও ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।
২. মুসনাদে আহমাদেই এই হাদীসও বর্ণিত হয়েছে।

ইমাম আহমাদ (রঃ) ইসনাদসহ বর্ণনা করেছেন যে, একদা রাসূলুল্লাহ (সঃ) ফজরের সালাত পড়ান এবং তাতে সূরায়ে "রূম" পাঠ করেন। পাঠে তাঁর কিছু সন্দেহ হয়। সালাত শেষে তিনি বলেনঃ "আমার কুরআন পাঠে কিছু বিশৃংখলা সৃষ্টি হয়েছিল। দেখো! তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ এমনও রয়েছে যে আমার সাথে সালাত আদায় করে, কিন্তু উত্তমরূপে অযু করে না। সুতরাং যে আমাদের সাথে সালাত পড়তে চায় তার উচিত উত্তমরূপে অযু করার ব্যাপারে কোন ত্রুটি না করা।"

যুলকিলা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে সালাত পড়েন, তখন তিনি তাঁকে এই হিদায়াতই করেন। এটা এরই প্রমাণ যে, উত্তমরূপে অযু করা ইবাদতে দাঁড়ানো অবস্থাকে সহজ করে তোলে এবং ইবাদতের পরিপূর্ণতায় সহায়ক হয়।

আবূল আলিয়া (রঃ) وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ আল্লাহ পাকের এই উক্তির ব্যাপারে বলেন যে, পানি দ্বারা পবিত্রতা লাভ করা তো অতি উত্তম কাজ বটেই, তবে আল্লাহ তা'আলা যাঁদের পবিত্রতার প্রশংসা করেছেন তাঁরা হচ্ছেন ঐসব লোক যাঁরা নিজেদেরকে গুনাহ থেকে পবিত্র রেখেছেন। আ'মাশ (রঃ) বলেন যে, এই তাহারাত দ্বারা গুনাহ থেকে তাওবা করা এবং শির্ক থেকে পবিত্র থাকা বুঝানো হয়েছে। হাদীসে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) আহ্লে কুবাকে বলেনঃ "আল্লাহ তা'আলা যে তোমাদের তাহারাতের প্রশংসা করেছেন তা কিরূপ?" তাঁরা উত্তরে বলেনঃ "আমরা পানি দ্বারাই ইসতিনজা করে থাকি।"

হাফিজ আবূ বকর বায্যায (রঃ) ইসনাদসহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, এই আয়াতটি আহ্লে কুবার ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। যখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) আহলে কুবাকে জিজ্ঞেস করেনঃ "তোমাদের তাহারাত কিরূপ?" তাঁরা উত্তরে বলেনঃ "প্রথমে আমরা ঢিলা ব্যবহার করি, তারপর পানি দ্বারা ধৌত করি।" এটা বায্যায্ (রঃ) রিওয়ায়াত করেছেন। অতঃপর তিনি বলেনঃ "এটাকে শুধু মুহাম্মাদ ইবনে আবদিল আযীয এবং তাঁর থেকে তাঁর পুত্র বর্ণনা করেছেন।" আমি বলি, আমি এ ব্যাখ্যা এখানে এই জন্যেই করলাম যে, এটা ফকীহ্দের নিকট মাশহূর হলেও পরবর্তী অধিকাংশ মুহাদ্দিস এটাকে সুপরিচিত হিসাবে স্বীকার করেন না। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

১০৯। তবে কি এমন ব্যক্তি উত্তম, যে ব্যক্তি স্বীয় ইমারতের ভিত্তি আল্লাহর ভীতির উপর এবং তাঁর সন্তুষ্টির উপর স্থাপন করেছে অথবা সেই ব্যক্তি, যে স্বীয় ইমারতের ভিত্তি স্থাপন করেছে কোন গহ্বরের কিনারায়, যা ধ্বসে পড়ার উপক্রম, অতঃপর তা তাকে নিয়ে জাহান্নামের আগুনে পতিত হয়। আর আল্লাহ এমন যালিমদেরকে (ধর্মের) জ্ঞান দান করেন না।

١٠٩- أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ○

১১০। তাদের এই ইমারত যা তারা নির্মাণ করেছে, তা সদা তাদের মনে খট্‌কা সৃষ্টি করতে থাকবে, হ্যাঁ, যদি তাদের (সেই) অন্তরই ধ্বংস হয়ে যায়, তবে তো কথাই নাই, আর আল্লাহ হচ্ছেন মহাজ্ঞানী ও বড় বিজ্ঞানময়।

١١٠- لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ○ ع

আল্লাহ তা'আলা বলছেন যে, যারা মসজিদের ভিত্তি তাকওয়া ও আল্লাহর সন্তুষ্টির উপর স্থাপন করেছে, আর যারা মসজিদে যিরার ও মসজিদে কুফর বানিয়েছে এবং মুমিনদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করার ইচ্ছা করেছে ও আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (সঃ)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে ঐ মসজিদকে আশ্রয়স্থল করেছে তারা কখনো সমান হতে পারে না। ঐ লোকগুলো তো মসজিদে যিরারের ভিত্তি যেন একটি গহ্বরের কিনারার উপর স্থাপন করেছে, যা ধ্বসে পড়ার উপক্রম, অতঃপর তা তাকে নিয়ে জাহান্নামের আগুনে পতিত হয়েছে। যারা সীমালংঘন করে আল্লাহ তাদেরকে সুপথ প্রদর্শন করেন না। অর্থাৎ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের আমলকে সংশোধন করেন না।

জাবির ইবনে আবদিল্লাহ (রাঃ) বলেনঃ "আমি মসজিদে যিরারটি দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নির্দেশক্রমে যখন তাতে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয় তখন তার থেকে ধোঁয়া বের হচ্ছিল।" ইবনে জুরাইজ (রঃ) বলেনঃ "আমাদের কাছে বর্ণনা করা হয়েছে যে, লোকেরা এক জায়গায় গর্ত খনন করে এবং সেখান থেকে তারা ধোঁয়া বের হতে দেখে।" কাতাদাও (রঃ) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। খালাফ ইবনে ইয়াসীন আল কূফী (রঃ) বলেনঃ "আমি মুনাফিকদের ঐ মসজিদটি দেখেছি যার বর্ণনা আল্লাহ কুরআনে করেছেন, তাতে একটি ছিদ্র রয়েছে যার মধ্য দিয়ে ধূম্র বের হচ্ছে। সেটা আজ আবর্জনা ফেলার জায়গায় পরিণত হয়েছে।" ইবনে জারীর (রঃ) এটা বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ তা'আলার উক্তি ঃ

لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ

অর্থাৎ ঐ ইমারত যা তারা নির্মাণ করেছে, তা সর্বদা তাদের মনে খটকা সৃষ্টি করতে থাকবে। এর কারণে তাদের অন্তরে নিফাকের বীজ বপন করার কাজ চলতে থাকবে। যেমন গো-বৎস পূজারীদের অন্তরে ওর মহব্বত সৃষ্টি হয়েছিল।

إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ অর্থাৎ অবশ্যই যদি তাদের সেই অন্তরই ধ্বংস হয়ে যায় তবে তো কোন কথাই থাকে না। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদের আমলগুলো সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল এবং তিনি ভাল ও মন্দের প্রতিদান দেয়ার ব্যাপারে মহাজ্ঞানী ও বড় বিজ্ঞানময়।

১১১। নিঃসন্দেহে আল্লাহ মুমিনদের নিকট থেকে তাদের প্রাণ ও তাদের ধন-সম্পদ সমূহকে এর বিনিময়ে ক্রয় করে নিয়েছেন যে, তাদের জন্যে জান্নাত রয়েছে, (অর্থাৎ) তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে, যাতে তারা (কখনও) হত্যা করে এবং (কখনও) নিহত হয়ে যায়, এর (অর্থাৎ এই যুদ্ধের) দরুন (জান্নাত প্রদানের) সত্য অঙ্গীকার করা হয়েছে তাওরাতে, ইঞ্জীলে এবং

١١١- إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ قف وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَىٰ

بِعَهْدِهٖ مِنَ اللّٰهِ فَاسْتَبْشِرُوْا بِبَيْعِكُمُ الَّذِيْ بَايَعْتُمْ بِهٖ ؕ وَ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ○

কুরআনে; আর কে আছে নিজের অঙ্গীকার পালনকারী আল্লাহ অপেক্ষা অধিক? অতএব তোমরা আনন্দ করতে থাকো তোমাদের এই ক্রয়-বিক্রয়ের উপর, যা তোমরা সম্পাদন করেছো, আর এটা হচ্ছে বিরাট সফলতা।

এই আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, তিনি তাঁর মুমিন বান্দাদেরকে তাঁর পথে ব্যয়কৃত জান ও মালের বিনিময় হিসেবে জান্নাত প্রদান করবেন। আর এটা বিনিময় নয় বরং তাঁর ফয্‌ল, করম ও অনুগ্রহ। কেননা, বান্দাদের সাধ্যে যা ছিল তা তারা করেছে। এখন তিনি তাঁর অনুগত বান্দাদের জন্যে কোন বিনিময় বা প্রতিদান ঠিক করলে জান্নাতই ঠিক করবেন। এ জন্যেই হাসান বসরী (রঃ) এবং কাতাদা (রঃ) বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা যখন তাঁর বান্দাদের সাথে বেচাকেনা করলেন তখন তিনি তাদের খিদমতের বিরাট ও উচ্চমূল্য প্রদান করলেন। আর শামর ইবনে আতিয়্যা (রঃ) বলেন যে, এমন কোন মুসলিম নেই যার স্কন্ধে আল্লাহর অঙ্গীকার ও চুক্তি নেই, যা সে পূর্ণ করে এবং যার উপর সে মৃত্যুবরণ করে। অতঃপর তিনি উপরোক্ত আয়াতটি পাঠ করেন। এ জন্যেই বলা হয় যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদ করার উদ্দেশ্যে বের হলো সে যেন আল্লাহর সাথে বেচাকেনা করলো এবং আল্লাহ তার সাথে এই আক্‌দ কবূল করে নিলেন ও তা পূর্ণ করলেন।

মুহাম্মাদ ইবনে কা'ব আল কারাযী (রঃ) প্রমুখ গুরুজন বলেন যে, আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাঃ) লাইলাতুল আকাবার সময় বলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আপনি আল্লাহর জন্যে এবং আপনার জন্যেও যা ইচ্ছা হয় আমাদের উপর শর্ত আরোপ করুন।" তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "আল্লাহ সম্পর্কে আমি তোমাদের উপর এই শর্ত আরোপ করছি যে, তোমরা তাঁর খাঁটি বান্দা হয়ে থাকবে, তাঁর ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে অন্য কাউকেও শরীক করবে না। আর আমার সম্পর্কে তোমাদের উপর এই শর্ত আরোপ করছি যে, যেসব বিষয় থেকে তোমরা নিজেদের জান ও মালকে রক্ষা করে থাকো সেই সব বিষয়ে আমার ব্যাপারেও শুভাকাঙ্ক্ষী হয়ে থাকবে।" তখন তিনি বলেনঃ "এর বিনিময়ে আমরা কি পাবো?" উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "এর বিনিময় হচ্ছে

জান্নাত।” তাঁর এ কথা শুনে প্রশ্নকারীরা বললেনঃ “এটা তো বড় লাভের ব্যবসা। আমরা অঙ্গীকার ভঙ্গ করবো না এবং আমাদের সাথে কৃত অঙ্গীকারও ভঙ্গ করা হবে না।” তখন إِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ -এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

আল্লাহ তা'আলার উক্তিঃ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ অর্থাৎ তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে, অতঃপর হত্যা করে ও নিহত হয়। সাওয়াবের দিক দিয়ে দুটোই সমান হয়। তারা হত্যা করে গাযী হোক অথবা নিহত হয়ে শহীদ হোক। সর্বাবস্থাতেই তাদের জন্যে জান্নাত অবধারিত রয়েছে। এ জন্যেই সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে এসেছে– “যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে বের হয়, আর এই বের হওয়ার পেছনে একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে তাঁর পথে জিহাদ করা এবং তাঁর রাসূলদের সত্যতা প্রমাণ করা, এ অবস্থাতেই তার মৃত্যু হয়, আল্লাহ তার যিম্মাদার যে, তিনি তাকে জান্নাতে প্রবিষ্ট করাবেন। আর যদি মারা না যায় তবে আল্লাহ এই দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন যে, সে যেখান থেকে বের হয়েছে সেখানে তাকে তার লাভকৃত গনীমতের মালসহ পৌঁছিয়ে দিবেন।”

وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِى التَّوْرٰىةِ وَالْاِنْجِيْلِ وَالْقُرْاٰنِ আল্লাহ পাকের এই উক্তিটি তাঁর ওয়াদার গুরুত্ব হিসেবে করা হয়েছে। বলা হচ্ছে যে, তিনি নিজের পবিত্র সত্তার উপর এটা ফরয করে নিয়েছেন এবং তাঁর রাসূলদের উপর তাঁর এই ওয়াদার অহীও পাঠিয়েছেন, যা মূসা (আঃ)-এর উপর অবতারিত কিতাব তাওরাতে লিপিবদ্ধ আছে এবং ঈসা (আঃ)-এর উপর অবতারিত কিতাব ইঞ্জীলেও লিখিত রয়েছে, আর মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর উপর অবতারিত কিতাব আল কুরআনের মধ্যে লিখা আছে। তাঁদের সবারই উপর আল্লাহর দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক।

মহান আল্লাহর উক্তিঃ وَمَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ مِنَ اللّٰهِ অর্থাৎ আল্লাহ অপেক্ষা স্বীয় ওয়াদা অধিক পূর্ণকারী আর কে হতে পারে? কেননা, তিনি কখনো ওয়াদা ভঙ্গ করেন না। যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেছেনঃ وَمَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ حَدِيْثًا অর্থাৎ “কথায় আল্লাহ অপেক্ষা অধিক সত্যবাদী আর কে আছে?” (৪ঃ ৮৭) আর এক স্থানে তিনি বলেছেনঃ وَمَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ قِيْلًا অর্থাৎ “কথা বলায় আল্লাহ অপেক্ষা অধিক সত্যবাদী আর কে হতে পারে?” (৪ঃ ১২২) এ জন্যেই ইরশাদ হচ্ছে–আল্লাহর সাথে তোমরা যে বেচা-কেনা করেছো এতে তোমরা খুশী হয়ে যাও এবং এই সফলতা হচ্ছে বিরাট সফলতা, যদি তোমরাও নিজেদের অঙ্গীকার পূর্ণ কর।

১১২। তারা হচ্ছে তাওবাকারী, ইবাদতকারী, শোকরগুযার, সিয়াম পালনকারী, রুকু ও সিজদাকারী, সৎ বিষয় শিক্ষা প্রদানকারী এবং মন্দ বিষয়ে বাধা প্রদানকারী, আল্লাহর সীমাসমূহের (অর্থাৎ আহকামের) সংরক্ষণকারী; আর তুমি এমন (অর্থাৎ উক্ত গুণে গুণান্বিত) মুমিনদেরকে সুসংবাদ শুনিয়ে দাও।

١١٢- اَلتَّائِبُوْنَ الْعٰبِدُوْنَ الْحٰمِدُوْنَ السَّائِحُوْنَ الرّٰكِعُوْنَ السّٰجِدُوْنَ الْاٰمِرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّاهُوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحٰفِظُوْنَ لِحُدُوْدِ اللّٰهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ○

এই পবিত্র আয়াতটি ঐ মুমিনদের প্রশংসায় অবতীর্ণ হয়েছে যাদের জান ও মালকে আল্লাহ তা'আলা তাদের এই উত্তম গুণাবলীর বিনিময়ে ক্রয় করে নিয়েছেন। তারা সমস্ত পাপ ও নির্লজ্জতাপূর্ণ কার্য থেকে বিরত থাকে, নিজেদের প্রতিপালকের ইবাদতের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং নিজেদের কথা ও কাজের উপর কড়া দৃষ্টি রাখে। কথার মধ্যে বিশিষ্ট বিষয় হচ্ছে আল্লাহর প্রশংসা। এ জন্যেই মহান আল্লাহ اَلْحَامِدُوْنَ বলেছেন। আর আমল ও কাজের দিক দিয়ে উত্তম কাজ হচ্ছে সিয়াম। সিয়াম বা রোযা বলা হয় পানাহার, স্ত্রী-সহবাস হতে বিরত থাকাকে। আর سَيَاحَتْ দ্বারা এই সিয়ামকেই বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা اَلسَّائِحُوْنَ বলেছেন। যেমন তিনি سَائِحَاتٍ শব্দ দ্বারা নবী (সঃ)-এর সহধর্মিণীদের প্রশংসা করেছেন। এই سَائِحَاتٍ দ্বারা صَائِمَاتٍ ভাবার্থ নেয়া হয়েছে। অনুরূপভাবে رُكُوْع ও سُجُوْد দ্বারা صَلٰوة সালাত বা নামায অর্থ নেয়া হয়েছে এবং رَاكِعُوْنَ ও سَاجِدُوْنَ বলা হয়েছে। তারা শুধু নিজেদের উপকারের প্রতি লক্ষ্য রেখেই ইবাদত করে না, বরং আল্লাহর অন্যান্য বান্দাদেরকেও সুপথ প্রদর্শন করতঃ "সৎ কাজের আদেশ ও মন্দ কাজ হতে নিষেধ"-এর উপর আমল করে উপকার পৌঁছিয়ে থাকে। কোন্ কাজ করা উচিত এবং কোন্ কাজ পরিত্যাগ করা ওয়াজিব এসব কথা বাতলিয়ে থাকে আর জ্ঞান ও আমল উভয় প্রকারে হালাল ও হারামের ব্যাপারে আল্লাহর সীমা সংরক্ষণের প্রতি তারা পূর্ণ দৃষ্টি রাখে। সুতরাং তারা আল্লাহর ইবাদত ও সৃষ্টজীবের মঙ্গল কামনা–এই উভয় প্রকারের ইবাদতে

পতাকাধারী। এ জন্যেই মহান প্রতিপালক আল্লাহ বলেন—মুমিনদেরকে শুভ সংবাদ দিয়ে দাও, কেননা ও দুটোর সমষ্টির নামই হচ্ছে ঈমান এবং পূর্ণমাত্রায় সৌভাগ্য তো তারাই লাভ করেছে যারা এই দুটো গুণে গুণান্বিত।

سَيَاحَت দ্বারা صِيَام বা রোযাকে বুঝানো হয়েছে।

সুফিয়ান সাওরী (রঃ) বলেন যে, سَائِحُوْنَ -এর অর্থ হচ্ছে صَائِمُوْنَ বা সিয়াম পালনকারীগণ। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, আল্লাহ পাক কুরআন কারীমের মধ্যে যেখানেই سَيَاحَت শব্দ ব্যবহার করেছেন সেখানেই উদ্দেশ্য হচ্ছে صِيَام বা রোযা। যহ্হাকও (রঃ) এ কথাই বলেন। আয়েশা (রাঃ) বলেন যে, এই উম্মতের سَيَاحَت হচ্ছে রমযানের সিয়াম পালন করা। মুজাহিদ (রঃ), সাঈদ (রঃ), আতা (রঃ), আব্দুর রহমান (রঃ), যহ্হাক (রঃ) এবং সুফইয়ান ইবনে উয়াইনা (রঃ) সবাই এই খেয়ালই রাখেন যে, سَائِحِيْنَ দ্বারা রোযাদারদেরকে বুঝানো হয়েছে। হাসান বসরী (রঃ) বলেন যে, سَائِحُوْنَ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে রমযানের রোযাদারগণ। আবূ আমর আল আবদীও (রঃ) এ কথাই বলেন। একটি মারফূ' হাদীসেও এটাই এসেছে। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "سَائِحُوْنَ সিয়ামকারী লোকদেরকে বলা হয়।"[১] উবাইদ ইবনে উমাইর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, নবী (সঃ)-কে سَائِحِيْنَ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেনঃ "তারা হচ্ছে সিয়ামকারী।"[২] এই উক্তিও আছে যে, سَيَاحَت দ্বারা জিহাদকে বুঝানো হয়েছে। ইমাম আবূ দাঊদ (রঃ) স্বীয় কিতাব সুনানের মধ্যে আবূ উমামা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, একটি লোক রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট আবেদন করেঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমাকে 'সিয়াহাত'-এর অনুমতি দিন!" তখন নবী (সঃ) বলেনঃ "আমার উম্মতের 'সিয়াহাত' হচ্ছে আল্লাহর পথে জিহাদ।"

আম্মারা ইবনে গাযিয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট سَيَاحَت সম্পর্কে আলোচনা করা হলে তিনি বলেনঃ "আল্লাহ তা'আলা আমাদের জন্যে আল্লাহর পথে জিহাদ করাকে ও প্রত্যেক উঁচু স্থানের উপর তাকবীর পাঠ করাকে سَيَاحَت বানিয়েছেন।" ইকরামা (রঃ)-এর খেয়াল এই যে, এর দ্বারা বিদ্যা অন্বেষণকারীদেরকে বুঝানো হয়েছে। আর আব্দুর রহমান

১. এ হাদীসটি ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন। এটা মাওকূফ, অত্যধিক বিশুদ্ধ।

২. এ হাদীসটি 'মুরসাল' এবং খুবই উত্তম। আর এটা বিশুদ্ধ ও প্রসিদ্ধতম উক্তি।

ইবনে যায়েদ ইবনে আসলাম (রঃ) বলেন যে, এর দ্বারা মুহাজিরদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। এই উক্তি দু'টি ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। এখানে এটা মনে রাখার বিষয় যে, এই স্থলে 'সিয়াহাত' দ্বারা ঐ অর্থ বুঝানো হয়নি যা কোন কোন দরবেশ ও বনবাসী প্রকৃতির লোক বুঝেছেন যে, এর অর্থ হচ্ছে ভূ-পৃষ্ঠে একাকী সফর করা এবং ঐ লোকগুলোর উদ্দেশ্য, যারা পাহাড়-পর্বতে, খাল-খন্দকে এবং বন-জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায় ও জনপদ থেকে পলায়ন করে। কেননা এরূপ করা শরীয়ত সম্মত নয়। তবে হ্যাঁ, যদি ফিৎনার যুগ হয় এবং দ্বীনের মধ্যে অসঙ্গতিপূর্ণ ও চাঞ্চল্যকর অবস্থার সৃষ্টি হয় তাহলে সেটা অন্য কথা। যেমন সহীহ বুখারীতে আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "অচিরেই এমন এক যামানা আসবে যখন কোন ব্যক্তির সর্বোত্তম মাল হবে তার বকরীগুলো, যেগুলোকে সে পাহাড়-পর্বতে ও বৃষ্টিবর্ষণের স্থানে চরিয়ে নিয়ে বেড়াবে এবং ফিৎনা হতে বাঁচার উদ্দেশ্যে নিজের দ্বীন নিয়ে পালাতে থাকবে।"

الْحٰفِظُوْنَ لِحُدُوْدِ اللّٰهِ দ্বারা আল্লাহর আনুগত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিদেরকে বুঝানো হয়েছে। আর হাসান বসরী (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, এর দ্বারা ঐ সব লোককে বুঝানো হয়েছে যারা আল্লাহর আদেশ ও নিষেধ যথাযথভাবে পালন করে এবং তার উপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাকে।

١١٣- مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْ يَّسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشْرِكِيْنَ وَلَوْ كَانُوْٓا اُولِيْ قُرْبٰى مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُمْ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ○

১১৩। নবী ও অন্যান্য মুমিনদের জন্যে জায়েয নয় যে, তারা মুশরিকদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করে, যদিও তারা আত্মীয়ই হোক না কেন, একথা প্রকাশ হওয়ার পর যে তারা জাহান্নামের অধিবাসী।

١١٤- وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ اِبْرٰهِيْمَ لِاَبِيْهِ اِلَّا عَنْ

১১৪। আর ইবরাহীমের নিজ পিতার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করা, তা তো শুধু সেই ওয়াদার কারণে ছিল, যে ওয়াদা সে তার সাথে করেছিলো। অতঃপর যখন তার নিকট এ বিষয় প্রকাশ পেলো যে, সে

مَّوْعِدَةٍ وَّعَدَهَآ اِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهٗٓ اَنَّهٗ عَدُوٌّ لِّلّٰهِ تَبَرَّاَ مِنْهُ اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ لَاَوَّاهٌ حَلِيْمٌ ○

(পিতা) আল্লাহর দুশমন, তখন সে তা হতে সম্পূর্ণরূপে নির্লিপ্ত হয়ে গেল, বাস্তবিকই ইবরাহীম ছিল অতিশয় কোমল হৃদয়, সহনশীল।

মুসনাদে আহমাদে ইবনুল মুসাইয়াব (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, আবূ তালিব যখন মৃত্যুমুখে পতিত হচ্ছিলেন, সেই সময় নবী (সঃ) তাঁর কাছে গমন করেন। ঐ সময় তাঁর কছে আবূ জাহেল ও আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই উমাইয়া উপস্থিত ছিল। রাসূলুল্লাহ (স) বললেনঃ "হে চাচা! আপনি 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পাঠ করুন! এই বাক্যটিকেই আমি আপনার মার্জনার পক্ষে আল্লাহর নিকট হুজ্জত হিসেবে পেশ করবো।" তখন আবূ জাহেল এবং আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই উমাইয়া বললোঃ "হে আবূ তালিব! তুমি আব্দুল মুত্তালিবের মিল্লাত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে?" আবূ তালিব তখন বললেনঃ "আমি আব্দুল মুত্তালিবের মিল্লাতের উপরই রয়ে গেলাম।" এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে বললেনঃ "আমি ঐ পর্যন্ত আপনার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবো যে পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা আমাকে নিষেধ না করেন।" আল্লাহ তা'আলা তখন مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ.. -এ আয়াতটি অবতীর্ণ করেন। অর্থাৎ "নবী (সঃ) ও মুমিনদের জন্যে এটা জায়েয নয় যে, তারা মুশরিকদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করে।" اِنَّكَ لَا تَهْدِيْ مَنْ اَحْبَبْتَ.... -এই আয়াতটিও এই সম্পর্কেই নাযিল হয়। অর্থাৎ "হে নবী (সঃ)! নিশ্চয়ই তুমি যাকে ভালবাস তাকে তুমি হিদায়াত করতে পার না, বরং আল্লাহই যাকে চান তাকে তিনি হিদায়াত করে থাকেন।" (২৮ঃ ৫৬)

আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন-আমি একজন লোককে দেখলাম যে, তার মুশরিক পিতা-মাতার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করছে। আমি তাকে বললাম, তুমি তোমার মুশরিক পিতা-মাতার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করছো! সে তখন বললোঃ "ইবরাহীম (আঃ) কি তাঁর মুশরিক পিতার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করেনি?" আমি ঘটনাটি নবী (সঃ)-এর সামনে বর্ণনা করলাম। তখন مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ..... -এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

لِاَبِيْهِ-এর পরে لَمَّا مَاتَ -এই শব্দগুলোও বলা হয়েছে। কিন্তু আমি বলতে পারি না যে, সুফিয়ান (রঃ) স্বয়ং বলেছেন, কিংবা ইসরাঈল (রঃ) বলেছেন, অথবা স্বয়ং হাদীসেই এই শব্দগুলো রয়েছে। আমি বলি- এটা প্রমাণিত যে, এই শব্দগুলো মুজাহিদ (রঃ) বলেছেন।

বুরাইদা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা এক সফরে নবী (সঃ)-এর সাথে ছিলাম। আমরা এক জায়গায় অবতরণ করি। আমরা প্রায় এক হাজার আরোহী ছিলাম। রাসূলুল্লাহ (সঃ) সেখানে দু'রাকাআত সালাত পড়েন। অতঃপর তিনি আমাদের দিকে মুখ ঘুরিয়ে বসেন। আমরা দেখলাম যে, তাঁর চক্ষু দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছে। উমার (রাঃ) তাঁর কাছে এসে বলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমার পিতা-মাতা আপনার উপর উৎসর্গিত হোন! আপনার কাঁদার কারণ কি?" তিনি উত্তরে বললেনঃ "আমি আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করেছিলাম যে, আমাকে যেন আমার মায়ের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করার অনুমতি দেয়া হয়। কিন্তু তিনি আমাকে অনুমতি দেননি। তখন আগুনের ভয়ে আমার মায়ের প্রতি আমার করুণার উদ্রেক হলো এবং এ কারণেই আমার চক্ষুদ্বয় অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠলো। ইতিপূর্বে আমি তোমাদেরকে তিনটি জিনিস থেকে নিষেধ করেছিলাম। তোমাদেরকে আমি কবর-যিয়ারত হতে নিষেধ করেছিলাম। কিন্তু এখন থেকে তোমরা কবর যিয়ারত করতে পার; উদ্দেশ্য শুধু এটাই যে, এর ফলে তোমাদের মৃত্যুর কথা স্মরণ হবে এবং তোমরা কল্যাণের দিকে ঝুঁকে পড়বে। ইতিপূর্বে আমি তোমাদেরকে কুরবানীর গোশত তিন দিনের বেশী জমা রাখতে নিষেধ করেছিলাম। এখন হতে তোমরা যত ইচ্ছা খেতে পার এবং যত দিন ইচ্ছা জমা করে রাখতে পার। ইতিপূর্বে আমি তোমাদেরকে চারটি পান-পাত্র থেকে নিষেধ করেছিলাম। কিন্তু এখন থেকে তোমরা যে কোন পাত্র থেকেই পান করতে পার। কিন্তু কোন নেশা আনয়নকারী জিনিস পান করো না।[১]

বুরাইদা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সঃ) যখন মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হন তখন তিনি পথে একটি কবরের পার্শ্বে এসে বসে পড়েন এবং কবরকে সম্বোধন করতে শুরু করেন। অতঃপর তিনি কাঁদতে কাঁদতে উঠে পড়েন। তখন আমরা বলি, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আপনি যা করেছেন তা আমরা দেখেছি। তিনি বলেনঃ "আমি আল্লাহ তা'আলার নিকট আমার মায়ের কবর যিয়ারত করার অনুমতি চেয়েছিলাম। তিনি আমাকে অনুমতি দিয়েছেন। অতঃপর আমি তাঁর জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করার অনুমতি চাইলে আমাকে অনুমতি দেয়া হয়নি।" সেই দিন তিনি এতো বেশী কেঁদেছিলেন যে, ইতিপূর্বে আমরা তাঁকে কখনো এতো কাঁদতে দেখিনি।[২]

---

১. এ হাদীসটি ইমাম মুসলিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

২. এ হাদীসটি ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সঃ) গোরস্থানের দিকে বেরিয়ে যান। আমরাও তাঁর অনুসরণ করি। তিনি একটি কবরের পাশে বসে পড়েন। অতঃপর তিনি দীর্ঘক্ষণ ধরে মুনাজাত করতে থাকেন। তারপর তিনি কাঁদতে শুরু করেন। তাঁকে কাঁদতে দেখে আমরাও কাঁদতে থাকি। উমার ইবনে খাত্তাব (রাঃ) তাঁর কাছে যান। তিনি উমার (রাঃ)-কে এবং আমাদেরকে ডেকে জিজ্ঞেস করেনঃ "তোমরা কাঁদছিলে কেন?" আমরা উত্তরে বলি, আপনাকে কাঁদতে দেখে আমাদেরও কান্না এসে যায়। তিনি তখন বলেনঃ "আমি যে কবরের নিকট বসেছিলাম সেটা আমার মায়ের কবর। আমি আল্লাহ তা'আলার নিকট এই কবর যিয়ারত করার অনুমতি চেয়েছিলাম। তিনি আমাকে অনুমতি দান করেন।"[১] এ হাদীসটি অন্যভাবেও বর্ণিত হয়েছে। ইবনে মাসঊদ (রাঃ)-এর হাদীসটিরই প্রায় অনুরূপ। তবে তাতে এ কথাও রয়েছে– "আমি আমেনার জন্যে দুআ' করার অনুমতি চাই। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা অনুমতি দেননি এবং তিনি উপরোক্ত আয়াত অবতীর্ণ করেন। সুতরাং মাতার জন্যে ছেলের মন যেমন দুঃখিত হয় তদ্রূপ আমার মনও দুঃখিত হয়েছে। আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করা থেকে নিষেধ করেছিলাম। কিন্তু এখন হতে তোমরা কবর যিয়ারত করবে। কেননা, এটা আখিরাতকে স্মরণ করিয়ে দেয়।"

ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) যখন তাবূকের যুদ্ধ হতে ফিরে আসেন ও উমরার নিয়ত করেন এবং যখন তিনি 'গাসফান' ঘাঁটি হতে অবতরণ করেন তখন স্বীয় সাহাবীদেরকে নির্দেশ দেনঃ "তোমরা আকাবায় বিশ্রাম কর, আমি তোমাদের কাছে (কিছুক্ষণের মধ্যেই) ফিরে আসছি।" তিনি সেখানে তাঁর মায়ের কবরের পার্শ্বে অবস্থান করলেন। সেখানে তিনি অনেকক্ষণ স্বীয় প্রতিপালকের নিকট মুনাজাত করলেন। তারপর তিনি কাঁদতে লাগলেন এবং বহুক্ষণ ধরে কাঁদলেন। তাঁকে কাঁদতে দেখে লোকেরাও কাঁদতে লাগলেন এবং বললেনঃ "এখানে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে কোন জিনিস কাঁদালো? তাঁর উম্মতের ব্যাপারে এমন নতুন কিছু কি ঘটেছে যা তিনি সহ্য করতে পারছেন না?" রাসূলুল্লাহ (সঃ) লোকদেরকে কাঁদতে দেখে তাঁদের কাছে আসলেন এবং জিজ্ঞেস করলেনঃ "তোমরা কাঁদছো কেন?" তাঁরা উত্তরে বললেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আপনাকে কাঁদতে দেখে আমাদেরও কান্না এসে গেল। আমাদের ধারণা হলো যে, আপনার উম্মতের ব্যাপারে হয়তো এমন নতুন কিছু ঘটেছে যা

১. এই হাদীসটি ইবনে আবি হাতিম (রঃ) তাঁর তাফসীরে বর্ণনা করেছেন।

আপনি সহ্য করতে পারছেন না।” তিনি তখন বললেন, না, না, এটা একটা সাধারণ ব্যাপার ছিল। ঘটনা এই যে, আমি আমার মায়ের কবরের পার্শ্বে অবস্থান করছিলাম এবং কিয়ামতের দিন তাঁর শাফাআতের জন্যে আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করেছিলাম। কিন্তু তিনি অনুমতি দিতে অস্বীকার করেছেন। এতে আমার অন্তর ফেটে যায়। কেননা তিনি আমার মা। তাই, আমি কাঁদছিলাম। এরপর জিবরাঈল (আঃ) আমার নিকট আগমন করেন এবং বলেন, ইবরাহীম (আঃ)-এর তাঁর পিতার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা শুধু এ কারণেই ছিল যে, তিনি তাঁর পিতার সাথে অঙ্গীকার করে বলেছিলেনঃ “আমি আপনার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করবো। কিন্তু যখন তিনি জানতে পারলেন যে, সে আল্লাহর শত্রু তখন তিনি তা থেকে বিরত থাকেন। সুতরাং হে নবী (সঃ)! ইবরাহীম (আঃ) যেমন তাঁর পিতার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করা থেকে বিরত থেকেছিলেন, তদ্রূপ আপনিও আপনার মায়ের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করা থেকে বিরত থাকুন।” তিনি তো আমার মা ছিলেন। কাজেই এটা আমার মনে রেখাপাত করবে না কেন? আর আমি আমার প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা করেছিলাম যে, তিনি আমার উম্মত হতে যেন চারটি জিনিসের বোঝা উঠিয়ে নেন। তখন আল্লাহ তা'আলা দু'টি শাস্তি উঠিয়ে নেন এবং দু'টি বাকী রেখে দেন। আমি দুআ' করেছিলাম যে, আমার উম্মতের উপর যেন আকাশ থেকে পাথর বর্ষিত না হয়, যেমন অন্যান্য উম্মতদের উপর বর্ষিত হয়েছিল।

আমি প্রার্থনা করেছিলাম যে, শাস্তি হিসাবে আমার উম্মতকে যেন যমীনে ধ্বসিয়ে দেয়া না হয়।

আরও প্রার্থনা করেছিলাম যে, আমার উম্মত যেন বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে না পড়ে।

আমার আর একটি প্রার্থনা ছিল এই যে, আমার উম্মত যেন পরস্পর যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হয়ে না পড়ে। আল্লাহ তা'আলা প্রথম দু'টি কবূল করেন বটে, কিন্তু পরের দু'টি কবূল করেননি।”[১]

রাসূলুল্লাহ (সঃ) রাস্তা কেটে তাঁর মায়ের কবরের নিকট গিয়েছিলেন। কেননা তাঁর মায়ের কবর একটি টিলার নীচে ছিল। এ হাদীসটি গারীব। এর বর্ণনা বিস্ময়কর বটে। এর চেয়ে বেশী বিস্ময়কর ও অস্বীকারযোগ্য হচ্ছে ঐ রিওয়ায়াতটি যা খাতীব বাগদাদী তাঁর 'কিতাবুস সায়েক ওয়াল লাহিক' নামক

১. এ হাদীসটি ইমাম তিবরানী (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

গ্রন্থে অপরিচিত সনদে বর্ণনা করেছেন এবং আয়েশা (রাঃ) হতে ইসনাদ জুড়ে দিয়েছেন। কাহিনীটি এইভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর মাতা আমেনাকে জীবিত করেছিলেন এবং জীবিত হয়ে তিনি ঈমান এনেছিলেন। তারপর মারা গিয়েছিলেন। সাহীলীও 'রাওয' এর মধ্যে অপরিচিত একটি দলের সনদে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর পিতা ও মাতা উভয়কেই জীবিত করেছিলেন এবং তাঁরা ঈমান এনেছিলেন। হাকিম ইবনে দাহ্ইয়া (রঃ) বলেন যে, এ হাদীসটি মিথ্যা। কুরআন ও ইজমা উভয়ই এটাকে রদ করছে। আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং কুরআন কারীমে বলেছেনঃ وَلَا الَّذِيْنَ يَمُوْتُوْنَ وَهُمْ كُفَّارٌ অর্থাৎ " আর ঐ লোকদেরকে ক্ষমা করা হবে না যারা কুফরী অবস্থায় মারা গেছে।" (৪ঃ ১৮) আবূ আবদিল্লাহ কুরতুবী (রঃ) বলেন যে, এই হাদীসের দাবীর উপর চিন্তা করা হোক এবং তিনি বড় রকমের তীর মেরে এই দলীল পেশ করেছেন যে, এই নব জীবন দান ঠিক এই রূপেই হতে পারে যেমন আসরের সময় চলে যাওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর মু'জিযা বলে সূর্য অস্তমিত হওয়ার পর পুনরায় বেরিয়ে আসে এবং তিনি আসরের সালাত আদায় করেন। এই দলীল দ্বারা তিনি ইবনে দাহ্ইয়ার উক্তি খণ্ডন করেছেন। সূর্য পুনঃউদয় হাদীসটি প্রমাণিত। কুরতবী বলেনঃ "রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর পিতা-মাতার পুনর্জীবন লাভ জ্ঞানের দিক দিয়েও অসম্ভব নয় এবং শরীয়তের দিক দিয়েও অসম্ভব নয়। আমি তো এ কথাও শুনেছি যে, আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর চাচা আবূ তালিবকেও জীবিত করেছিলেন এবং তিনি ঈমান এনেছিলেন।" আমি বলি—এটা হাদীসের বিশুদ্ধতার উপর নির্ভরশীল। যদি হাদীস বিশুদ্ধ হয় তবে তা মানতে কোন বাধা নেই। আর যদি হাদীসই সহীহ না হয় তবে কোন ঝগড়াই নেই। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক জ্ঞানের অধিকারী।

আওফী (রঃ) ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সঃ) তাঁর মাতার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করার ইচ্ছা করেছিলেন, তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁকে তা থেকে নিষেধ করে দেন। তখন তিনি বলেন "ইবরাহীম খালীলুল্লাহ (আঃ) তো তাঁর পিতার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন।" এ সময় আল্লাহ তা'আলা وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ اِبْرٰهِيْمَ.... -এ আয়াতটি অবতীর্ণ করেন।

এই আয়াতের ব্যাপারে ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, লোকেরা তাদের মৃতদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করতো। তখন وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ اِبْرٰهِيْمَ... -এ

আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। জনগণ তখন ঐ নাজায়েয ক্ষমা প্রার্থনা থেকে বিরত থাকে। কিন্তু মুসলিমদেরকে তাদের জীবিত মুশ্‌রিক আত্মীয় স্বজনদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করতে নিষেধ করা হয়নি।

কাতাদা (রঃ) এই আয়াত সম্পর্কে বলেন যে, নবী (সঃ)-এর সাহাবীদের কতকগুলো লোক তাঁকে বললেন, হে আল্লাহর নবী (সঃ)! আমাদের পূর্বপুরুষরা বড়ই সৎ লোক ছিল। তাঁরা প্রতিবেশীদের সাথে উত্তম ব্যবহার করতে এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক যুক্ত রাখতে অভ্যস্ত ছিল। তাঁরা বন্দীদেরকে ছাড়িয়ে নেয়ার এবং জনগণের ক্ষতিপূরণ আদায়ের ব্যাপারে টাকা পয়সা খরচ করতো। আমরা কি ঐ মৃতদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করবো না? উত্তরে নবী (সঃ) বললেনঃ "কেন করবে না? আল্লাহর শপথ! আমিও ইবরাহীম (আঃ)-এর মত আমার পিতার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করবো।" তখনই উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়। অতঃপর ইবরাহীম (আঃ)-কে ক্ষমার্হ সাব্যস্ত করে বলছেন যে, তাঁর ক্ষমা প্রার্থনা শুধুমাত্র ঐ ওয়াদার কারণে ছিল যা তিনি তাঁর পিতার সাথে করেছিলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "আল্লাহ তা'আলা আমার উপর এমন কতকগুলো কালেমার অহী করলেন যা আমার কানে গুঞ্জরিত হচ্ছে এবং আমার অন্তরে বদ্ধমূল হয়েছে। আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যেন মুশরিক অবস্থায় মৃত্যুবরণকারীদের জন্যে আমি ক্ষমা প্রার্থনা না করি। আর যে ব্যক্তি তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত মাল সাদকা করে দিলো সেটা তার জন্যে বড় রকমের কল্যাণ লাভের কারণ হবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তা থেকে বিরত থাকলো, সেটা তার জন্যে হবে বড়ই ক্ষতির কারণ। যারা প্রয়োজন মোতাবেক আহার করে ও খরচ করে তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার কোন আপত্তি নেই।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একবার একজন ইয়াহূদী মারা যায়। তার পুত্র ছিল মুসলিম। সে তার ঐ পিতার কাফন দাফনের জন্যে বেরিয়ে আসলো না। ইবনে আব্বাস (রাঃ) এটা জানতে পেরে বললেনঃ "তার পুত্রের উচিত ছিল তার (ইয়াহূদী) পিতার কাফন দাফনের ব্যবস্থা করে দেয়া এবং তার জীবিত থাকা পর্যন্ত তার কল্যাণের নিমিত্ত প্রার্থনা করা এবং মৃত্যুর পরে তার নিজের অবস্থার উপর সমর্পণ করা। এরপর আর তার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করা চলবে না।" এর সঠিকতার প্রমাণ পাওয়া যায় আলী (রাঃ)-এর নিম্ন বর্ণিত রিওয়ায়াত দ্বারা–তিনি বলেন, যখন (আমার পিতা) আবূ তালিব মারা যান তখন আমি বলি, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আপনার পথভ্রষ্ট পিতৃব্য মারা গেছেন,

সুতরাং এখন কি করা যায়। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন বললেনঃ "তাঁকে দাফন করে দাও। আর কিছুই করতে হবে না। এরপর আমার কাছে আসবে।" অতঃপর সম্পূর্ণ হাদীসটি উল্লেখ করা হয়। আরো বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সামনে যখন আবূ তালিবের জানাযা গমন করে তখন তিনি (আবেগে তাঁর মৃতদেহকে) সম্বোধন করে বলেনঃ "হে চাচা! আমি আপনার আত্মীয়তার সম্পর্কের হক আদায় করে দিয়েছি।" আতা ইবনে আবূ রাবাহ (রঃ) বলেনঃ "আমি কোন আহলে কিবলার জানাযার সালাত পড়তে বাধা দেবো না, যদিও সে ব্যভিচার দ্বারা গর্ভধারিণী হাবশী মহিলাও হয়। কেননা, জানাযার সালাত হচ্ছে দুআ'। আর মুশরিক ছাড়া আর কারো জন্যে দুআ' করতে আল্লাহ তা'আলা নিষেধ করেননি।"

রামিল (রঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবূ হুরাইরা (রাঃ)-কে বলতে শুনেছিঃ "আল্লাহ ঐ ব্যক্তির উপর দয়া করুন যে ব্যক্তি আবূ হুরাইরা (রাঃ) ও তাঁর মাতার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করে।" আমি জিজ্ঞেস করলামঃ "আর তাঁর পিতার জন্যে?" তিনি উত্তরে বললেন– "না, আমার পিতা মুশরিক অবস্থায় মারা গিয়েছে।"[১]

فَلَمَّا تَبَيَّنَ সম্পর্কে ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, ইবরাহীম (আঃ) তাঁর পিতার মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকেন। তার মৃত্যুর পর যখন তিনি অবহিত হলেন যে, সে আল্লাহর শত্রু ছিল তখন তিনি তা থেকে বিরত থাকেন।

সাঈদ ইবনে জুবাইর (রঃ) বলেন যে, কিয়ামতের দিন ইবরাহীম (আঃ) যখন পিতার সাথে মিলিত হবেন তখন দেখবেন যে, সে অত্যন্ত ব্যাকুল ও উদ্বিগ্ন হয়ে ফিরছে। তিনি তার থেকে সম্পূর্ণরূপে বিমুখ হয়ে যাবেন। ঐ সময় তাঁর পিতা তাঁকে বলবেঃ "হে ইবরাহীম (আঃ)! (দুনিয়ায়) আমি তোমার কথা মানিনি। কিন্তু আজ আমি তোমার কোন কথাই অমান্য করবো না।" তখন ইবরাহীম (আঃ) বলবেনঃ "হে আমার প্রতিপালক! আপনি কি আমার সাথে ওয়াদা করেননি যে, কিয়ামতের দিন আমাকে অপমানিত করবেন না? তাহলে আজকের দিন এর চেয়ে বড় অপমান আর কি হতে পারে (যে, আমার পিতা অত্যন্ত লাঞ্ছিতভাবে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে)?" তখন তাঁকে বলা হবেঃ "তোমার পিছন দিকে তাকাও।" তিনি তখন দেখতে পাবেন যে, একটি অর্ধমৃত জানোয়ার পড়ে রয়েছে এবং একটি বেজীর আকারে রূপান্তরিত হয়েছে। ওর পা ধরে টেনে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

১. এ হাদীসটি ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহ তা'আলার উক্তি- إِنَّ إِبْرَٰهِيمَ لَأَوَّٰهٌ حَلِيمٌ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন যে, أَوَّاهٌ শব্দের অর্থ হচ্ছে অত্যধিক প্রার্থনাকারী। শাদ্দাদ ইবনুল হাদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি একদা নবী (সঃ)-এর নিকট বসেছিলেন। এমন সময় একটি লোক জিজ্ঞেস করলোঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! أَوَّاهٌ শব্দের অর্থ কি?" তিনি উত্তরে বললেনঃ "অত্যন্ত বিনয় প্রকাশকারী।" ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর অর্থ 'দয়ালু' বলেছেন। হাসান বসরী (রঃ), কাতাদা (রঃ) প্রমুখ গুরুজন বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহ বান্দাদের প্রতি দয়ালু। ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর অর্থ মুমিন বলেছেন। আলী ইবনে আবি তালহা (রঃ) এর অর্থ তাওবাকারী মুমিন বলেছেন।

উকবা ইবনে আমির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) যুন্নাজাদীন (রাঃ) নামক একটি লোক সম্পর্কে বলেনঃ "নিশ্চয়ই এই লোকটি أَوَّاهٌ বটে।" এর কারণ এই যে, কুরআন কারীমের মধ্যে যেখানেই আল্লাহ তা'আলার নাম আসতো সেখানেই তিনি উচ্চৈঃস্বরে প্রার্থনা করতে শুরু করতেন।[১]

আবু দারদা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, সকাল বেলায় যে ব্যক্তি তাসবীহ পাঠরত থাকে তাকেই أَوَّاهٌ বলা হয়। আবু আইয়ুব (রাঃ) বলেন যে, أَوَّاهٌ ঐ ব্যক্তিকে বলা হয় যে নিজের গুনাহ্‌কে স্মরণ করে ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকে।[২]

মুসলিম ইবনে বায়ান (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একটি লোক খুব বেশী তাসবীহ পাঠ করতেন, তখন আল্লাহর নবী (সঃ) তাঁকে أَوَّاهٌ বলেন।[৩] ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহর নবী (সঃ) একটি লোককে দাফন করার পর বলেনঃ "আল্লাহ তোমার প্রতি রহম করুন! তুমি তো একজন أَوَّاهٌ ছিলে।" এর দ্বারা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর উদ্দেশ্য ছিল এই যে, লোকটি কুরআন কারীমের একজন বড় পাঠক ছিলেন। একটি লোক কা'বা শরীফ তাওয়াফ করা অবস্থায় দুআ' করার সময় আহ্! আহ্! করতেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সামনে তাঁর আলোচনা হলে তিনি বলেনঃ সে أَوَّاهٌ ছিল।

আবু যার (রাঃ) বলেনঃ "একদা রাত্রে আমি বাইরে বের হয়ে দেখি যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) ঐ লোকটিকেই দাফন করছেন এবং তাঁর সাথে প্রদীপ রয়েছে।" এ হাদীসটি গারীব বা দুর্বল। এটা ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন। সর্বাপেক্ষা উত্তম কথা এই যে, أَوَّاهٌ শব্দের অর্থ হচ্ছে দুআ' বা প্রার্থনা। আর এটা বচন রীতির উপযুক্ত ও যোগ্যও বটে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করলেন যে,

১. এই হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) ও ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন।
২. এটা ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।
৩. এ হাদীসটি ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

ইবরাহীম (আঃ)-এর দুআ'র ভিত্তি ছিল ওয়াদার উপর এবং তিনি অধিক প্রার্থনাকারী ছিলেন, দুর্ব্যবহারকারীর ব্যাপারে তিনি ছিলেন সহিষ্ণু। তাই তো তিনি পিতার নিকট থেকে কষ্ট পাওয়া সত্ত্বেও তার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করতেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

اَرَاغِبٌ اَنْتَ عَنْ اٰلِهَتِیْ یٰۤاِبْرٰهِیْمُ لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ لَاَرْجُمَنَّكَ وَ اهْجُرْنِیْ مَلِیًّا ـ قَالَ سَلٰمٌ عَلَیْكَ سَاَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّیْ اِنَّهٗ كَانَ بِیْ حَفِیًّا

অর্থাৎ "সে (ইবরাহীমের আঃ পিতা) বললো, হে ইবরাহীম! তুমি কি আমার মা'বূদগণ হতে ফিরে আছ (এবং আমাকেও বারণ করছো)? (স্মরণ রেখো) যদি তুমি এটা হতে নিবৃত্ত না হও, তবে আমি নিশ্চয়ই তোমাকে প্রস্তরাঘাতে মেরে ফেলবো, আর দূর হয়ে যাও আমা হতে চিরতরে। ইবরাহীম বললো, আমার সালাম গ্রহণ কর, এখন আমি তোমার জন্যে আমার প্রতিপালকের দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করবো; নিশ্চয়ই তিনি আমার প্রতি অতিশয় অনুগ্রহশীল।" (১৯: ৪৬-৪৭) মোটকথা, পিতা থেকে কষ্ট পাওয়া সত্ত্বেও ইবরাহীম (আঃ) সহিষ্ণুতা অবলম্বন করেছিলেন। তিনি পিতার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন। তাই আল্লাহ তা'আলা তাঁকে حَلِیْمٌ বা সহিষ্ণু উপাধিতে ভূষিত করেছেন।

১১৫। আর আল্লাহ এরূপ নন যে, কোন জাতিকে হিদায়াত করার পর পথভ্রষ্ট করে দেন, যে পর্যন্ত না তাদেরকে সেসব বিষয় পরিষ্কারভাবে বলে দেন, যা হতে তারা বেঁচে থাকবে; নিশ্চয়ই আল্লাহ হচ্ছেন সর্বজ্ঞ।

١١٥- وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِیُضِلَّ قَوْمًۢا بَعْدَ اِذْ هَدٰىهُمْ حَتّٰی یُبَیِّنَ لَهُمْ مَّا یَتَّقُوْنَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِیْمٌ ۝

১১৬। নিশ্চয়ই আল্লাহরই রাজত্ব রয়েছে আসমানসমূহে ও যমীনে; তিনিই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটিয়ে থাকেন; আর তোমাদের জন্যে আল্লাহ ছাড়া না কোন বন্ধু আছে আর না কোন সাহায্যকারী।

١١٦- اِنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ یُحْیٖ وَ یُمِیْتُ ؕ وَ مَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِیٍّ وَّ لَا نَصِیْرٍ ۝

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় মহান সত্তা ও ন্যায়নীতিপূর্ণ হিকমত সম্পর্কে সংবাদ দিচ্ছেন যে, তিনি যেই পর্যন্ত না কোন কওমের নিকট রাসূল পাঠিয়ে ফিতনা খতম করেন সেই পর্যন্ত তাদেরকে পথভ্রষ্টতার জন্যে ছেড়ে দেন। যেমন তিনি অন্য এক জায়গায় বলেনঃ "সামূদ সম্প্রদায়কে আমি পথ প্রদর্শন করেছিলাম।" মুজাহিদ (রঃ) আল্লাহ তা'আলার وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ اِذْ هَدٰهُمْ -এই উক্তি সম্পর্কে বলেন যে, মৃত মুশরিকদের জন্যে মুমিনদের ক্ষমা প্রার্থনা করা ছেড়ে দেয়ার ব্যাপারে মহিমান্বিত আল্লাহর বর্ণনাটি হচ্ছে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। আর তাদের তাঁর আনুগত্য এবং অবাধ্যতার কাজটি হচ্ছে সাধারণ। অর্থাৎ হে মুমিনগণ! তোমাদের ইচ্ছার স্বাধীনতা রয়েছে। ইচ্ছানুযায়ী হয় তোমরা আল্লাহর আনুগত্য স্বীকার কর, না হয় তাঁর নাফরমানী কর। তোমরা এটা কর বা ছেড়ে দাও। কিন্তু ক্ষমা প্রার্থনা পরিত্যাগ করার বর্ণনাটি সাধারণ নয়, বরং বিশিষ্ট।

ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বলেন যে, আল্লাহ পাক বলেন, যদি তোমরা তোমাদের মধ্যস্থিত মৃত মুশরিকদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা কর তবে কেন তিনি তোমাদের উপর পথভ্রষ্টতার ফায়সালা দিবেন না? কেননা তিনি আমাদেরকে হিদায়াত দান করেছেন এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ)-এর উপর ঈমান আনয়নের তাওফীক দিয়েছেন। আর তোমাদেরকে নিষিদ্ধ বিষয় হতে দূরে রেখেছেন এবং তোমরা তা থেকে বিরত থেকেছো। কিন্তু এর পূর্বে নয় যে, তিনি ঐ নিষিদ্ধ বিষয়গুলোর নিকৃষ্টতা বর্ণনা করে দিয়েছেন এবং তোমরা ঐগুলোর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছো। ঐ অবস্থায় কি করে তিনি তোমাদের উপর পথভ্রষ্টতার হুকুম লাগাতে পারেন? কেননা, আনুগত্য ও অবাধ্যতা তো আদেশ ও নিষেধের সাথে সম্পর্কযুক্ত। কিন্তু যে ঈমানই আনেনি এবং বিরতও থাকেনি, তাকে অনুগত বলা যাবে না এবং অবাধ্যও বলা চলবে না।

আল্লাহ তা'আলার উক্তি—"আল্লাহরই রাজত্ব রয়েছে আসমানসমূহে ও যমীনে এবং তিনিই জীবন দান করেন ও তিনিই মৃত্যু ঘটিয়ে থাকেন।" এটা দ্বারা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাঁর মুমিন বান্দাদেরকে কাফির ও মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার প্রতি উৎসাহ ও উদ্দীপনা প্রদান করা হয়েছে এবং এ কথা বুঝানো হয়েছে যে, তাদের আল্লাহ তা'আলার সাহায্যের উপর ভরসা করা উচিত এবং তাঁর শত্রুদেরকে ভয় করা মোটেই উচিত নয়। কেননা তারা আল্লাহকে ছেড়ে দিয়েছে। সুতরাং তাদের না কোন বন্ধু আছে, না আছে কোন সাহায্যকারী।

হাকীম ইবনে হিযাম (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে বসেছিলাম। এমন সময় তিনি বললেনঃ "আমি যা শুনতে পাচ্ছি তা তোমরা শুনতে পাচ্ছ কি?" তাঁরা (সাহাবীগণ) বললেনঃ "আমরা তো কিছুই শুনতে পাচ্ছিনে।" তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ "আমি আকাশের চড় চড় শব্দ শুনতে পাচ্ছি। আর আকাশ চড় চড় কেন করবে না? তাতে আধহাত পরিমাণও জায়গা এমন নেই যেখানে কোন না কোন ফেরেশ্তা সিজদা বা দাঁড়ানো অবস্থায় বিদ্যমান না রয়েছেন।"[১]

কা'বুল আহবার (রঃ) বলেন যে, যমীনের মধ্যে সূঁচের ছিদ্র পরিমাণও এমন জায়গা নেই যেখানে কোন ফেরেশ্তা আল্লাহর তাসবীহ্ পাঠে রত না আছেন। আর আকাশের ফেরেশতাদের সংখ্যা মাটির অণু-পরমাণুর সংখ্যা অপেক্ষাও বেশী। আরশ বহনকারী ফেরেশ্তাদের পায়ের গিঁট হতে পদনালি পর্যন্ত জায়গার ব্যবধান একশ বছরের দূরত্ব।

১১৭। আল্লাহ অনুগ্রহ দৃষ্টি করলেন নবীর অবস্থার প্রতি এবং মুহাজির ও আনসারদের অবস্থার প্রতিও যারা নবীর অনুগামী হয়েছিল সংকট মুহূর্তে, এমন কি যখন তাদের মধ্যকার এক দলের অন্তর বিচলিত হওয়ার উপক্রম হয়েছিল, তৎপর আল্লাহ তাদের অবস্থার প্রতি অনুগ্রহপরায়ণ হলেন, যাতে তারা তাওবা করে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাদের সকলের উপর স্নেহশীল, করুণাময়।

١١٧- لَقَدْ تَّابَ اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ فِيْ سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْۢ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيْغُ قُلُوْبُ فَرِيْقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ اِنَّهٗ بِهِمْ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۙ

১. এই হাদীসটি ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

মুজাহিদ (রঃ) প্রমুখ মনীষী বলেন যে, এ আয়াতটি তাবূকের যুদ্ধ সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়। অর্থাৎ জনগণ যখন তাবূকের যুদ্ধে বের হন তখন কঠিন গরমের সময় ছিল। সেটা ছিল দুর্ভিক্ষের বছর এবং পানি ও পাথেয়ের বড়ই সংকট ছিল। মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, যখন মুজাহিদরা তাবূকের পথে যাত্রা শুরু করেন তখন ছিল কঠিন গরমের সময়। মুজাহিদরা কত বড় বিপদের সম্মুখীন হয়েছিলেন তা আল্লাহ তা'আলাই জানেন। এমন কি বলা হয় যে, একটি খেজুরকে দু'টুকরা করে দু'জন মুজাহিদের মধ্যে বণ্টন করে দেয়া হতো, খেজুর হাতে হাতে বাড়িতে দেয়া হতো। একজন কিছু চুষে নিয়ে পানি পান করতেন। তারপর অন্য একজন ঐ খেজুর চুষতেন এবং পরে পানি পান করতেন। এভাবেই তাঁরা সান্ত্বনা লাভ করতেন। অতঃপর মহান আল্লাহ তাঁদের প্রতি দয়া পরবশ হন। তাঁরা যুদ্ধক্ষেত্র হতে ফিরে আসেন।

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, উমার ইবনে খাত্তাব (রাঃ)-কে তাবূকের সংকট সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, আমরা তাবূকের উদ্দেশ্যে নবী (সঃ)-এর সাথে বের হই। কঠিন গরমের মৌসুম ছিল। আমরা এক জায়গায় অবস্থান করি। সেখানে আমরা পিপাসায় এমন কাতর হয়ে পড়ি যে, মনে হলো আমরা প্রাণে আর বাঁচবো না। কেউ পানির খোঁজে বের হলে সে বিশ্বাস করে নিতো যে, ফিরবার পূর্বেই তার মৃত্যু ঘটে যাবে। লোকেরা উট যবেহ করতো। উটের পাকস্থলীর এক জায়গায় পানি সঞ্চিত থাকতো। তারা তা বের করে নিয়ে পান করতো। তখন আবূ বকর (রাঃ) বললেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আপনার দুআ' তো কবূল হওয়ার যোগ্য। সুতরাং আপনি আমাদের জন্যে দুআ' করেন।" তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ "তোমরা কি এটাই চাও?" আবূ বকর (রাঃ) উত্তরে বললেনঃ "হ্যাঁ!" রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন দুআ'র জন্যে তাঁর হাত দু'টি উঠালেন। দুআ' শেষ না হতেই আকাশ মেঘে ছেয়ে গেল এবং মুষলধারে বৃষ্টি হতে লাগলো। কিছুক্ষণ পর বৃষ্টি থামলো। জনগণ পানি দ্বারা তাদের পাত্রগুলো ভর্তি করে নিলো। তারপর আমরা সেখান থেকে প্রস্থান করলাম। দেখলাম যে, সামনে আর কোন জায়গায় বৃষ্টি বর্ষিত হয়নি।

ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) আল্লাহ তা'আলার ...... لَقَدْ تَّابَ اللّٰهُ -এই উক্তি সম্পর্কে বলেন যে, এই আয়াতের عُسْرَةٌ শব্দ দ্বারা জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় ব্যয়, পথ খরচ এবং পানির সংকীর্ণতা বুঝানো হয়েছে।

مِنْۢ بَعْدِ مَا كَادَ..... অর্থাৎ এরপর যে, তাদের মধ্যকার এক দলের অন্তর বিচলিত হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। তারা সত্যের পথ থেকে সরে পড়ার কাছাকাছি হয়েছিল। তারা এই সফরে এত বড় বিপদের সম্মুখীন হয়েছিল যে, তারা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর দ্বীনের ব্যাপারে সন্দিহান হয়ে উঠেছিল। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি দয়া করেন এবং তাদেরকে তাঁর দিকে ফিরে আসার তাওফীক দান করেন। আর তাদেরকে দ্বীনের উপর অটল থাকার মর্যাদা প্রদান করেন। তিনি বড়ই স্নেহশীল ও করুণাময়।

১১৮। আর ঐ তিন ব্যক্তির অবস্থার প্রতিও (অনুগ্রহ করলেন) যাদের ব্যাপার মূলতবী রাখা হয়েছিল; এই পর্যন্ত যে, যখন ভূ-পৃষ্ঠ নিজ প্রশস্ততা সত্ত্বেও তাদের প্রতি সংকীর্ণ হতে লাগলো এবং তারা নিজেরা নিজেদের জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে পড়লো, আর তারা বুঝতে পারলো যে, আল্লাহর পাকড়াও হতে কোথাও আশ্রয় পাওয়া যেতে পারে না তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করা ব্যতীত; তৎপর তাদের অবস্থার প্রতিও অনুগ্রহ-দৃষ্টি করলেন, যাতে তারা ভবিষ্যতেও (আল্লাহর দিকে) রুজু থাকে; নিশ্চয়ই আল্লাহ হচ্ছেন অতিশয় অনুগ্রহকারী, করুণাময়।

١١٨- وَعَلَى الثَّلٰثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوْا ؕ حَتّٰۤى اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَ ضَاقَتْ عَلَيْهِمْ اَنْفُسُهُمْ وَ ظَنُّوْۤا اَنْ لَّا مَلْجَاَ مِنَ اللّٰهِ اِلَّاۤ اِلَيْهِ ؕ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوْبُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ۠

১১৯। হে মু'মিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং (কাজে কর্মে) সত্যবাদীদের সঙ্গে থাকো।

١١٩- يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ كُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ

আব্দুল্লাহ ইবনে কা'ব ইবনে মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, কা'ব ইবনে মালিক (রাঃ) তাবূকের যুদ্ধে তাঁর অংশগ্রহণ না করার কাহিনী এবং রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে গমন না করার ঘটনা প্রসঙ্গে বলেন, তাবূকের যুদ্ধ ছাড়া অন্য কোন যুদ্ধে আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সঙ্গ লাভ থেকে বঞ্চিত হইনি। অবশ্য বদর যুদ্ধেও আমি শরীক হতে পারিনি। তবে এ যুদ্ধে যারা অংশগ্রহণ করতে পারেনি তাদের প্রতি কোন দোষারোপ করা হয়নি। ব্যাপারটা ছিল এই যে, ঐ সময় রাসূলুল্লাহ (সঃ) কুরায়েশদের একটি যাত্রীদলের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেছিলেন। সেখানে আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছানুযায়ী পূর্বে কোন দিন নির্ধারণ করা ছাড়াই তাঁর শত্রুদের সাথে মুকাবিলা হয়। আকাবার রাত্রে আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথেই ছিলাম, তিনি ইসলামের উপর আমাদের বায়আত গ্রহণ করেছিলেন। বদরের যুদ্ধে উপস্থিতি অপেক্ষা আকাবার রাত্রে উপস্থিতি আমার নিকট বেশী পছন্দনীয় ছিল, যদিও জনগণের মধ্যে বদরের খ্যাতি বেশী রয়েছে। এখন তাবূকের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে আমি যে অংশগ্রহণ করতে পারিনি তার ঘটনা এই যে, যেই সময় আমি তাবূকের যুদ্ধ থেকে পিছনে রয়ে গিয়েছিলাম সেই সময় আমার আর্থিক অবস্থা ছিল খুবই স্বচ্ছল। ইতিপূর্বে আমার কখনো দু'টি সওয়ারী ছিল না। কিন্তু এই যুদ্ধে আমি দু'টি সওয়ারীও রাখতে পারতাম। রাসূলুল্লাহ (সঃ) যখন কোন যুদ্ধ যাত্রার ইচ্ছা করতেন তখন তিনি সাধারণভাবে এ সংবাদ ছড়িয়ে দিতেন না। এই যুদ্ধে গমনের সময় কঠিন গরম ছিল এবং এটা ছিল খুবই দূরের সফর। আর এই সফরে বন জঙ্গল অতিক্রম করতে হয়েছিল এবং বহু সংখ্যক শত্রুর মুকাবিলা করতে হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ (সঃ) মুসলিমদেরকে এ স্বাধীনতা দিয়েছিলেন যে, তারা তাদের সুবিধামত শত্রুর মুকাবিলা করার প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারে। তিনি নিজের ইচ্ছার কথা মুসলিমদের নিকট প্রকাশ করেছিলেন। মুসলিমরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে এতো অধিক সংখ্যায় ছিলেন যে, তাঁদেরকে তালিকাভুক্ত করা কঠিন ছিল। কা'ব (রাঃ) বলেন, এমন লোকের সংখ্যা খুবই কম হবে যাদের অনুপস্থিতির খবর রাসূলুল্লাহ (সঃ) জানতে পারবেন। বরং এই ধারণা ছিল যে, সৈন্যদের সংখ্যাধিক্যের কারণে অনুপস্থিতদের খবর তিনি জানতেই পারবেন না, যতক্ষণ না আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাঁকে জানিয়ে দেয়া হয়। এই যুদ্ধের উদ্দেশ্যে এমন সময় যাত্রা শুরু করা হয়েছিল যখন গাছের ফল পেকে গিয়েছিল এবং গাছের ছায়া ছিল তখন অনেক আরামদায়ক। এমতাবস্থায় আমার প্রবৃত্তি আরামপ্রিয়তার দিকে আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিল। রাসূলুল্লাহ (সঃ) এবং মুসলিমরা

যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুতি শুরু করে দেন। সকালে উঠে আমি জিহাদের জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণের উদ্দেশ্যে বের হতাম কিন্তু শূন্য হাতে ফিরে আসতাম। প্রস্তুতি এবং সফরের আসবাবপত্র ক্রয় ইত্যাদি কিছুই করতাম না। মনকে এ বলে প্রবোধ দিতাম যে, যখনই ইচ্ছা করবো তখনই ক্ষণিকের মধ্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করে ফেলবো। এভাবে দিন অতিবাহিত হতে থাকে। জনগণ পূর্ণমাত্রায় প্রস্তুতি গ্রহণ করে ফেলে, এমন কি মুসলিমরা এবং স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সঃ) জিহাদের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে দেন। আমি মনে মনে বলি যে, দু' একদিন পরে প্রস্তুতি গ্রহণ করে আমিও তাঁদের সাথে মিলিত হয়ে যাবো।

ইতিমধ্যে মুসলিম সেনাদল বহু দূরে চলে গেছেন। আমি প্রস্তুতি গ্রহণের উদ্দেশ্যে বের হই। কিন্তু এবারও প্রস্তুতি গ্রহণ ছাড়াই ফিরে আসি। শেষ পর্যন্ত প্রত্যহ এরূপই হতে থাকে এবং দিন অতিবাহিত হতেই থাকে। সৈন্যেরা যুদ্ধ করতে লাগলেন। এখন আমি ইচ্ছা করলাম যে, তাড়াতাড়ি যাত্রা শুরু করে তাঁদের সাথে মিলিত হয়ে যাবো। তখনও যদি আমি যাত্রা শুরু করতাম! কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাও হয়ে উঠলো না। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর যুদ্ধে গমনের পর যখন আমি বাজারে যেতাম তখন এ দেখে আমার বড়ই দুঃখ হতো যে, কোন মুসলিম দৃষ্টিগোচর হলে হয় তার উপর কপটতার অভিশাপ পরিলক্ষিত হতো, না হয় এমন মুসলিমকে দেখা যেতো যারা বাস্তবিকই আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে ক্ষমার্হ অথবা খোঁড়া ও বিকলাঙ্গ ছিল। তাবূকে পৌঁছার পর রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে স্মরণ করে জিজ্ঞেস করেনঃ 'কা'ব ইবনে মালিক (রাঃ)-এর কি হয়েছে?' তখন বানু সালমা গোত্রের একটি লোক উত্তরে বলেঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! স্বচ্ছলতা ও আরামপ্রিয়তা তাকে মদীনাতেই আটকিয়ে রেখেছে।" এ কথা শুনে মুয়া'জ ইবনে জাবাল (রাঃ) তাকে বলেনঃ "তুমি ভুল ধারণা পোষণ করছো। হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! তার সম্পর্কে আমরা ভাল ধারণাই রাখি।" রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর এ কথা শুনে নীরব হয়ে যান। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সঃ) যখন তাবূক হতে প্রত্যাবর্তন করেন তখন আমি ভীষণ উদ্বিগ্ন ছিলাম যে, এখন কি করি? আমি মিথ্যা বাহানার কথা চিন্তা করলাম যাতে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর শাস্তি থেকে রক্ষা পেতে পারি। সুতরাং আমি সকলের মত জানতে লাগলাম এবং যখন অবগত হলাম যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) এসেই পড়েছেন তখন মিথ্যা চিন্তা মন থেকে দূর করে দিলাম। এখন আমি ভালরূপে বুঝতে পারলাম যে, কোন বাহানা দ্বারা আমি রক্ষা পেতে পারি না। তাই আমি সত্য বলারই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলাম। নবী (সঃ) সফর থেকে ফিরে এসে সর্বপ্রথম মসজিদে

অবস্থান করলেন। দু'রাকাআত সালাত আদায় করে তিনি লোকদেরকে নিয়ে বৈঠক করলেন। এখন যারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি তারা এসে ওযর পেশ করতে লাগলো এবং কসম খেতে শুরু করলো। এরূপ লোকদের সংখ্যা আশিজনের কিছু বেশী ছিল। নবী (সঃ) তাদের বাহ্যিক কথার উপর ভিত্তি করে তা কবূল করে নিচ্ছিলেন এবং তাদের অবহেলার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনাও করছিলেন। কিন্তু তাদের মনের গোপন কথা তিনি আল্লাহ তা'আলার দিকে সমর্পণ করছিলেন। অতঃপর আমার পালা আসলো। আমি গিয়ে সালাম করলাম। তিনি ক্রোধের হাসি হাসলেন। তারপর আমাকে বললেনঃ "এখানে এসো।" আমি তাঁর সামনে গিয়ে বসলাম। তিনি আমাকে বললেনঃ "তুমি কেন (যুদ্ধে না গিয়ে) পিছনে রয়ে গিয়েছিলে? তুমি কি যুদ্ধের প্রস্তুতি হিসেবে আসবাবপত্র ক্রয় করনি?" আমি উত্তরে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! যদি আমি এ সময় আপনি ছাড়া আর কারো সাথে কথা বলতাম তবে এমন বানানো ওযর পেশ করতাম যে, তা কবূল করতেই হতো। কেননা, কথা বানানো, তর্ক বিতর্ক এবং ওযর পেশ করার যোগ্যতা আমার যথেষ্ট আছে। কিন্তু আল্লাহর কসম! আমি জানি যে, এই সময় মিথ্যা কথা বানিয়ে নিয়ে আপনাকে সন্তুষ্ট করতে পারবো বটে, তবে আল্লাহ আপনাকে সত্বরই আমার ব্যাপারে অসন্তুষ্ট করবেন। আর যদি আমি সত্য কথা বলি তবে আল্লাহর পক্ষ থেকে আমি উত্তম পরিণামের আশা করতে পারি। হে নবী (সঃ)! আমার কোন গ্রহণযোগ্য ওযর ছিল না। প্রকৃতপক্ষে আমার কাছে যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করার কোনই বাহানা নেই। আমার এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ "এ লোকটি বাস্তবিকই সত্য কথা বলেছে। ঠিক আছে, তুমি এখন যাও এবং তোমার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশের অপেক্ষা কর।" সুতরাং আমি চলে আসলাম। বানু সালমা গোত্রের লোকেরাও আমার সাথে আসলো এবং আমাকে বললোঃ "আল্লাহর কসম! ইতিপূর্বে আমরা আপনাকে কোন অপরাধ করতে দেখিনি। অন্যান্য লোকেরা যেমন আল্লাহর নবী (সঃ)-এর সামনে ওযর পেশ করলো তেমনি আপনিও কেন তাঁর কাছে কোন একটা ওযর পেশ করলেন না? তাহলে নবী (সঃ) অন্যদের ন্যায় আপনার জন্যেও ক্ষমা প্রার্থনা করতেন। আর তাঁর ক্ষমা প্রার্থনাই আপনার জন্যে যথেষ্ট হতো।" মোটকথা, লোকগুলো এর উপর এতো জোর দিলো যে, আমি পুনরায় ফিরে গিয়ে কিছু ওযর পেশ করার ইচ্ছা করেই ফেললাম। তাই আমি লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলাম, আমার মত আর কারো কি এরূপ পরিস্থিতি হয়েছে? তারা উত্তরে বললোঃ "হ্যাঁ, আপনার মত আরো দু'টি লোক সত্য কথাই বলে দিয়েছে।" আমি

জিজ্ঞেস করলাম, তারা কারা? উত্তরে বলা হলোঃ "তারা হচ্ছে মুরারাহ্ ইবনে রাবী' এবং হিলাল ইবনে উমাইয়া আলওয়াকেফী।" বলা হয়েছে যে, এ দু'টি লোক সৎলোক রূপে পরিচিত ছিলেন এবং বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। আমি তাদেরই পদাংক অনুসরণ করলাম। সুতরাং আমি পুনরায় আর রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট গমন করলাম না। এখন আমি জানতে পারলাম যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) জনগণকে আমাদের সাথে সালাম-কালাম করতে নিষেধ করে দিয়েছেন এবং লোকেরা আমাদেরকে বয়কট করেছে। তারা আমাদের থেকে এমনভাবে বদলে গেছে যে, যমীনে অবস্থান আমাদের কাছে একটা বোঝা স্বরূপ মনে হয়েছে। এভাবে আমাদের উপর দিয়ে পঞ্চাশ দিন অতিবাহিত হয়ে যায়। ঐ দু'জন তো মুখ লুকিয়ে গৃহ-বাস অবলম্বন করতঃ সদা কাঁদতে থাকেন। কিন্তু আমি কিছুটা শক্ত প্রকৃতির লোক ছিলাম বলে আমার মধ্যে ধৈর্য অবলম্বনের শক্তি ছিল। তাই আমি বরাবর জামাআতে সালাত পড়তে থাকি এবং বাজারে ঘোরাফেরা করি। কিন্তু আমার সাথে কেউ কথা বলতো না। আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে যেতাম, তাঁকে সালাম করতাম এবং সালামের জবাবে তাঁর ঠোঁট নড়ছে কি-না তা লক্ষ্য করতাম। আমি তাঁর পাশেই সালাত আদায় করতাম। আমি আড়চোখে তাকাতাম এবং দেখতাম যে, আমি সালাত শুরু করলে তিনি আমার দিকে দৃষ্টিপাত করতেন। আর আমি তাঁর দিকে মুখ করে বসলে তিনি আমার দিক হতে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতেন। যখন এই বয়কটের সময়কাল দীর্ঘ হয়ে যায় তখন আমি একদা আবূ কাতাদা (রাঃ)-এর বাড়ীর প্রাচীরের উপর দিয়ে তাঁর কাছে গমন করি। তিনি আমার চাচাতো ভাই হতেন। আমি তাঁকে খুবই ভালবাসতাম। আমি তাঁকে সালাম দেই। কিন্তু আল্লাহর কসম! তিনি আমার সালামের জবাব দেননি। আমি তাঁকে বলি, হে আবূ কাতাদা (রাঃ)! আপনার কি জানা আছে যে, আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ)-কে ভালবাসি? তিনি শুনে নীরব থাকেন। আমি আল্লাহর কসম দিয়ে কথা বলি। তবুও তিনি কথা বলেন না। পুনরায় আমি কসম দেই। কিন্তু তিনি অপরিচিতের মত বলেনঃ "আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ)-ই খুব ভাল জানেন।" এতে আমার কান্না এসে যায়। অতঃপর আমি প্রাচীর টপকে ফিরে আসি।

একদা আমি মদীনার বাজারে ঘুরতেছিলাম। এমন সময় সিরিয়ার একজন কিবতী, যে মদীনার বাজারে কিছু খাবারের জিনিস বিক্রি করছিল, লোকদেরকে জিজ্ঞেস করেঃ "কেউ আমাকে কা'ব ইবনে মালিক (রাঃ)-এর ঠিকানা দিতে পারে কি?" লোকেরা আমাকে ইশারায় দেখিয়ে দেয়। সুতরাং সে আমার কাছে

আগমন করে এবং গাস্সানের বাদশাহর একখানা চিঠি আমাকে প্রদান করে। আমি লিখাপড়া জানতাম। চিঠি পড়ে দেখি যে, তাতে লিখা রয়েছে– "আমাদের কাছে এ খবর পৌঁছেছে যে, আপনার সঙ্গী (নবী সঃ) আপনার প্রতি কঠোরতা অবলম্বন করেছেন। আল্লাহ তো আপনাকে একজন সাধারণ লোক করেননি! আপনার মর্যাদা রয়েছে। সুতরাং আপনি আমাদের কাছে চলে আসুন। আপনাকে যথাযোগ্য মর্যাদা দান করবো।" এটা পড়ে আমি মনে মনে বললাম যে, এটি একটি নতুন বিপদ। অতঃপর আমি চিঠিখানা (আগুনের) চুল্লীতে ফেলে দেই। পঞ্চাশ দিনের মধ্যে যখন চল্লিশ দিন অতিবাহিত হয় তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর একজন দূত আমার নিকট এসে বলেনঃ "রাসূলুল্লাহ (সঃ) আপনাকে স্ত্রী থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন?" আমি জিজ্ঞেস করলাম, তালাক দিতে বলেছেন কি? উত্তরে তিনি বললেনঃ "না, শুধুমাত্র স্ত্রী হতে পৃথক থাকতে বলেছেন।" দূত এ কথাও বললেন যে, অপর দু'জনকেও এই নির্দেশই দেয়া হয়েছে। সুতরাং আমি আমার স্ত্রীকে বললাম, বাপের বাড়ী চলে যাও। দেখা যাক, আল্লাহ তা'আলার কি নির্দেশ আসে। হিলাল ইবনে উমাইয়া (রাঃ)-এর স্ত্রী রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট এসে আরয করেঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমার স্বামী একজন খুবই দুর্বল ও বৃদ্ধ লোক। তাঁর সেবা করার কোন লোক নেই। আমি যদি তার সেবায় লেগে থাকি তবে আশা করি আপনি অমত করবেন না!" তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে বলেনঃ "আচ্ছা, ঠিক আছে। তবে তুমি তার সাথে সহবাস করবে না।" সে তখন বলেঃ "তাঁর তো নড়াচড়া করারই শক্তি নেই। আপনার অসন্তুষ্টির দিন থেকে আজ পর্যন্ত তিনি শুধু কাঁদছেনই।" আমার পরিবারের একজন লোক আমাকে বললোঃ "আপনিও রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট আপনার স্ত্রী থেকে খিদমত নেয়ার অনুমতি প্রার্থনা করুন, যেমন হিলাল (রাঃ) অনুমতি লাভ করেছেন।" আমি বললাম, আল্লাহর কসম! আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে এ ব্যাপারে আবেদন করবো না। জানি না তিনি কি বলেন! আমি তো একজন যুবক লোক। কারো সেবা গ্রহণের আমার প্রয়োজন নেই। এরপর আরো দশ দিন অতিবাহিত হয়ে যায় এবং জনগণের সম্পর্ক ছিন্নতার পঞ্চাশ দিন কেটে যায়। পঞ্চাশতম দিনের সকালে আমার ঘরের ছাদের উপর ফজরের সালাত আদায় করে ঐ অবস্থায় বসেছিলাম যে অবস্থার কথা মহান আল্লাহ তাঁর কালামে পাকে বলেছেনঃ "যখন ভূ-পৃষ্ঠ নিজ প্রশস্ততা সত্ত্বেও তাদের প্রতি সংকীর্ণ হতে লাগলো এবং তারা নিজেরা নিজেদের জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে পড়লো, আর তারা বুঝতে পারলো যে, আল্লাহর পাকড়াও হতে কোথাও

আশ্রয় পাওয়া যেতে পারে না তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করা ব্যতীত।” এমন সময় ‘সালা’ পাহাড় হতে একজন চীৎকারকারীর শব্দ আমার কানে আসলো। সে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করে বলছিলঃ “হে কা’ব ইবনে মালিক (রাঃ)! আপনি সুসংবাদ গ্রহণ করুন!” এটা শোনা মাত্রই আমি সিজদায় পতিত হই এবং বুঝতে পারি যে, আল্লাহ তা‘আলা আমার দুআ’ কবূল করেছেন। আমার দুঃখ ও বিপদের দিন ফুরিয়েছে। ফজরের সালাতের পর রাসূলুল্লাহ (সঃ) ঘোষণা করেন যে, আল্লাহ তা‘আলা এই তিনজনের তাওবা কবূল করেছেন। লোকেরা আমাদেরকে সুসংবাদ জানাতে দৌড়িয়ে আসে। তারা ঐ দু’জনের কাছেও যায় এবং আমার কাছেও আসে। একটি লোক দ্রুতগামী ঘোড়ায় চড়ে আমার কাছে আগমন করে। কিন্তু পাহাড়ের উপর উঠে চীৎকারকারী সবচেয়ে বেশী সফলকাম হয়। কেননা, তার মাধ্যমেই আমি সর্বপ্রথম সংবাদ পাই। কারণ, ঘোড়ার গতি অপেক্ষা শব্দের গতি বেশী। সুতরাং যখন ঐ লোকটি আমার সাথে সাক্ষাৎ করে যার শব্দ আমি শুনেছিলাম, তখন তার শুভ সংবাদ প্রদানের বিনিময়ে আমি আমার পরনের কাপড় তাকে পরিয়ে দেই। আল্লাহর কসম! সেই সময় আমার কাছে দ্বিতীয় কাপড় আর ছিল না, অপরের কাছে কাপড় ধার করে আমি তা পরিধান করি। এরপর আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে বের হই। পথে লোকেরা দলে দলে আমার সাথে মিলিত হয় এবং আমাকে মুবারকবাদ জানাতে থাকে। আমি মসজিদে প্রবেশ করে দেখি যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) লোকজনের মাঝে বসে আছেন। আমাকে দেখেই তালহা ইবনে আবদিল্লাহ (রাঃ) দৌড়িয়ে এসে আমার সাথে মুসাফাহা করেন এবং আমাকে মুবারকবাদ জানান। আল্লাহর কমস! মুহাজিরদের মধ্যে তিনি ছাড়া অন্য কেউ আমাকে এই অভ্যর্থনা করেননি। কা’ব (রাঃ) তালহা (রাঃ)-এর এই আন্তরিকতা কখনো বিস্মৃতি হননি। আমি এসে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে সালাম করি। তাঁর মুখমণ্ডল খুশীতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তিনি বললেনঃ “খুশী হয়ে যাও। সম্ভবতঃ তোমার জন্মগ্রহণের পর থেকে আজ পর্যন্ত তোমার জীবনে এর চেয়ে বড় খুশীর দিন আর আসেনি।” আমি জিজ্ঞেস করলাম, এই সুসংবাদ কি আপনার পক্ষ থেকে না আল্লাহর পক্ষ থেকে? তিনি উত্তরে বললেনঃ “আল্লাহার পক্ষ থেকে।” রাসূলুল্লাহ (সঃ) যখন খুশী হতেন তখন তাঁর চেহারা মুবারক উজ্জ্বল হয়ে উঠতো। তা যেন চাঁদের খণ্ড বিশেষ। তাঁর খুশীর চিহ্ন তাঁর চেহারাতেই প্রকাশিত হতো। আমি আরয করলাম, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমার তাওবা কবূলের এই বরকত হওয়া উচিত যে, আমি আমার সমস্ত সম্পদ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ)-এর পথে

বিলিয়ে দেই। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ "এরূপ করো না, কিছু রেখে দাও এবং কিছু সাদকা কর। এটাই হচ্ছে উত্তম পন্থা।" এ কারণে খায়বার থেকে আমি যে অংশ লাভ করেছি তা আমার জন্যে রেখে দিলাম। হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! সত্যবাদিতার বরকতে আল্লাহ আমাকে মুক্তি দান করেছেন। আল্লাহর শপথ! যখন থেকে আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে সত্যবাদিতার বর্ণনা করেছি তখন থেকে কখনো মিথ্যা কথা বলিনি। আল্লাহ তা'আলার কাছে প্রার্থনা এই যে, ভবিষ্যতেও যেন তিনি আমার মুখ দিয়ে মিথ্যা কথা বের না করেন।[১]

لَقَدْ تَابَ اللّٰهُ...... আল্লাহ পাকের এই উক্তি সম্পর্কে কা'ব (রাঃ) বলেন, আল্লাহর কসম! আমার ইসলাম গ্রহণের পর থেকে আমার উপর আল্লাহ তা'আলার এর চেয়ে বড় নিয়ামত আর কি হতে পারে যে, তিনি আমাকে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সামনে সত্য কথা বলার তাওফীক দান করেছেন? নতুবা আমিও ঐ লোকদের মতই ধ্বংস হয়ে যেতাম যারা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সামনে মিথ্যা কথা বলে পারলৌকিক জীবনের দিক দিয়ে ধ্বংস হয়ে গেছে। এই লোকদের সম্পর্কেই আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

سَيَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ لَكُمْ اِذَا انْقَلَبْتُمْ اِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوْا عَنْهُمْ فَاَعْرِضُوْا عَنْهُمْ اِنَّهُمْ رِجْسٌ وَّ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ جَزَآءً بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ - يَحْلِفُوْنَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَاِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يَرْضٰى عَنِ الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْنَ

অর্থাৎ "হ্যাঁ, তারা তখন তোমাদের সামনে আল্লাহর শপথ করে বলবে যখন তোমরা তাদের কাছে ফিরে যাবে, যেন তোমরা তাদেরকে তাদের অবস্থার উপর ছেড়ে দাও; অতএব, তারা হচ্ছে অতিশয় অপবিত্র আর তাদের ঠিকানা হচ্ছে জাহান্নাম, সেই সব কর্মের বিনিময়ে যা তারা করতো। তারা এ জন্যে শপথ করবে যেন তোমরা তাদের প্রতি রাযী হয়ে যাও, অনন্তর যদি তোমরা তাদের প্রতি রাযী হয়ে যাও, তবে আল্লাহ তো এমন দুষ্কর্মকারী লোকদের প্রতি রাযী হন না।" (৯ঃ ৯৫-৯৬)

এই আয়াতটি পাঠ করে কা'ব (রাঃ) বলেনঃ "আমাদের তিন ব্যক্তির ফায়সালা ঐ লোকদের পিছনে নিক্ষেপ করা হয়েছিল যারা মিথ্যা শপথ করেছিল এবং রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে তাদের বাহ্যিক শপথকে মেনে নিয়ে তাদের বায়আত কবূল করতে হয়েছিল। তিনি তাদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনাও করেছিলেন। কিন্তু

১. এই হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

আমাদের ফায়সালা তিনি স্থগিত রেখেছিলেন যে পর্যন্ত না আল্লাহ তা'আলা وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا.....-এ আয়াতটি অবতীর্ণ করেন। আমাদেরকে পিছনে নিক্ষেপ করা দ্বারা আমাদের ফায়সালাকে পিছনে নিক্ষেপ করা বুঝানো হয়েছে, এটা নয় যে, আমাদেরকে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা থেকে পিছনে নিক্ষেপ করা হয়েছিল।” এই হাদীসটি বিশুদ্ধরূপে প্রমাণিত এবং মুত্তাফিক আলাইহে। ইমাম বুখারী (রঃ) এবং ইমাম মুসলিমও (রঃ) যুহরী (রঃ)-এর হাদীস হতে এরূপই রিওয়ায়াত করেছেন। এই হাদীসটি উত্তম পন্থায় এই আয়াতে কারীমার তাফসীর করছে। পূর্ববর্তী গুরুজনদের প্রায় সবাই এরূপই রিওয়ায়াত করেছেন। জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ)-এরও এই আয়াত সম্পর্কে এই উক্তিই রয়েছে যে, এই তিনজন হচ্ছেন কা'ব ইবনে মালিক (রাঃ), হিলাল ইবনে উমাইয়া (রাঃ) এবং মুরারা ইবনে রাবী (রাঃ)। এঁরা সবাই আনসারী ছিলেন। মুজাহিদ (রঃ), যহ্হাক (রঃ), কাতাদা (রঃ), সুদ্দী (রঃ) প্রমুখ এটাই বলেছেন। সবাই মুরারা ইবনে রাবীআ বলেছেন। ইমাম মুসলিমও (রঃ) ইবনে রাবীআ' লিখেছেন। কিন্তু কোন কোন নুসখায় রয়েছে রাবী ইবনে মুরারা। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে মুরারা ইবনে রাবীআ' (রাঃ) লিখিত আছে। আর রিওয়ায়াতও এটাই আছে। আর এ কথা যে বলা হয়েছে যে, অপর দু'ব্যক্তি বদরের যুদ্ধে শরীক ছিলেন তা ইমাম যুহরী (রঃ)-এর ভুল ধারণা মনে করা হয়েছে। কেননা, এই তিনজনের কেউই বদরের যুদ্ধে শরীক ছিলেন না। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী।

আল্লাহ তা'আলা ঐ তিন ব্যক্তির দুশ্চিন্তার বর্ণনা দিলেন যা তাঁরা মুসলিমদের বয়কটের পঞ্চাশ দিন ভোগ করেছিলেন এবং তাঁদের জীবন ও দুনিয়া তাঁদের উপর সংকীর্ণ হয়ে পড়েছিল। তাঁদের বাইরে যাতায়াতও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তাঁরা কি করবেন তা অনুধাবন করতে পারছিলেন না। তাঁরা বুঝেছিলেন যে, ধৈর্য ধারণ এবং লাঞ্ছনা ও অপমানের উপর সন্তুষ্ট থাকা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সামনে মিথ্যা ওযর পেশ না করার কারণে আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে কিছুকাল শাস্তি ভোগ করানোর পর তাঁদের তাওবা কবূল করেন। এ জন্যে তিনি বলেন ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ كُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ

অর্থাৎ “হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং (কাজে কর্মে) সত্যবাদীদের সঙ্গে থাকো।” তাহলে তোমরা ধ্বংস ও বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা

পেয়ে যাবে। ইবনে মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "তোমরা শুধু সত্য কথা বল। কেননা, সত্যবাদিতা হচ্ছে পুণ্যের কাজ। আর পুণ্য জান্নাত পর্যন্ত পৌঁছিয়ে থাকে। যে ব্যক্তি সত্য কথা বলে, তার নাম আল্লাহর দফতরে সত্যবাদীরূপে লিখিত হয়। মিথ্যা কথা বলা থেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত থাকো। কেননা, মিথ্যা পাপাচারের দিকে নিয়ে যায়। আর পাপাচার জাহান্নাম পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়। মানুষ যখন মিথ্যা কথা বলতে থাকে তখন আল্লাহর দফতরে তার নাম 'মিথ্যাবাদী' রূপে লিখে দেয়া হয়।" এই হাদীসটি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে।

ইবনে মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ "আন্তরিকভাবে বা রহস্যভাবে, কোন অবস্থাতেই মিথ্যা বলা বৈধ নয়। ইচ্ছা করলে আল্লাহ তা'আলার يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ كُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ -এই উক্তিটি পাঠ কর।" অতঃপর তিনি বলেনঃ "তোমরা কি মনে করতে পার যে, কেউ এই হুকুমের আওতার বহির্ভূত হতে পারে?" আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) বলেন যে, مَعَ الصّٰدِقِيْنَ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে মুহাম্মাদ (সঃ) ও তাঁর সাহাবীগণ। যহ্হাক (রঃ) বলেন যে, এর দ্বারা আবূ বকর (রাঃ) ও উমার (রাঃ)-কে বুঝানো হয়েছে। হাসান বসরী (রঃ) বলেনঃ صَادِقِيْن বা সত্যবাদীদের সাথে সামিল হতে চাইলে দুনিয়া হতে উদাসীন থাকো এবং সাধারণ মানুষের সাথে মেলামেশা কম কর।"

১২০। মদীনার অধিবাসীদের এবং তাদের আশে-পাশে যেসব পল্লী রয়েছে, তাদের পক্ষে এটা উচিত ছিল না যে, তারা আল্লাহর রাসূলের সঙ্গী না হয়, আর এটাও (উচিত ছিল) না যে, নিজেদের প্রাণ তাঁর প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় মনে করে; এটার (অর্থাৎ রাসূলের সঙ্গী হওয়ার প্রয়োজনীয়তার) কারণ এই যে, আল্লাহর পথে তাদের যে পিপাসা দেখা দেয়, যে ক্লান্তি স্পর্শ করে, আর যে ক্ষুধা পায়,

١٢٠- مَا كَانَ لِاَهْلِ الْمَدِيْنَةِ وَ مَنْ حَوْلَهُمْ مِّنَ الْاَعْرَابِ اَنْ يَّتَخَلَّفُوْا عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ وَ لَا يَرْغَبُوْا بِاَنْفُسِهِمْ عَنْ نَّفْسِهٖ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ لَا يُصِيْبُهُمْ ظَمَاٌ وَّ لَا نَصَبٌ وَّلَا مَخْمَصَةٌ فِيْ

سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ لَا يَطَئُوْنَ مَوْطِئًا يَّغِيْظُ الْكُفَّارَ وَ لَا يَنَالُوْنَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلًا اِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهٖ عَمَلٌ صَالِحٌ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ ۙ

আর তাদের এমন পদক্ষেপ যা কাফিরদের ক্রোধের কারণ হয়ে থাকে, আর দুশমনদের হতে তারা যা কিছু প্রাপ্ত হয় –এর প্রত্যেকটির বিনিময়ে তাদের জন্যে এক একটি নেক আমল লিপিবদ্ধ হয়ে যায়, নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎ কর্মশীল লোকদের পুণ্যফল (সওয়াব) বিনষ্ট করবেন না।

তাবূকের যুদ্ধে মদীনাবাসীদের যে আরব গোত্রগুলো যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত ছিল এবং নবী (সঃ)-কে যুদ্ধে যে দুঃখকষ্ট সহ্য করতে হয়েছিল তাতে সহানুভূতি না দেখিয়ে বরং আরামপ্রিয়তা অবলম্বন করেছিল তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ক্রোধের সুরে বলেন যে, তারা যুদ্ধে অংশগ্রহণের প্রতিদান থেকে নিজেদেরকে বঞ্চিত করেছে। তারা না পিপাসার কষ্ট পেয়েছে, না যুদ্ধের ক্লান্তি সহ্য করেছে। না ক্ষুধার কষ্ট অনুধাবন করেছে, না তারা এমন স্থানে এসেছে যা কাফিরদেরকে ভীত-সন্ত্রস্ত করতো, আর না তারা কাফিরদের উপর জয়যুক্ত ও সফলকাম হওয়ার মর্যাদা লাভ করেছে। পক্ষান্তরে, যারা এসব কষ্ট সহ্য করেছে এবং এসব কষ্ট যারা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে স্বীকার করে নিয়েছে, তাদের উপর কোন জোর জবরদস্তি করা হয়নি, আল্লাহ্ এসব নেককার লোকের নেক কাজের প্রতিদান কখনো নষ্ট করবেন না। যেমন মহান আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেনঃ

اِنَّا لَا نُضِيْعُ اَجْرَ مَنْ اَحْسَنَ عَمَلًا

অর্থাৎ "যে ব্যক্তি ভাল কাজ করেছে, আমি তার প্রতিদান বিনষ্ট করবো না।" (১৮ ঃ ৩০)

١٢١- وَ لَا يُنْفِقُوْنَ نَفَقَةً صَغِيْرَةً وَّ لَا كَبِيْرَةً وَّ لَا يَقْطَعُوْنَ وَادِيًا

১২১। আর ছোট বড় যা কিছু তারা ব্যয় করেছে, আর যত প্রান্তর তাদের অতিক্রম করতে হয়েছে, তৎসমুদয়ও তাদের

إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ○

নামে লিখিত হয়েছে, যেন আল্লাহ তাদের কৃতকর্মসমূহের অতি উত্তম বিনিময় প্রদান করেন।

আল্লাহ পাক বলেন– এই গাযী লোকগুলো আল্লাহর পথে ছোট বড় খরচও করে এবং কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে বন জঙ্গলের অল্পবিস্তর পথ অতিক্রমও করে। এর প্রতিদান তারা অবশ্যই পাবে। আল্লাহ তা'আলা এখানে إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ বলেছেন। আর পূর্ববর্তী আয়াতে كُتِبَ لَهُمْ بِهِ বলেছেন। এই بِهِ -এর ভাবার্থ এই যে, এই খরচকরণ এবং শত্রুদের দিকে এই গমনাগমন হচ্ছে তাদের ব্যক্তিগত ও নিজস্ব কাজ। এ জন্যেই এই আয়াতে শারীফায় مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ বলেছেন। আর পূর্ববর্তী আয়াতে কারীমায় আল্লাহর পথে ক্ষুধা, পিপাসা ইত্যাদির কষ্ট আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে ছিল। এ জন্যে এ আয়াতে بِهِ ও আনা হয়নি এবং আমলকে তাদের দিকে সম্বন্ধযুক্ত করাও হয়নি। আমীরুল মুমিন উসমান ইবনে আফফান (রাঃ) এই আয়াতে কারীমা হতে একটা পূর্ণ ও বিরাট অংশ লাভ করেছেন। কেননা, তাবূকের যুদ্ধে তিনি মুসলিম সেনাবাহিনীকে তাঁর প্রচুর সম্পদ দান করেছিলেন। ইবনে হাব্বাব আসসালমী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) একদা ভাষণ দান করেন এবং এই দরিদ্র ও অভাবগ্রস্ত সেনাবাহিনীকে সাহায্য করার জন্যে জনগণকে উৎসাহিত ও উত্তেজিত করেন। তখন উসমান (রাঃ) বললেনঃ "আমার উপর রইলো জিন ও গদিসহ একশ'টি উট (অর্থাৎ আমি একশ'টি উট দান করবো)।" রাসূলুল্লাহ (সঃ) পুনরায় কওমের কাছে চাঁদা চাইলেন। এবারও উসমান (রাঃ) বললেনঃ "আমার উপর থাকলো জিন, গদি ইত্যাদিসহ একশ'টি উট।" নবী (সঃ) মিম্বরের উপর থেকে এক সিঁড়ি নেমে আবার বললেনঃ "হে লোক সকল! আরো সাহায্যের প্রয়োজন রয়েছে।" তখন উসমান (রাঃ) বললেনঃ "সাজ ও সামানসহ একশ'টি উট।" (বর্ণনাকারী বলেন) আমি তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে দেখলাম যে, তিনি খুশীতে তাঁর হাত এভাবে নাড়াচ্ছেন (সর্বশেষ বর্ণনাকারী আব্দুস সামাদ (রঃ) এ কথা বলার সময় তাঁর হাত নাড়ালেন) এবং তিনি (নবী সঃ) বললেনঃ "এরপর উসমান (রাঃ) যে আমলই করুক না কেন তার (জাহান্নামের আগুনে দগ্ধীভূত হওয়ার) আর কোন ভয় নেই।" অতঃপর উসমান (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রার একটি থলে নিয়ে আসলেন এবং তা তাঁর ক্রোড়ে রেখে দিলেন, যেন তিনি তা দিয়ে অভাব ও অসুবিধাগ্রস্ত সেনাবাহিনীর যুদ্ধ যাত্রার প্রস্তুতি গ্রহণের

ব্যবস্থা করেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) স্বর্ণমুদ্রাগুলো নাড়াচ্ছিলেন এবং বলছিলেনঃ "আজ থেকে উসমান (রাঃ)-কে তার কোন আমল কোন কষ্টে ফেলতে পারবে না। এই এক আমলই তার মুক্তির জন্যে যথেষ্ট।" আর খুশীতে তিনি বার বার ঐ মুদ্রাগুলোকে নাড়াচাড়া করছিলেন।[১]

কাতাদা (রঃ) আল্লাহ তা'আলার وَلَا يَقْطَعُوْنَ -এই উক্তি সম্পর্কে বলেন যে, আল্লাহর পথে সফর করতে গিয়ে মানুষ যত দূর পথ অতিক্রম করে ততই তারা আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভের দিক দিয়ে সামনে এগিয়ে যায়।

১২২। আর মুমিনদের এটা (ও) সমীচীন নয় যে, (জিহাদের জন্যে) সবাই একত্রে বের হয়ে পড়ে; সুতরাং এমন কেন করা হয় না যে, তাদের প্রত্যেকটি বড় দল হতে এক একটি ছোট দল (জিহাদে) বহির্গত হয়, যাতে অবশিষ্ট লোক ধর্মজ্ঞান অর্জন করতে থাকে, আর যাতে তারা নিজ কওম (অর্থাৎ জিহাদে অংশগ্রহণকারীদের) -কে (নাফরমানী হতে) ভয় প্রদর্শন করে যখন তারা ওদের নিকট প্রত্যাবর্তন করে, যেন তারা পরহেয করে চলে।

١٢٢- وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُوْنَ لِيَنْفِرُوْا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِي الدِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوْا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ ۝ ع

(১৫/৪/৪)

এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা এই বর্ণনা দিয়েছেন যে, তাবূকের যুদ্ধে জনগণ যখন রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে গমনের ইচ্ছা করলেন তখন পূর্ববর্তীদের একটি দলের এই ধারণা হলো যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) যখন যুদ্ধের জন্যে বের হবেন তখন প্রত্যেক মুমিনের উপর সেই যুদ্ধে গমন করা ওয়াজিব হয়ে যাবে। এ জন্যেই مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِيْنَةِ বলেছেন এবং اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالًا (৯ঃ ৪১) আল্লাহ তা'আলা وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِّنَ الْأَعْرَابِ -এই উক্তি করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন যে, এই আয়াত দ্বারা উপরের আয়াতগুলো মনসূখ বা রহিত হয়ে গেছে। এ কথা বলা হয়েছে যে, সমস্ত গোত্রের সফর করা বা কোন গোত্রের সবাই বের না হয়ে কতক

১. এ হাদীসটি আব্দুর রহমান ইবনে সামরা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন।

লোকের সফর করা দ্বারা আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্য এই যে, যারা সফরে না গিয়ে নবী (সঃ) -এর সাথে অবস্থান করবে তারা যেন নতুন অবতারিত অহী লিখে নেয় এবং মুখস্থ করে রাখে এবং সফর হতে প্রত্যাবর্তনকারীদেরকে আল্লাহ পাকের আহকাম জানিয়ে দেয়। আর সফর হতে প্রত্যাবর্তনকারীদের কর্তব্য হবে নবী (সঃ)-এর সাথে অবস্থানকারীদেরকে এটা জানিয়ে দেয়া যে, তারা শত্রুদের সাথে কিভাবে সময় কাটিয়েছে এবং কাফিরদের অবস্থা কিরূপ। এখন এই স্থিরীকৃত সফরে দু'টি বিষয় একত্রিত হলো। এক স্থিরীকৃত সফর ঐ লোকদের, যারা জিহাদে যাচ্ছে। আর দ্বিতীয় ঐ লোকদের অবস্থান যারা ধর্মীয় জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে নবী (সঃ)-এর সাথে রয়ে গেছে। কেননা, এটা হচ্ছে ফরযে কিফায়া। কিছু লোক না করলে বাকী লোকদের উপর তা জরুরী ও ফরয। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন– مَا كَانَ الْمُؤْمِنُوْنَ لِيَنْفِرُوْا كَافَّةً -এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন– মুমিনদের জন্যে এটা উচিত নয় যে, নবী (সঃ)-এর নিকট থেকে সবাই চলে যাবে এবং নবী (সঃ)-কে একাকী ছেড়ে দেবে। আর এরূপ কেন হবে না যে, প্রত্যেক দলের মধ্য থেকে লোক যাবে যাতে অবশিষ্ট লোক রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে থেকে দ্বীনের জ্ঞান লাভ করতে পারে এবং যখন তারা ফিরে আসবে তখন এরা নিজেদের কওমের কাছে গিয়ে তাদেরকে দ্বীন সম্পর্কে অবহিত করবে ও আল্লাহ থেকে ভয় প্রদর্শন করবে। আর রাসূলুল্লাহ (সঃ) যতক্ষণ না সফরে গমনের অনুমতি দেন ততক্ষণ সফরে গমন করবে না। এই লোকদের অনুপস্থিতির সময়কালে কুরআনের যেসব আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে ঐগুলোকে নবী (সঃ)-এর কাছে অবস্থানকারী লোকেরা তা জানিয়ে দেবে এবং বলে দেবেঃ "আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল (সঃ)-এর উপর এগুলো অবতীর্ণ করেছেন, আমরা এগুলো শিখেছি। এখন তোমরা সফর হতে ফিরে এসেছো, সুতরাং তোমরাও এগুলো শিখে নাও।" এখন আবার দ্বিতীয় দলকে পাঠানো হবে যেন তারা পরহেয করে চলে। لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ -এর অর্থ এটাই।

মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, এই আয়াত রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাহাবীদের মধ্যে ঐ লোকদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয় যারা শিক্ষা লাভ করে নিজেদের পল্লীতে চলে যায়। সেখানে জনগণের নিকট থেকে উপকার লাভ করে, শান্তি ও আরাম প্রাপ্ত হয়, ধন-সম্পদও উপার্জন করে এবং দ্বীনের তবলীগও করে। কিন্তু জনগণ তাদেরকে বলেঃ "তোমরা নবী (সঃ) ও তাঁর সাহাবীদের সাহচর্য পরিত্যাগ করে আমাদের কাছে চলে এসেছো এবং তাঁর সঙ্গ লাভ হতে সরে পড়েছো!" এ কথায় তারা মনে খুব ব্যথা ও দুঃখ অনুভব করলো। তারা সবাই পল্লী হতে নবী

(সঃ)-এর কাছে এসে গেল। এ ব্যাপারেই আল্লাহ তা'আলা আয়াত নাযিল করলেনঃ "এমন কেন করা হয় না যে, তাদের প্রত্যেকটি বড় দল হতে এক একটি ছোট দল (জিহাদে) বহির্গত হয় যাতে অবশিষ্টরা ধর্মজ্ঞান অর্জন করতে থাকে, আর যাতে তারা নিজ কওম অর্থাৎ জিহাদে অংশগ্রহণকারীদেরকে নাফরমানী হতে ভয় প্রদর্শন করে যখন তারা ওদের নিকট প্রত্যাবর্তন করে, যেন তারা পরহেয করে চলে।" কাতাদা (রঃ) বলেন যে, এই আয়াত ঐ সময় অবতীর্ণ হয় যখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে নির্দেশ দেন যে, তারা যেন নবী (সঃ)-এর সাথে থেকে যুদ্ধ করে। কিন্তু অন্য একটি দল যেন তাঁর সাথে অবস্থান করে, যাতে তারা ধর্মীয় জ্ঞান লাভ করতে পারে। আর অন্য আরেকটি দল যেন নিজের গোত্রের কাছে পল্লীতে চলে যায় এবং আল্লাহর ঐ আযাব থেকে তাদেরকে ভয় প্রদর্শন করে যে আযাব তাদের পূর্ববর্তী কওমদের উপর অবতীর্ণ হয়েছিল।

যহ্হাক (রঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) যখন স্বয়ং যুদ্ধে গমন করেন তখন ওযর বিশিষ্ট লোকদের ছাড়া আর কারো এই অনুমতি নেই যে, সে পিছনে রয়ে যায়। আর যদি তিনি স্বয়ং না যান বরং সেনাবাহিনী পাঠিয়ে দেন তবে তাঁর অনুমতি ছাড়া কেউ সেনাবাহিনীর মধ্যে শরীক হতে পারে না। যখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) কর্তৃক প্রেরিত সেনাবাহিনী যুদ্ধে গমন করে এবং তাদের অনুপস্থিতিকালে যে অহী অবতীর্ণ হয়, আর নবী (সঃ) তাঁর পাশে অবস্থানকারীদেরকে তা শুনিয়ে দেন, তখন ঐ সেনাবাহিনী ফিরে আসলে এই অবস্থানরত লোকেরা তাদেরকে তা শুনিয়ে দিয়ে বলবেঃ "তোমাদের যুদ্ধে গমনের পর এই অহী অবতীর্ণ হয়েছে।" এভাবে তাদের মধ্যেও ধর্মীয় জ্ঞান সৃষ্টি করতে হবে। সবারই যুদ্ধে গমন না করার নির্দেশ ঐ অবস্থায় প্রযোজ্য হবে যখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) সেনাবাহিনী পাঠিয়ে দিয়ে নিজে বাড়ীতে অবস্থান করেন।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, لِيَنْفِرُوْا كَافَّةً.....-এই আয়াতটি জিহাদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়নি। বরং রাসূলুল্লাহ (সঃ) যখন মুযার গোত্রের উপর দুর্ভিক্ষের বদ দুআ' করেন এবং সবাই দুর্ভিক্ষের কবলে পতিত হয়, তখন সবাই মদীনায় এসে বাস করতে শুরু করে এবং নিজেদেরকে ঝুট মুট মুসলিম বলে পরিচয় দেয়। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাহাবীদের উপর তাদের মেহমানদারী বোঝা স্বরূপ হয়। তখন আল্লাহ তা'আলা অহীর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জানিয়ে দেন যে, প্রকৃতপক্ষে তারা মুসলিম নয়। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাদেরকে নিজ নিজ গোত্রের নিকট ফিরিয়ে দেন। আর দ্বিতীয়বার যেন এরূপ না করা হয় এ ব্যাপারে তাদেরকে সতর্ক করে দেন।

وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ........ -এই আয়াতের ব্যাপারে ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, আরবের প্রত্যেকটি গোত্রের মধ্য হতে দলে দলে লোক রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট আগমন করতো। তারা তাঁকে ধর্মীয় বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করতো। তাদের ধর্মীয় জ্ঞান লাভের ইচ্ছা থাকতো। তারা নবী (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করতোঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমাদেরকে কি কাজের নির্দেশ দিচ্ছেন?" তারা আরো বলতোঃ "আমাদের গোত্রের কাছে গিয়ে আমরা কি করবো?" তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাদেরকে উপদেশ দিতেন আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ)-এর আনুগত্য করার এবং বলতেনঃ "তোমরা তোমাদের কওমের কাছে গিয়ে তাদের মধ্যে সালাত ও যাকাতের প্রসার ঘটাবে।" তারা তখন তাদের গোত্রের কাছে গিয়ে তাদেরকে পরিষ্কারভাবে বলে দিতোঃ "তোমরা যদি ইসলাম গ্রহণ কর তবে আমরা তোমাদের সাথে রয়েছি, নচেৎ নই।" আর তারা তাদেরকে আল্লাহ হতে ভয় প্রদর্শন করতো। এমন কি এরূপ হিদায়াতপ্রাপ্ত লোক নিজের কাফির পিতা-মাতা থেকেও সম্পর্ক ছিন্ন করতো। নবী (সঃ) তাদেরকে সতর্ক করতেন এবং আল্লাহ হতে ভয় প্রদর্শন করতেন। ঐ লোকগুলো যখন নিজেদের লোকদের কাছে ফিরে যেতো তখন তাদেরকে দ্বীন ইসলামের দিকে আহ্বান করতো, জাহান্নাম হতে ভয় দেখাতো এবং জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করতো।

ইকরামা (রঃ) বলেন যে, যখন إِلَّا تَنفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (৯ ঃ৩৯) এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয় তখন কাফিররা বলতে শুরু করেঃ "এখন তো তাহলে ঐ গ্রাম্য মুসলিমরা ধ্বংস হয়ে গেল যারা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে যুদ্ধে গমন না করে পিছনে রয়েছিল।" অথচ তাঁরা তো রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাহাবীদের মধ্যকার ঐ সব লোক ছিলেন যাঁরা নিজেদের কওমের লোকদেরকে দ্বীন শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যে গমন করেছিলেন এবং তাঁদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করার কারণ তো ছিল এটাই। তাই আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করে দিলেন—এই লোকগুলো যুদ্ধের জন্যে কেন গমন করবে? কিছু লোক অন্যদেরকে দ্বীন শিখাবার জন্যে কেন রয়ে যাবে না? ঐ সময় وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ...... (৪২ঃ ১৬) এই আয়াত অবতীর্ণ হয়।

হাসান বসরী (রঃ) বলেন, এই আয়াতের উদ্দেশ্য ছিল এই যে, যারা যুদ্ধে গমন করেছে তারা যখন নিজেদের লোকদের কাছে ফিরে আসবে তখন যুদ্ধের ফলাফলে তারা যে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রভাব দেখেছে এবং ইসলামের শান-শওকতপূর্ণ বিজয় অবলোকন করেছে, তা যেন জনগণকে অবহিত করে।

১২৩। হে মুমিনগণ! ঐ কাফিরদের সাথে যুদ্ধ কর যারা তোমাদের আশে-পাশে অবস্থান করে, আর যেন তারা তোমাদের মধ্যে কঠোরতা পায়; আর জেনে রেখো যে, আল্লাহ পরহেযগারদের সাথে রয়েছেন।

١٢٣- يَٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَاتِلُوا الَّذِيْنَ يَلُوْنَكُمْ مِّنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوْا فِيْكُمْ غِلْظَةً وَّاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ ○

আল্লাহ তা'আলা মুমিনদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, তারা যেন প্রথমে ঐ জায়গার কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করে যা ইসলামের কেন্দ্রস্থলের অতি নিকটবর্তী। এ জন্যেই রাসূলুল্লাহ (সঃ) সর্বপ্রথম আরব উপদ্বীপের মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ শুরু করেছিলেন। তারপর তিনি মক্কা, মদীনা, তায়েফ, ইয়ামন, ইয়ামামা, হিজর, খায়বার, হাযারা মাউত প্রভৃতি জায়গার অমুসলিমদের সাথে যুদ্ধ করেছিলেন। মোটকথা, প্রথমে তিনি আরব উপদ্বীপের বিভিন্ন অঞ্চল জয় করেন এবং ওগুলোর অধিবাসীদেরকে মুসলিম বানিয়ে নেন। আরব গোত্রগুলো দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতে থাকে। এরপর আহলে কিতাবদের সাথে যুদ্ধ হয় এবং রোমকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এই লোকগুলো আরব উপদ্বীপের নিকটেই বসবাস করতো। ইসলামের দাওয়াত সর্বপ্রথম তাদেরকে দেয়ারই প্রয়োজন ছিল। তাছাড়া তারা ছিল আহলে কিতাব। কিন্তু তাবূক পর্যন্ত পৌঁছে মুসলিমরা আর আগে না বেড়ে ফিরে আসেন। কেননা, তাঁদের অবস্থা ছিল ঐ সময় খুবই সংকীর্ণ এবং তাঁরা দুর্ভিক্ষের কবলে পতিত হয়েছিলেন। এটা ছিল নবম হিজরীর ঘটনা। দশম হিজরীতে নবী (সঃ) বিদায় হজ্বের ব্যাপারে মশগুল ছিলেন। বিদায় হজ্বের একাশি দিন পরে তিনি ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তাঁর ইন্তেকালের পর তাঁর নির্দেশ পূরণকারীরূপে দাঁড়িয়ে গেলেন তাঁর উযীর ও বন্ধু আবূ বকর (রাঃ)। এই বাধ্যতামূলক ইনকিলাবের সময়ে দ্বীনের মধ্যে একটা চাঞ্চল্যকর অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা আবূ বকর (রাঃ)-এর মাধ্যমে দ্বীনের মধ্যে দৃঢ়তা আনয়ন করেন। আবূ বকর (রাঃ) দ্বীনকে মজবুত করে দেন এবং এর স্তম্ভকে দৃঢ় করেন। আর ধর্মত্যাগী লোকদেরকে পুনরায় ধর্মের দিকে ফিরিয়ে আনেন। যারা যাকাত দিতে অস্বীকার করেছিল তাদেরকে যাকাত প্রদানে বাধ্য করেন। যারা ধর্মের মাসআলা থেকে বিস্মরণ হয়ে গিয়েছিল তাদেরকে তা স্মরণ করিয়ে দেন।

রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে সম্পর্কযুক্ত যেসব কর্তব্য ছিল সেগুলো তিনি পূর্ণ করেন। তারপর তিনি মুসলিম সেনাবাহিনীকে রোম সাম্রাজ্যের দিকে প্রেরণ করেন। তারা ছিল শূলের পূজারী। ইসলামী বাহিনীকে তিনি অগ্নিপূজক পারস্যবাসীদের দিকেও প্রেরণ করেন। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নবী (সঃ)-এর বরকতে এই অঞ্চলগুলোর উপর মুসলিমদেরকে বিজয় দান করেন। আর (পারস্য সম্রাট) কিসরা ও (রোম সম্রাট) কায়সার এবং তাদের অনুসারীরা হয় লাঞ্ছিত ও অপমানিত। এই দুই সম্রাটের ধনভাণ্ডার আল্লাহর পথে খরচ করা হয়, যেমন রাসূলুল্লাহ (সঃ) ইতিপূর্বে এর সংবাদ দিয়েছিলেন। সুতরাং তাঁর উপদেশ প্রাপ্ত ব্যক্তি আবূ বকর (রাঃ) তাঁর এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করেন। তারপর পূর্ণ করেন আবূ বকর (রাঃ)-এর স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি উমার (রাঃ)। উমার (রাঃ)-এর মাধ্যমে এই বিপথগামী কাফিরদেরকে খুবই লাঞ্ছিত করা হয়। বিদ্রোহী ও মুনাফিকদেরকে পূর্ণরূপে দমন করেন এবং পূর্ব ও পশ্চিমের সমস্ত সাম্রাজ্যের উপর বিজয় লাভ করেন। নিকটের ও দূরের সমস্ত রাজ্যের ধন-সম্পদ ইসলামের কেন্দ্রস্থলে নিয়ে আসা হয়। এসব সম্পদ শরীয়তের বিধান অনুযায়ী হকদার লোকদের মধ্যে ও জরুরী কাজে ব্যয় করা হয়। উমার (রাঃ) জীবিত থাকলেন প্রশংসার পাত্র হয়ে এবং মারা গেলেন শহীদরূপে। তারপর মুহাজির ও আনসারগণ সর্বসম্মতভাবে আমীরুল মুমিনীন উসমান (রাঃ)-কে খলীফা নির্বাচন করলেন। উসমান (রাঃ)-এর যুগে ইসলামের শান-শওকত বৃদ্ধি পায় এবং সুনাম অর্জিত হয়। আর সারা ইসলাম জগতে মানুষের উপর হুজ্জতে ইসলাম জয়যুক্ত হয়। তাঁর যুগেই পূর্ব ও পশ্চিমের সব জায়গাতেই ইসলাম উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করে। আল্লাহর কালেমার প্রভাব প্রতিটি জায়গায় মানুষদের উপর ছড়িয়ে পড়ে এবং মিল্লাতে হানীফিয়্যা আল্লাহর শত্রুদের উপর পূর্ণ বিজয় লাভ করে। কোন সময় এক কওমের উপর এবং কোন সময় অন্য কওমের উপর ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়। আবার কখনো এমন কওমের উপর বিজয় লাভ করে যাদের ঐ কাফির ও মুশ্‌রিকদের সাথে মিত্রতা রয়েছে। এটা ছিল আল্লাহ তা'আলার নিম্নের নির্দেশ অনুযায়ীঃ يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَاتِلُوا الَّذِيْنَ يَلُوْنَكُمْ مِّنَ الْكُفَّارِ । আর এক জায়গায় বলেনঃ وَلْيَجِدُوْا فِيْكُمْ غِلْظَةً অর্থাৎ "হে মুমিনগণ! তোমরা কাফিরদের সাথে যুদ্ধ কর যারা তোমাদের নিকটবর্তী এবং তারা যেন তোমাদের মধ্যে কঠোরতা পায়।" কেননা, পূর্ণ মুমিন হচ্ছে ঐ ব্যক্তি, যার আচরণ নিজেদের মধ্যে খুবই কোমল এবং কাফিরদের উপর অত্যন্ত কঠোর। যেমন আল্লাহ পাক বলেনঃ

فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ

অর্থাৎ "অচিরেই আল্লাহ এমন কওমকে আনয়ন করবেন যাদেরকে তিনি ভালবাসেন এবং তারাও তাঁকে ভালবাসে। তারা মু'মিনদের প্রতি কোমল ও কাফিরদের প্রতি কঠোর হবে।" (৫ঃ ৫৪) আর এক জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ

অর্থাৎ "আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ (সঃ) এবং তাঁর সঙ্গীরা কাফিরদের উপর অত্যন্ত কঠোর এবং তাদের পরস্পরের প্রতি খুবই দয়ালু।" (৪৮ঃ ২৯) অন্য এক জায়গায় বলেনঃ

يَأَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ

অর্থাৎ "হে নবী (সঃ)! কাফির ও মুনাফিকদের সাথে যুদ্ধ কর এবং তাদের উপর কঠোর হও।" (৬৬ঃ ৯)

হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "আমি খুব হাস্যকারী, আবার খুব যুদ্ধকারীও বটে।" অর্থাৎ আমি বন্ধুদের জন্যে খোশ মেযাজী, আবার শত্রুদের সাথে ভীষণ যুদ্ধকারীও বটে। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "তোমরা কাফিরদের সাথে যুদ্ধ কর এবং আল্লাহর উপর ভরসা কর। আর বিশ্বাস রেখো যে, যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তাঁর আনুগত্য কর তবে তিনি সদা তোমাদের সাথে রয়েছেন।" এ বিষয়টি এই উম্মতের সর্বোত্তম যুগ কুরূণে সালাসার মধ্যে খুবই দৃঢ়তার সাথে ছিল। আর এ যুগটা ছিল আল্লাহর আনুগত্য প্রতিষ্ঠার যুগ। মুসলিমরা সদা কাফিরদের উপর বিজয়ী থাকে এবং কাফিররা সর্বদা ক্ষতিগ্রস্ত ও লাঞ্ছিত হয়। যখন বাদশাহদের মধ্যে গণ্ডগোল ও মতানৈক্য সৃষ্টি হয় তখন শত্রুরা দেশসমূহের চারদিকে দৃষ্টিপাত করতে শুরু করে। তারা ইসলামী সাম্রাজ্যগুলোর দিকে ধাবিত হয় এবং শত্রু দেশগুলো একে অপরের সাথে এক জোট হয়ে যায়। তারপর একে অপরের সাহায্যে ইসলামী সাম্রাজ্যগুলোর সীমান্তের উপর চড়াও হয়। এভাবে তারা মুসলিমদের বহু দেশ দখল করে নেয়। কিন্তু যে ইসলামী বাদশাহ্ আল্লাহর আহকাম মেনে নেয়, আল্লাহর উপর ভরসা করে, তখন আল্লাহ অবশ্যই তাকে বিজয় দান করেন এবং সে হারানো দেশ পুনরুদ্ধার করে। আমরা আশা রাখি যে, আল্লাহ তা'আলা পুনরায় মুসলিমদের বিজয় দান করবেন এবং সারা দুনিয়ায় তাওহীদের কালেমা সমুন্নত হবে। তিনি হচ্ছেন পরম দাতা ও দয়ালু।

১২৪। আর যখন কোন সূরা অবতীর্ণ করা হয় তখন কোন কোন মুনাফিক বলে—তোমাদের মধ্যে এই সূরা কার ঈমান বৃদ্ধি করলো? অনন্তর যেসব লোক ঈমান এনেছে, এই সূরা তাদের ঈমানকে বর্ধিত করেছে এবং তারাই আনন্দ লাভ করেছে।

١٢٤- وَإِذَا مَآ أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِۦٓ إِيمَٰنًا ۚ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ فَزَادَتْهُمْ إِيمَٰنًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ۝

১২৫। আর যাদের অন্তরসমূহে রোগ রয়েছে, এই সূরা তাদের মলিনতার সাথে আরো মলিনতা বর্ধিত করেছে, আর তাদের কুফরী অবস্থাতেই মৃত্যু হয়েছে।

١٢٥- وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا۟ وَهُمْ كَٰفِرُونَ ۝

আল্লাহ তা'আলা বলেন, যখন এই সূরা অবতীর্ণ হয় তখন মুনাফিকরা একে অপরকে বলে—আচ্ছা, এই সূরাটি মুসলিমদের মধ্যে এমন কোন অতিরিক্ত ঈমান এবং অতিরিক্ত সৌন্দর্য সৃষ্টি করলো? তাদের এই প্রশ্নের উত্তরে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই মুসলিমদের মধ্যে অধিক ঈমান সৃষ্টি হয়েছে। আর তারা এতে খুশীও হয়েছে।

এই আয়াতটি এই ব্যাপারে বড় দলীল যে, ঈমান বাড়ে এবং কমে। এটা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অধিকাংশ আলেমের মাযহাব। এমন কি অধিকাংশের উক্তি এই যে, এই ইতেকাদ বা বিশ্বাসের উপর উম্মতের ইজমা হয়েছে। শারহে বুখারীর শুরুতে এই মাসআলার উপর দীর্ঘ আলোচনা করা হয়েছে।

কিন্তু যাদের অন্তরে পীড়া রয়েছে, এই আয়াতের মাধ্যমে তাদের সন্দেহ আরো বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। যেমন অন্য জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ

অর্থাৎ "আমি কুরআন অবতীর্ণ করেছি যা হচ্ছে (অন্তর রোগের) শিফা।" (১৭ঃ ৮২) আর এক জায়গায় তিনি বলেনঃ

قُلْ هُوَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هُدًى وَّ شِفَاۤءٌ وَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ فِىْ اٰذَانِهِمْ وَقْرٌ وَّ هُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى اُولٰۤئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَّكَانٍۭ بَعِيْدٍ -

অর্থাৎ "হে নবী (সঃ)! তুমি মুমিনদেরকে বলে দাও যে, কুরআন হচ্ছে ঈমানদারদের জন্যে হিদায়াত ও শিফা। আর যারা ঈমান আনে না, (কুরআনের দিক থেকে) তাদের কানে বধিরতা রয়েছে, তাদের চক্ষুগুলো অন্ধ হয়ে আছে, তাদেরকে যেন এতো দূর থেকে ডাকা হচ্ছে যে, তারা শুনতে পাচ্ছে না।" (৪১ঃ ৪৪) এটা কতই না দুর্ভাগ্যের কথা যে, যে জিনিস অন্তরের হিদায়াতের যোগ্যতা রাখে, সেটাই তাদের পথভ্রষ্টতা ও ধ্বংসের কারণ হয়ে যায়। যেমন রুগ্ন ব্যক্তিকে ভাল খাবার দিলেও তা তার ক্ষতি সাধনই করে থাকে।

১২৬। আর তারা কি দেখে না যে, তারা প্রতি বছর একবার বা দু'বার কোন না কোন বিপদে পতিত হয়ে থাকে? তবুও প্রত্যাবর্তন করে না, আর না তারা কিছু বুঝে।

١٢٦- اَوَلَا يَرَوْنَ اَنَّهُمْ يُفْتَنُوْنَ فِىْ كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً اَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوْبُوْنَ وَ لَا هُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ○

১২৭। আর যখন কোন সূরা নাযিল করা হয় তখন তারা একে অপরের দিকে তাকাতে থাকে (এবং ইঙ্গিতে বলে); তোমাদেরকে কেউ দেখছে না তো? অতঃপর তারা চলে যায়; আল্লাহ তাদের অন্তরগুলোকে ফিরিয়ে দিয়েছেন, কারণ তারা হচ্ছে নির্বোধ সমাজ মাত্র।

١٢٧- وَ اِذَا مَاۤ اُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ نَّظَرَ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ هَلْ يَرٰىكُمْ مِّنْ اَحَدٍ ثُمَّ انْصَرَفُوْا صَرَفَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ ○

আল্লাহ তা'আলা বলেন– এই মুনাফিকরা কি এটুকুও বুঝে না যে, প্রতি বছর তাদেরকে একবার বা দু'বার ফিৎনায় জড়িয়ে ফেলা হয়। তথাপি তারা তাদের পূর্ববর্তী গুনাহ্ থেকে বিরত থাকছে না এবং এই ব্যাপারে আগামীতে তাদের যে অবস্থা ঘটতে যাচ্ছে তা থেকে একটুও ভয় করছে না? কাতাদা (রঃ) বলেন যে,

যুদ্ধের বিপদ তাদের মাথায় পতিত হতো। সাহাবীগণ বলেনঃ “প্রতি বছর আমরা কোন না কোন মিথ্যা গুজব শুনতাম যার ফলে অধিকাংশ লোক বিভ্রান্ত হয়ে পড়তো।”[১]

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ “কাঠিন্যের যুগ বেড়ে চলছে, হীনমন্যতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং প্রত্যেক বছর পূর্ব বছরের তুলনায় খারাপ অনুভূত হচ্ছে।” উল্লিখিত আয়াত মুনাফিকদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। এতে বলা হয়েছে যে, নবী (সঃ)-এর উপর যখন কোন সূরা অবতীর্ণ হয় তখন তারা একে অপরকে লক্ষ্য করে বলে— তোমাদেরকে কেউ দেখছে না তো? তারপর তারা সত্য থেকে ফিরে যায়। দুনিয়ায় এই মুনাফিকদের অবস্থা এই যে, না তারা সত্যের সামনে আসে, না তা বুঝে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

فَمَالَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِيْنَ ـ كَاَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنْفِرَةٌ ـ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ ـ

অর্থাৎ “তাদের কি হলো যে, তারা এই উপদেশ হতে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে? যেন তারা বন্য গাধা যারা ব্যাঘ্র হতে পলায়ন করছে।” (৭৪ঃ ৪৯-৫১) আর এক জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

فَمَالِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا قِبَلَكَ مُهْطِعِيْنَ ـ عَنِ الْيَمِيْنِ وَ عَنِ الشِّمَالِ عِزِيْنَ

অর্থাৎ “সুতরাং কাফিরদের কি হলো যে, তারা (এসব বিষয় জেনে নেয়া সত্ত্বেও তা মিথ্যা প্রতিপাদনের জন্যে) তোমার দিকে দৌড়িয়ে আসছে ডান দিক থেকে এবং বাম দিক থেকে দলবদ্ধভাবে?” (৭০ঃ ৩৬-৩৭) তারা যেন বন্য পশু। তারা ব্যাঘ্র হতে পলায়ন করছে এবং একবার ডান দিকে যাচ্ছে, একবার বাম দিকে যাচ্ছে। সত্য থেকে মিথ্যার দিকে তারা ঝুঁকে পড়ছে। আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরগুলো ফিরিয়ে দিয়েছেন। না তারা আল্লাহর ডাক বুঝতে পারছে, না বুঝবার চেষ্টা করছে।

১২৮। তোমাদের নিকট আগমন করেছে তোমাদেরই মধ্যকার এমন একজন রাসূল যার কাছে তোমাদের ক্ষতিকর বিষয় অতি কষ্টদায়ক মনে হয়, যে হচ্ছে তোমাদের খুবই হিতাকাঙ্ক্ষী, মুমিনদের প্রতি বড়ই স্নেহশীল, করুণা পরায়ণ।

١٢٨- لَقَدْ جَاۤءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ○

---

১. এটা ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

১২৯। অতঃপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তুমি বলে দাও–আমার জন্যে তো আল্লাহ্ই যথেষ্ট, তিনি ছাড়া অন্য কোন মা'বূদ নেই, আমি তাঁরই উপর নির্ভর করেছি, আর তিনি হচ্ছেন অতিবড় আরশের মালিক।

١٢٩- فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ۝ ع

এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মুমিনদের উপর নিজের ইহ্সান প্রকাশ করে বলেন– আমি তোমাদের জন্যে তোমাদেরই মধ্য হতে একজন রাসূল প্রেরণ করেছি। যেমন ইবরাহীম (আঃ) প্রার্থনা করেছিলেনঃ

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ

অর্থাৎ "হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি তাদের মধ্যে তাদের নিজেদের মধ্য থেকে একজন রাসূল প্রেরণ করুন।" (২ঃ ১২৯) আল্লাহ্ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেনঃ

لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنْفُسِهِمْ

অর্থাৎ "অবশ্যই আল্লাহ্ মুমিনদের উপর ইহ্সান করেছেন, কারণ তিনি তাদের মধ্যে তাদের নিজেদের মধ্য থেকে একজন রাসূল (সঃ) প্রেরণ করেছেন।" (৩ঃ ১৬৪) অন্য এক জায়গায় আল্লাহ্ পাক বলেনঃ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ অর্থাৎ "অবশ্যই তোমাদের কাছে তোমাদের নিজেদের মধ্য থেকেই একজন রাসূল আগমন করেছে।" যেমন জা'ফর ইবনে আবি তালিব (রাঃ) নাজ্জাশীকে এবং মুগীরা (রাঃ) কিসরার (পারস্য সম্রাট) দূতকে বলেছিলেনঃ "আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের মধ্যে আমাদেরই কওমের একজনকে রাসূল হিসাবে প্রেরণ করেছেন যাঁর বংশ সম্পর্কে আমরা অবহিত রয়েছি, যাঁর গুণাবলী আমরা জানি। যাঁর উঠা, বসা, আসা, যাওয়া, সত্যবাদিতা, বিশ্বস্ততা ইত্যাদি সম্পর্কে আমাদের পূর্ণ জ্ঞান রয়েছে। অজ্ঞতার যুগ থেকেও যাঁর বংশের মধ্যে কোন কলংক নেই।" রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেনঃ "আমি বিয়ের মাধ্যমে বের হয়েছি, ব্যভিচারের মাধ্যমে বের হইনি। আদম (আঃ) থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত আমার পূর্বপুরুষদের কেউই বিবাহের মাধ্যম ছাড়া জন্মগ্রহণ করেনি।"

আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "আদম (আঃ) থেকে নিয়ে আমার পিতা মাতা আমাকে জন্ম দেয়া পর্যন্ত আমার বংশধারা বিবাহের মাধ্যমে চলে আসছে, ব্যভিচারের মাধ্যমে নয়।"

আল্লাহ পাকের উক্তিঃ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ অর্থাৎ হে উম্মতে মুহাম্মাদী! তোমাদের যে কোন কষ্ট ও ক্ষতিকর বিষয় তাঁর (রাসূল সঃ-এর) কাছে খুবই কঠিন ঠেকে। হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেঃ بُعِثْتُ بِالْحَنِيْفِيَّةِ السَّمْحَةِ অর্থাৎ "আমি সহজ দ্বীন নিয়ে আগমন করেছি।" সহীহ হাদীসে রয়েছে– "এই শরীয়ত খুবই সহজ। আল্লাহ তা'আলা এটাকে খুবই সহজ করে পাঠিয়েছেন।"

حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা বড়ই আশা পোষণ করেন যে, তোমরা হিদায়াত লাভ করে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উপকার প্রাপ্ত হও। আবু যার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ "রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদেরকে এমন সাধারণ জ্ঞান দান করেন যে, আকাশে উড়ন্ত কোন পাখী সম্পর্কেও তিনি আমাদেরকে জ্ঞান দেন।" রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "জান্নাতের নিকটবর্তীকারী এবং জাহান্নাম হতে দূরকারী এমন কোন কিছু বাকী নেই যা আমি তোমাদের কাছে বর্ণনা করিনি।"[১]

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক হারাম ও নাজায়েয বিষয় সম্পর্কে তোমাদেরকে অবহিত করেছেন। সুতরাং যদি তোমরা তাঁর বর্ণনাকৃত হারাম বিষয় থেকে দূরে না থাকো তবে আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছি যে, তোমরা এমনভাবে আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে যেমনভাবে পোকা মাকড় আগুনে পতিত হয়ে থাকে।"[২]

ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, (একদা) নবী (সঃ)-এর কাছে দু'জন ফিরিশ্তা আগমন করেন। ঐ সময় তিনি ঘুমাচ্ছিলেন। একজন তাঁর মাথার কাছে বসলেন। পায়ের কাছে উপবিষ্ট ফিরিশ্তা মাথার কাছে উপবিষ্ট ফিরিশ্তাকে বললেনঃ "তাঁর (নবী সঃ-এর) এবং তাঁর উম্মতের অবস্থা উপযোগী কোন একটি উপমা বর্ণনা করুন!" তখন শিয়রে উপবিষ্ট ফিরিশ্তা বললেন, তাঁর উপমা তাঁর উম্মতের সাথে এইরূপ, যেমন একদল লোক সফর করতে করতে এক জন-মানবহীন বিস্তীর্ণ মরু প্রান্তরের মাঝে পৌঁছে গেল। তাদের পাথেয়

১. এই হাদীস দু'টি ইমাম তিবরানী (রঃ) বর্ণনা করেছেন।
২. এই হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

নিঃশেষ হয়ে গেছে। তারা এখন না পারছে সামনে অগ্রসর হতে, না পারছে পিছনে ফিরে আসতে। এমতাবস্থায় একজন সুন্দর পোশাক পরিহিত লোক তাদের কাছে আসলেন এবং বললেনঃ "আমি কি তোমাদেরকে এখান থেকে বের করে এক সুন্দর সবুজ বাগানে নিয়ে যাবো? সেখানে রয়েছে নহর ও পানির হাউজ! তোমরা আমার সাথে যাবেকি?" তারা তাঁর কথায় খুবই খুশী মনে সম্মত হয়ে যায়। তিনি তাদেরকে ঐ সুন্দর সবুজ বাগানে নিয়ে যান। তারা সেখানে সুস্বাদু ফল খেয়ে ও সুপেয় পানি পান করে পরিতুষ্ট ও পরিতৃপ্ত হয় এবং বেশ মোটা তাজা হয়। অতঃপর ঐ লোকটি তাদেরকে বলেনঃ "আমি কি তোমাদের শুভাকাঙক্ষী হিসেবে তোমাদের হক আদায় করিনি এবং তোমাদেরকে সুন্দর শ্যামল স্থানে পৌঁছিয়ে দেইনি? এখন জেনে রেখো যে, তোমাদের সামনে এর চেয়েও বেশী মনোরম ও আনন্দদায়ক সবুজ শ্যামল বাগান রয়েছে এবং সেখানে সুপেয় পানির হাউজও রয়েছে। চল, আমি তোমাদেরকে সেখানে নিয়ে যাই।" তখন তাদের মধ্যে কেউ কেউ বললোঃ "আপনি ইতিপূর্বেও সত্য কথা বলেছিলেন এবং এখনও সত্য কথাই বলছেন। অবশ্যই আমরা আপনার সাথে রয়েছি।" আর কতকগুলো লোক বললোঃ "আমরা তো এখানেই ভাল রয়েছি। আমাদের জন্যে এটাই যথেষ্ট। ভবিষ্যতের ভোগ্য বস্তুর আমাদের কোনই প্রয়োজন নেই।" অর্থাৎ এরা হচ্ছে ঐসব লোক যারা দুনিয়ার পিছনেই পাগল হয়ে রয়েছে, পরকালের কোন খবর তাদের নেই। অথচ এখানকার তুলনায় সেখানকার সুখ বহুগুণে বেশী।

আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, এক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে এসে কিছু আর্থিক সাহায্য চাইলো। ইকরামা (রঃ) বলেন, আমার মনে হয় লোকটি রক্তপণ আদায় করার জন্যে সাহায্য চেয়েছিল। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে কিছু দান করে বলেনঃ "লও, আমি তোমার কাজ চালিয়ে দিলাম এবং তোমার সাথে উত্তম ব্যবহার করলাম।" লোকটি তখন বললোঃ "না, আপনি আমার প্রতি কোন ইহসান বা অনুগ্রহ করেননি।" তার এ কথা শুনে কয়েকজন সাহাবী ক্রোধান্বিত হন এবং তাকে আক্রমণ করার ইচ্ছা করেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) ইঙ্গিতে তাঁদেরকে নিষেধ করে দেন। অতঃপর তিনি উঠে নিজের মনযিলে চলে যান এবং ঐ বেদুঈনকে ডেকে পাঠান। তারপর তিনি তাকে বলেনঃ "তুমি কিছু চেয়েছিলে, আমি তোমাকে দিয়েছিলাম। এর পর তুমি যা বলার তা বলেছো। আচ্ছা, আরো লও।" আবার তিনি তাকে জিজ্ঞেস করেনঃ "এবারও কি আমি

তোমার সাথে উত্তম ব্যবহার করিনি?” বেদুঈন উত্তরে বললোঃ “হ্যাঁ, আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান প্রদান করুন।” তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে বলেনঃ “আমার সাহাবীগণ তোমার প্রতি ক্রোধান্বিত রয়েছে। সুতরাং তুমি এখন তাদের কাছে যাও এবং আমার সামনে যা বললে তাদের সামনেও তাই বলো যাতে তাদের ক্রোধ দূর হয়ে যায়।” বেদুঈন তখন বললোঃ “আচ্ছা, ঠিক আছে।” অতঃপর যখন বেদুঈন তাঁদের কাছে আসলো তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) তার সম্পর্কে বললেনঃ “এ লোকটি আমার কাছে কিছু চেয়েছিল, আমি কিছু তাকে দিয়েছিলাম। কিন্তু সে যা বলেছিল তা তোমরা অবগত আছ। তারপর আমি তাকে ডেকে আরো দিয়েছি। সে এখন সন্তুষ্ট হয়েছে। হে বেদুঈন! আমার এ কথা সত্য কি?” বেদুঈন উত্তরে বললোঃ “হ্যাঁ, আল্লাহ আপনাকে প্রতিদান প্রদান করুন!”

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, আমার ও এই বেদুঈনের দৃষ্টান্ত হচ্ছে এইরূপ, যেমন কোন লোকের একটি উষ্ট্রী রয়েছে। উষ্ট্রীটি উত্তেজিত হয়ে উঠলো। জনগণ ওর পিছনে ছুটলো। উষ্ট্রীটি আরো দ্রুত বেগে পালাতে লাগলো। তখন উষ্ট্রীর মালিক জনগণকে বললোঃ “তোমরা উষ্ট্রীটিকে অনুগত করার ব্যাপারটা আমার উপর ছেড়ে দাও। কারণ ওর আচরণ সম্পর্কে আমিই ভাল জানি। আমি ওকে নম্র করে নেবো।” তারপর সে ঘাস নিয়ে ওকে ডাকতে লাগলো। ও এসে গেল। লোকটি তখন ওকে ঘাস খেতে দিয়ে ধরে ফেললো। ওর উপর জিন ফেলে দিলো। আমিও যদি এই বেদুঈনের দুর্ব্যবহারের কারণে তোমাদের মত তার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে যেতাম তবে সে জাহান্নামী হয়ে যেতো।[১] কিন্তু এই হাদীসটি দুর্বল। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী।

আল্লাহ পাকের উক্তিঃ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ এই আয়াতে কারীমাতেও এই নির্দেশই দেয়া হচ্ছে—হে মুহাম্মাদ (সঃ)! যে মহান শরীয়ত তুমি আনয়ন করেছো, যদি এই লোকগুলো এর থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে তবে তুমি তাদেরকে বলে দাও—আমার জন্যে আল্লাহই যথেষ্ট। আমি তোমাদের উপর নয়, বরং তাঁরই উপর ভরসা করছি। তিনি প্রত্যেক জিনিসের মালিক ও স্রষ্টা, তিনি বিরাট আরশের রব। তাঁর বিরাট আরশ হচ্ছে সারা মাখলূকাতের ছাদ স্বরূপ। যমীন ও আসমানের সমস্ত মাখলূক তাঁর আরশের নীচে রয়েছে। সমস্ত সৃষ্টজীব তাঁর ক্ষমতার দখলে রয়েছে। তাঁর জ্ঞান সমস্ত বস্তুকে পরিবেষ্টনকারী।

---

১. এ হাদীসটি বাযযার (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) বলেন যে, ...لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ -এই আয়াতটিই হচ্ছে কুরআন কারীমের শেষ আয়াত। কুরআনের সমস্ত আয়াত ও সূরা আবূ বকর (রাঃ)-এর খিলাফতকালে বিন্যস্ত কুরআনের আকারে জমা করা হয়। লোকেরা লিখতেন এবং উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) লিখাতেন। যখন সূরায়ে বারাআতের ثُمَّ انْصَرَفُوْا صَرَفَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ -এই আয়াতে পৌঁছেন, তখন ধারণা করা হয় যে, এটাই কুরআন কারীমের শেষ আয়াত। তখন তিনি তাদেরকে বলেন, এর পরে রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে নিম্নের দু'টি আয়াতও শুনিয়েছিলেনঃ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ হতে সূরার শেষ পর্যন্ত। তিনি বলেন যে, এ হচ্ছে কুরআন কারীমের শেষ আয়াত এবং যার উপর শুরু হয়েছিল তারই উপর শেষ হয়েছে। অর্থাৎ ঐ আল্লাহর নামে যিনি ছাড়া অন্য কোন মাবূ'দ নেই। এ সম্পর্কেই আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا نُوْحِىْ اِلَيْهِ اَنَّهٗ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا فَاعْبُدُوْنِ

অর্থাৎ "(হে নবী সঃ)! তোমার পূর্বে আমি যে নবীকেই পাঠিয়েছি তার কাছেই আমি এই অহী করেছি—আমি ছাড়া অন্য কোন মা'বূদ নেই, সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদত করো।"[১] (২১ঃ ২৫)

আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, হারিস ইবনে খুযাইমা (রাঃ) সূরায়ে বারাআতের শেষ দু'টি আয়াত নিয়ে উমার (রাঃ)-এর নিকট আগমন করেন। উমার (রাঃ) তাঁকে জিজ্ঞেস করেনঃ "এই অহীর সাক্ষ্য আর কে দিবে?" হারিস (রাঃ) উত্তরে বলেনঃ "আর কেউ এটা জানে কি না তা তো আমার জানা নেই। তবে আল্লাহর কসম! আমি স্বয়ং এটা নবী (সঃ)-এর মুখে শুনেছি এবং সঠিক মনে রেখেছি।" তখন উমার (রাঃ) বলেনঃ "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি এটা রাসূলুল্লাহ (সঃ) হতে শুনেছি।" তারপর তিনি বলেনঃ "যদি এটা কমপক্ষে তিনটি আয়াত হতো তবে আমি এটাকে একটা পৃথক সূরারূপে নির্ধারণ করতাম। তুমি এটাকে কুরআন কারীমের কোন এক জায়গায় রেখে দাও।" সুতরাং এটাকে সূরায়ে বরাআতের শেষে রাখা হয়েছে।[২] এ কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, উমার ইবনে খাত্তাব (রাঃ)-ই আবূ বকর (রাঃ)-কে পরামর্শ দিয়েছিলেন যেন কুরআন কারীমের সমস্ত আয়াতকে খুঁজে

১. এ হাদীসটিও গারীব বা দুর্বল।
২. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

খুঁজে এক জায়গায় জমা করা হয় এবং এটা খুবই কল্যাণকর কাজ হবে। সুতরাং আবূ বকর (রাঃ) যায়েদ ইবনে সাবিত (রাঃ)-কে কুরআন জমা করার নির্দেশ দেন। এই নির্দেশ মোতাবেক যায়েদ ইবনে সাবিত (রাঃ) কুরআন জমা করতেন ও বিন্যস্ত করে চলতেন এবং উমার (রাঃ)-ও সেখানে উপস্থিত থাকতেন।

সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, যায়েদ (রাঃ) বলেছেনঃ "সূরায়ে বারাআতের শেষ অংশটুকু আমি খুযাইমা ইবনে সাবিত বা আবূ খুযাইমা (রাঃ)-এর নিকট পেয়েছিলাম। আর এটাও আমি বর্ণনা করে দিয়েছি যে, সাহাবীদের একটি দল নবী (সঃ)-এর সামনে এর বর্ণনা করেছেন, যেমন খুযাইমা ইবনে সাবিত (রাঃ) বলেছিলেন। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক জ্ঞানের অধিকারী।

আবূ দারদা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, যে ব্যক্তি সকাল সন্ধ্যায় নিম্নের কালেমা সাতবার করে পাঠ করে, আল্লাহ তা'আলা তার সকল কাজ সমাধা করে দেন এবং তার সকল ইচ্ছা পূর্ণ করেন। কালেমাটি হচ্ছেঃ

حَسْبِيَ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

অর্থাৎ "আমার জন্যে আল্লাহই যথেষ্ট, তিনি ছাড়া অন্য কোন মা'বূদ নেই, আমি তাঁরই উপর নির্ভর করেছি, আর তিনি হচ্ছেন অতি বড় আরশের মালিক।" আর একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, যে ব্যক্তি এই অংশটুকু সাতবার পাঠ করবে, তার ইচ্ছা পূর্ণ করার জন্যে আল্লাহই যথেষ্ট, সে তা নিষ্টার সাথে পাঠ করুক বা নাই করুক। কিন্তু এই বর্ধিত অংশটুকু গারীব বা দুর্বল। একটি মারফূ' হাদীসেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে। কিন্তু এটাও গ্রহণযোগ্য নয়। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক জ্ঞানের অধিকারী।

সূরা ঃ তাওবা এর তাফসীর সমাপ্ত

সূরা ঃ ইউনুস মাক্কী

سُوْرَةُ يُوْنُسَ مَكِّيَّةٌ

(আয়াত ঃ ১০৯, রুকূ ঃ ১১)

(اٰيَاتُهَا: ١٠٩، رُكُوْعَاتُهَا: ١١)

শুরু করছি আল্লাহর নামে যিনি পরম করুণাময়, অতি দয়ালু।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

১। আলিফ-লাম-রা, এটা হচ্ছে অতি সূক্ষ্ম তত্ত্বপূর্ণ কিতাবের আয়াত।

١- الٓرٰ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْحَكِيْمِ ○

২। এ লোকদের জন্যে এটা কি বিস্ময়কর হয়েছে যে, আমি তাদের মধ্য হতে একজনের নিকট অহী প্রেরণ করেছি এই মর্মে— তুমি সকলকে ভয় প্রদর্শন কর এবং যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে এই সুসংবাদ দাও যে, তারা তাদের প্রতিপালকের নিকট পূর্ণ মর্যাদা লাভ করবে; কাফিররা বলতে লাগলো যে, এ ব্যক্তি তো নিঃসন্দেহে প্রকাশ্য যাদুকর।

٢- اَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا اَنْ اَوْحَيْنَآ اِلٰى رَجُلٍ مِّنْهُمْ اَنْ اَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكٰفِرُوْنَ اِنَّ هٰذَا لَسٰحِرٌ مُّبِيْنٌ ○

حُرُوْفُ مُّقَطَّعَاتٌ যেগুলো সূরাসমূহের শুরুতে এসে থাকে সেগুলোর উপর আলোচনা ইতিপূর্বে হয়ে গেছে এবং সূরায়ে বাকারায় এর পুরোপুরি ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। আবুয্ যুহা (রঃ) ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, الٓرٰ আল্লাহ তা'আলার এই উক্তির ভাবার্থ হচ্ছে— اَنَا اللّٰهُ اَرٰى অর্থাৎ আমি আল্লাহ, আমি সব কিছু দেখতে রয়েছি। যহ্হাক (রঃ) প্রমুখ গুরুজনও এ কথাই বলেছেন।

এটা হচ্ছে অতি সূক্ষ্ম তত্ত্বপূর্ণ কিতাবের আয়াতসমূহ। মুজাহিদ (রঃ)-এরও এটাই উক্তি। হাসান (রঃ) বলেন যে, কিতাব দ্বারা তাওরাত ও যবূরকে বুঝানো

হয়েছে। কাতাদা (রঃ)-এর ধারণা এই যে, কিতাব দ্বারা কুরআনের পূর্ববর্তী সমস্ত আসমানী কিতাবকে বুঝানো হয়েছে। কিন্তু তাঁর এ ধারণা ভিত্তিহীন।

আল্লাহ তা'আলার উক্তিঃ اَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا অর্থাৎ কাফিরদের বিস্ময়ের প্রতি লক্ষ্য করে আল্লাহ পাক বলেন, মানুষের মধ্য হতেই যদি রাসূল নির্বাচিত হয় তাতে বিস্ময়ের কি আছে? যেমন মহান আল্লাহ অতীত যুগের কাফিরদের উক্তি নকল করে বলেনঃ اَبَشَرٌ يَّهْدُوْنَنَا অর্থাৎ "কোন মানুষ কি আমাদেরকে হিদায়াত করবে?" (৬৪ঃ ৬) এখানে কাফিররা হুদ (আঃ) ও সালিহ (আঃ)-কে উদ্দেশ্য করে ঐ কথা বলেছিল। হুদ (আঃ) ও সালিহ (আঃ) তাদের কওমকে সম্বোধন করে বলেছিলেনঃ "তোমাদের মধ্যকার এক ব্যক্তির উপর তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে অহী অবতীর্ণ করা হয়েছে এতে কি তোমরা বিস্মিত হয়েছো?"

কুরায়েশ কাফিরদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "(কাফিররা বলে) সে (মুহাম্মাদ সঃ) কি এতগুলো উপাস্যের স্থলে মাত্র একজন উপাস্য করে দিলো? বাস্তবিকই এটা তো বড় বিস্ময়কর ব্যাপার বটে!"

যহহাক (রঃ) ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা যখন মুহাম্মাদ (সঃ)-কে রাসূল করে পাঠালেন তখন আরবরা তাঁকে অস্বীকার করে বসলো এবং বলতে লাগলো– আল্লাহ তো এর চেয়ে অনেক বড় যে তিনি মুহাম্মাদের ন্যায় মানুষকে রাসূল করে পাঠাবেন। তখন আল্লাহ তা'আলা বললেন যে, এতে বিস্ময়ের কিছুই নেই।

اَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ-এই উক্তির ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, قَدَمَ صِدْقٍ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রথম বর্ণনাতেই সত্যতা স্বীকার করে নেয়া এবং সৌভাগ্য লাভ করা। আর নিজের আমলের উত্তম প্রতিদান লাভ করা। এটা সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ তা'আলার لِيُنْذِرَ بَاْسًا شَدِيْدًا (১৮ ঃ ২) এই উক্তির সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত অর্থাৎ "যেন তিনি তাদেরকে যুদ্ধ ও কঠিন শাস্তি হতে ভয় প্রদর্শন করেন।" قَدَمَ صِدْقٍ-এর ব্যাপারে মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, এর দ্বারা উত্তম আমল বুঝানো হয়েছে। যেমন সালাত, সিয়াম, সাদকা, তাসবীহ এবং রাসূল (সঃ)-এর শাফাআত। যায়েদ ইবনে আসলাম (রঃ) এবং মুকাতিল ইবনে হাইয়ান (রঃ) এরূপই বলেছেন। কাতাদা (রঃ) বলেন যে, এর দ্বারা سَلَفَ صِدْقٍ উদ্দেশ্য। ইবনে জারীর (রঃ) মুজাহিদ (রঃ)-এর অভিমত সমর্থন করে এর দ্বারা

'উত্তম আমল' ভাবার্থ নিয়েছেন। যেমন قَدَمَ صِدْقٍ فِى الْاِسْلَامِ এ কথা বলা হয়। যেমন হাসসান (রাঃ)-এর কবিতায় রয়েছেঃ

لَنَا الْقَدَمُ الْعُلْيَا اِلَيْكَ وَ خَلْفُنَا * لِاَوَّلِنَا فِى طَاعَةِ اللّٰهِ تَابِعٌ

অর্থাৎ "আমাদের আমল এবং আমাদের রীতিনীতি আপনার সাথে সত্য ও সঠিকভাবে রয়েছে, আর আল্লাহর আনুগত্যের ব্যাপারে আমাদের পরবর্তীরা পূর্ববর্তীদের অনুসারী।"

আল্লাহপাকের উক্তি- قَالَ الْكٰفِرُوْنَ اِنَّ هٰذَا لَسٰحِرٌ مُّبِيْنٌ অর্থাৎ যদিও আমি তাদেরই মধ্য হতে একজন লোককে সুসংবাদদাতা ও ভয়প্রদর্শনকারী রূপে প্রেরণ করেছি তবুও ঐ কাফিররা বলে-এই ব্যক্তি তো অবশ্যই একজন প্রকাশ্য যাদুকর। এই ব্যাপারে তারা সম্পূর্ণরূপে মিথ্যাবাদী।

৩- اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْاَمْرَ مَا مِنْ شَفِيْعٍ اِلَّا مِنْ بَعْدِ اِذْنِهٖ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ○

৩। নিশ্চয়ই আল্লাহই হচ্ছেন তোমাদের প্রতিপালক, যিনি আসমানসমূহকে এবং যমীনকে সৃষ্টি করেছেন ছয়দিন পরিমিত কালে, অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হলেন, তিনি প্রত্যেক কাজ পরিচালনা করে থাকেন; কোন সুপারিশকারী নেই, কিন্তু তাঁর অনুমতির পর; এমন আল্লাহ হচ্ছেন তোমাদের প্রতিপালক, অতএব তোমরা তাঁর ইবাদত কর; তবুও কি তোমরা বুঝছো না?

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, তিনি সমস্ত জগতের প্রতিপালক। তিনি আসমানসমূহ ও যমীনকে ছয়দিনে সৃষ্টি করেছেন। বলা হয়েছে যে, এই দিন আমাদের দিনের মতই ছিল। আবার এ কথাও বলা হয়েছে যে, হাজার বছরের একটি দিন ছিল, যার বর্ণনা সামনে আসবে। তারপর তিনি বড় আরশের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলেন। আরশ হচ্ছে সমস্ত সৃষ্টবস্তুর মধ্যে সবচেয়ে বড় সৃষ্টবস্তু। ওটা লাল ইয়াকুতের তৈরী। অথবা এটাও হচ্ছে আল্লাহর একটি নূর। আল্লাহ তা'আলা হচ্ছেন সারা মাখলূকের পরিচালক, অভিভাবক এবং যামানতদার। তাঁর

রক্ষণাবেক্ষণ হতে যমীন ও আসমানের অণু পরিমাণ জিনিসও বাদ পড়ে না। তাঁর একদিকের মনোযোগ অন্য দিকের মনোযোগ থেকে বিরত রাখতে পারে না। তাঁর জন্যে কোন একটা ব্যাপার ভুলবশতঃ বাকী থাকতে পারে না। পাহাড়ে, সাগরে, লোকালয়ে এবং জঙ্গলে কোথাও কোন বড় তদবীর কোন ছোট তদবীরকে ভুলিয়ে রাখতে পারে না। ভূ-পৃষ্ঠে এমন কোন প্রাণী নেই যার আহারের দায়িত্ব আল্লাহ তা'আলার উপর অর্পিত নয়। কোন কিছু নড়লে বা কোন একটা পাতা ঝরলে তারও খবর তিনি রাখেন। যমীনের অন্ধকারে কোন অণু পরিমাণ জিনিসও এমন নেই বা সিক্ত এবং শুষ্ক এমন কিছু নেই যে তাঁর লাওহে মাহফুযে বা ইলমের কিতাবে বিদ্যমান নেই। যখন إِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ.... -এই আয়াত অবতীর্ণ হয় তখন এমন এক বিরাট যাত্রীদল মুসলিমদের দৃষ্টিগোচর হয় যাদেরকে বেদুঈন মনে করা হয়েছিল। জনগণ তাদেরকে জিজ্ঞেস করেঃ "তোমরা কে?" তারা উত্তরে বলেঃ "আমরা জ্বিন জাতি। এই আয়াতের কারণে আমরা শহর হতে বেরিয়ে পড়েছি।"

আল্লাহ পাকের مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ এই উক্তিটি তাঁর مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ (২ঃ ২৫৫) ও وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمٰوٰتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللّٰهُ...... (৫৩ ঃ ২৬) এবং وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ (৩৪ঃ ২৩) এই উক্তিগুলোর মতই।

ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ অর্থাৎ ঐ লোকগুলো ইবাদতের জন্যে আল্লাহ তা'আলাকেই বিশিষ্ট করে নিয়েছে। আর হে মুশরিকরা! তোমরা ইবাদতে আল্লাহর সাথে তোমাদের অন্যান্য দেবতাদেরকেও শরীক করে নিচ্ছ! অথচ তোমরা ভালরূপেই জান যে, সৃষ্টিকর্তা হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ। তিনি ছাড়া আর কারো উপাসনা করা যেতে পারে না। যেমন মহান আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেনঃ

وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللّٰهُ

অর্থাৎ "তুমি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর- তাদেরকে কে সৃষ্টি করেছে? তবে (উত্তরে) অবশ্যই তারা বলবে- আল্লাহ (তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন)।" (৪৩ঃ ৮৭) আল্লাহ তা'আলা আর এক জায়গায় বলেনঃ

قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ـ سَيَقُولُونَ لِلّٰهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ـ

অর্থাৎ "তুমি বল (অর্থাৎ তুমি জিজ্ঞেস কর) সাতটি আকাশ ও বিরাট আরশের প্রতিপালক কে? (তবে উত্তরে) অবশ্যই তারা বলবে– আল্লাহই (এগুলোর প্রতিপালক), তুমি বলে দাও– তবুও কি তোমরা ভয় করছো না?" (২৩ঃ ৮৬-৮৭) এরূপ আরও আয়াত এর পূর্বেও আছে এবং পরেও আছে।

٤- اِلَيۡهِ مَرۡجِعُكُمۡ جَمِيۡعًا ؕ وَعۡدَ اللّٰهِ حَقًّا ؕ اِنَّهٗ يَبۡدَؤُا الۡخَلۡقَ ثُمَّ يُعِيۡدُهٗ لِيَجۡزِىَ الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ بِالۡقِسۡطِ ؕ وَالَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا لَهُمۡ شَرَابٌ مِّنۡ حَمِيۡمٍ وَّعَذَابٌ اَلِيۡمٌۢ بِمَا كَانُوۡا يَكۡفُرُوۡنَ ○

৪। তোমাদের সকলকে তাঁরই দিকে ফিরে যেতে হবে, আল্লাহর ওয়াদা সত্য; নিশ্চয়ই তিনিই প্রথমবার সৃষ্টি করেন, অতঃপর তিনিই পুনর্বারও সৃষ্টি করবেন, যাতে এরূপ লোকদের, যারা ঈমান আনয়ন করেছে এবং ভাল কাজ করেছে তাদেরকে ইনসাফ মত প্রতিফল প্রদান করেন; আর যারা কুফরী করেছে তারা পান করার জন্যে পাবে উত্তপ্ত পানি এবং তাদের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হবে তাদের আচরিত কুফরীর কারণে।

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, কিয়ামতের দিন সমস্ত সৃষ্টজীব তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তিত হবে। তাঁর সৃষ্ট সমস্ত প্রাণীকে অবশ্যই অবশ্যই তাঁর কাছে ফিরে যেতে হবে। কেননা, যেমন তিনি তাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন তেমনিই তিনি দ্বিতীয়বারও তাদেরকে সৃষ্টি করতে সক্ষম। আল্লাহ তা'আলা আদল ও ইনসাফের সাথে আমলের প্রতিদান প্রদান করবেন। একটুও কম করবেন না। আর কাফিরদেরকে তাদের কুফরীর কারণে কিয়ামতের দিন বিভিন্ন শাস্তি দেয়া হবে। যেমন প্রচণ্ড লু হাওয়া, গরম পানি এবং এই ধরনের আরও শাস্তি। এই কাফিররা যে জাহান্নামকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে তার মধ্যেই তাদেরকে চিরকাল বসবাস করতে হবে এবং সেখানে পাবে তারা তামার ন্যায় গলানো গরম পানি।

٥- هُوَ الَّذِىْ جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَآءً وَّ الْقَمَرَ نُوْرًا وَّ قَدَّرَهٗ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَ الْحِسَابَ ؕ مَا خَلَقَ اللّٰهُ ذٰلِكَ اِلَّا بِالْحَقِّ ۚ يُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ○

৫। আল্লাহ এমন, যিনি সূর্যকে দীপ্তিমান বানিয়েছেন এবং চন্দ্রকে আলোকময় বানিয়েছেন এবং ওর (গতির) জন্যে মঞ্জিলসমূহ নির্ধারিত করেছেন যাতে তোমরা বছরসমূহের সংখ্যা ও হিসাব জানতে পার; আল্লাহ এসব বস্তু অযথা সৃষ্টি করেননি, তিনি এই প্রমাণাদি বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন ঐসব লোকের জন্যে যারা জ্ঞানবান।

٦- اِنَّ فِىْ اخْتِلَافِ الَّيْلِ وَ النَّهَارِ وَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِى السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَّقُوْنَ ○

৬। নিঃসন্দেহে রাত্রি ও দিবসের পরিবর্তনের মধ্যে এবং আল্লাহ যা কিছু আসমানসমূহে ও যমীনে সৃষ্টি করেছেন তৎসমুদয়ের মধ্যে প্রমাণসমূহ রয়েছে ঐ লোকদের জন্যে যারা আল্লাহর ভয় পোষণ করে।

আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, তিনি তাঁর ক্ষমতার পূর্ণতা এবং তাঁর সাম্রাজ্যের বিরাটত্বের প্রমাণস্বরূপ বহু নিদর্শন সৃষ্টি করেছেন। সূর্যের কিরণ হতে বিচ্ছুরিত আলোকমালাকে তিনি তোমাদের জন্যে দীপ্তি বানিয়েছেন। আর চন্দ্রের কিরণকে তোমাদের জন্যে নূর বানিয়েছেন। সূর্যের কিরণ এক রকম এবং চন্দ্রের কিরণ অন্য রকম। একই আলো, অথচ দুটোর মধ্যে বিরাট পার্থক্য। একটির কিরণ অপরটির সঙ্গে মোটেই খাপ খায় না বা একটির কিরণের সাথে অপরটির কিরণ মিলিত হয় না। দিবসে সূর্যের রাজত্ব আর রাত্রে চন্দ্রের কর্তৃত্ব। দুটোই আসমানী আলোকবর্তিকা। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা সূর্যের মঞ্জিল নির্ধারণ করেননি, অথচ চন্দ্রের মঞ্জিল তিনি নির্ধারণ করেছেন। প্রথম তারিখের চাঁদ অতি ক্ষুদ্ররূপে প্রকাশিত হয়। তারপর ওর কিরণও বাড়ে এবং আয়তনও বেড়ে যায়।

শেষ পর্যন্ত ওটা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় এবং গোল বৃত্তের আকার ধারণ করে। এরপর আবার কমতে শুরু করে এবং পূর্ণ একমাস পর প্রথম অবস্থায় এসে যায়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "আমি চন্দ্রের জন্যে মঞ্জিলসমূহ নির্ণিত করে রেখেছি (এবং ওটা তা অতিক্রম করছে), এমন কি ওটা (অতিক্রম শেষে ক্ষীণ হয়ে) এইরূপ হয়ে যায়, যেন খেজুরের পুরাতন শাখা। সূর্যের সাধ্য নেই যে চন্দ্রকে গিয়ে ধরবে, আর না রাত্রি দিবসের পূর্বে আসতে পারবে; এবং উভয়ে এক একটি চক্রের মধ্যে সন্তরণ করছে।" আর এক জায়গায় মহান আল্লাহ বলেনঃ "সূর্য ও চন্দ্রের নিজ নিজ হিসাব রয়েছে।" এই আয়াতে কারীমায় বলা হয়েছে যে, সূর্যের মাধ্যমে দিনের পরিচয় পাওয়া যায়, আর চন্দ্রের আবর্তনের মাধ্যমে পাওয়া যায় মাস ও বছরের হিসাব। আল্লাহ এগুলো বৃথা সৃষ্টি করেননি। বরং জগত সৃষ্টি মহান আল্লাহর বিরাট নৈপুণ্যের পরিচয় বহন করে এবং এটা তাঁর ব্যাপক ক্ষমতার যে স্পষ্ট প্রমাণ এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। যেমন তিনি বলেনঃ

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَ الْاَرْضَ وَ مَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا.......

অর্থাৎ "আমি আকাশ, পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যে যা কিছু রয়েছে এগুলোকে বৃথা সৃষ্টি করিনি, এটা হচ্ছে কাফিরদের ধারণা, সুতরাং কাফিরদের জন্যে রয়েছে (জাহান্নামের) আগুনের শাস্তি।" (৩৮ঃ ২৭) আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنٰكُمْ عَبَثًا وَّ اَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُوْنَ ـ فَتَعٰلَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ ـ

অর্থাৎ "তবে কি তোমরা এই ধারণা করেছিলে যে, আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি? আর এটাও (ধারণা করেছিলে) যে, তোমাদেরকে আমার নিকট ফিরিয়ে আনা হবে না? অতএব আল্লাহ অতি উচ্চ মর্যাদাবান, তিনি প্রকৃত বাদশাহ, তিনি ছাড়া কেউই ইবাদতের যোগ্য নয়, তিনি মহান আরশের মালিক।" (২৩ঃ ১১৫-১১৬) আয়াতগুলোর ভাবার্থ হচ্ছে– আমি দলীল প্রমাণাদি খুলে খুলে বর্ণনা করছি যাতে অনুধাবনকারীরা অনুধাবন করতে পারে।

اِخْتِلَافُ الَّيْلِ وَ النَّهَارِ এর ভাবার্থ এই যে, দিন গেলে রাত্রি আসে এবং রাত্রি গেলে দিনের আগমন ঘটে। একে অপরের উপর জয়যুক্ত হয়ে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে না। যেমন আল্লাহ পাক বলেনঃ "রাত দিনের উপর ছেয়ে যায় এবং দিন রাতের উপর ছেয়ে যায়, কিন্তু এটা সম্ভব নয় যে, সূর্য চন্দ্রের সাথে টক্কর খায়।" মহান আল্লাহ বলেনঃ "সকাল হয়ে যায় এবং রাত্রি নির্বিঘ্নে অতিক্রান্ত হয়।

আল্লাহ আসমান ও যমীনে যা কিছু সৃষ্টি করেছেন সেগুলো এটাই প্রমাণ করে যে, তাঁর ক্ষমতা কতই না ব্যাপক।" যেমন তিনি বলেনঃ "আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে আল্লাহর কতই না নিদর্শন রয়েছে।" আর এক জায়গায় তিনি বলেনঃ "তুমি বলে দাও– তোমরা লক্ষ্য কর যে, আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে কতই না নিদর্শন রয়েছে এবং যারা ঈমানদার নয় তাদেরকে সতর্ককারী নিদর্শনের কোনই অভাব নেই।" আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ "তারা কি আকাশ ও পৃথিবীতে তাদের সামনে ও পিছনে দৃষ্টিপাত করে না?" আর এক জায়গায় মহান আল্লাহ বলেনঃ "নিঃসন্দেহে আসমানসমূহ ও যমীনের সৃজনে এবং পর্যায়ক্রমে দিবা ও রাত্রির গমনাগমনে নিদর্শনসমূহ রয়েছে জ্ঞানীদের জন্যে।" আর এখানে বলেনঃ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَّقُوْنَ অর্থাৎ "অবশ্যই নিদর্শনসমূহ রয়েছে ঐ লোকদের জন্যে যারা (আল্লাহর শাস্তির) ভয় করে।"

৭। যারা আমার সাথে সাক্ষাতের আশা পোষণ করে না এবং পার্থিব জীবনেই পরিতৃপ্ত এবং এতেই নিশ্চিন্ত থাকে এবং যারা আমার নিদর্শনাবলী সম্বন্ধে গাফিল।	٧- إِنَّ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا وَ رَضُوْا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَاطْمَاَنُّوْا بِهَا وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنْ اٰيٰتِنَا غٰفِلُوْنَ ۝
৮। এইরূপ লোকদের ঠিকানা হচ্ছে জাহান্নাম, তাদের কার্যকলাপের কারণে।	٨- اُولٰٓئِكَ مَاْوٰىهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ۝

যে দুর্ভাগা কাফিররা কিয়ামতের দিন আল্লাহর সাথে মিলিত হওয়াকে অস্বীকার করে এবং তাঁর সাথে মুলাকাত হওয়াকে মোটেই বিশ্বাস করে না, শুধু পার্থিব জগতই কামনা করে এবং এই দুনিয়া নিয়েই যাদের আত্মা খুশী থাকে, তাদের সম্পর্কেই আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতে আলোচনা করেছেন। হাসান (রঃ) বলেনঃ "আল্লাহর শপথ! এই কাফিররা দুনিয়াকে না শোভনীয় করেছে, না উন্নত করেছে, অথচ এই জীবনের প্রতি সন্তুষ্টও হয়ে গেছে। তারা আল্লাহর আয়াতসমূহ হতে সম্পূর্ণরূপে উদাসীন রয়েছে। তারা নিজেদের জীবনের উপর মোটেই চিন্তা গবেষণা করে না। কিয়ামতের দিন এদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম। আর এটা তাদের পার্থিব আমলের সঠিক প্রতিদানও বটে। কেননা, তারা যে

আল্লাহ, তাঁর রাসূল (সঃ) এবং পরকালকে অস্বীকার করেছে এবং যে অবাধ্যাচরণ ও অপরাধ তারা করেছে তার জন্যে তাদের উপযুক্ত শাস্তি এটাই।

৯। নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে এবং ভাল কাজ করেছে, তাদের প্রতিপালক তাদেরকে লক্ষ্যস্থলে (জান্নাতে) পৌঁছিয়ে দিবেন, তাদের ঈমানের কারণে, শান্তির উদ্যানসমূহে তাদের (বাসস্থানের) তলদেশ দিয়ে নহরসমূহ বইতে থাকবে।

৯- اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ يَهْدِيْهِمْ رَبُّهُمْ بِاِيْمَانِهِمْ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهِمُ الْاَنْهٰرُ فِيْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ○

১০। তথায় তাদের বাক্য হবে– হে আল্লাহ! তুমি মহান, পবিত্র! এবং পরস্পরের সালাম হবে– আসসালামু আলাইকুম, আর তাদের শেষ বাক্য হবে– আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন।

১০- دَعْوٰىهُمْ فِيْهَا سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيْهَا سَلٰمٌ وَاٰخِرُ دَعْوٰىهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○ع

এখানে ঐ ভাগ্যবানদের খবর দেয়া হচ্ছে যারা ঈমান এনেছে, নবী রাসূলদের সত্যতা স্বীকার করেছে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ)-এর অনুগত হয়েছে এবং ভাল কাজ করেছে, তাদের ব্যাপারে এই ওয়াদা করা হয়েছে যে, তাদের নেক আমলের বিনিময়ে তাদেরকে হিদায়াত দান করা হবে। এখানে بِاِيْمَانِهِمْ-এর ب অক্ষরটি سَبَبِيَّةٌ (কারণবোধক) হতে পারে। অর্থাৎ দুনিয়ায় তাদের ঈমান আনয়নের কারণে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সরল সঠিক পথের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখবেন। শেষ পর্যন্ত তারা সেই পথ অতিক্রম করে নেবে এবং জান্নাত পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। আবার এই ب অক্ষরটি اِسْتِعَانِيَّةٌ (সাহায্যবোধক) হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। যেমন মুজাহিদ (রঃ) বলেছেন যে, তাদের সাথে একটা নূর (আলো) থাকবে যার সাহায্যে তারা পথ চলতে থাকবে। ইবনে জারীর (রঃ)-এর উক্তি এই যে, তাদের আমলগুলো একটি সুন্দর প্রতিকৃতি ও সুগন্ধময় হাওয়ার আকার বিশিষ্ট হবে এবং তারা যখন কবর হতে

উঠবে তখন এই সুন্দর প্রতিকৃতি তাদের আগে আগে চলবে এবং তাদেরকে সর্বপ্রকারের সুসংবাদ দিতে থাকবে। যখন সেই নেককার ব্যক্তি ঐ প্রতিকৃতিকে জিজ্ঞেস করবেঃ "তুমি কে?" সে উত্তরে বলবেঃ "আমি তোমার নেক আমল।" সে আলোকবর্তিকারূপে তার আগে আগে চলবে এবং তাকে জান্নাত পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেবে। এজন্যেই আল্লাহ পাক يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ-এ কথা বলেছেন। পক্ষান্তরে কাফিরের আমলগুলো অত্যন্ত কুৎসিত প্রতিকৃতির আকারে হবে এবং দুর্গন্ধময় হাওয়ার দেহ ধারণ করবে। সে তার সঙ্গীকে আঁকড়ে ধরে থাকবে এবং জাহান্নামে নিয়ে গিয়ে ফেলে দেবে। কাতাদা (রঃ)-এরও উক্তি এটাই। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক জ্ঞানের অধিকারী।

জান্নাতবাসীদের অবস্থা এই হবে যে, سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ হবে তাদের সম্বোধন। ইবনে জুরাইজ (রঃ) বলেন যে, যখন তাদের পার্শ্ব দিয়ে এমন পাখী উড়ে যাবে যার চাহিদা তাদের মনে জেগে উঠবে তখন উল্লিখিত কালেমা তাদের মুখে উচ্চারিত হবে। তথায় এটাই হবে তাদের উক্তি। তখন একজন ফিরিশ্তা তাদের আকাঙ্ক্ষিত বস্তু নিয়ে হাযির হয়ে তাদেরকে সালাম করবেন। তারা সালামের জবাব দেবে। তাই আল্লাহ তা'আলা تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلٰمٌ -এ কথা বলেছেন। তারা ঐ খাদ্য খাওয়ার পর আল্লাহর শোকর ও প্রশংসা করবেন। এ জন্যেই মহান আল্লাহ اٰخِرُ دَعْوٰهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ-এই উক্তি করেছেন।

মুকাতিল ইবনে হাইয়ান (রঃ) বলেন যে, জান্নাতবাসী যখন কোন খাবার চেয়ে নেয়ার ইচ্ছে করবে তখন سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ বলবে। তখন তার কাছে দশ হাজার খাদেম একটি সোনার খাঞ্জা নিয়ে হাযির হয়ে যাবে। প্রত্যেক খাঞ্জায় এমন নতুন খাদ্য থাকবে যা অন্য খাঞ্জায় থাকবে না। জান্নাতবাসী তখন প্রত্যেক খাঞ্জা হতেই কিছু না কিছু খাবে।

সুফইয়ান সাওরী (রঃ) বলেন যে, যখন কোন লোক কোন জিনিস চাইবে তখন سُبْحٰنَكَ বলবে। এই আয়াতটি تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلٰمٌ (৩৩ঃ ৪৪) এবং لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا وَّ لَا تَاْثِيْمًا ـ اِلَّا قِيْلًا سَلٰمًا سَلٰمًا (৫৬ঃ ২৫-২৬) ইত্যাদি আয়াতগুলোর সহিত সাদৃশ্যযুক্ত । এগুলো একথাই প্রমাণ করে যে, আল্লাহ পাক সদা সর্বদাই প্রশংসিত এবং সর্বদাই পূজনীয়। এজন্যেই সৃষ্টির শুরুতেও তিনি স্বীয় সত্তার প্রশংসা করেছেন এবং অবতারণের শুরুতেও। যেমন তিনি বলেছেনঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْۤ اَنْزَلَ عَلٰی عَبْدِهِ الْكِتٰبَ .... (১৮ঃ১)

আর এক জায়গায় বলেছেনঃ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ (৬ঃ ১) ইত্যাদি।।

তিনি প্রথমেও প্রশংসিত এবং শেষেও প্রশংসিত, হয় দুনিয়াই হোক বা দ্বীনই হোক। এজন্যেই হাদীসে এসেছে যে, জান্নাতবাসীকে তাসবীহ ও তাহমীদ শেখানো হয়েছে, যেমন নফসের কামনা ও বাসনাও তাদেরকে দেয়া হয়েছে। যেমন আল্লাহর নিয়ামতরাজী তাদের উপর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তেমন তাঁর তাহ্মীদ ও তাস্বীহ্ও বর্ধিত হতে থাকে। তা কখনও শেষ হবার নয়। আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ ও প্রতিপালক নেই।

১১। আর যদি আল্লাহ মানবের উপর তড়িত ক্ষতি ঘটাতেন, যেমন তারা তড়িত উপকার লাভ করতে আগ্রহ রাখে, তবে তাদের অঙ্গীকার কবেই পূর্ণ হয়ে যেতো; অনন্তর আমি সেই লোকদেরকে যারা আমার নিকট উপস্থিত হওয়ার চিন্তা করে না, ছেড়ে দেই তাদের অবস্থার উপর, যেন তারা তাদের অবাধ্যতার মধ্যে ঘুরপাক খেতে থাকে।

١١- وَلَوْ يُعَجِّلُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِىَ اِلَيْهِمْ اَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا فِىْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ○

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদের উপর নিজের স্নেহ ও সহনশীলতার সংবাদ দিচ্ছেন যে, মানুষ যদি তার সংকীর্ণমনা ও ক্রোধের কারণে নিজের জান, মাল ও সন্তানদের উপর বদ দুআ' করে তবে তিনি তার সেই বদ দুআ' কবূল করেন না। কেননা তিনি জানেন যে, এটা তার আন্তরিক ইচ্ছায় নয়। এটা হচ্ছে আল্লাহর বিশেষ দয়া ও মেহেরবানীর দাবী। কিন্তু যদি মানুষ তার নিজের জন্যে এবং তার ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির পক্ষে দুআ' করে তবে আল্লাহ সেই দুআ' কবূল করে থাকেন। এজন্যেই তিনি বলেন—মানুষ যেমন তার কল্যাণের জন্যে তাড়াহুড়ো করে তেমনি যদি আল্লাহ তা'আলা তার উপর বিপদ-আপদ পৌঁছানোর ব্যাপারে তাড়াহুড়ো করতেন তবে তো তার অকাল মৃত্যু ঘটে যেতো। তবে মানুষের জন্যে এটা কখনই শোভনীয় নয় যে, সে বারবার এরূপ বলতে থাকে

এবং বদ দুআ' করার অভ্যাস করে ফেলে। যেমন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "তোমরা নিজেদের উপর, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির উপর বদ দূআ' করো না, কেননা কোন কোন সময় দুআ' কবূল হয়ে থাকে। সুতরাং যদি সেই সময় বদ দুআ' মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ে তবে তা কবূল হয়েই যাবে।"[১]

মুজাহিদ (রঃ) এ আয়াতের তাফসীরে বলেন যে, এই বদ দুআ' মানুষের একটা উক্তি যা সে ক্রোধের সময় নিজের উপর, নিজের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির উপর করে থাকে। এই সময় উচিত যে, সে যেন তৎক্ষণাৎ বলে ওঠেঃ اَللّٰهُمَّ لَا تُبَارِكْ فِيْهِ অর্থাৎ "হে আল্লাহ! এ কথায় আপনি বরকত দান করবেন না।" নচেৎ তার এই বদ দুআ' কবূল হয়েই যাবে এবং এর ফলে তার সর্বনাশ হবে।

১২। আর যখন মানুষকে কোন ক্লেশ স্পর্শ করে তখন আমাকে ডাকতে থাকে শুয়ে, বসে, এবং দাঁড়িয়েও, অতঃপর যখন আমি সেই কষ্ট ওর হতে দূর করে দেই তখন সে নিজের পূর্ব অবস্থায় ফিরে আসে– যে কষ্ট তাকে স্পর্শ করেছিল তা মোচন করার জন্যে সে যেন আমাকে কখনো ডেকেই ছিল না; এই সীমালংঘনকারীদের কার্যকলাপ তাদের কাছে এইরূপই পছন্দনীয় মনে হয়।

١٢- وَاِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْۢبِهٖۤ اَوْ قَاعِدًا اَوْ قَآئِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهٗ مَرَّ كَاَنْ لَّمْ يَدْعُنَاۤ اِلٰى ضُرٍّ مَّسَّهٗ ؕ كَذٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِيْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○

এই আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, মানুষ যখন কোন বিপদের সম্মুখীন হয় তখন সম্পূর্ণরূপে হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে। যেমন তিনি বলেনঃ وَاِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُوْ دُعَآءٍ عَرِيْضٍ অর্থাৎ "যখন তাকে বিপদ স্পর্শ করে তখন সে লম্বা চওড়া দুআ' করতে শুরু করে।" (৪১ঃ ৫১) পূর্ববর্তী আয়াত এবং এই আয়াতের অর্থ একই। কেননা, যখন তার উপর বিপদ পৌঁছে তখন সে ব্যাকুল ও

১. এ হাদীসটি হাফিজ আবূ বকর আল বায্যার (রঃ) স্বীয় মুসনাদে জাবির (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন।

অধৈর্য হয়ে পড়ে। উঠতে, বসতে, শুইতে, জাগতে সর্বাবস্থাতেই বিপদের বৃষ্টি দূর হওয়ার জন্যে প্রার্থনা করতে শুরু করে। অতঃপর যখন আল্লাহ পাক সেই বিপদ সরিয়ে দেন তখন সে আল্লাহকে এড়িয়ে চলে এবং পরান্মুখ হয়ে যায়। তার ভাব দেখে মনে হয় যে, তার উপর ইতিপূর্বে কোন বিপদই পৌঁছেনি। মহান আল্লাহ এই অভ্যাসের নিন্দে করে বলেন– এরূপ ব্যবহার তো পাপী ও বদকারদের জন্যেই শোভা পায়। আল্লাহ তা'আলা যাকে হিদায়াত ও তাওফীক দান করেন সে এর থেকে স্বতন্ত্র। যেমন রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর উক্তি রয়েছেঃ "মুমিনের কাজ কারবার তো খুবই বিস্ময়কর। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে তার উপর যা কিছু এসে পড়ে তা তার জন্যে কল্যাণকরই হয়ে থাকে। যদি তার উপর কোন বিপদ আপদ পৌঁছে এবং তাতে সে ধৈর্যধারণ করে তবে সে তার প্রতিদান লাভ করে থাকে। আর যদি সুখ শান্তি প্রাপ্ত হয় এবং তাতে সে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তবে তাতেও পুণ্য লাভ করে। আল্লাহর এই দয়া ও করুণা শুধু মুমিনের জন্যেই বিশিষ্ট, আর কারো জন্যে নয়।

١٣- وَلَقَدْ اَهْلَكْنَا الْقُرُوْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوْا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ وَمَا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْقَوْمَ الْمُجْرِمِيْنَ ○

১৩। আমি তোমাদের পূর্বে বহু সম্প্রদায়কে ধ্বংস করে দিয়েছি, যখন তারা যুলুম করেছিল, অথচ তাদের নিকট তাদের রাসূলগণও প্রমাণাদিসহ আগমন করেছিল, আর তারা কখনই বা এইরূপ ছিল যে, ঈমান আনয়ন করতো, আর আমি অপরাধীদেরকে এইরূপেই শাস্তি দিয়ে থাকি।

١٤- ثُمَّ جَعَلْنٰكُمْ خَلٰٓئِفَ فِى الْاَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ ○

১৪। অতঃপর আমি তাদের স্থলে তোমাদেরকে তাদের পর ভূ-মণ্ডলে আবাদ করলাম, যেন আমি প্রত্যক্ষ করি যে তোমরা কিরূপ কাজ কর।

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, পূর্ববর্তী রাসূলগণ যখন ঐ সময়ের কাফিরদের নিকট আগমন করেছিলেন এবং তাদের কাছে সুস্পষ্ট দলীল প্রমাণাদি উপস্থাপন করেছিলেন তখন তারা তাঁদের মিথ্যা প্রতিপন্ন করায় তিনি তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। তাদের পর আল্লাহ তা'আলা এই কওমকে সৃষ্টি করলেন এবং তাদের কাছে তাঁর একজন রাসূলকে পাঠালেন। তিনি দেখতে চান যে, তারা তাঁর এই রাসূল (সঃ)-এর কথা মানছে কি না। সহীহ মুসলিমে আবূ সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "দুনিয়াটা (বাহ্যিকভাবে) খুবই মিষ্ট ও সবুজ শ্যামল। এখন আল্লাহ তোমাদেরকে পূর্ববর্তী কওমদের স্থলাভিষিক্ত বানিয়েছেন। তিনি দেখতে চান যে, তোমরা কিরূপ আমল করছো। তোমাদের উচিত যে, তোমরা দুনিয়ার অবৈধ কামনা-বাসনা থেকে দূরে থাকবে। সবচেয়ে বড় কথা এই যে, তোমরা স্ত্রীলোকদের থেকে খুবই সতর্ক থাকবে। কেননা বানী ইসরাঈলের উপর প্রথম যে ফিৎনা এসেছিল তা ছিল এই স্ত্রীলোকদেরই ফিৎনা।"

একবার আউফ ইবনে মালিক (রাঃ) আবূ বকর (রাঃ)-এর কাছে নিজের স্বপ্নের কথা বর্ণনা করেন যে, যেন আকাশ থেকে একটি রজ্জু লটকে আছে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) রজ্জুটি টানলেন। আবার ওটা আকাশের সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়ে গেল। তখন আবূ বকর (রাঃ) ওটা টানলেন। তারপর জনগণ মিম্বরের চার দিকে ওটাকে মাপতে লাগলেন। উমার (রাঃ)-এর মাপে ওটা মিম্বর থেকে তিন হাত লম্বা হলো। সেখানে উমারও (রাঃ) বিদ্যমান ছিলেন। তিনি এই স্বপ্নের কথা শুনে বললেনঃ "রেখে দাও তোমার স্বপ্ন। এর সাথে আমাদের কি সম্পর্ক? কোথাকার কি স্বপ্ন!" কিন্তু যখন উমার (রাঃ) খলীফা নির্বাচিত হলেন তখন আউফ (রাঃ)-কে ডেকে বললেনঃ "হে আউফ (রাঃ)! আপনার স্বপ্নের বৃত্তান্ত আমাকে শুনিয়ে দিন।" তখন আউফ (রাঃ) বললেনঃ "এখন স্বপ্ন শ্রবণের কি প্রয়োজন পড়েছে? আপনি তো ঐ সময় আমাকে ধমক দিয়েছিলেন।" তাঁর এই কথা শুনে উমার (রাঃ) তাঁকে বললেনঃ "আল্লাহ আপনার মঙ্গল করুন! আমি এটা কখনো চাচ্ছিলাম না যে, আপনি রাসূল (সঃ)-এর খলীফা নফসে সিদ্দীক (রাঃ)-এর মৃত্যুর সংবাদ শোনাবেন।" অতঃপর আউফ (রাঃ) তাঁর স্বপ্নের বর্ণনা দিলেন। যখন তিনি এই পর্যন্ত পৌঁছলেন যে, জনগণ ওটাকে মিম্বর পর্যন্ত তিন তিন হাত মাপলেন, তখন উমার (রাঃ) বলে উঠলেনঃ "এই তিনের মধ্যে

একজন ছিলেন খলীফা অর্থাৎ আবূ বকর (রাঃ)। দ্বিতীয় হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যিনি আল্লাহর ব্যাপারে কারো তিরস্কার ও অসন্তুষ্টির কোনই পরওয়া করেন না। আর তৃতীয় হাতের উপর সমাপ্তির উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, তিনি শহীদ হবেন।" উমার (রাঃ) বলেন, আল্লাহ পাক বলেছেনঃ

ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ -

অর্থাৎ "অতঃপর আমি তাদের স্থলে তোমাদেরকে তাদের পর ভূ-পৃষ্ঠে আবাদ করলাম, আমি দেখতে চাই যে, তোমরা কিরূপ কাজ কর।" সুতরাং হে উমার (রাঃ)! তুমি এখন খলীফা নির্বাচিত হয়েছো। কাজেই তুমি কাজ করার সময় চিন্তা করো যে, তুমি কি কাজ করছো। উমার (রাঃ) যে তিরস্কারকারীর তিরস্কারকে ভয় না করার কথা বললেন ওটা ছিল আল্লাহর আহকামের ব্যাপারে। আর شَهِيْد শব্দ দ্বারা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল এই যে, তিনি শহীদ হবেন। আর ওটা ঐ সময় হবে যখন সমস্ত লোক তাঁর অনুগত হয়ে যাবে।

১৫। আর যখন তাদের সামনে আমার আয়াতসমূহ পাঠ করা হয় যা অতি স্পষ্ট, তখন ঐ সব লোক যাদের আমার নিকট উপস্থিত হওয়ার চিন্তা নেই, এইরূপ বলে– এটা ছাড়া অন্য কোন কুরআন আনয়ন করুন, অথবা এতেই কিছু পরিবর্তন করে দিন; তুমি বলে দাও– আমার দ্বারা এটা সম্ভব নয় যে, আমি নিজের পক্ষ হতে এতে পরিবর্তন করে দেই, আমি তো শুধুমাত্র ওরই অনুসরণ করবো যা অহীযোগে আমার কাছে পৌঁছেছে, যদি আমি আমার প্রতিপালকের নাফরমানী করি তবে আমি এক অতি ভীষণ দিনের শাস্তির আশংকা রাখি।

١٥- وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَٰتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَائِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ○

١٦- قُلْ لَّوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا تَلَوْتُهٗ عَلَيْكُمْ وَلَآ اَدْرٰىكُمْ بِهٖ ۖ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيْكُمْ عُمُرًا مِّنْ قَبْلِهٖ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ○

১৬। তুমি বলে দাও– যদি আল্লাহর ইচ্ছা হতো তবে না আমি তোমাদেরকে এটা পাঠ করে শুনাতাম, আর না আল্লাহ তোমাদেরকে ওটা জানাতেন, কেননা আমি এর পূর্বেওতো জীবনের এক দীর্ঘ সময় তোমাদের মধ্যে অতিবাহিত করেছি; তবে কি তোমরা এতটুকু জ্ঞান রাখো না?

মুশরিক কুরায়েশদের মধ্যে যারা উদ্ধত কাফির ছিল এবং যারা সব কথাই অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করতো, আল্লাহ তা'আলা তাদেরই সংবাদ দিচ্ছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) যখন তাদেরকে আল্লাহর কিতাব শুনিয়ে দেন এবং তাদের সামনে সুস্পষ্ট দলীল পেশ করেন তখন তারা বলে– এই কুরআন ছাড়া অন্য কোন কুরআন নিয়ে এসো, যা অন্য ধারায় লিখিত। এখন আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নবী (সঃ)-কে ইরশাদ করছেন– তুমি তাদেরকে বলে দাও, আচ্ছা বলতো আমার কি অধিকার আছে যে, আমি নিজের পক্ষ থেকে কুরআনকে পরিবর্তন করতে পারি? আমি তো শুধু আল্লাহর একজন আদিষ্ট বান্দা এবং তাঁর বার্তাবাহক। এসব যা কিছু আমি তোমাদের সামনে পেশ করছি, সব কিছুই আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা অনুযায়ী হচ্ছে। আমার উপর যা কিছু অহী করা হচ্ছে, আমি শুধু ওগুলোই বলছি। আমি যদি আল্লাহর অবাধ্য হয়ে যাই তবে আমি কিয়ামতের কঠিন শাস্তির ভয় করি। এগুলো যে আমার নিজের রচিত নয়, তার স্পষ্ট প্রমাণ এই যে, আমি যদি এটা (এই কুরআন) রচনা করতে পারতাম তবে তোমরাও পারতে। কিন্তু তোমরা তো রচনা করতে সক্ষম নও। তাহলে আমি কিরূপে সক্ষম হতে পারি? সুতরাং এটা সুস্পষ্ট কথা যে, এটা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কালাম হতে পারে না। তাছাড়া তোমরা আমার সত্যবাদিতা ও বিশ্বস্ততার কথা তখন থেকে অবগত আছ যখন থেকে আমি তোমাদেরই কওমের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছি। আর যখন থেকে আমি তোমাদের কাছে রাসূলরূপে প্রেরিত হয়েছি তখন থেকেও তোমরা আমার সত্যবাদিতা ও ঈমানদারীর উপর কোন কটাক্ষ করতে পার না। এ জন্যেই আল্লাহ পাক বলেনঃ হে নবী (সঃ)! তুমি তাদেরকে বলে দাও– আমি এক দীর্ঘজীবন তোমাদের সাথে অতিবাহিত করেছি। তোমাদের কি এতটুকুও

জ্ঞান নেই যে, তোমরা সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করতে পার? এজন্যেই যখন রোমক সম্রাট হিরাক্লিয়াস আবূ সুফিয়ান (রাঃ) ও তাঁর সঙ্গীদেরকে নতুন নবী (সঃ)-এর অবস্থা জিজ্ঞেস করতে গিয়ে প্রশ্ন করেনঃ "তোমাদের কাছে তিনি কখনো মিথ্যা কথা বলেছেন এরূপ কোন প্রমাণ আছে কি?" আবূ সুফিয়ান উত্তরে বলেনঃ "না।" আবূ সুফিয়ান (রাঃ) তো ঐ সময় কাফিরদের সরদার ও মুশরিকদের নেতা ছিলেন। তথাপি তাঁকে এই নবী (সঃ)-এর সত্যবাদিতার কথা স্বীকার করতেই হয়। সে সময় হিরাক্লিয়াস মন্তব্য করেছিলেনঃ "মানুষের ব্যাপারে যিনি কখনও মিথ্যা কথা বলেননি, আল্লাহর ব্যাপারে কিরূপে তিনি মিথ্যা কথা বলতে পারেন।"

জা'ফর ইবনে আবি তালিব (রাঃ) হাবশার বাদশাহ নাজ্জাশীর সামনে বলেছিলেনঃ "আল্লাহ তা'আলা আমাদের নিকট এমন একজন রাসূল (সঃ) পাঠিয়েছেন যাঁর স্বভাবগত সত্যবাদিতা, বংশগত মর্যাদা এবং আমানতদারী সম্পর্কে আমরা পূর্ণ ওয়াকিফহাল। নবুওয়াতের পূর্বে সুদীর্ঘ চল্লিশ বছর তিনি আমাদের সাথে অবস্থান করেছেন।" সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব (রাঃ) তেতাল্লিশ বছর পর্যন্ত বলেছেন। তবে প্রথম উক্তিটিই সঠিকতর।

১৭। অতএব সেই ব্যক্তির চেয়ে অধিক অত্যাচারী কে হবে, যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে অথবা তাঁর আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে? নিঃসন্দেহে এমন পাপাচারীদের কিছুতেই মঙ্গল হবে না।

١٧- فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِهٖ ط اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُوْنَ ۝

আল্লাহ তা'আলা বলেন, ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা বড় অত্যাচারী ও অবাধ্য আর কে হতে পারে যে আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করে, তাঁর ব্যাপারে মিথ্যা কথা বলে এবং ঝুটমুট এই দাবী করে বসে যে, সে আল্লাহ হতে প্রেরিত? এই ব্যক্তি অপেক্ষা বড় অপরাধী ও গুনাহগার আর কেউ হতে পারে কি? এ কথা তো কোন স্থূলবুদ্ধি সম্পন্ন ও বোকা লোকের কাছেও গোপনীয় নয়। তাহলে বুদ্ধিমান ও নবীদের কাছে কিভাবে এটা গোপন থাকতে পারে? যে ব্যক্তি নবুওয়াতের দাবী করে সে সত্যবাদী হোক বা মিথ্যাবাদী হোক, আল্লাহ তার সুকর্ম ও কুকর্মের

উপর দলীল কায়েম করে থাকেন যা সূর্যের চেয়েও অধিক প্রকাশমান। সুতরাং যে ব্যক্তি মুহাম্মাদ (সঃ) ও মুসাইলামা কায্যাবকে দেখেছে সে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য ঠিক এভাবেই করতে পারবে যেভাবে দিনের আলো ও রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে। এখন দু'জনের স্বভাব-চরিত্র, কার্যাবলী এবং কথাবার্তার মধ্যে তুলনা করলে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হবে যে, মুহাম্মাদ (সঃ)-এর কথা ও কাজের মধ্যে কি পরিমাণ সততা ও সত্যবাদিতা ছিল, আর মুসাইলামা কায্যাব সাজাহ এবং আসওয়াদ আনসারীর মধ্যে কি পরিমাণ মিথ্যা ও বেঈমানী ছিল।

আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) যখন মদীনায় আগমন করেন তখন জনগণ তাঁর আগমনে খুবই খুশী ছিল। তাঁর আগমনে যারা খুশী হয়েছিল আমিও ছিলাম তাদের মধ্যে একজন। আমি যখন প্রথমবার তাঁকে দেখি তখনই আমার অন্তর এই সাক্ষ্য দেয় যে, কোন মিথ্যাবাদী লোকের চেহারা এমন নূরানী (আলোকময়) কখনই হতে পারে না। আমি সর্বপ্রথম তাঁর মুখে যে কথা শুনি তা ছিল নিম্নরূপঃ

"হে লোক সকল! তোমরা পরস্পর একে অপরকে সালাম করবে, তার সফলতার জন্যে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করবে, গরীব ও ক্ষুধার্তদেরকে পেট পুরে খাওয়াবে, আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক ঠিক রাখবে এবং রাত্রে উঠে সালাত আদায় করবে যখন লোকেরা ঘুমিয়ে থাকে, তাহলে তোমরা নিঃসন্দেহে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"

যমান ইবনে সা'লাবা (রাঃ) তাঁর গোত্র বানু সাদ ইবনে বকরের পক্ষ হতে প্রতিনিধি হয়ে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট আগমন করেন এবং তাঁকে বলেনঃ "আচ্ছা বলুন তো, এই আকাশকে কে এমন উঁচু করে সৃষ্টি করেছেন?" রাসূলুল্লাহ (সঃ) উত্তরে বলেনঃ "আল্লাহ।" এরপর লোকটি পুনরায় জিজ্ঞেস করেনঃ " কে এই পাহাড়কে এমনভাবে যমীনে দাঁড় করিয়ে রেখেছেন?" উত্তরে নবী (সঃ) বলেনঃ "আল্লাহ।" লোকটি আবার প্রশ্ন করেনঃ "এই যমীনকে কে বিছিয়ে রেখেছেন?" নবী (সঃ) জবাবে বলেনঃ "আল্লাহ।" লোকটি পুনরায় প্রশ্ন করেনঃ "আপনাকে ঐ সত্তার কসম দিয়ে বলছি যিনি ঐ উঁচু আকাশ বানিয়েছেন, এই বড় বড় পাহাড়গুলো যমীনে গেড়ে দিয়েছেন এবং এতো বড় ও প্রশস্ত যমীন ছড়িয়ে দিয়েছেন, তিনিই কি আপনাকে সমস্ত মানুষের জন্যে রাসূল করে পাঠিয়েছেন?" রাসূলুল্লাহ (সঃ) উত্তরে বলেনঃ "হ্যাঁ, ঐ আল্লাহরই কসম যে, তিনিই আমাকে পাঠিয়েছেন।" অতঃপর লোকটি নবী (সঃ)-কে আল্লাহর কসম দিয়ে সালাত,

যাকাত, হজ্ব এবং সাওমের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করেন এবং নবীও (সঃ) আল্লাহর কসম খেয়ে খেয়ে উত্তর দিতে থাকেন। তখন লোকটি নবী (সঃ)-কে বলেনঃ "আপনি সত্য বলেছেন। যিনি আপনাকে সত্যসহ পাঠিয়েছেন সেই সত্তার কসম করে বলছি যে, আমি এর উপর বেশীও করবো না কমও করবো না। বরং সঠিকভাবে এর উপরই আমল করবো।" সুতরাং এই পরিমাণ আমলই তাঁর জন্যে যথেষ্ট হয়ে যায় এবং তিনি নবী (সঃ)-এর সত্যতার উপর ঈমান আনয়ন করেন। কেননা, তিনি দলীল প্রমাণাদি প্রাপ্ত হয়েছিলেন। হাসসান ইবনে সাবিত (রাঃ) বলেনঃ

لَوْ لَمْ تَكُنْ فِيهِ اٰيَاتٌ مُّبِيْنَةٌ ـ كَانَتْ بَدِيهَتُهُ تَأْتِيكَ بِالْخَبَرِ

অর্থাৎ "যদি তাঁর কাছে সুস্পষ্ট দলীল প্রমাণাদি নাও থাকতো তথাপি তাঁর চেহারার পবিত্রতা, সরলতা এবং অকপটতা স্বয়ং তাঁর সততা ও সত্যবাদিতার দলীল ছিল।"

কিন্তু মুসাইলামা কায্যাবকে চক্ষুষ্মানদের যে কেউ দেখেছেন, তিনিই তার অশ্লীল কথন, দুষ্কার্য এবং তার নবুওয়াতের দাবীর ভন্ডামি দেখে যা তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে, এই ফলাফল পেয়ে গেছেন যে, সে কিরূপ নবুওয়াতের মিথ্যা দাবীদার ছিল! আল্লাহ তা'আলার এই উক্তি اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ অর্থাৎ "আল্লাহ (এইরূপ যে) তিনি ছাড়া অন্য কেউ ইবাদতের যোগ্য নেই; তিনি চিরঞ্জীব, সংরক্ষণকারী। না তন্দ্রা তাঁকে আচ্ছন্ন করতে পারে, আর না নিদ্রা।" (২ঃ ২৫৫) আর মুসাইলামার উক্তিঃ

يَاضِفْدَعُ بِنْتَ ضِفْدَعٍ نَقِّي كَمْ تَنِقِّيْنَ لَا الْمَاءَ تُكَدِّرِيْنَ وَلَا الشَّارِبَ تَمْنَعِيْنَ ـ

অর্থাৎ "হে ব্যাঙসমূহের সন্তান ব্যাঙ! তুমি আর কত ঘেনর ঘেনর করবে? তুমি এর দ্বারা পানিও ঘোলা করতে পারবে না এবং পানি পানকারীও পান করা থেকে বিরত থাকবে না।" ঐ যালিমের আর একটা অহী হচ্ছে—

لَقَدْ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَى الْحُبْلٰى اِذَا خَرَجَ نَسَمَةً تَسْعٰى مِنْ بَيْنِ صِفَاقٍ وَحَشَى،

অর্থাৎ "আল্লাহ তা'আলা গর্ভবতী নারীর উপর বড় রকমের ইহসান করেছেন যে, অন্ত্রের মধ্য হতে একটি জীবন্ত আত্মা বের করেছেন।" তার আরো উক্তি হচ্ছে—

اَلْفِيلُ مَاالْفِيلُ وَمَا اَدْرَاكَ مَاالْفِيلُ لَهُ ذَنْبٌ قَصِيرٌ وَخُرْطُومٌ طَوِيلٌ،

অর্থাৎ “হাতী, হাতী কি? তুমি কি জান হাতী কি? ওর রয়েছে ছোট লেজ ও লম্বা শুঁড়।” আরো বলেছে–

وَالْعَاجِنَاتِ عَجْنًا وَالْخَابِزَاتِ خَبْزًا وَاللاَّقِمَاتِ لَقْمًا اِهَالَةً وَسَمْنًا اِنَّ قُرَيْشًا قَوْمٌ يَعْتَدُونَ -

অর্থাৎ “আটা খমীরকারিণীদের শপথ! রুটী তৈরীকারিণীদের শপথ! তরকারী ও ঘিয়ে খাবারের গ্রাস ডুবিয়ে ভক্ষণকারিণীদের শপথ! কুরায়েশরা খুবই সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়।” এখন রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর পবিত্র অহী এবং ঐ মিথ্যাবাদীর বাজে ও অশ্লীল কথার প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, শিশুরাও তার কথা শুনে বিদ্রূপ করবে। এ জন্যেই আল্লাহ তা'আলা তাকে লাঞ্ছিত করেছেন এবং হাদীকার দিন তাকে ধ্বংস করে দিয়েছেন। তার সঙ্গী সাথীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে এবং তার উপর লা'নত বর্ষিত হয়। তার লোকেরা তাওবা করে সিদ্দীকে আকবর (রাঃ)-এর নিকট আগমন করে এবং ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিতে শুরু করে। ঐ সময় তিনি তাদেরকে বলেনঃ “মুসাইলামার কোন কুরআন শুনাও তো দেখি।” তখন তারা তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে। কিন্তু তিনি নাছোড় হয়ে যান এবং তাদেরকে বলেনঃ “অবশ্যই তোমাদেরকে শোনাতে হবে, যাতে অন্যেরাও শুনে নেয় এবং তারা এই কথাগুলো রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর অহীর সাথে তুলনা করে অহীর শ্রেষ্ঠত্ব ও গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারে।” তখন তারা মুসাইলামার ঐ কথাগুলো শুনিয়ে দেয় যা আমরা উপরে নকল করেছি। তখন আবূ বকর (রাঃ) তাদেরকে বলেনঃ “ওরে হতভাগ্যের দল! তোমাদের জ্ঞান ও বিবেক কোন দিকে গিয়েছিল? আল্লাহর শপথ! এরূপ কথা তো কোন নির্বোধের মুখ দিয়েও বের হবে না।”

কথিত আছে যে, অজ্ঞতার যুগে আমর ইবনুল আস (রাঃ) মুসাইলামার নিকট গমন করেন। সে তাঁর বন্ধু ছিল। তখন পর্যন্ত আমর ইবনুল আস (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করেননি। মুসাইলামা তাঁকে জিজ্ঞেস করেঃ “হে আমর! আপনাদের লোকের উপর (অর্থাৎ মুহাম্মাদ সঃ-এর উপর) এখন কি অহী অবতীর্ণ হয়েছে?” উত্তরে ইবনুল আস (রাঃ) বলেনঃ “আমি তাঁর সঙ্গীদেরকে এক ব্যাপক অথচ সংক্ষিপ্ত সূরা পাঠ করতে শুনেছি।” সে জিজ্ঞেস করলোঃ “ সেটা কি?” আমর (রাঃ) উত্তরে বললেনঃ وَالْعَصْرِ - اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِى خُسْرٍ (শেষ পর্যন্ত)। মুসাইলামা

কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললোঃ "আমার উপরও এমনি এক অহী অবতীর্ণ হয়েছে।" আমর (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেনঃ 'সেটা কি?' সে জবাবে বললোঃ

"يَا وَبَرُ، يَا وَبَرُ، اِنَّمَا اَنْتَ اُذُنَانِ وَصَدْرٌ وَ سَائِرُكَ حَقْرٌ وَنَقْرٌ"

অর্থাৎ "হে অবর, হে অবর (এক প্রকার জন্তু) তোমার দু'টি কান ও একটি বক্ষ প্রতীয়মান হচ্ছে, এ ছাড়া তোমার সারা দেহই বাজে।" অতঃপর সে আমর (রাঃ)-কে বললোঃ "হে আমর (রাঃ)! আমার অহী কেমন মনে হলো?" আমর ইবনুল আস (রাঃ) বলেনঃ "আল্লাহর কসম! আপনিতো নিজেও জানছেন যে, আপনার অহী যে মিথ্যা এতে আমার কোনই সন্দেহ নেই।" যখন একজন মুশরিকেরও এই অবস্থা যে, নবী (সঃ)-এর সত্যবাদী হওয়া ও মুসাইলামার মিথ্যাবাদী হওয়া তার কাছেও গোপনীয় নয়, তখন চক্ষুষ্মানদের কাছে এটা কিরূপে গোপন থাকতে পারে? তাই আল্লাহ পাক বলেনঃ

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ قَالَ اُوْحِيَ اِلَيَّ وَلَمْ يُوْحَ اِلَيْهِ شَيْءٌ وَّ مَنْ قَالَ سَاُنْزِلُ مِثْلَ مَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ

অর্থাৎ "ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা বড় অত্যাচারী আর কে হতে পারে যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করে অথবা বলে– আমার উপর অহী করা হয়েছে, অথচ তার উপর কিছুই অহী করা হয়নি, আর বলে– আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন অনুরূপ আমিও অবতীর্ণ করতে পারি?" (৬ঃ ৯৩) আর এই আয়াতে কারীমায় আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِهٖ ـ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُوْنَ ـ

অর্থাৎ "সুতরাং ঐ ব্যক্তির চেয়ে অধিক অত্যাচারী কে হবে যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করে, অথবা তাঁর আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে? নিশ্চয়ই এমন পাপাচারীদের কিছুতেই মঙ্গল হবে না।" অনুরূপভাবে ঐ ব্যক্তিও বড় অত্যাচারী যে ব্যক্তি ঐ সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, যে সত্য রাসূলগণ আনয়ন করেছেন এবং ওর উপর দলীল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যেমন হাদীসে এসেছেঃ "আল্লাহর নিকট ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে বড় যালিম ও দুর্ভাগা যে ব্যক্তি কোন নবীকে হত্যা করেছে অথবা কোন নবী তাকে হত্যা করেছেন।"

١٨- وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُوْلُوْنَ هٰٓؤُلَآءِ شُفَعَآؤُنَا عِنْدَ اللّٰهِ قُلْ اَتُنَبِّـُٔوْنَ اللّٰهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِى السَّمٰوٰتِ وَلَا فِى الْاَرْضِ سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝

১৮। আর তারা আল্লাহ ছাড়া এমন বস্তুসমূহেরও ইবাদত করে যারা তাদের কোন অপকারও করতে পারে না এবং তাদের কোন উপকারও করতে পারে না, আর তারা বলে– এরা হচ্ছে আল্লাহর নিকট আমাদের সুপারিশকারী; তুমি বলে দাও– তোমরা কি আল্লাহকে এমন বিষয়ের সংবাদ দিচ্ছ যা তিনি অবগত নন, না আসমানে, আর না যমীনে? তিনি পবিত্র ও তাদের মুশরিকী কার্যকলাপ হতে অনেক উর্ধ্বে।

١٩- وَمَا كَانَ النَّاسُ اِلَّآ اُمَّةً وَّاحِدَةً فَاخْتَلَفُوْا وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَقُضِىَ بَيْنَهُمْ فِيْمَا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ۝

১৯। আর সমস্ত মানুষ (প্রথম) এক উম্মতই ছিল, অতঃপর তারা মতভেদ সৃষ্টি করলো; আর যদি তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে এক নির্দেশবাণী প্রথমে সাব্যস্ত হয়ে না থাকতো তবে যে বিষয়ে তারা মতভেদ করছে তার চূড়ান্ত মীমাংসা হয়ে যেতো।

আল্লাহ তা'আলা ঐ মুশরিকদের নিন্দে করছেন যারা এমন সব ছোট মা'বূদের ইবাদত করে যারা না পারে তাদের জন্যে আল্লাহর কাছে সুপারিশ করতে, যেমন তারা এটা ধারণা করে থাকে, আর না পারে কোন ক্ষতি করতে এবং না পারে কোন উপকার করতে। তারা কোন কিছুর মালিকও নয় এবং তারা যা ইচ্ছা করে তা করতেও পারে না। এজন্যেই আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "তোমরা কি আল্লাহকে এমন বিষয়ের সংবাদ দিচ্ছ যা তিনি অবগত নন, না আসমানে, না

যমীনে?” এরপর তিনি স্বীয় মহান সত্তাকে শির্ক ও কুফরী থেকে পবিত্র ঘোষণা করতে গিয়ে বলেনঃ “আল্লাহ তাদের মুশরিকী কার্যকলাপ হতে পবিত্র ও অনেক উর্ধ্বে।”

আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, এখন লোকদের মধ্যে শিরকের উৎপত্তি ঘটেছে। পূর্বে এর কোন অস্তিত্ব ছিল না, কিন্তু এখন হয়েছে। সমস্ত লোক একই দ্বীনের উপর ছিল। আর ওটা ছিল প্রথম হতেই ইসলাম। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, আদম (আঃ) ও নূহ (আঃ)-এর মধ্যে দশটি যুগ অতিবাহিত হয়েছে। এসব লোক আদম (আঃ)-এর সত্য দ্বীনের উপর ছিল। তারপর লোকদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হয়ে যায় এবং তারা মূর্তিপূজা করতে শুরু করে দেয়। তখন আল্লাহ তা'আলা দলীল প্রমাণাদিসহ রাসূল প্রেরণ করেন। যারা তাঁর দলীলকে ছেড়ে দেয় তারা ধ্বংস হয়ে যায়। আর যারা তা গ্রহণ করে নেয় তারা রক্ষা পেয়ে যায়।

وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ আল্লাহ পাকের এই উক্তির ভাবার্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলা কাউকেও শাস্তি দেন না যে পর্যন্ত তিনি তার কাছে নবী পাঠিয়ে দলীল ও হুজ্জত কায়েম করেন। আল্লাহ তা'আলা তো মাখলূককে একটা নির্ধারিত সময় পর্যন্ত জীবিত রেখে পরে মৃত্যু দান করে থাকেন। আর যে ব্যাপারে তারা পরস্পর মতভেদ করছিল, কিয়ামতের দিন তিনি তার ফায়সালা করে দিবেন। সেই দিনই মুমিনরা সফলকাম হবে, আর কাফিররা হবে লাঞ্ছিত ও অপমানিত।

٢٠- وَيَقُوْلُوْنَ لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَقُلْ اِنَّمَا الْغَيْبُ لِلّٰهِ فَانْتَظِرُوْا اِنِّيْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ ۝ ع

২০। আর তারা বলে– তাঁর প্রতি তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ হতে কোন মু'জিযা কেন নাযিল হলো না? সুতরাং তুমি বলে দাও– গায়েবের খবর শুধুমাত্র আল্লাহই জানেন, অতএব তোমরাও প্রতীক্ষায় থাকো, আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষায় থাকলাম।

এই মিথ্যাবাদী কাফিররা বলে যে, মুহাম্মাদ (সঃ)-কেও কেন এমন (নবুওয়াতের) নিদর্শন দেয়া হয়নি, যেমন সামূদ সম্প্রদায়কে উষ্ট্রী দেয়া হয়েছিল? অথবা সাফা পাহাড় কেন সোনা হয়ে যায় না? অথবা কেন মক্কার পাহাড় মক্কা

হতে সরে যায় না এবং ঐ জায়গায় বাগান ও নদী কেন হয় না? আল্লাহ যখন মহা শক্তিশালী তখন এরূপ হওয়া উচিত ছিল ইত্যাদি। কিন্তু সঠিক কথা তো এই যে, আল্লাহ তা'আলা নিজের কাজে বড়ই ক্ষমতাবান ও মহাবিজ্ঞ। যেমন তিনি বলেনঃ

تَبٰرَكَ الَّذِیْۤ اِنْ شَآءَ جَعَلَ لَكَ خَیْرًا مِّنْ ذٰلِكَ جَنّٰتٍ تَجْرِیْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ وَیَجْعَلْ لَّكَ قُصُوْرًا ـ بَلْ كَذَّبُوْا بِالسَّاعَةِ وَاَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِیْرًا ـ

অর্থাৎ "সেই সত্তা অতি মহান, যিনি ইচ্ছে করলে তোমাকে তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট বস্তু প্রদান করবেন অর্থাৎ উদ্যানসমূহ– যার নিম্নদেশে নহরসমূহ বইতে থাকবে এবং তোমাকে বহু বালাখানাও দিবেন। বরং তারা কিয়ামতকে মিথ্যা মনে করেছে, আর আমি এইরূপ লোকদের জন্যে জাহান্নাম নির্ধারণ করে রেখেছি যারা কিয়ামতকে মিথ্যা মনে করেছে।" (২৫ঃ ১০-১১) অন্য জায়গায় আল্লাহ পাক বলেনঃ

وَمَا مَنَعَنَاۤ اَنْ نُّرْسِلَ بِالْاٰیٰتِ اِلَّاۤ اَنْ كَذَّبَ بِهَا الْاَوَّلُوْنَ ـ

অর্থাৎ "আমাকে এটা ছাড়া অন্য কিছুই নিদর্শন পাঠানো হতে বিরত রাখেনি যে, পূর্ববর্তী লোকেরা তা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল।" (১৭ঃ ৫৯)

আল্লাহ তা'আলা বলেন, মাখলূকের ব্যাপারে আমার নীতি এই যে, তারা মু'জিযা চায়, আর আমি তাদেরকে তা দিয়ে থাকি। এখন তারা যদি মু'জিযা দেখে আমার উপর ঈমান আনে তবে তো ভালই নচেৎ সত্বরই আমি তাদের উপর শাস্তি অবতীর্ণ করে থাকি এবং কিয়ামত পর্যন্ত আর অবকাশ দেই না। এ জন্যেই আল্লাহ পাক যখন স্বীয় নবী (সঃ)-কে স্বাধীনতা দিয়ে বললেনঃ "দু'টির যে কোন একটি গ্রহণ কর। প্রথম হলো এই যে, তাদের আবেদন অনুযায়ী আমি তাদেরকে মু'জিযা দিচ্ছি। যতি তারা মু'জিযা দেখে ঈমান আনয়ন করে তবে তো ভালই। নতুবা আমি তাদেরকে অতি তাড়াতাড়ি শাস্তি প্রদান করবো। আর দ্বিতীয় হলো– আমি তাদেরকে তাদের মৃত্যু পর্যন্ত অবকাশ দেবো, যাতে তারা সংশোধিত হয়ে যায়।" রাসূলুল্লাহ (সঃ) স্বীয় উম্মতের জন্যে দ্বিতীয়টিই গ্রহণ করলেন। যেমন ঐ কাফিরদের ব্যাপারে বহুবার তাঁর ধৈর্য ও সহনশীলতা প্রমাণিত হয়েছে।

আল্লাহ পাক স্বীয় নবী (সঃ)-কে বলেন, তুমি বলে দাও– সব কিছুই আল্লাহর অধিকারে রয়েছে। কাজের পরিণতি সম্পর্কে তিনিই পূর্ণ ওয়াকিফহাল। তোমরা যদি চোখে না দেখা পর্যন্ত ঈমান আনতে না চাও তবে আমার ও তোমাদের

ব্যাপারে আল্লাহর হুকুমের অপেক্ষা কর। তারা তো নবী (সঃ)-এর এমন কতগুলো মু'জিযাও দেখেছিল যেগুলো তাদের আকাঙ্ক্ষিত মু'জিযার চেয়ে বড় ছিল। যেমন রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাদের চোখের সামনে চৌদ্দ তারিখের চাঁদকে অঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করেন এবং সাথে সাথে চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায়। এটা তো যমীনে প্রকাশিত মু'জিযা হতে বহুগুণে বড় ছিল। আর জিজ্ঞাসিত ও অজিজ্ঞাসিত সমস্ত নিদর্শন অপেক্ষা উত্তম ছিল। এখনও যদি আল্লাহ তা'আলা জানতেন যে, তারা কোন মু'জিযা সুপথ প্রাপ্তির ইচ্ছায় দেখতে চাচ্ছে তবে তিনি অবশ্যই তা দেখাতেন। কিন্তু তিনি জানেন যে, তারা জিদ ও অবাধ্যতার মন নিয়েই মু'জিযা দেখতে চাচ্ছে। তাই তাদের আবেদন মঞ্জুর করা হচ্ছে না। মহান আল্লাহ এটা জ্ঞাত ছিলেন যে, এখনও তারা ঈমান আনবে না। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ ـ

অর্থাৎ "নিশ্চয়ই যাদের উপর তোমার প্রতিপালকের দলীল অবধারিত হয়ে গেছে, তাদের উপর যতই নিদর্শন পেশ করা হোক না কেন তারা ঈমান আনবে না।" (১০ঃ ৯৬) অন্য জায়গায় আল্লাহ পাক বলেনঃ

وَلَوْ اَنَّنَا نَزَّلْنَا اِلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتٰى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْا

অর্থাৎ "যদি আমি তাদের কাছে ফেরেশতাও অবতীর্ণ করি এবং মৃতেরা তাদের সাথে কথা বলতেও শুরু করে দেয়, আর সমস্ত জিনিস তাদের কাছে জমা করে দেয়াও হয় এবং প্রত্যেকটা মু'জিযাও দেখানো হয় তথাপি তারা কখনো ঈমান আনবে না।" (৬ঃ ১১১) কেননা শুধু জিদ করাই হচ্ছে তাদের উদ্দেশ্য। যেমন তিনি বলেনঃ ... وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَآءِ (১৫ঃ ১৪) আরো বলেনঃ وَاِنْ يَّرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَآءِ (৫২ঃ ৪৪) এবং আর এক জায়গায় বলেনঃ

وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتٰبًا فِيْ قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوْهُ بِاَيْدِيْهِمْ لَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِنْ هٰذَا اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ـ

অর্থাৎ "যদি আমি তাদের উপর আসমানের দরজাও খুলে দেই বা তারা আকাশের একটা টুকরা খসে পড়তেও দেখে নেয় এবং তাদের উপর যদি আমি এমন কোন আসমানী কিতাবও অবতীর্ণ করি যা কাগজে লিখিত অবস্থায় থাকে, অতঃপর তারা তা তাদের হাত দ্বারা স্পর্শও করে, তবুও সেই কাফিররা অবশ্যই

বলবে– এটা তো স্পষ্ট যাদু ছাড়া আর কিছুই নয়।" (৬ঃ ৭) সুতরাং তাদেরকে কাম্য বস্তু প্রদান করে লাভ কি? কেননা তারা যা কিছুই দেখতে চাচ্ছে তা শুধু জিদের বশবর্তী হয়ে। এজন্যেই মহান আল্লাহ বলেনঃ "অতএব তোমরাও প্রতীক্ষায় থাকো, আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষায় থাকলাম।"

২১। আর যখন আমি মানুষকে কোন নিয়ামতের স্বাদ উপভোগ করাই তাদের উপর কোন বিপদ পতিত হওয়ার পর, তখনই তারা আমার আয়াতসমূহ সম্বন্ধে দুরভিসন্ধি করতে থাকে; তুমি বলে দাও–আল্লাহ অতিসত্বরই এই দুরভিসন্ধির শাস্তি প্রদান করবেন; নিশ্চয়ই আমার ফেরেশতারা তোমাদের সকল দুরভিসন্ধি লিপিবদ্ধ করছে।

٢١- وَإِذَآ أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّنْۢ بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَّكْرٌ فِيْٓ اٰيَاتِنَاؕ قُلِ اللّٰهُ أَسْرَعُ مَكْرًاؕ إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُوْنَ مَا تَمْكُرُوْنَ○

২২। তিনি এমন, যিনি তোমাদেরকে স্থলভাগে ও জলভাগে পরিভ্রমণ করান; এমন কি যখন তোমরা নৌকায় অবস্থান কর, আর সেই নৌকাগুলো লোকদের নিয়ে অনুকূল বায়ুর সাহায্যে চলতে থাকে, আর তারা তাতে আনন্দিত হয়, (হঠাৎ) তাদের উপর এক প্রচণ্ড (প্রতিকূল) বায়ু এসে পড়ে এবং প্রত্যেক দিক হতে তাদের উপর তরঙ্গমালা ধেয়ে আসে, আর তারা মনে করে যে, তারা

٢٢- هُوَ الَّذِيْ يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِؕ حَتّٰىٓ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِۚ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيْحٍ طَيِّبَةٍ وَّفَرِحُوْا بِهَا جَآءَتْهَا رِيْحٌ عَاصِفٌ وَّجَآءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَّظَنُّوْٓا أَنَّهُمْ أُحِيْطَ بِهِمْۙ دَعَوُا اللّٰهَ

مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هٰذِهِ لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ ○

(বিপদে) বেষ্টিত হয়ে পড়েছে, (তখন) সকলে খাঁটি বিশ্বাসের সাথে আল্লাহকেই ডাকতে থাকে, (হে আল্লাহ!) যদি আপনি আমাদেরকে এটা হতে রক্ষা করেন, তবে আমরা অবশ্যই কৃতজ্ঞ হয়ে যাবো।

٢٣- فَلَمَّا أَنْجٰهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُوْنَ فِى الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يٰأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلٰى أَنْفُسِكُمْ مَّتَاعَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ○

২৩। অনন্তর যখনই আল্লাহ তাদেরকে উদ্ধার করে নেন, তখনই তারা ভূ-পৃষ্ঠে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহাচরণ করতে থাকে, হে লোক সকল! (শুনে রেখো), তোমাদের বিদ্রোহাচরণ তোমাদেরই (প্রাণের) জন্যে বিপদ হবে, পার্থিব জীবনে (এটা দ্বারা কিছু) ফলভোগ করছো, তৎপর আমারই পানে তোমাদেরকে ফিরে আসতে হবে, অতঃপর আমি তোমাদের যাবতীয় কৃতকর্ম তোমাদেরকে জানিয়ে দেবো।

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন-বিপদ আপদের স্বাদ গ্রহণ করার পর মানুষ যখন আমার রহমত প্রাপ্ত হয়, যেমন দারিদ্রের পরে স্বচ্ছলতা, দুর্ভিক্ষের পরে উত্তম উৎপাদন, মুষলধারে বৃষ্টি ইত্যাদি, তখন সে হাসি-তামাশা করতে শুরু করে এবং আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। আর যখন মানুষকে বিপদ আপদে ঘিরে ফেলে তখন সে উঠতে, বসতে, শুইতে, জাগতে সর্বাবস্থাতেই প্রার্থনায় লেগে পড়ে।

সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) একদা ফজরের সালাত পড়ান। বর্ষার রাত্রি ছিল। তিনি বললেনঃ "আজকে রাত্রে আল্লাহ তা'আলা কি বলেছেন

তা তোমরা জান কি?" সাহাবীগণ উত্তরে বললেনঃ "আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলই (সঃ) খুব ভাল জানেন।" তখন তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেনঃ "আজ আমার মুমিন বান্দাও সকাল করেছে এবং কাফির বান্দাও সকাল করেছে (অর্থাৎ সবাই সকালে উঠেছে)। কিন্তু যে বান্দা বলেছে যে, এই বৃষ্টির কারণ হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহ ও করুণা, সে আমার উপর বিশ্বাস স্থাপনকারী এবং তারকার প্রভাবকে অস্বীকারকারী। পক্ষান্তরে যে বান্দা এই বিশ্বাস রাখে যে, এই বৃষ্টির কারণ হচ্ছে নক্ষত্রের প্রভাব, সে আমাকে অস্বীকারকারী এবং নক্ষত্রের উপর বিশ্বাস স্থাপনকারী।"

আল্লাহপাকের উক্তিঃ قُلِ اللّٰهُ اَسْرَعُ مَكْرًا অর্থাৎ হে রাসূল (সঃ)! তুমি এই কাফিরদেরকে বলে দাও– আমার প্রতিপালক আল্লাহ্ তা'আলার কর্মকৌশল বড়ই কার্যকরী হয়ে থাকে। হে পাপীদের দল! তোমরা কি ধারণা করছো যে, তোমাদেরকে তোমাদের কুফরীর কারণে কোন শাস্তি দেয়া হবে না? প্রকৃতপক্ষে তোমাদেরকে ঢিল দিয়ে রাখা হয়েছে। অতঃপর যখন তোমাদের উদাসীনতা শেষ সীমায় পৌঁছে যাবে তখন আকস্মিকভাবে তোমাদেরকে পাকড়াও করা হবে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, আমার ফেরেশ্তারা তাদের কাজ কর্ম লিখতে থাকে। অতঃপর তারা তা আলেমুল গায়েব আল্লাহর নিকট পেশ করে তাকে। তারপর তিনি প্রত্যেক বড় ও ছোট পাপের শাস্তি প্রদান করেন।

এরপর মহান আল্লাহ্ বলেন, আল্লাহ্ তোমাদের জন্যে স্থলভাগ ও জলভাগের ভ্রমণ সহজ করে দিয়েছেন এবং পানির মধ্যেও তিনি তোমাদেরকে তাঁর আশ্রয় ও হিফাজতে নিয়ে নিয়েছেন। যখন তোমরা নৌকায় আরোহণ কর এবং বাতাস নৌকা চালাতে শুরু করে, তখন তোমরা বাতাসের নিম্নগতি ও দ্রুত চালিত হওয়ার কারণে খুবই খুশী হয়ে থাকো। হঠাৎ তোমাদের উপর এক প্রচণ্ড ও প্রতিকূল বাতাস এসে পড়ে এবং প্রত্যেক দিক থেকে তোমাদের উপর তরঙ্গমালা ধেয়ে আসে। ঐ সময় তোমাদের মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে, তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় তোমরা খাঁটি বিশ্বাসের সাথে একমাত্র আল্লাহকেই ডাকতে থাকো। ঐ সময় না তোমাদের কোন প্রতিমার কথা স্মরণ হয়, না স্মরণ হয় লাত, হুবল ইত্যাদি কোন মূর্তির কথা। বরং তখন শুধুমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাকেই সম্বোধন করে থাকো। অতঃপর মহান আল্লাহ্ যখন তোমাদেরকে নিরাপদে সমুদ্রের তীরে পৌঁছিয়ে দেন তখন পুনরায় তোমরা তাঁর থেকে বিমুখ হয়ে যাও। সত্যি, মানুষ কতই না অকৃতজ্ঞ!

এখানে আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ

دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ـ لَئِنْ اَنْجَيْتَنَا .....

অর্থাৎ "তারা বড়ই আন্তরিকতার সাথে আল্লাহ তা'আলাকে ডেকে বলে- হে আল্লাহ! যদি আপনি আমাদেরকে এই বিপদ হতে রক্ষা করেন তবে অবশ্যই আমরা কৃতজ্ঞ হয়ে যাবো। অতঃপর যখন তিনি তাদেরকে বিপদ থেকে রক্ষা করেন তখন তারা দেশে অন্যায় ও অবিচার করতে শুরু করে দেয়। দেখে মনে হয় যেন তারা কখনও বিপদে পড়েইনি।

ইরশাদ হচ্ছে ...... يٰاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ অর্থাৎ "হে লোক সকল! জেনে রেখো যে, তোমাদের বিদ্রোহাচরণ তোমাদেরই প্রাণের জন্যে বিপদের কারণ হবে, এতে অন্য কারো ক্ষতি হবে না।" যেমন হাদীসে এসেছেঃ "(আল্লাহর বিরুদ্ধে) বিদ্রোহ ঘোষণা এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকরণ, এ দুটো এমনই পাপ যে, এ কারণে পরকালে শাস্তি হবেই, এমনকি দুনিয়াতেও সত্বর এর শাস্তি হয়ে যাবে।"

আল্লাহ পাকের উক্তিঃ ..... مَتَاعَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا অর্থাৎ "এই পার্থিব জগতে তোমরা কিছুকাল সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করবে বটে, কিন্তু এর পরেই তোমাদেরকে আমারই কাছে ফিরে আসতে হবে।" .... فَنُنَبِّئُكُمْ অর্থাৎ "যখন তোমরা আমার কাছে ফিরে আসবে তখন আমি তোমাদেরকে তোমাদের সমস্ত আমল সম্পর্কে অবহিত করবো এবং ওগুলোর পূর্ণ প্রতিদান তোমাদেরকে দেয়া হবে।" যে ভাল প্রতিদান পাবে সে তো মহান আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। আর যে শাস্তি পাবে সে নিজের নফ্সের উপর ভর্ৎসনা করবে।

২৪। বস্তুতঃ পার্থিব জীবনের অবস্থা তো এরূপ, যেমন আমি আসমান হতে পানি বর্ষণ করলাম, তৎপর তা দ্বারা উৎপন্ন হয় যমীনের উদ্ভিদগুলো অতিশয় ঘন হয়ে, যা মানুষ ও পশুরা ভক্ষণ করে; এমন কি, যখন সেই যমীন নিজের সুদৃশ্যতার পূর্ণ রূপ

٢٤- اِنَّمَا مَثَلُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا

كَمَآءٍ اَنْزَلْنٰهُ مِنَ السَّمَآءِ

فَاخْتَلَطَ بِهٖ نَبَاتُ الْاَرْضِ مِمَّا

يَاْكُلُ النَّاسُ وَالْاَنْعَامُ حَتّٰى اِذَآ

اَخَذَتِ الْاَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ اَهْلُهَآ اَنَّهُمْ قٰدِرُوْنَ عَلَيْهَآ لا اَتٰهَآ اَمْرُنَا لَيْلًا اَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنٰهَا حَصِيْدًا كَاَنْ لَّمْ تَغْنَ بِالْاَمْسِ ط كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ○

ধারণ করলো এবং তা শোভনীয় হয়ে উঠলো, আর ওর মালিকরা মনে করলো যে, তারা এখন ওর পূর্ণ অধিকারী হয়েছে, তখন দিবাকালে অথবা রাত্রিকালে ওর উপর আমার পক্ষ হতে কোন আপদ এসে পড়লো, সুতরাং আমি ওকে এমন নিশ্চিহ্ন করে দিলাম যেন গতকল্য ওর অস্তিত্বই ছিল না, এই রূপেই আয়াতগুলোকে আমি বিশদরূপে বর্ণনা করি এমন লোকদের জন্যে যারা ভেবে দেখে।

٢٥- وَاللّٰهُ يَدْعُوْٓا اِلٰى دَارِ السَّلٰمِ ط وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ○

২৫। আর আল্লাহ তোমাদেরকে স্থায়ী নিবাসের দিকে আহ্বান করেন; এবং যাকে ইচ্ছা সরল পথে চলার ক্ষমতা দান করেন।

আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার বাহ্যিক সৌন্দর্য, সজীবতা এবং এরপর ওর সত্বরই ধ্বংস হয়ে যাওয়ার দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন ঐ লতাপাতা ও উদ্ভিদের সাথে যাকে তিনি আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণের মাধ্যমে যমীন থেকে বের করে থাকেন। এগুলো মানুষ খেয়ে থাকে। যেমন খাদ্যশস্য এবং বিভিন্ন প্রকারের ফলমূল। এগুলো শুধু মানুষেরই খাদ্য নয়, বরং চতুষ্পদ জন্তুগুলোও এর নাড়া খেয়ে থাকে। যখন যমীনের এই ধ্বংসশীল সৌন্দর্য বসন্তকালে দেখা দেয় এবং বিভিন্ন রূপের ও বর্ণের সবজিগুলো পূর্ণ সজীবতায় এসে পড়ে, তখন কৃষক ধারণা করে যে, ফসল কেটে নেবে এবং ফল পেড়ে নেবে। এমতাবস্থায় অকস্মাৎ ওর উপর বিদ্যুৎ অথবা ঘূর্ণিঝড় এসে গেল। ফলে গাছের সমস্ত পাতা শুকিয়ে জ্বলে গেল এবং ফুল-ফল যত কিছু ছিল সমস্তই ধ্বংস হয়ে গেল। আর ওর সজীবতা ও শ্যামলতার পরে ওটা শুষ্ক কাঠের ঢেরিতে পরিণত হলো। মনে হলো যেন ওটা কখনো সজীব ও

সবুজ শ্যামল ছিলই না এবং কৃষককে এরূপ নিয়ামত কখনো দেয়াই হয়নি। এ জন্যেই হাদীসে এসেছে– দুনিয়াবাসীকে নিয়ামত দান করা হয়ে থাকে। অতঃপর তাকে আগুনে নিক্ষেপ করা হয় এবং জিজ্ঞেস করা হয়ঃ "তুমি কখনো শান্তি লাভ করেছিলে কি?" সে উত্তরে বলেঃ "না, কখনই না।" অন্য একটি লোক এমন হয় যে, সে দুনিয়ায় বড়ই শাস্তি ও কষ্ট ভোগ করেছে। অতঃপর তাকে জান্নাতে পাঠিয়ে দেয়া হয় এবং জিজ্ঞেস করা হয়ঃ "তুমি কখনো কোন কষ্ট ভোগ করেছিলে কি?" সে জবাবে বলেঃ "না, কখনই না।" আল্লাহ পাক ঐ ধ্বংসপ্রাপ্ত লোকদের সম্পর্কে বলেনঃ "তারা তাদের বাসভূমিতে এমনভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে যে, তারা যেন সেখানে কখনো বাসই করেনি।"

ইরশাদ হচ্ছে– .. كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ অর্থাৎ এই ভাবেই আমি আয়াতগুলোকে বিশদরূপে বর্ণনা করি এমন লোকদের জন্যে যারা চিন্তা ভাবনা করে থাকে। মানুষ যেন এই শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে যে, দুনিয়া খুবই তাড়াতাড়ি ধ্বংস হয়ে যাবে। দুনিয়ার উপর ক্ষমতা প্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও দুনিয়া তার সাথে প্রতারণা করে যাচ্ছে। যে ব্যক্তি দুনিয়ার দিকে অগ্রসর হয়, দুনিয়া তার থেকে পলায়ন করে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি দুনিয়ার দিক থেকে পলায়ন করে, দুনিয়া তার পায়ের উপর এসে পতিত হয়। আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়ার দৃষ্টান্ত উদ্ভিদের সাথে কুরআন কারীমের অন্য জায়গাতেও দিয়েছেন। সূরায়ে কাহাফে তিনি বলেছেন ঃ

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ اَنْزَلْنٰهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهٖ نَبَاتُ الْاَرْضِ فَاَصْبَحَ هَشِيْمًا تَذْرُوْهُ الرِّيٰحُ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا

অর্থাৎ "তুমি তাদের কাছে পার্থিব জীবনের অবস্থা বর্ণনা কর যে, তা এরূপ– যেমন, আমি আকাশ হতে পানি বর্ষণ করি তৎপর তার সাহায্যে যমীনের উদ্ভিদসমূহ ঘন সন্নিবেশিত হয়ে যায়, অতঃপর তা (শুকিয়ে) চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায় যে, বায়ু তা উড়িয়ে নিয়ে ফিরে (দুনিয়ার অবস্থাও তদ্রূপ)। আর আল্লাহ্ প্রত্যেক বস্তুর উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান।" (১৮ঃ ৪৫) অনুরূপভাবে আল্লাহ্ তা'আলা সূরায়ে যুমারে ও সূরায়ে হাদীদে পার্থিব দুনিয়ার দৃষ্টান্ত ওরই সাথে প্রদান করেছেন।

হারিস ইবনে হিশাম (রঃ) বর্ণনা করেছেন, আমি মারওয়ান ইবনে হাকাম (রাঃ)-কে মিম্বরের উপর পড়তে শুনেছিঃ

وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ اَهْلُهَا اَنَّهُمْ قَادِرُوْنَ عَلَيْهَا
وَمَا كَانَ لِيُهْلِكَهُمْ اِلَّا بِذُنُوْبِ اَهْلِهَا

অর্থাৎ "তা (যমীন) শোভনীয় হয়ে উঠলো, আর এর মালিকরা মনে করলো যে, তারা এখন এর উপর পূর্ণ অধিকার লাভ করেছে, (এমন সময় সারা ক্ষেত ধ্বংস হয়ে গেল।) শুধু এর মালিকদের পাপের কারণেই তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে।" তিনি বলেন, আমি যা পাঠ করলাম তা কিন্তু মাসহাফে নেই। তখন আব্বাস ইবনে আব্দিল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বললেন যে, ঐ রূপই ইবনে আব্বাস (রাঃ) পাঠ করে থাকেন। ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর নিকট লোক পাঠিয়ে তাঁকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেনঃ "উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) আমাকে এরূপই পড়িয়েছেন।" এ কিরআতটি গারীবই বটে। মনে হয় এটা যেন তাফসীরে বেশী করে দেয়া হয়েছে।[১]

وَاللّٰهُ يَدْعُوْا اِلٰى دَارِ السَّلٰمِ আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার নশ্বরতা ও জান্নাতের প্রতি উৎসাহ প্রদানের বর্ণনার পর এখন জান্নাতের দিকে আহ্বান করছেন এবং ওটাকে 'দারুস সালাম' বলে আখ্যায়িত করছেন। অর্থাৎ জান্নাত হচ্ছে সমস্ত বিপদ-আপদ ও ক্ষয়-ক্ষতি থেকে আশ্রয় লাভের স্থান।

আবূ কালাবা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ "আমাকে বলা হয়– আপনার চক্ষু যেন ঘুমিয়ে থাকে, অন্তর যেন (জেগে জেগে) বুঝতে থাকে এবং কর্ণ যেন শ্রবণ করতে থাকে। সুতরাং আমার চক্ষু ঘুমিয়ে গেল, আমার অন্তর বুঝতে থাকলো এবং আমার কর্ণ শুনতে থাকলো। অতঃপর আমাকে বলা হলোঃ (আপনার দৃষ্টান্ত এইরূপ) যেমন একজন নেতা একটা ঘর নির্মাণ করলো ও ওর মধ্যে ভোজের ব্যবস্থা করলো। তারপর (লোকদেরকে দাওয়াত করার জন্যে) একজন দাওয়াতকারীকে পাঠালো। অতএব, যে ব্যক্তি তার দাওয়াত কবূল করলো সে ঘরে প্রবেশ করে খাদ্য গ্রহণ করলো এবং নেতা তার উপর সন্তুষ্ট হয়ে গেল। আর যে ব্যক্তি দাওয়াত কবূল করলো না সে ঘরেও প্রবেশ করলো না ও খাবারও খেলো না এবং নেতা তার উপর সন্তুষ্টও হলো না। নেতা হলেন আল্লাহ্, ঘর হলো ইসলাম, খাদ্য হলো জান্নাত এবং দাওয়াতকারী হলেন মুহাম্মাদ (সঃ)।" এ হাদীসটি মুরসাল।[২]

জাবির ইবনে আবদিল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদের নিকট বেরিয়ে আসলেন এবং বললেনঃ "আমি স্বপ্নে দেখি যে,

১. এটা ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

২. হাদীসের বর্ণনাকারী কোন তাবেয়ী যদি সাহাবীকে বাদ দিয়ে বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, তবে ঐ হাদীসকে মুরসাল বলে।

জিবরাঈল (আঃ) আমার মাথার কাছে রয়েছেন এবং মীকাঈল (আঃ) রয়েছেন আমার পায়ের কাছে। তাঁদের একজন স্বীয় সাথীকে বলছেন- 'এই (ঘুমন্ত) ব্যক্তির একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করুন।' তখন তিনি বললেন- '(হে ঘুমন্ত ব্যক্তি!) আপনি শ্রবণ করুন! আপনার কান শুনছে, আপনার অন্তর (জেগে জেগে) অনুধাবন করছে। আপনার দৃষ্টান্ত ও আপনার উম্মতের দৃষ্টান্ত হচ্ছে একজন বাদশাহ্র দৃষ্টান্তের মত, যিনি একটি ঘর বানিয়েছেন এবং তাতে একটি বড় কক্ষ তৈরী করেছেন। আর তাতে বিছিয়ে দিয়েছেন (খাদ্যের) দস্তরখানা। তারপর তাঁর খাদ্য খাওয়াবার জন্যে একজন দূতকে পাঠিয়ে দিয়েছেন লোকজনকে ডেকে আনতে। সুতরাং কেউ কেউ ঐ দূতের আহ্বানে সাড়া দিলো এবং কেউ কেউ সাড়া দিলো না, বরং তা প্রত্যাখ্যান করলো। বাদশাহ হচ্ছেন আল্লাহ, ঘর হচ্ছে ইসলাম, কক্ষ হচ্ছে জান্নাত এবং হে মুহাম্মাদ (সঃ)! আপনি হচ্ছেন দূত। অতএব, যে ব্যক্তি আপনার আহ্বানে সাড়া দিলো সে ইসলামের মধ্যে প্রবেশ করলো। আর যে ইসলামের মধ্যে প্রবেশ করলো সে জান্নাতে প্রবেশ করলো এবং যে জান্নাতে প্রবেশ করলো সে ওর থেকে (খাদ্য) ভক্ষণ করলো।"[১]

আবূ দারদা (রাঃ) হতে মারফূ' রূপে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "যখন সূর্য উদিত হয় তখনই ওর দু'দিকে দু'জন ফিরিশ্তা থাকেন এবং তাঁরা উচ্চৈঃস্বরে ডাক দিয়ে থাকেন, যে ডাক দানব ও মানব ছাড়া সবাই শুনতে পায়। তাঁরা ডাক দিয়ে বলেন- হে লোক সকল! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের দিকে ধাবিত হও। যদি কম পাওয়া যায় এবং তা যথেষ্ট মনে করা হয় তবে ঐ কম ঐ বেশী অপেক্ষা উত্তম যা (আল্লাহর স্মরণ থেকে) ভুলিয়ে রাখে।"

২৬। যারা নেক কাজ করেছে তাদের জন্যে উত্তম বস্তু (জান্নাত) রয়েছে; আর তদুপরি (আল্লাহর দীদার) ও; আর না তাদের মুখমণ্ডলকে মলিনতা আচ্ছন্ন করবে, আর না অপমান; তারাই হচ্ছে জান্নাতের অধিবাসী, তারা ওর মধ্যে অনন্তকাল থাকবে।

٢٦- لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ○

---

১. এ হাদীসটি ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, যে ব্যক্তি ভাল কাজ করলো সে পরকালে উত্তম প্রতিদান পাবে। কেননা, পুণ্যের বিনিময়ে পুণ্য পাওয়া যায়। বরং আরো কিছু বেশী পাওয়া যাবে। অর্থাৎ কমপক্ষে দশগুণ এমন কি সাতশ' গুণ পর্যন্ত প্রাপ্ত হবে, বরং এর চেয়েও কিছু বেশী, যেগুলো আল্লাহ তা'আলার অন্যান্য দানের অন্তর্ভুক্ত। যেমন জান্নাতে সে পাবে হুর ও প্রাসাদ এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি। আর এমন মনোমুগ্ধকর জিনিস যা এই পর্যন্ত তার কাছে অজানা রয়েছে। কিন্তু সর্বোপরি নিয়ামত হচ্ছে মহান আল্লাহর দর্শন লাভ। এটা হবে সমস্ত করুণার মধ্যে বড় করুণা। কেননা, সে তার আমলের কারণে এর যোগ্য হবে না, বরং এটা হবে একমাত্র আল্লাহ পাকের সীমাহীন দয়ার কারণে। পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বিভিন্ন মনীষী হতে اَلزِّيَادَةُ শব্দের যে তাফসীর বর্ণিত হয়েছে, তা হচ্ছে আল্লাহ পাকের পবিত্র চেহারার প্রতি দৃষ্টিপাত। ঐ মনীষীগণ হচ্ছেন আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ), হুযাইফা ইবনে ইয়ামান (রাঃ), আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ), সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব (রাঃ), আবদুর রহমান ইবনে আবি লাইলা (রাঃ), আবদুর রহমান ইবনে সাবিত (রাঃ), মুজাহিদ (রঃ), ইকরামা (রঃ), আমির ইবনে সাদ (রঃ), আতা (রঃ), যহ্হাক (রঃ), হাসান (রঃ), কাতাদা (রঃ), সুদ্দী (রঃ), মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক (রঃ) প্রমুখ। এই মতের সমর্থনে নবী (সঃ) হতে বহু হাদীসও বর্ণিত আছে। সুহাইব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوا الْحُسْنٰى وَزِيَادَةٌ -এই আয়াতটি পাঠ করে বলেন, যখন জান্নাতবাসী জান্নাতে এবং জাহান্নামবাসী জাহান্নামে প্রবেশ করবে, তখন একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করবেনঃ "হে জান্নাতবাসীরা! আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সাথে যে ওয়াদা করেছিলেন তা তিনি পূরণ করতে চান।" তখন জান্নাতবাসীরা বলবেঃ "সেই ওয়াদা কি? দাঁড়িপাল্লায় আমাদের (পুণ্যের) ওজন ভারী হয়েছে, আমাদের চেহারা উজ্জ্বল করা হয়েছে, আমরা জান্নাতে প্রবেশ করেছি এবং জাহান্নাম হতে মুক্তি পেয়েছি। (সুতরাং আল্লাহ পাকের ওয়াদা পূরণ হতে আর বাকী থাকলো কি?)।" এমন সময় হঠাৎ তাদের উপর থেকে পর্দা উঠিয়ে নেয়া হবে এবং তাদের দৃষ্টি আল্লাহ তা'আলার উপর পড়ে যাবে। আল্লাহর শপথ! জান্নাতীদের জন্যে এর চেয়ে বড় দান আর কিছুই হবে না। এটাই হবে সবচেয়ে বেশী চক্ষু ঠাণ্ডাকারী ও মনে শান্তিদায়ক।[১] মোটকথা, বিভিন্ন হাদীসে রয়েছে যে, زِيَادَةٌ শব্দ দ্বারা আল্লাহ তা'আলার দর্শন বুঝানো হয়েছে।

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহ পাক বলেনঃ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ অর্থাৎ হাশরের ময়দানে জান্নাতাবাসীদের মুখমণ্ডল মলিন ও কালিমাময় হবে না। পক্ষান্তরে কাফিরদের চেহারা হবে ধূলিমলিন ও কালিমাযুক্ত। জান্নাতীরা কোনক্রমেই লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবে না, প্রকাশ্যেও না, অপ্রকাশ্যেও না। বরং আল্লাহ পাক তো এই জান্নাতীদের সম্পর্কেই বলেছেনঃ

فَوَقَاهُمُ اللّٰهُ شَرَّ ذٰلِكَ الْيَوْمِ وَلَقّٰهُمْ نَضْرَةً وَّسُرُورًا

অর্থাৎ "আল্লাহ তাদেরকে ঐ দিবসের কঠোরতা হতে নিরাপদে রাখবেন এবং তাদেরকে স্ফূর্তি ও আনন্দ দান করবেন।" (৭৬ঃ ১১) আল্লাহ দয়া করে আমাদেরকে এই লোকদেরই অন্তর্ভুক্ত করুন। আমীন।

২৭। পক্ষান্তরে যারা মন্দ কাজ করে, তারা তাদের মন্দ কাজের শাস্তি পাবে ওর অনুরূপ, এবং অপমান তাদেরকে আচ্ছাদিত করে নেবে; তাদেরকে আল্লাহ (এর শাস্তি) হতে কেউই রক্ষা করতে পারবে না, যেন তাদের মুখমণ্ডলকে আচ্ছাদিত করে দেয়া হয়েছে অন্ধকার রাত্রির পরতসমূহ দ্বারা; এরা হচ্ছে জাহান্নামের অধিবাসী, তারা ওর মধ্যে অনন্তকাল থাকবে।

٢٧- وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّاٰتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَا لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمٍ كَاَنَّمَا اُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ الَّيْلِ مُظْلِمًا اُولٰئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خٰلِدُونَ○

আল্লাহ তা'আলা যখন সৌভাগ্যবানদের সম্পর্কে খবর দিলেন যে, তাদের পুণ্যের বিনিময় বহুগুণ দেয়া হয়ে থাকে তখন এখানে তিনি হতভাগ্য, পাপী ও মুশরিকদের অবস্থার বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তাদের প্রতি ন্যায় বিচার করা হবে। আর তা হলো এই যে, তাদের পাপ ও অপরাধের শাস্তি দ্বিগুণ, চারগুণ দেয়া হবে না, বরং সমান সমান দেয়া হবে। আল্লাহ পাক বলেন– যখন ঐ পাপীদেরকে পেশ করা হবে তখন তোমরা তাদেরকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত অবস্থায় দেখতে পাবে। তোমরা এটা ধারণা করো না যে, আল্লাহ তা'আলা ঐ সব যালিমের আমল থেকে উদাসীন ও অমনোযোগী রয়েছেন। কিয়ামতের দিন পর্যন্ত তাদের শাস্তি বিলম্বিত

করা হয়েছে। তাদেরকে আল্লাহর শাস্তি হতে কেউ বাঁচাতেও পারবে না এবং তাদের জন্যে কোন সুপারিশকারীও হবে না। সেই দিন মানুষ বলবে– পালাবার স্থান কোথায়? কখনও সম্ভব নয়, কোথাও আশ্রয়ের স্থান নেই। সেই দিন শুধুমাত্র তোমার প্রতিপালকের সমীপেই ঠিকানা আছে। তাদেরকে আল্লাহর সামনে হাযির হতেই হবে। ঐ দিন তাদের মুখমণ্ডল এতো কালো হবে যে, যেন তাদের চেহারার উপর রাত্রির অন্ধকারের চাদর চড়িয়ে দেয়া হয়েছে। সেই দিন কতকগুলো মুখমণ্ডল হবে উজ্জ্বল, আর কতকগুলো চেহারা হবে কালো ও মলিন। যাদের চেহারা মলিন হবে তাদেরকে বলা হবে– তোমরাই কি ঈমান আনয়নের পর কুফরী করেছিলে? তাহলে এখন কুফরীর স্বাদ গ্রহণ কর। আর যাদের চেহারা উজ্জ্বল হবে তারা আল্লাহর করুণার মধ্যে থাকবে এবং ঐ করুণার মধ্যে তারা চিরকালই থাকবে। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে– "কতকগুলো চেহারা হবে উজ্জ্বল ও হাস্যময় এবং তারা থাকবে সদা প্রফুল্ল। আর কতকগুলো চেহারার উপর মলিনতা ছেঁয়ে যাবে (অর্থাৎ কতকগুলো লোকের মুখমণ্ডল রাত্রির অন্ধকারের মত কালো দেখাবে)।"

২৮। আর সেই দিনটিও উল্লেখযোগ্য, যেদিন আমি তাদেরকে একত্রিত করবো, অতঃপর বলবো– তোমরা ও তোমাদের নিরূপিত শরীকরা স্ব-স্ব স্থানে অবস্থান কর, অনন্তর আমি তাদের মধ্যে পরস্পর বিভেদ সৃষ্টি করে দেবো এবং তাদের সেই শরীকরা বলবে–তোমরা তো আমাদের ইবাদত করতে না।

২৮– وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ ۝

২৯। বস্তুতঃ আমাদের ও তোমাদের মধ্যে আল্লাহই হচ্ছেন যথোপযুক্ত সাক্ষী যে, আমরা তোমাদের ইবাদত সমন্ধে অবগত ছিলাম না।

২৯– فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ ۝

৩০। তথায় প্রত্যেক ব্যক্তিই স্বীয় পূর্ব কৃতকর্মগুলো পরীক্ষা করে নেবে এবং তাদেরকে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তিত করা হবে, যিনি তাদের প্রকৃত মালিক, আর যেসব মিথ্যা মা'বূদ তারা বানিয়ে নিয়েছিল তারা সবাই তাদের দিক থেকে অদৃশ্য হয়ে যাবে।

٣٠- هُنَالِكَ تَبْلُوا كُلُّ نَفْسٍ مَّآ أَسْلَفَتْ وَرُدُّوٓا إِلَى اللَّهِ مَوْلٰهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ع

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ দানব ও মানব এবং ভাল ও মন্দ সকলকেই আমি কিয়ামতের দিন হাযির করবো। কাউকে ছাড়া হবে না। মুশরিকদেরকে বলা হবে–তোমরা ও তোমাদের শরীকরা নিজ নিজ স্থানে অবস্থান কর এবং মুমিনদের হতে পৃথক থাকো। যেই দিন কিয়ামত সংঘটিত হবে সেই দিন এই দু'শ্রেণীর মানুষ পৃথক পৃথকভাবে অবস্থান করবে। যেমন মহান আল্লাহ এক জায়গায় বলেনঃ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُوْنَ অর্থাৎ "হে অপরাধীরা! তোমরা আজ পৃথক হয়ে যাও।" (৩৬ঃ ৫৯) আর এক জায়গায় আল্লাহ পাক বলেনঃ وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَّتَفَرَّقُوْنَ। অর্থাৎ "যেই দিন কিয়ামত সংঘটিত হবে সেই দিন তারা পৃথক পৃথক হয়ে যাবে।" (৩০ঃ ১৪) এটা ঐ সময় হবে যখন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা মুকদ্দমার ফায়সালা করার ইচ্ছা করবেন। এজন্যেই বলা হয়েছে যে, মুমিনরা আল্লাহ তা'আলার কাছে আবেদন করবে– হে আল্লাহ! তাড়াতাড়ি মুকদ্দমার ফায়সালা করুন এবং আমাদেরকে এই স্থান হতে মুক্তিদান করুন।

হাদীসে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "কিয়ামতের দিন আমরা অন্যান্য লোকদের চেয়ে উঁচু জায়গায় থাকবো। এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা এই খবর দিচ্ছেন যে, ঐদিন তিনি বলবেন, হে মুশরিকদের দল! তোমরা এবং তোমাদের শরীকরা স্ব-স্ব স্থানে পৃথক পৃথকভাবে অবস্থান কর। এভাবে আল্লাহ পাক তাদের পরস্পরের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে দিবেন এবং তাদের শরীকরা তাদের ইবাদতকে অস্বীকার করে ফেলবে। মহান আল্লাহ তাই বলছেন যে, এই মুশরিকরা যাদের অনুসরণ করতো এবং এর উপর ভিত্তি করেই তাদেরকে আল্লাহ তা'আলার শরীক মনে করে নিয়েছিল, তারাই ঐ দিন এদের প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করবে। এক জায়গায় আল্লাহ পাক বলেছেনঃ ঐ লোকদের চেয়ে অধিক

পথভ্রষ্ট আর কে হতে পারে, যারা আল্লাহকে ছেড়ে এমন সব মা'বূদকে আহ্বান করছে যারা কিয়ামত পর্যন্ত তাদের ডাকে সাড়া দিতে সক্ষম নয় এবং তারা তাদের আহ্বান থেকে সম্পূর্ণরূপে উদাসীন। আর যখন লোকদেরকে কিয়ামতের দিন উঠানো হবে তখন ওরা (শরীকরা) তাদেরই ইবাদতকারীদের শত্রু হয়ে যাবে এবং বলবে- তোমরা যে আমাদের ইবাদত করতে তাতো আমাদের জানা নেই। তোমরা আমাদের উপাসনা এমনভাবে করতে যে, আমরা নিজেরা তা মোটেই অবগত নই! স্বয়ং আল্লাহ সাক্ষী রয়েছেন যে, আমরা কখনো তোমাদেরকে আমাদের ইবাদত করার জন্যে ডাকিনি, তোমাদেরকে নির্দেশও দেইনি এবং এই ব্যাপারে আমরা তোমাদের প্রতি সন্তুষ্টও নই। এভাবে মুশরিকদের মুখ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে যে, তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন কিছুর ইবাদত করছে যারা শুনেও না, দেখেও না, তাদের কোন উপকারও করতে পারে না, তাদেরকে এর নির্দেশও দেয়নি এবং এতে তাদের সম্মতিও ছিল না। বরং তারা ছিল এ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। তারা এমন প্রতিপালকের ইবাদত পরিত্যাগ করেছে যিনি চিরঞ্জীব ও চিরবিরাজমান। যিনি সবকিছু শ্রবণকারী, সবকিছু দর্শনকারী ও যিনি সবকিছুর উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান। যিনি তাঁর রাসূলগণকে পাঠিয়েছেন এবং কিতাবসমূহ অবতীর্ণ করেছেন এই উদ্দেশ্যে যে, যেন একমাত্র তাঁরই ইবাদত করা হয় এবং তিনি ছাড়া অন্যদের ইবাদত পরিত্যাগ করা হয়। যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ "আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে রাসূল পাঠিয়েছি (এবং বলতে বলেছি) যে, তোমরা আল্লাহরই ইবাদত করবে এবং তাগুত (শয়তান) থেকে দূরে থাকবে, সুতরাং তাদের মধ্যে যারা সুপথ পাওয়ার তারা সুপথ প্রাপ্ত হলো এবং যারা পথভ্রষ্ট হওয়ার তারা পথভ্রষ্ট হলো।" আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ "(হে নবী সঃ)! তোমার পূর্বে আমি যে রাসূলই পাঠিয়েছি তার কাছেই অহী করেছি- আমি ছাড়া কেউ উপাস্য নেই, সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদত করো।" আল্লাহ আর এক জায়গায় বলেনঃ "তোমার পূর্ববর্তী রাসূলদেরকে আমি জিজ্ঞেস করবো-তোমরা কি মানুষকে এই আদেশ করেছিলে যে, রাহমান (আল্লাহ)-কে বাদ দিয়ে বিভিন্ন মা'বূদগুলোর ইবাদত করবে?"

মুশরিকদের অনেক প্রকার রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কিতাবে তাদেরকে উল্লেখ করেছেন এবং তাদের কথা ও অবস্থা বর্ণনা করে তাদের সবকিছু খণ্ডন করেছেন। ঘোষণা করা হচ্ছে যে, কিয়ামতের দিন হিসাবের জন্যে দাঁড়াবার স্থানে প্রত্যেকের পরীক্ষা হয়ে যাবে এবং ভাল ও মন্দ যা কিছু আমল করেছে তা সামনে

হাযির করে দেয়া হবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "সেই দিন সকলের গুপ্ত বিষয় প্রকাশ হয়ে পড়বে।" আর এক জায়গায় মহান আল্লাহ বলেনঃ "সেই দিন মানুষকে তার সমস্ত পূর্বকৃত ও পরে কৃত কার্যাবলী জানিয়ে দেয়া হবে।" আল্লাহ তা'আলা অন্য এক জায়গায় বলেনঃ "কিয়ামতের দিন আমি তার আমলনামা তার জন্যে বের করে তার সামনে হাযির করবো, যা সে উন্মুক্ত অবস্থায় দেখতে পাবে। (বলা হবে) তোমার আমলনামা পাঠ কর; আজ তোমার হিসাব গ্রহণকারীরূপে তুমি নিজেই যথেষ্ট।"

কেউ কেউ هُنَالِكَ تَتْلُوْا كُلُّ نَفْسٍ مَّا اَسْلَفَتْ এরূপ পড়েছেন। অর্থাৎ تَبْلُوْا-এর স্থলে تَتْلُوْا পড়েছেন, যার অর্থ হবে পাঠ করা। কেউ কেউ এর তাফসীর করেছেন– ভাল বা মন্দ কাজ যা সে করেছে তার ফল সে ভোগ করবে। যেমন হাদীসে রয়েছে– "প্রত্যেক উম্মত নিজ নিজ মা'বূদের পিছনে থাকবে। সূর্যপূজক থাকবে সূর্যের পিছনে, চন্দ্রপূজক থাকবে চন্দ্রের পিছনে এবং মূর্তিপূজক থাকবে মূর্তির পিছনে।

আল্লাহ পাকের উক্তিঃ وَرُدُّوْا اِلَى اللّٰهِ مَوْلٰهُمُ الْحَقِّ অর্থাৎ তারা আল্লাহরই কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে। শুধু তারা কেন, বরং সবকিছুই আল্লাহ তা'আলার নিকট ফিরিয়ে নেয়া হবে। অতঃপর তিনি ফায়সালা করে জান্নাতীদেরকে জান্নাতে এবং জাহান্নামীদেরকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দেবেন। আর পথভ্রষ্ট লোকেরা নিজেদের পক্ষ হতে যেসব কপোলকল্পিত মা'বূদ বানিয়ে নিয়েছিল তারা সব বাতাসের মত উড়ে যাবে।

৩১। তুমি বল– তিনি কে, যিনি তোমাদেরকে আসমান ও যমীন হতে রিযিক পৌঁছিয়ে থাকেন? অথবা কে তিনি, যিনি কর্ণ ও চক্ষুসমূহের উপর পূর্ণ অধিকার রাখেন? আর তিনি কে, যিনি জীবন্তকে প্রাণহীন হতে বের করেন, আর প্রাণহীনকে জীবন্ত হতে বের করেন? আর তিনি কে যিনি সমস্ত কাজ পরিচালনা করেন?

٣١- قُلْ مَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ اَمَّنْ يَّمْلِكُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَمَنْ يُّخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُّدَبِّرُ

الْاَمْرَ فَسَيَقُوْلُوْنَ اللّٰهُ فَقُلْ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ○

তখন অবশ্যই তারা বলবে যে, আল্লাহ; অতএব, তুমি বল–তবে কেন তোমরা (শিরক হতে) নিবৃত্ত থাকছো না?

٣٢- فَذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ اِلَّا الضَّلٰلُ فَاَنّٰى تُصْرَفُوْنَ ○

৩২। সুতরাং তিনিই হচ্ছেন আল্লাহ, যিনি তোমাদের প্রকৃত প্রতিপালক, অতএব সত্যের পর ভ্রষ্টতা ছাড়া আর কি রইলো? তবে তোমরা (সত্যকে ছেড়ে) কোথায় ফিরে যাচ্ছ?

٣٣- كَذٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِيْنَ فَسَقُوْٓا اَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ○

৩৩। এইভাবে সমস্ত অবাধ্য লোকের সম্পর্কে তোমার প্রতিপালকের এই কথা সাব্যস্ত হয়ে গেল যে, তারা ঈমান আনবে না।

আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের উপর হুজ্জত পেশ করছেন যে, তাদেরকে তাঁর প্রভুত্ব ও একত্ব স্বীকার করতেই হবে। অর্থাৎ (হে নবী সঃ)! মুশরিকদেরকে জিজ্ঞেস কর– আকাশ হতে যিনি বৃষ্টি বর্ষণ করে থাকেন তিনি কে? যিনি নিজের ক্ষমতাবলে যমীনের মধ্য থেকে আঙ্গুর, নাশপাতি, যায়তুন, খেজুর, ঘন ঘন বাগান এবং গুচ্ছযুক্ত ফল সৃষ্টি করে থাকেন, তাঁর সাথে অন্য কোন মা'বূদ আছে কি? উত্তরে তাদেরকে অবশ্যই বলতে হবে যে, এগুলো শুধুমাত্র আল্লাহরই কাজ। যদি তিনি তাঁর রিযিক বন্ধ করে দেন, তবে কে এমন আছে যে তা খুলতে পারে? যিনি এই শ্রবণশক্তি ও দর্শনশক্তি দান করেছেন এবং ইচ্ছা করলে যিনি এগুলো ছিনিয়ে নিতে পারেন, তিনি কে? যিনি স্বীয় বিরাট ক্ষমতাবলে জীবন্তকে প্রাণহীন থেকে বের করেন এবং প্রাণহীনকে বের করেন জীবন্ত হতে, তিনি কে? এরূপ প্রশ্ন করলে তারা অবশ্যই জবাব দিতে বাধ্য হবে যে, এগুলো করার ক্ষমতা রয়েছে একমাত্র আল্লাহর। তিনিই এসব কাজ করে থাকেন। এই আয়াতের ব্যাপারে মতভেদ পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে এবং এটা সাধারণ ও সবকেই পরিবেষ্টনকারী। সারা বিশ্বের ব্যবস্থাপনা আল্লাহ পাকেরই দায়িত্বে রয়েছে। যা

কিছু হচ্ছে সকলই তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী হচ্ছে। তিনিই সকলকে আশ্রয় দিচ্ছেন। তাঁর বিরুদ্ধে কেউ কাউকেও আশ্রয় দিতে পারে না। সবারই উপর তিনি হাকিম। তাঁর হুকুমের পর কারো হুকুমের কোনই মূল্য নেই। তিনি যাকে ইচ্ছা প্রশ্ন করেন, কিন্তু তাঁকে কেউই কোন প্রশ্ন করতে পারে না। আসমান ও যমীনের সমস্ত মাখলূক তাঁরই রক্ষণাবেক্ষণে রয়েছে। সব সময়েই তিনি একাই সব। আকাশ ও পৃথিবীর সমস্ত রাজত্ব তাঁরই। ফিরিশ্তা, দানব ও মানব তাঁরই মুখাপেক্ষী এবং তাঁরই দাস। তাঁর কাছে সবারই জবাব এটাই যে, এ সমুদয় ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার মধ্যেই রয়েছে। কাফির ও মুশরিকরাও এটা জানে এবং স্বীকারও করে। সুতরাং হে নবী (সঃ)! (তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করঃ) আচ্ছা! তাহলে তোমরা মহান আল্লাহকে ভয় করছো না কেন? কেন অজ্ঞতা প্রকাশ করতঃ তাঁকে ছেড়ে অন্যের উপাসনা করছো? প্রকৃত মা'বূদ তো সেই আল্লাহ যাঁকে তোমরাও স্বীকার করছো। অতএব, একমাত্র তিনিই তো ইবাদতের হকদার। সত্য ও সঠিক কথা বুঝে নেয়ার পরেও এরূপ ভ্রষ্টতার অর্থ কি? তিনি ছাড়া সমস্ত মা'বূদই মিথ্যা ও বাতিল। প্রকৃত মা'বূদের ইবাদত ছেড়ে কোন দিকে তোমরা বিভ্রান্ত হয়ে ফিরছো?

আল্লাহ পাকের উক্তিঃ "এইভাবে সমস্ত অবাধ্য লোকদের সম্পর্কে তোমার প্রতিপালকের এই কথা সাব্যস্ত হয়ে গেল।" অর্থাৎ যেমনভাবে এই মুশরিকরা কুফরী করেছে এবং কুফরীর উপরই প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, তেমনিভাবে তারা এ কথা স্বীকারও করে নিয়েছে যে, আল্লাহই হচ্ছেন মহান ও পবিত্র প্রতিপালক, তিনিই হচ্ছেন সৃষ্টিকর্তা ও রিযিকদাতা, সারা বিশ্বের ব্যবস্থাপক তিনি একাই এবং তিনি রাসূলদেরকে তাওহীদসহ প্রেরণ করেছেন। সুতরাং এই অবাধ্য লোকদের সম্পর্কে মহান আল্লাহর কথা সাব্যস্ত হয়ে গেল যে, তারা জাহান্নামী। যেমন আল্লাহ পাকের উক্তিঃ

قَالُوْا بَلٰى وَلٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِيْنَ

অর্থাৎ "(রাসূলগণ তাদের কাছে এসেছিলেন কি-না, আল্লাহ তা'আলার এই প্রশ্নের উত্তরে) তারা বলবেঃ হ্যাঁ (এসেছিলেন), কিন্তু (আমরা অমান্য করেছিলাম, ফলে) কাফিরদের জন্যে আযাবের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হয়ে রইলো।" (৩৯ ঃ৭১)

٣٤- قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَآئِكُمْ مَّنْ يَّبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ قُلِ اللّٰهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ ○

৩৪। (হে নবী) তুমি বল– তোমাদের (নিরূপিত) শরীকদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি যে প্রথমবারও সৃষ্টি করে, আবার পুনর্বারও সৃষ্টি করে; তুমি বলে দাও– আল্লাহই প্রথমবারও সৃষ্টি করেন, তৎপর তিনিই পুনর্বারও সৃষ্টি করবেন, অতএব, তোমরা (সত্য হতে) কোথায় ফিরে যাচ্ছ?

٣٥- قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَآئِكُمْ مَّنْ يَّهْدِيْٓ اِلَى الْحَقِّ ؕ قُلِ اللّٰهُ يَهْدِيْ لِلْحَقِّ ؕ اَفَمَنْ يَّهْدِيْٓ اِلَى الْحَقِّ اَحَقُّ اَنْ يُّتَّبَعَ اَمَّنْ لَّا يَهِدِّيْٓ اِلَّآ اَنْ يُّهْدٰى ۚ فَمَا لَكُمْ ۚ قف كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ ○

৩৫। তুমি বল– তোমাদের শরীকদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি যে সত্য বিষয়ের সন্ধান দেয়? তুমি বলে দাও যে, আল্লাহই সত্য বিষয়ের পথ প্রদর্শন করেন; তবে কি যিনি সত্য বিষয়ের পথ প্রদর্শন করেন, তিনিই অনুসরণ করার সমধিক যোগ্য, না ঐ ব্যক্তি যে অন্যের পথ প্রদর্শন করা ছাড়া নিজেই পথ প্রাপ্ত হয় না? তবে তোমাদের কি হলো? তোমরা কিরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছো?

٣٦- وَمَا يَتَّبِعُ اَكْثَرُهُمْ اِلَّا ظَنًّا ؕ اِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِيْ مِنَ الْحَقِّ شَيْـًٔا ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِمَا يَفْعَلُوْنَ ○

৩৬। আর তাদের অধিকাংশ লোক শুধু অলীক কল্পনার পিছনে চলছে; নিশ্চয়ই অলীক কল্পনা বাস্তব ব্যাপারে মোটেই ফলপ্রসূ নয়: নিশ্চয়ই আল্লাহ সবই জানেন, যা কিছু তারা করছে।

মুশরিকরা যে আল্লাহর সাথে গায়রুল্লাহকে মিলিয়ে দিয়েছে এবং প্রতিমা পূজায় লিপ্ত হয়ে পড়েছে, এটা যে বাতিল পন্থা, এ কথাই এখানে আল্লাহ পাক বলেছেন। তিনি স্বীয় নবী (সঃ)-কে সম্বোধন করে বলছেন– হে নবী! তুমি এই মুশরিকদেরকে জিজ্ঞেস করঃ "হে মুশরিকদের দল! আচ্ছা বলতো, তোমাদের নিরূপিত শরীকদের মধ্যে এমন কি কেউ আছে, যে আসমান ও যমীনকে সৃষ্টি করেছে? অতঃপর এতে যে মাখলূকাত রয়েছে ওগুলোকে অস্তিত্বে এনেছে? আকাশে যা কিছু রয়েছে ওগুলোকে অস্তিত্বে এনেছে? আকাশে যা কিছু রয়েছে ওগুলোকে তারা স্ব স্ব স্থান থেকে সরাতে পারবে কি? বা ওগুলোর কোন পরিবর্তনে সক্ষম হবে কি? অথবা ওগুলোকে ধ্বংস করে দিয়ে পুনরায় নতুন মাখলূক সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখে কি? হে নবী (সঃ)! তুমি তাদেরকে বল যে, তারা এরূপ কাউকেও পেশ করতে পারবে না। এটা তো একমাত্র আল্লাহরই কাজ। এটা জানা সত্ত্বেও কেন তোমরা সঠিক পথ ছেড়ে ভুল পথের দিকে ঝুঁকে পড়ছো? সত্য পথের সন্ধান দেয় এমন কেউ আছে কি? এরূপ পথ প্রদর্শন তো করতে পারেন একমাত্র আল্লাহ। এটা তোমরা নিজেরাও জান যে, তোমাদের শরীকরা একজনকেও ভ্রান্ত পথ হতে সঠিক পথে আনতে পারে না। একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই পথভ্রষ্টকে সুপথ প্রদর্শন করতে সক্ষম। তিনি ভ্রান্ত পথ হতে সঠিক পথের দিকে মানুষের মনকে ফিরিয়ে দিতে পারেন। সত্য পথের পথিকের যে অনুসরণ করে এবং যার অন্তর্দৃষ্টি রয়েছে সেই ভাল, না ঐ ব্যক্তি ভাল, যে একটু হিদায়াতও করতে পারে না, বরং নিজের অন্ধত্বের কারণে এরই মুখাপেক্ষী যে, কেউ যেন তারই হাত ধরে নিয়ে চলে? ইবরাহীম (আঃ) স্বীয় পিতাকে সম্বোধন করে বলেছিলেনঃ "হে পিতঃ! আপনি অন্ধ ও বধির মা'বূদের উপাসনা করছেন কেন, যে আপনার কোনই উপকারে আসে না?" স্বীয় কওমকেও তিনি লক্ষ্য করে বলেছিলেনঃ "তোমরা তোমাদের নিজেদেরই নির্মিত বস্তুর ইবাদত করছো! অথচ তোমাদেরকে ও তোমাদের মা'বুদদেরকে আল্লাহ তা'আলাই সৃষ্টি করেছেন! তোমাদের সিদ্ধান্ত কতই না ভুল সিদ্ধান্ত! তোমাদের জ্ঞান লোপ পেয়ে গেছে। তোমরা কি করে আল্লাহকে ও তাঁর মাখলূককে সমান করে দিলে? একেও মানছো, তাঁকেও মানছো! অতঃপর আল্লাহ থেকে সরে গিয়ে তোমাদের শরীকদের দিকে তোমরা ঝুঁকে পড়ছো? মহামর্যাদাপূর্ণ প্রতিপালক আল্লাহকেই কেন তোমরা ইবাদতের জন্যে বিশিষ্ট করে নিচ্ছ না? একমাত্র তাঁরই ইবাদত করলেই তো তোমরা বিভ্রান্ত পথ থেকে ফিরে আসতে পারতে! আর বিশেষ করে

আল্লাহর কাছেই কেন প্রার্থনা করছো না?” এ লোকগুলো কোন দলীলকেই কাজে লাগাচ্ছে না। বিশ্বাস ছাড়াই শুধু কল্পনার উপরেই তারা প্রতিমা পূজার ভিত্তি স্থাপন করেছে। কিন্তু এতে তাদের কোনই লাভ হবে না। আল্লাহ তা‘আলা তাদের সমস্ত কাজ সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল। এটা এই কাফিরদের জন্যে হুমকি ও কঠিন ভয় প্রদর্শন। কেননা, তিনি সংবাদ দিচ্ছেন যে, সত্বরই তারা তাদের এই বোকামির শাস্তি পাবে।

٣٧- وَمَا كَانَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ اَنْ
يُّفْتَرٰى مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ
تَصْدِيْقَ الَّذِىْ بَيْنَ يَدَيْهِ
وَتَفْصِيْلَ الْكِتٰبِ لَا رَيْبَ فِيْهِ
مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○ قف

৩৭। আর এই কুরআন কল্পনাপ্রসূত নয় যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো দ্বারা প্রকাশিত হয়েছে, এটা তো সেই কিতাবের সত্যতা প্রমাণকারী যা এর পূর্বে (নাযিল) হয়েছে, এবং আবশ্যকীয় বিধানসমূহের তফসীল বর্ণনাকারী, (এবং) এতে কোন সন্দেহ নেই, (এটা) বিশ্বপ্রতিপালকের পক্ষ হতে (নাযিল) হয়েছে।

٣٨- اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ قُلْ
فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّثْلِهٖ وَادْعُوْا
مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ
اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○

৩৮। তারা কি এরূপ বলে যে, এটা তার (নবীর) স্বরচিত? তুমি বলে দাও–তবে তোমরা এর অনুরূপ একটি সূরাই আনয়ন কর এবং গায়রুল্লাহ হতে যাকে নিতে পার ডেকে নাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

٣٩- بَلْ كَذَّبُوْا بِمَا لَمْ يُحِيْطُوْا
بِعِلْمِهٖ وَلَمَّا يَاْتِهِمْ تَاْوِيْلُهٗ

৩৯। বরং তারা এমন বিষয়কে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে, যাকে নিজ জ্ঞানের পরিধিতে আনয়ন করেনি, আর এখনো তাদের

كَذٰلِكَ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظّٰلِمِيْنَ ۝

প্রতি ওর পরিণাম (আযাব) পৌঁছেনি; এরূপভাবে তারাও মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিল, যারা তাদের পূর্বে গত হয়েছে; অতএব, দেখো সেই অত্যাচারীদের পরিণাম কি হলো?

٤٠- وَمِنْهُمْ مَّنْ يُّؤْمِنُ بِهٖ وَمِنْهُمْ مَّنْ لَّا يُؤْمِنُ بِهٖ ۚ وَرَبُّكَ اَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِيْنَ ۝

৪০। আর তাদের মধ্যে এমন কতক লোক আছে, যারা এর প্রতি ঈমান আনবে এবং এমন কতক লোকও আছে যে, তারা এর প্রতি ঈমান আনবে না, আর তোমার প্রতিপালক অত্যাচারীদেরকে ভালরূপে জানেন।

এখানে কুরআন কারীমের অলৌকিকতার উপর আলোকপাত করা হয়েছে যে, এই কুরআনের মত কিতাব পেশ করে এমন যোগ্যতা কোন মানুষেরই নেই। শুধু তাই নয়, বরং এর উপরও সক্ষম নয় যে, এর সূরার ন্যায় একটি সূরা আনয়ন করে। এটা পবিত্র কুরআনের ভাষার অলংকার ও বাকপটুতার দাবীর ভিত্তিতে বলা হয়েছে। কুরআন কারীমের ভাষা সংক্ষিপ্ত, অথচ ভাবার্থ খুবই ব্যাপক এবং শ্রুতিমধুর। এটা দুনিয়া ও আখিরাতের জন্যে বড়ই উপকারী। অন্য কোন পুস্তক এসব গুণের অধিকারী হতে পারে না। কেননা, এটা হচ্ছে মহান আল্লাহর পক্ষ হতে আগত গ্রন্থ। ঐ আল্লাহ্র যিনি স্বীয় সত্তা, গুণাবলী এবং কাজে ও কথায় সম্পূর্ণ একক, মাখলূকের কালাম তাঁর কালামের সাথে কিরূপে সাদৃশ্যযুক্ত হতে পারে? এ জন্যেই আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ এই কুরআন কল্পনাপ্রসূত নয় যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও দ্বারা প্রকাশিত হয়েছে। এর সাথে মানুষের কথার একটুও মিল থাকতে পারে না। আবার এই কুরআন ঐ কথাই বলে যে কথা এর পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবগুলো বলেছে। তবে পূর্ববর্তী এই ইলহামী কিতাবগুলোর মধ্যে যে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন ঘটেছে তা লোপ করে দেয়া হয়েছে এবং হালাল ও হারামের বিধানগুলো পূর্ণভাবে কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহর পক্ষ হতে এটা অবতারিত হওয়ার ব্যাপারে

সন্দেহের কোন অবকাশ থাকতে পারে না। এতে অতীত যুগের সংবাদও রয়েছে এবং আগামী যুগের ভবিষ্যদ্বাণীও এতে বিদ্যমান। অতীত ও ভবিষ্যৎ সব কথার উপরই এতে আলোকপাত করা হয়েছে এবং লোকদেরকে ঐ পথে চালিত করা হয়েছে যা সম্পূর্ণ সঠিক ও আল্লাহ তা'আলার নিকট পছন্দনীয়।

আল্লাহ পাক বলেনঃ এই কিতাব আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে অবতারিত হওয়ার ব্যাপারে যদি তোমাদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ হয় এবং তোমাদের মনে যদি এ ধারণা জন্মে তাকে যে, মুহাম্মাদ (সঃ) এটা নিজেই রচনা করেছেন, তবে তিনিও তো তোমাদের মতই মানুষ। তিনি যদি এরূপ কুরআন রচনা করতে পারেন তবে তোমাদের মধ্যকার কোন সুযোগ্য ব্যক্তি এরূপ কিতাব রচনা করতে পারে না কেন? অতএব, তোমরা তোমাদের দাবীর সত্যতা প্রমাণ করার জন্যে এই কুরআনের সূরার মত একটি সূরাই আনয়ন কর; যার ভাষা হবে অলংকারপূর্ণ, সংক্ষিপ্ত এবং ব্যাপক অর্থবোধক। মুহাম্মাদ (সঃ) তো একা। এখন তোমরা দুনিয়ার সমস্ত মানব ও দানব একত্রিত হয়ে চেষ্টা করে দেখো তো। এভাবে মহান আল্লাহ তাদেরকে চ্যালেঞ্জ করলেন যে, যদি তারা তাদের এই দাবীতে সত্যবাদী হয় যে, এটা মুহাম্মাদ (সঃ)-এর রচিত, তাহলে তারা এই চ্যালেঞ্জ কবূল করুক। শুধু তারা নয়, বরং হাজার হাজার ও কোটি কোটি লোক মিলিত হয়েই করুক। এর পরেও আল্লাহ্ তা'আলা বিরাট দাবী করে বললেনঃ জেনে রেখো যে, তোমরা কখনই এ কাজ করতে সক্ষম হবে না।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ "(হে নবী সঃ)! তুমি বলে দাও– যদি মানব ও দানব এজন্যে একত্রিত হয় যে, তারা এই কুরআনের মত কিতাব আনয়ন করবে, তবে তারা এর মত কিতাব আনতে পারবে না, যদি তারা একে অপরের সাহায্যকারী হয়ে যায়।" এর পরেও তিনি আরো নীচে নামিয়ে দিয়ে বলেন যে, সম্পূর্ণ কুরআন নয় বরং এর মত দশটি সূরাই আনয়ন করুক। যেমন মহান আল্লাহ সূরা হূদে বলেনঃ " তবে কি তারা এইরূপ বলে যে, সে (নবী সঃ) নিজেই এটা রচনা করেছে? তুমি বলে দাও– তাহলে তোমরাও তার অনুরূপ রচিত করা দশটি সূরা আনয়ন কর এবং (নিজেদের সাহায্যার্থে) যেই গায়রুল্লাহকে ডাকতে পার ডেকে আন, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।" আর এই সূরায় আরো নীচে নামিয়ে দিয়ে বলেনঃ "যদি মুহাম্মাদ (সঃ) এটা নিজেই রচনা করে থাকে তবে বেশী নয়, বরং অনুরূপ একটি সূরাই আনয়ন কর।" মদীনায় অবতারিত সূরায়ে বাকারায়ও একটি সূরা আনয়নের চ্যালেঞ্জ দেয়া হয়েছে এবং

খবর দেয়া হয়েছে যে, তারা কখনো তা আনতে সক্ষম হবে না। সেখানে বলা হয়েছে– "অনন্তর যদি তোমরা তা করতে না পার এবং তোমরা তা করতে পারবে না; তবে আত্মরক্ষা করো জাহান্নাম হতে, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর, (ওটা) প্রস্তুত রাখা হয়েছে কাফিরদের জন্যে।" অথচ বাক্যালংকার ও বাকপটুতা ছিল আরবদের প্রকৃতিগত গুণ। তাদের যেসব কবিতা কা'বা ঘরের দরযায় লটকিয়ে দেয়া হতো তা তাদের পূর্ণ বাক্যালংকার ও বাকপটুতারই পরিচায়ক। কিন্তু মহান আল্লাহ যে কুরআন পেশ করলেন, কোন বাক্যালংকার ও বাকপটুতা ওর কাছেই যেতে পারলো না। কুরআন কারীমের বাক্যালংকার, শ্রুতিমধুরতা, সংক্ষেপণ, গভীরতা ও পূর্ণতা দেখে যারা ঈমান আনবার তারা ঈমান আনলো। কেননা আরবে সে সময় এমন বাগ্মী ব্যক্তিও বিদ্যমান ছিলেন যাঁরা কুরআন কারীমের ভাষার অলংকার, সংক্ষেপণ ও ভাবের গভীরতা উপলব্ধি করে ওর সামনে নিজেদের মস্তক অবনত করেছিলেন। তাঁরা নিঃসংকোচে স্বীকার করে নিয়েছিলেন যে, এটা আল্লাহ ছাড়া আর কারো কালাম হতে পারে না। যেমন মূসা (আঃ)-এর যুগের যাদুকররা, যারা ছিল সেই যুগের সেরা যাদুকর, তারা মূসা (আঃ)-এর ক্রিয়াকলাপ দেখে সমস্বরে বলে উঠেছিল যে, মূসা (আঃ)-এর লাঠির সাথে যাদুর কোনই সম্পর্ক নেই। এটা একমাত্র আল্লাহর পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমেই সম্ভব। সুতরাং মূসা (আঃ) যে আল্লাহর নবী তাতে কোন সন্দেহ নেই। যে ব্যক্তি যে বিষয়ে পারদর্শী সেই ঐ বিষয়ের পরিপূর্ণতা উপলব্ধি করতে পারে। অনুরূপভাবে ঈসা (আঃ) এমন যুগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন যে যুগে চিকিৎসা বিদ্যা উন্নতির উচ্চতম শিখরে আরোহণ করেছিল। ঐ যুগের অভিজ্ঞ চিকিৎসকরা রোগীদের চিকিৎসায় পূর্ণ পারদর্শিতা প্রদর্শন করছিল। এইরূপ সময়ে ঈসা (আঃ)-এর জন্মান্ধ ও শ্বেতকুষ্ঠ রোগীকে ভাল করে দেয়া, এমন কি আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশক্রমে মৃতকেও জীবিত করে তোলা এমনই এক চিকিৎসা ছিল, যার সামনে অন্যান্য চিকিৎসা ও ওষুধ ছিল মূল্যহীন। সুতরাং বুদ্ধিমানরা বুঝে নিলেন যে, মুহাম্মাদ (সঃ) আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। তাই রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ "প্রত্যেক নবীকেই কোন না কোন মু'জিযা দেয়া হয়েছিল যা দেখে মানুষ ঈমান আনতো। আর আমাকে যা দেয়া হয়েছে তা হচ্ছে অহী (কুরআন), যে অহী আল্লাহ আমার নিকট পাঠিয়েছেন। সুতরাং আমি আশা করি যে, এর মাধ্যমে আমার অনুসারী তাঁদের অপেক্ষা বেশী হবে।"

আল্লাহপাকের উক্তিঃ بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ অর্থাৎ বরং তাদের মধ্যে কতকগুলো লোক, যারা কুরআন কারীম সম্পর্কে কোন জ্ঞানই

রাখে না, ওকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে শুরু করে দেয়। কিন্তু তারা কোন দলীল আনতে পারেনি। এটা হচ্ছে তাঁদের মূর্খতা ও বোকামির কারণ। পূর্ববর্তী নবীদের উম্মতেরাও এইরূপভাবে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল। অতএব হে নবী (সঃ)! তুমি দেখো, সেই অত্যাচারীদের পরিণাম কি হলো! তারা শুধুমাত্র বিরুদ্ধাচরণের মনোভাব নিয়ে এবং একগুঁয়েমীর বশবর্তী হয়েই মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল। সুতরাং হে অস্বীকারকারী কুরায়েশরা! তোমরা এখন তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের পরিণাম চিন্তা করে শিক্ষা গ্রহণ কর। সেই যুগেও কিছু লোক ঈমান আনয়ন করেছিল এবং কুরআন কারীম দ্বারা উপকৃত হয়েছিল। পক্ষান্তরে, কতক লোক ঈমান আনেনি এবং তারা কুফরীর মৃত্যুবরণ করেছিল। আল্লাহ তা'আলার উক্তিঃ وَرَبُّكَ اَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِيْنَ অর্থাৎ হে নবী (সঃ)! কে হিদায়াত লাভের যোগ্য এবং কে পথভ্রষ্ট হওয়ার যোগ্য তা তোমার প্রতিপালক ভালরূপেই অবগত আছেন। সুতরাং যে হিদায়াত লাভের যোগ্য তাকে তিনি হিদায়াত দান করবেন, আর যে পথভ্রষ্ট হওয়ার যোগ্য তাকে তিনি পথভ্রষ্ট করবেন। এই কাজে তিনি অতি ন্যায়পরায়ণ। তিনি মোটেই অত্যাচারী নন।

৪১। আর (এতদসত্ত্বেও) যদি তারা তোমাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করতে থাকে, তবে তুমি বলে দাও—আমার কর্মফল আমি পাবো আর তোমাদের কর্মফল তোমরা পাবে, তোমরা তো আমার কৃতকর্মের জন্যে দায়ী নও, আর আমিও তোমাদের কর্মের জন্যে দায়ী নই।

٤١- وَاِنْ كَذَّبُوْكَ فَقُلْ لِّيْ عَمَلِيْ وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ اَنْتُمْ بَرِيْـُٔوْنَ مِمَّاۤ اَعْمَلُ وَاَنَا بَرِيْۤءٌ مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ ○

৪২। আর তাদের কতক এমন (ও) আছে, যারা তোমার (কথার) প্রতি কান পেতে রাখে; তবে কি তুমি বধিরদেরকে শুনাচ্ছ, যদিও তাদের বোধশক্তি না থাকে?

٤٢- وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّسْتَمِعُوْنَ اِلَيْكَ اَفَاَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوْا لَا يَعْقِلُوْنَ ○

৪৩। আর তাদের কতক এমন (ও) আছে, যারা তোমাকে দেখছে; তবে কি তুমি অন্ধকে পথ দেখাতে চাচ্ছ, যদিও তাদের অন্তর্দৃষ্টি না থাকে?	٤٣- وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ ○
৪৪। এটা স্থির নিশ্চিত যে, আল্লাহ মানুষের প্রতি কোন যুলুম করেন না, পরন্তু মানুষ নিজেরাই নিজেদেরকে ধ্বংস করছে।	٤٤- إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَٰكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ○

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নবী (সঃ)-কে বলেছেন–যদি এই মুশরিকরা তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, তবে তুমিও তাদের প্রতি ও তাদের কার্যকলাপের প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ কর এবং স্পষ্টভাবে বলে দাও– আমার আমল আমার জন্যে এবং তোমাদের আমল তোমাদের জন্যে। আমি তোমাদের মা'বূদগুলোকে কখনই স্বীকার করবো না।

ইবরাহীম খলীল (আঃ) ও তাঁর অনুসারীরা তাঁদের মুশরিক কওমকে বলেছিলেনঃ "আমরা তোমাদের হতে এবং তোমাদের মা'বূদগণ হতে সম্পূর্ণ মুক্ত।" মহান আল্লাহ স্বীয় রাসূল (আঃ)-কে আরো বলেন–কুরায়েশদের মধ্যেই কতক লোক এমনও রয়েছে যে, তারা তোমার উত্তম কথা ও পবিত্র কুরআন শুনে থাকে এবং তা তাদের হৃদয়গ্রাহী হয়। এটাই ছিল তাদের জন্যে যথেষ্ট। কিন্তু এর পরেও তারা সঠিক পথে আসে না। এতে তোমার কোনই ত্রুটি নেই। কেননা, তুমি বধিরদেরকে শুনাতে সক্ষম নও এবং তাদেরকে হিদায়াত করারও শক্তি তোমার নেই, যে পর্যন্ত না আল্লাহ তাদেরকে হিদায়াত করার ইচ্ছা করেন। আবার তাদের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে যারা গভীর দৃষ্টিতে তোমার দিকে তাকাতে থাকে। তোমার নির্মল নিষ্কলুষ চরিত্র, সুন্দর অবয়ব এবং নবুওয়াতের প্রমাণাদি (যার মাধ্যমে চক্ষুষ্মান লোকেরা উপকৃত হতে পারে) স্বচক্ষে অবলোকন করে। কিন্তু এরপরেও কুরআনের হিদায়াত দ্বারা মোটেই উপকৃত হয় না, যেমন বিদ্বান ও অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিরা উপকার লাভ করে থাকে। এরূপ মুমিন লোকেরা যখন তোমার দিকে তাকায় তখন তারা অত্যন্ত সম্মানের দৃষ্টিতে তাকায়।

পক্ষান্তরে যখন কাফিররা তোমার দিকে তাকায় তখন তারা ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। তারা তোমাকে দেখে উপহাস করে।

আল্লাহ তা'আলা কারো উপর বিন্দুমাত্র অত্যাচার করেন না। কেউ শুনে এবং হিদায়াতপ্রাপ্ত হয়। আবার অন্য কেউ শুনে, দেখে, অথচ অন্ধ ও বধির হয়ে যায়। সে চোখ থাকতেও অন্ধ এবং কান থাকতেও বধির। তার অন্তঃকরণ রয়েছে, কিন্তু তা মৃত। কেউ লাভবান হলো, আবার কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হলো। মহান আল্লাহর পবিত্র সত্তা সম্পূর্ণ স্বাধীন। তিনি সবারই কাছে পুংখানুপুংখরূপে হিসাব গ্রহণ করবেন, কিন্তু তাঁর কাছে কেউ কোন হিসাব চাইতে পারে না। আল্লাহ তো বান্দার উপর যুলুম করেন না। কিন্তু বান্দা নিজেই নিজের উপর যুলুম করে থাকে। হাদীসে কুদসীতে রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "হে আমার বান্দারা! আমি নিজের উপর যুলুম করাকে হারাম করেছি এবং তোমাদের উপরও এটা হারাম করে দিলাম। সুতরাং তোমরা একে অপরের উপর যুলুম করবে না। তোমাদের কার্যাবলী আমি দেখে যাচ্ছি। আমি তোমাদের প্রতিটি কাজের পূর্ণ প্রতিদান প্রদান করবো। যে ভাল প্রতিদান প্রাপ্ত হবে সে যেন আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। আর যে ব্যক্তি শাস্তি প্রাপ্ত হবে সে যেন নিজেকেই ভর্ৎসনা করে।"

৪৫। আর (ঐ দিনটি তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দাও) যে দিন তিনি (আল্লাহ) তাদেরকে এইরূপ অবস্থায় একত্রিত করবেন, যেন তারা পূর্ণ দিবসের মুহূর্তকাল মাত্র অবস্থান করেছিল, এবং তারা পরস্পর একে অপরকে চিনবে; বাস্তবিকই ক্ষতিগ্রস্ত হলো ঐসব লোক যারা আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হওয়াকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে এবং তারা হিদায়াত প্রাপ্ত ছিল না।	٤٥- وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَاَنْ لَّمْ يَلْبَثُوْا اِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُوْنَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِلِقَاءِ اللّٰهِ وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ ○

আল্লাহ তা'আলা মানুষকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে, যেই দিন কিয়ামত সংঘটিত হবে এবং লোকেরা নিজ নিজ কবর থেকে উঠে হাশরের মাঠে একত্রিত হবে, সেটা হবে খুবই ভয়াবহ দিন। সেই দিন মানুষ মনে করবে যে, দুনিয়ায়

তারা একটি দিনের কিছু অংশ মাত্র অবস্থান করেছিল। যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ "যেই দিন তারা ওটা দেখতে পাবে, তখন এইরূপ মনে করবে যে, তারা শুধুমাত্র একদিনের শেষাংশ অথবা প্রথমাংশে অবস্থান করেছিল।" অন্য এক জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "যেই দিন শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে, সেই দিন পাপীরা দলে দলে উদ্বিগ্ন অবস্থায় হাশরের মাঠের দিকে বের হয়ে আসবে। তারা পরস্পরের মধ্যে চুপেচুপে বলাবলি করবে-আমরা দুনিয়ায় দশ দিনের বেশী অবস্থান করিনি। তাদের তীক্ষ্ণ স্মরণশক্তি সম্পন্ন লোক বলবে- তোমরা এক দিনের বেশী অবস্থান করনি।" আর এক জায়গায় মহান আল্লাহ বলেনঃ "যেই দিন কিয়ামত সংঘটিত হবে, সেই দিন পাপীরা শপথ করে করে বলবে যে, তারা এক ঘন্টা ছাড়া (দুনিয়ায়) অবস্থান করেনি।" এতে একথাই প্রমাণ করে যে, আখিরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবন কতই না ঘৃণ্য ও তুচ্ছ! আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ "জিজ্ঞেস করা হবে-আচ্ছা বলতো, তোমরা দুনিয়ায় কত বছর অবস্থান করেছিলে? তারা উত্তরে বলবে- এক দিন বা একদিনের কিছু অংশ। তখন স্মরণশক্তি সম্পন্ন লোকদেরকে জিজ্ঞেস করা হলে তারা বলবে-তোমরা যদি জানতে যে, তোমরা কতই না অল্প সময় অবস্থান করেছিলে!"

আল্লাহ পাকের উক্তিঃ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ অর্থাৎ তারা পরস্পর একে অপরকে চিনবে। পিতামাতা ছেলেকে চিনবে এবং ছেলে পিতামাতাকে চিনবে। আত্মীয়-স্বজন নিজ নিজ আত্মীয়-স্বজনকে চিনতে পারবে। কিন্তু প্রত্যেকেই নিজ নিজ বিপদ আপদ বা নিজ নিজ সুখ শান্তির মধ্যে নিমগ্ন থাকবে। কোন প্রিয়জন নিজ প্রিয়জনকে কিছুই জিজ্ঞেস করবে না।

আল্লাহ তা'আলার قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ -এই উক্তিটি তাঁর وَيْلٌ لِلْمُكَذِّبِينَ (অবিশ্বাসীদের বড় সর্বনাশ হবে) এই উক্তির মতই। কেননা তারা নিজেদেরকে এবং নিজেদের পরিবারবর্গকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছে। এর চেয়ে বড় সর্বনাশ ও ক্ষতি আর কি হতে পারে যে, তারা কিয়ামতের দিন নিজেদের সঙ্গী সাথীদের সামনে লজ্জিত ও অপমানিত হবে এবং তাদের থেকে পৃথক থাকবে?

৪৬। আর আমি তাদের সাথে যে শাস্তির অঙ্গীকার করছি, যদি ওর সামান্য অংশও তোমাকে দেখিয়ে দেই, অথবা তোমাকে	٤٦- وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا

مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللّٰهُ شَهِيْدٌ عَلٰى مَا يَفْعَلُوْنَ ○

মৃত্যু দান করি, সর্বাবস্থায় তাদেরকে আমারই পানে আসতে হবে, আর আল্লাহ তাদের সকল কৃতকর্মেরই খবর রাখেন।

٤٧- وَلِكُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلٌ فَاِذَا جَآءَ رَسُوْلُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ○

৪৭। প্রত্যেক উম্মতের জন্যে এক একজন রাসূল রয়েছে, সুতরাং তাদের সেই রাসূল যখন এসে পড়ে, (তখন) তাদের মীমাংসা করা হয় ন্যায়ভাবে, আর তাদের প্রতি কোন অবিচার করা হয় না।

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল (সঃ)-কে সম্বোধন করে বলছেন—হে রাসূল (সঃ)! তোমার মনে শান্তি আনয়নের জন্যে যদি তোমার জীবদ্দশাতেই তাদের (কাফিরদের) উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করি, অথবা তোমার মৃত্যু ঘটিয়ে দেই, তবে জেনে রেখো যে, সর্বাবস্থাতেই তাদের প্রত্যাবর্তন আমারই কাছে হবে। যদি তুমি দুনিয়ায় বেঁচে না-ও থাকো, তবুও তোমার পরে তাদের কার্যকলাপের সাক্ষী আমি নিজেই হয়ে যাবো।

হুযাইফা ইবনে উসায়েদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ "গতরাত্রে আমার সামনে আমার প্রথম ও শেষের উম্মতকে পেশ করা হয়েছিল।" একটি লোক তখন জিজ্ঞেস করলেনঃ "আপনার প্রথম উম্মতকে আপনার সামনে পেশ করা হয়েছিল এটা তো বুঝলাম। কিন্তু শেষের উম্মতকে কিরূপে পেশ করা হলো?" উত্তরে তিনি বলেনঃ "তাদেরকে 'খাকী' (মেটো) আকারে আমার সামনে পেশ করা হয়। তোমাদের কোন লোক যেমন তার সঙ্গীকে চিনতে পারে, এর চেয়ে বেশী আমি তাদেরকে চিনতে পারবো।"[১]

আল্লাহ তা'আলার উক্তিঃ وَلِكُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلٌ فَاِذَا جَآءَ رَسُوْلُهُمْ অর্থাৎ প্রত্যেক উম্মতের জন্যে এক একজন রাসূল রয়েছে, যখন তাদের কাছে তাদের রাসূল এসে যায় তখন ন্যায়ভাবে তাদের মীমাংসা করা হয়। মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, এর দ্বারা কিয়ামতের দিনকে বুঝানো হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "যমীন আল্লাহর নূরের ঔজ্জ্বল্যে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।" প্রত্যেক উম্মতকে তাদের

---

১. এই হাদীসটি ইমাম তিবরানী (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

নবীর বিদ্যমান অবস্থায় আল্লাহ তা'আলার সামনে পেশ করা হয়। তাদের সাথে থাকে তাদের ভাল বা মন্দ কাজের আমলনামা। এটা তাদের সাক্ষীরূপে কাজ করে। ফিরিশ্তাগণও সাক্ষী হন যাঁদেরকে তাদের উপর রক্ষক নিযুক্ত করা হয়েছিল। একের পর এক প্রত্যেক উম্মতকে পেশ করা হবে। এই উম্মত আখেরী উম্মত হলেও কিয়ামতের দিন এরাই প্রথম উম্মত হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম এদের ফায়সালাই করবেন। যেমন সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "যদিও আমরা সকলের শেষে এসেছি, কিন্তু কিয়ামতের দিন আমরা সর্বপ্রথম হবো। সমস্ত মাখলূকের পূর্বে আমাদেরই হিসাব নেয়া হবে।" এই উম্মত এই মর্যাদা লাভ করেছে একমাত্র তাদের রাসূল (সঃ)-এর বরকতে। সুতরাং কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর উপর দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক!

৪৮। আর তারা বলে- (আমাদের) এই অঙ্গীকার কখন (সংঘটিত) হবে? যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

٤٨- وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَٰدِقِينَ ○

৪৯। তুমি বলে দাও- আমি তো আমার নিজের জন্যে কোন উপকার বা ক্ষতির অধিকারী নই, কিন্তু যতটুকু আল্লাহ চান, প্রত্যেক উম্মতের (আযাবের) জন্যে একটি নির্দিষ্ট সময় আছে; যখন তাদের সেই নির্দিষ্ট সময় এসে পৌঁছে, তখন তারা মুহূর্তকাল না পশ্চাদপদ হতে পারবে, আর না অগ্রসর হতে পারবে।

٤٩- قُلْ لَّآ أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُونَ ○

৫০। তুমি বলে দাও- বলতো, যদি তোমাদের উপর আল্লাহর আযাব রাত্রিকালে অথবা দিবাভাগে এসে পড়ে, তবে

٥٠- قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَتٰىكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مَّاذَا

يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُوْنَ ○

আযাবের মধ্যে এমন কোন জিনিস রয়েছে যে, অপরাধীরা ওকে তাড়াতাড়ি চাচ্ছে?

٥١- أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ اٰمَنْتُمْ بِهٖ اٰلْئٰنَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهٖ تَسْتَعْجِلُوْنَ ○

৫১। তবে কি ওটা যখন এসেই পড়বে, তখন ওটা বিশ্বাস করবে? (বলা হবে) হ্যাঁ, এখন মানলে, অথচ তোমরা ওর জন্যে তাড়াহুড়া করছিলে।

٥٢- ثُمَّ قِيْلَ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ذُوْقُوْا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُوْنَ ○

৫২। অতঃপর যালিমদেরকে বলা হবে-চিরস্থায়ী শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করতে থাকো, তোমরা তো তোমাদেরই কৃতকর্মের ফল পাচ্ছ।

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন- এই মুশরিকরা শাস্তির জন্যে তাড়াতাড়ি করছে এবং সময় আসার পূর্বেই যাচ্ঞা করছে। এতে তাদের জন্যে কোনই মঙ্গল নেই। কাফিররা তো শাস্তির জন্যে তাড়াতাড়ি করছে, কিন্তু মুমিনরা এর থেকে ভয় করছে। তারা বিশ্বাস রাখছে যে, শাস্তি অবশ্য অবশ্যই আসবে, যদিও এর নির্দিষ্ট সময় জানা নেই। এ জন্যেই মহান আল্লাহ স্বীয় নবী (সঃ)-কে শিখিয়ে দিচ্ছেন- হে নবী (সঃ)! তুমি বলে দাও, আমি নিজের জীবনেরও লাভ ও ক্ষতির মালিক নই। আমি শুধু ঐটুকু বলি যেটুকু আমাকে বলে দেয়া হয়েছে। যদি আমি কিছু পাওয়ার ইচ্ছে করি, তবে আমি ওর উপর সক্ষম নই, যে পর্যন্ত না আল্লাহ আমাকে তা প্রদান করেন। আমি তো শুধু তাঁর একজন বান্দা এবং তোমাদের কাছে প্রেরিত একজন দূত। আমি তোমাদেরকে সংবাদ প্রদান করেছি যে, কিয়ামত অবশ্যই সংঘটিত হবে। কিন্তু এর সময় আমার জানা নেই। কারণ এটা আমাকে বলে দেয়া হয়নি। প্রত্যেক কওমের জন্য (শাস্তির) একটা নির্ধারিত সময় রয়েছে। যখন ঐ সময় এসে যাবে তখন আর মুহূর্তকালও তারা পিছনে সরতে পারবে না এবং সামনেও অগ্রসর হতে পারবে না। যেমন আল্লাহ পাক বলেনঃ وَلَنْ يُّؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفْسًا إِذَا جَآءَ أَجَلُهَا অর্থাৎ "আল্লাহ কাউকেও কোন অবকাশ দেন না, যখন তাঁর নির্দিষ্ট সময় এসে পড়ে।" (৬৩ঃ ১১) কাফিরদের

উপর আল্লাহর শাস্তি অকস্মাৎ এসে যাবে। মহান আল্লাহ এ সম্পর্কেই তাদেরকে বলেছেন– যদি রাত্রিকালে বা দিবাভাগে কোন এক সময় আকস্মিকভাবে তোমাদের উপর শাস্তি এসে পড়ে, তখন কি করবে? কাজেই তাড়াতাড়ি করছো কেন? যদি শাস্তি এসেই পড়ে, তবে কি তখন ঈমান আনবে? তখন আর ঈমান আনয়নের সময় কোথায়? ঐ সময় তাদেরকে বলা হবে– যে শাস্তির জন্যে তোমরা তাড়াতাড়ি করছিলে, এখন এই শাস্তির স্বাদ গ্রহণ কর। ঐ সময় তারা বলবেঃ "হে আল্লাহ! আমরা দেখলাম ও শুনলাম।" শাস্তি এসে পড়লেই তারা বলে উঠবেঃ "এখন আমরা এক আল্লাহকে মানছি এবং অন্যান্য সমস্ত মা'বূদ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছি।" কিন্তু ঐ সময়ের ঈমান কোনই কাজে আসবে না। বান্দাদের ব্যাপারে আল্লাহর নীতি তো এরূপই চলে আসছে।

এ যালিমদেরকে বলা হবে– "এখন তোমরা চিরস্থায়ী শাস্তির স্বাদ গ্রহণ কর।" এইভাবে তাদেরকে খুব ধমক দিয়ে এ কথা বলা হবে। জাহান্নামের যে শাস্তির কথা তারা অস্বীকার করতো ঐ শাস্তির মধ্যে তাদেরকে ধাক্কা দিয়ে দিয়ে ফেলে দেয়া হবে। যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ "ঐ দিন তাদেরকে জাহান্নামের আগুনে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়া হবে। (বলা হবেঃ) এটা হচ্ছে ঐ আগুন যা তোমরা মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে। এটাই কি যাদু? না, বরং তোমরা দেখছো না (অনুধাবন করছো না)। তোমরা (এখন) জাহান্নামে প্রবেশ কর। তোমরা ধৈর্যধারণ কর আর নাই কর, এটা সমান কথা, তোমরা তোমাদের কৃতকর্মের প্রতিদান অবশ্যই প্রাপ্ত হবে।"

৫৩। তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করে– ওটা (শাস্তি) কি যথার্থ বিষয়? তুমি বলে দাও–হ্যাঁ, আমার প্রতিপালকের কসম! ওটা নিশ্চিত সত্য; আর তোমরা কিছুতেই আল্লাহকে অপারগ করতে পারবে না।

٥٣- وَيَسْتَنْبِئُونَكَ اَحَقٌّ هُوَ قُلْ اِيْ وَرَبِّيْ اِنَّهٗ لَحَقٌّ وَمَا اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ۝

৫৪। আর যদি প্রত্যেক মুশরিকের কাছে এই পরিমাণ (মাল) থাকে যে, তা সমগ্র পৃথিবীর সমপরিমাণ হয়ে যায়, তবে সে

٥٤- وَلَوْ اَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْاَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهٖ

وَاَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَاَوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ○

তা দান করেও নিজের প্রাণ রক্ষা করতে উদ্যত হবে; এবং যখন তারা আযাব দেখতে পাবে, তখন (নিজেদের) মনস্তাপকে গোপন রাখবে, আর তাদের ফায়সালা করা হবে ন্যায়ভাবে এবং তাদের প্রতি অবিচার করা হবে না।

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নবী (সঃ)-কে বলছেনঃ "লোকেরা তোমাকে জিজ্ঞেস করছে যে, দেহ মাটিতে পরিণত হওয়ার পর কিয়ামতের দিন পুনরুত্থান কি সত্য? তুমি তাদেরকে বলে দাও– হ্যাঁ! আল্লাহর কসম! এটা সত্য। তোমাদের মাটি হয়ে যাওয়া এবং এরপর তোমাদেরকে পুনরায় পূর্ব অবস্থায় ফিরিয়ে আনা আমার প্রতিপালকের কাছে খুবই সহজ কাজ। তিনি যখন কোন কাজের ইচ্ছা করেন, তখন শুধু 'হও' বললেই তা হয়ে যায়।" এইরূপ কসমযুক্ত আয়াত কুরআন কারীমের মধ্যে আর মাত্র দুই জায়গায় রয়েছে। এতে আল্লাহ পাক স্বীয় রাসূল (সঃ)-কে হুকুম করেছেন যে, পুনরুত্থান ও পুনর্জীবনকে যারা অস্বীকার করে, তাদের কাছে তিনি যেন কসম দিয়ে বর্ণনা করেন। সূরায়ে সাবায় রয়েছেঃ "কাফির লোকেরা বলে, আমাদের উপর কিয়ামত আসবে না; তুমি বলে দাও– (কেন আসবে না?) হ্যাঁ, আমার প্রতিপালকের কসম! অবশ্যই ওটা তোমাদের উপর আসবে।" সূরায়ে তাগাবুনে রয়েছেঃ "কাফিররা এই দাবী করে যে, তাদেরকে কখনো পুনরুজ্জীবিত করা হবে না; তুমি বলে দাও– (কেন করা হবে না?) হ্যাঁ, আমার প্রতিপালকের শপথ! নিশ্চয়ই তোমাদেরকে পুনরায় জীবিত করা হবে, অনন্তর, তোমরা যা কিছু করেছো, সমস্তই তোমাদেরকে জানিয়ে দেয়া হবে; আর এটা আল্লাহর পক্ষে খুবই সহজ।" এরপর আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, যখন কিয়ামত সংঘটিত হবে তখন কাফিররা কামনা করবে যে, যদি যমীন ভর্তি সোনার বিনিময়ে হলেও তারা আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা পেতো! কিন্তু এটা কখনই হতে পারবে না। আর যখন তারা শাস্তি দেখতে পাবে তখন নিজেদের মনস্তাপকে গোপন রাখবে। তবে তাদের সাথে যে ব্যবহার করা হবে তা ইনসাফের সাথেই করা হবে। তাদের প্রতি মোটেই কোন অবিচার করা হবে না।

৫৫। স্মরণ রেখো যে, সবই আল্লাহর স্বত্ব যা কিছু আসমান সমূহে এবং যমীনে রয়েছে; স্মরণ রেখো যে, আল্লাহর অঙ্গীকার সত্য, কিন্তু অধিকাংশ লোকই অবগত নয়।

٥٥- اَلَآ اِنَّ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَلَآ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝

৫৬। তিনিই জীবন দান করেন এবং তিনিই মৃত্যু ঘটান, আর তোমরা সবাই তাঁরই পানে প্রত্যাবর্তিত হবে।

٥٦- هُوَ يُحْىٖ وَيُمِيْتُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ۝

আল্লাহ্ তা'আলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, তিনিই আকাশসমূহের ও পৃথিবীর মালিক। তাঁর অঙ্গীকার অবশ্য অবশ্যই পূর্ণ হবে। তিনিই জীবন দান করে থাকেন এবং তিনিই মৃত্যু ঘটিয়ে থাকেন। তাঁরই কাছে সকলকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। তিনি এর উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান যে, সমুদ্রে, প্রান্তরে এবং বিশ্বের সর্বত্র তাদের মাটি হয়ে যাওয়া দেহের প্রতিটি অণু পরমাণুকে পুনরায় একত্রিত করবেন এবং জীবিত দেহ তৈরী করবেন।

৫৭। হে মানব জাতি! তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের তরফ হতে এমন এক বস্তু সমাগত হয়েছে যা হচ্ছে নসীহত এবং অন্তরসমূহের সকল রোগের আরোগ্যকারী, আর মুমিনদের জন্যে ওটা পথ প্রদর্শক ও রহমত।

٥٧- يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَتْكُمْ مَّوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَشِفَآءٌ لِّمَا فِى الصُّدُوْرِ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۝

৫৮। তুমি বলে দাও- আল্লাহর এই দান ও রহমতের প্রতি সকলেরই আনন্দিত হওয়া উচিত; তা এটা (পার্থিব সম্পদ) হতে বহুগুণে উত্তম যা তারা সঞ্চয় করছে।

٥٨- قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهٖ فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ ۝

বান্দার উপর স্বীয় ইহসানের বর্ণনা দিতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন– হে লোক সকল! তোমাদেরকে যে পবিত্র গ্রন্থটি (কুরআন কারীম) দেয়া হয়েছে তা হচ্ছে নসীহতের একটি দফতর, যা তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহর পক্ষ হতে অবতীর্ণ হয়েছে। এটা তোমাদের অন্তরের সমস্ত রোগের আরোগ্যদানকারী। অর্থাৎ এটা তোমাদের অন্তরের সন্দেহ, সংশয়, কালিমা ও অপবিত্রতা দূরকারী। এর মাধ্যমে তোমরা মহান আল্লাহর হিদায়াত ও রহমত লাভ করতে পারবে। কিন্তু এটা লাভ করবে একমাত্র তারাই যারা তাঁর প্রতি বিশ্বাস রাখে। কুরআনকে আমি মুমিনদের জন্যে শিফা ও রহমতরূপে অবতীর্ণ করেছি। কিন্তু পাপীদের জন্যে এটা ধ্বংস ও ক্ষতি আনয়নকারী। হে নবী (সঃ)! তুমি জনগণকে বলে দাও– এই কুরআন হচ্ছে আল্লাহর অনুগ্রহ ও অনুকম্পা। সুতরাং এটা নিয়ে তোমরা খুশী হয়ে যাও। আর দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী যেসব ভোগ্য বস্তু তোমরা লাভ করেছো, সেগুলো অপেক্ষা কুরআনই হচ্ছে শ্রেষ্ঠতম ও উৎকৃষ্টতম বস্তু।

উমার (রাঃ)-এর নিকট ইরাকের খেরাজ আসলে তিনি তা দেখার জন্যে বেরিয়ে আসেন। তাঁর সাথে তাঁর খাদেমও ছিল। উমার (রাঃ) খেরাজে আগত উটগুলো গণনা করতে শুরু করেন। কিন্তু শেষে গণনায় অপারগ হয়ে বলে ওঠেনঃ "আমি মহান আল্লাহর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।" এ দেখে তাঁর খাদেমটি বলেঃ "আল্লাহর কসম! এটাও আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমত।" তখন উমার (রাঃ) বলেনঃ "না, এটা নয়। বরং আল্লাহ তা'আলা بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهٖ বলে কুরআন ও ওর দ্বারা উপকার গ্রহণ বুঝিয়েছেন। সুতরাং এই খেরাজের সম্পদগুলোকে আল্লাহর ফযল ও রহমত মনে না করে বরং এটাকে مِمَّا يَجْمَعُوْنَ মনে করাই উচিত। কেননা, এগুলো তো হচ্ছে আমাদের জমাকৃত সম্পদ। 'ফযল' ও 'রহমত' তো অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এর মাহাত্ম্য অত্যন্ত বেশী।"[১]

৫৯। তুমি বল–আচ্ছা বলতো, আল্লাহ তোমাদের জন্যে যা কিছু রিয্ক পাঠিয়েছেন, অতঃপর তোমরা ওর কতক অংশ হারাম এবং কতক অংশ হালাল সাব্যস্ত করে নিলে; তুমি জিজ্ঞেস কর–আল্লাহ কি তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, নাকি তোমরা আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করছো?

٥٩- قُلْ اَرَءَيْتُمْ مَّا اَنْزَلَ اللّٰهُ لَكُمْ مِّنْ رِّزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِّنْهُ حَرَامًا وَّ حَلٰلًا ؕ قُلْ آٰللّٰهُ اَذِنَ لَكُمْ اَمْ عَلَى اللّٰهِ تَفْتَرُوْنَ ۝

১. ইবনে আবি হাতিম (রঃ) এই আয়াতের তাফসীরে এটা বর্ণনা করেছেন।

৬০। আর যারা আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করে, তাদের কিয়ামত দিবস সম্বন্ধে কি ধারণা? বাস্তবিক, মানুষের উপর আল্লাহর খুবই অনুগ্রহ রয়েছে, কিন্তু অধিকাংশ লোকই অকৃতজ্ঞ।

٦٠- وَمَا ظَنُّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُوْنَ ۟

ইবনে আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রঃ), যহ্হাক (রঃ), কাতাদা (রঃ), আবদুর রহমান ইবনে যায়েদ ইবনে আসলাম (রঃ) প্রমুখ মনীষীগণ বলেন যে, মুশরিকরা কতকগুলো জন্তুকে 'বাহায়ের' 'সাওয়ায়েব' এবং 'আসায়েল' নামে নামকরণ করে কোনটাকে নিজেদের উপর হালাল এবং কোনটাকে হারাম করে নিতো, এখানে এটাকেই খণ্ডন করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ "জমি হতে যা উৎপন্ন হয় এবং যেসব পশুর জন্ম হয়, তা থেকে তারা একটা অংশ আল্লাহর জন্যে নির্ধারণ করে।"

আবুল আহওয়াস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি হচ্ছেন আউফ ইবনে মালিক ইবনে নায্লা, তিনি তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট গমন করি। ঐ সময় আকৃতি ও পোশাক পরিচ্ছদের দিক দিয়ে আমার অবস্থা ভাল ছিল না। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করেনঃ "তোমার কি কোন ধন-সম্পদ নেই?" আমি উত্তরে বললামঃ হ্যাঁ আছে। তিনি পুনরায় প্রশ্ন করলেনঃ "কি মাল আছে?" আমি জবাব দিলামঃ সর্বপ্রকারের মাল রয়েছে। যেমন, উট, দাসদাসী, ঘোড়া এবং বকরী। তখন তিনি বলেনঃ "যখন তিনি তোমাকে মালধন দান করেছেন, তখন তিনি তার নিদর্শন তোমার উপর দেখতে চান।" অতঃপর তিনি বললেনঃ "তোমাদের উষ্ট্রীর বাচ্চা হয়। ওর সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ভাল ও নিখুঁত হয়। কিন্তু তোমরাই ক্ষুর উঠিয়ে নিয়ে ওর কান কেটে দিয়ে থাকো। আর এটাকে বলে থাকো 'বাহায়ের'। তোমরা ওর চামড়া চিরে দাও এবং ওকে বলে থাকো 'সরম'। তোমরা এগুলো নিজেদের উপরও হারাম করে নাও এবং পরিবারবর্গের জন্যেও। এটা সত্য নয় কি?" আমি বললামঃ হ্যাঁ, সত্য। এরপর তিনি বললেনঃ "জেনে রেখো যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে যা কিছু দান করেছেন, তা সর্বসময়ের জন্যে হালাল। কখনও তা হারাম হতে পারে না। আল্লাহর হাত তোমাদের হাত অপেক্ষা অনেক বেশী শক্তিশালী। আল্লাহর চাকু তোমাদের চাকু অপেক্ষা বহুগুণে তীক্ষ্ণ।"[১]

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা ঐ লোকদের প্রতি নিজের কঠিন অসন্তুষ্টির কথা প্রকাশ করছেন, যারা তাঁর হালালকে নিজেদের উপর হারাম করে নেয় এবং তাঁর হারামকে নিজেদের জন্যে হালাল বানিয়ে নেয়। আর এটা শুধু নিজেদের ব্যক্তিগত মত ও প্রবৃত্তির উপর ভিত্তি করেই করে থাকে, যার কোন দলীল নেই।

এরপর আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে কিয়ামত দিবসের শাস্তি হতে ভয় প্রদর্শন করছেন। তিনি বলছেন, যারা আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করে, কিয়ামতের দিন আমি তাদের সাথে কিরূপ ব্যবহার করবো এ সম্পর্কে তাদের ধারণা কি? اِنَّ اللّٰهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ অর্থাৎ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ লোকদের উপর বড়ই অনুগ্রহশীল।' ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বলেন যে, এটা ছেড়ে দেয়ার মধ্যে যেন দুনিয়াতেই তাদেরকে শাস্তি দিয়ে চিকিৎসা করা উদ্দেশ্য। আমি বলি– এটাও উদ্দেশ্য হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা লোকদের উপর বড়ই অনুগ্রহশীল। কেননা, তিনি দুনিয়ায় তাদের জন্যে এমন বহু জিনিস হালাল করেছেন, যেগুলো পেয়ে তারা আনন্দিত হয় এবং তাদের জন্যে সেগুলো উপকারী। পক্ষান্তরে তিনি মানুষের জন্যে এমন জিনিস হারাম করেছেন, যেগুলো তাদের জন্যে সরাসরি ক্ষতিকর ছিল। এটা হয় দ্বীনের দিক দিয়েই হোক, না হয় দুনিয়ার দিক দিয়েই হোক। কিন্তু অধিকাংশ লোকই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। অর্থাৎ তারা আল্লাহর দেয়া নিয়ামতগুলো নিজেদের উপর হারাম করে নিচ্ছে এবং নফসের উপর সংকীর্ণতা আনয়ন করছে। এটা এইরূপে যে, নিজেদের পক্ষ থেকে কোন জিনিস হালাল করছে এবং কোন জিনিস হারাম করছে। মুশরিকরা এটাকে নিজেদের মধ্যে বহুল পরিমাণে প্রকাশ করেছে এবং একরূপ পন্থাই বানিয়ে নিয়েছে। যদিও আহ্লে কিতাবের মধ্যে এটা ছিল না, কিন্তু এখন তারাও এই বিদআত চালু করে দিয়েছে। মূসা ইবনে সাবাহ হতে اِنَّ اللّٰهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ -এই উক্তির ব্যাপারে বর্ণিত আছে যে, কিয়ামতের দিন তিন প্রকারের আল্লাহওয়ালা লোককে পেশ করা হবে। আল্লাহ তা'আলা তাদের মধ্যে প্রথম প্রকারের লোককে জিজ্ঞেস করবেনঃ "হে আমার বান্দা! কি উদ্দেশ্যে তুমি ভাল কাজ করেছিলে?" উত্তরে সে বলবেঃ "হে আমার প্রতিপালক! আপনি জান্নাত তৈরী করেছেন এবং তার মধ্যে বাগান, ফলমূল, বৃক্ষলতা, নদ-নদী, হূর ও প্রাসাদ এবং অনুগত বান্দাদের জন্যে সর্বপ্রকারের নিয়ামত সরবরাহ করে রেখেছেন। ঐগুলো লাভ করার আশাতেই আমি রাত্রি জেগে জেগে আপনার ইবাদত করেছি ও সারা দিন রোযা রেখেছি।" তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেনঃ "তুমি যখন

জান্নাত লাভের আশাতেই এসব আমল করেছো, তখন যাও, জান্নাতই তোমার ঠিকানা। কিন্তু এটা তোমার আমলের বিনিময়ে নয়। আমি তোমাকে জাহান্নাম হতে মুক্তি দিলাম। এটা আমার অনুগ্রহ। আর তোমাকে আমি জান্নাতে প্রবিষ্ট করছি আর এটাও আমার অনুগ্রহ।" তখন সে এবং তার সঙ্গীরা জান্নাতে প্রবেশ করবে। তারপর দ্বিতীয় প্রকারের লোককে হাযির করা হবে। তাকে আল্লাহ তা'আলা জিজ্ঞেস করবেনঃ "হে আমার বান্দা! তুমি কেন ভাল কাজ করেছিলে?" উত্তরে সে বলবেঃ "হে আমার প্রতিপালক! আপনি জাহান্নাম তৈরী করেছেন এবং তার মধ্যে রেখেছেন জিঞ্জির, লু-হাওয়া ও গরম পানি। নাফরমান বান্দাদের জন্যে সেখানে সর্বপ্রকারের শাস্তির ব্যবস্থা রেখেছেন। আমি এই জাহান্নাম হতে রক্ষা পাওয়ার আশাতেই রাত্রি জেগে জেগে ইবাদত করেছি এবং সারা দিন রোযা রেখেছি।" তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেনঃ "তুমি যখন জাহান্নামের ভয়ে ভাল কাজ করেছো, তখন আমি তোমাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিলাম। তারপর এটা অতিরিক্ত অনুগ্রহ যে, তোমাকে আমি জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেয়ার পর জান্নাতও দান করলাম।" সুতরাং সে এবং তার সাথীরা জান্নাতে প্রবেশ করবে। অতঃপর তৃতীয় প্রকারের লোককে পেশ করা হবে। তাকেও আল্লাহ্ জিজ্ঞেস করবেনঃ "হে আমার বান্দা! তুমি কেন ভাল কাজ করেছিলে।" সে উত্তরে বলবেঃ "হে আমার প্রতিপালক! আমি শুধু আপনার প্রতি প্রেম ও মহব্বতের কারণে আপনার ইবাদত করেছি। আমি রাত জেগে জেগে ইবাদত করেছি এবং ক্ষুধা ও পিপাসা সহ্য করে সারা দিন রোযা রেখেছি একমাত্র আপনার সাথে সাক্ষাৎ লাভের আশায় এবং আপনার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে।" তখন মহান আল্লাহ তাকে বলবেনঃ "তুমি যখন আমার মহব্বতে ও আমার সাথে সাক্ষাৎ লাভের উদ্দেশ্যে এরূপ করেছো, তখন আমি তোমার সামনে আমার ঔজ্জ্বল্য প্রকাশ করছি। তুমি এখন আমাকে মন ভরে দেখে নাও এবং চক্ষু জুড়িয়ে নাও। তুমি সর্বাপেক্ষা বড় সম্পদ লাভ করলে।" এরপর তিনি তাকে বলবেনঃ "আমি আমার অনুগ্রহের বদৌলতে তোমাকে জাহান্নাম থেকেও মুক্তি দিচ্ছি এবং জান্নাতেও প্রবিষ্ট করছি। আমার ফিরিশ্তামণ্ডলী তোমার পাশে হাযির থাকবে এবং আমি স্বয়ং তোমার উপর আমার শান্তি বর্ষণ করতে থাকবো।" সুতরাং সে ও তার সঙ্গীরা জান্নাতে প্রবেশ করবে।[১]

১. ইবনে আবি হাতিমই (রঃ) এই আয়াতের তাফসীরে এটা বর্ণনা করেছেন।

৬১। আর তুমি যে অবস্থাতেই থাক না কেন, আর সেই অবস্থাগুলোর অন্তর্গত এটাও যে, তুমি (নবী সঃ) যে কোন স্থান হতে কুরআন পাঠ কর এবং তোমরা (অন্যান্য লোক) যে কাজই কর, আমার সব কিছুরই খবর থাকে, যখন তোমরা সেই কাজ করতে শুরু কর; কণা পরিমাণও কোন বস্তু তোমার প্রতিপালকের (জ্ঞানের) অগোচর নয়– না যমীনে, না আসমানে, আর না কোন বস্তু তা হতে ক্ষুদ্রতর, না তা হতে বৃহত্তর, কিন্তু এই সমস্তই কিতাবে মুবীনে (কুরআনে) লিপিবদ্ধ রয়েছে।

٦١- وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَّمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْاٰنٍ وَّلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ اِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا اِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَّبِّكَ مِنْ مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَآ اَصْغَرَ مِنْ ذٰلِكَ وَلَآ اَكْبَرَ اِلَّا فِي كِتٰبٍ مُّبِينٍ ○

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নবী (সঃ)-কে সংবাদ দিচ্ছেন– আল্লাহ তা'আলা তোমার উম্মত এবং সমস্ত মাখলূকের সমুদয় অবস্থা সম্পর্কে সব সময় অবহিত রয়েছেন। যমীন ও আসমানের অণু পরিমাণ জিনিসও, তা যতই নগণ্য হোক না কেন, কিতাবে মুবীন অর্থাৎ ইলমে ইলাহীতে বিদ্যমান রয়েছে। কিছুই তাঁর দৃষ্টির অগোচরে নেই। অদৃশ্যের জ্ঞান একমাত্র তাঁরই রয়েছে। জল ও স্থলের অদৃশ্যের খবর তিনি ছাড়া আর কেউই জানে না। গাছের একটা পাতাও যে ঝরে পড়ে, রাতের অন্ধকারে কোন জায়গায় কোন অণু পরিমাণ জিনিসও যে পড়ে থাকে, যে কোন জিনিস, তা সিক্ত হোক বা শুষ্কই হোক, ভাল হোক বা মন্দই হোক, সব কিছুরই জ্ঞান একমাত্র তাঁরই আছে। বৃক্ষ, জড় পদার্থ এবং প্রাণীসমূহের গতির খবর তিনিই রাখেন। যমীনে যত প্রাণী রয়েছে, শূন্যে যত পাখী উড়ছে, এসবও তোমাদের মত দলে দলে রয়েছে। প্রতিটি প্রাণীর জীবিকার জামিন তিনিই।

এ সমুদয় বস্তুর গতিরও জ্ঞান যখন তাঁর রয়েছে, তখন যে মানুষ মুকাল্লাফ ও ইবাদতের জন্যে আদিষ্ট, তাদের গতি ও আমলের জ্ঞান তাঁর কেন থাকবে না?

যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ "ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণকারী যত প্রাণী রয়েছে এবং যেসব পাখী দু'ডানার সাহায্যে উড়ে বেড়ায়, সবই তোমাদের ন্যায় এক একটি জাতি বা সম্প্রদায়।" অন্যত্র তিনি বলেনঃ

وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِي الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا

অর্থাৎ "ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণকারী এমন কোন প্রাণী নেই যে, তার রিয্ক আল্লাহর যিম্মায় না রয়েছে।" (১১ঃ ৬) তাহলে বুঝা গেল যে, পৃথিবীতে বিচরণকারী সমুদয় প্রাণীরই খবর যখন তিনি রাখেন, তখন তাঁর ইবাদতের জন্যে আদিষ্ট মানুষের খবর যে তিনি রাখবেন, এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই? যেমন তিনি বলেনঃ "তুমি মহা প্রতাপশালী ও দয়ালুর উপর (আল্লাহর উপর) ভরসা রাখো, যিনি তোমাকে তোমার দণ্ডায়মান অবস্থায়ও দেখেন এবং যখন তুমি সিজদা কর তখনও তোমাকে দেখতে পান।" এ জন্যেই মহান আল্লাহ বলেনঃ "যে অবস্থাতে তোমরা থাক, কুরআন পাঠ কর, কিংবা অন্য যে কোন কাজ কর, আমি তোমাদেরকে দেখছি এবং সবকিছুই শুনছি।" এ কারণেই যখন জিবরাঈল (আঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে ইহ্সান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন তখন তিনি বলেনঃ "(ইহ্সানের অর্থ এই যে) এমনভাবে তুমি আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত করবে যেন তুমি তাঁকে দেখছো, এটা না হলে কমপক্ষে এটা হওয়া উচিত যে, তিনি অবশ্যই তোমাকে দেখছেন (এরূপ বিশ্বাস রাখবে)।"

৬২। মনে রেখো যে, আল্লাহর বন্ধুদের না কোন আশংকা আছে, আর না তারা বিষণ্ন হবে।

٦٢- اَلَآ اِنَّ اَوْلِيَآءَ اللّٰهِ لَاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُوْنَ

৬৩। তারা হচ্ছে সেই লোক যারা ঈমান এনেছে এবং (গুনাহ্ হতে) পরহেয্ করে থাকে।

٦٣- الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ

৬৪। তাদের জন্যে সুসংবাদ রয়েছে পার্থিব জীবনে এবং পরকালেও; আল্লাহর বাক্যসমূহে কোন পরিবর্তন হয় না; এটা হচ্ছে বিরাট সফলতা।

٦٤- لَهُمُ الْبُشْرٰى فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ لَا تَبْدِيْلَ لِكَلِمٰتِ اللّٰهِ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ

আল্লাহ্ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, তাঁর বন্ধু হচ্ছে ঐ লোকগুলো যারা ঈমান আনয়নের পর পরহেযগারীও অবলম্বন করে থাকে। সুতরাং যারা আল্লাহভীরু তারাই আল্লাহর বন্ধু। যখন তারা পারলৌকিক অবস্থার সম্মুখীন হবে তখন তারা মোটেই ভয় পাবে না। আর দুনিয়াতেও তারা কোন দুঃখ ও চিন্তায় পরিবেষ্টিত হবে না। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) এবং ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, আল্লাহর অলী হচ্ছে ঐ লোকেরা যারা সদা-সর্বদা তাঁর স্মরণ ও চিন্তায় নিমগ্ন থাকে।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একটি লোক জিজ্ঞেস করেঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আল্লাহর অলী কারা?" উত্তরে তিনি বলেনঃ "তারা হচ্ছে ওরাই যাদেরকে তুমি দেখতে পাও যে, তারা আল্লাহর স্মরণে নিমগ্ন রয়েছে।"

আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে কিছু এমন লোকও রয়েছে যারা নবীও নয় এবং শহীদও নয়। কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট তাদের মর্যাদা দেখে নবী ও শহীদগণ তাদের উপর রিশ্‌ক (আকাঙ্ক্ষা) করবেন।" জিজ্ঞেস করা হলোঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! তারা কারা?" উত্তরে তিনি বললেনঃ "তারা হচ্ছে ঐ সব লোক যারা শুধু আল্লাহর মহব্বতে একে অপরকে মহব্বত করেছে (ভালবেসেছে)। তাদের মধ্যে নেই কোন মালের সম্পর্ক এবং নেই কোন বংশের সম্পর্ক। তাদের চেহারা হবে নূরানী (উজ্জ্বল) এবং তারা নূরের মিম্বরের উপর থাকবে। যখন মানুষ ভয় পাবে, তখন তাদের কোন ভয় হবে না এবং মানুষ যখন দুঃখে থাকবে, তখনও তাদের কোন দুঃখ ও চিন্তা থাকবে না।" অতঃপর তিনি পাঠ করলেনঃ اَلَاۤ اِنَّ اَوْلِيَآءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ অর্থাৎ " জেনে রেখো, নিশ্চয়ই আল্লাহর অলীদের জন্যে কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না।"

আবূ মালিক আশ্‌আরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ লোকদের মধ্য হতে ও বিভিন্ন গোত্র হতে এমন সম্প্রদায়ের আগমন ঘটবে, যাদের পরস্পরের মধ্যে নেই কোন আত্মীয়তার সম্পর্ক, তারা শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে একে অপরকে ভালবাসবে। তাদের মধ্যে গড়ে উঠবে আন্তরিকতাপূর্ণ প্রেম প্রীতি। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্যে নূরের মিম্বর স্থাপন করবেন, যার উপর তারা উপবেশন করবে। মানুষ সেই দিন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন থাকবে। কিন্তু এরা থাকবে সম্পূর্ণ শান্ত ও নিশ্চিন্ত; আল্লাহর অলী এসব লোকই বটে।[১]

---

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

আবূ দারদা (রাঃ)-কে একটি লোক জিজ্ঞেস করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) لَهُمُ الْبُشْرٰى فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ -এই আয়াতের কিরূপ ব্যাখ্যা করেছেন? উত্তরে তিনি বলেনঃ "এটা হচ্ছে ভাল স্বপ্ন যা কোন মুসলিম দেখে থাকে বা অন্য কোন মুসলিমকে তার সম্পর্কে ঐ স্বপ্ন দেখানো হয়।" আবূ দারদা (রাঃ) লোকটিকে বলেনঃ "তুমি আমাকে এই প্রশ্ন করলে, ইতিপূর্বে শুধু একবার একটি লোক নবী (সঃ)-কে এই প্রশ্ন করেছিল। তিনি উত্তরে বলেছিলেন, এটা হচ্ছে সঠিক ও সত্য স্বপ্ন যা কোন মুসলিম দেখে থাকে বা তার পক্ষে অন্য কাউকেও দেখানো হয়। এটা পার্থিব জীবনেও তার জন্যে শুভ সংবাদ এবং পরকালেও তার জন্যে জান্নাতের সুসংবাদ।"[১] উবাদা ইবনে সামিত (রাঃ)-কে রাসূলুল্লাহ (সঃ) একথাই বলেছিলেন– "তোমার পূর্বে কেউ আমাকে এ প্রশ্ন করেনি। بُشْرٰى শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে ভাল স্বপ্ন।" ইবনে সামিত (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেনঃ "এই আয়াতে আখিরাতের সুসংবাদ তো হচ্ছে জান্নাত, কিন্তু দুনিয়ার সুসংবাদ দ্বারা উদ্দেশ্য কি?" উত্তরে তিনি বলেনঃ "সত্য সপ্ন, যে স্বপ্ন কেউ দেখে বা তার সম্পর্কে কাউকে স্বপ্ন দেখানো হয়। আর এই সত্য স্বপ্নও হচ্ছে নবুওয়াতের সত্তর বা চুয়াল্লিশটি অংশের একটি অংশ।"

আবূ যার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ " হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! মানুষ ভাল কাজ করে এবং লোকেরা তার প্রশংসা করে (এটা কিরূপ?)।" উত্তরে তিনি বলেনঃ "এটা যেন মুমিনের জন্যে দুনিয়াতেই জান্নাতের শুভ সংবাদ। আর এটা নবুওয়াতের ঊনপঞ্চাশটি অংশের একটি অংশ। সুতরাং যে ব্যক্তি ভাল স্বপ্ন দেখবে সে যেন জনগণের সামনে তা বর্ণনা করে দেয়। আর যে খারাপ স্বপ্ন দেখবে, তার এটা জেনে রাখা উচিত যে, ওটা শয়তানের পক্ষ থেকে হয়েছে। সে মানুষকে ভীত-সন্ত্রস্ত করার জন্যেই এরূপ করে। সুতরাং তখন ঐ ব্যক্তির উচিত যে, সে যেন বাম দিকে তিনবার থুথু ফেলে ও তাকবীর পাঠ করে এবং জনগণের সামনে তা প্রকাশ না করে।"[২]

অন্য এক জায়গায় নবুওয়াতের ছেচল্লিশ ভাগের এক ভাগ বলা হয়েছে।

আবূ হুরাইরা (রাঃ) বলেন যে, উত্তম স্বপ্ন হচ্ছে আল্লাহ প্রদত্ত শুভ সংবাদ। কথিত আছে যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে– মুমিনের মৃত্যুর সময় ফিরিশ্তাগণ তাকে জান্নাত ও মাগফিরাতের শুভ সংবাদ দিয়ে থাকেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "নিশ্চয়ই যারা বলেছে–আমাদের প্রতিপালক (হচ্ছেন একমাত্র) আল্লাহ অতঃপর তারা (ওর উপর) অটল রয়েছে, তাদের প্রতি (সুসংবাদ নিয়ে)

১. এ হাদীসটি ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন।
২. এ হাদীসটি ইমাম মুসলিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

ফিরিশতারা অবতীর্ণ হবে, (এবং বলবে যে,) তোমরা (আখিরাতের বিপদসমূহের) ভয় করো না এবং (দুনিয়া ত্যাগের জন্যে) দুঃখও করো না, আর তোমরা সেই জান্নাতের প্রতি সন্তুষ্ট থাকো, যার প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে প্রদান করা হতো। আমি পার্থিব জীবনেও তোমাদের সঙ্গী ছিলাম এবং পরলোকেও থাকবো, আর যা কিছু তোমাদের বাসনা হবে, তোমাদের জন্যে তাতে তা বিদ্যমান আছে, আর যা কিছু তোমরা চাবে, তাও তোমাদের জন্যে তাতে রয়েছে। এটা ক্ষমাশীল করুণাময়ের সন্নিধান হতে মেহমানদারী।"

বারা'র হাদীসে রয়েছে যে, যখন মুমিন ব্যক্তির মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসে, তখন উজ্জ্বল চেহারা ও সাদা পোশাক বিশিষ্ট ফিরিশ্তা তার কাছে আগমন করেন এবং বলেনঃ "হে পবিত্র আত্মা! তার মুখ দিয়ে এমনভাবে বেরিয়ে যাও যেমনভাবে মশকের মুখ দিয়ে পানি বের হয়ে থাকে।" যেমন আল্লাহ পাক বলেনঃ "কিয়ামতের আতংক তাদেরকে হতবুদ্ধি করবে না, ফিরিশ্তারা তাদেরকে বলবে– এটা হচ্ছে ঐদিন, তোমাদের সাথে যেই দিনের ওয়াদা করা হয়েছে।" আর এক জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "সেই দিন তুমি মুমিন পুরুষ এবং মুমিনা নারীদেরকে দেখবে যে, তাদের সামনের দিকে এবং ডান দিকে নূর (আলো) চলছে, (বলা হবে) আজ তোমাদেরকে ঐ জান্নাতের সুসংবাদ দেয়া হচ্ছে, যার নিম্নদেশে নহর প্রবাহিত হচ্ছে– এটা হচ্ছে বিরাট সফলতা।"

৬৫। আর তোমাকে যেন তাদের উক্তিগুলো বিষণ্ন না করে, সকল ক্ষমতা আল্লাহরই জন্যে রয়েছে; তিনি শুনেন, জানেন।

٦٥- وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝

৬৬। মনে রেখো, যত কিছু আসমানসমূহে আছে এবং যত কিছু যমীনে আছে, এই সমস্তই আল্লাহর; আর যারা আল্লাহকে ছেড়ে অন্য শরীকদের ইবাদত করে, তারা কোন্ বস্তুর অনুসরণ করছে? তারা শুধু অবাস্তব খেয়ালের তাবেদারী করে চলছে এবং শুধু অনুমানপ্রসূত কথা বলছে।

٦٦- أَلَآ إِنَّ لِلّٰهِ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ شُرَكَآءَ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ۝

٦٧- هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ○

৬৭। তিনি এমন, যিনি তোমাদের জন্যে রাত্রি বানিয়েছেন, যেন তোমরা তাতে স্বস্তিলাভ কর, আর দিবসকেও এভাবে সৃষ্টি করেছেন যে, তা হচ্ছে দেখাশুনার উপকরণ; ওতে (তাওহীদের) প্রমাণসমূহ রয়েছে তাদের জন্যে যারা শোনে।

আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলছেন– মুশরিকদের কথা যেন তোমাকে দুঃখিত না করে। তাদের উপর জয়যুক্ত হওয়ার জন্যে আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর এবং তাঁরই উপর নির্ভরশীল হও। সর্বপ্রকারের সম্মান ও বিজয় আল্লাহ, তাঁর রাসূল (সঃ) এবং মুমিনদের জন্যে। মহান আল্লাহ স্বীয় বান্দাদের কথা শুনে থাকেন এবং তাদের অবস্থা সম্পর্কে তিনি পূর্ণ ওয়াকিফহাল। আকাশসমূহ ও পৃথিবীর রাজত্ব তাঁরই। মুশরিকরা যে প্রতিমাগুলোর পূজা করছে সেগুলো তাদের ক্ষতি ও লাভ কিছুই করতে সক্ষম নয়। আর তাদের কাছে এর যুক্তিসম্মত কোন দলীলও নেই। এই মুশরিকরা তো শুধু মিথ্যা, অযৌক্তিক ও অনুমানপ্রসূত মতেরই অনুসরণ করছে।

এরপর ইরশাদ হচ্ছে– আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের জন্যে রাত্রি বানিয়েছেন, যেন তারা সারা দিনের শ্রান্তি ও ক্লান্তির পর আরাম ও শান্তি লাভ করতে পারে। আর তিনি দিবসকে জীবিকা উপার্জনের উদ্দেশ্যে উজ্জ্বল করেছেন। তারা দিনে সফর করে থাকে এবং আলোকের মধ্যে তাদের জন্যে আরো অনেক সুযোগ সুবিধা রয়েছে। দলীল প্রমাণাদি দেখে ও শুনে যারা উপদেশ ও শিক্ষা লাভ করে থাকে তাদের জন্যে এই আয়াতগুলোর মধ্যে নিদর্শনসমূহ রয়েছে। এগুলো সৃষ্টিকর্তার শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ বহন করে।

٦٨- قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ

৬৮। তারা বলে–আল্লাহর সন্তান আছে, তিনি পবিত্র! তিনি তো কারো মুখাপেক্ষী নন; তাঁরই স্বত্বে রয়েছে যা কিছু

وَمَا فِي الْأَرْضِ إِنْ عِنْدَكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ بِهٰذَا أَتَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ○

আসমানসমূহে আছে এবং যা কিছু যমীনে আছে; তোমাদের কাছে এর (উক্ত দাবীর) কোন প্রমাণও নেই; আল্লাহ সম্বন্ধে কি তোমরা এমন কথা আরোপ করছো যা তোমাদের জানা নেই?

٦٩- قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ○

৬৯। তুমি বলে দাও– যারা আল্লাহর উপর মিথ্যা রচনা করে তারা সফলকাম হবে না।

٧٠- مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ○

৭০। এটা দুনিয়ার সামান্য আরাম আয়েশ মাত্র, তৎপর আমারই দিকে তাদের আসতে হবে, তখন আমি তাদেরকে তাদের কুফরীর বিনিময়ে কঠিন শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করাবো।

এখানে আল্লাহ তা'আলা ঐ লোকদের কথা খণ্ডন করছেন যারা বলে যে, আল্লাহর সন্তান রয়েছে (নাঊযুবিল্লাহি মিন যালিক)। তিনি এসব থেকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র। সন্তান কি, বরং তিনি সমস্ত জিনিস থেকেই অমুখাপেক্ষী। দুনিয়ায় যত কিছু বিদ্যমান রয়েছে, সবকিছুই তাঁর অনুগ্রহ ও দয়ার কাঙ্গাল ও একমাত্র তাঁরই মুখাপেক্ষী। যমীন, আসমান ও এ দু'য়ের মধ্যে যা কিছু রয়েছে সবই তাঁর অধিকারভুক্ত। তাহলে তিনি নিজেরই বান্দা বা দাসকে কিরূপে সন্তান বানাতে পারেন? হে মুমিনগণ! তোমাদের কাছে তো এর দলীল রয়েছে, কিন্তু এই কাফির ও মুশরিকদের কাছে এই মিথ্যা ও অপবাদমূলক কথার কোনই প্রমাণ নেই। তারা জানে না কিছুই অথচ অনেক কিছু দাবী করছে। এটা মুশরিকদের জন্যে কঠিন সতর্কতামূলক উক্তি।

এই কাফিরগণ বলে যে, আল্লাহরও একটি পুত্র রয়েছে (নাঊযুবিল্লাহ)। এটা এমনই এক কঠিন অপবাদমূলক কথা যে, তা শুনে যদি আকাশ ফেটে পড়ে, যমীন ধ্বসে যায় এবং পাহাড় ভেঙ্গে পড়ে, তবে এতে বিস্ময়ের কিছুই নেই।

আল্লাহ তা'আলার সন্তান হওয়া কিরূপে শোভা পাবে? যমীন ও আসমানের সমুদয় জিনিস তো তাঁরই অনুগৃহীত এবং তাঁরই দাস! সবই তাঁর গণনার মধ্যে রয়েছে। ওগুলোর সংখ্যা তাঁর জানা আছে। কিয়ামতের দিন সবাই এককভাবে তাঁর কাছে হাযির হবে। এরপর মহান আল্লাহ এই অপবাদ প্রদানকারী কাফিরদেরকে ধমকের সুরে বলছেন যে, তারা দ্বীন ও দুনিয়া কোথায়ও মুক্তি পাবে না। কিন্তু দুনিয়াতে যে তাদেরকে কিছু ভোগ্য বস্তু প্রদান করা হচ্ছে তা এই জন্যে যে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ঢিল দিয়ে রেখেছেন, যেন তারা দুনিয়ার নগণ্য ভোগ্য বস্তু দ্বারা কিছুটা উপকার লাভ করে। অতঃপর তাদেরকে ভীষণ শাস্তির শিকারে পরিণত করা হবে। এই দুনিয়াটা তো তাদের জন্যে অল্প কয়েক দিনের সুখের জায়গা। এরপর তাদেরকে আল্লাহ পাকের কাছেই ফিরে যেতে হবে। সেখানে তাদেরকে গ্রহণ করতে হবে কঠিন শাস্তির স্বাদ। এটা হবে তাদের মিথ্যা অপবাদ এবং কুফরীর কারণে।

٧١- وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ نُوْحٍ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ اِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَّقَامِىْ وَتَذْكِيْرِىْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَعَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ فَاَجْمِعُوْٓا اَمْرَكُمْ وَشُرَكَآءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ اَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوْٓا اِلَىَّ وَلَا تُنْظِرُوْنِ ○

৭১। আর তুমি তাদেরকে নূহের ইতিবৃত্ত পড়ে শুনাও, যখন সে নিজের কওমকে বললো– হে আমার কওম! যদি তোমাদের কাছে দুর্বহ মনে হয় আমার অবস্থান এবং আল্লাহর আদেশাবলী নসীহত করা, তবে আমার তো আল্লাহরই উপর ভরসা, সুতরাং তোমরা তোমাদের (কল্পিত) শরীকদেরকে সঙ্গে নিয়ে নিজেদের তদবীর মজবুত করে নাও, অতঃপর তোমাদের সেই তদবীর (গোপন ষড়যন্ত্র) যেন তোমাদের দুশ্চিন্তার কারণ না হয়, তারপর আমার সাথে (যা করতে চাও) করে ফেলো, আর আমাকে মোটেই অবকাশ দিও না।

٧٢- فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِّنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللّٰهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ○

৭২। তৎপরও যদি তোমরা পরান্মুখই থাকো, তবে আমি তো তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাই না, আমার পারিশ্রমিক তো শুধু আল্লাহরই যিম্মায় রয়েছে, আর আমাকে হুকুম করা হয়েছে যে, আমি যেন অনুগতদের অন্তর্ভুক্ত থাকি।

٧٣- فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَٰهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَٰهُمْ خَلَٰٓئِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِاٰيٰتِنَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ ○

৭৩। অনন্তর তারা তাঁকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে থাকে, অতএব আমি তাকে এবং যারা তার সাথে নৌকায় ছিল তাদেরকে নাজাত দিলাম ও তাদেরকে আবাদ করলাম, আর যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিল, তাদেরকে নিমজ্জিত করে দিলাম, সুতরাং দেখো কি পরিণাম হয়েছিল তাদের, যাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছিল।

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নবী (সঃ)-কে বলছেন– হে নবী (সঃ)! মক্কার কাফিরদেরকে, যারা তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে এবং তোমার বিরোধিতা করছে তাদেরকে নূহ (আঃ) এবং তার কওমের ঘটনা শুনিয়ে দাও। তারা তাদের নবীকে অবিশ্বাস করেছিল, ফলে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে কিভাবে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন এবং তাদের সকলকে কিভাবে পানিতে ডুবিয়ে দেন! যাতে পূর্ববর্তীদের এই ভয়াবহ পরিণাম দেখে এ লোকগুলো সতর্ক হয়ে যায় যে, না জানি তাদেরকেও ধ্বংসের সম্মুখীন হতে হয়। ঘটনা এই যে, নূহ (আঃ) যখন তাঁর কওমকে বললেনঃ "যদি তোমাদের কাছে আমার ঘোরাফেরা এবং সঠিক পথে আনয়নের জন্যে তোমাদেরকে উপদেশ দান তোমাদের নিকট ভারী বোধ

হয়, তবে জেনে রেখো যে, আমি এটাকে মোটেই গ্রাহ্য করি না। আমি শুধু আল্লাহর উপর নির্ভর করেছি। তোমাদের কাছে কঠিন বোধ হোক বা নাই হোক, আমি কিন্তু প্রচার কার্য থেকে বিরত থাকতে পারি না। আচ্ছা, তোমরা এবং আল্লাহ ছাড়া তোমরা যাদেরকে শরীক বানিয়ে নিয়েছো, অর্থাৎ তোমাদের উপাস্য প্রতিমাগুলো, সবাই একমত হয়ে যাও এবং নিজেদের চেষ্টার কোনই ত্রুটি না করে সবদিক দিয়ে নিজেদেরকে দৃঢ় করে নাও। অতঃপর তোমাদের যদি বিশ্বাস থাকে যে, তোমরাই হক পথে রয়েছো, তবে আমার ব্যাপারে তোমাদের সিদ্ধান্ত কার্যকরী করে ফেলো এবং আমাকে এক ঘন্টাকালও অবকাশ দিও না। সাধ্যমত তোমরা সবকিছুই করতে পার। তথাপি জেনে রেখো যে, তোমাদেরকে আমি পরওয়া করি না এবং ভীতও নই। কেননা, আমি জানি যে, তোমাদের অনুমানের ভিত্তি কোন কিছুরই উপর প্রতিষ্ঠিত নয়।”

হুদ (আঃ) স্বীয় কওমকে এরূপই বলেছিলেনঃ “আমিও আল্লাহকে সাক্ষী রাখছি এবং তোমরাও সাক্ষী থাকো যে, তোমরা যে আল্লাহকে ছেড়ে মূর্তিগুলোকে তাঁর শরীক বানিয়ে নিচ্ছ, আমি এ ব্যাপারে তোমাদের থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। এখন তোমরা যত পার আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে থাকো এবং আমাকে মুহূর্তকালও অবকাশ দিয়ো না। আমার ভরসাস্থল একমাত্র আল্লাহ, যিনি তোমাদেরও প্রতিপালক এবং আমারও প্রতিপালক। যদি তোমরা আমাকে অবিশ্বাস করতঃ আমার দিক থেকে সরে পড়, তবে এতে আমার কি হবে? এমন তো নয় যে, তোমাদের কাছে আমার কিছু পাওয়ার আশা ছিল, যা নষ্ট হওয়ার কারণে আমার দুঃখ হবে? আমি যে তোমাদের কল্যাণ কামনা করছি তার তো কোন বিনিময় তোমাদের কাছে চাচ্ছি না। আমাকে তো বিনিময় প্রদান করবেন আল্লাহ। আমার প্রতি এই গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে যে, আমি যেন সর্বপ্রথম ঈমান আনয়ন করি। আর আমার জন্যে এটা অবশ্য কর্তব্য যে, আমি যেন ইসলামের আহকাম কার্যকর করি। কেননা, প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত সমস্ত নবীর দ্বীন ইসলামই বটে। নীতি ও পন্থা পৃথক হলেও কোন ক্ষতি নেই। তাওহীদের শিক্ষা তো একই।” আল্লাহ পাকের উক্তিঃ “তোমাদের প্রত্যেকের জন্যে আমি এক একটি শরীয়ত এবং পৃথক পৃথক নীতি ও পন্থা বানিয়েছি।” এই নূহ (আঃ) বলেনঃ “আমাকে এই নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, আমি যেন মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত হই।”

ইবরাহীম (আঃ) সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ "যখন তার প্রতিপালক তাকে বললেন, ঈমান আনয়ন কর, তখন সে তৎক্ষণাৎ বলে উঠলো– আমি ঈমান আনলাম বিশ্ব প্রতিপালকের প্রতি। আর এই হুকুম করে গেছে ইবরাহীম (আঃ) নিজ সন্তানদেরকে এবং ইয়াকুবও (আঃ), হে আমার সন্তানগণ! আল্লাহ্ এই দ্বীনকে তোমাদের জন্যে মনোনীত করেছেন, সুতরাং তোমরা ইসলাম ছাড়া আর কোন অবস্থায় মরো না।"

ইউসুফও (আঃ) বলেছিলেনঃ "হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমাকে রাজত্বের বিরাট অংশ দান করেছেন এবং আমাকে স্বপ্নফল বর্ণনা শিক্ষা দিয়েছেন, হে আসমানসমূহের ও যমীনের সৃষ্টিকর্তা! আপনি আমার কার্য নির্বাহক, দুনিয়াতেও এবং আখিরাতেও, আমাকে পূর্ণ আনুগত্যের অবস্থায় দুনিয়া হতে উঠিয়ে নিন এবং আমাকে বিশিষ্ট নেক বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করুন।"

মূসা (আঃ) বলেছিলেনঃ "হে লোক সকল! যদি তোমরা মুসলিম হও, তবে আল্লাহর উপরই ভরসা কর এবং তাঁরই উপর ঈমান আনয়ন কর।" মূসা (আঃ)-এর যুগের যাদুকরগণ বলেছিলঃ "হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের মধ্যে ধৈর্য আনয়ন করুন এবং ইসলামের অবস্থায় আমাদের মৃত্যু দিন!"

বিলকিস বলেছিলঃ "হে আমার প্রতিপালক! আমি আমার নিজের উপর যুলুম করেছি এবং সুলাইমান (আঃ)-এর বিশ্ব প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনলাম।"

ইরশাদ হচ্ছে– "আমি যে তাওরাত অবতীর্ণ করেছি তা হচ্ছে হিদায়াত ও নূর। নবী এর মাধ্যমে মুসলিমদের উপর হুকুম কায়েম করে থাকে।" আর এক জায়গায় মহান আল্লাহ বলেনঃ "আমি যখন (ঈসার আঃ) হাওয়ারীদের উপর অহী করেছিলাম– তোমরা আমার উপর ও আমার রাসূলের উপর ঈমান আনয়ন কর, তখন তারা বলেছিল, আমরা ঈমান আনলাম এবং আপনি সাক্ষী থাকুন যে, আমরা মুসলিম।"

সর্বশেষ নবী, মানব নেতা মুহাম্মাদ (সঃ) বলেছেনঃ "আমার সালাত, আমার ইবাদত, আমার জীবন এবং আমার মরণ সমস্তই বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহর জন্যেই। তাঁর কোনই অংশীদার নেই, আমি এ কাজেই আদিষ্ট হয়েছি এবং আমিই হলাম প্রথম মুসলিম।" তিনি বলেনঃ "আমরা নবীদের দল যেন বৈমাত্রেয় ভাই। আমাদের সবারই পিতা একজন এবং মাতা পৃথক পৃথক। অর্থাৎ আমাদের সবারই দ্বীন একই। আর সেটা হচ্ছে এক আল্লাহর ইবাদত করা, যদিও আমাদের শরীয়ত পৃথক পৃথক।"

আল্লাহ পাকের উক্তিঃ "আমি নূহ (আঃ)-কে এবং তার অনুসারীদেরকে নৌকার উপর উঠিয়ে মুক্তি দিয়েছিলাম এবং তাদেরকে যমীনের উপর প্রতিনিধি বানিয়েছিলাম। পক্ষান্তরে যারা তাকে (নূহ আঃ-কে) অবিশ্বাস ও মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল তাদেরকে পানিতে ডুবিয়ে দিয়েছিলাম। দেখো, হতভাগ্যদের পরিণাম কি হয়েছিল! হে মুহাম্মাদ (সঃ)! দেখো, আমি মুমিনদেরকে কিরূপে মুক্তি দিয়েছি এবং নাফরমানদেরকে কিভাবে ধ্বংস করেছি!"

৭৪। আবার আমি তার (নূহ আঃ -এর পরে) অপর নবীদেরকে তাদের কওমের নিকট প্রেরণ করলাম, সুতরাং তারা তাদের নিকট মু'জিযাসমূহ নিয়ে আসলো, এতদসত্ত্বেও এটা হলো না যে, তারা যে বস্তুকে পূর্বে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিল, পরে তা মেনে নেয়; এভাবেই আল্লাহ কাফিরদের অন্তরসমূহের উপর মোহর লাগিয়ে দেন।

٧٤- ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهٖ رُسُلًا اِلٰى قَوْمِهِمْ فَجَآءُوْهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَمَا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْا بِمَا كَذَّبُوْا بِهٖ مِنْ قَبْلُ كَذٰلِكَ نَطْبَعُ عَلٰى قُلُوْبِ الْمُعْتَدِيْنَ○

আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি নূহ (আঃ)-এর পরে অন্যান্য রাসূলদেরকেও তাদের কওমের নিকট দলীল প্রমাণাদি ও মু'জিযাসহ পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু তারা পূর্বে যেভাবে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিল, ওর উপরই প্রতিষ্ঠিত থাকলো। তারা পূর্ববর্তী রাসূলদের মিথ্যা প্রতিপন্ন করার কারণে গুনাহ্গার তো হয়েছিলই, তদুপরি এই রাসূলদের উপরও ঈমান আনলো না। যেমন আল্লাহ পাক বলেনঃ "আমি তাদের অন্তর ও চক্ষুসমূহ হতে বুঝবার ও শুনবার যোগ্যতাই বের করে নিলাম।"

আল্লাহ্ পাকের উক্তিঃ "এভাবেই আল্লাহ কাফিরদের অন্তরসমূহের উপর মোহর লাগিয়ে দেন।" অর্থাৎ যেমন পূর্ববর্তী উম্মতেরা তাদের নবীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার কারণে আমি তাদের অন্তরসমূহের উপর মোহর লাগিয়ে দিয়েছিলাম, অনুরূপভাবে ঐ পথভ্রষ্টদের অনুসরণকারীদের অন্তরসমূহের উপরও আমি মোহর লাগিয়ে দিয়েছি। যে পর্যন্ত না তারা বেদনাদায়ক শাস্তির শিকারে

পরিণত হবে, বিশ্বাস স্থাপন করবে না। ভাবার্থ এই যে, রাসূলদেরকে অস্বীকারকারী উম্মতদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা ধ্বংস করে দিয়েছেন এবং যারা তাদের উপর ঈমান এনেছে তাদেরকে তিনি মুক্তি দিয়েছেন। এটা নূহ (আঃ)-এর পরবর্তী লোকদের বর্ণনা। আসলে আদম (আঃ)-এর পরের যুগের লোকেরা তো ইসলামের উপরই কায়েম ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে তাদের মধ্যে প্রতিমা-পূজার প্রচলন হয়ে যায়। এ জন্যেই আল্লাহ তা'আলা তাদের নিকট নূহ (আঃ)-কে প্রেরণ করেন। এ কারণেই তো কিয়ামতের দিন মুমিনরা নূহ (আঃ)-কে বলবেঃ 'আপনি হচ্ছেন দুনিয়ায় প্রেরিত প্রথম নবী।'

ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, আদম (আঃ) ও নূহ (আঃ)-এর মাঝে দশ শতাব্দী অতিবাহিত হয়েছিল। তারা সবাই ইসলাম ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "নূহ (আঃ)-এর পরে আমি কতইনা যুগ খতম করেছি!" উপরোল্লিখিত আয়াত দ্বারা আরবের সেই মুশরিকদের ভয় প্রদর্শন করা হয়েছে, যারা সর্বশেষ নবী (সঃ)-কে মিথ্যা সাব্যস্ত করছিল। পূর্ববর্তী নবীদেরকে অবিশ্বাসকারীদের শাস্তির কথা যখন আল্লাহ তা'আলা এইভাবে উল্লেখ করলেন, তখন কুরায়েশরা যে নবী (সঃ)-কে অবিশ্বাস করছে, এ ব্যাপারে বাস্তবিকই চিন্তা করা উচিত যে, তারা তো আরো বেশী পাপে জড়িয়ে পড়ছে। কারণ তিনি তো হচ্ছেন সর্বশেষ নবী (সঃ)! তাঁর পরে আর কোন নবী আসবেন না যে, তারা হিদায়াত লাভের আর কোন সুযোগ পাবে।

৭৫। অতঃপর আমি তাদের পর মূসা ও হারূনকে আমার মু'জিযাসমূহ সহকারে ফিরআউন ও তার প্রধানদের নিকট পাঠালাম, অনন্তর তারা অহংকার করলো, আর সেই লোকগুলো ছিল পাপাচারী সম্প্রদায়।

٧٥- ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْۢ بَعْدِهِمْ مُّوسٰى وَهٰرُوْنَ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَا۟ئِهٖ بِاٰيٰتِنَا فَاسْتَكْبَرُوْا وَكَانُوْا قَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ ○

৭৬। অতঃপর যখন তাদের প্রতি আমার সন্নিধান হতে প্রমাণ পৌঁছলো, তখন তারা বলতে লাগলো, নিশ্চয়ই এটা সুস্পষ্ট যাদু।

٧٦- فَلَمَّا جَآءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوْٓا اِنَّ هٰذَا لَسِحْرٌ مُّبِيْنٌ ○

৭৭। মূসা বললো– তোমরা কি এই যথার্থ প্রমাণ সম্পর্কে এমন কথা বলছো, যখন ওটা তোমাদের নিকট পৌঁছলো? এটা কি যাদু? অথচ যাদুকররা তো সফলকাম হয় না!

٧٧- قَالَ مُوسَىٰٓ أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَكُمْ أَسِحْرٌ هَٰذَا وَلَا يُفْلِحُ السَّٰحِرُونَ ○

৭৮। তারা বলতে লাগলো– তুমি কি আমাদের নিকট এই জন্যে এসেছো যে, আমাদেরকে সরিয়ে দাও সেই তরীকা হতে, যাতে আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের পেয়েছি, আর পৃথিবীতে তোমাদের দু'জনের আধিপত্য স্থাপিত হয়ে যায়? আর আমরা তোমাদের দু'জনকে কখনো মানবো না।

٧٨- قَالُوٓا أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا الْكِبْرِيَآءُ فِى الْأَرْضِ ط وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ ○

আল্লাহ তা'আলা বলেন, এই রাসূলদের পরে আমি ফিরআউন ও তার দলবলের কাছে মূসা (আঃ) ও হারূন (আঃ)-কে পাঠালাম এবং তাদের সাথে আমার নিদর্শনাবলী, দলীল প্রমাণাদি ও মু'জিযাসমূহও ছিল। কিন্তু ঐ পাপিষ্ঠ কওম সত্যের অনুসরণ ও আনুগত্য অস্বীকার করে বসে। যখন তাদের কাছে আমার পক্ষ থেকে সত্য বিষয়গুলো পৌঁছে গেল, তখন তারা কোন চিন্তা না করেই বলতে লাগলো– এটা তো সুস্পষ্ট যাদু। তারা যেন নিজেদের অবাধ্যতার উপর শপথই করে বসেছিল। অথচ তাদের নিজেদেরই বিশ্বাস ছিল যে, তারা যা কিছু বলছে প্রকৃতপক্ষে তা মিথ্যা ও অপবাদ ছাড়া কিছুই নয়। যেমন স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা বলেন, তারা অস্বীকার তো করছে বটে, কিন্তু তাদের অন্তর স্বয়ং বিশ্বাস রাখছে যে, ওটা তাদের যুলুম ও অবাধ্যাচরণ। মোটকথা, মূসা (আঃ) তাদের দাবী খণ্ডন করতে গিয়ে বলেন– সত্য যখন তোমাদের কাছে এসে যাচ্ছে, তখন তোমরা বলছো যে, এটা যাদু ছাড়া কিছুই নয়। অথচ যাদুকররা তো কখনো কল্যাণ ও মুক্তির মুখ দেখতে পারে না।

ঐ অবাধ্যরা মূসা (আঃ)-কে বললো– হে মূসা (আঃ)! আপনি তো আমাদের কাছে এজন্যেই এসেছেন যে, আমাদেরকে আমাদের পূর্বপুরুষদের ধর্ম থেকে

ফিরিয়ে দিবেন, অতঃপর শ্রেষ্ঠত্ব, রাজত্ব এবং বিজয় গৌরব সবই হয়ে যাবে আপনার ও আপনার ভাই হারূন (আঃ)-এর জন্যে।

আল্লাহ পাক মূসা (আঃ) ও ফিরআউনের কাহিনী কয়েক জায়গায় বর্ণনা করেছেন। কেননা, এটা হচ্ছে বিস্ময়কর কাহিনী। ফিরআউন পূর্ব হতেই মূসা (আঃ) থেকে আতংকিত ছিল। কিন্তু কি আশ্চার্যজনক ব্যাপার যে, যে ফিরআউন মূসা (আঃ)-কে এতো ভয় করতো, আল্লাহ্ তা'আলা তার কাছেই তাঁকে লালিত পালিত করলেন। রাজকুমাররূপে মূসা (আঃ) ফিরআউনের কাছে লালিত পালিত হতে থাকলেন। অতঃপর একটা বিপ্লব ঘটে গেল এবং এমন এক পরিস্থিতির সৃষ্টি হলো যে, তিনি ফিরআউনের কাছে আর টিকতে পারলেন না। তাঁকে তার নিকট থেকে পালিয়ে যেতে হলো। আল্লাহ পাক তাঁকে নবুওয়াত ও রিসালাত দান করে গৌরবান্বিত করলেন এবং তাঁকে এতো বড় সম্মান দিলেন যে, স্বয়ং তিনি তাঁর সাথে কথা বললেন। এরপর তিনি তাঁকে ঐ ফিরআউনের কাছেই নবীরূপে প্রেরণ করলেন এবং বলে দিলেন– তাকে গিয়ে বল যে, সে যেন আমার দিকে প্রত্যাবর্তন করে এবং বে-দ্বীনীর পরিবর্তে দ্বীনের উপর চলে। অথচ ফিরআউন সেই সময় বিপুল ধন-সম্পদ ও ক্ষমতার অধিকারী ছিল। যা হোক, আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশক্রমে মূসা (আঃ) ফিরআউনের কাছে পয়গাম নিয়ে আসলেন। ঐ সময় তাঁর ভাই হারূন (আঃ) ছাড়া তাঁর আর কোন সাহায্যকারী ছিল না। ফিরআউন কিন্তু ক্ষমতার গর্বে গর্বিত হয়ে উঠলো এবং তাঁর দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করলো। সে এমন এক দাবী করে বসলো, যার সে মোটেই হকদার ছিল না। বানী ইসরাঈলের মুমিনদেরকে সে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করলো। এরূপ সংকীর্ণ পরিস্থিতিতেও মূসা (আঃ) ও হারূন (আঃ) ফিরআউনের অন্যায়ের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে গেলেন। আল্লাহ পাক তাঁদেরকে স্বীয় তত্ত্বাবধানে নিয়ে নিলেন। একের পর এক মূসা (আঃ)-এর সঙ্গে ফিরআউনের বিবাদ ও তর্ক বিতর্ক হতে থাকলো। মূসা (আঃ) এমন এমন নিদর্শন ও মু'জিযা পেশ করতে লাগলেন যে, যা দেখে হতবাক হতে হয় এবং স্বীকার করতে হয় যে, আল্লাহর পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া কেউই এরূপ দলীল কখনো পেশ করতে পারে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও ফিরআউন ও তার দলবল এই শপথ করে বসলো যে, তারা কখনো মূসা (আঃ)-কে মানবে না। অবশেষে এমন শাস্তি নেমে আসলো যে, তা রদ করার ক্ষমতা কারো থাকলো না। একদিন ফিরআউন ও তার দলবলকে নদীতে ডুবিয়ে দেয়া হলো এবং এইভাবে ঐ অত্যাচারী কওমের মূলোচ্ছেদ হয়ে গেল।

٧٩- وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُوْنِىْ بِكُلِّ سٰحِرٍ عَلِيْمٍ ○

৭৯। এবং ফিরআউন বললো– আমার কাছে সমস্ত সুদক্ষ যাদুকরকে উপস্থিত কর।

٨٠- فَلَمَّا جَآءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُّوْسٰى اَلْقُوْا مَآ اَنْتُمْ مُّلْقُوْنَ ○

৮০। অনন্তর যখন যাদুকররা আসলো, তখন মূসা তাদেরকে বললো– নিক্ষেপ কর যা কিছু তোমরা নিক্ষেপ করতে চাও।

٨١- فَلَمَّآ اَلْقَوْا قَالَ مُوْسٰى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ اِنَّ اللّٰهَ سَيُبْطِلُهٗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِيْنَ ○

৮১। অতঃপর যখন তারা নিক্ষেপ করলো, তখন মূসা (আঃ) বললো– যাদু এটাই; নিশ্চয়ই আল্লাহ এখনই এটাকে বানচাল করে দিবেন; (কেননা) আল্লাহ এমন ফাসাদীদের কাজ সম্পন্ন হতে দেন না।

٨٢- وَيُحِقُّ اللّٰهُ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ ○ ع

৮২। আর আল্লাহ সঠিক প্রমাণকে স্বীয় অঙ্গীকার অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত করে দেন, যদিও পাপাচারীরা তা অপ্রীতিকর মনে করে।

মহান আল্লাহ যাদুকর ও মূসা (আঃ)-এর কাহিনী সূরায়ে আ'রাফে বর্ণনা করেছেন এবং সেখানে এর উপর আলোকপাত করা হয়েছে। আর এই সূরায় এবং সূরায়ে তাহা ও সূরায়ে শুআরায়ও এটা বর্ণিত হয়েছে। ফিরআউন তার যাদুকরদের বাজে কথন এবং প্রতারণামূলক কলাকৌশলের মাধ্যমে মূসা (আঃ)-এর সুস্পষ্ট সত্যের মুকাবিলা করতে চেয়েছিল। কিন্তু সে সম্পূর্ণরূপে বিফল মনোরথ হয় এবং সাধারণ সমাবেশে আল্লাহ্ পাকের দলীল প্রমাণাদি ও মু'জিযাসমূহ জয়যুক্ত হয়। সমস্ত যাদুকর সিজদায় পড়ে যায় এবং বলে ওঠেঃ "আমরা বিশ্ব প্রতিপালকের উপর ঈমান আনলাম। যিনি মূসা (আঃ) ও হারূন (আঃ)-এর প্রতিপালক।" ফিরআউনের তো বিশ্বাস ছিল যে, সে যাদুকরদের সাহায্যে আল্লাহর রাসূলের উপর বিজয় লাভ করবে। কিন্তু সে অকৃতকার্য হয়

এবং তার জন্যে জাহান্নাম অবধারিত হয়ে যায়। ফিরআউন নির্দেশ দিয়েছিল যে, দেশের প্রত্যেক প্রান্ত থেকে যেন যাদুকরদেরকে একত্রিত করা হয়। ঐ যাদুকররা মূসা (আঃ)-কে বলেঃ "আপনি যে কাজ করতে চান করে ফেলেন।" তাদের একথা বলার কারণ ছিল এই যে, ফিরআউন তাদের সাথে অঙ্গীকার করেছিলঃ "তোমরা যদি বিজয় লাভ করতে পার, তবে আমার নৈকট্য লাভ করবে এবং তোমাদেরকে বড় রকমের পুরস্কার দেয়া হবে।" যাদুকররা মূসা (আঃ)-কে বলেঃ "প্রথমে আপনি আপনার কর্মকৌশল দেখাবেন, না আমরাই প্রথমে দেখাবো?" উত্তরে মূসা (আঃ) বললেনঃ "তোমরাই প্রথমে তোমাদের কলাকৌশল প্রদর্শন কর।" এটা বলার উদ্দেশ্য ছিল এই যে, যাতে যাদুকররা কি পেশ করছে তা জনগণ দেখতে পারে। তারপর যেন সত্যের আগমন ঘটে এবং মিথ্যাকে মিথ্যারূপেই প্রমাণ করে। যাদুকররা তাদের যাদুর দড়িগুলো নিক্ষেপ করলো এবং জনগণের চোখে যাদু লাগিয়ে দিলো। তাদের দড়িগুলো সাপ হয়ে গেল, ফলে জনগণ ভয় পেয়ে গেল। তারা মনে করলো যে, যাদুকররা বড় রকমের যাদু পেশ করেছে। মূসা (আঃ)-ও ভয় পেয়ে গেলেন। আল্লাহ পাক তখন মূসা (আঃ)-কে বললেনঃ "হে মূসা (আঃ)! ভয় করো না। তুমিই জয়যুক্ত হবে। তোমার লাঠিখানা তুমি মাটিতে নিক্ষেপ কর। ওটি অজগর হয়ে গিয়ে তাদের সাপগুলোকে গিলে ফেলবে। যাদুকরদের এই কর্মকৌশল তো যাদু ছাড়া কিছুই নয়। যাদুকররা কোনক্রমেই সফলতা লাভ করতে পারে না।" এ অবস্থায় মূসা (আঃ) তাদেরকে বললেনঃ "এটা তো তোমাদের যাদুর খেলা। আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই তোমাদের এ কাজকে মিথ্যা প্রমাণিত করবেন।"

আল্লাহ পাক বলেন– "আল্লাহ্ ফাসাদকারীদের কাজ সম্পন্ন হতে দেন না। তিনি সত্যকে সত্যরূপেই প্রমাণ করবেন, যদিও পাপাচারীদের কাছে তা অপছন্দনীয় হয়।"

ইবনে আবি সুলাইম (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নিম্নের আয়াতগুলো আল্লাহ তা'আলার হুকুমে যাদুক্রিয়া থেকে আরোগ্য দানের কাজ করে থাকে। এই আয়াত পড়ে পানিতে ফুৎকার দিতে হবে। অতঃপর সেই পানি যাদুকৃত ব্যক্তির মাথায় ঢেলে দিতে হবে। আয়াতগুলো হচ্ছে সূরায়ে ইউনুসের নিম্নের আয়াতঃ فَلَمَّا اَلْقَوْا قَالَ مُوسٰى হতে وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ পর্যন্ত। অন্য আয়াত হচ্ছেঃ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ (৭ঃ ১১৮) হতে শেষ চার আয়াত পর্যন্ত। আর اِنَّمَا صَنَعُوْا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ اَتٰى (২০ঃ ৬৯) এই আয়াতটি।

৮৩- فَمَآ اٰمَنَ لِمُوْسٰٓى اِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّنْ قَوْمِهٖ عَلٰى خَوْفٍ مِّنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَا۟ئِهِمْ اَنْ يَّفْتِنَهُمْ ؕ وَاِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِى الْاَرْضِ ۚ وَاِنَّهٗ لَمِنَ الْمُسْرِفِيْنَ ○

৮৩। বস্তুতঃ মূসা (আঃ)-এর প্রতি তার স্বগোত্রীয় লোকদের মধ্যে (প্রথমে) শুধু অল্প সংখ্যক লোকই ঈমান আনলো, তাও ফিরআউন ও তার প্রধানবর্গের এই ভয়ে যে, তারা তাদেরকে নির্যাতন করে; আর বাস্তবিকপক্ষে ফিরআউন সেই দেশে (রাজ্য) ক্ষমতা রাখতো, আর এটাও ছিল যে, সে (ন্যায়ের) সীমাতিক্রম করে ফেলতো।

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, মূসা (আঃ) যখন সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী পেশ করলেন, তখন ফিরআউনের কওম ও তার স্বগোত্রীয় লোকদের মধ্যে খুব কম সংখ্যক লোকই তাঁর উপর ঈমান আনলো। ঈমান আনয়নকারী নবযুবকদের এই ভয় ছিল যে, জোরপূর্বক তাদেরকে পুনরায় কুফরীর দিকে ফিরিয়ে নেয়া হবে। কেননা, ফিরআউন ছিল বড়ই দাম্ভিক, ধূর্ত ও উদ্ধত। তার শান-শওকত ও দবদবা ছিল খুই বেশী। তার কওম তাকে অত্যধিক ভয় করতো। বানী ইসরাঈল ছাড়া অন্যান্যদের মধ্য থেকে শুধু ফিরআউনের স্ত্রী, ফিরআউনের বংশধরের মধ্য হতে অন্য একটি লোক, তার কোষাধ্যক্ষ এবং তার স্ত্রী, এই অল্প সংখ্যক লোক ঈমান এনেছিল।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, اِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّنْ قَوْمِهٖ দ্বারা মূসা (আঃ)-এর বানী ইসরাঈলকে বুঝানো হয়েছে। মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, ذُرِّيَّةٌ দ্বারা ঐ লোকদের সন্তানাদি উদ্দেশ্য যাদের কাছে মূসা (আঃ)-কে প্রেরণ করা হয়েছিল এবং তাদের এই সন্তানদেরকে ছেড়ে তারা বহু যুগ পূর্বে মারা গিয়েছিল। ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) মুজাহিদ (রঃ)-এর অভিমত পছন্দ করে বলেন যে, ذُرِّيَّةٌ দ্বারা ফিরআউনের কওম নয়, বরং মূসা (আঃ)-এর কওমের বানী ইসরাঈলকে বুঝানো হয়েছে। কেননা ضَمِيْر বা সর্বনাম যখন কারো দিকে প্রত্যাবর্তিত হয় তখন তা নিকটতরের দিকেই প্রত্যাবর্তিত হয়ে থাকে। এখানে নিকটতর হচ্ছে مُوْسٰى শব্দটি, فِرْعَوْن শব্দটি নয়। আর এ ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনার

অবকাশ রয়েছে। কেননা, ذُرِّيَّةٌ শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে নবযুবক লোকেরা। আর তারা ছিল বানী ইসরাঈলের অন্তর্ভুক্ত। প্রসিদ্ধ উক্তি এই যে, বানী ইসরাঈলের সবাই তো মূসা (আঃ)-এর উপর ঈমান আনয়ন করেছিল এবং তাদেরকে সুসংবাদও দেয়া হয়েছিল। তারা মূসা (আঃ)-এর গুণাবলী সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল ছিল। পবিত্র গ্রন্থাবলী হতে তারা এই সুসংবাদ প্রাপ্ত হয়েছিল যে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ফিরআউনের বন্দীত্ব থেকে মুক্তিদান করবেন এবং তার উপর তাদেরকে করবেন জয়যুক্ত। আর এ কারণেই ফিরআউন যখন এ খবর জানতে পারলো তখন থেকে সে খুব সতর্কতা অবলম্বন করতে লাগলো। মূসা (আঃ) যখন তার কাছে প্রচারক হয়ে আসলেন তখন সে বানী ইসরাঈলের উপর যুলুম করতে শুরু করে। তখন তারা মূসা (আঃ)-কে বলেঃ "হে মূসা (আঃ)! আপনার আগমনের পূর্বেও আমাদের উপর অত্যাচার করা হয়েছে এবং আপনার আগমনের পরেও আমরা অত্যাচারিত হচ্ছি।" মূসা (আঃ) তাদেরকে বললেনঃ "কিছুদিন সবর কর। অল্পদিনের মধ্যেই আল্লাহ তা'আলা তোমাদের শত্রুদেরকে ধ্বংস করবেন। তারপর তিনি তোমাদেরকে তাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন এবং তোমরা কি আমল কর তা তিনি দেখবেন।" কথা যখন এটাই তখন ذُرِّيَّةٌ দ্বারা মূসা (আঃ)-এর কওম অর্থাৎ বানী ইসরাঈলকে ছাড়া আর কি উদ্দেশ্য হতে পারে? বানী ইসরাঈল ফিরআউনকে এবং নিজেদের কওমের কোন কোন লোককেও ভয় করতো যে, তারা তাদেরকে পুনরায় কাফির করে দেবে। বানী ইসরাঈলের মধ্যে কারূন ছাড়া অন্য কেউ এরূপ ছিল না যাকে তারা ভয় করতো। কারূন মূসা (আঃ)-এরই কওমের লোক ছিল। কিন্তু সে বিদ্রোহী হয়ে ফিরআউনের দলে মিলে গিয়েছিল।

এখন مَلَإِيْهِمْ -এর সর্বনামটি বানী ইসরাঈলের দিকে ফিরেছে। কিন্তু যাঁরা বলেন যে, এই সর্বনামটি ফিরআউন ও তার প্রধানদের দিকে ফিরেছে, কেননা, তার প্রধানরাও তারই অনুসারী ছিল, অথবা ফিরআউনের পূর্বে آل শব্দটি উহ্য রয়েছে, এ জন্যে সর্বনামটি বহুবচন আনা হয়েছে এবং مُضَاف-এর স্থলে مُضَاف اِلَيْهِ টি বসানো হয়েছে, অর্থাৎ آل শব্দের স্থলে فِرْعَوْنَ শব্দটি বসিয়ে দেয়া হয়েছে, এটা কিয়াস হতে খুবই দূরের কথা। যদিও ইবনে জারীর (রঃ) এ দুটো কথাই লিখেছেন। এসব বর্ণনা এটাই প্রমাণ করে যে, বানী ইসরাঈলের সবাই মুমিন ছিল।

৮৪। আর মূসা বললো– হে আমার সম্প্রদায়! যদি তোমরা আল্লাহর উপর ঈমান রাখো, তবে তাঁরই উপর ভরসা কর, যদি তোমরা মুসলিম হও।

٨٤- وَقَالَ مُوسَىٰ يَٰقَوْمِ إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوٓا۟ إِن كُنتُم مُّسْلِمِينَ ○

৮৫। তারা বললো– আমরা আল্লাহরই উপর ভরসা করলাম, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এই যালিমদের লক্ষ্যস্থল বানাবেন না।

٨٥- فَقَالُوا۟ عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ ٱلظَّٰلِمِينَ ○

৮৬। আর আমাদেরকে নিজ রহমতে এই কাফিরদের (কবল) হতে মুক্তি দিন।

٨٦- وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْكَٰفِرِينَ ○

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, মূসা (আঃ) বানী ইসরাঈলকে বললেন– যদি তোমরা আল্লাহর উপর ঈমান এনেই থাকো, তবে একমাত্র তাঁরই উপর ভরসা কর। আল্লাহ তা'আলা ভরসাকারীদের যিম্মাদার হয়ে যান।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আল্লাহ তা'আলা ইবাদত ও তাওয়াক্কুলকে এক জায়গায় মিলিয়ে বলেছেন। যেমন বলেছেনঃ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ অর্থাৎ "তোমরা তাঁর ইবাদত কর এবং তাঁর উপর ভরসা কর।" (১১ঃ ১২৩) অন্যত্র বলেছেনঃ

قُلْ هُوَ الرَّحْمَٰنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا

অর্থাৎ "(হে নবী সঃ)! তুমি বল–তিনি রহমান, আমরা তাঁর উপর ঈমান এনেছি এবং তাঁর উপর ভরসা করেছি।" (৬৭ঃ ২৯) আল্লাহ তা'আলা মুমিনদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, তারা যেন প্রতিটি সালাতে কয়েকবার বলেঃ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ অর্থাৎ "আমরা আপনারই ইবাদত করি এবং আপনার নিকটই সাহায্য প্রার্থনা করি।" বানী ইসরাঈল মূসা (আঃ)-এর কথা মেনে নেয় এবং বলেঃ عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ অর্থাৎ "আমরা আল্লাহরই উপর ভরসা করলাম, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এই

যালিমদের লক্ষ্যস্থল বানাবেন না।" অর্থাৎ আমাদের উপর তাদেরকে সফলতা দান করবেন না। তা না হলে তারা ধারণা করবে যে, তারাই সঠিক পথে রয়েছে এবং বানী ইসরাঈল বাতিল পথে রয়েছে। ফলে তারা আমাদের উপর আরো বেশী যুলুম করবে। হে আমাদের প্রতিপালক! ফিরআউনের লোকদের হাতে আমাদের শাস্তি দিবেন না এবং নিজের শাস্তিতেও আমাদেরকে জড়িত করবেন না। নতুবা ফিরআউনের কওম বলবে যে, যদি লোকগুলো সত্যের উপরই থাকতো তবে কখনো আযাবে জড়িত হতো না এবং আমরা (ফিরাউনের কওম) তাদের উপর জয়যুক্ত হতাম না। হে আল্লাহ! আপনার রহমত ও ইহসানের মাধ্যমে আমাদেরকে এই কাফির কওম হতে মুক্তিদান করুন। এরা হলো কাফির, আর আমরা হলাম মুমিন। আমরা আপনারই উপর ভরসা রাখি।

٨٧- وَاَوْحَيْنَا اِلٰى مُوْسٰى وَاَخِيْهِ اَنْ تَبَوَّاٰ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوْتًا وَّاجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ قِبْلَةً وَّاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ ؕ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

৮৭। আর আমি মূসা ও তার ভ্রাতার প্রতি অহী পাঠালাম– তোমরা উভয়ে তোমাদের এই লোকদের জন্যে মিসরে(ই) বাসস্থান বহাল রাখো, আর (সালাতের সময়) তোমরা সবাই নিজেদের সেই গৃহগুলোকে সালাত পড়ার স্থানরূপে গণ্য কর এবং সালাত কায়েম কর, আর মুমিনদেকে শুভ সংবাদ জানিয়ে দাও।

আল্লাহ তা'আলা বানী ইসরাঈলকে ফিরআউন হতে মুক্তি দেয়ার কারণ বর্ণনায় বলেন, মূসা (আঃ) ও হারূন (আঃ)-কে আমি হুকুম করলাম– তোমরা তোমাদের কওমকে মিসরে নিয়ে যাও এবং সেখানেই বসতি স্থাপন কর।

وَّاجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ قِبْلَةً এর ব্যাপারে মুফাসসিরদের মতানৈক্য রয়েছে। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে–তোমরা নিজেদের ঘরগুলোকেই মসজিদ বানিয়ে নাও। ইবরাহীম (রঃ) বলেন যে, বানী ইসরাঈল ভীত-সন্ত্রস্ত ছিল। তাই তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয় যে, তারা যেন বাড়ীতেই সালাত আদায় করে। এই নির্দেশের ব্যাপারটি ঠিক এইরূপই যে, ফিরআউন

এবং তার কওমের পক্ষ থেকে কষ্ট ও বিপদ যখন খুব বেশী আসতে লাগলো, তখন খুব বেশী বেশী করে সালাত পড়ার নির্দেশ দেয়া হলো। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ

অর্থাৎ "হে মুমিনগণ! তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে (আল্লাহর নিকট) সাহায্য প্রার্থনা কর।" হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) যখন কোন ব্যাপারে হতবুদ্ধি ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়তেন, তখন তিনি সালাত শুরু করে দিতেন। এজন্যেই এই আয়াতে বলা হয়েছে– গৃহকেই মসজিদ মনে করে তোমরা সালাত আদায় করতে থাকো। আর মুমিনদেরকে সওয়াব ও সাহায্যদানের সুসংবাদ দিয়ে দাও।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, বানী ইসরাঈল মূসা (আঃ)-কে বলেছিলঃ "আমরা ফিরআউনের লোকদের সামনে প্রকাশ্যভাবে সালাত আদায় করতে পারবো না।" তখন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বাড়ীতেই সালাতের অনুমতি দেন। মুজাহিদ (রঃ) বলেন, বানী ইসরাঈল এই ভয় করতো যে, যদি তারা মসজিদে সালাত আদায় করে তবে ফিরআউন তাদেরকে হত্যা করবে। এজন্যেই তাদেরকে গোপনে বাড়ীতে সালাত আদায় করার অনুমতি দেয়া হয়। সাঈদ ইবনে জুবাইর (রঃ) বলেন যে, وَاجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ قِبْلَةً-এর অর্থ হচ্ছে– যেন একটি অপরটির সামনে থাকে।

৮৮। আর মূসা (আঃ) বললো–হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি ফিরআউন ও তার প্রধানবর্গকে দান করেছেন জাঁকজমকের সামগ্রী এবং বিভিন্ন রকমের সম্পদ পার্থিব জীবনে, হে আমাদের রব! যার কারণে তারা আপনার পথ হতে (মানবমণ্ডলীকে) বিভ্রান্ত করে, হে আমাদের প্রতিপালক! তাদের সম্পদগুলোকে নিশ্চিহ্ন করে দিন এবং তাদের

٨٨- وَقَالَ مُوْسٰى رَبَّنَآ اِنَّكَ
اٰتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَاَهٗ زِيْنَةً
وَّاَمْوَالًا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا لا
رَبَّنَا لِيُضِلُّوْا عَنْ سَبِيْلِكَ رَبَّنَا
اطْمِسْ عَلٰٓى اَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ

عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ۝

অন্তরসমূহকে কঠিন করুন, যাতে তারা ঈমান না আনতে পারে এই পর্যন্ত যে, তারা যন্ত্রণাময় আযাবকে দেখে নেয়।

৮৯- قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَّعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَنِّ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۝

৮৯। তিনি (আল্লাহ) বললেন– তোমাদের উভয়ের দুআ' কবূল করা হলো, অতএব তোমরা দৃঢ় থাকো, আর তাদের পথ অনুসরণ করো না যাদের জ্ঞান নেই।

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, ফিরআউন ও তার দলবল যখন সত্যকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করলো এবং নিজেদের ভ্রান্তি ও কুফরীর উপরই কায়েম থাকলো এবং যুলুম ও ঔদ্ধত্যপনা অবলম্বন করলো, তখন মূসা (আঃ) আল্লাহকে বললেনঃ “হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি ফিরআউন ও তার লোকদেরকে দুনিয়ার শান-শওকত এবং প্রচুর ধন-সম্পদ দান করেছেন। এর ফলে তো তারা আরো পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে এবং অন্যদেরকে পথভ্রষ্ট করে দেবে।” لِيَضِلُّوا অর্থাৎ ى-কে যবর দিয়ে পড়লে অর্থ হবে– হে আল্লাহ! আপনি ফিরআউনকে এই নিয়ামতগুলো দিয়ে রেখেছেন অথচ আপনি জানেন যে, সে ঈমান আনবে না। সুতরাং সে নিজেই পথভ্রষ্ট হবে। আর لِيُضِلُّوا অর্থাৎ ى -কে পেশ দিয়ে পড়লে অর্থ হবে– হে আল্লাহ! আপনার ফিরআউনকে দেয়া নিয়ামতগুলো দেখে লোকেরা ধারণা করবে যে, আপনি থাকে ভালবাসেন। আপনি যখন তাকে সুখে শান্তিতে রেখেছেন, তখন ফল যেন এটাই দাঁড়াবে যে, লোকেরা বিভ্রান্ত হয়ে পড়বে। সুতরাং হে আল্লাহ! তাদের ধন-সম্পদকে ধ্বংস করে দিন।

যহ্হাক (রঃ), আবুল আলিয়া (রঃ) প্রমুখ গুরুজন বলেন যে, এরপরে আল্লাহ তা'আলা ফিরআউনের মালধনকে পাথরে পরিণত করেছিলেন। কাতাদা (রঃ) বলেনঃ “আমরা জানতে পেরেছি যে, তার ফসলও পাথরের আকার ধারণ করেছিল এবং চিনি ইত্যাদিও কুচি পাথরে পরিণত হয়েছিল।

মুহাম্মাদ ইবনে কা'ব (রঃ) উমার ইবনে আবদিল আযীয (রঃ)-এর সামনে সূরায়ে ইউনুস পাঠ করেন। যখন তিনি এই আয়াতে পৌঁছেন رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَىٰٓ أَمْوَالِهِمْ তখন উমার (রঃ) বলেনঃ " হে আবূ হামযা! طَمْس কি জিনিস?" আবূ হামযা উত্তরে বললেনঃ "তাদের মালধন ও আসবাবপত্র পাথরে পরিণত হয়েছিল।" তখন উমার ইবনে আবদুল আযীয (রঃ) স্বীয় গোলামকে বললেনঃ "থলেটি নিয়ে এসো।" সে থলেটি নিয়ে আসলো যাতে ছোলা ও ডিম রাখা ছিল। দেখা গেল যে. সেগুলো পাথরে পরিণত হয়েছে।

আল্লাহ পাকের উক্তিঃ وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ এটা মহান আল্লাহ মূসা (আঃ)-এর উক্তি নকল করেছেন। তিনি বললেনঃ "হে আল্লাহ! আপনি তাদের অন্তরসমূহে মোহর লাগিয়ে দেন, যেন তারা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি না দেখা পর্যন্ত ঈমান আনয়ন না করে।" মূসা (আঃ) ক্রোধান্বিত হয়ে ফিরআউন ও তার কওমের বিরুদ্ধে এই দুআ' করেছিলেন। এই ব্যাপারে মূসা (আঃ)-এর দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছিল যে, তাদের মধ্যে সংশোধনের কোন যোগ্যতাই নেই। কাজেই তাদের নিকট থেকে কল্যাণের কোন আশাই করা যায় না। যেমন নূহ (আঃ) বলেছিলেনঃ

رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا....

অর্থাৎ "হে আমার প্রতিপালক! কাফিরদের মধ্য হতে যমীনের উপর একজনকেও অবশিষ্ট রাখবেন না। যদি আপনি তাদেরকে ভূ-পৃষ্ঠে থাকতে দেন, তবে তারা আপনার বান্দাদেরকে বিভ্রান্তই করবে এবং তাদের শুধু দুষ্কার্যকারী ও কাফির সন্তানই ভূমিষ্ট হবে।" (৭১ঃ ২৬) এ জন্যেই আল্লাহ তা'আলা মূসা (আঃ)-এর প্রার্থনা কবূল করে নেন এবং তাঁর ভাই হারূন (আঃ) তাতে আমীন বলেন। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন, তোমাদের দু'জনের প্রার্থনা কবূল করা হলো এবং ফিরআউনীদের ধ্বংস করে দেয়া হচ্ছে। এ আয়াতটি এটাই প্রমাণ করছে যে, যদি মুকতাদী ইমামের সূরা ফাতিহার কিরআতের উপর আমীন বলে, তবে সেও স্বয়ং সূরায়ে ফাতিহা পাঠকারী বলে গণ্য হবে।

মহান আল্লাহর উক্তিঃ فَاسْتَقِيمَا অর্থাৎ হে মূসা (আঃ) ও হারূন (আঃ)! যেমন তোমাদের প্রার্থনা কবূল করা হলো, তেমনই তোমরাও আমার হুকুমের উপর সোজা ও দৃঢ় থাকো এবং তা কার্যকরী কর। اِسْتِقَامَتْ বলে এটাকেই। কথিত আছে যে, এই প্রার্থনার চল্লিশ বছর পর ফিরআউনকে ধ্বংস করা হয়। আবার কেউ কেউ বলেন যে, এই প্রার্থনার চল্লিশ দিন পরেই সে ধ্বংস হয়েছিল।

٩٠- وَجٰوَزْنَا بِبَنِيْٓ اِسْرَآئِيْلَ الْبَحْرَ فَاَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُوْدُهٗ بَغْيًا وَّعَدْوًا ؕ حَتّٰٓى اِذَآ اَدْرَكَهُ الْغَرَقُ ۙ قَالَ اٰمَنْتُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا الَّذِيْٓ اٰمَنَتْ بِهٖ بَنُوْٓا اِسْرَآئِيْلَ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ○

৯০। আর আমি বানী ইসরাঈলকে সমুদ্র পার করে দিলাম, অতঃপর ফিরআউন তার সৈন্যদলসহ তাদের পশ্চাদানুসরণ করলো যুলুম ও নির্যাতনের উদ্দেশ্যে, এমন কি যখন সে নিমজ্জিত হতে লাগলো, তখন বলতে লাগলো– আমি ঈমান আনছি বানী ইসরাঈল যাঁর উপর ঈমান এনেছে, তিনি ছাড়া অন্য কোন মা'বূদ নেই এবং আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছি।

٩١- آٰلْـٰٔنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ ○

৯১। এখন ঈমান আনছো? অথচ পূর্ব (মুহূর্ত) পর্যন্ত তুমি নাফরমানী করছিলে এবং ফাসাদীদের অন্তর্ভুক্ত রয়েছিলে।

٩٢- فَالْيَوْمَ نُنَجِّيْكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُوْنَ لِمَنْ خَلْفَكَ اٰيَةً ؕ وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ اٰيٰتِنَا لَغٰفِلُوْنَ ○ ع

৯২। অতএব, আমি আজ তোমার লাশকে উদ্ধার করবো, যেন তুমি তোমার পরবর্তী লোকদের জন্যে উপদেশ গ্রহণের উপকরণ হয়ে থাকো; আর প্রকৃতপক্ষে অনেক লোক আমার উপদেশাবলী হতে উদাসীন রয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা ফিরআউন ও তার লোক লশকরের নদীতে নিমজ্জিত হওয়ার বর্ণনা দিচ্ছেন। বানী ইসরাঈল যখন মূসা (আঃ)-এর সাথে মিসর হতে যাত্রা শুরু করে তখন তাদের সংখ্যা ছিল ছয় লাখ। ফিরআউনের লোকদের মধ্যে

যে কয়েকজন ঈমান এনেছিল তারা এদের সাথে ছিল না। বানী ইসরাঈল ফিরআউনের কওম কিবতীদের নিকট থেকে বহু সংখ্যক অলংকার ঋণ স্বরূপ নিয়েছিল এবং সেগুলো নিয়েই তারা মিসর হতে বেরিয়ে পড়ে। ফলে ফিরআউনের ক্রোধ খুবই বেড়ে যায়। তাই সে তার কর্মচারীদেরকে তার দেশের প্রতিটি অঞ্চলে এই নির্দেশ দিয়ে প্রেরণ করে যে, তারা যেন একটি বিরাট বাহিনী গঠন করে। সুতরাং তার আদেশ মোতাবেক এক বিরাট বাহিনী গঠিত হয় এবং তা নিয়ে সে বানী ইসরাঈলের পশ্চাদ্ধাবন করে। আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্য ছিল এটাই। অতএব, ফিরআউনের রাজ্যে যতগুলো ধনাঢ্য ও সম্পদশালী লোক ছিল কেউই তার সেনাবাহিনীতে যোগদান থেকে বাদ পড়লো না। তারা সবাই ফিরআউনের সাথে বেরিয়ে পড়লো। সকালেই তারা বানী ইসরাঈলের নাগাল পেয়ে গেল। উভয় দলের মধ্যে যখন একে অপরকে দেখে নিলো, তখন মূসা (আঃ)-এর সঙ্গীরা তাঁকে ডাক দিয়ে বললোঃ "হে মূসা (আঃ)! আমরা তো প্রায় ধরা পড়েই গেলাম।" এটা ছিল ঐ সময়ের ঘটনা যখন বানী ইসরাঈল নদীর তীরে পৌঁছে গিয়েছিল এবং ফিরআউন ও তার বাহিনী তাদের পিছনেই ছিল। উভয় দল এমন পর্যায়ে এসে পড়েছিল যে, তাদের মধ্যে প্রায় টক্কর লেগেই যাবে। মূসা (আঃ)-এর লোকেরা তাঁকে বারবার বলতে লাগলোঃ "এখন উপায় কি হবে? ফিরআউনের দলবল থেকে আমরা কিরূপে বাঁচতে পারি? সম্মুখে নদী এবং পিছনে শত্রু!" মূসা (আঃ) বললেনঃ "আমাকে তো এই নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, আমি যেন নদীতে রাস্তা করে দেই। আমরা কখনো ধরা পড়বো না। আমার প্রতিপালকই আমার পরিচালক। যখন নৈরাশ্য শেষ সীমায় পৌঁছে গেল তখন মহান আল্লাহ নৈরাশ্যকে আশায় পরিবর্তিত করলেন। মূসা (আঃ)-কে তিনি হুকুম করলেনঃ "তোমার লাঠি দ্বারা নদীর পানিতে আঘাত কর।" মূসা (আঃ) তাই করলেন। তখন নদীর পানি পেটে গেল। পানির প্রতিটি খণ্ড এক একটি উঁচু পাহাড়ের রূপ ধারণ করলো। নদীতে বারোটি রাস্তা হয়ে গেল। প্রত্যেক দলের জন্যে হয়ে গেল একটি করে রাস্তা। নদীর মধ্যভাগের সিক্ত মাটিকে শুষ্ক হাওয়া তৎক্ষণাৎ শুকিয়ে দিল। ফলে রাস্তা চলাচলের যোগ্য হয়ে গেল। নদীর রাস্তা সম্পূর্ণরূপে শুকিয়ে গেল। এখন না থাকলো ধরা পড়ার ভয় এবং না থাকলো ডুবে যাওয়ার আশংকা। নদীর পানির প্রাচীরের মধ্যে জানালা হয়ে গিয়েছিল, যাতে প্রতিটি পথের লোক অন্য লোককে দেখতে পায় এবং নিশ্চিত হতে পারে যে, অন্যেরা ধ্বংস হয়ে যায়নি। এভাবে বানী ইসরাঈল নদী পার হয়ে গেল। তাদের শেষ দলটিও যখন নদী পার হয়ে গেল, তখন

ফিরআউনের লোক লশকর নদীর এপারে পৌঁছে গেছে। ফিরআউনের এই সেনাবাহিনীতে শুধু এক লাখ কালো ঘোড়ার আরোহী ছিল। অন্যান্য রং এর অশ্বারোহী তো ছিলই। এর দ্বারা ফিরআউনের সৈন্য সংখ্যার আধিক্যের কিছুটা অনুমান করা যেতে পারে। ফিরআউন এই ভয়াবহ অবস্থা দেখে ভীষণ আতংকিত হয়ে উঠলো এবং ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা করলো। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, তখন আর মুক্তি লাভের সুযোগ ছিল না। তার ভাগ্যে যা ঘটবার ছিল, তা ঘটে যাওয়ার সময় এসেই পড়েছিল। মূসা (আঃ)-এর দুআ' কবূল হয়ে গিয়েছিল। জিবরাঈল (আঃ) একটি ঘোটকীর উপর সওয়ার ছিলেন। তিনি ফিরআউনের ঘোটকের পার্শ্ব দিয়ে গমন করলেন। তাঁর ঘোটকীকে দেখে ফিরআউনের ঘোড়াটি চিঁহি চিঁহি শব্দ করে উঠলো। জিবরাঈল (আঃ) তাঁর ঘোটকীকে নদীতে নামিয়ে দিলেন এবং তা দেখে ঘোড়াটিও নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়লো। ফিরআউন ওকে থামিয়ে রাখতে পারলো না। বাধ্য হয়ে তাকে নদীতে নামতেই হলো। সে তখন তার বীরত্ব প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে তার সেনাবাহিনীকে উত্তেজিত করে বললোঃ “বানী ইসরাঈল আমাদের চেয়ে নদীর মধ্যে প্রবেশ করার বেশী হকদার নয়। সুতরাং তোমরা সবাই নদীতে প্রবেশ কর। রাস্তা তো বানানোই রয়েছে।” তার এই উত্তেজনাপূর্ণ ভাষণ শুনে তার সেনাবাহিনী নদীতে নেমে পড়লো। মীকাঈল (আঃ) তাদের সবারই পিছনে ছিলেন এবং তাদেরকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন এবং তাদেরকে এভাবে সামনের দিকে এগিয়ে দিচ্ছিলেন। সবাই যখন নদীর মধ্যে প্রবেশ করলো এবং বানী ইসরাঈল সব পার হয়ে গেল, তখন আল্লাহ তা'আলা নদীকে পরস্পর মিলিয়ে দিলেন। এখন ফিরআউন এবং তার দলবলের কেউই বাঁচলো না। তরঙ্গ উঁচু নীচু হচ্ছিল এবং সেখানে মহাপ্রলয় শুরু হয়ে গিয়েছিল। ফিরআউনের উপর মৃত্যুযন্ত্রণা শুরু হয়েছিল। ঐ সময় সে বলে উঠলোঃ “আমি এখন ঈমান আনছি।” কিন্তু বড়ই আফসোস যে, সে এমন সময় ঈমান আনলো, যখন ঈমান আনয়নে কোনই উপকার ছিল না। আল্লাহ পাক বলেনঃ “সে যখন আমার আযাব আসতে দেখল, তখন বলে উঠলো— আমি এক আল্লাহর উপর ঈমান আনলাম এবং কুফর ও শিরক পরিহার করলাম। কিন্তু আমার শাস্তি দেখার পর ঈমান আনয়নে কোনই লাভ হয় না। আল্লাহ তা'আলার নীতি এটাই। কাফিররা ক্ষতিগ্রস্ত হবেই।” তাই ফিরআউনের এ কথার উত্তরে আল্লাহ তা'আলা বললেনঃ “তুমি এখন ঈমান আনছো? অথচ পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত তুমি নাফরমানীই করছিলে এবং ফাসাদীদের অন্তর্ভুক্ত রয়েছিলে।” সে লোকদেরকে পথভ্রষ্ট করছিল। সে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে জনগণের নেতৃত্ব দিচ্ছিল। সুতরাং এখন তাকে মোটেই সাহায্য করা হবে না।

আল্লাহ তা'আলা ফিরআউনের اٰمَنْتُ بِرَبِّ مُوْسٰى-এ কথাটি স্বীয় নবী (সঃ)-এর নিকট বর্ণনা করেন। এটা ছিল ঐ গায়েবের কথাগুলোর অন্তর্ভুক্ত যার খবর তিনি একমাত্র তাঁকেই দিয়েছিলেন। এ জন্যেই রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, যখন ফিরআউন ঈমানের কালেমাটি মুখে উচ্চারণ করে তখনকার কথা জিবরাঈল (আঃ) আমার নিকট বর্ণনা করেনঃ " হে আল্লাহর নবী (সঃ)! আমি নদীর কাদা নিয়ে ফিরআউনের মুখের ভিতর ঢুকিয়ে দিয়েছিলাম এই ভয়ে যে, হয়তোবা আল্লাহর রহমত তাঁর গযবের উপর জয়লাভ করবে।"[১] আবূ হুরাইরা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে আছে যে, জিবরাঈল (আঃ) রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলেনঃ "হে মুহাম্মাদ (সঃ)! আপনি যদি সেই সময় আমাকে দেখতেন, তবে দেখতে পেতেন যে, ঐ সময় আমি ফিরআউনের মুখের মধ্যে কাদা ভরে দিচ্ছিলাম এই ভয়ে যে, আল্লাহর রহমত তাকে পেয়ে বসে, সুতরাং তিনি হয়তো তাকে ক্ষমা করে দেন।"[২]

আল্লাহ তা'আলার উক্তিঃ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيْكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُوْنَ لِمَنْ خَلْفَكَ اٰيَةً অর্থাৎ "অতএব, আজ আমি তোমার মৃতদেহকে উদ্ধার করবো, যেন তুমি তোমার পরবর্তী লোকদের জন্যে উপদেশ গ্রহণের উপকরণ হয়ে থাকো।" ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, বানী ইসরাঈলের কতকগুলো লোক ফিরআউনের মৃত্যুর ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করেছিল। তখন আল্লাহ তা'আলা দরিয়াকে আদেশ করলেন যে, সে যেন ফিরআউনের পোশাক পরিহিত আত্মাহীন দেহকে যমীনের কোন টিলার উপর নিক্ষেপ করে, যাতে জনগণের কাছে ফিরআউনের মৃত্যুর সত্যতা প্রমাণিত হয়। অর্থাৎ তারা যেন বুঝতে পারে যে, ওটা হচ্ছে ফিরআউনের আত্মাবিহীন দেহ।

মহান আল্লাহর উক্তিঃ وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ اٰيٰتِنَا لَغٰفِلُوْنَ অর্থাৎ "প্রকৃতপক্ষে অনেক লোক আমার উপদেশাবলী হতে উদাসীন রয়েছে।" অর্থাৎ অধিকাংশ লোক আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনাবলী থেকে উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণ করে না। কথিত আছে যে, এই ধ্বংস কার্য সংঘটিত হয়েছিল আশুরার দিন (১০ই মুহাররাম)। নবী (সঃ) যখন হিজরত করে মদীনায় আগমন করেন তখন তিনি দেখলেন যে, ইয়াহূদীরা ঐ দিন রোযা রেখে থাকে। তিনি তাদেরকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তারা বলেঃ "এই দিনে মূসা (আঃ) ফিরআউনের উপর জয়যুক্ত হয়েছিলেন।" তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) সাহাবীদেরকে বললেনঃ "হে লোক সকল! তোমরা ইয়াহূদীদের চাইতে এই রোযা রাখার বেশী হকদার। সুতরাং তোমরা আশুরার দিনে রোযা রাখবে।"

---

১. এ হাদীসটি ইবনে আবি হাতিম (রঃ) ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন।
২. এ হাদীসটি ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন।

৯৩। আর আমি বানী ইসরাঈলকে থাকবার জন্যে অতি উত্তম বাসস্থান প্রদান করলাম, আর আমি তাদেরকে আহার করবার জন্যে উৎকৃষ্ট বস্তুসমূহ দান করলাম, সুতরাং তারা মতভেদ করেনি এই পর্যন্ত যে, তাদের নিকট (আহকামের) জ্ঞান পৌঁছলো (অতঃপর তারা মতভেদ করলো); নিঃসন্দেহে তোমার প্রতিপালক কিয়ামত দিবসে তাদের মধ্যে সেই সব বিষয়ের মীমাংসা করবেন, যাতে তারা মতভেদ করছিল।

٩٣- وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِيٓ إِسْرَآءِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنٰهُم مِّنَ الطَّيِّبٰتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتّٰى جَآءَهُمُ الْعِلْمُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ○

আল্লাহ তা'আলা বানী ইসরাঈলের উপর ইহলৌকিক ও পারলৌকিক নিয়ামতের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেনঃ আমি তাদেরকে বসবাসের জন্যে উত্তম জায়গা দান করেছি। অর্থাৎ মিসর ও সিরিয়া, যা বায়তুল মুকাদ্দাসের নিকটেই অবস্থিত। আল্লাহ তা'আলা যখন ফিরআউন ও তার দলবলকে ধ্বংস করে দেন তখন তিনি মিসরের উপর মূসা (আঃ)-এর শাসন পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন। যেমন আল্লাহ পাক বলেনঃ "আর আমি সেই লোকদেরকে, যারা অতিশয় দুর্বল বিবেচিত হতো, সেই ভূখণ্ডের পূর্ব ও পশ্চিমের উত্তরাধিকারী করে দিলাম যাতে আমি (যাহেরী ও বাতেনী) বরকত রেখেছি; আর তোমার প্রতিপালকের মঙ্গলকর অঙ্গীকার বানী ইসরাঈলের প্রতি পূর্ণ হলো তাদের ধৈর্যধারণের কারণে, আর আমি ধ্বংস করে দিলাম ফিরআউন ও তার সম্প্রদায়ের তৈরী কারখানাসমূহ এবং যেসব সুউচ্চ প্রাসাদ তারা নির্মাণ করতো।" অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক বলেনঃ "অবশেষে আমি তাদেরকে (ফিরআউন ও তার কওমকে) বাগানসমূহ ও ঝর্ণাসমূহ হতে বের করে দিলাম। আর ধন-ভাণ্ডারসমূহ এবং উত্তম প্রাসাদ হতেও। (আমি) এইরূপ করলাম; আর তাদের পরে বানী ইসরাঈলকে তৎসমুদয়ের মালিক করে দিলাম।" মহান আল্লাহ আরো বলেনঃ "তারা ছেড়ে গিয়েছিল কতই না উদ্যান ও ঝর্ণাসমূহ!"

বানী ইসরাঈল কিন্তু মূসা (আঃ)-এর কাছে বায়তুল মুকাদ্দাস শহরের জন্যে আবেদন জানায়, যা ইবরাহীম খলীল (আঃ)-এর বাসভূমি ছিল। ঐ সময় বায়তুল মুকাদ্দাস 'আমালেকা' সম্প্রদায়ের অধিকারভুক্ত ছিল। বানী ইসরাঈলকে তাদের সাথে যুদ্ধ করতে বলা হলে তারা অস্বীকার করে বসে। আল্লাহ্ পাক তখন তাদেরকে 'তীহ' ময়দানে হারিয়ে দেন। চল্লিশ বছর ধরে তারা সেখানে উদ্ভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায়। এর মধ্যে হারূন (আঃ) ইন্তেকাল করেন এবং পরে মূসাও (আঃ) মৃত্যুমুখে পতিত হন। অতঃপর বানী ইসরাঈল ইউশা ইবেন নূন (আঃ)-এর সাথে তীহের ময়দান হতে বেরিয়ে পড়েন এবং তাঁর হাতে আল্লাহ তা'আলা বায়তুল মুকাদ্দাস বিজিত করেন। কিছুকাল এটা তাঁর অধিকারে থাকে। তারপর 'বাখতে নাসার' তা দখল করে নেয়। এরপর ইউনানী রাজাদের ওর উপর আধিপত্য লাভ হয়। বহুদিন পর্যন্ত ওর উপর এদের শাসন চলতে থাকে। এই সময়ের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা ঈসা ইবনে মারইয়াম (আঃ)-কে সেখানে পাঠিয়ে দেন। ইয়াহূদীরা ঈসা (আঃ)-এর সাথে খুবই দুর্ব্যবহার করে এবং রটনা করে যে, তিনি জনগণের মধ্যে ফিৎনা ফাসাদ সৃষ্টি করছেন। ইউনানী বাদশাহ তাঁকে ধরে শূলে দেয়ার ইচ্ছা করে। কিন্তু মহান আল্লাহর ইচ্ছায় একজন হাওয়ারীকে ঈসা (আঃ) মনে করে তারা তাকে ধরে শূলে চড়িয়ে দেয়। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "প্রকৃতপক্ষে তারা তাকে হত্যা করেনি বরং আল্লাহ তাকে তাঁর কাছে উঠিয়ে নিয়েছেন এবং আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, বিজ্ঞানময়।" অতঃপর ঈসা (আঃ)-এর প্রায় তিনশ' বছর পর 'কুসতুনতীন' নামক একজন ইউনানী বাদশাহ খ্রীষ্টান ধর্ম কবূল করে। কিন্তু সে ছিল একজন দার্শনিক। কেউ বলে যে, ভয়ে সে খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিল, আবার একথাও বলা হয়েছে যে, ঈসা (আঃ)-এর ধর্মে ফিৎনা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে বাহানা করে সে খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিল। খ্রীষ্টান পাদ্রীরা তার নির্দেশক্রমে শরীয়তের নতুন নতুন আইন তৈরী করে নেয়, বিদআত ছড়িয়ে দেয়, ছোট বড় গীর্জা ও ইবাদতখানা নির্মাণ করে এবং প্রতিমা ও মূর্তি বানিয়ে নেয়। ঐ সময় খ্রীষ্টান ধর্ম ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে এবং তাতে বহু পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হতে থাকে। সন্যাসীত্ব ও বৈরাগ্য সৃষ্টি হয়ে গেল এবং ঈসা (আঃ)-এর সত্য ধর্মের বিরোধিতা শুরু হয়ে গেল। প্রকৃত ধর্ম শুধুমাত্র কয়েকজন ধার্মিক লোকের মধ্যেই অবশিষ্ট থাকলো। এখন এরাও বৈরাগীদের আকারে জঙ্গলে ও প্রান্তরে গীর্জা তৈরী করে থাকতে লাগলো। সিরিয়া, জাযীরা এবং রোম দেশের উপর খ্রীষ্টানদের প্রতিপ্রত্তি জমে গেল। ঐ সম্রাটই (কুসতুনতীন) কুসতুনতুনিয়া (কনস্টান্টিনোপল) ও কামামা শহর স্থাপন করলো। বায়তুল মুকাদ্দাসের মধ্যে 'বায়তুল লাহাম' ও গীর্জা নির্মাণ করলো এবং হাওরানের শহর স্থাপন করলো, যেমন বুসরা ইত্যাদি। সে বড় বড় ও

মজবুত অট্টালিকাসমূহ নির্মাণ করলো। এখান থেকেই ক্রুশ-পূজার সূচনা হয়, যা সুদূর প্রাচ্য পর্যন্ত পৌঁছে যায়। ওখানেও গীর্জা নির্মাণ করা হয়। তারা শূকরের মাংস হালাল করে নেয়। দ্বীনের মূল ও শাখার মধ্যে অদ্ভুত অদ্ভুত বিদআত সৃষ্টি হয়। বাদশাহর নির্দেশক্রমে শরীয়তের নতুন নতুন বিধান বানিয়ে নেয়া হয়। এর ব্যাখ্যা খুবই দীর্ঘ। মোটকথা, ঐ শহরগুলোর উপর তাদের কর্তৃত্ব সাহাবীদের যুগ পর্যন্ত চলতে থাকে। অবশেষে বায়তুল মুকাদ্দাস উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ)-এর হাতে বিজিত হয়। সুতরাং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্য।

আল্লাহ পাক বলেন, আমি তাদেরকে আহার করবার জন্যে উৎকৃষ্ট বস্তুসমূহ দান করেছি। কিন্তু মাযহাব সম্পর্কে জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও তারা ঐ ব্যাপারে মতভেদ করতে থাকে। অথচ মাযহাব সম্পর্কে মতভেদ সৃষ্টি করার কোনই কারণ ছিল না। আল্লাহ তা'আলা তো সমস্ত কথাই অতি সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দিয়েছিলেন।

হাদীসে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "ইয়াহূদীরা একাত্তরটি দল বানিয়ে নিয়েছিল, আর খ্রীষ্টানরা বানিয়ে নিয়েছিল বাহাত্তরটি দল। আমার উম্মত তেহাত্তরটি দল বানিয়ে নেবে। ওগুলোর মধ্যে শুধু একটি দল মুক্তিপ্রাপ্ত হবে এবং বাকী সবগুলোই হবে জাহান্নামী। জিজ্ঞেস করা হলোঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! ঐ একটি দল কোনটি?" তিনি উত্তরে বললেনঃ "যার উপর আমি ও আমার সাহাবীবর্গ রয়েছি।"[১]

আল্লাহ তা'আলা বলেন, নিশ্চয়ই আমি কিয়ামতের দিন ঐ সব বিষয়ের উপর মীমাংসা করবো, যে বিষয়ে তারা মতভেদ করছিল।

৯৪। অতঃপর (হে নবী!) যদি তুমি এই (কিতাব) সম্পর্কে সন্দিহান হও, যা আমি তোমার নিকট পাঠিয়েছি, তবে তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করে দেখো, যারা তোমার পূর্বেকার কিতাবসমূহ পাঠ করে, নিঃসন্দেহে তোমার নিকট এসেছে তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে সত্য কিতাব, সুতরাং তুমি কখনই সংশয়ীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।

٩٤- فَاِنْ كُنْتَ فِىْ شَكٍّ مِّمَّاۤ اَنْزَلْنَاۤ اِلَيْكَ فَسْئَلِ الَّذِيْنَ يَقْرَءُوْنَ الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَآءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ ○

---

১. এ হাদীসটি ইমাম হাকিম (রঃ) তাঁর 'মুসতাদরিক' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

৯৫। আর ঐ সব লোকেরও অন্তর্ভুক্ত হয়ো না, যারা আল্লাহর আয়াতগুলোকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, যেন তুমি ধ্বংস হয়ে না যাও।

৯৫- وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخٰسِرِينَ ○

৯৬। নিঃসন্দেহে যাদের সম্বন্ধে তোমার প্রতিপালকের বাক্য সাব্যস্ত হয়ে গিয়েছে, তারা কখনো ঈমান আনবে না।

৯৬- إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ○

৯৭। যদিও তাদের নিকট সমস্ত প্রমাণ পৌঁছে যায়, যে পর্যন্ত না তারা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেখে নেয় (কিন্তু তখন ঈমান আনা বৃথা)।

৯৭- وَلَوْ جَآءَتْهُمْ كُلُّ اٰيَةٍ حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ ○

কাতাদা ইবনে দআমা (রঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)! বলেছেনঃ “আমি সন্দেহও করি না এবং আমার জিজ্ঞেস করার কোন প্রয়োজনও নেই।” এই আয়াতে উম্মতে মুহাম্মাদীকে দ্বীনের উপর অটল থাকার প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। এতে জানানো হয়েছে যে, পূর্ববর্তী আসমানী গ্রন্থ তাওরাত, ইঞ্জীলে নবী (সঃ)-এর গুণাবলীর বর্ণনা বিদ্যমান ছিল। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ “যারা নবী উম্মী (সঃ)-এর আনুগত্য করে, তারা এর উপর ভিত্তি করেই করে যে, তাঁর গুণাবলীর বর্ণনা তারা তাওরাত ও ইঞ্জীলে লিখিত পেয়ে থাকে।” কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোক তাঁর উপর ঈমান আনয়ন করে না, অথচ তারা তাঁর সত্যবাদিতা ও সততাকে এমনভাবে জানে ও চিনে, যেমনভাবে চিনে নিজেদের সন্তানদেরকে। তারা ইঞ্জীলের মধ্যে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে এবং নবী (সঃ)-এর গুণাবলী গোপন করে দেয়। হুজ্জত কায়েম হওয়ার পরেও তারা ঈমান আনে না। এ জন্যেই আল্লাহ পাক বলেনঃ “সত্যের প্রমাণাদি কায়েম হয়ে গেছে, কিন্তু যতই প্রমাণ তাদের কাছে উপস্থিত করা হোক না কেন, তারা ঐ পর্যন্ত ঈমান আনবে না, যে পর্যন্ত না আল্লাহর আযাব অবলোকন করে। কিন্তু ঐ সময় তাদের ঈমান আনয়নে কোনই লাভ হবে না। কওমের এই পর্যায়ে পৌঁছে যাওয়ার পরই মূসা (আঃ) তাদের উপর বদ দুআ' করেছিলেন। তিনি বলেছিলেনঃ “হে আমার

প্রতিপালক! তাদের ধন-সম্পদ ধ্বংস করে দিন এবং তাদের অন্তরসমূহের উপর মোহর লাগিয়ে দিন। শাস্তি দেখা ছাড়া তারা ঈমান আনবে না।” অনুরূপভাবে আল্লাহ পাকের উক্তি রয়েছে– “আমি যদি তাদের উপর ফিরিশ্তাও অবতীর্ণ করি এবং মৃত লোকেরা তাদের সাথে কথাও বলতে থাকে, আর সমস্তই যদি তাদের কাছে জমা করে দেয়া হয়, তবুও তারা ঈমান আনবে না। তাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই অজ্ঞ।

৯৮- فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ اٰمَنَتْ فَنَفَعَهَآ اِيْمَانُهَآ اِلَّا قَوْمَ يُوْنُسَ لَمَّآ اٰمَنُوْا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنٰهُمْ اِلٰى حِيْنٍ ○

৯৮। সুতরাং এমন কোন জনপদই ঈমান আনেনি যে, তাদের ঈমান আনয়ন উপকারী হয়েছে, ইউনুসের কওম ছাড়া, যখন তারা ঈমান আনলো, তখন আমি তাদের থেকে পার্থিব জীবনে অপমানজনক শাস্তি বিদূরিত করে দিলাম এবং তাদেরকে সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে থাকতে দিলাম এক নির্ধারিত কাল পর্যন্ত।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, পূর্ববর্তী উম্মতদের কোন উম্মতেরই সমস্ত লোক ঈমান আনেনি, যাদের কাছে আমি নবী পাঠিয়েছিলাম। হে মুহাম্মাদ (সঃ)! তোমার পূর্বে যত নবী এসেছিল, সকলকেই মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হয়েছিল। যেমন আল্লাহ পাকের উক্তিঃ “আফসোস বান্দাদের উপর! তাদের কাছে কখনো এমন কোন রাসূল আসেনি যাকে তারা বিদ্রূপ না করেছে।” আল্লাহ তা'আলা আর এক জায়গায় বলেছেনঃ “তাদের পূর্বে যাদের কাছেই কোন রাসূল এসেছে, তাকেই তারা যাদুকর অথবা পাগল বলেছে।” অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেনঃ “তোমার পূর্বে যে গ্রামেই আমি কোন রাসূল পাঠিয়েছি, সেখানকারই স্বচ্ছল লোকেরা বলেছে– আমরা তো আমাদের বাপ-দাদাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলবো।”

সহীহ হাদীসে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “নবীদেরকে আমার সামনে পেশ করা হয়। কোন নবীর সাথে ছিল বড় বড় উম্মতের দল। আবার কোন নবীর সাথে ছিল একটিমাত্র লোক, কোন নবীর সাথে ছিল দু'টি লোক এবং কোন নবীর সাথে একটি লোকও ছিল না।” অতঃপর তিনি মূসা (আঃ)-এর

উম্মতের আধিক্যের বর্ণনা দেন। তারপর তিনি নিজের উম্মতের আধিক্যের বর্ণনা দেন, যারা পূর্ব ও পশ্চিমকে ঢেকে নিয়েছিল। মোটকথা ইউনুস (আঃ)-এর কওম ছাড়া কোন নবীরই কওমের সমস্ত লোক ঈমান আনেনি। ইউনুস (আঃ)-এর কওম ছিল নিনওয়া গ্রামের অধিবাসী। আল্লাহর আযাব দেখার পর ভয়ে তারা ঈমান এনেছিল। আল্লাহ তা'আলার আযাব হতে ভয় প্রদর্শন করে নবী ইউনুস (আঃ) নিজেও কওমের মধ্য হতে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। তখন ঐ লোকগুলোর খুবই দুঃখ হলো। তারা আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করলো এবং অত্যন্ত কান্নাকাটি করলো। নিজেদের শিশু ও গৃহপালিত পশুগুলোকে নিয়ে মাঠের দিকে গেল এবং মহান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করলোঃ "হে আল্লাহ! আপনার নবী যে আযাবের খবর দিয়ে আমাদের মধ্য থেকে বেরিয়ে গেছেন তা দূর করে দিন।" ঐ সময় আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি সদয় হন এবং যে আযাব সামনে এসে গিয়েছিল তা সরিয়ে নেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "ইউনুস (আঃ)-এর কওম যখন ঈমান আনলো, তখন পার্থিব জীবনে আগত আযাব আমি তাদের উপর থেকে সরিয়ে দিলাম এবং তাদের জীবনকাল পর্যন্ত ঐ আযাব থেকে তাদেরকে বাঁচিয়ে নিলাম।"

ইউনুস (আঃ)-এর কওমের উপর থেকে শুধুমাত্র পার্থিব জীবনের আযাব সরেছিল কি পারলৌকিক আযাবও সরেছিল এ ব্যাপারে মুফাসসিরদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। কেউ কেউ বলেন যে, শুধুমাত্র পার্থিব জীবনের শাস্তি সরেছিল। কেননা, এই আয়াতে শুধু এর উপরই আলোকপাত করা হয়েছে। আবার অন্য কেউ কেউ বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ "আমি নবীকে এক লক্ষাধিক লোকের কাছে পাঠিয়েছিলাম। তারা ঈমান আনয়ন করে। তখন আমি একটা নির্দিষ্ট সময়কাল পর্যন্ত তাদেরকে লাভবান করি।" এখানে ঈমান শব্দটি মুতলক বা সাধারণ। এখানে কোন কয়েদ বা বাধ্যাবাধকতা নেই। আর মুতলক ঈমান তো পারলৌকিক শাস্তি থেকে মুক্তিদানকারী হয়ে থাকে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক জ্ঞানের অধিকারী।

কাতাদা (রঃ) এই আয়াতের তাফসীরে লিখেছেন যে, আযাব এসে যাওয়ার পর কোন কওম ঈমান আনলে তাকে ছেড়ে দেয়া হয় না। কিন্তু ইউনুস (আঃ) যখন নিজের কওমকে ছেড়ে চলে গেলেন এবং লোকেরা বুঝতে পারলো যে, এখন আযাব থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে না তখন তাদের অন্তরে তাওবার অনুভূতি জেগে উঠলো। তারা খারাপ কাপড় পরিধান করে নিজেদের অবস্থা খারাপ করে

নিলো। অতঃপর তারা পশুগুলোর দল এবং শিশুদের দলকে পৃথক করলো। নিজেদের সাথে তারা পশুগুলোকে এবং শিশুদেরকে নিয়ে গেল। চল্লিশ দিন পর্যন্ত তারা কান্নাকাটি করলো। আল্লাহ তা'আলা তাদের আন্তরিকতাপূর্ণ নিয়ত এবং তাওবার বিশুদ্ধতা দেখে এসে যাওয়া শাস্তি তাদের উপর থেকে উঠিয়ে নিলেন। ইউনুস (আঃ)-এর কওম মুসিল অঞ্চলের নিনওয়া গ্রামের অধিবাসী ছিল। ইবনে মাসঊদ (রাঃ) لَوْكَانَتْ-কে هَلَّا كَانَتْ পড়েছেন। মোটকথা, শাস্তি তাদের মাথার উপর এমনভাবে ঘুরতে লাগলো, যেমনভাবে অন্ধকার রাত্রে মেঘখণ্ড ঘুরতে থাকে। ঐ লোকগুলো তাদের এক আলেমের কাছে গিয়ে বললোঃ "আমাদেরকে এমন একটি দুআ' লিখে দিন যার বরকতে আযাব সরে যায়।" ঐ আলেম নিম্নের দুআ'টি লিখে দেনঃ

يَاحَيُّ حِيْنَ لَا حَيَّ - يَا حَيُّ مُحْيِ الْمَوْتٰى - يَا حَيُّ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ

অর্থাৎ "হে জীবিত! যখন কেউ জীবিত নেই। হে জীবিত! মৃতকে জীবিতকারী। হে জীবিত! আপনি ছাড়া অন্য কেউ উপাস্য নেই।" এর ফলে আযাব দূর হয়ে যায়। এ সমুদয় কাহিনী সূরায়ে সাফ্ফাতের মধ্যে ইনশাআল্লাহ বর্ণিত হবে।

৯৯। আর যদি তোমার প্রতিপালক ইচ্ছা করতেন তাহলে বিশ্বের সকল লোকই ঈমান আনতো; তবে তুমি কি মানুষের উপর জবরদস্তি করতে পার, যাতে তারা ঈমান আনয়নই করে?

٩٩- وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَاٰمَنَ مَنْ فِى الْاَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيْعًا ۚ اَفَاَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتّٰى يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ ○

১০০। অথচ আল্লাহর হুকুম ছাড়া কারো ঈমান আনা সম্ভব নয়; আর আল্লাহ নির্বোধ লোকদের উপর (কুফরীর) অপবিত্রতা স্থাপন করে দেন।

١٠٠- وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تُؤْمِنَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۚ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ ○

আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে মুহাম্মাদ (সঃ)! যদি আল্লাহ চাইতেন তবে দুনিয়ার সমস্ত মানুষই ঈমান আনতো। কিন্তু তিনি যা কিছু করেন তাতে নিপুণতা রয়েছে। আল্লাহর ইচ্ছা হলে সবাই এক খেয়ালেরই হতো। কিন্তু পৃথিবীতে বিভিন্ন মতের লোক রয়েছে। সঠিক মতের উপর তারাই রয়েছে যাদের উপর আল্লাহর করুণা বর্ষিত হয়েছে। আর তাদের স্বভাবও এভাবেই বানানো হয়েছে। হে নবী (সঃ)! তোমার প্রতিপালকের এ কথাটি পূর্ণ হয়েই থাকবে। তা হচ্ছে এই যে, তিনি বলেনঃ "আমি অবশ্যই জাহান্নামকে দানব ও মানব উভয় জাতি দ্বারা পূর্ণ করবো।" যদি সকলকেই আল্লাহ হিদায়াত করতেন, তবে কি ঈমান অর্থহীন হয়ে যেতো না? তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে নবী (সঃ)! তুমি কি জোর করে তাদেরকে মুমিন বানাতে চাও? না, এটা তোমার জন্যে শোভনীয় নয় এবং ওয়াজিবও নয়। আল্লাহই যাকে চান পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে চান হিদায়াত দান করেন। তুমি তাদের জন্যে আফসোস করে করে নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিও না এই মনে করে যে, তারা ঈমান আনছে না। আল্লাহ পাক এক জায়গায় বলেনঃ "হে নবী (সঃ)! তুমি যাকে ভালবাস তাকে হিদায়াত দান করতে পার না।" অন্য জায়গায় তিনি বলেনঃ "হে রাসূল (সঃ)! তোমার দায়িত্ব হচ্ছে শুধু পৌঁছিয়ে দেয়া, আর হিসাব গ্রহণের দায়িত্ব আমার।" আর এক জায়গায় মহান আল্লাহ বলেনঃ "হে নবী (সঃ)! তুমি শুধু উপদেশ দিতে থাকো, কেননা, তুমি তো শুধু উপদেষ্টা মাত্র। তুমি তাদের উপর দায়গ্রস্ত অধিকারী নও।" এ আয়াতগুলো এটাই প্রমাণ করছে যে, আল্লাহ তা'আলা যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন। আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া কেউই ঈমান আনতে পারে না। জ্ঞান ও বিবেক দ্বারা যে কাজ করে না তাকে পথভ্রষ্ট করে দেয়া হয়। হিদায়াত করা ও না করার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা ন্যায়পরায়ণ।

১০১। তুমি বলে দাও– তোমরা ভেবে দেখো, কি কি বস্তু রয়েছে আসমানসমূহে ও যমীনে; আর যারা ঈমান আনয়ন করে না, প্রমাণাদি ও ভয় প্রদর্শন তাদের কোন উপকার সাধন করতে পারে না।

١٠١- قُلِ انْظُرُوْا مَاذَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْاٰيٰتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُوْنَ ○

১০২। অতএব, তারা শুধু ঐ লোকদের অনুরূপ ঘটনাবলীর প্রতীক্ষা করছে, যারা তাদের পূর্বে গত হয়ে গেছে, তুমি বলে দাও- আচ্ছা তবে তোমরা (ওর) প্রতীক্ষায় থাকো, আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষারতদের মধ্যে রইলাম।

١٠٢- فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ○

১০৩। পরন্তু আমি স্বীয় রাসূলদেরকে এবং মুমিনদেরকে বাঁচিয়ে রাখতাম, এইরূপেই আমি মুমিনদেরকে নাজাত দিয়ে থাকি। এটা আমার দায়িত্ব।

١٠٣- ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَٰلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ ○

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বন্দাদেরকে অন্তর্দৃষ্টি প্রসারিত করার উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন- সারা বিশ্বে আমার যেসব নিদর্শন ছড়িয়ে রয়েছে, যেমন আকাশের তারকারাজি, নক্ষত্র, সূর্য, চন্দ্র, রাত, দিন ইত্যাদি, এগুলোর প্রতি তোমরা তোমাদের অন্তর্দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখো যে, কিভাবে রাত্রির মধ্যে দিবসকে এবং দিবসের মধ্যে রাত্রিকে প্রবেশ করিয়ে দেয়া হচ্ছে! কখনো দিন বড় হচ্ছে, আবার কখনো রাত বড় হচ্ছে। আর আকাশের উচ্চতা ও প্রশস্ততা, তারকারাজি দ্বারা তাকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করা, আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণ, যমীন শুষ্ক হয়ে যাওয়ার পর পুনরায় তাকে সঞ্জীবিত ও সবুজ-শ্যামল করা, উদ্ভিদ ও বৃক্ষরাজিতে ফল, ফুল ও পাঁপড়ি সৃষ্টি করা, বিভিন্ন প্রকারের তরুলতা উৎপন্ন করা, বিভিন্ন প্রকারের জীব-জন্তু সৃষ্টি করা, এগুলোর আকৃতি, রং, উপকারিতা ও অপকারিতা পৃথক হওয়া, পাহাড়, মরুভূমি, বন-জঙ্গল, বাগবাগিচা, আবাদী ও পতিত ভূমি, সমুদ্র, তার তলদেশের বিস্ময়কর বস্তুরাজি, তরঙ্গমালা, জোয়ার-ভাটা, এতদসত্ত্বেও ভ্রমণকারীদের ওর উপর দিয়ে নৌকা, জাহাজ ইত্যাদি যোগে ভ্রমণ করা, এ সবগুলো হচ্ছে মহাশক্তিশালী আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনসমূহ, যিনি ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় এই যে, এসব নিদর্শন কাফিরদের চিন্তা ও গবেষণার কোনই কারণ হচ্ছে না। আল্লাহর দলীল সাব্যস্ত হয়ে গেছে, এরা ঈমান আনছে না এবং আনবেও না। এ

লোকগুলো তো ঐ শাস্তির দিনগুলোরও অপেক্ষা করছে, যার সম্মুখীন হয়েছিল তাদের পূর্ববর্তী কওমগুলো। আল্লাহ পাক বলেনঃ হে নবী (সঃ)! তাদেরকে বলে দাও– তোমরা সময়ের জন্যে অপেক্ষা কর। আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষা করছি। অবশেষে যখন অপেক্ষার সময় শেষ হয়ে শাস্তি এসেই পড়বে তখন আমি রাসূলদেরকে এবং তাদের উম্মতদেরকে বাঁচিয়ে নিব। আর যারা রাসূলদেরকে অস্বীকার করেছিল তাদেরকে ধ্বংস করে দিব। মুমিনদেরকে রক্ষা করার যিম্মা মহান আল্লাহ গ্রহণ করেছেন, যেমন তিনি সৎকর্মশীলদের উপর করুণা বর্ষণ নিজের যিম্মায় নিয়েছেন। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, আল্লাহর কিতাব লাওহে মাহফূজে, যা আরশের উপর রয়েছে, তাতে লিখিত আছেঃ "আমার রহমত আমার গযবের উপর জয়যুক্ত।"

১০৪। তুমি বলে দাও– হে লোক সকল! যদি তোমরা আমার দ্বীন সম্বন্ধে সন্দিহান হও, তবে আমি সেই মা'বূদদের ইবাদত করি না, আল্লাহকে ছেড়ে তোমরা যাদের ইবাদত কর, কিন্তু আমি সেই মা'বূদের ইবাদত করি, যিনি তোমাদের জান কব্জ করেন, আর আমাকে এই আদেশ করা হয়েছে যে, আমি যেন ঈমান আনয়নকারীদের দলভুক্ত থাকি।

١٠٤- قُلْ يٰاَيُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ فِيْ شَكٍّ مِّنْ دِيْنِيْ فَلَآ اَعْبُدُ الَّذِيْنَ تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ اَعْبُدُ اللّٰهَ الَّذِيْ يَتَوَفّٰكُمْ ۖ وَاُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

১০৫। আর এটাও যে, নিজেকে নিজে এই ধর্মের প্রতি এইভাবে নিবিষ্ট করে রাখবে যে, অন্যান্য সকল তরীকা হতে পৃথক হয়ে যাও, আর কখনো মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।

١٠٥- وَاَنْ اَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا ۚ وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۝

١٠٦- وَلَا تَدۡعُ مِنۡ دُوۡنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنۡفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ ۚ فَاِنۡ فَعَلۡتَ فَاِنَّكَ اِذًا مِّنَ الظّٰلِمِيۡنَ ○

১০৬। আর আল্লাহকে ছেড়ে এমন বস্তুর বন্দেগী করো না, যা না তোমার কোন উপকার করতে পারে, না কোন ক্ষতি করতে পারে, বস্তুতঃ যদি এইরূপ কর তবে তুমি এমতাবস্থায় হক বিনষ্টকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

١٠٧- وَاِنۡ يَّمۡسَسۡكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗۤ اِلَّا هُوَ ۚ وَاِنۡ يُّرِدۡكَ بِخَيۡرٍ فَلَا رَآدَّ لِفَضۡلِهٖ ؕ يُصِيۡبُ بِهٖ مَنۡ يَّشَآءُ مِنۡ عِبَادِهٖ ؕ وَهُوَ الۡغَفُوۡرُ الرَّحِيۡمُ ○

১০৭। যদি আল্লাহ তোমাকে কোন কষ্টে নিপতিত করেন, তবে তিনি ছাড়া কেউ তা মোচনকারী নেই, আর যদি তিনি তোমার প্রতি কোন কল্যাণ ও শান্তি পৌঁছাতে চান, তবে তাঁর অনুগ্রহের কোন অপসারণকারী নেই; তিনি স্বীয় অনুগ্রহ নিজের বান্দাদের মধ্য হতে যাকে চান দান করেন; এবং তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতিশয় দয়ালু।

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল মুহাম্মাদ (সঃ)-কে বলেনঃ তুমি বলে দাও– হে লোক সকল! আমি যে দ্বীনে হানীফ (একনিষ্ঠ ধর্ম) নিয়ে এসেছি, যার অহী আমার উপর অবতীর্ণ হয়েছে, যদি এর সঠিকতা ও সত্যতার ব্যাপারে তোমাদের সন্দেহ হয়ে থাকে তবে জেনে রেখো যে, আমি তোমাদের উপাস্যদের কখনো উপাসনা করবো না। আমি এক ও অংশীবিহীন আল্লাহরই বান্দা, যিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটিয়ে থাকেন এবং যিনি তোমাদের জীবন দান করেছেন। নিঃসন্দেহে তোমাদের সকলকেই তাঁরই নিকট ফিরে যেতে হবে। আচ্ছা, যদি ধরে নেয়া হয় যে, তোমাদের মা'বূদ সত্য, তবে তাদেরকে আমার কোন ক্ষতি করতে বলতো? জেনে রেখো যে, তাদের কারো লাভ বা ক্ষতি করার কোনই ক্ষমতা নেই। লাভ ও ক্ষতি করার হাত তো শরীকবিহীন আল্লাহর। হে নবী (সঃ)! তুমি কাফিরদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে সম্পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে আল্লাহর ইবাদতে লেগে

যাও। শিরকের দিকে একটুও ঝুঁকে পড়ো না। যদি আল্লাহ তোমাকে ক্ষতির মধ্যে পরিবেষ্টন করেন, তবে কে এমন আছে যে, তোমাকে তা থেকে বের করতে পারে? লাভ ও ক্ষতি, কল্যাণ ও অকল্যাণ তো তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী।

আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "তোমরা সারা জীবন কল্যাণ অনুসন্ধান কর এবং আল্লাহর নিয়ামতসমূহ কামনা কর। আল্লাহর করুণার হাওয়া যে সৌভাগ্যবানকে স্পর্শ করেছে সে ভাগ্যবান বটে। তিনি যাকে চান তার উপর নিজের করুণা বর্ষণ করেন। আল্লাহ পাকের নিকট প্রার্থনা কর যে, তিনি যেন তোমাদের দোষত্রুটি গোপন রাখেন এবং তোমাদেরকে যুগের বিপদাপদ এবং নফসের বিপদাপদ থেকে নিরাপত্তা দান করেন। তিনি ক্ষমাশীল ও দয়ালু। তোমাদের যত বড়ই পাপ হোক না কেন, যদি তাওবা করে নাও, তবে তিনি তা ক্ষমা করে দেবেন। এমন কি শিরক করেও যদি তাওবা কর, তবে তাও তিনি ক্ষমা করবেন।

১০৮। তুমি বলে দাও– হে লোক সকল! তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে সত্য (ধর্ম) এসেছে, এতএব, যে ব্যক্তি সঠিক পথে আসবে, বস্তুত সে নিজের জন্যেই পথে আসবে, আর যে ব্যক্তি পথভ্রষ্ট থাকবে, তার পথভ্রষ্টতা তারই উপর বর্তাবে, আর আমাকে (রাসূল সঃ -কে) তোমাদের উপর দায়িত্বশীল করা হয়নি।

١٠٨- قُلْ يَاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدٰى فَاِنَّمَا يَهْتَدِيْ لِنَفْسِهٖ وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَآ اَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيْلٍ ۝

১০৯। আর তুমি তোমার প্রতি প্রেরিত অহীর অনুসরণ কর, আর ধৈর্যধারণ কর এই পর্যন্ত যে, আল্লাহ মীমাংসা করে দেন এবং তিনিই উত্তম মীমাংসাকারী।

١٠٩- وَاتَّبِعْ مَا يُوْحٰى اِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتّٰى يَحْكُمَ اللّٰهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ ۝ ع

আল্লাহ তা'আলা নবী (সঃ)-কে নির্দেশ দিচ্ছেন- হে নবী (সঃ)! তুমি লোকদেরকে বলে দাও যে, আল্লাহ তা'আলার নিকট হতে যেসব অহী এসেছে তা সত্য। তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। যে ব্যক্তি হিদায়াত প্রাপ্ত হয়েছে এবং তার অনুসরণ করেছে, তার উপকার সে নিজেই লাভ করবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি হিদায়াত লাভ করেনি, তার কুফল তাকেই ভোগ করতে হবে। আমি আল্লাহর ফৌজদার নই যে, তোমাদেরকে জোরপূর্বক মুমিন বানিয়ে দিব। আমি তো শুধু তোমাদেরকে আল্লাহর শাস্তি হতে ভয় প্রদর্শনকারী। হিদায়াত দান করার কাজ একমাত্র আল্লাহর। আল্লাহ পাক বলেন- হে নবী (সঃ)! তুমি নিজেই অহীর অনুসরণ কর এবং তাকে শক্ত করে ধরে থাক। যারা তোমার বিরোধিতা করছে ওর উপর ধৈর্যধারণ কর, যে পর্যন্ত না আল্লাহর ফায়সালা চলে আসে। তিনি উত্তম ফায়সালাকারী। অর্থাৎ স্বীয় ইনসাফ ও হিকমতের মাধ্যমে তিনি উত্তম মীমাংসাকারী।

সূরা ঃ ইউনুস এর তাফসীর সমাপ্ত

تفسير ابن كثير

تأليف

الحافظ عماد الدين ابن كثير رحمه اللّه

الترجمة

الدكتور محمد مجيب الرحمن
الاستاذ للغة العربية والدراسات الاسلامية
جامعة راجشاهى، بنغلاديش